পাবনা জেলার ইতিহাস



পাবনা জেলার ইতিহাস

(১—৬ খণ্ড একত্রে)

রাধারমণ সাহা

সিরাজগঞ্জের ইতিহাস

মৌলবি মোখ্‌তার আহ্‌মদ-সিদ্দিকী



সম্পাদনা/সংযোজন

কমল চৌধুরী



২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

PABNA JELAR ITIHAS
by Radharaman Saha
Edited by Kamal Choudhuri

প্রথম প্রকাশ : ১ম ও ২য় খণ্ড ১৩৩০
৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৩৩৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০০

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
অপরূপ উকিল

অক্ষর বিন্যাস
ভারবি
১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—সাধারণ বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ—জেলার অবস্থান ও প্রাচীনত্ব ১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—পাবনা নামের উৎপত্তি ২০

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রাকৃতিক বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ—চতুঃসীমা ও আয়তন ২৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—স্থল, জল ও বায়ু ২৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—নদী সমূহের বিবরণ—পদ্মা-যমুনা-করতোয়া-আত্রাই-হুরাসাগর-বরল-ইছামতী ও অন্যান্য ৩৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—খাল, বিল ও চর ৫৮

তৃতীয় অধ্যায়—যাতায়াতের উপায়

প্রথম পরিচ্ছেদ—স্থলপথ—প্রাচীন শাহীপথ—কোম্পানির আমলের রাস্তা—ইম্পিরিয়াল ও লোকাল রোড—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রোড—রেলপথ—হালট ও জাঙ্গাল ৬৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জলপথ—স্টিমার পথ—নৌকাপথ ৭৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সেতু ও খেওয়া—হার্ডিঞ্জ ব্রীজ—ইলিয়ট ব্রীজ—ইমারসন ব্রীজ—খেওয়া ঘাট ৭৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস ৮৯

চতুর্থ অধ্যায়—থানা ও গ্রামাদি

প্রথম পরিচ্ছেদ—থানাসমূহ ৯১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—প্রধান প্রধান গ্রাম ও বাজারাদি ৯১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—আদালত ও অফিসাদি ৯২

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—পুরাবৃত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ—ঐতিহাসিক বিবরণ
(ক) সাধারণ বিবরণ ১০১
(খ) প্রাচীন ইতিবৃত্ত ১০৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—হিন্দু রাজত্বকাল
(ক) জৈন বৌদ্ধযুগ ১০৭
(খ) পাল রাজত্বকাল ১১৩
(গ) সেন রাজত্বকাল ১১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মুসলমান অধিকার কাল
(ক) পাঠান আমল ১১৯
(খ) মোঘল আমল ১২৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—ইংরেজশাসন কাল
(ক) ইংরেজ অধিকারের পূর্বাবস্থা ১৪৯
(খ) বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা ১৫৪
(গ) বর্তমান ইংরেজ শাসন কাল ১৬২

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—প্রত্নতত্ত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ—মসজিদ ও মন্দির ১৭৭
(১) মক্‌দুম সাহেবের মসজিদ, (২) মাশুম খাঁর মসজিদ, (৩) নসরৎ শাহের মসজিদ, (৪) সমাজ গ্রামের মসজিদ, (৫) পীর সাহেবের দরগাহ, (৬) সাহনুরের দরগাহ, (৭) শাহ কামালের দরগাহ—(ক) নবরত্ন মন্দির—পোতাজিয়া ও হাটিকুমরুল, (খ) জগন্নাথে মন্দির—হাণ্ডিয়াল, (গ) কপিলেশ্বর মন্দির—তাড়াস, (ঘ) শেঠের বাঙ্‌লা-হাণ্ডিয়াল, (ঙ) জোড় বাঙ্‌লা—পাবনা।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—প্রাচীনত্বের নিদর্শন ১৯৬
(ক) বিগ্রহাদি—(১) চৈতন্যভৈরবী উধুনিয়া, (২) সিদ্ধেশ্বরী—নরসিংহপাড়া, (৩) ভবানী সরগ্রাম, (৪) বাসুদেব বিগ্রহমূর্তি, (৫) দশভূজা মূর্তি—দৌলতপুর, (৬) সূর্য মূর্তি—কাঁটাবাড়ি, (৭) হরগৌরী মূর্তি—বোঁথড়।
(খ) জলাশয় ও দীর্ঘিকাদি—(১) জয়সাগর, (২) ময়দান দীঘি।
(গ) প্রাচীন জাঙ্গাল ও রাজবর্ত্ম—(১) ভীমের জাঙ্গাল, (২) সাহীপথ।
(ঘ) প্রাচীন মুদ্রা।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—তাম্রশাসন ও সনন্দাদি ২০৭
(ক) লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন
(খ) সায়েস্তা খাঁর সনন্দ
(গ) প্রাচীন দলিলাদি—(১) গোঁসাইরামপুর (৯৪৫), (২) হিমাইতপুর (১০১৪), (৩) শঙ্করপাশা (১০১৫), (৪) গুণাইগাছা (১১০৮), (৫) ডেমরা (১১১৩), (৬) স্থল (১১১৭), (৭) দৌলতপুর (১১২১), (৮) হাণ্ডিয়াল (১১৪১/৮২), (৯) নরনিয়া (১১৭৯), (১০) অষ্টমণীষা (১১৭৪)।
(ঘ) গবর্নমেন্ট পেনসন পেমেন্ট অর্ডার।

দ্বিতীয় অধ্যায়—জমিজমা ও জমিদারগণ

প্রথম পরিচ্ছেদ—জমির স্বত্বাদি ২২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—খাজনাদি ২২৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—প্রজাবিদ্রোহ—কারণ—প্রকাশ—দমন ২২৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—জমিদারগণের বিবরণ। সাধারণ বিবরণ। ২৩৮

(ক) জেলাবাসী জমিদারগণ ২৪১
(১) তাড়াস জমিদার বংশ, (২) তাঁতিবন্দ চৌধুরী বংশ, (৩) দুলাই চৌধুরী বংশ, (৪) পার্শ্বডাঙ্গা জমিদার বংশ, (৫) পোরজনা ভাদুড়ী বংশ, (৬) বেলকুচি চৌধুরী বংশ, (৭) শীতলাই জমিদার বংশ, (৮) সলপ জমিদার বংশ, (৯) স্থল পাকড়াশী বংশ।
(খ) ভিন্ন জেলাবাসী জমিদারগণ ২৬৮
(১) ঠাকুর, (২) বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) করোটিয়া, (৪) নাটোর, (৫) দিঘাপাতিয়া, (৬) বলিহার, (৭) কাসিমবাজার, (৮) লালগোলা, (৯) নবাব, ঢাকা (১০) নরাইল, (১১) নলডাঙা, (১২) ছয়আনী, (১৩) বড় পাঁচ আনী, (১৪) ছোট পাঁচ আনী, (১৫) আমবারিয়া, (১৬) ধরাইল, (১৭) সাহা চৌধুরী।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—কৃষি ও উৎপন্ন দ্রব্য

প্রথম পরিচ্ছেদ—সাধারণ বিবরণ ২৭৭
জমির প্রকৃতি—সার—কৃষিকার্যে ব্যবহৃত দ্রব্য—গবাদি—কৃষির উন্নতি চেষ্টা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষিজীবী ও তাহাদের অবস্থা ২৮০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—উৎপন্ন দ্রব্য ২৮২
কৃষিজাত—বাগানজাত—বনজাত—জলজাত

দ্বিতীয় অধ্যায়—শিল্প ও বাণিজ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ—সাধারণ বিবরণ ৩০৯
শিল্পের অবস্থা—উন্নতি ও অবনতি
পাবনায় ব্যবসায়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শিল্পজীবী ও তাহাদের অবস্থা ৩১২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—শিল্পজাত দ্রব্য ৩১৪
যন্ত্রচালিত শিল্প—হস্তচালিত শিল্প—লুপ্ত শিল্প—খাদ্য শিল্প।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—বাণিজ্যাদি ৩২৩
ব্যবসায়ী জাতি—স্থায়ী বাজার—প্রধান প্রধান হাটের তালিকা—মেলাদি—বাজার ওজন, কৃষকের মাপ—জমির মাপ—বাজার দর—শ্রমজীবী ও পারিশ্রমিক—ব্যাঙ্ক—ঋণগ্রহণ—আমদানি রপ্তানি।

তৃতীয় অধ্যায়—শিক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ—সাধারণ বিবরণ ৩৩২
সংস্কৃতচর্চা—আধুনিক শিক্ষা—ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত—উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় মধ্য ইংরাজি ও বাংলা স্কুল—প্রাইমারি স্কুল—বিশেষ স্কুল—মাদ্রাসা।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—বিদ্যালয় ও শিক্ষিত সংখ্যা ৩৩৪
বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যা—হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র সংখ্যা—হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিত সংখ্যা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সংবাদপত্র, লাইব্রেরী ও প্রেস ৩৩৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—পণ্ডিত, কবি ও সাহিত্যিকগণ ৩৩৮

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত—গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, যদুনাথ বিদ্যারত্ন, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ বারিধি ও কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ—কবি ও সাহিত্যিকগণ—স্ত্রীলোক কবি ও গ্রন্থকর্ত্রী—মুসলমান গ্রন্থকারগণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—বিশিষ্ট ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ ৩৪২

যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী—ঠাকুর শম্ভুচাঁদ—সাধক বক্তা—সঙ্গীতজ্ঞগণ —বিভিন্ন প্রকার গান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—সভাসমিতি ও প্রদর্শনী ৩৫২

সপ্তম পরিচ্ছেদ—পাবনাবাসী বিদেশে ৩৫৩

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—পাবনা সদর

প্রথম পরিচ্ছেদ—পাবনা ৩৬১

পাবনা, রাধানগর দিং, হিমাইতপুর দিং, মালঞ্চি পয়দা দিং, গয়েশপুর দিং, দোগাছি দিং, ভাউডাঙা দিং, দুবিলা দিং, কুঁচিয়ামোরা দিং, দাপুনিয়া দিং।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সাঁড়া ৩৭৯

সাঁড়া, ঈশ্বরদি, পাকসি, রূপপুরদিং, পাকুরিয়া, দিঘা, সিলিমপুরদিং, দাশুরিয়া, ধাপারি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—আটঘরিয়া ৩৮৪

আটঘরিয়া, দেবোত্তর, চান্দভা. মূলগ্রাম, গোররীদিং, একদন্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—চাটমহর ৩৮৭

চাটমহর, গুণাইগাছাদিং, হরিপুর, পার্শ্বডাঙা, হাণ্ডিয়াল, বল্লভপুর, অষ্টমনীষা, ভাঙ্গুরিয়াদিং, সমাজদিং, ধানুয়াঘাটা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ফরিদপুর ৪০১

ফরিদপুর, গোপালনগর, ডেমড়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—সাঁথিয়া ৪০৩

সাঁথিয়া, করঞ্জা, হাপানিয়াদিং. আতাইকুলা, ক্ষেতুপাড়া. ধুলাউরি, ছাতকদিং, কাশীনাথপুরদিং।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—বেড়া ৪১৩

বেড়া, সাধুগঞ্জদিং, সিন্দুরীদিং. ভারেঙ্গা. নগরবাড়িদিং, রতনগঞ্জদিং, মাসুন্দিয়া, মথুরাদিং, রঘুনাথপুরদিং।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—সুজানগর ৪২২

সুজানগর. নাজিরগঞ্জদিং, সাগরকান্দি, খলিলপুর দুলাই. তাঁতিবন্দ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সিরাজগঞ্জ মহকুমা

প্রথম পরিচ্ছেদ—সিরাজগঞ্জ ৪৩০

সিরাজগঞ্জ, বাগবাটি, পিপুলবারিয়া, ঘোরাচড়াদিং, দত্তবাড়ি, কালিয়াহরিপুর, সয়দাবাদ, কাওয়াখোলা, রাণীগ্রাম, কাজিপুর, সোনামুখী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—রায়গঞ্জ ৪৪৩

রায়গঞ্জ, ধানঘরা, করিলাবাড়ি, পাঙাসি, চান্দাইকোণা, আটঘরিয়া, ভূঁএগাগাতি, তাড়াস, কোহিত, নিমগাছি, বারুহাস, কাঁটাবাড়ি, তালম, নবগ্রাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—উল্লাপাড়া ৪৫০

উল্লাপাড়া, মোহনপুর, সলঙ্গা, সলপ, উধুনিয়া, চৈত্রহাটি, জামতৈল, ঝাউল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—শাহজাদপুর ৪৫৩

সাহাজাদপুর, গাঁড়াদহ, পোতাজিয়া, পোরজনা, স্থলদিং, চৌহালি, সোহাগপুর সদিয়াচাঁদপুর, দৌলতপুর।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—আদম সুমারি

প্রথম পরিচ্ছেদ—সাধারণ বিবরণ ৪৬৯

(ক) প্রাচীন অধিবাসী, (খ) বর্তমান অধিবাসী,
(গ) মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—লোক সংখ্যা ৪৭৪

হ্রাসবৃদ্ধি—বসতি সংখ্যা—প্রবাসী ও নিবাসী প্রতি দশ বৎসরের লোক সংখ্যা—থানা প্রতি লোক সংখ্যা—পরিমাণকল ও লোক সংখ্যা—থানা প্রতি জাতি সংখ্যা—বিভিন্ন জাতি সংখ্যা, বিবাহিত ও অবিবাহিত—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত—ব্যাধিগ্রস্ত সংখ্যা—প্রতি থানায় শিক্ষিত সংখ্যা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিভিন্ন জাতি ও সমাজ ৪৮০

কাপালি—কামার—কায়স্থ—কুম্ভকার—কৈবর্ত—গন্ধবণিক—গোপ—তন্তুবায়—তিলি—ধোপা—নমঃশূদ্র—নাপিত—পাটনি—মালি—মোলো—মুচি—চামার—মুণ্ডাদিং—বারুই—ব্রাহ্মণ—বৈশ্য—বৈষ্ণব—সাহা—সুবর্ণবণিক—সূত্রধর—যোগী—মুসলমান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় ৫০২

শৈবশাক্ত—বৈষ্ণব—সৎসঙ্গী—ব্রাহ্ম—খ্রিস্টান—জৈন—বৌদ্ধ—প্রেতোপসনা—মুসলমান ধর্ম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—লোকের আকৃতি, প্রকৃতি, উপজীবিকা ৫০৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—জীবজন্তু ৫০৫

গৃহপালিত—বন্য—জলজন্তু—পক্ষী—সর্প।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দেশের অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ—সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা ৫০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—লোকের সুখ শান্তি ৫১০
শ্যামা-রামা—পণ্ডিতা ডাকাইত—মগ আক্রমণ—গামছামোড়া—মহর খাঁ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—প্রাকৃতিক বিপ্লবাদি ৫১১
জলপ্লাবন—দুর্ভিক্ষ—ঝটিকাবর্ত—ভূমিকম্প।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—ক্রীড়া ও ব্রতপূজাদি ৫১৩
ক্রীড়া—ব্রতপূজাদি—খাদ্য ও স্বাস্থ্য—দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহ—প্রচলিত কথা—আচার—ব্যবহার—নামকরণ—শোক প্রকাশ—সংস্কার।

তৃতীয় অধ্যায়—শাসন সংরক্ষণাদি

প্রথম পরিচ্ছেদ—সাধারণ শাসন বিভাগ ৫২০
ফৌজদারী বিভাগ—দেওয়ানি বিভাগ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—রাজস্ব বিভাগ ৫২১
পরগণার নাম ও অবস্থান—জেলার রাজস্বাদি—স্ট্যাম্প—ইনকাম ট্যাক্স—আবগারি—মোট আয় ব্যয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিবিধ বিভাগ ৫২৪
পুলিশ—রেজেস্টারি—জেলা বিভাগ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—স্বায়ত্বশাসন ৫২৫
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচন—ডিস্ট্রিক্টবোর্ড—মিউনিসিপ্যালিটি—আয় ও ব্যয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ডাক বিভাগ ৫২৮
পোস্টাফিস ও তদধীনস্থ গ্রামের নাম।

সিরাজগঞ্জের ইতিহাস—মৌলবি মোখ্‌তার আহমদ-সিদ্দিকী ৫৩৯—৫৮৪

সংযোজন ৫৮৫

সাধারণ বিবরণ : নদনদী—সড়ক ও জলপথ—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৫৮৭
হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি—ব্যবসা বাণিজ্য—হাট বাজার—মেলা—
প্রাকৃতিক বিপর্যয়—দুর্ভিক্ষ : ১৮৭৪—প্রজাবিদ্রোহ ৬০৭

পাবনার বিবরণ—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৬৫১
বিশিষ্ট স্থান ৬৫৫
ভেষজ উদ্ভিদ ৬৬৪
লোকসঙ্গীত ও ছড়া ৬৬৭
মানচিত্র ৬৮৭—৬৮৮
চিত্র

পাবনা জেলার ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।



উৎসর্গ পত্র।

জেলার

হিন্দু ও মুসলমানাদি

দেশীয় ও বিদেশীয়

অধিবাসিগণের

করকমলে

পাবনা জেলার ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

সাদরে অর্পিত

হইল।

১৩৩০

বিনীত—

শ্রীশ্রীপঞ্চমী।

গ্রন্থকার

নিবেদন

প্রায় চৌদ্দ বৎসরের চেষ্টায় ও বিগত চারি বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে পাবনা জেলার ইতিহাসের প্রকাশ আরম্ভ হইল। আরও কিছুদিন পরে মুদ্রিত হইলে ভাল হইত, কিন্তু অনেকের আগ্রহাতিশয্যে ও নানাকারণে ইহা এক্ষণেই প্রকাশিত হইল। পাবনার ইতিহাস পাবনাতেই মফঃস্বলে মুদ্রিত, সুতরাং কলকাতার ন্যায় তেমন সুন্দর ছাপা আশা করা যায় না। যথাসাধ্য প্রুফ সংশোধনের চেষ্টা সত্ত্বেও পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে; তজ্জন্য পুস্তক শেষে শুদ্ধিপত্র সন্নিবেশিত হইল। ইহা যথেষ্ট হইয়াছে কিনা বলা যায় না। আশা করি, পাঠকবর্গ পুস্তকের ত্রূটি মার্জনা করিবেন।

বাংলায় সমগ্র জেলার ইতিহাস না থাকিলেও, ভিন্ন জেলাবাসী জনৈক সরকারি কর্মচারী ইতিপূর্বে "সিরাজগঞ্জের ইতিহাস" (১৩২২) নামে একখণ্ড পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। শিল্পবাণিজ্য হিসাবে পাবনা জেলায়, বিশেষতঃ সিরাজগঞ্জের ইতিহাসে বাঙালির বহু জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এই সিরাজগঞ্জে সর্বপ্রথম নিযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এ. বেরী যে স্থানীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পরে রাজকার্য পরিত্যাগপূর্বক পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত হন এবং কালে তথাকার প্রসিদ্ধ চটকল প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রথমতঃ অন্যান্য জেলার ন্যায় পাবনায় ইতিহাসের কোন বিশেষ উপকরণ নাই ভাবিয়া একরূপ হতাশ হই; এমন কি পাবনার বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ও এক সময়ে আমাকে এই পুস্তক প্রকাশের উদ্যমে নিরুৎসাহিত করেন। পরে অনুসন্ধানে ও কার্যে লিপ্ত হইয়া যতই অগ্রসর হইয়াছি, ততই এখানেও ইতিহাসের বহু উপাদান আছে জানিয়া, তাহার ফলে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাই সরলভাবে যথাসাধ্য বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সমগ্র পুস্তকখানি একত্রে প্রকাশের ইচ্ছা থাকিলেও নানাকারণে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। একসঙ্গে দুই প্রেসে দিয়া এক বৎসরে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মাত্র মুদ্রিত হইল এবং সম্পূর্ণ পুস্তকখানিকে নিম্নলিখিতভাবে খণ্ডাকৃতি করিতে হইল। যথা—প্রথম খণ্ড—সাধারণ বিবরণ—প্রাকৃতিক বিবরণ—যাতায়াতের উপায়—থানা ও গ্রামাদি। দ্বিতীয় খণ্ড—পুরাবৃত্ত। তৃতীয় খণ্ড—প্রত্নতত্ত্ব—জমিজমা ও জমিদারগণ—আদমশুমারী—দেশের অবস্থা। চতুর্থ খণ্ড—কৃষি ও উৎপন্ন—শিল্প ও বাণিজ্য—শিক্ষা—শাসনাদি। পঞ্চম খণ্ড—প্রধান প্রধান গ্রামের বিবরণ।

পুস্তক মধ্যে যে সমস্ত ইংরেজি অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ভাব গুরুত্ব ও পাঠ সৌকর্যার্থে পাদটিকায় না দিয়া অনুবাদসহ পুস্তক মধ্যেই সন্নিবেশিত হইল। প্রথম অধ্যায়ে পাবনা নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গ প্রয়োজনানুরোধেই কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিতে হইয়াছে। জেলার দক্ষিণে ও পূর্বের পদ্মা ও যমুনা নদী দ্বারা ইহার বার্ষিক পরিবর্তন ঘটিতেছে; আজ যাহা আছে, দুই দিন পরে তাহা আর দেখা যাইতেছে না। তজ্জন্য নদী বিল খাল ও চরসমূহের নীরস বিবরণাদিও একেবারে অবহেলাযোগ্য নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহা লিখিত হইয়াছে। জেলার নদীসমূহ মধ্যে পদ্মা (গঙ্গা), যমুনা (ব্রহ্মপুত্র), করতোয়া ও আত্রাই (আত্রেয়ী) নদী চতুষ্টয় পুণ্যতোয়া বলিয়া কীর্তিত তজ্জন্য তাহাদের সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক বিবরণ লিখিত হইল। তৃতীয় অধ্যায়ে সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থ রাস্তা পথের বিবরণসহ সেতু ও খেওয়া ঘাট এবং পোস্ট অফিসাদির তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে থানা ও প্রধান গ্রামাদির তালিকা দেওয়া গেল; তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র লিখিত হইবে। এই চারি অধ্যায়ে জেলার ভৌগোলিক বিবরণ স্থূলতঃ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

মফঃস্বলে ভ্রমণকালে অনেকেই আমাকে নানারূপ সাহায্য ও উৎসাহিত করিয়াছেন। সহায়তাকারিগণ মধ্যে হিমাইতপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরী মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থলের পাক্‌ড়াশী বংশীয় কতিপয় শিক্ষিত ও উৎসাহী ব্যক্তিও আমার কার্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। পাবনা "রজনীকান্ত পাঠাগারের" অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস মহাশয় বয়সে নবীন হইলেও অনেক সময় আমাকে প্রবীণের উপদেশ প্রদানে ও সাধারণের নিকট আমার কার্য জন্য আবেদন নিবেদনপূর্বক আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। পাবনার ভূতপূর্ব জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। ইনি মদীয় প্রথম উদ্যমকালে আমাকে মৌখিক উপদেশ ও বিশেষ বিশেষ পুস্তকাদি পাঠে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। পাবনার অন্য যে সমস্ত শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ ও মদীয় বন্ধুবর্গ আমাকে নানাপ্রকারে সাহায্য ও উৎসাহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক বি. এল ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন চৌধুরী বি. এল মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা উভয়েই অনেক সময়ে পুস্তকের প্রুফ এবং মদীয় লিখিত বিষয় সংশোধন ও পরিবর্তনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত তারকনাথ মৈত্র বি. এল মহাশয়ও আমাকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিয়াছেন।

এইরূপে প্রোৎসাহিত হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পর কখনও আর্থিক বিভীষিকায় ভীত হই নাই, সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণপূর্বক পারিবারিক ও শারীরিক নানারূপ বিপত্তি মধ্যে কেবলমাত্র সাহসে নির্ভর করতঃ স্বীয় সংকল্প ও উদ্দেশ্য সাধনে ক্রমে অগ্রসর হইয়াছি। অনেক সময় আর্থিক সমস্যা কায়িক পরিশ্রমে সমাধান করিয়াছি, তথাপি কখন লক্ষ্যচ্যুত হই নাই। ঘরে বসিয়া বই লেখা সহজ, কিন্তু গ্রামে গ্রামে একাকী ঘুরিয়া ঘুরিয়া তথ্যানুসন্ধান কিরূপ সহজসাধ্য তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের সহজে বোধগম্য নহে। এরূপ কার্যে এই কয়েক বৎসর মধ্যে মাত্র দুই দিনের জন্য ডোমরা নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবীলাল গোস্বামী মহাশয়ের সহায়তা ব্যতীত অন্য কাহারও বিশেষ সাহায্য পাই নাই।

পুস্তকের এই খণ্ড মুদ্রিত হওয়াকালে মদীয় সহাধ্যায়ী ও প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত নবগৌরাঙ্গ বসাক পি. আর. এস মহাশয় ২০ কুড়ি টাকা, শিতলাই এর জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় ১০০ এক শত টাকা এবং তাড়াস পূর্ববাটির নায়েব শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সিংহ মহাশয় ৫ পাঁচ টাকা এতদুপলক্ষে অর্থ সাহায্য করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

উপরিউক্তরূপে এই পুস্তক প্রকাশে যাঁহারা আমাকে যে কোন প্রকারে সাহায্য ও উৎসাহদান করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকটই আমি কৃতজ্ঞ ও বাধিত থাকিলাম। এই পুস্তক দ্বারা জেলাবাসী ও অন্য কাহারও কিছুকাল উপকার হইলে, স্বীয় পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। পরিশেষে, পাঠকবর্গ সমীপে নিবেদন ইহাতে কেহ কোন প্রকার ভ্রমপ্রমাদ দর্শন করিলে, তাহা অনুগ্রহপূর্বক লিখিয়া জানাইলে সাদরে গৃহীত হইবে এবং বিশেষ উপকৃত ও বাধিত হইব।

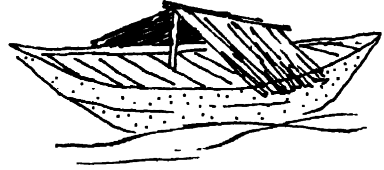
পুস্তকের সর্বপ্রথম পৃষ্ঠা ও উৎসর্গ পত্র সিরাজগঞ্জের অধীন কান্তাপাড়া গ্রামে এই জেলায় প্রস্তুত কাগজে মুদ্রিত। এই জেলারই 'কান্তকবি' গাহিয়াছেন "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।"

পাঠকবর্গ সমীপেও মদীয় নিবেদন তাঁহারা ভাই-এর তৈয়ারি মোটা কাগজ দয়া করিয়া হাতে তুলিয়া গ্রহণ করিবেন। নিবেদন ইতি।

পাবনা, বিনীত নিবেদন—

২৫শে মাঘ, ১৩৩০ সাল। শ্রীরাধারমণ সাহা

প্রথম অধ্যায়
সাধারণ বিবরণ



প্রথম পরিচ্ছেদ—জেলার অবস্থান ও প্রাচীনত্ব

অবস্থান ঃ

বর্তমান পাবনা জেলা বঙ্গের রাজশাহী বিভাগের দক্ষিণ পূর্বাংশে ২৩°৪৯' ও ২৪°৪৫' উত্তর অক্ষরেখা, এবং ৮৯°১' ও ৮৯°৫৩' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। পুতসলিলা গঙ্গার বর্তমান প্রধান প্রবাহ ও ধারা পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ বা ধারা যমুনা বা যবুনা, বঙ্গের দুইটি বৃহৎ ও প্রধান নদী যথাক্রমে ইহার দক্ষিণ ও পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত। ইহার মধ্যস্থলে ও চতুর্দিকে বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ নদী বিল খাল প্রভৃতি বর্তমান আছে।

রামায়ণ মহাভারতীয় প্রাচীন যুগ হইতে ভারতবর্ষের পূর্বদিকস্থ প্রদেশ যাহার অধিকাংশ ভূভাগ বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশ নামে খ্যাত তাহা নিম্নলিখিত ৫টি বিভাগে বিভক্ত ছিল। যথা—অঙ্গ (বিহার), বঙ্গ (ভাগীরথীর উভয় তীরস্থ প্রদেশ, অর্থাৎ বর্তমান মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বর্ধমান, রাজশাহী, পাবনা ও ঢাকার কতকাংশ), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা), পুণ্ড্র (মালদহ হইতে বর্তমান মৈমনসিংহ পর্যন্ত), সুঙ্গ (দক্ষিণ রাঢ় বা হুগলি প্রভৃতি প্রদেশ)। এই পাঁচটি বিভাগ ঋগ্বেদের সুক্ত রচয়িতা দীর্ঘতমা মুণির ঔরসে চন্দ্রবংশীয় বলিরাজপত্নী সুদেষ্ণার গর্ভজাত উপরোক্ত পঞ্চ পুত্রের অধিকার ভুক্ত ছিল। তাঁহাদের নামানুসারে উপরোক্ত পঞ্চ বিভাগের নাম হইয়াছে।

তৎপরবর্তী বৌদ্ধাদি যুগে বৈদেশিক ভারতভ্রমণকারী ও চৈনিক পরিব্রাজকগণের লিখিত বিবরণী ও ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতিতে বর্তমান বঙ্গভূমির নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা কামরূপ, পৌণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট, তাম্রলিপ্ত ও উড়িষ্যা। পরে পাল ও সেন রাজত্ব সময়ে সমগ্র বঙ্গভূমি ও গৌড়দেশ নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত ছিল। যথা, মিথিলা, রাঢ় উপবঙ্গ, বঙ্গ ও বরেন্দ্র।

এক্ষণে দেখা যাউক, যে স্থান অধুনা পাবনা জেলা নামে পরিচিত, তাহা কোন্ সময়ে কোন্ বিভাগের অন্তর্গত থাকা সম্ভব।

কাহারও কাহারও মতে মহাভারতীয় যুগে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণই প্রায় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। পরে গঙ্গার মোহনায় ক্রমশ চর পড়িয়া ব-দ্বীপ সৃষ্টি হইয়া বঙ্গের নিম্নভাগ গঠিত হইয়াছে। পাণ্ডবগণ যখন তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সাগরসঙ্গমে স্নান করিতে আসেন, তখন তাঁহারা যে স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের উত্তরে অবস্থিত ছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ তাঁহারা সমুদ্রের তীরভূমি বা তীরভুক্তিতে সাগরস্নান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বর্তমান ত্রিহুত (দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি জেলা) নামের উৎপত্তি হইয়াছে এমতও কেহ অনুমান করেন।

যদি এই মত বলবত্তর ধরা যায়, তাহা হইলে মহাভারতীয় যুগে পাবনা জেলার অস্তিত্ব একেবারে ছিল না বলিতে হইবেক। কিন্তু এখন পর্যন্তও এই জেলার কোন কোন অংশ বিশেষতঃ করতোয়া নদীর পূর্বপারস্থ স্থানসমূহ সাধারণত পাণ্ডব বর্জিত (কিন্তু পশ্চিম পারস্থ

ভূভাগ নহে) বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। করতোয়া নদী পূর্বে তীর্থরূপে পূজিত হইত। মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা প্রকরণের বিবরণে জানা যায় বগুড়া জেলার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত সাগর বিস্তৃত ছিল। পাণ্ডবগণ করতোয়া স্নান উপলক্ষে উক্ত নদীর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।[১] এই করতোয়া নদী ক্রমশ দক্ষিণবাহিনী হইয়া পাবনা জেলার কতকাংশ দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় এবম্বিধ প্রবাদের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। আবার সভাপর্বের ভীমের পূর্ব দিগ্বিজয়[২] প্রসঙ্গে পুণ্ড্রাধিপতির পরাজয় বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, ইহাতেও বোধহয় তৎসময়ে পাণ্ডবগণের এদিকে আগমণ সম্ভব।

পূর্বোক্ত মত ঠিক না হইলে, মহাভারতীয় যুগে বর্তমান পাবনা জেলা বঙ্গ ও পুণ্ড্র নামক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকা বলিয়া সম্ভব।[৩]

তৎপরবর্তী বৌদ্ধযুগে পাবনা পৌণ্ড্রবর্ধন বিভাগের অন্তঃপাতী এবং পাল ও সেন রাজত্বকালে ইহা বরেন্দ্রভূমির মধ্যবর্তী থাকা বলিয়া বোধ হয়। বিস্তারিত পরে আলোচিত হইল।

পরবর্তী মুসলমান আমলে যখন বঙ্গদেশ বা সুবা বাঙ্গলা, সরকার, পরগণাদিতে বিভক্ত হইয়াছিল, তখন এই জেলার অধিকাংশ ভূমি মহামতি শের শাহের বিভক্ত সরকার সোনাবাজুদিগরের অধীন ছিল বলিয়া বোধ হয়। পরে টোডরমল্লের সময়ে পাবনা জেলা 'আইন-ই-আকবরি' মতে সরকার বাজুহায় (বড়বাজু, সোনাবাজু, প্রতাপবাজু, বাজুচপ্ল, বাজুরস, নাজিরপুর প্রভৃতি) সরকার জেন্নেতাবাদ (মালদহের নিকট হইতে গঙ্গার পূর্বোত্তর প্রদেশস্থ ভূভাগ) ও সরকার বার্বেকাবাদ (গঙ্গা বা পদ্মার উভয় তীরস্থ ভূভাগ), প্রভৃতির অন্তর্গত থাকা সম্ভব। পরবর্তীকালে মুরশিদকুলি খাঁর নবাবী আমলে ও সুজা খাঁর সময়ে বঙ্গে জমিদারিপ্রথার প্রবর্তন হইলে, এই জেলার সমস্ত ভূভাগই রাজশাহী জমিদারির অধীনস্থ পরগণা ভাতুরিয়া দিগরের অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

বর্তমান সময়ে ইংরেজ আমলে ইহা বঙ্গের পাঁচটি বিভাগের অন্যতম রাজশাহী বিভাগের অধীন হইয়াছে।

প্রাচীনত্ব ঃ

পাবনার অগ্নিকোণে দুইটি বৃহৎ নদীর সম্মিলন ও অভ্যন্তরে নাতি-বৃহৎ স্রোতস্বতী ও বিল খালাদির প্রাচুর্য দর্শনে অনেকে অনুমান করেন যে, বর্তমান পাবনা জেলা সম্পূর্ণরূপে গঙ্গার নিম্নাংশ পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের নিম্নাংশ যমুনা, নদীদ্বয়ের বা দ্বীপ হইতে ক্রমশ উৎপন্ন হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক ৫/৬ শতাব্দীকাল পূর্বে ইহার অধিকাংশস্থল বিশেষত পূর্বদক্ষিণাংশ একেবারে নদীগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। এতদঞ্চলে কোন দেবমন্দিরাদি কি প্রাচীন দীর্ঘিকাদি কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না ; স্থাপত্যবিদ্যার উৎকর্ষসূচক মন্দিরাদি কি সুদূর বিস্তৃত রাজবর্ত্ম, কিংবা প্রাচীন জলাশয়াদি কি দীর্ঘিকাদি যাহা এই জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়, তদসমুদায়ই রায়গঞ্জ ও শাহজাদপুর প্রভৃতি থানায় অবস্থিত ; সুতরাং এই জেলার পূর্বদক্ষিণাংশ আধুনিক ও উত্তরপশ্চিমাংশ কথঞ্চিৎ প্রাচীন।

পাবনার স্থানীয় পত্রিকা "সুরাজে" ১৯১৩ অব্দের আগস্ট মাসের সংখ্যাদ্বয়ে সাতবাড়িয়া মধ্য ইংরাজি স্কুলের হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস মহাশয় লিখিয়াছিলেন "যাহার নাম বর্তমান সময়ে পাবনা জেলা এই ভূখণ্ডটি যে প্রাচীনকালে কি নামে অভিহিত হইত তাহা আমরা অবগত নহি, পাবনা জেলাটি অতি প্রাচীন স্থান ; অনুসন্ধান করিলে তৎ-সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। কিঞ্চিদধিক অশীতি বৎসর পূর্বে বর্তমান পাবনা নগরীর প্রায় ৬ মাইল পূর্বদিকস্থিত কামারজানি নামক গ্রামটি উত্তালতরঙ্গময়ী খরস্রোত প্রবাহিনী ভীষণ পদ্মানদী গর্ভে নিমজ্জিত হইলে, ঐ স্থানে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিপাকের আবির্ভাব হয়। তথা হইতে একজন ডুবুরি ... প্রায় দৈর্ঘ্য ২ হাত, প্রস্থে ১।। হাত, ও উচ্চতায় ৩/৪ পরিমিত কয়েক খণ্ড

প্রস্তর ও ৪ কি ৪।। হাত উচ্চ মনোহর কারুকার্য খচিত মন্দিরের চূড়ার ন্যায় প্রস্তর নির্মিত আর একটি স্তম্ভ উত্তোলন করে। ... উত্থিত প্রস্তর খণ্ডের একখানা খোর্দচাঁদপুরের বাঙাল সাহেবের দরগায় ও একখানা ভাঁড়ারার গোলার উপর অদ্যাপিও বর্তমান আছে। ... কামারজানির ঘূর্ণিপাক হইতে ঐ শিলাখণ্ড ও স্তম্ভ উত্থিত হওয়াতে এবং তৎসন্নিকটবর্তী দেবালয়, মহাদেবপুর তারাবাড়িয়া ঘোড়াদহ, করিয়াদহ ও ভাঁড়ারা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগুলির একত্র সমাবেশ হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বহু পূর্বকালে কোন রাজা, মহারাজা বা তৎতুল্য শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি এই স্থানে বাস করিতেন। ... ছাপঘাটির মোহানা হইতে ভাগীরথী দক্ষিণ বাহিনী হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইলেন এবং পদ্মা পূর্বাভিমুখে গমন করিয়া বর্তমান গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্র বা যমুনার সহিত মিশিলেন। শাস্ত্রে জানিতে পারা যায়, শঙ্খাসুরের রাজত্ব পদ্মানদীর পার্শ্বে ছিল ; সুতরাং ছাপঘাটি ও গোয়ালন্দের মধ্যবর্তী স্থানেই যে শঙ্খাসুরের রাজত্ব তাহার আর সন্দেহ নাই।

"পদ্মাগর্ভে যে স্থান হইতে উল্লিখিত শিলাখণ্ড ও স্তম্ভ উত্থিত হইয়াছিল এবং যে স্থানের নিকট দেবালয় (বিগ্রহ স্থান), তারাবাড়িয়া (শক্তিস্থান), মহাদেবপুর (শিবস্থান), ভাঁড়ারা (ভাণ্ডারখানা), করিয়াদহ (হস্তিশালা), ঘোড়াদহ (অশ্বশালা) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী বর্তমান রহিয়াছে, ঐ স্থানে দৈত্যরাজ শঙ্খাসুরের বাসভবন ছিল। কালক্রমে উহা পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। উক্ত স্তম্ভ ও প্রস্তর খণ্ড শঙ্খাসুরের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। অতএব ইহা পাবনার প্রাচীনত্বের একটি নির্ব্যূঢ় প্রমাণ।"

শঙ্খাসুরের গঙ্গাহরণ বৃত্তান্ত প্রাচীন রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী" ও "কৃত্তিবাসী রামায়ণে" ভগীরথ আনীত গঙ্গাকে দক্ষিণ হইতে পূর্ববাহিনী হইবার প্রবাদ সংশ্রবে যথাক্রমে শঙ্খাসুর ও পদ্মা নামে মুণির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মানদীর বিবরণ প্রসঙ্গে তাহা বিস্তারিত আলোচিত হইল। উক্ত পুস্তকদ্বয় আধুনিক বলিয়া ইহাদের উপর কেহ কেহ আস্থা স্থাপন করিতে চাহেন না, কিন্তু এই প্রবাদ একেবারে নূতন নহে।

আবার বিশ্বকোষ অভিধানে "পাবনা" শব্দের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "১৮৩৭ অব্দে পাবনার ৪ মাইল দূরে পদ্মানদী গর্ভে ৪টি প্রস্তরস্তম্ভ পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকটি ৭ ফিট উচ্চ ; প্রত্যেকটি বর্গক্ষেত্রাকৃতি, তদদেশে একটি করিয়া খিলানপথ, তন্মধ্যে একটি মনুষ্যাকৃতি ; এই তলদেশ ৯ ইঞ্চি উচ্চ... তদুপরি নর্তক নর্তকীর আকৃতি সুন্দররূপে খোদিত আছে। স্ত্রীলোকদিগের কর্ণদেশ সুবৃহৎ ও শোভিত, একটি স্তম্ভে স্ত্রীলোকদিগের নৃত্য অঙ্কিত আছে। প্রত্যেক স্ত্রীলোক দুই হস্তে ২ খানি যষ্টি ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছে ; প্রত্যেক স্তম্ভের এই অংশের উপরিভাগ ২ ফিট দীর্ঘ এবং দ্বাদশটি প্রান্তদেশ বিশিষ্ট। নিম্নভাগের বহির্গামী অংশের ন্যায় এই অংশেরও একটি প্রান্তভাগ বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহার উপরিভাগের আর একটি অংশের মধ্যে প্রায় ৬ ইঞ্চি উচ্চ একটি পুষ্পাকৃতি, তাহার উপরিভাগে একটি নরাকৃতি এবং সর্বোপরি একটি মৌমাছি এবং অন্যদিকে একটি করিয়া টিক্‌টিকির আকৃতি আছে।"।

এক্ষণে বিবেচনার বিষয় এই যে, পাবনা একেবারে ব-দ্বীপজাত নূতন বা আধুনিক হইলে নদীতীরস্থ ভূভাগে পদ্মাগর্ভে এবম্বিধ নানাপ্রকার কারুকার্যখচিত সুদীর্ঘ প্রাচীনকালের ব্যবহৃত কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর খণ্ড ও স্তম্ভাদি কোথা হইতে আসিল?

"সুরাজের" উপরোক্ত লেখক মহাশয় অধিক দূর যাইয়া এই সমস্ত প্রস্তরাদির সহিত কতিপয় গ্রামসমষ্টির সমাবেশ প্রদর্শনে পাবনার প্রাচীনত্ব দেখাইতে শঙ্খাসুরের বাসভবন পর্যন্ত নির্দেশে অগ্রসর হইয়াছেন ; তবে শঙ্খাসুরের বৃত্তান্ত প্রাচীন রামায়ণাদিতে না থাকিলেও, তৎবর্ণিত স্থান সমূহে যে "কোন রাজা, মহারাজা বা তৎতুল্য শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি এই স্থানে বাস করিতেন" তাহাতে সন্দেহ নাই, গঙ্গার নামের সহিত শঙ্খাসুরের প্রবাদ বহুদিন হইতে

সংযোজিত হওয়াতেই বোধ হয় পণ্ডিত মহাশয়ও উক্ত নাম সংযোগে প্রয়াসী হইয়াছেন। যাহা হউক, এই প্রস্তরাদি প্রাপ্তি এই অঞ্চলের প্রাচীনত্বের নিদর্শন মাত্র।

বিশ্বকোষ বর্ণিত প্রস্তর স্তম্ভাদির বিবরণেও অনুমিত হয় যে, এই সমস্ত প্রস্তরাদি বৌদ্ধযুগাদির পূর্বে বা তৎসময়ে ব্যবহৃত হইত। আবার এই জেলার স্থানে স্থানে বাসুদেবমূর্তি ও চৈত্রহাটি, নরসিংহপাড়া প্রভৃতি গ্রামে যে সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময়ী কালিকা মূর্তির কোনটি সিদ্ধেশ্বরী, কোনটি ভবানী নামে পূজিত হইতেছে, তাহা বৌদ্ধযুগের অবলোকিতেশ্বর মূর্তি বিশেষ অথবা বৌদ্ধতান্ত্রিক কালের মূর্তি সদৃশ বলা যাইতে পারে ; যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে। এই সমস্ত দৃষ্টে বোধ হয়, পাবনা জেলার অধিকাংশ স্থল প্রাচীন বৌদ্ধাদি যুগের পূর্বে বা তৎকালে গঠিত হইয়া থাকিবে।

মাধাইনাগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত তাম্রশাসন দৃষ্টে জানা যায়, পাবনা প্রাচীন সেনরাজগণের রাজ্যান্তর্গত পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির বারেন্দ্র মণ্ডলের অন্তঃপাতী ছিল। মুসলমান রাজত্বকালের প্রথমে ইহা সরকার সোনাবাজু, পরে বাজুহার, বার্বেকাবাদ, জেন্নেতাবাদ প্রভৃতি সরকার সমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরবর্তীকালে পরগণা ভাতুরিয়া দিগরের অধীন থাকিয়া প্রথমে রাজশাহী জমিদারির মধ্যে, পরে ১৭৫৭ অব্দে ইংরেজ আমল হইতে ক্রমশ রাজশাহী বিভাগের অধীন হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—পাবনা নামের উৎপত্তি

পূর্বে করতোয়া নদী ও চলনবিল, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে মিথিলা,[৪] এই ভূভাগের নাম বরেন্দ্রভূমি। ইহা চন্দ্রবংশীয় বলিরাজ পুত্র পুণ্ড্রের অধিকৃত স্থানের একাংশ ছিল। সাধারণত বৈদিক যুগ হইতে পৌণ্ড্ররাজ্য বা পুণ্ড্রদেশ নামে অভিহিত হইত এবং ইহার রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রপত্তন নামে খ্যাত ছিল।

পৌণ্ড্ররাজ্য পরে আদিশূরের সময়ে গৌড় দেশ নামে পরিচিত হইত। অনেকের মতে "পৌণ্ড্রদেশের পশ্চিমে মহানন্দার অপর পারে যথেষ্ট পরিমাণে গুড় উৎপাদিত হওয়ায় ; আবার কাহারও মতে রাজা ভোজ গৌড়ের নাম হইতে ঐ ভূভাগ সাধারণত 'গৌড়' নামে অভিহিত হইত।"[৫] এই গৌড়দেশ কালে আবার তিন ভাগে বিভক্ত হয়, যথা রাঢ়, ভড়, বরেন্দ্র ; শূররাজগণের সময়ে ঐ অংশে তিনটি রাজধানী, যথা রাঢ়ে নবদ্বীপ, ভড়ে রামপাল ও বরেন্দ্রে গৌড় ছিল বলিয়া জানা যায়। যাহা হউক, মহানন্দা নদীর পূর্ব, করতোয়া নদীর পশ্চিম, গঙ্গা নদীর উত্তর ও কোচবিহার প্রভৃতি প্রদেশের দক্ষিণ, এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূভাগ বহুদিন হইতে **বারেন্দ্র** বা **বরেন্দ্রভূমি** বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান পাবনা জেলা এই বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ; কোন্ সময় হইতে ও কিজন্য এই প্রদেশ বরেন্দ্রভূমি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, তাহা সবিশেষ জানা যায় না। এই জেলার অন্তর্গত স্থান সমূহে বহুল পরিমাণে 'বরিন্দা' ধান্য জন্মে, তাহারই অপভ্রংশ 'বরণ' ধান বা তাহা হইতে জাত 'বরণ' চাউল, ইহা এই জেলার একটি প্রধান কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য ও সর্ব সাধারণের খাদ্য। আবার সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে স্থান বিশেষকে সাধারণত 'বরিন্দা' বা 'বরিণ' বলা হয়। এই 'বরিন্দা' 'বরিণ' বা 'বরণ' প্রত্যেকটি হইতে প্রাচীন বরেন্দ্র আখ্যার আভাস পাওয়া যায়।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জিকা 'বিপ্রকুললতিকা' পাঠে জানা যায় বিক্রম সেন ক্ষত্রিয় রাজপুত্র শুকদেব সেন ; তিনি আদিশূরের জামাতা ছিলেন এবং তৎপুত্র প্রদ্যুম্ন সেন ও বরেন্দ্র

সেনের মধ্যে ; বরেন্দ্র সেনের নামানুসারে এই বরেন্দ্রভূমির নামকরণ হইয়াছে। এই ভূভাগ আত্রাই নদীর উভয়কূলে অবস্থিত।[৬] এই বরেন্দ্র সেন গৌড়ে রাজা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধিকৃত দেশ 'বারেন্দ্র' বা 'বরেন্দ্র'ভূমি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যথা

"বরেন্দ্রা গৌড়দেশেন্দ্রা বভুব নিজ কাম্যয়া
বরেন্দ্রাধিকৃতত্বেন দেশো বারেন্দ্র সংজ্ঞক
অদ্যাপি গীয়তে লোকৈরাত্রেয়্যাশ্চতটদ্বয়ে"।

শূরবংশীয় রাজগণের সময়ে পুণ্ড্রের অধিকৃত পৌণ্ড্ররাজ্য গৌড় দেশ নামে আখ্যাত হইয়া পরবর্তীকালে বরেন্দ্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও ইহার রাজধানী বহুদিন পর্যন্ত পৌণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত ছিল ;[৭] দেশের নাম গৌড় ও পুণ্ড্র উভয়ই প্রবল ও প্রচলিত ছিল। পাল ও সেন রাজগণের তাম্রশাসনাদিতে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী বরেন্দ্র মণ্ডলাদির উক্তি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে পৌণ্ড্রবর্ধন নগরীর স্থান নির্দেশ লইয়া ঐতিহাসিকগণ মধ্যে নানাবিধ মতভেদ দেখা যায়। অনেক বাদানুবাদের পর বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়কেই অনেকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, "বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার তিলকপুর স্টেশনের ৪ মাইল দূরে যে পুণ্ডরী বা পুণ্ডরিয়া নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে, তাহাকে পৌণ্ড্রবর্ধন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। নিকটে দেওয়া বা দেওপালের বাটি, রামশালা গ্রাম, রামনীর গাঁ, রামপুর বিজয়কান্দি, যশোহর গ্রাম এবং প্রায় ২।।৹ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে জয়সাগর[৮] প্রভৃতি গ্রাম সমূহের নাম প্রসিদ্ধ পালবংশীয় রামপাল, দেবপাল ও জয়পাল প্রভৃতি পালরাজগণের নামের পরিচায়ক ; পালরাজাগণের স্মৃতি ; পৌণ্ড্রের অপভ্রংশে পুণ্ডরিয়া নাম ও ধ্বংসাবশেষ হইতে বোধ হয়, এই প্রদেশে পালরাজগণের রাজধানী "পৌণ্ড্রবর্ধনপুর" অবস্থিত ছিল।... বগুড়া শহরের ৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে মহাস্থানগড় নামে যে সুপ্রাচীন স্থান আছে, চীন পরিব্রাজক ও রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনানুসারে এই স্থানকে আমরা জয়ন্তের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন বলিয়া মনে করি।... পাল রাজগণের সময়ে পৌণ্ড্রবর্ধন রাজধানী বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ায় সেই সেই স্থানও পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী বলিয়া তাহাও পৌণ্ড্রবর্ধনপুর বলিয়া পরিচিত হওয়ায় আদি পৌণ্ড্রবর্ধন নাম বিলুপ্ত হয়।"[৯] বর্তমান পাবনা জেলা উপরোক্ত পৌণ্ড্ররাজ্য বা বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ছিল। অনেকের মতে পৌণ্ড্ররাজ্য বা পুণ্ড্রদেশ হইতে পাবনা জেলার নামকরণ হইয়াছে। সরকার বাহাদুর নিযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেব বলেন যে, পুণ্ড্ররাজ্য বা পৌণ্ড্রবর্ধন ভূভাগ (যে স্থানে পূর্বে পোদ জাতি বাস করিত ও যাহার রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন নগর অধুনা পাবনা জেলার নিকটবর্তী বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে) হইতে পাবনা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।[১০] বহুদিন হইতে এই জেলার অন্তর্গত ভূভাগের নানাস্থানে বহু "বারেন্দ্র" ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির বাস, "বরিন্দা" বা বরণ ধানের আবাদ, পালরাজগণের প্রদত্ত করঞ্জা গ্রামের মৈত্র উপাধি বিশিষ্ট বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের "শাসনাদি" প্রাপ্তি ও মাধাইনগর হইতে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনাদির বিবরণ পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান পাবনা জেলা পূর্বতন পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতী বরেন্দ্র মণ্ডল বা ভূমির অন্তর্গত ছিল। পৌণ্ড্রবর্ধন নগরীর স্মৃতিবাহক নিকটবর্তী বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ও এই জেলার ২/৩ ক্রোশ মধ্যেই অবস্থিত ; এমতাবস্থায় পৌণ্ড্রবর্ধন ভূভাগ বা পৌণ্ড্ররাজ্যের নামানুসারে আধুনিক পাবনা জেলার নামোৎপত্তি একেবারে অমূলক বা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, পাবনা বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ছিল, কিন্তু পৌণ্ড্ররাজ্যের

নামানুসারে পাবনা নামকরণ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের মতে "বগুড়া জেলাই পৌণ্ড্র জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। তৎকালে পাবনা জেলার অধিকাংশ স্থল, জলমগ্ন ছিল। রেনেলের ম্যাপে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পাবনা বলিয়া কোন স্থান কোন কারণে বিখ্যাত ছিল না। ...রাজা টোডরমল্ল যে সময়ে বাংলা দেশকে সরকার, চাকলা প্রভৃতিতে বিভক্ত করেন, তখনও পাবনা বলিয়া কোন সরকার, চাকলা, কি মৌজার নির্দেশ নাই, সুতরাং তাহার বহু শতাব্দী পূর্বে পৌণ্ড্ররাজ্যের নামানুসারে পাবনা নাম হওয়া অসম্ভব"।[১১]

পৌণ্ড্রবর্ধন হইতে পাবনা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে "পৃথিবীর ইতিহাস" লেখক মহাশয় বলেন, "কানিংহামের মতে পাবনা ও পৌণ্ড্রবর্ধন অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কাশ্মীরের ইতিহাসে প্রকাশ পৌণ্ড্রবর্ধননগর রাজা জয়ন্তের রাজধানী ছিল। অধ্যাপক উইলসন বলেন পৌণ্ড্রবর্ধনের বহু জনপদ গঙ্গার উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। (The greater part of the province of Paundrabardhan was to the north of the Ganges including Gauda, Pabna). চলতি ভাষায় পুণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রবর্ধন পোনবর্ধন বা পোবাবর্ধন রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। কানিংহাম সিদ্ধান্ত করেন উহা হইতে পাবনা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।" [১২] উক্ত "পৃথিবীর ইতিহাসের" প্রথম খণ্ডের প্রথমে প্রাচীন ভারতবর্ষের যে একখণ্ড মানচিত্র সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতেও গঙ্গার বর্তমান প্রধান প্রবাহ পদ্মা নদীর তীরে পাবনা বলিয়া একটি স্থানের উল্লেখ আছে।

পাবনা যে একেবারে আধুনিক স্থান নহে, তাহা আমরা যদুনন্দন কৃত বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের "ঢাকুর" নামক কুলজী গ্রন্থে জানিতে পারি। উহাতে নরসিংহ দাস বংশের বিবরণে "পাবনা" নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে যথা—

মচমলি, ময়দান দীঘি, বিপছিল, চৌপাকি,
"পাবনা" মালঞ্চি আদি স্থান।
কেচুয়াডাঙা মেহেরপুরে, মানিকদি গঙ্গাতীরে,
ঘরগ্রাম স্থানে প্রচলিত।

এই "ঢাকুরের" প্রণয়নকাল সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ইহা যে অন্তত ২০০/২২৫ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ ইহার ভাষা ও বর্ণিত বিষয় সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহা সম্যক উপলব্ধি হয় ; ইহাতে মাত্র আকবর বাদশাহের সমকালবর্তী ঘটনাসমূহের বর্ণনা ভিন্ন পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বাদশাহগণের কোনই উল্লেখ নাই। আবার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় মূল "ঢাকুর ও সমালোচনা" নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে, "আরবি পার্শী ভাষায় যাহারা সুদক্ষ ছিলেন, উক্ত পুস্তকে তাহাদিগের প্রশংসাবাদ লিখিত আছে ; এতৎদ্বারা বোধ হয়, এই পুস্তক ইংরেজ অধিকারের কিয়ৎকাল পূর্বে বা প্রথমাবস্থায় লিখিত হইয়াছে। আবার উক্ত "ঢাকুরে" তাড়াস জমিদারের পূর্বপুরুষ বলরাম রায়ের নাম আছে ; তৎকৃত দোলমঞ্চেও বাংলা ১৬৪০ শকাব্দের উল্লেখ আছে ; তাহাতে জানা যাইতেছে তিনি ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন"। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, এতাধিক বর্ষ পূর্বেও পাবনা বলিয়া অন্তত একটি স্থানের উল্লেখ আছে। আবার পাবনা বলিয়া একেবারেই কোন মৌজাদি ছিল না বা নাই এমত বলা যায় না ; কারণ ১৮৫০ অব্দের সার্ভে নক্সায় বাজুরস নাজিরপুর পরগণায় ৮৬ নম্বরে Pabna Baze (বাজে পাবনা) এবং Boundary Commissioner's list মধ্যে যে সকল মৌজার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে ১০০ নম্বরে Pudeh Pabna (পোদে পাবনা) বলিয়া মৌজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং পাবনা বলিয়া একেবারেই কোন মৌজার উল্লেখ নাই এমত বলা যায় না ; এই মৌজা বর্তমান পাবনা শহরের সালগাড়িয়া নামক পাড়ায় (মহল্লায়) অবস্থিত। কানিংহাম পোদ জাতির রাজ্য বা তাহার

রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন (চলিত ভাষায় পোনবর্ধন বা পোবাবর্ধন) হইতে পাবনা নামের উৎপত্তি হইয়াছে এমত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এখন পর্যন্তও "পোদে পাবনা" বলিয়া একটি মৌজার উল্লেখ ও তাহার স্থান নির্দিষ্ট আছে। পরবর্তী অনুসন্ধানের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি দৃষ্টে পৌণ্ড্রবর্ধন নগরী পূর্বে পাবনার সহিত অভিন্ন সিদ্ধান্ত হইলেও, অধুনা বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় বলিয়া নির্ধারিত হইতেছে মাত্র ; তাই বলিয়া পাবনা নামে কোনস্থান কোন কারণে বিখ্যাত ছিল না জন্য, ইতিপূর্বে তাহার অস্তিত্বই অস্বীকার করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

পোদ জাতির বাসস্থান বা রাজ্য পুণ্ড্রদেশ বলিয়া জানা যায় ; ইহারই রাজধানীর নাম পৌণ্ড্রবর্ধন ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে "পূর্বে বাংলা দেশ ব্রাহ্মণ শূন্য অনার্য দেশ ছিল। তৎকালে পুণ্ড্র প্রভৃতি অনার্য[১৩] জাতিগণ এখানে বাস করিত। অদ্যাপিও পদ্মার দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিকে বহুদূর পর্যন্ত বহু সংখ্যক পোদ বা পুঁড়া জাতির বাস আছে। পুঁড়া বা পোদ পুণ্ড্র শব্দের অপভ্রংশ ; এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক চণ্ডাল, চান্দাল বা চাঁড়াল এই সমস্ত দেশের বর্তমান ফরিদপুর, পাবনা, নদীয়া, যশোর প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে বাস করে, ইহাদের অনেকেই নমশূদ্র বলিয়া পরিচিত।"[১৪] শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে পূর্বের পুণ্ড্র জাতি বাস করিত।[১৫] বঙ্কিমবাবু আরও বলিয়াছেন সংস্কৃত পুণ্ড্র শব্দ বাংলায় চলতি ভাষায় পুঁড়, পুঁড়ো, বা পুঁড়া শব্দে পরিণত হইয়াছে। জেলার আদিম নিবাসী প্রসঙ্গে তাহা বিস্তারিত বর্ণিত হইবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বঙ্কিমবাবু ঔপন্যাসিক গ্রন্থকার মাত্র, ঐতিহাসিক নহেন ; কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তিতেও যখন তাঁহার মত সমর্থিত হইতেছে, তখন বঙ্কিমবাবুর মত একেবারে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। পাবনা জেলার সাঁড়া থানার সাহাপুর, দাপুনিয়া প্রভৃতি গ্রামে, নদীয়া জেলার কুমারখালি[১৬] প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও বহু সংখ্যক পুঁড়া বা পুণ্ডরিক নামক জাতির বাস আছে ; পূর্বে পাবনা শহরেও ছিল। আবার সাঁথিয়া থানায় পুণ্ডরিয়া নামে একটি গ্রাম এখনও বর্তমান আছে।

উপরোক্ত বিবরণাদি ও মতামত হইতে জানা যায়, পৌণ্ড্রবর্ধন ভূভাগ বা পৌণ্ড্র রাজ্যের নামানুসারে পাবনা নামের উৎপত্তি হওয়া অযৌক্তিক নহে। কারণ পৌণ্ড্রবর্ধন কোন স্থান বিশেষের নাম নহে, ইহা একটি বিস্তীর্ণ বিভাগ বিশেষ।[১৭] ইহার রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধনপুর ও বর্তমান পাবনা বিভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন বা সিদ্ধান্ত হইলেও, পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র বা পোদ জাতির বাসস্থান বা রাজ্য হইতে, কিংবা পৌণ্ড্রবর্ধন বিভাগের নামানুসারে পাবনা নামের উৎপত্তি একেবারে অসম্ভব নয়, অথবা "পোদে পাবনা" নামক মৌজা পাবনায় বর্তমান থাকিতে পারে কানিংহাম সাহেবের পূর্ব সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে আবার পদ্মা নদীর বিবরণে জানা যায় যে, বর্তমান সময়ে উহা গঙ্গার প্রধান ধারা হইলেও পূর্বে তাহা ছিল না ; প্রথমে ভাগীরথীই গঙ্গার প্রবল ও প্রধানতম প্রবাহ বলিয়া গণ্য ছিল, পদ্মার উৎপত্তি পরে হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থে পদ্মা নামে কোন নদীর উল্লেখ নাই ; ভাগীরথীরই বর্ণনা প্রাচীন কাব্য পুরাণাদিতে দেখা যায়। পদ্মা নামে কোন নদী বিশেষের উল্লেখ না থাকিলেও নলিনী, পাবনী প্রভৃতি গঙ্গার পূর্বগামী প্রবাহত্রয়ের নাম অতি পুরাকাল হইতে জানা যায়।[১৮]

কেহ কেহ নলিনী নামক গঙ্গার এই ধারাকে বর্তমান পদ্মা নদী বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহেন, পূর্বে ভাগীরথী ধারা প্রবল ছিল, কাল-সহকারে পদ্মা নামক ধারার উৎপত্তি হইয়া ক্রমশ প্রবলতর হইয়াছে।

পাবনা নামোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া, অনেকে বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, আমাদের এই জলমগ্ন দেশে "পবনা" নামক ডাকাইতের নাম অনুসারে পাবনা নামের উৎপত্তি হইয়াছে ; অনুসন্ধানে যতদূর জানা যায়, এই জেলার দস্যু তস্কর সংস্রবে "পবনা"

বলিয়া কোন ডাকাইতের নাম পাওয়া যায় না ; তজ্জন্য এমত অনুমান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

বর্তমান পাবনা জেলার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া পদ্মা নদী প্রবাহিত এবং পাবনা নগরও ইহার উত্তর তীরে অবস্থিত। গঙ্গার পূর্বগামী একটি ধারার নাম নলিনী ; হলাদিনী[১৯] ও পাবনী নামক ধারাদ্বয়ের পরিচয় বর্তমানে পাওয়া যাইতেছে না। "দেবীভাগবত" ও "ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণে"র বর্ণনানুসারে নলিনী নামক প্রবাহকে পদ্মা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। পদ্মা নদীর বিবরণে তাহা সবিস্তার আলোচিত হইবে। 'পাবনী' নামক প্রবাহ্ অবশ্য কালে গঙ্গার প্রাচ্যদেশগামী ধারাত্রয়ের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাহা হইতে বর্তমান পাবনা নামের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন গঙ্গা হরিদ্বারের নিকট হইতে বহির্গত হইয়াছে ; কেবল পাবনার নিকট আসিয়া "পাবনী" নাম ধারণ করা অসম্ভব। মুর্শিদাবাদের ছাপঘাটি নামক স্থান পর্যন্ত গঙ্গা সর্বত্রই কিন্তু নিজ নামে পরিচিত ; কেবল তথা হইতে ভাগীরথী ও পদ্মা দুই বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া প্রাচ্য প্রতীচ্য ও দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছে ; সুতরাং দক্ষিণপূর্ব দিকে "পাবনী" নামক ধারা প্রবাহিত থাকা অসম্ভব নহে। আবার ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে পদ্মার উৎপত্তি প্রসঙ্গে জানা যাইতেছে যে, পদ্মা প্রভৃতি গঙ্গার ধারা পরবর্তীকালে উৎপন্ন হইয়াছে ; পূর্বে ভাগীরথীই প্রবল ছিল। ইহাতে বোধ হয়, কালে উক্ত পূর্বগামী গঙ্গার ধারাত্রয় বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত ছিল।[২০] কালের বিবর্তনে উহাদের কোনটি শুকাইয়া বা মজিয়া স্থলে পরিণত হইয়াছে। হয়ত এক্ষণে যেস্থানে পাবনা জেলার অবস্থান দেখা যাইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপেই ঐ "পাবনী" নামক ধারার অবরুদ্ধ অংশের স্থল ভাগ মাত্র। নলিনী অর্থে "পদ্ম" বলিয়া উক্ত নলিনী ধারাকে "রামায়ণ" ও "মৎস্যপুরাণে"র বর্ণনা মতে পদ্মার সহিত অভিন্ন বিবেচনা করিলেও, "পাবনী" নামক গঙ্গার ধারা হইতে পাবনা নামের উৎপত্তি একেবারে অযৌক্তিক নহে। হয়ত কালে উক্ত ধারা অবরুদ্ধ হইয়াছে, কিংবা "পাবনী" ও "নলিনী" উভয় স্রোত সম্মিলিত হইয়া বর্তমান পদ্মারূপে ভীষণ ও প্রবলতর আকার ধারণ করিয়াছে। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এবং পদ্মার উৎপত্তি প্রসঙ্গে উপরোক্ত সেনস্যাসে রিপোর্ট ও রেনেল সাহেব বর্ণিত পদ্মার পূর্বতন প্রবাহ বা গতির বিবরণ পাঠে তাহা সম্যক উপলব্ধি হয়।[২১]

অতএব "পাবনা" নামক ডাকাইতের নাম অপেক্ষা পোদ জাতির রাজ্য বা বাসস্থান "পৌণ্ড্রবর্ধন" ভুক্তি বা বিভাগ হইতে পাবনা নামের উৎপত্তি অধিকতর এবং পতিতপাবনী গঙ্গার পূর্বগামী ধারাত্রয়ের অন্যতম "পাবনী" হইতে বর্তমান পাবনা জেলাস্থ ভূখণ্ডের নাম পাবনা রূপে পরিণত হওয়া অধিকতম, সম্ভবপর বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. "পৌণ্ড্রবর্ধন ও করতোয়া"—হরগোপাল দাশকুণ্ডু প্রণীত। ৯৮ পৃষ্ঠা।

২. "ততঃ পুণ্ড্রধিপং ধীয়ং বাসুদেবং মহাবলম্"। মহাভারত, সভাপর্ব ৩০শ অধ্যায়।

৩. রামায়ণেও ভারতের পূর্বদিকস্থ প্রদেশ মধ্যে বঙ্গ ও পুণ্ড্রদেশের উল্লেখ আছে, যথা–

"অধিগচ্ছ দিশং পূর্ব্বাং সশৈলবন কাননং।

মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাসুঙ্গাং স্তথৈব চ।।"

রামায়ণ কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ৪০শ সর্গ

"বঙ্গাঙ্গ মগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশী কোশলাঃ

ঐ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০ম সর্গ

বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিখোন জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষুসঃ।।
রঘুবংশ, ৪র্থ সর্গ, ৩৬ শ্লোক।

৪. *কাহারও কাহারও মতে মহানন্দা নদী।*

৫. *The name of Gour or Ganda is, I believe, derived from Guru (গুড়) common name of melases or raw sugar for which this province has always been famous.*
Cunningham's Arch. Survey Report of India. Vol. XV, P. 41.
"বগুড়ার ইতিহাস" ভূমিকাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠা। দ্রষ্টব্য।
আবার কেহ কেহ প্রাচীন গৌড় দেশের রাজধানী বর্তমান মালদহ জেলার "গৌড়" কে "গৌরবনগর" বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন।

৬. *কাহারও মতে পদ্মা নদীর পূর্ব ও ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম দিকস্থ স্থানই বরেন্দ্র দেশ বলিয়া পরিচিত; যথা—*
"পদ্মাবত্যা পূর্বভাগে দেশোজলময়ো মহান্
বরেন্দ্র দেশো বিজ্ঞেয় শস্যাঢঃ সর্ব্বদানৃপ।।" "ভবিষ্য ব্রহ্ম খণ্ড"।
পদ্মা নদ্যাঃ পূর্বধার ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
বারেন্দ্র সংজ্ঞাকে দেশো নানা নদনদীযুতঃ।।" ৭৫৫ "দিগ্বিজয় প্রকাশ"।

৭. *আবার "বারেন্দ্র কুলাচার্য" গ্রন্থ মতে আদিশূরের পুত্র ভূশূর; তৎপুত্র ক্ষিতিশূর; তৎপুত্র ধরাশূর, তৎপুত্র প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর। এই আদিশূর বংশীয় বরেন্দ্রশূরের নামানুসারেই বরেন্দ্রভূমির নামকরণ হইয়াছিল। যথা—"প্রদ্যুম্ন যোগমার্গে চ বরেন্দ্র রাজ্য শাসনে।" "বারেন্দ্র কুলাচার্য"।*

৮. *পাবনা জেলার নিমগাছির হাটের নিকটস্থ জয়সাগর দীঘি বলিয়া বোধ হয়।*

৯. *"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্য কাণ্ড, ১১৮/১১৯ পৃ.*

১০. *Cunningham conjectured that the name of Pabna is derived from the old kingdom of Pundra or Paundrabardhan, the country of the Pods, whose capital was at Mahasthan in the adjoining district of Bogra. Imp. Gazetter of E. B. & Assam P 284.*

১১. *পাবনা বগুড়া হিতৈষী, ৩০ মাঘ ১৩১৯ সাল*

১২. *শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস", ২য় খণ্ড, ২২১ পৃষ্ঠা।*

১৩. *কেহ কেহ অনার্য বলিয়া স্বীকার করেন না।*

১৪. *বিবিধ প্রবন্ধ, "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার"।*

১৫. *The Earlier history of Bengal is involved in obscurity. It was first inhabited by the Paundras on Pulindas, the modern Purros and Pods who from the lowest strata of Hindu Society in Bengal. "History of India" by Haraprosad Sastri, P. 13.*

১৬. *পূর্বে কুমারখালি পাবনা জেলার অধীন ছিল, এক্ষণে নদীয়ায় গিয়াছে।*

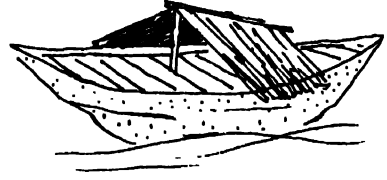
১৭. *"Paundrabardhan was the name of a royal city as well as the name of a Bhucti or province" "Gour under the Hindus" by A. K. Moitra.*

১৮. *"বিসর্জ্জ ততো গঙ্গাং হরো বিন্দুসরঃ প্রতি।*
তস্যাং বিসৃজ্যমানায়ং সপ্ত স্রোতাংসি জজ্ঞিরে।।

১৯. *হলাদিনী পাবনীচৈব নলিনী চ তথৈব চ।*
তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মু গঙ্গা শিবজলা শুভাঃ"
"রামায়ণ," বালকাণ্ড, ৪৩শ অধ্যায়।

২০. *রামায়ণ বর্ণিত সময়ে বর্তমান নিম্নবর্ণের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল, যদি এমত ঠিক ধরা যায়।*

২১. *Appearances favour very strongly the opinion that the Ganges had its former bed in the tract now occupied by the lakes & morasses between Nattore & Jaffargunge (in the Dacca district not far from the borders of Pabna).*
"Account of the Ganges & Burrampooter Rivers (Philosophical Transactions 1781)."



দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাকৃতিক বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ—চতুঃসীমা ও আয়তন

চতুঃসীমা ঃ

এই জেলার উত্তরে বগুড়া জেলা, পূর্বে মৈমনসিংহ ও ঢাকা জেলা, দক্ষিণে ফরিদপুর ও নদীয়া জেলা পশ্চিমে নদীয়া, রাজশাহী ও বগুড়া জেলা। পদ্মা নদী, দক্ষিণ ও পশ্চিমে, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলা হইতে এবং যমুনা বা যবুনা নদী, পূর্বদিকে, মৈমনসিংহ ও ঢাকা জেলা হইতে প্রাকৃতিক সীমারূপে এই জেলাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর তারিখ হইতে পাবনা প্রভৃতি রাজশাহী জেলার ৫টি ও ধরমপুর প্রভৃতি যশোহর জেলার ৩টি থানা লইয়া সর্বপ্রথম এই জেলার গঠন আরম্ভ হয় ; কিন্তু সময় সময় ইহার এলাকা ও সীমার নানারূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ২১/১১/২৮ তারিখে যশোহর জেলার খোকসা থানাটিও পাবনায় সামিল হয় ; ৯/৬/৫০ তারিখে রায়গঞ্জ থানা বগুড়ার মধ্যে যায়, ১৭/১০/৪৮ তারিখে যমুনা নদী পাবনা জেলার পূর্ব সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট হয় ; ১২/১/৫৫ তারিখে সিরাজগঞ্জ থানা মৈমনসিংহ হইতে পৃথক হইয়া পাবনার অন্তর্ভুক্ত হয় ; ১৮৫৯ অব্দে কুষ্টিয়া থানা নদীয়া জেলা ভুক্ত হয়। ২৭/৩/৭১ তারিখে কুমারখালিও ঐ জেলায় সামিল হয় ; ১৪/১/৭৫ তারিখে রায়গঞ্জ থানা পুনরায় পাবনা জেলাভুক্ত হয় ; ২১/৪/৭৭ তারিখে যমুনা নদীর গতি পরিবর্তন হেতু তখন হইতে ইহার বর্তমান প্রবাহ এই জেলার পূর্ব সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ২৭/৩/৮১ তারিখে পদ্মা নদীরও ঐরূপ গতির পরিবর্তন জন্য পাংসা থানা ফরিদপুর জেলায় সামিল হইয়া ইহা পাবনার দক্ষিণ সীমা নির্ধারিত হইয়াছে।

আয়তন ঃ

পাবনা জেলা রাজশাহী বিভাগের পূর্ব দক্ষিণাংশে প্রায় ত্রিভুজাকারে অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ মাইল ; দক্ষিণ দিকে পূর্বপশ্চিমে ইহার বিস্তার প্রায় ৪৫ মাইলের অধিক নহে, কিন্তু উত্তরাংশে ইহার পরিমাণ মাত্র ১০ মাইল।

জেলার কেবলমাত্র স্থলভাগের পরিমাণ পূর্বে প্রায় ১৮৩৯ বর্গমাইল ছিল। যথা—

থানা	পরিমাণ		থানা	পরিমাণ	
দুলাই	২৫৯ বর্গমাইল		সিরাজগঞ্জ	৩০৬ বর্গমাইল	
পাবনা	২৯৭	"	শাহজাদপুর	২১২	"
মথুরা	১১৫	"	রায়গঞ্জ	২২১	"
চাটমোহর	২১১	"	উল্লাপাড়া	২১৮	"
	৮৮২	"		৯৫৭	"

গত ১০/১২ বৎসর মধ্যে সিরাজগঞ্জ, মথুরা, পাবনা প্রভৃতি থানাসমূহের কতকাংশ

ভাঙিয়া যাওয়ায় জেলার মোট আয়তন ১৯২১/২২ খ্রিস্টাব্দে ১৬৭৮ বর্গ মাইলে পরিণত হইয়াছে।

নদী বিল খাল প্রভৃতিতে মোটামুটি এই জেলার এক চতুর্থাংশ জল ও তিন চতুর্থাংশ স্থলভাগ ধরা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—স্থল, জল ও বায়ু

স্থল ঃ

এই জেলার স্থলভাগ সর্বত্রই প্রায় সমতল ; অতি উচ্চ ভূখণ্ড বা পাহাড় কোথাও নাই। বরং অনেক বিল খাল ও নিম্নভূমি বহু স্থানে দেখা যায়। প্রত্যেক থানায় প্রধানত শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, চাটমোহর ও সুজানগর প্রভৃতি অঞ্চলে বহু বিল, খাল, নালা প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। পদ্মাতীরস্থ ভূভাগ হইতে যমুনা তীরের স্থান সমূহ অপেক্ষাকৃত নিম্ন বলিয়া বোধ হয়। উত্তরে রায়গঞ্জ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সাঁড়া থানায় খাল বিলাদির পরিমাণ কথঞ্চিৎ অল্প ; কিন্তু শাহজাদপুর প্রদেশের অধিকাংশ স্থান নিম্নভূমি ; তজ্জন্য ঐ দিকের স্থলভাগ কোন কোন বৎসর বর্ষার প্রথমেই জ্যৈষ্ঠ মাসে একেবারে জলমগ্ন হইয়া যায়। নিম্নভূমির স্থান সমূহ বর্ষাকালে জলমগ্ন হইলে, তন্মধ্যবর্তী গ্রামগুলি সুদূর বিস্তৃত জলরাশি মধ্যে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আবার শরদাগমে জলরশি অপসারিত হইলে, উচ্চভূখণ্ডের উপর উক্ত গ্রামসমূহ বৃক্ষলতা সমচ্ছাদিত থাকিয়া দূরবর্তী সমতলক্ষেত্র হইতে উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ বলিয়া ভ্রম জন্মায়।

বর্ষাকালে সকল স্থানই অল্পবিস্তর জলপ্লাবিত হয়, তজ্জন্য এই জেলার মৃত্তিকা সাধারণ কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সদর অপেক্ষা সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের স্থানসমূহ অধিক পরিমাণে বালুকাময়, উর্বর ও শ্বেতবর্ণ ; চর অপেক্ষা বিলময় "ভড়" প্রদেশের মাটি "আটিয়াল" ও কৃষ্ণবর্ণ ; কোন কোন স্থানের মাটি দোঁয়াশ (মাটি ও বালি মিশ্রিত)। চাটমোহর ও ফরিদপুর প্রভৃতি থানার কোন কোন গ্রামের নিকট প্রধানত কোলা, মৃজাপুর প্রভৃতি স্থানের নিকট হাড়ি, পাতিল, চাড়ি প্রভৃতি মৃৎপাত্র প্রস্তুতোপযোগী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মাটি পাওয়া যায়। তদুত্তরে তাড়াস নিমগাছা হইতে ভবানীপুর পর্যন্ত কোন কোন স্থানের মাটি ঈষৎ পীতবর্ণ। মধ্য পুঙ্গলি প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের নিকট নদী তীরস্থ ভূভাগে যে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ মাটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে উত্তম রঙ তৈয়ারি হইতে পারে। ইহা সচরাচর বাজারে প্রতি মন ১৷৷৹ টাকা মূল্যে বিক্রিত 'এলা' (গৈরিক) মাটির ন্যায়। পদ্মা ও যমুনার চর অপেক্ষা ফুলজোড় বা ফুলঝোর নদীর চর ভূমিতে ও তীরে অনেক স্থলে অতি উৎকৃষ্ট লাল আভাযুক্ত মোটা বালুকারাশি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইমারতাদি নির্মাণে উত্তমরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পদ্মা প্রভৃতি নদী তীরস্থ 'পলি' মৃত্তিকাযুক্ত চরের জমি অতি উর্বর, কিন্তু এই সমস্ত চর দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। বর্ষা অন্তে জল কমিবার সময় নদীর গতি পরিবর্তন হেতু স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকা ও বালুকারাশি স্থান বিশেষে জমিতে জমিতে নদীগর্ভে চর জাগিয়া উঠে ; ক্রমশ তাহার উপর বন, ঝাউ প্রভৃতি নানা প্রকার জলজ গুল্মাদি জন্মিতে থাকে এবং প্রতি বৎসর বর্ষাকালে তাহা নূতন 'পলি' মাটি বা বালুকা দ্বারা আবৃত হইতে হইতে কালসহকারে বহুদূর পর্যন্ত চরে পরিণত হয়। সচরাচর বালুকাময় চর 'পতিত' (অনাবাদি) থাকে, পলি মৃত্তিকাযুক্ত

স্থানসমূহ ধীরে ধীরে আবাদি জমি রূপে ব্যবহৃত হয়। তখন দলে দলে কৃষককুল তথায় যায়, বন কাটে, ঝাউ মারে, চতুর্দিকস্থ ভূমি চাষ করে ও স্থানে স্থানে ঘর বাড়ি নির্মাণ করিয়া কৃষিকার্যের নিত্যসহচর গো মহিষাদিসহ বাস করিতে থাকে। ক্রমে জন সংখ্যার বৃদ্ধি সহকারে এই সমস্ত চর গ্রামে পরিণত হয় ; মালেক জমিদার প্রভৃতি নূতন নূতন প্রজা পত্তন করিয়া নজর সেলামী আদি আদায় করিতে থাকেন। এইরূপে ১০/১৫ বৎসর একাদিক্রমে চলিতে থাকিয়া হয়ত অকস্মাৎ এক বর্ষা ঋতুতেই ৩/৪ মাস মধ্যে কোন কোন স্থলে দৈনিক একাধিক মাইল হিসাবে জলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙিয়া ক্রমশ ৯/১০ মাইল বিস্তৃত গ্রাম একেবারে নদীগর্ভে অদৃশ্য হইয়া যায়।

এই সমস্ত চর জমিদারগণের অনেক লাভজনক ভূসম্পত্তি বলা যায়। ইহা পলি মৃত্তিকাযুক্ত হইলে সাতিশয় উর্বর হইয়া থাকে। ধান, পাট অধিক পরিমাণে জন্মে জন্য চাষী প্রজাগণ লোভে পড়িয়া অনেক সময় উচ্চহারে নজর দিয়াও এই সমস্ত চরের জমি পত্তন হয়। কৃষকের কিছু হউক না হউক, অনেক সময় রায়তগণ মধ্যে প্রতিযোগিতা বশতঃ জমিদারগণ কিঞ্চিৎ নজর সেলামী পাইয়া থাকেন। পদ্মার চরে শিলাইদহের "ঠাকুর" জমিদার এবং যমুনার চরে সন্তোষ প্রভৃতি মৈমনসিংহ জেলার জমিদারগণের অনেক ভূসম্পত্তি আছে। ইহাতে মালেকগণের কিছু লাভ আছে বলিয়াই বোধ হয়, কারণ ইহার দখল বেদখল লইয়া, কি বা সীমানার মীমাংসাদি লইয়া, মালিকগণ মধ্যে নানাপ্রকার ব্যয়সাধ্য দেওয়ানি ফৌজদারি মোকদ্দমা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুন-জখম পর্যন্তও হইতে দেখা যায়। এই সমস্ত জমিদারগণ ব্যতীত গবর্নমেন্টেরও এই চরসমূহে অনেক খাস মহল সম্পত্তি আছে। তাহাতে সরকার বাহাদুরেরও অনেক রাজস্ব আদায় হয়।

এই জেলার ভূভাগ মৃত্তিকার প্রকৃতি অনুসারে সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যথা—"বরিণ", "ভর" ও "চর"। উত্তর পশ্চিম দিকস্থ রায়গঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ থানার কতকাংশে উচ্চভূমিকে "বরিণ" বা বরিন্দ, কোন কোন স্থলে "থিয়ার" বলে। জেলার মধ্যবর্তী বিলময় নিম্নস্থান সমূহ চলিত ভাষায় 'ভড়' এবং তথাকার আদিবাসী 'ভড়ে' নামে পরিচিত। সম্ভবত ঐ বিলময় প্রদেশজাত জন্যই এই জেলার এক প্রকার ধানের নাম 'ভড়েনাটা' হইয়াছে। পদ্মা যমুনাদি নদীবক্ষে উৎক্ষিপ্ত জমি 'চর' নামে খ্যাত।

কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের দেশের গ্রাম নগরের নামকরণ বিষয় অনুধাবন করিলে এবং তাহাদের বিভাগ ও পর্যায়াদির প্রতি মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিলে, দেশের ভূভাগ গঠনের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে পারা যায়। "প্রবাসী" মাসিক পত্রিকায় ১৩১৭ সালের ভাদ্র ও আশ্বিনের সংখ্যাদ্বয়ে এবং "যশোর খুলনার" ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের ১৪১ পৃষ্ঠায়, এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। উহাতে লেখকগণ বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, অস্মদেশীয় গ্রামাদির নাম পর্যায়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার অনেক আভাস ও ভূভাগ গঠনের ইতিবৃত্ত লুক্কায়িত রহিয়াছে।

উপরোক্ত হিসাবে বিবেচনা করিলে, এরূপ বলা যাইতে পারে যে, পাবনা জেলার অধিকাংশ স্থান পূর্বে জলমগ্ন ছিল ও এখনও কতকাংশ নদী বিল খাল নালা দতে পূর্ণ আছে। ক্রমে জলভাগ হ্রাস হইতে হইতে, যখন স্থলভাগের গঠন আরম্ভ হইয়াছে, তখন ইহার ভূখণ্ডের কোন কোন স্থান 'স্থল' নামে অভিহিত হইয়াছে। স্থল নামক কয়েকটি গ্রাম, স্থলচর স্টিমার স্টেশন ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যখন স্থলভাগ ধীরে ধীরে চতুর্দিকস্থ ভূখণ্ড অপেক্ষা উচ্চতর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন তাহা ডাঙা জমিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতেই ডাঙা সংযুক্ত গ্রামের নামের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যথা ভাউডাঙা, পোরাডাঙা, পার্শ্বডাঙা প্রভৃতি। যখন জল মধ্যে উচ্চ ও বিস্তৃত ভূভাগ গঠিত হইয়া সুদূর বিস্তৃত চরে পরিণত হইয়াছে তখন সেই সমস্ত চর হইতে দিয়ারা, দিয়ার, দির প্রভৃতি উচ্চত্ব সূচক নামের

গ্রাম সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যথা, ভূতের দিয়ার (বর্তমান সিরাজগঞ্জ), দিয়ারারূপপুর (সাঁড়া থানা) দিয়ারবাঘল, মানিকদির প্রভৃতি। এই সমস্ত ক্রমে চাচ্চরজাত দিয়ারা জমি যখন নদী নালা সোতা প্রভৃতিতে ক্রমশ বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশে পৃথক হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতে চর সংযুক্ত গ্রামের নামে ভূভাগ গঠিত হইয়াছে। যথা চরতারাপুর, চরকুডুলিয়া প্রভৃতি। কালে এইরূপে ভূভাগ গঠিত হইতে হইতে যখন নদী নালা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, তখন নদীর কুলে কুলে গ্রামের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইলে, আতাইকুলা (আত্রেয়াকুল), দহকুলা, গাঙ্গকুলা প্রভৃতি গ্রামের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

আবার যখন নদী তীরে হাট বাজার বসিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন গোলাগঞ্জ প্রভৃতি নাম সংযুক্ত স্থানের নাম সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যেমন নাজিরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, সাধুগঞ্জ প্রভৃতি। যখন এই প্রকারে ভূভাগ গঠন আরম্ভ হইয়া তথায় জাতি নির্বিশেষের বসতি বিস্তার ঘটিয়াছে, তখন হইতে জাতিবাচক গ্রামের নাম সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যথা—ব্রাহ্মণগ্রাম, ঘোষগাঁতি ; কালে তৎ তৎ স্থানে ব্যক্তি বিশেষ প্রধান হইয়া উঠিলে তাহাদের নামানুসারেও অনেক স্থানের নামকরণ হইয়াছে বোধ হয় ; যথা গোপালনগর, বনওয়ারিনগর, নন্দীবেড়া ; কালে ভূভাগ দীর্ঘদিন স্থায়ী হইয়া তথায় সুবৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিলে গাছের নামানুসারেও অনেক গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে, দোগাছি, তিনগাছা, তালগাছি, নিমগাছি, কলাগাছি প্রভৃতি। হিন্দু-মুসলমানের রাজত্ব সময়ের নিদর্শন স্বরূপও অনেক গ্রামের অস্তিত্ব বর্তমান আছে বলিয়া বোধ হয় ; যথা, গয়েশপুর (গিয়াসুদ্দিন হইতে), জালালপুর, হামিদপুর, ইয়াকুবপুর প্রভৃতি। হিন্দু-মুসলমানগণের ধর্মস্বাতন্ত্র্যের পর্যায় ক্রমেও অনেক গ্রাম আছে, যথা কৃষ্ণপুর, দুর্গাপুর, রাধানগর, ব্রহ্মগাছা, কালিকাপুর, কাজিপুর প্রভৃতি। জলমগ্ন দেশের মৎস্যের নামানুসারেও অনেক স্থানের নামোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যথা, বোয়ালমারি, চান্দাইকোণা, পরাখালি, টাকিগাড়া প্রভৃতি। ধান্যবহুল দেশে ধানের নাম সংযোগেও অনেকগুলি গ্রামের নাম পাওয়া যায়, যথা—ধানঘড়া, ধানবিলা, ধানবাঁধি, ধানুয়াঘাটা প্রভৃতি।

এই প্রকারে আরও অধিক দূর পর্যন্ত গ্রামের নাম পর্যায় বিশ্লেষণ করিলে, দেখা যায় যে, নদীগর্ভ বা সুবিস্তীর্ণ জলরাশি মধ্য হইতে স্থল, চর, দিয়ার, ডাঙা প্রভৃতি স্থলভাগ জ্ঞাপক নাম সমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া জাতি, ব্যক্তি, ধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন অর্থবোধক নামে পরিচিত পল্লী, গ্রাম, নগরাদির সৃষ্টি ক্রমশ হইয়াছে। এই সকল নাম পর্যায় মধ্যেও দেশের ভূতত্ত্বের একটি ঐতিহাসিক রহস্য নিহিত আছে বলিয়া অনুমান অতীব সমীচীন ও সুসঙ্গত বলা যাইতে পারে।

পুষ্করিণী, ইন্দারা ও কুপাদি খননকালে ভূগর্ভে অনেক স্থানে নানারূপ মৃত্তিকা ও বালি মিশ্রিত স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয়, এই সমস্ত স্থানসমূহের মৃত্তিকা অল্পদিন হইল গঠিত হইয়াছে। ৫/৭ বৎসর হইল নাজিরগঞ্জ অঞ্চলে হাকিমপুর গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে ১৪/১৫ হাত মৃত্তিকার নিম্নে বিলের শৈবালাদির চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতে বোধ হয়, পূর্বে এ সমস্ত স্থানে বিলাদি জলাশয় বর্তমান ছিল। জলপ্লাবনে মৃত্তিকা জমিয়া ভূভাগে পরিণত হইয়াছে। সাধারণত কুপাদিতে ১০/১২ হাত মধ্যে জল দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালেও ১৫/২০ হাত মৃত্তিকার নিম্নে কূপ ইন্দারাদিতে জল থাকে।

সাঁড়ায় রেলওয়ের সেতু নির্মাণকালে উহার স্তম্ভ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার সময়ে বালি ও শক্ত আটিয়াল মাটি মিশ্রিত নানাপ্রকার স্তর ঐ প্রদেশের ভূগর্ভে দেখা গিয়াছিল। সর্বনিম্ন জলোচ্ছ্বাসের ১৫০ হইতে ১৬০ ফুট পরিমাণ নিম্নে স্থায়ী মৃত্তিকা স্তর পাওয়া গিয়াছিল, তদবলম্বনে ঐ সেতুর স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট হইতে সিরাজগঞ্জ টেলিগ্রাফ অফিস প্রাঙ্গণে ২০/২/১৯১৬ তারিখে মৃত্তিকার পরীক্ষায় জানা যায় তথাকার

ভূগর্ভে ২২ ফিট নিম্নে ওগ্রা বালি (running sand), ৩৪ ফিট নিম্নে শক্ত কাল মাটি, তন্নিম্নে মোটা বালি আছে। আবার ২০/১/১৯১৬ তারিখে পাবনা সারকিট হাউজে (এক্ষণে পদ্মা গর্ভে) ইন্দারা খননকালে জানা গিয়াছিল ২৯ ফিট নিম্নে ওগ্রা বালি, ৩৮ ফিট নিম্নে মোটা বালি, ৪০ ফিট পর্যন্ত শক্ত মোটা বালি, ৬২ ফিট নিম্নে নীলাভ শক্ত কর্দম, ৭০ ফিট নিম্নে গাঢ় শক্ত পীতবর্ণ মাটি আছে।

সম্প্রতি ১৯২৩ অব্দের প্রারম্ভে সরকার হইতে পাবনাতে জলের কল প্রতিষ্ঠাকল্পে মৃত্তিকা ও জলের পরীক্ষা হইতেছে; তাহাতে জানা যাইতেছে যে প্রায় ৭০ ফিট নিম্নে সাধারণ বালি ও মৃত্তিকা মিশ্রিত মাটি আছে; তন্নিম্নে ১১০/১১৫ ফিট পর্যন্ত বালি ও কঙ্কর, আবার তৎপর ১২০/১২৫ ফিট পর্যন্ত আটিয়াল কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা আছে। ক্রমশ এই প্রকার বালি ও মাটি মিশ্রিত স্তর প্রায় ২২০ ফিট পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

অনেকে অনুমান করেন ৪৫০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান বঙ্গের অধিকাংশ ভূমি সাগর গর্ভে নিমজ্জিত ছিল, ক্রমশ করতোয়া, আত্রেয়ী, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানন্দা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত মৃত্তিকা রাশি সমুদ্র মুখে পতিত হইয়া চর উৎপন্ন হইতে হইতে প্রথমে আধুনিক পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি জেলার ভূভাগের সৃষ্টি হয়; বহু শতাব্দী কাল পরে ২৪ পরগণা, খুলনা, যশোহর, নদীয়া, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, ঢাকা, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলার স্থান সমূহ ক্রমশ গঠিত হইয়াছে। (Lyall's Principles of Geology দ্রষ্টব্য)। এই সমস্ত জেলার ভূপঞ্জরস্থ ক্রমনিম্নবর্তী স্থানের মৃত্তিকার নানাপ্রকার বর্ণ এবং বালি ও মাটি মিশ্রিত বিভিন্ন রূপ স্তরাদি ইহাদের পূর্বে সাগরগর্ভে নিমজ্জিত থাকার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

জল ঃ

পদ্মা, বরল ইছামতী প্রভৃতি নদীর জল আষাঢ় হইতে কার্তিক পযন্ত কয়েক মাস কর্দমাক্ত ও পঙ্কিল বা 'ঘোলা' হইয়া থাকে। যমুনার জল বর্ষাকালে কিয়ৎ পরিমাণে কর্দমাক্ত কিংবা ঘোলা হইলেও পদ্মাদি নদীর মত ইহার জল অধিক ঘোলা হয় না; ইংরেজ লেখকগণ এই নদীকে 'ব্লু রিভার' বলিয়াছেন; বাস্তবিক ভাদ্র মাসেও 'বাইস কোদালিয়ার' মোহনায় পদ্মা ও যমুনা সঙ্গমস্থলেও পদ্মার ঘোলা ও যমুনার কৃষ্ণবর্ণ জলের পার্থক্য অনুভূত হয়। বর্ষাকালে এই সমস্ত নদীর জল ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। কিন্তু অবগাহন স্নানাদিতে স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ; অন্যান্য সময়ে এই নদীসমূহের জল স্বচ্ছ ও নির্মল এবং সুস্বাদু; ফুলঝোর বা ফুলজোড় নদীর জল বর্ষায় কর্দমাক্ত, অন্য সময়ে কথঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ।

নদী অপেক্ষা বিলের জল সাধারণত কিঞ্চিৎ কাল রঙ বিশিষ্ট বটে, কিন্তু বিস্বাদ নহে। গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ বিল শুকাইয়া যায়; যে স্থানে সামান্য জল থাকে তাহা গবাদির অত্যাচার ও মানুষের নানারূপ উপদ্রবে একেবারে পঙ্কিল ও অব্যবহার্য হয়। তবে বিল কুড়ুলিয়া প্রভৃতি গভীর জল বিশিষ্ট বিলের জল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেও পরিষ্কার থাকে। দীঘি, পুষ্করিণী, কূপাদির জল স্থান ভেদে মৃত্তিকার গুণে স্বচ্ছ, কৃষ্ণবর্ণ বা নীলাভ দেখায়।

সদর অপেক্ষা সিরাজগঞ্জ মহকুমার মাটি বালুকা মিশ্রিত ও দোঁয়াশ জন্য তদঞ্চলের পানীয় জলের বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। রায়গঞ্জ প্রভৃতি থানায় কতক গ্রামে বহুল পরিমাণে প্রাচীন ও সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা বর্তমান আছে, তাহার কোন কোনটিতে এখনও নির্মল জল পাওয়া যায়, তবে ইহাদের অধিকাংশই শৈবালাদিতে পরিপূর্ণ।

সর্বত্রই জল অল্প বিস্তর সুস্বাদু, কোথাও লবণাক্ত নহে। তবে বিলময় প্রদেশে সদর মহকুমার জল ব্যবহারে গুরু বা ভারি, সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের জল অপেক্ষাকৃত লঘু বা পাতলা, বিলের জল অবরুদ্ধ গতি প্রযুক্ত সর্বত্রই স্বচ্ছ ও নির্মল, পদ্মা প্রভৃতি স্রোতস্বতী নদীর জল বর্ষা ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতেও কথঞ্চিৎ শ্বেতবর্ণ বা সাদা থাকে। হুরাসাগর, ফুলঝোর প্রভৃতি নদীসমূহ অত্যধিক বালুকায় স্থান দিয়া প্রবাহিত হওয়ার জন্য স্বভাবত নির্মলসলিলা; বর্ষায়

কথঞ্চিৎ কর্দমাক্ত হইলেও অন্যান্য সময়ে সাধারণত কৃষ্ণাভ বলিয়া বোধ হয়। সিরাজগঞ্জ অপেক্ষা পাবনার কুপ ইন্দারাদির জলে কিঞ্চিৎ লৌহ ও অধিক পরিমাণে সোরা মিশ্রিত আছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে পরিপাক শক্তি হ্রাস হইয়া সময় সময় উদরপীড়া বৃদ্ধি করে। রন্ধনাদি কার্যেও পাবনার জলে সহজে ডাউলাদি সিদ্ধ হয় না ; ভক্ষ্য বস্তুর বর্ণের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।

এই জেলায় কার্তিক হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত কম বৃষ্টি হয় ; কোন কোন বৎসর পৌষ মাঘ মাসে কচিৎ বৃষ্টি হইতে দেখা যায়। চৈত্র মাসের শেষ হইতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয় ; বর্ষায় মাসিক ১১ ইঞ্চি হইতে ১২ ইঞ্চি পরিমাণ বারিপাত হয়। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত কোন কোন বৎসর অত্যধিক বৃষ্টি হয়। সাধারণত ঐ সময় বৃষ্টির পরিমাণ মাসিক গড়ে ৭ হইতে ৮ ইঞ্চি ধরা যাইতে পারে। শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, সাঁড়া ও পাবনায় বারিপাত পরীক্ষার স্থান নির্দিষ্ট আছে। ১৯২২ অব্দে জুন মাসে গড়ে কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১৯২২, জুন।

শাহজাদপুর—১১.০৩ ইঞ্চি।	সাঁড়া—১১.২৮ ইঞ্চি।
সিরাজগঞ্জ—২১.০৯ ইঞ্চি।	পাবনা—১১.৮৮ ইঞ্চি।

ঐ অব্দে সমস্ত জেলার বার্ষিক গড়পরতা মোট বারিপাতের পরিমাণ ৯০.৪৬ ইঞ্চি। গত ৫ বৎসর মধ্যে কেবলমাত্র পাবনা টাউনে ১৯২২ অব্দে সর্বাপেক্ষা বেশি ৭০.০২ ইঞ্চি এবং ১৯১৮ অব্দে ৪৬.০১ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

পাবনা ও সিরাজগঞ্জ মহকুমায় উক্ত ১৯২২ অব্দে কি পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছিল, কলকাতা গেজেট হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। তদৃষ্টে দেখা যায় পাবনা অপেক্ষা সিরাজগঞ্জে ঐ অব্দে কম বারিপাত হইয়াছে।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দ

মাস	পাবনা	সিরাজগঞ্জ	মাস	পাবনা	সিরাজগঞ্জ
জানুয়ারি	০.০৫	—	জুলাই	১১.৯০	৭.৫৭
ফেব্রুয়ারি	০.১৭	০.১৪	আগস্ট	১১.৫৯	৮.২৩
মার্চ	—	০.০৩	সেপ্টেম্বর	১.৭৩	৪.২৬
এপ্রিল	৩.৮৪	০.৬৯	অক্টোবর	৪.৮৪	২.৫০
মে	৩.৯৯	৩.৩১	নভেম্বর	০.৮১	০.১০
জুন	১১.৮৮	১১.৯০	ডিসেম্বর	—	০.০২

বায়ু ঃ

এতদ্দেশের আবহাওয়া সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিভিন্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দিবাভাগে অত্যুষ্ণ বায়ু সঞ্চালিত হয়। মধ্যে মধ্যে বৈকালে পশ্চিমদিক হইতে মেঘ উঠিয়া সবেগে ঝটিকা আরম্ভ হয় ; কখনও বা "ঘুর্ণি বায়ু" উঠিয়া প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইয়া স্থান বিশেষে ঘরবাড়ি ও বৃহৎ বৃক্ষাদি পর্যন্ত ভূমিসাৎ করে। এই সমস্ত বৈকালিক ঝড় সচরাচর এদেশে "কাল বৈশাখী ঝড় বা সাফট" নামে অভিহিত হয়। প্রবল বাত্যা মধ্যে এই সকল সাময়িক বায়ু বা মনসুন এদেশে বৃষ্টি আনয়ন করে ও তাহাতে নিদাঘের উষ্ণ বায়ু শীতল ও আর্দ্র হয়।

বর্ষায় দক্ষিণদিক হইতে বায়ু সঞ্চালিত হইতে থাকে। ইহা সাধারণ লোকের নিকট "দক্ষিণে বাতাস বা সংক্ষেপে দক্ষিণে" নামে খ্যাত। বর্ষান্তে শরদাগমে পূর্বদিক হইতে শীতল

বাতাস বহিতে থাকে। ইহা চলিত ভাষায় "পুবাণ হাওয়া" নামে পরিচিত। এই সময় বঙ্গোপসাগরে সাধারণত ঝড় আরম্ভ হইলে, এদেশেও ঐ সময় ইহার প্রকোপ অনুভূত হয়। কোন কোন বৎসর ভাদ্র মাসের শেষে কিংবা আশ্বিনের প্রথমে এদেশে ভয়ঙ্কর ঝড় তুফান দেখা যায়। ক্রমাগত ২/৩ দিন ব্যাপী, কখন বা একভাবে সপ্তাহকাল স্থায়ী ঝড় বৃষ্টি ও প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়। ফলে লোকের ঘর-বাড়ি ভূমিসাৎ হয়, হৈমন্তিক ধান্যাদি বিনষ্ট হয় এবং কোন কোন বৎসর দুর্গোৎসবের আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হয়।

কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বায়ুর গতি পরিবর্তিত হইয়া উত্তরদিক হইতে শীতল বায়ু বহিতে থাকে। মাঘের শেষ পর্যন্ত এই বায়ু এদেশে 'উত্তরে হাওয়া' নামে পরিচিত। তখন হইতে ফাল্গুন মাসের প্রথমে দক্ষিণপশ্চিম দিক হইতে বায়ু সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা স্বাস্থ্যপ্রদ ; শীতাবসানে লোকের জড়তানাশক ও নবজীবনোন্মেষক। ইহাতে লোকে নানারূপ ব্যাধি পীড়াদি হইতে মুক্তিলাভ করে ; তজ্জন্য ইহাকে স্বাস্থ্যকর 'ফাল্গুনেবাও' (মলয়ানিল) বলা যাইতে পারে। ফাল্গুনের শেষ ও চৈত্র মাসের কতকদিন পর্যন্ত পশ্চিমদিক হইতে সবেগে শুষ্ক 'ঝাপটা বায়ু' বা বাত্যা বহে ; ইহাতে বৃক্ষাদির পুরাতন পত্রাদি ঝরিয়া পড়ে ; ইহা সাধারণত চলিত ভাষায় এদেশে 'ফাল্গুনে ঝাঁওয়াল' নামে পরিচিত।

এদেশে সাধারণত আকাশের কোণে বিশেষে মেঘের সঞ্চার দেখিয়া ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতির ও বায়ুর গতি নির্ণয় করিবার সঙ্কেত নির্দিষ্ট আছে। "আষাঢ়ে" কোণ, "শাউনে" (শ্রাবণে) মেঘ ও "ভাদুরে" মেঘের ডাক বা গর্জন প্রভৃতিতে এদেশের লোক বায়ুর গতির পূর্বাভাষ জানিতে পারে। ইহাতে নৌকারোহী বা নৌকাবাহী মাঝিমাল্লা ও মাঠে কর্মশীল কৃষককুল আকাশের চিহ্ন দেখিয়া ঝড় তুফানের পূর্বলক্ষণ অনুভব করিতে পারে। এইরূপে অনেক সময় আকাশের মেঘাদিতে বায়ুর গতির নির্দেশ আছে বলিয়া বোধ হয়।

বিল নদী বহুল স্থানে হইলেও, এ জেলার বায়ু, একেবারে শীতল নহে, শীত ব্যতীত অন্যান্য ঋতুতে সর্বত্রই উষ্ণ বায়ু সঞ্চালিত হয়। সাধারণত পদ্মা যমুনাদি নদী তীরস্থ চরের খোলা 'হাওয়া' স্বাস্থ্যকর ; জঙ্গলাকীর্ণ পল্লী বায়ু ম্যালেরিয়ার বিষপূর্ণ ও বিলময় প্রদেশের উন্মুক্ত স্থানের বাতাস স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়াই বোধ হয়।

বায়ু মণ্ডলের শৈত্য ও উষ্ণতা নির্ধারণকল্পে পাবনায়, তাপমান যন্ত্রে ১২ মাসের মাসিক যে গড় পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইতে অঙ্কগুলির ভগ্নাংশ পরিমাণ বাদ দিয়া কেবলমাত্র স্থূল ডিগ্রির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল। ইহাতে দেখা যায় গড় তাপ পরিমাণ জানুয়ারি মাসে ৬৫° হইতে জুন মাসে ৮৫° পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বর্ষার মনসুন সময়ে প্রায় ৮২° পরিমাণ থাকে। এপ্রিল মাসে ৮৪° হইতে ৯৫° পর্যন্ত উঠিয়া থাকে, ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে সর্বাপেক্ষা কম ৫০° পর্যন্ত নামিয়া থাকে। সর্বাপেক্ষা উচ্চ ১০৬° ও সর্বনিম্ন ৪৬° পর্যন্তও হইয়া থাকে।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দ

	তাপমান				তাপমান		
মাস	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	গড়	মাস	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	গড়
জানুয়ারি	৭৮	৩৩	৬৫	জুলাই	৮৯	৭৬	৮২
ফেব্রুয়ারি	৮৫	৫৮	৭১	আগস্ট	৮৮	৭৫	৮১
মার্চ	৮৯	৬৯	৭৯	সেপ্টেম্বর	৮৯	৭৫	৮১
এপ্রিল	৯৪	৭৪	৮৪	অক্টোবর	৮৯	৭২	৮১
মে	৯৫	৭৫	৮৫	নভেম্বর	৮৫	৬০	৭২
জুন	৮৯	৭৪	৮১	ডিসেম্বর	৭৯	৫৩	৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—নদীসমূহের বিবরণ

সাধারণ ঃ

এই জেলার নদীসমূহ অধিকাংশই উত্তর অথবা পশ্চিমোত্তর হইতে দক্ষিণ অথবা পূর্বদক্ষিণ বাহিনী। ইহাতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, এই জেলার পশ্চিমোত্তর অপেক্ষা পূর্বদক্ষিণাংশ নিম্ন। সাধারণত যমুনা, হুরাসাগর প্রভৃতি নদীর জল বর্ষার প্রথমেই বর্ধিত হয় ; তাহাতে ইছামতী, বরল, গোমানী নদী সকলের জল পূর্ণ বর্ষার পূর্বেই পূর্বদক্ষিণ দিকের ঐ জলে বাধা প্রাপ্ত হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে বারিপাত হইয়া আবাদ বুনানী শেষ না হইতে পারিলে, উক্ত জল বৃদ্ধি হেতু কোন কোন বৎসর বড়বিল প্রভৃতি ভড় অঞ্চলে ধান্যাদি ফসল একেবারে নষ্ট হয়।

পদ্মা ও যমুনা নদী আধুনিক কালে প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বে করতোয়া ও আত্রেয়ী নদীদ্বয়ই বিশালাকায় ও প্রবল ছিল। নদী বহুল দেশে নদী চির প্রবাহমান ও স্রোতস্বতী থাকিলে, দেশে বাণিজ্য ও ধন সম্পদ বৃদ্ধি সহকারে সভ্যতারও বিস্তার হইতে থাকে। নদী দেশের উন্নতির মূল কারণ ও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ; নদীকূলে উন্নতিশীল জাতিগণ বাস করিয়া দেশে সমৃদ্ধি আনয়ন করে ; নদী তীরে বর্ধিষ্ণু বন্দর, গ্রাম ও নগরাদি প্রতিষ্ঠিত হয় ; কালে সেই সকল স্থান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিল্প বাণিজ্যকলা প্রভৃতি নানা বিদ্যা ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এই জেলার প্রাচীন করতোয়া নদীতটেই নিমগাছি, মরিচপুরাণ, নবগ্রাম, হাণ্ডিয়াল প্রভৃতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ গ্রাম সকল অবস্থিত ছিল ; আত্রেয়ী তীরে ছাতক, বরাট, সিন্দুরী প্রভৃতি বর্ধিষ্ণু পল্লীসমূহ এক সময়ে জনসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বরল ও করতোয়ার নিম্নাংশে সাঁড়োরা, গুয়াখারা, সালিখা, গুণাইগাছা, সমাজ, সিদ্ধিনগর প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান পল্লীসমূহ বর্তমান ছিল। করতোয়া জেলার পশ্চিমাংশে একেবারে বিলুপ্ত ; কোন কোন স্থানে আত্রেয়ী নদীর চিহ্ন পর্যন্তও নাই ; বরল নদীও স্থানে স্থানে ভরট্র হইয়া (মজিয়া) "পচা বরল" নামে খ্যাত হইয়াছে ; এই সমস্ত নদীর অবরোধ ও বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত গ্রামসমূহের অবনতি ও হীনাবস্থা এবং কোন কোনটির একেবারে বিলোপসাধন ঘটিয়াছে।

অধুনাতন যমুনা তীরে সিরাজগঞ্জ পূর্ববঙ্গের একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর ; পৃথিবীর নানাদেশীয় ব্যবসায়ী ও সওদাগরী জাতিসমূহের অবস্থান ও নবপ্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র স্থানে বহু জন সমাগম, ভূতপূর্ব সিরাজগঞ্জ জুটমিল, নানাস্থানের জমিদার তালুকদারগণের আদায় তহশীল কাছারি, ডাক্তার কবিরাজ বৈদ্যগণের অবস্থান এবং এথাকার স্কুল, মক্তব ও মাদ্রাসাদি এই জেলার শ্লাঘার বিষয় ; ফুলঝোর তীরে চান্দাইকোণা ও উল্লাপাড়া, হুরাসাগর তীরে শাহজাদপুর ও বেড়া এবং বরলের প্রবাহিত অংশের তীরে ভাঙ্গুরিয়া ও বনওয়ারীনগর প্রভৃতি স্থান বর্তমানে স্রোতস্বতী নদী তীরে অবস্থিত বলিয়াই ক্রমোন্নতিশীল ও বর্ধিষ্ণু। বর্তমান পাবনা নগরীও একসময়ে বার মাস প্রবহমান ও স্রোতস্বতী ইছামতী নদী তীরে অবস্থিত থাকায় বিশেষ উন্নতিশীল ছিল বলিয়া বোধ হয়। এথাকার দেয়ানগঞ্জ, রাধানগর, পৈলানপুর এবং শহরের নূতন ও পুরাণ বাজার নামে ৫টি বাজার বর্তমান থাকার নিদর্শনই তাহার প্রমাণ ; তজ্জন্যই অধিক জনসমাকুল পাবনায় প্রথমে মহকুমা ও পরে জেলার কেন্দ্রস্থল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় ; অধুনা বাহ্যিক চাকচিক্য বৃদ্ধি পাইলেও ইছামতী নদী ক্রমে শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করায় পূর্বতন স্থায়ী আভ্যন্তরীণ উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নদী পথে দেশে ধন সমাগম, শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতা বিস্তার কি প্রকারে সাধিত হয় এবং নদীর বিলোপসাধন ও বিশীর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে দেশের গ্রামনগরের কিরূপ অবনতি ও

অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহা এই জেলার উপরোক্ত পূর্বতন ও বর্তমান স্থানসমূহের উন্নতি অবনতির প্রতি মনোনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

পদ্মা ও যমুনা নদীর গতি অতিশয় পরিবর্তনশীল ; ইহাদের উভয়কূল প্রতি বৎসরই ভাঙিতেছে এবং নূতন নূতন চর গঠিত হইতেছে। এই সকল চর কি প্রকারে জলস্রোত ও নদীর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হইতেছে, আবার কিয়দ্দিনান্তর সহসা নদীগর্ভে অদৃশ্য হইতেছে ইতিপূর্বে তাহা বিবৃত হইয়াছে। অল্পদিন পূর্বে যে সমস্ত গ্রাম নদী হইতে *৩/৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল, অধুনা তাহার অস্তিত্ব একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, নাম ও স্মৃতি ভিন্ন কিছুই বর্তমান নাই, যথা—বেলকুচি, মথুরা, নগরবাড়ি, কুমিদপুর, কুড়ুলিয়া প্রভৃতি।* যে সমস্ত গ্রামের পার্শ্ব দিয়া নদী অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত, নদী গর্ভে চর জাগিয়া তৎসমুদয় স্থান নদী হইতে ২/৪ ক্রোশ দূরবর্তী বলিয়া দেখা যাইতেছে। যথা—সাঁড়া থানার পাকুরিয়া, দিঘা, দাপুনিয়া প্রভৃতি গ্রামসমূহ।

এই জেলার নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গার বর্তমান প্রধান প্রবাহ পদ্মা, ব্রহ্মপুত্রের আধুনিক মূলধারা যমুনা, করতোয়ার নিম্নাংশ ফুলঝোর ও আত্রেয়ী এই চারটি নদী মধ্যে যদিও পদ্মা পতিতপাবনী গঙ্গা ও যমুনা কলুষবিনাশন ব্রহ্মপুত্র হইতে উৎপন্ন ; তথাপি করতোয়া ও আত্রেয়ী ভিন্ন, পদ্মা ও যমুনা নদী পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয় না। বারুণী, বসন্তাষ্টমী, দশহরা প্রভৃতি হিন্দুর পুণ্যদিনে যে সমস্ত স্থানে স্নানোপলক্ষে নরনারীগণ সমবেত হয় এবং ঐ দিনে তথায় মেলা ও আরঙ্ প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়, তৎসমুদয়ই আবহমান কাল হইতে করতোয়া তটে নবগ্রাম ও মৃজাপুর (অষ্টমনীষা), ফুলঝোর তীরে শাহজাদপুর ও বাতিয়া এবং আত্রেয়ীকূলে ফৈলজানা, কাবারিখোলা ও সিন্দুরী প্রভৃতি গ্রামে অবস্থিত। এতদৃষ্টে বোধ হয় আধুনিক কালে উৎপন্ন পদ্মা ও যমুনা নদীদ্বয় অপেক্ষা প্রাচীন করতোয়া ও আত্রেয়ী নদী দুইটি লোকের নিকট তীর্থরূপে পূজিত হয়।

জেলার পশ্চিমোত্তর দিক হইতে পূর্বদক্ষিণাংশ ক্রমনিম্ন হইলেও প্রথম বর্ষায়ই যমুনা হুরাসাগরাদি নদীর জল স্ফীত হইয়া জেলার বদ্ধজলরাশি একেবারে নিসারিত হইতে দেয় না। কোন কোন বৎসর অতিরিক্ত জলপ্লাবন নিবন্ধন দেশের বিলময় প্রদেশের শস্যাদির অনেক অনিষ্ট হয় ও অবরুদ্ধ জলরাশি জেলার মধ্যে জমিয়া জেলাময় ম্যালেরিয়া উৎপাদন ও তাহা বৃদ্ধির সহায়তা করে। সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেলপথ নির্মিত হওয়ার পর, গত কয়েক বৎসর রীতিমত জল নিকাশের কথঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটিয়াছে। ইহাতে বিল মধ্যস্থিত অনেক গ্রামের কৃষক কুলের দুরবস্থা হইয়াছে। গত ১৩২৯ সালের ভাদ্র আশ্বিন মাসের অত্যধিক জলপ্লাবনে এই জেলার যে ক্ষতি হইয়াছে, উক্ত বিলমধ্যবর্তী স্থানে রেলপথে উপযুক্ত পরিমাণ জল নির্গমণের সুব্যবস্থার অভাব তাহার একটি প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিয়দ্দিন হইল চিকনাই নদীতে বাঁধ দিয়া ফরিদপুর চাটমোহর থানার কতকগুলি গ্রামকে বর্ষার জলপ্লাবন হইতে রক্ষাকল্পে এবং গাজনার বিলের জলের গতি ও অবস্থার পরিবর্তন জন্য জেলাবোর্ড ও সরকার বাহাদুরের নিকট লোকে আবেদন নিবেদন করিতেছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

১. পদ্মা ঃ

পাবনা জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমের কতকাংশ দিয়া পদ্মা নদী প্রবাহিত। ইহা বর্তমানে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ বলিয়া গণ্য, কিন্তু পূর্বে তাহা ছিল না ; ভাগীরথীই গঙ্গার মূল স্রোত, পদ্মা একটি ক্ষীণ জলধারারূপে প্রবাহিত হইয়া মেঘনার সহিত মিলিত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার অধীন ছাপঘাটি নামক স্থানে পদ্মা আধুনিক কালে ভাগীরথী হইতে পৃথক হইয়া পূর্বদক্ষিণ দিকে উত্তরে রাজশাহী ও পাবনা এবং দক্ষিণে নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ঢাকা, ফরিদপুর ও পাবনা জেলাত্রয়ের সন্ধিস্থল গোয়ালন্দ নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাংশ যমুনা বা যবুনা নামক নদী পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থল

সাধারণত "বাইস কোদায়িলা"র মোহানা নামে খ্যাত। প্রবাদ মুসলমান রাজত্বকালে ঢাকা নগরে রাজধানী থাকা কালে নবাবের যাতায়াত জন্য জনৈক নমঃশূদ্র পরিবারের ২২ জন লোক মিলিয়া, আবার কেহ কেহ বলেন কোন সময়ে জলপ্লাবন নিবারণকল্পে জনৈক কৃষক পরিবারের প্রত্যেকে একখানি কোদাল লইয়া আবাদ বুনানীর সুবিধার্থ, যমুনা মুখস্থ ভূখণ্ড কাটিয়া দেয়। বর্ষায় যমুনার প্রবাহ ক্রমশ ব্রহ্মপুত্রের দিকে চলিয়া ঐ খাল দ্বারা পদ্মার সহিত মিলিত হয়। কতিপয় দিবস মধ্যে এই পদ্মা ও যমুনা সঙ্গম অতি প্রবল ও প্রশস্ত হইয়াছে। *প্রথমে বাইস জন লোক প্রত্যেকে এক একখানা কোদাল দ্বারা এই খাল কাটার জন্য ইহা* "বাইস কোদালে" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। আবার ইহার নিকটবর্তী ঢাকা, ফরিদপুর ও পাবনা জেলার নমঃশূদ্রগণের মধ্যে প্রবাদ মুসলমান আমলে তাহারা উপরোক্ত রূপ রাজসহায়তা করায় তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুরস্কৃত হয়; তজ্জন্য ঐ সাহায্যকারী নমঃশূদ্রগণের বংশধরগণ অদ্যাপিও স্বীয় সমাজে সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছে।

নদীয়া জেলার অধীন চর গোলাপনগর ও পাবনা জেলার অধীন মাজপাড়া, আরামবাড়িয়া এবং কোমরপুর প্রভৃতি গ্রামের নিকট হইতে "বাইস কোদালিয়া"র মোহনা পর্যন্ত এই জেলা মধ্যে পদ্মার দৈর্ঘ্য পরিমাণ প্রায় ৫০ মাইল, বক্রগতি নিবন্ধন এই ২৪/২৫ ক্রোশ মধ্যে প্রায় ২/৩ স্থানে ইংরাজি S অক্ষরের ন্যায় ইহাতে 'বাঁক' আছে। রেনেল সাহেব কৃত মানচিত্রে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষায় কোন কোন বৎসর স্থানে স্থানে ইহাতে 'পাক' বা জলের ঘুর্ণাবর্তের আবির্ভাব হয় ও তাহাতে নৌকা ডুবিয়া অনেক লোক মারা যায়। পদ্মার তুল্য খরস্রোত প্রবাহিনী নদী বঙ্গে অতি বিরল; বর্ষায় ইহার বেগ ও স্রোত দর্শনে ও কলনাদ শ্রবণে মনে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তৎকালে ইহার বিস্তার স্থানে স্থানে ৫ হইতে ৭ মাইল পর্যন্তও হইতে দেখা যায়। বেগগামী স্টিমার সমূহও ইহার গতি ভেদ করিয়া স্রোতের প্রতিকূলে সহসা যাইতে পারে না।[১]

প্রতি বৎসরই বর্ষায় পদ্মার উভয়তীরস্থ ভূমির পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। ইহার এক কুল ভাঙিতেছে, আবার স্থানে স্থানে নদী গর্ভে চর বাঁধিয়া অন্য কূল গঠিত হইতেছে; ইহাতে কোন কোন গ্রাম নদীবক্ষে বিলীন হইতেছে কোন কোন স্থান নদীতীর হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িতেছে। এই নদীর গ্রাম নগর ও ঘরবাড়ি ধ্বংসকারিণী মূর্তি দেখিয়া এই জেলার ভাঙাবাড়ি নিবাসী 'কান্ত' কবি যথার্থই গাহিয়াছেন (বাণী)

"কূলে তোরা সংসার পেতে, মাযায় ভুলে রয়েছিস,
কত ফল আর ফুলের বাগান, দালান কোঠা করেছিস,
আমি গিয়ে লাগাই গোল, পেতে দি এই নিষ্ঠুর কোল,
একটি মাত্র কূল রাখি, আর—
কাঁদিয়ে তোদের আর এক কূলের মাথা খাই।"

ভাদ্র মাসে উভয় কূল প্লাবিত হইলে, পদ্মা স্থানে স্থানে সমুদ্রবৎ প্রতিভাত হয়। বর্ষা ও গ্রীষ্মে পদ্মার জলোচ্ছ্বাসের হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য রামপুর বোয়ালিয়ায় গেজ্ রিডিং (Gauge reading) এর ব্যবস্থা আছে। পদ্মার রামপুর বোয়ালিয়া ও পাবনার অংশে জলের হ্রাসবৃদ্ধি প্রায় একরূপ ধরা যাইতে পারে। কিন্তু পদ্মার উজান ও ভাটিতে প্রতি মাইলে প্রায় ৩ ইঞ্চি পরিমাণ ঢালের পার্থক্য থাকার জন্য পাবনা জেলা অংশে পদ্মার জলোচ্ছ্বাস প্রায় ১৪/১৫ ফিট নিম্ন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তথাকার গেজ রিডিং-এর 'শূন্য' স্থানের পরিমাণ সমুদ্রতল হইতে প্রায় ৪২ ফিট উচ্চ ধরা হয়; তদপেক্ষা পদ্মার জলোচ্ছ্বাস বর্ষায় প্রায় ২৬.৩০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে, তৎপরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কিরূপ তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

রামপুর বোয়ালিয়ার গেজ রিডিং-এর P.W.D. নির্ধারণ মতে পদ্মার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন জলোচ্ছ্বাস (Water Level) পরিমাণ।

সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস		সর্বনিম্ন জলোচ্ছ্বাস	
তারিখ	পরিমাণ (ফিট)	তারিখ	পরিমাণ (ফিট)
১৫/৯/১৯২২	৬১.৭৫	২৭/৪/১৯২২	৩৪.৭০
২৬/৮/১৮৯০	৬৮.২১	৬/৫/১৯০৮	৩৯.২৮
৯/৯/১৮৮৫	৬৯.০৮	২২/৪/১৮৯৭	৩৯.০২
২৬/৮/১৮৭৯	৬৯.২৫	২৫/৪/১৮৮৪	৩৭.৬৩

কলকাতা গেজেট, ১১ এপ্রিল ১৯২৩

ইহাতে দেখা যায় যে, পদ্মার অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইতেছে; এখন আর বর্ষায় জল তেমন বৃদ্ধি পায় না, কিংবা গ্রীষ্মে জল তেমন থাকে না, ইহা ক্রমশ শীর্ণতোয়া ও ক্ষীণস্রোতা হইয়াছে। পাবনায় সম্প্রতি শহর রক্ষাকল্পে কয়েক বৎসর হইল যে বাঁধ আরম্ভ হইয়াছে, তথায় পদ্মার জলের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ অনুসারে জানা যায় ১৯১৯ অব্দে সর্বাপেক্ষা উচ্চ ৯৫.৩০ ফিট এবং গত ১৯২২ অব্দে ১৫/৯/১৯২২ তারিখে উচ্চ ৯৪.০০ ফিট, ২৭/৪/১৯২২ তারিখে নিম্ন ৬৮.৪০ ফিট পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস হইতে দেখা যায়। এই পরিমাণ বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ গোয়ালন্দের পরিমাণ ১৬/৬/১৯২২ তারিখে P.W.D.-এর মাপের শূন্য স্থান হইতে সর্বোচ্চ ২৪.৬০ এবং ১৪/৩/১৯২২ তারিখে সর্বনিম্ন ৬.০৩ ফিট মাত্র জানা যায়।

খরস্রোত ও পরিবর্তনশীল গতি প্রযুক্ত এই নদী বক্ষে এ পর্যন্ত কোন সেতু নির্মিত হয় নাই। গত ১৯১৫ অব্দে সাঁড়াঘাটের পূর্বদক্ষিণ কোণে পাক্‌সি নামক স্থানে "হার্ডিঞ্জ ব্রিজ" নামক সেতু নির্মিত হওয়ায় কলকাতার সহিত পূর্ববঙ্গীয় রেলপথ সমূহের সংযোগ ঘটিয়াছে। ইহাতে দার্জিলিং মেল ও সাঁড়া সিরাজগঞ্জ লাইন দিয়া মৈমনসিংহগামী ট্রেন ও যাত্রীগণের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

পদ্মা তীরে ধাপারি, সাহেব বাজার, সাঁড়া রাজার বাজার, পাবনা বাজিতপুর, সুজানগর, সাতবাড়িয়া, নাজিরগঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি বাণিজ্য বন্দর অবস্থিত আছে। এতদ্ব্যতীত পাক্‌সি, বাজিতপুরঘাট, সাতবাড়িয়া, উপেন্দ্রনগর প্রভৃতি স্টিমার স্টেশনে "পাটনা গোয়ালনন্দ" সার্ভিসের স্টিমার সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিন যাতায়াত করে।

পদ্মা আধুনিককালে গঙ্গার ভাগীরথী ধারা হইতে পৃথক হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন কাব্য পুরাণেতিহাসে পদ্মা বলিয়া কোন নদীর উল্লেখ নাই; সর্বত্র ভাগীরথীরই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র কৃত্তিবাসী বাংলা বামায়ণে পদ্মাবতী নদীর উল্লেখ আছে। তজ্জন্য কেহ কেহ বলেন, পদ্মা খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে উৎপন্ন হইয়াছে ও ভাগীরথী হইতে পৃথক হইয়া পূর্বাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। কারণ কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন কৃত্তিবাস ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তৎপ্রণীত Literature of Bengal (1895, P. 48) নামক গ্রন্থে বলেন সম্ভবত কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে তাঁহার রামায়ণের বাংলা অনুবাদ প্রণয়ন করেন। ইহাতে বোধ হয় আজ হইতে চারি পাঁচ শত বৎসর মধ্যে পদ্মার উদ্ভব হইয়াছে। ইহা যে আধুনিককালের নদী তাহা ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টেও সরকার প্রকাশিত বিবরণীতে প্রকাশ, যথা—The strange phenomenon in the river development is only a repetition of the great changes which by the formation of the Padma cut off Nadia & Jessore from the great district of Rajshahi and reduced the Bhagirathi from a vast river on

which grew up nearly all the capitals of the early Hindu Bengal to a petty stream. *Census Report of India, 1891, Vol. III, P. 39-40.*

The name Padma is given to the main stream of the Ganges in the lower part of its course between the offtake of the Bhagirathi in the Murshidabad District and the south-eastern corner of Dacca Dist. where it joins the Meghna. Until about 400 yrs. ago the main volume of the Ganges poured down the Bhagirathi ; but by degrees this channel silted up and became unequal to its task and the main stream of the Ganges was thus obliged to find another outlet. ... ... The present course of the Padma is, therefore, of comparatively recent origin. *Bengal Dt. Gazetter, Rajshahi, 1916, P. II.*

মোটামুটি অর্থ এই যে, মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকা জেলা পর্যন্ত গঙ্গার নিম্নাংশ পদ্মা নামে পরিচিত। এই ধারা আধুনিককালে আনুমানিক ৪০০ বৎসর হইল উৎপন্ন হইয়া হিন্দু রাজত্বকালের রাজধানী সমূহের তলদেশ বাহিনী ভাগীরথী নামক প্রবল ধারাকে নদীয়া ও যশোহর হইতে পৃথক করতঃ ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীরূপে পরিণত করিয়াছে।

গঙ্গার এই স্রোতাংশের নাম পদ্মা বলিয়া কথিত হইলেও, সরকারি কাগজ পত্রাদিতে গঙ্গা নামই ব্যবহৃত হয়। তবে ভাগীরথী অথবা গঙ্গা হইতে আধুনিক কালে উৎপন্ন অপর একটি ধারা হুগলির ন্যায়, পদ্মা পবিত্র বলিয়া পূজিত বা বিবেচিত হয় না। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিবেচনায় এবং নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লী প্রভৃতি অঞ্চলের স্মার্তব্যবস্থাপক পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা ও বর্ণনায় একই গঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়া পদ্মার ভাগ্যে আধুনিক হুগলি নদীর ন্যায়ও পাবনী খ্যাতিলাভ ঘটে নাই। ঐ অঞ্চলে গঙ্গার মাহাত্ম্য বিশেষ করিবার মানসেই তাহা ভাগীরথী নাম দিয়া পূর্বগামিনী ধারাকে পদ্মা নামে অভিহিত করতঃ ইহাকে পদ্মমুনি বা শঙ্খাসুর প্রভৃতি কর্তৃক গঙ্গার অপহৃত অংশ বলিয়া আধুনিক গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু গঙ্গা হরিদ্বার হইতে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত তৎপূর্বে আজন্মকাল পর্যন্ত ভগীরথ আনীত গঙ্গা নামেই পরিচিত হইয়াছে।

পদ্মার গঙ্গার ভাগীরথী প্রবাহ কিংবা হুগলি ধারার ন্যায় পবিত্রতার পুণ্য প্রসিদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইলেও, তাহার বিশালত্ব হারায় নাই। উদার চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিতে পদ্মার নিম্নলিখিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যথা—

Though not a sacred river, the Padma has all the grandeur and utility which conferred sanctity on the upper channel. In the words of S. W. Hunter, it rolls majestically down to the sea in a bountiful stream, which never becomes a merely destructive torrent in the rains and never dwindles away in the hottest summer. *B.D.G. Rajshahi, 1916 P. 12*

অর্থাৎ পদ্মা যদিও একটি পূতঃসলিলা নদী নহে, তথাপি যে বিশালত্ব ও উপকারিতা ইহার উর্ধাংশ স্রোতকে পবিত্র করিয়াছে, তাহা ইহাতে সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছ। হান্টার সাহেবের ভাষায় "ইহা গ্রীষ্মে বিশীর্ণকায়া ও বর্ষায় কেবল তাহা ধ্বংসকারিণী খরস্রোতা নদী নহে, ইহার বিপুল স্রোত সগর্বে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে।"

বক্রগতি হেতু পদ্মা গর্ভে স্থানে স্থানে যে বাঁক গঠিত হয় বা পড়ে, তাহাতে নদী স্রোতের নিম্নাংশে একাধিক মাইল ব্যাপী ঋজুভাবে প্রবাহিত স্থানসমূহে অনেক মৎস্য পাওয়া যায়। বাঁক সমূহের ঈদৃশ স্থানে মৎস্য ব্যবসায়ী ধীবর নিকারি ও অন্যান্য বহুলোক কেহ মাছ ধরিতে, কেহ তাহা ক্রয় বিক্রয় করিতে সমবেত হয় ও তাহাতে বার্ষিক বহু অর্থ উপার্জন করে। বহুদূর দূরান্তর হইতে ধীবরগণ ও মৎস্যব্যবসায়ীদিগের এতাদৃশ সমাগমে ও পদ্মা বক্ষে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীসমাকুল দৃশ্যে এবং বহুদূর পর্যন্ত সময় সময় বেড় জালের আবর্তনে পদ্মাবক্ষ

এক অভিনব ও মনোহর শোভা ধারণ করে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময়েই বাঁকে মাছ মারিবার প্রথা দেখা যায়, তবে বর্ষায়ই ইহার আধিক্য বেশি বোধ হয়। অন্য সময় মাছ কম উঠিয়া থাকে। পদ্মায় ইলিশ মাছই সর্বাপেক্ষা অধিক। চাঁই, পাঙাস, রোহিত, কাতলা প্রভৃতি বড় মাছ ব্যতীত খরশোলা, বাঁশপাতা, চাঁপলা, সুবর্ণখরিকা প্রভৃতি শুভ্রবর্ণ ও সুস্বাদু নানাবিধ ক্ষুদ্র মৎস্যও অল্পাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এই মৎস্যাধিক্য হেতু নদী তীরে হিমাইতপুর, মাঝিপাড়া, সাতবাড়িয়া প্রভৃতি গ্রামে বহুল পরিমাণে হালদার ও দাস উপাধিধারী মালো জাতীয় ধীবরগণের বাস। নদীয়া জেলার সদরপুর নিবাসী কায়স্থ জমিদারগণ পদ্মার বাইস কোদালিয়ার মোহনা হইতে পাবনা জেলার সম্পূর্ণ অংশের জলকরের মালিক। তাঁহারা এই জলকর হইতে জালিকদিগের নিকট বহু টাকা বার্ষিক খাজনা আদায় করিয়া থাকেন। ইহাও ভূসম্পত্তির ন্যায় লাভবান সম্পত্তি বিশেষ ; তবে আয় স্থায়ী বলিয়া বোধ হয় না।

পৌরাণিক বিবরণ ঃ

প্রাচীন কাব্যে পুরাণেতিহাসে পদ্মা নামে নদী বিশেষের উল্লেখ না থাকিলেও, জানা যায়, ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবাদিদেব মহাদেব যখন স্বীয় জটামণ্ডলী হইতে গঙ্গাকে পরিত্যাগ করেন, তখন গঙ্গা যে সপ্ত ধারায় প্রবাহিত হয়, তাহার হলাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে তিন স্রোত পূর্বদিকে, সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু নামে তিন স্রোত পশ্চিমে এবং অন্য স্রোত ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া সাগরে পতিত হয়, যথা—

তেতো বিসর্জ্জয়ামাসাসপ্ত স্রোতাংসি গঙ্গায়াঃ।। ৩৮
ত্রীণি প্রাচীমভিমুখং প্রতীচীং ত্রীণ্য থৈবতু।
স্রোতাংসি ত্রিপথায়াস্তু প্রত্যপদ্যন্ত সপ্তধা।। ৩৯
নলিনী হলাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাচ্যগা।
সীতা চক্ষুশ্চ সিন্ধুশ্চ তিস্রস্তা বৈপ্রতীচ্যগা।। ৪০
সপ্তমী ত্বনগাতাসাং দক্ষিণেন ভগীরথম।
তস্মাদ্ভাগীরথী সা বৈ প্রবিষ্টা দক্ষিণোদবিস।। ৪১ *মৎস্যপুঃ, ১২১ অঃ*

বাল্মীকি প্রণীত মূল রামায়ণের বালকাণ্ডের ৪৩শ অধ্যায় ১১/১২/১৩/১৪ শ্লোকেও ঈদৃশ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তবে চক্ষু স্থানে সুচক্ষু বলিয়া বর্ণনা আছে। নলিনী অর্থ পদ্ম বলিয়া কেহ কেহ বর্তমান পদ্মাকেই রামায়ণ বর্ণিত গঙ্গার পূর্বগামী নলিনী ধারার সহিত অভিন্ন বিবেচনা করেন। আবার "দেবী ভাগবত" নবম স্কন্দ, ৭ম অধ্যায় ও "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" প্রকৃতি খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৩১—৫২ শ্লোকের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, নারায়ণের ভার্য্যাত্রয়, গঙ্গা সরস্বতী ও লক্ষ্মী কলহ করতঃ পরস্পর পরস্পরকে নদীরূপে জন্মিতে অভিসম্পাৎ প্রদান করিলে, ভগবানের আদশে গঙ্গা ভাগীরথীরূপে, লক্ষ্মী পদ্মারূপে ও সরস্বতী স্বীয় নামে নদীরূপে ভারতে অবতীর্ণা হন। উপরোক্ত বিবরণ মতে কেহ কেহ পদ্মা ও গঙ্গাকে দুইটি বিভিন্ন নদী রূপে নির্দেশ করেন।

তবে পদ্মা এক্ষণে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত, পূর্বে তাহা অপেক্ষা বহু উত্তর দিক দিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত ছিল। ক্রমশ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলেন, "রামায়ণের সময়ে পদ্মার অস্তিত্ব একেবারেই বর্তমান ছিল না এমন নহে ; সে সময় পদ্মা বর্তমান পদ্মা হইতে আরও উত্তরে সমুদ্রের সহিত মিলিত ছিল, ভাগীরথী বা গঙ্গার সহিত তাহার যোগ হয় নাই। বরঞ্চ তাহা ব্রহ্মপুত্র নদের স্থান অধিকার করিয়া ছিল বলিয়া অনুমান হয়। পরে সমুদ্রে দ্বীপ সৃজন আরব্ধ হইলে সমুদ্রের একাংশ প্রাচীন পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া নদীর আকার ধারণ করে ও বর্তমান পদ্মা হইয়া উঠে ; প্রাচীন পদ্মা রামায়ণে নলিনী নামে অভিহিত হইয়াছে।" *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ৫৭ পৃষ্ঠা।*

প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক রেনেল সাহেব তৎকৃত Account of the Ganges and Burrampooter Rivers (Philosophical Transaction 1781) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, নাটোর হইতে জাফরগঞ্জ পর্যন্ত ভূভাগের মধ্যবর্তী বিল ও নিম্নভূমির দৃশ্যে অনুমান হয়, গঙ্গা পূর্বে রামপুর বোয়ালিয়া হইতে পুটিয়া দিয়া প্রবাহিত হইত। এতদৃষ্টে রাজশাহীর গেজেটিয়ার লেখক মিঃ ওমেলী বলেন, গঙ্গার পূর্বতন স্রোত রামপুর বোয়ালিয়ার ৭ মাইল পূর্বে নারদ ও সরদহের নিকট হইতে উৎপন্ন পাবনা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত বরল নামক নদীদ্বয় দিয়া প্রবাহিত হইত। *B.D.G. Rajsauhi, P. 11.* এই জেলার বিল কুড়ুলিয়া, বিল বকরি, চাটরা বিল, দিকসি বিল, বড়বিল, কালিয়াকৈর বিল প্রভৃতি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকস্থ ক্রমনিম্ন ভূভাগের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে গঙ্গার ধারা পদ্মা যে পূর্বে ইহার বর্তমান খাত অপেক্ষা আরও উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিত ছিল তাহা সম্যক উপলব্ধি হয়।

করতোয়া নদীর বিবরণে জানা যায়, উক্ত নদী পূর্বে অতি বৃহদাকারে পাবনা জেলাব পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত। অদ্যাপি নিমগাছি, অষ্টমনীষা, চাটমোহর প্রভৃতি অঞ্চলে তাহার নিদর্শন আছে। ইহা পূর্বে গঙ্গার সহিত মিলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। কালে করতোয়ার এই অংশ অবরুদ্ধ হইয়াছে। বর্তমান আটঘরিয়া ও চাটমোহর থানার অন্তর্গত সানখিভাঙা বিল, সোনাপাতিলা বিল ও বিল বকরি প্রভৃতি নিম্নবর্তী স্থানের অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয়, এই প্রদেশেই করতোয়া ও পদ্মার সঙ্গম ঘটিয়াছিল। মূলগ্রাম, ভবানীপুর গ্রামের নিচ দিয়া প্রবাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী নালাদি তাহার নিদর্শন। ইহাতে বোধ হয় পদ্মা পূর্বকালে ইহার বর্তমান খাত অপেক্ষা আরও উত্তরে পাবনা জেলার পশ্চিমাংশের উক্ত বিলময় নিম্ন প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত ছিল ; ক্রমশ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আবার মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা প্রকরণের ১১৪ অধ্যায়ের ১—৩ শ্লোকে বর্ণিত আছে, পাণ্ডবগণ তীর্থযাত্রা উপলক্ষে বহির্গত হইা যখন নন্দা ও কোশিকী তীর্থে স্নান করতঃ সাগর সঙ্গমে উপনীত হন, তখন তাঁহারা তথায় বহু নদী মধ্যে অবগাহন করেন ও সমুদ্র তীর দিয়া কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) দেশে গমন করেন। "বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত" লেখক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মহাভারতীয় যুগে মিথিলার পূর্ব পর্যন্ত সমুদ্রকুল বিস্তৃত ছিল, তাহা হইতে কুলান্তর্গত তীরভুক্তি শব্দের উৎপত্তি হয়। এখন পর্যন্তও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অনেক স্থানের নামের সহিত দ্বীপ, দিয়া, দহ, চর প্রভৃতি সংযুক্ত আছে। *বাঃ পুঃ ১৪/১৫ পুঃ*। ইহাতে বোধ হয় ঐ সময়ের পর গাঙ্গেয় উপদ্বীপ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, নিম্নবঙ্গের এ প্রদেশের অস্তিত্ব তৎকালে বর্তমান ছিল না, কিন্তু নিখিলবাবু বলেন, "নন্দা সম্ভবত রামায়ণ বর্ণিত হলাদিনী ও বর্তমান মহানন্দা" *মুঃ ইঃ ৬০ পৃঃ*। আবার শ্রীযুক্ত জে. এন. গুপ্ত মহাশয় বলেন, "Mr. Gait thinks that possibly Sankosh and even Manosh joined it (Karatoya) and the sited up bed of Manosh in Bogra may indicate the former course of the river of that name, which flows into Brahmaputra ... ... The Pauranic name of the Kosi or Kosh was Kousiki and it is interesting to note that a Naid of the name was worshipped on the banks of the Karatoya." *Eastern Bengal District Gazetteer, Bogra, 1910, P. 10*

অর্থাৎ মিঃ গেট সাহেবের বিবেচনায় সঙ্কোশ, এমন কি মানস, করতোয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল। বগুড়া জেলার অবরুদ্ধ মানস নদী ব্রহ্মপুত্রে প্রবাহিত উক্ত নদীর পূর্বতন গতি নির্দেশ করে। কোশী বা কুশীর পৌরাণিক নাম কৌশিকী এবং করতোয়া তীরে ঐ নামে একটি মূর্তি পূজিত হইত।

পূর্ব বর্ণিত নন্দা বর্তমানে মহানন্দা এবং কৌশিকী উপরোক্ত সঙ্কোশ বা মানসাদি নদী বলিয়া অনুমিত বা বিবেচিত হইলে, এদেশ মহাভারতীয় যুগে সম্পূর্ণ সাগর গর্ভে নিমজ্জিত

ছিল না ; কিংবা নন্দা ও কৌশিকী নদীদ্বয়ও তৎকালে বঙ্গের বাহিরে ছিল বলিয়া অনুমান হয় না। বিদেহাদি মিথিলা সন্নিহিত প্রদেশ বেদবর্ণিতকালে সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল, তাহার তীর ভূমি হইতে "তীর ভূক্তি", তাহা হইতে বর্তমান "ত্রিহুত" (দ্বারভাঙা, মজঃফরপুর প্রভৃতি জেলা) নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিলেও এদেশ যে তখন একেবারেই সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, তাহা বলা যায় না। কারণ মহাভারতের বনপর্বের ৮৫ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে করতোয়া নদীর উল্লেখ আছে।

"পৌণ্ড্রবর্ধন ও করতোয়া" লেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় বলেন, "মহাভারতে আমরা প্রথমে করতোয়ার পরিচয় পাই। মহাভারতের যুগে যখন ব্রহ্মপুত্র নদ প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্তই অগ্রসর হইত, তখন করতোয়া নদী তীর্থরূপে পূজিত হইত। (মহাভারত, বনপর্ব, তীর্থযাত্রা প্রকরণ ৮৫ অধ্যায়।) সে সময় বর্তমান বগুড়া জেলার দক্ষিণপ্রান্ত সাগর জলে প্রক্ষালিত হইত এবং করতোয়াও এইখানেই সাগরের সহিত মিলিত ছিল। মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক পর্ব পাঠে ইহা বেশ উপলব্ধি হয়।" *পৌঃ ও কঃ ৯৮ পৃঃ*। করতোয়া নদীর পূর্ব পারস্থ স্থানসমূহ আবহমানকাল হইতে পাণ্ডব বর্জিত দেশ বলিয়া পরিচিত ; কিন্তু পশ্চিমদিকস্থ স্থানে এমত কোন জনশ্রুতি প্রচলিত নাই। ইহাতে অনুমান হয়, পাণ্ডবগণ করতোয়া স্নানোপলক্ষে ভারতের পূর্বদিকে উক্ত নদীর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং কালে উক্ত নদী ক্রমশ দক্ষিণবাহিনী হইয়া এই জেলার পশ্চিমাংশ দিয়া প্রবাহিত হওয়ার জন্য উপরোক্ত এবিম্বধ প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, মহাভারতীয় যুগে যে পদ্মার অস্তিত্ব একেবারে ছিল না, এরূপ বলা যায় না ; তবে তখন হয়ত নলিনী কিংবা অন্য কোন শীর্ণ জলধারা রূপে প্রবাহিত হইত।

কৃত্তিবাসী "রামায়ণ" নামক আধুনিক গ্রন্থ পাঠ পদ্মাকেই গঙ্গার আদিপ্রবাহ বলিয়া অনুমান করা হয় ; কারণ গঙ্গা পূর্বদিকের কিয়দূর গমন করিলে পর, পুনরায় ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া তৎসহ গমন হেতু ভাগীরথী আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহাতে বোধ হয় পদ্মাই গঙ্গার প্রথম ও মূলধারা, ভাগীরথী পরবর্তী স্রোত। "রামায়ণে" পদ্ম নামক মুণি গঙ্গাকে পূর্বদিক লইয়া যাওয়ার ও "গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিনী"তে শঙ্খাসুরের গঙ্গাহরণ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, যথা—

পদ্ম নামে এক মুনি পুর্ব মুখে যায়।
ভগীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাতে গোড়ায়।।
জোড় হাত করিয়া বলেন ভগীরথ।
পূর্বদিক যাইতে আমার নাহি পথ।।
পদ্মমুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথের সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী।।
শাপবাণী সুরধনী দিলেন পদ্মারে।
মুক্তিপদ যেন নাহি হয় তবে নীরে।।

রামায়ণ, আদিকাণ্ড, সগর বংশোদ্ধার।

আসিতে সুতির কাছে ভগীরথ পড়ে পাছে
শঙ্খাসুর করিল মোহিত।
আগে শঙ্খ বাজাইয়া চলিল গঙ্গাকে লইয়া

রাজা বলে নিবেদন আছে দিক্ নিরূপণ
যাইতে যে হবে মা দক্ষিণে।

এ যে পূর্ব বহুদূর ভুলাইল শঙ্খাসুর
ফিরে চল দয়া করি দীনে।

—গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিনী।

উপরোক্ত বিবরণ আধুনিককালে রচিত গ্রন্থাদিতে বর্ণিত জন্য কেহ কেহ ইহার প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে চাহেন না, কিন্তু পদ্মার এবম্বিধ প্রবাদ যে কালে সংযোজিত হইয়াছে, তাহা সহজে উপলব্ধি হয়।

পাবনা জেলার নামোৎপত্তি প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে যে, গঙ্গার পাবনী নামক ধারা হইতে পাবনা নামকরণ হওয়া সম্ভব। মৎস্য পুরাণে গঙ্গার নলিনী পাবনী প্রভৃতি সপ্তধারা যে সমুদয় জনপদ দিয়া প্রবাহিত হওয়া জানা যায়, তন্মধ্যে নলিনী আদি ধারা ধীবর, কিরাত প্রভৃতি দেশ দিয়া প্রবাহিত থাকার উল্লেখ আছে। কোচবিহারাদি উত্তর বঙ্গীয় জেলাসমূহকে কেহ কেহ কিরাত দেশ বলিয়া নির্দেশ করেন এবং মৎস্য বহুল নিম্নবঙ্গের এই সমস্ত দেশকে ধীবর দেশ বলা যাইতে পারে। সম্ভবত পৌরাণিক যুগে তাহা ছিল বলিয়া ঈদৃশ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পদ্মা অতি পুরাকাল হইতেই এ দেশকে গঙ্গার প্রবাহরূপে বিধৌত করিয়া আসিতেছে। এ দেশে গঙ্গার অপভ্রংশ গাঙ্‌শব্দ নদ্যর্থে ব্যবহৃত হয়। তজ্জন্য পদ্মা, ইছামতী, চিক্‌নাই প্রভৃতি সমস্ত নদীই গাঙ্‌ শব্দ সংযোগে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উত্তরপূর্বাঞ্চলে নদীর সহিত গাঙ্‌ শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না। গঙ্গাগর্ভে মৃত্তিকা জমিতে জমিতে সুদীর্ঘ প্রাচীনকাল হইতে এই জেলার ভূভাগ গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে গঙ্গা পূর্বদক্ষিণ দিকে নিম্নাংশে পদ্মা বলিয়া বর্ণিত হইলেও দেশের লোক গাঙের জল পান, গাঙের হাওয়া সেবন ও গাঙ্গকুলা, গঙ্গাদিয়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিয়া ওতপ্রোতভাবে দেশের জল, বায়ু, মৃত্তিকা সহ সর্বাংশেই গঙ্গার স্মৃতি ও নাম জাগরুক রাখিয়াছে।

২. যমুনা ঃ

পাবনা জেলার পূর্বদিকে উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত জেলার সম্পূর্ণ অংশে যমুনা নদী প্রবাহিত, ইহা যবুনা ও যমুনা দুই নামেই পরিচিত। যমুনা মৈমনসিংহ ও ঢাকা জেলাদ্বয়কে পাবনা হইতে পৃথক করিয়াছে এবং জেলার পূর্বদিকে প্রাকৃতিক সীমারূপে পরিগণিত হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ মহকুমা সৃষ্টির সময় ১৮৬৬ অব্দে গবর্নমেন্ট হইতে বাংলার নদ-নদীর (Navigable rivers and khals in Bengal) যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে তৎকালীন পাবনা জেলা অংশে বয়া (Boya) নামক স্থান হইতে বাইস কোদালিয়ার মোহনা পর্যন্ত যমুনা নদীর উত্তরদক্ষিণে দৈর্ঘ্য পরিমাণ মাত্র ৩২ মাইল প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে ১৮৭৫ ও ১৮৭৭ অব্দে ক্রমশ মৈমনসিংহ জেলা হইতে আরও কিয়দংশ লইয়া জেলার আয়তন বৃদ্ধি করা হয়, তাহাতে বর্তমানে পাবনা জেলার উত্তর সীমান্তে ধুলাউরি ও শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রামের নিকট হইতে বাইস কোদালিয়ার মোহানাস্থিত কালিকাবাড়ি ও চর নতিবপুর পর্যন্ত যমুনা উত্তরদক্ষিণে জেলার মধ্যে প্রায় ৬৪ মাইল পরিমিত স্থান দিয়া প্রবাহিত। এই নদী পাবনা জেলার উত্তরে রঙ্‌পুর ও বগুড়া জেলার মধ্যে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের অংশ দাওকোবা নামক নদী হইতে বহির্গত হইয়াছে। ইহার বিস্তার স্থানে স্থানে ৬/৭ মাইলের বেশিও হইয়া থাকে। প্রবাদ ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের পশ্চিমদিকস্থ ভূখণ্ডে দাত্রখণ্ড (দাও) দ্বারা একটি সাধারণ খাল কাটিয়া জল আনয়ন করা হয়। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রের গতি প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করিয়া এই খাল দ্বারা "দাওকোবা" নামে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে ও অন্যান্য নদীর সহিত মিলিত হইয়া অবশেষে দক্ষিণে পাবনা জেলার পূর্বদিক বাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী জিনাই বা জনায়া নামক নদীর সহিত মিশিয়া ক্রমশ বর্তমান যমুনা বা যবুনা নাম গ্রহণ করতঃ প্রবাহিত হইতেছে।

পদ্মা অপেক্ষা যমুনা বিপুলতোয়া ও অধিকতর গভীর ; বার মাস ইহাতে খরস্রোত ও ভাঙন বর্তমান থাকে। যবুনাতে সর্বপ্রকার নৌকা ও বড় বড় মালবাহী স্টিমার সমূহ ৩/৪ বা ততোধিক ফ্ল্যাটসহ বার মাস অনায়াসে যাতায়াত করে। পদ্মার ন্যায় ইহাও সাতিশয় বেগবতী ও বর্ষায় অতি ভীষণাকার ধারণ করে। যমুনা তীরস্থ প্রদেশ অধিক ভাঙ্গনশীল ; তজ্জন্য ইহার তীরে কোন স্থায়ী বাজার, বন্দর কিংবা প্রাচীন গ্রাম বর্তমান নাই। সিরাজগঞ্জ বন্দর গত শতাধিক বৎসর কাল মধ্যে ২/৩ বার ভাঙিয়াছে ; প্রথম প্রতিষ্ঠিত বন্দর বহুদিন সম্পূর্ণ নদীগর্ভে বা পরপারে পড়িয়াছে। এই প্রকারে বেলকুচি, দেলুয়া, নগরবাড়ি, মথুরা, ভায়েঙ্গা প্রভৃতি গ্রামসমূহকে যমুনা বহুদিন আপন কুক্ষিগত করিয়াছে। কেবলমাত্র তৎতৎ গ্রামের অধিবাসীগণ যেস্থানে যাইতেছে, সেই স্থানকেই পূর্বতন নামে অভিহিত করিতেছে; যথা— সিরাজগঞ্জ ভূতেরদিয়ার নামক স্থানে অবস্থিত হইলেও. পূর্বতন নামেই পরিচিত হইতেছে ; ভারেঙ্গা নদীগর্ভে বিলীন হইলেও, নূতন ভারেঙ্গা পুরাতন স্থানের স্মৃতি বহন করিতেছে।

এই নদীতেও প্রতি বৎসর চর পড়িতেছে ও ভাঙিতেছে। পদ্মা অপেক্ষা যমুনাতে গভর্নমেন্টের অধিক খাস মহাল সম্পত্তি আছে, তজ্জন্য শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত মীরকুটা নামক চরে খাসমহালের আদায় তহশীলের সুবিধা জন্য একজন কাননগু ও তহশীল মহরেরাদি নিযুক্ত আছেন। পদ্মার চর ও যমুনার চরের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। যমুনার ভাঙনের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে তাহা সহজে উপলব্ধি হয়। ইহার ভাঙন দীর্ঘকাল স্থায়ী ; নদীর বিশালত্ব, গভীরতা ও খরস্রোত প্রযুক্ত মৃত্তিকারাশি বহুদূরে নীত হওয়ায় চর উৎপত্তি হইতে বিলম্ব হয়। জমিদার তালুকদার প্রভৃতি মালিকগণ অধিকদিন পর্যন্ত রাজস্বাদি চালাইতে অক্ষম হয়, ইহাতেই বোধ হয় যমুনা গর্ভে খাস মহালের সংখ্যা অত্যধিক। পদ্মার ন্যায় ইহাতে ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গেই অদূরে বা অপর পারে চর “জাগে” না। চর উঠিতে বহুকাল বিলম্ব হওয়ার জন্য জমিদার ও প্রজা উভয়েই রাজস্ব ও খাজনা আদায়ে অক্ষম হয়, ফলে খাস মহাল সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সিকস্তি পয়স্তি আইনমূলেও বহু মৌজা সরকারের খাসে গিয়াছে।

সিরাজগঞ্জ যমুনা তীরে পূর্ববঙ্গের একটি প্রধান বাণিজ্য বন্দর। এতদ্ব্যতীত ধোবাকোলা, মথুরা, সাধুগঞ্জ, চৌহালি, কান্দাপাড়া, কাজিপুর প্রভৃতি স্থানেও নানাপ্রকার দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানি হয়। তন্মধ্যে ধোবাকোলা বা নগরবাড়িতে বহু কাঠের আমদানি হয়। ইহার তীরে সিরাজগঞ্জ, স্থলচর, সাধুগঞ্জ, নূতন ভারেঙ্গা, নগরবাড়ি প্রভৃতি কয়েকটি স্টিমার স্টেশনে আসাম সুন্দরবন ও কালীগঞ্জ স্টিমার সার্ভিসের স্টিমার প্রত্যহ যাতায়াত করে। পদ্মার ন্যায় যমুনারও গ্রীষ্মে ও বর্ষায় জলের হ্রাস বৃদ্ধি পরিমাণ নির্ধারণ জন্য সিরাজগঞ্জ ও গোয়ালন্দে গেজ্‌রিডিং-এর ব্যবস্থা আছে। তৎপরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে দেখা যায়, পূর্বাপেক্ষা যমুনার জলের হ্রাস ও বৃদ্ধির পরিমাণে রূপান্তর ঘটিয়াছে।

সিরাজগঞ্জের পরিমাণ

তারিখ	পি.ডব্লিউ.ডি	মাপ	তারিখ	পি.ডব্লিউ.ডি	মাপ
২১/৯/১৯২২	২৯.২০৯	ফিট	১৯২১	৪১.৮৯	ফিট
১৯২০	৪১.৮০৯	ফিট			

কলিকাতা গেজেট, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২২

গোয়ালন্দের ।রিমাণ

তারিখ	উচ্চ	নিম্ন	তারিখ	উচ্চ	নিম্ন
১৬/৮/১৯২২	২৪.৬	০	৩১/৭/১৯০০	২৫.৬৬	০
১৪/৩/১৯২২	০	৪.৩	১৬/৩/১৯০১	০	৩.৬১

কলিকাতা গেজেট, ১১ এপ্রিল, ১৯২৩

যমুনার জল পদ্মার জল হইতে অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণ বা নীলাভ। বর্ষায়ও ইহার জল পদ্মার জলের ন্যায় বেশি ঘোলা হয় না। বাইস কোদায়িলার মোহানায় পদ্মা ও যমুনা সঙ্গমস্থলে উভয় নদীর শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ জলের পার্থক্য বিশেষ অনুভূত হয়। যমুনা দিয়া ব্রহ্মপুত্রের প্রধান স্রোত প্রবাহিত হওয়ার জন্য বর্ষায়ও জল সাতিশয় ঘোলা বা কর্দমাক্ত হয় না। বৈদেশিক পর্যটকগণ ব্রহ্মপুত্রকে ব্লু রিভার (Blue river) নামে অভিহিত করিয়াছ। "The following account of the country in the time of Fakharuddin (1338 A.D.) is given by Ibn Betua. Writing of the Brahmaputra, he says, it descends from the mountains of Kamrup and is called the Blue River, by which the people travel towards Bengal and Laknauti" [২]

অর্থাৎ ১৩৩৮ অব্দে ইবন বেতুয়া ব্রহ্মপুত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইহা কামরূপের পর্বতমালা হইতে প্রবাহিত ও ব্লু রিভার বা নীল নদী নামে কথিত হয় ; ইহা দ্বারা লোকে বাংলা ও লক্ষণাবতীর দিকে যায়।

পদ্মার ন্যায় যমুনার জলে পরিপাক শক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহার তীরস্থ চর ও উন্মুক্ত স্থানের স্বাস্থ্য মন্দ নহে, কিন্তু এই নদীর জলের দোষে অথবা এ প্রদেশের আবহাওয়ার গুণে এই নদী তীবস্থ পাবনা জেলা অংশের অধিবাসীগণ মধ্যে গলগণ্ড রোগ হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির ভিতর ন্যূনাধিক দেখা যায়। চলতি ভাষায় ইহাকে "ঘ্যাগ" বলে। স্ত্রীলোক পুরুষ উভয়েরই গলদেশে সম্মুখে অথবা পার্শ্বে ছোট বড় গোলাকার মাংসপিণ্ড বর্ধিত হইয়া থাকে। রাজাপুর, মকিমপুর, দেলুয়া, চালা প্রভৃতি গ্রামে এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়, যথা—

"দেলুয়া চালা ঘ্যাগের মালা"

ইহাতে বোধ হয় অন্যস্থান অপেক্ষা এই গ্রামসমূহে উক্ত রোগ বেশি। কেহ কেহ বলেন, হিন্দুর বারুই বা বারুজীবির মধ্যে এই রোগ সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। যমুনার জল ও মৎস্যের স্বাদেও পার্থক্য আছে।

যমুনায়ও নানাপ্রকার মৎস্য পাওয়া যায়। ইলিশ মাছ এই নদীতে কম। গভীর নদীর জন্য ইহাতে সাধারণত বৃহদাকার মৎস্যই অধিক। তন্মধ্যে বাঘাইর নামক আইর (বাঘ+আইর) জাতীয় ঈষৎ রক্ত কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য যমুনার বিশেষত্ব বলা যায়। রোহিত জাতীয় মহাশৈল নামে এক প্রকার ২/৩ হাত লম্বা ও প্রায় ৩০/৩৫ সের ওজনের মৎস্য যমুনায় পাওয়া যায় ; ইহার এক একটা সময় সময় ১৫ হইতে ২০ টাকা পর্যন্ত মূল্যেও বিক্রি হয়। ইহার আঁইস (চোঁচা) অতি বৃহৎ ও প্রায় চতুষ্কোণাকার ; তাহাতে প্লীহাদি দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যারাম আরোগ্য হওয়ার জন্য লোকে অনেক সময় এই মাছের আঁইস রুগ্ন ছেলেমেয়েদিগের গলদেশে ঝুলাইয়া দেয়। যমুনায় গজার নামেও একরূপ মৎস্য আছে। এই নদীতেও নানাস্থানে কোল, দহ, কিংবা বাঁকে বহু ধীবর জালিক ও আব্দাল বা নিকারি জাতীয় মুসলমানগণ কেহ মৎস্য শিকার করিয়া, কেহ তাহার ব্যবসার অবলম্বন করিয়া এবং নানাস্থানের জমিদারগণ জলকরাদি বন্দোবস্ত মুলে খাজনাদি আদায় করিয়া বহু টাকা অর্জন করিয়া থাকে।

অধুনা যমুনা বিপুল সলিলা সুগভীর ও খরস্রোতবাহিনী প্রবল নদীরূপে পরিগণিত হইলেও পূর্বে তাহা ছিল না ; অনেকের মুখে শুনা যায়, জনায়ী নদী পূর্বে লোকে হাঁটিয়া পার হইত। ১৭৭৮ অব্দে মেজর রেনেল সাহেব বাংলার যে নদনদী সম্বলিত মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে বর্তমান পাবনা জেলার পূর্বদিকস্থ ভূভাগে জিনাই বা জনায়ী নামধেয় একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র তখন সুবিশাল নদ বা নদীরূপে তাহার বহু পূর্বদিকে মৈমনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যমুনা আধুনিককালে বৃহৎ নদীরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহা বর্তমান সময়ের কিছু পূর্বে

উৎপন্ন হইলেও, কোন সময়ে ও কি কারণে ইহার উদ্ভব হয় তাহা বিবেচ্য। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে যমুনা বা যবুনার উৎপত্তি কাল নির্দেশ করা যাইতে পারে। "In 1781 (or 1778) ... ... Major Rennel published his Bengal Atlas, The Jamuna was then a small branch, its upper part was called the Jinai ; 30 years later, when Dr. Bunchanon Hamilton visited this part, the change of course had began to be effected." [৬]

অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে মেজর রেনেল সাহেব বাংলার যে নক্সা প্রকাশ করেন, তখন যমুনা একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ছিল, ইহার উর্ধ্বাংশ জিনাই (জনায়ী) নামে আখ্যাত হইত। ৩০ বৎসর পর যখন বুকানন হ্যামিলটন এই প্রদেশ পরিদর্শন করেন, তখন নদীর গতি পরিবর্তিত হইতে থাকে।

কি কারণে ব্রহ্মপুত্রের গতির পরিবর্তন হইয়া বর্তমান যমুনা ব্রহ্মপুত্রের মূলধারা রূপে পরিণত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, ১৭৮৭ অব্দের প্রবল বন্যার পর তিস্তা নদী ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়, তজ্জন্য প্রাকৃতিক বিবর্তনে ব্রহ্মপুত্র বগুড়া জেলার মানস নামক নদীর সহিত মিলিত হইয়া দাওকোবা নামে খ্যাত হয়। পরে দাওকোবার মোহানার নিকট পলি পড়িয়া বন্ধ হইলে, ক্ষুদ্রকায়া জিনাই বা জনায়ী নদীতে ব্রহ্মপুত্রের প্রবলতর স্রোত প্রবাহিত হয় ও বর্তমান যমুনা বা যবুনা নামক নদী উৎপন্ন হয়। কিন্তু আবার জানা যায় যে, "It is now proved that the great Tibetian Tsampoo joined the Brahmaputra about 1780 and this accession was important than the Tista flood indicating the Brahmapatra to try a shorter way to the sea ... ... In Rennel's time, Brahamputra, as a first step towards securing a more direct course began to send a considerable body of waters to the Jinai or Jabuna. ... ... The junction of these rivers, gave Brahmaputra, a course worthy of her immense power and rivers to the right and left silted up. In 1800, Bunchanon Hamilton writing says that the new channel was scarcely inferior to the mightly river and threatens to sweep away immediate country. By 1830, old channel had been reduced to its present insignificance. ... ... Sri J. Hooker writing in 1850 says that "we were surprised to hear that within 20 years the main channel had shifted its course west-ward, the eastern channel silted up so rapidly that Jinai became the principal stream." [৮]

ভাবার্থ এই যে ১৭৮০ অব্দে তিব্বত দেশিয় সাম্পু নামক নদী ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। তিস্তা নদীর জলপ্লাবন অপেক্ষা উহাই ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি যমুনা প্রবাহে পরিণত হওয়ার সমীচীন কারণ বোধ হয়। রেনেল সাহেবের সময়ে ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি কতক সমুদ্রের দিকে আসিয়া জিনাই নদীতে পড়িতে থাকে ; এই সমুদয় নদীর মিলনে ব্রহ্মপুত্রের গতির পরিবর্তন হয়। জিনাই দিয়া প্রবাহিত নূতন ধারা মূল প্রধান নদী হইতে কোন অংশে হীন নহে। ১৮০৯ হইতে ১৮৫০ অব্দ মধ্যে এই জিনাই নামক খাত দ্বারা ব্রহ্মপুত্র বিগত ২০ বৎসর মধ্যে পশ্চিমদিকে সরিয়া প্রবাহিত হওয়ায় পূর্বদিকের খাত অতি দ্রুতবেগে মজিয়া গিয়া জিনাই যমুনা নামে প্রধান নদীতে পরিণত হইয়াছে।

এই নদী যমুনা বা যবুনা নামে খ্যাত হইলেও পাবনা জেলার পূর্ব প্রান্তের প্রাকৃতিক সীমা সরকারি কাগজ পত্রাদিতে ব্রহ্মপুত্র নামেই ব্যবহৃত হয়। এই নদী তিব্বত দেশিয় মানস সরোবর হইতে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন ; পক্ষান্তরে অনেকের মতে ইহা আসামের শৈলমালা মধ্যবর্তী ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য সাগর হইতে বহির্গত হইয়া মানস

সরোবরে সম্ভূত সাম্পু নামক নদীর সহিত মিলিয়া আসাম এবং বঙ্গের রঙ্পুর, বগুড়া ও মৈনসিংহাদি জেলার মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। The Brahmaputra spends half its total length in a hollow trough on the north of the Himalayas between its birth place near the eastern base of Kailas to its bend southwards towards Assam. It enters British territory under the name of Dihong near Sadiya. After absorbing the waters of its coufluents, the Dihong and the Lahit, the untited stream takes the name of Brahmaputra and thence forward rolls for 400 miles down the valley of Assam.[a]

ভাবার্থ, হিমালয়ের উত্তরে কৈলাশ পর্বতের নিকট হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্র ডিহং নামে ব্রিটিশ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ডিহং ও লৌহিত্য নদীদ্বয় মিলিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত এবং তথা হইতে আসামের উপত্যকার নিম্নে প্রায় ৪০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত আছে।

উপরোক্ত বিবরণ সমূহে জানা গেল পাবনার পূর্বদিগ্‌বাহিনী যমুনা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ অভিন্ন। কেবল উপরাংশ ও নিম্নাংশ ভেদমাত্র। পূর্বগামী ধারা অবরুদ্ধ হওয়ায় ব্রহ্মপুত্র এক্ষণে পাবনা জেলার পূর্বপ্রান্ত বাহিনী জিনাই বা জনায়ী নামক পূর্বতন শীর্ণ স্রোতস্বতী দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রায় শতাব্দীকাল মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। যমুনা হইতে এই জেলা মধ্যে যে সমস্ত শাখা নদী প্রবেশ করিয়াছে তন্মধ্যে হুরাসাগর ও ইছামতী (নং ২) সর্বপ্রধান ; অন্য যে সকল নদী নালা বাহির হইয়াছে তাহা যে গ্রামের নিচ দিয়া গিয়াছে সেই গ্রামের নামেই পরিচিত হইতেছে।

পদ্মার ন্যায় যমুনার চর ভূমিতে নানাপ্রকার হাঁস, চখা, টিলা প্রভৃতি শিকারের উপযুক্ত জলচর বন্য পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে শিকার উপলক্ষে এই চরে যাইয়া থাকে। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র অতি বিস্তৃত নদী ছিল ; কেহ কেহ বলেন সিরাজগঞ্জের উত্তর পূর্বাঞ্চল হইতে পাবনার উত্তরে করতোয়া নদী অথবা ময়মনসিংহের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া সেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যাইতে হইলে দশ কাহন কড়ি লাগার জন্য, উক্ত সেরপুর "দশ কাহনিয়া সেরপুর" নামে কথিত হইত। রেনেল সাহেবকৃত মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় উক্ত সেরপুরের দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের ক্ষুদ্র এক শাখা জিনাই নামে দক্ষিণবাহিনী হইয়া, বেলকুচির প্রায় ৩/৪ মাইল উত্তরে দুবিয়া (Dubyah) নামক স্থান হইতে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একাংশ বেলকুচি দিয়া শাহজাদপুরের দিকে কোনাই নামে ও অপরাংশ দুরিয়া হইতে ৩/৪ মাইল পূর্বদিক দিয়া যুবনা (Joobna) নামে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীরূপে প্রবাহিত ছিল। উক্ত মানচিত্রে হুরাসাগর প্রভৃতি নামে কোন নদীর উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয় প্রথমে এই যবুনা দিয়া বরাবর দক্ষিণদিকে ব্রহ্মপুত্রের গতির পরিবর্তন ঘটে পরে ক্রমশ পশ্চিমদিকস্থ ভূমি ভাঙিতে থাকে ও অধিকতর বেগে এই ধারা দিয়া ব্রহ্মপুত্রের খরস্রোত প্রবাহিত হইতে হইতে কালে এই ধারাই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহরূপে পরিগণিত হইয়াছে। সাধারণত সেরপুরের নিম্নাংশে পাবনা জেলার উত্তরে বগুড়ায় জেলার পূর্বদিক হইতে বাইস কোদায়িলার মোহানা পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের এই নূতন ধারা যবুনা নামে পরিচিত হয়। ইহা আধুনিক হইলেও ব্রহ্মপুত্রের নিম্নাংশের বর্তমান প্রধান প্রবাহ।

পৌরাণিক বিবরণ ঃ

"কালিকা পুরাণে"র ৮৪/৮৫ অধ্যায়ে ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে ; তাহাতে এই নদীর পবিত্রতা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, "পরশুরাম মাতৃহত্যা জনিত পাপ বিমোচনের জন্য পিতার আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করেন। এই নদে স্নান করিবা মাত্রই তাঁহার পাপ সকল বিমোচিত হয়। তখন পরশুরাম এই তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া পরশু দ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া ইহাকে প্রবাহিত করেন। ব্রহ্মপুত্র নদ ব্রহ্মকুণ্ড

হইতে নিঃসৃত হইয়া কৈলাশ পর্বতের উপত্যকা হইতে লোহিত্য সরোবরে পতিত হয়। তখন পরশুরাম লোহিত্য সরোবরের তীরে উঠিয়া কুঠারাঘাতে পথ পরিষ্কার করিয়া ইহাকে পূর্বদিগ্‌বাহিনী করেন। পরে এই ব্রহ্মপুত্র নদ হেমগিরি ভেদ করিয়া কামরূপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ স্বীয় জলরাশি দ্বারা সমগ্র কামরূপ পীঠ প্লাবিত করিয়া দক্ষিণ সাগরে মিলিত হইয়াছে। যমুনা ব্রহ্মপুত্রের সহিত একই সঙ্গে চলিয়াছিল ; মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশ যোজনের পর পুনরায় এই লৌহিত্য নদে মিলিত হইয়াছে। চৈত্র মাসে শুক্লাষ্টমীর দিন জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিলে ব্রহ্মপদ্ প্রাপ্তি হয়।" (বিশ্বকোষ)

"তিথিতত্ত্বে" লিখিত আছে

"মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে অশোকাখ্যাং তথাষ্টমীম্।
পিবেদ্ অশোক কলিকা স্নায়া লৌহিত্যে বারিণী।।
পুনর্ব্বসৌ বৃষে লগ্নে চৈত্র মাসি সীতাষ্টমীম্।
লৌহিত্যে বিরজে স্নায়াৎ সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।"

অশোকাষ্টমীর দিন অর্থাৎ চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীর দিন পুনর্বসু নক্ষত্র ও বৃষলগ্নে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্মপুত্রের এই বিবরণ পাঠে জানা যায় ইহার উপরাংশও যমুনা নামে কতকদূর পূর্ব হইতে পরিচিত ; আবার নিম্নাংশও জনায়ী বা জিনাই নামক ধারা দিয়া প্রবাহিত হইয়া যমুনা নামে বর্তমানে খ্যাত হইয়াছে।

৩. করতোয়া ঃ

পুরাণ প্রসিদ্ধা করতোয়া নদীর দক্ষিণাংশ পাবনা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই নদী হিমালয়ের পাদদেশস্থিত সিকিম রাজ্যে উৎপন্ন হইয়া পার্বত্য প্রদেশে নেপাল ও ইংরেজ রাজ্যের সীমারূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং পরে জলপাইগুড়ি ও পূর্ণিয়া জেলাদ্বয়কে পৃথক করতঃ দক্ষিণে জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও রঙ্‌পুর জেলাত্রয়ের মধ্য দিয়া বগুড়া জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। করতোয়া ঐ জেলার সেরপুর থানার অন্তর্গত খানপুর গ্রামের নিকট হলহালিয়া নামক নদীর সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দূর গেলে, বাঙালি নামে অন্য একটি নদীও ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং ঐ স্থান হইতেই **ফুলজোড়** নাম ধারণ করিয়াছে। চলতি ভাষায় ইহা ফুলজোড় বা ফুলঝোর উভয় নামেই কথিত হয়। ক্রমশ দক্ষিণবাহিনী হইয়া এই নদী রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত চান্দাইকোণা[৬] বন্দরের নিচে পাবনা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে ধানঘড়া, রায়গঞ্জ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া প্রায় ১০ মাইল পথ অতিক্রম করতঃ পূর্বদক্ষিণ দিকে নলকা নামক বন্দরের নিম্নে যমুনা হইতে বহির্গত ইছামতী নং ২ নামক নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তথা হইতে ক্রমশ দক্ষিণ বাহিনী হইয়া প্রায় ১৪ মাইল পথ পরিভ্রমণপূর্বক নবীপুর ও নরনিয়া গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যমুনার শাখা নদী হুরাসাগরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। চান্দাইকোণা হইতে এই সঙ্গমস্থল পর্যন্ত করতোয়া নদী ফুলজোড় বা করতোয়া উভয় নামেই পরিচিত, কেবল নরনিয়া গ্রাম হইতে ইহা **হুরাসাগর** নাম ধারণ করিয়াছে এবং প্রায় ১০/১২ মাইল পথ ঘুরিয়া ধুনাইল নামক গ্রামের নিকট হুরাসাগর ও বরল নদী পরস্পর মিলিত হইয়াছে ও হুরাসাগর নামে তথা হইতে প্রায় ৫/৬ মাইল দূরে পূর্বদক্ষিণ দিকে আরালিয়া সাধুগঞ্জ নামক বন্দরের নিচে যমুনার সহিত মিশিয়া আপন অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়াছে।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট হইতে প্রকাশিত বিবরণীতে করতোয়া বা ফুলজোড় (Karotoya or Phooljore) নদী পাবনা জেলার মধ্যে পশ্চিমোত্তর হইতে পূর্বদক্ষিণে এরন্দ হইতে নলসোঁদা পর্যন্ত মাত্র ১৬ মাইল বিস্তৃত থাকা প্রদর্শিত হইয়াছে ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে

এই নদীর দৈর্ঘ্য চান্দাইকোণা হইতে নরনিয়া পর্যন্ত ফুলজোড় নামে প্রবাহিত অংশে প্রায় ২৪ (১০ + ১৪) মাইল এবং তথা হইতে আরালিয়া পর্যন্ত হুরাসাগর নামে প্রবাহিত অংশে প্রায় ১৮ (১২ + ৬) মোট প্রায় ৪২ মাইল ধরা যাইতে পারে। নরনিয়া পর্যন্ত ফুলজোড় নামে অভিহিত হইলেও, বোধ হয় প্রবল যমুনার শাখা হুরাসাগর অপেক্ষাকৃত সুবৃহৎ নদী ও ফুলজোড় দক্ষিণাংশে মন্থর গতি, তদ্ধেতু এই নদী তথা হইতে আরালিয়া পর্যন্ত হুরাসাগর নামে পরিচিত হইয়াছে।

ইহার ফুলজোড় নামে প্রবাহিত অংশের তীরে এই জেলা মধ্যে চান্দাইকোণা, ধানঘড়া, রায়গঞ্জ, ভূএগাতি, সাহেবগঞ্জ, উল্লাপাড়া প্রভৃতি এবং হুরাসাগর নামে প্রবাহিত অংশে শাহজাদপুর, কৈজুরি, নাকালিয়া, আরালিয়া, সাধুগঞ্জ প্রভৃতি বাণিজ্য বন্দর ও বাজার প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সমস্ত বন্দরাদিতে ধান, চাউল, পাট, গুড়, লঙ্কা প্রভৃতি জেলার নানাবিধ উৎপন্ন দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি হয়। কোন কোন স্থানে কাঠের আমদানি দেখা যায়।

এই নদী বার মাস স্রোতস্বতী থাকে বটে, কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত ইহাতে দুই তিন শত মণ মালবাহী নৌকা কচিৎ যাতায়াত করিতে পারে। তখন মৎস্য শিকারকল্পে ধীবর ও জালিকাগণ এই নদী স্থানে স্থানে অবরোধ করিয়া থাকে। ইহার বিস্তার পদ্মা ও যমুনার ন্যায় বহুদূরব্যাপী নহে। স্থানে স্থানে একেবারে সংকীর্ণ, মাত্র ৬/৭ রশি অর্থাৎ ৫০০/৬০০ হাতের অধিক নহে।

এই নদীরও ভাঙন আছে। সম্প্রতি ধানঘড়া বন্দর অনেকাংশে ভাঙিয়া নদী গর্ভে নিপতিত হইয়াছে এবং উল্লাপাড়া, শাহজাদপুরেও ভাঙনের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

এই নদীর জল কৃষ্ণাভ বা ঈষৎ নীলাভ বলা যায়। জলের স্বাদ ও পরিপাক শক্তি যমুনার জলের ন্যায় বটে, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই নদীর পূর্বাঞ্চলে যমুনার দিকে লোকের গলগণ্ড রোগ দৃষ্ট হইলেও, পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভূভাগে লোকের ইদৃশ কোন ব্যাধি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নদীর স্থানে স্থানে ঈষৎ লালবর্ণ বালুকারাশি পাওয়া যায়। তাহা ইমারতাদি নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্তমান সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেললাইনের উল্লাপাড়া স্টেশনের অনতিদূরে এই নদীর উপরে একটি সেতু নির্মিত হইয়াছে।

করতোয়া নদী অধুনা বগুড়া জেলায় কয়েকটি ক্ষুদ্র নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়া ফুলজোড় নামে ক্ষীণকায়া ও শীর্ণতোয়া নদীরূপে এই জেলার কতকাংশ দিয়া যমুনা নদীতে পতিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু পূর্বে তদ্রূপ ছিল না। কিঞ্চিদধিক ৩০০ বৎসর পূর্বে মুসলমান রাজত্বকালেও ইহা অতি বিশালাকারী স্রোতস্বতীরূপে গঙ্গার প্রায় তিনগুণ বিস্তার বিশিষ্ট ও গঙ্গায় নিপতিতা ছিল। আসামের ইতিবৃত্ত লেখক মিঃ গেট সাহেব বলেন, "It (Karotoya) is mentioned in the Jogini Tantra as the ancient boundary of the Kingdom of Kamrup and it was along its bank that Buktiar Khiliji marched on his ill-fated invasion of Tibet. In the narrative of that expedition, it is described as being three times the width of the Ganges. It was no doubt the great river crossed by Hiuen Tsang on his way to Kamrup and Hossain Shah on his invasion of the same country. It is shown in Vanden Brucke's map of 1660 as flowing into the Ganges." *(Census Report of India, 1901.)*

ভাবার্থ—যোগিনী তন্ত্রে করতোয়া নদী কামরূপ রাজ্যের সীমারূপে নির্ধারিত হইত। এই নদী তীর দিয়া বক্তিয়ার খিলিজি তিব্বত অভিযান প্রেরণ করেন। ইহা গঙ্গার তিনগুণ বিস্তৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। হুয়েন সাঙ্ ও হোসেন শাহ উভয়ে এই নদী পার হইয়া কামরূপে গিয়াছিলেন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ভন্‌ডেন্ ব্রুক কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্রে এই নদী গঙ্গায় পতিত হইতে দেখা যায়।

বঙ্গের গেজেটিয়ার লেখক মিঃ হান্টার সাহেব বলেন, "The Karotoya was once a river of first-class size, but is now narrower and shallower than most of the minor rivers of the district ... ... The present condition of the district (Bogra) and of Pabna and Rangpur to the south and north, shows that a great river did once flow in or near the present bed of the Karotoya, a river of such size that it gained a reputation of holiness, as we learn from the Puranas scarecly second to the Ganges." *(Statistical Account of the Bogra District.)*

অর্থাৎ করতোয়া এক সময়ে প্রথম শ্রেণীর আকার বিশিষ্টা নদী ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহা স্বল্পতোয়া ও ক্ষীণ কলেবরা হইয়াছে। উত্তরে রঙ্‌পুর ও দক্ষিণে পাবনা জেলার অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় যে, করতোয়ার খাতে বা নিকট দিয়া পূর্বে একটি বৃহৎ নদী প্রবাহিত হইত। ইহা এত বড় ছিল যে পবিত্রতায় গঙ্গার তুল্য স্থান অধিকার করিত।

অধুনা করতোয়া ফুলজোড় নামে চান্দাইকোণা গ্রামের নিচে পাবনা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে ; কিন্তু পূর্বে বগুড়া জেলার ভবানীপুর নামক প্রসিদ্ধ পীঠস্থানের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত, যথা ঃ

পশ্চিমে করতোয়ায়া আস্তে দেবীপুরং মহৎ।
ভাবতায়াং ভবানীতি মহাপীঠ নিদর্শনম্।। ৬৪
তদুত্তরে সেরপুরং করতোয়া নদীতটে।
তস্য পূর্বে সেরপুরং দ্বিতীয়ং বঙ্গ মণ্ডলে।। ৬৫
তয়োর্মধ্যে করতোয়া প্রবলাসীন্মহানদী।
ত্রিস্রোতা ব্রহ্মপুত্রাদেঃ শাখাভির্মিশ্রিতা পরে।। ৬৬
লেভিরে নৌকয়া পারং দশ কার্যাপণৈর্নরাঃ।
দশকার্যাপণ সেরপুরং তেনৈব গীয়তে। ৬৭

লঘু ভারত, ৩য় খণ্ড

ভবানীপুরের দক্ষিণে পাবনা জেলার নিমগাছি, তাড়াস হাণ্ডিয়াল, নবগ্রাম, অষ্টমনীষা, সমাজ, জালেশ্বর প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া পূর্বে করতোয়া প্রবাহিত হইত। স্থানে স্থানে এখনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি নবগ্রামের দক্ষিণে করতোয়া পারে করতকান্দি নামে একটি গণ্ডগ্রাম বর্তমান আছে। নবগ্রাম, অষ্টমনীষা, মৃজাপুর, চাটমোহর, জালেশ্বর প্রভৃতি গ্রামের নিচে এই নদী তীরে বাসন্তী অষ্টমী, বারুণী প্রভৃতি দিনে স্নান উপলক্ষে যে সকল মেলা এখনও অনুষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে নবগ্রামের ও মৃজাপুরের অষ্টমী স্নান ও তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলা উল্লেখযোগ্য। ইহা এই প্রদেশে করতোয়া নদীর প্রতি লোকের ভক্তি, এই নদীর পুণ্য প্রসিদ্ধি এবং প্রাচীন প্রবাহের নির্দশন। স্থানে স্থানে এই নদীর প্রাচীন খাতের চিহ্ন, লোক মুখে প্রচলিত জনশ্রুতি এবং চাটমোহর ও আটঘরিয়া থানার বিল কুরুলিয়া, বিল বকরি, সোনাপাতিলা বিল প্রভৃতি বিলময় প্রদেশের নিম্নভূমির অবস্থা অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, এই প্রদেশে সুবৃহৎ নদী প্রবাহিত ছিল ; নদী মজিয়া বিলে পরিণত হইয়াছে। মুলগ্রাম, ভবানীপুর, চাঁদভা প্রভৃতি গ্রামসমূহের নিকটে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী নালা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে অনুমান হয়, এই প্রদেশেই করতোয়া নদী গঙ্গা বা তাহার বর্তমান প্রধান প্রবাহ পদ্মার সহিত সংযুক্ত ছিল। তখন পদ্মা তাহার বর্তমান খাত অপেক্ষা আরও উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইত। অধুনা চাটমোহরের নিচ দিয়া প্রবাহিত বরল বা পদ্মার বড় হাওর নদীর যে অংশ মজিয়া পচা বরল নামে পরিচিত, তাহাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ অনুমান করেন ১৭৮৭ সালের উত্তরবঙ্গীয় প্রবল বন্যায় করতোয়ার বিলোপসাধন ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার বহু পূর্বেই পাবনা জেলার পশ্চিমোত্তর প্রদেশে করতোয়া নদীর পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়, কারণ পূর্বে ইহার তীরে নবগ্রামে মুসলমান আমলে রাজকীয় শাসনকেন্দ্রাদি স্থাপিত ছিল, ক্রমশ তথা হইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম আমলে হাণ্ডিয়ালে বাণিজ্য বন্দর ও রাজকীয় বিচারালয়াদি স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ইংরেজ আমলের প্রথমাবস্থায়ও এখানেই জেলার মধ্যে ইংরেজ বণিকদিগের ক্রয় বিক্রয়ের প্রধান স্থান ছিল ; পরে পদ্মা তীরে পাবনা প্রভৃতি স্থান প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। হাণ্ডিয়ালে জগৎ শেঠের কুঠি ছিল। ইহাতে অনুমান হয়, খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে অথবা তৎপূর্বে নিমগাছি, তাড়াস, নবগ্রাম, হাণ্ডিয়াল প্রভৃতি অঞ্চলে করতোয়া ক্রমশ শুকাইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সর্বশেষে ১৭৮৭ অব্দের প্রবল বন্যায় এই অংশ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

পৌরাণিক বিবরণ ঃ

শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে লিখিত আছে "গৌরী বিবাহসময়ে হরকবল-গলিত-সংপ্রদানতোয়-প্রভবত্বাৎ করস্য তোয়ং বিদ্যতেহত্র ইতি করতোয়া।।" অর্থাৎ পার্বতীর বিবাহ সময়ে শিবের হস্তে যে সম্প্রদান বারি অর্পিত হইয়াছিল, তাহাই ভূপতিত হইয়া পৃথিবীতে করতোয়া নদী নামে খ্যাত হইয়াছে। "পৌন্ড্রবর্ধন ও করতোয়া" লেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় করতোয়া ও গঙ্গা অভিন্না বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাঁহার মতে "গঙ্গার প্রবাহান্তর পুণ্যতোয়া করতোয়া নদী। এ বিষয়ে অপর একটি প্রমাণ এই যে, অমরকোষ অভিধানের প্রামাণিক টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্তী করতোয়া শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ করিতে "হরকর কবলি তত্বাৎ করতোর্য়েত খ্যাতিঃ" লিখিয়াছেন, "পার্বতী পরিণয়কালে সাপত্ন্যদ্বেষিণী গঙ্গা বিরুদ্ধবাদিনী হইয়া তুমুল ঝগড়া উপস্থিত করেন, পরিশেষে মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জটা হইতে গঙ্গাকে নামাইয়া দেন, তৎকালীন গঙ্গার প্রবাহই করতোয়া। সুতরাং হরকবলিত্ব হেতুর সার্থকতা থাকে, উহা দ্বারা অভিন্নাই বুঝিতে হইবে।"[৭]

উপরোক্ত বিবরণাদি পাঠে বগুড়া জেলার গেজেটিয়ার লেখক শ্রীযুক্ত জে. এন. দাশ গুপ্ত মহাশয় বলেন, The name is derived from Karhand and toya–water, and is held to signify that the river was formed by the water which was poured on the hand of Shiva when he married the mountain goddess Parbati. This may also point to the mountainous origin of the river.[৮]

অর্থাৎ পার্বতীর বিবাহ সময়ে শিবের হস্তস্থিত জল হইতে করতোয়া নদীর উদ্ভব হইয়াছে, ইহাতে পার্বত্য প্রদেশে এই নদীর উৎপত্তিস্থান সূচিত হয়।

গঙ্গা হইতে ভিন্না হউক আর অভিন্না হউক, করতোয়া কালে অতি বৃহদাকারে প্রবাহিত এবং তীর্থরূপে পূজিত হইত। এক্ষণেও পাবনার উত্তরাংশে বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক স্থানে প্রসিদ্ধ "পৌষ নারায়ণী" মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই জেলার পশ্চিমাংশে ইহার প্রাচীন প্রবাহ বিলুপ্ত হইলেও নবগ্রাম, মৃজাপুর, অষ্টমনীষা প্রভৃতি স্থানে কোথায় বারুণী, কোথায়ও বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে স্নান এবং তদুপলক্ষে মেলা ও আড়ঙ্ আদির অনুষ্ঠান হইতেছে। উহা এই নদীর প্রতি লোকের ভক্তি ও সম্মান জ্ঞাপক। পূর্বতন ধারা বিলুপ্ত হইয়া ফুলজোড় নামে চান্দাইকোণা দিয়া যে নূতন প্রবাহ এই জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও পবিত্র জ্ঞানে তাহার তীরে শাহজাদপুর, বাতিয়া নরনিয়া প্রভৃতি স্থানে স্নান ও মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

করতোয়ার পবিত্রতা সম্বন্ধে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে ইহার তীরে তিন রাত্রি বাস করিলে অশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি হয়, যথা—

করতোয়াং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রো পোষিতোনরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি প্রজাপতি কৃতোবিধিঃ।। ৩

মহাভারত, বনপর্ব, ৮৫ অধ্যায়

পুরাণ ও তান্ত্রিকগ্রন্থাদিতেও করতোয়ার পবিত্রতা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, যথা—

"করতোয়া মহাগৌরী দুর্গা চান্তঃ শিরা তথা।
বিন্ধ্যপাদপ্রসৃতাস্তা নদ্যঃ পুণ্যজলা শুভাঃ।।" ২৫

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৫৭ অধ্যায়

"তমসা পিপ্‌পলা শ্রোণী করতোয়া পিশাচীকা।
... ...
ঋক্ষপাদাৎ প্রসৃতাস্তা নদ্যোমণিনিভোদকাঃ।।"

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ৪৯ অধ্যায়

"করতোয়া সত্যগঙ্গা পূর্বভাগাবধিশ্রিতা।
যাবল্লতিকাস্তাপি তাবদেশং পুরং তথা।"

কালিকা পুরাণ, ৩৮ অধ্যায়

"করতোয়া সদানীরে সরিৎ শ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হরকরোদ্ভাবো"

"করতোয়া মাহাত্ম্য"

৪. আত্রাই :

প্রচলিত ভাষায় এই নদী আত্রাই নামে পরিচিত, কিন্তু সাধু ভাষায় ইহা আত্রেয়ী নামে অভিহিত হয়। বর্তমান সময়ে সাঁথিয়া থানার অন্তর্গত বোয়াইলমারি গ্রামের নিকট হইতে বনগ্রাম, দুলাই, ছাতক, কাশীনাথপুর, সিন্দুরী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রামের নিচ দিয়া যে ক্ষীণ স্রোতস্বতীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পূর্বতন আত্রাই বা আত্রেয়ী নদীর প্রাচীন খাত নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বে ইহা সুপ্রশস্ত ও সুদূর বিস্তৃত নদীরূপে পরিচিত ছিল। এক্ষণে পাবনা জেলায় ইহা একটি শীর্ণকায়া ও স্বল্পতোয়া নদী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; এমন কি কোন কোন স্থলে ইহার তলদেশ একরূপ শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

পূর্বে ইহা আতাইকুলার নিকট ইছামতীর সহিত মিলিত ছিল। তজ্জন্য আত্রাইকুলা হইতে পরে আতাইকুলা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। সুপবিত্র আত্রাই নদীর নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাবধি মাদপুর নামক গ্রামে আতাইকুলার নিকট ইছামতী ও আত্রাই সঙ্গমে বারুণী স্নানোপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ইহা এ প্রদেশ দিয়া আত্রাই নদী প্রবাহিত থাকার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই নদীর বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত ছাতক, সিন্দুরী প্রভৃতি গ্রামসমূহ শ্রীহীন হইয়াছে।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের সরকারি বিবরণীতে পাবনা জেলা মধ্যে বোয়াইলমারি হইতে বানাদি (সম্ভবত বাদাই জোলা) পর্যন্ত এই নদীর দৈর্ঘ্য পরিমাণ ২৪ মাইল প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা জেলার পশ্চিম প্রান্তেও কিয়দ্দূর বিস্তৃত থাকার নিদর্শন আছে। বর্তমান আটঘরিয়া পুলিশ স্টেশনের অধীন গোরড়ী ফৈলজানা নামক স্থানে বহুদিন হইতে বারুণী স্নান ও তদুপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা পূর্বাপর আত্রাই নদীর স্নান বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তথা হইতে ক্রমশ দক্ষিণ বাহিনী হইয়া ধানগা নামে যে ধারা চৌকিবাড়ির পূর্বে একদন্তের নিকট পাবনার নিচ দিয়া প্রবাহিত ইছামতী নদীর সহিত মিলিত হইয়া যে স্থানে ত্রিমোহিনী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, সেখানেও ইছামতী ও আত্রাই সঙ্গম ঘটিয়াছে জানা যায়। ধানগা নদী উত্তরে আটলঙ্কা, সাহাপুর দিয়া চাটমোহরের দক্ষিণাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। ইহাতে অনুমান হয় পূর্বেই আত্রাই নদী এই প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইত।

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের মেজর রেনেলের মানচিত্রে আত্রাই নদী চাটমোহরের উত্তরপূর্বে ক্রমশ দক্ষিণবাহিনী হইয়া পূর্বদিকে গুমানী নামে বরলের সহিত মিলিত হইয়া বেরা অভিমুখে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। আর একটি ধারা বরল ভেদ করিয়া ক্রমশ দক্ষিণ বাহিনী হইয়া ময়লা, সজনাই, গোয়ালগ্রাম দিয়া বিলচাটরা, বড়বিলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া আতাইকুলা পর্যন্ত বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। তথা হইতে এই ধারা নাতিবৃহৎ স্রোতস্বতীরূপে সোজাসুজি বিল গণ্ডহস্তী বা গাজনার বিল ভেদ করিয়া পদ্মায় পতিত দেখা যায়।

করতোয়ার ন্যায় আত্রাই নদীও পাবনার পশ্চিম প্রান্তে রাজশাহী জেলায় বিল চলন মধ্যে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া এই জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহার দক্ষিণাংশ এই জেলা দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা উত্তরবঙ্গীয় জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে পাবনা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে ও বিল গণ্ডহস্তী দিয়া জেলার পূর্বদক্ষিণে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। গুমানী নামে প্রবাহিত অংশও পদ্মা হইতে নির্গত হইয়া বরল নামে অপর একটি নদীতে পতিত হইয়াছে। আধুনিক কালে ব্রহ্মপুত্র যমুনা ধারা দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় গুমানী বরল দিয়া তাহাতে পতিত হইয়া আপন অস্তিত্ব বিলোপ করিয়াছে। ইহাতে অনুমান হয় এক সময়ে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ পদ্মা, করতোয়া ও আত্রাই নামক পুরাণ প্রসিদ্ধা ও পুণ্যতোয়া পবিত্র নদীত্রয় পাবনা জেলা অংশে সম্মিলিত ছিল। কালসহকারে ব্রহ্মপুত্রও ক্রমশ তাহার প্রাচীন খাত পরিত্যাগপূর্বক পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া পাবনার দিকে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। চাটমোহর, আটঘরিয়া ও পাবনা থানার উত্তর পশ্চিমাংশের বিলময় প্রদেশে উক্ত নদীত্রয়ের সংযোগ ঘটিয়াছিল। ক্রমে জলভাগ শুকাইতে আরম্ভ করিলে এই নিম্নবর্তী প্রদেশে বিলসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে।

আত্রাই নদী সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, "The Atrai, one of the channels of the Trisrota, or Tista flows through the centre of Dinajpur and enters Rajshahi district, a few miles north of Manda P.S. It flows through the southern extremity of Bill Challan under the name of Gumani and finally passes into Pabna District where it joins its waters with those of the Baral." [১] অর্থাৎ তিস্তা বা ত্রিস্রোতা নদীর এক ধারা আত্রাই নামে দিনাজপুরের মধ্য দিয়া মান্দা পুলিশ স্টেশনের উত্তরে রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। বিল চলনের দক্ষিণে গুমানী নাম ধারণ করিয়া পাবনা জেলার বরলের সহিত মিলিত হইয়াছে।

আত্রাই নদী গুমানী নামে চাইখোলা কাছিকাটা বন্দরের নিচে পাবনা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে; উক্ত নামে তথা হইতে প্রায় ৭ মাইল দক্ষিণে অষ্টমনীষা মৃজাপুর গ্রামের নিচে মাঠিয়াদহ নামক স্থানে করতোয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সঙ্গমস্থল অতি পবিত্র বোধে মৃজাপুরে বারুণী স্নান ও মেলার অনুষ্ঠান হয়। তথা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে নুননগরের নিচে গুমানী বরলের সহিত সম্মিলিত হইয়া তথা হইতে বরল নামেই পূর্বদক্ষিণে ভাঙ্গুরিয়া, বনওয়ারীনগর, ডেমরা দিয়া বেড়া অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু বরল ভেদ করিয়া দক্ষিণ দিকে ময়লা, সজনাই, গোয়ালগ্রাম বড়বিলা, বিল চাটরা প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া ইছামতীর উত্তর দিক হইতে আতাইকুলার নিকট তাহাকেও ভেদ করিয়া যে প্রাচীন ধারা বোয়াইলমারি গ্রাম দিয়া দুলাই, ছাতক, কাশীনাথপুর প্রভৃতি গ্রামের দিকে প্রবাহিত আছে, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে এক্ষণে আত্রাই বা আত্রেয়ী নামে পরিচিত হয়। ইহার পশ্চিমে চাটমোহরের দক্ষিণে সাহাপুর, আটলঙ্কা, গৌরড়ি, ফৈলজানা দিয়া প্রবাহিত হইয়া একদন্তের নিচে ত্রিমোহিনীতে মিলিত ধানগা নামে স্রোতাংশও কালে আত্রাই নামে পরিচিত হইত। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় আত্রাই নদী বিল চলন মধ্যে ২/৩ ধারায় বিভক্ত হইয়া দক্ষিণে পাবনা জেলা দিয়া গঙ্গা বা পদ্মায় পতিত হইয়াছে।

নুননগরের দক্ষিণ হইতে বোয়াইলমারি পর্যন্ত প্রবাহিত অংশের পরিমাণ প্রায় ১৪/১৫ মাইল ; তথা হইতে আত্রাই নামে প্রবাহিত অংশ পদ্মা পর্যন্ত প্রায় ২৪ মাইল ধরা যায়। তাহা হইলে আত্রাই নদীর মোট দৈর্ঘ্য পরিমাণে এই জেলায় প্রায় ৪৬ মাইল হইবে।

পূর্বে এই নদী সুপ্রশস্ত ছিল। এক্ষণে শীর্ণকায়া, কোন কোন স্থলে ইহার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ষাকাল ব্যতীত ইহার কোন কোন স্থানে জল থাকে না। পূর্ণ বর্ষায় ইহাতে প্রায় হাজার মণ মালবাহী নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না ; তবে গুমানী ধারা কথঞ্চিৎ গভীর। উহার তীরে ছাইখোলা, অষ্টমনীষা এবং আত্রাই নামক প্রবাহিত অংশে বর্তমান সময়ে দুলাই ও কাশীনাথপুর ব্যতীত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য বন্দর বা বাজার অবস্থিত নাই।

আত্রাই নদী পাবনা জেলায় প্রবেশ সময়ে যেমন বিল চলন দিয়া প্রবেশ করিয়াছে তদ্রূপ, আবার বহির্গমনকালেও বিল গণ্ডহস্তী দিয়া পদ্মায় পতিত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যমুনা দিয়া ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হইতেছে। বরল তাহাতে পতিত হইয়াছে এবং গুমানীও নুননগরে বরলের সহিত মিলিত হওয়ায় আত্রাই নদী ব্রহ্মপুত্রের সহিতই সংযুক্ত থাকার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। যথা—The out for waters of the Bill is through the Nandakuja, which from Katchikata southwards flows through the centre of the Bill and empties itself again into the Baral at Nun-nagar. Mr. Norman, the Joint-Magistrate of Rajshahi, here and throughout his extract, uses the name Nandakuja for the united waters of the Atrai and the Nandakuja, which under the name of Gumani find their way into the Baral after crossing the Challan Bill. The Nandakuja proper only runs from Baral north into Atrai. The Baral falls into the Hurasagar, which in its turn distributes its water into the Brahmaputra."[১০] অর্থাৎ চলন বিলের জলরাশি নন্দকুজা দিয়া কাছিকাটা হইতে দক্ষিণ দিকে বাহির হইয়া নুননগরের নিকট বরলের সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজশাহীর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নরমান সাহেবের মতে আত্রাই ও নন্দকুজার মিলিত স্রোত গুমানী নামে পরিচিত। বরলের উত্তরবাহিনী অংশের নামই নন্দকুজা ; ইহাই আত্রাই নদীর সহিত মিলিত হইয়া গুমানী নামে আবার বরলে নিপতিত ও বরল হুরাসাগর দিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে।

আত্রাই নদী গুমানী নামে কিয়দ্দূর প্রবাহিত হইয়া নুননগরের নিকট বরলের সহিত মিলিত হইয়া হুরাসাগর দিয়া ব্রহ্মপুত্রে আপন জলরাশি নিঃস্বারিত করিলেও, নুননগরের দক্ষিণাংশ দিয়া আতাইকুলা বোয়াইলমারি হইতে বিলগণ্ডহস্তী দিয়া পদ্মা পর্যন্তই আত্রাই নদীর প্রধান ধারা প্রবাহিত হইত। তজ্জন্য এই ধারাই অদ্যাপি আত্রাই নামেই পরিচিত, অন্যান্য ধারা বিভিন্ন নামে খ্যাত হইয়াছে। বিলগণ্ডহস্তীর অবস্থা দৃষ্টেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা আত্রাই ও পদ্মা সঙ্গমেই উৎপন্ন হইয়াছে।

পৌরাণিক বিবরণ ঃ

করতোয়াদি নদীর ন্যায় আত্রাই নদীও পুরাণ প্রসিদ্ধা ও পবিত্রসলিলা বলিয়া লোকের নিকট পূজিত হয়। এই জেলা অংশে ইহার তীরে স্থানে স্থানে বারুণী আদি স্নান উপলক্ষে লোক সমাগম ও তৎ তৎ স্থানের অনুষ্ঠিত মেলাদি তাহার প্রমাণ। এতদ্ব্যতীয় দুর্গোৎসবের মহাস্নানের মন্ত্র মধ্যে যে কয়েকটি পুণ্যতোয়া নদীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যেও আত্রাই নদীর উল্লেখ দেখা যায়, ইহাতে অনুমান হয় ইহা প্রাচীন পুরাণ প্রসিদ্ধা নদী ঃ

"আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযূ গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেত গঙ্গা চ কৌশিকী।
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।।"

'দেবী পুরাণ'

৫. হুরাসাগর ঃ

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মেজর রেনেলকৃত ম্যাপে হুরাসাগর নামে পাবনা জেলার পূর্বাংশে কোন নদীর উল্লেখ নাই। কেবলমাত্র ক্ষুদ্রকায়া জিনাই বা জনায়ী নদী এই জেলার পূর্বদিকে উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয়, যমুনার উৎপত্তির পর হুরাসাগরের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা এদেশে 'উরা' সাগর নামেও কথিত হয়। রেভিনিউ সার্ভের ম্যাপেও ইহা Oorasagar (উরাসাগর) নামে লিখিত হইয়াছে। জেলার মানচিত্রেও উক্ত নামই ব্যবহৃত হয়। প্রবাদ যমুনার অত্যধিক জলপ্লাবনে স্বল্পদিন মধ্যে হঠাৎ এই নদীর উৎপত্তি হয়, তজ্জন্য উড়িয়া আসিয়া বা হঠাৎ কিয়দ্দিনের মধ্যে প্রবল নদীরূপে পরিণত হওয়ায় যমুনার এই শাখা উরাসাগর বা হুরাসাগর নামে খ্যাত হইয়াছে। এতদ্দেশে সুদূর বিস্তৃত বৃহৎ জলরাশি সাধারণত নৈরাকার অর্থাৎ কুল কিনারাবিহীন জল ভাগ বা সমুদ্র নামে পরিচিত ; তদ্ধেতু নদী হইয়াও ইহা সাগর সংযুক্ত নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহা যে যমুনার ন্যায় আধুনিককালে তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া পাবনা জেলার পূর্বাংশে প্রবাহিত ও পুনরায় তাহাতেই নিপতিত, তাহা রেনেল সাহেবকৃত ম্যাপ ও জেলার বর্তমান মানচিত্র দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

প্রাচ্যদ্যািমহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই জেলার হুরাসাগর নদী বর্তমান থাকা দৃষ্টে, এ প্রদেশকে অতি অল্পদিন পূর্বে সাগর জলে নিমগ্ন ও সমতট বা সমুদ্রতটের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'সমতট' শব্দ 'সমুদ্রতট' শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ বলিয়াই মনে হয়। ঢাকা জেলার মেঘনাপদ্মা সঙ্গম হইতে উত্তরে আসামসংলগ্ন শৈলমালা পর্যন্ত একসময়ে সমুদ্র বিস্তৃত ছিল, এমন কি পাবনার সিরাজগঞ্জ হইতে যে প্রবল স্রোত বরাবর দক্ষিণপূর্বে বহিয়া আসিয়া ধলেশ্বরী ও যমুনার সঙ্গমস্থলে মিলিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি হুরাসাগর নামে পরিচিত। এ অঞ্চলে যে এক সময়ে সাগর ছিল, এখানকার রেলওয়ে জরিপের বিবরণী (যথা ঃ Upon the east, the area is bounded by a low lying country which for 6 or more months of the year, is under water and where the communication by boat of maundage varying with the stream and season is always possible. This country is frequently spoken of as the sea. The coast line of the sea may be taken as the line drawn from Bhairab Bazar, Bajitpur etc. and from thence by a line bearing northwest. West ward of this coast the country is a land of dead and dying rivers thickly populated by a most industrious race. *Report on Bhairab Bazar. Netrokona Mymensing Railway Reconnaissance survey*) ও উক্ত নদীই তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। সমতট রাজ্যের উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ভাগে প্রবাহিত এই সমুদ্র হইতেই পালরাজ বংশ রামচরিতে "সিন্ধু কুলজ" এবং ধর্ম মঙ্গলে "সরিত পতি" সুত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।"[১১]

পূর্বে উক্ত হইয়াছে এ দেশে সুদূর জলরাশি নৈরাকার সমুদ্র বলিয়া পরিচিত হয়। এতদ্ব্যতীত এই জেলায় দীঘি পুরস্করিণী আদি অনেক সুবৃহৎ জলাশয় ও সাগর আখ্যায় পরিচিত হয় ; যথা ঃ নিমগাছির "জয়সাগর", তাঁতিবন্দের 'দুর্গাসাগর' 'গঙ্গাসাগর' 'পাবনার 'লক্ষ্মীসাগর'। সুতরাং কেবলমাত্র শতাব্দীকাল মধ্যে উৎপন্ন এই নদী সাগর সংযুক্ত নামে অভিহিত হইলেও, ইহার আদ্য নাম হুরা বা উরা শব্দেই ইহার আধুনিকতার সাক্ষ্য দান করিতেছে। সাগর সংযুক্ত আছে বলিয়া প্রদেশের ভূভাগ একেবারে নূতন গঠিত বলা যায় না। ভূতত্ত্ববিৎগণ মীমাংসা ও প্রাচীন পৌরাণিক কালের বিবরণাদি পাঠে এ প্রদেশ খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাঙের সময় বর্ণিত সমতট ভূভাগ গঠিত হইবার বহু পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তবে এ জেলার সুজানগর থানায় সাগরকান্দি নামে যে একটি প্রাচীন পল্লী বর্তমান আছে, তাহা সুবিশাল গঙ্গার আধুনিক ধারা পদ্মা তীরে অবস্থিত।

গঙ্গার এই ধারাও প্রায় চারি শতাধিক বর্ষ মধ্যে প্রবল হইয়াছে জানা যায়। সুতরাং সাগরকান্দি নামও উক্ত প্রকারে উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে।

অত্যল্প কাল পূর্বে যে এদেশ সাগর জলে নিমগ্ন ছিল না, তাহার একটি প্রমাণ এই যে এই প্রদেশের মৃত্তিকা একেবারে খুলনাদি জেলার ন্যায় লবণাক্ত নহে কিংবা এই প্রদেশে সুপারি নারিকেল বৃক্ষাদি বেশি দেখা যায় না। সমুদ্র তীরবর্তী প্রদেশ সমূহে ঐ প্রকার বৃক্ষাদি সহজে জন্মে ; কিন্তু পাবনা সদরে কোন কোন স্থলে ঈদৃশ বৃক্ষাদি সামান্য বর্তমান থাকিলেও সিরাজগঞ্জ মহকুমায় তাহা অতি বিরল।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারি বিবরণীতে ছোট ও বড় নামে দুইটি হুরাসাগরের উল্লেখ আছে। বড়টি নলসোঁদা হইতে সাঁরাসিরা পর্যন্ত পশ্চিমোত্তর হইতে পূর্বদক্ষিণে ২২ মাইল ; ছোট সয়দাবাদ হইতে নলসোঁদা পর্যন্ত ১২ মাইল বিস্তৃত থাকা দেখা যায়।

বর্তমান সময়ে যমুনা হইতে সয়দাবাদের উত্তরে এক ধারা বাহির হইয়া ৯/১০ মাইল পথ অতিক্রম করতঃ ঐ যমুনার দেলুয়া গ্রামের নিকট হইতে বহির্গত অপর এক ধারার সহিত যোগনালা নামক গ্রামে সম্মিলিত হইয়াছে। তথা হইতে এই মিলিত স্রোত হুরাসাগর নামে প্রায় ৪/৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নলসোঁদা নবীপুর ও নরনিয়া নামক স্থানে করতোয়া বা ফুলজোড় নামক নদীর সহিত মিলিত হইয়া শাহজাদপুরের নিচ দিয়া বক্রাকারে ১৬ মাইল ঘুরিয়া ধুনাইল গ্রামের নিকট বরলের সহিত মিলিত হইয়া হুরাসাগর নামেই প্রায় ৬ মাইল দূরে পরিশেষে আরালিয়া সাধুগঞ্জ নামক স্থানে পুনরায় যমুনায় পতিত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যায় হুরাসাগরের দৈর্ঘ্য এই জেলাংশে প্রায় ৩২ মাইল। নরনিয়াতে করতোয়া, ধুনাইলে বরল ও বাগাবাড়ি মোহনগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের নিচে বেড়া ত্রিমোহিনীতে ইছামতী নদী হুরাসাগরে পতিত হইয়াছে ; কিন্তু সয়দাবাদ হইতে আরালিয়া পর্যন্ত এই নদী সর্বত্রই হুরাসাগর নামেই পরিচিত হইয়া থাকে। ইহার বিস্তার সর্বত্র সমান নহে, কোথায় ৫/৭ রশি, কোথায় প্রায় অর্ধ মাইল ও নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। ইহার গভীরতাও সর্বত্র সমান নহে। ইহা প্রায় বার মাস স্রোতস্বতী থাকে, তবে কোথায় কোথায় একেবারে গ্রীষ্মে শুকাইয়া যায়।

হুরাসাগর তীরে দেলুয়া একটি প্রধান কাপড় খরিদ বিক্রয়ের স্থান। এতদ্ব্যতীত শাহজাদপুর, কৈজুরি, নাকালিয়া, আরালিয়া ও সাধুগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বন্দর ইহার তীরে বর্তমান আছে।

৬. বরল ঃ

রাজশাহী জেলার চারঘাটের নিকট পদ্মা হইতে বহির্গত হইয়া উক্ত জেলার দক্ষিণাংশ দিয়া বরল নদী চাটমোহর থানায় হরিপুরের নিকট পাবনা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং তথা হইতে চাটমোহর, সালিখা, গুণাইগাছা আদি গ্রাম ঘুরিয়া নুননগরের নিকট চলন বিল হইতে বহির্গত ও কাছিকাটা ছাইখোলা নামক বাজারের নিচে দিয়া প্রবাহিত গুমানী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ভাঙ্গুরিয়া, বনওয়ারিনগর, গোপালনগর, ডেমরা প্রভৃতি গ্রামের তলদেশ বহিয়া বরল ধুনাইল নামক গ্রামের নিকট বেড়ার উত্তরাংশের হুরাসাগরে মিশিয়াছে। ইতিপূর্বে বিবৃত হইয়াছে রাজশাহী জেলায় বরলের উত্তরবাহিনী স্রোতাংশ ও আত্রাই নদীর মিলিত স্রোত গুমানী নামে খ্যাত ; কিন্তু পাবনা জেলা অংশে হরিপুর হইতে নুননগর প্রায় ৬ মাইল। তথা হইতে ধুনাইল পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ মাইল, কিন্তু নদীর বক্রগতি হেতু ইহা প্রায় ২৬/২৭ মাইল পথ দিয়া প্রবাহিত আছে। হরিপুর হইতে নুননগর পর্যন্ত বরলের অংশ প্রায় অবরুদ্ধ, মাত্র বর্ষায় স্রোতস্বতী দেখা যায় ; এই ধারা মজিয়া যাওয়ায় ইহা পচা বরল নামে খ্যাত। ছাইখোলা হইতে নুননগর ও তথা হইতে মিলিত স্রোতাংশ বার মাস স্রোতস্বতী থাকে, তবে

সুগভীর নহে। বর্ষা ব্যতীত শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুতে ইহাতে ৫/৭ শত মণ মালবাহী নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না। বৈশাখ মাস হইতে এই নদীর জল বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার বিস্তার বেশি নহে ; স্থানে স্থানে ২/৩ রশি মাত্র।

বরল পদ্মা হইতে বহির্গত তজ্জন্য ইহার জল সুস্বাদু, শুভ্র এবং বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ। ইহার তীরে ভাঙুরিয়া বনয়ারীনগর, ডেমরা প্রভৃতি বন্দর ও বাজারাদি বর্তমান আছে। সম্প্রতি সাড়া সিরাজগঞ্জ রেলপথ খুলিবার পর ইহার উপর ভাঙুরিয়া ও শরৎনগর স্টেশন মধ্যে ইহার বক্ষে একটি সেতু নির্মিত হইয়াছে। ভাঙুরিয়া বন্দর হইতে সাধুগঞ্জ পর্যন্ত কয়েক মাস দৈনিক স্টিমার যাতায়াত করিয়া থাকে। এই লাইনে রাউতারা, ফরিদপুর (বনয়ারীনগর) ডেমরা বেড়া প্রভৃতি কয়েকটি ঘাট স্টেশনে লোকের যাতায়াতের সুবিধা আছে।

পদ্মা হইতে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, তজ্জন্য কেহ কেহ এই নদীকে বরল বা বড়হর অর্থাৎ পদ্মার বড় হাওর (স্রোতাংশ) বলিয়া থাকেন। পূর্বে পাবনা জেলায় পদ্মা যে আরও উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিত হইত এই নদীই তাহার প্রমাণ বলা যায়। পূর্বে করতোয়া গঙ্গায় পতিত হইত এমন জানা গিয়াছে। এই নদীর গতি পর্যালোচনা করিলে, করতোয়া যে উহার সহিত পূর্বে মিলিত ছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। হরিপুরের নিকটবর্তী বিল কুরুলিয়ার অবস্থা দৃষ্টে স্পষ্ট অনুমান হয়, কালে পদ্মা, করতোয়া ও আত্রাই প্রভৃতি কয়েকটি নদীর অবরুদ্ধ ধারা হইতে উহা উৎপন্ন হইয়াছে।

৭. ইছামতী ঃ

এই জেলায় ইছামতী নামে দুইটি নদী এক্ষণে বর্তমান আছে। প্রথমটি পাবনা শহরের নিকট পদ্মা হইতে বাহির হইয়া শহরের মধ্য দিয়া একদন্ত, আতাইকুলা, ভুলবাড়িয়া, সাঁথিয়া, বেড়া প্রভৃতি বাজার ও গোলার নিচ দিয়া বেড়া ত্রিমোহিনীতে হুরাসাগরে পতিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টি সিরাজগঞ্জের উত্তরে যমুনা হইতে বাহির হইয়া সুপগাছা, পাঙাসি, ব্রহ্মগাছা, বাগবাটি প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া নলকা বন্দরে ফুলজোড় বা করতোয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রথমটি ইছামতী (নং ১) ও দ্বিতীয়টি ইছামতী (নং ২) নামে অভিহিত হইল।

ইছামতী (নং ১) বর্তমান সময়ে পাবনার নিকট পদ্মা হইতে বহির্গত দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু পূর্বে সেরূপ ছিল না। ইহা কিঞ্চিদধিক ৬০ বৎসর পূর্বে পাবনার পূর্বদক্ষিণদিকে দোগাছির নিকট পাবনা হইতে প্রায় ৬/৭ মাইল দূরে পদ্মা হইতে বাহির হইয়া ব্রজনাথপুর টুকরারচর প্রভৃতি গ্রাম ঘুরিয়া পাবনার নিচে আসিয়া পতিত হইত ; তখন পদ্মা পাবনা হইতে দক্ষিণে প্রায় ৪/৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। বিগত ৭/৮ বৎসর মধ্যে পদ্মা ভাঙিয়া ক্রমশ পাবনা শহরের উপকণ্ঠে আসায় ইছামতী পাবনার নিকটে পদ্মা হইতে বহির্গত দেখাইতেছে।

এই ইছামতী নদী পাবনা হইতে প্রায় ২৫/২৬ মাইল দূরে বেড়া ত্রিমোহিনীতে হুরাসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে ; ইহার বক্রগতি নিবন্ধন এই নদী প্রায় ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এই জেলাংশে প্রবাহিত আছে। আত্রাই নদীর ন্যায় ইহাও স্থানে স্থানে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় বলেন, "ইছামতী নদীর নামও পাবনার একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত জড়িত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় যখন রাজমহল হইতে ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, সে সময়ে স্থল পথে রাজমহল ঢাকা যাইবার সুবিধা ছিল না। পদ্মা ও মহানন্দা নদী ভিন্ন শাখা নদীর কোন সংযোগ ছিল না অথচ পাবনা প্রদেশ ভয়ানক জলাকীর্ণ স্থান ছিল। এই সময় বাংলার শাসনকর্তা নবাব ইসমাইল খাঁ ছিলেন। তিনি যাতায়াতের সুবিধার জন্য সেই সময়ের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ঈশা খাঁকে একটি খাল কাটিয়া পদ্মা ও যবুনা নদীর সহিত যোগ করিয়া দেওয়ার আদেশ দেন। রাজাজ্ঞায় ঈশা খাঁ

পদ্মা হইতে একটি খাল কাটিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত যোগ করিয়া দেন। ঈশা খাঁর নামানুসারে 'ইছামতী' নদীর নাম হইয়াছে। ... ... আধুনিক সুয়েজ প্রণালীর সহিত অতীত মুসলমান রাজ্যের ইছামতী খাল তুলনা করিতে পারা যায়।"[১২]

অবশ্য ইহা প্রবাদমূলক কাহিনী। বঙ্গে ইছামতী নামে অনেকগুলি নদী দেখিতে পাওয়া যায়। ঢাকা, দিনাজপুর ও যশোহরাদি জেলাতেও ইছামতী নামক নদীর পরিচয় পাওয়া যায়। কি কারণে এই সকল নদীর নাম ইছামতী হইয়াছে তাহা বিবেচনার বিষয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ইস্‌লাম খাঁ (১৬০৮—১৬১০ খ্রিঃ) বঙ্গ শাসন সময়ের বিবরণ তদীয় কর্মচারী সিতাব খাঁ (মির্জা সহন) রচিত ফারসি হস্তলিখিত বহারিস্তান অবলম্বনে "বাঙ্গালার স্বাধীন জমিদারের পতন" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন" সাত দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া মির্জা সহন সেই শুষ্কনালা কাটিয়া তাহাতে ইছামতীর জল আনিলেন।"[১৩] এই প্রবন্ধে জানা যায় তৎকালে পাবনা ও ঢাকা উভয় জেলার ইছামতী তীরেই ইস্‌লাম খাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল। উভয় জেলার কোন্ ইছামতী নদীর মুখে নালা কাটা হইয়াছিল, তাহা জানা যাইতেছে না, তবে পাবনার ইছামতী সংস্রবে অদ্যাপি একটি প্রবাদ জানিতে পাওয়া যাইতেছে মাত্র। আরও জানা যায় তখন পাবনা জেলার শাহজাদপুর, চাটমোহর ও একদন্তে নবাব সৈন্যের সমাবেশ ও এই জেলার স্থানে স্থানে যুদ্ধাভিনয় হইয়াছিল। সুতরাং বোধ হয় এই জেলার এই ইছামতী (নং ১) নদীরই কিয়দংশ উক্ত রূপে কাটা হইয়া থাকিবে ও তাহা হইতেই সম্ভবত উক্ত প্রবাদ সৃষ্টি হইয়াছিল।

উপরোক্ত প্রধান নদীগুলি ব্যতীত এই জেলাতে বর্তমান সময়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত আছে। যথা ঃ

১. **চিকনাই**—চাটমোহরের দক্ষিণ পশ্চিমে সাঁতৈল বিল হইতে বহির্গত হইয়া আটলঙ্কা, ফৈলজানা ও গোরড়ি দিয়া একদন্তের পশ্চিমে ইছামতী (নং ১) পর্যন্ত চিকনাই নদী ধানগা নামে পরিচিত। এই অংশ আত্রাই নদীর নিম্নাংশ বলিয়াও খ্যাত। প্রকৃত প্রস্তাবে গোরড়ি ফৈলজানা হইতে কদমতলী ইদিলপুর ধানুয়াঘাটা প্রভৃতি গ্রামের নিচ দিয়া প্রায় ১৩/১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গোপালনগরের নিচে বরল নদী পর্যন্ত প্রবাহিত স্রোতস্বতীই সাধারণত চিকনাই নদী নামে খ্যাত। এই নদী প্রায় বারমাসই অল্প পরিমাণে স্রোতস্বতী থাকে। তবে জল প্রায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য পাওয়া যায়।

২. **রত্নাই**—তিনগাছা গ্রামের নিকট পদ্মা হইতে বাহির হইয়া গোঁসাইরামপুর, মালিগাছা মুণিদহ, আলাদি, চাঁদভা আদি গ্রামের নিচ দিয়া সোনাপাতিলা বিলে পতিত হইয়াছে। এই নদী দিয়া চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য তরী গমনাগমনের প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

৩. **দুর্গাদহ**—দিলপশারের পূর্ব দিয়া বরলে মিশিয়াছে।

৪. **কোচিয়া**—সাধারণত কৈডাঙার নদী নামে পরিচিত। দিলপসার ও মোহনপুর রেল স্টেশনের মধ্যে ইহার উপর একটি পুল নির্মিত হইয়াছে। ফরিদপুরের কিয়দ্দূর বরলের সহিত মিলিত হইয়াছে।

৫. **গোহালা**—কোচিয়া নদীর অপর ধারা গোহালা নামে পরিচিত। রামকান্তপুর ও রাউতারার দক্ষিণ দিয়া পূর্বদিকে হুরাসাগরে পতিত আছে।

৬. **কাকিয়ান**—শাহজাদপুরের মধ্য দিয়া হুরাসাগরে পতিত আছে।

৭. **জলকা**—বড়বিল হইতে বাহির হইয়া চিকনাইতে পতিত।

৮. **বলেশ্বর**—পাইকরহাটির নিকট দিয়া আত্রাইতে পতিত হইয়াছে।

৯. **হারগিলা**—পেচাখোলার নিকট হুরাসাগর ও যমুনাসহ সংযুক্ত হইয়াছে।

১০. **ধানবাঁধী**—যমুনা হইতে বাহির হইয়া সিরাজগঞ্জের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ও ফুলজোড়ে মিলিত হইয়াছে।

১১. **বুধ্সি**—সারাসিয়া হইতে মথুরা অঞ্চলে প্রবাহিত ছিল ; এক্ষণে ইহার অধিকাংশ প্রায় যমুনা নদীগর্ভে পড়িয়াছে।

১২. **কুমিল্লীর নদী**—হাটি কুলিল্লীর নিকট দিয়া প্রবাহিত এবং সাহেবগঞ্জের ভাটিতে ফুলজোড়সহ মিলিত।

১৩. **আঠার দহ**—স্থলের নিকট যমুনার শাখা বিশেষ।

১৪. **কাকেশ্বর**—সালনা কুঠির নিচে ইছামতী (নং ১) হইতে বাহির হইয়া আপরা গোপীনাথপুরের মধ্য দিয়া সাফুল্লাখাল বা বেনুপুরের জোলা সহ মিলিত হইয়াছে।

১৫. **ভাদাই**—পাবনা ও রাজশাহী জেলা মধ্যে সীমারূপে পাবনার পশ্চিমোত্তর সীমায় খোসালপুর হইতে কুন্দইল গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত আছে।

রায়গঞ্জের দক্ষিণে বরাবর প্রসিদ্ধ চৌবিলা হাট ও তথা হইতে মোহনপুর দিলপসার পর্যন্ত অনেকগুলি নদী নালা প্রবাহিত আছে ; ইহা ফুলজোড়ের বা প্রাচীন করতোয়ার অংশ বিশেষ। এতদ্ব্যতীত আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী নালা অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে গ্রামের নিচ দিয়া প্রবাহিত, তৎ তৎ গ্রামের নদী বলিয়া পরিচিত।

দ্রষ্টব্য—পাবনা জেলার পার্শ্বে ও মধ্যে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ পদ্মা, ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ যমুনা, করতোয়া ও আত্রাই (আত্রেয়ী) নদী চতুষ্টয় প্রবাহিত আছে। ইহার প্রত্যেকটিই পুরাণপ্রসিদ্ধা ও পুণ্যতোয়া। এরূপ পবিত্র নদী বিধৌত জেলা বঙ্গে অতি বিরল। এদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষিত সমাজ এ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুশীলন করিলে এই জেলার উক্ত নদী সকল তীর্থ নদীরূপে এবং এই জেলার স্থান বিশেষ তীর্থস্থানরূপে পরিণত হইতে পারিত। বারুণী, দশহরা ও বাসন্তী অষ্টমী প্রভৃতি স্নান উপলক্ষে স্থানে স্থানে অধুনা যে সকল মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা আরও পুষ্টিলাভ করিত। ইহাতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে, জমিদারবর্গ স্বীয় এলাকাস্থিত মেলাদি সংস্থাপনে, দেশের শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণ ক্রয় বিক্রয়ে এবং জনসাধারণ যুগপৎ ধর্মানুশীলনে ও আমোদপ্রমোদ উপভোগে লাভবান হইতে পারিতেন। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের রাঢ় দেশিয় পণ্ডিতসমাজ শাস্ত্র চর্চা ও অনুশীলন প্রভাবেই হুগলি আদি গঙ্গার আধুনিক ধারাকে শিল্পবাণিজ্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন তীর্থনদী রূপে পরিণত করিয়াছেন। এই জেলার পণ্ডিতমণ্ডলী, জমিদারশ্রেণী ও বণিকসম্প্রদায়ের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাঁহারা এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে দেশের ধর্ম ও অর্থ উভয়বিধ উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

নদী বদ্ধ বা রূপান্তরিত হইয়া নিম্নলিখিত নামে খ্যাত হয়। যথা ঃ

১. **বাঁওর**—যখন নদী তাহার প্রাচীন খাত বা প্রবাহ ছাড়িয়া নূতন ধারা দিয়া প্রবাহিত হয়, তখন প্রাচীন খাতে জল থাকিয়া যায়, কিন্তু দুই দিকে মুখবন্ধ হয়, বর্ষা সময়ে অনেক নৌকাদিও তথায় যাতায়াত করে। এবম্বিধ নদীর প্রাচীন খাতকে "বাঁওর" বলে। সাড়া থানায় পদ্মার এরূপ অনেক বাঁওর গঠিত হইয়াছে।

২. **হাওর**—কোন বৃহৎ নদী হইতে শাখা নদী বাহির হইলে তাহা সাধারণত হাওর নামে খ্যাত হয়। সাতবাড়িয়ার নিকট পদ্মা হইতে এবম্বিধ একটি হাওর বাহির হইয়াছে।

৩. **দহ**—নদীর গভীর মৃত খাতকে দহ বলে। সাধারণত বর্ষাকালে নদীতে ঘূর্ণাবর্ত বা পাক পড়িয়া দহের উৎপত্তি হয়।

৪. **কোল**—ইহাও দহের ন্যায় নদীর গভীর খাত বিশেষ ; তবে কোলের বিশেষত্ব এই যে কোল সাধারণত বহুদূর বিস্তৃত হয় এবং অনেক নৌকাদি তথায় লাগাইবার সুবিধার জন্য বাণিজ্য হিসাবে কোল সমূহ বন্দরের ন্যায় কার্যকরী হইয়া থাকে, দহের ন্যায় কেবলমাত্র নদীর মৃত খাত নহে।

৫. ডামস্—দহের ন্যায় ডামস্‌ও নদীর মৃত খাত বিশেষ, তবে কোলের ন্যায় বহুদূর বিস্তৃত হইলেও ইহার উভয় মুখ বন্ধ হইয়া যায়। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময় ইহাতে কোলের ন্যায় বাণিজ্যাদির সুবিধা পাওয়া যায় না। সাঁড়া থানায় পদ্মার অনেক ডামস্ দেখিতে পাওয়া যায়।

৬. সোতা—নদীর বন্ধ স্রোতকে সোতা বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—খাল, বিল ও চর

ক. খাল ঃ

নদী ব্যতীত এই জেলায় কতকগুলি খাল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণত কখন চাষ আবাদের সুবিধার্থে পয়ঃপ্রণালীরূপ অথবা কখন নৌকাপথে যাতায়াতের জন্য কৃত্রিম উপায়ে খনিত বা কাটা হয় কিংবা জল প্লাবন বা বর্ষাসময়ে জল চলাচলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা জোলা ও খাল উভয় নামে খ্যাত। নদী মাতৃক জলমগ্ন দেশে ঈদৃশ খাল বা কাটা জোলা নৌকা পথে সোজাসুজি গমনাগমন পক্ষে কিংবা বাণিজ্য সৌকর্যার্থে বিশেষ আবশ্যক। বর্তমান সময়ে এই জেলায় যে কয়েকটি প্রধান খাল বা জোলা বিদ্যমান আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

	খাল বা জেলা	হইতে	দিকে	পর্যন্ত	দৈর্ঘ্য	মাইল
১)	ধুলাউরি খাল	ডেমরা	দক্ষিণ	ধুলাউরি	৫	”
২)	সাঁথিয়া খাল	সাঁথিয়া	দক্ষিণ	গোপীনাথপুর	৪	”
৩)	হলুদঘর খাল	হলুদঘর	উত্তর	সেলন্দ	৬	”
৪)	বান্নাই খাল	সুজানগর	উত্তর	পোরাডাঙা	৪	”
৫)	সাফুল্লা[১৪] খাল	সাফুল্লা	পশ্চিম	গোপীনাথপুর	৮	”
৬)	ঘুরকা খাল	ঘুরকা	পশ্চিম	সলঙ্গা	৬	”
৭)	দত্তবাড়ি খাল	দত্তবাড়ি	পশ্চিম	সোনামুখী	৩	”
৮)	ঘাটিনা খাল	সলপ	পূর্ব	ফুলঝোড়	৩	”
৯)	কিশোরখালি	চান্দাইকোণা	পশ্চিম	প্রাচীন করতোয়া	৪	”
১০)	বাদাই জোলা	গাজনা বিল	পূর্ব	মালদহ	৮	”
১১)	গোপালপুর জোলা	চৌকিবাড়ি	উত্তর	ফৈলজানা	৬	”

এবং মাদারবাড়িয়া জোলা, সরিসা জোলা, কিনু জোলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খ. বিল ঃ

নদী ক্রমশ বদ্ধ হইয়া প্রথমে বাঁওরে, পরে তাহা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে বিলে পরিণত হয়। দুই বা ততোধিক নদীর মোহনা একত্র মিলিত হইয়া স্রোতের গতি ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকিলে কাল সহকারে বিল উৎপন্ন হয়। বর্ষায় নদীবাহিত মৃত্তিকারাশিতে ক্রমশ বিলের ধার উচ্চ হয় ; কালে চতুর্দিক ধীরে ধীরে উচ্চ হইলে, নদীর মুখ ক্ষুদ্রায়তন হইয়া যায় বা কোন স্থানে একেবারে বন্ধ হয় ; মধ্যস্থলে জল ভাগ থাকিয়া বিল নামে খ্যাত হয়। এ দেশে হ্রদ না থাকিলেও বিলসকল হ্রদের স্থান অধিকার করে।

বিল সাধারণত স্রোতবিহীন, বর্ষায় জলপ্লাবিত হইলে সুদূর বিস্তৃত বিলময় প্রদেশ নৈরাকার অর্থাৎ কুলকিনারাবিহীন সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান হয়। কালিয়াকৈর বিল, বিল গণ্ডহস্তী, বড় বিলা, সোনাপাতিলা প্রভৃতি বিল দিয়া নৌকা পথে যাতায়াত সুবিধাজনক, কিন্তু প্রবল বাত্যা বা ঝটিকা সময়ে ঈদৃশ বিলময় প্রদেশে যাতায়াত একেবারে নিরাপদ নহে। একে বিল স্রোতহীন ও স্থানে স্থানে জল ৮/১০ হাত গভীর, তজ্জন্য সানুকুল বাতাস ব্যতীত বিল দিয়া নৌকায় গমনাগমন সুকঠিন। অপরিচিত স্থানের নাবিকগণ সময় সময় ঝড়ে বিল গণ্ডহস্তী, কালিয়াকৈর প্রভৃতি বিল দিয়া সোজাসুজি যাইতে বা বিল পাড়ি দিতে ঝড়ের সময় স্রোত বিহীন বিল মধ্যে বিপদগ্রস্ত হয়। স্রোতহীন বিলের জল "বোবা" বা "বোকা" জল নামে খ্যাত। পদ্মা ও যমুনার অত্যধিক জলপ্লাবনে অনেক সময় বিলে স্রোত বা ঢালান পড়িয়া থাকে।

ক্রমশ চতুর্দিকস্থ নদীবাহিত মৃত্তিকা দ্বারা বিল ক্রমে ভরট্ট হইলে জলভাগ হ্রাস ও স্থলভাগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহাকে বিল "জোয়ান" বলে। এতাদৃশ বিলের জোয়ান সমতল জমি অতি উর্ব্বর। বর্ষা অন্তে শরদাগমে বিলময় প্রদেশের চতুর্দিকস্থ ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে কলাই, মুগ, খেসারি প্রভৃতি ছিটাইয়া বুনানী হয়। ইহাতে জমিতে চাষের প্রয়োজন হয় না। এরূপ জমিকে সাধারণত "ছিটা" জমি বলে। রাউতারা, পোতাজিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিল মধ্যে নাচনা, ভানীকঁ্যাদো, শুয়ারঘুনী প্রভৃতি ছাহামের নিকট ঠাকুর জমিদারগণের এলাকার ঈদৃশ বহু ছিটা জমি আছে। ইহার ফসল অপেক্ষা কলাই খেসারি প্রভৃতির ঘাসই অধিক লাভজনক। প্রতি খাদা ঘাসের জমি সময় সময় ১২৫ টাকা হইতে ১৫০ টাকা পর্যন্ত হারে বন্দোবস্ত হয়। অগ্রহায়ণ মাস হইতে এই সমস্ত জমির ডাক বা বিলি আরম্ভ হয়। মালদহের আমের বাগানের ন্যায় আমাদের দেশের শাহজাদপুর অঞ্চলের জমিদার ও জোতদারগণ এই সকল ছিটা জমি বার্ষিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন। দেশের অনেক গোপ ও গৃহস্থগণ অনেকে গো মহিষাদি লইয়া তখন হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত এই সকল প্রদেশে যায় ও স্থানে স্থানে বাথান বা অস্থায়ী গবাদির আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিয়া গো মহিষাদি লইয়া তথায় যায় ও কয়েক মাস পর্যন্ত থাকে। এ কারণে শাহজাদপুর ও উল্লাপাড়া থানার পোরজনা, বাল্লপাড়া, মোহনপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত সুলভে পাওয়া যায়।

বহুদূর বিস্তৃত বিলময় প্রদেশ গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময়ই বিপদসঙ্কুল। চলন বিল, কালিয়াকৈর বিল প্রভৃতি স্থান দস্যুতস্করপূর্ণ দুর্গম পাঁথার নামে খ্যাত ছিল। অনেক লোক একত্র বা ২/৩ খানা নৌকা এক সঙ্গে না হইলে এই সমস্ত বিল পাড়ি দিত না। এই সমস্ত স্থান এক্ষণে অনেকাংশে নিরাপদ হইয়াছে, বিল মধ্যে আজকাল অনেক গ্রাম বসিয়াছে। রাউতারা ও ডেমরার পাঁথার এবং গাজনার বিল মধ্যে অনেক গ্রাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

বিলময় প্রদেশের অধিবাসিগণ সাধারণত নদী তীরস্থ ঘনসন্নিবিষ্ট পল্লী বা শহরতলীর লোক অপেক্ষা অনেকাংশে সুখী। বর্ষার ৩/৪ মাস ব্যতীত বৎসরের অবশিষ্ট কয়েক মাস ইহারা পরমানন্দে বাস করে। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জল নামিবার সময় কলাই খেসারি বিনা চাষে ছিটাইয়া বুনানী করে। তাহাতে নিজেদের আহার্য ও গবাদির প্রচুর ঘাস জন্মে। শীতকালে বাড়ির চতুস্পার্শ্বে তামাক, সরিষা ও নানারূপ তরকারি আবাদ করে। বাটির নিচে বিলে প্রচুর মাছ মারে ; বিলের উচ্চতম অংশে আউস ধান্যাদি ও নিম্নভাগে আমন ধানের চাষ করিয়া সম্বৎসরের খোরাক জোগাড় করে ; চৈত্র বৈশাখ মাসে সময় মত বৃষ্টি হইয়া আমন ধান একবার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইলে, বর্ষায় ধীরে ধীরে জল অধিক বৃদ্ধি হইলেও বিলের অঞ্চলের লোক ধান্যের অভাবে ভাতে মারা যায় না। মোটের উপর ইহারা ক্ষেত্রের ধান, বিলের মাছ ও জল, গাভীর দুধ, মাঠের কলাই মশুর খেসারি ও সরিষাদি প্রচুর পরিমাণে উপভোগ

করিয়া পরমানন্দে মুক্ত হাওয়ায় নিশ্চিন্ত মনে আড়ম্বরশূন্য দীর্ঘ কর্মজীবন যাপন করে। বাহ্য জগতের আন্দোলন ও প্রতিযোগিতা, শহরের কোলাহল, শিক্ষিত সমাজের নূতন নূতন অভাব ইহাদের নিকট উপস্থিত হয় না। কেবল জমির খাজানা আদায় করিতে পারিলেই ইহাদের রাজকীয় সংস্রব শেষ হয় ; নিজেরাই আপনাপন গ্রাম মণ্ডল ও প্রামাণিক মিলিয়া বিবাদ মীমাংসা করিয়া লয় ; গ্রাম্য মোল্লা বা স্থানে স্থানে ২/৪টি গ্রাম লইয়া একজন হিন্দু গুরু মহাশয় ইহাদের বালকগণের শিক্ষাকার্য নির্বাহ করে। মাথায় বোঝা লইয়া কিংবা নৌকা যোগে দোকানদারগণ গ্রামের বাটিতে বাটিতে আবশ্যকীয় দ্রব্য বহন করিয়া গাঁওয়াল করে, কিংবা স্থল বিশেষে ছোট বড় হাটে ঈদৃশ বিলময় প্রদেশের ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য নিষ্পন্ন হয়। ব্যাপারিগণও সময় সময় গ্রামের উপর ঘুরিয়া উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করে।

বিল অঞ্চলের লোকের প্রকৃতিরও বিশেষত্ব আছে। ইহারা সন্তরণে ও নৌকা চালনে বিশেষ পারদর্শী। সাধারণ লোকে বর্ষায় বাধ্য হইয়া সর্বত্র নৌকায় গমনাগমনে বাল্যকাল হইতে জল দেখিয়া সহসা ভীত হয় না ; আষাঢ় মাসে বিলে জল বৃদ্ধির সময়ে এবং কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জল কমিবার সময় হইতে বিলে মাছ মারিবার আমোদ পল্লীবাসীর পক্ষে বিশেষ উপভোগের বিষয় ; ফাল্গুন চৈত্র মাসে পাঁচ সাত গ্রামের ২/৩ শত লোকের একত্র সমবেত হইয়া গ্রাম পার্শ্বে কিংবা দূরবর্তী স্থানে মাছ মারিবার উদ্যোগ, উৎশাহ ও নির্দোষ আমোদ ও উল্লাস উল্লেখযোগ্য। এতাদৃশ সমবেত লোকেরা "বাহুত" নামে পরিচিত হয়। লাঠি ও পলো লইয়া সারিবদ্ধ ভাবে ইহাদের গমন ও জল কাদা উপেক্ষা করিয়া মাছ মারিবার আমোদ প্রমোদ দর্শনযোগ্য। সময় সময় ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোকের মধ্যে বিবাদও সংঘটিত হইয়া থাকে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিল মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ঃ

১. **বড় বিল**—চাটমোহর, ফরিদপুর ও সাঁথিয়া থানার কতকাংশে এই বিল অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ১২/১৪ বর্গ মাইল।

২. **বিল গণ্ডহস্তী**—সাধারণত গাজনা বিল নামে পরিচিত। সুজানগর ও পূর্বতন মথুরা থানার কতকাংশে ইহা অবস্থিত। ইহা আত্রাই ও পদ্মা নদী সঙ্গমে উৎপন্ন। সম্ভবত পদ্মার বর্ষাকালীন গভীর গর্জন হইতে ইহার গাজনা নাম হইয়া থাকিবে। বিলের জমি নিম্ন হইলেও ইহার জমি প্রায় সর্বত্রই সমতল। মটর খেসারি ব্যতীত ধনিয়া, কৃষ্ণজিরা প্রভৃতি মসলা জাতীয় রবিশস্য এই বিলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ; ক্ষেত্রফল প্রায় ৬ বর্গ মাইল।

৩. **বিল চলন**—ইহার মাত্র পূর্বাংশ পাবনা জেলার চাটমোহর, তাড়াস, রায়গঞ্জ থানায় অবস্থিত। ইহা পূর্বে অতি গভীর ও বিপদসঙ্কুল ছিল, এক্ষণে ক্রমশ ইহার মধ্যে অনেক গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৪. **কালিয়াকৈর**—শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, ফরিদপুর প্রভৃতি ২/৩টি থানা ব্যাপী ইহা একটি প্রধান বিল। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তরদক্ষিণে প্রায় ১৫/১৬ মাইল, পূর্বপশ্চিমে প্রস্থ প্রায় ১০/১২ মাইল। বর্ষায় সর্বত্র জলমগ্ন হইলেও গ্রীষ্মে প্রায় একেবারে শুকাইয়া যায়। ইহা সাধারণত পাঁথার বলিয়া পরিচিত। এই বিলে অনেক সরিষা জন্মে। এই সমস্ত বিলময় প্রদেশে ৫০/৬০ বৎসর পূর্বে ধান্য একেবারেই জন্মিত না। লোকে চিনা, কাউন বেশি খাদ্যরূপে ব্যবহার করিত। পঙ্গুলি অঞ্চলে শুনা যায়, পূর্বে ছেলেরা আব্দার করিলে ধানের ভাত দিবে বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিত।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিলসমূহ

পাবনা

থানা	বিল	পরিমাণ (মাইল)	থানা	বিল	পরিমাণ (মাইল)
পাবনা	সোনাপাতিলা	৩ × ২	চাটমোহর	দিক্‌সি	২ × ২
”	বিল ভেদুড়ি	১ × ১	”	কুরুলিয়া	২ × ১
”	পদ্ম বিল	১ × ১	”	গারুলিয়া	১ × ১
”	বিল চাটরা	২ × ১	”	সানখিডাঙা	২ × ২
”	বাঙাবাড়িয়া	১ × ১	মথুরা (বেড়া)	নাদুরে	১ × ১
সাঁথিয়া	ঘুঘুদহ	২ × ২	”	নলগারা	১ × ১
”	গাঙভাঙা	২ × ১	”	রঙ্গাইল	২ × ১
”	মুক্তাহার	১ × ১			

সিরাজগঞ্জ

থানা	বিল	পরিমাণ (মাইল)	থানা	বিল	পরিমাণ (মাইল)
শাহজাদপুর	সল্যা	১ × ১	রায়গঞ্জ	সোনাই বিল	১ × ১
”	সোনামুখী	২ × ২	”	বোয়ালিয়া	১ × ১
”	চণ্ডী বিল	২ × ২	”	বাঘ্‌নি	১ × ১
উল্লাপাডা	কালিয়াকৈর	×			

এতদ্ব্যতীত এই জেলায় আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিল আছে। তাহা যে যে গ্রামের ধারে অবস্থিত তন্নামেই পরিচিত। এই সমস্ত বিলে স্থানে স্থানে কেসুর, পানিফল এবং ট্যাঁপ পাওয়া যায়। বিল কুরুলিয়া, চণ্ডীবিল প্রভৃতিতে সুন্দর পদ্ম ফুল জন্মে। কোন কোন বিলের মৎস্যে বিশেষত্ব আছে; গাঙভাঙা বিলে অধিক চিতল মাছ, দিক্‌সি বিলে বহুল পরিমাণে বড় বড় কই মাছ পাওয়া যায়। ঘুঘুদহের বিল অধিক দাম দলে ও ঘাসে পূর্ণ, তজ্জন্য ইহার মাছে এক প্রকার গন্ধ আছে। কোন কোন বিলের ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা পাওয়া যায়। ধুলাউরি (সাঁথিয়া), দুবিলা (সুজানগর) প্রভৃতি স্থানে ইহা কখন কখন বিক্রি হয়। বোধ হয় ইহা হইতে মুক্তাহার বিলের নাম হইয়া থাকিবে। এ দেশে চুনিয়া বা যুগী, স্থল বিশেষে নমঃশূদ্রগণ বিলের ঝিনুক ও শামুক পোড়াইয়া চুণ তৈয়ারি করে।

গ. চর ঃ

পদ্মা ও যমুনা উভয় নদীতে যে সমস্ত চর আছে, তাহার কোন কোনটি দ্বীপ নামে পরিচিত হইলেও বর্তমানে ইহাদের কোনটিকেই প্রকৃত দ্বীপ বলা যায় না। সমস্তগুলিই প্রায় লপ্ত পয়স্তি জমি বিশেষ। চরসিলিমপুর চর নামে পরিচিত হইলেও ইহা এক্ষণে একপ্রকার গণ্ডগ্রাম বিশেষ। এখানে বহু প্রাচীন বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে। এই সকল চর কোনস্থলে মালিকগণের নামে যথা চর গিরীশমমিন, কোথায়ও জাতি নির্বিশেষের নামে, যথা চর গোয়ালবাথান, কোথাও জেলা ও মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মহোদয়গণের নামে, যথা চর বেল্, চর মুখার্জি প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এ সকল চর তিন প্রকারে বন্দোবস্ত হইয়া থাকে, কতক গভর্নমেন্ট খাসে রাখিয়া, কতক পূর্বতন মালিকগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এবং কতক গভর্নমেন্ট প্রজা মধ্যে মেয়াদী ইজারা বিলি করিয়া ইহার রাজস্বাদি আদায় করেন। মোট চর সংখ্যা বর্তমানে এই জেলায় প্রায় ৭৩টি; তন্মধ্যে এক হাজার একরের উর্ধ্ব পরিমাণ ফলবিশিষ্ট চরগুলির নামও রাজস্বাদি নিম্নে লিখিত হইল।

সিরাজগঞ্জ

থানা	চর	তৌজি নম্বর	ক্ষেত্রফল (একর)	রাজস্ব (টাকা)
শাহজাদপুর	(১) কাওলিয়া দিং	১৭৪০	৪৪৭১	৩৮৭২
”	(২) মিরকুটিয়া দিং	১৮৩০	৪৪৬০	৬২৬৮
”	(৩) কিঃ কাওয়ালিয়া	১৭৩৮	৩১৯৬	১২৪৮
”	(৪) পুখুরিয়া দিগর	১৭৩৯	২৬৪৪	৪৫১৮
”	(৫) চর সাহাপুর দিং	১৬৯০	১৬৯০	১৪৭৫
”	(৬) আটাপাড়া	১৭৪২	১২০৭	৫০০
সিরাজগঞ্জ	(৭) চর চন্দনী	১৮৩৪	২৪০৪	২১০
”	(৮) চর গোয়ালবাথান	২১০৮	১৬০২	১৫১১
”	(৯) দ্বীপ চর বেল	১৯০৮	১৪২৫	১৩৯৩
”	(১০) রাজবাড়ি কালিকাপুর	১৭৪৫	১০৮১	১৯৩৫
”	(১১) চর গিরীশ মমিন	২২০৩	১০০০	৮৬৯
রায়গঞ্জ	(১২) চর খুক্‌সিয়া	১৭৫৩	২৭৮২	৪২৭

পাবনা

থানা	চর	তৌজি নম্বর	ক্ষেত্রফল (একর)	রাজস্ব (টাকা)
সুজানগর	(১) চর খাঁপুর	১৮৩১	১২১৪	১০৬৭
”	(২) চর শ্রীকৃষ্ণপুর	২২০০	১১৭২	১৮১০
”	(৩) দ্বীপ চর খাঁপুর	২১৪০	১০৯০	১১৫১
পাবনা	(৪) চর বলরামপুর	১৯০২	১৯৮৫	১৭১৮
মথুরা	(৫) চর পেচাকোলা	১৭০২	১৫২৩	২৬৯২
সাঁড়া	(৬) চর সিলিমপুর	১৭৩২	৮৭৩৯	৮৯২৫
”	(৭) নামজাদ বাহির চর	১৭২৫	৭৫৭৪	৭৮৭৯
”	(৮) কুরুরিয়া দিগর	২১৫২	২৫৮০	২২৬০
”	(৯) চর দাদাপুর	১৭৩৩	১৯২৫	৪৭৭

উপরোক্ত খাস মহালগুলি ব্যতীত জমিদারগণও অনেক চরের মালিক।

খাল, বিল, চর ও জেলার নিম্নভূমি আষাঢ় হইতে কার্তিক, স্থল বিশেষে অগ্রহায়ণ পৌষ মাস পর্যন্ত বৎসরের প্রায় ছয় মাস কাল জলমগ্নাবস্থায় থাকে ; বর্ষায় সুদূর বিস্তৃত বিলময় প্রদেশে ও বেগবতী নদী নালাদি মধ্যে নৌকা ডুবিতে চর ও পদ্মা যমুনাদি বৃহৎ নদীতে কুম্ভীরাদি জল জন্তুর আক্রমণে এবং খাল ও জলমগ্ন জঙ্গলাদি ও লোকালয়ে বিষধর সর্পের দংশনে প্রতি বৎসর বহু লোকের অকালমৃত্যু ঘটে। গভর্নমেন্ট হইতে তাহার যে তালিকা প্রস্তুত হয়, তাহাতে জানা যায়, ১৮৭০ অব্দে কেবলমাত্র নৌকা ডুবিতে মোট ১৯৮ জন মধ্যে ৩৪ পুরুষ, ২৪ স্ত্রীলোক ও ১৪০ বালক মারা গিয়াছিল। ১৮৭০ হইতে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৫ বৎসরে গড়ে নৌকা ডুবিতে মোট ১৯৯ জনের মধ্যে ৩৪ পুরুষ, ২৪ স্ত্রীলোক এবং ১৪১ বালক মরিয়াছিল। এক্ষণে নৌকা ডুবিতে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা সঠিক রাখা হয় না ; তবে সর্পাঘাত ও বন্য জন্তুর আক্রমণে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা নির্ধারিত হয়। তাহার তালিকা হইতে জানা যায়, ১৯২২-১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মোট ২১৯ জনের মধ্যে ১১০ পুরুষ ও ১০৯ স্ত্রীলোকের সর্পাঘাতে ও বন্য জন্তুর আক্রমণে অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহাতে আরও জানিতে পারা যায়

বৎসরে অন্যান্য মাস অপেক্ষা জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষার ৫ মাসেই প্রায় অধিক লোক মরিয়া থাকে। তদ্বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সর্পাঘাত ও হিংস্র জন্তুতে মৃত্যু—১৯২২-১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ

মাস	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	মাস	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
জানুয়ারি	৩	১	৪	জুলাই	১৮	১৩	৩১
ফেব্রুয়ারি	২	০	২	আগস্ট	১৯	২১	৪০
মার্চ	৪	৪	৮	সেপ্টেম্বর	১৮	২৫	৪৩
এপ্রিল	৭	২	৯	অক্টোবর	১৬	১২	২৮
মে	১১	১১	২২	নভেম্বর	৪	৪	৮
জুন	৬	১৫	২১	ডিসেম্বর	২	১	৩
	৩৩	৩৩	৬৬		৭৭	৭৬	১৫৩

জেলার অনেক স্থান খাল বিলাদিতে পূর্ণ হইলেও, এই সমস্ত একেবারে উপক্ষেণীয় নহে; ইহাদেরও কিঞ্চিৎ উপকারিতা আছে। খাল অনেক সময় লোকের উপকারে আসে। নৌকা পথে সোজাসুজি যাতায়াতে ও বাণিজ্য কার্যে ইহা বিশেষ সুবিধাজনক। খাল দ্বারা সুদূর বিস্তৃত ভূভাগের জল নিকাশ না হইলে বা তদ্বারা জল না আসিলে অনেক সময় বিলের ফসল নষ্ট হয়। বিল সমূহ কেবলমাত্র জলাকীর্ণ স্থান নহে; জেলার পশ্চিমোত্তরে তাড়াসাদি অঞ্চলে বিল মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আমন ধান জন্মে। জল নামিতে আরম্ভ করিলে কেহ বিলে নানাবিধ মাছ মারিয়া, কেহ তাহার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জন করে। দিলপসার, মোহনপুর প্রভৃতি বিল মধ্যবর্তী রেল স্টেশন হইতে বার্ষিক বহু টাকার মাছ কলকাতায় চালান হয়। বিল ও চরভূমির স্থানে স্থানে নানারূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ শীকারোপযোগী পাখি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে আমোদ ও লাভের বিষয়। চরে ঝাউ, বন, সানি প্রভৃতি বিনা পরিশ্রমে অপর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে; গরিব দুঃখী ও বহু নিরাশ্রয় লোকে তাহা গ্রামে লইয়া বিক্রয় করতঃ প্রতিপালিত হয়। পলি মৃত্তিকাযুক্ত চর জমিতে প্রচুর পরিমাণে কলাই, মুগ, ধান ও পাট জন্মে। জমিদারগণেরও খাস মহাল হিসাবে গভর্নমেন্টের পক্ষেও চর অনেক সময় লাভবান সম্পত্তি।

তথ্যসূত্র

১. *The fall of the Ganges is about nine inches per mile and the current varies from about three miles an hour in cold weather to at least double that rate during the rains. In perticular spots, as, for instance, where the stream rushes round some projecting point, this rate of motion is exceeded and boats and steamers find great diffuculty in making their way against the current.* *Bengal District Gazetteer,' Rajashahi, 1916, P. 10.*

২. *B. D, G. Dacca, by B. C. Allen, 1912. P. 21*

৩. *Bengal District Gazetter. E B. and Assam, Bogra 1910, P 8*

৪. *Bengal District Gazetter, Mymensing, 1917. P. 7.*

৫. *Imperial Gazetter of India. Vol. I P. 27.*

৬. *চান্দাইকোণার কতকাংশ পাবনা ও কতকাংশ বগুড়া জেলায় অবস্থিত।*

৭. *"পৌণ্ড্রবর্ধন ও করতোয়া" ৯৬/৯৭ পৃঃ।*

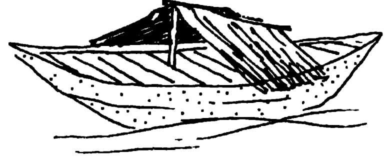
৮. *B. D. G. E. B and Assam, Bogra, 1910. P. 9.*

৯. *Hunter's Statistical Accounts of Rajshahi.*

১০. *Hunter's Statistical Accounts of Rajshahi.*
১১. *"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্য কাণ্ড, ১৪৮/১৪৯ পৃঃ।*
১২. *উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন তৃতীয় অধিবেশন, গৌরীপুর কাব্যবিবরণ, ৪২ পৃঃ।*
১৩. *প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯ সাল। ৬৪০ পৃঃ।*
১৪. *বেনুপুরের জোলা নামেও খ্যাত হয়।*

তৃতীয় অধ্যায়

যাতায়াতের উপায়



প্রথম পরিচ্ছেদ—স্থলপথ

ক. প্রাচীন শাহীপথ ঃ

বঙ্গদেশ বিশেষত পূর্ববঙ্গ নদীবহুল ও বিল-খালপূর্ণ নিম্নভূমি ; তজ্জন্য এ দেশে স্থল অপেক্ষা জলপথে যাতায়াত ও বাণিজ্যাদি বিশেষ সুবিধাজনক। বৎসরে প্রায় ৪/৫ মাস এ জেলার অনেক স্থান জলমগ্ন থাকে ; সুতরাং এতাদৃশ স্থানে উচ্চ রাস্তাদি নির্মাণ ও তাহার সংরক্ষণাদি কার্য অতি ব্যয়সাধ্য। যাহা হউক, নদী মাতৃক হইলেও পাবনা জেলার উত্তরাংশে সিরাজগঞ্জের সীমা হইতে সেরপুরাভিমুখে বিস্তৃত যে উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ সাধারণত "ভীমের জাঙ্গাল" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে, তাহা পালরাজত্বকালে কৈবর্তনায়ক ভীম কর্তৃক নির্মিত এরূপ জানা যায়। এতদ্ব্যতীত মুসলমান আমলে সময়ে সময়ে স্থলপথে যাতায়াত ও সৈন্যাদি পরিচালনের জন্য যে সকল রাজবর্ত্ম নির্মিত হইত, তাহা সাধারণত বাদশাহী বা সংক্ষেপে শাহীপথ নাম অভিহিত হইত। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যানডেন ব্রুক সমগ্র বঙ্গদেশের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী ঢাকা হইতে ধলেশ্বরী ও যমুনার সঙ্গমস্থল বেলদলিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া পাবনা জেলার শাহজাদপুর, হাণ্ডিয়াল এবং তাড়াসের পার্শ্ব দিয়া চলনবিলের পূর্ব পার পর্যন্ত বিস্তৃত এবম্বিধ একটি শাহীপথ অঙ্কিত আছে। তাড়াস ও হাণ্ডিয়ালের মধ্যে এখনও উহার চিহ্ন বর্তমান আছে। প্রবাদ আরঙ্গজেব পৌত্র আজিম-ওশ্বানের ঢাকায় সুবেদারী আমলে, তাড়াস জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ বলরাম রায় যখন তথায় দেওয়ানি বা মুৎসদ্দি পদে কার্য করিতেন, তখন তাঁহার উদ্যোগে ও পরামর্শে ঐ রাস্তা নির্মিত হইয়াছিল।

খ. কোম্পানি আমলে রাস্তা ঃ

ইংরেজ অধিকারের প্রারম্ভে যখন দেশময় রেলপথ কিংবা স্টিমার প্রভৃতি প্রচলিত হয় নাই, তখন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ এদেশে যাতায়াতের রাস্তার অবস্থা অবগত না থাকায় সর্বত্র যাতায়াতে অসুবিধা অনুভব করিতেন। তজন্য মেজর রেনেল সাহেব বঙ্গের নদ নদীর বিবরণীর সঙ্গে সঙ্গে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তৎকালীন রাজপথসমূহের অবস্থারও যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করতঃ তাহার এক বিস্তারিত মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে পাবনা জেলা মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান রাস্তার উল্লেখ আছে। এই সময়ে রাস্তা সমস্তই নবাবী আমলের নির্মিত।

(১) হাস্তিয়াল বা সেরপুর রোড—কলকাতা হইতে পাবনা জেলার চাটমোহর, নবগ্রাম, তাড়াসের উত্তর দিয়া বগুড়া জেলার সেরপুর অভিমুখে বিস্তৃত।

(২) রাজশাহী রোড—মুর্শিদাবাদ হইতে রাজশাহী দিয়া পদ্মা তীরে নাজিরপুর হইয়া পাবনা পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৩) ঢাকা রোড—ঢাকা হইতে যমুনা অতিক্রম করিয়া শাহজাদপুর দিয়া চলন বিলের পার পর্যন্ত বিস্তৃত।

এতদ্ব্যতীত মেঃ রেনেল কৃত মানচিত্রে নিম্নলিখিত রাস্তার নির্দেশ আছে।

(১) পাবনা হইতে রতনগঞ্জ দিয়া জাফরগঞ্জ পর্যন্ত। (২) রতনগঞ্জ হইতে সিন্দুরী দিয়া শাহজাদপুর। (৩) বেলকুচি হইতে তাড়াস পর্যন্ত।

গ. ইম্পিরিয়াল ও লোক্যাল রোড ঃ

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট হইতে বঙ্গের রাস্তাসমূহের যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতে এই জেলা মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি রাস্তার উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে প্রথমটি জেলার সীমা পরিবর্তন ও ষষ্ঠটি নদীর ভাঙন প্রযুক্ত এক্ষণে পাবনা জেলায় বর্তমান নাই।

	রাস্তা	হইতে	পর্যন্ত	দৈর্ঘ্য (মাইল)	বাঁধা সড়ক
১)	বালিয়াকান্দি	পাবনা	বালিয়াকান্দি	৪৬	ঐ
২)	সিরাজগঞ্জ	ঐ	সিরাজগঞ্জ	৪০	ঐ
৩)	মথুরা	ঐ	মথুরা	৩২	ঐ
৪)	অরণকোলা	ঐ	অরণকোলা	১৬	ঐ
৫)	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	১০	ঐ
৬)	কুমিদপুর	কুষ্টিয়া	কুমিদপুর	৮	পাকা বাঁধা
৭)	জামতৈল	সিরাজগঞ্জ	জামতৈল	৮	বাঁধা সড়ক
৮)	রাজাপুর	সিরাজগঞ্জ	রাজাপুর	৬	ঐ
৯)	ঐ	জামতৈল	ঐ	৫	ঐ

ঘ. ডিস্ট্রিক্টবোর্ড রোড ঃ

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর হইতে সর্বপ্রথম পাবনায় জেলাবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে জেলা মধ্যে স্থানে স্থানে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা নির্মিত হয়। তৎপূর্বে রোড সেস কমিটির উপর জেলার রাস্তাদি প্রস্তুত ও তাহা মেরামতের ভার ন্যস্ত ছিল। পূর্বে ডাকসেস নামে যে কর আদায় হইত, তাহা জেলার রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত কার্যে ব্যয়িত হইত। ১৮৭১/৭১ খ্রিস্টাব্দে রোড সেস আইন পাশ হইবার পর ডাক সেস ক্রমে উঠিয়া যায়। এক্ষণে রোড সেস (পথকর) ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস দ্বারা জেলার মফঃস্বলস্থ রাস্তা নির্মাণ এবং তাহার বার্ষিক উন্নতি ও মেরামতাদি কার্য সম্পন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত খোয়ার ও খেওয়া ঘাটের আয়ও উক্ত কার্যাদিতে ব্যয়িত হয়।

বর্তমান সময়ে পাবনা জেলাবোর্ডের তত্ত্বাবধানে পাবনা সদরে ৩২৯।।৹ মাইল ও সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ৩৯৪।।৹ মাইল মোট ৭২৪ মাইল বিস্তৃত ৭২টি রাস্তা আছে। ইহার মধ্যে ৭টি রাস্তায় প্রায় ৩৫৷৵৹ মাইল পথ পাকা বাঁধা। এতদ্ব্যতীত পাবনা লোকাল বোর্ডের অধীনে ১১০।।৹ মাইল বিস্তৃত ৬০টি ও সিরাজগঞ্জ লোকালবোর্ডর অধীনে ১৩৪।।৹ মাইল বিস্তৃত ৭২টি, মোট ২৪৫ মাইল বিস্তৃত ১৩২টি গ্রাম্য রাস্তা আছে। এই সকল রাস্তার মধ্যে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তাগুলি কতক উচ্চ মৃত্তিকা বাঁধা সড়ক এবং কতক কেবলমাত্র ট্র্যাক বা সাধারণ পথ ; কোনস্থলে এক রাস্তারই কতকাংশ বাঁধা সড়ক ও কতকাংশ সাধারণ ট্র্যাক মাত্র। ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনেও প্রায় ১৫৷৵৹ মাইল বিস্তৃত রাস্তা আছে।

এই সকল রাস্তা পরিদর্শনাদির জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁহার অধীনে পাবনা সদরে একজন ও আতাইকুলায় একজন ওভারসিয়ার এবং চাটমোহরে একজন সাবওভারসিয়ার নিযুক্ত আছেন। তদ্রূপ সিরাজগঞ্জে একজন ওভারসিয়ার ও সাবওভারসিয়ার এবং উল্লাপাড়ার একজন সাব-ওভারসিয়ার নিযুক্ত আছেন বা থাকিবার ব্যবস্থা আছে।

বর্তমান সময়ে জেলার কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় রাস্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

১. পাবনা-সাঁড়া রোড—ইহা পাবনা সদর হইতে পশ্চিম বা ঈষৎ পশ্চিমোত্তরে পূর্বতন সাঁড়াঘাট রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ১৯ মাইল বিস্তৃত ; ইহার মধ্যে পাবনা হইতে ঈশ্বরদি জংশন অবধি ১৭ মাইল পাকা বাঁধা, দুইধারে বৃক্ষাদি রোপিত ও স্থানে স্থানে কাঠের ও ইঁটের পাকা বাঁধা ছোট বড় সেতু আছে। এই রাস্তার দ্বারা পূর্ববঙ্গীয় রেল পথের ঈশ্বরদি স্টেশনের সহিত পাবনার সংযোগ থাকায় ইহা বর্তমানে জেলার মধ্যে একটি প্রধান ও আবশ্যকীয় রাস্তা। পাবনার নিচে ইছামতী ব্রিজ পার হইলে এই রাস্তায় অন্য কোন নদী পার নাই। ইহার ধারে পাবনা হইতে ৬ মাইল পর মালিগাছা, ৯ মাইল পর ভবানীপুর, ১২ মাইলে দাশুরিয়ায়, ১৫ মাইল পর পার্শ্বে অরণকোলা এবং ১৭ মাইল পর ঈশ্বরদী ও ১৯ মাইল পর সাঁড়া রাজারবাজারে বাজার ও সাপ্তাহিক হাট আছে। দাশুরিয়া, ঈশ্বরদি ও সাঁড়ায় ইন্স্পেসকন বাঙ্লা বা ডাক-বাঙ্লা বর্তমান আছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল এই রাস্তায় ঈশ্বরদি পর্যন্ত ১ টাকা ভাড়ায় মোটরগাড়ি চলাচলের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

২. পাবনা-সিরাজগঞ্জ রোড—পাবনা হইতে সিরাজগঞ্জ যাইবার স্থল-পথে দুইটি রাস্তা বর্তমান আছে। প্রথমটির নাম নূতন পাবনা-সিরাজগঞ্জ রোড ও দ্বিতীয়টির নাম পুরাতন পাবনা-সিরাজগঞ্জ রোড।

(ক) নূতন পাবনা-সিরাজগঞ্জ রোড পাবনা ও সিরাজগঞ্জ এই দুই বিভাগে বিভক্ত। পাবনা বাজার হইতে পূর্বদিকে ২৬।৹ মাইল দূরে বেড়া পর্যন্ত বিস্তৃত, তজন্য এই বিভাগকে বেড়া রোডও বলা যায়। পাবনা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্য হইতে ৬নং মাইল পর্যন্ত ধোপাঘাটা নামক স্থান অবধি এই রাস্তা পাকা বাঁধা ; তথা হইতে ২১।৹ মাইল দূরে বেড়া বন্দরের নিকট পর্যন্ত এই রাস্তা উচ্চ 'কাঁচা' বাঁধা সড়ক। ইহার ধারে পাবনা হইতে অনেক দূর পর্যন্ত বৃক্ষাদি রোপিত, স্থানে স্থানে পাকা বাঁধা ছোট বড় সেতু দেখিতে পাওয়া যায়। ১২ মাইল পর আতাইকুলায় বাজার, হাট ও ডাক-বাঙ্লা ; ২১ মাইল পর সাঁথিয়ায় ডাক-বাঙ্লা, হাট বাজার এবং ২৬ মাইল দূরে বেড়া প্রসিদ্ধ বন্দর। তথায় ডাক-বাঙ্লা ও বাজার বর্তমান আছে।

বেড়ার কিয়দ্দূরে পায়না ও ভেড়াখোলার মধ্যবর্তী হুরাসাগর নদী পার হইয়া তথা হইতে উত্তরাভিমুখে কৈজুরী, দেলুয়া, বেলকুচি দিয়া সিরাজগঞ্জ মিরপুর পর্যন্ত ২৯ মাইল এই রাস্তার সিরাজগঞ্জ বিভাগ। তন্মধ্যে মিরপুর হইতে দক্ষিণে ২ মাইল পর্যন্ত পাকা বাঁধা, অবশিষ্ট ২৭ মাইল কেবলমাত্র ট্র্যাক (সাধারণ লাইন বা পথ) সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে সয়দাবাদে, ১০ মাইল পরে দেলুয়ায় এবং ২৩ মাইল অন্তরে কৈজুরির নিকট যমুনার শাখা হুরাসাগর ও আঠারদহের নদী পার আছে, বর্ষায় নৌকায় বন্দোবস্ত আছে। সয়দাবাদ মকিমপুর, দেলুয়া, সোহাগপুর, কৈজুরি প্রভৃতি স্থানে হাটবাজার আছে।

(খ) পুরাতন পাবনা-সিরাজগঞ্জ রোডও পাবনা ও সিরাজগঞ্জ দুই বিভাগে বিভক্ত। সিরাজগঞ্জ রায়পুর হইতে উল্লাপাড়া শাহজাদপুর দিয়া রাউতাড়া ঘাট পর্যন্ত ২৭৷৷৹ মাইল সিরাজগঞ্জ বিভাগ এবং তথা হইতে আতাইকুলা পর্যন্ত ১২৷৷৹ মাইল পাবনা বিভাগ। সিরাজগঞ্জ হইতে উল্লাপাড়া পর্যন্ত প্রায় ১৬ মাইল তন্মধ্যে প্রায় ৫ মাইল কাঁচা বাধা, উল্লাপাড়া হইতে শাহজাদপুর পর্যন্ত প্রায় ১১৷৷৹ মাইল কাঁচা বাঁধা। শাহজাদপুর হইতে রাউতাড়া ও নদী পার আতাইকুলা পর্যন্ত ১২৷৷৹ মাইল কাঁচা বাঁধা। এই রাস্তাও জেলার পূর্বোত্তর প্রদেশে যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। এই রাস্তার বাঁধা অংশ অতীব সুন্দর কিন্তু ইহাতে অল্প বৃক্ষাদি রোপিত ; কোন কোন স্থানে বিশেষত উল্লাপাড়া হইতে শাহজাদপুর পর্যন্ত অংশে একেবারে কোন বৃক্ষাদি রোপিত নাই বলিলেই হয়। স্থানে স্থানে ২/১টি সেতু আছে মাত্র। আতাইকুলায় ইছামতী, রাউতাড়ার নিকটে সেলন্দে বরল, রামকান্তপুর রাউতাড়ায় গোহালা,

উল্লাপাড়ায় ফুলঝোড় বা করতোয়া এবং কামারখন্দে নদী পার আছে; উল্লাপাড়া ও রাউতাড়ার বার মাস খেওয়া থাকে, অন্যত্র বর্ষা ভিন্ন গ্রীষ্মে বাঁশের সেতু নির্মিত হয়।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি এই রাস্তায় বাইসিকল্ গাড়িতে যাতায়াত করা যায়। ইহার ধারে আতাইকুলা ব্যতীত সেলন্দ, পোতজিয়া, শাহজাদপুর, তালগাছি, উল্লাপাড়া, কামারখন্দ প্রভৃতি স্থানে হাটবাজার আছে। উল্লাপাড়ায় ডাকবাঙ্লা ও শাহজাদপুরে জমিদারগণের কাছারিতে অবস্থানের বন্দোবস্ত আছে।

৩. রাণীগাঁও-রাণীহাট রোড—সাঁড়া রাস্তার ৬নং মাইলের পর রাণীগাঁও প্রকাশ্য টেম্না নামক স্থান হইতে উত্তরাভিমুখে বাঘলবার পর্যন্ত ২৩ মাইল পাবনা বিভাগ মধ্যে চাটমোহর পর্যন্ত ১২।।৹ মাইল কাঁচা বাঁধা, অবশিষ্ট ১০।।৹ মাইল ট্র্যাক। বাঘলবার হইতে হাণ্ডিয়াল, তাড়াস দিয়া সোজা উত্তরাভিমুখে রানীহাট পর্যন্ত ১৬।।৹ মাইল এই রাস্তার সিরাজগঞ্জ বিভাগ। ইহার অল্প স্থানে বৃক্ষাদি রোপিত। ভবানীপুর, মুলগ্রামে, চাটমোহরে নদী পার আছে, বর্ষায় খেওয়া থাকে ; অন্য সময়ে মুলগ্রাম, চাটমোহরে নদী পার আছে, বর্ষায় খেওয়া থাকে ; অন্য সময়ে মুলগ্রামে ও চাটমোহরে বাঁশের পুল দেওয়া হয়। চাটমোহরে গাড়ি পারাপারের বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। বওসা ঘাটে গুমানী নদীতে বারমাস খেওয়া থাকে। কিন্তু বিলের মধ্যবর্তী জন্য পূর্ণ বর্ষায় তাহা উঠিয়া যায়। নৌকা ব্যতীত চাটমোহরের উত্তর হইতে বর্ষার প্রায় ৪/৫ মাস এই রাস্তায় যাতায়াত একেবারে অসম্ভব। এই রাস্তার ধারে দেবোত্তর, ভবানীপুর, চাটমোহর, হাণ্ডিয়াল, তাড়াস প্রভৃতি স্থানে হাট বাজার বর্তমান আছে। চাটমোহর ও তাড়াসে ডাক-বাঙ্লার বন্দোবস্ত আছে।

জেলার পশ্চিম দিকে উত্তরাভিমুখে যাতায়াতে ইহা সর্বপ্রধান রাস্তা। বিল মধ্যবর্তী বলিয়া চাটমোহর হইতে উত্তরে এই রাস্তা জেলার মধ্যে অতি প্রাচীন হইলেও ইহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। চলন বিলের মধ্যে প্রচুর ধান জন্মে, তাহা খরিদ জন্য দক্ষিণাঞ্চল হইতে বহু ধানবাহী গোমহিষের গাড়ি এই রাস্তায় কার্তিক হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত যাতায়াত করে ; তজ্জন্য বওসা খেওয়া ঘাট বিশেষ প্রসিদ্ধ ও এই ঘাটের আয়ও যথেষ্ট।

জানা যায় নবাবী আমলে ঢাকায় রাজধানী থাকা সময়ে শাহজাদপুর, হাণ্ডিয়াল, তাড়াস দিয়া চলন বিলের পূর্বধারে এই রাস্তার কতকাংশ বিদ্যমান ছিল। পাবনা হইতে উত্তরাভিমুখে বগুড়া, সেরপুর প্রভৃতি স্থানে যাইবার তৎকালে ইহা একটি প্রধান রাস্তা বলিয়া পরিচিত ছিল। যথা ঃ The oldest road in the district and one of the oldest, so far as our present knowledge goes in this part of Bengal in running north and south through the whole length of the district on the west side of the Koratoya. It now runs up to Rungpur and towards the south bends southeast to Serajgunj. In the oldest Dutch map of Venden Brouche, it is the part of the great military road though the present district of Pabna near Harial, the through Sherpur called "Ceerpur mirts"[১] অর্থাৎ পাবনা জেলার হাণ্ডিয়ালের মধ্য দিয়া উত্তরে বগুড়া, সেরপুর পর্যন্ত উহা ভ্যানডেন ব্রুকের অঙ্কিত (১৬৬০ খ্রিঃ) ওলন্দাজ ম্যাপে সামরিক রাস্তার অংশ বিশেষ। ইহা (বগুড়া) জেলার মধ্য দিয়া করতোয়ার পশ্চিমে অবস্থিত একটি সুপ্রাচীন রাস্তা—উত্তরে রঙ্পুর এবং দক্ষিণে সিরাজগঞ্জের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত আছে।

৪. মথুরা রোড—পাবনার তিন মাইল পূর্বে খরশুতি গ্রামে দোগাছি রোড হইতে বাহির হইয়া, তাঁতিবন্দ, দুলাই কাশীনাথপুর দিয়া এই রাস্তা প্রায় ২৮।।৹ মাইল পথ বিস্তৃত। ইহার পার্শ্বে নলধা, দুবলিয়া, চিনাখরা, দুলাই, কাশীনাথপুরে (আত্রাই পার) হাট বাজার এবং দুলাইতে ডাক-বাঙ্লা আছে। তাঁতিবন্দের পূর্বে পোরাডাঙা, কাশীনাথপুর ও রঘুনাথপুর পারঘাটায় বর্ষায় খেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। এই রাস্তার অবস্থা দুলাইর নিকট উভয় দিকে

অতীব সুন্দর, বৃক্ষাদি সমাচ্ছাদিত এবং এমন কি কতকদূর পর্যন্ত বর্ষাকালেও চলাচলে কোন অসুবিধা নাই। ২৮॥৹ মধ্যে খরশুতি হইতে ১৬৷৹ মাইল পর্যন্ত কাঁচা বাঁধা অবশিষ্ট ১১৷৹ মাইল ট্র্যাক। খরশুতি হইতে দুলাই পর্যন্ত ভাল সেতুর বন্দোবস্ত না থাকায়, প্রতি বৎসরই এই রাস্তায় মাটি ফেলিয়া যে উন্নতি করা হয়, বর্ষায় তাহা অনেকাংশে নষ্ট হয় এবং ভাল রাস্তা হইলেও বন্দোবস্ত অভাবে বর্ষা বেশি হইলে এই রাস্তা দিয়া যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা হয়।

৫. সিরাজগঞ্জ-বগুড়া রোড—সিরাজগঞ্জ হইতে বগুড়া যাইবার নূতন ও পুরাতন দুইটি রাস্তা আছে। দুইটিই পাবনা জেলার সীমান্তে চান্দাইকোণার নিকট মিলিত হইয়াছে; তথা হইতে বগুড়া জেলার সেরপুর প্রায় ২৪ মাইল। প্রথম রাস্তাটি সিরাজগঞ্জ মাসিমপুর হইতে ভদ্রঘাট, নলকা, দিয়া চান্দাইকোণা অভিমুখে ১৯৷৹ মাইল বিস্তৃত। ইহার সমস্ত অংশই উচ্চ কাঁচা বাঁধা, কিন্তু বেতনালী, পাঁচিল, কুমরুল, ঘুরকা, ভুএঞাগাতি, সেরিখেল ও কিশোরখালি প্রভৃতি স্থানে ভাঙা আছে; কোন কোন স্থানে বর্ষায় খেওয়া নৌকা থাকে। নলকা বন্দরে ফুলঝোর নদীতে বার মাস খেওয়া থাকে। স্থানে স্থানে সেতু ও বৃক্ষাদি রোপিত আছে। এই রাস্তার ধারে শিয়ালখোল, ভদ্রঘাট, নলকা, সাহেবগঞ্জ, ভুএঞাগাতি প্রভৃতি স্থানে হাটবাজার বর্তমান আছে। অগ্রহায়ণ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সাইকেল গাড়িতে এই রাস্তায় যাতায়াত করা যায়।

দ্বিতীয়টি পাঙাসি ও ধানঘরা দিয়া চান্দাইকোণা পর্যন্ত প্রায় ১৫॥৹ মাইল কাঁচা বাধা। উভয় পার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপিত, কিন্তু বহুস্থান ভাঙা। তথায় কোন প্রকার সেতু নাই। ইহা পুরাতন বগুড়া রোড বটে, কিন্তু ফুলঝোর তীরে সাহেবগঞ্জ বন্দরের উন্নতি হেতু তথায় ইউরোপীয় মহাজনদিগের যাতায়াতের জন্য নূতন বগুড়া রোডের অধিক উন্নতি হইয়াছে, ইহার কোন উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। রাস্তাটি প্রাচীন, মধ্যে স্থানে স্থানে বৃক্ষাদিতে আচ্ছাদিত, তজ্জন্য গতায়াতে বিশেষ সুবিধাজনক হইলেও, ইহার ভাঙা স্থানসমূহে সেতু না থাকায় বর্ষায় ইহাতে চলাচল অতীব কষ্টকর। চান্দাইকোণা এই রাস্তায় সিরাজগঞ্জ হইতে ১৪॥৹ মাইল দূর, তথাপি তথাকার মহাজনগণ এই রাস্তা দিয়া সিরাজগঞ্জ হইতে কলকাতার মালপত্র না লইয়া, প্রায় ২৪/২৫ মাইল দূরবর্তী বগুড়া রেল স্টেশন হইতে তাহা আনিয়া থাকে। এই রাস্তা দুইটির মধ্যে স্থানে স্থানে ভাঙা থাকায় এবং তথায় কোন ব্রিজের বন্দোবস্ত না থাকার জন্য গাড়ি চলাচলে অসুবিধা নিবন্ধন সিরাজগঞ্জ রেলপথ খুলিবার পরও, জেলার উত্তরাঞ্চলবাসী ব্যবসায়ীগণের বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। অন্য সময়ে যাতায়াতে ও মালপত্রাদি বহন কষ্টে চলিলেও বর্ষায় উভয়ই অসুবিধাজনক। পাঙাসিতে বাজার, ধানঘড়ায় হাটবাজাব, ডাক-বাঙ্‌লা ও তথায় বারমাস খেওয়া থাকে।

৬. রাজশাহী রোড—বর্তমানে অরণকোলা হইতে জেলার পশ্চিম প্রান্তে আরামবাড়িয়া পর্যন্ত ৫৷৹ মাইল বিস্তৃত রাস্তা রাজশাহী রোড নামে পরিচিত; কিন্তু পূর্বে পাবনা হইতে পদ্মার ধারে নাজিরপুর ও কুমিদপুর, রূপপুর প্রভৃতি অঞ্চল দিয়া রামপুর বোয়ালিয়া রোড নামে একটি রাস্তা রাজশাহী অভিমুখে বিস্তৃত ছিল। তাহাতে পাবনা হইতে রামপুর বোয়ালিয়া পর্যন্ত যাতায়াত চলিত। পদ্মা ভাঙিয়া যাওয়ায় ইহার কতকাংশ পুরাতন সাঁড়া-সিলিমপুর রাস্তায় পড়িয়াছে, তজ্জন্য কেবলমাত্র অরণকোলা হইতে আরামবাড়িয়া, মাজপাড়া পর্যন্ত রাজশাহী রোড প্রদর্শিত হইতেছে।

৭. সুজানগর-নাজিরগঞ্জ রোড—পাবনা হইতে দক্ষিণপূর্ব দিকে সুজানগর, সাতবাড়িয়া দিয়া নাজিরগঞ্জ পর্যন্ত যে রাস্তা বিস্তৃত আছে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইলেও ইহাকে সুজানগর-নাজিরগঞ্জ রোড বলা যায়। মথুরা রোডের ১০নং মাইল পর খালিসপুর হইতে সাতবাড়িয়া, রাইপুর পর্যন্ত কাঁচা বাঁধা সড়ক প্রায় ৯ মাইল, তৎপর নাজিরগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ৭ মাইল ট্র্যাক বা সাধারণ পথ। এই রাস্তার ধারে সুজানগরে, সাতবাড়িয়ায়, ভাটপাড়া, রাইপুরে

(ক্ষেতুপাড়া), নাজিরগঞ্জে হাট ও বাজার বর্তমান আছে। সুজানগরে ডাক-বাঙ্‌লা আছে। সুজানগর ও সাতবাড়িয়ায় বর্ষায় জোলা পারাপার জন্য খেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। ভাটপাড়ার পর রাইপুর হইতে বর্ষায় এই রাস্তায় চলাচলে অসুবিধা। এই রাস্তা নবাবী আমলে রাজশাহী রোডের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া পদ্মার ধারে ধারে রামপুরবোয়ালিয়া হইতে পাবনা দোগাছি আদি স্থান দিয়া ঢাকা অভিমুখে বিস্তৃত ছিল।

ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তাসমূহের তালিকা ঃ

ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের অধীনে বর্তমান সময়ে যে ৭২টি রাস্তা প্রদর্শিত হয়, তন্মধ্যে ২/৩টি নদীতে ভাঙিয়া গিয়াছে এবং কয়েকটি এমন রাস্তা আছে যাহা একত্রে একই রাস্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারে ; তজ্জন্য উক্ত তালিকা হইতে নিম্নলিখিত ভাবে জেলাবোর্ডের রাস্তাগুলির বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। রাস্তার এই নীরস তালিকা পাঠে বিরক্তিকর বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু জেলার মফঃস্বলবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট বার্ষিক গড়ে প্রায় ৶৹ আনা পরিমাণ যে পথকরাদি আদায় হয়, তাহাতে দেখা যায় কেবলমাত্র এই সমস্ত রাস্তার বার্ষিক উন্নতি ও মেরামতাদিতে প্রায় গড়ে ৭০ হইতে ৭৫ হাজার পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়, তজ্জন্য ইহাদের বিবরণ একেবারে অবহেলাযোগ্য নহে।

(ক) পাকা-বাঁধা রাস্তা

নং	রাস্তার নাম				দৈর্ঘ্য (মাইল)		
					পাকা	সড়ক	ট্র্যাক
১)	পাবনা সাঁড়া রোড	পাবনা	হইতে	সাঁড়া	...	...	...
	পাবনা—ঈশ্বরদি	...	...	...	১৭	...	...
	ঈশ্বরদি—সাঁড়া	...	...	...	...	২	...
২)	নূতন পাবনা সিরাজগঞ্জ রোড ভায়া বেড়া	...	...	...	...	...	...
	(ক) পাবনা বিভাগ	ঐ	”	বেড়া	৫	২১৷৹	...
	(খ) সিরাজগঞ্জ বিভাগ	মিরপুর	”	ঐ	২	...	২৭
৩)	পাবনা দোগাছি রোড	পাবনা	”	দোগাছি	৩৷৷৹	...	...
৪)	বাজিতপুর রোড	ঐ	”	বাজিতপুর	১৷৷৹	...	...
৫)	পাবনা পার্শ্বডাঙা রোড ভায়া মালঞ্চি ইদিলপুর	ঐ	”	চাটমোহর	২৷৹	১৷৹	১৬
৬)	সিরাজগঞ্জ কোল বন্দর	সিরাজগঞ্জ	”	কোলবন্দর	১৷৷৹	১৷৷৹	...
৭)	গয়েশপুর রোড	দুবকোলা	”	একদন্ত	১	৩৷৷৹	...
৮)	ক্রশ রোড	আরিপপুর	”	মহেন্দ্রপুর	৷৷৹	...	...
৯)	রাণীগাঁও রাণীহাট রোড ভায়া চাটমোহর, তাড়াস						
	(ক) পাবনা বিভাগ	রাণীগাঁও	”	বাঘলবার	১৷৷৹	১০৸৹	১০৷৸৹
	(খ) সিরাজগঞ্জ বিভাগ	বাঘলবার	”	রাণীগাঁও	...	...	১৬৷৷৹
১০)	পুরাতন পাবনা-সিরাজগঞ্জ রোড ভায়া শাহজাদপুর ও উল্লাপাড়া						
	(ক) সিরাজগঞ্জ বিভাগ	রাইপুর	”	রাউতাড়া	...	১৩৷৹	১৪৷৷৹
	(খ) পাবনা বিভাগ	রাউতাড়া	”	আতাইকুলা	...	১২৸	...
১১)	বেলকুচি নাকালিয়া রোড	বেলকুচি	”	নাকালিয়া	...	...	২৭

(খ) কাঁচা-বাঁধা সড়ক

(পাবনা সদর)

নং	রাস্তার নাম				দৈর্ঘ্য (মাইল) বাঁধা	ট্র্যাক	মোট
১)	পাবনা মথুরা রোড ভায়া তাঁতিবন্দ	পাবনা খরগুতি	হইতে	মথুরা	১৬৸	১১৸	২৮৷৷৹
২)	সুজানগর নাজিরগঞ্জ রোড ভায়া সাতবাড়িয়া	খালিসপুর	”	নাজিরগঞ্জ	৯	৭	১৬
৩)	দুলাই সাঁথিয়া রোড	দুলাই	”	সাঁথিয়া	৮	...	৮
৪)	রাজশাহী রোড	অরণকোলা	”	আরামবাড়িয়া	৫৸	...	৫৸৹
৫)	দাশুরিয়া রাজাপুর রোড	দাশুরিয়া	”	রাজাপুর	৪৷৷৹	...	৪৷৷৹
৬)	মধুপুর মুন্সিদপুর রোড	মধুপুর	”	মুন্সিদপুর	৪৷৷৹	...	৪৷৷৹
৭)	দোগাছি ভাউডাঙা রোড	দোগাছি	”	ভাউডাঙা	৩৸৹	...	৪৸৹
৮)	চাটমোহর হরিপুর রোড	চাটমোহর	”	হরিপুর	৩	...	৩
৯)	দোগাছি নলধা রোড	দোগাছি	”	নলধা	২	...	২
১০)	দাশুরিয়া চাঁদভা রোড	দাশুরিয়া	”	চাঁদভা	২	৭	৯

(সিরাজগঞ্জ মহকুমা)

নং	রাস্তার নাম				বাঁধা	ট্র্যাক	মোট
১১)	নূতন সিরাজগঞ্জ-বগুড়া রোড ভায়া নলকা	সিরাজগঞ্জ মাসিমপুর	”	সিমলা চান্দাইকোণা	১৮৷৷৹	...	১৮৷৷
১২)	পুরাতন সিরাজগঞ্জ-বগুড়া রোড ভায়া ধানঘড়া	সিরাজগঞ্জ	”	চান্দাইকোণা	১৪৷৷৹	...	১৪৷৷
১৩)	সিরাজগঞ্জ শাহজাদপুর রোড ভায়া নরনিয়া	সিরাজগঞ্জ মিরপুর	”	শাহজাদপুর	৭	১৪	২১
১৪)	সিরাজগঞ্জ কাজিপুর রোড ভায়া সুগগাছা	সিরাজগঞ্জ	”	কাজিপুর	২৷৹	১৪৷৹	১৬৷৷

(গ) ট্র্যাক বা সাধারণ পথ

(পাবনা সদর)

নং	রাস্তার নাম				দৈর্ঘ্য (মাইল)
১)	বেড়া চাটমোহর ভায়া ফরিদপুর	বেড়া	হইতে	চাটমোহর	২৭
২)	নাজিরগঞ্জ মথুরা ভায়া রতনগঞ্জ	নাজিরগঞ্জ		মথুরা	১৪
৩)	পুরাতন পাবনা সাঁড়া ভায়া সিলিমপুর	পাবনা		সাঁড়া, রূপপুর	১২
৪)	বেড়া কাশীনাথপুর	বেড়া		কাশীনাথপুর	১০
৫)	দুলাই নাজিরগঞ্জ	দুলাই		নাজিরগঞ্জ	১০
৬)	চাটমোহর সর্টকাট ভায়া সিঙা ভবানীপুর	সিঙা		ভবানীপুর	১০
৭)	বেড়া মথুরা ভায়া নাকালিয়া	পায়না		মথুরা	৯
৮)	দাশুরিয়া দাদাপুর ভায়া পাকুরিয়া	দাশুরিয়া		দাদাপুর	৮
৯)	মাদপুর চিনাখরা	মাদপুর		চিনাখরা	৬৷৷৹
১০)	আতাইকুলা তাঁতিবন্দ	আতাইকুলা		তাঁতিবন্দ	৫

নং	রাস্তার নাম				দৈর্ঘ্য (মাইল)
১১)	কুঁচিয়ামোরা লক্ষ্মীপুর	কুঁচিয়ামোরা	হইতে	লক্ষ্মীপুর	৫
১২)	সিলিমপুর জোতগজী	সিলিমপুর	”	জোতগজী	৪
১৩)	সেখপাড়া নাদুরিয়া	সেখপাড়া	”	নাদুরিয়া	৩
১৪)	তাঁতিবন্দ সুজানগর	তাঁতিবন্দ	”	সুজানগর	২
১৫)	খরবাড়ি চাটমোহর	খরবাড়ি	”	চাটমোহর	১।৹

(সিরাজগঞ্জ মহকুমা)

১)	সিরাজগঞ্জ সোনামুখী	সিরাজগঞ্জ	”	সোনামুখী	১৭
২)	উল্লাপাড়া তাড়াস	উল্লাপাড়া	”	তাড়াস	১৬
৩)	নলকা তাড়াস ভায়া কুমরুল, সলঙ্গা	নলকা	”	তাড়াস	১৬
৪)	রাইগঞ্জ তাড়াস	ধানঘরা	”	ঐ	১৩॥৹
৫)	উল্লাপাড়া রায়গঞ্জ ভায়া সাহেবগঞ্জ	রায়গঞ্জ	”	উল্লাপাড়া	১৩
৬)	উল্লাপাড়া মৌপুর ভায়া মৌপুর	উল্লাপাড়া	”	বেলকুচি	১৩
৭)	সিমলা রাণীহাট	সিমলা	”	রাণীহাট	১২
৮)	সিরাজগঞ্জ সলপ ভায়া কামারখন্দ	আলকদিয়া	”	সলপ	১২
৯)	চৌহালি শাহজাদপুর ভায়া স্থল, কৈজুরি	চৌহালী	”	শাহজাদপুর	১১।৹
১০)	বেতিল শাহজাদপুর	বেতিলহাট	”	শাহজাদপুর	৮
১১)	ব্রহ্মগাছা বাগবাটি	ব্রহ্মগাছা	”	বাগবাটি	৭॥৹
১২)	উল্লাপাড়া শুকলহাট	শুকলহাট	”	উল্লাপাড়া	৭
১৩)	সলঙ্গা গয়হাটা	সলঙ্গা	”	গয়হাটা	৬৸৹
১৪)	ভবানীপুর নিমগাছি	ভবানীপুর	”	নিমগাছি	৬॥৹
১৫)	চালুহারা কৈজুরি	চালুহারা	”	কৈজুরি	৬
১৬)	গাড়াদহ শুকলহাট	গাড়াদহ	”	শুকলহাট	৬
১৭)	পোরাবাড়ি মৌপুর	পোরাবাড়ি	”	মৌপুর	৬
১৮)	কৈজুরি শম্ভুদিয়া ভায়া সোনাতলা	কৈজুরি	”	শম্ভুদিয়া	৬
১৯)	কাজিপুর সোনামুখী	কাজিপুর	”	সোনামুখী	৫
২০)	ভবানীপুর রোড	চান্দাইকোণা	”	ভবানীপুর	৪॥৹
২১)	নিমগাছি লক্ষ্মীপুর	নিমগাছি	”	লক্ষ্মীপুর	৩
২২)	বৈকুণ্ঠপুর রায়গঞ্জ	বৈকুণ্ঠপুর	”	রায়গঞ্জ	৪
২৩)	পাঙাসি বাগবাটি	পাঙাসি	”	বাগবাটি	৩॥৹
২৪)	নাগডেমরা শাহজাদপুর ক্রশ ট্র্যাক	নাগডেমরা	”	শাহজাদপুর	৩।৹
২৫)	পোরজনা শাহজাদপুর	শাহজাদপুর	”	পোরজনা	৩
২৬)	হরিপুর চাকুলি	হরিপুর	”	চাকুলি	১

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এই জেলায় মোট ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা ডাক সেস্ আদায় হইয়াছিল জানা যায়। ঐ বৎসর এই জেলার রাস্তাদি নির্মাণ ও মেরামত আদি কার্যে ২০৫০০৲ বিশ হাজার পাঁচশত টাকা খরচ হইয়াছিল। পূর্বপেক্ষা যেমন জেলাবোর্ডের আয়ও বৃদ্ধি হইয়াছে, তদ্রূপ খরচের পরিমাণও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাবনা ও সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি ব্যতীত জেলাবোর্ডের এলাকার মোট লোকসংখ্যা প্রায় ১৩৪৪৫৬৩ জন

ধরা হয় তাহাতে দেখা যায় গড়ে বার্ষিক জন প্রতি প্রায় ৴১৫ হইতে ৵৹ রোড সেসাদি বাবদ আদায় হয়। কেবলমাত্র রাস্তা নির্মাণ এবং তাহার বার্ষিক উন্নতি ও সংরক্ষণ কার্যে মাইল প্রতি প্রায় ৪৫ টাকা পরিমাণ ব্যয়িত হয়। রোড সেস্‌, খেওয়া ঘাট, খোয়ারাদিতে যত টাকা আদায় হয়, তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ২১।৷৹ টাকা কেবলমাত্র রাস্তার বার্ষিক উন্নতি ও মেরামত আদি কার্য বাবদ খরচ হয়। বর্তমান সময়ে রাস্তাগুলির বাবদ জমা-খরচাদির বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত জন্য খরচ এবং ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের আয় ব্যয়ের জমা খরচ ঃ

মোট আয়	১৯২১	১৯২২
১) পথকর ও পাবলিক ওয়ার্কস সেস ও তাহার সুদ আদায়	১৫৫০৫১	১৬৮১০০
২) গভর্নমেন্ট হইতে রাস্তাদি নির্মাণ ও তাহা মেরামত জন্য প্রাপ্ত	*২৫৮৭৩	২১১২১
* ইহার মধ্যে চিকিৎসা বাবদ প্রাপ্ত সাহায্য প্রায় দুই হাজারের উপর।		
৩) খেওয়া ঘাটের আয়	১০৯৬৫	১৩৩৯৭
৪) খোয়াড়ের আয়	১০৩৪২	৯৮৬৫
৫) শিক্ষা ও চিকিৎসাদি বাবদ গভর্নমেন্ট হইতে প্রাপ্ত এবং	২০২২৩১	২১২৪৯০
বিবিধ প্রকার আয়	৫৮৬১৬	৫৫৫২০
	২৬০৮৪৭	২৬৮০১০

মোট ব্যয়	১৯২১	১৯২২
১) সিভিল ও পাবলিক ওয়ার্কস *		
* রাস্তাদি নির্মাণ ও কূপ-ইন্দারা আদি খনন ও মেরামত ব্যয়।		
(ক) যাতায়াতের উন্নতি মায় সরকারি ডাক-বাঙ্‌লা নির্মাণ	২৮১৬৫	১০৪৫৪
(খ) ঐ মেরামত ব্যয়	৪১১২২	৩৫২৫৮
(গ) রাস্তায় গাছ লাগান ব্যয়	৩৭৭	২২৮
(ঘ) কুপ ইন্দারাদি নির্মাণ ব্যয়	১৩২৭০	৭২৪৪
(ঙ) ঐ মেরামত ব্যয়	২৮১৩	২০৬৮
(চ) সিভিল বিল্ডিং নূতন (অফিস, স্কুল, হাসপাতাল গৃহাদি নির্মাণ)	১১১৭৭	৯৪৫৬
(ছ) ঐ মেরামত ব্যয়	৩৯৯৭	৩৫৬৩
(জ) ইঞ্জিনিয়ারগণের মাহিনাদি ও তাঁহাদের আফিস খরচ	১৯৭৪৯	২২৪৫৮
	১২০৬৭০	৯০৭২৯
২) কুষ্টিয়া ও পাকসি হইতে পাবনায় স্টিমার চলাচল জন্য স্টিমার কোম্পানিকে বার্ষিক দেয়	৫০০০	৫০০০
৩) সর্বপ্রকার শিক্ষা বাবদ ব্যয়	১০১৬৫৯	৮৭৬৬৫
৪) চিকিৎসা বাবদ ব্যয়	২৯২৫১	২৯৬৩০
৫) বিবিধ প্রকার ব্যয় মায় ডিঃ বোর্ড অফিস খরচ ও মেম্বারগণের পাথেয়াদি	২৬৬৩৩	৩০৪০২
	২৮৩২১৩	২৪৫৪২৬

ডাক-বাঙ্‌লা মোট এই জেলায় ১৮টি দেখা যায়। ইহা.দর মধ্যে কয়েকটি পাকা

ইস্টকগৃহ, কয়েকটি মাত্র টিনের ঘর। পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জের দুইটি ব্যতীত সমস্ত ডাক-বাঙ্‌লাগুলিই ইনস্পেকসন বাঙ্‌লা নামে পরিচিত। যাতায়াতে ঝড় বৃষ্টি শীতাতপ নিবারণ জন্য বৃক্ষতলে আশ্রয় স্থল ব্যতীত, ডাক-বাঙ্‌লা দ্বারা সর্বসাধারণের বিশেষ কোন উপকার হয় না। দেশের জনসাধারণের সুবিধার্থে যেমন স্থানে স্থানে কূপ ইন্দারাদি খনিত হয়, তদ্রূপ রাস্তার ধারে মধ্যে মধ্যে পান্থশালা ও তৎপার্শ্বে কূপাদি খনিত থাকিলে, সর্বসাধারণের অনেক উপকার হয়। নচেৎ ডাকবাঙ্‌লা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ধনী ভদ্রলোকের অবস্থান কিংবা সরকারি কর্মচারিবৃন্দের সাময়িক মফঃস্বল পরিদর্শন কার্যের জন্য প্রকৃতই ইন্‌স্পেকশন বাঙ্‌লা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তদ্বাবদ বার্ষিক উন্নতি ও মেরামতাদি কার্যে যে টাকা ব্যয় হয়, তদ্বারা জন সাধারণের বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয় বলিয়া বোধ হয় না।

গতায়াতের পথ পার্শ্বে সর্বপ্রকারের পাবনা সদরে ৮৯টি ও সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ১৩৬টি মোট ২২৫টি পাকা ইন্দারা, পাবনা সদরে ২৩টি, সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ১৫টি মোট ৩৮টি কূপ এবং পাবনা সদরে ১৭টি ও সিরাজগঞ্জে ২টি পুষ্করিণী বর্তমান আছে। যাতায়াতের রাস্তার উন্নতির ন্যায় এই সকল কূপ ইন্দারাদিও বৃদ্ধি হওয়া একান্ত আবশ্যক। বর্ষার ৩/৪ মাস ব্যতীত যাতায়াতের পথ পার্শ্বে জলের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়।

৬. রেলপথ

পূর্ববঙ্গীয় রেলপথের শিলিগুড়ি লাইনের দক্ষিণাংশ এবং সাঁড়া সিরাজগঞ্জ লাইন পাবনা জেলার মধ্যে বিস্তৃত আছে। প্রথম লাইন পদ্মা তীরে পাকসিয়া হইতে ঈশ্বরদি জংশন দিয়া রাজশাহী জেলার গোপালপুর স্টেশন পর্যন্ত মাত্র ১০ মাইলব্যাপী। পূর্বে সাড়াঘাট স্টেশন হইতে গোপালপুর স্টেশন পর্যন্ত এই লাইনের অংশ পাবনা জেলা মধ্যে ছিল, ১৯১৫ সালের মার্চ হইতে পাকসিয়া দিয়া এই লাইনের গাড়ি যাতায়াত করিতেছে।

১৯১৫/১৬ খ্রিস্টাব্দে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ খুলিবার পর হইতে সাঁড়া সিরাজগঞ্জ লাইন নির্মিত হইয়াছে। ঈশ্বরদি জংশন হইতে সিরাজগঞ্জঘাট পর্যন্ত এই লাইন বিস্তৃত। কলকাতা হইতে পাকসি স্টেশন ১৩৮ মাইল দূর ; তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ২৷৷১৫, ঈশ্বরদি জংশন পাকসি হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। কলকাতা হইতে সাঁড়া-সিরাজগঞ্জ লাইনের স্টেশনসমূহের ভাড়া হিসাবে দূরত্ব ও ভাড়া নিম্নে দেওয়া গেল। সম্প্রতি এই লাইনের ধানবিলা, মহিষাখোলা প্রভৃতি কয়েকটি ছোট স্টেশন উঠিয়া গিয়াছে।

কলিকাতা হইতে দূরত্ব ও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার পরিমাণ

দূরত্ব (মাঃ)	স্টেশন	ভাড়া	দূরত্ব (মাঃ)	স্টেশন	ভাড়া
১৪৩	ঈশ্বরদি জং	২৷৷৶৫	১৭৭	মহিষাখোলা	৩৷৴১০
১৫১	মুলাডুলি	২৸৴৹	১৭৯	উল্লাপাড়া	৩৷৶৫
১৫৬	ধানবিলা	২৸৶৹১০	১৮২	সলপ	৩৷৶৹৫
১৫৯	চাটমোহর	২৸৶৹১০	১৮৭	জামতৈল	৩৷৷৴০
১৬২	গুয়াখরা	৩৷১০	১৯০	কালিয়াহরিপুর	৩৷৷৶৹০
১৬৫	তাঙ্গুরিয়া	৩৴১০	১৯৩	সিরাজগঞ্জ	৩৷৷৶৹০
১৬৮	শরৎনগর	৩৶১০	১৯৪	ঐ বাজার	৩৷৷৶৹৫
১৭১	দিলপসার	৩৶৹১০	১৯৬	ঐ কোর্ট	৩৸০
১৭৪	লাহিড়ী মোহনপুর	৩৷১০	১৯৭	ঐ ঘাট	৩৸৫

মোটের উপর এই লাইন জেলা মধ্যে ৫৪ মাইল পথ বিস্তৃত। সাঁড়া ব্রিজ নির্মিত হইবার পূর্বে পদ্মার উত্তর পারের লাইন মিটারগেজ ছিল, ১৯১৫ সালের ৪ মার্চের পর পাকসি হইতে ব্রডগেজ লাইন খোলা হইয়াছে।

উপরোক্ত লাইনদ্বয় ব্যতীত এই জেলা মধ্যে অন্য কোন রেলপথ নাই। ঈশ্বরদি হইতে বেড়া হইয়া সাধুগঞ্জ পর্যন্ত আর একটি লাইন খুলিবার প্রস্তাব হইয়া তাহার জরিপ কার্যও শেষ হইয়াছে। ১৯১৪ অব্দ হইতে ইউরোপের সামরিক ব্যয় বাহুল্য হেতু ও নানা কারণে উক্ত প্রস্তাবিত রেল লাইনের আর কোন কার্য হয় নাই। জেলার অনেক স্থান নিম্নভূমি ; বিলময় প্রদেশে উচ্চ মৃত্তিকা বাঁধা রাস্তায় উপযুক্ত পরিমাণ সেতু নির্মাণ ব্যয়সাধ্য, অথচ তাহা না হইলে বর্ষায় জল নিকাশের ব্যাঘাত ঘটে, সময় সময় অনেক শস্যাদি নষ্ট হয়। ১৩২৯ সালের জলপ্লাবনে পাবনা জেলায় যে শস্য হানি হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল লাইনে এখনও স্থান স্থানে ব্রিজের অভাব আছে।

চ. হালট ও জাঙ্গালাদি ঃ

সাধারণত এ দেশের রাস্তা রাজপথ বা পথ নামে খ্যাত ; পল্লীগ্রামের অধিবাসিগণ দশজনে মিলিয়া বা জমিদার সহায়তায় তাহাদের নিজ নিজ গমনাগমনের সুবিধার জন্য অথবা গো মহিষাদির চলাচল নিমিত্ত যে সকল রাস্তা প্রস্তুত করে, তাহা সচরাচর হালট বা "ডহর" নামে খ্যাত হয়। ঈদৃশ হালটগুলি কখন কখন প্রস্তুতকারীর নামেও পরিচিত হয়। বাগ কাশীনাথপুরের নিকট একটি হালট "রাণীর হালট" নামে অভিহিত হইতেছে। প্রবাদ নাটোরের সুপ্রসিদ্ধা রাণী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরী যখন সিন্দুরীর নিকবর্তী নয়াবাড়িতে কিয়দ্দিন অবস্থান করেন, তখন এই হালট নির্মিত হইয়াছিল, তজ্জন্য ইহা রাণীর হালট বা তারাসুন্দরীর হালট উভয় নামেই পরিচিত হইয়া থাকে। সাঁথিয়া থানার অধীন আপ্‌রা গ্রামের নিকট একটি হালট "ঘোড়া বাঁধার" হালট নামে পরিচিত। প্রবাদ সুলেমান কেরাণী যখন ছাতকের রাজা দেবী দাসের পুত্রগণের অত্যাচার নিবারণার্থ ছাতক আক্রমণ করেন, তখন এখানে মুসলমান সৈন্যগণের ঘোড়া বাঁধা হইত। সেজন্য ইহা তদবধি "ঘোড়াবাঁধার হালট" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

গ্রাম্য হালট সমূহের অধিকাংশ ডহর নামে পরিচিত ; ইহা বর্তমান সময়ের ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তাসমূহের ন্যায় গ্রামের মাতব্বর লোকের পরামর্শে নির্মিত। ইহা দ্বারা গ্রামের গাড়ি গো মহিষাদি চলাচল করে। গ্রীষ্মে যেমন যাতায়াতের সুবিধা, তেমনি বর্ষায়ও এই সকল গ্রাম হালট বা ডহরসমূহ জলপ্লাবিত হইলে, তদুপরি নৌকাদি অবাধে যাতায়াত করিতে পারে ; তখন কোন কোন গ্রামের মধ্যে এই সকল হালট বা ডহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোলা বা খালের কাজ করে। জেলার মধ্যে অনেক গ্রামেই ঈদৃশ বহু হালট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল হালট শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতেই লোকের যাতায়াতে সুবিধাজনক। তবে নৌকাবিহীন গরিব দুঃখীর পক্ষে ইহাতে বর্ষার চলাচল অতীব কষ্টকর। তদ্ব্যতীত বর্ষায় জলপ্লাবিত হইলেও গ্রাম্য হালটের কথঞ্চিৎ উপকারিতা আছে।

জাঙ্গাল সাধারণত সেতু, বাঁধ, আলি প্রভৃতি অর্থে প্রযোজ্য। অনেক সময় ইহা রাস্তা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। পাবনা জেলা মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রাচীন জাঙ্গালের পরিচয় জানা যায়।

১. **ভীমের জাঙ্গাল**—সিরাজগঞ্জের পশ্চিমোত্তর সীমা হইতে ক্রমশ উত্তরাভিমুখে বগুড়া জেলার সেরপুর পর্যন্ত যে একটি লোহিতবর্ণ মৃত্তিকা স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাধারণত "ভীমের জাঙ্গাল" নামে অভিহিত হয়। "গৌড়রাজমালার" লেখক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলেন, "রামচরিতে বর্ণিত আছে, ৩য় বিগ্রহপাল পরলোক গমন করিলে, ২য় মহীপাল সিংহাসন লাভ করিয়া দুষ্কর্মান্বিত হইয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠ শূরপালকে ও রামপালকে লৌহনিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন কৈবর্ত জাতীয় দিব্য বা দিব্বোক যুদ্ধে মহীপালকে নিহত করিয়া 'জনকভু' বা পাল রাজাগণের জন্মভূমি বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন এবং দিব্বোকের অনুজ রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীয় রাজপদে অধিরূঢ়

হইয়াছিলেন।" *গৌড় রাজমালা ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।* তিনি আরও বলেন, "ভীমের নাম এখনও জনশ্রুতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি রামপালের আক্রমণবেগ প্রতিহত করিবার আশয়ে বারেন্দ্র মণ্ডলের প্রান্তভাগের নানাস্থানে যে সকল মৃৎ প্রাকার রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও 'ভীমের ডাইঙ্গ', 'ভীমের জাঙ্গাল' নামে কথিত হইতেছে।" *গৌড় রাজমালা ভূমিকাংশ ။০ দ্রষ্টব্য।* প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, "উক্ত সুদৃঢ় ও বিশাল দুর্গ প্রাকার ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানই রামচরিত বর্ণিত "ভীমের ডমর" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ... ভীম কেবল নিজ রাজ্য সুরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না ; তাঁহার অধিকৃত বারেন্দ্রী রাজ্যের দক্ষিণ সীমা পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ হইতে রাজ্যের উত্তরসীমা ধুবড়ি পর্যন্ত যে এক সুবিস্তৃত জাঙ্গাল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি 'ভীমের জাঙ্গাল' নামেই পরিচিত।"[২] বগুড়ার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় ভ্যানডেন ব্রুকের মানচিত্রে অঙ্কিত পাবনা জেলার হাণ্ডিয়াল তাড়াসের মধ্য দিয়া ক্রমশ উত্তরাভিমুখে বগুড়া জেলার সেরপুর পর্যন্ত ও তদুত্তরে বিস্তৃত রাস্তাটিকেই ভীমের জাঙ্গালের অংশ বিশেষ অনুমান করিয়াছেন। *"বগুড়ার ইতিহাস", ১ম খণ্ড, ৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।* শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় ১৩১০ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'কায়স্থ পত্রিকায়' লিখিয়াছেন, "রাণী ভবানীর নির্মিত জাঙ্গালের ভগ্নাবশেষ রামরায়ের দীঘি হইতে রাণীরহাট ও ভবানীপুর প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। ঐ জাঙ্গালের স্থানে স্থানে ইস্টক নির্মিত সোপানাবলীযুক্ত পুষ্করিণী ও তীরে বিল্ববৃক্ষাদি পরিলক্ষিত হয়। অজ্ঞ লো.করা রাণী ভবানীর পবিত্র নাম বিস্মৃত হইয়া উহাকে "ভীমের জাঙ্গাল" কহে। চলন বিলের মধ্যে মসিন্দা নামক স্থান যে তিনটি উচ্চ টিপি আছে, তাহাও অজ্ঞ লোকের নিকট ভীমের উনন্ নামে পরিচিত। যাহা কিছু শক্তি সামর্থের পরিচায়ক তাহাই ভীমের কার্য।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট অনুমান হইতেছে যে, সিরাজগঞ্জের পশ্চিমোত্তরাংশ হইতে যে উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ "ভীমের জাঙ্গাল" নামে খ্যাত হয়, তাহাকে কেহ ২য় মহীপালের রাজত্ব সময়ের (১০৫৫/৫৬ খ্রিস্টাব্দ) কৈবর্ত নায়ক ভীম কর্তৃক নির্মিত মৃৎ প্রাকার, কেহ তাহাকে একটি প্রাচীন রাস্তার অংশ বিশেষ এবং কেহ তাহাকে রাণী ভবানীর জাঙ্গাল নামে নির্দেশ করিতেছেন।

২. বসন্ত রায়ের জাঙ্গাল—স্থলের নিকটবর্তী মালীপাড়া বাওইখোল' প্রভৃতি গ্রামের নিকট যে একটি প্রাচীন জাঙ্গালের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা রাজা বসন্ত রায়ের জাঙ্গাল নামে পরিচিত। বাওইখোলা গ্রামের নিকট বসন্তপুর মালীপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় ; এখানে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বসন্তপুরে রাজা বসন্ত রায় নামক জনৈক রাজার বসতি ছিল। তিনিই বাওইখোলা হইতে বসন্তপুর পর্যন্ত এই জাঙ্গাল নির্মাণ করিয়াছিলেন। বসন্ত রায় কে এবং কোন জাতীয় ছিলেন তাহার প্রমাণ নাই ; তবে প্রতাপাদিত্যের সময় তাঁহার পিতৃব্য জনৈক বসন্ত রায়ও রাজা বসন্ত রায় নামে পরিচিত হইতেন, তিনিই এই বসন্ত রায় কিনা তাহাও বিবেচ্য। সিরাজগঞ্জের উত্তরাংশেও রাজা বসন্ত রায়ের জনশ্রুতি শুনা যায়।

৩. গজেন্দ্র রায়ের জাঙ্গাল—সুজানগর পুলিশ স্টেশনের অধীন মানিকহাট হইতে হাটখালি পর্যন্ত প্রায় দুই মাইলের অধিক দূরব্যাপী একটি জাঙ্গালের চিহ্ন বর্তমান আছে। ইহা গজেন্দ্র রায়ের জাঙ্গাল নামে পরিচিত।

৪. মানসিংহের জাঙ্গাল—পাবনা সদর স্টেশনের অন্তর্গত মালিগাছা মনোহরপুর গ্রামের নিকট একটি উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ রাজা মানসিংহের জাঙ্গাল নামে পরিচিত হয়। প্রবাদ যখন তিনি নিকটবর্তী হিমাইতপুর গ্রামে ছাউনি ফেলিয়াছিলেন, তখন তিনি মনোহরপুর, মুরাপাড়া প্রভৃতি গ্রামে কিয়দ্দিন অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি এখানে কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা ও দীঘি পুষ্করিণী খনন এবং জাঙ্গালাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জলপথ

জেলার অধিকাংশ স্থল, বিশেষত পশ্চিমোত্তর ও পূর্বাংশের অনেক স্থান বিলময় অথবা নিম্নভূমি। বর্ষার প্রারম্ভে আষাঢ় মাসের প্রথমেই জেলার অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হইতে থাকে এবং প্রায় কার্তিক মাস, স্থল বিশেষে অগ্রহায়ণ মাস অবধিও জল থাকে ; নদী বিল খাল পভৃতি জলপূর্ণ হইলে, তদ্দারা নৌকা পথে গমনাগমন ও বাণিজ্যাদি কার্য অতি সুবিধাজনক। অতএব বর্ষায় নদী খাল বিলাদিতে জলপথে নৌকায় যাতায়াত সুগম। পদ্মা ও যমুনা প্রভৃতি বৃহৎ নদীতে বারমাস স্টিমার ও নৌকায় যাতায়াত চলে।

ক. স্টিমার পথ ঃ

পদ্মা নদীতে এই জেলার সাঁড়াঘাট, আধুনিক পাক্‌সি স্টিমার স্টেশন হইতে গোয়ালন্দ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান জেনারল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির (I. G. S. N.) পাটনা গোয়ালন্দ সার্ভিসের স্টিমার প্রতিদিন যাতায়াত করে। তবে ইহার সময়ের স্থিরতা নাই। কখন কখন দুই তিন দিন পর্যন্তও স্টিমার পাওয়া যায় না। পাক্‌সি হইতে গোয়ালন্দ পর্যন্ত ভাড়া হিসাবে দূরত্ব প্রায় ৮৪ মাইল ধরা হয় ; তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বর্তমানে ১৵৹ আনা, পাক্‌সি হইতে গোয়ালন্দ পর্যন্ত পদ্মাতীরে এই জেলায় পাবনা (বাজিতপুরঘাট) সাতবাড়িয়া উপেন্দ্রনগর প্রভৃতি কয়েকটি স্টিমার স্টেশন বর্তমান আছে।

পাবনা বাজিতপুরঘাট হইতে বর্তমানে একবেলা কুষ্টিয়া ও একবেলা পাক্‌সি পর্যন্ত স্টিমার যাতায়াত করে। উভয় স্থানের ভাড়া সাত আনা। মাঘ ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত গোরই নদী শুকাইয়া গেলে কুষ্টিয়ায় স্টিমার যাতায়াত বন্ধ হয়, তখন মাত্র পাক্‌সিতে স্টিমার চলাচল করে। এই স্টিমার লাইন দ্বারা পাবনা দুইটি রেলপথের সহিত সংযুক্ত আছে।

গোয়ালন্দ হইতে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত যমুনায় আসাম কালীগঞ্জ লাইনের স্টিমার দৈনিক নিয়মিত রূপে যাতায়াত করে। এই লাইনে এই জেলা মধ্যে নগরবাড়ি, নূতন ভারেঙ্গা, সাধুগঞ্জ, স্থলচর ও সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্টেশন আছে। গোয়ালন্দ হইতে ভাড়া হিসাবে এই জেলা মধ্যে এই লাইনের দূরত্ব প্রায় ৬২ মাইল ধরা হয়। গোয়ালন্দ হইতে সিরাজগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১।৶১০ আনা।

বর্তমান সাঁড়া সিরাজগঞ্জ লাইনের ভাঙ্গুরিয়া রেল স্টেশন হইতে সাধুগঞ্জ পর্যন্ত রবিবার ব্যতীত সপ্তাহে প্রতিদিন বরল নদীতে স্টিমার যাতায়াত করে। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১ টাকা। এই লাইনে ফরিদপুর, গোপালনগর, ডেমরা, রাউতারা, বেড়া প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান স্টেশন আছে। এই লাইন পৌষ মাঘ হইতে বৈশাখের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বন্ধ থাকে।

এতদ্ব্যতীত এই জেলায় আর কোন স্টিমার পথ নাই। চান্দাইকোণা হইতে ফুলঝোর হুরাসাগরাদি নদীতেও চেষ্টা করিলে স্টিমার চলাচল করিতে পারে।

খ. নৌকা পথ ঃ

বর্ষায় সর্বত্র নৌকা পথে যাতায়াত করা যায়। অন্য সময়ে পদ্মা, যমুনা, হুরাসাগর ও বরল প্রভৃতি কয়েকটি নদী ভিন্ন কুত্রাপি নৌকাপথে যাতায়াত সম্ভবপর নহে। বিলময় ভড় অঞ্চলের কিংবা নদী তীরস্থ লোকে বর্ষায় নৌকায় যাতায়াতে, নৌকাচালনে এবং এ দেশের সূত্রধরগণ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকার নৌকা নির্মাণে বিশেষ অভ্যস্ত। পল্লীবাসী ইতর ভদ্র সাধারণের আবালবৃদ্ধ সকলেই বাধ্য হইয়া অল্প বিস্তর নৌকা চালনে পারদর্শী হয়। উল্লাপাড়া থানার অধীনে চৌবিলা, পুঠিয়া প্রভৃতি হাটে ৫/৭ টাকা মূল্যের সাধারণ ডোঙা হইতে শতাধিক টাকা মূল্যের পানসি, ছিপ প্রভৃতি নানাপ্রকার নৌকা পাওয়া যায় ; দুই বা তিন জন পাইট (মজুর) বিশিষ্ট নৌকা দৈনিক বা মাসিক ভাড়ায় অধিকাংশ স্থানে পাওয়া যায় ; পাবনা সদর

অপেক্ষা সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ইহার প্রচলন বেশি। হিন্দু মুসলমান বহুলোকের নৌকা এই প্রকারে দৈনিক বা মাসিক ভাড়া খাটে। ভাড়া প্রায় পাইট প্রতি ।।৵০ হইতে ৬০ পর্যন্ত দিতে হয়।

সিরাজগঞ্জ ও পাবনা সদর হইতে মামলা মোকদ্দমাকারী লোকের যাতায়াতের সুবিধার্থে বর্ষায় কয়েক মাস গহনার নৌকা জেলার প্রধান প্রধান স্থানে সাময়িক যাতায়াত করে। বাণিজ্যাদি কার্যে মালপত্রাদি বহন জন্য প্রধান প্রধান বন্দর ও বাজারে মালবাহী ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকার নৌকা পাওয়া যায়।

এই জেলায় যাতায়াতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার নৌকার নাম ঃ

(১) **ছিপ**—সাধারণত ৩০/৪০ হাত লম্বা, ৩/৪ হাত চওড়া ; জালিকগণ মৎস্য শিকার উপলক্ষে বেড় জাল ফেলিবার সময় ব্যবহার করে। সচরাচর এক এক খানা নৌকায় ২০/২৫ জন মাল্লা থাকে। দ্রুতগমন পক্ষে সুবিধাজনক, সাধারণ গমনাগমনে ইহার কম ব্যবহার হয়।

(২) **পান্‌সি**—সর্বসাধারণের আরোহন জন্য গতায়াতে ব্যবহৃত হয়। ছোট বড় নানা জাতীয় ইহার প্রচলন সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আবরণযুক্ত, অনেক লোক বা অধিক পরিমাণ মাল বহনের উপযুক্ত হইলে ইহাকে "গের্‌দারী" পান্‌সি কহে। ২/৩ জন হইতে ৮/৯ জন পর্যন্ত মাল্লায় চালিত হয়।

(৩) **ছাঁদি, ভেদী ও জঙ্**—এই নৌকার সবগুলিই পান্‌সি অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু মধ্য স্থলে পান্‌সি অপেক্ষা অধিক বিস্তার বিশিষ্ট এবং ইহাদের গলই পান্‌সি অপেক্ষা খর্বাকার। প্রকার ভেদে ইহার মধ্যে কতকগুলি ছাঁদি কতকগুলি ভেদী ও কতকগুলি জঙ্ নামে অভিহিত হয়। সাধারণের যাতায়াত অপেক্ষা পণ্য দ্রব্যাদি বহনেই অধিক ব্যবহার হয়।

(৪) **বজরা**—এই জেলার পোতাজিয়ায় নৌকা বাইজ উপলক্ষে বিজয়া দশমীর দিন অনেক দেখা যায়। ইহাও পান্‌সি জাতীয়, তবে সাজ সরঞ্জাম ইহার বিশেষত্ব।

(৫) **ডেঙ্গী**—ইহা বড় ও ছোট নানাপ্রকার ; সর্বসাধারণের হাটে ঘাটে ও মাঠে যাতায়াতে ব্যবহার্য।

(৬) **ডোঙা**—জেলার পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে চলন বিলের মধ্যে স্থানে স্থানে তালগাছ খুঁড়িয়া এক প্রকার ডোঙা নৌকা তৈয়ার হয়, তাহাতে বিলময় প্রদেশের লোকের যাতায়াত চলে ; ইহাও নৌকার ন্যায় অধিক দিন স্থায়ী।

(৭) **কোশা**—কাঠ ও টিনের দ্বারা সচরাচর কোশার আকারে যাতায়াতের জন্য নির্মিত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোশা নৌকা নামে পরিচিত। ইহাও মফঃস্বলস্থ লোকে অনেক ব্যবহার করে ও স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়।

পান্‌সি প্রভৃতি নৌকার গোলই আদিতে পিতল নির্মিত চোখ মুখ প্রভৃতি দ্বারা নানাপ্রকারে সুদৃশ্য করা হয়, তজ্জন্য ঈদৃশ নৌকা গহনার নৌকা নামে খ্যাত হয়। ধনী ও জমিদার শ্রেণীর লোকে ঢাকা আদি ভিন্ন জেলা হইতে ব্যবহার জন্য আনীত বোট নামক নৌকায় যাতায়াত করেন।

ডাকবাঙ্‌লা ঃ

মফঃস্বলে যাতায়াতের সুবিধার্থে সাধারণের ও সরকারি কর্মচারীবৃন্দের অবস্থান জন্য ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের তত্ত্বাবধানে পাবনায় ১৩টি, সিরাজগঞ্জে ৫টি, মোট ১৮টি ডাঁক বাঙ্‌লা নির্মিত আছে। তন্মধ্যে * চিহ্নিতগুলি করগেট টিনের ঘর, অবশিষ্টগুলিপাকা দালান। ইহাতে দৈনিক এক টাকা হিসাবে ভাড়া দিলে ৩/৪ দিন মাত্র অবস্থানের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকটিতে পাকগৃহ, ভৃত্যগণের অবস্থানের জায়গা ও স্থানে স্থানে আস্তাবলও আছে।

পাবনা			সিরাজগঞ্জ
১) পাবনা	৬) ভাঙুরিয়া	১১) সাধুগঞ্জ *	১) সিরাজগঞ্জ
২) দাশুরিয়া	৭) ফরিদপুর *	১২) সুজানগর *	২) ধানঘড়া
৩) সাঁড়া	৮) আতাইকুলা	১৩) দুলাই	৩) উল্লাপাড়া
৪) ঈশ্বরদি	৯) সাঁথিয়া *		৪) সলঙ্গা
৫) চাটমোহর	১০) বেড়া		৫) স্থল

যান বাহনাদি ঃ

স্থলপথে যাতায়াতের সাধারণ যান মধ্যে (১) গরুর গাড়ি সর্বত্র ভাড়া পাওয়া যায়। পাবনা সদরে (২) মহিষের গাড়িও ভাড়া খাটে। যাতায়াত ও জিনিসপত্রাদি বহনে গো মহিষের গাড়ি উভয়ই ব্যবহৃত হয়। (৩) ঘোড়া গাড়ির মধ্যে পাবনা ও সিরাজগঞ্জে টম্‌টম্ ও পালকি উভয়বিধ গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। ইহাদের চালক অধিকাংশ পশ্চিম দেশিয় দোসাদ, দেশিয় মুসলমান অল্প। (৪) বাইসাইকেল অধুনা প্রায় সর্বত্র গমনাগমনে ব্যবহৃত হয়। পাবনা হইতে ঈশ্বরদি পর্যন্ত দৈনিক (৫) মোটরগাড়ি যাতায়াত করে। সাধারণ লোক দুইজনে বাহিত বাঁশের (৬) ডুলিতে এবং ধনী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক কাষ্ঠ নির্মিত, ৪, ৬ বা ৮ জন বেহারায় বাহিত (৭) পালকিতে যাতায়াত করেন। দেশিয় ও নদীয়া জেলার শিকারপুর অঞ্চলের মুসলমান ও পশ্চিম দেশিয় কুর্মি, কাহার প্রভৃতি জাতিগণ শহরে ও পল্লীর নানাস্থানে ডুলি পালকি বহনে কাজ করে। জলপথে নৌকা সর্বত্র জলযান, স্টিমার নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সেতু ও খেওয়া

ক. সেতু ঃ

যাতায়াতে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তাসমূহের মধ্যে ঈশ্বরদি রোড, বেড়া রোড প্রভৃতি রাস্তায় স্থানে স্থানে ইস্টক ও কাষ্ঠ নির্মিত ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি সেতু দেখিতে পাওয়া যায়। সিরাজগঞ্জ মহকুমায় জেলাবোর্ডের অনেক ভাল বাঁধা রাস্তা আছে, কিন্তু ঐ রাস্তাসমূহে বেশি পরিমাণ সেতু না থাকায় যাতায়াত অসুবিধাজনক। স্থানে স্থানে বাঁশের পুল দেওয়া হয়, তাহাতে লোকের সাময়িক যাতায়াত চলিলেও গাড়ি যাতায়াত বিশেষ কষ্টকর। সদর ও সিরাজগঞ্জের মফঃস্বলের রাস্তার যে সমস্ত স্থানে ভাঙা ও নিম্নস্থান আছে, তথায় গাড়ি পারাপার ও লোক চলাচলের সুবিধার জন্য আরও অনেকগুলি স্থায়ী সেতু নির্মাণ আবশ্যক। কেবলমাত্র অর্থাভাব ব্যতীত চেষ্টার অভাবেও অনেক সময় এই সমস্ত অভাব দূর ও নিরাকরণ হয় নাই বা হয় না।

সাঁড়া-সিরাজগঞ্জ রেল লাইন নির্মিত হইবার পর ভাঙুরিয়ায় বরল, মোহনপুর, উল্লাপাড়া প্রভৃতি স্টেশন সান্নিধ্যে ফুলজোড় আদি নদীর উপর রেলপথেও অনেকগুলি সেতু নির্মিত হইয়াছে। বিলময় নিম্নভূমিতে এই রেলপথে সেতুর অভাব প্রযুক্ত জেলার জল নিকাশের বাধা হইয়াছে বলিয়া অসুবিধা হইতেছে; কিন্তু যমুনা নদী ক্রমশ ভাঙিয়া পাবনা জেলার পূর্বাংশ অনেক উদরসাৎ করিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতেছে। যমুনার জল বর্ষা আরম্ভের প্রথমেই স্ফীত হয়; বরল আদি নদীর জল সহসা সরিতে দেয় না। তজ্জন্য এই রেলপথে

কেবলমাত্র সেতুর অভাবে জেলার জল নিকাশের অসুবিধা ও তন্নিমিত্ত শস্যনাশের একমাত্র কারণ বলা যায় না।

বর্তমানে জেলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেতু মধ্যে (১) হার্ডিঞ্জ ব্রিজ—সাঁড়া, (২) ইলিয়ট ব্রিজ—সিরাজগঞ্জ, (৩) ইমারসন্ ব্রিজ—পাবনা প্রধান। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১. হার্ডিঞ্জ ব্রিজ—সাঁড়া ঃ

ইহার বিস্তারিত বিবরণ গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং অফিস, কলকাতা হইতে ১৯২১ অব্দে প্রকাশিত "The Hardinge Bridge over the Lower Ganges at Sara, by R. R. Gales, F. C. H., M. Inst. C E" নামক পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে কেবলমাত্র ব্রিজ নির্মাণের বিবরণ ব্যতীত পূর্ববঙ্গীয় নদ নদী সংস্থানের ইতিহাস, ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকার অবস্থা, ব্যবসায় ও পণ্যদ্রব্যের আমদানি রপ্তানির বিবরণ, কুলি-মজুরের কার্যাদির পারিশ্রমিক ও অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বিশদরূপে বর্ণিত আছে। ব্রিজের স্থূল বিবরণ উক্ত পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইল। মাল-মসলা ও কলকবজাদি সম্বন্ধে ইহাতে অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বঙ্গানুবাদ সহজসাধ্য ও সম্ভবপর না হইলেও, এই ব্রিজ সম্বন্ধে যে দুইটি গান পরে প্রকাশিত হইল, তাহাতে দেখা যাইবে যে, এ দেশের সাধারণ লোকও কি প্রকারে কবিতাকারে দেশের এই বিরাট কার্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকের পক্ষে ব্রিজের বিস্তারিত বিবরণ জন্য উপরিউক্ত পুস্তক দ্রষ্টব্য।

সাধারণ—সাঁড়া হইতে প্রায় ৩/৪ মাইল দূরে পূর্বদক্ষিণ দিকে পাক্সি (পাক্সিয়া) নামক স্থানে অবস্থিত হইলেও, পাবনা ও নদীয়া জেলার মধ্যে বিস্তৃত পদ্মা নদীবক্ষে এই প্রসিদ্ধ সেতু সাধারণত লোয়ার গ্যাঞ্জেস ব্রিজ, সাঁড়া নাকে খ্যাত। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় কর্তৃক উন্মুক্ত হয়, তজ্জন্য ইহা হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নামে পরিচিত। এতদ্বারা পূর্ববঙ্গীয় রেলপথসমূহ সংযোজিত হইয়া পদ্মার দক্ষিণ পারে ব্রডগেজ লাইনের সহিত সংযোগ ঘটিয়াছে। সাঁড়া-সিরাজগঞ্জ লাইন নির্মিত হওয়ায় ইহার দ্বারা কলকাতার সহিত পূর্ববঙ্গীয় রেলপথসমূহেরও বিশেষ সম্মিলন এবং সান্তাহার ও তদুত্তরস্থ স্থানসমূহের ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শেষ মঞ্জুর হইবার প্রায় বিংশতি বৎসরাধিক কাল পূর্বে এই সেতু নির্মাণের প্রস্তাব আলোচিত ও বিবেচিত হইয়াছিল। সর্বপ্রথমে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গীয় স্টেট-রেলওয়ে কোম্পানি ইহার প্রস্তাব একটি কমিটি দ্বারা তদন্ত করেন এবং উক্ত কমিটি সেতু নির্মাণ সম্ভবপর বলিয়া রিপোর্ট দেন। ১৯০২ অব্দে F. J. E. Spring সাহেবের উপর সেতুর বিস্তারিত নকসা প্রস্তুতের ভার অর্পিত হয়। তখন ব্যবসায়ী হিসাবে ইহার স্থান নির্বাচন লইয়া তর্ক উপস্থিত হয়। সাধারণভাবে ইহার আলোচনার পর ১৯০৭ অব্দে একটি কমিটির উপর ব্রিজের স্থান নির্বাচনের ভার অর্পিত হয় এবং উক্ত কমিটি রায়টার নিকট সেতু নির্মাণ মনোনয়ন করেন, কিন্তু রায়টার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহপ্রযুক্ত ১৯০৮ অব্দে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কমিটির উপর পুনরায় ইহার ভার অর্পিত হয় ; উক্ত কমিটি গোদাগাড়ি, রায়টা, সাঁড়া, পাক্সি কয়েকটি স্থানের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনাপূর্বক সাঁড়ার নিকট হইতে প্রায় ৩/৪ মাইল দূরে পাক্সি নামক স্থানের মৃত্তিকায় স্থায়িত্ব বিবেচনায় ও অন্যান্য সুবিধা দৃষ্টে, Spring সাহেবের অনুমোদিত পাক্সিতেই ব্রিজ নির্মাণ পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

নদীর গতি পরিবর্তন, তীরভূমির অস্থায়িত্ব, বর্ষার প্রথমে ও শেষে নদীর জলের উত্থান ও পতন, পদ্মার দক্ষিণ পারে ব্রডগেজ ও উত্তর পারে মিটারগেজ লাইন এবং মালপত্রাদি নদী পারাপারের অসুবিধা নিবারণকল্পে সেতু নির্মাণ অবশেষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে।

তখন ১৯০৮ অব্দের শেষে সেক্রেটারি অব স্টেট সাহেব বাহাদুর সাঁড়া বা তন্নিকটবর্তী স্থানে সেতু নির্মাণ প্রস্তাব মঞ্জুর করতঃ R. R. Gales সাহেব মহোদয়কে ইহার চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত করেন। প্রথমে প্রস্তাব ছিল যে, সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাসের উপর ৩৩৷৷৹ ফিট উচ্চ সেতুর উপর একটি মাত্র লাইন তৈয়ার হইবে, কিন্তু ১৯০৯ অব্দের ১৭ অক্টোবরের ঝটিকাবর্তের পর সেতুর স্থায়িত্বের জন্য নদীর গতি পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা নিবন্ধন ও ব্যবসায়াদির বিস্তার হেতু, সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাসের চল্লিশ ফিট উচ্চে ডবল রেললাইন ও মানুষ চলাচলের জন্য পাঁচ ফিট বিস্তৃত রাস্তাসহ সেতু নির্মাণ স্থিরীকৃত হয়। ব্রিজের নিকট ব্যতীত রায়টা ও পাক্‌সির নিকটেও তীরবাঁধ দেওয়া সাব্যস্তে ব্রিজ নির্মিত হয়।

নির্মাণ কার্য—১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগ প্রাথমিক জরিপ, জমি গ্রহণ ও প্রস্তরাদি সংগ্রহে অতিবাহিত হয়। ... ১৯০৯/১০ অব্দে পাথরের জন্য পাহাড় খনন কার্য আরম্ভ হয়, ব্রিজের নিকট চলাচলের রাস্তাদি অফিস ও কর্মচারিগণের বাসস্থানাদি নির্মিত হয়। ...১৯১০/১১ অব্দে পাথর সংগ্রহ কার্য শেষ হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ তীরস্থ guide bank নির্মিত হয়। ...১৯১১/১২ অব্দে পাঁচটি কূপ নামান হয়। ...১৯১২/১৩ অব্দে সাতটি কূপ নামান হয় ; রায়টার নিকট তীর বাঁধ প্রায় শেষ হয়। একটির main span (প্রধান ফুকর বা ভাগ) এবং service girder নির্মিত হয়। ...১৯১৩/১৪ অব্দে অবশিষ্ট চারিটি কূপ নামান হয় ও সমুদয় piers (স্তম্ভ বা পায়া) শেষ হয়। এগারটি main span প্রধান ফুকর নির্মিত হয়। ...১৯১৪/১৫ অব্দে জমির উপরে piers বা স্তম্ভ ও তীর ভূমিস্থ স্তম্ভ বর্ষার মধ্যে শেষ হয়। ছয়টি জমির ফুকর ও অবশিষ্ট তিনটি main span ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হয়। ...১৯১৫ অব্দের ১ জানুয়ারি মধ্যে ডাউন মালগাড়ির লাইন খোলা হয়। যাত্রীগাড়ি খুলিবার এক সপ্তাহ পূর্বে ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপ মালগাড়ি লাইন খোলা হয়। সর্বশেষে ৪ মার্চ তারিখ লর্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব বাহাদুর কর্তৃক এই ব্রিজের উপর যাত্রী গাড়ি চলাচলের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

পরিমাণ—পনেরটি প্রধান ফুকরের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ৩৪৯ ফিট ১৷৷৹ ইঞ্চি এবং ব্রিজের উত্তর দক্ষিণ উভয় দিকে ৭৫ ফিট দৈর্ঘ্য ৩টি হিসাব ৬টি জমির উপরের ফুকর (land span) লইয়া সমুদয় ব্রিজের দৈর্ঘ্য পরিমাণ ৫৮৯৪ ফিট অর্থাৎ প্রায় সোয়া মাইল। ইহার উপর দুইটি ব্রডগেজ রেললাইন এবং পাঁচ ফিট বিস্তৃত একটি লোক চলাচলের রাস্তা আছে। ফুকরের Girders (বিম্ বা কড়ি) গুলি সর্বসমেত ৫২ ফিট উচ্চ। ইহা পেটিট ধরনের (Petit type) Girders নামে পরিচিত। প্রত্যেকটির ওজন ১২৫০ টন। বর্ষায় সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাসের ৪০ ফিট ও গ্রীষ্মে সর্বনিম্ন জলপাতের ৭১ ফিট উচ্চে সমুদয় ব্রিজটি অবস্থিত।

কূপ খনন ও স্তম্ভাদি নির্মাণ—কূপ খনন, তন্মধ্য হইতে পাথর ও ইস্টক নির্মিত এবং স্টিল দ্বারা প্রস্তুত স্তম্ভ, তদুপরি উত্তোলিত ও স্থাপিত লৌহ নির্মিত বিম (girders) আদি নির্মাণ সাতিশয় শিল্প ও স্থপতি বিদ্যার পরিচায়ক।

গ্রীষ্মে নদীর জল শুকাইয়া যত নিম্নে পতিত হয়, তাহার উপরিভাগের ১৫০ হইতে ১৬০ ফিট নিম্নে সেতুর স্তম্ভগুলির জন্য কূপ খনিত হইয়াছে। ব্রিজের এই কূপগুলি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীরতম খাত বিশিষ্ট। ৫০ ফিট বালির নিচে মাটির উপর স্তম্ভগুলি স্থাপিত। এইগুলি পাথর ও ইস্টক চূর্ণ দ্বারা নূতন প্রণালীতে প্রস্তুত ব্লক দ্বারা নির্মিত। ইহাদের মাথার ভার কমাইবার জন্য উপরিভাগ স্টিল নির্মিত। মোট ১৬টি প্রধান স্তম্ভের উপর ব্রিজটি অবস্থিত। ইহাতে সাকুল্যে ৪৭৮০০ টন ওজনের পাথরের এবং ৩১৬০ টন ওজনের স্টিলের কাজ আছে। প্রত্যেক স্তম্ভের এবং পাথরের নির্মিত অংশ ৫৫ ফিট দৈর্ঘ্য ও ২৯ ফিট প্রস্থ অর্ধবৃত্তাকার ও নদী তীরস্থ স্তম্ভগুলি (abutment piers) ৪৫৷৷৹ ফিট দৈর্ঘ্য ও ২৭৷৷৹ ফিট প্রস্থ আয়তক্ষেত্রাকার বিশিষ্ট। স্তম্ভের প্রস্তরভাগ ভাসমান মঞ্চ দ্বারা নির্মিত ও লৌহভাগ ১০ টন ডেরিকক্রেন দ্বারা সংস্থাপিত এবং সমস্তই pueumatic revetor দ্বারা পেরেক বদ্ধ। স্তম্ভের

উপর girders বা লৌহ বিমগুলি উত্তোলন ও স্থাপন অতি বিস্ময়কর ব্যাপার ও শিল্পচাতুর্যের পরিচায়ক। চরের উপরের ছয়টি girder (বিম) stage girder দ্বারা ও জলের উপরের নয়টি girder (বিম) stage girder দ্বারা উঠান হইয়াছে। পদ্মার দক্ষিণপার ভেড়ামারা স্টেশন হইতে উত্তরপার গোপালপুর স্টেশন পর্যন্ত ব্রিজ বাদে ইহার ১৫ মাইল পথ approach (ক্রম নিম্ন তীর-বাঁধ) নির্মিত হইয়াছে। ইহাতে ১৬,০০,০০০,০০০ ঘন ফুট মাটির কাজ আছে।

মাল মসলাদি—রাজমহলের নিকটবর্তী ১৩৪ মাইল দূরে ফুদ্‌কিপুর, লুপ লাইনের ২৩৪ মাইল দূর় পাকুড় ও হিমালয়ের পাদদেশস্থিত ২১৯ মাইল দূরে জয়ন্তি পাহাড় হইতে নদীর তীরবাঁধ, কনক্রীট প্রস্তুত ও লাইন নির্মাণ জন্য পাথর সংগৃহীত হয়। কুড়িগ্রাম, শিলিগুড়ি ও ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের খানিয়ান নামক স্থান হইতে বালি এবং সমুদয়ে ৩,৯০,০০,০০০ ঘন ফুট পাথর গড়ে ২০০ মাইলের অধিক দূর হইতে আনীত হইয়াছে। কূপ ও স্তম্ভাদির জন্য যথাক্রমে ২৪০০০ ও ১৬০০ ব্লক তৈয়ারি হয়। পায়া ও বিমের জন্য মোট ২৯৯০০০ টন পাথর ও ৩০০০০ টন স্টিলের কাজ হইয়াছে। ৫০০০ টন আমেরিকান পাইন কাঠ লৌহ বিম বসাইতে ও জেটিতে লাগিয়াছে।

কলকব্জা ও সরঞ্জামাদি—নদীর উপরের কার্য জন্য pontoons barges ও ভাসমান cranes ব্যবহৃত হয়। ২টি erection travellor, ২টি ১০ টন কপি, ২টি ২০ টন কপি, ৩টি ১০ টন ভাসমান কপি সাহায্যে কাজ হয়। ২ খানি পাডেল স্টিমার, ৩ খানি স্টিম লঞ্চ, ৩ খানি মোটর লঞ্চ, ৫০ খানি পন্টুন ও বারজেস ব্যবহৃত হয়। ২৪ খানি লোকোমোটিভ, ২৪ খানি ব্রেকভ্যান, ৮৩০ খানি ট্র্যাসেল, নিউম্যাটিক ও হাইড্রলিক রিভেটিং যন্ত্রাদি এই সেতু নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তি ও কলকব্জাদির কার্য পরিচালন জন্য দক্ষিণপার বাহিরচরে ও উত্তরতীরে পাক্‌সিতে দুইটি power হাউস নির্মিত হয়। প্রত্যেক তীরে ১১২৫ kilowatt আলো তৈয়ারি হয়।

মোটামুটি সেতু নির্মাণে খরচ হইয়াছে

১৫টি প্রধান ফুকর নির্মাণ ব্যয়		১,৮০,৬৪,৭৯৬্
জমির উপরের ফুকর নির্মাণ ব্যয়		৫,১৩,৮৪৯্
নদীর গতিরক্ষা ব্যয়		৯৪,০৮,৩৪৬্
	মোট	২,৭৯,৭৬,৯৯১্

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও নদীর গতি রক্ষার্থ খরচ

কার্যের নাম	পরিমাণ		বিতং ব্যয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১) প্রাথমিক ব্যয়	...		...	৮১,৯০১
২) সেতুর কার্য				
(ক) স্তম্ভ	...		...	৭৭,৮৫,৮০২
(১) বেড়	৫,৮৫৬	টন	১৬,০৫,৬৫৯	
(২) কূপ কাটা	৩৪,৬৬,৪২০	ঘন ফুট	২৯,৭১,৭৩২	
(৩) কূপ নামান	৫০,৫২,১১৬	”	৭,১০,২৯৭	
(৪) কূপ পূরণ	১৫,০১,৫৭৮	”	৩,৪৫,৭৫৭	
(৫) পাশ বাঁধা	১৪,৪৫,৪১২	”	৩,৫৫,৫৩৮	
(৬) পাথরের কাজ	৬,৭৩,৭৮৭	”	৭,০২,৪৬৬	
(৭) স্টিলের কাজ	৬,৭৩,৭৮৭	”	৭,০২,৪৬৬	
(৮) জমির ফুকর	..		১,৬৭,৬১২	

কার্যের নাম	পরিমাণ		বিতং ব্যয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
(খ) Girders (বিম)	...		...	৭১,৮১,৫৫৯
(১) প্রধান বিম	১৮,৭৫০	টন	৬৯,৩৮,০৮৫	
(২) জমির ফুকর	৭৯৭	টন	২,৪৩,৪৭৪	
(গ) Trainign work (নদীর গতিরক্ষা)	...		...	৭৫,৯১,০৭০
(ঘ) Service work কাজের জন্য রাস্তাদি	...		...	২১,৬৭,০৯০
৩) কল কব্জাদি	...		...	১০,৯০,৬৭৮
৪) সাধারণ ব্যয়াদি	...		...	২৪,৬৪,৩৪০
				২,৮৩,৭২,৪৪০
বাদ মূলধন মধ্যে প্রাপ্ত	...		...	৩,৯৫,৪৪৯
				২,৭৯,৭৬,৯৯১

সমুদয় কার্যের ব্যয়

কার্যের নাম	সেতু	তীরবাঁধ (approaches)	মোট (টাকা)
১) প্রাথমিক ব্যয়	৮১৯০১	...	৮১,৯০১
২) জমির মূল্য	...	৯,৪৯,১৯৮	৯,৪৯,১৯৮
৩) বাঁধের ব্যয়	...	২৯,৯৩,১৫৪	২৯,৯৩,১৫৪
৪) সেতুর কার্য	২,৪৭,৩৫,৫২১	১,৫৩,৩৬৬	২,৪৮,৮৮,৮৭,৫৭
৫) বেড়া নির্মাণ	...	২,০৩,৮৮০	২,০৩,৮৮০
৬) প্রস্তরাদি ও স্থায়ী পথ	...	১৭,১১,৪৯০	১৭,১১,৪৯০
৭) স্টেশন ও গৃহাদি	...	৩,৩৯,৪১০	৩,৩৯,৪১০
৮) কলকব্জা	১০৯০,৬৭৮	১,১৫,০৭৫	১২,০৫,৭৫৩
৯) সাধারণ খরচাদি	২৪,৬৪,৩৪০	৮,২১,৪৪৬	৩২,৮৫,৭৮৬
মোট	২,৮৩,৭২,৪৪০	৭২,৮৬,৯৮৯৩	৩,৫৬,৫৯,৪২৯
বাদ মূলধন মধ্যে প্রাপ্ত	—৩,৯৫,৪৪৯	—১,৩১,৮১৬	—৫,২৭২৬৫
	২,৭৯,৭৬,৯৯১	৭১,৫৫,১৭৩	৩,৫১,৩২,১৬৪

১। পদ্মা নদীর পুলের গান
বাউলের সুর, তাল কাওয়ালি।

পদ্মা নদী বিষম নদী বাঙ্গালাতে এ পর্যন্ত কেউ পারে নাই বাঁধিতে।
(সম্প্রতি) মিস্টার গেল্ বাহাদুর আচ্ছা কারিকর,
পদ্মা বেঁধেছে দিয়া লৌহ আর প্রস্তর,
সে ত আজ্‌গবি তামাসা রে ভাই দেখ গে পাব্‌শিয়ার ঐ ঘাটেতে
কয়টা পাহাড়ের পাথর করেছে জড়,
কলের দ্বারায় পাথর ভেঙ্গে ক'রতেছে গুড়,
আবার নূতন করে গড়েছে পাথর তিন চারিটা মসলাতে
এক পাথর ওজন শত—মন আর এক কল কেমন,
চিলের মত ছোঁ মেরে নেয় চিলে মাছ ধরে যেমন,

আবার সেই পাথরে গড়ছে পায়া না জানি কোন বুদ্ধিতে।
জলের নিচে দেড় শত হাত উপরে ষাট হাত,
লৌহপত্রে বেড় গড়েছে বেড় পয়তাল্লিশ হাত
সেই বেড়ের খাঁচা আজগবি ভাই দুইখানা ফ্ল্যাটের উপরেতে।
আর একটা কলে সে বেড় ফেলে দেয় জলে,
ঐ খাঁচার উপর দুইখানা গাড়ি বিদ্যুতে চলে,
বেড় হতে ফাফরা কলে মাটি তোলে ভাই পায়ার গড়ন হয় বেড়েতে।
জলের উপরের ছায়া তিন হাত পাথরের পায়া,
তাহার উপরে গড়েছে পায়া কেমন লোহাতে,
আজ্গবি সেই লোহারে ভাই গড়িয়েছে সব কিম্ভুতে।
পুলের পায়া ষোলটা তাঁর ভাগ পনেরটা,
পনের ভাগে বিভক্ত ভাই হচ্ছে সে পুলটা,
তার এক এক ভাগে কত লোহা সাধ্য কি তার ওজন দিতে।
না জানি কলের ঠিকানা আজগবি কারখানা,
কলে কলে কাজ চলে মানুষ আছে ঘুরানা।
তার সাক্ষী গোপাল মানুষ সবাই ইংরেজ রেখেছে আপন হাতে।
ধন্য ইংরাজ কোম্পানি তারা আচ্ছা সন্ধানী,
বিদ্যুতে মারিছে হাতুড় কবজার আটুনী,
লোহায় লোহায় কব্জা আটা সাধ্য কি বলিতে।
পুলের খরচ মোটামুটি টাকা সাত কোটি,
কেমন ভাবের কারখানাটি হবে বুঝিতে,
দাস বিজয় বলে বুঝতে নারি আমি ভিখারী সন্তোষ মুষ্টিতে।
বিজয় আবারও বলে হরি হরি বলে,
উচ্চ রবে ডাক সবে দুই বাহু তুলে,
অপার ভর নদীর সেতু, তারি, অন্তে হবে পার হতে।

২। পদ্মা নদীর পুলের গান

পদ্মা নদীর পুল দেখিতে চমৎকার আহা কি বাহার।
কি হেকমতে বেঁধেছে পুল ধন্য কারিগিরি তার।
১) দেখা যায় জলের উপরে, রামধনুর আকারে,
পোনর খানা পাতা আছে ষোল জনার ঘারে,
আবার দূর হতে বুঝায় যেন প্রতিমার চালির আকার।
২) একদিকে চলে ট্রেন গাড়ি, ঘড়্ ঘড়্ শব্দে দেয় পারি,
তিন পোয়া ক্রোশ দীর্ঘে ঐ পুল যাই বলিহারি,
পুলের অপরদিকে তিন হাত রাস্তা আছে মানুষ চলিবার।
৩) পুলের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নাম, পাকসিয়া ঘাটে ধাম,
নাম রেখেছেন বড় লাট বাহাদুরের নাম,
উনিশ শত পনেরো সালের চৌঠা মার্চ এই ব্যাপার।
৪) ঐ সালের বিশে জানুয়ারি, প্রথম চলে মাল গাড়ি,
পরীক্ষার কারণে দেড় মাস না চলে গাড়ি,
আবার ৪ঠা মার্চ নামকরণ পর পেসেঞ্জার ট্রেন হল পার।

৫) কর্ণে পেতেম শুন্‌তে সাতটি কীর্ত্তি জগতে,
এইটি নিয়ে আটটি হল হবে বুঝিতে।
ধন্য ধন্য "গেল্" বাহাদুর পুল বেঁধেছে সে পদ্মার।
৬) পদ্মা সামান্য ত নয় যার নাম শুনে হয় ভয়,
কত রাজার রাজ্য ধন প্রাণ পদ্মা গর্ভে রয়
কত কলের জাহাজ পদ্মার মাঝে ভেঙে হল চূরমার।
৭) পদ্মার পুল ত এইখানে, অন্তে যাবে সেইখানে,
সেই পুলের কারিগর কোন জন আর কে চিনে,
দাস বিজয় বলে হরি বল অপার ভব নদী হবে পার।

শ্রীবিজয়ানন্দ দাস নবজ্যোতি। হাল সাকিন সাঁড়া গোয়ালপাড়া।

পৃথিবীর মধ্যে ইহা অদ্বিতীয় গভীরতম খাত ও কলাকৌশল বিশিষ্ট এবং স্থাপত্য বিদ্যার পরিচায়ক ব্রিজ। ১৯২২ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইহাতে কুলি মজুর সহ মোট ২৪৪০০ কর্মচারী নিযুক্ত ছিল।

মিঃ গেল্ ও বড় লাট সাহেবের বক্তৃতাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

10, There is comparatively so little to see of all the work done in bridging and training a river of the character of the Ganges that your Excellency will perhaps pardon an explanatory illustration to those familiar with Calcutta. It may be explained that the part of each pier under water is equal in depth to the height of the Ochterlony Monument and to visitors of Delhi that each pier from foundation to girder is equal to the height of the Kutub.

A few figures will further assist the imagination. At high flood level 2½ million cub. feet of water will pass under the bridge per second. Some 26 million cub. feet of pitching stone have been used in the training works and reserve and 30 million cub. feet have been used altogether in the bridge and training works. Each well weighs fifteen thousands tons and all the wells and piers together weight three hundred tons, Each span of girders weight twelve hundred tons and there are thirty thousand tons of steel work in the whole bridge. One million seven hundred thousand field revets have been put in the site."

... ... Mr. Gale's report.

"That an outlay of some four crores of rupees should have been justifiable in order to provide better fecilities for this traffic is the more remarkable when we consider recent has been the development of trade and of railway communication in northern Bengal. Sixty years ago the engineer officers of the time were still considering the best starting point for the proposed Calcutta Darjeeling road ... It was not until 1877-78 that the first section of the present Eastern Bengal Railway metre gauge system the section from here to Siliguri was opened. From that date commercial development and improvement of railway communications have in this area proceeded with

equal rapidity. At the present time the territory which will be served by this bridge contains the greatest area under jute and probably the greatest area under tea in the world. ...In each of these areas in the Province of Assam and the districts of Bengal east of the Brahamputra, I look for the rapid development of railway communications and for a corresponding increase of trade and general prosperity. But advantages of this great bridge will not stop there. It seems to me certain that, before many years are over, these tracks will form part of a trunk line already connecting India and Burma."

... ... Viceroy's Speech.

Vide "Bengalee" dated, Saturday March 6, 1915.

২. ইলিয়ট ব্রিজ—সিরাজগঞ্জ ঃ

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগস্ট তারিখে বঙ্গের তৎকালীন লেফট্যানান্ট গভর্নর সার চার্লস ইলিয়ট সাহেব মহোদয় কর্তৃক সিরাজগঞ্জ টাউনে ধানবাঁধি নদীর উপর পুল নির্মাণের জন্য সর্বপ্রথম যে বুনিয়াদ পত্তন হয়, তাহা তাঁহার নামানুসারে ইলিয়ট ব্রিজ নামে পরিচিত। বিটসন বেল সাহেব তখন সিরাজগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বাণিজ্যপ্রধান বহু জনসমাকুল সিরাজগঞ্জে বর্ষায় নদী পারাপারে লোকের বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা নিবারণের জন্য বেল্ সাহেবের সবিশেষ চেষ্টায় এই পুল নির্মিত হওয়ায় সর্বসাধারণের অশেষ কল্যাণসাধন হইয়াছে। তন্নিমিত্ত প্রাদেশিক শাসন কর্তার নামে ইহার নামকরণ হইলেও যতদিন ইহা বর্তমান থাকিবে, ততদিন এই জেলায় ইহা বেল্ সাহেবেরই সুযশ ও স্মৃতি জাগরূক রাখিবে।

সমুদয় ব্রিজের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮০ ফিট, প্রস্থ প্রায় ১৬ ফিট ; তদ্ব্যতীত উভয়দিকের খিলান ও তীরবাঁধ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে, সম্পূর্ণ ব্রিজটি একটি মাত্র খিলানের উপর অবস্থিত ; পূর্বে ইহা সমতল ছিল, ১৮৯৭ অব্দের প্রবল ভূমিকম্পের পর মৃত্তিকার পরিবর্তন হেতু ইহা কথঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রিজ নির্মাণের জন্য মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে একটি ব্রিজ কমিটি গঠিত হইয়া দেশিয় জমিদার মহাজনদিগের নিকট চাঁদা সংগৃহীত হয়। মোট ব্যয় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে জেলাবোর্ড হইতে পনেরো হাজার টাকা পাওয়া যায়, অবশিষ্ট টাকা চাঁদা হইতে আদায় হয়। কেবলমাত্র পুল নির্মাণের জন্য Stewart Hurtland & Co. কে ৩৩,০০০্ টাকায় কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়।

৩. ইমারসন ব্রিজ—পাবনা ঃ

পাবনা শহরে বাজিতপুর রোডে ইছামতী নদীর উপর পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান, টী, ইমারসন্ সাহেবের উদ্যোগে ১৯১১/১২ অব্দে এই ব্রিজ নির্মাণ আরম্ভ হয়। তাঁহার চেষ্টায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কর্তৃক মোট প্রায় ৩৬ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহা নির্মিত হয়। ইহাতে পাবনা হইতে বাজিতপুর স্টিমার ঘাটগামী পথিক এবং মালবাহী ও আরোহীগণের গাড়ি যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বর্ষাকালে নদীতে পারাপারে লোকের বহু ক্লেশ ও অসুবিধা হইত ; তন্নিবারণকল্পে মিঃ ইমারসন সাহেব বাহাদুরের যত্ন ও চেষ্টায় ইহা নির্মিত হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে তাঁহার নামানুসারে ইমারসন ব্রিজ আখ্যা দেওয়া যায়।

সমুদায় ব্রিজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ ফিট, প্রস্থ প্রায় ১৬ ফিট, ইহা সলিড লৌহ স্তম্ভের উপর অবস্থিত। ব্রিজ ব্যতীত তীরভূমিরও বহুদূর পর্যন্ত বাঁধ আছে।

এতদ্ব্যতীত শাহজাদপুর ও অন্যান্য অনেক স্থানে কয়েকটি ব্রিজ আছে।

খ. খেওয়া বা খেয়া ঘাট ঃ

জেলাবোর্ডের অধীনে পাবনা সদরে ২৫টি ও সিরাজগঞ্জে ৪৫টি মোট ৭০টি খেওয়া ঘাট দেশিয় মুসলমান ও পশ্চিম দেশিয় লোকের নিকট বার্ষিক ইজারা বন্দোবস্ত হয়, ইহাতে বোর্ডের গড়ে প্রায় ১১/১২ হাজার টাকা আয় আছে। পাটনিগণ ক্বচিৎ এই সকল পারঘাটা বন্দে বস্ত লয়। ইহারা পূর্বে জমিদারগণের অধীনে দেশের নদী নালাদিতে যাতায়াতে লোকজন পারাপার করিত ; এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা ও ব্যবসায় লুপ্তপ্রায়। অধুনা লোকালবোর্ডের অধীন হইলেও, মফঃস্বলে জমিদারগণ অনেক খেয়াঘাট বন্দোবস্ত করেন। এতদ্ব্যতীত পাবনা মিউনিসিপ্যালিটির ৩টি এবং খাস মহাল চর মধ্যেও গভর্নমেন্টের কয়েকটি ঘাট ইজারা বিলি হয়।

জেলাবোর্ডের খেওয়া ঘাটের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল (১৯২১)

পাবনা

বার মাসের জন্য

	ঘাটের নাম	নদী বা জোলা	রাস্তার নাম	আদায়
১)	ইদিলপুর	চিকনাই	পার্শ্বডাঙা রোড	১৬০৲
২)	কাঁচাদিয়া	পদ্মা	... ...	১০২৲
৩)	বাজিতপুর	পদ্মা	বাজিতপুর রোড	৭০০৲
৪)	বায়সা	গুমানি	হাণ্ডিয়াল রোড	১২০২৲
৫)	ভাঙ্গুরিয়া	বরল	... ...	
			কেবল বর্ষার জন্য	
৬)	আরিয়াডেঙি	জোলা	আতাইকুলা তাঁতিবন্দ	৬৲
৭)	আতাইকুলা	ইছামতী	সিরাজগঞ্জ রোড	৫০৲
৮)	চান্দভা	জোলা	দাশুরিয়া ক্রশ	৪৲
৯)	চাঁদমারি	ঐ	সিলিমপুর রোড	—
১০)	চণ্ডীপুর	বারনাই	মথুরা রোড	১৲
১১)	চাটমোহর নূতনবাজার	বরল	হাণ্ডিয়াল রোড	৩৩১৲
১২)	জোতগজি	খাল	দাশুরিয়া রোড	২৲
১৩)	দাশুরিয়া	ঐ	ঐ	৬৲
১৪)	নিশ্চিন্তপুর	হাওর	সাতবাড়িয়া রোড	২২
১৫)	পুরাণ বেড়া	ইছামতী	... ...	১৪২
১৬)	পোরাডাঙা	জোলা	মথুরা রোড	১৪৩৲
১৭)	ফকিরপুর	ইছামতী	পার্শ্বডাঙা রোড	১০১৲
১৮)	বাঁশের বাধা	জোলা	সিলিমপুর রোড	৫৲
১৯)	বারনাই	ঐ	সুজানগর রোড	৪৲
২০)	ভবানীপুর	রত্নাই	চাটমোহর রোড	১০৲
২১)	মুলগ্রাম	চিক্নাই	ঐ	২৬৲
২২)	রাধাকান্তপুর	পদ্মা	দোগাছি রোড	৪৭০৲
২৩)	সাঁথিয়া	ইছামতী ও জোলা	বেড়া রোড	২৫০৲
২৪)	সুজানগর	বারনাই	সুজানগর রোড	১১২
২৫)	সেলন্দ	বরল	সিরাজগঞ্জ রোড	

সিরাজগঞ্জ বার মাসের জন্য

	ঘাটের নাম	নদী বা জোলা	রাস্তার নাম	আদায়
১)	উল্লাপাড়া	ফুলজোড়	বেলকুচি উল্লাপাড়া	৩৫০৲
২)	এরন্দহ	ঐ	নূতন বগুড়া	১২০০৲
৩)	ঘাটিনা	ঐ	বেলকুচি উল্লাপাড়া	৪২৭৲
৪)	ঘুরকা	ঐ	রায়গঞ্জ উল্লাপাড়া	৪০০৲
৫)	ধানঘড়া	ঐ	পুরাণ বগুড়া রোড	২৩২৫৲
৬)	নবীপুর নরনিয়া	ঐ	সলপ রোড	৩৫০৲
৭)	ভূএগ্রাগাতি	ঐ	রায়গঞ্জ তাড়াস	৬৯৫৲
৮)	ভেড়াখোলা	হুরাসাগর	নূতন সিরাজগঞ্জ	১৬২৫৲
৯)	রাউতারা	বরল	পুরাণ সিরাজগঞ্জ	৫০০৲

কেবল বর্ষার জন্য

১০)	আলোকদিয়া	ইছামতী	শাহজাদপুর সিরাজগ	২৲
১১)	টাংগ্রাইল			
১২)	আঠার দহ			
১৩)	চৌহালি খাল	জোলা	শাহজাদপুর চৌহালি	১০৲
১৪)	সৈদপুর			
১৫)	স্থল খাল			
১৬)	কালীগঞ্জ	ফুলজোড়	—	১৭৲
১৭)	কৈজুরি	হুরাসাগর	কৈজুরি ট্র্যাক	২৲
১৮)	গঙ্গারামপুর			
১৯)	হাসিল	খাল	পুরাণ বগুড়া	৫৲
২০)	লক্ষ্মীকোল			
২১)	নলুয়া বিল			
২২)	ঘুরকা খাল		নূতন বগুড়া	
২৩)	চর কাওয়াক	খাল	উল্লাপাড়া বেলকুচি	২৫৲
২৪)	চর জামালপুর	সোতা	—	৪০৲
২৫)	চন্দ্রকোণা	খাল	নূতন বগুড়া	১১৫৲
২৬)	চান্দাইকোণা	করতোয়া	—	৭৩০৲
২৭)	চাকীপাড়া কুমরুল	খাল	কুমরুল তাড়াস	২৫৲
২৮)	হাটি কুমরুল			
২৯)	ডেমরা	বরল	শাহজাদপুর ক্রশ	৩৲
৩০)	বেলকুচি	সোতা	...	২৲
৩১)	নূতনপাড়া	ঐ	...	৪০৲
৩২)	পাঙাসি	ইছামতী	পুরাণ বগুড়া	১৬০৲
৩৩)	ইছামতী			
৩৪)	পাঁচিল	খাল	ঐ	
৩৫)	পূর্ব দেউলিয়া	সোতা	রায়গঞ্জ ট্র্যাক	২৫৲
৩৬)	বওসিয়া	ঐ		৬৲
৩৭)	বরাল	ঐ		৭৭

ঘাটের নাম	নদী বা জোলা	রাস্তার নাম	আদায়
৩৮) বার মাসিয়া	খাল		—
৩৯) বাওইতরা	ধানবাঁধি	সলপ রোড	৫২
৪০) বাহুকী	ইছামতী	...	২৭৫
৪১) বেতনালী	জোলা	নূতন বগুড়া	৪০
৪২) বেলকুচি	যমুনা	নূতন সিরাজগঞ্জ	৩১০
৪৩) ব্রহ্মগাছা	ইছামতী	ব্রহ্মগাছা	৫০
৪৪) সয়দাবাদ	হুরাসাগর	নূতন সিরাজগঞ্জ	৪৫
৪৫) শ্রীফলতলা	সোতা	বেতিল রোড	৬০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস

ক. পোস্ট আফিস ঃ

জেলার সদরে পাবনা হেড অফিস তদধীনে সদরে ও সিরাজগঞ্জে ২৭টি সাব অফিস এবং ৭৮টি ব্রাঞ্চ অফিস, মোট ১০৬টির মধ্যে পাবনায় ৪১টি ও সিরাজগঞ্জে ৬৫টি পোস্ট আফিস বর্তমান আছে। ইহার দ্বারা জেলার সর্বত্র চিঠি পত্রাদি প্রেরিত ও গৃহীত হয়। সর্বসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে জেলার পোস্ট আফিসসমূহের যে তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল তন্মধ্যে সাব আফিস ব্যতীত * চিহ্নিতগুলিতে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হিসাব খুলিবার ও ইনসিওর যোগে পত্রাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

পোস্টআফিস সমূহের নাম

পাবনা সদর

পুলিশ স্টেশন	সাব অফিস	ব্রাঞ্চ অফিসসমূহ
পাবনা	পাবনা (হেড)	আতাইকুলা, একদন্ত * দাপুনিয়া* দুব্লিলা* দোগাছি, মালঞ্চি* শাঁকারিপাড়া* হিমাইতপুর।
	১) পাবনা বাজার	
সাঁড়া	২) সাঁড়া	
	৩) ঈশ্বরদি	দাশুরিয়া, দেবোত্তর*, ধাপারি।
	৪) পাক্‌সি	দিঘা*, পাকুরিয়া।
চাটমোহর	৫) চাটমোহর	অষ্টমনীষা, গুণাইগাছা, জোনাইল,* পার্শ্বডাঙা, শিতলাই, হরিপুর, হাণ্ডিয়াল।
ফরিদপুর	৬) বনওয়ারিনগর	গোপালনগর (পাবনা)*, ডেমরা, নরদহ*।
সাঁথিয়া	৭) সাঁথিয়া	ধোপাদহ, নন্দনপুর।
	৮) দুলাই	ক্ষেতুপাড়া, বনগ্রাম*।
	৯) কাশীনাথপুর	পাইকরহাটি, রাজনারায়ণপুর।
সুজানগর	১০) তাঁতিবন্দ	সাতবাড়িয়া, সুজানগর।

পুলিশ স্টেশন	সাব অফিস	ব্রাঞ্চ অফিসসমূহ
বেড়া	১১) বেড়া	তলট।
	১২) নাকালিয়া	চক্‌চাপড়ি, নূতন ভারেঙ্গা।
	১৩) পুকুরপার	কালিয়াবাড়ি, খলিলপুর, নাজিরগঞ্জ, মাশুন্দিয়া, সাগরকান্দি।
-	১৪) পুরাণ ভারেঙ্গা	নলকোলা*, নাটিয়াবাড়ি (রঘুনাথপুর পাবনা), ভারেঙ্গা।

সিরাজগঞ্জ মহকুমা

সিরাজগঞ্জ ও	১) সিরাজগঞ্জ বাজার	... ...
কামারখন্দ	২) সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর, কালিয়াহরিপুর, কোলবন্দর,* নলকা, পাঙাসি, বৈদ্যজামতৈল, ভিক্টোরিয়া স্কুল,* মেছরা, সলঙ্গা, হাটিকুমরুল।
	৩) বাগবাড়ি	ফুলকোঁচা।
রায়গঞ্জ	৪) রায়গঞ্জ	আটঘরিয়া,* তাড়াস।
উল্লাপাড়া	৫) উল্লাপাড়া	উল্লাপাড়া।
	৬) দুর্গানগর	গাড়াদহ,* ভাঙুরিয়া।
	৭) মোহনপুর	উধুনিয়া।
	৮) সলপ	খুক্‌নী,* দৌলতপুর, ভাঙাবাড়ি, যোগনালা, রায় দৌলতপুর।
শাহজাদপুর	৯) শাহজাদপুর	নরনিয়া,* পোতাজিয়া।
	১০) জামিরতা	সোনাতনী।
	১১) পোরজনা	বেলতৈল,* ভেকা গোপালগঞ্জ।
চৌহালি	১২) স্থল	চালুহারা,* চৌহালি, স্থল নওহাটা।*
বেলকুচি	১৩) বেলকুচি	বড়ধুল,* বেতিলহাটখোলা,* রাজাপুর, সদিয়াচাঁদপুর, সয়দাবাদ।

টেলিগ্রাফ অফিস ঃ

বর্তমান সময়ে এই জেলায় পোস্টঅফিসের সহিত মিলিত মোট ১৪টি টেলিগ্রাফ অফিস আছে। এতদ্ব্যতীত সিরাজগঞ্জে গভর্নমেন্টের একটি খাস টেলিগ্রাফ অফিস এবং রেলওয়ে স্টেশনসমূহের মধ্যে দিলপসার ব্যতীত সর্ব স্টেশনেই টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত আছে। টেলিগ্রাফ অফিসসমূহের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

পাবনা—(১) চাটমোহর, (২) নাকালিয়া, (৩) পাক্‌সি, (৪) পাবনা, (৫) পাবনা বাজার, (৬) পুরাণ ভারেঙ্গা, (৭) বেড়া, (৮) সাঁড়া।

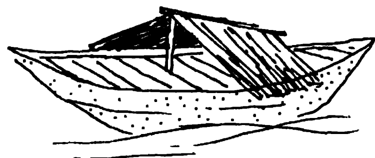
সিরাজগঞ্জ—(১) উল্লাপাড়া, (২) জামিরতা, (৩) পোরজনা, (৪) সলপ, (৫) শাহজাদপুর, (৬) সিরাজগঞ্জ বাজার।

তথ্যসূত্র

১. *Eastern Bengal District Gazetter, Bogra, 1010. P. 104.*

২. *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।*

চতুর্থ অধ্যায়
থানা ও গ্রামাদি



প্রথম পরিচ্ছেদ—থানাসমূহ

পাবনা সদর (১৯২১)

থানা	পুলিশ স্টেশন	ক্ষেত্রফল	গ্রাম সংখ্যা	লোক সংখ্যা
পাবনা	পাবনা	১১৮ বর্গ মাঃ	৩৬২	১০৪৯৪২
	আটঘরিয়া	৭১ ”	১২২	৩০২১৭
	সাঁড়া	৯৩ ”	১৭৭	৫৯৫০২
চাটমোহর	চাটমোহর	১৭২ ”	৩৮১	৭৫৫৮৩
	ফরিদপুর	১১৫ ”	২৪১	৫০৩০৯
দুলাই	সাঁথিয়া	১৪১ ”	২৯৫	৭৪৬৪২
	সুজানগর	১২০ ”	২৫৩	৭৮০৩৭
মথুরা	বেড়া	৭৫ ”	২৪১	৮৩৬০২
		৮০৫ ”	২০৭২	৫৫৬৮৩৪

সিরাজগঞ্জ মহকুমা (১৯২১)

থানা	পুলিশ স্টেশন	ক্ষেত্রফল	গ্রাম সংখ্যা	লোক সংখ
সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	২১০ বর্গ মাঃ	৩৬১	১৫৭০৬৫
	কাজিপুর	৬৩ ”	১৬৯	৯৮১১৫
শাহজাদপুর	শাহজাদপুর	১০৫ ”	৩২২	১৬০৩৪৫
	চৌহালি	৮৫ ”	১৭৯	৫৪৮৫৯
	বেলকুচি*	৮০ ”	১৫৫	৭৪২০২
উল্লাপাড়া	উল্লাপাড়া	১৫৫ ”	৪৪৪	১২৯৯৯৬
	কামারখন্দ	৩৩ ”	৯৮	৪৩০৪২
রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ	১৯০ ”	৩৭৬	৮১০৫৬
	তাড়াস	৫২ ”	২৩২	৩৩৯৮০
		৮৭৩	২৩৩৬	৮৩২৬৬০
		১৬৭৮	৪৪০৮	১৩৮৯৪৯৪

বেড়ার অধীন দরিসরিপপুর ও সাঁথিয়ার অধীন দুর্গাপুর দুইটি আউটপোস্ট আছে। শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ ও উল্লাপাড়ার অংশ লইয়া বেলকুচি গঠিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—প্রধান প্রধান গ্রাম ও বাজারাদি

পাবনা

পুলিশ স্টেশন	গ্রাম	বাজার বা বন্দর
পাবনা	রাধানগর, হিমাইপুর দিং, মালঞ্চি, পয়দা, গয়েশপুর	একদন্ত, দোগাছি, দুবিলা, দাপুনিয়া, শাখারিপাড়া।
সাঁড়া	ঈশ্বরদি, পাক্‌সি, পাকুরিয়া	দাশুরিয়া, ধাপারি।
আটঘরিয়া	চান্দভা, পাঁচুরিয়া	দেবোত্তর, মূলগ্রাম।
চাটমোহর	সালিখা দিং, হরিপুর, পার্শ্বডাঙা, জামালপুর, হাণ্ডিয়াল	অষ্টমনীষা, চাটমোহর। ভাঙ্গুরিয়া, ধানুয়াঘাটা।
ফরিদপুর	ডেমরা, গোপালনগর	বনয়ারিনগর।
বেড়া	ছাতক, সিন্দুরী, করঞ্জা, ভারেঙ্গা, হাটুরিয়া, রতনগঞ্জ, মাশুন্দিয়া	সাধুগঞ্জ, ধুলাউরি, নগরবাড়ি মথুরা।
সুজানগর	সাগরকান্দি, খলিলপুর, তাঁতিবন্দ, হাটখালি, হাসামপুর	নাজিরগঞ্জ, দুলাই। সাতবাড়িয়া, রাইপুর।
সাঁথিয়া	হাপানিয়া, ক্ষেতুপাড়া, কাশীনাথপুর	সাঁথিয়া, আতাইকুলা

সিরাজগঞ্জ

পুলিশ স্টেশন	গ্রাম	বাজার বা বন্দর
সিরাজগঞ্জ	কাওয়াখোলা, কালিয়াহরিপুর, খোকসাবাড়ি, বাগবাটি, বয়রা	কোল বন্দর নলকা, ভদ্রঘাট।
কাজিপুর	কাজিপুর, সিমলা, মেছরা	সোনামুখী, রতনকান্দি।
রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ, আটঘরিয়া, ঘুরকা	ধানঘড়া, চান্দাইকোণা।
তাড়াশ	তাড়াশ, নিমগাছি	প্রতাপ, দেওভোগ।
উল্লাপাড়া	উধুনিয়া, মোহনপুর, সলপ	উল্লাপাড়া, সলঙ্গা।
কামারখন্দ	বৈদ্যজামতৈল	ঝাউল।
শাহজাদপুর	দৌলতপুর, পোরজনা, জামিরতা, পোতাজিয়া	কৈজুরি, তালগাছি, বেতিল।
চৌহালি	স্থল, নওহাটা, সদিয়াচাঁদপুর	চৌহালি, কান্দাপাড়া।
বেলকুচি	সোহাগপুর, চাপড়ি	দেলুয়া, রাজনগর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—আদালত ও অফিসাদি

ফৌজদারি কাছারি (১৯২২)

	ম্যাজিস্ট্রেট	মহকুমা ম্যাঃ	ডেপুটি ম্যাঃ	সাব ডেঃ ম্যাঃ	বেঞ্চ ম্যাঃ
পাবনা	১	১	৪	২	৭
সিরাজগঞ্জ	—	১	২	১	৬
শাহজাদপুর	—	—	১	—	৪
উল্লাপাড়া	—	—	—	—	

দেওয়ানি আদালত (১৯২২) কালেক্টরি অফিস

	জজ	সাবজজ	মুন্সেফ	কালেক্টর	ডেপুটি কাঃ	সাব ডেঃ কাঃ
পাবনা	১	২	৩	১	৫	২
সিরাজগঞ্জ	—	—	৩	—	২	১

সাব রেজেস্টারি অফিস

পাবনা		১৯২২/২৩	সিরাজগঞ্জ
সাব রেঃ অফিস	এলাকা (পুলিশ স্টেঃ)	সাব রেঃ অফিস	এলাকা (পুলিশ স্টেঃ)
১) চাটমোহর	চাটমোহর, ফরিদপুর।	১) উল্লাপাড়া	উল্লাপাড়া।
২) পাবনা	পাবনা, আটঘরিয়া, সাঁড়া।	২) সলঙ্গা	কামারখন্দ, রায়গঞ্জ
৩) সুজানগর	সুজানগর।	৩) শাহজাদপুর	শাহজাদপুর।
৪) বেড়া	বেড়া, সাঁথিয়া।	৪) সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ।
		৫) গান্দাইল	কাজিপুর।
		৬) স্থল, চৌহালি,	বেলকুচি।

মুসলমান ম্যারেজ রেজিস্টারি অফিস

পাবনা— ১) আটঘরিয়া, ২) চাটমোহর, ৩) দুলাই, ৪) পাবনা, ৫) ফরিদপুর, ৬) মথুরা, ৭) সাঁথিয়া।

সিরাজগঞ্জ— ১) কাজিপুর, ২) কামারখন্দ, ৩) চৌহালি, ৪) তাড়াস, ৫) পূর্ণিমাগাঁতি, ৬) রায়গঞ্জ, ৭) শাহজাদপুর, ৮) সিরাজগঞ্জ।

পাবনা ও সিরাজগঞ্জে দুইটি মিউনিসিপ্যাল অফিস এবং পাবনায় ডিস্ট্রিক্ট ও লোকালবোর্ড এবং সিরাজগঞ্জে লোকালবোর্ড অফিস আছে।

বিবিধ ঃ অন্যান্য গভর্নমেন্ট অফিসাদির মধ্যে পাবনায় পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট অফিস, সিরাজগঞ্জে সার্ভে সেটেলমেন্ট অফিস ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ব্র্যাঞ্চ অফিস প্রধান। এতদ্ব্যতীত পাক্‌সিতে রেলওয়ে ডিস্ট্রিক্ট ট্র্যাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও হার্ডিঞ্জ ব্রিজ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিসাদি উল্লেখযোগ্য।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

পাবনা জেলার ইতিহাস
দ্বিতীয় খণ্ড

পাবনা জেলার ইতিহাস।

দ্বিতীয় খণ্ড।



শ্রীরাধারমণ সাহা বি, এল্

প্রণীত ও প্রকাশিত।

পাবনা।

১৩৩০

পাবনা।

হিতৈষী প্রেস।

শ্রীবসন্ত কুমার বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ—১৩৩০ সাল—১০০০।

মূল্য এক টাকা চারি আনা।

নিবেদন

পাবনা জেলার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত জেলার পুরাবৃত্ত একটি মাত্র অধ্যায়ের চারি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। পাবনা মুসলমান অ.মল হইতে ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্কাল পর্যন্ত পূর্বে সাঁতৈল ও পরে নাটোর রাজবংশের জমিদারি ভুক্ত ছিল, তজ্জন্য উক্ত রাজবংশদ্বয়ের বিবরণ কথঞ্চিৎ লিখিত হইল। উভয় রাজবংশীয় দুই জন হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবা মহিলা, রাণী সর্বাণী (এই জেলার ডেমরা রায়বংশ দুহিতা) ও রাণী ভবানী রমণী হইয়াও সবিশেষ রাজ্যশাসন কৌশলের পরিচয় প্রদানপূর্বক বঙ্গের ইতিহাসে চিরপরিচিতা হইয়া রহিয়াছেন। বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতা গুণে উভয়েই বাঙালির নিকট প্রাতঃস্মরণীয়া ; এতদুভয়ের স্বাক্ষরিত বহু ব্রহ্মত্র দেবত্রাদির দানপত্র এই জেলার অনেকের গৃহে অদ্যাপিও বর্তমান রহিয়াছে।

পাবনা জেলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য চির প্রসিদ্ধ ; হাড়িয়ালের বিবরণে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। আধুনিক সিরাজগঞ্জ বন্দর প্রতিষ্ঠা কাল হইতেই বিশেষ উন্নত ; বাণিজ্যে্ন প্রসিদ্ধিহেতু মুসলমান আমল হইতে ইংরেজ শাসনের প্রাক্কাল পর্যন্ত ইউরোপীয় বণিকগণের এখানে গতিবিধি ছিল ; তজ্জন্য কোম্পানির আমলের বাণিজ্যের অবস্থা কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। সমস্তই পাবনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি, তবে স্থানে স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে দূরে গেলেও তাহা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইতে দেই নাই বা অযথা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করি নাই।

এই খণ্ড মুদ্রিত হওয়া কালে তাড়াসের জমিদার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় মহাশয় ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা এবং বর্ধমান রাজস্টেটের সার্ভে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পাবনা নিবাসী শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ সাহা মহাশয় ২৫৲ পাঁচিশ টাকা আমাকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ ও বাধিত থাকিলাম।

ইংরেজি উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠের সুবিধার্থ পাদটীকায় না দিয়া যথাসাধ্য অনুবাদসহ পুস্তক মধ্যেই সন্নিবেশিত হইল। প্রসিদ্ধ লেখক ও ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাদি হইতে বহু বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে। পাবনার সহিত তৎসমুদয়ের সংস্রব প্রদর্শনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। পাবনা জেলার ইতিহাস হইলেও, ইহাতে সাধারণেরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেক বিষয় লোক মুখে শুনিয়াও লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। এতাদৃশ সংগ্রহে ভ্রমপ্রমাদ থাকা অসম্ভব নহে। তজ্জন্য পাঠকবর্গ সমীপে নিবেদন তাঁহারা এই পুস্তকে কোন প্রকার ভ্রমাদি দর্শন করিলে তাহা অনুগ্রহপূর্বক কেহ লিখিয়া জানাইলে সাদরে গৃহীত হইবে এবং বিশেষ উপকৃত ও বাধিত হইব।

পরিশেষে পাবনাবাসীর নিকট বিশেষ নিবেদন এই যে, দেশের যা ভাল মন্দ যে রূপ ভাবেই লিখিত হউক, তাহা দেশবাসীর নিকটও আদরণীয় সন্দেহ নাই। হয়ত আজ যাহা আমার নিকট ভুল হইয়াছে কাল তাহা অন্য যোগ্যতর লেখক সংশোধিতভাবে লিখিতে পারেন। ইহাও আশা করা যায়। প্রকৃত স্বদেশভক্ত চিরকালই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী" এবং "স্বদেশের ধুলি স্বর্ণ রেণু বলি" জ্ঞান করিবেন। অন্যথায় কবি তাঁহার ভাষায় চিরদিনই জিজ্ঞাসা করিবেন—

"Breathes there the man, with soul so dead,
Who never to himself hath said—
This is my own, my native land!"

পাবনা, কালাচাঁদপাড়া।
৮ ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল।

বিনীত নিবেদন
শ্রীরাধারমণ সাহা

উৎসর্গ পত্র।

জেলার

হিন্দু ও মুসলমানাদি,

দেশীয় ও বিদেশীয়,

অধিবাসিগণের

করকমলে

পাবনা জেলার ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

সাদরে অর্পিত

হইল।

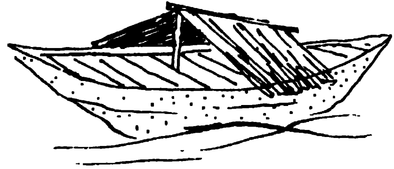
১৩৩০

বিনীত—

মাঘী পূর্ণিমা।

গ্রন্থকার

প্রথম অধ্যায়



পুরাবৃত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ—ঐতিহাসিক বিবরণ

সাধারণ ঃ

মানবমাত্রেরই স্বসংস্রবীয় ও নিজ পারিপার্শ্বিক বিষয় শুনিবার জন্য স্বাভাবিক আগ্রহ বর্তমান আছে; তন্নিবারণ জন্য দেশের ইতিহাস আলোচনা প্রয়োজন। জীবনধারণ করিতে হইলে, যেমন দেহতত্ত্ব জানা আবশ্যক, তদ্রূপ দেশে বাস করিতে হইলে ও দেশবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, সেখান মানুষ জন্মে, যেখানকার জলবায়ু ও মৃত্তিকায় সে বর্ধিত হয়, যাহাদের সহিত সে বাস করে এবং যাহাদের শুভাশুভ ও সুখদুঃখের সহিত তাহার ভালমন্দ অনেকাংশে নির্ভর করে ঐ স্থানে ভৌগোলিক ও জনমণ্ডলীর সামাজিক বিবরণাদি জানিয়া মানবগণের কর্মক্ষেত্র, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও স্থাবর জঙ্গম পদার্থ নিচয়ের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করা অবশ্য কর্তব্য; ইহাতে স্বকীয় দুঃখ দারিদ্র্য হ্রাস ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। প্রাচীন স্মৃতি ও পূর্বাবস্থা বর্তমানের পথ প্রদর্শক, পুরাতন সমস্তই হিতকারী ও জ্ঞানদায়ক; পুরাতনের উপর নূতনের ভিত্তি সংস্থাপিত, আধুনিক প্রাচীনের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতীত হইতেই বর্তমান পরিচালিত এবং ভবিষ্যৎ সূচিত ও গঠিত হয়, সুতরাং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ। কোন জাতি কি প্রকারে হীনাবস্থা হইতে উচ্চ পদে উঠিয়াছে, কে কি করিয়া কি ফলাফল লাভ করিয়াছে, তাহার আলোচনায় আমাদের বর্তমানে কি করা কর্তব্য এবং ভবিষ্যতে কি প্রকারে চলিতে হইবে বা প্রস্তুত হইতে হইবে, কেবলমাত্র ঔৎসুক্য নিবৃত্তি ব্যতীত তাহাও এই পুরাতত্ত্ব আলোচনা ও অনুশীলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এদেশে ধারাবাহিক ভাবে আধুনিক প্রণালীতে ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি ছিল বলিয়া বোধ হয় না; তবে ইতিবৃত্ত বলিতে যে কিছুই ছিল না, তাহা একেবারে বলা যায় না, কারণ এদেশে প্রাচীন কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থাদি রচনার রীতি না থাকিলেও কাব্য পুরাণ প্রভৃতিতে যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাতে দেশের পূর্বতন অবস্থা, নদ নদীর অবস্থান, রাজ্য জনপদের উৎপত্তি, বিস্তার ও ধ্বংস কাহিনী, জাতি, সমাজ, শিল্পাদির বিবরণ, শিক্ষা ও রাজনৈতিক অবস্থা অনেকাংশে অবগত হওয়া যায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি যে সমস্ত গ্রন্থাদি এদেশে পূর্বপর প্রচলিত আছে, তাহা ধারাবাহিক হিসাবে লিখিত না হইলেও বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত দেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণী বলা যাইতে পারে।

এই সকল প্রাচীন কাহিনী হিন্দু রাজত্বকালে দেশের সংস্কৃত ভাষায় এবং পরবর্তী মুসলমান আমলে সমসাময়িক আরব্য পারস্যাদি ভাষায় ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত। কাব্য পুরাণ সংহিতাদি ও মুসলমান রাজত্বের সমকালীন বৃত্তান্তাদি এবং বৈদেশিক ভারতভ্রমণ-কারীগণের লিখিত বিবরণাদি ইউরোপীয় আধুনিক ধারাবাহিক ইতিহাসের ন্যায় একের পর

একটি কাল পর্যায়ানুসারে লিখিত নহে, তজ্জন্য আমাদের এই দেশের প্রকৃত ইতিহাসের অভাব অনুভূত ও বিবেচিত হয় ; তদুপরি বর্তমানকালে ইংরেজ আমলের সর্বত্র রাজভাষার অধিক অনুশীলন জন্য উপরোক্ত দেশিয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি ও এশিয়াখণ্ডের অন্য প্রাচীন ভাষায় লিখিত ও বর্ণিত বিষয়সমূহের আলোচনা ও অনুশীলন উপেক্ষিত বা অনায়ত্ত বলিয়া একেবারে আমাদের দেশের ইতিহাস নাই বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এদেশেও ইতিহাসের উপকরণ ও উপাদান সমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লুক্কায়িত এবং অপ্রকাশিত আছে। আধুনিক ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট যেমন দেশিয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা দুরূহ, পক্ষান্তরে রক্ষণশীল দেশিয় পণ্ডিত সমাজের নিকট বর্তমান সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান সমন্বিত ও অভিনব প্রণালীতে লিখিত ইতিহাসাদি অনাদৃত বলিয়াই এতাদৃশ পুরাবৃত্তের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের দেশের প্রাচীন কুলেতিহাস, কুলজি, ঢাকুরাদির বিবরণ সমস্তই কতক মৌখিক, কতক লিপিবদ্ধ আকারে আবহমান কাল হইতে ঘটক, ভাট, গুরু, পুরোহিত কুলজ্ঞগণের নিকট অসংলগ্নভাবে রক্ষিত, ইহাতে ধারাবাহিক সন তারিখের অভাবে ও অনেকাংশে কাল্পনিক বলিয়া বর্তমান ঐতিহসিকগণের নিকট হেয় ও অনাদৃত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেশের নিরক্ষর, মেধাবী ব্যক্তিগণ অবসর সময়ে বা কার্যকালে নানাপ্রকার ছড়া, পাঁচালি, প্রবন্ধাকারে বা গ্রাম্য গীতিতে দেশের যে সমস্ত প্রাচীন কাহিনী ও স্মৃতি স্মরণাতীত কাল হইতে মৌখিক বহন করিয়া জাগরূক রাখিয়াছে, তাহা একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, এই জেলায় ৫০/৬০ বৎসর পূর্বে নীল হাঙ্গামা ও প্রজা বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। সরকার পক্ষে তাহার আবশ্যকীয় যে বিবরণী আছে, তাহা একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ধারাবাহিক না হইলেও নিরক্ষর কৃষক বা জনসাধারণের মুখে মুখে রচিত জারী, ভাসান, ধুয়া, শারি প্রভৃতি পল্লীগাথায় ও কবিদার এবং হোলি পাঁচালি রচয়িতাগণের পয়ার প্রবন্ধে তাহার কিয়ৎপরিমাণ বিস্তারিত ও হৃদয়গ্রাহী বিবরণ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে, ইহাদের মধ্যেও দেশের অনেক পুরাতন তথ্য পাওয়া যায়। দেশের ব্রত, নিয়ম, আচার পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তন্মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ নিহিত আছে বলিয়া জানা যায়। দেশের পুরাকীর্তি স্বরূপ প্রাচীন মন্দির মসজিদ, সুবিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা, রাজবর্ত্ম ও পুরাতন জাঙ্গালের ধ্বংসাবশেষ, সমস্তই পূর্বতন প্রসিদ্ধ জনপদ ও জাতি বিশেষের উত্থান পতনের সাক্ষী স্বরূপ অতীতকালের মহাত্মাগণের কীর্তিকলাপ বিঘোষিত করে। এই সমুদয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক রহস্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও নিরুপণ প্রবৃত্তি, শক্তি, সময়, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও উৎশাহ সাপেক্ষ।

পূর্বতন রাজশাহী ও যশোহর জেলা হইতে প্রায় শতাব্দী কাল মাত্র গঠিত বলিয়া অনেকের ধারণা, পাবনা জেলা আধুনিক, ইহার কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইতিহাস নাই। অবশ্য কোন রাজনৈতিক ঘটনা বা রাজ্য বিশেষের উত্থান পতন বা রাজপরিবারের বিবরণের সহিত পাবনার নাম বিজড়িত হয় নাই, কিংবা বিশেষ গুণ গরিমায় গৌরবান্বিত কোন আবতারকল্প মহাত্মা এই জেলার কোন ভূখণ্ডে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জেলার মুখোজ্বল করেন নাই, কিংবা অগণিত মানবশোণিত স্রোত প্লাবিত কোন রণক্ষেত্র বলিয়া পাবনার নাম সুবিখ্যাত হয় নাই ; কিন্তু ইতিহাস কেবলমাত্র রাজা মহারাজার বা ব্যক্তি বিশেষের জীবন বৃত্তান্ত বা যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনীতে অথবা তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনায় সীমাবদ্ধ নহে। দেশের মধ্যে এই জেলার অবস্থান, প্রাকৃতিক বিবরণ, জাতি, ধর্ম, সমাজের অবস্থা, লোকের আচার ব্যবহার স্থানীয় শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও শাসন সংরক্ষণাদির যথাযথ বর্ণন এবং জনশ্রুতিমূলক কাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয় ও পুরাকীর্তি সমূহের স্বরূপ নির্ধারণ ও তত্ত্বোদঘাটন এই জেলার প্রকৃত ইতিহাস। আধুনিক কালে পাবনা জেলার ১৮৭৩ অব্দের "প্রজা বিদ্রোহ" বঙ্গের প্রজাসত্ব

আইনের জন্মদাতা ও প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ঘটনা ; কারণ ইহাতে রায়তগণের স্বত্ব বিশদরূপে আলোচিত হইয়া পরিশেষে ১৮৮৫ অব্দের প্রজার "সনন্দ" স্বরূপ বঙ্গীয় প্রজাসত্ব বিষয়ক আইন প্রচলিত হয়। "ইতিহাস কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, ইতিহাস জাতীয় বিবর্তনের বিশদ বিবরণ। ব্যক্তি সমষ্টি লইয়াই জাতি, এই জন্যই ইতিহাস কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবন চরিত নহে ; এই জন্যই একজনকে লইয়া ইতিহাস হয় না। সাধারণকে লইয়া হয়। এইজন্য প্রধানত প্রজাই ইতিহাসের বিষয়, রাজা ক্বচিৎ। সিরাজদৌল্লা অত্যাচারী ছিলেন কিনা, আরঙ্গজেব স্বয়ং মদ্য পান করিতেন কিনা, ইহার অপেক্ষা সিরাজদৌল্লার সময় প্রজা সাধারণের অবস্থা কিরূপ ছিল, আরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যে সাধারণ জনগণ মধ্যে মদ্যপান প্রচলিত ছিল কিনা এই সকল প্রশ্নের ঐতিহাসিক মূল্য অধিক।"[১]

তজ্জন্য বোধ হয় এই জেলার যে সকল স্থানবিশেষকে আবাল বৃদ্ধ বণিতা আবহমানকাল হইতে পুরুষানুক্রমে "মরিচপুরাণ" "সুবুদ্ধিমরিচ" "কমলমরিচ" "কোটার ভিটা" "পণ্ডিতার ভিটা" "সারির ভিটা" প্রভৃতি নামে নির্দেশ করিয়া আসিতেছে, তৎসমুদয়ই জেলার ইতিবৃত্ত-মন্দিরের এক একটি প্রকাণ্ড অধ্যায়ের ভিত্তি স্থল ; স্থানে স্থানে অধুনা শৈবালাদি পরিপূর্ণ সুদূর বিস্তৃত দীর্ঘিকা সমূহের কোনটি "জয়সাগর" কোনটি "ভাণসিংহের দীঘি", কোনটি "ময়দান দীঘি" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এতৎ সমূহের মধ্যেই দেশের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। গ্রাম বিশেষে তৃণ গুল্মাদি সমাচ্ছাদিত শৃগাল শার্দুলের আবাসস্থল রূপে বিরাজমান ভগ্ন অট্টালিকা সমূহের কোনটি "নবরত্ন" মন্দির, কোনটি "জোড়াবাঙ্লা", কোনটি "বুড়াপীরের দরগা" নামে কিংবা নির্জন প্রান্তর মধ্যে লোকালয়ের পার্শ্বে বহু শতাব্দী হইতে রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি নানারূপ নৈসর্গিক বিপ্লবাদির আক্রমণ সহ্য করতঃ নীরবে দণ্ডায়মান। প্রাচীন হিন্দু মন্দির অথবা মুসলমানের ভজনালয় সমূহের কোনটি "জগন্নাথের মন্দির" কোনটি "শিবের মঠ" কোনটি "মক্দম্ সাহেবের দরগা", কোনটি "মামার মসজিদ", কোনটি "মাকুম খাঁর মসজিদ" প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে, ইহারা নিত্য দেশের স্বধর্মনিষ্ঠ মহাত্মাগণের কীর্তিকলাপ জ্বলন্ত অক্ষরে ঘোষণা করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রাচীন কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তরময়ী মূর্তি সমূহের মধ্যে যে কোনটি "ভবানী" কোনটি "সিদ্ধেশ্বরী" কোনটি "বাসুদেব" নামে পরিচিত ও পূজিত হইতেছে, তাহা সুপ্রাচীন হিন্দু বৌদ্ধাদি যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে এবং হিন্দু মুসলমান রাজত্ব সময়ের জনসাধারণের সামাজিক বিবর্তনের ছায়া যাহা অদ্যাপি দেশ মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে, তৎসমুদয়ই প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে ; উল্লেখিত সমস্তই জেলার ইতিবৃত্ত-মন্দির নির্মাণকল্পে উপযুক্ত উপাদান ও উপকরণ বলা যাইতে পারে। সুদক্ষ শিল্পী ও কারিগর হইলে, তৎসংযোগে সুদৃশ্য মন্দির নির্মিত হইতে পারে। উক্ত পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে, উপযুক্ত সাধনা ও পুষ্পার্ঘ্যাদি আহরণ আবশ্যক। মাদৃশ ব্যক্তির সেরূপ সাধনা আছে কিনা ও উপকরণাদি সংগ্রহ হইয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে ; মন্ত্র কিংবা পুজোপকরণাদির অভাবে মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রসাদে ও তদীয় সিদ্ধ ও গুণবান সাধকের অনুকম্পায় অকৃতী জনের অশেষ ত্রুটি সত্ত্বেও যৎসামান্য উপহার যেমন গৃহীত হয়, তত্ত্বরসা ও সাহসেই জেলার কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আলোচিত হইল। আশা সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ মরাল-বৃত্তি অবলম্বনে ইহার দোষ ভুলিয়া যদি কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণীয় থাকে, তাহা নিজ গুণে সুসংস্কৃত করিয়া গ্রহণ করিবেন।

নিজ বাটিতে উৎপন্ন অতি সামান্য দ্রব্যও যেমন অতি উপাদেয় ও প্রিয়, নিজ জন্মভূমি যতই নগণ্য ও সামান্য হউক না কেন, তাহা যেমন তথাকার আদিবাসীগণের নিকট সকল সময় সর্বাবস্থায় স্বর্গাদপি গরীয়সী ; নিজবংশে জাত নির্গুণ ব্যক্তিও যেমন "নির্গুণ সগুণ বলে তবু বলে জ্ঞাতি" বোধে রক্ত মাংসের টান নিত্য সম্বন্ধশীল, সর্বদা কলহপরায়ণ হইলেও প্রতিবাসী যেমন আবাল্য একত্র বাস হেতু সর্বদা প্রিয়দর্শন এবং যে স্থানেই থাকুক, তাহার

নিকট নিজ জন্মভূমির কোন লোক, কোন দ্রব্য, তাহার আলোচনা যেমন প্রিয়, তদ্রূপ আমাদের এই ক্ষুদ্র জেলার প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাদি ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির এবং শিক্ষার আলোচনা মনে বিমলানন্দ জন্মায় ; তাহাতে দেশের পূর্ববর্তী মহাত্মাগণের ক্রিয়া কলাপের স্মৃতি একদিকে নৈরাশ্য ও অবসাদ দূর করতঃ সর্বদা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে, অপরদিকে যাহা তাঁহারা চেষ্টা করিয়া ভুল বশত অথবা আলস্য নিবন্ধন সুসম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা সমাধা করিতে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে। ইতিবৃত্ত আলোচনা একদিকে অতীতের ভুল-ভ্রান্তি হইতে আমাদিগকে সতর্ক ও সাবধান করে, এবং জাতীয় ভাব উদ্দীপন করে, পক্ষান্তরে আমাদিগকে নূতন নূতন কার্যক্ষেত্রে প্ররোচিত ও প্রধাবিত করে, ইহাই ইতিহাস আলোচনার ফল ও মুখ্য উদ্দেশ্য। যে জাতিগণ মধ্যে যে স্থানে ইহার যত বেশি আলোচনা ও অনুশীলন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহারা জগতে তত অধিকতর উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে। আর যাহারা অতীতের দিকে না চাহিয়া, ইতিহাসকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহারা তত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেন, "ইতিহাসের জ্ঞান জাতীয় উন্নতির সোপান। যে পরিমাণে অতীত জগত সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার করিব, যে পরিমাণে অতীতের উপদেশ বর্তমানে লাগাইতে পারিব, সেই পরিমাণে আমাদের জনগণ-মন উচিত পথে ধাবিত হইবে। * * * অধ্যাপক সিলি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতার পক্ষে ইতিহাস সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও মহাবন্ধু। ইতিহাসের সাহায্যে অতীতকালের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞান বর্তমানে প্রয়োগ করিতে হইবে। দূরবর্তী যুগে বা দেশে মানবভ্রাতারা কি করিয়া উঠিলেন, কি কারণে পড়িলেন, রাজ্য, সমাজ, ধর্ম কিরূপে গঠিত হইল, কি জন্য ভাঙিল, সেই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের নিজের সমাজের গতি ফিরাইতে হইবে। অতীত হইতে উদ্ধার করা সত্য ও দৃষ্টান্তের দীপশিখা আমাদের ভবিষ্যতের পথে রশ্মিপাত করিবে, ইহাই ইতিহাস চর্চার চরম লাভ।"[২]

প্রাচীন ইতিবৃত্ত ঃ

যে ভূভাগ লইয়া বর্তমান পাবনা জেলা গঠিত হইয়াছে, তাহার কতকাংশ অতি পূর্বে পুণ্ড্র ও বঙ্গ নামক রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ; উক্ত পুণ্ড্র রাজ্যকালে পৌণ্ড্রবর্ধন জনপদ, পরে গৌড় দেশাংশ, তৎপরে বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত হইয়াছিল। বঙ্গভূমি চিরদিন একই নামে খ্যাত ছিল এবং এখনও এই নামেই পরিচিত। তবে ইহার সীমা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ভাগীরথীর উভয় তীরস্থ ভূমি মুর্শিদাবাদের পূর্বাঞ্চল হইতে ঢাকা পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ বঙ্গদেশ নামে খ্যাত, তথাকার অধিবাসী বাঙালি বা বাঙাল নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "ইহার পশ্চিমে সিংভূম, ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগণা, পূর্বে পার্বত্য ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম।" *বাঙলার পুরাবৃত্ত, ৪/৫ পৃষ্ঠা।* সেন রাজত্ব কালে বরেন্দ্রভূমির পূর্ব হইতে মেঘনা নদী পর্যন্ত প্রদেশ বঙ্গভূমি বলিয়া পরিচিত হয়, কিন্তু অতি পূর্বে করতোয়া নদীর পূর্ব দিকস্থ ভূভাগ কামরূপ রাজ্য বা প্রাগ্‌জ্যোতিষ জনপদের অন্তর্গত ছিল। The ancient kingdom of Kamrup, although roughly equivalent to Assam, generally occupied an area larger than that of the modern province, and extended westward to the Karatoya river.[৩] The western boundary of Kamrup was the Karatoya, a river which still rans out of Nepal parallel to the Atrai, through Rungpur and Pabna. * * * * * * * So the present bed of the Jamuna and considerable strips of Rajshahi Division districts must have been included in Kamrup. * * * * This view would leave little room for Banga, the kingdom of the Sens, which lay between Barendra and the Megna.[৪] অর্থাৎ

নেপাল হইতে বহির্গত রঙ্পুর, পাবনাদি রাজশাহী বিভাগীয় জেলাসমূহের মধ্য দিয়া আত্রাই নামক নদীর সমান্তরালভাবে প্রবাহিত করতোয়া নদী প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্দিষ্ট ছিল, এই রাজ্য স্থূলত আসাম বলিয়া গণ্য হইলেও পশ্চিমে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কেহ কেহ কামরূপ ও পৌণ্ড্রবর্ধন উভয় রাজ্য মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদী বলিয়া নির্দেশ করেন, যথা—The kingdom of Pundrabardhan was separated from Kamrup by a large river viz. Brahmaputra.[৫]

বেদোক্ত ঋষি দীর্ঘতমার ঔরসে চন্দ্রবংশীয় বলিরাজ পুত্র পুণ্ড্র ও বঙ্গ নামক পুত্রের অধিকৃত ভূভাগ হইতে যথাক্রমে পুণ্ড্র ও বঙ্গ রাজ্যের উৎপত্তি হয় ;[৬] পুণ্ড্র রাজ্য পরবর্তীকালে পৌণ্ড্রবর্ধন নামক জনপদে পরিণত হয়। তৎপরে শূরবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে বরেন্দ্র শূরের নামানুসারে বরেন্দ্র ভূমি বলিয়া পরিচিত হয় এবং দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে মহানন্দা, উত্তরে কোচবিহার ও পূর্বে করতোয়া নদী ইহার সীমা নির্দিষ্ট হয়। উভয় বঙ্গের বর্তমান জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও পাবনা জেলার পূর্বাংশ ব্যতীত এক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া এই বরেন্দ্রভূমি গঠিত হয়। সময় সময় বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হইলেও ইহার রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত ছিল। সেন রাজত্ব কালে গৌড় নগরে বরেন্দ্রের এবং রামপালে বঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হয়। ইহাতে বোধহয়, পাবনা জেলাস্থ ভূভাগ প্রাচীন পুণ্ড্র বঙ্গ এবং কামরূপ রাজ্যান্তর্গত ছিল।

বর্তমান সময়ে পাবনা ও পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের স্থানে স্থানে পোদ, পোড় বা পুঁড়া, সাধুভাষায় পুণ্ডরিক, পৌণ্ডরিক ও পুণ্ডরী প্রভৃতি নামধেয় যে সকল জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা সকলেই পূর্বতন দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র পুণ্ড্র ও তৎবংশজাত পুণ্ড্র নামক জাতির বংশধর ; অধুনা নিচ জাতীয় রূপে প্রতীয়মান হইলেও, ইহারা সুপ্রাচীন বেদ বর্ণিত উচ্চ জাতিসমূহের বংশধর মাত্র। বাংলা ভাষার সুলেখক ও প্রবর্তক সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত শব্দে 'ণ্ড' থাকিলে, বাঙ্গলার প্রচলিত ভাষায় ড কার ড় কার হইয়া যায়। আর ণ কার লুপ্ত হইয়া পূববর্তী হলবর্ণে চন্দ্রবিন্দু রূপে পরিণত হয়। যথা, ভাণ্ডের স্থলে ভাঁড়, ষণ্ড স্থলে ষাঁড়। আর সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশ হইয়া বাঙ্গালাদিতে পরিণত হইতে গেলে শব্দের রকারাদির সচরাচর লোপ হয়, যথা, তাম্র স্থলে তামা, আম্র স্থলে আম। অতএব পুণ্ড্র শব্দ লৌকিক ভাষায় প্রথমে পুন্ড তারপর পুঁড় বা পুঁড়ো। পুড়ো বাঙ্গালায় একটি সংখ্যায় প্রধান জাতি।"[৭] পাবনা জেলার সাঁড়া, দাদাপুর, দাপুনিয়া ও সাঁথিয়া থানার অনেক গ্রামে এখনও বহু পুঁড়া, পোঁড়, পুণ্ডরিক, কোঁড়, কোঁড়া, কাঁড়াল ও বহু স্থানে চাঁড়াল, নমশূদ্র প্রভৃতি নামে যে সমস্ত জাতি বাস করিতেছে, তাহাদের সকলেই পূর্বতন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র জাতির নামান্তর মাত্র বলিয়া বোধহয়। এদেশে চাঁড়াল বা চণ্ডালও সংখ্যায় একটি প্রধান জাতি। এই জেলায় ইহাদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজারের উপর। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে শব্দ রত্নাবলীর মতানুসারে পৌণ্ড্র শব্দের অর্থ স্থানে চন্দেল দেশ বলিয়া বর্ণিত আছে। পদ্মা ও মহানন্দা সন্নিকটস্থ প্রদেশ চন্দেল বলিয়া জানা যায়। তাহা হইতে রাজশাহী ও মালদহ জেলার চন্দেল বা চান্দলাই নামে একটি বৃহৎ পরগণার নামকরণ হইয়াছে। ইহা পুণ্ড্র দেশের অন্তর্গত, এখানে পূর্বে চন্দেল নামক যে জাতি বাস কবিত, তাহারাও পুণ্ড্র জাতি বলিয়া পরিচিত হইত, কালক্রমে তাহারা বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমণের সময় পূর্ববঙ্গে গিয়া বাস করিতেছে ও চন্দেল বা চান্দলাই নামক জনপদের পূর্ব অধিবাসী বলিয়া চান্দাল, চণ্ডাল বা চাঁড়াল আখ্যায় অভিহিত হইতেছে। বস্তুত ইহারা পূর্বোক্ত পুণ্ড্র জাতির শাখান্তর মাত্র। বোধহয়, বেদোক্ত ঋষির কুলে জাত জন্য ইহাদের দশ রাত্রাশৌচ অদ্যাবধি পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে। তবে কেহ কেহ ইহাদিগকে বর্ণশঙ্কর বলিয়াও উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিক স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় বলে, "খ্রিঃ পূঃ ষোড়শ

শতাব্দীতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ গুণ প্রভাবে ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করেন। তাঁহার শুণঃশেপ নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল, তিনি তাহাকে পুত্র তুল্য স্নেহ করিতেন। তিনি তাহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্র তুল্য জ্ঞান করিতেন এবং শত পুত্রকে ডাকিয়া তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বলায় ৫০ জন স্বীকার করিল, অবশিষ্ট পুত্রগণ অস্বীকার করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহারা পুণ্ড্র দেশে গিয়া বাস করে। এই বৃত্তান্ত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। ইহা খ্রিঃ পূর্ব যোড়শ শতাব্দীর কথা।[৮]

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব ৩৪ অঃ ১৭—১৮ শ্লোক, ঐ শান্তিপর্ব ৬ষ্ঠ অঃ ১৪ শ্লোক, রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪০ সর্গ, মনুসংহিতা ১০ অঃ ৪০—৪৪ শ্লোকে পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে। মহাভারত, সভাপর্ব ৩৪ অঃ ১১ শ্লোক, ঐ ৫২ অঃ ১৬—৭৮ শ্লোকে পুণ্ড্র জাতি ও পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামক পরাক্রান্ত রাজার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে তিনি ভীম কর্তৃক পরাজিত ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শঙ্খ চক্রাদি বিষ্ণুচিহ্ন ধারণ করায়, পরে তৎকর্তৃক নিহত হন। হরিবংশে ৩০ অঃ ৩৩—৩৩ শ্লোকেও পৌণ্ড্রকগণ বালেয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভারত সভাপর্ব ৩০ অঃ ২১ শ্লোক, ঐ ২৬ অঃ ৭—৮ শ্লোকে পুণ্ড্র ও প্রাগজ্যোতিষ জনপদের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪৮ অঃ ৫৮ শ্লোক, মার্কণ্ডপুরাণ ৫৮ অঃ ১২—১৩ শ্লোক, মৎস্যপুরাণ ১১৩ অঃ ৪৫ শ্লোক, বামনপুরাণ ১৩ অঃ ৪৬—৪৭ শ্লোকে পুণ্ড্র ও প্রাগজ্যোতিষ জনপদের বর্ণনা আছে। রামায়ণ ও মহাভারত রচনার কাল নির্ণয় লইয়া নানাপ্রকার মতভেদ আছে। ১৩২৭ সালের কার্তিক ও পৌষ সংখ্যার "প্রবাসী" পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগের মীমাংসার উত্তরে জানা যায় যে, "রামায়ণ খ্রিস্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্বে ও মহাভারত ৫০০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়া ছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল ২৪৪৮ খ্রিস্টপূর্ব নির্ধারিত হইয়াছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ (Vincent A Smith) মতে রামায়ণের অধিকাংশ খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দের পূর্বে রচিত হয়। পরবর্তীকালে অপরাপর অংশ রচিত হয়। মহাভারত রচনার কাল তাঁহার মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ হইতে খ্রিস্টিয় ৪০০ অব্দ। অন্যান্য পণ্ডিতের মত অন্যবিধ।" "বগুড়ার ইতিহাস" লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় জ্যোতির্বিদগণের গণনায় শকাব্দ আরম্ভ হওয়ার ৩১৭৯ বৎসর পূর্বে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। *বগুড়ার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা।* মাননীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় খ্রিস্টাব্দ আরম্ভ হওয়ার ১৪৪৮ বৎসর পূর্বে রামায়ণ মহাভারতাদি রচনার কাল নির্দেশ করেন।[৯] তাহা হইলে বোধহয়, অদ্য হইতে ৫ হাজার বৎসরের মধ্যে উক্ত গ্রন্থাদি রচিত হওয়া সম্ভব। সংহিতাদি রচনা কাল আরও আধুনিক। খ্রিস্টিয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীকাল মধ্যে সংহিতাদি সংকলিত হইয়াছে এমত সামাজিক ও জাতীয় গ্রন্থাদিতে জানিতে পারা যায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এতাধিক বর্ষ পূর্বে পুণ্ড্রদেশ বা পুণ্ড্র জাতি কিংবা প্রাগজ্যোতিষ জনপদ বর্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু তখন নিম্নবঙ্গের এই সমস্ত জেলায় অধিকাংশ স্থল সাগরজলে নিমগ্ন ছিল ; সুতরাং তৎকালে পাবনা প্রভৃতি স্থানের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদগণের মীমাংসায় অন্যরূপ জানা যায়। "বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত" লেখক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Lyall's Principles of Geology নামক গ্রন্থাবলম্বনে অনুমান করেন ৪৫০০ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমি সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন ছিল, পরে করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, গঙ্গা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত মৃত্তিকা রাশি সমুদ্রমুখে পতিত হইয়া প্রথমে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি জেলা গঠিত হয়, তাহার বহু শতাব্দী পরে নদীয়া, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি জেলাসমূহ গঠিত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয়, অনূন্য ৩/৪ হাজার বৎসর পূর্বে এই জেলা সমূহের ভূভাগ গঠিত হইয়া

থাকিবে। তখন হইতেই পুণ্ড্রাদি জাতি হইতে জাত আধুনিক পোদ, পুঁড়া, পুণ্ডরী, চান্দাল বা চাঁড়াল প্রভৃতি জাতিগণ এদেশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বর্গীয় বটব্যাল মহাশয় বলেন, "আমার যতদূর দৃষ্টি তাহাতে ইহার পূর্বে পুণ্ড্রদেশ ঘটিত আর কোন কথাই লিপিবদ্ধ হয় নাই। ফলতঃ খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীর কথাও অল্প প্রাচীন নহে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, এখনকার সময়ের সার্দ্ধ ত্রিসহস্র বৎসর পূর্বেও পুণ্ড্রজাতি ও পুণ্ড্রদেশ বর্তমান ছিল।" [১০] আবার পাবনা জেলার যে কয়েক প্রকার ইক্ষু জন্মিতে দেখা যাইতেছে, তন্মধ্যে বেদোক্ত পুণ্ড্রেক্ষু, রক্তেক্ষু প্রভৃতি কয়েকটি ইক্ষু এই জেলায় অদ্যাপি উৎপন্ন হইতেছে ; ইহাতে বোধহয়, এ দেশ অতি পুরাকালেও বর্তমান ছিল, একেবারে আধুনিক নহে।

উপরোক্ত "বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত"কার এবং প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমবাবু বিবিধ প্রবন্ধের ব্রাহ্মণাধিকার, ১ম প্রস্তাবে পুণ্ড্র জাতিকে অনার্য জাতি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ; কিন্তু পূর্বোক্ত মহাভারত, মনুসংহিতাদি গ্রন্থোক্ত বালেয় ক্ষত্রিয়গণের বিবরণ, পৌণ্ড্রক বাসুদেবের বর্ণনা, অভিশপ্ত বিশ্বামিত্র নন্দনগণের কাহিনী পাঠে ইহাদিগকে অনার্য বা হীন জাতি বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ পরিলক্ষিত হয় না। ১৩১৬ সালের ভাদ্র সংখ্যার "প্রবাসী"তে আর্য পৌণ্ড্রক শীর্ষক প্রবন্ধে বাচস্পত্যাভিধান ও নানাপ্রকার টীকাকারগণের মতে ইহাদিগকে ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অধুনা এই জেলায় ও অন্যত্র যে সকল পুণ্ডরিক বা পুঁড়া জাতি দেখা যাইতেছে, তাহারা সকলেই শাকসবজীর আবাদ ও অন্যান্য কৃষিকার্যাদিতে লিপ্ত। ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি ব্যবসায়াদি দৃষ্টে, ইহাদিগকে কখনই হীন জাতি বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব বর্ণিত মত ক্ষত্রিয়কুলে জাত হইলেও বর্তমানে ইহারা সকলেই কৃষি বাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বী ; ইহারা মূলত নিচ জাতি নহে ; তবে কালক্রমে অনার্য সংশ্রবে বা যুগধর্মে জাতিভেদাদি বর্জিত বৌদ্ধাদি ধর্মাশ্রয়ে ইহাদের পাতিত্য ঘটিতে পারে। বোধ হয়, তন্নিমিত্তই রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনমোহন চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন, "The Pundras were too powerful to be left out of the Aryan pale, but had rites and customs so different from those in the home of Vedic Brahmans." [১১] অর্থাৎ পুণ্ড্রগণ এতদূর প্রভাবশালী যে, তাহাদিগকে আর্যগণ্ডী হইতে পৃথক করা যায় না, তবে ইহাদের রীতি নীতি বেদবর্ণিত আচার পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—হিন্দু রাজত্ব কাল

ক. জৈন-বৌদ্ধযুগ ঃ

"বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত" পাঠে জানা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি জৈন ধর্ম প্রবর্তকগণ, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি স্থানে উক্ত ধর্মমত প্রচলন করেন। পার্শ্বনাথ খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৭ অব্দে নির্বাণ লাভ করেন, নেমিনাথ তৎপূর্ববর্তী ছিলেন। উত্তরকালে মহাবীর কর্তৃক জৈনধর্মের বহুল প্রচার হওয়ার জন্য অনেকে মহাবীরকেই এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া নির্দেশ করেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "Mahabir, The founder of Jaina religion died one hundred and fifty years before Chandra Gupta ascended the throne i.e. in 667. B.C." [১২] অর্থাৎ জৈনধর্ম প্রবর্তক মহাবীর চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণের ১৫০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ

খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৭ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। মহাবীর ইহাতে পরবর্তী সময়ের লোক বলিয়া বিবেচিত হইলেও বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের পূর্বে বঙ্গদেশে জৈন ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। জৈনধর্ম হিন্দু ধর্মের একটি শাখা মাত্র এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতি জৈনদিগের শ্রদ্ধা থাকিলেও, তাহারা বৈদিক ক্রিয়াকলাপের ও আচার পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। এইজন্য বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি জনসাধারণের আস্থা কমিয়া যায়। জৈনধর্মাবলম্বীগণ সকলেই শৈবশাক্তগাণপাত্য মতের পক্ষপাতী ও শিবভক্ত ছিলেন ; গবাদি পশুর প্রতি তাহারা অতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। অদ্যাপি গোরক্ষা কল্পে যে সমস্ত পিঞ্জরাপোল স্থানে স্থানে দেখা যায়, তৎসমুদয়ই জৈনদিগের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।

পাবনা জেলায় গাভী প্রসবান্তে মাসাধিক কাল পর বা মধ্যে "গোরক্ষনাথের ধারশোধা," চলিত ভাষায় "গোক্ষুরনাথের ধারশোধা" নামে হিন্দু মুসলমান জাতি নির্বিশেষে যে প্রাচীন প্রথা ও তদুপলক্ষে গীত পাঁচালি আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহা উক্ত জৈন ধর্মমতের গোজাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রথা বিশেষ এই জেলার স্থানে স্থানে বিশেষত পাবনা সদরের, বাদাই, রাণীনগর, রাইশিমুল প্রভৃতি ও সিরাজগঞ্জ মহকুমার সোহাগপুর, বড়ধুল, ছোটধুল, চাপানিদেলুয়া প্রভৃতি গ্রামে যে সমস্ত কাপালিক, নাথ ও যোগী সম্প্রদায়ের জাতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ইহারা সকলেই প্রাচীন জৈন যুগের উক্ত ধর্মাবলম্বী জাতি সমূহের নিদর্শন। ইহাদের অধিকাংশই বস্ত্রবয়ন অথবা দেশীপ্রথায় পাট দ্বারা চট বা ছোলা তৈয়ারি কার্য কিংবা অনেকেই কৃষিকার্যে লিপ্ত দেখা যায়। ইহারা প্রথমে নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ প্রভৃতির প্রবর্তিত জৈনধর্মাবলম্বী ছিল বলিয়া, ইহাদের কেহ কেহ নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহারা সকলেই শিব গোত্রীয় ; হিন্দু তান্ত্রিক মতাবলম্বী ও শিবের নামানুসারে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রসার সময়ে গোরক্ষনাথ প্রভৃতি হঠযোগ বলে নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শনের ফলে যোগী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কালে তান্ত্রিক বামাচার মতে নানাপ্রকার উপাসনা পদ্ধতির প্রচার সময়ে কাপালিক নামে পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কথিত আছে "নাথ" সম্প্রদায়ভুক্ত "যোগী"গণ "এক সময়ে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভারতীয় রাজন্যবর্গের গুরুপদে বরিত হইয়াছিল।"

"অশোক অবধান" নামক একখানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। * * * এই গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্ধনের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদ্বেষী বীতাশোক তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বৌদ্ধধর্মানুরাগী সম্রাট অশোক কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া আত্মরক্ষার্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুর্ভেদ্য আশ্রয় স্বরূপ পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যে পলায়ন করেন। অশোক ২৭০ খ্রি পূর্বাব্দে রাজসিংহাসন লাভ করেন। * * * "অশোক অবধানের" মতে পৌণ্ড্রবর্ধন একটি প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল।[১৩] জানা যায় অশোকের বৌদ্ধধর্ম বিস্তার সময়ে পৌণ্ড্রবর্ধন জনপদের যেখানে বুদ্ধদেব স্বীয়ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তথায় একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণ করেন।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের অবস্থা ক্রমে হ্রাস ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার আরম্ভ হয় ; তখন দেশ মধ্যে বৌদ্ধবিহার, মঠ, সঙঘারাম প্রভৃতি নির্মিত হইতে থাকে। পাবনা জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে রায়গঞ্জ থানায় স্থানে স্থানে যে সমস্ত উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ ও তদুপরি ইস্টকালয়ের নিদর্শন এবং কোন কোন স্থানে দ্বারদেশে সংস্থাপিত বুদ্ধমূর্তিযুক্ত যে সকল কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা উক্ত বৌদ্ধবিহার, মঠ ও চৈত্যের চিহ্ন বলিয়া অনুমান হয়। জৈন বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও শক রাজত্বকালে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম প্রবল ছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বঙ্গদেশে প্রতিমা পূজা প্রবর্তিত হয় এমত জানা যায়। আমাদের দেশে ৩/৪ হাত উচ্চ শিবলিঙ্গ মূর্তি সকল এই সময়ে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে ইহাও অনেকে অনুমান করেন। রায়গঞ্জ থানার অধীন তালম গ্রামে প্রায় ৩ হাত উচ্চ

যে প্রস্তরময়ী শিবলিঙ্গ মূর্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাও এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধহয়। তালম গ্রাম পাবনা ও বগুড়া জেলার সান্নিধ্যে অবস্থিত। এতদঞ্চলে প্রবাদ—

"গাঁও দেখ ত কলম,
বিল দেখ ত চলন,
শিব দেখ ত তালম,"

প্রচলিত আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ এই শিব রাণী-ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করেন ; বোধহয়, তাঁহার সময়ে এখানে পূজাদির সুব্যবস্থা হওয়ার জন্য তাহার নাম ইহার সহিত বিজড়িত হইয়া থাকিবে। এতদঞ্চলে নিকটবর্তী তাড়াস গ্রামে কপিলেশ্বর শিবলিঙ্গ নামে যে অনাদি লিঙ্গমূর্তি দেখা যাইতেছে, তাহা তারাসুন্দরীর সময়ের বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানা যায়, ইহাতে অনুমান হয়, এতদঞ্চলে বৌদ্ধযুগে শক রাজত্ব সময়ে এই সকল লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অথবা তাহার অব্যবহিত পরে বৌদ্ধতান্ত্রিক কালে স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনের অভ্যুদয় সময়ে তৎকর্তৃক বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান নামক দুই ভাগে বিভক্ত হয়। যখন বৌদ্ধশূন্য বাদের উপর হিন্দুর যোগ ও ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত হয়, মহাযান বৌদ্ধমত হিন্দু তান্ত্রিকতার সহযোগে সহজে দেশ মধ্যে ক্রমশ প্রচার লাভ করিলে, ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ও শৈবধর্ম সংমিশ্রণে এক হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম সমন্বয়ের আবির্ভাব হয়, তৎকালেই এদেশে শিবপূজা পদ্ধতি বহুল পরিমাণে প্রতিপত্তি লাভ করে। রায়গঞ্জ থানায় স্থানে স্থানে বৃক্ষতলে পুঞ্জীকৃত শিবলিঙ্গ এবং পুষ্করিণী ইন্দারাদি খননকালে এদেশে যে সমস্ত প্রস্তরময়ী শিবলিঙ্গ মূর্তি পাওয়া যায়, তাহা ঐ যুগের এতদঞ্চলে পূজা পদ্ধতি প্রচলিত থাকার নিদর্শন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তৎকৃত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ডে" (১২০ পৃঃ) লিখিয়াছেন "মহাযান স্থানই পরবর্তীকালে "মহাস্থান" নামে পরিচিত হইল। মহাযানদিগের উপাস্য দেবদেবীর মূর্তি শোভিত পীঠস্থান ও মহাস্থান গন্ধকুঠি নামে পরিচিত হইত। পূর্বে এখানে গড় থাকায়, এই স্থান "মহাস্থান গড়" নামে অভিহিত হইতেছে।" এই স্থান পাবনা জেলার রায়গঞ্জ থানার সীমা সংলগ্ন। এক সময়ে শিবের আরাধনা, শিবের গাজন, শিবের গীতি এদেশে অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এখন পর্যন্তও এদেশে "ধান বান্‌তে শিবের গীত" একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। শিবপূজায় জাতিভেদ নাই, শিবমন্দিরে হিন্দুর সমস্ত জাতি প্রবেশ করিতে পারে এবং শিবের গাজনে উচ্চ নিম্ন সমস্ত শ্রেণীর হিন্দু যোগদান করে। এই শৈব মত এদেশে এই হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয়কালেই প্রচলিত হওয়া বিশেষ সম্ভব।

খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীর শেষ অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে ভৌজ-গৌড়গণ বঙ্গদেশ জয় করেন, ইহারা সম্ভবত নাগবংশীয় ; দক্ষিণাত্যের অন্তর্গত গৌড় অঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহারা ভোজগৌড় নামে আখ্যাত ছিলেন। "বগুড়ার ইতিহাস" লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "আইন-ই-আকবরি ও মিনহাজুল মুতাক্ষরীণের মতে কায়স্থ জাতীয় ভোজবংশীয় ৯ জন রাজা ৫২০ বৎসর রাজত্ব করার পর সুবে বাংলায় শূরবংশীয় আদিশূরের অভ্যুদয় হয়।"[১৪] ইহাতে বোধহয়, ভোজরাজগণ খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে রীতিমত শাসন বিস্তার করেন এবং তাহারা দাক্ষিণাত্যের গৌড় অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন ও সেখান হইতে এদেশে আগমন করেন, তখন হইতে বঙ্গভূমি গৌড়দেশ নামে কথিত হইতে থাকে, বোধহয় তখনও সুবিস্তৃত বঙ্গদেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল, সেইজন্য বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যাদি স্থান গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্য নামে অভিহিত হইত। ইহারা কোন জাতীয় ও কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা সবিশেষ জানা যায় না। তবে ইহাদিগকে

কায়স্থ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহাদের সমকালের কোন প্রাচীন কীর্তি ও নিদর্শন অধুনা জানিতে বা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই জেলায় গয়েশবাড়ি নিবাসী রায় উপাধি বিশিষ্ট কায়স্থগণ নাগবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইহারা বলেন বঙ্গ বারেন্দ্র-কায়স্থ সমাজ স্থাপয়িতা ভৃগুনন্দী প্রমুখ কায়স্থগণের সাহায্যকারী পাবনা জেলা সরগ্রাম নিবাসী চটাধর নাগ ও যশোহর জেলার শৈলকুপা নিবাসী কর্কট নাগ ইহাদের পূর্বপুরুষ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর মতে কাশীদাস কৃত আদি ঢাকুরের বর্ণনানুসারে জানা যায়, নাগবংশীয় কায়স্থগণ নাগকোট, নাগপুর প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী, তবে তাহাদের বঙ্গে আগমন আদিশূরের রাজত্বকালে ঘটিয়াছিল। এই জেলার উক্ত গয়েশবাড়ি প্রভৃতি স্থানের পূর্বতন কায়স্থগণ নাগবংশীয় ভোজগৌড়গণের বংশধর কিনা তাহা বিবেচনার বিষয় সন্দেহ নাই, তবে নদীয়া কৃষ্ণনগরের উকিল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় মহাশয় তৎকৃত 'নাগবংশ' নামক পুস্তিকায় গয়েশবাড়ি গ্রামের রায় উপাধিক কায়স্থগণকে নাগবংশ বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন।

খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ হইতে গুপ্তসম্রাটগণের অভ্যুদয় কাল। ইহাদের রাজ্যারম্ভে শক, সেন প্রভৃতি রাজগণ বঙ্গের স্থানে স্থানে রাজত্ব করিতেন। সমুদ্রগুপ্ত ৩৪৭ হইতে ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং এই সময় মধ্যে সমতট, ডবাক (বর্তমান ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চল), নেপাল, কামরূপ প্রভৃতি জনপদ জয় করেন। ইহাতে বোধহয় ভোজরাজ ও গুপ্তসম্রাটগণ একই সময়ে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। "খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধজৈনদিগের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। পৌণ্ড্রবর্ধন তাহাদের নিকট পুণ্যস্থান বলিয়া গণ্য ছিল। দেবকোট, পুণ্ড্রবর্ধন, মহাস্থান, শেলবর্ষ তাহাদের পবিত্র তীর্থ ছিল। মহাস্থানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল শীলবর্ষ নামে আখ্যাত হইত। শীলবর্ষ সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল, আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে।"[১৫]

শীলবর্ষ বা শেলবর্ষ পাবনা জেলার একটি পরগণার নাম, ইহা রায়গঞ্জ থানায় বগুড়া জেলার সান্নিধ্যে অবস্থিত। ইহাতে বোধহয় গুপ্তরাজগণের সময়ে পাবনা জেলার পশ্চিমোত্তরস্থ ভূভাগে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল। এদিকে স্থানে স্থানে বিশেষত নিমগাছির উত্তরাংশে যে সকল উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ, সুবৃহৎ দীর্ঘিকাদি ও প্রাচীন রাজবর্ত্মের নিদর্শন বর্তমান আছে, তৎসমুদয়ই এই যুগে বা পরবর্তী বৌদ্ধরাজত্ব কালে নির্মিত হইয়া থাকিবে। গুপ্তরাজগণ কেহ বৌদ্ধবিহার, মঠ নির্মাণ এবং বৌদ্ধ ধর্মে উৎসাহদান করিলেও অনেকে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মমতাবলম্বী ছিলেন। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "The Guptas were worshippers of Bishnu and the image of Lakshmi figures in their coins." (School History of India P. 23) অর্থাৎ গুপ্ত সম্রাটগণ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং লক্ষ্মীমূর্তি তাঁহাদের মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলার স্থানে স্থানে (যথা পোতাজিয়ায় পূজিত দয়ামাধব, হাণ্ডিয়ালে প্রাপ্ত বাসুদেব মূর্তি ও বাবুলদহে রক্ষিত বাসুদেব মূর্তি) যে সকল প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণু মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ই গুপ্তরাজত্বকালে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিশেষ সম্ভব। এই জেলায় নরসিংহপাড়ার সিদ্ধেশ্বরী, চৈত্রহাটির কালীমূর্তি, সরগ্রামের ভবানী, উধুনিয়ার চৈতন্যভৈরবী প্রভৃতি যে সকল প্রস্তরময়ী মূর্তিসমূহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তৎসমুদয় বৌদ্ধতান্ত্রিক কালে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করা যায়। কারণ খ্রিস্টিয় তৃতীয় হইতে যষ্ঠ শতাব্দী কাল মধ্যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বঙ্গে তান্ত্রিকতার প্রসারলাভ ঘটে। এই সময়ে গুপ্তরাজগণ তান্ত্রিক ধর্মে অনুরাগ প্রকাশ করায় বঙ্গদেশে তান্ত্রিকতা প্রবল হইয়াছিল। "যে বঙ্গদেশ এক সময়ে অপবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত, গুপ্তরাজগণের সময় তাহা তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। স্কন্দপুরাণে পুণ্ড্রবর্ধন একটি তীর্থস্থান বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের কালীঘাট, করতোয়াতট * * পীঠস্থান বলিয়া কথিত হয়।"[১৬]

এই সকল প্রস্তরমূর্তির অধিকাংশই দীঘি পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় খনন কালে কিংবা

বিলখাল প্রভৃতিতে পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে এবং অধুনা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে ইহাদের কোনটি কালী, কোনটি ভৈরবী কিংবা কোনটি বাসুদেব প্রভৃতি নামে পূজিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে, ইহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের অবলোকিতেশ্বর মূর্তিবিশেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্কের রাজত্বকালে অবলোকিতেশ্বর মূর্তির পূজা আরম্ভ হয়। চীন ও জাপানে অবলোকিতেশ্বরদেব স্ত্রীমূর্তিতে এবং তিব্বতে ও ভারতে পুরুষরূপে অর্চিত হইতেন। বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় এসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন।[১৭]

এই মূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের কলা (অংশ) লইয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ কর্তৃক কল্পিত; তজ্জন্য ইহাদের কাহারও হাতে কমণ্ডলু, কোথাও ত্রিশূল, কোথায়ও অক্ষমালা, কোথায়ও পদ্ম, কোথায়ও শঙ্খ, কোনস্থলে মূর্তি চতুর্ভুজ ও কোন স্থলে ষড়ভূজ। কেহ শঙ্খ ও পদ্ম দর্শনে ইহাদিগকে বাসুদেবমূর্তি জ্ঞানে পূজা করিতেছে, কেহ অক্ষমালা ও ত্রিশূল দেখিয়া ভবানী বা ভৈরবী বোধে ইহাদের অর্চনা করিয়া আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে চৈত্রহাটির কালীমূর্তি, নরসিংহপাড়ার সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি, সরগ্রামের ভবানী দেবী এবং ষড়ভুজ বিশিষ্টা উধুনিয়ার চৈতন্যভৈরবী মূর্তিসকল মনোনিবেশ সহকারে দেখিলে ইহাদিগকে কোনক্রমেই কালী, বা ভৈরবী আদির কোন মূর্তি বলিয়াই অনুমান করা যায় না। ইহা বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের অবলোকিতেশ্বর মূর্তি সদৃশ বলা যাইতে পারে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা ইহাদের পরীক্ষা ও রহস্য উদ্ঘাটন এবং তথ্য নির্ণীত হইলে, এতৎ সমূহের মধ্যে অনেক পুরাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে। চাটমোহর মসজিদে যে প্রস্তর-ফলকে মাকুম বা মাসুম খাঁ কর্তৃক ৯৮৯ হিজরিতে মসজিদ নির্মাণের স্মরণলিপি খোদিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার অপর পৃষ্ঠায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ত্রিমূর্তি স্পষ্ট অঙ্কিত বা খোদিত আছে, ইহাতে বৌদ্ধযুগের নব প্রচারিত ত্রিমূর্তি সংযোগ উপাসনাপদ্ধতি সূচিত হওয়া ভিন্ন আর কিছুই অনুমান করা যায় না। বোধ হয়, পূর্বে এই মসজিদ হিন্দু মন্দির ছিল, পরে মুসলমান আমলে ইহা মসজিদে পরিণত হইয়াছে। পূর্বোক্ত মূর্তিসমূহের অধিকাংশগুলিই জলাশয়ে, বা জলাশয় খনন কালে পাওয়া গিয়াছে এরূপ জানা যায়, কাহারও নাসিকা ক্ষত, কাহারও হস্তাদির ভগ্নাবস্থা দর্শনে বোধ হয় যে, পরবর্তী মুসলমানগণের অত্যাচারকালে ইহাদের কতক ভগ্ন হয়, কতক জলমধ্যে লুক্কায়িত বা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ক্রমশঃ পাওয়া যাইতেছে ও নানা প্রকারে পূজিত হইতেছে। জল মধ্যে হইতে ইহাদের প্রাপ্তিসহ মায়ের স্বপ্নাদেশ প্রভৃতি যে সমস্ত উপাখ্যান কালসহকারে সংযোজিত হইয়াছে, তাহা লোকের ভক্তি আকর্ষণ উদ্দেশ্যে রচিত বা কল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

হিন্দুদিগের অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় গণেশপূজা পৃথকভাবে এদেশে প্রচলিত নাই। গণেশ মূর্তি পূজা স্বতন্ত্র ভাবে না থাকিলেও অনেকের বাড়িতে দেওয়াল গাত্রে বা দরজার সম্মুখে গণেশ মূর্তি অঙ্কিত, খোদিত বা রক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ব্যবসায়ী জাতিগণের নিকট ইহার বিশেষ সম্মান আছে। বৈশ্য ও বাণিজ্যজীবী জাতিগণের বিশেষ অনিষ্টকারী মুষিকের শাসকরূপেই বোধ হয় মুষিকবাহন গণপতি ইহাদের নিকট সম্মানিত। অনেকে যাত্রাকালে বা কোন শুভকার্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় সিদ্ধিদাতা গণেশের নামোচ্চারণ করিয়া থাকে। প্রস্তরময়ী কোন গণেশ মূর্তির পরিচয় বর্তমানে জেলার মধ্যে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না, তবে প্রত্যক্ষদর্শীদিগের নিকট জানা গিয়াছে যে ফরিদপুর পুলিশ স্টেশনের অধীন গোপালনগরের আখড়ায় নিকটবর্তী ন্যাচরাদহ হইতে প্রাপ্ত একটি সুন্দর সুঠাম প্রস্তরময়ী গণেশমূর্তি বহুদিন রক্ষিত ছিল; উহা কয়েক বৎসর পূর্বে অগ্নিদাহে বিনষ্ট হইয়াছে। বর্তমানে গণেশ ঠাকুরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি যাহা কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হয়, তাহা কেবল দেওয়াল গাত্রেই পর্যবসিত হইয়াছে, ইহাও জৈন বৌদ্ধযুগের প্রবর্তিত প্রথার নির্দশন মাত্র।

খ্রিস্টিয় ৬২৯ অব্দ হইতে ৬৪৫ অব্দ মধ্যে চৈনিক-পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। ঐ সময় মধ্যে তিনি পৌণ্ড্রবর্ধন জনপদ ও তাহার রাজধানীতে আগমন করেন। পূর্বে জানা গিয়াছে পৌণ্ড্র বর্ধনের যে স্থানে বুদ্ধদেব স্বীয়ধর্ম প্রচার করেন, অশোকের রাজত্বকালে তথায় একটি স্তূপ নির্মিত হয়। বোধ হয় তজ্জন্য গুপ্ত সম্রাটগণের রাজত্ব কালে তান্ত্রিকতার প্রাদুর্ভাব সময়ে মহাস্থানগড় একটি প্রসিদ্ধস্থান বলিয়া পরিণত হয়। হুয়েনসাঙ উক্ত তীর্থ দর্শনাভিলাষেই তথায় আগমন করেন। তিনি তৎকালীন বঙ্গভূমির পৌণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট, কামরূপ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগে পরিভ্রমণ করতঃ পৌণ্ড্রবর্ধন জনপদের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে জানা যায়, তথাকার অধিবাসীগণ সমৃদ্ধিশালী ও শিক্ষিত, দেশ শস্যসম্ভারে পূর্ণ, নিম্নভূমি হইলেও এই জনপদের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে সুদূর বিস্তৃত জলাশয় ও দীর্ঘিকাদি বর্তমান ছিল। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, "চীন পরিব্রাজক এখানে আসিয়া ১০০টি দেবমন্দির, ২০টি বৌদ্ধ সংঘারাম ও তাহাতে তিন হাজারের অধিক শ্রমণ ও বহুসংখ্যক দিগম্বর জৈন দর্শন করিয়াছিলেন।" ("বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস," রাজন্যকাণ্ড ১১৯/২০ পৃষ্ঠা) এই জেলার রায়গঞ্জ থানার পার্শ্ববর্তী, বগুড়া জেলার এলাকাধীন মহাস্থানগড়কেই তিনি পৌণ্ড্রবর্ধন জনপদের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধনপুর বলিয়া মনে করিয়াছেন। রায়গঞ্জ থানার কহিত, নিমগাছি, তাড়াশ, চৈত্রহাটি, আমশরা প্রভৃতি প্রাচীন পল্লী অঞ্চলে যে সমস্ত ইস্টক ও প্রস্তর মিশ্রিত নাতিউচ্চ মৃত্তিকা স্তূপাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তৎকালীন ঐ প্রদেশের সমৃদ্ধিশালী জনপদের ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শন। উল্লাপাড়ার অধীন চৈত্রহাটি নামক গ্রামটি বৌদ্ধযুগের চৈত্রহাট অর্থাৎ বহুসংখ্যক চৈত্য মঠ প্রভৃতি ও তন্মধ্যে বাসকারী বহুসংখ্যক জনতাবহুল বৌদ্ধশ্রমণগণের নিবাসস্থলের পরিচয়জ্ঞাপক বলা যাইতে পারে। প্রমাণ এখানকার বৌদ্ধতান্ত্রিক কালের অবলোকিতেশ্বর মূর্তি ; যদিও ইহা কালিমূর্তি জ্ঞানে বর্তমানে পূজিত, কিন্তু সহসা কালীর প্রতিমা বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই জেলার সুজানগর থানায় চৈত্রহাটি নামে অপর একটি গ্রাম আছে বটে, কিন্তু সেখানে বা তন্নিকটবর্তী স্থানে এখানকার ন্যায় প্রাচীনত্ব জ্ঞাপক নিদর্শনাদি বিদ্যমান নাই। শেষোক্ত চৈত্রহাটি চাকীহাটা নামেও খ্যাত। আবার উল্লাপাড়া থানাতেই এতদঞ্চলের নিকটবর্তী "নান্নামধু" নামে যে একটি পল্লী দেখা যাইতেছে, তাহা মণ্ডিতশীর্ষক বৌদ্ধশ্রমণ, বা চলিত ভাষায় "নাড়ামুড়া" সন্ন্যাসী নামের পরিচায়ক বলিয়াই বোধ হয়। ইহাতে অনুমান এতদঞ্চলে তৎকালে বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার হইয়াছিল। করতোয়া নদী তৎকালে এদিকে বিপুলকায়া স্রোতস্বতীরূপে প্রবাহিত থাকায়, এদেশ সভ্যতা ও ধর্মের স্রোতেও প্লাবিত হইয়াছিল। অতীত যুগের নিদর্শন স্বরূপ এক্ষণেও স্থানে স্থানে উচ্চ স্তূপ ও ভূখণ্ড এবং মধ্যে মধ্যে প্রাচীন রাজবর্ত্ম ও সুদূর বিস্তৃত দীর্ঘিকাসমূহ বর্তমান রহিয়াছে।

খ্রিস্টিয় ৭ম শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতের পূর্বপ্রান্তস্থিত বঙ্গদেশ বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গ কর্তৃক আক্রান্ত হইতে থাকে ; তখন পৌণ্ড্র দেশ বা গৌড়বঙ্গে এক প্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে গৌড়, ওড, কলিঙ্গ ও কোশল, কামরূপরাজগণের হস্তগত হইয়াছিল। এই সময়ে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মা সমগ্র উত্তরাপথ অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। * * * * যশোবর্মা ৭৩৪—৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় মধ্য চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তপীড় যশোবর্মকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। যশোবর্মা পরাজিত হইলে গৌড় মণ্ডলের অধিপতি ললিতাদিত্যকে কতকগুলি হস্তী উপহার দিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন।"[১৮]

ইহাতে বোধ হয়, পূর্বে কামরূপরাজ হর্ষদেব কর্তৃক এবং পশ্চিমে কান্য কুব্জাধিপতি যশোবর্মা ও কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য কর্তৃক গৌড়দেশ আক্রান্ত হইলে, যখন তথায়

অরাজকতার সূত্রপাত হয় তৎসুযোগ অবলম্বন করিয়াই অনুমান ৭৪০—৭৪২ খ্রিস্টাব্দ মধ্যে শূরবংশীয় আদিশূর গৌড়দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম জয়ন্ত অর্থাৎ জয়শীল ; শূরবংশীয় আদিরাজা বলিয়া আদিশূর তাঁহার উপাধি মাত্র। এই সমস্ত বৃত্তান্ত কহ্লণ মিশ্র প্রণীত "রাজতরঙ্গিণী" ও বাকপতিরাজ বিরচিত "গৌরবধ বা গউডবহো" নামক গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে।

এই সময়ে বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্ম প্লাবিত হইয়া পরে তান্ত্রিকতার প্রভাবে সদাচার ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বর্জিত হইয়াছিল। তজ্জন্য আদিশূর রাজ্যারোহণ করিয়াই বিলুপ্তপ্রায় বৈদিকমার্গ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।[১৯] বর্তমান পাবনা জেলা পূর্বে পৌণ্ড্রবর্ধন জনপদের অধীন ছিল ; শূররাজগণের সময়ে পূর্বে করতোয়া ও পশ্চিমে মহানন্দা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগ বরেন্দ্রভূমি বলিয়া খ্যাত হইলে. পাবনা উক্ত বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত হয়। তখন হইতে আদিশূর আনীত কোন কোন ব্রাহ্মণ ও যেসকল জাতিগণ এই জেলার ভূভাগে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তজ্জন্যই এই জেলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, মালী, তন্তুবায়াদি হিন্দুসমাজোক্ত জাতিগণ মধ্যে অধিকাংশ বারেন্দ্র শ্রেণী বলিয়া পরিচিত। রাঢ়ী বঙ্গজ শ্রেণীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

এই শূররাজগণের জাতি নির্ণয় লইয়া মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহাদিগকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[২০] কিন্তু গোষ্ঠীকথায় লিখিত আছে—

"আদিশূর রাজা বৈদ্য বৈশ্য তার জাতি।
একছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি।"

বলিয়া আদিশূর যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা কায়স্থ ছিলেন, তৎসম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হইয়াছেন। যাহা হউক, শূরবংশীয় রাজগণ প্রায় ১০৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিলেও আদিশূরের পুত্র ভূশূরের রাজত্বকালে ৭৮৩—৮১০ খ্রিস্টাব্দ মধ্যে পালরাজগণ তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া সমগ্র পৌণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্রভূমি দখল করিতে আরম্ভ করেন। তখন শূররাজ রাঢ় অঞ্চলে গিয়া বঙ্গের পশ্চিমভাগে রাজত্ব করিতে থাকেন।

খ. পালরাজত্ব কাল ঃ

রাজা ভূশূর (৭৮৩—৮১০) পৌণ্ড্রবর্ধন পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, গৌড়রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্মপালের তাম্রশাসনে সেই সময়ের অবস্থা "মাৎস্য-ন্যায়" বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। যেমন প্রবল মৎস্য দুর্বল মৎস্যকে নাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ গৌড়ের সর্বত্র দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই সময়ে গৌড়মণ্ডল ও নিকটবর্তী পাঁচটি প্রদেশেই প্রত্যেক রাজন্য, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ও প্রত্যেক বণিক স্ব স্ব প্রাধান্য সংস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গৌড়রাজ্যের এই অরাজকতা নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রজাসাধারণ বপ্পটের পুত্র গোপালকে গৌড়রাজ-লক্ষ্মীপ্রদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে রাজা করিয়াছিলেন।"[২১]

কিছুদিন পর্যন্ত প্রজাকুলকে অরাজকতা ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশের প্রবল রাজন্যবৃন্দের আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই প্রথমে গোপালদেবের রাজত্ব সময়ের প্রধান কর্তব্য ছিল বলিয়া এই পালনকারী রাজা গোপালদেব হইতে যে রাজবংশের অভ্যুদয় হয় তাহাই ইতিহাসে পাল রাজবংশ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। "অনুমান হয় গোপালদেব ৭৮৫—৮৯০ খ্রিঃ মধ্যে রাজা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। * * * ৭৯০—৭৯৫ খ্রিঃ মধ্যে কোন সময়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।"[২২] ধর্মপালের রাজত্বকাল লইয়াও নানা মতভেদ আছে। তবে ইহা এক প্রকার স্বীকৃত হইয়াছে যে তিনি খ্রিস্টিয় ৭৯৫ হইতে ৮৩৪ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং ঐ কাল মধ্যে গৌড় বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর মতে "অনুমান হয় ধর্মপালদেব পঞ্চত্রিংশ বর্ষকাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ধর্মপালদেবের রাজ্যকালে স্বর্ণরেখ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে বরেন্দ্রভূমির করঞ্জ নামক একখানি গ্রাম "শাসন" স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বর্ণরেখের উত্তরপুরুষ 'হরচরিত' নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "হরিচরিত" কাব্যের একখানি পুথি নেপালে, নেপালরাজের গ্রন্থাগারে আবিষ্কার করিয়াছেন, এই গ্রন্থে স্বর্ণরেখের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

"গ্রামোত্তমোঽস্ত্যমলমঞ্জুগুণৈকপুঞ্জঃ
শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বন্দতমো বরেন্দ্র্যাম্।
যত্র শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পদ-প্রবীণাঃ
সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণা স্ম বসন্তি বিপ্রাঃ।।
কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ
শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোঽবতীর্ণঃ।।
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং
জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্ম্মপালাৎ।।"

Catalougue of Palmleaf and Selected Mss., Durbar Library, Napal by Mahamohopadhya Haraprasad Shastri P. 134.[২৩] এই করঞ্জ বা করঞ্জা গ্রাম বরেন্দ্রভূমিতে জানা যাইতেছে। আদিশূরের রাজত্বকাল হইতে কণোজাগত ব্রাহ্মণগণ বঙ্গের রাঢ় বরেন্দ্রভূমিতে বাসহেতু রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে এবং তথাকার ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস নিবন্ধন তন্নামক "গাঁই" বা "গ্রামিন" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে করঞ্জ বা করঞ্জা একটি প্রধান গাঁই বলিয়া গণ্য। পাবনা জেলায় করঞ্জা একটি প্রধান ও প্রাচীন গ্রাম ; এখানে লাহিড়ী, সান্যাল, মৈত্র, চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ অতি পুরাকাল হইতে বাস করিতেছেন। ইহাতে বোধ হয় এই জেলার করঞ্জ বা করঞ্জা গ্রামই উপরোক্ত "হরিচরিত" বর্ণিত করঞ্জ গ্রাম। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও বলেন "গাইমালাতে যে সকল গ্রামে না লিখা আছে, সেই সকল গ্রাম কোথায় ছিল, তৎসমুদয় নিরূপণ করা সুকঠিন। মালদহ, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ভূভাগ ও ঢাকার পশ্চিমাংশের ভূমিখণ্ডে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিতে বাস হইয়াছিল। ... করঞ্জা গ্রাম জেলা পাবনার অধীন ইছামতী নদী ধারে।[২৪]

কেহ কেহ বলেন রাজশাহী ও বগুড়া জেলাতে করঞ্জ গ্রাম আছে ; রাজশাহীতে করচমারি নামে একটি গ্রাম আছে এবং বগুড়া জেলার পাবনা জেলার উত্তরে সাড়িয়াকান্দী থানায় একটি করঞ্জা গ্রাম আছে, কিন্তু তথায় ব্রাহ্মণাদির বিশেষ কোন সমাজ পূর্বাপর বর্তমান থাকা জানা যায় না। পরন্তু পাবনা জেলার এই করঞ্জা গ্রাম বৌদ্ধতান্ত্রিক কালের নিদর্শন স্বরূপ সিদ্ধেশ্বরীর পূজা ও তদুপলক্ষে শূকর বলিদান এবং সুবৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে পালরাজত্ব কালের "হরিচরিত" বর্ণিত "করঞ্জ" নামক শাসন ও বর্তমান করঞ্জা বা করঞ্জ গ্রাম অভিন্ন বলা যাইতে পারে।

পালরাজত্ব কালের তাম্রশাসনাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, তাহাদের শাসন সময়ে বঙ্গদেশের সুবৃহৎ জনপদসমূহ "ভুক্তি", তদন্তর্গত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ সকল 'মণ্ডল' তৎসমূহ ছোট ছোট "বিষয়" এবং তাহা নানাবিধ "শাসন" বা বর্তমান গ্রামের ন্যায় ছোট বড় বিভাগাদিতে বিভক্ত ছিল। এই সকল বর্তমান সময়ের ডিভিসন, জেলা, মহকুমা, থানা ও গ্রামাদির ন্যায় বলা যাইতে পারে। পুলিশ ও রাজস্ববিভাগ ব্যতীত রাজ্য মধ্যে হস্তী, অশ্ব, গো প্রভৃতির জন্যও তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী নিযুক্ত থাকিত। পাল রাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন,

কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিও তাঁহাদের বিদ্বেষ ছিল না। উপরোক্ত করঞ্জ গ্রামিন ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে তাঁহারা যে সকল বিষয় শাসনাদি দান করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিও সহানুভূতিসূচক বলা যায়।

১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য় মহীপাল ১০৫৫।৫৬ অব্দে স্বীয় ভ্রাতৃদ্বয় ২য় শূরপাল ও রামপালকে বন্দি করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। তখন বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্তনায়ক দিব্যক ও তদীয় ভ্রাতষ্পুত্র ভীম কর্তৃক যে "কৈবর্তবিদ্রোহ" উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন বরেন্দ্রভূমির অনেক স্থানে দেখা যায়। তৎকালে ২য় মহীপালকে পরাজিত করিয়া কৈবর্তনায়ক ক্রমে ক্রমে বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবঙ্গ অধিকার করেন। ...নদীমাতৃক বরেন্দ্রঅঞ্চলে কৈবর্তগণের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। ...এই সময়ে 'আদিকর্মবিধি' নামে একখানি বৌদ্ধ-ধর্ম-গ্রন্থ প্রচার হয়। ...এই গ্রন্থে মৎস্যঘাতী কৈবর্তগণ কখনও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না, যাহারা বংশানুক্রমে মৎস্য, পশুহিংসাদি পরিত্যাগ করিবে, কেবল তাহারাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে পারে, এই প্রকার ব্যবস্থা হয়। "আদিকর্মবিধি" প্রচারের ফলে বৌদ্ধমাত্রেই কৈবর্ত জাতিকে পূর্বাপেক্ষা ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ...বৌদ্ধশাসনের উপর কৈবর্তসমাজ বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা স্ব স্ব নৌবল লইয়া প্রজামণ্ডলীর পক্ষ হইয়া ২য় মহীপালকে আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে ২য় শূরপাল ও রামপাল কারামুক্ত হইলেও, তাঁহারা আর গৌড় সিংহাসনে স্থান পাইলেন না। কৈবর্তনায়ক দিব্য বা দিব্বোক কিছুদিনের জন্য... বরেন্দ্রী অধিকার করিয়া বসিলেন ; তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র ভীম গৌড় বা বরেন্দ্রীর সিংহাসনে অবস্থিত হইলেন।... ভীম কেবল নিজ রাজধানী সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহার অধিকৃত বরেন্দ্রীরাজ্যের দক্ষিণ সীমা পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ হইতে রাজ্যের উত্তর সীমা ধুবড়ী পর্যন্ত এক সুবিস্তৃত জাঙ্গাল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি 'ভীমের জাঙ্গাল' নামেই পরিচিত।[২৫]

"গৌড়রাজমালা" লেখক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলেন, 'তিনি (ভীম) রামপালের আক্রমণ প্রতিহত করিবার আশায় বারেন্দ্রমণ্ডলের প্রান্ত ভাগের নানা স্থানে যে সকল মৃৎপ্রাকার রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এখন "ভীমের ডাইঙ্গ", "ভীমের জাঙ্গাল" নামে কথিত হয়।[২৬]

ভীম কালে রামপাল কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ভীম ও রামপাল মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদি অবলম্বনে সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত "রামচরিত" নামক হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে পাইয়া ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ তিনি এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকার প্রকাশ করিয়াছেন।

পাবনা জেলার সদরে ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, ভূএগ্রাগাতি প্রভৃতি গ্রামে অনেক কৈবর্ত জাতির বাস আছে। উত্তরবঙ্গের ন্যায় পাবনা জেলায়ও স্থানে স্থানে মৎস্যশিকারি এবং মৎস্যবিক্রেতা অনেক রাজবংশী জাতি দেখা যায়। রাজবংশী ধীবর জাতির এক শ্রেণী বিশেষ ; তবে উত্তর বঙ্গীয় রাজবংশীকে পার্বত্য প্রদেশে লুক্কায়িত ক্ষত্রিয় বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন। যাহা হউক, রাজবংশী কৈবর্ত বা ধীবর জাতির এক পর্যায় বিশেষ হইলে, পাল রাজত্ব সময়ের এই কৈবর্ত বিদ্রোহ বা রাজত্বকাল হইতে ধীবর জাতিয়েরাও বরেন্দ্র ভূমিতে কিয়ৎকালের জন্য রাজত্ব হেতু রাজবংশী বলিয়া পরিচিত হওয়া অসম্ভব নহে। তবে উত্তরবঙ্গের কোন কোন রাজবংশী জাতি দেশভেদে সমাজে জল আচরণীয় হইয়াছে, আমাদের দেশে রাজবংশীরা এখনও পতিত অবস্থায় রহিয়াছে।

গ. সেনরাজত্ব কাল ঃ

পালরাজগণের অন্তর্বিপ্লব সময়ে যখন উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন অনুমান ১০৮০ খ্রিস্টাব্দে চোড় বা চোলগঙ্গ কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। তদীয় সেনাপতি সামন্ত সেন তৎকালে সৌভাগ্য অন্বেষণে আসিয়া সুবর্ণরেখা নদীতটে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার

সূত্রপাত করেন। তিনি বা তৎপুত্র হেমন্ত সেন বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তৎপৌত্র বিজয় সেন পালরাজগণের নিকট হইতে বরেন্দ্রভূমি ও বঙ্গের কিয়দংশ অধিকার করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অনুমান ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে সেনরাজত্ব প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন।

পূর্বোক্ত পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন ; উক্ত ধর্মে জাতিভেদ ছিল না ; কিন্তু সেন রাজগণের সময়ে বঙ্গ ও সমতটে বৈষ্ণবমত প্রচলিত হয়। পাবনা জেলার দক্ষিণে ফরিদপুর জেলার সামন্তসার গ্রাম হইতে প্রাপ্ত হরিবর্মদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, তিনি তৎকালে অনেক বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মত্রাদি দান করিয়া স্বীয় রাজধানীর চতুস্পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন এদেশে বৈদিক, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণে এক অভিনব তান্ত্রিকমত প্রচলিত হইয়াছিল। সেনরাজগণ উক্ত মতের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং পালরাজগণের অপেক্ষা সেনরাজগণের রাজত্বকালে জাতি, সমাজ ও আভিজাত্যের সমধিক আলোচনা ও চর্চা চলিয়াছিল। তৎকালের, বিশেষতঃ বল্লাল সেনের রাজত্বসময়ের, জাতীয় বা সামাজিক আন্দোলন ও কৌলীন্য মর্যাদা সংস্থাপন বঙ্গের প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহার ছায়া পাবনা জেলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি হিন্দু সমাজান্তর্গত সকল জাতির মধ্যে অল্প বিস্তর প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজ প্রতিষ্ঠাতৃগণের অনেকেই তখন হইতে এই জেলার স্থানে স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এই জেলা নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় বলেন, "ভীম ওঝা সম্রাট বল্লাল সেনের পুরোহিত ছিলেন। গৌড়নগরের নিকট কালিয়া গ্রামে তাঁহার বসতি ছিল। বল্লালের হড্ডিকা সংস্রব ঘটিলে তিনি কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্তমান পাবনা জেলার পূর্বদক্ষিণাংশে ছাতক গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানেরা কালিয়াই গোষ্ঠী নামে খ্যাত। তিনি যখন পূর্ববঙ্গে বাড়ি করিয়াছিলেন, তখন পূর্ববঙ্গে আর কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল না ; এজন্য তদ্বংশীয়েরা বাঙাল ওঝা নামে পরিচিত হইতেন। ভীমের পৌত্র অনন্তরাম বাঙাল ওঝা, রাজা লক্ষ্মণসেনের গুরু ছিলেন। তিনি সিন্দুরী ও শাখিনী এই দুই পরগণা নিষ্করর‍্যপে গুরুদক্ষিণা পাইয়া বহু সংখ্যক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এইস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন।[২৭] এই জেলায় প্রবাদ সেনরাজগণ তাঁহাদের গুরুপত্নীর সিন্দুর ও শাঁখার বার্ষিক ব্যয় নির্বাহার্থ যে দুই "ভুক্তি" (পরগণা) দান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই জেলার সিন্দুরী ও শাখিনী নামক উক্ত পরগণাদ্বয়ের নামকরণ হইয়াছে।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের যদুনন্দন কৃত "ঢাকুর" নামক সামাজিক গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ—

বল্লালের মত ছাড়ি   ভৃগুনন্দী, নরহরি,
মুরহর দেব তিন জন।
পশ্চিম হইতে যবে   আইলা এদেশে সবে,
নাগ হইতে হইলা স্থাপন।।

* * * * *

নাগ মুখে শুনি বাণী   করিলা বারেন্দ্র শ্রেণী
সন্তুষ্ট হইয়া তিন জন।

* * * * *

ভৃগুনন্দী সুত,   অতি গুণ যুত,
শ্রীকানু মাধব নাম।
বল্লাল ছাড়িয়া,   গেল পোতাজিয়া,
সমাজ বসতি গ্রাম।।

কানুর সন্তান, তিন যোগ্যবান,
কেহ অষ্টমুনীষা গেলা।
কেহ বা কালাই, গঙ্গা তীর যাই,
সবাই পোতাজিয়া স্থিতি।।

নরহরিদাস ও মুরহরচাকীর সহিত মিলিত হইয়া ভৃগুনন্দী তৎকালীন বঙ্গের দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ উপাধিক অপর চারিজন কায়স্থকে লইয়া বঙ্গে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ভৃগুনন্দী মহাশয় অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি ও তৎপুত্রগণ সেনরাজগণের সময় হইতে এই জেলার অষ্টমনীষা ও পোতাজিয়া আদি গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহাদেরই বংশধরগণ অদ্যাপি এই জেলার নানাস্থানে বাস করিতেছেন। এই জেলার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের সামাজিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ইহাদের পূর্বপুরুষগণ তৎকালে বঙ্গের একচ্ছত্রী সম্রাট বল্লাল সেনের প্রদত্ত কৌলীন্য মর্যাদা অবহেলা ও উপেক্ষা করিয়া স্বীয় স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সমাজশক্তির উপর যথেচ্ছ রাজশক্তির প্রসারলাভ করিতে দেন নাই।

সেনরাজগণ তান্ত্রিক মতাবলম্বী হইলেও, লক্ষ্মণসেন পরম বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ প্রতিপালক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই জেলার রায়গঞ্জ থানার অধীন মাধাইনগরে লক্ষ্মণসেনের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, তদ্দারা তিনি জনৈক ব্রাহ্মণকে উক্ত মাধাইনগর, চড়িয়া, তাড়াশ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রহ্মাত্র ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইহা তৎকালে বর্তমান পাবনা জেলা অংশ সেন রাজগণের রাজ্যান্তর্গত থাকার নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

সিরাজগঞ্জ মহকুমার উত্তরাংশে বাগবাটি ; ফুলকোঁচা, ঘোড়াচড়া, খোকসাবাড়ি প্রভৃতি গ্রামে ও নিকটবর্তী জামতৈল, ভাঙাবাড়ি আদি পল্লী সমূহে অত্যধিক বৈদ্য জাতির বাস আছে। এতদ্ব্যতীত রাণীগ্রামের বৈদ্য জমিদারগণ এই জেলার প্রাচীনতম ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিচিত। এই অঞ্চলের বৈদ্য জাতির আধিক্যের কারণ বিবেচনার বিষয়।

সেনরাজগণকে কেহ বৈদ্য, কেহ কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন ; তাহারা কোন জাতীয় ছিলেন, তাহা নির্ণয়ের ইহা উপযুক্ত স্থল না হইলেও, উপরোক্ত মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিতে সিরাজগঞ্জের জনৈক কবিরাজ গোপীচন্দ্র সেন ও পাবনার উকিল শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয় দুইজন জেলাবাসী দুই বিরুদ্ধ মত প্রকাশ কবায় তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল। কবিরাজ মহাশয় সেন বংশকে "অম্বষ্ঠ সংজ্ঞক ব্রাহ্মণ বংশ" এবং প্রসন্নবাবু তাঁহাদিগকে "কর্ণাট-ক্ষত্রিয়" সাব্যস্ত করিয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ মাধানগরের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারে দ্রষ্টব্য।

এই জেলার বৈদ্যবংশীয় বাগবাটি নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় মহাশয় সেন রাজগণকে বৈদ্য জাতি এবং "বাঙ্লার বৈদ্যগণও ব্রাহ্মণ সংজ্ঞার মধ্যেই ছিল" বলিয়াছেন।[২৮] সেন বংশের জাতি নির্ণয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহাদিগকে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[২৯] তবে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Vincent A. Smith সাহেব বলেন,"The ancestors of the Sen Kings must have been a Brahmin from the Deccan probably employed in the natural office of a Brahmin as a minister ; when he passed from ministrial to ruling function, he became a Brahmakhatri, his descendants being accepted as full khatriyas capable of intermarriage with other ruling families as Khatriyas.[৩০] অর্থাৎ সেনরাজগণের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যাগত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং মহীত্বপদ হইতে রাজপদে উন্নীত হইয়া ব্রহ্মক্ষত্রিয় আখ্যা প্রাপ্ত হন। তদ্বংশীয়গণ অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত যৌনসম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া সম্পূর্ণরূপে ক্ষত্রিয়ত্ব পদলাভ করেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন যে, পাল রাজত্বকালের শেষাংশে চোল ও পাণ্ড্য রাজগণের বঙ্গে আগমন সময়ে বঙ্গ ও মিথিলায় যে সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসী ঔপনিবেশিকগণ স্থায়ী হন তাহারাই সেন ও কর্ণাট বংশীয় বলিয়া খ্যাত। তাহাদের পূর্বপুরুষগণ জৈনধর্মমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। তাহাদের মধ্যে কেহ সামরিক শক্তিসম্পন্ন হইলেও বেদ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া "বৈদ্য" নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। "বৈদ্য" কোন জাতিবাচক শব্দ নহে। অনেক বৈদ্যগণ দ্রাবিড় দেশিয় রাজন্যবর্গের পৌরোহিত্য করিতেন এবং চোল ও পাণ্ড্য রাজগণের সময়ে উচ্চ অমাত্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। যাহারা এবম্প্রকারে রাজকার্যে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই, তাহারা চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। বৈদ্য কোন জাতি বাচক শব্দ নহে।[৩১]

সুতরাং দেখা যাইতেছে সেন রাজগণ আদিতে ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত, কার্যে ও ব্যবহারে ক্ষত্রিয় ; স্থল বিশেষে তাহাদের বংশধরগণের কেহ কেহ বৃত্তিতে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন মাত্র।

যাহা হউক, সিরাজগঞ্জের এই অঞ্চলের বৈদ্যজাতির প্রাধান্যের কারণ নির্দেশে বলা যাইতে পারে, যখন ধীরে ধীরে বঙ্গে মুসলমান অধিকার ঘটিয়াছিল, তখন পর্যন্তও কিছুদিন পাবনা জেলার পশ্চিমাংশে নিমগাছি আদি স্থানে ও বগুড়া জেলার পূর্বাঞ্চলে সেন রাজগণের রাজত্বের সংস্রবে স্বাধীন হিন্দু আধিপত্য চলিয়াছিল। মাধাইনগরের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারে শ্রীযুক্ত গোপীচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, মৎস্যবনে রাজা লক্ষ্মণ সেন নিজ পুরোহিতকে জনৈক তস্কর হইতে রক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠ সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট অনুমান হয়, এই অঞ্চলের বৈদ্য জাতিগণ সেন রাজগণের বংশধররূপেই হউক, অথবা উপরোক্ত যোদ্ধৃবর্গের সন্তানসন্ততিরূপেই হউক, কিম্বা কেহ চিকিৎসাব্যবসায়ী রূপেই হউক, এই জেলার এতদঞ্চলে তৎকালে স্থায়ী হইয়াছিলেন। চিকিৎসাব্যবসায়ী রূপেও এদিকে এককালে যে ইহাদের বিস্তার ঘটিয়াছিল, তাহা ঐ অঞ্চলের বৈদ্য জামতৈল, সরাতৈল, বেলতৈল প্রভৃতি "তৈল" সংযুক্ত গ্রামসমূহের নামেই সুপ্রকাশিত আছে।

সেন রাজত্বকালে কৈবর্ত জাতি দ্বিধা বিভক্ত হয়, কেহ রাজসহায়তাপূর্বক স্বীয় সমাজে উন্নতি লাভ করে, কেহ পালরাজত্ব কালের ন্যায় পূর্ববৎ হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া থাকে। পূর্বোক্ত সম্প্রদায় হালিক নামে এবং শেষোক্ত শ্রেণী জালিক আখ্যায় পরিচিত হইয়া তদবধি এই জেলায় বাস করিতেছে। সুবর্ণ বণিক ও সাহা উপাধি বিশিষ্ট বৈশ্যজাতি বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া ধনসমৃদ্ধি হেতু চিরদিন লোকের নিকট ঈর্ষার পাত্র ; তাহারা বল্লালের ঋণভার জড়িত যুদ্ধাভিযানে ধনসাহায্যে অস্বীকৃত হওয়ায় পূর্ব আচরিত বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিলেও, "নবশাক" বা নবশাখায় পরিণত ও ধর্মান্তরিত তিলি, মালী, তাম্বুলী, গোপাদি জাতিগণের ন্যায় রাজানুগ্রহে প্রয়োজনানুসারে হিন্দু সমাজে উন্নত হইতে পারেন নাই বা নিজ স্বাধীন ব্যবসায়ে নিরত থাকিয়া কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি জাতির ন্যায় রাজমর্যাদা অবহেলা করিয়া নিজ নিজ সমাজগঠনে প্রয়াসী হন নাই।

পাল রাজত্বের শেষে এবং সেন বংশের অভ্যুদয়কালে বঙ্গদেশে জৈন বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে থাকে। যোগী, নাথ, কাপালিকগণ পূর্বোক্ত ধর্মাবলম্বী ছিল, তাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। সেন রাজগণের সময়ে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ও তান্ত্রিক শৈবমতের পক্ষপাতী যোগীজাতিগণ নানা প্রকারে নিগৃহীত এবং সমাজে হেয় হইয়াছিল জানা যায়। ইহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানকালে অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হইলেও অদ্যাপি ইহারাই আমাদের দেশে চৈত্র মাসের চড়কোৎসব ও দেউল পূজাদিতে প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধ-ধর্ম জাগরূক রাখিয়াছে বৌদ্ধ পূজাপদ্ধতি হইলেও এই সমস্ত আমোদ প্রমোদ ধীরে ধীরে কাল সহকারে রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দ স্বামী জন্মোৎসব আদির ন্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পঞ্জিকায় হিন্দু

ধর্মের পূজাপার্বণ মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। চাটমোহর বোথড় গ্রামে যে সুবৃহৎ প্রাচীন চড়ক মেলার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে তাহা এতদঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মোৎসবের চিহ্ন বলা যায়। সম্ভবত এই সময় হইতেই পূর্বোক্ত তান্ত্রিক যুগের শৈবশাক্ত মতের পূজাপদ্ধতিও হিন্দু সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া গ্রামের বাহিরে বা প্রান্তে পঞ্চাননতলা, সিদ্ধেশ্বরীতলা, ষষ্ঠীতলা ও শীতলাস্থান প্রভৃতি নামে বৃক্ষতলে আশ্রয়লাভ করিয়াছে।

সেন রাজগণের রাজত্বকালেও দেশ ও জনপদগুলি মণ্ডল, ভুক্তি আদিতে বিভক্ত ছিল ; মাধাইনগরের তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ আছে। দেশে শাসন সংরক্ষণাদি কি প্রকারে পরিচালিত হইত তাহাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে জানা যাইতেছে। দেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনের যথেষ্ট প্রসার প্রতিপত্তি ও তাহাদের প্রতি রাজানুগ্রহ বর্তমান ছিল। শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা তৎকালে কিরূপ ছিল, তাহা সম্যক অবগত হওয়া যায় না ; তবে সুবর্ণ বণিক প্রমুখ বাণিজ্যজীবী বৈশ্যজাতিগণ প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক ছিলেন জানা যায় ; ইহাতে অনুমান হয় দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাহারা নির্বিঘ্নে পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ে দেশ ধন-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করিয়াছিলেন। পাল ও সেন রাজগণ উভয়ে প্রজাসাধারণের উপকারার্থ রাজ্য মধ্যে সুদূর বিস্তৃত দীর্ঘিকা ও জলাশয়াদি খনন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পাবনা জেলার নিমগাছি অঞ্চলে জয়সাগর, প্রতাপদীঘি, উদয়দীঘি প্রভৃতিতে তাহার চিহ্ন অদ্যাবধি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মুসলমান-অধিকার কাল

ক. পাঠান আমল ঃ

পাবনা জেলায় কোন সময়ে সর্বপ্রথম মুসলমান আগমন হইয়াছে, তাহা সবিশেষ জানিবার কোন উপায় নাই। অনেকের মতে ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বাংলাদেশে মুসলমান ছিল না। বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাধিকার কাল ১২০৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে মুসলমানগণ এদেশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বল্লাল সেনের সময়েও বঙ্গে অনেক মুসলমান ছিল এমত জানা যায়।

এই জেলার শাহজাদপুরের মক্‌দম্ সাহেবের বিবরণে জানিতে পারা যায়, তিনি লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে এদেশে আসিয়াছিলেন। "বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত" পাঠে জানা যায়, "লক্ষ্মণ সেনের সময়ে মক্‌দম্ সাহেব জালালউদ্দিন তাব্রেজী গৌড়ে আগমন করেন, তিনি একজন সাধুপুরুষ ছিলেন ; তাঁহার সৌজন্যে হিন্দুগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।" পোতাজিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ রায় ওরফে বি এন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "ইমান সহরের অধিপতি ... শাহজাদা মক্‌দম্ সাহেব শত্রুকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ... দিল্লির সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ... ভারতবর্ষে আগমনের পর সর্বদা ফকিরের ভাবে ও বেশে কালাতিপাত করিতেন। মক্‌দম্ সাহেবের পুত্র ছিল না। তাঁহার ভাগিনেয় খেজনুর সাহেবই পুত্র স্থানীয় ছিলেন। ... দিল্লিতে আশ্রয় গ্রহণের পর তাঁহারা বঙ্গের রাজধানীতে উপনীত হন। তথায় খেজনুর সাহেবের সহিত মাধবের বংশধরগণের একজনের অকৃত্রিম সৌহার্দ্য জন্মে। এই মিত্রের অনুরোধে খেজনুর সাহেব দুর্গোৎসবের সময় নৌকাপথে পোতাজিয়ায় উপস্থিত হন। ... মক্‌দম্ সাহেবের অনুমতিক্রমে খেজনুর সাহেব পোতাজিয়া গ্রামে স্বনামখ্যাত দীঘি খনন করিয়া উত্তরপশ্চিম

দিকে আপন বাসাবাটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ... (কিছুকাল পরে) পোতাজিয়ার উত্তরপূর্ব দিকে ... শাহজাদপুর নাম দিয়া একটি নূতন পল্লী সংস্থাপনপূর্বক তাহাতে বাটি ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।[৩২]

খোয়াজদীঘি এখনও পোতাজিয়ায় বর্তমান আছে। পোতাজিয়া নিবাসী গৌড়রাজ-সভাসদ ভৃগুনন্দীর বংশধর মাধবসন্তানগণের সহিত সৌহার্দ্য হিসাবে সময় বিবেচনা করিলে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশে মক্‌দম্‌ সাহেবের বঙ্গে আগমন ও তৎসহ পাবনা জেলায় মুসলমান উপনিবেশ সংস্থাপনের সূত্রপাত হওয়া সম্ভবপর। Antiquities and Tradition of Shahazadpur নামক প্রবন্ধে মৌলবী আব্দুলওয়ালি (Moulavi Abdul Wali) সাহেব বলেন, "I am, therefore, led to suppose that Makhdum Sahib, too, was from central Asia, closely related to some of the Khwajas of the time and that he too was by decent an Arab of the family of Muazz-ibn-Jabal, His settling in Yusufshahi may be said to synchronise with the conquest of Bengal by the Khiliji general, Muhammad Bakhtyar.[৩৩] অর্থাৎ আমার বিশ্বাস মক্‌দম্‌ সাহেব খোজাদিগের সম্পর্কিত মধ্য এশিয়াবাসী ছিলেন ; তিনি আরব জাতীয় মোয়াজ-ইবন জাবাল বংশীয় ছিলেন। খিলিজি সেনাপতি মহম্মদ বক্তিয়ারের বঙ্গাধিকারের সমকালে তাঁহার ইউসুপশাহীতে অধিষ্ঠান হইয়াছিল ; যাহা হউক, এই মক্‌দম্‌ সাহেবের বিবরণে জানা যায় তিনি আরব দেশিয় সামন্ত নরপতি ছিলেন ; ভাগ্যবিপর্যয়ে বঙ্গে আগমন করতঃ মুসলমান ধর্ম প্রচারক হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে পাবনাদি অঞ্চলে আসিয়া জলমগ্ন দেশের পোতাজিয়া (পোতআওজিয়া) গ্রামে প্রথমে অবতরণ করেন, পরে শাহজাদপুর পল্লী সংস্থাপনপূর্বক তথায় স্থায়ী হইয়াছিলেন। পাঠান রাজ্যারম্ভে এদেশে ঈদৃশ ধর্মপ্রচারকগণের বহুল পরিমাণে আবির্ভাব হইয়াছিল জানা যায়।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের পাবনা কালেক্টরির ২৭ নং রোবকারি দৃষ্টে জানা যায়, মক্‌দম্‌ সাহেবের ভাগিনেয় খেজনুর বংশীয়গণ প্রায় হাজার বৎসরের অধিক কাল শাহজাদপুর মসজিদের মোতওয়ালি সূত্রে ৭২২ বিঘা ফসলী জমি মক্‌দম্‌ মৌসুফের ... গজ দন্তীর মাপে ১৬ খাদা জমি দখল করিতেছেন।

খিলিজি বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গে মুসলমান রাজ্যাধিকার ঘটে। পাঠানেরা গৌড় বা লক্ষণাবতী অধিকার করিয়াই বঙ্গের রাজা হন নাই। পাঠান রাজত্বের প্রারম্ভে তাহারা দেশিয় ভূম্যধিকারী ও সামন্ত নরপতিগণকে সহজে বশে আনিতে পারেন নাই। হিন্দু রাজত্বের অবসান ও মুসলমান আমলের প্রারম্ভের সন্ধি স্থলে বঙ্গদেশ এক প্রকার অরাজক ছিল। গৌড় মণ্ডলের এবংবিধ রাষ্ট্রবিপ্লব সময়ে যে যেদিকে পাইত সে সেই দিকই দখল করিয়া বসিত। জনৈক পাঠান সর্দার বঙ্গের কতক অংশ দখল করিতেন যতদিন নিজ ক্ষমতায় শাসন দণ্ড পরিচালন করিতে পারিতেন, করিতে অপারগ হইলে দিল্লি সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। আবার বাদশাহ নিযুক্ত শাসনকর্তা কতক দিন তাহার অধীন থাকিয়া সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিতেন। এই সমস্ত অরাজকতার সুযোগে বঙ্গদেশ পাঠান অধিকৃত হইলেও বহুদিন পর্যন্ত দেশিয় হিন্দু নরপতিগণ বঙ্গের স্থানে স্থানে স্বাধীন ক্ষমতা পরিচালন করিতেন। বঙ্গের পশ্চিমে গৌড়ে পাঠান সর্দারগণ যখন স্বীয় রাজক্ষমতা বদ্ধমূল করিতেছিলেন, তখন বঙ্গের পূর্বাঞ্চলে সেনরাজগণের জ্ঞাতিবর্গ অনেক স্থানে রাজত্ব করিতেন। নবাগত বৈদেশিক শত্রুকে বিতাড়িত করিবার ক্ষমতা তাহাদিগের না থাকিলেও যিনি যে স্থানে পারিতেন সেখানেই পূর্বতন রাজশক্তি কিঞ্চিৎ পরিচালনা করিতেন।

এতাদৃশ পাঠান রাজত্বকালে পাবনা জেলা অংশেও স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব বিদ্যমান ছিল। তাহার নিদর্শন রায়গঞ্জ থানার অধীন নিমগাছি নামক স্থানের বিবরণে জানিতে পারা যায়।

"বগুড়ার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমাংশের মধ্যে এই কমলাপুর রাজ্যে (বগুড়ার ১৬ মাইল ও সেরপুরের ৬ মাইল দক্ষিণে) বল্লাল সেন বংশীয় অচ্যুত সেন নামক সামন্ত নৃপতি গৌড়েশ্বর, নাসিরউদ্দীন সাহের পুত্র ফিরোজ সাহের করদ স্বরূপ সমগ্র করতোয়া প্রদেশে. রাজত্ব করিতেন। ... রাজপুরীর দক্ষিণে বর্তমান ভবানীপুরের ৫ মাইল নৈঋত কোণে প্রাচীন করতোয়া ও ভবতোয়ার সম্মিলন স্থানে 'গুলফাপুরী' নামক অপর্ণাদেবীর মনোরমপুরী এবং বর্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত রায়গঞ্জ থানার অধীন 'নিমগাছি' নামক স্থানে সুবৃহৎ দীর্ঘিকাদি সমাচ্ছাদিত যে বিশাল ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তথায় রাজা অচ্যুত সেনের দুর্গ ও সেনাবিশেষ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া প্রবাদ অবগত হওয়া যায়।[৩৪]

শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন, "বৃদ্ধ ভূপতি (রাজা অচ্যুত সেন) ঐহিক ও পারলৌকিক ফল প্রত্যাশায় চারিটি সরোবর খনন করাইলেন ; ইহার তিনটির প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য হাজার হাতের ন্যূন হইবে না। আর একটি বৃহৎ, তাহার দৈর্ঘ্য অর্ধ মাইল হইবেক। জয়যুক্ত হওয়ায় এই দীর্ঘিকার নাম জয়সাগর রাখা হইয়াছিল। চারি পারে ২৮টি ঘাট ছিল। ... মহাপীঠ স্থানের দক্ষিণাংশে নিমগাছি নামক ক্ষুদ্র পল্লীর পশ্চিমাংশে 'জয়সাগর' শোভা পাইতেছে। ইহার নিকট প্রিয় ভৃত্য উদয়ের নামে 'উদয়দীঘি' এবং উদয়দীঘির এক মাইল পূর্বোত্তরে প্রতাপদীঘি অদ্যাপি সেনাপতি প্রতাপের নাম ঘোষণা করিতেছে। চতুর্থ সরোবর রাজধানী কমলাপুর নগরীর অল্প দক্ষিণে রাজকুমারী ভদ্রাবলীর নামে খনিত।[৩৫] জয়সাগরই অধুনা এ জেলায় সর্বপ্রধান দীর্ঘিকা।

"বাংলাদেশ মুসলমান অধিকারভুক্ত হইলে দেড় শত বৎসর কাল দিল্লি সম্রাটের অধীন ছিল। তাহার পর বিকৃতবুদ্ধি মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে সাম্রাজ্য ভঙ্গ হইতে থাকে। সুবায় সুবায় নবাবেরা স্বাধীন হইয়াছিল। বাংলার নবাব সামস্উদ্দিন (১৩৪৫) তন্মধ্যে সর্বপ্রধান পথ প্রদর্শক। এখন নানা কারণে বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন বাংলাদেশে যত মুসলমান আছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই এই পরিমাণ স্থানে এত অধিক সংখ্যক মুসলমান নাই। কিন্তু সামস্উদ্দিনের সময়ে সমস্ত বাংলা ও বিহারে চৌত্রিশ হাজারের বেশি মুসলমান ছিল না। সামস্উদ্দিন বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, সেই অল্প সংখ্যক মুসলমানগণ সাহায্যে তিনি কদাচ সম্রাটের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। অধিকন্তু বিদ্রোহকালে সেই সকল মুসলমান তাঁহার স্বপক্ষে থাকিবেন কিনা তাহাও অনিশ্চিত, এজন্য তিনি একদল হিন্দু সেনা সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ... দামনাশ হইতে শিখাই (শিখি বাহন) সান্যালকে এবং ভাজনী হইতে সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ী, কেশবরাম ভাদুড়ী এবং জগদানন্দ ভাদুড়ীকে আহ্বান করিয়া নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করিলেন। ... সান্যাল এবং ভাদুড়ীত্রয়ই সামস্উদ্দিনের উন্নতি প্রধান সহায় ছিলেন। এজন্য তিনি তাহাদিগকে দুই প্রকাণ্ড জায়গির দিয়াছিলেন। শিখাই সান্যালের জায়গির পদ্মার উত্তরে চলন বিলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সান্যালগড় বা সাঁতোড় তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার জায়গিরের বার্ষিক মুনাফা এক লক্ষ টাকা ছিল। ... ভাদুড়ীত্রয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবুদ্ধি খাঁ জায়গির পাইয়া রাজা হইয়াছিলেন। তাহার জায়গির চলন বিলের উত্তরে ছিল। বিল চলনও এই দুই জায়গিরদারের অধিকৃত ছিল। ভাদুড়ীর চাক্‌লে ভাদুরিয়া (ভাতুরিয়া) নামে খ্যাত হইয়াছিল ... এই জায়গিরের মুনাফা এক লক্ষ টাকার অধিক ছিল। সুবুদ্ধি খাঁ তাহাতে প্রায় স্বাধীন রাজার ন্যায় ছিলেন। ... এবং বার্ষিক এক টাকা গৌড় বাদশাহকে নজর দিতেন। এজন্য তদ্বংশীয় রাজাদিগকে 'একটাকিয়া রাজা' বলিত।[৩৬]

সামস্উদ্দিনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মইজউদ্দিনের আমলে সাঁতোড় রাজগণের জায়গির জব্দ হইয়া তদুপরি ১৪ হাজার টাকা মালগুজারী ধার্য হয়। তখন হইতে তাঁহাদের ভূঁঞা বা

ভূঁইয়া উপাধি হয়। পক্ষান্তরে "মধু খাঁর কর্তৃত্ব সময়ে ভাদুরিয়ার রাজা তাঁহার জায়গির ভাতুরিয়ার চতুষ্পার্শ্বে রামবাজু, প্রতাপবাজু, সোনাবাজু ও বড়বাজু নামে চারিটি পরগণা অতি অল্প মাত্র মালগুজারিতে জমিদারি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দে এই ভাতুরিয়ার রাজা গণেশ ইলিয়স্‌বংশীয় আজম সাহের রাজত্বকালে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পুনরায় কিয়দ্দিনের জন্য গৌড়ে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র যদু মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিয়া জালালউদ্দিন নাম ধারণ করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ভাদুড়ী বংশীয় রাজগণ ১৪০৫ হইতে ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দ মধ্যে পাঠান রাজত্বকালেও গৌড় সিংহাসনে স্বাধীন হিন্দুরাজক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিলেন। ইহা তৎকালীন বঙ্গীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের অবস্থাজ্ঞাপক বলা যাইতে পারে।

পাবনা জেলা উক্ত ভাদুড়ী রাজ্য বা ভাতুরিয়ার অধীন ছিল। মেজর রেনেলকৃত মানচিত্রে পাবনার অধিকাংশ ভূভাগ ভাতুরিয়ার অন্তর্গতই প্রদর্শিত হইয়াছে। পাবনা জেলায় চাটমোহরের কতকাংশে ভাতুরিয়া নামে এখনও একটি পরগণা বর্তমান আছে। আইন-ই-আকবরিতে ভাতুরিয়া নামে কোন পরগণার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও সোনাবাজু, প্রতাপবাজু, বড়বাজু আদি যে পরগণাগুলি লইয়া ভাতুরিয়া রাজ্য গঠিত ছিল, তাহার সকলেরই উল্লেখ আছে। বর্তমান সময়ের সরকারি কাগজপত্রেও তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। যথা ঃ—

Bhaturia is still the designation of a pargana, but the name is given to the country on both sides of the Atrai river, its boundary being the river Mahananda and its tributary Purnarbhaba on the west, the Ganges on the south, the Karatoya on the east and Dinajpur on the north, practically the present district of Rajshahi (and part of Pabna)[৩৭] অর্থাৎ "উত্তরে দিনাজপুর, পূর্বে করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে মহানন্দা ও তাহার উপনদী পুনর্ভবা বেষ্টিত আত্রাই নদীর উভয় তীরস্থ প্রদেশ ভাতুরিয়া পরগণা নামে খ্যাত।

ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে বর্তমান পাবনা জেলার কতকাংশ যে, উক্ত ভাতুরিয়া বা ভাদুড়ীদিগের রাজ্য এবং সাঁতৈল বা সান্যালদিগের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। চাটমোহর থানার হরিপুর গ্রামের অনতিদূরে বড়ল-নদী-তীরে সান্যালগড় বা সান্যাল রাজগণের বাটির ধ্বংসাবশেষ ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কালিকামূর্তি এখনও বিদ্যমান আছে। উত্তরবঙ্গ রেলপথের আত্রাই স্টেশনের তিন ক্রোশ পূর্বে ভাদুড়ী রাজ্যের রাজধানী সপ্তদুর্গাপুরীর নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় স্থানই এক্ষণে রাজশাহী জেলার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। ভাদুড়ী রাজগণের রাজত্বের কোন চিহ্ন পাবনা জেলা অংশে অধুনা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু সান্যালরাজ বা ভৌমিকগণের শাসনের পরিচয় পাবনা জেলার ব্রাহ্মণগণের গৃহে তাঁহাদের উক্ত রাজসরকার হইতে প্রদত্ত দানপত্র ও ব্রহ্মত্রাদি জাগরূক রাখিয়াছে। উক্ত রাজবংশের সর্বশেষ ভূম্যধিকারিণী মহামহিমান্বিতা রাণী সর্বাণী এই জেলার ডেমড়ার রায়বংশের দুহিতা ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত অনেক জায়গির ব্রহ্মত্রাদি এই জেলার উক্ত ডেমড়া, গুণাইগাছা, সাঁড়োরা প্রভৃতি গ্রামের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের গৃহে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা উক্ত রাজবংশের বিদ্যোৎসাহিতার পরিচায়ক।

গণেশের বংশধরগণকে বিতাড়িত করিয়া হাবসিগণ ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে গৌড় সিংহাসন অধিকার করে এবং সুপ্রসিদ্ধ হোসেন শাহ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গৌড় অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করে। তিনি রাজ্য মধ্যে শিকদার, কারকুন প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া রাজস্ব-বিভাগের সংস্কার করেন। আমাদের দেশে হিন্দু ও স্থানবিশেষে মুসলমানগণ মধ্যে শিকদার, মণ্ডল প্রভৃতি যে সমস্ত উপাধি দেখা যায়, তাহা তৎকালীন রাজস্ববিভাগীয় উপাধি বিশেষ। হোসেন শাহের রাজত্বকাল বাংলার সুবর্ণযুগ

বলিয়া কীর্তিত হয়। "লিখিত আছে যে, হোসেন শাহের রাজ্যারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় ধনীগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্যাদা পাইতেন।" ইহাতে অনুমান হয়, বঙ্গের অধিবাসিগণ তৎকালে সমৃদ্ধিশালী ও সুখী ছিল। এই জেলার সোনাবাজু পরগণা, সোনাপাতিলা বিল, সোনাতলা, সোনাহাড়া প্রভৃতি গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও প্রভৃতি স্থান অদ্যাপি সোনাসংযুক্ত নামে আখ্যাত হইয়া সেই সুবর্ণযুগের আভাস প্রদান করিতেছে। সম্ভবত এই সুখের রাজত্বকাল হইতেই বঙ্গদেশ সোনার বাংলা আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

এই সময়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও তৎকর্তৃক বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার প্রসিদ্ধ ঘটনা। প্রায় তিন শতাব্দীকাল মুসলমান শাসন ও সংস্রবে হিন্দু-সমাজ নানা প্রকারে শিথিল হয় এবং নানা কারণে দেশের লোক বৈদেশিক রাজ-ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। দেশের সমাজ ও ধর্মের বিশৃঙ্খলতা দূরীকরণ ও হিন্দু মুসলমান মধ্যে সাম্য ও সখ্যভাব সংস্থাপন উদ্দেশ্যে তৎকালে চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক বঙ্গে যখন বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার হয়, তৎকালে এই জেলা অংশেও তাঁহার বিশ্বপ্রেমবন্যার ঢেউ লাগিয়াছিল। গোহাইলবাড়ি, বৈষ্ণব বহাপানিয়া প্রভৃতি গ্রামে নিতাই-গৌরাঙ্গদেব মূর্তির সেবা এবং বৈষ্ণবগণের স্থিতি (চাটমোহর) হরিপুরে যাদু কীর্তনীয়ার (চৌধুরী-বংশের পূর্বপুরুষ) অবস্থান এবং এই জেলার স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত মোহান্ত ও বৈষ্ণবগণের বহুকালীয় আখড়াদি, সেই অতীতযুগের বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারের নিদর্শন বিশেষ। সেই সময়ে এদেশের ইতর ভদ্র সর্বসাধারণ লোক হরিসংকীর্তনে অত্যধিক উন্মত্ত হইয়াছিল। অদ্যাপি আমাদের দেশের প্রবাদ—

"যত ছিল নাড়াবুনা, সব হ'ল কীর্তনে,
কোদাল ভাঙ্গে' বানা'ল করতাল।"

এখনও তাহার স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে।

হোসেন শাহ বাংলার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত জয় করিয়া কামরূপে এক বিরাট অভিযান প্রেরণ করেন। এই জেলার পূর্বাংশে ময়মনসিংহের অধীন আটিয়া নামক স্থানে হিজরী ৯২২ অব্দে (১৫০৪ খ্রিঃ) তৎকর্তৃক নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। ইহাতে অনুমান হয়, পাবনা জেলা অংশ তৎকালে তাঁহার রাজ্যান্তর্গত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব সময়ের কোন চিহ্ন এই জেলায় বর্তমান না থাকিলেও, তাড়াশ আউট পোষ্টের অধীন প্রাচীন করতোয়া তটে নবগ্রামে হিজরী ৯৩২ অব্দে (১৫১৪ খ্রিঃ) নির্মিত যে একটি প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান আছে, তাহা হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নসরৎ শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহাই অধুনা এই জেলার প্রস্তরফলক সংযুক্ত প্রাচীনতম মসজিদ ; তবে প্রস্তর ফলক না থাকিলেও নির্মাণকৌশল ও প্রতিষ্ঠাতৃগণের কাল বিবেচনায় শাহজাদপুরের মসজিদকেই পাবনা জেলার সর্বপ্রাচীন মসজিদ বলা যায়।

চাটমোহর থানায় সমাজ গ্রামে যে একটি প্রাচীন মসজিদের ভগ্নাবশেষ আছে, তাহার প্রস্তরফলক পাঠে জানা যায়, ইহা হিজরী ৯৫৮ অব্দে (১৫৪৯ খ্রিঃ) শের শাহের পুত্র সুলতান সমীর বা সলিম কর্তৃক নির্মিত। ইতিহাসে জানিতে পারা যায় যে, হিঃ ৯৫২ হইতে ৯৬০ অব্দ (১৫৪৫—১৫৫৩ খ্রিঃ) পর্যন্ত বাংলাদেশ মহম্মদ খাঁ সুর নামে জনৈক পাঠান সুলতান কর্তৃক শাসিত হইত। আরও জানা যায়, শের শাহ কর্তৃক মহম্মদ খাঁ সুর নামে তাঁহার জনৈক আত্মীয় বাংলার পূর্বাঞ্চলে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শের শাহের মৃত্যুর পর যখন তৎপুত্রগণ দিল্লি হইতে বিতাড়িত হন, তখন বঙ্গে নিযুক্ত শাসনকর্তাও স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে পৈত্রিক রাজ্য হইতে বঞ্চিত করেন এবং নিজে স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করিতে থাকেন। আবার এই সমাজ গ্রামেও প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বাংলার নবাবের জনৈক আত্মীয় এখানে থাকিয়া রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় প্রথমে শের শাহ বা

তৎপুত্র এ প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, তৎসময়ে এথাকার এই মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। পরে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদের নিযুক্ত শাসনকর্তাই এ প্রদেশে স্বীয় স্বাধীন ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সমাজ গ্রাম যে এক সময়ে পাঠান সুলতানগণের ক্রীড়াভূমি ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানকার সুপ্রাচীন দীর্ঘিকাদিও তৎকালে তাহাদের কর্তৃকই খনিত হইয়াছিল। অদ্যাপি সমাজের সেই কালের সমৃদ্ধি নিম্নের কবিতাংশে প্রকাশিত হয়, যথা ঃ—

"এক সমাজের আঠার পাড়া,
৬ বুড়ি পুখুর তার ৯ বুড়ি গাড়া।"

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিম লোদিকে পরাভূত করিয়া বাবর দিল্লিতে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেও, ১৫৯২ অব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ পাঠান সুলতান বা সরদারগণের করতলগত ছিল। কখন সুরবংশীয়, কখন করবানী বংশীয় পাঠানগণ কেহ গৌড়ে, কেহ রাজমহলে, কেহ তাণ্ডায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। রাজ্য মধ্যে হিন্দু মুসলমান সামন্ত নরপতিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে দেশে শাসন কার্য পরিচালন করিতেন ; পাঠান সুলতানগণ কেবলমাত্র রাজস্ব লইয়া বা পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। এই সমস্ত সামন্ত নরপতিগণ হইতে পরবর্তীকালে বঙ্গে ভৌমিকী বা বারভূঞার শাসনপ্রথা প্রবর্তিত হয়।

এই প্রকার শাসনপ্রথা প্রচলনের কারণ এই যে, "পাঠান রাজত্ব দৃঢ়ীভূত হইলে, নবাবেরা হিন্দু জমিদারগণকে বিচ্যুত করিয়া পাঠান সরদারগণকে জমিদারি দিতে পারিতেন, কিন্তু নবাবেরা তদ্রূপ চেষ্টা বা ইচ্ছা করেন নাই। তাহার অনেকগুলি ধারণা ছিল। নদী, হ্রদ ও জঙ্গল দ্বারা বাংলাদেশ দুর্ভেদ্য স্থান ছিল। ঈদৃশ দুর্গম দেশের অভ্যন্তরে অল্প সংখ্যক পাঠান ছড়াইয়া পড়িলে হিন্দুগণ কর্তৃক বিনষ্ট হইবার ভয় ছিল। যদি পাঠান সরদারের সঙ্গে উপযুক্ত সৈন্য থাকিত, তবে তাহাদের ব্যয়েই সমস্ত নিঃশেষ হইত। নবাবের ভাণ্ডারে কিছুই প্রেরিত হইত না। অধিকন্তু পাঠান সরদারেরা লেখাপড়া জানিত না। আদায় তহশীল কার্য কিছুমাত্র বুঝিত না। অথচ অতিশয় উগ্রপ্রকৃতি এবং বহুব্যয়শীল। তাহারা যুদ্ধকালে যেমন বীর ছিল, তেমনি আবার শান্তিসময়ে নিতান্ত অলস ও বিলাসী ছিল। তাহাদিগকে জমিদারি দিলে, তাহারা উপযুক্ত পরিনাণে রাজস্ব আদায় করিতে পারিত না এবং যাহা আদায় করিত, তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলিত। সুতরাং নবাবের নিকট মালগুজারী দিতে পারিত না। সেই বাকির জন্য পীড়াপীড়ি করিলে অমনি পাঠান সরদার বিদ্রোহী হইত। সুতরাং বাংলাদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইলেও দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু-রাজত্বই চলিতেছিল।"[৩৮]

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বঙ্কিমবাবু বলেন, "আমি যতদূর ঐতিহাসিক সন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস আছে যে, পাঠানেরা কস্মিনকালেও প্রকৃতপক্ষে বাংলা অধিকার করে নাই ; স্থানে স্থানে তাঁহারা সৈনিক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া উপনিবেশের পার্শ্ববর্তী স্থান সকল শাসন করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের আমলে বাঙালিই বাংলা শাসন করিত।"[৩৯]

উপরোক্ত রূপে হিন্দুগণকে জমিদার নিযুক্ত করিয়া রাজ্যশাসনের ফলে, পাবনা জেলা অংশে পাঠান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই সাঁতৈড় বা সাঁতৈল ও ভাদুড়ি রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। তদ্বিবরণ ইতিপূর্বে বিবৃত হইয়াছে। সাঁতৈল ও ভাতুরিয়ার রাজগণ পাবনা জেলা অংশে পাঠান রাজত্বকালে ভৌমিক বা ভূঞা বলিয়া গণ্য হইতেন।

১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে শের শাহের পুত্রগণকে বিতাড়িত করিয়া বিহারের শাসনকর্তা করবাণী বংশীয় সুলেমান কেরানি বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন ; তিনি গৌড় হইতে রাজমহলের নিকট তাণ্ডা নগরে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সময়ে ছাতকের রাজা বা তৎকালীন পাবনার পূর্বাংশের ভৌমিক বা ভূঞা রাজা দেবীদাসের অভ্যুদয় হয়। তৎপুত্রগণের অত্যাচারে তিনি বাদশাহের ক্রোধ-ভাজন হইয়াছিলেন। অবশেষে "বাদশাহ উমরু নামক

সেনাপতির অধীনে একদল সেনা ছাতক আক্রমণ জন্য পাঠইয়া ছিলেন। * * * রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র কার্তিক রায়, তিন দিন নগর রক্ষা করিয়া যুদ্ধে নিহত হইলে উমরু ছাতক দখল করিলেন। [এই যুদ্ধ বিগ্রহ অবলম্বনে এই জেলা নিবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন রায় মহাশয় "রাজা দেবীদাস" নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন] রাজ-পরিবারগণ বিষপানে জীবন শেষ করিলেন। রাজা-পুত্রদের মধ্যে ঠাকুর কেশবনাথ রায় ও ঠাকুর কাশীনাথ রায় মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহাদের সন্তান পাবনা জেলার আমিনপুরের মিএগ্রা ও ঢাকা জেলার এলাচিপুরের মিএগ্রা। রাজভক্ত ভোলা নাপিত নিজের তিন পুত্রকে রাজপুত্র বলিয়া বন্দি করিয়া, তিন জন রাজকুমারকে নিজ পুত্র বলিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ঠাকুর কালিদাস, ঠাকুর চণ্ডীদাস ও ঠাকুর নরোত্তম। বর্তমানে সমস্ত কালিয়াই গোষ্ঠীই এই তিনজনের সন্তান। এজন্য ইহাদিগকে নাপ্তিয়া কালিয়াই বলে।"[৪০]

"বর্তমান সময়ে পাবনা জেলার বাগ, কাশীনাথপুর, ক্ষেতুপাড়া, শঙ্করপাশার রায়গণ পূর্বোক্ত ঠাকুর কালিদাসের সন্তান; কাবারিখোলার মল্লিক, ভারেঙ্গার চৌধুরী, হাটুরিয়ার রায়গণ চণ্ডীদাসের সন্তান এবং সাড়াসিয়া বেলতৈল, ব্রাহ্মণগ্রাম, সাফল্লা, বাগমারা ও এলাসিনের রায়গণ নরোত্তমের বংশধর বলিয়া খ্যাত।"[৪১]

১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে সুলেমান কেরানির মৃত্যু হইলে তৎপুত্র দাউদ বঙ্গ সিংহাসনে আরোহন করেন। অত্যল্পকাল মধ্যে মোঘল সম্রাটের বিরুদ্ধাচারণ করিলে, ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া মহামতি আকবর বাদশাহ্ বাংলাদেশ মোঘল রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। মোঘলেরা বাংলাদেশ জয় করিলেও বাংলাদেশ শাসন ও রাজস্ব সংগ্রহ করিতে তাহাদিগকে বহুদিন পর্যন্ত ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেন, "বাংলার বাতাস ভেজা ও গরম, জমি অসংখ্য নদী-খাল-নালায় কাটা, গম ও বুট জন্মে না, লোকে উর্দু, এমন কি হিন্দি পর্যন্ত বলে না। সুতরাং উত্তর-ভারতের ভদ্রশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান সকলেই বাংলায় কাজ করিতে নারাজ ছিলেন। তাহারা এই প্রদেশকে 'রুটিপূর্ণ' নরক বলিতেন; রাজকর্মচারীদের অনেকসময় শাস্তির জন্য এখানে পাঠান হইত এবং তাহারাও শীঘ্র বদলি হইবার জন্য বাদশাহের দরবারে সুপারিশ খুঁজিতেন। * * * * আকবর বাংলা জয় করিলেন বটে, কিন্তু ইহা বশ করিতে তাঁহাকে বিশ বৎসর ধরিয়া শ্রম করিতে হয়। তাঁহার বঙ্গীয় সুবেদার ও সেনাপতি রাজা মানসিংহ বাংলার জলবায়ুকে ভয় করিতেন, রাজমহলে বাস করিতে ভালবাসিতেন।"[৪২]

আবার দেশের রক্ষকও অনেক সময় ভক্ষক হইয়া বসিত; পাঠান দমন জন্য যে সকল জায়গিরদারগণকে অব্যাহত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহারাও অনেক সময় দেশের শান্তিনাশক হইয়া উঠিতেন। পাবনা জেলা অংশে এবম্বিধ বিদ্রোহী প্রাদেশিক মোঘল শাসনকর্তার নিদর্শন চাটমোহরে পাওয়া যায়। তৎকালে এখানে পাঠান আধিপত্য বিদ্যমান ছিল, তাহার পরিচয় এখানকার পাঠানপাড়া, আফ্রাদ্ (আফ্রিদি) পাড়া, কাজিপাড়া প্রভৃতি পল্লী বা উপপল্লী সমূহ। চাটমোহরের মসজিদের প্রস্তরলিপি পাঠে জানা যায়, ইহা হিজরী ৯৮৯ অব্দে ১৫৭০ খ্রিঃ মাসুম খাঁ নামক জনৈক মুসলমান শাসনকর্তা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। Blockman কৃত অনূদিত আইন-ই-আকবরিতে মাসুম খাঁর নিম্নলিখিত পরিচয় আছে; যথা—The chief rebel was Macum-Khan-i Kabuli who had been formerly mentioned.He was Tarbati Sayiad. His uncle, Mirja Aziz, had been Vazir of Humayun * * * Having been involved in quarrels, Macum in the 20th year went to Akbar and was made a commander of 500. He distinguished himself in the war with the Afgans and was wounded in a fight with Kalapahar. For his bravery he received Orissa as *Trigul* when Mancar

and Mazaffar's strictness drove him into rebellion. Historians call him Macum Khan-i-Aci, Macum Khan the rebel. He was driven to Bhati where he died in the 44th year (1007).[৪৩] অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত মাসুম খাঁ কাবুলী প্রধান বিদ্রোহী ছিলেন। তিনি তরবতী সৈয়দ ছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত হুমায়ুনের উজির ছিলেন। ২০ বৎসর বয়সে মাসুম আকবরের নিকট গিয়া ৫০০ সৈন্যের সেনানী নিযুক্ত হন। আফগানদিগের সহ যুদ্ধে তিনি কৃতিত্ব লাভ করেন এবং কালাপাহাড়ের সহিত যুদ্ধে আহত হন। সাহসিকতার জন্য তিনি উড়িষ্যা জায়গির পান, পরে মানকর ও মজফ্ফরের কঠোরতা নিবন্ধন বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, ভাটি অঞ্চলে গিয়া অবশেষে ১০০৭ হিজরীতে (১৫৮৯ খ্রিঃ) ৪৪ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় বলেন, "মাসুম খাঁ বঙ্গে কুতুলু খাঁ লোহানী (কুতুলু) বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। অবশেষে তিনি কালা-পাহাড়কে নিজ দলে নিযুক্ত করেন। ইলিয়ট কৃত আকবর নামা পাঠে জানা যায় যে, মাসুম কাবুলী বাদশাহের সহিত যখন (যুদ্ধে) পরাস্ত হইয়াছিলেন, তখন ফতেয়াবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই হিসাবে ফতেয়াবাদ বাদশাহ বিপক্ষ দলের প্রধান আড্ডা ছিল।"[৪৪] তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, চাটমোহরের মসজিদ নির্মাতা মাসুম খাঁ আকবরের সমকালীন একজন বিদ্রোহী কাবুলি মোঘল সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি আকবর শাহ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া পরে তাঁহার বিদ্রোহীদলে যোগদান করেন। আবার জানা যাইতেছে "তিনি কালাপাহাড়কে নিজ দলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" কালাপাহাড় সুলেমান কেরানির সেনাপতি ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দু দেব-মূর্তি ধ্বংস করেন। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে সুলেমানের মৃত্যু হয়। চাটমোহর মসজিদ ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত জানা যায়। এই জেলার নরসিংহপাড়া, চৈত্রহাটি প্রভৃতি গ্রামের কালীবাড়িতে প্রতিমা-সমূহের ভগ্নাবস্থাদর্শনে অনেকে অনুমান করেন যে হিন্দু-ধর্ম বিদ্বেষী কালা-পাহাড়ের প্রভাবকালে এই সকল স্থানে হিন্দু দেবদেবীর উপর তাঁহার অত্যাচার হইয়াছিল, মূর্তিসমূহের ভগ্নাবস্থা এবং প্রচলিত জনশ্রুতি ব্যতীত হিন্দু মন্দিরের দেব-মূর্তির উপর মুসলমানের অন্য কোন অত্যাচারের নির্দশন এই জেলায় দেখা যায় না। তবে চাটমোহরের মসজিদের প্রস্তর ফলকের যে পৃষ্ঠায় হিজরী ৯৮৯ অব্দে মাসুম খাঁ কর্তৃক এই মসজিদ নির্মাণের পরিচয় লিখিত আছে, তাহার অপর পৃষ্ঠায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন হিন্দু শাস্ত্রোক্ত দেবমূর্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বে এই মসজিদ হিন্দুদের মন্দির ছিল, পরে মুসলমান আমলে ইহা তাহাদের ভজনালয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার কারুকার্য ও নির্মাণ-কৌশল এবং ঘন সন্নিবিষ্ট হিন্দু-পল্লী মধ্যে অবস্থানই ইহা পূর্বে হিন্দু-মন্দির থাকার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলা যায়।

মাসুম খাঁর বিবরণে জানা যায়, আকবর বাদশাহ ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশ জয় করিলেও, পাবনা জেলার চাটমোহরাদি উত্তরাঞ্চল পাঠান ও কাবুলি প্রভৃতি মোঘল বিদ্বেষী বিদ্রোহীগণের আশ্রয় স্থল ছিল। তাহারা মোঘল-রাজ-শক্তি উপেক্ষা করিয়া এতদঞ্চলে স্বাধীন রাজশক্তি পরিচালনা করিত। পাবনা জেলায় মানসিংহের আগমন প্রসঙ্গে জানা যায়, তিনি এই জেলার পদ্মাতীরে হিমাইতপুর, ছাতনি এবং মরিচপুরাণ প্রভৃতি স্থানে যে সকল সেনানিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কতকাংশে এই সকল বিদ্রোহীদল দমনোদ্দেশ্যেই হইয়াছিল।

পাঠান আমলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নানাকারণে অরাজক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, হোসেন শাহ ও শের শাহের রাজত্বকালে রাজ্য মধ্যে অনেক সুশাসনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জেলার সোনাবাজু, বড়বাজু প্রভৃতি পরগণা বিভাগ হোসেন শাহের রাজত্ব সময়ের রাজস্ব বিভাগীয় সুবন্দোবস্তের পরিচায়ক। শের শাহের আমলে বঙ্গদেশে ডাক বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎকালে এই জেলার নবগ্রাম, সুলতানপুর, মরিচপুরাণ, সমাজ

প্রভৃতি গ্রামে পাঠান রাজকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার নিদর্শন অদ্যাপি তথায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। মুসলমান রাজত্বকাল হইলেও হিন্দুগণ মধ্যে অনেকে উচ্চ রাজপদলাভ করিতেন এবং বেতন স্বরূপ জায়গির উপভোগ করিয়া নিজ এলাকা মধ্যে তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশ শাসন ও সংরক্ষণ করিতেন। ইহা হইতেই কালে ভৌমিকী প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং পাবনা জেলা তাহার ফলে সময়ে সাঁতৈল, সময়ে ভাতুরিয়ার ভৌমিক বা জমিদারগণের রাজ্যান্তর্গত ছিল।

নবগ্রাম, সমাজ, চণ্ডীপুর, চাটমোহর প্রভৃতি গ্রামে, পাঠান আমলের যে সকল মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে অনুমান হয়, পাঠান সুলতানগণ স্থাপত্য শিল্পের উন্নতিকল্পে সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ঐ সকল মসজিদের ভিত্তি অতি সুদৃঢ় ও প্রাচীর প্রায় ছয় হাত বেধ বিশিষ্ট। আজি চারি শতাধিক বৎসর পরে ইহা আমাদের নিকট আশ্চর্যজনক বোধ হইতেছে, কিন্তু পূর্বে এদেশে এই প্রকার গৃহনির্মাণ প্রণালী প্রচলিত ছিল। এদেশে সাধারণ লোকে ধনুকাকার "বাঙ্‌লা" গৃহে বাস করে ; প্রথমে মুসলমান আমলেও তদ্রূপ ছিল। জোড়াবাঙ্‌লা বা একটি বাঙ্‌লাগৃহ সমন্বিত হিন্দু দেব-মন্দিরও উক্ত আদর্শেই নির্মিত হইত। পাবনার জোড় বাঙ্‌লা ও অন্যান্য যে সমস্ত ইস্টক নির্মিত "বাঙ্‌লা" এই জেলায় এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা ঐ সময়ের আদর্শে নির্মিত। মুসলমানগণ এদেশে আগমন করিলে পর গম্বুজ বিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ প্রণালী প্রচলিত হয়। শাহজাদপুর ও পূর্বোক্ত স্থান সকলের মসজিদগুলিই তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। তৎপূর্বে এদেশে জৈনবৌদ্ধ যুগে এক চূড়াবিশিষ্ট মন্দির বা মঠ নির্মিত হইত। হাণ্ডিয়ালের জগন্নাথের মন্দির, তাড়াশে ও অন্যান্য স্থানে যে সকল শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায় তৎসমুদয়ই এক চূড়াবিশিষ্ট। তৎকালে বা তৎপরবর্তী যুগে হিন্দুদিগের পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট একতল পঞ্চরত্ন বা নয় চূড়াবিশিষ্ট দ্বিতল নবরত্ন মন্দির সকল ও সুপ্রাচীন অত্যুচ্চ এক চূড়া বিশিষ্ট শিবমন্দিরের আদর্শেই নির্মিত হইত। তবে চূড়ার সংখ্যাধিক্য ছিল মাত্র। ইহাতে অনুমান হয়, প্রাচীন জৈনবৌদ্ধাদি যুগে এক চূড়াবিশিষ্ট মন্দির ও মুসলমানের ৩, ৫, ৯ বা ততোধিক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ প্রণালী একই সময়ে এদেশে প্রচলিত থাকা সম্ভব।

অন্য শিল্প মধ্যে পাবনা জেলায় বস্ত্র-শিল্প বহুদিন হইতেই প্রচলিত আছে। এদেশে অধিক সংখ্যক তন্তুবায় আদি জাতির বাস তাহার সর্বপ্রধান পরিচয়, আবার মুসলমান আমলে যখন তাহারা ধর্মান্তরিত হইয়াছিল, তখনও এদেশের কারিগর সংখ্যা পূর্বাপর অন্য শিল্পী অপেক্ষা অধিক ছিল এবং এখনও এই জেলায় অন্যস্থান হইতে বেশি পরিমাণে আছে। দেশের সর্বত্র কার্পাসের আবাদ ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ নিজ বাটিতে ও ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর তুলার চাষ করিত। ইহার কল্যাণে দেশের লোকে চরকায় সূতা কাটিয়া নিজের লজ্জা নিবারণ করিত এবং দুই পয়সা উপার্জন করিয়া লাভবান হইত। মোটা ও মিহি দুই প্রকার সূতাই চরকায় প্রস্তুত হইত। ইহাতে অত্যধিক লাভ ছিল বলিয়া এমন কি স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত গর্ব করিয়া বলিতেন—

"চরকা আমার ভাতারপুত চরকা আমার নাতি। ,
চরকার দৌলতে আমি দুয়ারে বাঁধি হাতি।"

তন্তুবায় ও সর্বসাধারণ লোক ব্যতীত ব্রাহ্মণ মহিলাগণ হাতে কাটিয়া সূক্ষ্ম উপবীত প্রস্তুত করিতেন এবং এক্ষণেও এই জেলার স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম ও সুন্দর উপবীত পাওয়া যায়। মৃৎশিল্পের মধ্যে এই জেলার হাঁড়ি পাতিল এবং তদুপরি নানাপ্রকার কারুকার্য নিপুণ ও প্রতিমা-প্রস্তুতকারক কুম্ভকার এবং চিত্রকরগণ এই জেলার কোলা, মৃজাপুর, সাগরকান্দি এবং ছাতিয়ানতলী অঞ্চলে বহুদিন হইতে বাস করিতেছে। কাষ্ঠশিল্প ও লৌহশিল্পও এই জেলার নৌকা নির্মাণে অতীত যুগ হইতে বর্তমান আছে। খাদ্য দ্রব্যাদি তৈয়ারে এই জেলার হরিপুর,

চাটমোহর, বাগবাটি ও হাটুরিয়ার পাল ও মোদকগণ বহুদিন হইতে বিখ্যাত। "চৈতন্য চরিতামৃতে" যে ৫২ প্রকার খাদ্য-দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তাহার নির্দশন এই জেলার প্রাচীন বংশীয় বলবান, দীর্ঘকায় ও কর্মঠ ভোক্তাগণের পরিচয়ে জানা যায়।

দেশের বাণিজ্য কিরূপ ছিল, তাহা সবিশেষ জানা যায় না। তবে হোসেনশাহী আমলে দেশের লোকে স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিত জানা গিয়াছে; ইহাতে বোধ হয় দেশের লোক বাণিজ্যের প্রসাদে সুখী ছিল। প্রথম মুসলমান আমলে আরব্য ও পারস্য দেশিয় বণিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষেই এদেশে আসিতেন। শাহজাদপুরের মক্‌দুম সাহেবকে কেহ আরব দেশিয় এবং খোজাবংশ সম্পর্কীয় বলিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয়, তৎকালে আরব দেশিয় বণিকগণের এই জেলা অংশেও আগমন সম্ভব এবং তাহারা ক্রয় বিক্রয়ে দেশজ পণ্যদ্রব্য বিনিময় করিয়া এদেশকে ধনশালী করিয়াছিল। তৎকালে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত, ইহাতে অনুমান হয়, তৎকালীন সুলতানগণ দেশের অন্তর্বাণিজ্যে সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। যাহাতে কেবল দেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্যসম্ভার বাহিরে যায়, তৎপ্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। দেশের সম্পদ দেশে ব্যয় হয়, তাহাও তাঁহাদের শাসনকালের একটি বিশেষত্ব ছিল।

তৎকালে হিন্দু সমাজে কঠোর শাসন প্রচলিত ছিল। সামান্য কারণে লোকের কথায় কথায় জাতি যাইত। সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোরতায়, সময়ে নবাগত মুসলমান ধর্ম প্রচারকগণের সংঘর্ষে দেশের লোক নানাকারণে মুসলমান ধর্ম আশ্রয় করে। জাতিভেদ বর্জিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক কখন ব্রাহ্মণগণের কঠোরতায়, কখন পীর ফকিরগণের উত্তেজনা ও প্রলোভনে দলে দলে বৈদেশিক রাজধর্ম গ্রহণ করিয়া রাজানুগ্রহ লাভ করিতে থাকে। পৌণ্ড্রবর্ধন ও সমতটে অর্থাৎ পাবনা ও বগুড়া জেলা সান্নিধ্যে ও ঢাকাদি জেলার কতকাংশে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। যখন দলে দলে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী জাতিগণ নানা কারণে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে, তখন এই জেলার অধিকাংশ উক্ত ধর্মাবলম্বী জাতিগণও মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে। তাহার ফলে আজ পাবনা, বগুড়া ও ঢাকা প্রভৃতি জেলায় শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ জন মুসলমান দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এদেশের নিকারী পাঝার প্রভৃতি জাতিও তৎকালে মুসলমান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন মুসলমানগণ এদেশ আগমন করিলে হিন্দু সমাজে অনেক মুসলমানী কায়দা ও প্রণালী প্রবেশ করিয়াছিল। তখন হইতে লোকে দাড়ি রাখিতে আরম্ভ করে। জানা যায়, ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে ছুৎমার্গ পরিহার-জন্য হুঁকায় তামাক খাওয়া পরিত্যাগ করিয়া নস্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।

গার্হস্থ্য জীবনেরও পাঠান আমলে অনেক পরিতর্বন সাধিত হয়। ইজার চাপকান পরিধেয় বস্ত্রের এই সময়ে ব্যবহার হইতে থাকে। উষ্ণীষ পূর্বাপর প্রচলিত থাকিলেও, পাগড়ি তখন হইতে অধিক ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকের গহনাদির অনেক বিশেষত্ব তখন হইতে পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুগণ ঘটিবাটি থালা এবং মুসলমানগণ সানিখি রেকাব বদনা ব্যবহার করিত। কেহ হিন্দু হইতে মুসলমান হইলে বাটির সম্মুখে একটি বদনা ঝুলাইয়া রাখিত। লম্বা চুল রাখা পাঠান আমলে প্রচলিত হয়। দাঁতে মিশি দেওয়া তখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয়, তাহা হইতে দোক্‌তা বা তাম্রকুটচূর্ণ ব্যবহার দেখা যাইতেছে।

শিক্ষা ও শিক্ষিতের অবস্থা এই জেলা অংশে পাঠান আমলে কি প্রকার ছিল, তাহার নিদর্শন স্বরূপ কোন প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তকাদি দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে বৈষ্ণব যুগে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক অনেক পয়ার প্রবন্ধ ও পদাবলী রচিত হইয়াছিল। চাটমোহর থানার অধীন হরিপুর, গুণাইগাছা আদি পল্লী ও অন্যান্য অনেক গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের গৃহে চারি বা পাঁচ শতাধিক বৎসর পূর্বের তালপত্রে হস্ত-লিখিত ঈদৃশ রচিত গ্রন্থাদি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা সমস্তই রাধাকৃষ্ণলীলা ও রামলালী সম্বলিত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতীয় বিষয়াদি লইয়া অধিকাংশ পদ্যে রচিত বা লিখিত। অনুসন্ধানে এরূপ অনেক প্রকাশিত হইতে

পারে। মুসলমান আমলে আরবি পারসির চর্চাও অনেক চলিয়াছিল ; তাহারাই এদেশে তুলট কাগজ প্রচলন করেন। চাটমোহর মসজিদের প্রস্তরলিপিতে তৎকালীন পাঠান আমলের লিপি-প্রণালীর আভাস পাওয়া যায়। এই জেলার কাজিপুর, কাজিটোলা, মীরকুঠা প্রভৃতি পল্লী ও স্থানে স্থানে কাজিপাড়া, মীরপাড়া প্রভৃতি তৎকালীন শিক্ষিত মুসলমান পল্লীর নিদর্শন। সমাজের মসজিদ গাত্রে ১০/১২ বৎসর পূর্বে তোক্‌রা অক্ষরে লিখিত কোরাণ সরিফের যে সকল উদ্ধৃত অংশ পরিলক্ষিত হইত, তাহা মুসলমান সময়ের শিল্পনৈপুণ্য ও শিক্ষার পরাকাষ্ঠা বলা যায়। তৎকালীন বাংলা লিখন প্রণালী হাঁসপুর (চাটমোহর) জঙ্গলে প্রাপ্ত প্রস্তরফলকের অক্ষরে ও হিমাইতপুর গ্রামের ৩১৬ বৎসর পূর্বে লিখিত প্রাচীন ব্রহ্মোত্তর দানপত্রে কিঞ্চিৎ জানিতে পারা যায়।

বিশৃঙ্খলভাবে রাজ্যশাসনকালে সর্বদা সৈন্যাধক্ষ বা সরদারগণের সিংহাসন লালসায় পরস্পর বিবাদ মধ্যে ও দৃশ্যতঃ অরাজক পাঠান শাসনকালে এই জেলার স্থানে স্থানে যে কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ বা ভজনালয় এবং চৈত্রহাটি, তাড়াশ অঞ্চলে উনু খাঁর দীঘি, ময়দান দীঘি প্রভৃতি পুরাতন দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই অতীত পাঠান আমলের শাসন কর্তৃগণের প্রজাসাধারণের সহিত সহানুভূতি ও তাহাদের ধর্মপ্রাণতা আজ চারি পাঁচ শত বৎসর পরেও প্রকৃষ্টরূপে জ্বলন্ত অক্ষরে আমাদের নিকট ঘোষণা করিতেছে। পাঠান অধিকারকালে বাংলার স্থানে স্থানের এতাদৃশ উন্নতি ও কীর্তিকলাপ দর্শনেই বোধ হয়, সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, "পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে সে দুর্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্ন জাতি হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। সে সময়ের জমিদারদিগের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদিগকেই রাজা বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা করদ ছিলেন মাত্র ; পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই জানা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক শক্তি নিবিয়া যায়। পাঠান শাসন কালে বাংলার মানসিক দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়াছিল। * * * * বাস্তবিক তখন এদেশে স্থাপত্য বিদ্যায় আশ্চর্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল। * * * দেশে অনেক ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদের বিস্তর ক্ষমতা ছিল।[৪৫] পাবনা জেলা আধুনিক, তজ্জন্য এখানে দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য কিছুই নাই বলিয়া যাহারা উদাসীন বা হতাশ হইয়াছেন বা হইতেছেন, তাহাদের একবার আলস্য বা জড়তা পরিহার করিয়া এই জেলার অতি প্রাচীন হিন্দু-রাজত্ব কাল হইতে এই সমস্ত পাঠান সুলতানগণের ক্রীড়াভূমি পরিদর্শন করা আবশ্যক। এদেশে একেবারে কিছু না থাকিলে, হিন্দুরাজত্বকাল হইতে বরেন্দ্রভূমির এই অংশে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ও বাণিজ্যজীবী বৈশ্য প্রভৃতি হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন জাতিগণের কিম্বা পরবর্তী মুসলমান অধিকারকালে পাঠান আমলের এই জেলার স্থানে স্থানে মুসলমান সুলতানগণের অবস্থানের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না। এ জেলার ভূভাগ নদী বিল-খালাদিতে পূর্ণ থাকিলেও তন্মধ্যে ধনরত্নাদি লুক্কায়িত ছিল, তল্লাভে অথব্য সৌভাগ্য অন্বেষণে আসিয়া উদ্যোগী মহাত্মাগণ সুদূর প্রাচীনকাল হইতে এথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া এদেশে স্থায়ী হইয়াছিলেন। এদেশেও মধু সঞ্চিত ছিল বলিয়াই, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে মধুকরগণ আসিয়া জুটিয়াছিল। এই জেলার পোতাজিয়া, শাহজাদপুর, মরিচপুরাণ, সুলতানপুর, পাঠানপাড়া, সয়দাবাদ, (সৈয়দ আবাদ) সৈয়দপুর, নবগ্রাম, সমাজ, চাটমোহর প্রভৃতি পাঠান আমলের নিদর্শনসূচক পল্লী সমূহের যে পরিচয় জানা যাইতেছে এবং তৎ তৎ স্থানে অদ্যাবধি পাঠান শাসনকালের যে সকল কীর্তিকলাপ বিদ্যমান আছে, তৎপ্রতি আরবি পারশি ভাষাভিজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু যোগ্যতর লেখকগণের ও জেলাবাসী শিক্ষিত মুসলমান সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক।

খ. মোঘল আমল ঃ

হিন্দুর প্রতি মহামতি আকবর বাদশাহের সহানুভূতি জানিয়া, পাঠান আমলে কালা-পাহাড়ের উপদ্রবে উৎপীড়িত বাঙালি হিন্দু জমিদারগণের অনেকে দিল্লিতে গিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় বলেন, "তাঁহারাই আকবরকে বঙ্গদেশ জয় জন্য উত্তেজিত করিতে থাকেন। এই সকল লোকের মধ্যে তাহিরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ রায় (পাবনা), সিন্দুরীর জমিদার ঠাকুর কালিদাস রায়, সাঁতোড়ের জমিদার রাজকুমার গদাধর সান্যাল এবং দিনাজপুরের রাজভ্রাতা গোপীকান্ত রায় বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। * * * * উপরি উক্ত চারিজন বাঙালি সম্ভ্রান্ত লোক মোঘলদিগের অপরিচিত পথের পথপ্রদর্শক হইলেন। * * * * ভাতুরিয়ার রাজাও চন্দনায় বঙ্গজ কায়স্থবংশীয় বিক্রমাদিত্য (প্রতাপাদিত্যের পিতা) ভিন্ন কোন হিন্দু বড়মানুষ পাঠান পক্ষে থাকিলেন না। দাউদ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। বাংলা ও বিহার দিল্লি সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। সেই অবধি বাংলাদেশে পাঠান রাজত্ব শেষ হইল।" ইহাতে অনুমান হয়, পাবনা জেলার পূর্বাংশের জমিদার বা সিন্দুরীর ভৌমিক বংশীয় দেবীদাসের পুত্র ঠাকুর কালিদাস ও পশ্চিমাংশের ভৌমিক সাঁতৈল রাজবংশীয় গদাধর সান্যাল তাহাদের প্রতি পূর্বতন পাঠান অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার মানসে মোঘল পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সাহায্যেই পাবনা জেলা অংশে মোঘল শাসনের সূত্রপাত হইয়াছিল। ক্রমে, বঙ্গদেশ মোঘল অধিকারভুক্ত হইলে, পাবনা জেলার যে যে স্থানে প্রথমে তাঁহাদের আগমন ঘটিয়াছিল, তাহার নিদর্শন পাবনার নিকটবর্তী ছাতনি, চাটমোহর থানার অন্তর্গত মরিচপুরাণ, অষ্টমনীষা প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমান আছে। প্রসিদ্ধ মোঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহ সম্ভবত মাশুম খাঁ কাবুলিকে দমন জন্য পদ্মার উত্তর তীরে বর্তমান ছাতনি গ্রামে যে শিবির বা ছাউনি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কালে ছাউনি স্থলে ছাতনি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার নিকটবর্তী মুরাপারা, মনোহরপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও মানসিংহের জাঙ্গাল ও তৎপ্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ি আদির জনশ্রুতি অদ্যাবধি শুনিতে পাওয়া যায়। অপর সেনানিবাস চাটমোহরের উত্তরে মরিচপুরাণে অবস্থিত ছিল। পাঠান আমলে সমাজ, চণ্ডীপুর, সুলতানপুর ও মরিচপুরাণে তাহাদের রাজকীয় ও সামরিক কেন্দ্রস্থল ছিল। মুরচা অর্থ অস্ত্রশস্ত্র সমন্বিত শিবির। এদেশে মোঘল আগমনের পূর্বে এখানে যে সেনানিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল করতোয়া নদীর ক্রমশ বিলোপ সাধনের পর বা সঙ্গে সঙ্গে তাহা উঠিয়া ইহার উত্তরে বগুড়া জেলার সেরপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং এখানকার সেনানিবাস মুরচাপুরাণ বা মরিচপুরাণ নামে ও তদবধি সেরপুর মুরচাসেরপুর নামে অভিহিত হইতে থাকে।

বেণী রায়ের ডাকাইতি নিবারণ মানসিংহের এতদঞ্চলে আগমনের অন্যতম কারণ। প্রকাশ বেণী রায় একজন কুলিন ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তাড়াশ পুলিশ স্টেশনের অধীন কহিত নামক স্থানে চলন বিল মধ্যে তাহার নিবাস ছিল। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, সে জন্য লোকে তাহাকে "পণ্ডিত ডাকাইত" বলিত।[৪৬] কালাপাহাড় যেমন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া গৌড় বাদশাহের কন্যাকে বিবাহ করায় হিন্দু-সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন ও কঠোর সমাজ-শাসনের প্রতিশোধার্থ হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ বেণী রায়ের পত্নী পাঠান সেনাপতিগণ কর্তৃক অপহৃত হইলে, তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন না বটে, কিন্তু সংসার ত্যাগী হইয়া নানা জাতীয় হিন্দু চেলা বা শিষ্য সংগ্রহ করিয়া একদল ডাকাইত বা সৈন্য প্রস্তুত করেন। চলন বিলের মধ্যে কহিত নামক স্থানে এক কালীমূর্তি সংস্থাপন করিয়া তথায় মুসলমান ধরিয়া আনিয়া বলি দিতেন। তজ্জন্য উক্ত কালী "যবন মর্দ্দিনী" কালী নামে খ্যাত হইয়াছিল। তাহার বাসদ্বীপকে লোকে অদ্যাপি "পণ্ডিত ডাকাইতের ভিটা" বলে। মুসলমানেরা তাহাকে "শয়তানের ভিটা" বলিত। বেণী রায় সাঁতোড়

সান্যালদিগের কুটুম্ব ছিলেন ; তজ্জন্য সাঁতোড়ের সান্যাল ও কায়েতগণ তাঁহার দলে যোগ দিয়াছিল। তন্মধ্যে যুগলকিশোর সান্যাল ও কায়স্থ চণ্ডীপ্রসাদ রায় সর্বপ্রধান। * * * * বেণী রায় নিঃসন্তান মৃত হইলে তাহার প্রধান চেলা যুগলকিশোর সান্যাল সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তাহার সন্তানেরাই জেলা বগুড়ার সেরপুরের সান্যাল নামে অদ্যাপি জমিদারি ভোগ করিতেছেন। যবনমর্দিনী কালীমূর্তিও সেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ভূমিকম্পে সেই মূর্তি নষ্ট হইয়াছে। বেণী রায়ের দ্বিতীয় শিষ্য চণ্ডীপ্রসাদ রায়ও জমিদারি পাইয়া পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারই সন্তানেরাই পোতাজিয়ার রায়। ইহারাই বারেন্দ্র কায়স্থ মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন জমিদার এবং সম্মানিত যুগলকিশোর ও চণ্ডীপ্রসাদকে পাঠানেরা 'কাল জোগলা' ও 'কাল চণ্ডীয়া' বলিত। আর যে সকল কুলিন ব্রাহ্মণ বেণী রায়ের দলে ছিলেন, তাঁহারা এবং তৎসংসৃষ্ট কুলীনেরা "বেণী পঠির কুলিন' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানেরা অদ্যাপি বেণী-পঠির কুলিন নামেই পরিচিত।[৪৭]

"মানসিংহ যখন পদ্মার দক্ষিণ পারে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা ঠাকুর ভানু সিংহ সদ্ভাবে বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে বেণী রায়কে বশীভূত করিয়া তৎসহ সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। "ভানু সিংহ বেণী রায়কে জমিদারি এবং * * * * তাঁহার কালীদেবীর দেবত্ররূপে দিতে স্বীকারে রাজা মানসিংহের দ্বারা সম্রাটের সনন্দ আনাইয়া দিলেন। বেণী রায় তদবধি শান্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিলেন। বেণী রায়ের অনুরোধে ভানু সিংহ যুগল কিশোর সান্যালকে এবং চণ্ডীপ্রসাদ রায়কেও জমিদারি দিয়াছিলেন। আর চণ্ডীপ্রসাদ রায়কে নবাবী দরবারে পেস্কার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।"

ভৃগুনন্দীর পুত্র কানু ও মাধবের সময় হইতে বারেন্দ্র কায়স্থগণ পোতাজিয়ায় স্থায়ী হন ; সুতরাং চণ্ডীপ্রসাদ রায়ের "সন্তানগণই পোতাজিয়ার রায়" এমত বলিলে একেবারে নির্ভুল হয় না ; তবে ভারেঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন রায় মহাশয় "বেণী রায়" নামক একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসে বেণী রায়ের সংশ্লিষ্ট লোকের প্রযত্নে পোতাজিয়াতে "জয়ার" মন্দির নির্মাণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।[৪৮] ইহাতে অনুমান হয়, পোতাজিয়ারও কেহ কেহ বেণী রায়ের দলে থাকা সম্ভব। সত্যরঞ্জন বাবু "বেণী রায়ের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বেণী রায় রাজা দেবীদাসের সমসাময়িক। গৌড় বাদশাহ দাউদের সময়ে বরেন্দ্রভূমিতে তাঁহার প্রবল-প্রতাপ ছিল। কুল-শাস্ত্রে লিখিত আছে—

'গঙ্গাপথের গঙ্গাধর, কহিতের বেণী,
ছাতকের বসন্ত রায়, পুঙ্গলির ভবানী।'

এই উপন্যাস বর্ণিত মূল উপাখ্যান কিম্বদন্তী হইতে গৃহীত। কিন্তু ইহাতে যে সকল ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কাল্পনিক। ভানু সিংহের সহিত বেণী রায়ের যুদ্ধ ইতিহাসের কথা।" একেবারে কাল্পনিক ও কিম্বদন্তীমূলক হইলেও এতৎ সমূহ মধ্যে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত থাকা সম্ভব। কথঞ্চিৎ বাস্তব ঘটনা না থাকিলে কাল্পনিক একেবারে অসম্ভব। তৎকালে নবগ্রাম সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। তথায় ভানু সিংহ কিয়ৎকাল স্থায়ী হইয়া ছিলেন। অদ্যাবধি নবগ্রামে ভানু সিংহের খনিত দীর্ঘিকা চলিত ভাষায় ভানুসিংহের দীঘি নামে পরিচিত হইতেছে। তৎকর্তৃক নির্মিত রাজবর্ত্ম ভানুসিংহের রাস্তা বা জাঙ্গাল নামে তথায় বর্তমান থাকিয়া অতীত স্মৃতিবহন করিতেছে।

১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ মোঘল-সচিব রাজা টোডড়মল্ল সুবে বাংলার ভূভাগ জরিপ জমাবন্দি করিয়া কেবলমাত্র বঙ্গদেশকে ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগণায় বিভক্ত করিয়া ইহার রাজস্ব ১০৬৯৩১৫২ টাকা ধার্য করেন। উক্ত সরকারসমূহ মধ্যে তখন পাবনা জেলা সরকার বাজুহায়, সরকার মহাম্মদাবাদ প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সকল রাজস্ব বন্দোবস্ত

কার্যনির্বাহার্থ তৎকালে যে সকল কাননগু নিযুক্ত হয়েন, তন্মধ্যে পাবনা জেলার অষ্টমনীষা নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ-বংশীয় গোপীকান্ত রায় মহাশয় উক্ত কাননগু পদে কার্য করিয়াছিলেন। "ঢাকুরে" লিখিত আছে—

সমাজ প্রধান মধ্যে অষ্টমনীষা গ্রাম।
উত্তমে ক্রিয়াতে ব্যাখ্যা হইলা প্রধান।।
সর্ববিদ্যা নিপুণতা সর্বাদরনীয়।
অসীম অনন্তগুণে কেহ তুল্য নয়।।
যবে মানসিংহরাজা বঙ্গেতে আইলা।
উত্তম জানিয়া বংশ সম্মান করিলা।।
কাননগু দপ্তর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালাতে হয়।
সে দপ্তরে চাকরি কৈলা গোপীকান্ত রায়।।
নেউগী খেতাব দিলা সন্তুষ্ট হইয়া।
নিজ গ্রামখানি দিলা মিলিখ লিখিয়া।।

মোঘল আমলের কাননগুদিগের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা কিরূপ ছিল, তাহা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় Extract from the Fort St. George Diary of 2nd, August, 1695 অবলম্বনে লিখিয়াছেন যে, "These qanungoes receive no salary from the Emperor, but are allowed one or two percent of the produce of lands, not out of the Emperor's part, but the part belonging to farmers and husbandmen. ... The qanungoes alone knew the names of the tenants, the areas, and yield of their fields, their fixed rents and arrears. In the troubled times of mediaeval India, when there were frequent changes of dynasty, the new conqueror could not collect his dues from the land (or even ascertain its amount,) the zamindar could not retain his position nor tenant escape against exaction, without the help of the qanungo and his papers. Thus the qanungo had the whip-hand of the Government, zaminder and ryot alike. His position was one of extraordinary influence and gain." [৪৯] ভাবার্থ এই যে কাননগুগণ প্রজার জমি, খাজনা, জমির উৎপন্নাদি ও বাকিকর প্রভৃতির বিষয় অবগত থাকিতেন। রাজা, জমিদার ও প্রজা প্রত্যেককেই তাঁহাদের কার্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। এক রাজবংশের পর অপর রাজবংশ রাজা হইলে, তাঁহারা কাননগুগণের বিনা সাহায্যে খাজনা আদায় করিতে পারিতেন না ; জমিদার ও রায়তগণ তাহাদের স্বত্ব ও অবস্থা বজায় রাখিয়া অত্যধিক রাজকর হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিত না। এইরূপে কাননগুদিগের পদ অতি ক্ষমতাশালী ও লাভজনক ছিল।

গোপীকান্ত রায়বংশীয় অধঃস্তন কমল খাঁ ও সুবুদ্ধি খাঁ মোঘল রাজ-সরকারে সামরিক বিভাগে চাকুরি করিয়া খাঁ উপাধিলাভ করেন। প্রকাশ তাঁহারা বক্সিপদে কাজ করিতেন। তৎকালে সেনা ও সেনাপতিগণ স্থলবিশেষে যে জায়গির লাভ করিতেন, তাহা তাঁহাদের নামানুসারে কথিত হইত। মরিচপুরাণের নিকট যে স্থানে তাঁহাদের জায়গির অথবা অধীনস্থ শিবির অবস্থিত ছিল, তাহা অদ্যাপি কমলমরিচ ও সুবুদ্ধিমরিচ নাম অভিহিত হইয়া সেই প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় ১৩২৯ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসী পত্রিকায় "বাংলার স্বাধীন জমিদারের পতন" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "ইসলাম খাঁর বঙ্গশাসন এবং জমিদার ধ্বংসের সুদীর্ঘ ও সমসাময়িক বিবরণ তদীয় কর্মচারী শিতাব খাঁর (মির্জ্জা সহন) রচিত

ফারসি হস্তলিখিত বহারিস্তানে বর্ণিত হইয়াছে।" তিনি ইসলাম খাঁর বঙ্গশাসন সময়ের (১৬০৮-১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ) ঘটনা সমূহের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খাঁর সহিত পাবনা জেলার শাহজাদপুরের জমিদার এবং চাটমোহর অঞ্চলে সোনাবাজু পরগণাস্থিত বিদ্রোহী পাঠান ও ভূম্যধিকারিগণের যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল। "পাবনা জেলার জমিদারদের দমন" প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "এদিকে বর্ষার আগমনে ইসলাম খাঁর আজ্ঞায় তুক্‌মাক্ খাঁ আলপসিংহ হইতে উঠিয়া নিজ জাগির শাহজাদপুরে আসিলেন। এই শাহজাদপুরের জমিদার রাজা রায় তুক্‌মাকের সঙ্গে দেখা করিয়া নিজপুত্র রাঘু (রঘু বা রাঘব) রায়কে খাঁর দরবারে রাখিয়া বিদায় লইলেন ; কিন্তু বর্ষার মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া অনেক নৌকা লইয়া আসিয়া শাহজাদপুরের দুর্গ তিন দিনরাত্রি অবরোধ করিলেন, অবশেষে কিছু করিতে না পারিয়া রণভঙ্গ দিলেন। তখন তুক্‌মাক্ খাঁ রাগিয়া 'রঘু' রায়কে জোর করিয়া মুসলমান করিলেন এবং নিজ খিদ্‌মদ্‌গারের (ভৃত্যের) কাজ করিতে বাধ্য করিলেন। এ সংবাদে ইস্‌লাম্ খাঁ অসন্তুষ্ট হইলেন। ... ইহতমাম্ খাঁ সাতকুচে (নৌকায়) শাহজাদপুরে পৌছিলেন। এখানে সকলে ইদ্‌পর্ব যাপন করিলেন। (১৮ ডিসেম্বর ১৬০৮)। এখানে বাদশাহী নৌওয়ারার মহলা (Review) হইল।" এই প্রসঙ্গে জানা যায় পাবনার ইছামতী নদীতীরে একদন্ত গ্রামেও মোঘল সৈন্যগণের সমাগম হইয়াছিল।

উপরোক্ত রঘু রায় বা রাজা রায় কোন্ জাতীয় হিন্দু ছিলেন, তাহা সবিশেষ জানা যাইতেছে না। এই জেলায় কিম্বদন্তীতে প্রকাশ সিরাজগঞ্জের অধীন রাণীগ্রামের বৈদ্য জমিদারগণের পূর্বপুরুষ মধ্যে রাঘব রায় নামে জনৈক মহাত্মা মুসলমান হইয়াছিলেন। গুণেরগাতির মিঞাগণ অদ্যাপি তাঁহার বংশধর বলিয়া পরিচিত। রাণীগ্রামের বৈদ্য জমিদারগণ এই জেলার বড়বাজু প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ পরগণার জমিদার ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। ইনিই সেই ইসলাম খাঁর সময়ের রাজা রায়ের পুত্র রঘু ওরফে রাঘব রায় কি না তাহা বিবেচনার বিষয়। আবার গুনিবাড়ির ব্রাহ্মণ বংশীয় কুলিনদিগের মধ্যেও একজন রাজা রায়ের নাম শুনিতে পাওয়া যায় ; এতদ্ব্যতীত শাহজাদপুরের অধীন আজুগড়া নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থবংশীয় জনৈক রঘু রায় বা রাঘব রায়ের নাম জানিতে পারা যায়। প্রবাদ তিনি এতদঞ্চলের একজন দুর্দান্ত লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইনি বিস্তর ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। ইহার দস্যুতাপবাদও জানিতে পারা যায়। প্রবাদ তিনি বাদশাহী আমলে শাসন ভয়ে এথাকার সুবৃহৎ তেঁতুল বৃক্ষকোটরে লুক্কাইত থাকিতেন। এই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ৩জন রঘু বা রাঘব রায়ের মধ্যে রাণীগ্রামের জনৈক রাঘব রায়ের সংস্রবে মুসলমান ধর্মগ্রহণের প্রবাদ অদ্যাবধি প্রচলিত আছে এবং রাণীগ্রামের বৈদ্য জমিদারগণ প্রাচীন জমিদার বলিয়াও পরিচিত, এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদেরই কোন পূর্বপুরুষ রাঘব রায় ও তাহার পিতা রাজা রায়ই ইসলাম খাঁর সময়ে শাহজাদপুরের জমিদার থাকা সম্ভব।

উপরিউক্ত সমস্তই এ জেলায় মোঘল শাসনকর্তৃগণের কার্যকলাপের নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত এই জেলার বাগ, মৃজা (মির্জা) পুর, মাসুন্দিয়া প্রভৃতি গ্রামে মির্জা, বেগ প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাস আছে। প্রবাদ ইহারা অনেকেই সম্রাট আরঙ্গজেবের ভ্রাতা দারার পুত্র সোলেমান ওরফে টর্নুবেগের বংশধর। কথিত আছে যে, মীরজুমলার ঢাকায় সুবেদারী আমলে (১৬৬১-১৬৬৪ খ্রিঃ) তিনি কালিয়াই বংশীয় রাজচন্দ্র রায় নামক জনৈক ফৌজাদারের অধীনে ছাতক গ্রামে কিছু ভূসম্পত্তি জায়গির প্রাপ্ত হইয়া তথায় স্থায়ী হন। টর্নুবেগের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নানাবেগ বাগ মৃজাপুরে (মির্জাপুরে) বাস করেন। কালক্রমে তাঁহারই চারি পুত্র পাবনা জেলার এতদঞ্চলে স্থানে স্থানে বাস করিতে থাকে। ইহারা সিন্দুরী পরগণার চারি আনা অংশের মালিক ছিলেন। অনেকের ভূসম্পত্তি এক্ষণে নষ্ট হইয়াছে এবং অনেকে দরিদ্রাবস্থাপন্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের মির্জা বেগ প্রভৃতি উপাধি অদ্যাবধি

তাহাদের পূর্ববংশ পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে আজকাল ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পুলিসাদি বিভাগে রাজকার্যে লিপ্ত আছেন।

মোঘল আমলের পূর্ব হইতে ভাতুরিয়ার জমিদারগণ পাঠান পক্ষ ছিলেন ; তজ্জন্য রাজা টোডড়মল্লের সময়ে তাহাদের জমিদারির ৭ পরগণা মধ্যে ৫ পরগণা জব্দ হয় এবং বৃহৎ পরগণা রামবাজু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কালিগাঁও ও কুসুম্বী নামে পরিচিত হয়। মাত্র দেড় পরগণা ভাতুরিয়ার রাজগণের দখলে থাকে, অবশিষ্ট সমুদয় সাঁতৈল রাজ প্রাপ্ত হন। ভাতুরিয়ার রাজার এক টাকা নজরানা মালগুজারিতে পরিণত হয়। তদবধি তাঁহার ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস এবং সাঁতৈল রাজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন হইতে পাবনা জেলার অধিকাংশ ভূভাগ সাঁতৈল রাজের জমিদারি ভুক্ত হয়।

১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের পর রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে, পাবনা জেলা দিয়া বাংলার শাসন-কর্তাগণের গতায়াত হইতে থাকে। তাহার ফলে ইসলাম খাঁর সময়ে পাবনার ইছামতী নদী কাটার জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। সুলতান শাহ সুজার সময়ে পদ্মা নদী দিয়া যাতায়াতে তিনি এই জেলার যে স্থানে কিয়দ্দিন অবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি সুজানগর নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত পাবনার ৩ ক্রোশ পূর্বে ইছামতী নদীতীরে গয়েশপুর, ইয়াকুবপুর, হামিদপুর, জালালপুর প্রভৃতি মুসলমান নামজ্ঞাপক যে কয়েকটি পল্লীর অদ্যাপি একত্র সমাবেশ দেখা যাইতেছে, তাহাও প্রাচীন প্রাদেশিক মুসলমান শাসনকর্তৃগণের অধ্যুষিত বলিয়া অনুমিত হয়।

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে আরঙ্গজেব পৌত্র আজিম ওশান বা আজিম ওশ্মান বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। প্রবাদ তৎকালে ঢাকা রাজধানীতে তদাধীনে তাড়াস জমিদারের পূর্বপুরুষ বলরাম রায় তথায় দেওয়ানি কার্য করিতেন। ঐ সময়ে নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের আধিপত্যের সূত্রপাত হইতেছিল। জানা যায় তিনি প্রথমে পুঠিয়া রাজের উকিল স্বরূপে ঢাকায় উপনীত হন ; পরে মুৎসুদ্দি পদেও কিছুদিন কাজ করেন।

আরঙ্গজেবের সিংহাসন আরোহণের (১৬৫৮ খ্রিঃ) পূর্ব পর্যন্ত মোঘল সম্রাটগণের রাজত্বকালে দেশের রাজকীয় অবস্থা অতীব সুখপ্রদ ও সন্তোষজনক ছিল বলিয়াই বোধ হয়। সিয়ার-উল-মূত-ক্ষরিণ পাঠে জানা যায়, পূর্ববর্তী মুসলমান বাদশাহগণ প্রজাসাধারণকে অপত্যনির্বিশেষে পালন করিতেন; মুসলমান সম্রাটগণ বৈদেশিক হইলেও এদেশের প্রজাসাধারণকে নিজ পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং তাহারাও তাঁহার রাজ্য ও ব্যক্তিগত উন্নতি কামনায় প্রাণপণে যত্ন করিত ; তজ্জন্য হিন্দুর দেশে দিল্লির বাদশাহ "দিল্লিস্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু আরঙ্গজেব স্বীয় পিতাকে বন্দি এবং ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, তিনি উপরিউক্ত দোষক্ষালন জন্য কতকগুলি পারিষদ ও ধর্মবেত্তা নিযুক্ত করেন ; তাহারা সম্রাটকে সর্বদা প্রশংসাবাদে সন্তুষ্ট রাখিতেন এবং তাহা হইতে কালে রাজদরবার ক্রমশ কুলোক ও কুপ্রথায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে দেশে তাহার বিষময়ফল দেখা দেয়। যথা "But these hypocrites no sooner saw themselves at the head of affairs, than their avarice and covetiousness gave rise to such a train of evils as shed even their baneful influence on those courtiers continuing to pour ruin and devastation on the prosperities of the Faithful, ... Then commenced the custom of leasing out all branches of the finance office and all the districts and lands of the imperial demesne. The bribing men into compliance became fashion and of current use and sluggish people, addicted to their ease thinking it a good fortune to get at once so much assured money, made no difficulty to sacrifice the sweat of the brow of the people of God

and the boil of the helpless farmers, to the repacity of the lease-takers, tax-gatherers and contractors."[৫০]

তাৎপর্য এই যে, আরঙ্গজেবের সময়ে চাটুকারগণ প্রতিপত্তি লাভ করিলে, তাহাদের কার্যকারিতা অমাত্যগণের উপর বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছিল। তখন হইতে রাজ্যের সমস্ত জমি পত্তন ও বন্দোবস্তাদির ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয় ; তাহাতে ক্রমে দেশে উৎকোচ গ্রহণাদি কুপ্রথা প্রচলিত হইতে থাকে।

আজিম ওশ্মানের ব্যয় বাহুল্যে আরঙ্গজেব বিরক্ত হইয়া ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবেদার বা শাসনকর্তার পদ দ্বিধা বিভক্ত করেন। তদবধি নবাব নাজিম শাসন বিভাগের এবং নবাব দেওয়ান আয়ব্যয় ও রাজস্ব বিভাগের কর্তা হইলেন। আজিম ওশ্মান প্রথম পদে এবং মুরশিদকুলি খাঁ দ্বিতীয়পদে নিযুক্ত হইলেন। মুরশিদকুলি খাঁ পূর্বে জনৈক মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। পারশ্য দেশিয় বণিকের নিকট দাসরূপে বিক্রীত হইয়া তদ্দেশে নীত হয়েন ; স্বীয় বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে পরে উন্নতি লাভ করিয়া এদেশে আসিয়া সম্রাটের সুনজরে পড়িয়াছিলেন। মুসলমানগণ অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং সম্রাট হিন্দু কর্মচারী নিয়োগে ইচ্ছুক ছিলেন না, তথাপি দেওয়ান অর্থ সচিবগণ প্রায়ই হিন্দু ছিলেন। মুরশিদকুলি খাঁ একে ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদুপরি আয় ব্যয়ে তাঁহার বিশেষ বোধ থাকায় তিনি বাংলার নবাব দেওয়ানপদ লাভ করেন। তিনি বাংলার প্রসিদ্ধ মোঘল রাজস্ব সচিব টোডড়মল্ল কর্তৃক প্রস্তুত "আসল তুমার জমার" পরিবর্তে "জমা কামেল তুমারী" নামে যে জমাবন্দি প্রস্তুত করেন, তাহাতে বিনা জরিপেই অনেক জমিদারের কর বৃদ্ধি হইয়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব প্রায় এককোটি টাকা বৃদ্ধি হয়। কেবল বাংলার রাজস্ব ১৪২৮৮১৮৬৲ টাকা নির্ধারিত হয়। তিনি সর্বপ্রথম বাংলাদেশে তুল্য চারি কিস্তিতে মালগুজারী আদায়ের ব্যবস্থা প্রচলন করেন। পূর্বে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি হিন্দু ও স্থল বিশেষে মুসলমান জায়গিরদার ভিন্ন কেহ জমিদার হইতে পারিতেন না ; এখন কিস্তির শেষ তারিখে কোন জমিদার রাজস্ব আদায়ে অসমর্থ হইলে অমনি জমিদারি নিলাম হইবার প্রথা প্রবর্তিত হইল ; তাহাতে সমস্ত টাকা আদায় না হইলে বাকিদার জমিদার ধৃত হইয়া রাজধানীতে বন্দি হইত ; বাকি টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিত। এই প্রকারে জমিদারি খরিদ করিয়া যে কোন লোক জমিদার হইতে লাগিলেন। অনেকে মানসম্ভ্রম রক্ষার্থ সর্বস্বান্ত হইল। He (Murshid Kuli Khan) instituted a rigorous revenue policy, under which zamindars were dispossessed of their estates on any failure in payment of revenue and their properties were given to favourites of the Nowab or let out to the highest bidders. In this way the old type of hereditary Rajas made way for the modern type.[৫১] অর্থাৎ মুরশিদকুলি খাঁর কঠোর রাজস্ব প্রণালী প্রবর্তিত হইলে পুরাতন জমিদারগণ রাজস্ব আদায়ে অশক্ত হইয়া তাহাদের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে ; তৎসমুদয় নবাবের প্রিয়পাত্রগণ অথবা যাহারা উচ্চহারে ডাকিয়া লইতে সমর্থ হইলেন তাহারাই পাইলেন।

রাজস্ব প্রদানে অশক্ত জমিদারগণকে রাজধানীতে কারারুদ্ধ রাখিয়া তৎকালে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। কথিত আছে, কুলি খাঁর নাতিনী জামাতা মহম্মদ রেজা বাকিদার জমিদারগণকে লাঞ্ছিত করিবার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদে মলমুত্রাদি পুতিগন্ধপূর্ণ একটি কুণ্ড প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। টাকা দিতে না পারিলে, জমিদারগণ উক্ত কুণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতেন ; বিদ্রূপচ্ছলে উহাকে "বৈকুণ্ঠ" বলা হইত। দেশিয় ও বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ ইহার নানারূপ বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "বাকি খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারগণকে দেওয়ানি জেলে রাখা তৎকালে আইন ছিল। ... সুতরাং

চিরাগত মুসলমানি-আইন অনুসারে রাজস্ব দানে অশক্ত অথচ অবাধ্য জমিদারগণকে কারারুদ্ধ করিয়া কুলী খাঁ বেশি অন্যায় করিয়াছেন বোধ হয় না। এই সুসভ্য কালেও দেনার দায়ে জেলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আইনের দোষ ব্যক্তি বিশেষের স্কন্ধে অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। কুলী খাঁ এই আইন অবস্থা বিশেষেই কার্যে পরিণত করেন। ... অতএব এ অবস্থা সে কালের পক্ষে অসাধারণ নহে। ... মুতাক্ষারীণে বৈকুণ্ঠের নাম উল্লেখ নাই। রাজস্ব-সচিব গ্রান্ট সাহেব কুলী খাঁ স্কন্ধেই ইহার পিতৃত্বের আরোপ করেন। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন বৈকুণ্ঠ বাসের ব্যবস্থা হইত না। বিভীষিকা দেখাইয়া অনাদায়ী রাজস্বের সংগ্রহ ও ভবিষ্যতে ক্রটি না হয়, ইহাই লক্ষ্য ছিল। ... কুলী খাঁর বন্দোবস্তের পর হইতে দেওয়ান খালসা অর্থাৎ 'রাজস্ব সচিব' রায় রাইয়া রঘুনন্দন। ইনি নাটোরের রঘুনন্দন, কুলী খাঁর দক্ষিণ হস্ত। ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে মুরশিদ কুলীর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রিয়পাত্র রঘুনন্দন পরলোকগত হন অতএব রাজি খাঁর জমিদার পীড়নের অবসর কোথায়?"[৫২]

কুলী খাঁর কঠোর রাজস্ব বন্দোবস্তফলে রাজস্ব আদায়ে অশক্ত জমিদারগণের বৈকুণ্ঠবাস সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, এই জেলার স্থানে স্থানে প্রাচীন জমিদার বংশে বৈকুণ্ঠবাস বা তাহা দর্শনে প্রবাদ জানিতে পারা যাইতেছে। কথিত আছে, বাগবাটি নিবাসী ষষ্ঠিধর গুপ্ত-বংশীয় রাঘবানন্দ রায় কুলী খাঁর সময়ে বাকি রাজস্বহেতু রাজধানীতে ধৃত হইয়াছিলেন ; তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন ; রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র-জপবলে তথায় বৈকুণ্ঠ দর্শন বা তাহা অতিক্রমের লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি লাভ করত বাটি ফিরিয়া যে অষ্টধাতুময়ী রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি বাগবাটির রায় জমিদারগণের বাটিতে পূজিত হইতেছে। *ষষ্ঠিধর গুপ্তবংশাবলী* ২৯—৩০ *পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।* রাণীগ্রামের বৈদ্য জমিদারবংশেও প্রসিদ্ধি আছে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষ জনৈক রাধারাম রায় কুলী খাঁর সময়ে রাজস্ব আদায়ে অশক্ত হইলে রাজধানীতে নীত হইয়াছিলেন ; তিনিও তৎকালে বৈকুণ্ঠ দর্শন বা তাহাতে বাস করিতে আদিষ্ট হইলে, বেলকুচি চৌধুরী জমিদারগণের আদিপুরুষ ধর্মাত্মা আফ্‌জাল্ মহম্মদের সহায়তা ও কার্যকুশলতায় অব্যাহতি লাভ করেন এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বড়বাজু পরগণার অর্ধাংশ জমিদারি ছাড়িয়া দেন ; তাহার ফলে বেলকুচি চৌধুরী জমিদার বংশের উৎপত্তি হয়। আবার হাটিকুমিরুল্লী বা হাটিকুমরুল গ্রামের নবরত্ন মন্দির নির্মাতা রামনাথ ভাদুড়ীর প্রসঙ্গে জানা যায়, তিনি মুর্শিদাবাদে নায়েব দেওয়ান পদে কাজ করিতেন। কুলী খাঁর সময়ে দিনাজপুর মহারাজাকে ধরিবার নিমিত্ত তিনি আদেশ প্রাপ্ত হন। রামনাথ দিনাজপুরে উপস্থিত হইলে, মহারাজ তৎকালীন বৈকুণ্ঠ বাসের ভয়ে রামনাথকে লক্ষাধিক টাকা উৎকোচ প্রদানে সন্তুষ্ট করত ফিরাইয়া দেন। তৎকালে দিনাজপুরে কান্তনগরের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্মিত হইতেছিল, রামনাথ বাড়ি ফিরিয়া উক্ত অর্থে তৎকালে নিজগ্রামে নবরত্ন নামে যে দ্বিতল দোলমঞ্চ বা মন্দির নির্মাণ করেন, তাহাই পাবনা জেলার আধুনিককালের সর্বপ্রধান কারুকার্য বিশিষ্ট স্থাপত্যশিল্পের পরাকাষ্ঠাসূচক হিন্দু দেব-মন্দির। এতদ্ব্যতীত এই জেলার স্থানে স্থানের জলাশয়াদি সংস্রবে জনশ্রুতি আছে যে, নবাবী আমলে রাজধানীতে কারারুদ্ধ জমিদারগণের অনেকে সঙ্গে শিক্ষিত পারাবত লইয়া যাইতেন। নির্দেশ থাকিত যে তথায় তাহাদের প্রতি বৈকুণ্ঠবাস অথবা জাতিপাতরূপ কোন অত্যাচার বা উৎপীড়ন হইলে, তাহারা তথা হইতে উক্ত পারাবত ছাড়িয়া দিতেন। তৎকালে শিক্ষিত পারাবত টেলিগ্রাফের কাজ করিত। তদ্দর্শনে বাটিস্থ পরিজনবর্গ নিকটবর্তী দীঘিপুষ্করিণী আদি জলাশয়ে নৌকা আরোহণে তাহাতে কুঠারাঘাত করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। বাওইখোলার (চৌহালি) আঁধপুখুর, পাবনা জোড়বাঙ্‌লার কাণাপুকুর প্রভৃতি জলাশয় প্রসঙ্গে এবম্বিধ নবাব দরবারে ধৃত জমিদারবংশ নির্মূল হওয়ার জনশ্রুতি অবগত হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় কৃত "মুর্শিদাবাদ কাহিনী"তেও বৈকুণ্ঠের উল্লেখ আছে। বিল কুরুলিয়া (চাটমোহর) নামের এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে।

১৭০৪ খ্রিস্টাব্দের পর হইতে যখন আজিম ওশ্মানের সহিত কলহ-প্রযুক্ত মুরশিদকুলী খাঁ

ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে বঙ্গের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, তখন পাবনা জেলার পশ্চিমোত্তরস্থ ভূভাগ সাঁতৈল রাজগণের এবং ইহার দক্ষিণাংশ ভূষণার জমিদার সীতারাম রায়ের জমিদারিভুক্ত ছিল। তখন সাঁতৈলরাজ রাজা রামকৃষ্ণ সান্যাল ও তদাভাবে রাণী সর্বাণী পাবনা জেলার মালিক ছিলেন। গোহাইলবাড়ি, সালিখা, গুণাইগাছা, সারোরা, ডেমরা ও হিমাইতপুর প্রভৃতি গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণদিগের গৃহে অদ্যাপি রাণী সর্বাণীর প্রদত্ত দস্তখতি ও সিলমোহরযুক্ত ব্রহ্মত্রদানপত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পাবনা সহর নিবাসী ভোলানাথ অধিকারী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ১২৬৭ সালের ৮ চৈত্র তারিখের একখণ্ড পাট্টায় জানা যায়, তাহাদের দোগাছি গ্রামে রাজা সীতারাম রায় প্রদত্ত ১২ বিঘা জমি ব্রহ্মত্র ছিল। *শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য কৃত রাজা সীতারাম রায় ২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।* "বর্তমান পাক্‌সি রেলস্টেশনের সন্নিকটে পাক্‌সিয়া, পাত্‌লাখালি প্রভৃতি গ্রামে মোট ৮২৸২ কাঠা জমি সীতারাম তাঁহার দৌহিত্রদিগের গৃহে নিজ প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি দেববিগ্রহের জন্য দেবোত্তর দিয়াছিলেন। ... ১২২৫ সালে তাঁহার দৌহিত্র ভৈরবচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র সেন সেবার জন্য ... সীতারামের পূর্বতন গুরুবংশীয় কোড়কদি নিবাসী গৌরমোহন ভট্টাচার্যকে সমর্পণ করেন। ... ফরিদপুর রুকনী নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল মৈত্র মহাশয় এক্ষণে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী, তাঁহার নিকট সনন্দখানি আছে।" *যশোহর খুলনার-ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্রষ্টব্য।*

তৎকালে রাজস্ব আদায়ে অশক্ত ও তাহা আদায়ের কঠোরতা নিবন্ধন বিদ্রোহী জমিদারগণের যে সকল জমিদারি নিলাম হইতে থাকে, তাহা কুলি খাঁর রাজস্ব বন্দোবস্তে সহায়তাকারী ও তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ রঘুনন্দন স্বীয় ভ্রাতা রামজীবন ও তৎপুত্র কালী কুমারের নামে ক্রমে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই সমস্ত বিদ্রোহী জমিদারগণের মধ্যে রাজা সীতারাম রায়ের সম্পত্তি অন্যতম। প্রসিদ্ধি আছে, রঘুনন্দন রাজস্ব বন্দোবস্ত কার্যে সুদক্ষ এবং রামজীবন বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় এবং সাহসী ছিলেন জন্য তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে রঘুনন্দন দেওয়ানি বিভাগে ও রামজীবন সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন ; রামজীবনই তদীয় ভৃত্য দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়ের সাহায্যে ও মন্ত্রণাকৌশলে সীতারাম রায়কে বন্দি করত তাঁহাকে দমন করিয়াছিলেন। রামজীবন দীর্ঘকায় থাকার প্রমাণ আজিও "রামজীবনী হাত" কথায় এই জেলায় প্রচলিত আছে।

সালিখা (চাটমোহর) নিবাসী পণ্ডিত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎকৃত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ইতিহাসে লিখিয়াছেন ঃ—

তদা দুশ্চিন্তয়া রাজা রাজস্বদানকাতরঃ—
মুরশিদ্‌কুলিশুভাদার ভয়েন ব্যাকুলোঽভবৎ।।৩০
রাজস্বদান সময় নিয়মেলঙ্ঘিতে সতি।
জাতি জীবন সম্মান রক্ষণাসীৎ কথঞ্চন।।৩১

* *

তদামন্ত্রিবরপ্রাজ্ঞো রামদেবো বিচক্ষণঃ।
রাজানাং সান্ত্বয়ামাস তং দূতং তোষয়ন্ধনৈঃ।।৩৫।
তদানবাব মন্ত্র্যাসীৎ রায়াখ্যোরঘুনন্দনঃ।
নাটৈরী নগরে রাজা তজ্জ্যেষ্ঠোরামজীবন।।৩৬
স চ সান্তোল নগরং নেতুকামোদিবানিশং।
দূতানং প্রেরয়ামাস রামদেব সন্নিধৌ।।৩৭
ইত্যেব সময়ে রাজা মমারব্যাধিতোহটাং।
রাজ্যং ররক্ষ সর্বাণী রামদেবস্যসাহসাৎ।।

তদামুরশিদ্‌কুলেরেকঃ প্রিয় আসীম্মহম্মদঃ।
ঋষস্বরূপঃ সর্ব্বেষাং ভূপভূম্যধিকারিণাং।[৪০]
ঋযুগ্মাষ্টশ্রুতিমিতে বৎসরেবিগতে কলেঃ।
আক্রামৎ সৈনিকৈর্ঘোরৈঃ সান্তোল স মহম্মদঃ।[৪১]
লুলুণ্ঠ নসরং সর্বং বভঞ্জ রাজবাটিকা।
সসজ্জবিপুলৈশ্বর্যৈর্জ্জগর্জ্জমত্ত হস্তিবৎ।[৪২]
জবনাক্রমণং দৃষ্টাবাকুলারাজভামিনী।
দাক্ষায়ণী বা সর্বাণী জহৌ নিজ কলেবরং।[৪৩]
কলঙ্কাশঙ্কয়া তত্র রামদেব বিচক্ষণঃ।
রাজ্যলোভং পরিত্যজ্য গুপ্তোনক্তং পলায়িতঃ।[৪৪]
লক্ষ্মীনারায়ণ শিলাং দেবী মঙ্গলচণ্ডিকাং।
রাধাকৃষ্ণ সমীপে চ ররক্ষ নিজ মন্দিরে।[৪৫]
অদ্যাপি বর্ত্ততে কিঞ্চিৎ সান্তোলস্য নিদর্শনম্।
সুশ্রীর্দ্দশভুজামূর্তির্দ্দেবীধাত্তময়ী শুভা।[৪৬]
সারাজ্ঞী শোভয়ামাস ভবানীপুরপত্তনম্।
অদ্যাপি দৃশ্যতে লোকৈঃ সর্বাণীকৃতলক্ষ্মণম্।।
যুগপথ নির্মমে মূর্তি দ্বৈচৈকঃ শিল্পিনাম্বরঃ।
ঢাকেশ্বরীতয়োরেকা পরাসান্তোল বাসিনী।।

"লঘুভারত", তৃতীয় খণ্ড, গৌড়পর্ব্ব ২১৮।১৯ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত অংশ পাঠে জানা যাইতেছে যে, সাঁতৈল বা সান্তোলরাজ (রাজা রামকৃষ্ণ সান্যাল) মুরশিদকুলি খাঁর দেওয়ানি আমলে রাজস্বদানে কাতর হইলে, নবাবের মন্ত্রী রঘুনন্দন রায় ও তজ্জ্যেষ্ঠ রামজীবন সাঁতৈল রাজ্য গ্রহণে সমুৎসুক হন। তাঁহারা সান্তোলের মন্ত্রী রামদেব সকাশে দূত প্রেরণ করেন। এমন সময়ে রাজার মৃত্যু ঘটে। রাণী সর্বাণী রামদেব সাহায্যে কিয়ৎকাল রাজশাসনের পর জমিদারগণের কালস্বরূপ মুরশিদকুলী খাঁর প্রিয়পাত্র মহম্মদ (সম্ভবতঃ নাজির আহম্মদ) সান্তোল নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। মুসলমান আক্রমণ দৃষ্টে রাণী সর্বাণী প্রাণত্যাগ করিলে সুবিচক্ষণ রামদেব কলঙ্কভাজন হইবার ভয়ে রাজ্যলোভ পরিত্যাগ পূর্বক লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ও মঙ্গলচণ্ডী দেবী লইয়া নিজ বাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

দেওয়ান রামদেব হরিপুর (চাটমোহর) চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুষ। সান্তোল যদিও এক্ষণে হরিপুর হইতে প্রায় ২।৩ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে রাজশাহী জেলায় অবস্থিত, তথাপি তথাকার রাজপরিবারের সহিত পাবনা জেলার নানা বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তজ্জন্য উক্ত রাজবংশের বিবরণ সংক্ষেপে আলোচিত হইল। Grant's Analysis of Finances of Bengal পাঠে জানা যায়, তপ্পে ভাতুরিয়া ও তদন্তর্গত ২৪১৩৯৭৲ টাকা বার্ষিক রাজস্বের ১৩ পরগণায় সান্তোলরাজ রাজা রামকৃষ্ণের জমিদারি ছিল। কেহ কেহ বলেন, "নাটোররাজ রঘুনন্দনের অব্যবহিত পূর্বে সাঁতৈল জমিদারির ৩০ পরগণায় ৫০১৯২১৲ টাকা রাজস্ব নির্ধারিত ছিল এবং তাহা ভাতুরিয়া জমিদারি নামেই সুপরিচিত ছিল।"[৫৩] মোঘল বাদশাহগণের বঙ্গশাসন কালে সাঁতৈল রাজবংশ বিদ্যোৎসাহিতা ও পুণ্যকীর্তি জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। নবদ্বীপাধিপতির ন্যায় তাঁহার রাজধানীও সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ থাকিত। সুপণ্ডিত জয়দেব, তর্কবিশারদ রামকৃষ্ণ, দিব্যসিংহ, অনন্তরাম, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সান্তোলের রাজসভার অলঙ্কার ছিলেন। এই জেলার সারোরা, সালিখা সমাজ, সিদ্ধিনগর, স্থল (চাটমোহর), গাড়াদহ প্রভৃতি পল্লী-সমূহের বহু সুবিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতবর্গ উক্ত রাজ সরকার হইতে প্রতিপালিত হইতেন। সান্তোল রাজ্যের চিহ্ন এক্ষণে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে ; নাটোর রাজের অধীনে মাত্র তথাকার কালিকাদেবীর সেবা ভিন্ন উক্ত রাজ্যের আর কোনই নিদর্শন বর্তমান নাই ; কিন্তু পাবনা জেলা যে এক সময়ে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং এই জেলার অধিবাসিগণের সুখ-দুঃখ যে উক্ত রাজ পরিবারের উন্নতি অবনতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করিত, তাহা এই জেলার উপরোক্ত গ্রাম-সমূহের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের গৃহে গৃহে সযত্নে রক্ষিত সাঁতৈলরাজ প্রদত্ত ভূমিদান পত্র এবং দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতির প্রাচীন সনন্দ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনাদি জেলা লইয়া সাঁতৈল রাজ্য গঠিত ছিল ; উক্ত জেলা সমূহের তৎকালীন ব্রাহ্মণাদির গৃহে এবম্বিধ প্রাচীন দলিলাদি থাকা বিশেষ সম্ভব ; উক্ত জেলা সমূহের ইতিহাস পাঠে তাহা সবিশেষ জানিতে পারা যাইতেছে না, কিন্তু এই জেলার নানা স্থানে সাঁতৈল রাজবংশের সর্বশেষ ভূম্যধিকারিণী রাণী সর্বাণী প্রদত্ত অনেক লাখেরাজ ব্রহ্মত্রাদির প্রাচীন দলিলাদি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ডেমরার রায় বংশে তাঁহার জন্ম হয়, উক্ত রায় বংশীয়েরাও তাঁহার প্রদত্ত অনেক ভূসম্পত্তি অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। পাবনা ও বগুড়া জেলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ভবানীপুর নামক পীঠস্থানেরও তাঁহার সময়ে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" অবলম্বনে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, "তখন রামকৃষ্ণ নামক একজন ব্রাহ্মণ জমিদার সান্তোলের রাজা। ... রাজা রামকৃষ্ণ ডেমরার রায় বংশের সর্বাণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়া সর্বাণী দেবীকে বর্তমান রাখিয়া ১১১৭ সালে (১৭১০ খ্রিস্টাব্দে) স্বর্গারোহণ করেন।"[৫৪] পূর্বোক্ত লঘুভারত প্রণেতা সালিখা নিবাসী পণ্ডিত স্বর্গীয় গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় মুরশিদকুলী খাঁর সময়ে রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যুকাল নির্দেশ করিয়াছেন। আবার এই জেলার বক্তারপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন, "সাঁতোড়ের রাণী সর্বাণী একবিংশ বয়সে নিঃসন্তান বিধবা হইয়া ৬৭ বৎসর সাঁতোড় রাজ্য অসাধারণ যোগ্যতাসহ শাসন করিয়াছিলেন। ... অষ্টাশীতি বর্ষ বয়সে (তাঁহার) অভাব হইল। ... (তিনি) বাঙ্গালা লেখাপড়া উত্তমরূপ জানিতেন। তিনি শেষে কিছু পারসিও শিখিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত শ্লোক অনেক মুখস্থ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন ; সমস্ত বিষয়ে নিজে তদন্ত করিতেন। ... রাণী সর্বাণী দৈনিক নিকাশের নিয়ম করিয়াছিলেন। ... ইহাতে আমলাদের অনুচিত লাভ হইত না অথচ শেষে কোন বিপদও হইত না।[৫৫]

কিন্তু শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "বাঙ্গালা ১১১৭ সালে (১১১০ খ্রিঃ) আধুনিক রাজশাহী জেলার অন্যতম প্রধান ও প্রাচীন পরগণা ভাতুরিয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার রামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী সর্বাণী দেবীর মৃত্যু হইলে একমাত্র উত্তরাধিকারী রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম কার্যে অসমর্থ বলিয়া, এই বিস্তীর্ণ জমিদারির কার্যভার সেকালের একমাত্র সমর্থ রঘুনন্দনের হস্তে পড়িল। ভ্রাতা রামজীবন ও তৎপুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদের নামে বন্দোবস্ত হইল।"[৫৬]

১৭০১ খ্রিস্টাব্দে মুরশিদকুলি খাঁ বাংলার নবাব-দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে তাঁহার রাজস্ব বন্দোবস্তাদি কার্য আরম্ভ হয় ও তখন হইতেই মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। তাহা হইলে, পূর্ববর্তী লেখকগণের মতে ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১১১৭ সালে) রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যু ও ঐ সময়ে রাণী সর্বাণীর রাজ্যপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু এই জেলার গুণাইগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাটিতে ১১০৮ সালের একখণ্ড প্রাচীন দলিলে উল্লেখ আছে যে, জমিদার রানী সর্বাণী প্রদত্ত তপ্পে চাপিলা ভাতুরিয়ার অন্তর্গত মৌজে পাঁচুরিয়া (চাটমোহর) গ্রামে ২৩।২ কাঠা জমির বাবদ যে ব্রহ্মোত্তর দানের সনন্দ ছিল, তাহা গ্রহীতার পিতার আমলে অগ্নিদাহে পুড়িয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ডেমরার

শ্রীযুক্ত তারানাথ রায় মহাশয়দিগের বাড়িতে ১১১৩ সালের, হিমাইতপুরের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সান্যাল মহাশয়ের বাড়িতে ১১১৪ সালের এবং গোহাইলবাড়ি (স্থল) নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিহর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বাড়িতে প্রাপ্ত ১১১৭ সালের ২২ মাঘ তারিখের লিখিত ব্রহ্মত্র-দান-পত্রাদির প্রাচীন দলিলে দেখা যায়, রাণী সর্বাণী স্বয়ং উক্ত ব্রহ্মত্রাদি দান করিয়াছেন ; স্বামী জীবিত থাকিলে তাঁহার স্বয়ং জমিদার স্বরূপে ১১০৮ সালে বা তৎপূর্বে ব্রহ্মত্র দান সম্ভবপর নহে। উল্লিখিত দলিলাদি পাঠে ও তাহাদের প্রমাণ মূলে "লঘুভারত"-কার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে কিংবা তদবলম্বনে পরবর্তী লেখকগণের নির্দেশানুসারে ১১১৭ সাল বা ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যু সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। কালীপ্রসন্ন বাবুর বর্ণনানুসারে ১১১৭ সালে রাণী সর্বাণীর মৃত্যুকাল ধরিলে দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের উক্তিই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পরে। ১১১৭ সাল পর্যন্তও মহারাণী সর্বাণী জীবিত থাকার প্রমাণ এই জেলায় তৎপ্রদত্ত ব্রহ্মত্র দানের দলিলাদিতে প্রকাশিত আছে। সুতরাং তাহার বহু পূর্বে (১১১৭-৬৭—১০৫০ সাল) রাজা রামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর রাণী সর্বাণীর রাজ্য প্রাপ্তি একেবারে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না।

পাবনা জেলা পূর্বে রাজা সীতারাম রায় ও সাঁতৈল রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। কুলী খাঁর সময়ে তাঁহাদের জমিদারি রঘুনন্দনের চেষ্টায় রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত হয়। ঐ সময়ে উদয়নারায়ণের সুবিস্তীর্ণ রাজশাহী জমিদারি এবং আরও ২।৩টি জমিদারি রামজীবন প্রাপ্ত হন। তৎসমুদয় লইয়া যে নাটোর রাজ্য গঠিত হইল, তন্মধ্যে রাজশাহী সর্বপ্রধান, তজ্জন্য উহা রাজশাহী জমিদারি নামে এবং তাহার রাজধানী নাটোরে অবস্থিত হইলেও ১৭১০ খ্রিস্টাব্দের পর হইতে রামজীবন রাজশাহীর অধীশ্বর "রাজা রামজীবন" নামে খ্যাত হইলেন। রঘুনন্দন নবাব-সরকারে প্রধান কর্মচারী ও পরে খালসা বিভাগের দেওয়ানি পদ লাভ করিলেন। অত্যল্পকাল মধ্যে অধিকতর উন্নতি হেতু "রঘুনন্দনী বাড়" বাংলার প্রবাদ বচনে পরিণত হইল। তখন হইতে সান্তোল রাজ্যের নাম বিলুপ্ত হইয়া পাবনা রাজশাহী জমিদারি ভুক্ত হইল। সাঁতৈল রাজ্যের উৎপত্তি ও ধ্বংসের বিস্তারিত বিবরণ জন্য এই জেলা নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" ও গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ কৃত "লঘুভারত" দ্রষ্টব্য।

সাঁতৈল রাজ্যের পতনে পাবনা জেলায় পাঠান রাজত্বকালে ভৌমিকী শাসন প্রথা বা ভুঁঞার শাসন অন্তর্হিত হইয়া মোঘল আমলের জমিদারি শাসন প্রণালী প্রবর্তিত হইল। পাঠান আমলে রাজ্য মধ্যে যে সমস্ত করদ ও সামন্ত নরপতিগণ বিদ্যমান ছিলেন, তাহারা ভৌমিক বা ভুঁঞা নামে কথিত হইতেন। তাহারা পাঠান সুলতানগণকে নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানে স্বাধীনভাবে স্বীয় রাজ্য শাসন করিতেন। তাহারা রাজ্য মধ্যে নিজ্য সৈন্য রাখিতেন, বাহুবলে রাজ্য শাসন করিতেন। শাসন ও বিচার সর্বপ্রকার ক্ষমতাই তাহারা স্বাধীনভাবে পরিচালন করিতেন। বঙ্গের স্থানে স্থানে এবম্বিধ বহু ভৌমিক বা ভুঁঞা বিদ্যমান ছিলেন। সাধারণত যে কয়েকজন প্রধান ছিলেন তাহাদেরই নাম শুনা যাইত। পাঁচ জন মিলিত হইয়া কোন কাজ করিলে যেমন তাহাকে বারইয়ারী কার্য বলে, সেই রূপ পাঠান আমলের শেষ ও মোঘল আমলের প্রথমাবস্থা পর্যন্ত বঙ্গদেশ উক্ত প্রকারে ভৌমিকগণ কর্তৃক শাসিত হইত। তজ্জন্য বঙ্গদেশ বার ভুঁঞার মুল্লুক নামে পরিচিত ছিল। ইহাদের সংখ্যা কখন ১২, কখন ১৬, কখন বা ৯ জন হইত। কখন হিন্দুর সংখ্যা বেশি থাকিত, কখন মুসলমানের সংখ্যা বেশি থাকিত ; মুসলমানের সংখ্যাই বেশি হইত, তজ্জন্য কেহ কেহ ইহাদিগকে বার ভুঁঞা না বলিয়া বড় ভুঁঞা বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। *(বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস ৪৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)* ইহাদের অধিকাংশ বংশানুক্রমে নিযুক্ত হইতেন। তবে সময় সময় পরিবর্তনও হইত। সাঁতৈলরাজ রামকৃষ্ণ সান্যাল পাবনা জেলা অংশের ভৌমিক বলিয়া পরিচিত হইতেন ; তদাভাবে তাহার

পত্নী রাণী সর্বাণীর মৃত্যুর পর নূতন জমিদারি বন্দোবস্ত ফলে ভৌমিকী প্রথা বিলুপ্ত হইয়া জমিদারি প্রথা প্রবর্তিত হইল। যাহার টাকা দিবার শক্তি হইল, তিনি নিলাম ডাকিয়া বা নূতন জমিদারি বন্দোবস্ত লইয়া জমিদার হইতে লাগিলেন।

তৎকালে "বর্তমান মুর্শিদাবাদের উত্তর পশ্চিমাংশ, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও ফরিদপুরের প্রায় সমগ্র ভাগ, রঙ্পুর ও যশোহরের প্রায় অর্ধাংশ" ব্যাপী আনুমানিক ১২ হাজার বর্গমাইল লইয়া রাজশাহী জমিদারির আয়তন নির্দিষ্ট ছিল। রামজীবনের রাজ্য প্রাপ্তির পরই এই জেলার তাড়াস জমিদারগণের পূর্বপুরুষ নবাব দরবারের অন্যতম কর্মচারী নায়েব দেওয়ান বলরাম রায়ের কনিষ্ঠ সহোদর রাম রায় উহার সুবন্দোবস্ত জন্য তাহার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, রাম রায় মহাশয় স্বীয় কার্যের কৃতিত্ব স্বরূপ মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে উক্ত রাজ-সরকার হইতে লক্ষাধিক টাকা পুরস্কার লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামজীবনের পুত্র রাজা রামকান্ত স্বীয় গৃহবিবাদ হেতু রাজ্যচ্যুত হইলে, স্থল পাকড়াশি জমিদারগণের আদি পুরুষ হরিদেব ভট্টাচার্য মহাশয় তাহার সহায়তা করিয়া ১৪ মৌজা জমিদারি লাভ করিয়াছিলেন। প্রাতস্মরণীয়া রাণী ভবানীর রাজত্ব সময়ে সলপ সান্যাল জমিদারগণের পূর্ব-পুরুষদিগের মধ্যে কালীচরণ সান্যাল তাহার নিকট সলপের জয়কালী বিগ্রহ ও তাহার সেবা পরিচালনার্থ ব্রহ্মত্র স্বরূপ অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর পুত্র সাধক-প্রবর রাজা রামকৃষ্ণের রাজত্বকালেই এই জেলার অনেকে নানা প্রকারে নাটোর রাজসম্পত্তি হস্তগত করিয়া বর্তমানে জমিদার, তালুকদার, জোতদার পদবীতে উন্নীত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই জেলা সমস্তই নাটোর রাজের জমিদারি থাকায় এখানকার বহু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ উক্ত রাজ সরকার হইতে যে সমস্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর এবং বৈষ্ণবোত্তর প্রভৃতি লাভ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহাদের বংশধরগণ অনেকেই তাহা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। নাটোর রাজ সরকার হইতে এই জেলার স্থানে স্থানে যে সকল দেব-মন্দির নির্মিত ও জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত রাজ-সরকার হইতে এই জেলার বর্তমান ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদারগণের উৎপত্তি, উক্ত রাজ-দরবার হইতে এই জেলার বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদ্যানুশীলনে সাহায্যার্থ ব্রহ্মত্রাদি প্রাপ্তি এবং এই জেলার প্রজাসাধারণের উপকারার্থে স্থানে স্থানে রাস্তা নির্মাণ ও জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা বা তৎপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা, সমস্তই এই জেলার অধিবাসিগণকে উক্ত রাজবংশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে নিত্যসম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং প্রাচীন দলিল সনন্দাদিতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তজ্জন্য বোধ হয়, উক্ত রাজবংশের ইতিবৃত্তের সহিত পাবনা জেলার পুরাবৃত্ত সর্বাংশেই ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত বলিলে কোন অংশেই অত্যুক্তি হয় না।

১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে মুরশিদকুলি খাঁর তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে রঘুনন্দন নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। ঐ সময়েই রামজীবনের একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদেরও মৃত্যু হইলে, রামজীবন রামকান্তকে পোষ্যপুত্র রাখিয়া ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে গতাসু হন। রামকান্ত কয়েক বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গারোহণ করিলে তদীয় স্বনামধন্যা পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানী রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। তখন হইতে তিনি মোঘলসাম্রাজের শেষ ও ইংরেজ শাসনকালের প্রথমাবস্থা পর্যন্ত রাজশাহী জমিদারি সুশাসন করিয়া স্বীয় গুণগরিমায় ও পুণ্যকীর্তিতে বঙ্গের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন।

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোঘল সিংহাসন লইয়া তদীয় উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। বাংলার নবাব দেওয়ান বঙ্গের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া ও যথা সময়ে তাহা দিল্লিতে প্রেরণা করিয়া পূর্ব হইতেই সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এক্ষণে নূতন সম্রাটগণ সিংহাসনে উপবেশন করিয়াই রাজস্ব সংগ্রহে মনোযোগী হইতে লাগিলেন, তাহা

হইতেই নিরূপিত সময়ে রাজস্ব আদায়কারী বাংলার নবাব-দেওয়ানের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং নবাব নাজিমের ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। কালে নবাব দেওয়ানই সর্বময় কর্তা হইয়া নিজ মনোমত লোককেই নাজিমের পদে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ফলে পাঠান আমলের সুলতান, প্রথম মোঘল আমলের সুবেদারের পরিবর্তে কালে নবাব-দেওয়ান বা নবাবই বাংলার হর্তাকর্তা হইয়া উঠিলেন। দিল্লির অন্তর্বিপ্লবে বাংলার নবাব সর্বেসর্বা হইলেন বটে, কিন্তু ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে মুরশিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর দিল্লির ন্যায় মুর্শিদাবাদেও বাংলার মসনদ্ লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হইল। কুলী খাঁ সর্‌ফরাজ্‌কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সর্‌ফরাজের পিতা সুজাউদ্দিন নিজেই পুত্রের অভীপ্সিত সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন ও কয়েক বৎসর নবাবী করিবার পর ১৭৩৮ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর সর্‌ফরাজ্ খাঁ নবাব হইলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সকলের অপ্রিয়ভাজন হইয়া উঠিলেন। বাংলার জমিদারগণ রাজধানীর এবম্বিধ দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বসিলেন। তাহারই ফলে তাহাদের ক্ষমতাবলে ও সহায়তায় ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে বিহারের শাসনকর্তা আলীবর্দ্দী খাঁ বাংলার নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় প্রিয় দৌহিত্র বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদৌলা মুর্শিদাবাদের রাজ-গদিতে উপবেশন করেন। তাঁহার পর মীরজাফর ও মীরকাসিম নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহারা যে নবাব হইয়াছিলেন, তাহা কেবল ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারিবৃন্দের অনুগ্রহ ও অনুকম্পাবলে মাত্র।

দিল্লি ও মুর্শিদাবাদের উপরোক্ত বিপ্লব ও সিংহাসন লইয়া গোলযোগ এবং তদুপরি বর্গীর হাঙ্গামার বাৎসরিক হুলস্থূল মধ্যে বাংলার জমিদারগণ যেমন ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, তেমনি তাহাদের শাসনকালও একেবারে নিরাপদ ছিল না, বরং অধিকাংশ সময় বিপদসঙ্কুল ও সঙ্কটাপন্ন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। তৎকালে এদেশে রাজা রামকান্ত ও তৎপর তদীয় পত্নী-প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর রাজত্বকাল। উভয়ের শাসনকাল, বিশেষত তদীয় সহধর্মিণী রাণী ভবানীর গৌরবময় দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বকালই দান দাতব্যাদি নানাপ্রকার সৎকার্য ও সুশাসন জন্য বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। পূর্ববর্ণিত ঘোর বিপ্লবকাল মধ্যে তাঁহারা যে নির্বিবাদে ও শান্তিতে প্রজাসাধারণের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে এবং দেশমধ্যে নানাপ্রকার জন-হিতকর কার্যে লিপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহাই তাঁহাদের সুশাসনের একমাত্র পরিচয়। মুরশিদকুলী খাঁর সময় হইতে ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ পর্যন্ত সময়ের দেশের জমিদারগণের অবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্যাদির ধারাবাহিক বিবরণ রাজশাহীর উকিল ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তল্লিখিত "রাণী ভবানী" নামক প্রবন্ধে বিশদভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। তদবলম্বনে দেশের তৎকালীন সর্ববিধ অবস্থার অধিকাংশ বিবরণ বিবৃত হইল ; বিস্তারিত বিবরণ উক্ত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পদগৌরব অনেকাংশে পাঠান আমলের ভৌমিকগণ অপেক্ষা খর্ব হইলেও, মোঘল আমলের জমিদারগণ যথাকালে রাজস্ব আদায় করিতে পারিলে, তাহাদের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা কোন অংশে হ্রাস হয় নাই। তাহারা দেশে সর্বপ্রকার ক্ষমতা পরিচালন করিতেন। যিনি যত নিয়মিত সময়ে রাজস্ব প্রদান করিতে পারিতেন, তিনি নবাবের তত প্রিয়পাত্র ও প্রতিপত্তিশালী বলিয়া গণ্য হইতেন এবং তিনিই অধিক জমিদারির বন্দোবস্ত পাইতেন। নাটোররাজ রামজীবনের রাজ্য প্রাপ্তি তাহার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত। বিপ্লব সময়ের রাজ্য শাসনে "জমিদারগণকে বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে হইত, বিচারবলে দুষ্টের দমন করিতে হইত, শাসন-কৌশলে শান্তি সংস্থাপন করিতে হইত। ... যদিও মুসলমান এদেশের রাজ-সিংহাসন অধিকার করিতেন, তথাপি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাংলা দেশ জমিদারগণেরই শাসনাধীন ছিল। সে

শাসনে নবাবের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। ... ইহারা দেওয়ানি ফৌজদারী বিচারকার্য সম্পাদন করিয়া অপরাধিগণকে রাজবাটিতে কারারুদ্ধ করিতেন। সেনাপালন করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতেন এবং সর্বাংশে সামন্ত নরপতির ন্যায় পদগৌরব সম্ভোগ করিতেন। বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব নাজিমের ন্যায় এই সকল জমিদারগণ দিল্লিশ্বরের সনন্দ গ্রহণ করিয়া দিল্লিশ্বরের নামের দোহাই দিয়া রাজকার্য নির্বাহ করিতেন, সুতরাং যথাকালে রাজকর প্রদান করিতে পারিলে, মুর্শিদাবাদের নবাব ইহাদিগের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না।"

কেবলমাত্র রাজ্যশাসন ব্যতীত এদেশের জমিদারগণ দেশে শিক্ষা ও শিল্প বাণিজ্যের উৎশাহ জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন জানা যায়। "সেকালে এদেশে সংস্কৃত, পারসি ও বাংলা ভাষায় প্রচলন ছিল। ... বাংলা ভাষার এখন পর্যন্তও ভাল করিয়া দন্তোৎগম হয় নাই। রাজকার্য উপলক্ষে যাহাদিগকে নবাব দরবারে গতিবিধি করিতে হইত, তাহারা বাধ্য হইয়া রাজভাষা অভ্যাস করিতেন, কিন্তু সকলেই কোনরূপে কাজ চালাইবার মত ফারসি শিক্ষা করিয়াই মৌলবী হইয়া উঠিতেন ; তাহাতে উচ্চ শিক্ষার অভাব পূরণ হইত না। অগত্যা সংস্কৃতই উচ্চ শিক্ষার একমাত্র সোপান হইয়া উঠিয়াছিল। ... অনেকেরই সংস্কৃত শিক্ষায় সবিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু অধ্যাপকগণ বিনা মূল্যে বিদ্যাবিতরণ করিতেন বলিয়া তাহাদের অধ্যাপনাকার্যে রাজার সাহায্য দান না করিলে সংস্কৃত শিক্ষা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। ... শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম নামক বিখ্যাত নৈয়ায়িক মহারাজা রামজীবনের একজন সভাসদ ছিলেন। রামজীবন যে সত্য সত্যই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম ১৬৪৫ সনে (১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে) 'পদাঙ্কদূত' রচনা করিয়া বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ... 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' রচয়িতা লিখিয়াছেন, ... আমার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর এবং বগুড়াতে বিদ্যাভ্যাস এবং বিষয়কার্য করিয়াছি। বাটি যাতায়াতে রায়গঞ্জ থানার অন্তঃপাতী ঘুরকা গ্রামের নিকট দিয়া যাতায়াত করিতাম। ... ঐ ঘুরকা গ্রামে মোরশেদাবাদ চক্রের ভূতপূর্ব জজ আদালতের পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চাননের নিবাস ছিল ; অদ্যাপি তাঁহার বাটিতে দালান বর্তমান আছে, 'পদাঙ্কদূত রচয়িতা' শ্রীকৃষ্ণ শর্মা ঐ কৃষ্ণনাথের পিতামহ এবং তিনি পদাঙ্কদূত রচনা করিয়াছেন ঐ সুযোগে জ্ঞাত হই।"

রাজশাহী জমিদারির ১৩৯ পরগণার জন্য রামজীবন বার্ষিক ১৭,৪১,৯৮৭ টাকা রাজকর প্রদান করিতেন। রামকান্তের সময়ে পূর্বাপেক্ষা ১১১৩৩৮ টাকা রাজকর বৃদ্ধি হইয়া ১৬৪ পরগণা জন্য ১৮,৫৩,৩২৫ টাকা রাজকর নির্দিষ্ট হইল। রাণী ভবানীর বার্ষিক দেড়কোটি টাকা আয় ছিল, তাহা হইতে কেবল ৭০ লক্ষ টাকা রাজকর দিতে হইত জানা যায়। নাটোর রাজবংশের শেষাবস্থায় বোধ হয়, রাজা রামকৃষ্ণের সময় রাজস্ব অনেক কম হইয়াছিল, তজ্জন্য নাটোর রাজগণ এদেশে ৫২ লক্ষ ৫৩ হাজারের জমিদার বলিয়া পরিচিত হইতেন। রামকান্তের মৃত্যুর পর ১৭৪৮ অব্দে রাণী ভবানী রাজশাহীর ন্যায় বিস্তীর্ণ জমিদারির ভার প্রাপ্ত হন। স্বামীর জীবিত কালেই তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার কথা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি যখন রাজশাহী-রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পূর্ণ গৌরবের অবস্থা। ... স্বাধীনভাবে শাসন-ক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলে, বাঙালি কত সহজে কত অল্প ব্যয়ে, কিরূপ সুকৌশলে রাজ্য-শাসন করিয়া প্রজাপুঞ্জের সুখ-সৌভাগ্য বর্ধন করিতে সক্ষম, রাণী ভবানীর জীবন-কাহিনীই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। এদেশের স্ত্রীলোকও যে, সুযোগ পাইলে রাজকার্য পরিচালনে পারদর্শিনী হইতে পারেন, রাণী সর্বাণী ও রাণী ভবানী তাহার প্রমাণ।

বাংলার জমিদারগণ কখন বাহু-বলে, কখনও মন্ত্রণা-কৌশলে, কখন বা শাসন গুণে দেশ শাসন করিয়া মহারাষ্ট্র আক্রমণকালে বর্গীর হাঙ্গামার বিপ্লব সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, বিশেষ শাসন গুণের পরিচয় না থাকিলে বাংলার নবাব কখনই কিছুমাত্র

ইতস্তত না করিয়া জনৈক হিন্দু বিধবা রমণীকে সুবিস্তৃত জমিদারির শাসন ভার অর্পণ করিতেন না বা তজ্জন্য জমিদারি সনন্দ প্রদান করিতেন না। রামকান্তের জীবিতকালেই বাংলার বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়, রাণী ভবানীর সময়েও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। আলিবর্দ্দী বুঝিয়াছিলেন যে কেবল বাহুবলে বা সংগ্রাম কৌশলে মহারাষ্ট্র সেনার নিষ্ঠুর নির্যাতন হইতে প্রজা সাধারণকে রক্ষা করা অসম্ভব ; তন্নিমিত্ত জমিদারদিগের সহিত নবাবের এবং নবাবের সহিত জমিদারদিগের স্নেহ-বন্ধন সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতেই আলিবর্দ্দীর সিংহাসন তুমুল সংঘর্ষের মধ্যেও অটল হইয়াছিল।

রাণী ভবানী যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালের হিন্দু রীতিনীতি, আচার ব্যবহার হিন্দুর পরহিতাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নিদর্শন এখনও এদেশে বর্তমান রহিয়াছে। পরহিত কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশের কল্যাণ উদ্দেশ্যে স্বধর্মানুরাগের বশবর্তিণী হইয়া তিনি দেশে যে সকল দেবমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, এই জেলার দাশুরিয়ার নিকটবর্তী মার্মিকালিকাপুর গ্রামের তৎপ্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখনও তথায় দৈনন্দিন নাটোর রাজস্টেট হইতে পূজার ব্যবস্থা আছে ও শঙ্খঘণ্টা নিনাদে তাঁহারই পুণ্যস্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে। তাঁহার অন্য "পুণ্যকীর্তির যে সকল চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, তন্মধ্যে তিনি দরিদ্রের জলকষ্ট নিবারণ জন্য যে সকল দীর্ঘিকা ও সরোবর খনন বা তাহা খননে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহার স্বচ্ছসলিলে আজও তাঁহার পুণ্যকীর্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে।" উপরোক্ত মার্মি গ্রামের সুবিস্তৃত দীর্ঘিকা এবং হাণ্ডিয়ালের শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সাহা মহাশয়ের গৃহে প্রাপ্ত পুস্করিণী খনন উদ্দেশ্যে রাজা রামকান্ত ও রাণী ভবানী উভয় কর্তৃক প্রদত্ত যথাক্রমে ১১৪১ ও ১১৮২ সালের দানপত্রে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দেশের প্রজাসাধারণের সার্বজনীন মঙ্গলার্থ তিনি দেশ মধ্যে যে সকল হাটবাজার ও গ্রামাদি সংস্থাপন কিংবা রাজপথ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহারও অনেকগুলি এই জেলা মধ্যে অদ্যাপি রাণীরহাট, রাণীর গ্রাম, ভবানীপুর, রাণীর হালট, রাণীর জাঙ্গাল নামে খ্যাত হইয়া তাঁহারই পুণ্য-কার্যের সাক্ষ্যদান করিতেছে। তিনি নাটোর রাজধানী হইতে তালম শিব মন্দির পর্যন্ত এবং রাণী সর্বাণী কর্তৃক আবিষ্কৃত লুপ্তপীঠস্থান ভবানীপুর পর্যন্ত যে সকল রাস্তা নির্মাণ করিয়া দিয়া বিল্বময় প্রদেশের লোকের অশেষ কল্যাণ-সাধন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই উক্ত অঞ্চলে অদ্যাপিও রাণীর জাঙ্গাল নামে খ্যাত হইয়া থাকে। তাঁহার কন্যার নামে এই জেলার চর তারাপুর, তারা সুন্দরীর হালট প্রভৃতি অনেক স্থানের নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে।

বিদ্যোৎসাহিতা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মর্যাদা রক্ষা তৎকালে দেশের রাজা জমিদারবর্গের কর্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। রাণী ভবানী প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তর প্রাপ্ত হয় নাই এমনত প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশ এদেশে অতি বিরল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রধান প্রতি পল্লীতে তাঁহার স্বাক্ষরিত দানপত্রাদি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। "লোকে গৌরব লালসায় বা স্বধর্মানুরাগে বা স্বদেশ প্রীতিতে প্রণোদিত হইয়া এই শ্রেণীর পুণ্যকীর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে ; ... তাঁহার দানশীলতার সহিত খ্যাতি লাভের সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া তাহা উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া চতুর্দিক শীতল করিয়া দিত। ... রাণী ভবানীর পুণ্যকার্যের মূলে স্বদেশপ্রীতি বর্তমান (ছিল)। "রাজশাহী কালেক্টরীতে মূল দলিলের অনুলিপিতে জানা যায় তিনি প্রায় বার হাজার জমি মাত্র ১১৬২ হইতে ১১৭১ সাল মধ্যে ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর জন্য দান করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে কোন কোন স্থলে এক ব্যক্তিকেই ৩০০০ বিঘা পর্যন্ত ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছেন। ইহা একদিকে দেশের রাজার বিদ্বজ্জনের প্রতিপালনে প্রবৃত্তি, অপরদিকে দেশের বিদ্যানুশীলন ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

সামাজিক হিসাবেও তাঁহার শাসনকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় মধ্য বঙ্গেও একাদশী ব্রতকে সহজসাধ্য রবিবার আশায় পণ্ডিত সমাজের ব্যবস্থা

সংগ্রহের আয়োজন করিয়াছিলেন" কিন্তু বাংলার তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ তাহাতে সম্মতি দেন নাই। ইহা তাহাদের চিত্তের দৃঢ়তার পরিচায়ক। "এই সময়ে বিধবা বিবাহের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়। ... বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ প্রদেশের ভদ্র সমাজে অদ্যাপি এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, বিক্রমপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ স্বীয় তরুণ বয়স্কা কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণা দর্শনে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হৃদয় হইয়া বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য রাজা রাজবল্লভের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ... এই সময়ে বাংলা দেশের সকল স্থানেই, গৌরীদান, বিধবার ব্রহ্মচর্য ও সহমরণ প্রথা দৃঢ় সংস্থাপিত হইয়াছিল। নদীয়ার ও নাটোরের রাজবংশ শাক্ত মতাবলম্বী বলিয়া রাজশাহী ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলে রাজানুকম্পায় তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। ... রাজশাহী প্রদেশে অদ্যাপিও শাক্ত মতেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপায় গৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমিতেও শাক্ত মতের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। সভাপণ্ডিত আগম বাগীশ মহাশয় দীপান্বিতা-শ্যামা পূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করিয়া শাক্তোৎসবের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।" *[রাণী ভবানী, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।]*

তৎকালে আসল জমা ও আবওয়াব নামে দুই প্রকার রাজকর প্রচলিত ছিল। আসল জমা অতি কম এবং আবওয়াব অনির্দিষ্ট ছিল, তজন্য আসল অপেক্ষা আবওয়াবই অনেক সময় বেশি হইত ; অল্প জমায় তৎকালে অধিক জমি বন্দোবস্ত পাওয়া যাইত। জানা যায় রাণী ভবানীর সময় উত্তরদ্বারী গৃহের খাজানা লাগিত না। নবাবী আমলে পাবনা জেলার কালিহা হরিপুর (সিরাজগঞ্জ), মাসিমপুর (পাবনা), ক্ষেতুপাড়া, শাহজাদপুর, হাণ্ডিয়াল অঞ্চলে নবাবের আদায়, তহশীল কাছারি বর্তমান ছিল। এদেশের হিন্দু মুসলমান অনেকে ফৌজদার, থানাদার প্রভৃতি রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। অদ্যাপি মুসলমানদিগের মধ্যে থানদার নামে যে একটি উপাধি প্রচলিত দেখা যায়, তাহা থানাদার শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

পাঠান আমলে দেশের লোক প্রথম প্রথম নানা কারণে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু মোঘল অধিকার কালে বঙ্গদেশের লোক দলে দলে উক্ত ধর্ম গ্রহণ করে নাই, তবে অনেকে সময় সময় বাধ্য হইয়া কেহ যুদ্ধে পরাজিত বন্দিরূপে অথবা কেহ রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। এই জেলার শাহজাদপুরের জমিদার রঘু রায় প্রভৃতি তাহার প্রধান প্রমাণ বলা যায়। এই সমস্ত ধর্মান্তর গ্রহণের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তৎকালে সমাজের কঠোর শাসন ছিল, রাজস্ব প্রদানে ত্রুটি বা বিলম্ব হইলে ধৃত ও রাজধানীতে লাঞ্ছিত জমিদার বা ভূম্যধিকারীগণেরও অনেকে সমাজে হেয় ও নিন্দনীয় হইতেন, এরূপ জানা যায়।

পাঠান সুলতানগণ এদেশে আসিয়া দেশ জয় করিলে, তাঁহাদের অনেকে কালক্রমে এদেশে স্থায়ী হইয়াছিলেন। কেহ ধর্ম প্রচার কল্পে আসিয়া এই দেশের লোককে স্বীয়মতে আনিয়া তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে থাকেন। এই জেলার শাহজাদপুরের মক্‌দম্ সাহেবের ইতিহাস ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাহাদের অনেকে এদেশের স্থায়ী উন্নতি সূচক জলাশয়াদি খনন কিংবা প্রজা সাধারণের ধর্মানুষ্ঠানের সহায়ক হইতেন। ময়দান দীঘি, উণু খাঁর দীঘি আদি এবং চাটমোহরের মাশুম খাঁর, সমাজ ও নবগ্রামের মসজিদাদিতে তাহার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মোঘল আমলে তাহাদের প্রায় দেড় শতাধিক কাল রাজত্ব সময়ের কোন স্থায়ী নিদর্শন বা তাহারা প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষায় কোন কার্য করিয়াছেন এরূপ কোন চিহ্ন এজেলায় বিদ্যমান নাই। তাহারা কেবল কাননগু, আমিন, পাটওয়ারী প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া দেশের জমি জরিপ জমাবন্দি ও রাজস্ব আদায়ের যে সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা এই জেলার অষ্টমনীষার কায়স্থ বংশীয় গোপীকান্ত রায়ের ইতিবৃত্তে আভাস পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য অনেকে বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, পাঠান সুলতান ও সুরদারগণ কেবলমাত্র দেশ

জয় ও ধর্ম প্রচারের সহায়তায় এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এবং একমাত্র রাজস্ব সংগ্রহ ও তদ্দ্বারা দিল্লির রাজকোষ পূর্ণ মানসে মোঘল সম্রাটগণ বঙ্গদেশ জয়ে উদ্গ্রীব বা মনোযোগী হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "মোঘল বাংলা জয় করিয়া শাসন একটু কঠিনতর করিয়াছিল ; মোঘলজয়ের পর বাংলার অধঃপতন হইয়াছিল। বাংলার অর্থ বাংলায় না থাকিয়া দিল্লির পথে গিয়াছিল। ... মোঘল পাঠানের মধ্যে আমরা মোঘলের অধিক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোঘলের জয়গান গাইয়াই থাকি, কিন্তু মোঘল আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। ... যে দিন হইতে দিল্লির মোঘলের রাজ্য-ভুক্ত হইয়া বাংলার দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাংলার ধন আর বাংলায় রহিল না ; দিল্লির বা আগ্রার ব্যয় নির্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। বাংলার সৌভাগ্য মোঘল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে, বাংলায় হিন্দুর অনেক কীর্তি আছে, পাঠানের অনেক চিহ্ন দেখা যায়, শত বৎসর মাত্র (×) ইংরেজ অনেক কীর্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাংলায় মোঘলের কোন কীর্তি দেখিয়াছ কি? কীর্তির মধ্যে 'আসল তুমার জমা'। কীর্তি কি অকীর্তি বলিতে পারি না, কিন্তু তাহা একজন হিন্দুকৃত।"[৫৭]

পাঠান আমল অপেক্ষা মোঘল-শাসন কালে রাজানুকম্পায় সাধারণ হিতকর কার্যের কোন সবিশেষ নিদর্শন পাবনা জেলায় বর্তমান না থাকিলেও মোঘল রাজত্বকালে সুকুমার শিল্পকার্যের যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহার আদর্শ এই জেলার পোতাজিয়া ও হাটি কুমরুল গ্রামের নবরত্ন মন্দির নির্মাণ কার্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ঢাকায় রাজধানী থাকা সময়ে প্রথমটি এবং মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের আদর্শে দ্বিতীয়টি নির্মিত হইয়াছিল। ইস্টক নির্মিত হইলেও ইহাদের কারুকার্য দিল্লি আগ্রার মোঘল স্থপতি বিদ্যার আদর্শের অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত হাণ্ডিয়ালের শেঠের বাঙ্‌লা এবং তাড়াশের কপিলেশ্বর শিবমন্দিরাদির চিত্রাদিও মোঘল শিল্পকলার অনুকরণে ও রুচি অনুসারে চিত্রিত। এই সমস্ত মন্দিরাদির অধিকাংশই ধ্বংসাবশিষ্ট ও কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু ইহা যে অতি উচ্চ আদর্শের স্থাপত্য ও ভাস্কর শিল্পের নিদর্শন, দর্শন মাত্রেই তাহা সম্যক উপলব্ধি হয়।

মোঘল আমলে সঙ্গীত বিদ্যারও অনেক প্রসার ঘটে, এদেশে হোলি কবি, পাঁচালি, জারি, ভাসান প্রভৃতি যে সমস্ত সঙ্গীতের প্রচলন দেখা যায়, তাহা এই সময় হইতেই প্রবর্তিত বলিয়া বোধ হয়। মোঘল শাসনকালে পাঠান-আমল অপেক্ষা বেশি লেখাপড়া ও ইতিহাস চর্চা আরম্ভ হয় "আইন-ই-আকবরি" "আকবর নামা" তাহার প্রমাণ। তৎকালে দেশে প্রতি সুবাতে জমিদার ও জায়গিরদার নামে দুই প্রকার রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী ছিলেন। নগরে নগরে কাজি, কোটাল ও ফৌজদারগণ শাসন সংরক্ষণ কার্য সমাধা করিতেন। এই জেলার স্থানে স্থানে বহু কাজি উপাধিকারী যে সকল মুসলমান দেখা যায়, ইহারা সেই সমস্ত কাজিদিগের বংশধর ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতে মুসলমান সমাজের তৎকালীন শিক্ষা ও শিক্ষিতের অবস্থা সূচিত হয়। তৎকালীন কাজির বিচার কিরূপ ছিল, তাহার অবগতির জন্য ১৩০৪ সালের কার্তিক সংখ্যার "সাহিত্য" পত্রিকায় "কাজির বিচার" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মোঘল বাদশাহগণের সময়ে ইউরোপীয় বণিকগণ বাংলাদেশে বাণিজ্যাধিকার লাভ করে। মুরশিদকুলি খাঁর নবাবী আমলে ইংরেজ ফরাসি, ওলন্দাজ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিগণ বাংলা দেশে পদ্মা, করতোয়া আদি নদীতীরে পাবনা জেলার মধ্যেও নানাস্থানে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। কুলি খাঁ বঙ্গের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া জমিদার ও প্রজা সাধারণের নিকট কথঞ্চিৎ অপ্রিয়ভাজন হইলেও, তিনি বাংলার ব্যবসায়ীদিগের বৈদেশিক বণিকগণের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা কল্পে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। যাহাতে বৈদেশিক বণিকগণ দেশের অন্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া দেশিয় ব্যবসাদারগণের ক্ষতির কারণ না হয়, তৎপ্রতি তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। দিল্লি সম্রাটের নিকট হইতে বাংলার নানা স্থানে কুঠি স্থাপন ও জমি জমা ক্রয় করিবার

অনুমতি প্রাপ্ত হইলেও তিনি ইংরেজদিগকে তাহা খরিদের সুবিধা প্রদান করেন নাই। বরং তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। কারণ "নবাব বুঝিতে পারিলেন যে, বাংলার অন্তর্বাণিজ্য আর বেশি দিন বাঙালির হাতে থাকিবে না এবং ইংরেজরা যেরূপ অকুতোভয় অধ্যবসায়শীল যুদ্ধ নিপুণ বণিকজাতি, তাহাতে তাহারা বাংলাদেশে ৩৮ খানি গ্রামে দুর্গ নির্মাণ করিলে বাঙালিকে সসর্প গৃহবাসের ন্যায় সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইবে। এই সময় রঘুনন্দন নবাব দরবারের সর্বময় কর্তা, ইংরেজদিগের অধিকাংশ বাণিজ্যস্থান রাজশাহী জমিদারির অন্তর্গত ; সুতরাং ইংরেজরা যখন উচিত মূল্য দিয়া একখানি গ্রাম ক্রয় করিতে পারিলেন না, তখন রঘুনন্দনের মন্ত্রণার উপরই দোষারোপ করিতে লাগিলেন। ইহাই বাংলার জমিদারগণের সহিত ইংরেজদিগের প্রথম বিবাদ।"

তৎকালে রাজশাহী প্রদেশের বর্তমান পাবনাদি অঞ্চলের হাণ্ডিয়াল নবগ্রাম, চাটমোহর, রতনগঞ্জ, অরণকোলা, মুন্সিদপুর প্রভৃতি গ্রাম বাণিজ্য প্রধান বলিয়া পরিচিত হইত। এই সকল স্থানে বহু বণিক জাতির বাস ছিল। তৎকালে এদেশে কার্পাস ও রেশমের কারবার হইত। এদেশের তন্তুবায় কারিকরগণ এদেশের হাটেবাজারে, আড়ং ও মেলাদিতে বহু কার্পাস ও পট্টবস্ত্রের আমদানি করিত, তজ্জন্য ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকগণ এই সমুদয় স্থান হইতে উহা ক্রয় করিয়া ইউরোপে রপ্তানি করিত। এবং তাহারা তন্তুবায়গণকে অগ্রিম মূল্যে দাদন করিত। সুতরাং দেশিয় মহাজনদিগকে এদেশের রাজা সহায়তা না করিলে, বৈদেশিক রাজানুপালিত ব্যবসায়ীদিগেরসহ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশিয় ব্যবসায়ীগণ নিরুপায় হইয়া উঠিয়াছিল, তজ্জন্যই নবাবও তাহাদিগকে রক্ষা কল্পে যত্নবান ছিলেন। ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি কল্পেও দেশের জনসাধারণের সুবিধার্থ মুরশিদ কুলি খাঁ যে কিরূপ সতর্ক ছিলেন, তৎসম্বন্ধে জানা যায়, "খাদ্য সামগ্রীর বাণিজ্য বিষয়ক কৈবল্য তাহার অনুমোদিত ছিল না। তিনি স্বয়ং সর্বদা বাজার দরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, শস্যাদির মূল্যের সাময়িক বিবরণী সংগ্রহ করিবার নিয়ম ছিল। কোন ব্যবসায়ী নিরূপিত বাজার দরের উপরে মূল্য চড়াইলে বা অধিক লাভের আশঙ্কায় বিক্রয় স্থগিত রাখিলে, যথেষ্ট শাস্তি পাইত। আর এরূপ অপরাধীকে গর্দভপৃষ্ঠে নগর পরিভ্রমণ করান হইত। ... মুর্শিদাবাদে এ সময়ে সাধারণত টাকায় ৪।৫ মণ করিয়া চাউল বিক্রীত হইত। অন্যান্য শস্যাদি ও খাদ্য দ্রব্যের মূল্য এই অনুপাতে সুলভ ছিল।"[৫৮] মোটের উপর দেশিয় লোকের অন্ননাশ করিয়া বৈদেশিক বণিকগণ লাভবান হয়, ইহা কুলি খাঁর অভিপ্রেত ছিল না।

১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর সুজাউদ্দীন ও সরফরাজ্ খাঁ নিজেরাই পিতাপুত্রের সিংহাসন লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, সুতরাং তাহারাও এ বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। অবশেষে ১৭৪০ অব্দে বাংলার জমিদারগণের সহায়তায় আলিবর্দী খাঁ নবাবী পদ লাভ করিলে দেশে বর্গীর হাঙ্গামার তুমুল আন্দোলন মধ্যে যখন তিনি দেশের প্রজা সাধারণ ও ব্যবসায়ীদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া উঠেন, তখন বৈদেশিক বণিকদলকে তাহাদের নিজ নিজ পণ্য সম্ভার ও ধনাগারাদি রক্ষাকল্পে কুঠিতে কুঠিতে সৈন্যাদি রাখিবার অনুমতি দিতেন এবং তাহারাও ধীরে ধীরে তৎসুযোগে নিজ নিজ অস্ত্রবল ও লোকবল বৃদ্ধি করিতে থাকেন।

নামে দিল্লির অধীন থাকিলেও তখন মোঘল সম্রাটগণের অন্তর্বিপ্লববশত বাংলার নবাবগণ পূর্বতন পাঠান সুলতানগণের ন্যায় বাংলাদেশকে আপন বাসস্থলীর ন্যায়ই জ্ঞান করিতেন ; সুতরাং তাহারা রাজ্য মধ্যে বৈদেশিক বণিকগণের প্রসার লাভ পছন্দ করিতেন না। তবে যে তাহারা কখন তাহাদিগকে সময় সময় আশ্রয় দিতেন বা নানারূপ বাণিজ্যাধিকারের সুবিধা প্রদান করিতেন, তাহা কেবল বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার কল্পে কিংবা তাহাদের নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রযুক্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই প্রকারে আলিবর্দী খাঁর জীবিত কাল পর্যন্ত চলিতে থাকে, ১৭৫৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর সিরাজ-উদৌলা বাংলার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। আলিবর্দী বাংলার প্রবল জমিদারগণের সহায়তায় নবাব হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তাহাদিগের পদমর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন এবং ইংরেজ বণিক প্রমুখ বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগকে আপনাপন কুঠি ও বাণিজ্যালয়াদির রক্ষার্থে লোকবল ও অস্ত্রবল সংগ্রহে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা প্রদান করিতেন, কিন্তু "সিরাজ-উদৌলা ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। ... তাঁহারা সিংহাসনারোহণের পূর্বেই, রাজধানীর পাত্রমিত্রগণ জমিদার দলের সহায়তায় অন্য কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ... সিরাজ-উদৌলা ইংরেজদিগকে দেখিতে পারিতেন না, ইংরেজরা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই, এরূপ ক্ষেত্রে ইংরেজরাও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে অসম্মত হইলেন না। ... রাণী ভবানী এই সকল ষড়যন্ত্রের কোন পক্ষে লিপ্ত ছিলেন না। তিনি বিদেশিয় বণিক সমিতির সহায়তায় সিরাজ-উদৌলাকে সিংহাসন চ্যুত করিবার পক্ষপাতিনী ছিলেন না। বরং জমিদারদলের অগ্রণী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে এই অকীর্তিকর রাজবিগ্রহের সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আশায়, ইঙ্গিতে সদুপদেশ প্রেরণ (করিয়াছিলেন।) ... রমণীর নিকটেও যাহা স্ত্রীজন-সুলভ কাপুরুষোচিত অপকার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, বাংলার প্রধান পুরুষ জমিদার ও সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারিগণ তারা পৌরুষের কার্য বলিয়া ইংরেজের সহায়তা গ্রহণ করাই স্থির করিলেন। *(অক্ষয়কুমার মৈত্র কৃত "রাণী ভবানী" দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)*

রাণী ভবানীর মতামত পরবর্তীকালে কবি কাহিনীতেও নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যথাঃ—

"অতএব মহারাজ! এই মন্ত্রণায়
নাহি কাজ ; ষড়যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন।
শীতলিতে নিদাঘের আতপ জ্বালায়
অনল শিখায় পশে কোন মূঢ় জন?
"রাণীর কি মত? শুন আমার কি মত ঃ—
ইন্দ্রিয়-লালসা-মত্ত সিরাজ-উদৌলায়
রাজ্যচ্যুত করা নহে, আমার অমত,
(আহা! কিন্তু অভাগার কি হবে উপায়।)
নিশ্চয় প্রকৃত রোগ হয়েছে নির্ণয়,
কিন্তু এ ব্যবস্থা মম মনোমত নয়।
"আমার কি মতে? তবে শুন মহারাজ।
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোসিয়া অসি
সাজিয়া সমর সাজে নৃপতি সমাজ
প্রবেশ সম্মুখ রণে।"

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন রচিত "পলাশীর যুদ্ধ" প্রথম সর্গ, ৬৪।

"ষড়যন্ত্রের কথা আকারে ইঙ্গিতে সিরাজ কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু মীরজাফর কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করায় তিনি মীরজাফরকেই সেনাপতি পদে বরণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন বৃহস্পতিবারে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ সেনার সহিত ইংরেজদিগের যে যুদ্ধাভিনয় হইল, তাহাতে সিরাজ-উদৌলার সর্বনাশ হইয়া গেল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজপ্রাসাদে এবং রাজপ্রাসাদ হইতে কাঙ্গালের মত রাজপথে দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। ... পলাশীর যুদ্ধাবসানে যে রাষ্ট্র বিপ্লবের সূচনা হইল, তাহাই বাংলার জমিদার বংশের স্বাধীন রাজশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিল। রাজদ্রোহী রাজ-কর্মচারী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ; পদাশ্রিত বণিক সমিতি সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। ... ক্লাইব

স্বদেশযাত্রা করায়, যাহাদিগের উপর কলিকাতার ইংরেজ দরবারের কার্যভার ন্যস্ত হইল, তাহারা মীরকাসেমের টাকা খাইয়া জরাপলিত বৃদ্ধ "গর্দভকে" (মীরজাফরকে) কলিকাতায় নির্বাসিত করিয়া, মীরকাসেমকে সিংহাসন দান করিলেন। ... মীরকাসেমের দিনও সুখে কাটিল না। তিনি বাংলার বাণিজ্য রক্ষা করিতে গিয়া ইংরেজের বিরাগভাজন হইলেন। কালক্রমে তাহাতেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সে অগ্নিতে মোঘল রাজ-ছত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল। ... দিল্লিশ্বর শাহ আলম নামমাত্র বাদশাহ ছিলেন। মহারাষ্ট্র সেনাপতিগণ তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তিনি কখন আহম্মদশাহ আবদালী, কখন বা অযোধ্যাপতি উজির বাহাদুরের শরণাপন্ন হইয়া সিংহাসনারোহণের আয়োজন করিতেছিলেন। তাহাতে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট তারিখে বার্ষিক ২৬,০০,০০০ লক্ষ টাকা রাজকর লইয়া ইংরেজদিগকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি সনন্দ প্রদান করিলেন। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইব ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে "শুভ পুণ্যাহের"[৫৯] সূচনা করিয়া বাংলা বিহার উড়িষ্যার ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তিমূল প্রোথিত করিলেন। এই হইতেই কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।" *রাণী ভবানী দশ পরিচ্ছেদ।*

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—ইংরেজ-শাসন কাল

ক. ইংরেজ অধিকারের পূর্বাবস্থা ঃ

১৭১০ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান পাবনা জেলা রাজশাহী জমিদারির অধীন হয়। তখন হইতে ১৭৯৩ অব্দের দশসালা বন্দোবস্ত পর্যন্ত ইহা একমাত্র নাটোররাজ রাজা রামকৃষ্ণের অধিকার ভুক্ত ছিল। তাঁহার সময়ে রাজস্ব বাকি হেতু জমিদারি নিলাম হইতে আরম্ভ হইলে, এই জেলার অধিকাংশ ভূসম্পত্তি তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া ক্রমশ জেলাবাসী ও ভিন্ন জেলাবাসী ক্ষুদ্র বৃহৎ ভূম্যধিকারিগণের করতলগত হইয়াছে। তবে এখনও সুজানগর থানার অধীন চর তারাপুর ভবানীপুর প্রভৃতি ও দাশুরিয়ার নিকটবর্তী মার্মি কালিকাপুর আদি গ্রামে নাটোর ছোট তরফের কিয়ৎ পরিমাণে জমিদারি বর্তমান আছে। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে প্রায় শেষাংশকাল পর্যন্ত রাজশাহী জমিদারির ইতিহাস ও পাবনা জেলার পুরাবৃত্ত অভিন্ন বলা যাইতে পারে। এ দেশের অন্তঃ ও বহিঃ উভয়বিধ বাণিজ্য রক্ষায় সচেষ্ট মুসলমান রাজশক্তি এবং বঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারলোলুপ ইউরোপীয় বণিকদলের রাজানুগৃহীত বাণিজ্যশক্তি মধ্যে সংঘর্ষই এই কালের প্রধানতম ঘটনা।

পাবনা জেলার পার্শ্বে ও অভ্যন্তরে বঙ্গের অনেকগুলি প্রধান নদীর সম্মিলন হেতু এই জেলা চিরকাল বাণিজ্যজীবিদিগের পক্ষে গতায়াতে ও ব্যবসায়ে সুবিধাজনক। তদুপরি এই জেলার বস্ত্রশিল্প বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ ; এখন পর্যন্তও হিন্দুর মধ্যে তন্তুবায়, যোগী, কাপালিক, লাহারু প্রভৃতি এবং মুসলমানের মধ্যে কারিকর, চলিত ভাষায় 'জোলা ও নীলকসানে' বা সূত্র রঙকারক জাতিগণ এই জেলায় প্রায় লক্ষাধিক অর্থাৎ সমস্ত অধিবাসিগণ মধ্যে প্রায় এক চতুর্দ্দশাংশ। ইহাদের সকলেই বস্ত্র বয়নকারী কিংবা বস্ত্র বা সূত্র ব্যবসায়ী। রাজশাহী জনপদে পাবনা বাণিজ্য প্রধান স্থান বলিয়া চিরপরিচিত ও শ্রেষ্ঠ। হাণ্ডিয়ালের ন্যায় পদ্মাতীরে অরণকোলা, মুন্সিদপুর, কুমারখালি প্রভৃতি অঞ্চলেও কোম্পানির আমলে রেশমের কুঠি ছিল। এই সমস্ত কারণে এদেশে বিদেশিয় বণিকগণ পূর্বাপর গমনাগমন করিতেন।

পাবনায় ইংরেজ আগমন ঃ

সমগ্র ইউরোপীয় বণিকদলকে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ইংরেজ বণিক-সমিতি বঙ্গের বাণিজ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্বে ফরাসি, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ প্রভৃতি জাতিগণ এদেশের বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। সর্বপ্রথম কোন সময়ে পাবনা জেলার কোন স্থানে ইংরেজ আগমন ঘটে, তাহা সঠিক জানিবার কোন উপায় নাই। হাণ্ডিয়ালে ১৭০১ শকাব্দের (১৭৭৯ খ্রিঃ) ইস্টক নির্মিত একটি শিল্পকলা পরিশোভিত বাঙ্লা শেঠের বা জগৎ শেঠের বাঙ্লা নামে পরিচিত। জগৎ শেঠ নবাবী আমলে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের উপাধি বিশেষ ছিল। হাণ্ডিয়ালে প্রসিদ্ধি আছে যে, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস বিশ্রুত জগৎ শেঠের এখানে কারবার ছিল। যাহা হউক, করতোয়া নদীতটে বাণিজ্য প্রধান হাণ্ডিয়ালেও যে তৎকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্যন্ত দেশিয় ও বিদেশিয় বণিকগণের সমাগম হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে—"It was once a prosperous trade mart, which is mentioned under the spelling of Hurrial in Hamilton's *East India Gazetteer* (1828) as 'one of the three chief towns of Rajshaihi, which, it is said, used to produce fourfifths of all silk, raw and manufactured, used in, or exported from Hindustan.' The following account is given of it:—'A commercial mart where the East India Company has established factory for the purchase of silk and cotton goods. This commercial residency has for some time been incorporated with that of Comercolley (modern Kumerkhali in Nadia district.) *[Bengal District Gazetteer Pabna, By L. S. S. O'Malley, 1923 P, 117—118.]* ভাবার্থ এই যে ১৮২৮ সালের হামিলটন সাহেবের ইস্ট ইন্ডিয়া গেজেটিয়ারে জানা যায় হিন্দুস্থান হইতে যত রকম রেশম আমদানি হইত তাহার চারি পঞ্চামাংশ রাজশাহী জেলার তিনটি প্রধান বন্দরের মধ্যে এক হাণ্ডিয়াল হইতে পাওয়া যাইত। ইহা কালে কুমারখালি রেসিডেন্সীর সহিত একত্রিত হয়।

কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর ১৭৭৭ অব্দ হইতে ১৭৮১ অব্দের মধ্যে মেজর রেনেলের বাংলার নদনদী আদির জরিপ কার্য সময়ে ১৭৭৮ অব্দে পাবনা জেলা অংশ জরিপ কালে জেলার সর্বত্র ইংরেজ আগমন ঘটিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ১৮২৮ অব্দে সর্বপ্রথম জেলা সংস্থাপিত হইবার পূর্বে পাবনা জেলায় তৎকালীন রাজশাহী জেলার অধীন থানায় থানায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সারকীট জজগণের আগমন হইত মাত্র। তাহা ছাড়া জেলা গঠিত হইবার পূর্বে এ জেলায় ইংরেজ আগমনের কোন স্থায়ী নিদর্শন দেখা যায় না। তবে পাবনা সহরে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদিগের গোরস্থানের (Burial ground) মধ্যে একটি কবরের উপর লিখিত আছে—

Sacred
To the memory of
Matilda
Beloved wife of
T. Colombo
who died on
11th Nov. 1812.
aged 19.

Matilda ইংরেজী নাম বলিয়া বোধ হইলেও, Colombo সম্পূর্ণ পর্তুগিজ নাম তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় প্রণীত "ফিরিঙ্গি-বণিক" নামক পুস্তক

পাঠে জানা যায় যে, পর্তুগিজগণই ইউরোপীয় বণিকবৃন্দের মধ্যে সর্বপ্রথমে এদেশে আসিয়া বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয়, অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই বাণিজ্য-প্রধান পাবনা জেলা অংশেও পর্তুগিজ জাতীয় বণিকদলের যাতায়াত ছিল। যাহা হউক, ইহাই এই জেলায় ইউরোপীয় জাতিসমূহের বিশেষতঃ ইংরেজ আগমনের প্রাচীনতম স্থায়ী নিদর্শন। ইহাতে বোধ হয় যে, বাণিজ্য প্রধান পদ্মা বা তাহার শাখা ইছামতী নদীতীরস্থ পাবনা নগরেও ১৮২৮ অব্দে জেলা সংস্থাপনের পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের প্রাক্কালে এই জেলার হাটবাজার এবং বন্দরাদিতে ইংরেজ আদি ইউরোপীয় বণিকগণের গতিবিধি ছিল। বিশেষত মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকা আদি পূর্বাঞ্চলে গতায়াতে এই জেলার মধ্য দিয়া যাতায়াত সুবিধা-জনক ছিল। এই জেলায়ও ইংরেজ বণিকগণের নানাবিধ বাণিজ্যকার্যাদি সম্পন্ন হইত জানা যায়। তন্নিমিত্ত বাণিজ্যপ্রধান পাবনা জেলার তৎকালীন ব্যবসায়াদির অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, কোম্পানির আমলের বাণিজ্যাদির স্থূল বিবরণ পাবনা জেলার ইতিহাসে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নহে।

কোম্পানির বাণিজ্য ঃ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভের প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে ইংরেজ বণিকগণ দিল্লিশ্বরের সনন্দ-মূলে ও প্রাদেশিক শাসন-কর্তৃগণের অনুমত্যানুসারে নির্দিষ্ট ৩০০০ টাকা শুল্ক প্রদানে বাংলার স্থানে স্থানে বাণিজ্যালয় নির্মাণপূর্বক ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। "ক্রমে দিল্লিশ্বরের শাসন ক্ষমতার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির কর্তৃপক্ষগণ দেশিয় রাজপুরুষগণের কৃপাভিক্ষায় বাধ্য হন। উপযুক্ত বেতন দিবার সামর্থ্য না থাকায় কোম্পানি নিজ কর্মচারিগণকে স্বীয় ব্যবসায় চালাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন।" তজ্জন্য কোম্পানির ভৃত্যগণ কোম্পানির নামেই দোহাই দিয়া নিজের ব্যবসা চালাইতেন। তৎসুযোগে দেশিয় রাজপুরুষগণও তাহাদের নিকট, এমনকি সময় সময় কোম্পানির নিকটও নানা প্রকার উৎকোচ উপঢৌকন লাভ করিতেন। লিখিত আছে :—The amount expended on presents at this time must have been considerable as the following extract (The Dacca Diary) of the year 1681 will show :– 9th June—James Price acquainted us that the Dewan's Phurwana would be perfected upon our gratifying the mutsuddis. We thought convenient to send Rs 15 to the munshy, 20 yards of scarlet and 4 yards to ye cullumbardar." *[B.D.G. Dacca, by B. C. Allen, 1912, P. 48.]* ভাবার্থ—১৬৮১ অব্দের কোম্পানির ঢাকা ডায়েরিতে দেখা যায়, তখন ভেট দিবার খরচ বেশি ছিল। দেওয়ানের পরওয়ানা সম্পূর্ণ পাইবার জন্য মুৎসদ্দীকে সন্তুষ্ট করার উল্লেখ ৯ জুন তারিখের ডায়েরিতে দেখা যায়। মুন্সিকে ১৫ ও কলম্বরদারকে ২০ গজ স্কারলেট দেওয়া সঙ্গত বোধ করা গেল।

কুলি খাঁর সময়ে বঙ্গে "ইংরেজ কোম্পানি বাদশাহী ফার্মাণ ও নিশানের দোহাই দিয়া তিন সহস্র টাকা মাত্র দিয়া অবাধে বাণিজ্য চালাইতেন। সুতরাং প্রতিযোগিতায় অন্যান্য বণিকগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিতেন না।" অতএব প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় বণিকগণ কুঠি নির্মাণে অনুমতি চাহিবামাত্র তিনি তাহা মঞ্জুর করিতেন। কোম্পানির বাণিজ্যের বিস্তারিত বিবরণ জন্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল" দ্রষ্টব্য।

বর্গীর হাঙ্গামা ঃ

এই প্রকারে বাণিজ্য চালাইবার পর ১৭৪০ অব্দে আলিবর্দ্দী খাঁর নবাবী আমল হইতে বঙ্গে এক অভিনব রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। শিবাজীর অনুচরবর্গ দিল্লিশ্বরের নিকট হইতে বাংলার চৌথ আদায়ের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া যখন বঙ্গের দিকে প্রধাবিত হইল, তখন তাহাদের

"উপদ্রবে গ্রাম নগর উৎসন্ন হইতে লাগিল। শস্যক্ষেত্র পদদলিত হইতে লাগিল, লোকে প্রাণ লইয়া দূর স্থানে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শিল্প বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল।" বাংলার ইতিহাসে ইহাই বর্গীর হাঙ্গামা নামে পরিচিত। তখন মহারাজ রামকান্ত পাবনা জেলা অংশের অধিপতি। তখন "মহারাষ্ট্র লুণ্ঠনে রাজশাহী রাজ্যের একাংশ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। রাজকোষ দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে লাগিল, আত্মরক্ষা ও প্রজা পালনের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত সেনাদল পোষণ করিতে হইল, তাহাতেই রামকান্তের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইল।" নবাব আলিবর্দ্দী দেশে শান্তি স্থাপনে অসমর্থ হইয়া ইংরেজ বণিকদিগকে তাহাদের নিজ নিজ বাণিজ্যালয় রক্ষার্থ অনুমতি দিলেন। তখন হইতে কোম্পানির কুঠিতে সৈন্যবল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বর্ণিত আছে :—It is not clear when military guard was first entertained at the factory .... In 1745, it had increased to one Lieutenant, 47 European privates and several others in the following year, some further additions were made on the occasion of the Merhatta Scare.'' *[B.D.G. Dacca, 1912, P. 33.]* ভাবার্থ—কোন সময়ে কুঠিতে সামরিক পাহারা নিযুক্ত হয় তাহা জানা যায় না। ১৭৪৫ অব্দে লেপ্টনান্ট সার্জনাদি নিযুক্ত হয়। পরবর্তী বর্ষে মহারাষ্ট্র আক্রমণ ভয়ে আরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়।

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজ-উদৌলা রাজকার্যে প্রথমে লিপ্ত হইয়াই "চৌকিতে চৌকিতে ইংরেজদিগের নৌকা আটক করিয়া তাহা সত্য সত্যই কোম্পানির নৌকা কি অন্য কোন অর্থ লোলুপ ইংরেজ বণিকের নৌকা তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, কোম্পানির নামের দোহাই দিয়া ইংরেজ মাত্রেই বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছেন, তখন যেগুলি সত্যসত্যই কোম্পানির নৌকা তাহার উপর সন্দেহ হইতে লাগিল। অগত্যা কোম্পানির লোকেরাও কথঞ্চিৎ উৎকোচ না দিয়া পরিত্রাণ পাইলেন না। এই সূত্রে কোম্পানির কলিকাতাস্থ দরবারে অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। 'কালা আদমীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিয়া সিরাজ-উদৌলা বিদেশিয় বণিকের চক্ষুশূল হইয়া উঠিলেন।"[৬০]

পাবনা জেলার ইছামতী তীরে চৌকিবাড়ি, পদ্মাতীরে ডাক চৌকিপাড়া ও স্থানে স্থানে চৌবাড়িয়া বা চৌকিবাড়িয়া প্রভৃতি নদীতীরবর্তী গ্রামে তৎকালে এদেশে উক্ত প্রকারে বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। যাহা হউক, এইরূপে বঙ্গদেশের বাণিজ্য ও ব্যবসায়ীদিগকে রক্ষাকল্পে অগ্রসর হইয়া ক্রমে সিরাজ-উদৌলা ইংরেজ বণিকদলের অপ্রীতিভাজন হইলেন এবং অন্যান্য কারণ পরম্পরায় তাঁহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, তাহাতে তিনি বাংলার স্বাধীন রাজসিংহাসন ও স্বীয় জীবন আহুতি প্রদান করিলেন।

সিরাজের চরিত্রবিকার ও নানা অত্যাচার কাহিনী দেশিয় ও বিদেশিয় লেখকগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি ষড়যন্ত্রে তাঁহার পক্ষ সমর্থন-কারিণী রাণী ভবানীর কন্যা তারা ঠাকুরাণীকে তিনি বলপূর্বক হরণে ইচ্ছুক ছিলেন, এমতও কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু তৎকৃত "রাণী ভবানী" নবম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন "রাণী ভবানী কলঙ্কগ্রস্ত হইবার ভয়ে তারা ঠাকুরাণীর মৃত্যু রচনা করিয়া দিয়া নাটোরে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইহাই বিশ্বাসযোগ্য জনশ্রুতি।" রাণী ভবানী একে স্বয়ং রমণী, তাহাতে আবার সাতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন ; তদুপরি তাঁহারই একমাত্র বিধবা কন্যাকে অত্যাচারী নবাব হরণে ইচ্ছুক ; এরূপক্ষেত্রে রাণীর পক্ষে নবাবের পক্ষ সমর্থন কতদূর সমীচীন বা সম্ভবপর তাহা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ও পাঠকের নিকট সর্বথা বিবেচ্য ; অন্ধকূপহত্যা কাহিনীর ন্যায় সিরাজের এই কলঙ্কের জনশ্রুতি যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে, তাহা কে বলিতে পারে! পক্ষান্তরে প্রচলিত প্রবাদ সত্য হইলেও ষড়যন্ত্রে সিরাজ পক্ষসমর্থন কার্যে দূরদর্শিনী রাজশাহী

রাজ্যের অধিশ্বরী এদেশের হিন্দু বিধবা রমণীর মহত্ব ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিই সূচিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পলাশি যুদ্ধের পর হইতে বঙ্গদেশে যে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত হইল, তৎসুযোগে ইংরেজ কোম্পানি বাণিজ্য-ব্যপদেশে ক্রমে বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। মীরকাশিমের নিকট "ইংরাজ বণিক বামনের ন্যায় বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ত্রিপাদভূমি লাভ করিয়া কালক্রমে বাংলার শিল্প, বাণিজ্য ও কারুকার্যের স্বর্গ মর্ত রসাতল অধিকার করিয়া ফেলিলেন।" এই সময়ে ভান্সিটার্ট কোম্পানির সর্বময় কর্তা। দেশে ইংরেজের অসংখ্য বাণিজ্যালয় স্থাপিত হইল। কোম্পানির অত্যাচার 'প্রপীড়িত প্রজাবর্গের ক্রমাগত আর্তনাদে ও কর্মচারিগণের অভিযোগে উত্যক্ত হইয়া নবাব মীরকাশিম ভান্সিটার্টকে এই মর্মে পত্র লিখিলেন। .... 'ইংরেজ কর্মচারিগণ দেশের সর্বত্র প্রজাগণের সর্বনাশ করেন এবং সরকারি কর্মচারিগণকে নানা উপায়ে লাঞ্ছিত করিয়া আমার শাসনের অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন। প্রত্যেক পরগণায় ১০।২০টি নূতন কুঠি স্থাপন করিয়া কোম্পানির দস্তক দেখাইয়া পতাকা উড়াইয়া রায়ত ও দেশিয় বণিকবর্গের উপর অত্যাচার করিতেছে। প্রহার পর্যন্ত চলিতেছে। প্রত্যেক স্থানে নিজ ইচ্ছামত লবণ, সুপারি, ঘৃত, চাউল, খড়, বাঁশ, মৎস্য, চিনি, তামাক, অহিফেন ও অন্যান্য দ্রব্য যাহার ব্যবসায় কোম্পানি কোনকালে করেন নাই, তাহাই ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। লোকের নিকট বলপূর্বক সিকিমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন, অন্যত্র অত্যাচার করিয়া এক টাকার দ্রব্য পাঁচ টাকায় বিক্রয় চলিতেছে। ইতিমধ্যে চারি পাঁচ শত নূতন কুঠি সংস্থাপিত হইয়াছে। সরকারি কর্তৃপক্ষগণ মাশুল আদায়ে অক্ষম। রাজস্ব বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইতেছে। কোম্পানিকে যে সমস্ত প্রদেশ অর্পণ করা হইয়াছে, সেখানে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই ; আমার অধিকারে আপনাদের এইরূপ ব্যবহার করা উচিত নহে।" *[বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল। Vaos. Nar. II P. 97 &c. Nawab's letter to the Governor. 2nd May, 1762]*

লেখাপড়াতে যখন কিছু হইল না, তখন কথঞ্চিৎ স্বাধীনচেতা নবাব মীরকাসিম বঙ্গের দেশিয় বাণিজ্যের শুল্ক আদায় একেবারে রহিত করিয়া দিলেন। কথিত আছে—The Nawab to get rid of the persceution of the English on their private trade at once took to the bold front and comprehensive expedient of publishing all over Bengal a general abolition of all custom houses, tolls fees, and of granting indiscriminate exemption to all traders [Sier Mutaqchrin. Vol. 11 P. 469. Footnote, Para. 2] ইহাতেও ইংরেজেরা আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন, কারণ দেশিয় বণিকগণ অল্প খরচে ব্যবসায় চালাইয়া লাভবান হইলেন, ইংরেজ কোম্পানির নানাবিধ ব্যয় বাহুল্যে লোকসান হইতে লাগিল।

"রাণী ভবানীর জীবন-কাহিনীর সহিত এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার ঘনিষ্ঠ সংস্রব। তিনি তৎকালে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানের অধিশ্বরী কেবল তাহাই নহে ; তাঁহার রাজ্য মধ্যেই ইংরেজদিগের অধিকাংশ বাণিজ্যালয়। তখনও বাণী ভবানীর স্বাধীন ক্ষমতা তিরোহিত হয় নাই ; তখনও স্বরাজ্যের জীবন মরণের বিচার ক্ষমতা তাঁহার করতলগত। সুতরাং নূতন নবাবদিগের (ইংরেজ, কুঠিয়ালদিগের) সহিত রাণী ভবানীর নানা কারণে মনোমালিন্য সংঘটিত হইতে লাগিল।"

বঙ্গদেশে বহুবার রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। কখনও হিন্দু, কখনও বৌদ্ধ, কখনও পাঠান, কখনও মোঘল বাঙালির উপর রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। কিন্তু সে সকল রাষ্ট্রবিপ্লবে দীনদুঃখীদিগের দুঃখ ছিল না। যাহারা রাজা বা জমিদার, তাহাদেরই সর্বনাশ হইত ; দেশের লোকে নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে সক্ষম হইত। যিনি রাজসিংহাসন অধিকার করিতেন, তাহাকেই সহাস্যবদনে কর প্রদান করিত। বর্তমান রাষ্ট্রবিপ্লবে ইহার

বিপরীত ঘটনা সংঘটিত হইতে লাগিল। দেশের রাজা ও জমিদারবর্গ ইংরেজের সহায় ; তাহাদের আপাতত কোন ক্ষতি হইল না, যাহারা নিতান্ত দীন দুঃখী অসহায়, তাহাদিগেরই সর্বনাশ হইতে লাগিল। হাটবাজার কাঁপিয়া উঠিল ; ইংরেজ গোমস্তার অত্যাচারে জোলা তাঁতি পলায়ন করিতে লাগিল ; অর্থোপার্জনের আশায় ইংরেজেরা ধান, চাউল, পান-সুপারি, তামাক, লবণ প্রভৃতি সর্বপ্রকার দ্রব্যের কারবার খুলিয়া দিলেন। অন্তর্বাণিজ্যে দরিদ্র বঙ্গবাসির যে দুই পয়সা আয় হইবে সে আশা তো ফুরাইল।

"রাণী ভবানীর রাজ্যে এই উপলক্ষে কিরূপ অত্যাচার হইত, মালদহের ইংরেজ রাজকর্মচারী গ্রে সাহেব তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। যথা—Mr. Gray, resident at Maldah in January 1764 wrote to the president "Since my arrival here, I have had the opportunity of seeing the villainous practice used by the Calcutta Gomostas in carrying on their business. The Government has certainly too much reason to complain of their want of influence in their couentry, which is torn to pieces by a set of rascals, who in Calcutta walk in rags, but who they are set out on Gomostaships lord it over the country, imprisoning the ryots and merchants, and writing and talking in the most insolent, domineering manner to the fouzdars and officers." *"রাণী ভবানী" দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য*

এই সময়ে নানাবাদানুবাদের পর নবাব মীরকাসিম ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারিবর্গের সহিত গিরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অযোধ্যাধিপতির শরণাপন্ন হইলেন। দিল্লিশ্বর মহারাষ্ট্র আক্রমণে ব্যস্ত ছিলেন। ইংরেজ কোম্পানি জরাপলিত মীরজাফরের ছায়াতলে দণ্ডায়মান হইলেন ; অবশেষে বাদশাহ শাহআলমকে সিংহাসন লাভে সহায়তা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কোম্পানি বাহাদুরকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি পদ প্রদান করিলেন। তখন হইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে ইংলন্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ এদেশের রাজা হইলেন ও বাংলায় ইংরেজ রাজত্ব পত্তন আরম্ভ হইল।

খ. ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ

বঙ্গের দেওয়ানি লাভের পরে দেশের শাসন প্রণালী দ্বিধা বিভক্ত হইয়া হুজুরী বা রাজস্ব ও নিজমত বা বিচার দুই বিভাগে পরিণত হইল। ইংরেজ কোম্পানি প্রথম বিভাগ ও নাম সর্বস্ব বাংলার নবাব মীরজাফর—পুত্র নজমুদ্দৌলা নিজমতী কার্যের ব্যয় নির্বাহার্থ কোম্পানির নিকট বার্ষিক রাজস্ব ৫৩,৮৬,১৩১ টাকা বৃত্তি লইয়া দ্বিতীয় বিভাগের ভার গ্রহণ করিলেন। পূর্বে কুলী খাঁ কেবল বাংলার বার্ষিক রাজস্ব পরিমাণ ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা নির্ধারণ ও তাহা আদায়ের কঠোর নিয়ম প্রচলন করিয়া জমিদারগণের নিকট অত্যাচারী বলিয়া পরিচিত হন। সুজাউদ্দিন ও মীরকাসিম তদুপরি কিছু বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এক্ষণে "ইংরেজ কোম্পানি বার্ষিক আড়াই কোটি টাকা রাজস্বের অধিকারী হইলেন ; ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের হিসাবে বঙ্গ বিহারের রাজস্ব তিন কোটিরও উপর প্রদর্শিত হইয়াছে।" এই রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে বাংলা বিহার তৎকালে যে আটভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে বর্তমান পাবনা হুগলি নামক প্রথম বিভাগের অন্তর্গত রাজশাহী নামক প্রধান পরগণা মধ্যে পতিত হয়। এই বৃহৎ পরগণাগুলিই কালে কাটিয়া ছাটিয়া বর্তমান প্রাদেশিক বিভাগে পরিণত হইয়াছে।

শাসনভার নবাব এবং রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরেজ কোম্পানি গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের প্রাপ্য কর আদায় জন্য স্থানে স্থানে কালেক্টর নিযুক্ত হইল। এইরূপে দেশে "দ্বিত্বশাসন" (Double Government) প্রথা প্রবর্তিত হইল অর্থাৎ তৎকালে "যিনি নামতঃ শাসনকর্তা, তাঁহার কোনই ক্ষমতা রহিল না ; যাঁহারা কার্যত প্রভু, তাঁহাদের কোনরূপ শাসন-দায়িত্ব

সংস্থাপিত হইল না। বাংলাদেশ ক্রমশ মহাবিপ্লবে বিপর্যস্ত হইতে লাগিল। প্রজাপালন সর্বপ্রধান রাজধর্ম তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল। এই সকল রাষ্ট্রবিপ্লবে রাণী ভবানী স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণপণে প্রজারক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসন কৌশলে দস্যুতস্করের অত্যাচার প্রবল হইতে পারিল না। কিন্তু ইংরেজ বণিকদিগের অত্যাচার প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।" শিল্প বাণিজ্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল।

এই সময়ে এদেশের বাণিজ্যের অবস্থা প্রসঙ্গে "মহারাজ নন্দকুমার বা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা" লেখক ভূতপূর্ব সাবজজ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, কোম্পানির কর্মচারিগণ তৎকালীন নবাবকে বাধ্য করিয়া লবণ, তামাক ও সুপারির বাণিজ্য বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম প্রচার করেন। "এই নিয়মানুসারে কার্য হইবামাত্র দেশ মধ্যে হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। দেশিয় প্রজাগণের আর কষ্টের সীমা থাকিল না।" নিয়ম হইল যে, এদেশে যত লবণ উৎপন্ন হইবে তাহা প্রথমে কলিকাতার বণিক সমিতির নিকট মণ শতকরা ৭৫ টাকায় বিক্রয় করিতে হইবে। বণিক সমিতি তাহা দেশিয় মহাজনদিগের নিকট মণ শতকরা ৫০০ টাকায় বিক্রয় করিবেন ; তাহাই দেশিয় মহাজনেরা লাভ রাখিয়া সাধারণের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে। দেশিয় মহাজনগণ প্রথমে সরাসরি প্রস্তুতকারিগণের নিকট তাহা ক্রয় করিতে পারিবে না। *["নন্দকুমার" পঞ্চম অধ্যায়—লুঠ না বাণিজ্য। ৩৫-৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]* পাবনা জেলায় লবণ তৈয়ারির কোন চিহ্ন দেখা যায় না ; কিন্তু এখানে লবণ, তামাক, সুপারি ব্যবসায়ী মহাজন পূর্বাপর বহু বর্তমান ছিল এবং এখনও আছে। সুতরাং তাহারাও তৎকালোচিত ব্যবসায়ের নিয়মাধীন হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

এই সময়ে "জেলায় জেলায় রাজস্ব বিভাগের কার্য পরিদর্শন জন্য ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন 'সুপারভাইজার' নিযুক্ত হইলেন। তাহারা দেশের রীতি, নীতি, অবস্থা, ইতিহাস সঙ্কলনের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।" এই সময়ে এদেশের ইংরেজগণ কি প্রকারে এদেশের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তৎ-সম্বন্ধে মুতাক্ষরীণকার লিখিয়াছেন, "It was to be observed at this period (1760–70) that the English of some rank spent their time marrily and in pleasure........and so soon as one English man could pick up anything relative to the laws or business of this kind, he would immediately set it down in writing and lay it in store for the use of another European." [Sier Mutaqherin. Vol III. P. 27] ভাবার্থ—তৎকালে ভদ্রশ্রেণীর ইংরেজগণ আনন্দে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহারা এদেশের আইন ও রীতিনীতি সম্বন্ধে যখন যাহা পাইতেন, তাহা অন্য ইউরোপীয়দিগের জন্য তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করিতেন।

এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন—"১১৭৬ সালে বাংলা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই—ইংরেজ তখন বাংলার দেওয়ান। ... টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার (নবাবের) উপর।... (নবাব) গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ লেখে। বাঙালি কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

[আনন্দমঠ, ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঃ

নবাব আলিবর্দি খাঁ পূর্বে বিদেশিয় বণিকদিগকে ধান্য ও চাউলের বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। কিন্তু ১৭৬৬ অব্দে ইংরেজরা ধান্যের বাণিজ্য আরম্ভ করেন ও মাদ্রাজ প্রভৃতি দূরদেশে অনেক ধান্য প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। কোম্পানির আমলের প্রথমাবস্থা হইতেই দেশিয় শিল্প বাণিজ্য ধীরে ধীরে বিদেশিয় বণিকদিগের করতলগত হওয়ায় রাজশাহী প্রদেশের বিশেষত পাবনা বগুড়াদি অঞ্চলের লোক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অনেকে একমাত্র কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করিয়াছিল। ১১৭৪ ও ১১৭৫ সালে উপর্যুপরি দুই বৎসর অনাবৃষ্টি

হেতু এদেশে ভাল ফসল হইল না, কিন্তু কোম্পানির রাজস্ব কর্মচারী রেজা খাঁ মীর কাসিমকেও হার মানাইয়া একেবার শতকরা দশ টাকা হারে বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন।" রাজস্ব আদায়ের কঠোরতায়ই হউক, আর দৈব বিড়ম্বনা প্রযুক্তই হউক, ১১৭৬ সালে (১৭৬৯ খ্রিঃ) বাংলার সর্বত্র যে ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল ইতিহাসে তাহাই "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে খ্যাত। এই সময়ে দেশের লোক অন্নাভাবে লাঙল, গরু, ঘরবাড়ি বিক্রি করিতে আরম্ভ করিল। যখন তাহাতে কুলাইল না, স্ত্রী-পুত্রাদি বেচিল। খাদ্যাভাবে প্রথমে গাছের পাতা খাইতে আরম্ভ করিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর বিড়াল ও অখাদ্য খাইয়া জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, ও বসন্তাদি রোগে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এই সময়ে হাণ্ডিয়াল, বাঘলবাড়, সিদ্ধিনগর প্রভৃতি এ জেলার করতোয়া তটস্থ প্রাচীন সমৃদ্ধ পল্লীসমূহ একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল।

এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ সময়ে দীনপালিনী রাণী ভবানীর নিজ রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া প্রজার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। তাঁহার কৃপায় বহু লোক অন্ন জল লাভ করিল। দূরদেশ হইতে দুর্লভ মূল্যে ধান্য ও চাউল খরিদ করিয়া আনিয়া তিনি সুলভ মূল্যে বিক্রয় ও বিতরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিন দিন তাঁহার কোষাগারও শূন্য হইয়া পড়িল। দুর্ভিক্ষে রাজশাহী জনপদ শ্মশানে পরিণত হইল। "দুর্ভিক্ষের শেষে স্থির হইল যে, মন্বন্তরে বাংলার সর্বনাশ হইয়াছে—হলকর্ষণক্ষম কৃষক জীবিত নাই, বীজধান্য ও গো-বৎস্যের অভাব হইয়াছে, শস্যক্ষেত্র তৃণ-কণ্টকে পূর্ণ হইয়াছে।"

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঃ

দেশে রাজ শাসনের শিথিলতা ও তদুপরি অন্নাভাব তজ্জন্য দেশের লোক অনেকে দস্যু তস্করের বৃত্তি অবলম্বন করিল। দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার আরম্ভ হইল। এই সময়ে বঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দেখা দিল, তখন দলে দলে দেশের নিরন্ন লোক ঐ দলে যোগদান করিল।

সন্ন্যাসী দলের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে—Scrupulusly attached to his religious principles, he (Allyvordy Khan) was much addicted to the Company of Brahmins and sannyasees or Gentoo fakyrs, who entirely governed him ; if is to be observed that most of these sannyasees were Raghuji Bhonslas spies ; the fakyrs either go entirely naked or just cover their previes and no more. There are some other who live in troops together and are considerable merchants marching in droves and keeping theives and badditti at a distance. *[Sier Mutaqherin, vol II P. 2]*

"In the year subsequent to famine, their rank were swollen by a crowd of starving peasants who had neither seed nor implements to recommence cultivation with and the Cold wether of 1772 brought them down upon the harvest fields of Bengal, burning, plundering, ravaging in bodies of fifty thousands." [B. D G Rajshsahi P. 41] ভাবার্থ এই যে, আলিবর্দী খাঁর সময়ে রঘুজী ভোঁসলার গুপ্তচররূপে যে উলঙ্গ ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসীদল এদেশে আসে, তাহারা ভদ্র সন্ন্যাসী নামে পরিচিত। ইহারা কেহ ভিক্ষুক, কেহ ব্যবসায়ী বেশে চোর ডাকাইতগণকে দূরে রাখিয়া দেশ মধ্যে ভ্রমণ করে। মন্বন্তরের শেষে দেশের হাল গরু ও বীজ শূন্য কৃষকগণ কৃষিকার্যে অক্ষম ও নিরন্ন হইয়া এই দলে যোগ দিয়া ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে সংখ্যায় ৫০ হাজারে লুণ্ঠন আরম্ভ করে।

পাবনা জেলায় কোথায় কোথায় সন্ন্যাসী দলের উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা সঠিক

জানা যায় না। তবে মথুরা (হাল বেড়া) থানার অধীন সন্ন্যাসীবাধা, শ্রীনিবাসদিয়া, সিংহাসন, সাফল্লা, শিবপুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের নাম ও অবস্থান দেখিয়া এই জেলায়ও তাহাদের আগমন সম্ভবপর বোধ হয়। সন্ন্যাসীবাধার নদী নালা বেষ্টিত গড়বন্দি অবস্থান দৃষ্টে ইহা যে প্রকৃতই সন্ন্যাসীদলের আশ্রয়স্থল ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাবনা জেলায় সন্ন্যাসীদিগের অন্য কোন বিশেষ নিদর্শন না থাকিলেও ময়মনসিংহ জেলার ইতিহাসে জানা যাইতেছে যে, "সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এতৎ প্রদেশে আসিয়া মধুপুরের নিবিড় আরণ্যে ও সন্ন্যাসীগঞ্জে আড্ডা স্থাপন করে ও ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে। * * * ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে সন্ন্যাসীদল আলাপ-সিংহ ও জাফরশাহী পরগণায় প্রবেশ করিয়া জমিদার ও প্রজার অর্জিত শস্যক্ষেত্র হইতে কাটিয়া লইয়া গেল। জমিদারগণ অনন্যোপায় হইয়া ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে ৩০ জানুয়ারি রেভিনিউ বোর্ডের সমীপে প্রতিকার প্রার্থী হন।" *[ময়মনসিংহের ইতিহাস, কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত, ৯৪—৯৫ পৃষ্ঠা।]*

কাহারও কাহারও মতে সন্ন্যাসীগণের উৎপাতে কোন কোন জমিদার তাহাদিগকে জায়গির পর্যন্ত দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীদিগের বংশধরগণ গিরগিরি, পুরী ভারতী আখ্যায় পরিচিত হয়। এই জেলায় গির উপাধিধারী ..... ব্রাহ্মণ বংশ সহসা দেখা যায় না, কিন্তু পার্শ্ববর্তী বগুড়া রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় দেখা যাইতেছে। এই জেলার সন্ন্যাসীবাধা ও ময়মনসিংহের সন্ন্যাসীগঞ্জ (বর্তমান জামালপুর টাউনের নিকট 'পলটন') নামক স্থান হইতে এদেশে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেশে দস্যু তস্করের উপদ্রবে কোম্পানির আদায়ী টাকাও অনেক লুট হইতে লাগিল। এই কালের অবস্থাই বঙ্কিমবাবু কৃত—"আনন্দমঠে" আংশিক বিবৃত হইয়াছে। এদেশের কোম্পানির কার্যের বিশৃঙ্খলা দৃষ্টে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি বঙ্গের কোম্পানির কার্য-প্রণালীর প্রতি নিপতিত হয়। তখন ১৭৭২ অব্দে পার্লামেন্ট হইতে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলার কোম্পানির গবর্নর নিযুক্ত হইলেন। ব্রিটিশ সুশাসনের সূত্রপাতে ১৭৭২ অব্দে ৪ মে তারিখে তিনি বঙ্গে কোম্পানির খাস শাসন-প্রণালী প্রবর্তন করিলেন। জমিদারগণের সহিত রাজস্ব আদায় বন্দোবস্ত কল্পে ৪ জন সভ্য লইয়া একটি স্যরকট্ কমিটি গঠন করিলেন। তাঁহারা পরগণায় পরগণায় ঘুরিয়া ১৭৭২ হইতে ১৭৭৭ অব্দ পর্যন্ত ৫ বৎসর জন্য পঞ্চসনা বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তখন যে বর্ধিত হারে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইল, তাহার সহিতই ইজারা বিলি সূত্রে জমিদারি বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। এইরূপে পুরাতন জমিদারগণ অনেকে বৃদ্ধি হ'রে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইয়া পৈত্রিক জমিদারি হইতে বঞ্চিত হইলেন। মুসলমান আমলের উত্তরাধিকারী সূত্রে জমিদারি প্রাপ্তি প্রথা একরূপ রহিত হইল। এই সময়ে রাণী ভবানী এদেশের অধিশ্বরী। তাঁহাকেও নানা উপায়ে হেস্টিংসের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া রাজশাহী রাজ্যের পঞ্চসনা বন্দোবস্ত লইতে হইল। তথাপি রংপুরের অধীন বাহিরবন্দ পরগণা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া গেল।

এই সময়ে জেলায় জেলায় দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে সুপারভাইজারগণ কালেক্টর নামে খ্যাত হইলেন। তাহারা রাজস্ব আদায় ব্যতীত দেওয়ানি কার্যভার গ্রহণ করিলেন, তাহাদের সাহায্যার্থে তাহাদের অধীনে দেওয়ান নামে দেশিয় কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন। ফৌজদারি বিচার মুসলমান কাজির হস্তে রহিল, জনৈক মুফতি ও জনৈক হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহাকে সাহায্য করিতেন। কালেক্টরগণ তাহাদের কার্য পরিদর্শন করিতেন। জমিদারগণ নাম সর্বস্ব নবাবের অধীনে দেশ মধ্যে মাত্র শান্তিরক্ষার ভার লইয়া রহিলেন, কিন্তু তাহাদের অনেক ক্ষমতার হ্রাস হইল। এই প্রকারে স্বরাজ্যে ক্ষমতালোপ, শিল্প বাণিজ্যের অবনতিতে প্রজার দুঃখ, রাজস্ব বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণে মর্মাহত হইয়া রাণী ভবানী

স্বীয় পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গঙ্গাবাস আশ্রয় করিলেন। তদবধি রাজশাহী রাজ্যের গৌরব ক্রমশ অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হইল।

১৭৭৭ অব্দ হইতে ১৭৮১ অব্দ পর্যন্ত বার্ষিক বন্দোবস্ত মূলে রাজস্ব আদায় হইল। এই সময়ে বাংলার নদনদী জরিপ জন্য মেজর রেনেল সাহেব নিযুক্ত হইয়া ১৭৭৮ অব্দে পাবনা জেলা জরিপ করেন। কলিকাতার সুপ্রিম কোর্ট ও সুপ্রিম কাউন্সিল মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া দেশের গণ্যমান্য অনেক লোক নিগৃহীত হইল। নন্দকুমারের ফাঁসি এইকালেই অনুষ্ঠিত হয়। এদেশে অত্যাচার অবিচার ও দৌরাত্ম্যের নিরাকরণ জন্য ১৭৮১ অব্দে গবর্নর জেনারেল স্বাধীন হইলেন এবং তখন হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে দেশে সুশাসন ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজস্বের বার্ষিক বন্দোবস্তের পরিবর্তে ১০ বৎসরের জন্য জমিদারগণের সহিত এক নির্দিষ্ট হারে রাজস্বের দশসালা বন্দোবস্ত হইল। তাহাই কালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিণত হইয়াছে। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থ কলিকাতার বোর্ড অব রেভিনিউ ও বিভাগীয় কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। জেলায় জেলায় রাজস্ব আদায় ব্যতীত দেওয়ানি বিচার ও শাসনকার্য জন্য কালেক্টরগণ ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ নামে পরিচিত হইয়া তিন পদেই একই ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন। এই নিয়ম প্রবর্তিত হইলে বর্তমান পাবনা জেলা তৎকালে রাজশাহী কমিশনারের অধীনে উক্ত জেলার জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের শাসনাধীন হইল। তখন কালেক্টরগণ কোথাও Resident কোথাও chief কোথাও বা Collector নামে খ্যাত হইতেন। তখন মুর্শিদাবাদের অধীনস্থ মুরাদবাগে রাজশাহীর সদর স্টেশন প্রতিষ্ঠিত ছিল। যথা—From the old records of the Collectorate, we find that in March 1783 Mr. John Evelyn was engaged in making a settlement of Rajshahi with head-quarters at Muradbagh, a suburb of Murshidabad. In August 1783 Mr. George Dallas was made Collector and in the phraseology of that period was appointed to the general superintendence of the business of the Rajshahi District. [B. D. G. Rajshahi, 1916, P. 39] এই প্রথা প্রবর্তিত হইলে নাটোররাজের দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারক্ষমতা বিলুপ্ত হইল। ইতিপূর্বে তাঁহার অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড প্রয়োগের ক্ষমতা ও স্বীয় কারাগার ছিল। এক্ষণে তাহা রহিত হইল।

এই সময়ে কালেক্টরগণ কেহ কেহ Resident নামে পরিচিত হইয়া কোম্পানির পক্ষে কার্যপরিদর্শন করিতেন, তজ্জন্য রাজস্ব আদায় ও রেশমের কারবার উভয়ের উপরই মাহিনা ব্যতীত কমিসন পাইতেন, রেসিডেন্টগণ মহাজনদিগকে রেশম ও তুলা এবং রেশমের কাপড় জন্য অগ্রিম মূল্য দাদন করিতেন ; চুক্তি থাকিত যে তাহারা কোম্পানি ব্যতীত অন্য কাহাকেও উক্ত জিনিস বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং নিরূপিত সময়ে কুঠিতে মাল পৌঁছাইয়া দিবে। মহাজনেরাও তদনুরূপ দেশিয় রেশম ও তুলা ব্যবসায়ী কৃষকগণকে ও দেশিয় তন্তুবায়দিগকে উক্তরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া কোম্পানির মাল সরবরাহ করিত। তখন এই জেলায় হাণ্ডিয়াল মসিদপুর প্রভৃতি স্থানে কোম্পানির কারবার চলিত। তৎকালে রাজশাহী কালেক্টর সম্বন্ধে লিখিত আছে—"In addition to his pay, Collector was given a commission on revenue collection. * * * When the collection aggregated 10 lakhs, the Collector became entitled to a commission of Rs. 10,000. After that the commission was 3 per cent for the first 10 lakhs and one and half per cent on the remainder. * * * Besides having to deal with these, the Collector had to look after the silk trade. In 1787, for instance, Mr. Speke was given 31,000 for investment in silk on account of the East India Company. [B. D. G. Rajshahi 1916. P. 40] অর্থাৎ কালেক্টরগণ মাহিনা ব্যতীত ১০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের উপর এক টাকা হারে, তদূর্ধ্বে দেড়

টাকা হিসাবে কমিশন পাইতেন। তদ্ব্যতীত তিনি কোম্পানির পক্ষে রেশমের কারবার দেখিতেন। ১৭৮৭ অব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে রেশমের কারবারে ৩১,০০০ টাকা দেওয়া হয়।

এইরূপে পাঠান আমলের যুগপৎ ধর্ম ও রাজ্য বিস্তারের ন্যায় এই সময়ে কোম্পানির অধিকারকালে বাণিজ্য ও রাজ্যশাসন একত্রে চলিতে থাকে। রেশম ব্যতীত অহিফেন আদির জন্য আবগারি বিভাগ কোম্পানির নিজ হস্তে ছিল। প্রথম বিভাগ উঠিয়া গেলেও এখন পর্যন্ত রাজশাহী নওগাঁয়ের গাঁজা বিভাগ ও জেলায় জেলায় আবগারি বিভাগ গভর্নমেন্ট খাসে রাখিয়াছেন। এই সমস্ত রাজশাহী জেলা সংশ্লিষ্ট হইলেও ইহার সহিত পাবনার অনেক সম্বন্ধ ছিল। কারণ তখন রাজশাহী হইতে পাবনা শাসিত ও রক্ষিত হইত এবং পাবনা প্রদেশের আদর্শ উক্ত রাজশাহী অঞ্চলের অনুকরণেই পরিচালিত হইত।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়ে দশসালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইবার সময় পাবনা জেলার সমগ্র ভূসম্পত্তি একমাত্র নাটোররাজ রামকৃষ্ণের সহিত বন্দোবস্ত হয়। তদ্ব্যতীত এই জেলায় অন্য কেহই জমিদার পদবাচ্য ছিলেন না। তখন পর্যন্তও দেশের শান্তিরক্ষার ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল ও তজ্জন্য তিনি বার্ষিক ৩৭,৯২৬ টাকা বৃত্তি পাইতেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারগণের নিকট হইতে দেশের শান্তিরক্ষার ভার উঠাইয়া লইয়া প্রত্যেক জেলা দারোগার অধীনে থানায় থানায় বিভক্ত হইলে নাটোরে কোম্পানির সদর থানা প্রতিষ্ঠিত হইল ; তখন নাটোররাজের প্রজার নিকট খাজনা আদায় ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় ক্ষমতা একেবারে লোপ পাইল। কালেক্টর রাজস্ব আদায়ের ভার পাইলেন ; দেওয়ানি বিচার জন্য পৃথক জজ নিযুক্ত হইলেন। ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার জন্য কোর্ট অব সার্কিট নামে কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা ও ঢাকায় ৪টি বিচারালয় স্থাপিত হইল। তাহার জজগণ মফঃস্বলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুনী ও ডাকাইতি আদি বড় বড় মোকদ্দমার বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ছোট ছোট মোকদ্দমার বিচার দেশিয় কাজিদিগের হাতে রহিল। কালেক্টর সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট স্বরূপে তাহা পরিদর্শন ও নিজে স্থলবিশেষে সরাসরি বিচার করিয়া দণ্ড, বিধান বা সার্কিট কোর্টে সোর্পদ্দ করিতে লাগিলেন। ছোট ছোট দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচার জন্য জজের অধীনে স্থানে স্থানে মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন, মফঃস্বলের মোকদ্দমার আপীল শুনানী জন্য কলিকাতার সদর দেওয়ানি ও মুর্শিদাবাদের সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠা হইল। এই প্রকারে কোম্পানি তখন হইতে দেওয়ানি ব্যতীত নিজমতী কার্যও স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতে পাবনায় ক্রমশ হাণ্ডিয়াল, পাবনা, মথুরা, ক্ষেতুপাড়া আদি স্থানে থানা প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল।

পঞ্চসনা বন্দোবস্তে রাণী ভবানীর অধঃপতন হইয়াছিল ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর রাজা রামকৃষ্ণের সর্বনাশ হইল। দেশে শিল্প বাণিজ্যের বিনাশ হেতু রীতিমত খাজানা আদায় হইল না ; রাজস্ব বৃদ্ধি হেতু তিনি দেয় রাজস্ব প্রদানে অশক্ত হইলেন, তদুপরি তিনি তান্ত্রিকমতের সাধক ছিলেন ; সর্বদা পূজার্চনায় লিপ্ত থাকায় আমলা কর্মচারিবর্গের কার্য শিথিলতায় ক্রমে রাজস্ব বাকি পড়িতে লাগিল। অবশেষে তৎকালোচিত মুসলমানী প্রথানুসারে কোম্পানির প্রথম আমলেও রাজস্ব বাকি হেতু মহালের পরিবর্তে মালিক দায়ী হইবার প্রথা প্রচলিত থাকায় ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ তারিখে মহারাজ রামকৃষ্ণ রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের আদেশে কারারুদ্ধ হইলেন। অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিয়া অব্যহতি লাভ করিলেও, তৎসূত্রে টাকা দিতে না পারায় বাকি রাজস্ব জন্য জমিদারি নিলাম হইতে লাগিল। *[রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কালীনাথ চৌধুরী প্রণীত। ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]* এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধা ও অসুবিধায় ক্রমে নাটোররাজ সম্পত্তি নিলাম হইতে আরম্ভ হইল, দেশের নবোত্থিত ধনী, মহাজন, দালাল ও সরকারি কর্মচারিগণ তাহা খরিদ করিয়া অন্যান্য জেলার ন্যায় পাবনার নূতন জমিদাররূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন।

চুরি ডাকাইতি ঃ

কোম্পানি দেশ মধ্যে স্থানে স্থানে থানা ও পুলিশের বন্দোবস্ত করিয়া দেশের শাসন ও বিচার সর্ববিধ রাজকার্য গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত দেশের চতুর্দিকে চুরি ডাকাইতি চলিতে লাগিল। পাবনার পশ্চিমোত্তরে চলন বিল মধ্যে দস্যুদলের প্রধান আড্ডা ছিল। তাহাদের উৎপাতে লোকে পুলিশের দারোগা ও জমিদারগণের নায়েব গোমস্তাগণের আশ্রয় লইতে লাগিল। চোর ডাকাইতগণ অর্থ দ্বারা তাহাদিগকেও বশীভূত করিয়া দেশের মধ্যে অব্যাহতরূপে তাহাদের কার্য চালাইতে লাগিল। তদুপরি দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারগণ অনেকে তাহাদের সহিত যোগে, কেহ কেহ অপহৃত দ্রব্যাদি গোপনে রাখিয়া "থানীদার" (থালীদার বা থালাং) বলিয়া পরিচিত হইলেন। "এই প্রকারে সলপ ও রাজশাহী প্রদেশের অন্যান্য গ্রামের অনেক ব্যক্তি চোর ডাকাইতের অর্থ দ্বারা বহুতর ধন সঞ্চয় করিল।" *[রাজশাহী প্রদেশের বর্তমান কোন কোন ধনী সম্ভ্রান্তবংশের ধন সম্পত্তির মূল অনুসন্ধান করিলে ইহা অনুমিত হইবে যে, দস্যুবৃত্তিই তাঁহাদের সম্পত্তির মূল কারণ। [রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ১৮৮ পৃষ্ঠা।]*

নাটোরে রাজশাহীর সদর জেলা কোর্ট স্থাপিত হইলে, এই জেলার বর্তমান তাঁতিবন্দের ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় এবং দুলাই মুসলমান জমিদার বংশের আদিপুরুষ রহিমুদ্দিন মুন্সি সাহেব যথাক্রমে নাটোর কোর্টের সেরেস্তাদার ও পেশকার নিযুক্ত হন। তৎকালে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটগণ একে বিদেশিয়, তাহাতে আবার গুরুতর কার্যভার নিবন্ধন সমস্ত কার্যে স্বচক্ষে দেখিতে পারিতেন না, তন্নিমিত্ত তাহাকে আমলাদিগের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইত। এইরূপে দেশের বিচারক আমলাদিগের ক্রীড়াপুত্তলী, পুলিশ ও জমিদারের নায়েব গোমস্তাগণ চোর ডাকাইতের অর্থে পুষ্ট সুতরাং লোকে "পুলিশের অত্যাচার সহ্য অপেক্ষা চোর ডাকাইতের অত্যাচার সহ্য করা সঙ্গত মনে করিত।" তৎকালে রাজশাহী প্রদেশের পাবনা, বগুড়া আদি অঞ্চলের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সার্কিট কোর্টের তৃতীয় জজ মিঃ স্ট্রেচি সাহেবের নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। যথা—

To

W. B. Bayley Esqr.
Registrar ot the Nizamat Adawlat,
Murshidabad,
(Rajshahi Division)

That dacoity is very prevalent in Rajshahi has been stated, that if its vast extent were known, if the scenes of horrors, the murders, the burnings, the excessive cruelties. which are canstantly perpetrated here, were properly represented to Government, I am confident that same measures would be adopted to remedy the evil. * * * It can not be denied that, in point of fact. there is no protection for person and property and the present wretched, mechanical insufficient system, of police is are mere mockery.

Para 12 * * * On my way through the northern part of this Zilla, I had conversation with a zaminder and a police daroga, who have distinguished themselves by their exertion to apprehend dacoits. They say that it was impossible to get any information about the great dacoits, but the houses of all principal inhabitants were open to them ; yet no body dared mention their names for fear of being murdered. They attributed the success of the dacoits

to the same cause that every body else does, viz the protection given by the zaminders and police officers and other people of power and influence in the country, Every thing I hear and see, and read on the subject, serves to convince me of the truth of this statement.

Para. 13. The principal persons who have lands and farms in the northern part of this district where there are most dacoits are the Fouzdari Seristhadar, Unoopendra Narain and Peskar, Raheemoodeen, Kishen Sindel, a Dewani Mohrir, and Domeengeer Goseyn and Anup Munshee who hold no office under government.

Para 14. There is evidently a connection of interest between Domeengeer Gosevn and two Fouzdary officers who farm lands together and mutually support each other. * * * Most of the police dorogas seem to be under the influence of Raheemoodeen. Anoop Munshee and Domeengeer accuse each other of harbouring dacoits and there is every reason to believe, they are both guilty, for a great many notorious dacoits and harbourers of dacoits live in their estates, as well as in Raheemoodeen's and Unoopendranarain's and Sindel's, although it is not easy to apprehend, or to convict them.

Para-15. The magistrate here has so much to do that a great deal of important business is necessarily left to the principle amlas i.e. to the Seristadar and Raheemoodeen.

Para-21. The Fouzdari Seristadar with his 60 rupees a month and the Peskar with 40 rupees have contrived to possess themselves of great property in this district. For their official situation they have acquired a degree of power and influence which they turn to the worse purpose. I am persuaded that they derive a revenue from the dacoits and give them protection and they suppress complaints, which are brought against themselves and their dependents.

Para-22 * * * It is plain that, as long as they retain their power and influence, dacoity will increase and it is entirely difficult for any man to obtain justice here, if they are disposed to prevent it.

Natore
10th June, 1808
Calcutta
Committee of Circuit,

I have the etc.
E. Strachey
3rd Judge. [৬১]

১৮১০ অব্দে তৎকালীন গবর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো সাহেবের মিনিটেও এ দেশের চোর ডাকাইতের অত্যাচারের উল্লেখ আছে। তখন হইতে ১৮২৮ অব্দ পর্যন্ত পাবনা জেলার পশ্চিমোত্তর প্রদেশের দস্যুতস্করের উপদ্রব সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—Dacoity had been prevalent in the neighbourhood of Challan Bill, where the exploits of three Bandit chiefs, Syma, Rama and Beni Roy, are still remembered ; Hamilton's *East India Gazetter 1828*, informs us : "In the vicinity of Hunial (Handial) the face of the country is exceedingly wild and woody and otherwise fitted

for the harbour of dacoits. For the protection of the jeels or shallow lakes, a swift boat of 16 oars is retained commanded by a jamadar who is specially recommended to superinted Challan jeel, the largest expause of water of this description in Bengal [B. D. G. Pabna 1923. P. 21] তাৎপর্য এই যে, শ্যামা রামা ও বেণী রায়ের স্মৃতিবাহী চলনবিলে ডাকাইতি বিদ্যমান ছিল। ১৮২৮ সালের হামিলটন সাহেবের ইন্ডিয়া-গেজেটিয়ারে জানা যায় হান্ডিয়ালের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বনজঙ্গলে ডাকাইতগণ লুক্কায়িত থাকিত। বিলের এতাদৃশ স্থানের রক্ষাকল্পে ১৬ দাঁড়ের একখানি দ্রুতগামী নৌকাসহ জনৈক জামাদার নিযুক্ত ছিল।

পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় এ জেলার পূর্বদিকেও তৎকালে গামছা-মোড়ার উপদ্রব ছিল। ১৮২৮ অব্দে লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসন সময়ে ঠগি বিভাগ নিযুক্ত হয়, ঠগগণ ভ্রাতৃভাব বিশিষ্ট নর-হত্যাকারী ও লুণ্ঠন ব্যবসায়ী এক প্রকার স্থল ও জল দস্যু বিশেষ। ইহারা কেহ ব্যবসায়ী, কেহ তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে দেশের নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করিত। এই জেলার পূর্বাংশে যমুনা প্রভৃতি নদীতীরস্থ নাজিরগঞ্জ, বরখাপুর আদি গ্রামের ইতর ভদ্র অনেকেই তৎকালে এই গামছা মোড়া বা ঠগিদলে যোগদান করিয়া দস্যুবৃত্তি করিত। কাশীনাথপুরের নিকটবর্তী শিবপুরের মৈত্র বংশের অনেকে এই দলের নায়ক ছিলেন এবং অনেকে ধৃত হইয়া কারাদণ্ডভোগ করিয়াছিলেন। ইহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে এখনও এদেশে অনেক ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়।

জেলা গঠন ঃ

এই প্রকারে সুবিস্তীর্ণ রাজশাহী প্রদেশের দূরবর্তী অংশের দস্যুতা নিবারণ জন্য ইতিপূর্বে রাজশাহী জেলা হইতে কয়েকটি থানা লইয়া ১৮১৩ অব্দে প্রথমে মালদহ, ১৮২১ অব্দে বগুড়া জেলা গঠিত হইয়াছিল এবং শেষোক্ত অব্দে নাটোর অস্বাস্থ্যকর বিধায় রাজশাহীর সদর স্টেশন রামপুর-বোয়ালিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। এক্ষণে ১৮২৮ অব্দে তথা হইতে পাবনার সুদূরবর্তী পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাংশের চলন বিলের জলদস্যুতা ও "গামছা মোড়া" বা ঠগিদলের অচ্যাচার নিবারণ, সরকারি কর্মচারীর অল্পতা দূরীকরণ এবং জমিদারগণের শান্তিরক্ষায় উদাসীনতা পরিহারকল্পে ১৬ অক্টোবর তারিখের গবর্নমেন্টের মন্তব্যানুসারে রাজশাহী হইতে পাবনা, ক্ষেতুপারা, মথুরা ও রায়গঞ্জ এবং যশোহর হইতে ধরমপুর, মধুপুর, কুষ্টিয়া ও পরে পাংসা এই আট থানা লইয়া সর্বপ্রথম পাবনা জেলা গঠিত হয়। তখন হইতে ধীরে ধীরে দেশের শাসন প্রথা ক্রমশ সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়া এই জেলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করে।

গ. বর্তমান ইংরেজ শাসনকাল ঃ

১৮২৮ অব্দের ১৬ অক্টোবর তারিখের গবর্নমেন্টের নং ৩১২৪ পত্রানুসারে মালদহের ম্যাজিস্ট্রেট A. W. Mills Esq সর্বপ্রথমে পাবনার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তখন পাবনা রাজশাহী কালেক্টরের অধীন ছিল। ১৮২৯ অব্দে সার্কিট কোর্ট উঠিয়া গেলে, রেভিনিউ কমিশনারের পদ সৃষ্টি হইলে, পাবনা রাজশাহীর রেভিনিউ কমিশনরের অধীন হয় ; তখন জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট উভয়ই তাহার অধীন থাকে। ১৮৩২ অব্দে পাবনার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা লাভ করেন ও পাবনায় কতক রাজস্ব আদায় আরম্ভ হয়। ১৮৩৭ অব্দে সেসন জজের পদ সৃষ্টি হইলে, পাবনা, রাজশাহীর দায়রা জজের অধীনে আসে, তথা হইতে জজ সাহেব মধ্যে মধ্যে সার্কিট জজগণের ন্যায় পাবনায় আসিয়া বড় বড় ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার করিতে থাকেন। ১৮৫৫ অব্দে সিরাজগঞ্জ থানা ময়মনসিংহ জেলা হইতে পৃথক হইয়া পাবনার সামিল হয় ও শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ আদি থানা লইয়া সিরাজগঞ্জে

Mr. A. Barry নামে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সর্বপ্রথম নিযক্ত হন। দক্ষিণে পদ্মাতীরে ক্রমে নীল বুনানী আরম্ভ হইলে নীলকরগণের সহিত প্রজাগণের দাদনের চুক্তিটিতে গোলযোগ ও নানাপ্রকার মোকদ্দমার সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত ১৮৫৭ অব্দে পাংসা, বালিয়াকান্দি ও কুমারখালি থানা লইয়া কুমারখালিতে পাবনার একটি মহকুমা স্থাপিত হয়। পরে ১৮৬৩ অব্দে কুষ্টিয়া থানা, ১৮৭১ অব্দে কুমারখালি থানা নদীয়া জেলার এবং পাংশা থানা ফরিদপুর জেলার সামিল হয়।

সিপাহী বিদ্রোহ ঃ

১৮৫৭ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহ কালে পাবনা জেলায় বিশেষ কোন উপদ্রব বা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই। ১৮৫৮ অব্দের বঙ্গের তৎকালীন লেপ্টনান্ট গবর্নর স্যার ফ্রেডারিক হেলিডে সাহেব মহোদয়ের Minutes of Bengal নামক বিবরণীতে বিদ্রোহকালের পাবনার অবস্থায় জানা যায় যে, প্রথমে পাবনার জন্য কিঞ্চিৎ আশঙ্কা হয় ; কারণ ঢাকার বিদ্রোহীদল উত্তরাভিমুখে গমনকালে রাস্তায় সিরাজগঞ্জের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী বন্দর লুণ্ঠনের ভয় ছিল। তৎকালীন ডিঃ ম্যাঃ মিঃ রেভেন্স জেলার নীলকর ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণকে আহ্বান করতঃ একদল অশ্বারোহী সৈন্য গঠন করিয়া সিরাজগঞ্জের দিকে অগ্রসর হন। এই অভিযানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সহ অন্যান্য সাহায্যকারিগণ গবর্নমেন্টের ধন্যবাদ লাভ করেন। আরও জানা যায়—"The Commissioner of the Division also brought to my notice, the name of Bejoy Gobind Choudhury, Zaminder of Tantibanda, who offered to place guards at his own expense between Dacca and Pabna to prevent the mutineers from advancing on the latter place. This gentleman also received my warm acknowledgement for his loyality." *[Bengal under the Lieutenant Governors. P 132.]* ভাবার্থ—বিভাগীয় কমিশনার সাহেব তাঁতিবন্দের জমিদার বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় ঢাকা হইতে পাবনা পর্যন্ত স্থানে নিজ খরচে পাহারা রাখিতে সম্মত হওয়ায় আমার নিকট তাহার নাম উল্লেখ করেন ; তিনিও আমার বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন।

নীল বিদ্রোহ ঃ

ভারতব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে ১৮৫৯/৬০ অব্দে বঙ্গে যে নীল বিদ্রোহ বা হাঙ্গামা উপস্থিত হয় এ জেলায়ও তাহা প্রকাশ পায়। তখন পাবনা জেলা মধ্যে (ক) দেওয়ানগঞ্জ (পাবনা মাঝিপাড়া), (খ) ধুলাউরি (বেড়া) (গ) ধোবরাখোল (এক্ষণে নদীয়ায়) (ঘ) কুমিদপুর (এক্ষণে পদ্মাগর্ভে) (ঙ) হিজলাবট্ (এক্ষণে নদীয়ায়), প্রভৃতি পাঁচটি প্রধান কুঠি বা কন্‌সারন এবং তদধীনে এ জেলার স্থানে স্থানে বহু গ্রামে নীলকুঠির কাজ চলিত। পূর্বে রেশমের রেসিডেন্টগণের ন্যায় নীলকরগণও দেশিয় রায়ত ও প্রজাকুলকে তাহাদের জমিতে নীল বুনানী জন্য অগ্রিম দাদন দিতেন। অন্যান্য জেলার ন্যায় এই জেলার রায়তগণ তাহাদের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া দেশময় নীল হাঙ্গামায় যোগদান করে ও নীল বুনিতে অস্বীকার করে। তখন কুষ্টিয়া পাবনার অধীনে ছিল ; কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী সালঘর মধুয়া ও কুষ্টিয়ার নীলকর মিঃ কেনী সাহেবের সহিত তৎকালীন পাবনা শহরের পত্তনীদার পাংশা নিবাসী ভৈরবচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও (নদীয়া) সদরপুর নিবাসী প্যারীসুন্দরী দাস্যার সহিত নানাপ্রকার বিবাদ ও মোকদ্দমা চলিত। কেনী সম্বন্ধে এদেশে আজিও অনেক ছড়া প্রচলিত আছে। ১৮৫৯/৬০ অব্দে ক্রমশ দেশময় নীলবিদ্রোহের অশান্তি ঘটিলে পাবনা জেলায়ও তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। জানা যায়—"In the district of Pabna, a deputy Magistrate with a small body of military police was (partly in consequence of his injudicious conduct) repulsed by a body of lathials, who had assembled to

resist cultivation of indigo." *[Bengal under the Lieutenant Governors. P 188]* ভাবার্থ—নীল বুনানীতে বাধা প্রদানে একত্রিত লাঠিয়ালগণ পাবনা জেলার জনৈক ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেটকে (তাঁহার কথঞ্চিৎ নিজ অবিবেচনার কার্যবশত) সামরিক পুলিশ সহ হঠাইয়া দিয়াছিল।

নীলবিদ্রোহ কালে দেশে শান্তিস্থাপনার্থ নীল প্রধান জেলায় জেলায় যোগ্যতর ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তখন ১৮৫৯ অব্দে পাবনা জেলা ও রাজশাহী হইতে পৃথক হইয়া পাবনার ম্যাজিস্ট্রেটও কালেক্টর পদে Mr. G. Bright নিযুক্ত হন। ১৮৬৩ অব্দে কুষ্টিয়া নদীয়া জেলার সামিল হয়, ১৮৬৬ অব্দে সিরাজগঞ্জে মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭১ অব্দে কুমারখালিও নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ ১৮৭১ অব্দের শীতকালে ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেও সাহেব মহোদয় তাঁতিবন্দের জমিদার বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বানে শিকার উপলক্ষে তাঁতিবন্দের শুভাগমন করেন।

প্রজা বিদ্রোহ ঃ

১৮৭২/৭৩ অব্দের এই জেলার প্রজা বিদ্রোহ আধুনিক সময়ের প্রধানতম ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ ইহাতে প্রজাস্বত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া ১৮৮৫ সালের "প্রজাস্বত্ব বিষয়ক" আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। বর্ণিত আছে—"TheAgrarian Riots of 1873 in Pabna are very important, because it led to the exhaustive discussion of the tenant's right which culminated in "*Rayot's Charter*"—The Bengal Tenancy Act. 1885. *[Imperial Gazetteer of East Bengal Tanancy Act. 1908. P. 285]* ইহার বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র বর্ণিত হইবে। স্থূলত এ জেলায় (১) বাজে জমা আদায় (২) নূতন জরিপ প্রণালী (৩) বৃদ্ধি জমায় কবুলিয়ত গ্রহণের চেষ্টা, (৪) আদালত কর্তৃক উক্ত কবুলিয়ত অসিদ্ধ সাব্যস্ত প্রভৃতি কারণে এই জেলার রায়তগণ, বিশেষত ইউসুপসাহি পরগণার জমিদারদিগের খাজনা আদায়ে একেবারে অস্বীকৃত হয়। "হুরাসাগর তীরস্থ বেতকান্দি গ্রাম লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারদিগের সহিত তাঁহার (দৌলতপুর নিবাসী ঈশানচন্দ্র রায়) ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। কিন্তু তাঁহারা প্রবল ও ধনবান জমিদার কিছুতেই দম্য নহেন সুতরাং ঈশানচন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বিদ্রোহী দলের সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে তাহাদের নেতা হইলেন। *[সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত "আশালতা" ৯/১০ সংখ্যা, ১৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]* সাধারণত দেশের রায়তগণ একটি পলো ও একখানা লাঠি লইয়া মাছ ধরিবার ছলে একত্রিত হইত এবং (মহিষের) শিঙ্গা বাজাইয়া লোককে আহ্বান করিত। তজ্জন্য এই বিদ্রোহ এ জেলায় "পলো বিদ্রোহ" নামেও পরিচিত, যে গ্রামের লোক তাহাদের দলে যোগ দিত, তথায় কোন উপদ্রব হইত না, যাহারা যোগ দিতে না, সেখানে অত্যাচার হইত। দলপতিগণ সময় সময় নজর সেলামীও পাইতেন ; ঈশানচন্দ্র বিদ্রোহীর রাজা বলিয়া অভিহিত হইতেন। লুঠপাট বিদ্রোহী দলের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল বৃদ্ধি খাজনা আদায়ে বাধা প্রদানই তাহাদের লক্ষ্য ছিল এবং এই মর্মে তাহাদের অনেকে প্রায় ২৬৯ খানি গ্রামের অধিবাসী সিরাজগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি, নোলীন-এর নিকট আবেদন করিয়াছিল। ক্রমে ১২৮০ সালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে একটি দলে দুষ্ট লোক সমূহ যোগদান করিয়া স্থানে স্থানে লুঠতরাজ আরম্ভ করে এবং অবশেষে গবর্নমেন্টের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। অতিরিক্ত পুলিশ ও সামরিক পুলিশের বন্দোবস্ত এবং কুষ্টিয়ার ১০০ রিজার্ভ পুলিশ রক্ষিত হয়। ঈশানচন্দ্র রায় মহাশয় ধৃত হইয়া পরে বিচারে মুক্তিলাভ করেন। অন্যান্য মোট ৩০২ জন অপরাধীর এক মাস হইতে দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। বঙ্গের তৎকালীন ছোট লাট স্যর জর্জ ক্যাম্বেল সাহেব মহোদয়ের আদেশে রায়ত ও জমিদারগণের উপর শান্তভাব ধারণ ও স্বীয় স্বীয়

স্বত্বরক্ষা কল্পে আইন সঙ্গত বৈধ উপায় অবলম্বন করিবার জন্য সরকারি অনুরোধপত্র প্রচারিত হয়, ফলে ধীরে ধীরে প্রজাগণ শান্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৩/৪ বৎসর খাজনা আদায় বন্ধ থাকার জন্য বহু বাকি খাজনার মোকদ্দমার ও ১৮৭৬ সালের দুর্ভিক্ষের সূচনায় রায়তগণ ক্রমে শান্তভাব ধারণ করে।

স্বায়ত্ব শাসন ঃ

১৮৬৯ অব্দে সিরাজগঞ্জে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ অব্দে পাবনায়ও মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া তখন হইতে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পরিষ্কারের বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। ১৮৮৫ অব্দে এই জেলায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রবর্তিত হয়, তখন হইতে জেলার মফঃস্বল রাস্তাপথ নির্মিত হইতে থাকে। ১৮৮৫ অব্দে পাবনা সদরে সিভিল সার্জন নিযুক্ত হন এবং দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়।

পূর্বে রাজশাহীর সেসন জজ পাবনায় আসিয়া দায়রা মোকদ্দমার বিচার করিতেন, ১৮৭৯ অব্দে পাবনায় জজ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইলে, সর্বপ্রথমে পাবনা ও বগুড়া জেলার জন্য Mr. A. W. Cochram ডিঃ ও সেসন জজ নিযুক্ত হন এবং ১৮৮৪ অব্দে ১,৯২,৫৮৩ টাকা ব্যয়ে পাবনার বর্তমান জজকোর্ট বিল্ডিংস নির্মিত হয়।

১৮৮৭ অব্দে ইংলন্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৫০ বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ হইলে জুবিলি উপলক্ষে পাবনার স্থানীয় জেলখানা হইতে কতকগুলি কয়েদি মুক্তি পায় ও সহর আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়। এই সময়ে পাবনা মিউনিসিপ্যালিটির উদ্যোগে পাবনার ধনাঢ্য নাগরিক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ প্রামাণিক মহাশয়ের অর্থে খনিত সুবৃহৎ পুষ্করিণী "জুবিলি ট্যাঙ্ক" নামে অভিহিত হয়। ইহাই এক্ষণে পাবনা শহরে একমাত্র প্রধান পানীয় জলাশয়। এই প্রকার আইন আদালত প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই জেলায় আধুনিক শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে।

১৮২৮ অব্দের ১৬ অক্টোবর হইতে ১৯০৫ অব্দের ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত পাবনা জেলা রাজশাহী বিভাগের মধ্যে বঙ্গের কলিকাতা রাজধানীর অধীন ছিল। শেষোক্ত অব্দে বঙ্গভঙ্গের পর, ইহা পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ঢাকা রাজধানীর অধীনে আসে। তখন হইতে ৩০ আশ্বিনে অরন্ধন, রাখী বন্ধন, বিলাতী বর্জন কল্পে সভাসমিতির অধিবেশনাদি স্বদেশী আন্দোলন ফলে ১৯১১ অব্দে ১২ ডিসেম্বর তারিখের দিল্লিদরবারের ঘোষণার পর পাবনা পুনরায় কলিকাতা রাজধানীর অধীনে আসিয়াছে। এই স্বদেশী আন্দোলনকালে সিরাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ বক্তা ইসমাইল সিরাজি সাহেব স্বদেশী আন্দোলন ও "অনলপ্রবাহ" নামক বিদ্রোহাত্মক পুস্তক প্রচারের অভিযোগে দুই বৎসর জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পর ইনি তুরস্কে গিয়া তথাকার সুলতান কর্তৃত পুরস্কৃত ও সম্মানিত হন। ১৯১২ অব্দে হইতে দেশে বিপ্লববাদিগণের গুপ্তহত্যা আরম্ভ হইলে এ জেলায় কোনরূপ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় নাই, কিন্তু অন্যান্য জেলার বিপ্লববাদীদিগের মধ্যে ঢাকার ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় সিরাজগঞ্জের শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় মহাশয় ও নদীয় প্রায়াগপুর ডাকাইতি সংস্রবে খলিলপুরের ও পাবনার কেহ কেহ দণ্ডিত হয়, ১৯১৪ অব্দে জার্মান যুদ্ধের পর ষড়যন্ত্রকারিগণের সংশ্লিষ্ট বলিয়া পাবনা কলেজের একটি ছাত্র ও রাধানগর স্কুলের জনৈক শিক্ষককে সন্দেহপ্রযুক্ত যথাক্রমে নোয়াখালি ও মালদহে অন্তরীণ বা নজরবন্দি রাখা হয়। ১৯১৩ অব্দে রায়গঞ্জ থানার অধীন তেলিজানা ঘুরকা অঞ্চলের দুই জন যুবক ১৯১৫ অব্দের Defence of India Act অনুসারে পাবনার স্পেশাল, ট্রিবিউন্যালের বিচারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ১৯১৬/১৭ অব্দে এই জেলার হিন্দু মুসলমান অনেকে বসোরা মেসোপটোমিয়ায় ভারত-সম্রাটের পক্ষে সৈন্য স্বরূপে এবং কেহ ডাক্তার ও চিকিৎসকরূপে গমন করে।

১৯১৯ অব্দের নূতন সংশোধিত ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রবর্তন ফলে দেশে যে

অসহযোগ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তৎপ্রসঙ্গে এই জেলায়ও খদ্দর ব্যবহার, চরকা ও স্বদেশীদ্রব্য প্রচার এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিবারণ ও বিলাতি বর্জন উপলক্ষে বেড়া, সুজানগর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অনেক স্থানের স্বেচ্ছাসেবকদলের অনেকের পিকেটিং ও বক্তৃতা প্রসঙ্গে কারাদণ্ড হইয়াছে। পরিশেষে বিগত ১৯২২ অব্দের ২৭ জানুয়ারি তারিখে পুলিশের গুলিতে উল্লাপাড়া থানার অধীন সলঙ্গা হাটের হত্যাকাণ্ড উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ শাসনকালে দেশের অবস্থা ঃ

১. শান্তি ঃ

মুসলমান অধিকারের অবসান ও ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে বঙ্গে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ও মাৎস্যন্যায় উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে দেশে দুর্বলের প্রতি প্রবলের যে অত্যাচার সংঘটিত হইতে থাকে, ইংরেজ-শাসনে নানারূপ বিধি ব্যবস্থার ফলে তাহা অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছে। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের হেডপণ্ডিত এই জেলার গোয়ারিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল গুপ্ত মহাশয়ের "মধুকৃপা" নামক পুস্তিকাংশে লিখিত আছে যে "আমাদের দেশ ডাকাইত পূর্ণ ছিল। এতদঞ্চলে ৭৫ বৎসর পূর্বে (এ জেলায়) গামছা-মোড়ার এতদূর উপদ্রব ছিল যে, পাঁচটি টাকা লইয়া নাজিরগঞ্জ (সুজানগর) যাওয়া যাইত না।" অধুনা দেশের দস্যু তস্করের ঈদৃশ অত্যাচার বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে; দেশের লোক সুখশান্তিতে বাস ও নিশ্চিন্তমনে সর্বত্র গতায়াত করিতেছে। চোর ডাকাইতের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দেশ এইরূপে ক্রমশ শান্তিময় হইয়াছে কিরূপে পাবনায় শান্তি স্থাপিত হয়, তাহা অন্যত্র বিস্তারিত লিখিত হইল।

২. শিক্ষা ঃ

কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দী কাল পূর্বে এই জেলায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্যকায়স্থাদি হিন্দু জাতি এবং মুষ্টিমেয় কাজি মুফ্‌তি ও মৌলবি ব্যতীত অন্যান্য জাতিগণ মধ্যে শিক্ষার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইত না। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই জেলার নানাস্থানে নানাবিধ স্কুল ও পাঠশালা স্থাপন বা তাহা স্থাপনে সহায়তা হইয়াছে এবং দেশের তিলি মালি তন্তুবায়াদি নবশাক ও ঝল্লমল্ল বৈশ্যশূদ্রাদি সর্ব বর্ণের মধ্যে এই জেলায় অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পোতাজিয়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু, পাবনার শ্রীযুক্ত নবগৌরাঙ্গ বসাক, দোগাছির শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সরকার, সাতবাড়িয়ার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র হালদার, হাটবয়রার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সাহা প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। মুসলমান সমাজে শাহজাদপুর অঞ্চলেও অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনয়নে নিযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবি আবদাস সোভান এম. এস সি, এবং শাহজাদপুরের অনেক এম. এ. বিএ. উপাধিধারী মুসলমান ভদ্রমহোদয়গণের নাম উল্লেখ করা যায়। এতদ্ব্যতীত ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার কবিরাজ, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি স্বরূপে হিন্দু মুসলমান সমাজে ও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বর্তমান আছেন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমানাদি সমাজের উচ্চ ও নিম্ন সর্বশ্রেণী মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার ইংরেজ রাজত্বকালের প্রধান কীর্তি ও বিশেষত্ব।

৩. ধর্ম স্বাতন্ত্র্য ঃ

প্রথম পাঠান আমলে কথঞ্চিৎ বলপূর্বক পরে মোঘল আমলে রাজস্ব আদায় নিমিত্ত বা বিদ্রোহিতার অপরাধ মুক্তিকল্পে এদেশের হিন্দুগণকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে। আমিনপুরের মিঞাগণের উৎপত্তি ও শাহজাদপুরের রঘু রায়ের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ

তাহার দৃষ্টান্ত। ইংরেজ আমলে তাহাদের এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাজানুগৃহীত খ্রিস্টান মিশনারিগণের অব্যাহত প্রচারকার্য এই জেলার সর্বত্র প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহাকেও খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করিতে হইয়াছে এমত জানা যায় না। ধর্ম বিষয়ে সর্বজাতির এই স্বাধীনতাই ইংরেজ শাসনকালের অন্যতম বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব।

৪. রাজ পদ প্রাপ্তি ঃ

হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালের ন্যায় একালেও পাবনা জেলার সদর স্টেশন নাটোরে অবস্থিত থাকা সময়ে ১৮০৮ অব্দে এই জেলার দুলাই নিবাসী রহিমদ্দিন মুন্সি ও তাঁতিবন্দ নিবাসী উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী যথাক্রমে ৪০ ও ৬০ টাকা মাসিক বেতনে পেসকার ও সেরেস্তাদার নিযুক্ত ছিলেন জানা যায়। তখন হইতে ইদানিন্তন কালে হরিপুরের চৌধুরী বংশীয় স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের মাসিক ৪০০০ টাকা বেতনে হাইকোর্টের জজিয়তি এই জেলার অধিবাসীগণের ইংরেজ আমলের উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইবার প্রমাণ।

৫. শিল্প বাণিজ্য ঃ

ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় দেশিয় শিল্প বাণিজ্যের অশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং দেশিয় শিল্পী কারিকরগণ অনেকে স্বীয় জাতীয় ব্যবসায়াদি পরিহারপূর্বক ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিলেও পাবনা জেলা মধ্যে এখনও হিন্দু সমাজের তন্তুবায়, কাপালিক, যোগীলাহারু প্রভৃতি এবং মুসলমানগণ মধ্যে কারিকর (জোলা), নীলকসানে প্রভৃতি জাতিগণ এই জেলার সমুদয় অধিবাসী সংখ্যা মধ্যে এক চতুর্দ্দশাংশ বলিয়া জানা যাইতেছে; দেলুয়া, কৈজুরী, একদন্ত সুজানগর প্রভৃতি বস্ত্রশিল্পপ্রধান হাট এবং শাহজাদপুর ও পাবনা দোগাছি অঞ্চলের অনেক বস্ত্রবয়নকারি শিল্পীর বাস আছে। নীলকুঠির কার্য আমলে এই জেলার অনেক স্থানে নীলের কাজ হইত। অন্যান্য স্থানের কুঠির চিহ্ন কেবলমাত্র উচ্চ ঝাউ গাছে বিদ্যমান থাকিলেও, পাবনা মাঝিপাড়া কুঠি এখনও সম্পূর্ণ বর্তমান রহিয়াছে। এই জেলায় বাণিজ্য ব্যবসায় বৈশ্যজাতি সর্বত্র অল্প বিস্তর বর্তমান আছে। এই জেলার হাটবাজার বন্দরাদিতে ব্যবসায়ের উন্নতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এই জেলা ইংলন্ডের ন্যায় ত্রিভুজ আকার এবং ইহারও পূর্বে সুবিশাল যমুনা ও দক্ষিণে পদ্মা (গঙ্গা), মধ্যস্থলে বরল করতোয়া (ফুলঝোর) আদি নদী নালা প্রবাহিত থাকায় বাণিজ্য হিসাবে নদীপথে পাবনা সর্বত্র গতায়াতে সুগম ; সিরাজগঞ্জ পূর্ববঙ্গের অন্যতম প্রধান বন্দর ; এমন কি একসময়ে এথাকার সর্বপ্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বৈদেশিক এ. বেরী সাহেব এই স্থানের বাণিজ্যের মোহে সরকারি চাকরি ইস্তফা দিয়া পাটের ব্যবসায় অবলম্বন করেন ; কালে তাহা হইতেই সিরাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ চটকলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এথাকার বাণিজ্য সমৃদ্ধি হেতুই সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেলপথ নির্মিত হইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িগণের অশেষ সুবিধা হইয়াছে।

৬. সামাজিক ঃ

বিলাত যাত্রা ও ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণে ভারেঙ্গার চক্রবর্তী ও হরিপুরের চৌধুরীগণ প্রথম পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। তাঁতিবন্দর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রমোহন চৌধুরী ও হাসামপুরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়দ্বয় প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি আমেরিকাদি বিদেশগমনে সামাজিক উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যাহারা বর্তমান ইংরেজ রাজত্ব সময়ে প্রবর্তিত ও নবপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ঘোড়াচরা নিবাসী স্বর্গীয় গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় ও পাবনা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়দ্বয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। আজকাল শহর বাজারে পাওরুটি সর্বত্র ব্রাহ্মণাদি সর্বোচ্চ জাতির হাতে ও বাক্সে স্থানলাভ করিতেছে ; সোডা, লেমনেড অবাধে সর্বজাতির মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

৭. স্বায়ত্ত শাসন ঃ

পূর্বেও দেশে বৈদ্যকবিরাজ ছিল। কিন্তু আজকাল জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির প্রবর্তনে জেলার মফঃস্বল ও সদরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হওয়ায় লোকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। জেলা বোর্ডের সাহায্যে কলেরা ও ম্যালেরিয়া আক্রান্ত পল্লীতে ডাক্তার প্রেরণের ব্যবস্থা এবং জেলার সর্বত্র পানীয় জলের ব্যবস্থায় লোকের কথঞ্চিৎ সুবিধার সূত্রপাত হইয়াছে। জেলা বোর্ড হইতে রাস্তাপথ সেতু নির্মাণ এবং খোঁয়াড় ও খেওয়ার সুবন্দোবস্তে লোকের অশেষ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

৮. বিবিধ ঃ

অন্যান্য সুবিধা মধ্য ডাকবিভাগ ইংরেজ রাজত্বের অন্যতম প্রধান কীর্তি। রেল স্টিমার আদির দেশে প্রসার দ্বারাও দেশিয় লোকের অনেক কল্যাণ হইয়াছে। এইরূপে ইংরেজ আমলে বিচার বলে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা, শাসন কৌশলে অশান্তি নিবারণ, স্কুল কলেজে সুশিক্ষার প্রচলন, যোগ্যতর ব্যক্তির উচ্চরাজ কার্যে নিয়োগ এবং স্বায়ত্বশাসন বিস্তার ফলে দেশের লোক সুখশান্তিতে বাস করিতেছে।

বর্তমানে দেশের লোক শান্তিতে বাস করিলেও, লোকের অনেক বিষয়ে অবনতি ঘটিতে দেখা যাইতেছে। যথা—

(ক) শারীরিক ঃ বাল্যকাল হইতে দশটার সময় আহারান্তে স্কুল কলেজ ও অফিসাদিতে তাড়াতাড়ি গমনাগমন হেতু লোকের শারীরিক স্বাস্থ্যের অনেক অবনতি ঘটিতেছে। পূর্বে ডেমড়া, কাশীনাথপুর, শঙ্করপাশা প্রভৃতি গ্রামে সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারে যেরূপ দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও শ্রমশীল ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত, আজকাল নব্য "বাবুগণ" মধ্যে সেরূপ পরিশ্রমী ও কর্মঠ ব্যক্তি কেহই নাই। রাত্রিতে কেরোসিন তৈলের প্রদীপ ও আলো এবং দিবারাত্র স্টিল পেন ও নিবযুক্ত কলমের সাহায্যে লেখাপড়ার চর্চায় লোকের শীঘ্র শীঘ্র দৃষ্টিশক্তির হ্রাস ঘটিতেছে এবং চশমাধারীর সংখ্যা দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

(খ) বিদেশ গমন প্রবৃত্তি ঃ ইংরেজ রাজত্বকালে অনেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন ; কিন্তু ইংরেজগণ সর্বত্র আপন কার্যক্ষেত্রকে স্বর্গতুল্য নির্মাণ করিলেও স্বদেশ ও জন্মভূমির প্রতি প্রীতিহীন নহেন ; আমাদের জেলার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ জন্মভূমি ও স্বদেশের প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করিতেছেন না ; এই প্রকারে স্বদেশে পুষ্টিলাভ করিয়া দেশের কৃতি সন্তানগণ স্বীয় উন্নতি সহকারে মাতৃভূমির অঙ্কচ্যুত হওয়ায় জননী জন্মভূমি পুত্রবতী হইয়াও বন্ধ্যা দশা প্রাপ্ত হইতেছেন। আবাল্য পাবনার অন্নে প্রতিপালিত পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয় কলিকাতায় সৌধমালা নির্মাণ করিলেও পাবনায় তাঁহার ভদ্রাসন বাটি পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পৈত্রিক বাসস্থান ক্রমে বন্য বরাহ শার্দুলাদির শিকার ভূমিতে পরিণয় হইতেছে। পূর্বে পোতাজিয়া, অষ্টমনীষা, তাড়াসাদি গ্রামের "রায়" উপাধিক কায়স্থ ভদ্রমোহদয়গণ উচ্চরাজ কার্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশে নবরত্নাদি দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও দীঘি পুষ্করিণী আদি খননে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতেন, এক্ষণে সকলেই বিলাসিতার লীলাভূমি কলিকাতাবাসী হইতেছেন। পূর্বের অন্তর্মুখীন শিক্ষা অপেক্ষা, বর্তমানের বহির্মুখীন শিক্ষায় দেশ মাতৃকার সবিশেষ ক্ষতি হইতেছে। একমাত্র স্থলের পাকড়াশি ও ভারেঙ্গার চৌধুরীবাবুগণ ব্যতীত এই জেলার ভদ্র পরিবারবর্গ মধ্যে কেহই স্বগ্রামের উন্নতি প্রয়াসী নহেন। দেশের শিক্ষিত লোকের চাকরি-প্রিয়তা ও বিদেশ-বাসের ফলে, সামাজিকতা ও পল্লীবাসের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তর্ধানে জাতীয়তার উন্মেষ হইতেছে না। দেশের লোকে এই প্রকারে ক্রমশ আপনাপন ভদ্রাসন পরিত্যাগ করায় প্রতি পল্লী জঙ্গলে পরিণত হইতেছে। দেশের কৃতি সন্তান ও সুপুত্রগণ ভিন্ন স্থানে যাইতেছেন, অথচ ম্যালেরিয়া বেচারির ঘাড়ে যত দোষারোপ চাপিতেছে।

(গ) ব্যয় বাহুল্য ঃ ইউরোপীয় বিলাসিতায় ও চাকচিক্যের মোহে লোকের নানারূপ ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু এদেশের লোক বৈদেশিকগণের ন্যায় পরিশ্রমী ও কলকৌশলে অর্থোপার্জ্জনে বিমুখ ও নিশ্চেষ্ট ; তন্নিমিত্ত ইংরেজ আমলে দেশের লোক সুখ ও শান্তিতে বাস করিলেও, সর্বসাধারণের অভাব বৃদ্ধিহেতু সকলের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সহজে নিবাকরণ হইতেছে না। এ জেলার অধিকাংশ জমিদার ও মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারবর্গের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নহে ; কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী জাতি ও স্থল বিশেষে কৃষিজীবী লোকের সাংসারিক অবস্থা কথঞ্চিৎ উন্নত, তাহারাই সুখী, সমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যবান।

তথ্যসূত্র

১. *"বঙ্গদেশে ইতিহাস চর্চা।" সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩০৬ সাল।*
২. *"ইতিহাস চর্চা প্রণালী" প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২২ সাল।*
৩. *The Early History of India by Vincent A. Smith. P--30*
৪. *Bengal District Gazetter, Mymensing—1917. P -23.*
৫. *Indo Aryan, Vol. II. P–235.*
৬. *অঙ্গোবঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।*
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনাম কথিতা ভুবি।। ৫৩
মহাভারত, আদিপর্ব, ১০৪ অধ্যায়।
৭ *"বিবিধ প্রবন্ধ" অনার্য বাঙালি শীর্ষক প্রস্তাব।*
৮. *"বরেন্দ্রভূমি" সাহিত্য, ভাদ্র ১৩০৯।*
৯. *"বরেন্দ্রভূমি" সাহিত্য, ভাদ্র ১৩০৯।*
১০. *সাহিত্য, ভাদ্র ১৩০৯।*
১১. *J A S. of Bengal May 1008.*
১২ *School History of India. P. 12*
১৩. *সাহিত্য, আশ্বিন, ১৩০৬।*
১৪ *বগুড়ার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।*
১৫. *"বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত" ১৫৯/১৬০ পৃষ্ঠা।*
১৬. *"বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত" ১৬০ পৃষ্ঠা।*
১৭. *"প্রবাসী" কার্তিক, ১৩১৬ সাল।*
১৮. *"বাঙ্গালার ইতিহাস", ১ম ভাগ, ১০৪—১০৬ পৃষ্ঠা।*
১৯. *কোন কোন সামাজিক গ্রন্থে এই ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।*
২০. *"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্যকাণ্ড।*
২১ *"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্যকাণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।*
২২. *"বাঙ্গালার ইতিহাস" ১৫৩ পৃঃ।*
২৩. *"বাঙ্গালার ইতিহাস" ১৭৫ পৃষ্ঠা।*
২৪. *"গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ" ৮১ পৃষ্ঠা।*
২৫. *"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্যকাণ্ড, ১৯৩—১৯৬ পৃষ্ঠা।*
২৬. *"গৌড়রাজমালা" ভূমিকাংশ, ॥০ পৃষ্ঠা।*
২৭. *"বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" ১৫২।১৫৩ পৃষ্ঠা।*
২৮. *"যষ্ঠিধর গুপ্ত বংশাবলী" ১২২ পৃষ্ঠা।*
২৯. *"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্যকাণ্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা।*

৩০. *The Early History of India. P. 420.*
৩১. *The History of the Bangali Language P. 50—52 দ্রষ্টব্য।*
৩২. *"হিন্দুবিজ্ঞানসূত্র" ফাল্গুন, ৫ম সংখ্যা ১৩০৪ সাল। ৪।৫ পৃষ্ঠা।*
৩৩. *The Journal, Asiatic Society of Bengal vol, LXXIII Part I. (1904)*
৩৪. *"বগুড়ার ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড ৮৬ পৃষ্ঠা।*
৩৫. *"ভবানীপুর কাহিনী" ৯৫ পৃষ্ঠা।*
৩৬. *"বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" ৫২।৫৩।৫৪ পৃষ্ঠা।*
৩৭. *Bengal District Gazetteer, Rajshahi : —1916 P. 29. 30.*
৩৮. *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। ৫১ পৃষ্ঠা।*
৩৯. *বিবিধ প্রবন্ধ।*
৪০. *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। ১৫৫ পৃষ্ঠা।*
৪১. *"গৌড়ের ব্রাহ্মণ।" শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ১১৬ পৃষ্ঠা।*
৪২. *বাঙ্গালার স্বাধীন জমিদারের পতন। প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯ সাল।*
৪৩. *Aynee-Akbari (Blockman.) P. 431.*
৪৪. *ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড ৬৬/৬৭ পৃষ্ঠা।*
৪৫. *"বাঙ্গালার ইতিহাস" বিবিধ প্রবন্ধ।*
৪৬. *ইংরেজ আমলের প্রাক্কালেও একজন পণ্ডিত ডাকাইতের নাম জানা যায়।*
৪৭. *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, ১৩৬—১৩৮ পৃষ্ঠা।*
৪৮. *"বেণী রায়" ১৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।*
৪৯. *"Protap of Bengal" Modern Review, March, 1923, P. 316.*
৫০ *The Sier Mutaqherin vol III P. 160.*
৫১ *Bengal District Gazetteer Rajshahi, 1916. P. 36*
৫২ *"বাঙ্গালার ইতিহাসে বৈকুণ্ঠ।" সাহিত্য—মাঘ—১৩০৪ সাল।*
৫৩. *বগুড়ার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীপ্রভাস চন্দ্র সেন প্রণীত। ১২৯ পৃষ্ঠা।*
৫৪. *রাণীভবানী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।*
৫৫ *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। ৩৪৭—৩৪৯ পৃষ্ঠা।*
৫৬. *"বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল" ৭৪।৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।*
৫৭ *"বাঙ্গালার ইতিহাস" বিবিধ প্রবন্ধ।*
৫৮ *"বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল।" ৫৪ পৃষ্ঠা।*
৫৯. *পুণ্যাহপ্রথা পূর্বে এদেশে প্রচলিত ছিল না। কথিত আছে, "মুরশিদকুলি খাঁ প্রতি বৎসরের বৈশাখ মাসে দিল্লিতে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন, তদুপলক্ষে নূতন বৎসরের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য জমিদারদিগকে লইয়া 'পুণ্যাহ' করিবার এক অভিনব নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পুণ্যাহ দিনে সকল জমিদারকেই স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি পাঠাইয়া জগৎ শেঠের বাটিতে উপস্থিত থাকিয়া পূর্ববৎসরের রাজস্ব পরিশোধ করিয়া দিতে হইত. কপর্দক বাকি থাকিতে এবং সেই বাকি সঙ্গত কারণে মাফ না পাইলে কেহই নূতন বৎসরের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা পাইতেন না।"*
৬০. *"সিরাজ-উদ্দৌলা" অক্ষয়কুমার মৈত্র কৃত। ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা।*
৬১. *Appendix to Fifth Report from the select Committee. P 686*

। দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

পাবনা জেলার ইতিহাস
তৃতীয় খণ্ড

পাবনা জেলার ইতিহাস।

তৃতীয় খণ্ড।



শ্রীরাধারমণ সাহা বি, এল,

প্রণীত ও প্রকাশিত

পাবনা।

(১৩৩৩)

পাবনা সারদা প্রেসে
শ্রীকমলাকান্ত মুখার্জ্জি কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ—১০০০—১৩৩৩ সাল।

মূল্য—দেড় টাকা মাত্র

নিবেদন

ভগবানের আশীর্বাদে পাবনা জেলার ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডও পাবনাতেই মুদ্রিত হইল, মফঃস্বল প্রেসে ছাপা, মদীয় ও ছাপাখানার যথাসাধ্য প্রুফ সংশোধনের চেষ্টা সত্ত্বেও পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে ; আশা করি, পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্বক পুস্তকের এই ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদে, মসজিদ ও মন্দির, প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপ বিগ্রহাদি, জলাশয়, রাজবর্ত্ম এবং প্রাচীন সনন্দ ও দলিলাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। জমি জমা ও জমিদারগণের বিবরণ সম্বলিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিচ্ছেদ চতুষ্টয়ে এই জেলার জমি জমায় প্রজার স্বত্ব, খাজনাদির বিবরণ, প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ, প্রজা বিদ্রোহ, তাহার কারণ, প্রকাশ ও দমন প্রভৃতি এবং জেলাবাসী কয়েকটি প্রধান প্রধান জমিদার বংশের স্থূল বিবরণ এবং ভিন্ন ভিন্ন জেলাবাসী প্রধান প্রধান কয়েকজন ভূস্বামিগণের কেবলমাত্র নামের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

অন্যান্য জেলার ন্যায় পাবনায় একেবারেই অতি প্রাচীন কিছুই নাই এমন বলা যায় না। এখানে যে সকল পুরাতন মসজিদ ও মন্দিরের পরিচয়, প্রাচীন দলিলাদির প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তৎসমুদয় সম্যক আলোচিত হয় এবং তৎপ্রতি দেশের পুরাকীর্তি কাহিনী আলোচনাপ্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, এই পুস্তক খণ্ডে কেবল তাহারই প্রয়াস পাইয়াছে ; প্রকৃত কার্যভার দেশের সুযোগ্য ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপর ন্যস্ত রহিল। মদীয় উদ্যম কেবল পথ প্রদর্শন নিমিত্ত মাত্র।

এই জেলার প্রজা ও ভূম্যধিকারী মধ্যে সম্বন্ধও কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। ১৮৭২/৭৩ অব্দে এই জেলার প্রজা বিদ্রোহ আধুনিক কালের প্রধানতম ঐতিহাসিক ঘটনা। ইহারই ফলে বঙ্গে ১৮৮৫ অব্দের "প্রজাস্বত্ব বিষয়ক" আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। এই বিদ্রোহ সম্বন্ধীয় এই জেলায় প্রচলিত কতকগুলি ছড়া ও কবিতা সম্বলিত বিস্তারিত বিবরণ ও সিরাজগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট প্রদত্ত হইয়াছে।

পাবনা জেলাবাসী কয়েকটি জমিদার বংশের স্থূল বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ইহাতে জানা যায় নাটোর রাজপরিবার হইতেই ইহাদের অনেকের উৎপত্তি হইয়াছে। তৎপূর্বে পাবনার যাবতীয় ভূসম্পত্তি সাঁতৈল ও ভাতুরিয়া রাজবংশের অধিকারভুক্ত ছিল। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান জমিদারের সংখ্যা এই জেলায় অতি বিরল। বেলকুচির চৌধুরীবংশ ও দুলাই চৌধুরীবংশীয় মুসলমান জমিদারগণ এক সময়ে সাতিশয় প্রসিদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ভূস্বামিগণের বিবরণ প্রসঙ্গে অনেক স্থলে সত্যানুরোধে অপ্রিয় কাহিনীর অবতারণা করিতে হইয়াছে। কাহার মনস্তুষ্টি জন্য বা কাহারও অযথা নিন্দাবাদ সাধারণে প্রচার জন্য ইহাতে কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই। সত্য বলিয়া যাহা বিশ্বাস করিয়াছি, তাহাই অকপটে চিত্তে সরলভাবে বিবৃত করিয়াছি।

পাবনা — বিনয়াবনত—

১৩৩৩ সাল ২২ জ্যৈষ্ঠ — শ্রীরাধারমণ সাহা

উৎসর্গ পত্র।

জেলার

দেশীয় ও বিদেশীয়,

হিন্দু ও মুসলমান

অধিবাসিগণের

করকমলে

পাবনা জেলার ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

সাদরে অর্পিত

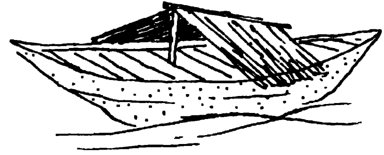
হইল।

১৩৩৩

বিনীত—

গ্রন্থকার

প্রথম অধ্যায়



প্রত্নতত্ত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ—মসজিদ ও মন্দির

১. মক্‌দুম্ সাহেবের মসজিদ ঃ

শাহ্‌জাদপুরে বহু দিন হইতে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে; উহা সাধারণত মক্‌দুম্ সাহেবের দরগা বাড়ি নামে পরিচিত। ইহার গঠনপ্রণালী ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অবস্থা দৃষ্টে ইহার প্রাচীনত্ব সহজে উপলব্ধি হয়। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইস্টক নির্মিত ও ১৫টি গম্বুজ বিশিষ্ট; অভ্যন্তরে ও সম্মুখভাগে সর্বসমেত ২৮টি প্রস্তর স্তম্ভের উপর অবস্থিত। মধ্যস্থলের একটি মাত্র স্তম্ভ ভিন্ন সমুদয় স্তম্ভগুলি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত; মধ্যস্থলের স্তম্ভটির প্রস্তর লোহিতবর্ণ। স্তম্ভটিকে স্পর্শ করিলে বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা নারীর সুপুত্রলাভ হয়, বহুদিন হইতে সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস থাকায় নানাস্থান হইতে বহু হিন্দু ও মুসলমান স্ত্রীলোক এখানে সমবেত হইয়া থাকে। সমুদয় মসজিটির দৈর্ঘ্য ৬২ ফুট ৯ ইঞ্চি, প্রস্থ ৪১ ফুট সাড়ে ৩ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ১৯ ফুট ১০ ইঞ্চি।

ভিতরে দক্ষিণ দেওয়াল গাত্রে একটি খোদিত চিহ্ন আছে; অনেকে উহা মসজিদ নির্মাণের সময় জ্ঞাপক বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু ইহা হিন্দি ভাষার ছয় সংখ্যা বাচক অক্ষরের ন্যায়; অদ্যাপি উহার প্রকৃত পাঠ নিরুপিত হয় নাই। অপর দেওয়াল গাত্রে প্রস্তরে খোদিত একটি খোদিত রেখা দেখিতে পাওয়া যায়; বর্তমান সময়ে উহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ ত্রিশ ইঞ্চি। প্রবাদ উহা মক্‌দুম্ সাহেবের হাতের পরিমাপ। ঐ হাতের মাপ তাঁহার সময়ে এতদঞ্চলে প্রচলিত ছিল। বর্ণিত আছে যে, "Most of the revenue free mahals situated in Sirajganj are small. Many of them are reported to be connected with the history of one Makdum shahib whose cubit was the unit of measurement in the Paragna Yusupshahi, until the Zamindars introduced short measure. *[Hunter's Statistical Account of Bengal, Bogra and Pabna, vol. X. P. 316]* অর্থাৎ সিরাজগঞ্জের লাখেরাজ তালুকের অধিকাংশগুলিই ক্ষুদ্র; ইহার অনেকগুলি মক্‌দুম্ সাহেবের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত; তাঁহার হাতের মাপ ইউসুপশাহী পরগণায় প্রচলিত ছিল। পরিশেষে জমিদারগণ কম মাপ প্রচলন করিয়াছেন।

মেঝের একস্থানে সামান্য একটি গর্ত আছে; প্রবাদ আছে পূর্বে এখানে আঘাত করিলে সুন্দর আওয়াজ হইত; উহার নিম্নভাগ চুনকাম করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে। মধ্যে পশ্চিম দেওয়াল সংলগ্ন ৫'—২" ইঞ্চি উচ্চ ইস্টক নির্মিত একটি বেদী আছে। বাহিরে সম্মুখভাগে কার্নিসের নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের খোদিত সামান্য কারুকার্য ব্যতীত মসজিদে অন্য কোন প্রকার শিল্পকার্য নাই। মসজিদ মধ্যে বোখারা দেশিয় অনেক জালালী পারাবত বহুদিন হইতে বাস করিতেছে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণে পাকা প্রাচীর যুক্ত পুরাতন গৃহে পাশাপাশি মক্‌দুম্ সাহেব ও

তদীয় ভাগিনেয় খেজনুর সাহেবের সমাধিদ্বয় বিরাজমান আছে। এতদ্ব্যতীত মসজিদের দক্ষিণে ১২ জন দরবেশ ও ৬ জন আউলিয়ার সমাধি রহিয়াছে। মক্দুম্ সাহেবের অনুচরবর্গের স্তূপীকৃত সমাধি "শিরকবর" নামে খ্যাত হইতেছে। বর্তমান সময়ে নিকটবর্তী ও গ্রামবাসী মুসলমানগণের মৃতদেহও প্রাঙ্গনে সমাধি দিতে আরম্ভ করায় উহা একরূপ সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

মসজিদের কার্য পরিচালন জন্য ৭২২ বিঘা পরিমাণ জমি সরকার হইতে নিষ্কর নির্দিষ্ট আছে। খেজনুর সাহেবের বংশধরগণ অদ্যাপি তাহা ভোগদখল করিতেছেন। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের পাবনা কালেক্টরির ২৭নং রোবকারি দ্রষ্টব্য।

প্রতিবৎসর বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে মসজিদ প্রাঙ্গণ পার্শ্বে একটি মেলা বসিয়া থাকে। পূর্বে ঐ মেলা মাসাধিককাল স্থায়ী হইত, অধুনা মাত্র সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। মক্দুম্ সাহেবের মৃত্যুদিনের স্মরণার্থ বহুদিন হইতে এই মেলার অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। কাহারও কাহারও মতে উহা হিন্দুরাজার বিজয়োৎসবে প্রথম অনুষ্ঠিত।

মক্দুম্ সাহেবের পরিচয় ঃ

এই মক্দুম্ সাহেব কে এবং তিনি কোন সময়ের লোক, তাহা আলোচনার বিষয়। পাবনা জেলার শাহজাদপুরে এবং পার্শ্ববর্তী রাজশাহী আদি জেলায়ও মক্দুম্ সাহেব বা বাবা মক্দুমের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমত **বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত** লেখক পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন "লক্ষ্মণ সেনের সময়ে মক্দুম্ (মকদম) শাহ জালালউদ্দিন তাব্রেজী গৌড়ে আগমন করেন। তিনি একজন সাধু পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সৌজন্যে হিন্দুগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধীয় নানা গল্প **শেখ শুভদয়া** গ্রন্থে বিবৃত আছে। লক্ষ্মণ সেন তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার প্রতিপালনার্থ বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। ঐ সকল সম্পত্তি "বাইসহাজারি" নামে পরিচিত।" *(বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ২৯৪ পৃষ্ঠা)।*

দ্বিতীয়ত এই জেলার পোতাজিয়া নিবাসী ভবানীনাথ রায় মহাশয়ের লিখিত **হিন্দু বিজ্ঞান সূত্র** পাঠে জানা যায় যে, মক্দুম্ সাহেব পারস্য দেশিয় জনৈক সামন্ত নরপতি। মুসলমান রাজত্বকালে তিনি বহু ধনসম্পত্তি ও আত্মীয়স্বজনসহ ভারতে আগমন করেন। এদেশে আসার পর তিনি সর্বদা ফকিরের ন্যায় কালাতিপাত করিতেন। কালক্রমে বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী গৌড়নগরে উপস্থিত হন। তথায় পোতাজিয়া নিবাসী ভৃগুনন্দীর পুত্র মাধবের বংশধরগণের সহিত তাঁহার ভাগিনেয় খেজনুর সাহেবের পরিচয় হয়। উক্ত খেজনুর সাহেব সময় সময় দুর্গোৎসব উপলক্ষে পোতাজিয়া গ্রামে নৌকা বাইজ দেখিতে আসিতেন। ঐ গ্রামের সৌন্দর্য দর্শনে প্রীত হইয়া কালে তথায় বাস করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মাতুলের অনুমতিক্রমে পোতাজিয়া গ্রামে যে দীঘি খনন করেন, তাহা অদ্যাপি **খোয়াজ দীঘি** নামে পরিচিত।

কালক্রমে মক্দুম্ সাহেবও মুসলমান ধর্ম প্রচার উপলক্ষে এতদ্দেশে আগমন করতঃ এতদঞ্চলে স্থায়ী হন এবং উক্ত সাহাজাদা মক্দুম্ সাহেব স্বীয় নামানুসারে শাহজাদপুর গ্রাম স্থাপনপূর্বক তথায় বর্তমান মসজিদ নির্মাণ করেন। *(হিন্দু বিজ্ঞান সূত্র, ফাল্গুন, ৫ম সংখ্যা ১৩০৪ সাল ৪/৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)*

তৃতীয়ত মৌলবী আবদুল ওয়ালী সাহেব লিখিয়াছেন যে "Hazarat Muazz-ibn-jabal, the king of Yaman in Arabia had two sons and a daughter. One of these Shazadas, Makhdum Shah Daula with the permission of his father left his native land on a religious expedition, for the spread of Islam, consisting of his nephews, Khwaja Kalum Danishmand Khwaja Nur and Khwaja Anwar his sister and large unmber of followers ....After a long and circuitotus

voyage, the missionaries arrived at a place now called Potazia, two miles south of Shahzadpur. The whole country at that time was under water and appeared as a vast ocean. The ships struck on a sandy bed and consequently the expedition could not proceed up. The Bokhara regions used, as usual to leave the ship in the morning and return to them by the evening tide. After a few day's hault the people on board noticed in the feet of the birds fresh clay and sand. On the following day a dingi (boat) was sent towards the flight of the birds and the newly formed *car*, subsequently raised Shahzadpur was discovered. The ships being disentangled and removed, the party landed upon *car* land. Little by little when the water subsided and the little *car* was transformed into an extensive one. On the spot to commemorate the landing, a mosque was built by order of Mokhdum Shaheb."

Antiquitics and Traditions of Shahzadpur.

ভাবার্থ—ইমান শহরের অধিবাসী শাহজাদা মক্‌দুম্ সাহেব পিতার আদেশ ক্রমে ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থ তদীয় ভাগিনেয়ত্রয় এবং অনুচরবর্গাদি সমভিব্যহারে স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। অনেক দিন পর এই প্রচারকগণ বর্তমান শাহজাদপুরের দুই মাইল দূরে পোতাজিয়া নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হন। তথায় তাঁহাদের পোত অবরুদ্ধ হয়, একদিন তাঁহারা পোত হইতে উড্ডীয়মান বোখরা দেশিয় পারাবতের পাদ সংলগ্ন মৃত্তিকা দর্শনে তৎপশ্চাৎ ডিঙ্গি প্রেরণ করেন এবং নূতন চর ভূমিতে অবতরণ করেন। ক্রমশ সলিলরাশি অপসারিত হইলে ক্ষুদ্র চর বৃহৎ ভূভাগে পরিণত হয় এবং তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তথায় মক্‌দুম্ সাহেবের আজ্ঞায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়।

প্রবাদ কালক্রমে তিনি হিন্দুদিগের বিরাগভাজন হন এবং ফলে হিন্দু রাজার সহিত তাঁহার যে যুদ্ধাভিনয় হয়, তাহাতে তিনি ও তদীয় ভাগিনেয়গণ নিহত হন। তদীয় ভাগিনী অপমানিত হইবার ভয়ে যে স্থানে জলাশয়ে ঝম্প প্রদান পূর্বক মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাহা অদ্যাপি শাহজাদপুরে **সতীবিবির খাল** নামে পরিচিত। মক্‌দুম্ সাহেবের অনুচরবর্গের মস্তক একত্র করতঃ যে স্থানে সমাধি দেওয়া হয়, তাহ অদ্যাপি **শিরকবর** নামে অভিহিত হয়।

আবার সিরাজগঞ্জের ভূতপূর্ব ওভারসিয়ার স্বর্গীয় হরিচরণ বসু মহাশয় তথা হইতে প্রকাশিত **আশালতা** নামক মাসিকে লিখিয়াছেন, "মহাত্মা রামশঙ্কর সেনের মতে বোরহান গাজী ও মক্‌দুম্ সাহেব এক ব্যক্তি ; সাহমক্‌দুম্ সাহেব জরিপ করিবার জন্য এখানে প্রেরিত হন। তাঁহার গজ **সেকেন্দরী গজ** বলিয়া খ্যাত। তাঁহার পিতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুলতান সেকেন্দর শাহ্। উহার প্রমাণস্বরূপ তিনি নিম্নলিখিত গীত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

পোড়া রাজা গয়েসদ্দি তাঁর পুত্র সমসুদ্দি
তাঁর পুত্র শাহ সেকেন্দর।
তাঁর বেটা বরহান গাজি খোদাবন্ধ মুলুকের রাজি
কলিযুগে যাঁর অবতার।।

এতদ্দেশে প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, একখানি লাঠি ধরিয়া তাহাতে এক ব্যক্তির নিজ হাতের চারি আঙ্গুলি হিসাবে নিম্নলিখিত ছড়াটি আবৃত্তিসহ মাপ করিতে করিতে যত পরিমাণ দৈর্ঘ্য হয়, তৎপরিমাণ মাপের গজ সেকেন্দর সাহেবের সময়ের এক গজের পরিমাণ ছিল। সমস্ত ছড়াটি আবৃত্তি করিতে একখানি লাঠিতে প্রায় ২২৷৷" ইঞ্চি পরিমাণ দৈর্ঘ্য হইয়া থাকে। এ প্রবাদ বা ছড়াটি এই জেলার অনেক স্থানে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়।

আওরে লকড়ি তোমকো পাকড়ি
কাঁহাসে আয়া কোন লে আয়া

সেখ সেকন্দর লায়া

... ...

উপরোক্ত কয়েকজন মক্‌দুম্ সাহেবের মধ্যে কোন ব্যক্তি শাহজাদপুরের মক্‌দুম্ সাহেব হওয়া সম্ভব, তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ।

সেকেন্দরী গজের প্রবাদ এদেশে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। মক্‌দুম্ শাহ নামক জনৈক ব্যক্তির হাতের মাপও পাবনা জেলায় প্রচলিত ছিল জানা যায়। শাহজাদা (রাজপুত্র) তাঁহার নামের সহিত সংযুক্ত থাকায় এবং তাঁহার নামানুযায়ী কালে শাহজাদপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুলতান সেকন্দরের পুত্র ও মক্‌দুম্ সাহেব এক ব্যক্তি বলা যায়। রাজপুত্রের শেষ জীবনে ধর্মানুশীলন জন্য গাজি আখ্যা হওয়া সম্ভবপর। তবে ভৃগুনন্দীর পুত্রগণের সহিত তদীয় ভাগিনেয় খেজনুর সাহেবের পরিচয় ও সৌহার্দ থাকা জানা যাইতেছে। আবার পরেশবাবুর মতে "মক্‌দুম্ শাহ জালালউদ্দিন" লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক ছিলেন। সুলতান সেকন্দর শাহ লক্ষ্মণ সেনের অনেক পরবর্তী লোক, এমতাবস্থায় মৌলবী আবদুল ওয়ালী সাহেবের মতে বক্তিয়ার খিলিজির সময়ে (পাঃ ইঃ—দ্বিতীয় খণ্ড) মক্‌দুম্ সাহেবের এদেশে আগমন অধিকতর সম্ভবপর। তিনি আরবদেশীয় সামন্ত নরপতি বা তৎপুত্র ছিলেন জন্য শাহজাদা নামে অভিহিত হইতেন। তিনি তৎকালোচিত পাঠান রাজ্যারম্ভের প্রচারকগণের ন্যায় ইসলাম ধর্ম প্রচার কল্পে এদেশে আগমন করেন এবং কালে তথায় স্থায়ী হইয়া স্বীয় নামানুসারে শাহজাদপুর নামক বর্তমান পল্লী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ও তদীয় অনুচরবর্গ ধর্ম প্রচার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তজ্জন্য কেহ আউলিয়া কেহ দরবেশ, ও উত্তরকালে তাঁহাদেরই সন্তানসন্ততিগণ, খোন্দকারাদি আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তথায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতে পাঠান আমলের দীর্ঘকায় বীরপুরুষগণের হস্তের দৈর্ঘ্যোচিত পরিমাপের হাতকাঠি এতদঞ্চলে প্রচলিত হইয়াছিল।

২. মাসুম (মাকুম) খাঁর মসজিদ ঃ

চাটমোহরে কাজিপাড়ায় (বর্তমান তিলিপাড়ায়) একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। ইহা সাধারণত মাসুম খাঁর মসজিদ নামে পরিচিত। ইহার উচ্চতা ৩০ হাতের উপর, উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৪ হাত, পূর্ব পশ্চিমে প্রস্থ প্রায় ১৫ হাত। উপরিভাগে তিনটি গম্বুজ আছে। ইহার গাত্রের ভিতরে ও বাহিরে নানারূপ ভাস্কর শিল্পের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। সমুদয় মসজিদটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইস্টক নির্মিত। অধুনা ইহা ভগ্ন প্রায়, উপরিভাগে নানারূপ বৃক্ষ লতা ও কণ্টকাদি জন্মিয়াছে। অচিরে জীর্ণ-সংস্কার না হইলে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

মসজিদের মধ্যে একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ফলক ছিল, তাহা এক্ষণে মসজিদের খোতিব সাহেবের নিকট রক্ষিত আছে। উক্ত প্রস্তর ফলকের এক পৃষ্ঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন হিন্দু দেবমূর্তি অঙ্কিত বা খোদিত আছে। অপর পৃষ্ঠে পার্শী অক্ষরে একটি খোদিত লিপি আছে। ব্লকম্যান (Blockman) কৃত অনূদিন আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উক্ত লিপির যে অনুবাদ আছে, তৎপাঠে জানা যায় এই মসজিদ মোঘল রাজত্বকালে হিজরি ৯৮৯ সালে (১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে) মাসুম (মাকুম) খাঁ নামক জনৈক কাবুলী সৈন্যাধ্যক্ষ কর্তৃক নির্মিত হয়। উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে—Macum Khan Kabuli—Thi rebel who gave Akbar no end of trouble had the audacity to assume royal prerogative in Bengal. The following inscription, I received through Babu Rajendrala Mitra from Raja Pramath Nath of Dighapatia. It was found in a ruined mosque at a village Chatmahar not very far from Dighapatia.

"This lofty mosque was built during the time of the Great Sultan, the chief of Sayyiads, Abdul Fate Mahammad Macum Khan—May god perpetuate his kingdom for ever, O Lord, thou who remained, by the high and exalted Khan Mahmmad, son of Mahmmad Khan Qaqshal in the year 989. This was therefore nerely two years after the Bengal military revolt."

Ayne Akbari (Blockman) P. 621.

ভাবার্থ—এই উচ্চ মসজিদ সৈয়দ প্রধান আবদুল ফতে মহাম্মদ মাসুম খাঁর সময়ে ৯৮৯ সালে নির্মিত হয়। ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন।

ব্লকম্যান কৃত অনুদিত আইন-ই-আকবরি পাঠে আরও জানা যায় মাসুম খাঁ আকবর বাদশাহের অধীনে ৫০০ সৈন্যের একজন অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে। গ্লাডউইন (Gladwin) কৃত অনুদিত আইন-ই-আকবরি (১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পাঠেও জানা যায় আকবর বাদশাহের অধীনে ১০০০ সৈন্যের পরিচালক মাসুম খাঁ নামে জনৈক মন্‌সবদার ছিলেন ; যাহা হউক মাসুম খাঁ মহামতি আকবরের জনৈক সেনাপতি ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি কালে কারণ বিশেষে বিদ্রোহী হইয়া মোঘল বাদশাহের বিপক্ষ দলে যোগদান ক'বেন। যৎকালে প্রতাপাদিত্য প্রমুখ বঙ্গের বারভূঞাগণ বিদ্রোহী হইয়া ওঠেন, তখন মাসুম খাঁও পাবনা জেলার চাটমোহরাদি অঞ্চলে স্বাধীন ক্ষমতা পরিচালন করত দিল্লিশ্বরের বশ্যতা অস্বীকার করেন। তৎকালে চাটমোহরে পাঠান আফ্রিদি প্রভৃতি বহু জাতির বাস ছিল, তাহাদের নামে অদ্যাপিও পাঠানপাড়া আফ্রাদপাড়াদি বর্তমান আছে। উক্ত মাসুম খাঁই এখানকার বর্তমান মসজিদ নির্মাণ করেন।

এই মসজিদ হিন্দুর মন্দির ছিল কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। ইহার নির্মাণ কৌশল, অবস্থান ও আনুসঙ্গিক অবস্থা বিবেচনা করিলে, ইহা পূর্বে মন্দির থাকা বলিয়াই অনুমান হয়। **প্রথমত**—ইহার গাত্রে, ভিতরে ও বাহিরে যে সকল কারুকার্যের নিদর্শন আছে, তাহা অনেক হিন্দু মন্দিরের শিল্পকার্যের অনুরূপ। **দ্বিতীয়ত**—উপরোক্ত খোদিত প্রস্তর লিপির পৃষ্ঠায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হিন্দু দেবমূর্তি অদ্যাপিও মসজিদ মধ্যে দেখা যাইতেছে। মসজিদে ২ হাত উচ্চ অষ্টকোণ বিশিষ্ট পদ্মাকার এক হাত পরিধি বিশিষ্ট এক খণ্ড গোলাকার প্রস্তর আছে, তাহা পুরাণোক্ত বিষ্ণুর পদ্মাসন বলিয়া বোধ হয়। **তৃতীয়ত**—ঘন সন্নিবিষ্ট হিন্দুপল্লী মধ্যে মসজিদের অবস্থান দৃষ্টে ইহা স্বতঃই মন্দির বলিয়া বোধ হয়। মসজিদটি পার্শ্ববর্তী ভূমি হইতে ৩/৪ হাত উচ্চ একটি স্তূপের উপর অবস্থিত। **চতুর্থত**—ইহার ৩/৪ হাত দূরেই হিন্দু জাতির বাস গৃহ। অনেকে বলেন চাটমোহরের অধিকাংশ তিলি জাতি অল্পদিন হইল ভিন্ন স্থান হইতে আগত। হিন্দুগণ সহসা ইচ্ছাপূর্বক মসজিদ সান্নিধ্যে বাস করিতে চাহেন না। যদি এরূপ হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে এখানে পূর্বে হিন্দু মুসলমানে বিশেষ সদ্ভাব ছিল অথবা হিন্দুগণকে নির্যাতন করিবার জন্য তাহাদের মন্দির ভাঙিয়া পরে তাহাকে মুসলমানদিগের ভজনালয়ে পরিণত করা হইয়াছে। মন্দিরকে মসজিদে পরিণত না করিলেও এই মসজিদ নির্মাণ কার্যে যে হিন্দু মন্দিরের অনেক গৃহ নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রস্তর লিপির অপর পৃষ্ঠায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মূর্তিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মুসলমান আমলের এরূপ কার্যের নিদর্শন ভারতের নানাস্থানে অদ্যাপিও বর্তমান রহিয়াছে।

৩. নসরৎ শাহের মসজিদ ঃ

তাড়াশ আউট পোস্টের অধীন প্রাচীন করতোয়া তীরে নবগ্রাম প্রকাশ্য নওগাঁও নামক বর্তমানে শশ্মানভূমি সদৃশ পরিত্যক্ত একটি পল্লীতে দুইটি পুরাতন মসজিদ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে একটির অবস্থা কথঞ্চিৎ ভাল ও ব্যবহারযোগ্য ; অন্যটি ভগ্ন ও অব্যবহার্য। স্থানীয় প্রবাদে প্রথমটি **মামার মসজিদ** এবং দ্বিতীয়টি **ভাগিনেয়ের মসজিদ** নামে খ্যাত।

মামার মসজিদ একটি গম্বুজ বিশিষ্ট; ইহার কতকাংশ মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত, উচ্চতা এখনও প্রায় ১৫/১৬ হাতের অধিক হইবে। ভিতরের দৈর্ঘ্য পরিমাণ ১২ হাত, প্রস্থ প্রায় ১০ হাত, প্রাচীরের বেধ ৬ হাত। সম্মুখের দুইটি মাত্র স্তম্ভ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত; তদ্ভিন্ন সমুদয় মসজিদটি প্রাচীনকালের আদর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইস্টক দ্বারা গঠিত। সম্মুখভাগে সামান্য কারুকার্য ব্যতীত বিশেষ কোন ভাস্কর শিল্পের নিদর্শন ইহাতে বিদ্যমান নাই। দেওয়াল গাত্রে এখনও কন্টকাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে নাই, অচিরে মেরামত ও সংস্কার আবশ্যক।

ইহার নিকটে ২/৩টি মুসলমানের বাড়ি ও একটি ইন্দারা আছে মাত্র। বহুদূর পর্যন্ত আর কোন লোকালয়ও নাই কিম্বা বিশেষ কোন নিবিড় জঙ্গলাদিও নাই; সুবিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে দণ্ডায়মান মসজিদটি বহুদূর হইতে স্বতঃই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। মসজিদ মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে খোদিত একখণ্ড শিলালিপি বর্তমান আছে। কিয়দ্দূর করতোয়া নদীতটে প্রতি বৎসর বাসন্তী অষ্টমীর দিনে স্নান উপলক্ষে যে সুবৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়, তদুপলক্ষে সমবেত হিন্দু মুসলমানগণ সসম্মানে উক্ত শিলালিপিকে পবিত্র জ্ঞানে তাহার উপর চাউল, দাইল, দুধ ও তৈলাদি প্রদান বা নিক্ষেপ করিয়া থাকে। উক্ত শিলালিপির যে পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, মসজিদটি হিজরী ৯৩২ সালের (১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে) রজব মাসে হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের সময়ে নির্মিত হয়।

শিলালিপি মর্মানুবাদ এইরূপ জানা গিয়াছে—The Prophet may God's blessing rest on the virtuous—says he who builds a mosque on earth will have a palace like it built in heaven for him by God. This mosque was built during the time of Sultan Nasrat Sah, son of Hossain Sah. The peace of God be upon him and may God perpetuate his kingdom forever. ....Rajab 932

তাৎপর্য—পয়গম্বর বলেন, যিনি পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, ভগবান তাঁহার জন্য স্বর্গে তত্তুল্য প্রাসাদ তৈয়ারি করিয়া থাকেন। এই মসজিদ সুলতান হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের আমলে নির্মিত হয়। পরমেশ্বরের আশীর্বাদ তাঁহার উপর বর্ষিত হউক, তাঁহার রাজত্ব চিরস্থায়ী হউক।.................রজব ৯৩২।

ইতিহাসে জানা যায় বাংলার সুলতানগণ মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ **হোসেন শাহের পুত্র নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ** হিজরি ৯২৫-৩৯ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। বর্তমান পাবনা জেলার পূর্বাংশে টাঙ্গাইলের অন্তর্গত আটিয়া নামক স্থানে হোসেন শাহ কর্তৃক হিজরী ৯২২ সালের নির্মিত একটি মসজিদ আছে। *(মৈমনসিংহের ইতিহাস ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)* এই জেলার পশ্চিমাংশে রাজশাহী জেলার **বাঘা** নামক গ্রামে তৎপুত্র নসরৎ শাহ কর্তৃক হিজরী ৯৩০ সালে নির্মিত একটি মসজিদ আছে জানা যায় *(বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত—২য় ভাগ)*। নওগাঁও বা নবগ্রামের এই মসজিদ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, পাবনা জেলার করতোয়াতটস্থ এতদঞ্চল এক কালে অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। এথাকার সুখ সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য সুষুমায় আকৃষ্ট হইয়া তৎকালীন পাঠান আমলের সুলতান ও রাজপ্রতিনিধিবর্গ এতদঞ্চলে স্থায়ী হইয়াছিলেন। নবগ্রামেব নিকটবর্তী করতোয়ার পরপারস্থিত **সুলতানপুর** নামক প্রাচীন পল্লী ও তথাকার পূর্ব পশ্চিম দিকে বিস্তৃত সুবৃহৎ দীর্ঘিকা সমূহ দেখিলেই মনে হয় পাবনা জেলার এই অংশ এক সময়ে প্রকৃতই বাংলার সুলতানগণের লীলাভূমি ছিল। অধুনা এখানে একটি মাত্র গ্রাম্য পাঠশালা ও মুষ্টিমেয় কৃষকের বাস ভিন্ন আর কিছুই বর্তমান নাই, কিন্তু সর্বসাধারণের উপকারার্থ ও জলদানের উদ্দেশ্যে পাঠান আমলে রাজাদেশে দেশ মধ্যে যেসকল সুদূর বিস্তৃত দীর্ঘিকাদি খণিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের স্বচ্ছ সলিল মধ্যে অদ্যাপি তাঁহাদের পুণ্যকীর্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে। উক্ত সুলতান বাদশাহগণ প্রজাগণের কল্যাণ কামনায় দেশ মধ্য স্থানে স্থানে যে সকল

ভজনালয়সমূহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন কিম্বা তন্নির্মাণে সহায়তা করিয়াছিলেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে জঙ্গল মধ্যে পল্লীর নিভৃত কোণে অবস্থিত তৎসমুদয়ের ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ নবগ্রামের এই **মামার মসজিদ** তাহারই সাক্ষ্যদান করিতেছে এবং যুগযুগান্তর পরে আমাদের নিকট জ্বলন্ত অক্ষরে অতীত কাহিনী জ্ঞাপন করিতেছে।

অন্য মসজিদটি **ভাগিনেয়ের** মসজিদ নামে পরিচিত। ইহার উপরে কোন ছাদ নাই। মাত্র স্তূপাকার ভূমির উপর চতুর্দিকের দেওয়াল দণ্ডায়মান আছে। স্তূপ মধ্যে কোন শিলালিপি ছিল বা আছে কিনা তাহাও জানিবার কোন সহজ উপায় নাই। স্থানীয় প্রবাদে প্রকাশ পূর্বোক্ত মামার মসজিদের আদর্শে তাঁহার ভাগিনেয় অতি অল্প সময় মধ্যে অর্থাৎ এক রাত্রি মধ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ মনস্থ করেন। সংকল্পিত সময় মধ্যে ইহার ছাদ দিতে না পারায় উহা আর সম্পূর্ণ হয় নাই। যতদূর বোধ হয় নির্মাতার জীবিতকালে উহা সমাধা হয় নাই সেজন্য উপরোক্ত অল্প সময় মধ্য নির্মাণের জনরব এই অসম্পূর্ণ মসজিদের সহিত কালে সংযুক্ত হইয়াছে।

প্রবাদমূলে কেন এই মসজিদদ্বয় **মামা ভাগিনেয়ের মসজিদ** নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে, তাহা সঠিক জানিতে পারা যাইতেছে না। নসরৎ শাহের সময়ে প্রথমটি নির্মিত হইয়াছিল, তাহা শিলালিপির পাঠে জানা যাইতেছে; কিন্তু তাঁহার ভাগিনেয় কে ছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

সিরাজগঞ্জে ১৮৮৭ অব্দে মুন্সেফী আদালতে ১৬৭৪ নম্বরে স্বত্ব সাব্যস্ত জন্য বাদী—ছিলাম খোন্দকার বনাম বিবাদী—আবদুল মিঞা মধ্যে যে মোকদ্দমা (নিঃ ১৮/৬/৮৮) উপস্থিত হয়, তাহার আরজি ও বর্ণনা পাঠে জানা যায়, উপরোক্ত মামার মসজিদের মোতওয়ালীর কার্যাদি পরিচালন জন্য পরগণা কাটার মহালের অধীন চক সরিফাবাদ মধ্যে ১৫ পনের খাদা পরিমাণ জমি সরকার বাহাদুর হইতে নিষ্কর নির্দিষ্ট হইয়াছিল। শাহজাদপুরের অধীনস্থ নরনিয়া নিবাসী উক্ত আবদুল হামিদ মিঞা (খোন্দকার) সাহেব বর্তমানে তাহা ভোগ দখল করিতেছেন। তাঁহার নিকট আরও অনেকগুলি প্রাচীন দলিল আছে শুনিয়াছি, দুঃখের বিষয় নরনিয়া পর্যন্ত গিয়াও তাহা দেখিতে সমর্থ হই নাই। বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি উহা আমাকে দেখান নাই। গৌড় পাণ্ডুয়া হুগলি ত্রিবেণী আদি প্রসিদ্ধ নগরীতে ও দেশ মধ্যে স্থানে স্থানে নসরৎ শাহের সময়ের নির্মিত যে সমস্ত মসজিদ আছে, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণের আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফলে তৎপ্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে তৎসমুদায় রক্ষা এবং সংস্কারেরও ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে। **বাঙ্গালার ইতিহাস** প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন "নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহের রাজত্বকালের অনেকগুলি প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান আছে। ৯৩০ হিজরায় বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট নগরে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। উক্ত বর্ষে রাজশাহী জেলার বাঘা নামক স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদ অল্পদিন পূর্বে গভর্নমেন্টের ব্যয়ে সংস্কৃত হইয়াছে" *[বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খণ্ড (১৩২৪) দ্রষ্টব্য)]*

রাজশাহী রাজা জমিদারগণের জেলা; তথাপি গবর্নমেন্ট নিজ ব্যয়ে বাঘার মসজিদ সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। আর পাবনা জেলার সেই একই সুলতানের সময়ের নির্মিত একটি প্রাচীন কীর্তি অযত্নে ও অজ্ঞাতসারে দিন দিন সংস্কার অভাবে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। কেবলমাত্র অনুসন্ধান ও আলোচনার অভাবে এবং দেশের লোকের উদ্যোগহীনতায় জেলার একটি পুরাতন কীর্তি লোপ পাইতে বসিয়াছে। এই জেলার জঙ্গলময় মরিচপুরাণ, হান্ডিয়াল, চণ্ডীপুর প্রভৃতি করতোয়া প্রদেশে চক্ষের অন্তরালে যে সকল প্রাচীন মন্দির ও মসজিদাদি বর্তমান রহিয়াছে, আমরা তৎপ্রতি উদাসীন। আশাকরি, এদেশের হিন্দু মুসলমান সুযোগ্য লেখক বা অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক কিংবা দেশের প্রাচীনকীর্তি রক্ষায় বদ্ধপরিকর

সোৎসুক কোন মহাত্মা বা সরিক এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে, এই সমস্ত পল্লীসমূহে এখনও যে সকল কীর্তিধ্বজা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার প্রকৃত তথ্য নির্ণীত হইয়া এদেশে পাঠান রাজত্বকালের অনেক শিল্পকলা ও স্থাপত্য বিদ্যার সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসের উপাদান সংগৃহীত হইবে এবং এই জেলার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি হিন্দুসমাজের ইতিবৃত্তের ন্যায় এতদঞ্চলের মুসলমান সমাজেরও যে প্রাচীন আভিজাত্যের ইতিহাস সংকলনের সহায়তা হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নবগ্রামে যে এক কালে সম্ভ্রান্ত মুসলমান সমাজের বাস ছিল তাহা এখনও এতদঞ্চলে প্রচলিত নিম্নলিখিত কবিতাংশ বা ছড়া হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

নওগাঁয়ের নওয়া কাজি, হাম কুড়ার খাঁ।
ঠেলাঠেলি করে নাও ডুবালো, পানি ছেঁচিল না।।

৪. সমাজ গ্রামের মসজিদ ঃ

চাটমোহর থানার অধীন সমাজ নামক সুবৃহৎ প্রাচীন পল্লীতে একটি ভগ্ন মসজিদ বিদ্যমান আছে। ইহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। খিলান একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে, উপরে বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে। উচ্চতা এখনও প্রায় ১৫ হাতের কম নহে, দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রায় সমান, অনুমান ১২ হাত হইবে। চারিদিকে স্তূপীকৃত ইস্টকরাশি বেষ্টিত উচ্চভূমির উপর মসজিদটি অবস্থিত। চারিদিকে বারান্দায় বিশেষত সম্মুখভাগ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে খোদিত বা নানাপ্রকারে লিখিত কোরান সরিফের অনেক অংশ উদ্ধৃত ছিল। এক্ষণে তাহা ক্রমে নষ্ট হইতেছে। মসজিদ গাত্রের ইষ্টকগুলিতে নানাপ্রকার কারুকার্য খোদিত ছিল, ক্রমে ভাঙিয়া পড়িতেছে: ইহা এক গম্বুজবিশিষ্ট ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইস্টক নির্মিত ; সম্মুখে ২টি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর স্তম্ভ আছে। ইহার মধ্যে একখণ্ড প্রস্তর লিপি আছে। মসজিদের দক্ষিণে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি দীর্ঘিকা বিদ্যমান আছে। এরূপ সুদুর বিস্তৃত জলাশয় একমাত্র জয়সাগর ব্যতীত এই জেলায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। শিলালিপি পাঠে যতদূর জানা যায় এই মসজিদ হিজরি ৯৫৮ সালে (১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে) শের শাহের পুত্র সুলতান সমিরের সময়ে নির্মিত হয়। "বাঙ্গালার ইতিহাসে" জানা যায় হিজরি ৯৫২ হইতে ৯৬০ সাল (১৫৪৫—১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত মহম্মদ খাঁসুর বাংলার মসনদে উপবিষ্ট ছিলেন। স্বনামধন্য সের শাহ পাঁচ বৎসর দিল্লির সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়া ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। তখন তৎপুত্র সলিম শাহ দিল্লির সিংহাসনারোহণ করিয়া নয় বৎসর পর্যন্ত তথায় রাজত্ব করেন। (History of India by Haraprasad Sastri P. 108) আবার ১৫৪৫ হইতে ১৫৫৩ পর্যন্ত দিল্লিতে ইসলাম শাহ নামক জনৈক বাদশাহ রাজত্ব করেন এইরূপও জানা যায় (বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এক্ষণে এই ইসলাম শাহ ও সলিম শাহ এক ব্যক্তি কিনা এবং তিনিই শের শাহের পুত্র কিনা তাহা বিশেষজ্ঞগণের বিবেচনা সাপেক্ষ। তবে মৌলবীগণকে দেখাইয়া এই সমাজ গ্রামের মসজিদের শিলালিপির যে পাঠ অবগত হইয়াছি, তাহাতে তাঁহারা শের শাহের পুত্র সুলতান সমিরের রাজত্বকালে ৯৫৮ হিজরায় (১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে) এই মসজিদ নির্মাণের সময় নির্দেশ করিয়াছেন। কেহ সমীর পড়িবেন, কেহ সলিম, কেহ বা ইসলাম পড়িতে পারেন, কিন্তু হিজরী ৯৫৮ (১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে) তাহা সাধারণ চক্ষেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সময়ে বাংলার সুলতান কে ছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলে জানা যায়, মহাম্মদ খাঁ সুরই তৎকালে বাংলার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন। সমাজ গ্রামে প্রবাদ আছে যে, বাংলার নবাবের জনৈক আত্মীয়ের উপর এ প্রদেশের শাসনভার অর্পিত ছিল, নবাবের মৃত্যু হইলে তিনি স্বাধীন ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিলেন। এই জনশ্রুতি ঐতিহাসিক বিবরণে সমর্থিত হইতেছে। কারণ ইতিহাসে জানা যায় যখন "শের শাহের ২য় পুত্র সলিম শা সিংহাসনে আরোহন করিলেন..... মহম্মদ খাঁ সুর নামে তাঁহার এক আত্মীয়কে

বঙ্গদেশ শাসনে প্রধানভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এই সেনাপতি একান্ত ন্যায়পরায়ণতার সহিত রাজকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু হিঃ ৯৬০ সালে যখন সকলের ঘৃণিত মহম্মদ আদিল (১৫৫২ খ্রিঃ) দিল্লির সিংহাসন অধিকার করিল, বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ভাবিলেন, তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রের প্রাণহন্তার সহিত তাঁহার আনুগত্য থাকিতে পারে না। তখন তিনি দিল্লির সম্রাটের প্রভুশক্তি অস্বীকার করিয়া আপন নামে মুদ্রার প্রচলন করিলেন।" *(বঙ্গের ইতিহাস—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত। ১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)*

যাহা হউক, সুলতান সমির বা ইসলাম শাহের রাজত্ব সময়ে ৯৫৮ হিজরায় সমাজ গ্রামের এই মসজিদ নির্মিত হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে তখন বা তাহার অব্যবহিত পূর্বে বা পরে দিল্লির সিংহাসন লইয়া গোলযোগের সুযোগে তৎকালীন বঙ্গের প্রাদেশিক শাসনকর্তা মহম্মদ খাঁ সূর স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহাই সম্ভবপর ঘটনা। তৎকালে পাবনা জেলার এতদঞ্চলে যে পাঠান সুলতান ও তদীয় নিযুক্তীয় কর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল, তাহা এই মসজিদ দৃষ্টে জানা যাইতেছে।

এই জেলার বোথড় নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় বিগত ১৩১৭ সালের **উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের** তৃতীয় অধিবেশন (গৌরীপুর) "কতিপয় ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "হাণ্ডিয়ালের কিছু দক্ষিণে **সমাজ** নামে একটি প্রাচীন গ্রাম বিল চলনের ধারে আছে। এখানে পুকুর খালের সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, বাংলার নবাবের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নবাবের কোপে পড়িয়া পলায়ন করেন এবং কিছুদিন ইতস্তত বিচরণ করিয়া কতিপয় অনুচর সঙ্গে করিয়া বিল চলনের মধ্যে **কাটেঙ্গা** নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। সম্ভবত কাটার খাঁ হইতে কাটেঙ্গা গ্রামের নাম ও কাটার খাঁর অধিকৃত ভূমি **কাটার মহাল** নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকিবে। কাটার খাঁ সমাজে রাজধানী স্থাপিন করিয়াছিলেন। কাটার মহাল এখন পাবনা জেলার একটি পরগণা, সমাজে একটি প্রকাণ্ড মসজিদ আছে। এই মসজিদের শিলালিপিখানা মাটিতে পড়িয়া আছে। তাহার পৃষ্ঠে বাসুদেব মূর্তি আছে। মূর্তির নাক কাটা দেখিয়া আমরা বাসুদেব মূর্তি বলিয়া ঠিক করিয়াছি। হঠাৎ দেখিলে বুদ্ধ মূর্তি বলিয়া ভ্রম হয়। অপর পৃষ্ঠে পারস্য ভাষায় অক্ষরে মসজিদের বিবরণাদি লেখা আছে।" *[উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—তৃতীয় অধিবেশন— গৌরীপুর ১৩১৭। ৪৮ পৃষ্ঠা।]*

বিগত ১৩২৮ সালে আমরা উক্ত শিলালিপিখানা বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিয়াছি। শিলালিপির অপর পৃষ্ঠায় কোন মূর্তি দেখি নাই, তবে তাহাতে যে কিছু ছিল এবং তাহা ভাঙা বা বিকৃত করা হইয়াছে এমত চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। কালীকান্তবাবু যদি ১৩১৭ সালে কোন মূর্তি এই শিলালিপির পৃষ্ঠে দেখিয়া থাকেন, তবে এই কয়েক বৎসর মধ্যে তাহা নষ্ট করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। সমাজ গ্রামে যে **ছয় বুড়ি পুকুর আর নয় বুড়ি গাড়া** আছে উক্ত পুকুরগুলি সবই পূর্বপশ্চিম লম্বা ; আকৃতি দেখিয়া মুসলমান আমলের কীর্তি বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। মসজিদের অতি নিকটবর্তী পুকুরটি অতি বৃহৎ তাহা ইতিপূর্বে বিবৃত হইয়াছে। অধুনা ইহা শৈবালাদিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিলে ইহা উত্তর দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত বলিয়াই বোধ হয়। এরূপ উত্তর দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত জলাশয় ও শিলালিপির পৃষ্ঠে কালীকান্তবাবু কর্তৃক পরিলক্ষিত বাসুদেব মূর্তির বিবরণে এই মসজিদ চাটমোহরের মাসমু খাঁর মসজিদের ন্যায় পূর্বে হিন্দু মন্দির ছিল কিনা, কিংবা ইহাতে হিন্দু মন্দিরের কোন উপকরণ ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা তাহার রহস্য উদঘাটিত হওয়া আবশ্যক।

৫. পীর সাহেবের দরগাহ ঃ

সিরাজগঞ্জ টাউনে সাধারণত পীর সাহেবের দরগাহ নামে খ্যাত মুসলমানদিগের একটি সমাধি মন্দির আছে। ইহার নামানুসারেই শহরের এই অংশ দরগাপটি নামে পরিচিত। ইহা

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধ বণিতা সর্বজন কর্তৃক সম্মানিত ও পূজিত। সকলেই এখানে নানাপ্রকার সিন্নি মানসিক করিয়া থাকেন। এখানে মানসিক করিলে অনেক সময় অসাধ্য সাধিত হয়, সাধারণের এরূপ সংস্কার আছে। সেজন্য সিরাগঞ্জের বহু মহাজন তাঁহাদের যাবতীয় পণ্যদ্রব্য খরিদ বিক্রয়ের উপর এই দরগাহের নামে চেরাগী বৃত্তি আদায় করিয়া থাকেন।

"ইহা আব্দাল মহম্মদের দরগাহ নামে খ্যাত। সাধারণে ইহাকে আবদুল মহম্মদের দরগাহ বলে ; আবদুল মহম্মদ ঠিক উচ্চারণ নহে। প্রবাদ শাহ মহম্মদকে বেলকুচিতে সমাধি দেওয়া হয় ; তাঁহার ভক্তগণ তথাকার প্রকৃত সমাধি লইয়া সিরাজগঞ্জে এই কৃত্রিম সমাধি স্থাপন করেন। ইহা পূর্বে ভাল অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পের পর নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" বর্তমানে এখানে একটি পাকা গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

জানা যায় বেলকুচির জমিদার আব্দাল বা আবজাল মহম্মদ সাহেব "একজন সাধু পুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বড় বাজু পরগণা তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত পরগণার সর্বত্র তাঁহার নামে সমাধি স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান সমভাবে এই স্বর্গীয় মহাত্মার নামে সিন্নি মানত করিয়া থাকে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তাঁহার নামে সিন্নি আমানত করিলে লোকে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পর সিরাজালী চৌধুরী উক্ত জমিদারি লাভ করেন।" *কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত "মৈমনসিংহের বিবরণ"। ২৪ পৃষ্ঠা।*

৬. শাহ নুরের দরগাহ ঃ

শাহজাদপুর থানার অধীন দেওয়ান তারাটিয়া নামক গ্রামে শাহনুর সাহেবের একটি দরগাহ আছে। প্রবাদ দেওয়ান সৈয়দ শাহনুর শাহজাদা মক্‌দুম্ সাহেবের অব্যবহিত পরই এ দেশে আগমন করেন। তাঁহার বংশধরগণ তাঁহাকে হজরৎ হোসেন বস্‌রি সাহেব মরহুমের পৌত্র বা প্রপৌত্র বলিয়া প্রকাশ করেন। প্রবাদ শাহজাদপুরের মক্‌দুম্ সাহেবের সহায়তা ও মধ্যস্থতায় দেওয়ান শাহনুর নরনিয়া গ্রামের শাহ ইসা সাহেবের বাটিস্থ কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে নরনিয়া ও তারাটিয়া গ্রামের মুসলমান সমাজের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর এখানে তাঁহার সমাধি হয়। তাহাই অদ্যাপি শাহনুরের দরগাহ নামে পরিচিত।

কুম্ভীর শিষ্য ঃ

সাধু পুরুষ ও মহাত্মা ব্যক্তিগণের অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে বিবেক বুদ্ধিহীন সাধারণ জীবজন্তুগণও মনুষ্যের ন্যায় তাঁহাদের বাধ্য হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত এই জেলার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধকগণের জীবন কাহিনীতে প্রকাশ। হিন্দুর মধ্যে পাবনা থানার অধীন গোসাইরামপুরের জগন্নাথ গোস্বামী মহাশয় এবং মুসলমান মধ্যে এই দেওয়ান তারাটিয়া গ্রামের শাহনুর সাহেবের কুম্ভীর শিষ্য থাকা জানা যায় ; এই কুম্ভীর শিষ্যগণ উক্ত সাধু পুরুষগণের উপাসনাদি কার্যে যোগদান করিত। ইহাতে সাধারণ সারকাচওয়ালা এবং পশুপালকগণের জীবজন্তু বশীকরণ অপেক্ষা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। শাহনুর সাহেবের দুইটি কুম্ভীর শিষ্য ছিল বলিয়া প্রবাদ। উহাদিগকে তিনি সোনা মিঞা ও বোচা মিঞা বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পর্যন্তও উহারা তাঁহার বাটিতে আসিত এবং দরকার বশত পাহারা দিত। পরে বাটির লোকেরা অত্যাচার করায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

৭. শাহ কামালের দরগাহ ঃ

কামারখন্দ পুলিশ স্টেশনের অধীন ভূইয়া নান্না গ্রামের দরগাহ সম্বন্ধে সিরাজগঞ্জের ইতিহাস প্রণেতা মৌঃ মোক্তার আহম্মদ সিদ্দিকী লিখিয়াছেন, "ভূইএগ্রা নান্নাতে (কামারখন্দ) যে শাহ কামালের দরগাহ আছে, তথায় আমি নিজে গিয়াছি ও জিয়ারৎ করিয়াছি। ঐ গ্রামের

পূর্ব প্রান্তে একটি মাঠের মধ্যবর্তী এক বিঘা পরিমাণ একটি উচ্চ ভিটি আছে। ইহার চতুর্দিকে আটটি গাব গাছ আছে। শাহ কামালের মাজারটি এই ভিটিতে আজকাল পতিত অবস্থায় আছে। শুনিলাম পূর্বে ইহা পাকা ইটদ্বারা আবৃত ছিল। এখন দাবিয়া গিয়াছে ও ইটের চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে। অনেক মুসলমান এখান হিন্দুদিগের মত দুধকলা ঢালিয়া দেয় ও কেহ কেহ সন্ধ্যার সময় বাতি দিয়া থাকে। এই শাহ সাহেব সম্ভবত পশ্চিম হইতে (অনেকের মত বোগবাদ হইতে) আসিয়া এখানে আস্তানা করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচটি পুত্র ছিল। প্রথম পুত্রের নাম হুর কামাল। শাহ্ সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ৫ পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করিতে গেলে নাকি তাহা ছয় ভাগ হইয়া পড়ে ; এইরূপ কয়েকবার হইলে তাঁহারা আপন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার কারণ কি? মাতা বলিলেন তাঁহার গর্ভে একবার একটি সর্প জন্মিয়া বাহিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে তাঁহারা উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "ছয় ভাগের এক ভাগের মালিক কেহ থাকিলে তিনি তাঁহার ভাগ লইয়া যান।" তখন কোথা হইতে একটি সর্প আসিয়া একটি ভাগের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়। তখন অপর পাঁচ ভ্রাতা ঐ ভাগটি বণ্টন করিয়া রাখেন। এখন পর্যন্ত ঐ গ্রামে তাঁহার বংশধরগণ বর্তমান আছে। তাঁহারা শাহ কামালের সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন ও জমিদারগণের মত (এখনও সামান্য যাহা কিছু আছে) কালেক্টরীতে রাজস্ব দিয়া থাকেন। তাঁহার স ম্পত্তি দুই মহালে ভুক্ত। পাঁচ ভ্রাতার অংশ ।./০৬॥ এক মহাল ও ৵/১৩। ক্রান্তি অন্য মহালভুক্ত হইয়া পৃথক ভাবে চলে। **বড় নম্বর** ও **ছোট নম্বর** রূপে কথিত হয়। ছোট নম্বরের নাম **আলাহিদা** মহাল বলিয়া গ্রামে প্রকাশ।"

সিরাজগঞ্জের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

জেলার প্রধান কয়েকটি প্রাচীন মসজিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল। এতদ্ব্যতীত আরও অলক্ষিতভাবে কোন কোন স্থানে প্রাচীন পাকা মসজিদ থাকা সম্ভব। তৎসমুদয়ের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হইলে বহু ঐতিহাসিক তথ্য উদঘাটিত হইবে।

জেলার মুসলমান প্রধান পল্লীমাত্রেই সর্বত্র কাঁচা অর্থাৎ খড় কিংবা টিনের নির্মিত নমাজঘর বা মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় গ্রামের লোকেরা সাধারণত প্রতি শুক্রবারে অথবা পর্বোপলক্ষে নমাজ উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও গ্রামের সাধারণ লোকের চেষ্টায় ও ব্যয়ে গ্রামের বাহিরে প্রকাশ্য সাধারণ স্থানে এরূপ মসজিদ নির্মিত আছে ; আবার কোথাও গ্রামের সঙ্গতিপন্ন উদারহৃদয় গৃহস্থগণের বহির্বাটিতে স্বীয় ও সাধারণের ব্যবহার জন্য কাঁচা বা ইস্টক নির্মিত পাকা মসজিদ বিদ্যমান আছে। তবে শেষোক্ত মসজিদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বর্তমানে এই জেলায় এরূপ পাকা মসজিদগুলির একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহা সম্পূর্ণ বা নির্ভুল বলা যায় না।

পাকা মসজিদসমূহের তালিকা

পাবনা সদর

পুলিশ স্টেশন	নম্বর	মসজিদের স্থান	মসজিদের মালিক
পাবনা	১	পাবনা কাছারি	সাধারণ
"	২	" বাজার	"
"	৩	" রাঘবপুর	"
"	৪	" শিবরামপুর	"
"	৫	" দিলালপুর	ইমামুদ্দিন শেখ
"	৬	রাধানগর	সাধারণ
"	৭	আটুয়া	সাধারণ
"	৮	সাদুল্যাপুর	এছমাইল চৌধুরী

পুলিশ স্টেশন	নম্বর	মসজিদের স্থান	মসজিদের মালিক
পাবনা	৯	গঙ্গারামপুর	ভাদু প্রামাণিক
আটঘরিয়া	১০	গাঁতি	কছের সরকার
”	১১	বেড়াণ	সাধারণ
”	১২	খিদিরপুর	”
চাটমোহর	১৩	ট্যাঙ্গরজানি	হেমাতুল্যা প্রামাণিক
”	১৪	হাণ্ডিয়াল	সাধারণ
সাঁড়া	১৫	লক্ষ্মীকুণ্ডা	হাজি চয়েনুদ্দিন বিশ্বাস
”	১৬	মানিকনগর	বরকত বিশ্বাস
”	১৭	পতিরাজপুর	সাধারণ
ফরিদপুর	১৮	ফরিদপুর	”
সাঁথিয়া	১৯	ধুলাউরি	”
সুজানগর	২০	সুজানগর	”
”	২১	খয়রান	মেছেরউদ্দিন হাজি
”	২২	দুলাই	চৌধুরী জমিদারি
বেড়া	২৩	রতনগঞ্জ	তালেবর রহমান মিএগা
”	২৪	আমিনপুর	মহম্মদ কাজেম

সিরাজগঞ্জ মহকুমা

সিরাজগঞ্জ	১	হোসেনপুর	মেহেরুল্যা মুন্সি
”	২	ছাতিয়ানতলী	সাধারণ
কাজিপুর	৩	বিয়ারা	×
”	৪	বেড়িপটল	×
রায়গঞ্জ	৫	বারুহাস	দেলবর খাঁ
”	৬	গ্রামপাঙাসি	নায়েবুল্যা হাজি
”	৭	কৃষ্ণদিয়া	জহিরুদ্দিন তালুকদার
উল্লাপাড়া	৮	আদাচাকি	নায়েবুল্লা হাজি
”	৯	বাখুয়া	দেলওয়ারালী মুন্সি
”	১০	রামগাতি	মোহরুদ্দিন চৌধুরী
”	১১	বিনাতপুর	×
”	১২	রামকৃষ্ণপুর	×
কানারখন্দ	১৩	চৌবাড়ি	দলু ভুঁইয়া
বেলকুচি	১৪	আলুকদিয়া	জব্বার সরকার
”	১৫	দেলুয়াকান্দি	হজরত সরকার
চৌহালি	১৬	কাটারবাড়ি	+
”	১৭	বামনদি	×
শাহজাদপুর	১৮	শাহজাদপুর	+

ক. নবরত্ন মন্দির ঃ

জেলার কয়েকটি স্থানে হিন্দু দেবালয় নবরত্ন মন্দির নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ইহাদের কোনটি দ্বিতল, কোনটি বা ত্রিতল দেবমন্দির বা দোলমঞ্চ বিশেষ। কোন কোনটির

প্রত্যেক তলে চতুষ্কোণে চারিটি হিসাবে আটটি এবং উপরিভাগে একটি চূড়া বর্তমান থাকায় এই মন্দিরসমূহ সাধারণত নবরত্ন মন্দির নামে পরিচিত হইয়াছে। এদেশের লোকের বাসগৃহ, দেবালয় বা মসজিদাদি নির্মাণ প্রণালী পূর্বে কিরূপ ছিল, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে এই জেলায় যে কয়েকটি নবরত্ন মন্দির বা দেবালয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তন্মধ্যে (১) পোতাজিয়া, (২) হাটি কুমরুল (৩) তাড়াস এই তিনটি নবরত্ন মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুইটি ভগ্ন ও অব্যবহার্য; দ্বিতীয়টি এখনও দেবমন্দিররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত হাণ্ডিয়াল, উধুনিয়া প্রভৃতি আরও কয়েকটি গ্রামে নবরত্ন মন্দিরের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয় জঙ্গল মধ্যে অবস্থিত ইস্টক স্তূপ বিশেষ।

১. পোতাজিয়া ঃ

শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রামের নবরত্ন মন্দির অতি প্রাচীন। ইহা এক্ষণে একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। কেবলমাত্র নিম্নতলে কতকাংশ এবং কিম্বদন্তী অতীতের সাক্ষ্যদান করিতেছে। এই মন্দির গ্রামের স্বধর্মনিষ্ঠ ও সদনুষ্ঠানকারী সমৃদ্ধিশালী বারেন্দ্র কায়স্থ বংশের উজ্জ্বল কীর্তি।

ইহা ইস্টক ও কড়িরচূর্ণ দ্বারা নির্মিত ছিল। ইহা ত্রিতল বেদমন্দির ও প্রত্যেক তলে তিনটি প্রকোষ্ঠ বর্তমান ছিল। সর্বসমেত নয়টি প্রকোষ্ঠ বর্তমান থাকায় ইহার নাম নবরত্ন মন্দির হইয়াছে। ইহার গাত্রে নানা প্রকার কারুকার্য ও নানারূপ দেবদেবীর মূর্তি খোদিত ছিল। বর্তমানে মন্দিরটি একেবারে বিনষ্ট হইলেও ঐ সমুদয় শিল্প কার্যের নিদর্শন অদ্যাপি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইস্টকাবলীর কার্যাদিতে প্রতীয়মান হয়। মন্দিরে রাধাবল্লভ নামক বিগ্রহ স্থাপিত ছিল। ইহা এখন পর্যন্ত এথাকার রায় বংশীয়গণের গৃহদেবতা স্বরূপে পূজিত হইতেছে।

প্রথমতলে পূজোপকরণ সামগ্রী রক্ষিত হইত, দ্বিতীয় তলে পূজক ও পরিচারকবৃন্দ বাস করিতেন এবং তৃতীয় বা সর্বোচ্চতলে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার তলদেশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকেই প্রায় ৬০ হাতের উপর ছিল। ইহার উচ্চতা এত অধিক ছিল যে বহুদূরবর্তী প্রদেশ হইতে তাহা দৃষ্টিগোচর হইত। অধুনা মন্দিরটি বিনষ্ট হইলেও ভগ্নাবশিষ্ট অংশের উচ্চতা ২৫ হাতের কম নহে।

এই মন্দিরের নির্মাণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, "পূর্বোক্ত দেওয়ান রূপরায়ের পর ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্বোক্ত গোপীকান্ত রায়ের বংশীয় গোবিন্দরাম রায় মহাশয় ঢাকার নবাবের দেওয়ানি করিতেন। তিনিই পোতাজিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ নবরত্ন মন্দির সংস্থাপিত করেন। তদ্বংশীয়গণ নবরত্ন পারায় রায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। *("বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ" কৃষ্ণবল্লভ রায় প্রণীত। ১১৭ পৃষ্ঠা।)*

প্রবাদ ইহার উচ্চতা এত অধিক ছিল যে জলপথে তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী ঢাকা হইতে যাতায়াতকালে নবাব এই মন্দিরের চূড়া দেখিতে পান এবং ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহা ভাঙিবার আদেশ দেন; মন্দিরস্বামী পরিবারস্থ লোকেরা তাহার পূর্বাভাগ বুঝিতে পারিয়া সপরিবারে বিগ্রহ সহ কিয়দ্দিনের জন্য স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মুসলমাগণ পোতাজিয়া আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করতঃ মন্দির মধ্যে হিন্দুধর্ম বিগর্হিত কার্যাদি সম্পাদন করেন এবং অগ্নি প্রদানে সমস্ত বাটি ভস্মীভূত করেন। তদবধি মন্দিরটি হতশ্রী হইতে থাকে। *ভবানীনাথ রায় ওরফে বি. এন. রায় প্রণীত হিন্দু বিজ্ঞান সূত্র দ্রষ্টব্য।*

উল্লিখিত বিবরণ হইতে এই মন্দিরের নির্মাণ সময়ের এবং ধ্বংসের পরিচয় কিয়ৎ পরিমাণে জানা যাইতেছে। এতৎ সম্বন্ধে জানা যায় যে, 'Tradition relates that one of the Mughal Nowab who was passing by Potazia on his way from

Murshidabad to Dacca ordered it to be demolished and the two top stories were pulled down. This may be connected with the orders issued by the Emperor Shah Jahan in 1632 and subsequently re-issued by Aurangazeb that all Hindu Temples which had recently been erected should be domolished. District Gagetter, Pabna. P. 120—121. অর্থাৎ স্থানীয় কিম্বদন্তীতে প্রকাশ জনৈক মোঘল নবাব মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকা যাতায়াত সময়ে মন্দির ভগ্নের আদেশ দেন এবং উপরের দুইটি তল ভাঙিয়া দেওয়া হয়। ইহা সম্ভবত ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে সাহাজান কর্তৃক প্রকাশিত এবং আওরঙ্গজেব কর্তৃক পুনপ্রকাশিত আদেশ—যে সমুদায় হিন্দু মন্দির সম্প্রতি নির্মিত হইয়াছে তাহা ভূমিসাৎ করিতে হইবে—সহ সংযোজিত করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত বিবরণাদি হইতে জানা যাইতেছে এই মন্দির মোঘল বাদশাহদিগের আমলে ঢাকা বঙ্গের রাজধানী থাকা সময়ে নবাব সরকারে দেওয়ান পদবীতে নিযুক্ত কর্মচারী গোবিন্দরাম রায় মহাশয় কর্তৃক নির্মিত হয় এবং মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার সমকালেই বিনষ্ট হয়।

২. হাটি কুমরুল ঃ

উল্লাপাড়া থানার অন্তর্গত অধুনা জঙ্গলময় হাটি কুমরুল গ্রামের গ্রামদ্বয় সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এথাকার ভগ্নাবশিষ্ট নবরত্ন মন্দিরের ন্যায় বিবিধ কারুকার্য খচিত হিন্দু দেবমন্দির পাবনা জেলার মধ্যে কুত্রাপি দেখা যায় না। ইহা কুমরুল গ্রামের ভাদুড়ীবংশের উজ্জ্বল কীর্তি এবং জেলার মধ্যে ভাস্কর শিল্পের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। হাটি নিকটবর্তী ভিন্ন গ্রাম হইলেও এই মন্দির হাটি কুমরুল গ্রামের নবরত্ন নামে পূর্বাপর পরিচিত। ইহা অবিকল দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তজী বিগ্রহের মন্দিরের আদর্শে নির্মিত। যাঁহারা কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত **বাঙ্গালার ইতিহাসে** উক্ত কান্তজীর মন্দিরের চিত্র দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই মন্দিরের নির্মাণ কৌশল ও কারুকার্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন ; অধুনা বহু কণ্টকাকীর্ণ ও বৃক্ষাদি সমাচ্ছাদিত হইলেও ইহার দ্বিতল এখনও আংশিক অক্ষতাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া নীরবে জঙ্গল মধ্যে অতীতকাহিনী জাগরুক রাখিয়াছে।

এই মন্দির ইস্টক নির্মিত। উচ্চতা প্রায় ১০০ হাতের উপর ছিল। বর্তমানেও প্রায় ৪০/৫০ হাতের উপর উচ্চ আছে। ইহা চতুষ্কোণ দোলমঞ্চাকার ; চারিদিকের বেষ্টন প্রায় ৩০০ ফিটের অধিক। মন্দির গাত্রে নানা প্রকার মূর্তি ও বহুসংখ্যক চিত্রাদি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত ইস্টক লালবর্ণ এবং পুরাতন হইলেও এখন পর্যন্ত একখানির গাত্রে লোনা ধরে নাই। প্রত্যেক ইস্টকখানির গাত্রে কিছু না কিছু শিল্পকার্য বিদ্যমান আছে। বাহ্যদৃষ্টিতে সহজেই চিত্তাকর্ষক এবং মনোরম। এমন সুন্দর অতি যত্নে ও ব্যয়ে নির্মিত দেবমন্দিরের জঙ্গল মধ্যে এমত পরিণতি দর্শন করিলে সাধারণ লোকেরও মনে সহসা উদাসভাব উদয় হইয়া থাকে। স্থানীয় প্রবাদ এই সমস্ত ইস্টক তেলে ভাজিয়া মন্দির নির্মাণ সময়ে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

প্রকাশ স্বর্গীয় রামনাথ ভাদুড়ি বহু অর্থব্যয়ে এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে নায়েব দেওয়ান ছিলেন। তৎকালে খাজনা আদায়ের কঠোর নিয়ম প্রচলিত ছিল ; বিশেষত মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে খাজনা আদায়ে ত্রুটি হইলে জমিদারগণ অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেন। কীস্তিমত হালগুজারি না দিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ জমিদারি নিলাম হইত, তদ্দারা বাকি রাজস্ব পরিশোধ না হইলে, জমিদারকে ধরিয়া নানাপ্রকার কষ্ট প্রদানে বাকি টাকা আদায় করা হইত। কাহাকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে হইত, কেহ বা অনাহারে সাপ্তাহিককাল আবদ্ধ থাকিতেন এবং কেহবা মলমুত্রাদি ঘৃণিত পদার্থ পরিপূর্ণ "বৈকুণ্ঠ" নামক কুণ্ডে বা হ্রদে পতিত হইয়া বাকি টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতেন। জানা

যায়—He (Murshid Kooly Khan) was severe in the execution of the revenue, None of the zeminders whom he empolyed, whether in the larger or smaller divisions, ever dared to keep back a single rupee of the Revenue, So great was the dread of his power that a single message from him was sufficient to bring in all arrears, ...One Nazir Ahmed is said to have subjected the Zeminders to every kind of torture, when their rent fell into arreaas. But Syed Raza Khan...exceeded all others in cruelty ; to enforce the collection, he caused a pond to be dug, which was filled with ordour and ntollerable filth. The Zeminder who withheld their rents, were dragged with a rope through this place which the inventor called by way of mockery "Bykoont or Paradise" *"History of Bengal" by J. C. Murshman, P. 95.* তাৎপর্য—মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব আদায়ের দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ছোট বড় সমস্ত জমিদারগণই রাজস্ব বাকি রাখিতে সাহসী হইত না। এক কথায় সমুদয় বাকি আদায় হইত। খাজানা আদায়ে ত্রুটি হইলে নাজির আহম্মদ অশেষ যন্ত্রণা দিত। কিন্তু সৈয়দ রেজা খাঁ সর্বাপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করেন। তিনি পূতিগন্ধ পরিপূর্ণ একটি স্থান দিয়া বাকি রাজস্ব আদায়ে অক্ষম জমিদারগণকে টানিয়া লইতেন এবং বিদ্রূপচ্ছলে উক্ত স্থানকে "বৈকুণ্ঠ" আখ্যাপ্রদান করিয়াছিলেন।

কুলি খাঁর কঠোর রাজস্ব আদায় প্রসঙ্গে বাংলার জমিদারগণের "বৈকুণ্ঠ" বাসের সত্যাসত্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এ সম্বন্ধে "বাঙ্গালার ইতিহাসে বৈকুণ্ঠ" (সাহিত্য—মাঘ—১৩০৪ সাল) শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে সম্যক অবগত হইবেন।

যাহা হউক, রামনাথ ভাদুড়ির সময়েও এতাদৃশ কঠোরতা বিদূরিত হইয়াছিল না। তৎকালে দিনাজপুর রাজের রাজস্ব বাকি পড়িলে উক্ত ভাদুড়ি মহাশয়ের উপর তাহা আদায়ের ভার অর্পিত হয়। তিনি দিনাজপুর উপস্থিত হইলে, তদানীন্তন রাজাবাহাদুর একযোগে সমুদয় টাকা পরিশোধে অসমর্থ হইয়া নবাবের উপরোক্ত অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ জন্য এবং কিছুদিন সময় দিয়া বাকি রাজস্ব আদায় নিমিত্ত রামনাথকে বহু অর্থ প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করেন। এইরূপে মহারাজ রামনাথের সহায়তায় নবাব দরবারে লাঞ্ছনার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

প্রবাদ রামনাথ এই উপলক্ষে দিনাজপুর হইতে লক্ষাধিক টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির নির্মিত হইতেছিল। রামনাথ তদ্দর্শনে প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া আশাতিরিক্ত প্রাপ্ত অর্থে স্বীয় বাসস্থলীতে তদনুরূপ একটি বিচিত্র কারুকার্য খচিত দেবালয় নির্মাণ করিতে মনস্থ করিয়া তথা হইতে মজুর ও কারিগরাদি আনাইয়া উক্ত মন্দিরের আদর্শে এই নবরত্ন মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

মন্দির গাত্রে কোন খোদিত লিপি নাই। কিন্তু কান্তজীর মন্দির ১৬৯২ খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রাণনাথের সময়ে আরম্ভ হইয়া ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামনাথের সময়ে সমাপ্ত হয় এরূপ জানা যায়। এই সময়ে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার নবাব ছিলেন। সুতরাং এই নবরত্ন মন্দির তাঁহার শাসন সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত পরে নির্মিত হওয়া সম্ভব।

মন্দির মধ্যে কোন স্থায়ী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া জানা যায় না। কেবলমাত্র প্রতিবৎসর দোলযাত্রা সময়ে রাধাকৃষ্ণ ও গোপাল বিগ্রহের দোলোৎসব হইত, তৎপর শূন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকিত। কেবলমাত্র দোলোৎসবে ব্যবহৃত জন্য উহার অন্য নাম দোলমঞ্চ। সিরাজগঞ্জের ভূতপূর্ব মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বিটসন বেলসাহেবের চেষ্টায় এই মন্দির আসন্ন

বিনাশ হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, নচেৎ এতদিন ইহার ইস্টকাদি অপসারিত ও বিক্রি হইয়া যাইত।

নবরত্ন মন্দিরের ঈশান কোণে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পার্শ্বে ভাদুড়ি বংশীয় মুকুন্দনাথ ভাদুড়ি মহাশয় প্রতিষ্ঠিত একটি শিব মন্দির অদ্যাপি বর্তমান আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তরলিপি দৃষ্টে জানা যায় ইহা ১৭৬৪ শকাব্দে (১৮৪২ খ্রিঃ) নির্মিত হইয়াছিল। অন্যত্র বর্তমান আছে কিনা জানা যায় না, কিন্তু এই গ্রামে ভাদুড়ি বংশ এক্ষণে একেবারে নির্মূল ও বিলুপ্ত, কীর্তি আজিও বিরাজমান।

সমীরণোৎ ক্ষিপ্ত পতাকা মঞ্চ
স্প্রদাৎ দ্বিজ শ্রীল মুকুন্দনাথঃ
ভবায় বেদর্তুমুনীন্দ্রমান শাকে মুকুন্দেশ্বর সম্প্রতুষ্ট্যে।

খ. জগন্নাথের মন্দির—হাণ্ডিয়াল ঃ

চাটমোহর থানার অন্তর্গত হাণ্ডিয়াল (হাড়িয়াল) অতি প্রাচীন গ্রাম ; বর্তমানে ইহা অতীব জঙ্গলাকীর্ণ। এখানে অনেক পুরাতন মসজিদ, মন্দির ও মঠ প্রভৃতি জঙ্গলমধ্যে অতীত কীর্তির নিদর্শনস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মন্দিরসমূহ মধ্যে জগন্নাথ দেবের মন্দির এখন পর্যন্ত দৈনিক সেবা পূজা ও সাময়িক পার্বণাদি রীতিমত চলিতেছে। ইহার নির্মাণ প্রণালী দৃষ্টে ইহা সাধারণত চারি শতাধিক বৎসরের উর্ধকালের নির্মিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইস্টক নির্মিত ; অনেক অংশ বসিয়া গেলেও, বর্তমানে ইহার উচ্চতা প্রায় ২৫ হাত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকেই ৭ হাত। মন্দিরগাত্রে বিশেষ কোন কারুকার্য বর্তমান নাই।

এই মন্দির কোন সময়ে কাহার কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে, তাহা সবিশেষ জানা যায় না। অধুনা পশ্চিমদ্বারী যে মন্দিরে বিগ্রহমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে একখণ্ড প্রস্তরলিপিতে নিম্নলিখিত শ্লোক খোদিত আছে—

শাকে পক্ষেন্দু বাণজ্বগণিতে
শ্রীজগৎপতে শ্রীমৎ ভবাণী
প্রসাদেন ভগ্নপ্রাসাদাঃ উদ্ধৃতঃ।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৫১২ শকাব্দে (১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে) অর্থাৎ অদ্য হইতে ৩৩৫ বৎসর পূর্বে ভবাণীপ্রসাদ নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এই মন্দিরের একবার জীর্ণ সংস্কার হয় ; অতএব তাহার পূর্বে ইহা নির্মিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বর্তমান মন্দির পার্শ্বে অপর একটি পুরাতন মন্দির বিদ্যমান ছিল, তাহা বিগত ১৮৯৭/৯৮ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে ; জানা যায় তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকাংশ লিখিত ছিল—

নেত্রাক্ষিবেদবলমিতে ... ...

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, ১৪২৩ শকাব্দে (১৫০১ খ্রিস্টাব্দে) অর্থাৎ ৪২৪ বৎসর পূর্বে উক্ত মন্দির নির্মিত বা তাহার সংস্কার হইয়াছিল। উপরোক্ত খোদিত লিপিসমূহের বিবরণ ও মন্দিরের অবস্থা দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এই জগন্নাথ বিগ্রহ চারি শতাধিক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত।

এই বিগ্রহ মূর্তির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রবাদ এই বিগ্রহ হাণ্ডিয়ালের জনৈক নিষ্ঠাবান তন্তুবায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নীলাচলক্ষেত্র পুরীধামে গমন করিয়া রথযাত্রার নির্দিষ্ট দিনে তথায় পৌছিতে পারেন নাই ; তখন তৎপ্রতি স্বপ্নাদেশ হয়, নিজ বাটিতেই তিনি শ্রীজগন্নাথ দেবমূর্তি দর্শন করিতে পারিবেন। তদনুসারে তিনি বাটি প্রত্যাবর্তন করতঃ করতোয়া নদী তটে ভাসমান জনৈক সন্ন্যাসী প্রাপ্ত নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা বর্তমান

জগন্নাথ বিগ্রহমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সম্ভবত তাঁহার সময়ে বা তৎপরবর্তীকালে মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।

হাণ্ডিয়ালে যে এক কালে বর্ধিষ্ণু ও স্বধর্মপরায়ণ তন্তুবায়াদি জাতির বাস ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ জানা যায় এখানে প্রচুর পরিমাণে রেশমাদি আমদানি হইত এবং করতোয়া নদীতটে ইহা একটি সমৃদ্ধশালী বন্দররূপে পরিগণিত ছিল। সমস্ত হিন্দুস্থানে যত রেশমসূত্র পাওয়া যাইত, এক হাণ্ডিয়ালেই তাহার চারি পঞ্চমাংশ আমদানি হইত। (দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) এমতাবস্থায় এখানে বস্ত্রশিল্পজীবী তন্তুবায় জাতির বাস বিশেষ সম্ভব এবং এই বিগ্রহও তাহাদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব নহে।

অন্যান্য স্থানে সর্বত্র প্রায় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই ত্রিমূর্তি একত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে কেবলমাত্র জগন্নাথ বিগ্রহমূর্তি বিরাজমান ; ইহা উচ্চে তিন হাত এবং দেখিতে সুশ্রী। দৈনিক সেবা পূজার সুব্যবস্থা ছিল ও আছে। তবে সেবাইতের ত্রুটিতে পূর্বাপেক্ষা সমারোহের অনেক হ্রাস হইয়াছে এমন শুনিতে পাওয়া যায়।

এই বিগ্রহের দৈনিক সেবা পূজা পরিচালনার্থ বহু দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দিষ্ট ছিল ; বর্তমানেও প্রায় ১৭৫ বিঘা পরিমাণ দেবোত্তর জমি আছে। পূর্বে **অধিকারী** আখ্যাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশ বিগ্রহের সেবাইত ছিলেন ; এক্ষণে তদ্বংশ বিলুপ্ত, তাহাদের জামাতা বংশীয় **তলাপাত্র** উপাধিক ব্রাহ্মণবংশ ইহার সেবাইত নিযুক্ত আছেন।

গ. কপিলেশ্বর শিবমন্দির—তাড়াস ঃ

তাড়াস গ্রামে বিনোদরায়, গোবিন্দজী, রসিক রায়, কপিলেশ্বর শিব প্রভৃতি বিগ্রহের দৈনিক পূজার্চনাদি জন্য অনেকগুলি পুরাতন দেবমন্দির বর্তমান আছে। এখানকার নবরত্ন মন্দির আধুনিক এবং দ্বিতল ও চূড়াদি ব্যতীত ইহাতে বিশেষ কোন শিল্পকার্য বর্তমান নাই। ইহা অধুনা গোবিন্দজী অথবা বিনোদ রায়ের দৈনিক পূজা ও পার্বনাদি সময়ে দেবমন্দির রূপে ব্যবহৃত হয়।

উপরোক্ত মন্দিরগুলি মধ্যে কপিলেশ্বর শিবমন্দির অতি প্রাচীন ও বিচিত্র কারুকার্য বিশিষ্ট। ইহা দক্ষিণদ্বারী ; অধুনা অনেকাংশ বসিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহা এখনও প্রায় ২৫ হাত উচ্চ ; দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয়দিকেই প্রায় ৭ হাত। প্রাচীনকালের আদর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইস্টকে নির্মিত এবং ইহার গাত্রে অনেক দেবদেবীর মূর্তিসহ অনেক কুৎসিত চিত্রাদিও অঙ্কিত আছে। ইহাতে নিম্নলিখিত দুইটি খোদিতলিপি বর্তমান আছে।

শাকে বাজিশরাগুগেন্দু গণিতে শ্রীরাম দেবাৎ পরঃ।
শ্রীনারায়ণ দেব এব সুকৃতিঃ স্বর্লোক লোকেত্তরঃ।
প্রাসাদাং শ্রুতি দৃষ্টতো নিরুপমং ভক্ত্যা দদৌ সম্ভবে।
মাতুঃস্বর্গসুখ প্রয়াণ করণে সোপনমেকং ভূরি।
ইতি শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৫৭ শ্রীগৌরাঙ্গ জয়তি।

ভাবার্থ ১৫৫৭ শকাব্দে (১৬৩৫ খ্রিঃ) কৃতিবান নারায়ণ দেব মাতার স্বর্গারোহণ সৌকর্যার্থে পৃথিবীতে সোপানস্বরূপ অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব এই মন্দির শম্ভুকে দান করিয়াছিলেন।

কালাগ্নি তর্কেন্দুমিতে শকাব্দে
বরং শিবস্যালয়মিষ্টকাদ্যৈঃ।
জীর্ণং ফুটগ্নোদ্বরতেস্ম ভক্ত্যা
তস্মিন প্রবীণ বলরাম দাসঃ।

ভাবার্থ ১৬৩৬ শকাব্দে (১৭১৪ খ্রিঃ) প্রবীণ বলরাম রায় ভক্তিসহকারে ইস্টকাদি দ্বারা এই শিব মন্দির একবার জীর্ণ সংস্কার করিয়া দেন।

এই শিবলিঙ্গমূর্তি এতদ্দেশে অনাদি শিবলিঙ্গ বলিয়া পরিচিত। প্রবাদ নারায়ণ দেব একদা বঙ্গের রাজধানী ঢাকা গমন কালে জঙ্গল মধ্যে আবৃত স্থানে এক স্থলে একটি দুগ্ধবতী গাভীকে দুগ্ধক্ষরণ দেখিয়া বিস্ময়াবিশিষ্ট হন। দেখিবামাত্র গাভী অন্তর্হিত হয়। তিনি দুগ্ধসিক্ত স্থান খনন করতঃ এই শিবমূর্তি অবলোকন করেন। পরে ঢাকা হইতে সফলকাম সহকারে বাটি প্রত্যাবর্তনপূর্বক এই বাণলিঙ্গের প্রতি ভক্তি পরবেশ হইয়া তাহা নিজ ভবন চড়িয়া গ্রামে লইতে ইচ্ছা করতঃ তাহাকে খুঁড়িতে আরম্ভ করেন। তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া পরিশেষে বহু ব্যয়ে ও যত্নে বর্তমান কারুকার্যখচিত এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন এবং কালক্রমে স্বগ্রাম পরিত্যাগপূর্বক এখানে ভদ্রাসন বাটি নির্মাণ করতঃ বাস করিতে থাকেন।

ঘ. শেঠের বাঙ্‌লা—হাণ্ডিয়াল ঃ

হাণ্ডিয়ালে শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সাহাদিগরের বাগানের উত্তর কোণে পথপার্শ্বে সুন্দর সুঠাম বাঙ্‌লা গৃহ সদৃশ ইস্টক নির্মিত একটি পরিত্যক্ত ও অব্যবহার্য দেবমন্দির শেঠের বাঙ্‌লা নামে অভিহিত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ হাত, প্রস্থ ৫ হাত, উচ্চতা ৭ হাত। ইহার গাত্রে নানাবিধ হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। দ্বারদেশের শিরোভাগে নিম্নলিখিত—

বিধূসুন্যসপ্তাবনি সংখ্যা
সাকে ব্রজরাম দাসস্য সু
তেন গেহেন্দু কৃত হিতার্থায়
বদেবতয়ো পূর্ব্বসিতা বেদমনয়ত।

খোদিতলিপি দৃষ্টে জানা যায় ইহা ১৭০১ শকাব্দে (১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে) ব্রজরাম দাসের পুত্র কর্তৃক দেবতার উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল।

স্থানীয় প্রবাদ এই বাটি মুর্শিদাবাদের ইতিহাসবিশ্রুত জগৎ শেঠের বাটি বা কুঠি ছিল। পূর্বে ধনী মাত্রেরই শেঠ উপাধি ছিল। আবার জানা যায় জগৎ শেঠ তৎকালে ধনাঢ্য ব্যক্তির একটি উপাধি ছিল। বাঙ্‌লা ১১৪১ সালে নাটোরাধিপতি রাজা রামকান্ত জলাশয় খনন জন্য মৌজে দরাপপুর পরগণে হাণ্ডিয়াল মধ্যে ব্রজরাম প্রামাণিককে যে পাঁচ বিঘা জমি লাখেরাজ দান করেন, উক্ত পুষ্করিণী অদ্যাপি জলছত্র পুষ্করিণী নামে পরিচিত এবং উক্ত ব্রজরাম প্রামাণিক পূর্বোক্ত মুকুন্দলাল সাহাদিগরের পূর্বপুরুষ। অদ্যাবধি উক্ত পুষ্করিণীও তাঁহাদিগের এজমালিতে দখল আছে বলিয়া জানা যায়। কালে হয়ত এই বাণিজ্যজীবী বৈশ্য কুলোদ্ভব সাহা উপাধিক মহাশয়দিগের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, তজ্জন্য তাঁহাদেরও শেঠ উপাধি হইয়াছিল। অথবা পূর্বে ইহা প্রকৃত জগৎ শেঠের কারবারি কুঠি ছিল, তাহাই কালক্রমে ইহাদিগের হস্তগত হওয়ায় ইহাদিগের পূর্ব পুরুষ ১৭০১ শকাব্দে এখানে দেবোদ্দেশ্যে বর্তমান বাঙ্‌লা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ঙ. জোড় বাঙ্‌লা—পাবনা ঃ

পাবনা শহরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি পাড়ার নাম "জোড় বাঙ্‌লা"। এরূপ নামকরণ হইবার কারণ এখানকার প্রাচীন দেবমন্দির জোড় বাঙ্‌লা ; ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইস্টক নির্মিত ও সবিশেষ কারুকার্য সমন্বিত এবং বাঙ্‌লা গৃহ সদৃশ অগ্রপশ্চাৎ সংযুক্ত দুইটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি দেবগৃহ বা মঠ বিশেষ। দুইটিরই উপরিভাগ অর্ধচন্দ্রাকার ; সম্মুখে মন্দিরগাত্রে লোহিতবর্ণের ইস্টকোপরি নানারূপ শিল্পকার্যের নিদর্শনস্বরূপ হিন্দুর দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে। ইহার নির্মাণকৌশল এবং কারুকার্যাদি অতি সুন্দর ও দর্শনযোগ্য। একত্র দুইটি বাঙ্‌লা-গৃহসদৃশ মন্দির বর্তমান থাকায় ইহার নাম জোড় বাঙ্‌লা। ইহা অনেকাংশে মৃত্তিকা গর্ভে

:প্রাথিত হইয়াছে; তথাপি এখন উচ্চে ২২ হাত, দৈর্ঘ্যে ১৬ হাত এবং প্রস্থে ১৪ হাত। প্রাচীরের বেদ ৩ হাত।

ইহার অভ্যন্তরে বর্তমানে কোন বিগ্রহ বর্তমান নাই। অধুনা ইহা অব্যবহার্য ও ভগ্নদশায় পরিণত। গাত্রে ও উপরিভাগে নানাবিধ বৃক্ষ ও কণ্টকাদি জন্মিয়াছে। পূর্বে ইহা গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দির স্বরূপে ব্যবহৃত হইত এবং উক্ত বিগ্রহ স্থানীয় অন্য আখড়ায় স্থান পাইয়াছে। জীর্ণ হইলেও ইহা একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। চেষ্টা করিলে এখনও রক্ষিত এবং ইচ্ছা করিলে ব্যবহারোপযোগীও হইতে পারে।

এই মন্দির কোন সময়ে কাহার কর্তৃক নির্মিত হয়, তাহা সঠিক জানা যায় না। স্থানীয় প্রবাদ ইহা ব্রজমোহন, কাহারও কাহারও মতে ব্রজবল্লভ রায় ক্রোড়ড়ী (ক্রোড়পতি) নামক পাবনা নিবাসী জনৈক কায়স্থ নাগরিক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। তিনি কোন সময়ের লোক ছিলেন তাহাও সঠিক জানা যায় না। নবাবী আমলে ক্রোড়ড়ী একটি উপাধি বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইত। যথা—Translate of Nowab Ebrahim & King Dewan's Parwana for the English their paying only Rs. 3000 yearly for their trade A. H. 1002-3, A. D. 1612-22.

"To all Mutsudis, Corrowries, Jaggirdars, Gomostas, Phousdars, Jimmadars, Cannongos, belonging to the Subaship of Bengal now in service or that shall be hereafter." *Stuwart's History of Bengal appendix VIII.*

পাবনার অনতিদূরে হিমাতইপুর সংলগ্ন ছাতনি (ছাউনি) গ্রামে মোঘল সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেনানিবেশে ব্রজবল্লভ রসদ সরবরাহকার, কেহ কেহ বলেন জিম্বাদার ছিলেন। তাঁহার প্রচুর ধন সম্পত্তি ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, ক্রোড়ড়ী আখ্যা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

প্রবাসী—বৈশাখ—১৩৩০ সালের প্রশ্নোত্তর বিভাগে মোঃ মনসুরউদ্দিন শাহজাদপুরী প্রশ্ন করেন যে—পাবনা শহরতলী কালাচাঁদ পাড়ায় যে জোড় বাঙ্‌লা আছে, উহা কোন সময়ে কাহার দ্বারা স্থাপিত? তদুত্তরের মীমাংসায় প্রবাসী—আষাঢ়—১৩৩০ সালের উক্ত পত্রিকার ৩৩০ পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন যে, "এই জোড় বাঙ্‌লা সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, পাবনাবাসী ব্রজমোহন ক্রোড়ী (ক্রোড়পতি) নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ে এই মন্দির নির্মাণ করাইয়া শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।"

পাবনা থানার অন্তর্গত গোঁসাইরামপুরের গোস্বামীগণ এই জোড় বাঙ্‌লা প্রতিষ্ঠাতা তথা কথিত ব্রজমোহনের গুরুদেব বলিয়া পূর্বাপর পরিচিত; তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসায় জানা যায় ইহার নির্মাতার প্রকৃত নাম ব্রজবল্লভ ক্রোড়ড়ী। আবার উপরোক্ত ছাতনি (ছাউনি) গ্রামের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সান্যাল মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত সন ১০১৪ সালের ১৫ কার্তিক তারিখের এক খণ্ড দলিলে লিখিত আছে যে জনৈক ব্রজবল্লভ দাস উক্ত সান্যাল মহাশয়ের পূর্বপুরুষ বাজারাম শর্মাকে মৌজে ছাতনি, পরগণে ধুলদি সরকার মহাম্মদাবাদ মধ্যে আট বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন। প্রকাশ উক্ত দলিলবর্ণিত ব্রজবল্লভ দাসই পাবনার এই জোড় বাঙ্‌লা নির্মাতা; তখন ছাতনি (ছাউনি) প্রভৃতি অঞ্চল তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল বা তিনি এতদঞ্চলের জিম্বাদার ছিলেন।

আরও কিম্বদন্তী আছে যে, ব্রজবল্লভ ছাতনি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বাদশাহী সেনানিবেশের কর্মচারীর অনুপস্থিতে তথাকার কোষাগার হইতে বহুতর গুপ্ত ধনরত্নাদি অপসারিত করিবার মানসে পাবনা মাঝিপাড়ার কুঠির দক্ষিণ পূর্ব দিক দিয়া পদ্মা হইতে ইছামতী নদী পর্যন্ত যে একটি নালা কাটিয়াছিলেন, তাহা এখনও কোষাখালির জোলা নামে পরিচিত। পরে

ব্রজবল্লভের কৃতকার্যের বিষয় প্রকাশিত হওয়ায় তিনি অপহৃত ধনরত্ন জোড় বাঙ্লার উত্তর দিকস্থ কানাপুকুর নামক সুবৃহৎ জলাশয়ে লুক্কায়িত রাখিয়া মুসলমানগণ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন। তদ্বেতু ব্রজবল্লভ এবং তাঁহার গুরুদেব বংশীয় প্রাগুক্ত গোঁসাইরামপুরের গোস্বামীগণ অনেকদিন পর্যন্ত হিন্দু সমাজে আবদ্ধ ছিলেন, এরূপ প্রবাদ এখনও প্রচলিত আছে।

ক্রোড়ড়ী উপাধি এবং ছাতনি গ্রামের সেনানিবেশের কোষাগার অপহরণের কিম্বদন্তী হইতে ব্রজবল্লভের ধন সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ১০১৪ সালের দলিল অনুসারে ব্রজবল্লভকে কোনক্রমেই নবাব সিরাজদৌল্লার সমসাময়িক লোক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সিরাজদৌল্লা বা তাঁহার বহু পূর্ব হইতে এরূপ বাঙ্লাগৃহ নির্মাণপ্রণালী এদেশে প্রচলিত ছিল সন্দেহ নাই। সুতরাং উক্ত দলিল ও কোষাখালির জোলার উৎপত্তির প্রবাদ একত্রে বিবেচনা করিলে বাংলার নবাবী পদ সৃষ্টির বহু পূর্বে খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে এই জোড় বাঙ্লা নির্মাতা ব্রজবল্লভের জীবিত থাকা ও তৎসময়ে এই মন্দির নির্মিত হওয়া বিশেষ সম্ভব। ব্রজমোহন তাঁহার প্রচলিত নাম হইলেও উক্ত দলিল অনুসারে ব্রজবল্লভই তাঁহার প্রকৃত নাম, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পাবনায় ব্রজবল্লভের কোন সন্তান সন্ততি বর্তমান নাই। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন কি কায়স্থ ছিলেন, তাহা জানিবার কোন সঠিক উপায় নাই। তবে হিমাইতপুরে প্রাপ্ত ১০১৪ সালের উপরোক্ত দলিলে ব্রজবল্লভ দাসস্য বলিয়া দস্তখৎ আছে, ইহাতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হয় না, কারণ তাহা হইলে দাসস্য স্থলে শর্ম্মণঃ উল্লেখ থাকিত। মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নাম রাধাগোবিন্দই হউক, আর গোপীনাথই হউক, তাহা যে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ; এতদিন ইহা স্থানীয় জয়কালীবাড়িতে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, সম্প্রতি জোড় বাঙ্লার বর্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীরামচন্দ্র সরকার নামক জনৈক স্থানীয় শ্মশান কালীবাড়ির পূজক কর্তৃক পূজিত হইতেছেন ; আর এই প্রাচীন দেবমন্দির এদেশের স্থাপত্যবিদ্যার জীর্ণ জয়পতাকা শিরে বহন করিয়া এখনও অতীত কীর্তির নিদর্শনস্বরূপ নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া মানবের নশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত হাটুরিয়া গ্রামে গোস্বামীগণের বাটিতে ইস্টক নির্মিত একটি প্রাচীন বাঙ্লা এবং পোরজনা, সলপ, স্থল, বোথর প্রভৃতি পল্লীতে আধুনিক নানাবিধ অল্পবিস্তর কারুকার্যখচিত ইস্টক নির্মিত মঠ, মন্দির ও দেবালয় বর্তমান আছে ; তাঁতিবন্দের দোলমঞ্চদ্বয় আধুনিক হইলেও দর্শনযোগ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—প্রাচীনত্বের নিদর্শন

ক. বিগ্রহাদি ঃ

প্রাচীনত্ব জ্ঞাপক স্থায়ী চিহ্নস্বরূপ অতীত যুগের প্রতিষ্ঠিত কোন পীঠস্থানাদি, প্রস্তরময়ী বিগ্রহ বা তদুদ্দেশ্যে নির্মিত বিচিত্র শিল্পকলা পরিশোভিত দেবমন্দির এই জেলায় বর্তমান নাই। প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ জেলার অভ্যন্তরে যে কয়েকটি স্থানে প্রস্তরময়ী বিগ্রহমূর্তি বিদ্যমান আছে তৎসমুদয় একেবারে দর্শনের অযোগ্য নহে ; বরং তাহার অনেকগুলিই অতিশয় প্রাচীন, সুদৃশ্য এবং জেলার মূল্যবান সম্পত্তি ও গৌরবাত্মক। এতৎসমূহের দৈনিক পূর্জার্চনাদি ও

রক্ষণাদির ভার নিরক্ষর ও যত্নহীন পূজক পরিচারকাদির হস্তে রহিয়াছে; তাহারা ইহাদের মূল্য ও মর্যাদা আদৌ অবগত নহে। দেশের লোক ও উক্ত বিগ্রহাদির স্বত্বাধিকারিগণ তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। কেবলমাত্র বৈদেশিক ইংরেজ বা ভিন্ন জেলাবাসী দেশিয় হাকিম বিচারকগণ মফঃস্বলে ভ্রমণে বাহির হইলে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সময় সময় ইহাদের অনুসন্ধান লইয়া থাকেন; তাহাও সাময়িক মাত্র।

জল জঙ্গলময় কেবলমাত্র সুদূর বিস্তৃত প্রান্তর বিশিষ্ট পাবনা জেলায় একেবারে কিছুই নাই বলিয়া যাঁহারা একেবারে দেশের তথ্যানুসন্ধানে বীতস্পৃহ, তাঁহাদের একবার জড়তা পরিহারপূর্বক নিজের দেশের এই সমস্ত প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তিসমূহের তথ্য ও বিবরণ অবগত হওয়া আবশ্যক। সীমাবদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট মাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা এতৎসমূহের প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য অনুসন্ধিৎসু লেখকগণের দৃষ্টি এই জেলার নিভৃত পল্লীপ্রান্তে অযত্নে রক্ষিত দেবমূর্তিসমূহের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদের প্রকৃত তথ্য উদঘাটিত হয়, তদুদ্দেশ্যে নিম্নে কয়েকটি বিগ্রহের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইল।

১. চৈতন্য ভৈরবী—উধুনিয়া ঃ

উল্লাপাড়া থানার অধীন সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল লাইনের দিলপসার কিংবা মোহনপুর উভয় স্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে উধুনিয়া গ্রাম। এখানকার সিংহ উপাধিধারী কায়স্থ জমিদারগণের ইস্টক নির্মিত প্রাচীন দক্ষিণদ্বারা দোলমঞ্চ বা নবরত্ন মন্দির মধ্যে চৈতন্য ভৈরবী নামে এক কালিকা দেবীমূর্তি দৈনিক পূজিত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত এখানে সাময়িক পার্বণাদিরও অনুষ্ঠান হয়।

কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত সম্পূর্ণ প্রতিমাখানি চালি সমেত উচ্চে দেড় হাতের কিছু বেশি, প্রস্থেও তদ্রূপ। প্রকাশ এই মূর্তি সিংহবাবুদিগের এলাকা উধুনিয়া হইতে দুই মাইল উত্তরে চন্দনগাতি নামক গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে পাওয়া গিয়াছিল। মূর্তি প্রাপ্তির পর এই জেলার পেচাখোলা নিবাসী ভট্টাচার্যগণ দেবী অর্চনার মন্ত্র অবগত আছেন; স্বপ্নাদেশে এমত জানিতে পারিয়া সিংহ জমিদারগণ উক্ত ভট্টাচার্যগণকেই দেবীর পুরোহিত নিযুক্ত করেন এবং তদবধি তাঁহারাই ইহার পূজক আছেন। তবে অধুনা সর্বত্র বিরাজমান উড়িয্যাবাসী ব্রাহ্মণের হস্তে ইহার দৈনিক পূজার ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

দেবী পদ্মের উপর সমাসীনা ও ষড়ভূজা; ত্রিনেত্র বিশিষ্টা, প্রধান চক্ষুদ্বয় অর্ধ নিমীলিত; গলদেশে মালা, কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে জটা, দক্ষিণ দিকে উর্ধ হস্তে গদা, মধ্য হস্তে অঙ্কুশ. নিম্ন হস্তে অভয়, বামদিকে উর্ধ্ব হস্তে ধনু, মধ্য হস্তে পাশ, নিম্ন হস্তে পানপাত্র।

পদ্মাসনের নিম্নে শায়িত মনুষ্যমূর্তি; দেবীর শিরোভাগে প্রতিমার চালিতে উপবিষ্ট শিবমূর্তি; তন্নিম্নে উভয় পার্শ্বে উড্ডীয়মান গন্ধর্বমূর্তি, তন্নিম্নে দুইদিকে রাজহংস মূর্তি, তন্নিম্নে উভয়দিকে সিংহ, তাহার তলে উভয় পার্শ্বে হস্তী মূর্তি বর্তমান আছে। দৈনিক পূজার ব্যবস্থা আছে, ভোগাদির বিশেষ নিয়ম নাই। মোটর উপর এই বিগ্রহমূর্তি দর্শনযোগ্য এবং সযত্নে রক্ষিত হওয়া কর্তব্য।

২. সিদ্ধেশ্বর—নরসিংহপাড়া ও চৈত্রহাটি ঃ

এই জেলার কোন কোন গ্রামে প্রস্তরময়ী দেবী (?) মূর্তি সিদ্ধেশ্বরী কালিকা দেবী নামে এবং এমন কি গ্রাম বিশেষে অনেক বৃক্ষাদি পর্যন্ত সিদ্ধেশ্বরীতলা নামে পূজিত হইয়া থাকে। নরসিংহপাড়া, চৈত্রহাটি, করঞ্জা, রতনগঞ্জ, বেতিল প্রভৃতি যে কয়েকটি গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী পূজা ও তদুপলক্ষে বার্ষিক সপ্তাহাধিক কালস্থায়ী মেলাদির অনুষ্ঠান হয়, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রামদ্বয়ে প্রস্তরময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহাদের দৈনিক অর্চনাদি হইতেছে। অন্যত্র কোনরূপ প্রস্তর বা মৃন্ময় মূর্তি বিদ্যমান নাই, তৎ তৎ স্থানে কেবলমাত্র নাতিউচ্চ (এক হস্ত পরিমাণ)

মৃত্তিকাস্তূপ সিন্দুর, তৈল ও দুগ্ধাদিতে সমাচ্ছাদিত বা সিক্ত হইয়া মানসকল্পে পূজিত হইয়া আসিতেছে। নরসিংপাড়া, চৈত্রহাটির প্রস্তর মূর্তি সিদ্ধেশ্বরী কালিকা দেবী জ্ঞানে ও ধ্যানে পূজিত হইলেও, নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে এই মূর্তিসমূহকে সহসা কালিকা দেবীমূর্তি বলিয়া বোধ হয় না। ইহা বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে প্রচলিত অবলোকিতেশ্বরাদি বৌদ্ধমূর্তি বিশেষ বলিয়া অনুমান হয়। এই সকল সিদ্ধেশ্বরী, ভবানী প্রভৃতি নামে পূজিত আমাদের দেশের জলাশয়াদিতে প্রাপ্ত মূর্তিসমূহ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের স্বরূপ নিরূপণ ও তথ্য উদঘাটনের ভার বিশেষজ্ঞ ও মনীষিগণের উপর রহিল, নিম্নে কেবলমাত্র কয়েকটি বিগ্রহমূর্তির সংগৃহীত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

ক. নরসিংপাড়া ঃ

সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেললাইনের মোহনপুর স্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে নরসিংপাড়া গ্রাম বিলময় প্রদেশে অবস্থিত। বর্তমানে এখানে একটি উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর ২/৪ ঘর লোকের বাস। বরিশাল জেলাবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ এখানকার সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পূজক। বর্তমানে গ্রামটি তাড়াস জমিদারের অধীনে পোতাজিয়া নিবাসী শ্রীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্তনীর অন্তর্গত সামান্য একখানি করুগেট টিনের গৃহে রক্ষিত বা পূজিত প্রস্তরময়ী সিদ্ধেশ্বরী দেবীমূর্তি বিরাজমান। প্রতিমার চালি সহ সম্পূর্ণ মূর্তিখানি উচ্চে তিন হাত ও প্রস্থে এক হাতের কিছু বেশি। ইহা ৪ চারি হস্ত বিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে মাত্র দক্ষিণ দিকের এক হস্ত বিদ্যমান আছে; অন্য তিন হাত ভগ্ন। যে হাত আছে তাহাতে পাথরের মালা, গলদেশেও পাথরের উপবীত বা উত্তরীয় পরিধানে কারুকার্য খচিত প্রস্তরে খোদিত কাপড়। পদ্মের উপর দেবী স্থির নেত্রে দণ্ডায়মান। পাদদ্বয় সমভাবে পদ্মের উপর স্থাপিত। সম্পূর্ণ মূর্তিখানি প্রস্তর নির্মিত, কেবলমাত্র কটিদেশে দুই পার্শ্বে ফাক আছে।

মূর্তির দক্ষিণ দিকে গণেশ বা শুঁড় বিশিষ্ট অর্থ হাত পরিমাণ মনুষ্য মূর্তি; তন্নিম্নে সিংহমূর্তি। বামদিকে সাধারণ মনুষ্যমূর্তি, কেহ কেহ বলেন নটরাজ শিবমূর্তি। তন্নিম্নে ষাঁড়ের মূর্তি। মূর্তির উপরিভাগে ও তৎপার্শ্বে শায়িত বা হেলান ত্রি-জটা শিবমূর্তি। দুই পার্শ্বেই তন্নিম্নে হস্তীর উপর মনুষ্যমূর্তি; তন্নিম্নে উভয় দিকেই সিংহমূর্তি।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত বিচিত্র কারুকার্য পরিশোভিত মূর্তিখানি সর্বথা দর্শনযোগ্য। ইহা অতীত যুগের ভাস্কর শিল্পের নিদর্শন। ইহা অপেক্ষা অনেক সাধারণ প্রস্তর মূর্তি প্রাচীন যুগের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ সযত্নে কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। আর এমন সুন্দর সুঠাম মূর্তিখানি অনাদরে কেবল দৈনিক সাধারণ পূজা প্রান্তে সামান্য ভগ্নপ্রায় টিনের চালায় রক্ষিত হইতেছে। মূর্তির তিন খানি হাত ভগ্ন থাকায় এই মূর্তি এ দেশে **হাত কাটা ঠাকুরাণী** নামে পরিচিত। তাড়াশ জমিদার স্বর্গীয় শম্ভু রায় মহাশয় প্রদত্ত লাখেরাজ দেবোত্তর এবং সাধারণ লোকের পূজা মানসিক দ্বারা দেবীর দৈনিক ও বার্ষিক সেবা পূজা নির্বাহ হয়; নাককাটি ঠাকুরাণী নামেও ইহা খ্যাত।

এই সিদ্ধেশ্বরী বিগ্রহ মূর্তি কালিকা ধ্যানে পূজিত হইতেছেন, কিন্তু ইহার ত্রিনেত্রের অভাব, হস্তে মালাদৃষ্টে পূজক মহাশয় বলিলেন, ইহা **মহালক্ষ্মী**ও হইতে পারে। যাহা হউক পূর্বাপর এই মূর্তি **সিদ্ধেশ্বরী** নামে পরিচিতা হইয়া আসিতেছেন; ইহা কোন সময়ে কাহার দ্বারা স্থাপিত তাহা সঠিক জানা যায় না। ইহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের ভার সুবিজ্ঞ পাঠক ও বিশেষজ্ঞগণের উপর; ইহার তথ্য উদঘাটন জন্য সাধারণের দৃষ্টি ঈদৃশ মূর্তি সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। সৈয়দপুর গ্রামে দুর্গাদহের শ্মশান ঘাটে অবিকল এতাদৃশ একখানি মূর্তি রৌদ্র বৃষ্টিতে ক্রমশ নষ্ট হইতেছে।

খ. চৈত্রহাটি ঃ

উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় সাত মাইল পশ্চিম দিকে অধুনা জঙ্গলাকীর্ণ চৈত্রহাটি নামক পল্লীতে সিদ্ধেশ্বরী নামে যে কালিকা দেবীমূর্তি দৈনিক পূজিত হইতেছেন, তাহা অনেকাংশে নরসিংপাড়ার সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি সদৃশ। তবে আয়তনে এখানকার দেবীমূর্তি কিঞ্চিৎ উচ্চ ও ইহার প্রতিমা অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার।

সম্পূর্ণ প্রতিমাখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত। দেবীমূর্তি মানুষের সমান উচ্চ ; ইহার দক্ষিণে গণেশ মূর্তি, বামেও মনুষ্যমূর্তি, তাহা কার্তিকেয় মূর্তি নামে খ্যাত হয়। তদুপরিও মনুষ্যমূর্তি তাহা লক্ষ্মী সরস্বতী দেবী নামে অভিহিত হয়। দেবীর দুই হাত বর্তমান আছে। পদ্মের উপর পাষাণময়ী দেবীমূর্তি স্থিরনেত্রে দণ্ডায়মান আছেন। দেবীসহ সম্পূর্ণ প্রতিমাখানি প্রস্তর গাত্রে খোদিত বলিয়া অনুমান হয়। তাড়াস নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় এখানকার পুরোহিত, তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসায় তিনি বলেন, এই দেবীমূর্তি বিন্দুবাসিনী কিংবা দশভূজা মূর্তিও বলা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতে দৈনিক পূজায় সুরথ রাজার নামে সংকল্প হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্য এই দেবী সুরথ রাজার সময় হইতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন।

মন্দিরের নিকটে ইস্টক নির্মিত ৪/৫ হাত গভীর খাত বিশিষ্ট একটি কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহা সাধারণত যজ্ঞকুণ্ড নামে পরিচিত। এই যজ্ঞকুণ্ডের অনতিদূরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে একটি বিল্ববৃক্ষ আছে, তথায় লোকে অন্নপ্রাশন বা চূড়াকরণ উপলক্ষে সংস্কারবশত সন্তানের দীর্ঘ জীবন ও শ্রীবৃদ্ধি কামনায় মস্তক মুণ্ডন করতঃ কেশাদি প্রদান করিয়া থাকে।

পূর্বদ্বারী ইস্টকনির্মিত মন্দিরে দেবী অবস্থিত আছেন, ইহা অতি প্রাচীন ও নানাপ্রকার কারুকার্য খচিত ছিল। বর্তমানে মন্দিরের উপরের কতকাংশ নষ্ট হইয়াছ। কালীবাড়ি ও চৈত্রহাটি সম্পত্তি রাজশাহী জেলার ধবাইল নিবাসী চৌধুরী উপাধিক বৈশ্য সাহা বংশীয় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চৌধুরীপ্রমুখ জমিদারগণের এলাকাভুক্ত। দেবীর সেবা পরিচালনার্থ বার্ষিক ৬০০ ছয় শত টাকা লাভের দেবত্র সম্পত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত জমিদারগণ বার্ষিক ১০৮ একশত আট টাকা মাসহারা ও আবশ্যকমত অতিরিক্ত ব্যায়াদিও বহন করিয়া থাকেন।

মায়ের পূজা দিলে সর্ববিঘ্ন বিনাশ হয়, এমত প্রবাদ থাকায় ব্যাধি, দৈন্য দুরীকরণ মানসে বহু লোক উপস্থিত হইয়া যে যাহা ইচ্ছা, ছাগ বোয়াইল মৎস্য প্রভৃতি মানসিক করিয়া থাকে। বোয়াইল মাছ এখানকার একটি প্রধান মানসিক। প্রতি অমাবস্যা ও রটন্তীপূজার সময় ব্যতীত প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে এখানে হিন্দু মুসলমান বহু দর্শক ও যাত্রিগণ সমবেত হয়।

কালীবাড়ির নিকট কয়েকটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা বর্তমান আছে। গ্রামে কয়েকঘর মুসলমান এবং মাহিষ্য জাতির বাস এবং ধরাইল জমিদারের তহশীল কাছারি ব্যতীত অন্য কোন লোকালয় নাই, সম্পূর্ণ গ্রাম জঙ্গলাকীর্ণ। কালে এখানে বর্ধিষ্ণু লোকের বাস ছিল, তাহা সহজেই অনুমান হয়। চৈত্রহাটির পশ্চিমাংশে অনু খাঁর দিঘি নামে প্রায় ৬০ বিঘা পরিমাণ বিস্তৃত একটি বৃহৎ জলাশয় বর্তমান আছে।

চণ্ডীর লিখিত নর্মদা পুলিনে মেধস আশ্রমের সহিত এই চৈত্রহাটির কাল্পনিক সংযোগও কেহ কেহ করিয়া থাকেন, তাহা সহসা বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না। তবে চৈত্রহাটির উত্তর পশ্চিম দিক দিয়া একটি মৃত নদীর খাতের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে; তাহা সুতাহাটির শ্মশান ঘাট নামে পরিচিত। ইহাতে বোধ হয় কালে করতোয়া নদী এতদ্দেশে প্রবাহিত থাকা সময়ে এই প্রদেশ তান্ত্রিক যুগে অতি সমৃদ্ধিশালী পল্লী বলিয়া পরিচিত ছিল এবং তৎকালেই বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের মূর্তিসমূহ এদিকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সুরথ রাজা কে তাহাও সম্পূর্ণ বিবেচ্য।

গ. সিমলা মোরদহ ঃ

সর্বপ্রথমে এই জেলায় প্রতিষ্ঠিত না হইলেও, জানা যায় যে, উল্লাপাড়া থানার অধীন সিমলা মোরদহ গ্রামে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ব্রহ্মচারী নামক বারেন্দ্র শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের বাটিতে সিদ্ধেশ্বরী নামে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত মূর্তিখানি বহুদিন হইতে দৈনিক পূজিত হইয়া আসিতেছে। প্রতিমা সমেত মূর্তিখানি প্রায় এক হাতের কিছু বেশি উচ্চ।

দেবী পদ্মের উপর বামপদ ভাঙিয়া দক্ষিণ পদ উত্তোলন পূর্বক উপবিষ্টা ও ষড়ভূজ বিশিষ্টা। দক্ষিণ দিকে উপরে হস্তে... মধ্য হস্তে গদা, নিম্ন হস্তে বর ; বামদিকে উপর হস্তে... মধ্য হস্তে...নিম্নহস্তে পাশ। পদ্মাসনের নিম্নে শায়িত একটি মনুষ্য মূর্তি বর্তমান আছে।

প্রকাশ এই মূর্তি পূর্বে এই গ্রামে ছিল না ; ইহা **রাজশাহী জেলার অধীনস্থ বর্ষণ গ্রামে বিদ্যমান ছিল** ; জনৈক ব্রাহ্মণ ইহা আনিয়া এই ব্রহ্মচারী মহাশয়দিগের পূর্বপুরুষ স্বর্গীয় রাধানাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে প্রদান করেন। তিনি তান্ত্রিক মতে জপ তপস্যায় নিয়ত থাকিতেন, তজ্জন্য তিনি ব্রহ্মচারী উপাধি লাভ করেন। ইহাদের বাটির উত্তর দিকে গভীর জল বিশিষ্ট একটি মৃত নদীর খাত বা সোতা বর্তমান আছে ; তাহা সাধারণত চণ্ডীদহ নামে পরিচিত। প্রবাদ তিনি এখানে বসিয়া তপস্যা করতঃ সিদ্ধিলাভ করেন ; তদ্ধেতু লোকে এই গভীর জলাশয়কে তপস্যা বলে খনিত বলিয়া থাকে। স্থানটি অতি নির্জন, শান্তিময় ও সর্বথা দর্শনযোগ্য।

দেবী পার্শ্বে "নিস্তারিণী দেবী" নামে মৃন্ময়ী চতুর্ভূজ বিশিষ্টা একখানি কালিকা মূর্তিও দেবীসহ দৈনিক পূজিত হইয়া থাকে। প্রকাশ উপরোক্ত চণ্ডীদহে প্রাপ্ত তাম্র নির্মিত গোলাকার একটি যন্ত্রের মধ্যে রক্ষিত বীজমন্ত্রে এই মৃণ্ময়ী প্রতিমা প্রতি বৎসর নির্মিত হয় এবং বর্ষশেষে বিসর্জনান্তে পুনরায় নির্মিত হইয়া দৈনিক পূজিত হইয়া থাকে।

সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সেবাপূজা পরিচালানার্থ কিঞ্চিৎ দেবত্র সম্পত্তি আছে।

৩. ভবানী—সরগ্রাম ঃ

পাবনা স্টেশন হইতে প্রায় ১৫ মাইল উত্তর পূর্বাংশে সাথিয়া পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত জলকা নামক বিলের ধারে সরগ্রাম অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন পল্লী। বর্তমানে এখানে অধিকাংশই মুসলমান, মাত্র ২/৩ ঘর হিন্দুর বাস ; কালে এখানে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ স্থাপয়িতা নাগবংশীয় জটাধর নাগ প্রভৃতির আবাস ছিল বলিয়া জানা যায়।

সরগ্রামে বাৎস্য গোত্রীয় রাঢ়ীশ্রেণীর "ব্রহ্মচারী" উপাধিক ব্রাহ্মণদিগের বাড়িতে ভবানী নামে প্রস্তরময়ী কালিকা দেবীর দৈনিক সেবা বর্তমান আছে। এই বিগ্রহ মূর্তি বর্তমান সেবাইতগণের দশ পুরুষ পূর্বে বীরনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সময়ে নিকটবর্তী জলাশয়ে পাওয়া যায়। নাটোরাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণের সময়ে ইহাদের পূর্বপুরুষ জনৈক ভৈরবানন্দ ভট্টাচার্য তাহার উত্তর সাধক ছিলেন, তজ্জন্য তাহার ব্রহ্মচারী আখ্যালাভ হয়। তখন হইতে ইহারা ব্রহ্মচারী আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভবানী দেবী চতুর্ভূজবিশিষ্টা ; দক্ষিণের প্রথম হস্তে—শিবলিঙ্গ, দ্বিতীয় হস্তে—ত্রিশূল ; বামে প্রথম হস্তে—বর, দ্বিতীয় হস্তে—কমণ্ডলু। দেবীর দক্ষিণদিকে গণেশ মূর্তি ; বামে কালভৈরব মূর্তি, ইহার চারিহাত, এক হস্তে একটি ত্রিশূল আছে। গণেশের নিম্নে মুষিক, তন্নিম্নে সিংহ। কালভৈরবের নিম্নে ঘোটক মূর্তি। দেবীর মস্তকে মুকুট। দুই পার্শ্বে একই রকম মনুষ্য মূর্তি। সম্পূর্ণ প্রতিমাখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত ; উচ্চে প্রায় দুই হাত এবং প্রস্থে প্রায় এক হাতের উপর। দেবী পদ্মের উপর দণ্ডায়মান।

এই মূর্তির ত্রিনেত্রের অভাব এবং হস্তে কমণ্ডলু দৃষ্টে বর্তমানে ইহা দক্ষিণা কালিকাধ্যানে পূজিত হইলেও ইহাকে কালিকাদেবী বলিয়া অনুমান হয় না ; ইহা বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগের প্রচলিত কোন বিগ্রহ বলিয়াই বোধ হয়। মূর্তিখানি অতি সুন্দর ও সুদৃশ্য।

দেবীর সেবা পূজা পরিচালনার্থ কিয়ৎ পরিমাণ দেবত্র সম্পত্তি আছে। নিকটবর্তী একটি স্থান মঠবাড়ি নামে পরিচিত। তৎপার্শ্বে কয়েকটি প্রাচীন দীর্ঘিকার নিদর্শন দৃষ্টে এখানকার পূর্ব সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

৪. বাসুদেব বিগ্রহ মূর্তি ঃ

শঙ্খচক্রগদাপদ্মের স্থাপন ভেদে বাসুদেব মূর্তি চতুর্বিংশতি প্রকার বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে। এতৎসমূহের অধিকাংশই প্রস্তর নির্মিত ; কোন কোন স্থানে ধাতু মূর্তিও বিদ্যমান আছে জানা যায়। এই বাসুদেব মূর্তি কোন সময়ে এতদ্দেশে প্রচলিত হয়, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। গুপ্ত সম্রাটগণ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের মুদ্রায় লক্ষ্মীমূর্তি পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য অনেকে অনুমান করেন তাঁহাদের রাজত্ব সময়ে খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর পর হইতে এদেশে বিষ্ণু পূজাপদ্ধতি ও বাসুদেবমূর্তি প্রচলিত হওয়া সম্ভব। তাঁহাদের রাজত্বের শেষাংশে খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীর পর এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে সেন রাজাগণের সময়ে এ দেশে বৌদ্ধধর্ম বিলোপসাধনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম পুনর্বার জাগরিত হইতে থাকে। তখন সেনরাজগণের সময়ে রাজ্য মধ্যে অনেক তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়েও অনেক প্রকার বিষ্ণুমূর্তি দেশ মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল। এদেশের বিষ্ণুমূর্তি, বাসুদেব মূর্তিও তৎকালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব এবং তাহার নিদর্শনও অদ্যাপি এই জেলায় বর্তমান রহিয়াছে।

পাবনা জেলায় অধুনা যে সকল বাসুদেব মূর্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তন্মধ্যে অধিকাংশগুলিই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত শঙ্খচক্রাদি হস্তে দণ্ডায়মান মূর্তি। কিন্তু নরসিংপাড়া সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ও কাঁটারবাড়ি গ্রামের সূর্যমূর্তির মন্দির মধ্যে বিষ্ণুবাহন গরুড় স্কন্ধে উপবিষ্ট শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি বিদ্যমান আছে। ইহাদের উভয়খানিই প্রায় এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ এবং শিল্পকার্য পরিশোভিত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত।

দণ্ডায়মান বাসুদেব মূর্তি মধ্যে পোতাজিয়া, শঙ্করপাশা, গুণাইগাছা, বাবুলদহ, গোবিন্দা (হাণ্ডিয়ালে প্রাপ্ত) প্রভৃতি গ্রামের বাসুদেব মূর্তি প্রধান। এতদ্ব্যতীত তাড়াস গ্রামে দুইস্থানে অনেকগুলি বাসুদেব মূর্তি সংগৃহীত আছে।

সুদূর অতীত যুগে এই বাসুদেব বিগ্রহমূর্তির পূজা এদেশে প্রচলিত থাকিলেও এখন পর্যন্ত এই মূর্তির পূজাপদ্ধতি আমাদের দেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। এই বিগ্রহ এখন পর্যন্ত হিন্দুর গৃহে বাসুদেব ও বিষ্ণুমূর্তি নামে এই জেলার পোতাজিয়া (শাহজাদপুর) এবং শঙ্করপাশা (সাথিয়া) গ্রামে দৈনিক পূজিত হইতেছেন এবং ইঁহাদের পূজার্চনাদির নিমিত্ত দেবোত্তরাদি নিষ্কর ভূমি পূর্বাপর নির্দিষ্ট আছে।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল তারিখের গরবলনী চিঠার একখণ্ড নকল দৃষ্টে জানা যায়, পোতাজিয়া গ্রামে কায়স্থ বংশীয় শ্রীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পূজিত বাটিতে **দয়ামাধব** নামে পরিচিত বাসুদেব বিগ্রহের সেবা পরিচালন জন্য পরগণে ইউসুপশাহীতে ১১৮২ সালের প্রদত্ত বাসুদেব ঠাকুরের সেবাইত অনন্তরাম রায়ের নামে ২/০ দুই বিঘা (?) দেবোত্তর জমি নির্দিষ্ট ছিল। সাথিয়া স্টেশনের অধীন শঙ্করপাশা গ্রামে শ্রীযুক্ত রামগোপাল ভৌমিক (ভাগিনেয় যাদবচন্দ্র বৈষ্ণব) মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত ১০১৫ সালের ১০ মাঘ তারিখের লিখিত একখণ্ড দলিলদৃষ্টে জানা যায় মৌজে মহম্মদপুর ও গোবিন্দপুর পরগণে বাজুচপ্প সরকার মহাম্মদাবাদ মধ্যে বর্তমানে শঙ্করপাশা গ্রামে উক্ত ভৌমিক মহাশয়ের বাটিতে দৈনিক পূজিত প্রস্তরময়ী বাসুদেব মূর্তির সেবা পূজাপরিচালনার্থে ২।০ সোয়া দুই খাদা জমি দেবোত্তর নির্দিষ্ট ছিল ও এখনও আছে।

এই সকল পাষাণময়ী বাসুদেব মূর্তি প্রস্তর গাত্রে খোদিত শঙ্খচক্রগদাপদ্ম হস্তে দণ্ডায়মান, কোন খানি ৩ হাত, কোন খানি ২ হাত, কোন খানি ১।।০ হাত পরিমাণ উচ্চ ; তাড়াস গ্রামে

যে কয়েকখানি মূর্তি রক্ষিত আছে, তাহাই সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ। মূর্তির উভয় দিকে নৃত্যশীল বাদ্যযন্ত্রাদি হস্তে দণ্ডায়মান মনুষ্যমূর্তি। সমস্ত মূর্তিগুলিই সুন্দর সুদৃশ্য এবং শিল্পকলা পরিশোভিত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত। অধুনা এই সমস্ত প্রাচীন বিগ্রহাদি ভারতের জীর্ণ ভাস্কর শিল্পের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া লোকের গৃহকোণে এবং স্থানে স্থানে গ্রামের প্রান্তে অবজ্ঞাত বা অজ্ঞাত অবস্থায় বৃক্ষাদি তলে নীরবে অতীত শিল্পের পরিচয় দিতেছে। এই সকল বিগ্রহমূর্তি পূর্বে এদেশে পূজিত হইত এবং উপরোক্ত স্থানে এখনও দৈনিক অর্চিত হইয়া থাকে। ধর্ম বা রাষ্ট্রবিপ্লব সময়ে এই সকল মূর্তির কতক জলাশয়াদিতে নিক্ষিপ্ত অথবা লুকায়িত হইয়াছিল, তজ্জন্য অধিকাংশগুলি দীর্ঘিকাদি খননকালেই পাওয়া যায়।

৫. দশভূজা মূর্তি—দৌলতপুর ঃ

শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত দৌলতপুর (খুক্নি) গ্রামে মিত্র মজুমদার মহাশয়দিগের বাড়িতে পালাক্রমে পূজিত একখানি ধাতুময়ী দশভূজা-মূর্তি দৈনিক পূজিত হইয়া থাকে। এই মূর্তি সম্বন্ধে ১৩১৯ সালের **বরিশাল সাহিত্য পরিষদ** শাখা হইতে প্রকাশিত **চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবরণ** হইতে জানা যায়, উক্ত রাজবংশের স্থাপিত তিনটি দেবমূর্তি ছিল, তাহার প্রথমটি **গোপীজনবল্লভ**, (রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ) ঢাকা জেলার উপাইল গ্রামে, দ্বিতীয়টি **বাসুদেব**, ঢাকা জেলার ধামাই-এর যশোমাধব, তৃতীয়টি পিত্তল নির্মিত **দশভূজা-মূর্তি**, পাবনা জেলার দৌলতপুর (খুক্নি) গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছে। আরও লিখিত আছে যে "হরিনারায়ণ মিত্র মজুমদারের এক ভ্রাতা দর্পনারায়ণ কোন কারণে ঢাকার নবাবের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তিনি উক্ত দৌলতপুরে আসিয়া তথায় বাসস্থান নির্মাণ করেন। তিনি এই দশভূজা ঠাকুরাণীকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন ; তথায় তাঁহার বংশীয়েরা এখনও বর্তমান আছে।" (চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ পৃঃ ৩৭)

উপরোক্ত দর্পনারায়ণ মিত্র মজুমদার যৎকালে উপাইল গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দৌলতপুরে আগমন করেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণ মিত্র মজুমদারের পুত্র কালীনারায়ণ মিত্রকে স্বীয় সম্পত্তির আদায় তহশীলের জন্য ২৫ বৈশাখ ১১২১ সালের লিখিত যে অধিকারপত্র প্রদান করেন, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি ১১২১ সালে এই জেলায় আগমন করিয়াছিলেন। উক্ত দলিলের নকল যথাস্থানে উদ্ধৃত হইবে, তাহা হইতে তৎকালীন বাংলা ভাষা ও সামাজিক রীতি জানিতে পারা যায়।

এই দশভূজা মূর্তি পিতল-নির্মিত, উপরে সোনার গিলটি করা বলিয়া বোধ হয়। মালিকগণ বলেন ইহা অষ্টধাতুময়ী। দুই দিকে লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্তি, প্রতিমার উপরিভাগে বৃষভারোহণে মহাদেব মূর্তি ; সিংহবাহিনী দেবী অসুরকে দমন করিতেছেন ; সর্বসমেত মূর্তি উচ্চ প্রায় এক ফুটের কিঞ্চিৎ অধিক। দৈনিক সেবা পূজা ও পার্বনাদির জন্য প্রায় বার্ষিক হাজার টাকা লাভের দেবত্র সম্পত্তি বর্তমান ছিল, এক্ষণে অনেক কমিয়া গিয়াছে, তথাপি প্রায় ৫/৬ শত টাকা আদায়ে স্থাবর সম্পত্তি দেবীর সেবার জন্য নির্দিষ্ট আছে। পালাক্রমে দেবী মালিকগণের বাটিতে মাসিক ও দৈনিক পূজিত হইয়া থাকেন।

এই মিত্র বাবুদের বাড়িতে একটি ইস্টকনির্মিত প্রাচীন মঠ মধ্যে ৫ পাঁচটি ছোট বড় প্রস্তরময়ী শিবলিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ; তাঁহারও দৈনিক পূজার ব্যবস্থা আছে।

৬. সূর্য মূর্তি—কাঁটারবাড়ি ঃ

রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত পাবনা জেলার পশ্চিমোত্তর সীমা সংলগ্ন রাজশাহী জেলার গুরুদাসপুরের পূর্বে বিল মধ্যবর্তী কাঁটারবাড়ি নামক গ্রামে জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোকের বাড়িতে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত সামান্য কারুকার্য বিশিষ্ট দ্বিভূজবিশিষ্ট দণ্ডায়মান প্রায় তিন হাত উচ্চ একখানি মূর্তি বহুদিন হইতে সূর্যমূর্তি নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহা দৈনিক বিশেষ

ভাবে পূজিত না হইলেও, সসম্মানে রক্ষিত হইতেছে। মূর্তিখানি অতি সুন্দর ও সুদৃশ্য। জানা যায় এই বিগ্রহের সেবা পরিচালন জন্যও কিঞ্চিৎ দেবোত্তরাদি বর্তমান আছে। এদেশে সূর্য পূজা নানা আকারে প্রচলিত আছে, তবে সূর্যমূর্তির পূজাপদ্ধতি কোন সময়ে প্রচলিত ছিল এবং এ মূর্তি কাহার দ্বারা এখানে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সম্যক তথ্য আলোচিত হওয়া কর্তব্য। মূর্তিখানি পল্লীর এই নিভৃত কোণে অজানিত অবস্থায় বহুদিন হইতে অবস্থিত আছে; ইহার প্রতি জেলাবাসী ও দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক।

৭. হরগৌরী মূর্তি—বোথড় ঃ

চাটমোহর থানার অধীন বোথড় গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশীয় চৌধুরী উপাধিক ভূম্যাধিকারিগণের বাটিতে ইস্টক নির্মিত একটি পুরাতন মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময়ী একখানি দেবীমূর্তি হরগৌরী নামে দৈনিক পূজিত হইয়া থাকে। শিবের ক্রোড়দেশে গৌরী উপবিষ্টা; চালি সমেত মূর্তিখানি প্রায় এক হাত উচ্চ। ইহাতে বিশেষ কোন কারুকার্য বিদ্যমান নাই। দেবীর সেবা পূজা পরিচালনার্থ কিয়ৎপরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি নির্দিষ্ট আছে। চৌধুরী মহাশয়গণ দেবীর সেবাইত সূত্রে উক্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করিয়া থাকেন।

প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ জেলার অভ্যন্তরে অধুনা বিরাজমান প্রধান প্রধান কয়েকখানি পাষাণময়ী প্রাচীন বিগ্রহমূর্তির কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল। ইহা সঠিক ও সম্পূর্ণ বলা যায় না। উপরোক্ত বিগ্রহগুলি ব্যতীত উল্লাপাড়া থানার অধীন খাদুলীগ্রামে মাঠের মধ্যে একটি মৃত্তিকাস্তূপের উপর একখানি ভগ্ন প্রস্তর মূর্তি অনেকদিন হইতে গণেশমূর্তি নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহা ভগ্ন, মাত্র পদদ্বয়ের কতকাংশ বর্তমান আছে; মূর্তিখানি দ্বিজভূজ ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়, ইহা সিমলা মোরদহ গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী কালিমূর্তির ন্যায়। অতি মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত; লোক ইহাকে পবিত্রজ্ঞানে সিন্দুর দুগ্ধাদিতেও সিক্ত করিয়া থাকে।

নরনিয়া (শাহজাদপুর) গ্রামে বট বৃক্ষতলে একখানি এবং নিমগাছি (তাড়াস) গ্রামে ৮/১০ হাত উচ্চ স্তূপের উপর একখানি ৭ হাত দীর্ঘ, ১॥ হাত প্রস্ত এবং প্রায় ১॥ হাত বেদ বিশিষ্ট একই রকমের প্রস্তরখণ্ড পতিত রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেক খানিতেই কর্ণে কুণ্ডল বিশিষ্ট উপর্যুপরি তিনটি করিয়া মনুষ্যমূর্তি অঙ্কিত আছে। নিমগাছির প্রস্তরখণ্ডের নিম্নের মূর্তিটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি বলিয়াই অনুমান হয়। প্রস্তরখণ্ডদ্বয়ই কোন দরজার উপরিভাগে স্থাপিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে কামারজানি (পাবনা) নামক গ্রাম ভগ্নকালে পদ্মার গর্ভ হইতে যে প্রস্তর স্তম্ভ চতুষ্টয় পাওয়া যায়, তাহা এক্ষণে কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ইহাতেও প্রাচীন কালোচিত কারুকার্য খোদিত আছে।

এতদ্ব্যতীত এই জেলায় অনেকের বাড়িতে এবং সাধারণ দেবালয়ে প্রস্তর ও ধাতুময়ী গোপাল ও রাধাকৃষ্ণ এবং কালিকা দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তালম (রায়গঞ্জ) এবং নবগ্রাম (তাড়াস) গ্রামে প্রায় দুইহাত উচ্চ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময়ী এবং হাণ্ডিয়ালে শ্রীযুক্ত শ্রীধর গোস্বামী মহাশয়ের বাটিতে শুভ্রবর্ণ প্রস্তরময়ী পঞ্চমুখী শিবলিঙ্গ বর্তমান আছে।

খ. জলাশয় ও দীর্ঘিকাদি ঃ

১. জয়সাগর ঃ

রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত নিমগাছি নামক প্রাচীন পল্লী প্রান্তরে "জয়সাগর", উদয় দীঘি", "প্রতাপ দীঘি" প্রভৃতি নামে যে কয়েকটি সুদুর বিস্তৃত প্রাচীন জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ও জেলার প্রাচীনত্বের একটি বিশেষ নিদর্শন। এই দীর্ঘিকাসমূহ হিন্দু রাজত্বকালে খনিত বলিয়া জানা যাইতেছে। ইহার কোন কোনটির জল এক্ষণে অব্যবহার্য এবং এই সকল

পুষ্করিণী ক্রমশ ভরিয়া যাইতেছে। জয়সাগরের উপরিভাগে এতাধিক পরিমাণে শৈবাল ও ঘাস জন্মিয়াছে যে, তাহার উপর গোমহিষ্যাদি পর্যন্ত চরিয়া বেড়াইতে পারে। কিন্তু নিচে জল থাকে। বর্তমান সময়ে ইহার ন্যায় সুবৃহৎ দীর্ঘিকা পাবনা জেলার কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার এক পার হইতে অপর পারের লোক ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহার মধ্যস্থলে একটি দ্বীপ আছে, তদুপরি একটি বিল্ববৃক্ষ বহুদিন হইতে বর্তমান ছিল। দ্বীপটি দীর্ঘিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায়, কেহই সহসা তথায় যাইয়া উক্ত বৃক্ষের ফল লইতে সমর্থ হইত না। তৎসম্বন্ধে এখনও নিম্নলিখিত ছড়া বা কবিতাংশ এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে—

"যার আছে গায় ত্যাল্ (তৈল)।
সে খায় জয়সাগরের ব্যাল্ (বেল)"।।

এই প্রাচীন জলাশয় খনন প্রসঙ্গে "ভবানীপুর কাহিনী" প্রণেতা শ্রীতারিণীচরণ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন যে "উক্ত জয়সাগর রাজা অচ্যুৎসেন খনন করাইয়াছিলেন। বর্তমান বগুড়া জেলার ভবানীপুর নামক পীঠস্থানের উত্তরাংশে বল্লালসেন প্রতিষ্ঠিত কমলপুরী নামক স্থানে সেনরাজগণ প্রায় ২০০ দুইশত বৎসর প্রথমে স্বাধীন, পরে সামন্তরাজ রূপে করতোয়াতটস্থ প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অচ্যুৎসেন এই প্রদেশের শেষ নরপতি।" *ভবানীপুর কাহিনী—৬৫/৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।* "তাঁহার (অচ্যুতসেনের) সময়ে গৌড় নগরে ফিরোজ শাহ নবাব ছিলেন। ১৫৩৩/৬৪ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ পুত্র বাহাদুর শাহ উক্ত সেনরাজের অনুপম সুন্দরী কন্যা ভদ্রবতীকে বলপূর্বক হরণ করিবার মানসে কমলপুরী আক্রমণ করেন। নিমগাছির সুবিস্তৃর্ণ প্রান্তরে মুসলমান সৈন্যসহ যুদ্ধে রাজা জয়লাভ করেন।"

(ভবানীপুর কাহিনী—৯২/৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

রাজা অচ্যুতসেন যুদ্ধজয়ের স্থায়ী নিদর্শন রাখিতে উদ্যোগী হইলে, যে কীর্তি বহুকাল স্থায়ী এবং যাহাতে প্রজাপুঞ্জের উপকার হয়, সেইরূপ কীর্তি সংস্থাপন আর্য নরপতির উদ্দেশ্য। ....বৃদ্ধ ভূপতি ঐহিক ও পারলৌকিক ফল প্রত্যাশায় চারিটি সরোবর খনন করাইলেন। ইহার তিনটির প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য হাজার হস্তের ন্যূন হইবে না। আর একটি বৃহৎ, তাহার দৈর্ঘ্য অর্ধ মাইল হইবেক। জয়যুক্ত হওয়াই এই দীর্ঘিকার নাম জয়সাগর রাখা হইয়াছিল। চারি পারে ২৮ আঠাইশটি ঘাট ছিল অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্তমান আছে। মহাপীঠস্থানের দক্ষিণে নিমগাছি নামক ক্ষুদ্র পল্লীর পশ্চিমাংশে জয়সাগর শোভা পাইতেছে। ইহার নিকট প্রিয় ভৃত্য উদয়ের নামে উদয়দীঘি এবং উদয়দীঘির এক মাইল পূর্বোত্তরে প্রতাপ দীঘি অদ্যাপিও সেনাপতি প্রতাপের নাম ঘোষণা করিতেছে। চতুর্থ সরোবর রাজধানী কমলাপুর নগরী অল্প দক্ষিণে রাজকুমারী ভদ্রাবতীর নামে খনিত।"

(ভবানীপুর কাহিনী—৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই জয়সাগরকে পাল রাজগণের সময়ে (খ্রিস্টিয় ৯ম শতাব্দীতে) জয়পাল কর্তৃক খনিত বলিয়া অনুমান করেন ; তিনি বলেন, "বগুড়া জেলায় আদম দীঘি স্টেশনের অধীন উত্তরবঙ্গ রেলপথের তিলিকপুর স্টেশনের পূর্বদিকে ৪ মাইল দূরে যে পুণ্ডরী বা পুণ্ডরীয়া নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহাই কেহ গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন স্থির করিয়াছেন। এখানে পৌণ্ড্রের রাজধানী থাকা অসম্ভব নহে। কারণ ইহার পার্শ্বে 'দেওরা' বা দেবপালের রাজবাটি, তাহার দেড় ক্রোশ দূরে রামশালা গ্রাম, তাহার কিছুদূরে আদমদীঘি থানার নিকট রামপুর ও রামনীগাঁ, তাহার ৩ ক্রোশ দক্ষিণে রেল লাইনের ১ মাইল দূরে বড়বাড়িয়া গ্রাম, তাহার পার্শ্বে বিজয়কান্দি ও যশোহর গ্রাম এবং ২৷৷ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বে 'জয়সাগর' রহিয়াছে। উক্ত গ্রামসমূহ হইতে আমরা প্রসিদ্ধ পালবংশীয় দেবপাল, জয়পাল ও রামপালের নাম পাইতেছি।" *"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১১৮/১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।*

পাল রাজগণের সময়ে হউক আর সেনরাজগণের সময়েই হউক, ইহা যে হিন্দুরাজত্বকালে খনিত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অধুনা জয়সাগরের পঙ্কোদ্ধার করা সম্ভবপর বোধ হয় না। তবে ইহার চতুস্পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ড স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হয়, এদেশে বসতি বিস্তার ঘটিলে এবং দেশের লোকের দৃষ্টি এই প্রাচীন জলাশয়ের প্রতি নিপতিত হইলে, ইহার জলরাশিও ব্যবহারোপযোগী করা যাইতে পারে। জয়সাগর ব্যতীত নিমগাছি অঞ্চলে চতুস্পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে মধ্যে মধ্যে অতি স্বচ্ছ সলিল বিশিষ্ট অনেক দীর্ঘিকা বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে এই সমস্ত প্রাচীন জলাশয়ের অধিকাংশগুলিই তাড়াস জমিদার মহাশয়দিগের এলাকাভুক্ত ; তাঁহারা সামান্য মনোযোগী হইলে ভিন্ন স্থান হইতে প্রজা আনয়ন করিয়া এতদঞ্চলে পত্তন করিলে, এ অঞ্চল আবার সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইতে পারে। উদ্যোগী ও দেশহিতৈষী ভূম্যাধিকারীর অভাবে এদেশ ক্রমশ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতেছে।

২. ময়দান দিঘি ঃ

তাড়াস আউট পোস্টের অধীন বিলময় প্রদেশে একটি প্রাচীন গ্রামের নাম ময়দান দিঘি। গ্রামটির এরূপ নামকরণ হইবার কারণ এখানকার প্রাচীন জলাশয়। ইহার আয়তন যে বৃহৎ তাহা ইহার নাম হইতেই অনেকাংশ উপলব্ধি হয়। বর্তমান সময়ে এই প্রাচীন জলাশয়টি এখানকার বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের মজুমদার উপাধিক দাস বংশীয় ভূম্যাধিকারিগণের এলাকা ভুক্ত। তাঁহাদের সকলেই বিদেশে প্রবাসী ; এমন কি গ্রামে মাত্র কয়েকঘর মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন বসতি পর্যন্ত নাই। প্রবাদ মুসলমান রাজত্বের প্রাক্কালে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ এই বিলময় প্রদেশে জলাশয় খনন করিয়া এখানে বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন। পূর্বে এখানে বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির বাস ছিল। এই দীর্ঘিকাটি প্রায় অর্ধ মাইল বিস্তৃত, বর্তমানে ইহার খাত প্রায় সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। উপরিভাগ শৈবালাদিতে আচ্ছাদিত, জল একেবারে অব্যবহার্য। পাঠান রাজত্বকালে রাজ্য মধ্যে রাজানুকম্পায় ও দেশহিতৈষী সদাশয় মহাত্মাগণ কর্তৃক যে সকল দীর্ঘিকা ও জলাশয় খনিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন এই জেলার শিতলাই, সমাজ, মরিচপুরাণাদি জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীতে অদ্যাপি বর্তমান আছে। এই ময়দানদীঘি কোন সময়ে কাহার দ্বারা খনিত হইয়াছে, তাহা সঠিক জানিবার কোন উপায় নাই। উক্ত গ্রাম সমূহের ন্যায় এই সুপ্রাচীন দীর্ঘিকাও মুসলমান আমলে খনিত বলিয়াই অনুমান হয়।

গ. প্রাচীন জাঙ্গাল ও রাজবর্ত্ম ঃ

১. ভীমের জাঙ্গাল ঃ

রায়গঞ্জ থানার পশ্চিমোত্তরাংশে বিলময় প্রদেশে স্থানে স্থানে বহুদূরে পর্যন্ত বিস্তৃত লোহিতবর্ণের যে সকল মৃত্তিকা স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাজ্যরক্ষাকল্পে নির্মিত মৃৎপ্রাকার (Embankment) বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই সকল মৃত্তিকা স্তূপকে কেহ কেহ পাল রাজত্বকালের ২য় মহীপালের সময়ের (১০৫৫/৫৬ খ্রিস্টাব্দের) কৈবর্ত নায়ক ভীম কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন দুর্গপ্রাকার, কেহ কেহ এতৎসমূহকে একটি প্রাচীন রাস্তার অংশ বিশেষ এবং কেহ কেহ এই সকল উচ্চ ভূখণ্ডসমূহকে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী কর্তৃক বিলময় প্রদেশে যাতায়াতের সুবিধার্থ নির্মিত রাজবর্ত্মের নিদর্শন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন ; তাহা প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, "রামচরিতে লিখিত আছে, ভীম নিজ রাজধানী সুদৃঢ় করিবার মানসে রাজধানীর উপকণ্ঠস্বরূপ একটি সুদৃঢ় "ডমর" নির্মাণ করিয়াছিলেন।......... রামপালের আক্রমণেও প্রায় আটশত বর্ষের নৈসর্গিক বিপ্লবে উক্ত 'ডমর' ক্রমশ বিধ্বস্ত হইলেও এখনও যাহা আছে, তাহাতে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিগণের বিস্ময় উৎপান করিতে সমর্থ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।......ভীম

কেবল নিজ রাজধানী সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহার অধিকৃত বরেন্দ্রীরাজ্যের দক্ষিণ সীমা পাবনা জেলার **সিরাজগঞ্জ** হইতে রাজ্যের সীমা **ধুবড়ি** পর্যন্ত এক সুবিস্তৃত জাঙ্গাল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি 'ভীমের জাঙ্গাল' নামেই পরিচিত।" *(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, ১৯৫/১৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)* অধুনা তাড়াসের নিকটবর্তী ভাদাস মসিন্দা প্রভৃতি গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল উচ্চ ভূখণ্ড পরিলক্ষিত হয়, তাহা পাল রাজত্বকালে কৈবর্ত নায়ক ভীম কর্তৃক নির্মিত জাঙ্গাল বা মৃৎপ্রাকারের অংশ বিশেষ বলিয়াই অনুমান হয়।

২. শাহীপথ ঃ

বিল-খাল পূর্ণ নদীবহুল নিম্নভূমি হইলেও, মুসলমান আমলে স্থলপথে যাতায়াতের জন্য বঙ্গদেশে নানা স্থানে যে সকল রাজবর্ত্ম নির্মিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শনও এই জেলায় বর্তমান আছে। এই সমুদায় রাজপথ সাধারণত বাদশাহী বা সংক্ষেপে শাহীপথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যানডেন ব্রুক সমগ্র বঙ্গদেশের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী ঢাকা হইতে ধলেশ্বরী ও যমুনার সঙ্গমস্থল বেদদলিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া পাবনা জেলার শাহজাদপুর, হাণ্ডিয়াল ও তাড়াসের পার্শ্ব দিয়া চলনবিলের পূর্বপার পর্যন্ত বিস্তৃত এবম্বিধ একটি শাহীপথের উল্লেখ আছে। প্রবাদ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাড়াস জমিদারগণের পূর্বপুরুষ ঢাকায় দেওয়ান বা মুৎসদ্দি পদবীতে কার্যকারক বলরাম রায় মহাশয়ের সময়ে তাঁহার উদ্যোগে এই প্রাচীন রাজবর্ত্ম নির্মিত হয়।

ঘ. প্রাচীন মুদ্রা ঃ

স্থাপত্য ও ভাস্কর শিল্পের ন্যায় প্রাচীন মুদ্রাও পুরাতত্ত্ব নির্ণয়ের একটি প্রধান উপাদান বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই জেলার প্রাচীন মসজিদ মন্দিরাদি ও বিগ্রহাদির কিঞ্চিৎ পরিচয় ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য জেলার ন্যায় পাবনা জেলা অংশে বিশেষ কোন প্রাচীন মুদ্রাপ্রাপ্তির সংবাদ পাওয়া যায় না বা তৎসমুদয় মদীয় নয়নগোচর হয় নাই।

শুনা যায় তাড়াস জমিদারগণের বাটিতে দনুজমর্দন দেবের সময়ের কয়েকটি মুদ্রা বর্তমান আছে, তাহা দেখিবার সুযোগ বা সহায়তা মদীয় ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। Treasure Trover Act অনুসারে ১৯১৭/১৮ খ্রিস্টাব্দে পাবনা কালেক্টরিতে ৪৬ নম্বর মোকদ্দমায় জানা যায় শাহজাদপুর দরগাপাড়ায় বিশু সরকারের বাটিতে মৃত্তিকা খনন কালে প্রায় ১৪৭টি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রাগুলির অধিকাংশ গবর্নমেন্ট লইয়া এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন, উহার ২টি পাবনার জনৈক উকিল মহাশয়ের নিকট আছে, উক্ত মুদ্রা ২টির প্রথম পৃষ্ঠা সুলতান সের শাহের নামাঙ্কিত এবং অপর পৃষ্ঠায় কোরাণের অংশ উদ্ধৃত আছে। উভয় পৃষ্ঠায় পার্শ্বের অংশ অস্পষ্ট। সদিয়া চাঁদপুর বাবুদিগের বাটিতে চতুষ্কোণ এবং গোলাকার কতকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। চতুষ্কোণ মুদ্রাগুলির এক পৃষ্ঠায় কোরাণের অংশ উদ্ধৃত ; অপর পৃষ্ঠায় মধ্যস্থলে মহম্মদ এবং চারি কোণে আলি, হোসেন, হাছেন ও ফতেমা এই চারিটি নাম খোদিত আছে। পার্শ্বডাঙাবাবুদের গৃহে কয়েকটি চতুষ্কোণ মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায় ; নিমগাছিতে কয়েকটি টাকা পাওয়া গিয়াছে, কোন সময়ের তাহা সহসা বোধগম্য নহে। বহু প্রাচীন মুদ্রা আরও অন্যত্র বর্তমান থাকা সম্ভব, অনুসন্ধিৎসু জেলাবাসী তাহা সাধারণে প্রকাশ করিয়া জেলার পুরাতত্ত্ব নির্ণয়ের সহায়তা করিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—তাম্রশাসন ও সনন্দাদি

ক. লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন ঃ

সিরাজগঞ্জ মহকুমার রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত মাধাইনগর গ্রামে রঘুনাথ বুনিয়া নামে জনৈক ব্যক্তি মৃত্তিকা খননকালে মাটির নিচে এই তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। ইহার উপরিভাগে দশভূজ (?) মূর্তি দেখিতে পাইয়া সে কয়েক বৎসর তাহা দুর্গার প্রতিমাস্থানে পূজা করে; সিরাজগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ তালুকদার মহাশয়ের নিকট গল্প করিলে, তিনি তাহার নিকট উক্ত তাম্রফলক খানি লইয়া তাহার পাঠ উদ্ধারমানসে তথাকার কবিরাজ গোপীচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট উহা প্রদান করেন। তিনি উহার একটি পাঠউদ্ধার করেন। পরে পাবনার তৎকালীন কালেক্টর সাহেব র‍্যাডিচি সাহেবের যত্নে তাম্রশাসনখানি পাবনার সরকারি উকিল প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের হস্তগত হয়; তিনিও উহার এক পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। উভয়ের পাঠোদ্ধারে পরস্পর অনৈক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রসন্নবাবুর পাঠই পরিশেষে সঠিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত 'বল্লাল মোহমুদ্গর" নামক গ্রন্থের ৪৭৮ পৃষ্ঠায় উভয়ের পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে নিম্নে তাম্রশাসনখানির উভয়ের পাঠই প্রদত্ত হইল। শ্রীযুক্ত প্রসন্নবাবু 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় তাম্রশাসন খানির নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। যথা—"এই তাম্রফলকের দৈর্ঘ্য ১২ ইঞ্চি; প্রশস্তি ১১$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি। মূল ফলকের সহিত সংলগ্ন উপরিভাগে প্রায় অর্ধ চন্দ্রাকৃতি কতকটা অংশ আছে, তাহার সঙ্গে কীলক দ্বারা আবদ্ধ পৃথক একখণ্ড তাম্রফলকে দশভূজ মূর্তি, পদ্মোপরি আসীন। দশহস্তে বিবিধ আয়ুধ রহিয়াছে। এই মূর্তিটি ছাঁচে ডালা বলিয়া বোধ হয়।

"মূল ফলকটি $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি মাত্র পুরু। ইহার অক্ষর মৈথিলী। অনেকটা দেবনাগর ও বাংলা অক্ষরের মিশ্রণ। কোন কোন অক্ষরের (যথা ই, ক্ষ) বাঙ্‌লা বা দেবনাগরের সঙ্গে সাদৃশ্যমাত্র নাই। ফলকের দুই পৃষ্ঠাই উৎকীর্ণ। প্রথম পৃষ্ঠাতে ২৯ পংক্তি ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৩০ পংক্তি। প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর অধিকাংশ পাঠ করা যায়। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অধিকাংশই পাঠ করা সুকঠিন। দীর্ঘকাল মাটির নিচে থাকায় উভয় পৃষ্ঠার, বিশেষত দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অনেক স্থল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই তাম্রফলকের সামান্য অংশ ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টবিংশতিতম, উনবিংশতম এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার উনবিংশতম ও ত্রিংশতম পংক্তির কয়েকটি অক্ষর নাই। যে ফলক পাওয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে ভগ্নাংশটি পাওয়া যায় নাই। যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে এই তাম্রশাসন গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেন শ্রীনারায়ণ ভট্টারককে দান করিয়াছিলেন"। ঐতিহাসিক চিত্র ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড। ৯৪ পৃষ্ঠা।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত তাম্রশাসন।
(মাধাইনগরে প্রাপ্ত)
শ্রীযুক্ত প্রসন্নবাবু কৃত পাঠোদ্ধার।
প্রথম পৃষ্ঠা

১) ৭ ওঁ নমো নারায়ণায়।। যস্যাঙ্কে শরদম্বুদোরসি তড়িল্লেখেব গৌরী প্রিয়া দেহার্দ্ধেন...

২) তমভূদ্যস্যাতি চিত্রং বপুঃ। দীপ্তার্কদ্যুতি লোচন ত্রয়রুচা ঘোরং দধানোমুখং। দর্পগ্রাস নিরস্ত দানব।

৩) গজঃ পুষ্ণাতু পঞ্চাননঃ।। স্বর্গগঙ্গা জলপুণ্ডরীকমমৃত প্রায়ার ধারা গৃহং শৃঙ্গার দ্রুমযুযামীশ্বর শি

৪) খালঙ্কার মুক্তামণিঃ। ক্ষীরাম্ভোনিধি জীবিতঃ কুমুদিনী-বৃন্দৈক বৈহাসকো জীয়ান্মমথরাজ পৌষ্টি

৫) ক মহাশান্তি দ্বিজশ্চন্দ্রমা।। ত্রিভুবন জয় সম্ভৃতাব ক্লপৈঃ ক্রতুভিরবাধিত স ত্রিণোঽমরাণাম্। অজনিষত

৬) তদন্বয়ে ধরিত্রীবলয়রেণুজলি কীর্ত্ত্যয়ো নরেন্দ্রাঃ।। পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিত গুণগণৈর্বীরসেনস্য

৭) বংশে কর্ণাট ক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্ত সেনঃ কৃত্বানির্বীরমুর্ব্বীতল মপি নত্তরা গুপ্যাতা না*

৮) ক নদ্যাং নির্ণিক্তো যেন যুধ্যদ্রিপুরুধিকরণাকীর্ণ ধারঃ কৃপাণঃ।। বীরাণা মধিদৈবতং রিপু চমূমারা

৯) স্ক মল্লব্রত স্তস্মাদ্বিস্ময়নীয় শৌর্য্যমহিমা হেমন্ত সেনোঽভবৎ। ক্ষীরোদাধর বাসসো বসুমতি দেব্যা

১০) যদীয় যশো রত্নস্যেব সুমেরু মৌলি মিলিতং ক্ষৌমশ্রিয়ং পুষ্যতি।। অজনি বিজয় সেন স্তেজসাং রাশের

১১) স্মাৎ সমর বিসমরাণাং ভূভৃতা মেক শেষঃ। ইহ জগতি বিযেহে যেন বংশস্য পূর্বঃ পুরুষ ইতি সুধাংশৌ-

১২) কেবলং রাজ শব্দঃ। ভূচক্রং কিয়দেতদাবৃত মভূদ্যদ্বামনস্যাঙ্ঘ্রিণা নাগাণাং কিয়দাস্য দর্পমুর (?)

১৩) সা লঙ্গন্তি গূঢ়াঙ্ঘ্রয়ঃ। একাহাদ্য * নূরং (?) বঞ্চতি কিয়ন্মাত্র স্তদপ্যম্বরং। যস্যেতীব * দ ক্রিয়া ত্রিভুব-

১৪) ন ব্যাপ্যাধিনো তৃপ্যতি। অস্মাদশেষ ভুবনোৎসব ধে *শেন্দুবল্লাল সেন জগতি পতি * জগাম। যঃ

১৫) কেবলং ন খলু সর্ব্ব নরেশ্বরাণামেকঃ সমগ্র বিবুধামধিচক্রবর্ত্তী। ধরাধরান্ত পুর মৌলি রত্ন *

১৬) লক্য ভূপাল কুলেন্দ্র লেখা। তস্য প্রিয়া ভুজঙ্গমানভূবি * ল্লক্ষ্মী পৃথিব্যো রধিরাম পূর্ব্বা।। *

১৭) বসুদেব দেবকসূতা দেহান্তরাস্যামিব শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন মূর্তি রজনিক্ষ্মাপাল নারায়ণঃ। **

১৮) যন্ময় জন্ম নিঃ সহ মিল দিম্বানুবচ্চঞ্চলাৎ কৃষ্টে নাধি * * বিকমি *

১৯) যা দেগৌড়েশ্বর শ্রীহ।। হরণ কর্ম্ম যস্য কৌমার কেলিঃ কলিঙ্গৈনাঙ্গনাভি **

২০) বে যস্য পূর্ব্বঃ। যে নাসৌ কাশিরাজ সমর-ভূবি জিতা যস্য কি * *। ধাবাভীর * পা * য্যতি

২১) শ্চরণ রজসা নির্ম্মমে কার্ম্মাণানি।। আকৌমার সমরকৃতি......

২২) মিব দিশা মীশিতাস্তে বিমুক্তাঃ।। হস্ত * * বপুর্বিকলষ্য তস্য * * স্তৌ প্রবিষ্টা-

২৩) * হি ক্ষত্রিয়াণাং কৃপাণঃ।। যত্রারাম দ্রুমদলরুচা শৈবাল * লতা যস্য

২৪) পুরো সঞ্চিতাভূঃ। প্রাণান্মুঞ্চন্ত্যবনি পতয়ো...

২৫) সমা (?) নির্গতে খল্ব ধার্য্য গ্রাম পরিসর সমবা-

২৬) পরম ভট্টারক মহরাজাধিরাজ শ্রীবল্লাল সেন দেব পর *

২৭) ক দেব শ্রীম ... চ বশীকৃত্বা ... পরম ... ররিরাজ

২৮) রা * পরম * * * গুরু * * পরম-

২৯) * * চক্রবর্ত্তী ভূপতি রাজপতি * পতি নৃপতি-

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

১) বিক্রমস্য বীর চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌম * * াম বংশ প্রদীপ রাজ-প্রতাপ নারায়ণ পরম

২) দিক্ষিত পরম ব্রহ্মক্ষত্রিয় ভূ * ক্রীড়াবধৃতমশেষ কেলিবিকলীকৃত ক-

৩) লঙ্ক বিক্রম বশীকৃত কামরূপ ... বর্ণামণ্ডলৈক চক্রবর্ত্তী গৌড়েশ্বরপরমে.

৪) শ্বর পরম নারসিংহ পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ সমা

৫) গতা শেষ রাজা রাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রাজপুত্র রাজমাত্য * ‡ পুরোহিত মহা ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহা সন্ধি

৬) বিগ্রহিক মহা সেনাপতি মহা মুদ্রাধিকৃ অন্ত ‡ ঙ্গ ‡ * পরিক মহাক্ষপটলিক মহা প্রতীহার

৭) মহা ভোগিক মহা পিলুপতি মহাগণস্ক দৌঃ সাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল হস্ত্যশ্ব গো মহিষা জা

৮) বিকাদি ব্যাপৃতক গৌথিক দণ্ড ... ক দণ্ড নায়ক বিষয়- পত্যাদীনন্যাংশ্চ সকল রাজ পাদোপ জী

৯) বিনোঽধ্যক্ষ প্রচারোক্তাহিনা কীর্ত্তিতান্ চট্টভ * জাতীয়ান্ জন গদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রা

১০) হ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়ন্তি বোধয়ন্তি সমাদিশন্তি চ মত মস্তুভবতাম্ যথা শ্রী পৌণ্ড্রবর্ধন ভূ

১১) ক্ত্যন্তঃ পাতি বরেন্দ্র্যাং কান্তা পুরাবৃত্তৌ রাবণ সরসি?*? স্থানে পূর্ব্বে চড়স্য সাপাটক পশ্চিম ভূঃ সীমা

১২) দক্ষিণে কায়নগর উত্তর ভূঃ সীমা পশ্চিমে গুণ্ডী স্থিরা পাটক পূর্ব ভূঃ সীমা উত্তরে গুণ্ডী দাপনিয়া দ

১৩) ক্ষিণ ভূঃ সীমা। ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন—* গোজব গোচরাদ্যস্যা * দেব ব্রাহ্মণপাল্য ভবন্তিঃ। এক—

১৪) নবতি খাড়িকাধিক ভূখাড়ী শতৈকাত্মকঃ সংবৎসরেণ কপর্দ্দকাণ্ব (?) বৃষ্টি পূরণাধিকশত মূন্যকা

১৫) ধিকো দাপনিয়া ঘাটকঃ সসাট বিটপঃ সজলস্থলং সগর্ত্তোযরঃ সগুবাক নারিকেলং সহ্য দ

১৬) ... প... হৃত সর্ব্বপীড়োঽচট্টভট্ট ... কিঞ্চিৎ প্রগ্রা ... ধৃতি গোচর পর্য্যন্তং দা

১৭) মোদর? দেব শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় শ্রীরামদেব দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় কুমার দেব শর্ম্মণঃ পুত্রায় কৌশিক

১৮) ————ঋদ্বেদাশ্বলায়ণ শাখাধ্যায়িণে শান্তশাবিক

১৯) শ্রীগোবিন্দ দেবশর্ম্মণে (বিধিবদু) দক পূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ ভট্টারক মুদ্দিশ্য

২০) মাতা পিত্রোরাত্মচশ্চ পুণ্য————পূর্ব্বক মুলাভিষেকঃ

২১) —দ্রা মহা————তগতি—নিকাদি উৎসৃজ্যা চন্দ্রার্ক—ক্ষিত্তি
২২) সমকালং যা (ব?) ৎভু—হি--প্রদ—মস্মাভিঃ তন্তুবত্তি—
২৩) ভাবিভির—নরক পাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্ম গৌরবাৎ পালনীয়ং। তদস্তি
২৪) ... ... যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি উভৌ তৌ পুণ্য কর্ম্মা
২৫) ....সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য সদা যদা
২৬) স্তস্য তস্য তদা ফলম। ... ... ভূমিদোহপুং কুলে জাত স ন
২৭) ... সহস্রানি ...
২৮) ...
২৯) ... ... ॥ সং ৩ (?)

ওঁ নমো নারায়ণায়

যস্যাঙ্কেঃ পরংঘঃস্থো যোরসিতয়িম্বেত্যেকশো ধীশ্রিয়া।
যশোঘনস্তীর দুগ্ধবহিঃ সমুদ্রং যস্যা তিথিঃ সংযযুঃ।।
অয়ুর্ব্বেদ্ দ্যুতিবোধন ত্রায়ন্তা সঘোর যুধানো মুরৈঃ
শ্রীধল্ল সৈনৈকো ভুষণো নৃপস্য যঃ পূজ্যস্তু পঞ্চাননঃ।
স্বঙ্গাঙ্গাঙ্গুল পুণ্ডরীক মম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ধারা—
যজুযুদ্ধারম্ভ সুহ্মধাম্নীস্বরোস্তিস্ম।
ক্ষিত্যলঙ্কারঃ সুহ্মমণিঃ ক্ষীরাম্ভোনিধি প্রীতি—
ঝমজৈমী ... কশৈঃ প্রংসী কাঙ্কীবান্মন্মথো রাজা যঃ স্ম।
সুকর্ম্মজাল নিধি শুদ্ধ ধর্ম্মা নীতিপঃ স্বধনম্পুযঃ সন্ধতিক্ষা ক্রয়ৈ।
ক্রতুভির্ব্বরিষ্ঠঃ প্রদ্যুম্নাখ্যো রাজা যে অজনিষ্ম।
তদম্বয়ে ধৃতি ধীরাখ্যো রিপুবলী কৃচ্ছোযোনরেন্দ্রাখ্যঃ
সৌরীক্ষিভিঃ সম্প্রাপ্তিঃ ঘোষিত গুণরাশের্বীরসেনস্য।
সঙ্গাবান্ সত্যসন্ধঃ ক্রিয়াণামুক্ত নিষ্কলঙ্কো যযাম সামন্ত সেনঃ—
কৃত্বানিৰ্ব্বীর মুৰ্ধ্বীতল মধীনতরং স্থৈর্য্যবারা।
বিদ্ধলক্ষ্যানি শ্লিষ্টে যেন সূর্য্যাস্তেযু রুধিরকণাকীর্ণধারঃ কৃপাণঃ
বীরাণামম্বৈযেস্তুষ্টো বিম্বরব্রামানঃ।

উৰ্দ্ধং শলাং ধ্বস্তং শল্যোনোৰ্দ্ধেঃ সাম্যনীয়োহসৌ যমসীমা-দ্বেমন্ত সেনো ভবথুর্ধীরো মাঘধবাসঃ স বসুমতী সেব্যঃ। ওষধীশ যশোবর্‌যম্মে বসুনেব মৌলীমৌক্তি ইন্দ্রৌমসি যন্ঘুষ্যতি, অজনি বিজয়সেনস্তে কস্য বীরোস্তু। যস্যাশু সমরে ঝঘাণ শ্রেয়সা মেক শেষ। কৃতজ্ঞঃ সতি বিধিপোযণ বনশ্যধবঃ ধ্রুবঃ সুকৃতি সুধীণাং। শীক্ষাশীলঃ সন্ধ্যা ক্ষমা সত্যং ব্রত্রিম যে তপোব্রতস্য প্রদ্যুম্ন সেনস্যাক্ষৌণিনাশা নিষ্ক্রয়শস্য যশসঃ স্মরঃ। লক্ষ্যলব্ধ স্তীক্ষ্ণচাক্ষুষঃ স্তোক প্রজ্ঞঘ্নঃ পুরংবঞ্চতি। ক্রিয়য়াবন্ধো যস্যাম্বর যশো ক্ষীরসঙ্গাব্ধি যোধীজ্ঞবিঘ্নঃ। ধর্ম্মকার্য্যাধীনো ইয্যতি যস্তীর্ধাস্বস্তেযু ভূযণোঽ সুরঘাতী বপূর্ব্বল্লালসেনোজজ্ঞে, হীনান্ধ ক্ষুব্ধ পামরস্য বন্ধুঃ। যশোবল নবজলাশয়ো নরেশ্বরাণামেকঃ স সলক্ষ্মীরম্বুধি। যজ্ঞবৃক্তৌ সুরাসুর বিঞ্চুঃ যুদ্ধাসিদ্ধি রুচধর্ম্মা। ত্রৈল্যেক্যসুখায় কুলোজ্জ্বলে ঘোরস্তস্য প্রয়াসঃ, ক্ষুব্ধ শান্ত সুশীল ক্ষমা দক্ষ যুধিক্ষম যুদ্ধ বিধি বিঘর্ষণৈঃ। ভূপস্য প্ররুষৈ ৰ্ব্বন্ধশ্চমুঃ যেপ্যন্তর স্থানি, বশীমল্ল কাপালিকমূর্ত্তিঃ যুদ্ধবিবক্ষা ক্ষমাবল ক্ষত্র প্রবুদ্ধৈঃ। ব্রহ্মণ্যষট্ কর্ম্মনিষ্ঠঃ স সুশীলঃ বিদ্বান বল্লক্ষ লক্ষ সৈন্যধক্ষ্য, যমাধিক কুঞ্জরসমঃ মত্ত ক্ষত্রঃ প্রাজ্ঞো যুদ্ধধর্ম্মেযু। বিশ্বাদৌগৌড়েশ্বরঃ

শ্রীক্রমপুরং প্রকর্ম্মা, যস্যাসীমচক্রে নিষ্কর লোকো রাজা সর্ব্বে প্রীতির্বশস্বন্ধঃ ক্ষণে ধণৈঃ দূরং যস্য সুলক্ষ্যং যেনাসৌ কাশীরাজ্ঞঃ সমরেম্বপি লিপ্সা রাজ্যবিধিক্ষম ধ্বংসো ভীমসংগ্রাম সন্ধান স্ত্রীক্লেস্তু। ভূশূরঃ প্রজ্ঞঃ কজ্ঞঃ প্রাণৈঃ সমৈর্ধর্ম্মৈঃ প্রাণিনাংস্বকৈর্মস্ত্রৈর্ধর্ম্মং রক্ষষি, প্রাজ্ঞসনে বিক্রমপুরে বসন্ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে। ঐশ্বর্য্যং যস্যাসি সম্পত্তির্বধো নৃজুষ্ঠো ঋদ্ধিধর্ম্মে। ক্ষুধাধ্রুবঃ, শশ্বংস্তস্যত্রিমূর্তি শ্চরিষ্ণুর্ধর্ম্মো বিধিঃ প্রজাপতিঃ। গুণ সিদ্ধক্রিয়া শার্দ্দুল স্ত্রিসন্ধ্যারাধাম ব্রহ্মাকবচং বিজ্ঞ ধীর সুব্রাহ্মণ সুশিষ্য বৃন্দে ক্ষত্রবলাভিষিক্তঃ। বন্ধুর্ব্রহ্ম বৈরিঞ্চ ঘস্রঃ যে ব্রাহ্মাণানঞ্চ সুরি নিয়ন্তা, মহোপম নবধা কুল সম্বন্ধি বিষয়াচার বিনয়কাদি ধর্ম্মঃ। লক্ষ্য সুখী লক্ষান্তরে লক্ষ্যং স্থাপ্য মবধি, সধর্ম্ম সুলক্ষ্যের্যত্তীক্ষ্ণ চক্ষুষা লক্ষ্মণোষধীজ্ঞো লক্ষ্যজ্ঞশ্চ ক্ষজ্ঞঃ। উর্ব্বীশঃ সুশাসকঃ সূক্ষ্মধীঃ সুশিক্ষঃ সুবিজ্ঞঃ সুযশস্বী ধর্ম্মবশো ব্রহ্মকর্ম্মস্বী ক্ষমালক্ষ্মী যুক্তো অশেষপ্রজ্ঞ। পরমসুধিরস্ত্রিসন্ধ্যাং ব্রহ্মাকবচং ব্রহ্মাগায়ত্রী মুপাসতে ব্রহ্মধৃতিঃ সুধন্যো অশেষসুধীব্রাহ্মণানাঞ্চ সঙ্গঃ। ঔষধ ধী স্বামী স্বধর্ম্ম পুষ্টকশ্চক্ষুঃ লক্ষ্যধীঃ কুর্যাদ্ধর্ম্মমূলং ব্রহ্মণ্য কুলঞ্চ বল্লালস্য সুতোলক্ষ্মণ ধীরঃ। ব্রহ্মণ্যশট্ কর্ম্মবৃত্তিঃ সুখ্যাতি ঘনদ্যুতি ক্ষমাবৃত্তি ক্ষধর্ম্ম ব্রাহ্মণধর্ম্মপ্রযুক্তঃ সকলকল্যাণহেতুঃ। সুদ্ধসন্ধঃ বীরব্রতঃ রক্ষিসৈন্যস্য রক্ষাকর্ম্ম বিধি নিযুক্ত ক্ষমঃ রক্ষজ্ঞঃ স্বীয় কর্ম্মজ্ঞতা সুকামযশঃসম্বন্ধঃ। শুদ্ধনীতিজ্ঞঃ বসুব্রহ্মজ্ঞঃ ধর্ম্মসুখী কর্ম্মসুখী সর্ব্বকর্ম্মেষু সুবিজ্ঞঃ রবিষ্ট ক্ষসাধুঃ কেলিবিকলীকৃতকর্ম্মা। নির্লিপ্তধীঃ ব্রাহ্মধর্ম্মেষু তদ্বর্ম্মৈকঃ সম্বন্ধঃ ধর্ম্মব্রহ্ম বিবিধজ্ঞ, ব্রহ্মমণ্ডলৈকশ্চক্রবর্ত্তী গৌড়েশ্বরো যশঃসিন্ধু। লক্ষ্মীশো বসুনাথো বিষয়সত্তমো ভূশূরো রঘু শ্রী লক্ষ্মণো বিরাজ, শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনঃ সেনয়া যো বিজয়ী লক্ষসমুদ্রঃ। রসজ্ঞ ক্ষুধা ধরাসুরামঃ বিশালাক্ষো বাণসংসক্ত শ্মশ্রু, বিজ্ঞমুখ্যঃ স সুধীবরোষি ব্রাহ্মণধর্ম্মাধ্যক্ষ সত্যসন্ধঃ। প্রবিশ্য বিক্রমপুরং সেনাসম্ভির্মর্দনৈর্ব্বধিকৃতং স্বপুরং, লক্ষ্মণধন্যে বিক্রমসিন্ধুর্যজষি কাম যজ্ঞেষ্বতীব প্রবৃত্তঃ। ধর্ম্মজ্ঞস্যঋক্‌কর্ম্মশাসী বসতি মৎস্য বনেষু, দৌঃসাধিক দোষেষু অরণ্যৈক মোষকো বসোর্মধ্যে ধাষ্টঃ। তংবিধ্বংসৈক্ষান্বষ্টকো যৌদ্ধিকো যন্নশংসো নৈকষ গুণীয়কো, বিষয় প্রয়াসী দক্ষাশ্চ সকল রাজন্য সেনা নিযুক্তাঃ। ক্ষব্রাহ্মণয়ো ক্ষপ্রবীরোক্তানি শাসিতৈঃ ক্ষমবপুঃ, সুযজ্ঞ ন্যাস লক্ষণ জপান্ ক্ষিপ্রকরান্ ব্রাহ্মণঃ সুবিজ্ঞঃ। ব্রাহ্মণেষ্ঠবান্ জপাৎশ্রমাদ্‌ঘ্নন্তি রোধয়ন্তি সমাধ্রিয়ন্তে, ব্রহ্মতম স্বভাবৈঃ ক্ষমন্তি জপাশিষ্যৈ র্গুরশ্চ বপুজ্ঞঃ। তং ব্রহ্মাশান্তি বরৈরাক্রান্তং যুদ্ধবৃত্তৈঃ রাবদ্ধবধেযিক্ষ্যামঃ পূর্ব্বে বপুশাসা যাপকাঃ পশ্চিমে ভূঃ সীমান্তাঃ। চন্দ্রকোণঃ বিরাট[১] নগরো উত্তর ভূঃ সীমা, পশ্চিমে সপ্তক্ষীরা যাসুকঃ পূর্ব্ব ভূঃ সীমা উত্তরৈঃ সর্ব্বং তারাসো অগ্রসরো দক্ষিণ ভূঃ সীমা। উক্ত চতুসীমাবচ্ছিন্নঃ কাননাশেষবিধসুরাজ্যং শ্রীমাধব ব্রাহ্মণ পাল্যভুরস্তু। সবৃক্ষ ফলবতী ঋত্বিগার্থিকাভুঃ ঋত্বিগ্‌গতৈঃ কর্ম্মৈঃ কৃত সর্ব্বস্য বনকর ঋত্বিকার্য্যৈঃ স্বস্তীশ্বরাণামৃক্‌কর্ম্ম সুসম্পাদানার্থং ঘুড়াকা পাবাণিয়া যাভুক ভূবা উধিবুষ চঙ্গধুপিল ভূশ্বর ক্ষ্মবব সাধু বাকলা বেতিল ভূশয়ঞ্চ। ধৈর্য্যশীলঃ কর্ম্মশীলো বিজ্ঞো ধর্ম্মক্ষমাদ্যৈ স্তুষ্টঃ শুভংযুঃ, প্রাজ্ঞোবিশুদ্ধ ক্ষিতিজ্ঞঃ সুশ্রাদ্ধতর্পণ শ্রুতিজ্ঞো-বিষয়ধ্বান্ত ক্ষয়জ্ঞঃ। বিষয়েষু বিজ্ঞোমুখ্যৈ র্যপযজ্ঞে র্যুক্ত স্তস্মৈ রধ্যত্মেসিদ্ধায় শ্রীসর্ব্বেশ্বরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় কৌশিকায় কৌথুমশাথায়ৈ বিশ্বামিত্রাপ্লুবদ্ যমদগ্নিপ্রবরায় ধর্ম্মবল যশৌদার্যশীলায় উপাধ্যায়িনে পাল্য ঋত্বিকে শ্রীম্মাধদেবশর্ম্মণে স্বস্তি ধর্ম্মনির্ব্বন্ধৈর্ব্বর্ষশক-পূর্ব্বকং ভূদ ধানা রবি মন্দরস সঙ্গকে শকাব্দামিতে। ধৈর্য্যশীলো ব্রাহ্মণশ্চ পুণ্যবান্ সদ্ভির্বিবদ্ধার্ণবঃ পৃথিবীশ্বরাম্বষ্ট সঙ্গো ক্ষবপূর্ব্বলাভিষেকশ্চ। কর্ম্মলব্ধা শুদ্ধাবেদ্যা মহাপ্রাজ্ঞা ক্ষত্রব্রহ্ম বুধে ধীর কবি জয়দেব ধোয়িকাদি বীর ব্রহ্মক্ষত্রিয়ৈঃ প্রসিদ্ধঃ। ত্রৈলক্যবশী ব্রহ্মমিব, ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ হিংস্রং হিংসাং কুর্য্যাৎ বৈধ-সিংসাদিভিঃ যজ্ঞৈঃ প্রজানাং মঙ্গলঞ্চ। করোতি অবিষ্ক্রিয়াং ধনংমহি বিজয় পুরীঞ্চ বিকরণ্ লক্ষ্মণাবতীং যশোরেখাং। ধর্ম্মগৌরববর্ধনকারী দ্বিজব্রাহ্মাণাণাং বিশ্বভুবনে লক্ষ্মণসেন রিহর্জ্জুনো, অর্জ্জুনস্য সমঃশস্ত্রেষু শিক্ষা, শীঘ্রকর্ম্মা মেঘসমঃ, পিযূষ সমংবাক্যং, বিক্রম দক্ষঃ। ক্ষীরাব্ধিকুলজয়কারী সুব্রহ্মমণিঃ সুবঙ্গধীপো

বীরবিশেষো বীর তেজস্বী সুন্দরঃ সুবুদ্ধি লক্ষ্মণোসেনকো দেবশর্ম্মা সুব্রাহ্মণকং শ্রীকৃষ্ণং সুস্মৃত্য পূজার্চিচস্যে সবিতুঃ পূজনপূর্ব্বকং বিস্মৃত্য স্বস্তি শ্রীবিষ্ণুং ও হ্রীং ব্রহ্মণে নমঃ। বিষ্ণু বিষ্ণু বিশ্বমূর্তি ত্রিমূর্ত্তি উপরিতমঃ সহস্রশীর্ষঃ পুরুষ সহস্রাক্ষো সহস্রপাৎ খ ভূমি সন্নিধিং শান্তিঃ সাক্ষী শান্তা। সুকর্ম্মা ব্রহ্মশক্তি বিশুদ্ধ ব্রহ্মণো বৈদ্যবর্ণো বৈদ্যবৃত্ত্যা ক্ষত্রিয়ব্রহ্মবৃত্তি ধর্ম্মসাক্ষী ব্রহ্মেশ্বরঃ স্বমিত্র ব্রহ্মবিদাং আশ্রয়ঃ স্বধর্ম্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম্মজ্ঞো ব্রাহ্মর্ণৈর্ব্রাহ্ম সন্নাস ধর্ম্মোষধৈ ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীযুক্তঃ ধর্ম্মরাজ রাম রাঘব তুল্যো অশেষ বিজয় লক্ষ্মী ব্রাহ্মণানাৎ কুলিন বন্ধু নিবাসঃ স্বধর্ম্মদেব বিপ্রাণাঞ্চ লক্ষ্মণো ব্রাহ্মণঃ॥

পাঠোদ্ধারক
শ্রীগোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরাজ
সিরাজগঞ্জ, পাবনা

বঙ্গানুবাদ

সুহ্মনামক দেশে, অম্বষ্ঠসংজ্ঞক ব্রাহ্মণবংশে শ্রীধন্নসেন নামে, নৃপতিগণের ভূষণস্বরূপ, পঞ্চাননসদৃশ পূজ্য এক রাজা ছিলেন। যাঁহার শরীর ও অঙ্গুলী সকল সুন্দর, শ্বেতপদ্মের বর্ণ বিশিষ্ট ছিল। যাঁহার গভীর ধ্বনি সমুদ্রের অপর পারে এবং যাঁহার সুযশ অতিথিরূপে দুগ্ধ সমুদ্রের অপর তীরে উপনীত হইত। যিনি নানারত্নে বিভূষিত, মহামহাক্ষত্রিয় যোদ্ধৃগণে বেষ্টিত ও আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণের একান্ত সহায় ছিলেন। এবং যিনি যজুর্ব্বেদকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তাঁহার বংশে নরপতি মন্মথসেনের জন্ম হয়। তিনি পৃথিবীর অলঙ্কার ও সুহ্ম দেশের মণিস্বরূপ ছিলেন। মন্মথসেন মত্তবৃষের ন্যায় একাকী ঝম্ ঝম্ শব্দে প্রীতির সহিত ক্ষীর সমুদ্রে পতিত হইতেন এবং তিনি একান্ত সৎকার্যাভিলাষী রাজা ছিলেন। মন্মথসেনের বংশে প্রদ্যুম্ন সেন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সৎকার্যের সমুদ্র, বিশুদ্ধধর্মা ও একান্ত নীতিপরায়ণ রাজা ছিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সহিষ্ণু, ক্ষমা ও ক্রয়শীল রাজা প্রদ্যুম্নসেন, স্বীয় সম্পত্তির পুষ্টিসাধন ও যজ্ঞাদি সৎকর্মের দ্বারা নিতান্ত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রদ্যুম্নসেনের পুত্র নৃপতিশ্রেষ্ঠ বীরসেন, অশেষ গুণের আধার ছিলেন। তিনি সর্বদা জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতগণের সহিত বাস করিতেন। তাঁহার গুণরাশি পৃথিবীর সর্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি একান্ত শত্রুহন্তা ছিলেন। বীরসেনের অপর নাম ধৃতি ও ধীরসেন। তাঁহার পুত্র সামন্তসেন, তিনি নিতান্ত জ্ঞানবান সত্যপ্রতিজ্ঞ, সৎক্রিয়াশীল ও কলঙ্কবিহীন রাজা ছিলেন। সামন্তসেন পৃথিবীকে বীরশূন্য করতঃ শান্তিরূপজালের দ্বারা ধৌত করিয়া স্বীয় অধীনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি সুর্যাস্তের পরেও অনায়াসে লক্ষ্যবিদ্ধ (শিকার) করিতেন। তিনি রাত্রিতে রুধির কণাকীর্ণ ধার বিশিষ্ট তরবার গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করতঃ বীরগণের অন্বেষণ করিতেন। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন, শত্রুগণের উর্ধবিক্ষিপ্ত শল্যাস্ত্র স্বীয় শল্যাস্ত্রদ্বারা বিনষ্ট করতঃ আপনাকে এবং সেনাগণকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিতেন। হেমন্তসেন মাঘধে বাস করিয়া বসুমতী ভোগ করিয়াছিলেন। হেমন্তসেনের ঔরসে নরপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। বিজয়সেনের তুল্য বীর পৃথিবীতে কেহই ছিলেন না। বিজয়সেন চন্দ্রের ন্যায় যশোবান ছিলেন। তাঁহার মস্তকে মণি চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় শোভা পাইত। সংগ্রাম সমুদ্রে যিনি ভীষণ ধ্বনি, বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধি, ইন্দ্র তুল্য অস্ত্র শিক্ষা ইত্যাদি অশেষ প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান এবং সৎলোকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। বিজয়সেন বিধি পোধণ বশদিগের ঈশ্বর, সুকৃতি ও সুধীগণের সত্য স্বরূপ ছিলেন। শিক্ষা, সন্ধ্যা ও ক্ষমাশীল বিজয়সেন সর্বদা সত্য কথা বলিতেন ও তদীয় পূর্বপুরুষ নিতান্ত ক্রিয়াশীল রাজা প্রদ্যুম্নসেনের অক্ষৌণীনাস যশঃ সমুদয়কে সর্বদা স্মরণ করিতেন।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন। যিনি লব্ধলক্ষ্য, তীক্ষ্ণদৃষ্টিবিশিষ্ট ও সকলের জ্ঞানদাতা ছিলেন। বল্লালসেন স্বীয় রাজধানীতে থাকিয়া সর্বদা যজ্ঞাদি সৎকার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার অম্বরতুল্য বীরত্ব যশঃ ক্ষীর সমুদ্র তীরবর্তী যোদ্ধৃগণেরও বীরত্বে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। ধর্মকার্যের অধীন তীর্থ বিশ্বাসি ব্যক্তিগণের তিনি ভূষণতুল্য ছিলেন। নরপতি বল্লালের শরীর অসুরবিনাশের একান্ত উপযুক্ত ছিল। তিনি নিচ জাতি, ক্ষুব্ধ, পাপিগণের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার যশঃ ও বল নূতন জলাশয়ের ন্যায় নির্মল ছিল এবং তিনি সমুদ্রের ন্যায় লক্ষ্মীযুক্ত ছিলেন।

তিনি যজ্ঞবৃত্তিতে সুরাসুর বিষ্ণুতুল্য ও উচ্চধর্মা ছিলেন এবং যুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ করিতেন। শুদ্ধ, শান্ত সুশীল, ক্ষমা দক্ষতা, যুদ্ধক্ষমতা, যুদ্ধবিধিপ্রভৃতি সদ্গুণের বিঘর্ষণের দ্বারা তিনি সর্বদা পৃথিবীর হিত ও উজ্জ্বল কুলসাধনে একান্ত যত্নবান ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ এবং নিতান্ত যুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বারা দুরস্থ শত্রু সৈন্যগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত এবং যজ্ঞাদি ক্ষমাবল ও ক্ষত্রিয়োচিত বিচক্ষণতা হইতে কাপালিক মূর্তি মল্ল (এক প্রকার শৈব ধর্মাবলম্বী শ্রেণীবিশেষ) গণও তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল। রাজা বল্লালসেন নিতান্ত সুশীল ও ব্রহ্মণ্যষট্ কর্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার লক্ষ লক্ষ বিদ্বান্ মত্ত কুঞ্জর সম, যম তুল্য যুদ্ধধর্মে প্রাজ্ঞ ক্ষত্রিয় সৈন্যাধক্ষ্য ছিল। গৌড়েশ্বর বল্লাল, স্বীয় রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, সুবিধান স্থাপন ও সুন্দর ভবনাদি নির্মাণবিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য রাজাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার অসীম চক্রে কলঙ্কবিহীন নৃপতিগণেরাও ক্ষণকালের মধ্যে প্রীতির সহিত করপ্রদানপূর্বক তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেন। তাঁহার লক্ষ্য দুরবর্তী স্থান পর্যন্ত গমন করিত। তিনি ভীম সংগ্রাম ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান দ্বারা কাশীরাজের সমর সাধ এবং রাজ্য শাসনাদির ক্ষমতা ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর মধ্যে বীর জ্ঞানবান্ ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। বিক্রমপুরে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে ক্ষত্রিয় ধর্মে অবস্থিতি করিয়া তিনি স্বীয় মন্ত্র, ধর্ম দ্বারা প্রাণ তুল্য জ্ঞানে প্রাণীগণকে ধর্মে রক্ষা করিতেন। তিনি একমাত্র অসিকেই তাঁহার ঐশ্বর্য, দুর্বৃত্তদিগকে বধ করাকেই সম্পত্তি, ধর্মকে উন্নতি, সত্যকে ক্ষুধা মনে করিতেন। তাঁহার শঙ্খদেশ (কপাল) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি বিশিষ্ট ছিল। তিনি ধর্মে সূর্য ও বিধিতে প্রজাপতি তুল্য ছিলেন। গুণসাগর ক্রিয়াশীল বল্লালসেন বিজ্ঞ, বীর সুব্রাহ্মণ সুশিষ্যগণের সহিত মিলিত ও ক্ষত্রিয় বলাভিষিক্ত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্ম কবচ আরাধনা করিতেন। তিনি বন্ধু ও ব্রাহ্মণগণের শত্রুদিগকে সর্বদা বধ করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেণীর ও মহোপম আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপঃ এবং দান প্রভৃতি নবগুণসম্পন্ন কুলাচারের আদিনিয়ন্তা।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন লক্ষ্য কার্যে নিতান্ত সুখী হন। বিদ্ধ করিবার উপযুক্ত জন্তু বহুদূরে থাকিতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে বধ করেন। তিনি বীর এবং ওষধীজ্ঞ (চিকিৎসক)। তিনি সহজেই লক্ষ্য কার্যের ও ক্ষত্রিয়দিগের সমুদয় কার্য বুঝিতে সক্ষম। রাজা লক্ষ্মণসেন সুশাসক, সূক্ষ্মধী, সুশীল, বিজ্ঞ সুযশস্বী ও ধর্মের নিতান্ত অধীন ; ব্রহ্ম ধর্মান্বিত ক্ষমা ও লক্ষ্মীযুক্ত এবং অশেষ প্রজ্ঞাবান। তিনি পরম সুধীর, ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্ম কবচ, ব্রহ্ম গায়ত্রী আরাধনা করেন। ব্রহ্ম ধৃতি সম্পন্ন অতিশয় ধার্মিক অসংখ্য সুধী ব্রাহ্মণ সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করেন। স্বধর্ম পুষ্টক বৈদ্যগণের তিনি চক্ষুঃস্বরূপ। তিনি সর্বদা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল যে কুল, বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহারই উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন। তাঁহার সুখ্যাতি ঘনদ্যুতি বিশিষ্ট, একমাত্র ক্ষমাই তাঁহার বৃত্তি। তিনি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ ধর্ম প্রযুক্ত এবং সকল প্রকার মঙ্গলের হেতু স্বরূপ। রাজা লক্ষ্মণ সেন শুদ্ধ প্রতিজ্ঞ, একমাত্র বীরত্বই তাঁহার ব্রত। রক্ষক সৈন্যদিগের রক্ষা কার্যের সুব্যবস্থা করিতে তিনি বিলক্ষণ পটু এবং কি প্রকারে রাজ্য রক্ষা করিতে হয় তাহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহার নিজের কার্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। সুকাম ও যশের সহিত তাঁহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা।

তিনি বিশুদ্ধ নীতিজ্ঞ বসু[২] ও ব্রহ্মজ্ঞ। ধর্ম কার্যাদিতে তিনি বিলক্ষণ সুখী হন। লক্ষ্মণ সেন সকল কার্যের সুবিজ্ঞ। তিনি ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের হইতে শ্রেষ্ঠ সাধু, কেলি বিহুল ও কৃতকর্মা। তিনি নির্লিপ্ত বুদ্ধি, একমাত্র ব্রাহ্মণ ধর্মের সহিতই তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম ব্রহ্ম প্রভৃতির সমুদয় বিদিত। গৌড়েশ্বর যশঃসিন্ধু লক্ষ্মণ সেন ব্রাহ্মণ মণ্ডলির একমাত্র চক্রবর্তী স্বরূপ। মহাবীর লক্ষ্মণ রঘুবংশীয় লক্ষ্মণের ন্যায় সম্প্রতি ভূতলে বিরাজমান। তিনি রসজ্ঞদিগের ক্ষুধাস্বরূপ, পৃথিবীতে রামচন্দ্র তুল্য তাঁহার চক্ষু বিশাল এবং শ্মশ্রু (দাড়ি গোঁপ) সকল বাণ সংসক্ত অর্থাৎ তীরের ন্যায়। লক্ষ্মণ সেন পণ্ডিত ও সুধী শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ধর্মের অধ্যক্ষ, সত্য প্রতিজ্ঞা সম্প্রতি তিনি বিক্রমপুরে গমন করতঃ মত্ত ও পরাক্রমশালী সৈন্যগণের দ্বারা স্বীয় পিতৃরাজধানীকে অধিকার করিয়া মহা সমারোহের সহিত যজুর্বেদোক্ত যজ্ঞাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ধর্মজ্ঞ নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের পুরোহিতের নিবাস মৎস্যবনে। দ্বারপালগণের দোষে সেই বনের একজন তস্কর পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় দুর্বৃত্ত হইয়া উঠে। তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য নৃশংস রাবণ গুণসম্পন্ন, বিষয় প্রয়াসী, দক্ষ, সুযোদ্ধা ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠ সৈন্যগণ নিযুক্ত হয়। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই বীর শ্রেষ্ঠ, পৃথিবী শাসনের উপযুক্ত শরীর বিশিষ্ট। জপ, যজ্ঞ ন্যাস লক্ষ্মণাদিতে ব্রাহ্মণ শীঘ্রহস্ত ও সুবিজ্ঞ। ইস্টরান ব্রাহ্মণেরা জপশ্রম দ্বারা দুর্বৃত্তদিগকে হত, ধৃত ও আবদ্ধ করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মতম স্বভাব দ্বারা দয়াবশতঃ কোন কোন সময়ে দুর্বৃত্তগণকে ক্ষমাও করেন। বপুজ্ঞ ব্রাহ্মণ জপ ও আশীর্বাদ দ্বারা সকলেরই গুরু। সেই চৌর রাজপুরোহিতের জপশ্রম দ্বারা প্রথমে আক্রান্ত হইয়া তৎপরে যুদ্ধে আবদ্ধ ও হত হয়, ইহা যুদ্ধ স্থানের পশ্চিম সীমান্তবাসী সমুদয় যোদ্ধা ও জাপকগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অতএব চন্দ্রকোণ বিরাটনগর যাহার উত্তর সীমা, যে ভূভাগের পশ্চিমে সপ্তক্ষীরা, যাসুক, চন্দ্রকোণ ও বিরাটনগরই যাহার পূর্বসীমা, তারাস, অগ্রসর যে ভূমির দক্ষিণ সীমা। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন কানন, অশেষবিধ সজলস্থল ভূমি শ্রীমাধব[৩] ব্রাহ্মণের পাল্য ভূমি হইল। মহারাজের ঋক্‌কর্ম অর্থাৎ পৌরহিত্য কার্য সম্পাদনার্থ সকল প্রকার পৌরহিত্য কার্যের দক্ষিণা স্বরূপ ঋত্বিক ঋষির সম্বন্ধে ঋতিগার্থিক ভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইল। ঘুড়াকা পাষাণিয়া যাসুক, ভূযা, উধিযুষ চঙ্গধূপিল ভূশ্বর, ক্ষযব, সাধুবাকলা, বেতিল ও ভূশয় প্রভৃতি গ্রাম, ধৈর্যশীল, কর্মশীল, বিজ্ঞ, ধর্ম ও ক্ষমাদিতে তুষ্ট, কৃশলী প্রাজ্ঞ, বিশুদ্ধ ক্ষিতিজ্ঞ শুশ্রাদ্ধ তর্পণ ও শ্রুতিজ্ঞ, বিষয় মোহান্ধকারের ক্ষয়কারক, বিষয় কার্যে বিজ্ঞ, প্রধান জপ যজ্ঞাদি যুক্ত, অধ্যাত্মসিদ্ধ শ্রীসর্বেশ্বর দেব শর্মার পুত্র, কৌশিকগোত্র, কৌথুম শাখানুধ্যায়ী, বিশ্বামিত্র আপ্লুবৎ ও জামদগ্ন্য প্রবর শ্রীমান মাধবদেব শর্মাকে ধর্মনির্বন্ধ দ্বারা বর্ষ শক ও স্বস্তি (অর্থাৎ স্বীকৃত বাক্য) উচ্চারণ পূর্বক ৬৭১ শতাব্দীতে প্রদত্ত হইল।

ধৈর্যশীল পুণ্যবান সৎলোকের দ্বারা বিবর্ধিত অর্ণব সদৃশ, অম্বষ্ঠ সংজ্ঞক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অভিষেক ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় শরীর, বলাদিযুক্ত, কর্মলব্ধ মহাপ্রাজ্ঞ বৈদ্যগণের ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের সহিত এবং ধীর কবি জয়দেব ধোয়িকাদি বীর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের সহিত বিখ্যাত ব্রহ্মের তুল্য ত্রৈলোক্য বিমুগ্ধ কারক, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি হিংসকের প্রতিহিংসক, যজ্ঞাদি দ্বারা প্রজাগণের মঙ্গলকারক, যশের রেখা স্বরূপ লক্ষ্মণাবতী নাম্নী নগরীর নির্মাতা ও তাহাতে নানাবিধ ধনরত্নের আবিষ্কার কর্তা ; ধর্ম, দ্বিজ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির গৌরব বর্ধনকারী পৃথিবীতে অর্জুন তুল্য, অর্জুনের ন্যায় যোদ্ধা, মেঘের ন্যায় শীঘ্রকর্মা, অমৃততার্যী বিক্রমদক্ষ, ক্ষীর সমুদ্র-তীর বিজয়ী, সুহ্ম দেশের মণি, সুবঙ্গের অধিপতি, বীর তেজ বিশিষ্ট, বীরশ্রেষ্ঠ, সুন্দর সুবুদ্ধিযুক্ত, শ্রীলক্ষ্মণ সেন দেবশর্মা সুব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ ও স্বস্তি স্মরণ করতঃ সূর্যদেবের পূজাপূর্বক বিষ্ণুকে পূজা করিলেন ও হ্রীং ব্রহ্মাকে নমস্কার। উপরিতন অর্থাৎ তাম্রশাসনের শীর্ষস্থ বিশ্বমূর্তি ত্রিমূর্তি বিষ্ণু, যিনি সহস্র মস্তক সহস্র চক্ষু, সহস্র বাহু, সহস্র পদবিশিষ্ট, যিনি

আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি সর্বত্র শান্তি সাক্ষী ও শান্তারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই এই দান সম্বন্ধে শান্তি সাক্ষী ও শান্তা স্বরূপ।

সুকর্মা, ব্রহ্মশক্তিযুক্ত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, বৈদ্যবৃত্তি দ্বারা বৈদ্যবর্ণ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের বৃত্তিও ধর্মের সাক্ষী, ব্রহ্মদেশের ঈশ্বর, স্বমিত্র ও ব্রহ্মবিদগণের আশ্রয়, স্বধর্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্মজ্ঞ, ব্রহ্ম সন্ন্যাস ধর্ম ও ঔষধ বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের সহিত বর্তমান, ত্রৈলোক্যর লক্ষ্মীযুক্ত, যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্রের তুল্য অশেষ বিজয়লক্ষ্মী, ব্রাহ্মণ কুলিন বন্ধুগণের ও স্বধর্ম, দেবতা, বেদজ্ঞগণের আশ্রয় এই লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণ।

এই তাম্রশাসন খানি জেলা পাবনা মহকুমা সিরাজগঞ্জ ও স্টেশন রায়গঞ্জের অধীন মাধাইনগর গ্রামে রঘুনাথ সিংহ নামে একজন বুনা, মৃত্তিকার নিচে প্রাপ্ত হয়। মাধাইনগর নিমগাছির জঙ্গলের অন্তর্গত স্থান। নিমগাছিতে বিরাট রাজার বাড়ি ছিল বলিয়া চিরজনশ্রুতি আছে। আজও এই স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই তাম্রলিপির শিরোভাগে যে বিষ্ণু শিব ও দশভূজা মূর্তি আছে, রঘুনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, সে তাহা প্রত্যহ পূজা করিত। মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষে রঘুনাথের সহিত আমার পরিচয় থাকাতে তাম্রলিপি প্রাপ্ত হওয়ার বৃত্তান্ত আমি তাহার নিকট অবগত হইয়া গত জ্যৈষ্ঠ মাসে তাম্রশাসন খানি তাহার নিকট হইতে লইয়াছি এবং তাহার পাঠোদ্ধারের জন্য এই সিরাজগঞ্জের শ্রীযুত গোপীচন্দ্র সেন করিরাজ মহাশয়কে উক্ত তাম্রশাসন প্রদান করি। তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন এবং আমি ঐ সংস্কৃত পাঠ দৃষ্টে তাহার বঙ্গানুবাদ ও ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছি। এইক্ষণ প্রার্থনা অনুবাদে কোন ভুল থাকিলে সকলেই অনুগ্রহপূর্বক সে দোষ মার্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি ১৩০৫ সন তারিখ ২৩শে ভাদ্র।

বশম্বদ

শ্রীদুর্গানাথ তালুকদার দেবশর্মা, উকিল সিরাজগঞ্জ।

খ. নবাব সায়েস্তা খাঁর সনন্দ ঃ

সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন হরিণাবাগবাটি গ্রামে জনৈক সূত্রধর পরিবার গৃহে নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রদত্ত একখণ্ড সনন্দ আছে, তন্মূলে তাহারা তাহাদের স্বজাতিবর্গের নিকট হইতে বিবাহাদিতে মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত গ্রামের জমিদারগণের নিকট হইতেও তাহারা উক্ত মর্যাদা আদায়ের ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় বি. এল. মহাশয় প্রণীত "ষষ্ঠিধর গুপ্ত বংশাবলী" ১০৭/৮ পৃষ্ঠা হইতে উভয় সময়ে প্রাপ্ত ক্ষমতার সনন্দের নকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নবাবী সনন্দ

শ্রীজাদুরাম সুত ও শ্রী ভবানীরাম সুত প্রতি আগে আমার এলাকা পরগণে বড়বাজুর সুতবর্গসনে তোমরা প্রামাণিক হইয়া সামাজিক কার্যনির্বাহ করার জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করিলা মতে তোমাদিগের নিকট নজর লইয়া সনদ দিতেছি জে তুমি লক্ষ্মীনারায়ণ সুতজন সাকিন হিজুলি পরগণে বড়বাজু ও অভিরাম সুত সাকিন তথা তোমরা জনপদে নিযুক্ত থাকিয়া সকল কার্য নির্বাহ করিবা এবং তুমি যদুরাম সুত প্রামাণিক সাকিন মধ্যভাগ পরগণে বড়বাজু ও ভবানী সুত সাকিন তথা তোমাদ্বয়কে প্রামাণিক নিযুক্ত করিলাম এবং সুত বর্গের প্রতি হুকুম দিতেছি যে প্রতি বিবাহে চাটাই বাটার জন্য দুইপক্ষে ২ টাকা দিয়া শতঘর

পূর্বোক্ত "সনন্দ অনুসারে জাদুরাম সুত ও ভবানীরাম সুতের ওয়ারিশানগণ হরিণাবাগবাটির জমিদারগণের এলাকায় সনন্দের উল্লিখিত সম্মান পাইবার প্রার্থনা করায় তাঁহারা তাহাদিগকে এক হুকুম নাম দিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করা গেল। বড়বাজু পরগণার অন্যান্য মালিকগণের নিকট এরূপ হুকুমনামা তাহারা পাইয়াছিল ও তাহাদিগের নিকট এখনও তাহা আছে।"

কুটম্বিতার জত্তাব পূর্ণ করিয়া ঐ প্রামাণিকদিগের হুকুম বাহাল রাখিয়া সামাজিক কার্য নির্বাহ করিবা। আদর মান সামান্যার প্রামাণিক মান ১০০ একশত টাকা জনের ৫০ পঞ্চাশ টাকা সম্ভ্রমের যে সমস্ত টাকা আমি দিলাম তোমরা সূত্রধরগণ জন হইয়া ঐ প্রামাণিকের পুরুষানুক্রমে ঐ মান্য বহাল রাখিয়া কার্য করিবা তাহাতে ত্রুটি করিলে সরকারে দণ্ডনীয় হইবা। এতদর্থে সনন্দ পাট্টা দিলাম ইতি ১০৭৩ সন তারিখ ১১ মাঘ।

(এই দলিলে পারস্যভাষায় দস্তখত ও শীলমোহর আছে।)

হরিণাবাগবাটির সূত্রধরদিগের প্রতি হুকুমনামা।

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীরামেশ্বর রায়
শ্রীআত্মাগোবিন্দ রায়
শ্রীকৃষ্ণদেব রায়

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ সুত ও শ্রীজগমোহন সুত ও শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ সুত ও শ্রীপ্রামাণিক সুত ও শ্রীগোবিন্দরাম সুত সচ্চবিত্রেষু আগে সাকিন হরিণার শ্রীরাধানাথ সুত প্রামাণিক ও শ্রীগোপীনাথ সুত প্রামাণিক ও শ্রীরামানন্দ সুত প্রামাণিক ইহাদিগের পূর্বপুরুষ জাদু ও ভবানী প্রসাদ প্রামাণিক ছিল, তদভাবে ইহারাও প্রামাণিক চলন মত কার্য প্রয়োজন করিয়া আসিতেছে। উক্ত ভবানী নিঃসন্তান থাকা ও দলিলখানা খোয়া যাওয়া প্রকাশ করিল মতে তাহার প্রামাণিকী মান সমাদর ও পাওনা আদি ইহারা নেওয়ার প্রার্থিত হওয়ায় প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া তোমাদিগকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে মৃত ভাবনী প্রামাণিকীর মান মর্যাদা আদি ও আদর বাটার পাওনা ২ টাকা যে দস্তুর আছে তাহা ইহাদিগকে দিয়া বিবাহ কার্য আদি সম্পাদন করিয়া এই মান্য ইহাদিগের পুরুষানুক্রমে বহাল করা গেল। ইতি সন ১২১৩ সাল তারিখ ২৯ শ্রাবণ।

(গ) প্রাচীন দলিলের নকল

(১) গোঁসাইরামপুর—পাবনা

(ক)

শ্রীশ্রীরাম ইষ্টদেব

৭ স্বস্তি সকলমঙ্গলালয়—
শ্রীকানুদেব দেবশর্মা গোস্বামী জিউ—
সচ্চরিত্রেষু ব্রহ্মোত্তর পত্রোমিদং সন ৯৪৫ নওসও—
পঞ্চতালিষ সালাব্দে লিখিনং কার্যাঞ্চাগে আমারদিগের—
জমীদারী পরগণে ইসলামপুর আমার দিগের পিতে—
১৩৮।৹ একশত সত্তা আটত্রিস কুড়া জমি আপনাকে—
ব্রহ্মোত্তর দিলাম মাফিক তপঃস্বিল জমিন—
আবাদ তরদুদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম—
শুখে ভোগ করেন ইহার রাজস্বের সহিত কোন দায়—
নাহি ইমসাল ও হরসাল ইহার খিরাজ মাপ এ বিত্য যদি কেহ—

শ্রীশিবশঙ্কর রায়স্য।
শ্রীবলরাম রায়স্য।

কালেকশ্মীন বাজে আপ্ত করার মনে করে সে ধর্ম দ্রোহি—
ক্রতঘ্ন হইবেক এতদর্থে ব্রহ্মোত্তর পত্রমিদং অর্ঘ্য গ্রহণ—
কালিন দিলাম ইতি সন সদর তারিখ ২৫ বৈশাখ—

তপঃশীল জায়—

কুমেদপুর	১।০	তারাবাড়িয়া	২।৶০
কমলনারায়ণদিয়া	৪।৶০	নারায়ণপুর	১।৶০
কান্তনগর	৫।৶০	শীয়ানীপাড়া	।।০
চকভোমরা	৫।৶০	মনগাওদিগর	৪০।৶০
চাঁন্দপুর	১।৶০	বাগন্দা	২।৶০
পাঁচুরিয়া	২।।০	অনন্তপুর	১৫।৶০
প্রতাপপুর	২০।৶০	কামালপুর	২৫।৶০

পাকুরিয়া ১৪।৶০ = ১৩৮।০

(খ)
শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

৭ স্বস্তি সকল মঙ্গলালয়—
শ্রীকানুদেব গোস্বামী-জিউ সচ্চরিতেষু—
ব্রহ্মউত্তর পত্র মিদং সন ৯৫৫ নও নওশত পঞ্চান্ন—
শালাব্দে লিখিনং কার্য্যাঞ্চ। আগে আমার জমিদারি—
পরগণে বাজুরায সরকার মাহাম্মাদাবাদ—
পরগণা মজকুরে খারিজ জমা পতিত ১৬১।৶০ একশত একসট্য—
বিঘা জমি শ্রীশ্রী ৺পিৃতার্থ আপনাকে ব্রহ্মোত্তর—
দিলাম মাফিক তপঃশ্মীল গ্রাম ২ জমি আবাদ তরদুদ—
করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করুন—
রাজস্ব সহিত কোন দায় নাহি ইমশাল ও হরশাল খিরাজ—
মাপ এতদর্থে ব্রহ্মোত্তর পত্র দিলাম ইতি ২৬ মাঘ।

শ্রীরামবল্লভ দেবশর্ম্মণঃ।

তপঃশীল

ভাঙ্গাবাড়িয়া	২।৶০	————	১।।৶০
গাতি	২০।৶০	চকভবানীপুর	১।।০
বালিয়াডাঙা	১।৶০	বাগবাড়ি রাধাকান্তপুর	২।৶০
পতিরাজপুর	৫।৶০	পয়াতৈল	২।৶০
বাগবাড়িয়া	২।।০	দাপুনিয়া	২।।০
মুলডুলী	২৬।।০	রামেশ্বরপুর	১৮।৶০
দুর্গাপুর	।১	ছয় ঘরি	১৭।৶০
নিকড়হাটা	১।৶০	মজিদপুর	।।০
ম্রজাপুর	২২।৶০	কুমেদপুর	৪।৶০
তোগলপুর	৫।৩	সারটিয়া	৬।৶০
সোমসপুর	৪।৶০	বাঙ্গাবারিয়া	১০।৶০

১৬১।৶০

মঃ একশত একসুট বিঘা জমি দিলাম ইতি—
ক ও খ দলিল শ্রীযুত হৃষিকেশ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আছে।

২. হিমাইতপুর—পাবনা ঃ

শ্রীঅনন্তরাম দাসস্য—
শ্রীব্রজবল্লভ দাসস্য

শ্রীশ্রীরাম—
শ্রীরাজারাম শর্ম্মা সচ্চিরিতেষু—
ব্রহ্মোত্তর পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে—
মৌজে ছাতনি পরগণে ধুলদি সরকার—
মাহাম্মাদাবাদ ইহাতে মৌজে মজকুরে আমার—
দিগের তালুকে খর জঙ্গলা ১১/০ এগার বিঘা জমি—
তোমাকে ব্রহ্মোত্তর দিলাও জোত আবাদ করিয়া পুত্র—
পৌত্রাদিক্রমে পরমশুখে ভোগ করহ ইহার রাজস্ব—
সহিত ইলাকা নাহি এতদর্থে ব্রহ্মোত্তর পত্র দিল—
ইতি সন ১০১৪ সাল তারিখে ১৫ কার্তিক।

এই দলিল হিমাইতপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সান্যাল মহাশয়ের নিকট আছে।

৩. শঙ্করপাশা—সাথিয়া ঃ

৭ শ্রীশ্রীরাম

শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ—

শ্রীযুত বাস দেব ঠাকুর—
শ্রীজয়দেব বৈষ্ণব যচরিতেযু—
দেবোত্তর পত্র মিদং সন ১০১৫ হাজার—
পনর সন সালাব্দে লিখিনং কার্য্যঞ্চ—
আগে মৌজে মহাম্মদপুর ও গোবিন্দপুর—
পরগণে বাজুচপ্ল সরকার মহাম্মদাবাদে মৌজে মজকুরে—
আমার জমিদারি মধ্যে ২।০ সত্তা দুই খাদা জমি ' সেবার—
কারণ দিলাম জোত আবাদ করিয়া ঠাকুর সেবা করহ—
রাজস্ব ওগএরহ সহিত দায় নাহি এতদর্থে দেবোত্তর পত্র দিলাম—
ইতি সন সদর—তারিখ ১০ দশএী মাঘ।

এই দলিল সাথিয়া থানার অধীন শঙ্করপাশা গ্রামে যাদবচন্দ্র বৈষ্ণবদিগের ওয়ারিশ ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত রামগোপাল ভৌমিক মহাশয়ের নিকট আছে। তাঁহার বাটিতে বাসুদেব বিগ্রহ দৈনিক পূজিত হইয়া থাকে। প্রবাদ দলিল দাতা রামকৃষ্ণ শর্মা খেতুপাড়া রায় বংশীয়দিগের পূর্বপুরষ ছিলেন। তিনি শঙ্করপাশার রায় পরিবারভুক্ত এবং খোঁড়া ছিলেন। সেজন্য ভেঁঙ্গুরা রামকৃষ্ণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

৪. গুণাইগাছা—চাটমোহর ঃ

শ্রীশ্রীরাম

১১০৮

হকীয়ত ব্রহ্মোত্তর জারী।

জমি কি প্রকার	দাতার নাম	গৃহীতার নাম	গৃহীতার সহিত হাল দাখিলকার	সনদের সন তারিখ	মৌজার নাম	জমি	পরগণার নাম
ব্রহ্মোত্তর	জমিদার রাণী সর্ব্বাণী	মহেশ্বর শর্ম্মা ১১।।৩।। ও শ্রীদুর্গারাম শর্ম্মা ১১।।৩।।	বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীরাম শর্ম্মা	সনদ নাহি	পাঁচুরিয়া	২৩।২	তপ্পে চাপেলা ভাতোরিয়া

সনদেব.........সনন্দ ছিল হাল দখিলকারের পিতা বর্তমানে গ্রিহ দাহ হইয়া পোড়া গাছে।

এই দলিল গুণাইগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাটিতে আছে এবং তিনি পাঁচুরিয়া গ্রামে এই জমি ভোগদখল করিতেছেন।

৫. ডেমরা—ফরিদপুর ঃ

শ্রীশ্রীরাম

মহামহিমান্বিতা রাণী সর্ব্বাণী—
শ্রীল মোহর

পরম শুভাশীঃ প্রয়োজনঞ্চ আগে রূপসী অংশমত শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়ের তাহা জানভাতে সামিল আছিল তাহা রায় মজকুরকো দিলাঙ সে গ্রামের নিজ তালুকের সামিল মালগুজারী করিবেন তোমরা কেহ আমাল দখল না করিবা ইতি—

তারিখ ১৪ মাঘ সন ১১১৩

পরয়ানা — পরম প্রতিষ্ঠ

পরশুরাম মণ্ডল — শ্রীযুক্ত রামদেব রায়

এই দলিল ডেমরা নিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ রায় মহাশয়দিগের বাটিতে আছে।

৬. স্থল—চৌহালি ঃ

শ্রীমহারাণী সর্ব্বাণী দেব্যা—
দস্তখত

স্বতী সকলমঙ্গলালয়—
ব্রহ্মাত্তর ভূমিদান পত্রমিদং সন ১১১৭ সালাব্দে—
লিখিনং কার্য্যাঞ্চাগে তরফ খবনঃ কাত মোতালক—
মৌজে বয়রা গ্রামে আমার পুখুর উৎসর্গ বাবত—
৪।।১ কাঠা জমি ভূমি দান করিলাম তুমি (ছিন্ন)—
করিয়া লইয়া দাখিলকার হৈয়া পুত্র পৌত্রাদি (ছিন্ন)—'
ভোগবান থাকিবা দানবিক্রয়ের স্বত্ত্বাধিকার ভাবে—
তোমার ও ওয়ারিশন আমি ও আমার ওয়ারিশনের—
সহিত কোন সম্পর্ক নাই হর সাল খেরাজ মাপ এতদর্থে—
ব্রহ্মাত্তর ভূমি দান পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি—
সন ১১১৭ সাল তারিখ ২২ মাঘ—

এই দলিল স্থল নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিহরস্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট আছে।

৭. দৌলতপুর—শাহজাদপুর ঃ

শ্রীশ্রীরাম—

ইয়াদ্দি কিদ্দ সকলমঙ্গলালয়

শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মজুমদার—

পরমকল্যাণবরেষু—

লিখিতং শ্রীদর্পনারায়ণ মিত্র অধিকার পত্রমিদং আগে আমার তালুক ও চৌধুরাই (জমিদারি) পরগণে সুলতান প্রতাপ তপ্পে ধামরাই ও পরগণে খলিলাবাদ ও পরগণে নুরুল্যাপুর তপ্পে হাজিপুর ও পরগণে সৈদপুর ও তালুক পরগণে মকিমাবাদ আমার হিস্যা দুইখানা অষ্ট গণ্ডা তোমার হাওআলে করিলাম হিস্যা মজকুর আমাল করিয়া বজায় রাখিয়া সদর মালগুজারী করিবা সাল সাল আমার জমাখরচ ওগরহ তোমার লওয়া কাগজ আমাকে বুঝাইবা কিফাইত হয় পাইব টোটা হয় তাহার নিশা করিব আর আমার হিস্যা মজকুরের নফর নমশূদ্র ও চণ্ডাল আমার ধেকমতের উপযুক্ত যে হয় তাহা দিবা বাকী যে থাকে তুমি আমল করিয়া তালুক মজকুর সাব্যস্থ করিবা আমার হিস্যা মকজুর যখন আমল করিতে চাহি আমলা করিব কাগজ বুঝিয়া টোটা হয় তাহার নিশা করিব কিফাইত হয় পাইব ইতি তারিখ ২৫ বৈশাখ ১১২১ সাল সদর।

কাগজপত্র বুঝিয়া ইস্তক সন ১১২১ শুরু পুণ্যাহ নাগাদ আখের কিফাইত হয় পাইব, টোটা হয় দিব হিস্যা মজকুর বিনা টোটা না দিয়া আমল করিতে না পারিব ইতি।

শ্রীদর্পনারায়ণ মিত্রস্য—

১৩১৯ সালে বরিশাল সাহিত্য পরিষদ শাখা হইতে প্রকাশিত "চন্দ্রদ্বীপরাজ বংশ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবরণ" ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮. হাণ্ডিয়াল—চাটমোহর ঃ

ক। শ্রীশ্রীরাম

শ্রীব্রজরাম প্রামাণিক—
যচরিতেসু পত্রমিদং সন ১১৪১—
এগার শত একচল্লিশ লিখনং—
কার্য্যঞ্চআগে মৌজে দরাপপুর—
পরগণে হাণ্ডিয়াল মৌজে মজকুরে—
একটি জলাশয় দিবা সে নিমিত্ত—
৫/৮ পাঁচ বিঘা জমি তোমায় দিলাও—
পুষ্করিণী খনন করিয়া আপন সাথ করহ—
পাঁচ বিঘার মধ্যেই পাড় হাবেক। পাড় তোমাকেই—
দিলাও বৃক্ষ লাগাইয়া ভোগ করহ খিরাজ সাহে—
দাবি নাই ইতি সন সদর ১৯ কার্তিক--

শ্রীরামকান্ত শর্মা—
দস্তখত

খ। শ্রীরাম—

ইয়াদি বিঙ্গ শ্রীধনিরাম সাহা—
সচ্চরিরেষু পত্র মিদং সন ১১৮২—
এগার শও বিরাশী সালাব্দে--
লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে মৌজে দরমাতা--
পাটীয়াতা পরগণে কাটার মহাল সরকার—

শ্রীমহারাণী ভবানী দেব্যাঃ—
দস্তখত

বাজুহার মৌজে মজকুরে একটি পুষ্করিণী—
খনন করিবা। তদর্থ জমী কীতাবত পরগণে ডি—
মহরির হাশিল ও পতিত মবলগে ৭।/ সাত বিঘা—
হাসিল পতিতধানী ২।৹ বিঘা পতিত নাএক্রা ধানী ৫।৹ বিঘা
তোমাকে লাখরাজ দিলাম পুষ্করিণী খনন করিবা—
জলোদ্দার করিয়া সাথ করহ পাহাড়ে বাস লাগায়া—
পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ হরসাল—
খিরাজ মাপ ইতি সন সদর তারিখ ১৯ কার্ত্তিক—

ক ও খ দলিল হান্ডিয়ালের শ্রীযুত মুকুন্দলাল সাহাদিগের নিকট আছে।

৯. নরনিয়া—শাহজাদপুর ঃ

ছেয়াদৎ ও নজাবৎ পানা সৈয়দ আব্দুল কাছেম বায়া ফিয়াৎ বাসেদ—

ফপরন্ নেছা ও আমিরণ নেছা সৈয়দয়ানীআন্ বাদিনী বয়া নিবাস নরনিয়া পরগণে ইসুপশাহী বাদিনীদ্বয়ার উকিল, সাকতেআলী প্রকাশ করিলেন যে, মোয়াজী ১০৵৹ পাকী ভূমি ও একখণ্ড খানাবাড়ি খারিজী জমা মধ্যে পূর্ব বাদ সাহার সুদৃষ্টে ভুতুরিয়া পরগণার ও সরকার বাজুহার অন্তর্গত পুরুষানুক্রমে বাদিনী দ্বয়ার দখলে রহিয়াছে এইক্ষণে উক্ত মৌজার ইজারাদার কালু সান্যাল ইচ্ছা করে যে জরিপ করতঃ বাজেআপ্ত করে এই সম্বন্ধে তোমাকে লেখা যায় যে উক্ত সান্যালকে বিশেষরূপে তাগিদের সহিত অবগত করাইবা যে উল্লিখিত ভূমি ও খানাবাড়ি গয়রহ পূর্ব নিয়মানুসারে উপরোক্ত বাদিনীদ্বয়কে ছাড়িয়া দেয় এবং অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হইতে ক্ষ্যান্ত থাকে ও জরিপ করার কোন অভিপ্রায় প্রকাশ না করে যে ভবিষ্যতে আবার এই নালিশ আমার নিকট উপস্থিত না হয় আর অধিক কি লিখিব ইতি—

১১৭৯ সাল
শাহ আলম বাদসাহ।

এই দলিল নরনিয়া নিবাসী সৈয়দ আব্দুল হামিদ খোন্দকার সাহেবের নিকট আছে।

১০. অষ্টমনীষা—চাটমোহর ঃ

অষ্টমনীষার গোপীকান্ত রায় বংশীয় সুবুদ্ধি খাঁ ও কমল খাঁ নবাব সরকারে বক্‌সি পদবীতে কার্য করিতেন, নিম্নলিখিত দলিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"এজলাস মৌলভি গোলাম আহম্মদ খাজেমসরা ১১৭৪ হিজরী ১০ সফর ১ জুলুস্।

"কানুরাম রায় দিগরের উকিল আব্দুলগণি দরখাস্ত করায় গোপীকান্ত নিউগীর বংশধর সুবুদ্ধি খাঁ বক্‌সি সুবাজাতে নিযুক্ত থাকায় তাহারা উক্ত কার্য অতি বিশ্বস্ত ও সাহসিকতার সহিত সম্পন্ন করায় বাদশাহ কর্তৃক উক্ত সোনাবাজু পরগণা নির্দিষ্টরূপে তাহাদিগকে দেড় হাজার বিঘা ভূমি লাখেরাজ প্রদত্ত হওয়ায় তাহারা ও তাহাদের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পরগণার মুৎসদ্দির চক্রান্তে তপ্পে ভাতুরিয়ার রাজার তহশীলদার শিবনারায়ণ মৈত্র উক্ত ভূমি হইতে প্রার্থকগণকে দখলচ্যুত করায় তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় না থাকায় হুজুরে দয়াবান ইত্যাদি বিবরণে বিচার প্রার্থী হইয়া হিজরী ১১৭১ সাল ১২ রজব দরখাস্ত করায় কাননগু আলমের কৈফিয়ত তলপ হওয়ায় কাননগু আলমের কৈফিয়তে প্রকাশ যে উক্ত **সুবুদ্ধি খাঁ** ও **কমল খাঁ** নামে ২০ বিঘা ভূমি লাখেরাজ লেখা যায়। সুবুদ্ধি খাঁ ও কমল খাঁ সুবাজাতের বক্‌সি ওয়াদার কার্য করায় অবশিষ্ট জমি তাহাদের জায়গীর। ছিল প্রার্থকগণ যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে তাহাদের জবানবন্দী খেলাপ হইয়া এই স্থানে মুরচা থাকায় ও তাহারা সুবাজাতের বক্‌সী থাকায়, তাহাদের নামানুসারে জায়গীরের নামকরণ হইয়াছে এ অবস্থায় সমস্ত জমি দাবী হইতে পারে না মতে সেফাতুল্যা চোপদারের নামে আদেশ করা যায়

যে, কাননগু আলমের ২০ বিঘা লাখেরাজ জমি প্রার্থকগণকে দখল দেয় ও তাহার কৈফিয়ৎ তলপ করে।" *কায়স্থ পত্রিকা—আষাঢ়—১৩১৫ সাল।*

ঘ. গবর্নমেন্ট পেনসান পেমেন্ট অর্ডার ঃ

উধুনিয়া গ্রামের সিংহ জমিদারগণের বাটিতে দৈনিক পূজিত গোপাল বিগ্রহের সেবা জন্য রাজশাহী কালেক্টরী হইতে যে পেন্সান পাওয়া যায় তাহার হুকুমনামা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Pension Payment Order

Pensioner's Half

Name of Pensioner— (1) Madhu Munjari Debya.
(2) Krishnasundari Debya

Head of charge 47 Miscellaneous Compensation Central rated

Class of pension and date of sanctioning it.	**Date or approximate date of birth.**	**Sect.**	**Residence showing Village Pargannah.**	**Amount of monthly compensation. Rs.**	**a.**	**p.**
Sebaits compensation order dated 3.1.1794 vide statt. record. with Collr. of Rajshahi No. 1470a of 2-1-84. R7 R461 & R 7 C881. of 18.9.13.	18.7.49 28.6.73	Hindu Kaystha	Udhunia Chatmahar Pabna.	23	8	5

No. S. R/505

Accountant General's Office
Calcutta, the 30th Sept. 1921

Sir,

Until further notice and on the expiration of every month, be pleased to pay (I) Madhumunjari Debya, widow of Kunjamohon Sinha and (II) Krishna Kumari Debya, widow of Ram Gobind Sinha, Sebaits of Gopal Deb Thakur, the sum of Rupees Twenty three annas eight pies five only with effect from 1st March 1921 being the amount of compensation granted on the abolition Hat Udhunia in Pergannah Kattermahal upon the production of this order and a receipt according to usual form,

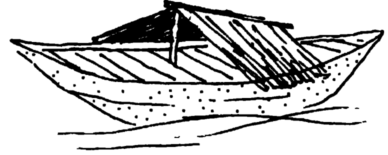
Note : Subject to revision by the Government of India in the department of Finance and to recovery of excess payment, if any.

To, The Collector of Rajshari, Asst. Acct. General, Bengal.

তথ্যসূত্র

১. তাম্রশাসনে বিরাজ নগর পাঠ আছে।
২. ধর, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাত, ইহাদিগকে বসু বলে।
৩. এই মাধব ব্রাহ্মণ হইতে বোধ হয় দত্ত ভূমির নাম মাধবনগর হইয়াছিল এবং তাহা হইতে কালে মাধাই নগর হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়



জমিজমা ও জমিদারগণ

প্রথম পরিচ্ছেদ—জমির স্বত্বাদি

জমির বন্দোবস্তানুসারে এই জেলার ভূসম্পত্তির স্বত্বাধিকার সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা—(ক) যে সমস্ত ভূমির উপস্বত্ব দখলভোগাদি জন্য ভূম্যধিকারিগণ সরকার বাহাদুরকে রাজস্ব দিয়া থাকেন এবং (খ) যাহার জন্য তাহাদিগকে কোন রাজস্ব দিতে হয় না অর্থাৎ সিদ্ধ নিস্কর। প্রথমোক্তগুলি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—(১) **চিরস্থায়ী** বন্দোবস্তের **জমিদারি স্বত্ব** (Permanently Settled Estate) অর্থাৎ যাহাদের রাজস্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে গভর্নমেন্ট ও ভূস্বামিগণের মধ্যে এক নির্দিষ্ট জমায় বা হারে স্থিরীকৃত হইয়াছে। (২) **অস্থায়ী জমিদারি স্বত্ব** (Temporarily Settled Estate) অর্থাৎ যাহার বন্দোবস্তের রাজস্ব সরকার বাহাদুর ইচ্ছা বা প্রয়োজনানুসারে হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারেন বা করিয়া থাকেন।

অস্থায়ী বন্দোবস্তমূলক ভূসম্পত্তিগুলিকে দুইভাগে বিভাগ করা যায়, যথা—

ক. বাজেআপ্ত তালুক (Resumed Estates) ঃ

এইগুলি প্রথমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তমূলক সম্পত্তির অন্তর্গত ছিল পরে গবর্নমেন্ট তৎসমুদায় মালিকগণের নিকট হইতে কারণ বিশেষে খাস করিয়া লইয়া পূর্বাধিকারগণের সহিত অথবা অন্য মালিক কিংবা প্রজা বিশেষের সহিত নির্দিষ্টকাল জন্য নূতন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন বা এখনও দিয়া থাকেন। বন্দোবস্তকারিগণ মেয়াদকাল পর্যন্ত অধীন প্রজাগণের নিকট আদায়ী খাজনার উপর একটা কমিশন বা লাভ রাখিয়া সরকারের সহিত স্বীকৃত রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকেন এবং নির্দিষ্ট কাল অন্তে পুনরায় বন্দোবস্ত করিয়া লন। পূর্বে এই সমস্ত সম্পত্তির রাজস্ব এক নির্দিষ্ট জমায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তমূলক ছিল, পরে তাহা গবর্নমেন্টের খাসে যাওয়ায় এতদসমুদয় বাজেআপ্ত তালুক (Resumed Estate) নামে পরিচিত হইয়াছে।

খ. খাসমহাল ঃ

পদ্মা, যমুনাদি নদীগর্ভে প্রতিবৎসর নূতন চর পড়িয়া যে সকল ভূভাগ গঠিত হয়, তৎসমুদায় গবর্নমেন্টের খাস ভূসম্পত্তি বা খাসমহাল বলিয়া অভিহিত হয়। এইগুলি সরকার বাহাদুর স্বয়ং ভূস্বামী রূপে কৃষিপ্রজাগণকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহার খাজনা জমির প্রকৃতি অনুসারে কখনও কখনও বার্ষিক পরিবর্তন হইয়া থাকে।

জমিদারি স্বত্বের অধীন (১) **পত্তনী** ও (২) **দর পত্তনী** স্বত্ব এই জেলায় অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। জমিদারি ও পত্তনীআদি স্বত্বাধিকারীগণের অধীনে (৩) **জোতদারি স্বত্ব** এবং তদাধীনে (৪) **প্রজাস্বত্বই** এই জেলার বেশি পরিমাণে প্রচলিত। এই প্রজাস্বত্ব ব্যতীত এই জেলার বহুলপরিমাণে (৫) **বর্গাদার** প্রথায় সাধারণ কৃষিজীবীগণ জমির চাষ আবাদ করিয়া

থাকে। বর্গাদারগণের জমিতে কোন স্থায়ী স্বত্ব নাই, তাহারা বার্ষিক অথবা স্থলবিশেষে একাদিক্রমে বহুদিন পর্যন্ত জোতদারগণের জমি চাষ আবাদ করে। বর্গাদারগণ নিজ লাঙ্গলাদিতে স্বকীয় পরিশ্রমে এবং স্থলবিশেষে কোন কোন ফলনের বেছন পর্যন্ত দিয়া জমি আবাদ বুনানী করতঃ উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ বা কম বেশি অংশ, জোতদারগণকে প্রদান করে ; জোতদারগণ জমির খাজনা এবং ফসলের বেছন বা তম্মূল্য বহন করিয়া থাকে।

জোতদারি স্বত্ব নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, যথা—(ক) কায়েমি মৌরসি জোত, (খ) ছরাছরি জোত, (গ) মেয়াদি জোত, (ঘ) ইজারা বন্দোবস্ত (ঙ) উঠিত পতিত বা চর্চা জোত। (সাধারণতঃ নদীর চরজমিতে অধিক প্রচলিত।)

প্রজাস্বত্ব বা রায়তি স্বত্ব নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, যথা—

(ক) কায়েমি মৌরসি প্রজা, (২) ছরাছরি প্রজা, (৩) দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা, (৪) কোরফা প্রজা, (৫) পাইকাস্ত প্রজা, (৬) খোদকাস্ত প্রজা।

নিষ্কর স্বত্ব এই জেলায় নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার বিদ্যমান আছে। যথা ঃ

(১) **দেবোত্তর**—দেবসেবার উদ্দেশ্যে জমির ভোগদখলের স্বত্ব।

(২) **ব্রহ্মোত্তর**—ব্রাহ্মণের গ্রাসাচ্ছাদনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জমির স্বত্ব।

(৩) **লাখেরাজ**—হিন্দু মুসলমান জমিদার বা জোতদারগণ কর্তৃক পুষ্করিণীআদি খনন অথবা কার্যবিশেষের পারিতোষিক বাবদ প্রদত্ত জমির স্বত্ব।

(৪) **পিরাণ বা পীরপাল**—পীর ফকিরাদির ভরণপোষণ জন্য প্রদত্ত জমির স্বত্ব।

(৫) **ভোগোত্তর**—দান বিক্রি আদি স্বত্ব ব্যতীত পুরুষাণুক্রমে ভোগ জন্য প্রদত্ত জমির স্বত্ব।

(৬) **বৈষ্ণবোত্তর**—বৈষ্ণবদিগের প্রতিপালনাদি উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জমির স্বত্ব।

(৭) **বৈদ্যোত্তর**—চিকিৎসকগণের পোষণার্থ প্রদত্ত জমির স্বত্ব।

(৮) **চাকরাণ**—পাইক বরকন্দাজ, ধোপা, নাপিত, ভুইমালি, সূত্রধর, চর্মকারাদির কার্যের মাহিনার পরিবর্তে প্রদত্ত জমির স্বত্ব।

(৯) মহাত্রাণ—শূদ্রাদিকে প্রদত্ত লাখেরাজ জমির স্বত্ব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—খাজনাদি

এই জেলায় সাধারণত (১) মাঠান জমি, (২) বাস্তু জমি, (৩) বাগান জমি, (৪) চরজাত জমি জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজনার নিরিখ প্রচলিত থাকা জানিতে পাওয়া যায়। সর্বপ্রকার জমির জন্য সিক্কা টাকায় খাজনা আদায় হইয়া থাকে। বর্গাদার বা বর্গাইত প্রথায় যে সমস্ত জমি বিলি করা হয়, তাহার ফসলের যে অর্ধাংশ জমির মালিকগণ লইয়া থাকেন, তাহাও খাজনা বা উৎপন্ন শস্য দ্বারা খাজনা (Produce rent) বলা যায়। তবে এই প্রকারে বন্দোবস্তমূলক ভূমি কর্ষণকারিগণকে প্রজাই স্বত্বাধিকার দেওয়া যাইবে কিনা তাহা লইয়া বর্তমানে নানারূপ বাগবিতণ্ডা ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

ধান, পাট, মটর খেসারি আদি রবিশস্য আবাদি জমির খাজনা সাধারণত সর্বত্র একই হারে আদায় হয়, কিন্তু সদর মহকুমায়, ইক্ষু, হলুদ, পান প্রভৃতি আবাদ জন্য ব্যবহৃত জমির খাজনা কথাঞ্চিৎ বেশি। বাস্তু জমির খাজনা তদপেক্ষা অধিক। পাবনা ও সিরাজগঞ্জ টাউনে

বাসাবাড়ির জন্য খাজনা দৈনন্দিন মফঃস্বলস্থ অধিবাসিগণের আগমন ও বাসস্থান নির্মাণ হেতু ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। পাবনার বিঘা প্রতি কায়েমি বাসাবাটির বার্ষিক খাজনা ২০/ কুড়ি টাকা এবং সিরাজগঞ্জ সদর রাস্তার সম্মুখে হাত প্রতি বার আনা হইতে ১ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। চর জাত নূতন জমির বিশেষত খাসমহালের জমির ধার্য খাজনা সর্বাপেক্ষা কম; স্থলবিশেষে বার্ষিক /০ আনা হইতে সর্বোচ্চ মাত্র ১ এক টাকা পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়।

উৎপন্ন দ্রব্যবিশেষে জমির খাজনার হার—

	১৮৭১ খ্রিঃ খাজনা বিঘা প্রতি			১৯২১ খ্রিঃ খাজনা বিঘা প্রতি		
ধান্যাদি আবাদি—	॥০	হইতে	॥৶	১	হইতে	৩
বিলজাত	৸০	"	১	১॥০	"	৪
চরজাত	।০	"	॥০	৸০	"	২
ইক্ষুর জমি	২	"	৩	৩	"	৪॥০
হলুদের জমি	১॥০	"	২	৩	"	৫
ছন ঘর	১॥০	"	২	২	"	৩॥০
পানের বরজ	৫	"	৬	৫	"	৬
বাগান	৪	"	৬	৫	"	৭

খাজনা ব্যতীত এই জেলায় প্রজাগণকে স্থল বিশেষে যে অতিরিক্ত করভার বহন করিতে হয়, তৎসমুদায় আবোওয়াব বা বাজে জমা নামে অভিহিত হয়। জমিদারগণের মফঃস্বল কাছারিতে স্থান বিশেষে জমার টাকা প্রতি ২ আনা / ৩ আনা হইতে আরম্ভ করিয়া তদূর্ধ্ব পর্যন্ত বাজে জমা আদায় করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে বলিয়া জানা যায়। বাজে জমা ব্যতীত কোন কোন সময়ে জমিদারগণের বিশেষ কার্যোপলক্ষে **ভিক্ষা** বা সাময়িক সাহায্য আদায় করিবার নিয়মও কোন কোন স্থলে প্রচলিত আছে।

নিম্নলিখিত বাজে জমা এই জেলায় প্রচলিত এবং প্রজাকে দিতে হয়।

১) **গ্রাম খরচা**—গ্রামে জমিদারগণের আমলা তহশীলদারাদির থাকাকালীন মাহিনা ও সর্বপ্রকার ব্যয়ভার সমস্ত গ্রামবাসী বহন করে। হারাহারি ভাবে সকলকেই দিতে হয়ে।

২) **তহরীর**—দাখিলা ও হিসাবাদি লেখক কর্মচারিবর্গের পাওনা।

৩) **ফারখতি**—সনান্তে হিসাব নিকাশ শোধকালীন আদায়।

৪) **পার্বণী**—বর্ষশেষে বা পূজার আমোদাদি বাবাদ আদায় হয়।

৫) **মারচা**—প্রজার বাটিতে বিবাহকালীন তাহাদের নিকট আদায় হয়। ইহা আজকাল প্রায় উঠিয়া যাইতেছে।

এতদ্ব্যতীত খাজনা জন্য পেয়াদা প্রজার বাটিতে গেলে (১) **পেয়াদার** রোজ নামে তাহার খোরাকি বাবদ দেয় খরচা, কোন প্রজার নামে নালিস উপস্থিত হইয়া দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার নিকট আদায়ী (২) **জরিবানা** এবং প্রজাগণ জমিদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে কিংবা তাহারা একে অন্যের জমি খরিদ করিলে তাহা খারিজ দাখিল জন্য,জমিদারকে (৩) **নজরানা** বা **সালামী** দিবার বা আদায় হইবার নিয়ম আছে। এইগুলি সমস্ত প্রজাগণকে দিতে হয় না; মাত্র এতৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে বহন করিতে হয়।

প্রজা ও ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে সম্বন্ধ ঃ

হিসাবে দেখিলে জানা যায় এই জেলার অনেকগুলি সমৃদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামী ভিন্নজেলাবাসী; এ জেলার সহিত তাঁহাদের জমিদারি ব্যতীত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্পর্ক নাই। কেবলমাত্র খাজনাদি আদায় লইয়াই তাঁহাদের বা তাঁহাদের কর্মচারিগণের প্রজার সহিত সংস্রব। জেলাবাসী জমিদারগণের মধ্যেও অনেকের ভোগবিলাসপ্রিয়তা হেতু অধিকাংশ সময়

জেলার বাহিরে অবস্থান প্রযুক্ত প্রজাগণ কর্ণে মাত্র ভূস্বামীর নাম অবগত হওয়া ব্যতীত চক্ষে বড় কাহার সহসা তাঁহার দর্শনের সুযোগ ঘটে না। তদুপরি অনেক জমিদারগণ অধুনা বহুবিধ শরিকে বিভক্ত হইয়াছেন, এবং স্থান বিশেষে তাঁহাদের অংশ হস্তান্তরিত হইয়া নূতন নূতন মালিকের সৃষ্টি হওয়ায় প্রজাগণের অভাব অভিযোগাদি নিরাকরণের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজাগণের প্রত্যক্ষভাবে ভূম্যধিকারীর সহিত সম্বন্ধ না থাকিয়া সম্বৎসর তদীয় কর্মচারিবৃন্দের সহিতই অধিক সম্পর্ক থাকে বা আছে বলিয়া বোধ হয়।

অন্যান্য জেলা অপেক্ষা পাবনায় জমিদারগণ অধিক পরিমাণে স্বাধীন ক্ষমতা পরিচালন করিতে ইচ্ছুক বা করিয়া থাকেন বলিয়াই বোধ হয়। ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে দেশিয় জমিদারগণের হস্তেই দেওয়ানি ফৌজদারি এবং শান্তিরক্ষাদি সর্বপ্রকার ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল, মুসলমান সম্রাট বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তাঁহাদের প্রাপ্য মালগুজারী যথাসময়ে পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন ; দেশের প্রজা সাধারণের সুখশান্তি ও সুযোগ সুবিধা সমস্তই দেশিয় জমিদার নামক মুরশিদ কুলি খাঁর সময়ে সৃষ্ট ভূস্বামিগণের উপর নির্ভর করিত। ইংরাজ আমলে উক্ত ক্ষমতা হ্রাস হইয়া ক্রমশ একে একে তাঁহাদের হস্ত হইতে তাহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু দেশিয় জমিদারগণ পূর্ব সংস্কারবশত এখনও তাহা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা এ দেশের প্রজা সাধারণের সর্ব বিষয়ের ক্ষমতা পরিচালন করিয়া থাকেন। এলাকা মধ্যে এই জেলায় জমিদারগণ হিন্দু মুসলমানের অনেক সময় সামাজিক গোলযোগে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ বা মীমাংসাদি করিয়া থাকেন। প্রজায় প্রজায় বিবাদের মীমাংসা, গ্রাম্য দলাদলির বিচার এবং প্রজাকে আবদ্ধ রাখিয়া খাজনা আদায় প্রভৃতি এই জেলায় অধিকাংশ জমিদারগণের সেরেস্তায় নিয়ম আছে। ইহার ভালমন্দ উভয়বিধ ফলাফল দৃষ্ট হয়। সামান্য কারণে মামলা মোকদ্দমা করিয়া অযথা আইন আদালতে উকিল মোক্তার মহুরিগণ কর্তৃক সর্বশান্ত হইতে হয় না এবং শীঘ্র সমস্ত বিষয় মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু অনেক সময় স্বয়ং জমিদারগণের দেশে অনুপস্থিতি হেতু কর্তব্যবুদ্ধিহীন ও নিরক্ষর নায়েব গোমস্তাগণের স্বার্থপরতায় সকল সময় সুবিচার হয় না এবং অনেক গুরুতর ব্যাপার সময় মত গবর্নমেন্টের দৃষ্টিতে পৌছিতে পারে না ; ধনবান পক্ষের সাধারণত জয়লাভ ঘটে।

এই জেলায় জমিদারগণ নূতন মালেক হইলে বা প্রজাগণ একে অন্যের সম্পত্তি খরিদ করিলে প্রজার কর বৃদ্ধি জন্য একবার চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত হয়েন না। নজর সালামী সর্বত্র এরূপ স্থলে আদায় প্রথা সর্বদা পরিলক্ষিত হয়। প্রজাগণ এই সমস্ত দিতে কুণ্ঠিত হয় না। কারণ পূর্বে তাহারা জমিদারগণের নিকট অনেক উপকার লাভ করিত। এক্ষণে তৎসমুদায় অন্তর্হিত হইয়াছে ; এই জেলার জমিদারবংশীয় অনেকে বিশেষ স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ এবং শারীরিক বলশালী ছিলেন ; তাঁহারা স্বীয় এলাকায় ব্যাঘ্র বরাহাদি বন্য জন্তুর আক্রমণ হইতে প্রজার অশেষ উপকার করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায় তাড়াসের স্বর্গীয় বনওয়ারিলাল রায় এবং তাঁতিবন্দের সুপ্রসিদ্ধ বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়দ্বয় এই জেলায় বিখ্যাত শিকারি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা প্রজার ও দেশের সাধারণের অশেষ উপকার হইত। এক্ষণে জমিদারগণ দার্জিলিং, শিলং, দেরাদুন, মধুপুর প্রবাসী হওয়ার ফলে এই জেলার কোন কোন স্থলে বন্য জন্তুর ভয়ে দিবাভাগে গতায়াত অসম্ভব এবং রাত্রিকালে বন্যবরাহের উপদ্রবে ধান্য ও ইক্ষুর জমিতে ফসল রক্ষা করা সুদুরপরাহত হইয়াছে।

এই জেলার প্রজাগণ সাধারণত শান্তিপ্রিয়। অধিকাংশ জমিদারগণ নানারূপ বাজে জমা আদায় করিলেও তাহারা তাহা দিতে নারাজ নহে। পূর্বে রাজা রামজীবনী হাতের মাপকাঠি প্রচলিত ছিল। তাহার আদর্শ পাবনা ও রাজশাহী কালেক্টারিতে এখনও বর্তমান আছে। তাহার জাবেদা নকল পূর্বে সাধারণে পাইত। এক্ষণে পাওয়া সুকঠিন। ইহার নকল কাহার কাহার ঘরে এখনও দেখা যায়। ঐ মাপকাঠি সাধারণত বর্তমানে প্রচলিত ১৮ ইঞ্চি অপেক্ষা অনেক

বড়। জমিদারগণ এক্ষণে নূতন মাপকাঠি দিয়া প্রজার জমি জরিপ করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তজ্জন্য প্রজা জমিদার মধ্যে নানারূপ মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এই গোলযোগ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ হইতে এই জেলায় এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বিঘা ও পাখির মাপ এই জেলায় প্রচলিত থাকায় অন্য এক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বর্তমানে এই জেলায় যে সার্ভে সেটেলমেন্টের কার্য চলিতেছে, তাহাতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি আদি নানা কারণে প্রজার খাজনা স্থানে স্থানে অনেক বৃদ্ধি হইল বলিয়াই বোধ হয়। তবে স্বত্বাদির অনেক মীমাংসা হইয়া প্রজাগণ অনেকাংশে সতর্ক ও সাবধান এবং স্থলবিশেষে লাভবান হইল।

এই জেলার ভূম্যধিকারিগণের অনেকের সম্পত্তি পাবনার ও সিরাজগঞ্জের অনেকগুলি ব্যাঙ্কের হস্তগত হওয়ায় প্রজাগণের অনেক প্রকার অসুবিধা হইয়াছে। তবে বোধ হয় ইহাতে বাজে জমা আদায়াদির অনেক লাঘব হইবার সম্ভাবনা আছে।

এই জেলার অধিকাংশ কৃষিজীবী প্রজা মুসলমান এবং ভূস্বামী জমিদার ও জোতদারগণের অনেকেই হিন্দু। এই জমিদারগণের এলাকা মধ্যে গো-কোরবানি আদি লইয়া অনেক সময় নানারূপ বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমা ঘটিয়া থাকে ; হিন্দু জমিদারগণ অনেক স্থলে মুসলমান প্রজাবর্গের নিকট হইতে বৃত্তি, কালী বৃত্তি আদি যে বাজে জমা (আবওয়াব) আদায় করিয়া থাকেন, প্রজাগণ তাহাদের ধর্মবিরুদ্ধ মনে করিয়া তৎসমুদায় আদায়ে অনেক সময় আপত্তি উত্থাপন করিলে তজ্জন্যও প্রজাভূম্যধিকারিগণের মধ্যে অশেষ প্রকার মনোমালিণ্যের কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে। বিগত তিন চারি বৎসর হইল কতকগুলি অপরিণামদর্শী লোকের প্রচেষ্টায় দেশে হিন্দু মুসলমান মধ্যে নানা গোলযোগের সৃষ্টি হওয়ায় এই জেলার স্থানে স্থানে হিন্দু জোতদারগণের জমি মুসলমান বর্গাদারগণ চাষ আবাদ করিতেছে না ; তাহার ফলে চাটমোহর থানার হাদল, পার্শ্বডাঙা ও অন্যান্য কতকগুলি স্থানে উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

প্রজাভূম্যধিকারী সম্বন্ধ নিম্নোদ্ধৃত বিবরণে কিঞ্চিৎ সূচিত হইয়া থাকে।

যথা ঃ—Many large proprietors belong to nonresident zamindars, while minor estates have been split up and sublet to a large extent. These had closly affected the position of the tenants, for the power of landlords is the greatest in campact well-managed estates under resident proprietors and is weakened where estates are subdivided and there are a number of petty share holders constantly squabling. As result of this state of affairs, combination of tenants against landlords are fairly common in the district, more especially in the Sirajgunj Subdivision, where cases arising from disputes between landlords and tenants occupy much of the Subdivisional Officer's time. The most remarkable instance of such combination is the Agrarian movement of 1873 ... by which the cultivators defeated their lanlord's attempts to enhance their rent-rolls. This led Sir William Hunter to remark in 1876 in the preface of the ninth volume of the Statistical Account of Bengal dealing with Pabna. "The rural population have proved themselves quick to appreciate to act upon the rights which English rule secures to rich and poor. They have fought out with keen persistence, but with few ebullitions of violence, the struggle between landlord and tenant and are conductiong before our eyes an agrarian revolution by due course of law" *Bengal District Gazetteer-Pabna. 1923 by L. S. S. O'Malley. P. 82.*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—প্রজাবিদ্রোহ

বাংলা ১২৭৯/৮০ সালের জমিদার ও প্রজাগণ মধ্যে বিবাদ পাবনা জেলার আধুনিক সময়ের প্রধানতম ঐতিহাসিক ঘটনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মূলে বাংলার ভূস্বামিগণ গভর্নমেন্টের সহিত চিরকালের জন্য স্থায়ীভাবে রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া লন, কিন্তু তাহারা প্রজার নিকট যদৃচ্ছা খাজনা আদায় করিয়া লইতে ও তাহা সময় সময় বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, এমন কি স্থলবিশেষে তাহারা বলপূর্বক উৎপীড়ন করতঃ বৃদ্ধি জমা ও বাজে জমাদি আদায় করিতেন। এ বিষয় লইয়া যদিও ইতিপূর্বে দেশে নানারূপ আন্দোলন চলিতেছিল, তথাপি প্রজা ও ভূম্যধিকারিগণ মধ্যে এযাবৎ খাজনা সম্বন্ধীয় আইনের কোন বিশেষ বিধান না থাকায় গভর্নমেন্ট জমিদারগণের এতাদৃশ অত্যাচার হইতে রায়তগণকে রক্ষা করিতে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। পাবনা জেলার প্রজাগণ সাধারণত শান্ত প্রকৃতি ও নিরীহ হইলেও এক্ষণে নিম্নলিখিত কারণসমূহে স্থানে স্থানে সবিশেষ উৎপীড়িত হইয়া বহু লোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া জমিদারগণের বৃদ্ধি জমা আদায়ে বাধা প্রদান করে এবং এতদুপলক্ষে স্থানে স্থানে নানারূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া জেলাময় যে বিষম আন্দোলন ও অশান্তির সৃষ্টি হয়, প্রজা ও জমিদারগণ মধ্যে জেলাবাসী এই সংঘর্ষ পাবনা জেলার **প্রজাবিদ্রোহ** নামে পরিচিত। এই তুমুল আন্দোলনের ফলে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি এ বিষয়ে বিশেষরূপে আকৃষ্ট এবং গভর্নমেন্ট হইতে নানারূপ আইন কানুন প্রচলিত হয়। পূর্বে প্রজাস্বত্ব আইনের নাম ছিল "Laws relating to Landlords and Tentants." Act VII. of 1859. এক্ষণে এই আন্দোলনের ফলে প্রজাকে রক্ষা কল্পে আইনের নাম সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন (Bengal Tenancy Act. Act VIII of 1885) প্রবর্তিত হয়। ১৮৭২।৭৩ খ্রিস্টাব্দের এই জেলার খাজনা সম্বন্ধীয় গোলযোগ প্রকৃতপক্ষে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তনের মূল কারণ।[১]

ক. বিদ্রোহের কারণ ঃ

১. বাজে জমা আদায় ঃ

প্রজাগণ তাহাদের দেয় খাজনা ভিন্ন বাজে জমাদি প্রদানে আপত্তি করে। জমিদার ও তাহাদের কর্মচারিগণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাহা আদায়ের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। তাঁহারা গ্রাম খরচ, স্কুল খরচ, তহরি, পার্বণী ও বিবাহাদিতে প্রজার নিকট সাহায্য ও ভিক্ষা প্রভৃতি আদায় করিতে থাকেন। রায়তগণ কোন স্থলে স্বেচ্ছায়, কোনস্থলে অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া এই সমস্ত দিয়া আসিতে থাকে।

যখন জমিদার ও প্রজাগণ মধ্যে বাজে জমাদি লইয়া এবম্প্রকার আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন নাটোররাজের জমিদারির অন্তর্গত ইসুপশাহী পরগণা বাকি রাজস্ব জন্য নিলাম হওয়ায় নিম্নলিখিত কয়েকজন ভূম্যধিকারিগণ তাহা খরিদ করেন। (১) কলিকাতার ঠাকুর জমিদার, (২) ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, (৩) সলপের সান্যাল (ভট্টাচার্যদিগের বিনামীতে), (৪) পোরজনার ভাদুড়ী, (৫) স্থলের পাকড়াশি। পূর্ব হইতে প্রজাবর্গ বাজে জমাদি আদায় জন্য জমিদারগণের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল, এক্ষণে উক্ত পরগণা নূতন মালেকগণ খরিদ করতঃ তাঁহারা প্রকারান্তরে প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করায় অসন্তোষ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

২. নূতন জরিপ প্রণালী ঃ

নূতন মালিকগণ প্রজার জমি জরিপ করিতে গিয়া নূতন জরিপ প্রথা প্রবর্তন করিলেন। নাটোর রাজের সময়ে জরিপের যে নিয়ম ছিল তাহারা তৎপরিবর্তে নূতন মাপের নলদ্বারা প্রজার জমি মাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বে রাজা রামজীবনী এক হাতের মাপ প্রায় ২৬।।০

ইঞ্চি হইতে ২৩৷৷৹ পরিমাণ ছিল, এক্ষণে ১৮ ইঞ্চি হাতের মাপ প্রচলিত হওয়ায় প্রজার জমি ক্রমশ হ্রাস হইয়া পক্ষান্তরে নানারূপ বাজে জমাদি লইয়া তাহাদের দেয় খাজনা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। শাহজাদপুরের মসজিদের দেওয়ালের প্রস্তরগাত্রে ৩০ ইঞ্চি পরিমাণ একটি খোদিত রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ ইহা মক্‌দম্ সাহেবের সময়ের এক হস্তের পরিমাণ ছিল। ইউসুপশাহী পরগণায় একসময়ে তাঁহার এই হাতের মাপকাঠি প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, নূতন জরিপ কার্যের মাপকাঠির পরিমাণ লইয়া রায়তগণের মধ্যে বিষম আঘাত লাগায় মনোমালিন্য ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

"The quarrel arose owing to the purchase, by absent landlords (zaminders) of lands, which formerly belonged to the Natore Raja. From the first the relation between the newcomers and Rayots were unfriendly. The Zamindars attempted to enhance rents and also to consolidate customary cesses with rents and dispute arose over the proper length of the measureing pole." *Imperial Gazetteer E. B. &. Assam. P. 285.*

ভাবার্থ এই যে পূর্বতন নাটোর রাজ সম্পত্তি জেলায় অনুপস্থিত জমিদারগণ কর্তৃক খরিদ করায় বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রথম হইতে রায়ত ও নূতন মালেকগণ মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। জমিদারগণ খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা এবং খাজনার সহিত প্রচলিত বাজে জমাদি একত্র করিতেছিলেন। জরিপী নলের পরিমাণ লইয়া এক্ষণে বিবাদ উপস্থিত হইল।

৩. বৃদ্ধি জমায় কবুলিয়ত গ্রহণ ঃ

এই সময় রোড সেস্ আইন সর্বত্র জারি হওয়ায় জমিদারগণ পথকরের রিটারণে প্রজার জমাজমি অবধারণপূর্বক তাহা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন।[২] তাঁহারা উল্লিখিত কারণে রায়তের নিকট হইতে বৃদ্ধি জমায় কবুলিয়ত আদায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রজাগণকে কোন পাট্টাদি কিছুই দিতে স্বীকৃত হইলেন না। নাটোর রাজের সময়ে যাহার খাজনা ১৲ টাকা ছিল পরে তাহার উপর আট আনা বৃদ্ধি হইয়াছিল। এক্ষণে ১৮৭২ খ্রিস্টব্দে তাহার উপর আরও আট আনা বৃদ্ধির চেষ্টা হইল ; মোটের উপর যাহার খাজনা ইতিপূর্বে ১৲ এক টাকা ছিল এক্ষণে তাহা ২৲ টাকা করিবার চেষ্টা হইল ; আদালতের বিচারে স্থলবিশেষে ১৷৷০ টাকা সাব্যস্ত হইতে লাগিল। এই প্রকারে প্রজাগণ আপনাদের দেয় খাজনার পরিমাণ সহসা নির্ণয় করিতে পারিত না। যেখানে জমিদারবর্গের কার্যকারকগণ জোরপূর্বক প্রজার নিকট কবুলিয়ত রেজেষ্টারী করিয়া লইয়াছিলেন, প্রজাগণ তাহা অস্বীকার করিল ও স্থলবিশেষে প্রজার বিনা সম্মতিতে বলপূর্বক লওয়া হইয়াছে, বিচারে এমত সাব্যস্ত হইতে লাগিল।

These were the two original causes of the dispute :–a high rate of collection as compared with other parganas and an uncertainity as to how far the amount claimed was due. The third and auxiliary cause is to be found in the violent and lawless character of some of the Zamindars and of the agents of others. *Hunters Statistical Account of Bengal, Pabna. P. 319-20.*

অর্থাৎ অন্যান্য পরগণার তুলনায় উচ্চ হারে খাজনা আদায় এবং দেয় খাজনার অস্থিরতা এই দুইটি বিরোধের আদি কারণ। তৃতীয় এবং সহকারী কারণ—কতকগুলি জমিদার ও কাহারও আমলাগণের উশৃঙ্খল এবং বেআইনি ব্যবহার।

আদালতের সাহায্যে নোটিস জারি ব্যতীত প্রজার অসম্মতিতে খাজনা বৃদ্ধি করা যায় না, কিন্তু জমিদারগণ ইচ্ছামত কৌশলে প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত হইলেন এবং প্রচার করিতে লাগিলেন যে, দখলি স্বত্ববিশিষ্ট প্রজার জমিতে কোন স্বত্ব নাই ; জমিদারদের সহিত বিবাদ করিলে তাহাদের ইচ্ছানুসারে জমি হইতে উচ্ছেদ হইতে হইবে।

খ. বিদ্রোহের প্রকাশ ঃ

জমা সম্বন্ধীয় গোলযোগ ক্রমশ জমি বিষয়ক গোলযোগের সহিত মিলিয়া উভয় পক্ষ মধ্যে বিবাদ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইল। ইতিপূর্বে রায়তগণ স্বেচ্ছায় জমিদারগণের খাজনা প্রদান করিয়া আসিলেও ১২৭৯ সালের ফাল্গুন চৈত্র মাসে ঐ সালের শেষ কিস্তির খাজনা দিতে তাহারা একেবারে অস্বীকার করিল। কোন কোন গ্রামের লোক জমিদারগণের বিরুদ্ধে ২।১টি মোকদ্দমায় জয়লাভ করে এবং আপীল পর্যন্ত বৃদ্ধি জমা রহিত হয়। রায়তগণকে কয়েদ রাখা অপরাধে জমিদার পক্ষীয় কাহার কাহার শাস্তি হয়। এই সমস্ত কারণে প্রোৎসাহিত হইয়া শাহজাদপুর থানার এলাকাস্থ রায়তগণ একেবারে খাজনা আদায়ে বাধা প্রদান করে এবং ক্রমশ দলবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করে।

অন্যান্য জমিদারগণ সহজে বিবাদ মীমাংসা করিতে স্বীকৃত হইলেও বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার পক্ষীয় কর্মচারিবর্গ কিছুতেই আপোষে এই সমস্ত গোলযোগ মীমাংসা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইহারা ইচ্ছামত প্রজার নিকট হইতে বর্ধিত হারে খাজনায় কবুলিয়ত লেখাইয়া লইয়া আদালতে দাখিল করিতে লাগিলেন। বিচারে তাহা বলপূর্বক লওয়া হইয়াছে সাব্যস্ত হইয়া স্বীকৃত জমায় কোন কোন স্থলে বিঘা প্রতি দশ আনা হারে খাজনা ডিক্রি হইল। উল্লিখিত কারণে এবং কোন কোন রায়তকে কয়েদ রাখিয়া খাজনা আদায় ও কবুলিয়ত গ্রহণের চেষ্টা জন্য সিরাজগঞ্জের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রে মিঃ নোলন সাহেব মহোদয়ের বিচারে জমিদারপক্ষের কোন কোন কর্মচারির দণ্ড হওয়ায় বাটুজো (বন্দ্যোপাধ্যায়) জমিদারগণের এলাকাস্থিত ধুবরা বেড়া গ্রামের প্রজাগণ একেবারে খাজনা আদায়ে বাধা প্রদান এবং রায়তগণকে ধরিয়া আনিবার চেষ্টা করিলে তাহারা পেয়াদা বেদখল করে ; ইহাই বিদ্রোহিগণের কার্যের প্রথম সূত্রপাত।

সচরাচর বিদ্রোহী অর্থে আমরা যাহা বুঝি ইহাদিগের উদ্দেশ্য তাহা ছিল না। দলবদ্ধ রায়তগণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, জমির খাজনা কম হারে দিতে হইবে এবং তাহারা বেশি মাপের হাত বিশিষ্ট মাপকাঠি বা নল প্রচলন করিবে। যাহাতে জমিদারগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত কম মাপের নলদ্বারা জমি জরিপ করতঃ জমিজমা সহসা হ্রাসবৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাহা নিবারণ করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

বিদ্রোহীগণের কার্য ঃ

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধন মানসে বিদ্রোহিগণ প্রথমে বহুলোক দলবদ্ধ হইয়া সিরাজগঞ্জ মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট জমিদারগণের অত্যাচার কাহিনী জ্ঞাপনার্থ আবেদন করিতে থাকে। প্রকাশ এই প্রকারে ১৮৭২।৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই পর্যন্ত সর্বসম্মত প্রায় ২৬৯ খানি গ্রামের অধিবাসী উক্ত মর্মে সিরাজগঞ্জ কোর্টে দরখাস্ত করিয়াছিল।

লিখিত আছে যে—"In May, the league spread and by the month of June it had spread over the whole of the Pargana. The Rayats calmly organised themselves into Bidrohi (rebels) as they styled themselves—a word which might be interpreted into unionist—under influence of an intelligent leader and a petty land holder and peaceably informed the Magistrate that they have united." *Bengal under the Lieut. Governors. P. 545.*

ভাবার্থ—মে মাসে জনতা বিস্তৃত হইল এবং জুন মাসে সমস্ত পরগণায় ইহা প্রসারিত হইল। রায়তগণ জনৈক চতুর ও ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর নেতৃত্বে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে শান্তভাবে জ্ঞাপন করে যে তাহারা সকলে একত্রিত হইয়াছে। লিখিত আছে যে, "এই জেলার শাহজাদপুর থানার মধ্যে দৌলতপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। তথাকার রায়বংশ অতি প্রসিদ্ধ। এই বংশে ঈশানচন্দ্র রায় নামে একজন বুদ্ধিমান ও সুচতুর লোক ছিলেন। হুরাসাগর

নদীতীরস্থ বেতকান্দি (কাদাই বাদলা, ফরিদ পাঙাসি আদি) গ্রাম লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল ; কিন্তু তাঁহারা প্রবল ও ধনবান জমিদার, কিছুতেই দম্য নহেন। সুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়াও ঈশানচন্দ্র কিছুই করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে তাহাদের নেতা হইলেন। *(সির:াজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত "আশালতা" ৯।১০ম সংখ্যা—১৪৯ পৃষ্ঠা)*

ঈশানচন্দ্র রায় সাধারণত বিদ্রোহিগণের রাজা বলিয়া অভিহিত হইতেন। রুদ্রগাঁতির বিখ্যাত অশ্বারোহী গঙ্গাচরণ পাল নামক জনৈক কায়স্থ তাহার সহকারী ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী রাজার দেওয়ান বলিয়া পরিচিত হইতেন, নিম্নলিখিত গ্রাম্য কবিতাংশে তাহা অদ্যাপি সূচিত হইয়া থাকে। যথা :—

"ও চাচা বিদ্রোহিদলের কথা কব কি,
নূতন আইন, নূতন দেওয়ান, কালু পালের ব্যাটা
সকলের আগে চলে মাথা বাঁধ্যা' ফ্যাঁটা।"

গঙ্গাচরণ পালের পিতা কালীচরণ পাল পাবনায় মোক্তারী করিতেন।

ঈশান রায় সম্বন্ধে আরও অনেক ছড়া কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহা এখনও স্থানে স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার কয়েকটি প্রদত্ত হইল।

"দৌলতপুরের কালী রায়ের বেটা।
ঈশান রায় বাবু।।
ছোট বড় সব জমিদার রেখেছেন কাবু।
তার নামের জোড়ে গগন ফাটে,
আষ্ট (রাষ্ট্র) আছে জগৎময়।"

"বঙ্গদেশে কলি শেষে ঘট্‌লো বিষম দায়।
মনিব লোকের জের হয়েছে বিদ্রূপের জ্বালায়।।
যত প্রজা লোকে জোটে থেকে জমিদারকে বেদখল দ্যায়।
নালিশ করে শান্তিরক্ষা জুলুম নিষেধ প্রজার পক্ষে।
তার রাজা হল নিসান বাবু কাল সাপ জমিদার।
গোপালপুরের জমিদারের লুটলো বাড়ি ঘর।।
সে বিদ্রূপ আলো ঘর জ্বালালো চমৎকার সব জমিদার।
শুনে হয় শঙ্কিত বিদ্রূপের ফটাং কত।
নিশান রায়ের হুকুম মত লোক চলে হাজার হাজার।
জোটায়ে মামলা নিসান বাবু করছেন কাবু মনিব লোক কত।
অস্থির হলো জমিদার আর তালুকদার যত।"

এই সময়ে ২/৪টি গ্রামের রায়তগণ দলবদ্ধ হইয়া অন্যান্য গ্রামের লোকদিগকে জমিদারগণের বিরুদ্ধে আপনাদের দলে যোগদান জন্য আহ্বান করিত। যাহারা তাহাদের সহিত মিশিত না, তাহাদের বাটি বিদ্রোহিগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইত। রাত্রিতে মহিষের শিঙ্গা বাজাইয়া সকলে একত্রিত হইত। মৎস্য শিকার করিবার ভান করিয়া সকলে স্কন্ধে একখানি লাঠির অগ্রভাগে একটি করিয়া পলো লইয়া বহুলোক একত্রে যাতায়াত করিত জন্য বিদ্রোহিদল সাধারণত পলোওয়ালা বা পলোনাথ কোম্পানি নামে অভিহিত হইত। এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়া থাকে—

'লাঠি হাতে পলো কাঁধে চল্লে সারি সারি
সকলের আগে যায়ে' লুটলো বিশির কাচারি।"

জমিদার কর্তৃক প্রজার প্রতি অত্যাচার নিবারণই বিদ্রোহিগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু এই উপলক্ষে অনেক দুষ্টু লোক আপনাপন শত্রু পক্ষকে আক্রমণের সুযোগ পাইয়াছিল। এই প্রকারে অনেক ধনী ও নিরীহ ব্যক্তির গৃহাদিও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। অনেকে মান সম্ভ্রম রক্ষার্থ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া গ্রামান্তরে আশ্রয় লইয়াছিল। বিদ্রোহিদল প্রকাশ্য দিবালোকেও দলবদ্ধ হইয়া জমিদার বা ধনী গৃহ আক্রমণ করিত। প্রথমে তাহারা বাটিতে গিয়া গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিত, তিনি তাহাদের দলে আছেন কিনা। যদি তিনি তাহাতে সম্মত হইতেন এবং তাহাদের পক্ষাবলম্বনপূর্বক সহায়তায় অগ্রসর হইতেন, তবে তাহারা নীরবে চলিয়া যাইত ; নচেৎ তাহার বাটি লুণ্ঠিত হইত। কেহ কেহ দলপতিকে ১০।১৫ টাকা নজর সালামি দিয়াও অব্যাহতি লাভ করিত।

প্রথমত শাহজাদপুর থানার অধীনস্থ গ্রামসমূহেই বিদ্রোহের সূচনা হয় ; কিন্তু পরে অন্যান্য স্থানে এবং সিরাজগঞ্জ মহকুমা হইতে পাবনা সদরেও বিদ্রোহিদল আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। পাবনা হইতে পার্শ্ববর্তী বগুড়া জেলায়ও ইহা প্রসারিত হইয়া জেলার সর্বত্রই কয়েক মাস পর্যন্ত লোকের আতঙ্ক এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল যে, কোন গ্রামের লোক ঐ পলোওয়ালা আসিতেছে বলিলে সেদিন গ্রামের লোকের আহারাদি বন্ধ হইত। কেহ হাটে বাজারে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিলে বিদ্রোহিদলের কার্য মনে করিয়া সেদিনকার জন্য হাট ভাঙিয়া যাইত। ধনী গৃহস্থের বাটিতে লুটতরাজের ভীতি প্রদর্শক পত্রাদি লিখিয়া তাহাদিগকে সশঙ্কিত করা হইত। অবস্থাপন্ন লোকের প্রত্যেকেই আত্মরক্ষার্থ নিজবাটিতে লাঠিয়াল সরদারাদি নিযুক্ত রাখিতেন।

১২৮১ সালের ২৮ বৈশাখ তারিখযুক্ত চাটমোহর জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত এবং শ্রীউমাচরণ (চৌধুরী) প্রণীত "গীত কৌমুদী" নামক কবিতাবলীর নিম্নলিখিত কবিতাংশে এই সময়ের অবস্থার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়, যথা—

কি বিদ্রোহী পরিত্রাহী বাপরে বাপ্ মলেম্ মলেম্
কি তামাসা সকল চাষা ভেবেছিল রাজা হলেম্।।
হাতে পলো, কাঁধে লাঠি লোটে যত ঘটি বাটি।
মাংনা খাব রাজার মাটি ভয়ে ভীরু অবাক হলেম্।।
দেশের যত বামন ভদ্র তারা কি আর আছে ভদ্র।
বিদ্রোহির দল দেখা মাত্র নজর আর বাজায় সেলাম।।

সিরাজগঞ্জ ও সদরের অনেক গ্রামে এই প্রকারে লুটতরাজ হয়। নাকালিয়া, হাটুরিয়া আদি গ্রামে অনেক অত্যাচার হয়। পরিশেষে গোপালনগর মজুমদার জমিদারগণের বাটি অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইবার সময়ে কয়েকজন সাংঘাতিকরূপে আহত ও ধৃত হওয়ায় সদরে বিদ্রোহিগণের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকে।

গোপালনগরের মজুমদার মহাশয়দিগের বাটি লুঠ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছড়া এখনও শুনিতে পাওয়া যায় যথা—

গোপালনগরের মজুমদাররা তারা কেঁদে ম'ল।
ডেমরা হতে বাজু সরকার বাড়ি লুটে নিল।।
কাশী কাঁদে, মহেশ কাঁদে কাঁদে তাহার খুড়ি।
গোলামের বেটা বিদ্রুক আসে' লুটল সকল বাড়ি।।
বিদ্রুক আসে' লুটে নিল গাছে নাইকো পাতা।
জঙ্গলের মধ্যে লুকায়ে থাকে ফুকচি পারে মাথা।।

গ. বিদ্রোহ দমন ঃ

পাবনা জেলার প্রজাগণ নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি। তাহারা প্রবল জমিদার শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে গভর্নমেন্ট এরূপ ধারণা করিতে পারেন নাই। প্রজা ও জমিদারগণ মধ্যে গোলযোগ আপোষে মীমাংসিত হয় এবং সরকার বাহাদুর তদ্বিষয় যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন প্রথম হইতে এই মতই গভর্নমেন্ট পোষণ করিয়াছিলেন। জেলার তৎকালীন ম্যাঃ মিঃ ভি জি টেলার সাহেব মহোদয় অত্যাচারের কথায় প্রথম প্রথম সহসা বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। যখন ক্রমে চতুর্দিক হইতে বহু লোকের বাড়ি লুণ্ঠিত হইতে লাগিল ও লোকে পুত্রকলত্রাদি লইয়া আত্মসম্মান রক্ষার্থ নিজ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এমন কি স্থানে স্থানে পুলিশের ক্ষমতা অগ্রাহ্য করিয়া সরকারি কর্মচারিগণও অপমানিত হইতে লাগিল, তখন গভর্নমেন্ট হইতে বিদ্রোহ দমনার্থ সবিশেষ চেষ্টার আয়োজন হইল।

অত্যাচার পীড়িত গ্রামের অনেক স্থলে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। যেখানকার প্রজাগণ অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া লুটতরাজে বেশি লিপ্ত ছিল, তথায় স্পেশাল পুলিশ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিল। বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের আদেশে ভিন্ন জেলা হইতে ৪০ জন অতিরিক্ত পুলিশ ও লাটসাহেব বাহাদুরের আদেশে গোয়ালন্দ হইতে সামরিক পুলিশ পাবনায় আনয়ন করা হইয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশে ঈশানচন্দ্র রায় ও অন্যান্য দলপদিগণ ধৃত হইয়া পাবনায় আনীত হইলে বিচারে ঈশানচন্দ্র রায় মহাশয় মুক্তিলাভ করিলেন এবং সর্বসমেত অন্যান্য ধৃত প্রায় ৩০২ জন আসামীর মধ্যে ১৪৭ জনের ১ মাস হইতে দুই বৎসর কাল কারাদণ্ড হইল। গভর্নমেন্ট ১৮৭৩ অব্দের ৪ জুলাই তারিখে জমিদার ও প্রজাবর্গের উপর নিম্নলিখিত ঘোষণা পত্র (Proclamation) প্রচার করিলেন যথা—

Proclamation

Whereas in the District of Pabna, owing to attempts of the Zaminders to enhance rents and to the combinations of Rayots to resist the same, large bodies of men have assembled at several places in a riotous and tumultous manner, and serious breaches of peace have occurred. This is very gravely to warn all concerned, that while on the one hand, the Government will protect the people from all forces of extortion and zaminders must assert any claims they may have by legal means only ; on the other hand, the Government will firmly repress all violent actions on the parts of the rayots and will strictly bring to justice all who offend against the law to whatever class they belong.

The ryots and others who have assembled are hereby required to disperse and to prefer peaceably and quickly any grievances they may have. If they do come forward they will be patiently listened to, but the officers of Government cannot listen to rioters ; on the contrary, they will take serious measures against them. It is asserted by the people who have combined to resist the demands of the zaminders, that they are to be the ryots of her majesty the Queen and of her only. These people and all who listen to them, are warned that the Government cannot and will not interfere with the right of property as secured by law, that they must pay what is legally due. It is

perfectly lawful to unite in a peaceful manner to assist any excessive demands of the zaminders but it is not lawful to unite to use violence and intimidation.

ভাবার্থ—পাবনা জেলার জমিদারেরা জমাবৃদ্ধি করিবার ও প্রজারা তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করাতে দাঙ্গাফসাদ উপস্থিত হইয়াছে। উভয় পক্ষকেই বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে কাহারও বেআইনি কার্য ক্ষমা করা হইবেক না। প্রজারা জমায়েত না হইয়া শান্তভাবে তাহাদের নালিস জানাইলে গভর্নমেন্ট তাহা শুনিয়া সুবিচার করিবেন ; বিদ্রোহীর গণ্ডগোলে কর্ণপাত করিবেন না বরং বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। প্রজারা মহারাণীর প্রজা হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে। তাহা হইতে পারে না ; সরকার বাহাদুর কাহাকেও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। জমিদারের ন্যায্য পাওনা পাওয়া উচিত, কিন্তু অপর পক্ষে অন্যায় অত্যধিক আদায়ে বাধা দিবার জন্য প্রজার সমবেত শক্তি প্রয়োগও ন্যায়সঙ্গত ; এই বাধা অবশ্য আইনসঙ্গত উপায়ে শান্তি ভঙ্গ না করিয়া দেওয়া কর্তব্য।

এইরূপে ক্রমশ লুটপাট বন্ধ হইল। গভর্নমেন্ট হইতে ঘোষণাপত্র প্রচার কালে সাধারণ লোকে প্রকাশ করিত যে "সরকার হইতে পাট্টা দেওয়া হইতেছে ; জমিদারগণের শাসন দেশ হইতে উঠিয়া গেল"; যাহা হউক বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রথম হইতে উভয় পক্ষের বিবাদ আপোষে মীমাংসার সানুকূলে ছিলেন এবং কতক আপোষে ও কতক ১৮৭৩।৪ খ্রিস্টাব্দের ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রযুক্ত পাবনা জেলার এই প্রজাবিদ্রোহের ক্রমশ শান্তি হইলেও প্রজাগণ সহজে জমিদারগণের খাজনা প্রদানে সম্মত হইল না। ৩।৪ বৎসর পর্যন্ত জমিদারগণ কর আদায়ে অসমর্থ হইলেন ; বহুবাকি খাজনার মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে প্রজাগণ ক্রমে শান্তভাব ধারণ করিল। এই বিদ্রোহকালের অবস্থা সিরাজগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা ম্যাঃ মিঃ পি নোলন সাহেব মহোদয়ের রিপোর্টে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছিল, পাঠকগণের অবগতি নিমিত্ত তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে বিদ্রোহের কারণ, তাহার বিস্তার, দমন ও তৎসাময়িক লোকের মনোভাব সমস্তই অনেকাংশে জানিতে পারা যাইবে।

The Report of Mr. P. Nolan.

S. D. O. SIRAJGUNJ.

23.4.1874

Agrarian disturbances :—This difficulty arose in the pergana of Eushopshahi. this large and oppulent tract formerly belonged to the Rajas of Natore and passed from their hands under the operation of our Sale Laws into the possession of five great families and some minor landlords. Most of the new proprietors were men who had acquired business habits either in the service of Govt. or of the Rajas and to this day the zaminders of Eushopshahi were more active and energetic than those of any other parts of the district. Unfortunately their good qualities were directed not to improving their Estates by rendering the soil more fertile but to raising the rent and latterly in some instances to the destruction of the right of the cultivatiors. The means adopted for increasing the rent were unfair and illegal. The old standard of measurment was the cubit of Mokhdum Shaheb, a Md. Saint and martyr beheaded at Shahazadpure. According to the record on his tomb the specimen filled under the good old rules in the collectors office was $23^3/_4$ inches long. The new zaminders took what land they could from Govt. by this pole but,

when they could, measured the riot's land by various standards all less than that authorised. In some villages, the old cubit has obsolete and the rents have been nearly doubled by the change. In others, the zaminders are now pressing for measurement by these new poles in order to secure a similar advantage. It must be understood that the ryots never consented to this alteration in the pole and regarded it as an act of fraud. In case of ryots possessing rights of occupancy, this is the proper light in which to regard the action of the zaminders. Another secret of underhand method of enhancement was the incorporation of cesses with rent without consents of the ryots. The unfairness of such a procedure consists in its being concealed from the ryots with a view to deceive courts in cases of litigation into believing that ryots paid as rents such sum really given only as cesses. In some instances, civil courts have found that the accounts were falsified in order to make it clear that higher rates were paid than those actually given. In other cases, ryots who could not be made to give in to enhancement were beaten or imprisoned or their houses plundered. False criminal charges were also constantly used as a means of enhancing rents. By these and other means the collection of Enshopsahi had been raised to about four times the amount entered in the Kanongo paper, about double the rate prevalent for similar lands in the adjoining perganas. There was a feeling among the zaminders that their gain did not rest on a firm basis. The enhancement had not been made in the legal way after giving formal notice through the collector, the ryots had given no written consent to them or accepted any leases at the new rates and a large proportion of sums realised still took the form of undoubted cesses which the ryots might at any moment repudiate even claiming refund of all payment formerly made. Moreover, some villagers had from time stood out and although these had generally been crushed by litigation and violence, still a few of them had successfully maintained their position and set, to all country around an example of showing that with union and discretion, illegal demand might be combated. Thus the village of Sthalchar resisted the collection of income-tax and seized the swordsmen of the party which came to collect it by force, got the amla imprisoned and in answer to Civil suit got a decree for Mukhdum Shaheb's Cubit and old rates. Again Zugtola has for years deposited its rents at the old rates in courts without being sued at law and its inhabitants having managed to beat zaminder's men and to get redress for the plunder of their headman's house have been let alone since 1871. Such being the state of parganah, the approach of the resistration system introduced by the Road Cess Act was naturally viewed by the zaminders with alarm and the Banerjees of Dacca, the largest land owners, made a great effort to put things in order. They demanded from their ryots Kabuliats or written agreements which would have deprived the latter of all rights and degraded them from

their previleged position to the miserable state of tenants at will. These Kabuliats were to the effects that the ryots agreed to the measurements of their lands at the rate calculated so as to include all cesses and some thing more and to accept the eighteen inches cubit as a standard ; and pay any taxes which might in future be imposed on them by landlord and to be liable to ejection if they quarrelled with him. Some of them on hearing of this demand commenced to deposit their rents in Courts. Others with extra-ordinary submission registered the deeds. The majority gave fair words to both sides and waited to see what would happen. In the Lower Courts zamindars obtained decrees against the ryots who had deposited at the rates which they alleged were prevalent. The judge, on appeal found that account produced to support the claim had been falsified and gave a decree only for the sum deposited by the ryots. On losing the case, zaminder's agent had the audacity to kidnap one of the witnesses of the ryots on his way back from courts and it was not until 20 days had elapsed that I was able, by personal enquiries, to ascertain the place of his confinement. The punishment of the parties to whom this outrage was directly brought home the taking of security from the principal agent of the Banerjee's as well as from those zaminders themselves against the recurrence of such a breach of peace, helped to give the ryots courage. Nearly all the tenants of Banarjees united to resist violence and to defend suits as to rent rate in Court depositing their rent until such cases were brought. Another success gained by the ryots when on being required to measure an estate Eushopshahi under Act VIII of 1869 by the Perganah pole, I found that the pole was based on Mukhdum Shahib's cubit further encouraged the ryots. It commenced in May and June to spread rapidly, taking the form of general opposition to enhanced rate and partly to illegal cesses, even in places where the state of things was not similar to that existing in Banarjee's Estate. The excitement caused by the union of hundreds of villages in a league became intense. The representation were sent to different parts of the subdivision uniting new villages to join, houses blows, secret meeting were held. As soon as the movement took form, steps were taken to stop its manefestation by forbidding and preventing all outward signs of union. But the spirit of turbulence continued to increase and individual or parties who had quarrel to prosecute considered it a favourable opportunity for attacking their opponents. During 3 days there was a panic in the Southern parts of the subdivision for several trespasses in the houses of baliffs who had left their houses through fear. One serious outrage occurred, inhabitants of village falling on and plundering a neighbouring hamlet with which they had a feud, after the inmates of the threatened houses had retired. The Government of Bengal issued a proclamation promising that fair hearing would be given to reasonable camplaint and acknowledging that the ryots had

a right to combine in order to defend their common interest but warning them to desist from all show of force ... The ryots themselves made exertions to suppress disturbances likely to injure their cause, and in a few days order was everywhere established ... It was the Famine which reduced those of the ryots who abandoned the union. They were simply impressed with the idea that a combination can resist a zaminder only, when it has a full purse and when they could collect no money they at once tried to negotiate... The ryots were in a state of excitement during the month of June which would have, I believe, produced an agrarian rising, if it existed among a more warlike population."

"State of public feeling—The higher classes regarded all the faults of the zaminders with levity, if not met with sympathy and generally wished to see the position of the ryots destroyed and country given over to the exclusive possession of the landlords and their tenants at will. Every Act of Govt. whether it was directly from headquarters or from any subordinate officers, was at once condemned as showing an undue partiality for the ryots. These were looked upon as insolent rebels who should be punished for resisting the pleasure of their betters ... As may be supposed feeling of the ryots themselves and of the lower orders generally were very different. They regarded the enhancement of rent as simple oppression and believed it to have been accompanied by very circumstance of fraud and violence. The resistence of the ryots appeared to them laudable though certainly dangerous. They had some hopes that Govt. would interfere for their protection and they regarded its atitude with approval. The ryots, they proposed, to disbelieve it altogether, stating that they had been got by the zaminder as an excuse for the parties to send the leading unionist to jail. This class feeling was so universal that the opinion of any native of the agrarian question may be told to a certainity by looking at his dress. If he wore a light chandar on his shoulder, used shoes on his feet and carried an umbrella, one could make sure that he was a zamindar's man ; If merely clad in the dhoti, and gamcha he was at heart an unionist ...

উপরোক্ত রিপোর্ট পাবনা বগুড়া সেটেলমেন্ট অফিসারগণের সৌজন্যে তাঁহাদের সংগৃহীত বিবরণী হইতে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—জমিদারগণের বিবরণ

সাধারণ বিবরণ ঃ

পাবনা জেলার ভূস্বামিগণ মধ্যে অধিকাংশই আধুনিক, অতি প্রাচীন ভূম্যধিকারী এই জেলায় প্রায় দেখা যায় না। অতি প্রাচীন জমিদার বংশ বা রাজা মহারাজা এই জেলার অধিবাসী বলিয়া কেহ পরিচিত নহেন। জমিদারগণ মধ্যে তাড়াসের বড় তরফ অধুনা সর্বপ্রধান এবং বাগ কাশী নাথপুরাদি গ্রাম প্রমুখ বিভিন্ন পল্লী নিবাসী কালিয়াই বংশীয় ভূস্বামিগণ প্রাচীন জমিদার বংশীয় বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন। মুসলমান রাজত্বকালে পাঠান আমলে জমিদারি প্রথার পরিবর্তে এদেশে ভৌমিকী প্রথার প্রচলন ছিল। জানা যায়—"ঔরংজীব (আরঙ্গজেব) বাদশাহের সময় হইতে ভূম্যধিকারিদের 'জমিদার' উপাধি হইয়াছে। তৎপূর্বে জমিদারদিগের "ভূঁইয়া" বা "ভূমিয়া" উপাধি ছিল। আর 'পরগণা' শব্দের পরিবর্তে 'চাকলা' শব্দ প্রচলিত ছিল। 'পরগণা' ও 'জমিনদার' শব্দ আরবী ভাষামূলক। আর 'ভূমিয়া ভূঁইয়া ও চাকলা' শব্দ সংস্কৃতমূলক—ভূমি এবং চক্র শব্দ হইতে উৎপন্ন। ভূঁইয়া বা জমিদারগণের অধিকার বৃহৎ হইলে যথাক্রমে চৌধুরী, রায়, রায় চৌধুরী এবং রাজা উপাধি হইত।" *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—দুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত—৬৬/৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।*

সান্যাল ও ভাদুড়ী উপাধিক দুইজন ব্রাহ্মণ জায়গিরদার হইতে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বরেন্দ্র ভূমিতে যথাক্রমে সাঁতৈর বা সাঁতৈল এবং ভাতুরিয়া বা ভাদুড়ী নামক দুইটি রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। সোনাবাজু, বড়বাজু, বাজুচপ্প আদি যে সমস্ত পরগণাদি লইয়া বর্তমান পাবনা জেলার অধিকাংশ ভূভাগ গঠিত হইয়াছে. তৎসমুদয়ই উপরোক্ত সাঁতৈল এবং ভাতুরিয়া রাজবংশদ্বয়ের অধিকার বা এলাকাভুক্ত ছিল। এই জেলায় এখনও ভাতুরিয়া নামে একটি পরগণার নিদর্শন স্থানে স্থানে বর্তমান আছে। সাঁতৈল রাজবংশীয় রাণী সর্বাণী দেবী প্রদত্ত অনেক ব্রহ্মত্র দেবত্রাদি দানপত্রের নিদর্শন অদ্যাপি এই জেলায় অনেকের গৃহে বর্তমান রহিয়াছে।

এই জেলার কতকাংশ পূর্বে ভূষণা পরগণার জমিদার রাজা সীতারাম রায়ের জমিদারিভুক্ত ছিল বলিয়া জানা যায়। পাবনা থানার অধীন দোগাছি এবং সাঁড়ার অধীন পাক্‌সিয়া ও পাতলেখালি গ্রাম এখনও উক্ত সীতারাম রায়ের প্রদত্ত ব্রহ্মত্রাদির দানপত্রসমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন যশোহর রাজ্যের স্বত্বাধিকারী এবং সাঁতৈর রাজের কর্মচারী চন্দনার গুহ বংশীয় রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায় প্রভৃতিও পাবনা জেলার কোন কোন অংশের মালিক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সিরাজগঞ্জের উত্তরাংশে এবং চৌহালি আউট পোস্টের অধীনস্থ স্থলবসন্তপুরের নিকটবর্তী ঘাটবাড়ি বাওইখোলা অঞ্চলে এখনও রাজা বসন্ত রায়ের পুষ্করিণী, জাঙ্গাল ও বাসভবনাদি বর্তমান থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তপুর নামক পল্লীও সম্ভবত উক্ত হিন্দু রাজা বা জমিদারের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। মানসিংহের বঙ্গে আগমন সময়ে যখন তিনি বঙ্গীয় বিদ্রোহী জমিদারগণকে দমন করিয়া বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে মোঘল রাজ্যভুক্ত করেন, তখন বসন্ত রায় প্রভৃতি সুন্দরবনে লুক্কায়িত থাকিয়া আত্মরক্ষা করেন। তৎকালে একমাত্র সাঁতৈলরাজই পাবনা জেলা অংশের সর্বপ্রধান ভৌমিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁর নবাবী আমলে "বাং ১১১৭ সালে (১৭১০ খ্রিঃ) আধুনিক রাজশাহী জেলার অন্যতম প্রধান ও প্রাচীন পরগণা ভাতুরিয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার রামকৃষ্ণের বিধবাপত্নী সর্বাণী দেবীর মৃত্যু হইলে একমাত্র উত্তরাধিকারী রামকৃষ্ণের ভ্রাতষ্পুত্র বলরাম কার্যে অসমর্থ বলিয়া এই বিস্তীর্ণ জমিদারির কার্যভার একমাত্র সমর্থ রঘুনন্দনের হস্তে পড়িল। ভ্রাতা

রামজীবন ও তৎপুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদের নামে বন্দোবস্ত হইল। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে (১১২৩ হিঃ) প্রদত্ত বাদশা শাহ আলম বাহাদুর সাহর দস্তখত ও মোহরযুক্ত এক সনন্দ অদ্যাপি নাটোর রাজবাটিতে দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এই যে, সাঁজোয়াল মহম্মদের (নাজির আহম্মদের) অত্যাচারে সর্বাণী আত্মহত্যা করেন।" *কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস" ৭৩/৭৪ পৃষ্ঠা এবং পাবনা জেলার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।*

অনুমান ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে রঘুনন্দন সীতারাম রায়ের অধিকৃত জমিদারিও বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। "অত্যল্পকাল মধ্যেই সমগ্র বাঙ্গালার প্রায় পঞ্চমাংশ রঘুনন্দনের উদ্যোগে রাজশাহী জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হইল। ...একালে রাজশাহী জমিদারি আয়তনে বঙ্গের সর্বপ্রধান জমিদারি ছিল ; ইহার তদানীন্তন পরিমাণ ফল ১২ হাজার বর্গমাইলেরও অধিক ছিল। বর্তমান মুর্শিদাবাদের উত্তর পশ্চিমাংশ রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও ফরিদপুরের প্রায় সমগ্র ভাগ, রঙ্‌পুর ও যশোহরের প্রায় অর্ধাংশ লইয়া এই সুবিস্তীর্ণ জমিদারি গঠিত হইল।"

উপরোক্ত বিবরণানুসারে জানা যাইতেছে যে, খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাকালে পাবনা জেলা নাটোররাজ রাজা রামজীবনের জমিদারি ভুক্ত ছিল। তদবধি পাবনা জেলা পূর্বতন ভৌমিক সাঁতৈলরাজ ও অন্যান্য মালিকগণের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া একমাত্র নাটোর রাজবংশের জমিদারি ভুক্ত হয়। তখন হইতে বঙ্গে দশশালা বন্দোবস্তের সময় পর্যন্ত পাবনার অধিকাংশ ভূসম্পত্তি নাটোর রাজের হস্তে থাকে ; পরে ক্রমশ ইহা ভিন্ন ভিন্ন মালিকগণের করতলগত হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে তাড়াসের রায় উপাধিক কায়স্থ, স্থলের পাকড়াশি, সলপের সান্যাল, শীতালাইয়ের মৈত্র উপাধিক ব্রাহ্মণ জমিদার বংশীয় অনেকেই নাটোররাজ স্টেটের সহিত পূর্বাপর অল্পবিস্তর সংশ্লিষ্ট। তাঁতিবন্দের চৌধুরী ও দুলাই-এর চৌধুরী উভয় জমিদারদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতাগণই নাটোরে চাকরি করিয়া জমিদারি অর্জন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ঠাকুর জমিদার ও অন্যান্য জেলাবাসী ভূস্বামিগণও নাটোর রাজসম্পত্তি ক্রমে খরিদ করিয়া এই জেলার জমিদার মধ্য গণ্য হইয়াছেন। নাটোর রাজসরকার হইতে এই জেলার বর্তমান ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদারগণেব অনেকেরই উৎপত্তি, উক্ত রাজানুকম্পায় এই জেলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির বিদ্যানুশীলনে সাহায্যার্থে ব্রহ্মত্রাদি প্রাপ্তি এবং এই জেলার স্থানে স্থানে উক্ত স্টেট হইতে রাস্তাদি নির্মাণ ও জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা বা তৎনির্মাণে সহায়তা সমস্তই এই জেলার অধিবাসিগণকে উক্ত রাজবংশের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। তজ্জন্য ভূস্বামী সম্পর্ক হিসাবে বিবেচনা করিলে পাবনা জেলার আধুনিক কালের ইতিহাস উক্ত রাজবংশের ইতিবৃত্তের সহিত বিজড়িত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

হিন্দুরাজত্বকালে প্রজাগণই ভূমির একমাত্র মালিক বলিয়া গণ্য হইত। তাহারা রাজাকে বার্ষিক উৎপন্ন শস্যের কিঞ্চিৎ ভাগ প্রদান করিত। মুসলমান অধিকারকালে মোঘল আমলে বঙ্গে জমিদারি প্রথার প্রবর্তনের ফলে ভূস্বামিগণ কতকাংশে স্বীয় এলাকা মধ্যে স্বাধীন ক্ষমতা পরিচালন করিতে থাকিলেও তাঁহারা প্রজার নিকট "খেরাজ" নামে কিঞ্চিৎ রাজকর লইয়া প্রজাকেই ভূমির মালিকী স্বত্ব প্রদান করিতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে জমি জরিপ করিয়া কাননগু পাটওয়ারি আদি নিযুক্ত করতঃ সমস্ত প্রজার নিকট হইতে খেরাজ আদায় অসম্ভব ও কষ্টকর বিধায় রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী তৃতীয় ব্যক্তির সহিত যে সমস্ত বন্দোবস্ত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইতেই জমিদারি প্রথা ক্রমে বঙ্গদেশে বিস্তৃত হয়। তাহাই বঙ্গে জমিদারি প্রথার সূত্রপাত করিয়াছে এবং উক্ত ভূস্বামিত্ব প্রথাই কালক্রমে ইংরেজ আমলে নানারূপ বন্দোবস্তের পরে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হওয়ার ফলে জমিদারগণকেই এক্ষণে গবর্নমেন্ট প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির একমাত্র স্বত্বাধিকার প্রদান করিয়াছেন।

এবম্বিধ প্রথা আধুনিক কালে প্রবর্তিত হইলেও, নাটোর রাজসরকারের সর্বপ্রথম সৃষ্টি কাল হইতে রাজা রামজীবন, তদীয় দত্তক পুত্র রাজা রামকান্ত ও পুত্রবধু প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী এবং তৎপুত্র রাজা রামকৃষ্ণের সুশাসন গুণে এই জেলার প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া বর্তমান জমিদারি প্রথায় কিঞ্চিৎ অসুবিধা থাকিলেও, তাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তমূলক জমিদারগণের অধীনেও প্রকৃত রামরাজত্ব কালের ন্যায় সুখে বাস করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মনে করিত। যখনই নাটোর রাজের হস্তচ্যুত হইয়া এই জেলার ভূসম্পত্তি ক্রমশ অন্যের করতলগত হইয়াছে এবং নূতন মালেকগণ নানারূপে নূতন প্রথায় শাসন প্রণালী পরিবর্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তখনই প্রজাগণ তাহাতে কষ্টানুভব করিয়া বাধা প্রদান করিয়াছে ও এই জেলার প্রজা বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার ফলেই গবর্নমেন্টে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনাদির সময় সময় নানারূপ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং এখনও এই জেলার বর্গাদার প্রথার পরিবর্তন আদি জন্য নানারূপ আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে।

এই জেলার ভূস্বামিগণ মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ; মুসলমান জমিদারের সংখ্যা অতি অল্প। বঙ্গে মুসলমানগণের জমিদারি প্রাপ্তির অভাবের যে সকল কারণ উল্লেখিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে প্রথম কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালীয় বাজেয়াপ্ত (Resumption) প্রথা বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করেন এবং দ্বিতীয় কারণ মুসলমানগণের হিসাব নিকাশাদি বিষয়ের অজ্ঞতা বা অক্ষমতা। এই দ্বিতীয় কারণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে—পাঠান রাজত্ব দূঢ়ীভূত হইলে, নবাবেরা হিন্দু জমিদারদিগকে বিচ্যুত করিয়া পাঠান সর্দারগণকে জমিদারি দিতে পারিতেন। কিন্তু নবাবেরা তদ্রূপ চেষ্টা বা ইচ্ছা করেন নাই। তাহার অনেকগুলি কারণ ছিল। বাংলাদেশ এক্ষণে যেরূপ অরক্ষণীয় সমতলক্ষেত্র পূর্বে এরূপ ছিল না, নদী হ্রদ ও জঙ্গল দ্বারা বাংলা দেশ অতি দুর্ভেদ্য স্থান ছিল। ঈদৃশ দুর্গম দেশের অভ্যন্তরে স্বল্প সংখ্যক পাঠান ছড়াইয়া পড়িলে হিন্দুগণ কর্তৃক বিনষ্ট হইবার ভয় ছিল। যদি পাঠান সর্দারের সঙ্গে উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত থাকিত ; তবে তাহাদের ব্যয়েই সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষ হইত ; নবাবের ভাণ্ডারে কিছুই প্রেরিত হইত না। অধিকন্তু পাঠান সর্দারের অনেকেই লেখাপড়া জানিত না। আদায় তহশীল কার্য কিছুমাত্র বুঝিত না, অথচ অতিশয় উগ্র প্রকৃতি এবং বহুব্যয়ী ছিল। তাহারা যুদ্ধস্থলে যেমন বীর ছিল, তেমনিই আবার শান্তি সময়ে নিতান্ত অলস ও বিলাসী ছিল। তাহাদিগকে জমিদারি দিলে তাহারা উপযুক্ত পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে পারিতে না এবং যাহা আদায় করিত তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলিত। সুতরাং নবাবের নিকট মালগুজারি দিতে পারিত না। সেই বাকির জন্য পীড়াপীড়ি করিলে অমনি পাঠান সর্দার বিদ্রোহী হইত। এই সমস্ত কারণে নবাবেরা পাঠানদিগকে দেশের অভ্যন্তরে জমিদারি দিতেন না।" *দুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" ৫১ পৃঃ*

মুসলমানগণ জমিদার হইলেও তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারী প্রথার ফলে সম্পত্তি ২/১ পুরুষ মধ্য শতধা বিভক্ত হইয়া বিলুপ্ত হইবার নিমিত্ত অনেক জমিদারি তাহাদের হস্তগত হইলেও সহসা বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রমাণ স্বরূপ বেলকুচির চৌধুরী জমিদারবংশ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সময়ে এই জেলার দুলাই নিবাসী স্বর্গীয় আজিমদ্দিন চৌধুরী সাহেবের বংশধরগণ এবং সিরাজগঞ্জের অধীনস্থ কয়েকজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারগণ এই জেলার মুসলমান জমিদার বা ভূস্বামী বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত শাহজাদপুর, মাসুন্দিয়া, আমিনপুরাদি গ্রামে অনেক খাঁ, মিঞা, মিরজা আদি উপাধিক সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন নিঃস্ব মুসলমান ভূস্বামি পরিবারের বাস। (ক) জেলাবাসী ও (খ) ভিন্ন জেলাবাসী হিসাবে জমিদারগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। নিম্নে কয়েকটি জমিদার বংশের স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ক. জেলাবাসী—জমিদারগণ ঃ

১. তাড়াস জমিদার বংশ ঃ

রায়গঞ্জ থানার অধীন তাড়াস গ্রামের দেব বংশীয় কায়স্থ জমিদারগণ এই জেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। বর্তমান সময়ে এই বংশীয় বড় তরফ পাবনা জেলার মধ্যে সর্বপ্রধান ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিচিত। তাড়াসের পূর্বোত্তরে প্রায় দশ মাইল দূরে চড়িয়া নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লী ইহাদের পূর্ব নিবাস ছিল। ইহাদের পূর্বপুরুষ বাসুদেব তালুকদার অতি পূর্বে চান্দাইকোণার নিকটবর্তী কোদলা নামক পল্লী নিবাসী চৌধুরী উপাধিক বঙ্গজ কায়স্থগণের গৃহে মুৎসদ্দি ওয়াদায় কার্য করিতেন বলিয়া প্রকাশ। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ঢাকুর নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

"আর এক কহি শুন দেব অনুপম।
চড়িয়া গ্রামেতে বাস শুকদেব নাম।।
শুকদেব পুত্র বাসুদেব তালুকদার।
তাহার যশের কথা শুনহ বিস্তার।।
ধনবান কীর্তিবন্ত বিষয় ব্যাপারে।
তাহার পুত্র চাকরি কৈলা নবাব সরকারে।।
সেই বংশে উদ্ভবিলা বলরাম রায়।
পিতামহ কার্য কৈলা বারেন্দ্র আশ্রয়।।
নিরাবিল কার্য সব করিতে লাগিল।
দাস নন্দী চাকী সবে অন্নভুক্ত হৈল।।
তাহার সন্তান সব বাড়িল সম্ভ্রমে।
বায়ান্ন লক্ষের কর্তা পুরুষানুক্রমে।
তাড়াস-বাসী দেব করণে প্রধান।
সর্ব ঘর ব্যাপিত হইয়া পাইল সম্মান।"

"মুলঢাকুর ও সমালোচনা" কৃষ্ণচরণ মজুমদার প্রণীত ৫৯/৬০ দ্রষ্টব্য।

নাটোর রাজবংশ বায়ান্ন লক্ষ তেপ্পান্ন হাজারের জমিদার বলিয়া পূর্বে পরিচিত হইতেন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাড়াস জমিদারগণের পূর্বপুরুষ রামরাম রায় মহাশয় রাজা রামজীবনের সময় হইতে উক্ত রাজবংশের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় তজ্জন্যই "বায়ান্ন লক্ষের কর্তা" বলিয়া ঢাকুরে উল্লেখিত হইয়াছে। "পুরুষানুক্রমে" এই বংশীয়গণ নাটোর রাজ স্টেটের দেওয়ান ছিলেন কি না তাহা জানা যায় না ; তবে পুরুষাণুক্রমে ইহাদের অনেকে নবাব সরকারে চাকুরি করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তজ্জন্য এবম্বিধ উক্তি হইতে পারে।

তাড়াসের কপিলেশ্বর শিবমন্দির গাত্রে খোদিত "শাকে বাজিশরাশুগেন্দুগণিতে শ্রীরাম দেবাৎ পরঃ শ্রীনারায়ণ দেব এব সুকৃতি.....সোপানমেকং ভূবি।" শ্লোক হইতে জানা যায়, শ্রীরাম দেবের পর নারায়ণ দেব ১৫৫৭ শকাব্দে (১৬৩৫ খ্রিঃ) মাতার স্বর্গসুখ গমন সুখ কামনায় উক্ত মন্দির শম্ভুকে দান করিয়াছিলেন। এই **নারায়ণ দেব** ও পূর্বের ঢাকুর বর্ণিত **শুকদেব তালুকদার** একই ব্যক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। প্রবাদ বঙ্গের রাজধানী রাজমহাল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হইবার সময় খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে নারায়ণ দেব একদা ঢাকা গমন সময়ে চলনবিল মধ্যে অনাবৃত স্থানে একটি বাণলিঙ্গের উপর একটি কামধেনুকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দুগ্ধ বর্ষণ করিতে দেখিতে পান। জনমানবশূন্য স্থানে এবম্বিধ ঘটনা আশ্চর্যজনক বোধে ঢাকা হইতে সফলকাম সহকারে বাটি প্রত্যাবর্তন করত উক্ত

বাণলিঙ্গকে উত্তোলণপূর্বক স্বীয় বাস বাটিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হন। কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া তদুপরি বিচিত্র কারুকার্য খচিত এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন।

ঢাকুরানুসারে শুকদেব তালুকদার বাসুদেবের পিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই জমিদারগণের গৃহে রক্ষিত কুর্শীনামায় রঘুনাথ তালুকদার বাসুদেবের পিতা বলিয়া লিখিত আছে। যাহা হউক, বাসুদেব নবাব সরকারে চাকরি করিয়া সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন এবং তৎকর্তৃক তাড়াসের ভদ্রাসন বাটি নির্মিত হয়। বাসুদেবের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া নবাব তাঁহাকে রায় চৌধুরী উপাধি প্রদান করেন এবং তিনি চৌধুরাই তাড়াস নামক সম্পত্তি অর্জন করেন। পরগণে কাটারমহল তৎকালে সাঁতেল-রাজের জমিদারিভুক্ত ছিল। তদন্তর্গত দুই শতাধিক মৌজা লইয়া এই চৌধুরাই তাড়াস নামক সম্পত্তির সৃষ্টি হয় এবং অধিকাংশ মৌজাই তাড়াসের চতুস্পার্শ্ববর্তী ছিল। বাসুদেবের পুত্রদ্বয়, জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী ও রামনাথ রায় চৌধুরী উভয় ভ্রাতাই ঢাকার নবাব সরকারে চাকরি করিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন।

জয়কৃষ্ণ চৌধুরীর সাত পুত্র মধ্যে বলরাম রায় নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময়ে বাংলার সুবেদার আজিম ওস্মানের অধীনে দেওয়ানি কার্যে লিপ্ত ছিলেন। নাটোরের সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দনের অভ্যুদয়কালে মুর্শিদকুলি খাঁ কর্তৃক বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইলে, নবাব সরকারে রঘুনন্দনের একাধিপত্য সময়ে যখন কুলি খাঁর অনুগ্রহপ্রসাদাৎ তিনি সাঁতের রাজ সম্পত্তি হস্তগত করেন, তখন বলরামের কনিষ্ঠ সহোদর রামরায় রায় রাজা রামজীবনের দেওয়ান নিযুক্ত হয়েন। নাটোর রাজস্টেটের সৃষ্টি হইতে তিনি রামজীবনের পরলোকগমনের পরও অত্যল্প কাল পর্যন্ত নাটোরে দেওয়ানি কার্য করিয়াছিলেন। রাজা রামকান্ত যৌবনের প্রারম্ভে প্রবীনদিগের সৎপরামর্শ অবহেলা করায় ও নিজ বার্ধক্যবশতঃ রামরাম রায় কর্মত্যাগ করেন।

তাড়াস জমিদারগণের পূর্বপুরুষদিগের অনেকে নবাব সরকার এবং কেহ কেহ নাটোররাজের অধীনে দেওয়ানি ও মুৎসদ্দি ওয়াদার চাকরিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা হইতেই জমিদারির উৎপত্তি হেতু ইহারা সাধারণত দেওয়ানের বংশ বলিয়া পরিচিত। এখন পর্যন্ত কোন কোন তরফ **দেওয়ানের** তরফ, কোন কোন তরফ **মুৎসদ্দির** তরফ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বলরাম রায় ও রামরায় রায় উভয়েই মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতৃবিয়োগকালে, ঢাকার অবস্থান হেতু বলরাম মাতৃচরণ সন্দর্শনে অপারগ হন, তজ্জন্য অতি সমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিয়া তাহাতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখিয়া পাঠান যে, "তুমি সামান্য জমিদারের অধীনে কার্য কর এবং সাংসারিক অবস্থাও স্বচ্ছল নহে, অতএব তুমি একটি সামান্য শ্রাদ্ধের আয়োজন করিবে, আমি যথা সময়ে বাটি পৌঁছিয়া দানসাগরের উদ্যোগ করিব।" তৎকালে বিশ্বস্ত কর্মচারিবৃন্দের প্রতি রাজা জমিদারদিগের আন্তরিক ভালবাসা ছিল। রাজা রামজীবন তাঁহার দেওয়ান দানসাগর শ্রাদ্ধ সম্পাদনে অসমর্থ জানিয়া ক্ষুব্ধ হন এবং যাহাতে দেওয়ানের মাতৃশ্রাদ্ধ সমারোহে সুসম্পন্ন হয়, তাহার বিহিত ব্যবস্থাপূর্বক স্বকীয় রাজস্টেট হইতে লক্ষাধিক টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। বলরাম রায় যথাকালে বাটি পৌঁছিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজনে স্তম্ভিত হন। যথাকালে শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইলে, বলরাম রায় মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তদ্বারা তাড়াসের কপিলেশ্বর শিবমন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করেন, তাহা উক্ত মন্দির গাত্রের খোদিত—কালাগ্নি তর্কেন্দুমিতে শকাব্দে.......শ্লোকদ্বারা সূচিত হইতেছে। তিনি উক্ত অর্থে নিজ বাসভবনে রসিক রায় নামক রাধাকৃষ্ণ মূর্তিবিগ্রহ স্থাপন এবং দোলমঞ্চ নামক উক্ত বিগ্রহের জন্য যে ত্রিতল মন্দির নির্মাণ করেন, তাহাতে নিম্নলিখিত লিপি খোদিত আছে। অর্থাৎ ১৬৪০ শকাব্দে (খ্রিঃ ১৭১৭) এই মন্দির নির্মিত হয়।

শাকেভ্রবেদতর্কেন্দুমিতে
প্রাসাদমুত্তমং শ্রীকৃষ্ণায় দদৌ
শ্রীল্ বলরাম মহাত্মনা।

উক্ত বিগ্রহের জন্য তিনি যে দ্বিতল মন্দির নির্মাণ করেন তাহাতে নিম্নলিখিত লিপি (অর্থাৎ ১৬৪৬ শকাব্দ ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দ) খোদিত আছে।

রসবেদঋতুক্ষৌণীমিতেশাকে মহাত্মনা
শ্রীকৃষ্ণায় দদৌ শ্রীল্ বলরাম গৃহশুভম্।।

আনুমানিক ১১৪১ সালের পূর্বে বলরাম রায়ের পরলোকগমনের পর তদীয় পুত্র ও ভ্রাতস্পুত্রগণ পৃথকান্ন হন। বলরামের ১ম পুত্র রঘুরাম নবাব সুজা খাঁর অধীনে দেওয়ান ও ২য় পুত্র হরিনাথ মুৎসদ্দি ছিলেন।

বলরামের বংশ বড়, রামদেবের বংশ মধ্যম এবং রামরামের বংশ ছোট তরফ নামে অভিহিত হইয়া থাকিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে বাসুদেব তালুকদার তাড়াস জমিদার বংশের আদিপুরুষ। বর্তমান সময়ে তদীয় বংশধরগণ নয় শরিকে বিভক্ত হইয়াছেন। কোন কোন শরিকের অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর হইলে তাঁহাদের দৌহিত্র বংশ সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন এবং তাহা হইতে এই বংশে অধুনা মজুমদার, চৌধুরী, নন্দী প্রভৃতি উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীশ্রী বিনোদরায় নামক বিগ্রহ এই জমিদার বংশের গৃহদেবতা। এই বিগ্রহ পূর্বে এই জেলার পূর্বতন সমৃদ্ধিশালী জনপদ নওঁগা বা নবগ্রাম নিবাসী বাঞ্ছারাম অধিকারী মহাশয়ের কুলদেবতা ছিলেন। অপুত্রক অবস্থায় বাঞ্ছারামের দেহান্তর ঘটিলে ঐ সেবা তাড়াস জমিদারবংশ গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বে নবগ্রামে থাকিয়াই সর্ব শরিকের এজমালিতে পূর্বে সেবা পরিচালিত হইত। কেবলমাত্র বৎসরের মধ্যে একবার সাধারণত বিজয়ার পর হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত তাড়াসে এই বিগ্রহ আনয়ন করিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে ইহার সেবা পূজা নির্বাহ হইত। বাঞ্ছারাম অধিকারী কে ছিলেন, তাহার বিশেষ কোন পরিচয় জানিবার উপায় নাই, কিন্তু সদিয়াচাঁদপুর নিবাসী কয়েক ঘর সাহা উপাধিক ব্যবসায়ী মহাজনের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, তাহারা পূর্বে আটিয়া নামক পরগণায় অধিবাসী ছিলেন, এবং কালক্রমে নবগ্রামে ব্যবসায় উপলক্ষে স্থায়ী হইয়াছিলেন, তাহাদের পূর্বপুরুষ কর্তৃক তথায় এই বিনোদ রায় নামক বিগ্রহ মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল। বাঞ্ছারাম অধিকারী উক্ত মহাজনদিগের গুরু অথবা পুরোহিত বংশীয় ছিলেন কিনা তাহাও বিবেচ্য।

পূর্বে বিনোদরায় বিগ্রহের কোন স্ত্রী মূর্তি ছিল না। বিজয়ার পর উক্ত বিগ্রহ তাড়াসে আসিলে একদা বাসুদেব তালুকদারের পৌত্র রামহরি রায় মহাশয়ের লক্ষ্মী নাম্নী কন্যা বিগ্রহ মন্দিরে সান্ধ্য প্রদীপ প্রদান কালে অন্তর্হিত হয়। রাত্রিতে স্বপ্নাদেশে উক্ত রায় মহাশয় জানিতে পারেন যে, উক্ত বিনোদরায় নামক বিগ্রহজি উক্ত কন্যাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নবগ্রামে করতোয়া নদীতে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা লক্ষ্মী মূর্তি নির্মাণ করিয়া লৌকিক আচারে বিনোদরায়ের সহিত তাহার বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। আদেশানুযায়ী কার্য হইবার পর হইতে উক্ত বিগ্রহসহিত তাড়াস জমিদার বংশের জামাতার ন্যায় ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। তাড়াসে লক্ষ্মীর ভূমিষ্ঠ স্থানের স্মৃতিরক্ষা হেতু যে স্মৃতিমন্দির নির্মিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান আছে।

শ্রীশ্রী বিনোদরায় বিগ্রহজি বহু দিন পর্যন্ত বড় তরফের প্রধান কাছারি বাড়ি ফরিদপুর বনওয়ারীনগর গ্রামে পর্যন্ত অবস্থিত ছিলেন। এক্ষণে বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বনওয়ারীনগরে স্বর্গীয় রায় বনমালী রায়বাহাদুর কর্তৃক ধাতুময়ী নূতন বিনোদরায় নামক অন্য একটি বিগ্রহমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তদুদ্দেশ্যে স্থাবর সম্পত্তি সম্বলিত দেবোত্তর সম্পত্তির

সৃষ্টি হইয়াছে। বৃন্দাবনে আদি প্রস্তরময়ী বিনোদরায় ও বনওয়ারীনগরে . .. বিনোদরায় বিগ্রহের সেবা পূজা পরিচালনের সুবন্দোবস্ত আছে। ভাদ্র মাসে ঝুলনের সময় এই বিনোদরায় বনওয়ারীনগর হইতে তাড়াসে নীত হইয়া থাকেন।

বর্তমান সময়ে সমস্ত শরিকগণের মাত্র তহশীল কাছারি তাড়াসে অবস্থিত; কাহারও ভদ্রাসন বাটি এখানে বর্তমান নাই। বাৎসরিক উৎসবাদি ও বিশেষ কোন ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষে কখনও কখনও কেহ এখানে পদার্পণ করিয়া থাকেন। নন্দীর তরফের শ্রীযুক্তা কৃষ্ণকামিনী চৌধুরাণী কলিকাতা ঘুঘুডাঙায়, মুৎসদ্দি তরফের শ্রীযুক্তা রাধারঙ্গিনী দেব্যা নবদ্বীপে, পূর্ববাটির শ্রীযুক্তা নবীনকিশোরী চৌধুরাণী মৈমনসিংহে এবং বড় তরফের বর্তমান স্বত্বাধিকারী রায় ক্ষিতীশভূষণ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় মহাশয়দ্বয় কলিকাতায় বাস করিয়া থাকেন। বড় তরফের স্বর্গীয় রায় বনমালী রায় বাহাদুর সুদীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে বৃন্দাবনে বাস করিতেন। প্রত্যেক তরফের সদর কাছারিও বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত।

বনওয়ারীলাল রায়—মহাশয় আধুনিক কালে এই বংশে জনৈক প্রতিষ্ঠাবান ও পরোপকারী ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সিরাজগঞ্জ বি এল স্কুল নামক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় তাঁহার নামানুসারে স্থাপিত। তিনি জেলার মধ্যে জনৈক সুদক্ষ ও সাহসী শিকারি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাড়াসের উত্তরাংশে নিমগাছি নামক জঙ্গলাকীর্ণ পল্লী বহুদিন হইতে বহু বন্যমহিষ বরাহ শার্দুলাদির আবাসস্থল বলিয়া পরিচিত ছিল। দিবাভাগে তথায় লোক চলাচলে বিশেষ অসুবিধা হইত। একমাত্র বনওয়ারীবাবুর উদ্যোগে ও শিকার ফলে নিমগাছির জঙ্গল অনেকাংশে নিরাপদ হইয়াছিল এবং এক্ষণে পুনরায় ক্রমশ উক্ত অঞ্চল জঙ্গলাদিতে পরিণত হইতেছে। তিনি সাঁওতাল ও বুনা জাতীয় বহু লোক এতদঞ্চলে আনয়ন করিয়া এ প্রদেশের অনেক জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়াছিলেন। একমাত্র তাঁহার স্বকীয় উদ্যোগে একটি অরণ্যময় প্রদেশ লোকালয়ে পরিণত হইয়াছিল, তিনি স্বীয় নামানুসারে বর্তমান ফরিদপুর পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত ফরিদপুর নামক স্থানে শিকার উপলক্ষে আসিয়া কালে বনওয়ারীনগর নামে একটি স্থায়ী গ্রাম সংস্থাপন করিয়া তথায় এই জেলার অধীনস্থ স্থাবর সম্পত্তি সমূহের জন্য সদর কাছারি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

সৎকীর্তি মধ্যে অতিথিসৎকারাদি সম্বন্ধে প্রত্যেক শরিকগণ মুক্তহস্ত। বার্ষিক ঝুলন যাত্রার উৎসব সময়ে প্রত্যেক শরিকগণই অল্পবিস্তর ব্যয় বাহুল্য করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বড় তরফ ও পূর্ববাটির ঝুলনের উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে; বড় তরফে গোবিন্দজী, বিনোদরায় এবং রসিকরায় নামক বিগ্রহত্রয়ের এবং পূর্ববাটিতে গোপালদেব বিগ্রহের অতি সমারোহে ঝুলনোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে চতুর্দিক জলরাশি বেষ্টিত দ্বীপাকার তাড়াসের ন্যায় ক্ষুদ্রপল্লীতে এই জেলার বিভিন্নপল্লী নিবাসী ও অন্যান্য জেলার বহু প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলীর শুভাগমন হইয়া থাকে। বড় তরফ ও পূর্ববাটি হইতে সমাগত পণ্ডিতগণের বিদায় ও পাথেয়াদি দিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ঝুলনের উপলক্ষে পক্ষাধিক কাল স্থায়ী মেলায় কয়েক দিবসাবধি গীতবাদ্যাদি মহোৎসব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, এবং সমাগত দর্শকগণের আহার্যার্থ সিধাদি প্রদান ও ব্রাহ্মণগণের ভূরিভোজনের সবিশেষ ব্যবস্থা বড় তরফের এই জেলার মধ্যে একটি সর্বপ্রধান কীর্তি। পূর্ববাটিতে বড় তরফের ন্যায় বৃহৎ আয়োজনে অন্যান্য অনুষ্ঠান না হইলেও, এখানে গীত-বাদ্যাদির ও অন্যান্য আমোদপ্রমোদের বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ঝুলনোপলক্ষে বার্ষিক ১৫/১৬ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হইয়া থাকে; মালিকগণ কেহই প্রতিবৎসর স্বয়ং উপস্থিত না থাকায় উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। পাবনা জেলার মধ্যে তাড়াসের ঝুলনোৎসব সাতিশয় প্রসিদ্ধ ও সর্বথা দর্শনযোগ্য। কিন্তু এই উৎসবের আরও সুবন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি কর্মকর্তাগণের বিশেষ দৃষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

বগুড়া জেলার কুসুম্বীর অন্তর্গত থাল্‌তা গ্রামে শ্রীথালতেশ্বরী নামক কালিকাদেবীর সেবা পরিচালন জন্য বড় তরফ হইতে বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে। বিদ্যার্থিগণকে সাহায্য ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য এই বংশ চির প্রসিদ্ধ। রাজশাহী বিভাগ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে ছাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকে শ্রীযুক্তা কৃষ্ণকামিনী চৌধুরাণী মহাশয়ার স্টেট হইতে তাহাকে মাসিক আট টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত একটি মেডেলও উক্ত স্টেট হইতে প্রদত্ত হয়। পাবনা ইলিয়ট বনমালী টেক্‌নিক্যাল স্কুল, সিরাজগঞ্জ বি. এল. স্কুল ও বনওয়ারীনগর করনেশন হাই স্কুল এই বংশীয় বিদ্যোৎসাহিতার পরিচায়ক। .

পাবনা এডোয়ার্ড কলেজে বড় তরফ হইতে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য দান উক্ত কলেজটিকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে। স্বর্গীয় রায় বনমালী রায় বাহাদুরের অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের টিকা সম্বলিত সংস্করণ এবং "কবিকণ্ঠহার" নামক বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রকাশ সমস্তই এই বংশের বড় তরফের বিদ্যানুশীলনে সাহায্যদানের পরিচায়ক। পাবনার টম্‌সন টাউনহল এবং বৃন্দাবনের বিনোদরায়ের কুঞ্জে দৈনিক অতিথিসৎকারাদি ও তাথাকার দাতব্য চিকিৎসালয়াদি সমস্ত এই বংশের বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। বৃন্দাবনে অনেক রাজা মহারাজার কুঞ্জ ও অতিথিশালাদি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাড়াসের স্বর্গীয় রায় বনমালী রায়বাহাদুরের অতিথিসৎকারের পরিচয় তথাকার আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সুপরিচিত।

স্বভাবসিদ্ধ দানশীলতার পরিচয় পাইয়া গবর্নমেন্ট বনমালীবাবুকে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে **রায় বাহাদুর** ও তাঁহার বিষয় লিপ্সাদির অভাব এবং সংসার নিস্পৃহতাহেতু নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে **রাজর্ষি** উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

ক্ষুধার্থকে অন্নদান, গরিব দুঃখী ও অনাথজনকে মাসিক সাহায্য ও দাতব্য চিকিৎসালয়াদিতে ব্যয় জন্য বড় তরফ হইতে বার্ষিক প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হয়। এতদ্ব্যতীত অনেক পণ্ডিত বিদ্যার্থী, স্কুল ও নিরাশ্রয় বিধবা প্রভৃতিকে মাসিক সাহায্য প্রদান কল্পেও বহু অর্থব্যয় হইয়া থাকে। স্বর্গীয় বনমালীবাবুর পুত্রদ্বয়ও পিতার ন্যায় সরলতা, অমায়িকতা, বদান্যতাদি সদ্‌গুণে ভূষিত। সম্প্রতি পাবনা টাউনে পানীয় জলের অভাব মোচনার্থ জলের কল প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব চলিতেছে, উহার সাধারণ সাহায্য ভাণ্ডারের (Public Subscription Fund) সর্বপ্রধান দান বড়তরফের স্বত্বাধিকারিগণ কর্তৃক প্রতিশ্রুত হইয়াছে। পিতার ন্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশভূষণ রায় মহাশয়কেও গবর্নমেন্ট তাঁহার সদগুণাদি নিমিত্ত **রায় বাহাদুর** উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছেন।

অধুনা এই বংশ দানশীলতার জন্য বিশেষ সুপরিচিত। কিন্তু পূর্বে সেরূপ ছিল না, তজ্জন্য এই বংশ সম্বন্ধে লিখিত আছে "রঞ্জিৎ (রায়) একদা তাড়াস গ্রামে ভ্রমণ করিতে গিয়া তত্রত্য জমিদার বংশীয় হরদেহ রায় সম্বন্ধে এই দোহা রচনা করেন—

হর দেবকো দেখে হেঁ তাড়াস কো গাঁওমে।।
তসলা কাটে যেস্কা নাম মে।।
ভুলা ভাট্‌কা অতিথি যায়।
আগলা বাড়ি দে বাতলায়।।
আখের জো ধরনা দে।
কহে তোড়া চাউল লে।।
শোন রঞ্জিত কি বাৎ।
এস্কৌ কৌন কহে কায়েৎ কি জাত।।

হরদেব রায় বোধ হয় কৃপণাশয় ব্যক্তি ছিলেন, তজ্জন্যই তিনি এই তীব্র উক্তি করিয়াছেন।" *মূলঢাকুর ও সমালোচনা—বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের বিবরণ। কৃষ্ণচরণ মজুমদার কর্তৃক সঙ্কলিত। উপক্রমণিকাংশ ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।*

তাড়াস জমিদার বংশাবলীদৃষ্টে হরদেব রায় নামে কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু জয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের পৌত্র হরিদেব রায় নামক জনৈক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। ইনিই রঞ্জিৎ রায় বর্ণিত হরদেব রায় কিনা তাহা সঠিক জানিতে পারা যায় না।

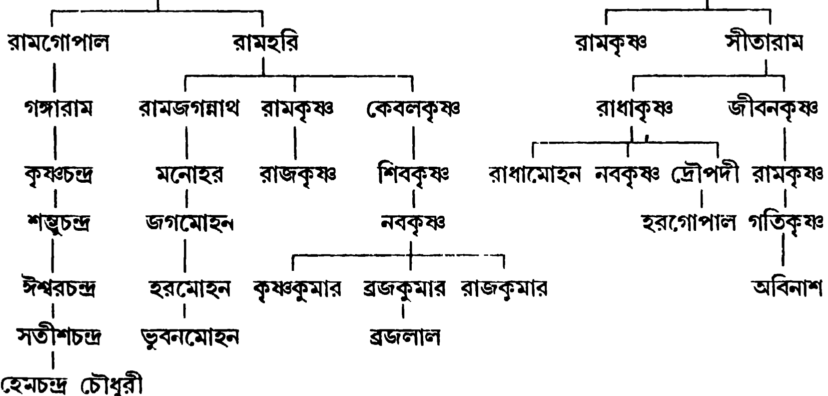
পূর্বোক্ত কপিলেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাদি দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, তাড়াস জমিদারগণ পূর্বে পরম শৈব এবং শিবভক্ত ছিলেন। কালক্রমে তাঁহারা বৈষ্ণব মতাবলম্বী হইয়াছেন। কোন সময়ে তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন তাহা সঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে বল্লভপুরের গোস্বামী পরিবারের ইতিবৃত্তে জানিতে পারা যায় এই বংশীয় জয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী মহাশয় দিগরের সময় হইতে ইহারা বৈষ্ণব মত গ্রহণ করতঃ উক্ত গোস্বামী পরিবারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বড় তরফের পূর্বপুরুষ দেওয়ান রামসুন্দর রায় মহাশয়ের সময় হইতে ইহারা বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া বলিয়া জানিতে পারা যায়।

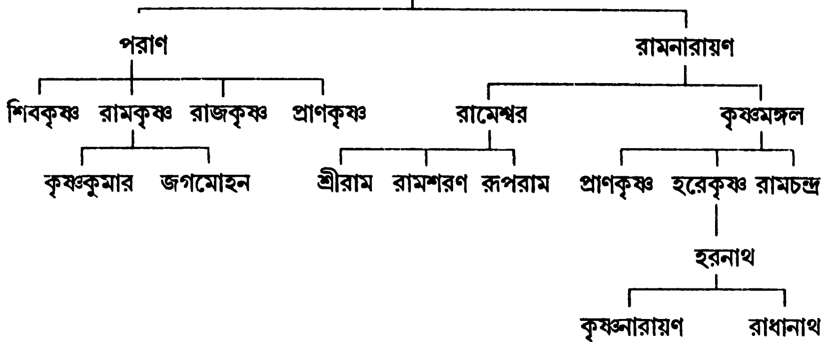
স্বর্গীয় রামসুন্দর মহাশয়ের পর বড়তরফ অপুত্রক হন। তৎপর চারিপুরুষ পর্যন্ত দত্তক গ্রহণ দ্বারা বংশ রক্ষা হইয়াছিল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ২৪ নভেম্বর তারিখে স্বর্গীয় বনমালী রায় মহাশয় তদীয় পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশভূষণ রায় ও শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায়কে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। বড় তরফের ন্যায় অন্যান্য শরিকেরও দত্তক গ্রহণ প্রথা পূর্বাপর প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

তাড়াস জমিদারগণের পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই ইতিপূর্বে নবাব সরকারে অন্যান্য ভূস্বামিগণেরও দেওয়ান ও মুৎসদ্দিগিরি কার্যে লিপ্ত থাকিয়া জমিদার পদবীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে বড় ছোট সমস্ত শরিকগণের কাহারই জমিদারির বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে বলিয়া বোধ হয় না। কোন বিষয়ের দরবারাদির জন্য রায়ত ও নিম্নতম কর্মচারিগণ বহুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও সময়ে কোন বিষয়ের বিশেষ মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারে না। মালিকগণ বিদেশবাসী হেতু অধীনস্থ কমচারিগণও সময় সময় সত্বর কোন বিষয়ের সদুত্তরী দানে সমর্থ হয়েন না। তাড়াসের জমিদার বলিয়া পরিচিত হইলেও অনেকে ক্বচিৎ তথায় পদার্পণ করেন কি না সন্দেহ। তজ্জন্য গ্রামটি প্রাচীন ও জমিদার প্রধান স্থান হইলেও এখানকার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। এমন কি এখানে একটি ভাল স্কুলও বর্তমান নাই। প্রবাদ হাণ্ডিয়াল তাড়াস দিয়া উত্তরাভিমুখে বগুড়া পর্যন্ত যে একটি প্রাচীন শাহী রোডের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাড়াস বংশীয়দিগের পূর্ব পুরুষগণের উদ্যোগে নবাবী আমলে প্রস্তুত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে তদপেক্ষা জমিদারির আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং এই বংশীয় বড়তরফের শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় মহাশয় কয়েক বৎসর পাবনা ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের সভাপতি পদে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও সিরাজগঞ্জ ও পাবনা উভয় স্থান হইতে তাড়াস যাতায়াতের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটির কোনই উন্নতি হয় নাই। এখানে যাতায়াতে লোকের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অনেক দূরবর্তী স্থান হইতে পত্রাদি একদিনে পাওয়া গেলেও পাবনা হইতে প্রায় ৩০/৩২ মাইল দূরবর্তী তাড়াসের চিঠিপত্রাদি পাবনায় পৌছিতে প্রায় তিন দিন লাগে। অচিরে এই সমস্ত অসুবিধা বিদূরিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

তাড়াস জমিদার বংশ

- কৃষ্ণদেব তালুকদার
  - জয়দেব তালুকদার
    - রামদেব তালুকদার
      - রঘুনাথ তালুকদার
        - বাসুদেব তালুকদার (নারায়ণদেব)
          - জয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী
            - বলরাম রায়
              - রঘুরাম রায়
                - রামচন্দ্র
                  - রামসুন্দর
                    - ব্রজসুন্দর
                      - গৌরসুন্দর
                        - বনওয়ালীলাল
                          - বনমালী রায়
                            - ক্ষিতীভূষণ
                            - রাধিকাভূষণ
              - হরিনাথ রায়
                - রাধাকান্ত
                  - গোপীনাথ
                    - গোলকনাথ
                      - উজ্জ্বলমণি
                        - কিশোরীলাল
                          - শরৎসুন্দরী
                      - রূপমঞ্জুরী
                        - আনন্দসুন্দর
                          - শৈলেন্দ্রসুন্দর মজুমদার
                  - গৌরসুন্দর
                    - গঙ্গাপ্রসাদ
                      - হরিশ্চন্দ্র
                      - অন্নদা
                      - বনমালী
                      - সীতানাথ
                        - গৌরাঙ্গিণী
                        - রাধিকাপ্রসাদ
            - হরেরাম
            - রামহরি (৩)
            - রামদেব (২)
            - রামরাম
              - কৃষ্ণশরণ
                - কৃষ্ণনারায়ণ
                  - কৃষ্ণমোহন
                    - গৌরমোহন
                      - প্যারীমোহন
                        - মোহিনীমোহন
            - রাজারাম
            - রামবল্লভ
          - রামনাথ রায় চৌধুরী (১)





২. তাঁতিবন্দ চৌধুরী বংশ ঃ

সুজানগর পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত তাঁতিবন্দ গ্রামের চৌধুরী জমিদার বংশ পাবনা জেলা মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারা বারেন্দ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ; ইহাদের পূর্ব উপাধি সান্যাল এবং চাটমোহর থানার অধীনস্থ বোঁথড় গ্রাম ইহাদের আদি নিবাস। তথায় এবং মালিগাছা গ্রামে এখনও ইহাদের জ্ঞাতিবর্গ বাস করিতেছেন। প্রকাশ কঠোর দারিদ্রের তাড়নায় এবং জ্ঞাতিবর্গের উৎপীড়নে জর্জরিত হইয়া ইহাদের পূর্বপুরুষ জনৈক রাজবল্লভ চৌধুরী মহাশয় অতি শৈশবে তদীয় জননী দেবী সমভিব্যহারে কুল বিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণ, গোপাল ও গোবিন্দজী নামক দেবমূর্তিসহ বোঁথড় গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক তাঁতিবন্দের নিকটবর্তী চণ্ডীপুর নামক পল্লীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় কিয়দ্দিন অবস্থানের পর তাঁতিবন্দের পূর্ব অধিবাসী মৌলিক উপাধিক ব্রাহ্মণগণের সহায়তা ও আশ্রয়ে এখানে আসিয়া স্থায়ী হন।

রাধাবল্লভের পুত্রত্রয়—(১) প্রেমনারায়ণ, (২) রামভদ্র, (৩) রামচন্দ্র মধ্যে কনিষ্ঠ রামচন্দ্রের পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ তৎকালোচিত বাংলা ও উর্দুতে কিঞ্চিৎ বুৎপত্তি লাভ করিয়া স্বীয় সৌভাগ্যান্বেষণে তদানীন্তন রাজশাহী জেলার সদর স্টেশন নাটোর নগরীতে উপনীত হন। তথায় কিয়ৎকাল অবস্থানের পর স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায় প্রভাবে ক্রমে নাটোর কালেক্টরির সেরেস্তাদার পদলাভ করেন।

তখন কেবলমাত্র এ দেশে থানা জেলা প্রভৃতি সংস্থাপনের সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে। বৈদেশিক ইংরাজ কর্মচারিগণ এ দেশের ভাষা ও অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ও অনভিজ্ঞ ছিল ; এদেশীয় কর্মচারীবৃন্দই তখন সর্ববিষয়ের হর্তাকর্তা। তাঁহারা সাহেবদিগকে যাহা বুঝাইতেন তাহাই কার্যেই পরিণত হইত। দেশের এবম্প্রকার অবস্থা সময়ে উপেন্দ্রনারায়ণ নাটোর কালেক্টার সাহেবের প্রধান কর্মচারি সেরেস্তাদার রূপে নিযুক্ত হইয়া অল্পদিন মধ্যেই সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তৎকালে সেরেস্তাদারগণ পুলিশ বিভাগেরও সর্বপ্রধান কর্মচারী ছিলেন। বোধ হয়, তজ্জন্য উপেন্দ্রনারায়ণ তৎকালে বাইস থানার দারোগা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বস্তুত তিনি কালেক্টরির কার্যে প্রভূত ক্ষমতা ও অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তখন দেশের চতুস্পার্শ্ববর্তী অবস্থা এক প্রকার অরাজক ছিল। তখনই নাটোর রাজের অনেক ভূসম্পত্তিও নিলাম হইতে আরম্ভ হয়। তৎসুযোগে উপেন্দ্রনারায়ণ বহু স্থাবর সম্পত্তিও খরিদ করেন। পূর্বতন রাজশাহী বিভাগের সারকিট কোর্টের তৃতীয় জজ মিঃ স্ট্রেচী সাহেব মহোদয় তৎকালীন মুর্শিদাবাদের নিজামত আদালতে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন তারিখে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহার কিয়দংশ এই পুস্তকের দ্বিতীয় ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত বিবরণানুসারে জানা যায় ফৌজদারি

সেরেস্তাদার তৎকালে মাসিক ৬০্ টাকা বেতন পাইতেন এবং ডাকাইতগণের নিকট প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন ও তাহাদের নিকট অর্থ গ্রহণে সরকারি কর্মচারিগণ তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। সেরেস্তাদার এবং পেশকারগণ তাহাদের অধীনস্থ লোকসমূহের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগাদি গোপন করিতেন।

উপরোক্ত রূপে নাটোরে চাকরি করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় প্রভূত অর্থ ও অনেক স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করেন। তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁতিবন্দের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন। তদীয় পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ চৌধুরী এবং তদীয় পৌত্র গুরুগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের সময়ে তাহারা তাঁতিবন্দের নিকটবর্তী ভবানীপুরের নন্দী ও হেমরাজপুরের সরকার উপাধিক কায়স্থ জমিদারগণের স্থাবর সম্পত্তি খরিদ করেন।

পরগণা জাহাঙ্গীরাবাদ পূর্বে যশোহর জেলার অধীনস্থ নলডাঙার রাজার জমিদারিভুক্ত ছিল। ইহা সুজানগর পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত হেমরাজপুরের নীলরতন সরকার মহাশয়দিগের সহিত ইজারা বন্দোবস্ত ছিল। ইজারার মেয়াদ অতীত হইলে রাজস্টেট হইতে উক্ত সম্পত্তি খাসদখল করিবার চেষ্টা করিলে, নীলরতন সরকারদিগের পক্ষ হইতে প্রজাগণকে বাধ্য রাখিয়া কিছুতেই তাহা উক্ত রাজা বাহাদুরকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। তজ্জন্য তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া উক্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ মানসে তৎকালীন এই প্রদেশের উদীয়মান তাঁতিবন্দের ভূম্যধিকারী উপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ চৌধুরী ও তদীয় পুত্র গুরুগোবিন্দ চৌধুরীদিগরের নিকট উক্ত সম্পত্তির অধীনস্থ বিগ্রহাদির সেবাপূজা পরিচালনের স্বত্বে তাঁহা বিক্রয় করেন। তখন ইহারা নামমাত্র মূল্যে উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিয়া তাহা দখল সময়ে হেমরাজপুর আক্রমণ করেন ; তৎকালে সরকার বাড়ি বিধ্বস্ত ও বিগ্রহাদি মধ্যে এথাকার শিবলিঙ্গ মূর্তিদ্বয় তথা হইতে তাঁতিবন্দে স্থানান্তরিত করেন। বিদ্রোহী ইজারা মহাল খরিদ করিয়া তাহা দখলে সিদ্ধিলাভহেতু তখন হইতে উক্ত সম্পত্তি মধ্যস্থিত সুজানগরে অবস্থিত সর্বসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কালিকা মূর্তি "মা সিদ্ধেশ্বরী" নামে অভিহিত হইতে থাকে এবং তাঁহার সেবাপূজাদি হইতে যে শিবলিঙ্গ মূর্তিদ্বয় তাঁতিবন্দে স্থানান্তরিত হয়, তাহা অদ্যাপি তাঁতিবন্দের জমিদারগৃহের প্রবেশ দ্বারদেশের উভয়দিকের মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন স্বয়ং মহাদেব ইহাদের দ্বাররক্ষক রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন।

উপেন্দ্রনারায়ণ শেষ জীবনে তাঁহার গৃহদেবতা গোবিন্দ জিউর সেবা পূজার সুবন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার ধ্যান ও চিন্তায় আত্মপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত বিগ্রহের নাম ও রূপ হৃদয়ে জাগরুক রাখিবার জন্য তাঁহার বংশীয়গণের নামের সহিত প্রিয়তম আরাধ্য দেবতা গোবিন্দ বিগ্রহের নামসংযোগ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই আদর্শে এ যাবৎকাল এই বংশীয় প্রত্যেকের নামের সহিতই প্রায় গোবিন্দ নাম সংযুক্ত হইয়া আসিতেছে।

উপেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতষ্পুত্র লক্ষ্মীচন্দ্র ও পরমানন্দ চৌধুরী মহাশয়দিগের সহিত তাহার পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা নদিয়া জেলার অধীনস্থ আমলা সদরপুর নিবাসী জমিদার শ্যামলাল সিংহ মহাশয়ের শরণাপন্ন হয়েন। তাহারা উভয় ভ্রাতা অতীব দীর্ঘকায় ও বীরপুরুষ ছিলেন। তখন দেশে নাগা সন্ন্যাসিদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহারা শক্তিশালী ও অতি উগ্র প্রকৃতি সম্পন্ন এবং অস্ত্রচালনায় বিশেষ সুদক্ষ ছিল। বীর লক্ষ্মীচন্দ্র ও পরমানন্দ নানাস্থানে পর্যটন করিয়া তাহাদিগকে লইয়া যে একটি প্রসিদ্ধ দল সংগঠন করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া তাহারা উক্ত জমিদার মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন ; তৎকালে কুষ্ঠিয়ার নিকটবর্তী সালঘর মধুয়ার প্রসিদ্ধ নীলকর মিঃ ক্যানি সাহেবের সহিত শ্যামলালবাবুর পদ্মার চরের দখল লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। লক্ষ্মীচন্দ্র ও পরমানন্দ উভয় ভ্রাতার সাহায্যে সদরপুরের জমিদার মহাশয় দুর্দান্ত ক্যানি সাহেবের সহিত বিবাদ বিজয়লাভ

করিয়া চর দখলে কতৃকার্য হইলে, তিনি লক্ষ্মীচন্দ্র ও পরমানন্দ উভয় ভ্রাতাকে বর্তমান সুজানগর পুলিশ স্টেশনের অধীনস্থ তারাবারিয়া গ্রামের নিকটবর্তী খোকসাবাড়ি নামক মৌজা পুরস্কার স্বরূপ নামমাত্র করে পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তৎকালে এই চৌধুরী বংশীয় রামভদ্রের পুত্র সর্বেশ্বর চৌধুরী মহাশয় উক্ত সিংহ জমিদারবংশের দেওয়ান ছিলেন। তিনিও স্বীয় কৃতকার্যের পুরস্কার স্বরূপ নামমাত্র করে তৎকালে খোর্দচাঁদপুর নামক মৌজার পত্তনী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ উক্ত সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছেন। এইরূপে লক্ষ্মীচন্দ্র ও পরমানন্দ ক্রমে উন্নতি লাভ করিলে তখন গঙ্গাগোবিন্দ উপয়ান্তর না দেখিয়া পরিশেষে তাহাদের সহিত আপোষ মীমাংসা সূত্রে ভূসম্পত্তি ভোগ দখল করিতে থাকেন।

গঙ্গাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র ত্রয়—(১) গুরুগোবিন্দ, (২) দুর্গাগোবিন্দ, (৩) বরদা গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়দিগের সময়ে এই জমিদার বংশের সবিশেষ উন্নতিলাভ ঘটে। কিন্তু তাহাদের সময়েই শরিকান বিভাগ বণ্টনাদি নিবন্ধন জমিদারির অনেক ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়। বর্তমান সময়ে গুরুগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম পক্ষীয় পুত্র স্বর্গীয় বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের বংশধরগণ বড় তরফ দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র স্বর্গীয় অভয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রগণ **নোয়া তরফ**, দুর্গাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের সন্তান সন্ততিগণ **মধ্যম তরফ** এবং বরদা গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রগণ **ছোট তরফ** নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

পূর্বে তাঁতিবন্দের কুলিন ব্রাহ্মণের বাস ছিল না। উপেন্দ্রনারায়ণ তদ্বংশীয়গণের সময়ে তাহারা বহু কুলিন ব্রাহ্মণদিগকে স্থাবর সম্পত্তি প্রদানে তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনপূর্বক এখানে আনিয়া স্থায়ী করিয়াছেন। ইহা হইতেই তাঁতিবন্দের লাহিড়ী, বাগছী, রায়, মৈত্র প্রভৃতি উপাধিক কুলিন ব্রাহ্মণগণের আবির্ভাব হইয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র বরদাগোবিন্দ ও দুর্গাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের বিধবা পত্নী চন্দ্রমণি ও মনমোহিনী দেব্যাদিগরের মধ্যে তাঁহাদের গৃহীত দত্তকদের মোকদ্দমা ঘটিত বিবাদে এই জমিদার বংশের অশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় তাঁতিবন্দ জমিদার বংশে ইদানীন্তন কালে পাবনা জেলা মধ্যে সাতিশয় বদান্য ও আদর্শ ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পাবনা জেলার মধ্যে এক প্রসিদ্ধ শিকারি বলিয়াও খ্যাত ছিলেন এবং শিকার উপলক্ষে তিনি সময় সময় সাতিশয় অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার শিকারপ্রিয়তা ও সাদর আহ্বানে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মেও সাহেব বাহাদুর পাবনা জেলার তদীয় বাসস্থান ক্ষুদ্র তাঁতিবন্দ নামক গ্রামে বন্য বরাহ ও ব্যাঘ্রাদি শিকার জন্য শুভাগমন করিয়াছিলেন। ভারতব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহকালে বিজয়বাবু সরকার বাহাদুরের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছিলেন। লিখিত আছে—

Sir Federick Halliday in a minute dated 30-8-58 on the mutinies as they affected the lower provinces under the Government of Bengal observes as :— The Commissioner of the Division also brought to my notice the name of Babu Bejoy Gobinda Chowdhury, zaminder of Tantiband, who offered to place guard at his own expenses between Dacca and Pabna, the mutineers coming over to the latter place. This gentlemen also received my warm acknowledgement for his loyalty.

Bengal under the Lieutenant Governors. P. 132.

ভাবার্থ—তাঁতিবন্দের জমিদার বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় ঢাকা হইতে পাবনা পর্যন্ত স্থানে বিদ্রোহীগণের গতিরোধ জন্য নিজ ব্যয়ে রক্ষক নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন ; তজ্জন্য লাটসাহেব স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডে সাহেব বাহাদুর সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধীয় ৩০/৮/৫৮

তারিখের মিনিটে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। বিভাগীয় কমিশনার সাহেব বাহাদুর তাঁহার রাজভক্তির জন্য গবর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

নীলকমিশন সময়ে এই জেলার জমিদারগণের পক্ষ হইতে তিনি উক্ত কমিশনের সদস্যগণ সমক্ষে তাহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। গবর্নমেন্ট বিজয়বাবুকে বিনাপাশে দুইটি কামান ও কয়েকটি বন্দুক রাখিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। এখন পর্যন্ত তাহার বংশধরগণও অপর শরিকগণ উক্ত বন্দুকাদি রাখিবার স্বত্ব উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী দেব্যা ও অপর শরিক শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়কে তদ্বাবদ গবর্নমেন্ট যে সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

No. 1083. J. D.
Government of Bengal.
Judicial Department
Police Notification.
Darjeeling, the 21st June 1894.

Under Paragraph I Clause 10 of the notification issued by His excellencey the Governor General in council under the Indian Arms Act XI of 1878, the Lieutenant Governor directs that Srimati Basant Kumari Debya and Babu Gnanada Gobinda Choudhury of Tantiband in the District of Pabna be exempted from the operation of all prohibitions and directions contained in Section 12, 14, 15 and 16 of the said Act otherwise than those referring to cannon articles designated for torpedo service, war rockets and machinery for the manufacture of arms and ammunitions.

By order of the Lieutenant Governor of Bengal.
Sd. H. J. S. Cotton
Chief secretary to the Government of Bengal.

বিজয়বাবু পাবনা জেলা মধ্যে সবিশেষ বদান্য, পরোপকারী এবং বিশেষ সৌখিন জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহার উদারতা, দানশীলতা এবং বিলাসিতা সম্বন্ধীয় অনেক গল্প ও কাহিনী এখন পর্যন্ত এদেশে প্রচলিত আছে। তাঁহার সময়ে তাঁতিবন্দের শারদীয় দুর্গোৎসব সাতিশয় প্রসিদ্ধ ও বিরাট ব্যাপার মধ্যে পরিগণিত ছিল। সরকারি বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, পূর্বে এই জেলার কোন স্থালে জমিদারগণ প্রজাবর্গের নিকট হইতে খাজানা ব্যতীত যে সকল বাজেজমা আদায় করিতেন, তন্মধ্যে তাহাদের বাটিতে কিংবা তহশীল কাছারিতে হস্তীপোষণার্থ **হাতি খরচ** নামে একটি বাজেজমা আদায় হইত। বিজয়বাবুর সময়ে তাঁতিবন্দে বার্ষিক অতি সমারোহে হস্তীর নাচ হইত। তদুপলক্ষে সমাগত প্রজাবর্গের আহারার্থ ও পরিচর্যাদি জন্য অনেক ব্যয়বাহুল্য হইত। ইহাতে মহালে হাতি খরচ নামক বাজেজমা আদায় অপেক্ষা তাহার বার্ষিক ব্যয়ই অধিক হইত। প্রজাগণ তাঁহার সময়ে এই বাজেজমা আদায়ে কোন প্রকারে কুণ্ঠিত হইত না ; বরং তাহারা আমোদোৎসব উপভোগ নিমিত্ত অসঙ্কুচিত চিত্তে ইহা প্রদান করিত। তদুপরি জমিদারগণ পূর্বে প্রায়শ শিকারপ্রিয় ছিলেন ; তাহাদের হস্তীপোষণ দ্বারা প্রজারও অনেক উপকার সাধিত হইত। শিকার ফলে জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীর ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে প্রজাগণ রক্ষা পাইত এবং বন্য বরাহাদির অত্যাচারে তাহাদের ক্ষেতের শস্যাদিও বিনষ্ট হইতে পারিত না। অধুনা জমিদার বংশধরগণের অনেকেই পল্লীবাস উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র রাজধানীর বিলাসময় জীবনযাত্রার প্রয়াসী ; কার্যভার সমস্তই স্বার্থান্ধ অধীন

কর্মচারি বর্গের উপর ন্যস্ত ; কাজে কাজেই দেশে প্রজা-ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ শিথিল। সুতরাং নানারূপ বাজেজমা ব্যতীত ন্যায্য জমা আদায়েই প্রজাগণ কষ্টানুভব করিয়া থাকে। বিজয়বাবু একাধারে প্রসিদ্ধ শিকারি ও প্রজারঞ্জক জমিদার ছিলেন।

সৎকীর্ত্তি মধ্যে এক সময়ে তাঁতিবন্দের এই দুর্গোৎসব এখানকার জমিদার বংশের একটি উজ্জ্বল কীর্তি ও উল্লেখযোগ্য বিষয় বলিয়া পরিচিত ছিল। বুধ নবমী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন যোড়শ উপচারে পূজা হইত এবং তদুপলক্ষে দৈনিক গ্রামবাসী ও দূরবর্তী অনেক গ্রামের বহুলোক প্রায় মাসাধিককাল ভুরিভোজনে পরিতুষ্টি লাভ করিত। দেবগণের শারদীয় উৎসবে মর্তে আগমন সম্বন্ধীয় কাল্পনিক উপাখ্যানে পাবনা জেলার বিভিন্ন পল্লীতে "মা ভগবতির" সদলবলে আগমনের যে রূপক গল্পের অবতারণা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে তাঁতিবন্দের বিজয়বাবুর সময়ের বিরাট দুর্গোৎসব ব্যাপার উপলক্ষে এখানে স্বয়ং মায়ের শুভাগমন সূচিত হইত। সুজানগরের সিদ্ধেশ্বরী কালিকাদেবীর সেবা পূজা পরিচালন জন্য নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি আদি সমস্তই তাঁতিবন্দের চৌধুরী বংশে পূর্ববৎ বজায় রাখিয়া সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

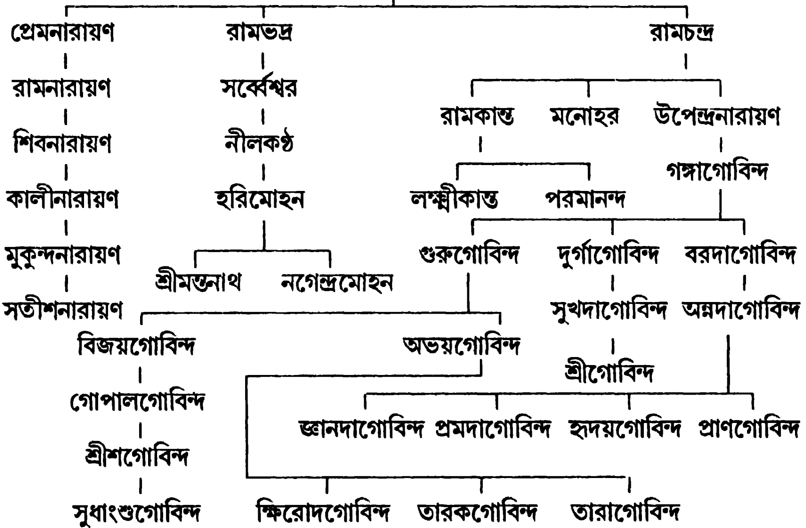
ছোটতরফের স্বর্গীয় বরদাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের দত্তকপুত্র অন্নদাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় পাবনা শহরে স্বীয় নামানুসারে "অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী" নামে একটি সাধারণ পাঠাগার নিমিত্ত একটি ইস্টকনির্মিত গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়া স্বীয় উদারতা ও বিদোৎসাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং সর্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বিজয়বাবুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অভয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় পাবনা শহরে জুবিলি ট্যাঙ্ক (লক্ষ্মীসাগর) নামক জলাশয় খননকালে উক্তস্থান দান করিয়া এবং পাবনার দাতব্য চিকিৎসালয়ে কলেরা ওয়ার্ড নামে রোগীদিগের অবস্থান জন্য একটি পাকা ইমারত নির্মাণ করিয়া দিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তিনিই স্বীয় উদ্যম ও প্রচেষ্টায় তাঁহার পাবনার বাসা বাটিতে পাবনা ব্যাঙ্ক নাম প্রদানে যে সমবায় ঋণ দান সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে পাবনার সর্বপ্রথম যৌথ কারবারের সৃষ্টি হয় এবং অধুনা উক্ত "পাবনা ব্যাঙ্ক লিমিটেড" কোম্পানিই পাবনার সর্বপ্রধান ব্যাঙ্ক মধ্যে পরিণত হইয়াছে।

এই জমিদার বংশীয় সকলেই শক্তিমন্ত্রের উপাসক। মধ্যম তরফের শ্রীগোবিন্দ বাবু জনৈক নিষ্ঠাবান হিন্দু, তিনি এক সময়ে এক নিশিতে এক শত আটখানি কালী মূর্তির পূজাক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রাদি আলোচনায় তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ ; সুকবি বলিয়াও শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ সুনাম আছে। তাহার ইতিপূর্বে প্রকাশিত কবিতা পুস্তকের মধ্যে "নূরজাহান" নামক কাব্যখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জেলার ভুস্বামিগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই অধিক সংখ্যক পদ্য গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তেজস্বী ও উচ্চাঙ্গীয় কবিতা রচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শী। পূর্বোক্ত অভয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত তারকগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় জমিদারি শিক্ষা, মহাজনী শিক্ষা নামধেয় দুইখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি জমিদার পুত্র হইয়াও তাহার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিপ্রভাবে ম্যানেজিং ডিরেক্টার স্বরূপে পাবনা শহরতলিস্থিত শিল্পসঞ্জীবনী নামক মোজা গেঞ্জির যৌথ কারবারটির অবস্থা সবিশেষ উন্নত করিয়াছেন। বাংলা ১২৪৮ সালে বরদাগোবিন্দ চৌধুরীদিগর এবং তদ্দৃষ্টে তাহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গুরুগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় ১২৫০ সালে তাঁতিবন্দে যে বিচিত্র কারুকার্য খরিচ দোলমঞ্চদ্বয় নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্তমান থাকিয়া তাহাদের ধর্মপ্রবণতা ও সদনুষ্ঠানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁতিবন্দের বহুদূর হইতে এই দোলমঞ্চদ্বয় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুঃখের বিষয় এক্ষণে সামান্য সংস্কার অভাবে ইহা বিনাশোন্মুখ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। মথুরার ঠাকুর বংশ বহুদিন হইতেই এই জমিদার বংশের গুরুদেব পরিবার বলিয়া পরিচিত। তাহারা তাঁতিবন্দ স্টেট হইতে অনেক ভূসম্পত্তি অদ্যাপি ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ উপভোগ

করিতেছেন। পূজাপার্বণ ও শ্রাদ্ধ বিবাহাদি সাময়িক ক্রিয়া ব্যতীত ইহারা কয়েক শরিক হইতে দৈনিক প্রণামী আদিতেও বার্ষিক প্রায় হাজার টাকা পরিমাণ বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

তাঁতিবন্দ চৌধুরী জমিদার বংশে দ্বিতীয়, তৃতীয় বার দার পরিগ্রহণ এবং বহু বিবাহ প্রথা পূর্বাপর বর্তমান আছে। রাজা জমিদারগণের বংশে ও সম্পত্তি রক্ষাকল্পে বহুবার বিবাহ সময় সময় আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু এই বংশীয় ভূস্বামিগণের দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহণ প্রথার কথঞ্চিৎ বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। গঙ্গাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় দুইবার ও তৎপুত্র গুরুগোবিন্দ চৌধুরীমহাশয় চারিবার বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় পূর্বপক্ষীয় একাধিক পুত্রপৌত্রকন্যাকলত্রাদি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনরায় ষাট বৎসরের অধিক বয়সে বিগত ১৩৩১ সালের ভাদ্র মাসে চতুর্থবার দারপরিগ্রহ করিয়া কুলপ্রথা বজায় রাখিয়াছেন।



৩. দুলাই চৌধুরী বংশ ঃ

পাবনা সদর হইতে ২০ মাইল পূর্বে বর্তমান সুজানগর পুলিশ স্টেশনের অতঃপাতি দুলাই নিবাসী চৌধুরী উপাধিক জমিদার বংশ এই জেলার মুসলমান ভূস্বামিগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। রহিমউদ্দিন মুন্সি নামক জনৈক প্রতিভাবান মহাপুরুষ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সরাব্দি সরকার নামক দুলাই গ্রামের নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পল্লীনিবাসী জনৈক সাধারণ গৃহস্থের সন্তান। মেধাবী রহিমউদ্দিন বাল্যে কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া নাটোর নগরীতে উপনীত হন। তথায় কিয়ৎকাল নাটোরে প্রতিষ্ঠিত থানায়, কেহ কেহ বলেন নাটোর রাজবাটিতে মহুরি গিরি ও নকলনবীশের কার্য করিয়া মুন্সি উপাধী লাভ করেন। রাজশাহীর সদর কালেক্টরি নাটোরে অবস্থিত থাকা কালে তিনি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া উক্ত কালেক্টরির পেস্কার পদ প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত কার্যে তিনি প্রভূত ক্ষমতা ও অর্থ অর্জন করেন ; তিনি ও তাঁতিবন্দের চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় একই সময়ে নাটোর কালেক্টরি অফিসে যথাক্রমে পেস্কার ও সেরেস্তাদার পদে কার্য করিতেন। তজ্জন্য তাঁতিবন্দ ও দুলাই উভয়

স্থানের হিন্দু মুসলমান চৌধুরী জমিদার পরিবার মধ্যে অনেক দিন পর্যন্ত এবং এখনও কিঞ্চিৎ পরস্পর সৌহার্দ ও প্রীতিভাব পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। উভয়েই রাজকার্যে লিপ্ত থাকিয়া সবিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। বর্ণিত আছে :—"It appears that the seristhadar and one Rohimuddin monopolised magisterial power and sheltered several sirdar dacoits, who were their ryots."

Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

অর্থাৎ সেরেস্তাদার এবং জনৈক রহিমউদ্দিন ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা একচেটিয়া করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রায়তগণ মধ্যে অনেক সরদার ডাকাইতগণকে আশ্রয় দিতেন।

তৎকালে প্রত্যেক জেলায় একই ব্যক্তি জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টার পদে কাজ করিতেন। রহিমউদ্দিন তখন অতি যোগ্যতার সহিত রাজকার্য সম্পন্ন করিতেন। পেস্কার ও সেরেস্তাদার কিভাবে কাজ করিতেন, তাঁহা এদেশে প্রচলিত নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক কবিতাংশে জানিতে পারা যায়।

নাটোর জেলাতে লিখি প্রথম ফৌজদার নিকী
টাপটীন সাহেব ওজার।
রেবণ টগরাভাবে হালন আমল এবে
পারকেণ সাহেব ফৌজদার।।
যে সাহেব অধিকারী কাজি মুপ্তি সঙ্গে করি
বৎসরে দুবার জেলায় স্থিতি।
জ্যৈষ্ঠ পোষ দুই মাস নাটোরে করেন বাস
মিছিল তামাম কৈরা গতি।।

শুন মিসিলের খণ্ড যবে বেলা চাইর দণ্ড
বৈসেন সাহেব কাজি সাথে।
মুন্সি রহিমদ্দি সব হতে বাড়ে বুদ্ধি
মিসিল শুনান লইয়া হাতে।।
তবে শুন তার মজা যে মতে লইল পূজা
প্রতিমা হইল সাহেব আসি।
কাদিয়া আসন করি সম্মুখেতে মেজ ধরি
পূজা লন পূর্ব মুখে বসি।।
রহিমদ্দি সুপণ্ডিত তিনি হইলা পুরোহিত
সদস্য চৌধুরী মহাশয়।
বক্সী করে অনুকূল নাহি চুক নাহি ভুল
কার্য খানি শুদ্ধ মতে হয়।।

"ঐতিহাসিক চিত্র" ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই কবিতাটি আড়ালিয়া নিবাসী জনৈক রমাপ্রসাদ মৈত্র কর্তৃক শতাধিক বৎসর পূর্বে রচিত ; সম্পূর্ণ কবিতাটিতে এদেশের আচার নীতি ও কার্য প্রণালীর অনেক বিষয় বর্ণিত আছে। সদস্য চৌধুরী মহাশয় তাঁতিবন্দের উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীমহাশয়কে উপলক্ষ করিয়া লিখিত।

আজিমউদ্দিন চৌধুরী ঃ

রহিমউদ্দিন দুলাই চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও তদীয় পুত্র আজিমউদ্দিন চৌধুরী

সাহেবের সময়ে দুলাই জমিদারির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। ধন, মান এবং প্রতিপত্তি সর্ব বিষয়ে তাঁহার সময়ে এই বংশ বিশেষ গৌরব লাভ করে। জমিদারির আয় ব্যতীত তাঁহার সময়ে তদীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ২।৩টি নীল কুঠিতে নীলের কাজ চলিত এবং তাহাতে তাঁহার বিস্তর লাভ ও আয় হইত। তাঁহার জমিদারি আমলে যেমন কঠোর শাসন দ্বারা প্রজাগণের নিকট হইতে খাজানা আদায়ের নিয়ম ছিল, তদ্রূপ আবার তাঁহার সময়ে নিয়ম ছিল যে, যদি বৎসর মধ্যে প্রজাগণ বৎসরের সম্পূর্ণ খাজানা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইত তাহা হইলে তাঁহারা খাজানা আদায়ে অক্ষম বলিয়া বৎসরের অবশিষ্ট বাকি খাজানাদি সম্পূর্ণই মাপ পাইত। দেশের অধিকাংশ প্রজা মুসলমান, ভূম্যধিকারীও স্বয়ং ধনাঢ্য মুসলমান ; গরিব প্রজাকুল অনেক সময়েই খাজানার দায় হইতে অব্যহিত লাভ করিত। মুসলমান জমিদার হইলেও তিনি অনেক সময় তাঁহার উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারিগণের সহায়তায় দুলাইয়ের বাজারে বার্ষিক অতি সমারোহে শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজন করিতেন। তাহাতে হিন্দু মুসলমান প্রজা ও দর্শকবৃন্দ ভুরিভোজনে আপ্যায়িত হইত। তিনি অতিশয় বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী জমিদার ছিলেন। তাঁহার স্টেট হইতে রাজশাহীর স্কুলকলেজের অনেক ছাত্র মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত হইত ; তিনি মসিন ফণ্ডে অনেক অর্থ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রযত্নে দুলাই-এ একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

তিনি ঢাকার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে সর্বপ্রথমে বিবাহ করেন এবং স্বীয় পত্নীকে কাবিলনামা দ্বারা সম্পত্তির ।।৶০ ছয় আনা অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। পুনরায় অন্য একটি রমণীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া পরে তাঁহাকে নিকা করিয়াছিলেন। তদ্ধেতু পূর্বপক্ষীয় স্ত্রীর সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইলে, উক্ত স্ত্রী তাঁহার কাবিলনামার লিখিত সম্পত্তির দাবিতে নালিশ করিয়া যে ডিক্রি হাসিল করেন, তাহা তিনি ঢাকার বিদেশিয় জমিদার মিঃ পোগজ সাহেবের নিকট বিক্রি করেন। তখন চৌধুরী সাহেব বিদেশিয় ফিরিঙ্গি বণিককে বহু টাকা খরচাদি সহ প্রদান করা অসঙ্গত বোধ করেন। অবশেষে মিঃ পোগজ যখন কিছুতেই তাঁহার খরিদা ডিক্রির টাকা ও সম্পত্তি উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন না, তখন তিনি উক্ত ডিক্রি পুনরায় অফিসিয়াল স্টার্স্ট্রীর নিকট বিক্রয় করিলে, যখন তাহা তাঁহার উপর জারি হয়, তখন তিনি তাহার জারি কার্যে বাধা প্রদান করেন। তখন পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহায্যে দুলাই-এর বাটিতে ডিক্রি জারি উপলক্ষে নানাপ্রকার দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হয় এবং অনেক মুল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে এদেশের সরকারি কর্মচারি ও সাধারণ লোকে বহু মূল্যের দ্রব্যাদি কেহ সামান্য মূল্যে খরিদ করিয়া, কেহ তাহা গোপনে লুক্কায়িত রাখিয়া আত্মসাৎ করেন এবং তাহা হইতে এই জেলার অনেকে ধনী বলিয়া গণ্য হইয়া উঠেন।

তদীয় পুত্র স্বর্গীয় হয়দারজান চৌধুরীসাহেব পাবনার বাসভবন নির্মাণ করেন। দুলাই এক্ষণে পরিত্যক্ত পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের রাজ প্রসাদতুল্য অট্টালিকা, রাজা বাদসাহের তুল্য গড়বন্দি বাসভবনাদি ক্রমে নষ্ট হইতেছে। হয়দারজান চৌধুরীসাহেবের পুত্রগণ (১) হোসেনজান চৌধুরী (২) ফসীউদ্দিন চৌধুরী, (৩) আব্দুলবাসেদ চৌধুরী সাহেবগণ বর্তমান সময়ে পাবনায় বাস করেন। ইহাদের জমিদারি অতি বিশৃঙ্খলায় পরিচালিত ; গভর্নমেন্টের কোম্পানির কাগজের আয় হইতে ইহারা বার্ষিক বহুতর টাকা পাইয়া থাকেন। নবাব বাদসাহদিগের পরিবারের ন্যায় ইহাদের বাটিতে স্বজাতীয় স্ত্রীপুরুষ বহুলোক প্রতিপালিত হয়। বহুবিবাহ ও নিকাদি প্রথার ফলে ইহারা অনেক সময় নানারূপ ব্যয়সাধ্য মামলামোকদ্দমায় জড়িত হইয়া থাকেন, তজ্জন্য সময় সময় ইহাদের অনেক ক্ষতিও হইয়া থাকে।

৪. পার্শ্বডাঙা জমিদার বংশ ঃ

পাবনা সদর স্টেশন হইতে ১৫ মাইল উত্তরে চাটমোহর থানার অন্তর্গত বর্তমান সাঁড়া

সিরাজগঞ্জ রেল লাইনের গুয়াখড়া নামক রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে দিকসির বিলের উত্তরাংশে অবস্থিত পার্শ্বডাঙা গ্রামের বৈশ্যসাহা বংশীয় চৌধুরী উপাধিক জমিদারগণ এই জেলার ভূস্বামিগণ মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রবাদ ইহাদের পূর্বপুরুষগণ পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে বাণিজ্য উপলক্ষে এতদঞ্চলে আগমন করত পাবনা জেলার তদানীন্তন সমৃদ্ধিশালী বন্দর করতোয়া তীরস্থ নবগ্রাম নামক স্থানে অবস্থান করেন। করতোয়ার অবরোধ এবং তৎসঙ্গে নবগ্রামের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশ বাণিজ্য বিস্তার উপলক্ষে পার্শ্বডাঙার নিকটবর্তী সজনাই নামক পল্লীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। পরে কালক্রমে বংশবিস্তার সহকারে পার্শ্বডাঙায় আসিয়া বাস করেন।

স্বর্গীয় হরানন্দ সাহা এই বংশীয় একজন খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চারিপুত্র মধ্যে ২য় ও ৩য় পুত্র বাল্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১ম পুত্র হরিনাথ এবং ৪র্থ পুত্র শম্ভুনাথ পিতার মৃত্যুর পর জীবিত ছিলেন। তাঁহারা উভয় ভ্রাতা জাতীয় ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেন এবং কলিকাতা, রঙপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত বালুরঘাট, ফকিরগঞ্জ, কুমারগঞ্জ, গোপালগঞ্জে বাণিজ্য বিস্তার করেন।

ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধি সহকারে উভয় ভ্রাতা ব্যবসায় হইতে জমিদারিতে মনোনিবেশ করেন। হরিনাথের সময় হইতে ইহারা নানাপ্রকার স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিয়া জমিদার পদবীতে উন্নীত হয়েন ও নানাপ্রকার জনহিতকর কার্যাদিতে বহু অর্থব্যয় করিয়া চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। হরিনাথের মৃত্যুর পর শম্ভুনাথ এজমালি স্টেটের ট্রাস্টি নিযুক্ত হয়েন।

শম্ভুনাথ চৌধুরী মহাশয় পার্শ্বডাঙা জমিদার বংশে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি অর্থোপার্জন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে বিবেচনায় ধর্মক্রিয়ায় ও জনহিতকর কার্যাদি এবং নানারূপ সদানুষ্ঠানে বিশেষ মুক্তহস্ত ছিলেন। নিজে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও, ইনিই সর্বপ্রথমে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে পাবনা জেলার মফঃস্বলে চাটমোহর নামক বন্দরে যে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি "শম্ভুনাথ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়" নামে বর্তমান থাকিয়া তাঁহার সদানুষ্ঠানের সাক্ষ্যদান করিতেছে। এই স্কুল দ্বারা নিকটবর্তী সালিখা, গুণাইগাছা প্রভৃতি পল্লীর অধিবাসিগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। এখন পর্যন্ত তাঁহার স্টেট হইতে তদীয় উত্তরাধিকারিগণ এই স্কুলে মাসিক অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। তবে ইহাদের অপেক্ষা এই বিদ্যালয়টির রক্ষা কল্পে গুণাইগাছার ভদ্রমণ্ডলীর উদ্যোগ অত্যধিক। শম্ভুনাথের দ্বিতীয় কীর্তি তৎকর্তৃক ১২৫৭ সালে কাশীতে ভুবনেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠা ও তৎসংশ্লিষ্ট সত্র স্থাপন। ইনি এই সত্রের ব্যয় নির্বাহার্থ এবং সম্যক পরিচালনার্থ বার্ষিক প্রায় ছয় হাজার টাকা আয়ের স্থাবর সম্পত্তি উক্ত দেবীর সেবা ও অতিথিসৎকার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। ১২৮৬ সালে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় গোবিন্দনাথ চৌধুরী মহাশয় পুনরায় এজমালি স্টেটের ট্রাস্টি নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়ে জমিদারির বিশেষ সুবন্দোবস্ত হয় এবং অর্থ ও সম্ভ্রমে এই জমিদার বংশ এই জেলা মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তিনিও তদীয় পিতৃব্যের পদানুসরণপূর্বক ধর্মক্রিয়াকলাপ ও সাধারণ জনহিতকর অনেক কার্যে মনোযোগী হইয়াছিলেন। পাবনার পূর্বতন বালিকা বিদ্যালয় গৃহের ইস্টকালয়, পাবনা জেলা স্কুলের হিন্দু বোর্ডিং এবং পার্শ্বডাঙা গোবিন্দনাথ মধ্য ইংরাজি স্কুল তাঁহার সময়ে এই বংশের অর্থে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। অতিথি সৎকার, ধর্মক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি জন্য এই জমিদার বংশ একসময়ে সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পার্শ্বডাঙার বাসন্তী দুর্গোৎসব একসময়ে এই জেলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। কলিকাতায় ইহারা আপন গদিতে অনেক ছাত্রগণকে আশ্রয় দান করিয়া তাহাদের বিদ্যা শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিতেন। ১৩০৫ সাল পর্যন্ত সমস্ত শরিকগণ একান্নভুক্ত ছিলেন ও ইহাদের কলিকাতায় গদি বাড়ি ও কারবার আদি সমস্তই এজমালি ছিল। ঐ সময় হইতে শম্ভুনাথের পুত্র শরৎচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কতকগুলি অপরিণামদর্শী যুবকের

পরামর্শে সংসারাভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও নীতিকুশল গোবিন্দনাথের সহিত বিবাদ করত পৃথকান্ন হইতে চেষ্টিত হন এবং তদবধি নানাপ্রকার বহুব্যয়সাধ্য মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া ক্রমে ১৩১১ সালে সমস্ত সরিকগণ একেবারে বিভক্ত হইয়া প্রধানত তিন সরিকে পরিণত হন। গোবিন্দনাথের তরফ বড়তরফ, তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রসন্ননাথের তরফ মধ্যম এবং শরচ্চন্দ্রের তরফ ছোট তরফ নামে খ্যাত হইয়া থাকে।

বর্তমান সময়ে সমুদায় সরিকগণ অল্পবিস্তর মামলা মোকদ্দমাদিতে জড়িত, বিষয় কার্যাদি বিশৃঙ্খলায় নির্বাহিত, পরস্পর আত্মকলহে হীনবল, ধর্মক্রিয়াদি ও প্রাচীন কীর্তিকলাপসমূহ ক্রমশ বিলুপ্তপ্রায়। সম্প্রতি প্রসন্ননাথ চৌধুরী মহাশয় পার্শ্বডাঙায় একটি গোপালবিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রায় দুই সহস্রাধিক টাকা আয়ের স্থাবর সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন।

৫. পোরজনা ভাদুড়ী বংশ ঃ

আদি বাসস্থান ঃ

শাহজাদপুর থানার অধীনস্থ উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় ১১ মাইল পূর্বদক্ষিণাংশে অবস্থিত পোরজনার ভাদুড়ি জমিদারগণ "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থ প্রণেতা উদয়নাচার্য ভাদুড়ী মহাশয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। উক্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের জনৈক পুত্র তাঁহার পূর্বনিবাস রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বিন্নাদইর গ্রামে পরিত্যাগপূর্বক ঢাকা জেলার বালিয়াটি গ্রামে বাস করেন। তাঁহারই অধস্তন বংশধর ধনঞ্জয় ভাদুড়ী উক্ত বাসস্থান পরিত্যাগপূর্বক পাবনা জেলার অন্তর্গত পোরজনা গ্রামে বাস করেন।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই বংশীয়গণের অবস্থিতি ঃ

ধনঞ্জয়ের ১ম পৌত্র রঘুদেবের পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে (ক) কৃষ্ণরামের ১ম পুত্র কালীচরণের বংশধরগণ জেলা মৈমনসিংহের অন্তর্গত নবগ্রাম নামক স্থানে বাস করিতেছেন। ধনঞ্জয়ের ২য় পৌত্র হরিদেবের বংশধরগণ রাজশাহী জেলার অধীন চৌগ্রামে বসবাস করিতেছেন। উপরোক্ত কৃষ্ণরামের ২য় পুত্র রামশঙ্কর ভাদুড়ীর ১ম পুত্র রামগোপাল ভাদুড়ীর বংশধরগণ মধ্যে ২য় পুত্র মদনগোপাল ও ৩য় পুত্র রত্নগোপালের বংশধর পাবনা জেলার জামিরতা গ্রামে এবং রামশঙ্করের ২য় পুত্র হরগোপালের সন্তানগণ পোরজনা গ্রামে বাস করিতেছেন। রঘুদেবের ২য় পুত্র (খ) বিষ্ণুরামের বংশধরগণ চৌহালি পুলিশ স্টেশনের অধীন মৌহালি গ্রামে, ৩য় পুত্র (গ) রামকৃষ্ণের সন্তানগণ এবং ৪র্থ পুত্র (ঘ) শুভারামের বংশধরগণ এক্ষণে পোরজনা গ্রামে বাস করিতেছেন। মোটামুটি বলিতে গেলে কৃষ্ণরামের পৌত্র হরগোপাল ও তদীয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের বংশধরগণ এবং শোভারামের সন্তান সন্ততিগণই বর্তমান সময়ে পোরজনা গ্রামে বাস করিয়া থাকেন। তাহারাই সম্প্রতি পোরজনার ভাদুড়ী জমিদার বংশ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন।

রামশঙ্কর ভাদুড়ী মহাশয়ের পিতা কৃষ্ণরাম ভাদুড়ী মহাশয় মৈমনসিংহ জেলার পুখুরিয়া পরগণায় অনেক স্থাবর সম্পত্তি খরিদ করেন। তাঁহার দুই পুত্র রামগোপাল ও হরগোপাল সাতিশয় প্রতাপশালী ছিলেন। ইহারা উক্ত পুখুরিয়া সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি করেন এবং পাবনা জেলার কাটারমহালের অধীন আলিয়ারপুরের সম্পত্তি খরিদ করেন।

ইহারা বেণীপাঠির বিখ্যাত শ্রোত্রীয় এবং উক্ত পঠির কুলিন সমাজ একত্রিত করিয়া নায়কত্ব গ্রহণ করেন ও প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তৎকাল হইতেই সুসঙ্গের রাজপরিবারের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হয়। হরগোপাল ভাদুড়ী মহাশয়ের পুত্র চন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহাশয় স্বকীয় বুদ্ধিবলে পৈত্রিক সম্পত্তির আয়তন অনেক বৃদ্ধি করেন এবং রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করেন। তাঁহার পুত্র মুকুন্দনাথ ভাদুড়ী মহাশয় অতিশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু ও শান্ত

প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি পূর্বপুরুষের বংশ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বেণীপটির কুলিনদিগকে প্রতিপালন করিতেন। তিনি পোরজনা ও তদন্তর্গত অন্যান্য সম্পত্তি খরিদ করেন। তাঁহার সময় হইতেই পোরজনায় একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনটি নাবালক পুত্র রাখিয়া মুকুন্দনাথ পরলোক গমন করিলে তদীয় ভগ্নিপতি দ্বারকানাথ সান্যাল মহাশয় জমিদারির কার্য পরিচালন করেন ; তাঁহার কর্তৃত্ব সময়ে ১২৮৬ সালে অত্রস্থ মধ্য ইংরাজি স্কুলটি মুকুন্দ বাবুর নামানুসারে "মুকুন্দনাথ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে" পরিণত হইয়াছে। তদীয় পুণ্যময়ী ও দয়াবতী সহধর্মিণী শ্রীযুক্ত ভুবনময়ী দেবী দরিদ্র ব্যক্তিগণের চিকিৎসার্থে ১৩০৭ সালে পোরজনায় "ভুবনময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়" নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। মুকুন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র কালীপ্রসন্ন বাবুর উদ্যোগে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে পোরজনায় একটি সাধারণ পাঠাগার এবং ব্যাঘ্রাদি বন্য জন্তু সম্বলিত একটি পশুশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুকুন্দবাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশপ্রসন্ন ভাদুড়ী মহাশয় বর্তমান সময়ে সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তিনি তদীয় পরলোকগতা সহধর্মিণী হেমাঙ্গিনীদেবীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার নামানুসারে পাবনা সহরে "হেমাঙ্গিনী ফিমেল হসপিটাল" নামে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার্থ একটি দাতব্য চিকিৎসালয় গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

রঘুদেবের পৌত্র রামচন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয় স্বীয় বুদ্ধিবলে পুখুরিয়া পরগণায় খারিজা তালুক ও পত্তনি সম্পত্তি খরিদ করেন। তিনি বহু ব্যয়ে নিজবাটিতে যে রামেশ্বর শিবলিঙ্গ মূর্তি সংস্থাপন ও তদুদ্দেশ্যে যে মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি পোরজনায় বর্তমান আছে এবং তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়।

বাণ ব্রহ্ম মুখাচলেন্দু বিমিতে শাকে মঠো নির্মমে।
শৈবাত্র স্বশুভায় খণ্ড পর শোর্লিঙ্গং পুনঃ সম্মদৈঃ।।
যত্নৈঃ শ্রীযুক্ত রামলোচনধরা দেবেন সংস্থাপিতং।
যো ব্রহ্মাদিক বাঞ্ছিত স্ত্রিপুর সন্নাশায় তৎপ্রীতয়ে।।

উপরোক্ত রামগোপাল ভাদুড়ী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র রত্নগোপালের দুই পুত্র জগবন্ধু ও দীনবন্ধু ভাদুড়ী মহাশয়দিগের বংশধরগণ পোরজনার নিকটবর্তী জামিরতা গ্রাম পত্তনি লইয়া তথায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদের প্রযত্নে তথায় একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৬. বেলকুচি চৌধুরী বংশ ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ পূর্বাংশে যমুনা নদীতীরে বেলকুচি নামক প্রাচীন গ্রামের চৌধুরী উপাধিক মুসলমান জমিদার বংশ এক সময়ে এই জেলায় সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বেলকুচি এক্ষণে নদীগর্ভে ; ইহার প্রাচীন অস্তিত্ব বিলুপ্ত। এথাকার চৌধুরী বংশের বিবরণ সম্বন্ধে জানিতে পারা যায়, রাণীগ্রামের রায় উপাধিক বৈদ্য জমিদারগণের জমিদারি বড়বাজু পরগণার অর্ধাংশ হইতে ইহাদের উৎপত্তি হয়। প্রকাশ বড়বাজু পরগণার একমাত্র ভূম্যধিকারী রাণীগ্রামের রায় পরিবারস্থ রাধারাম রায়মহাশয় বাঁকি রাজস্ব নিমিত্ত মুর্শিদাবাদে ধৃত হইলে তদীয় আত্মীয়বর্গ তাঁহার উদ্ধার সাধনে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। বেলকুচি গ্রামে তৎকালে আফজাল মহম্মদ নামে জনৈক ধর্মাত্মা সাধুপুরুষ বাস করিতেন। মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহাকে এ বিষয় জানাইলে, তিনি বড়বাজু পরগণার অর্ধাংশের বিনিময়ে রাধারাম রায়কে কারামুক্ত করিয়া দিতে স্বীকৃত হয়েন। অবশেষে তাঁহার কৃতকার্যে রাধারাম অব্যাহতি লাভ করিয়া প্রতিশ্রুতি মত বড়বাজু পরগণার অর্ধাংশ আফজাল মহম্মদ সাহেবকে প্রদান করেন এবং অপর অর্ধাংশ নিজ হস্তে রাখেন। কালক্রমে তাঁহার প্রাপ্ত অর্ধাংশ হইতে আফজালপুরের

মিঞাগণ একআনা অংশ প্রাপ্ত হন এবং অপর সাত আনা অংশ তদীয় উত্তরাধিকারিগণ নিজ হস্তে রাখেন। ইহা হইতেই কালে যথাক্রমে এক আনির ও সাত আনির জমিদারগণের উদ্ভব হইয়াছে।

আফজাল্ মহম্মদ জনৈক সাধুপুরুষ ছিলেন ; তজ্জন্য তিনি পীর আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। বেলকুচিতে তাহার মৃত্যুর পর যে স্থানে তদীয় দেহের সমাধি হয়, তাহা সাধারণত "পীর সাহেবের দরগাহ" নামে অভিহিত হয়। বড়বাজু পরগণার যে যে স্থানে তাঁহার সম্পত্তি বর্তমান ছিল, সেই সেই স্থানে একটি করিয়া দরগাহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রবাদ তাঁহার নামে সিন্নি মানস করিলে অসাধ্য সাধিত হইত, তজ্জন্য তদীয় দরগাহ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক অদ্যাপি সম্মানিত হইয়া থাকে। সিরাজগঞ্জের বর্তমান পীর সাহেবের দরগাহের উদ্দেশ্যে তথাকার অনেক আড়তদারগণ বৃত্তি আদির ন্যায় তাঁহাদের খরিদ বিক্রয়েব উপর "চেরাগী" বৃত্তি আদায় করিয়া থাকেন। বাঙালি অপেক্ষা মাড়ওয়ারী সম্প্রদায় এই দরগাহের বিশেষ ভক্ত।

আফজাল্ মহম্মদ সাহেব বিবাহ করেন নাই, তজ্জন্য তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় একমাত্র ভ্রাতা আলীমামুদের পুত্র ফয়েজ আলী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। তৎপর ফয়েজ পুত্র মেহেরালী ও পৌত্র রজবালী সাহেব যথাক্রমে সম্পত্তি ভোগ করেন। রজবালীর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ সিরাজালী পরিশেষে উত্তরাধিকারী হয়েন। তিনি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন ; তিনিই নিজ নামানুসারে সিরাজগঞ্জ বন্দর স্থাপন করেন। *(সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত আশালতা ৯।১০ম সংখ্যা ১৩৬।৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।* "জনসাধারণ আফজাল মহম্মদকে অল্পকাল মধ্যেই পীর বা মহাত্মা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুশাসনে প্রজাকুল এত সুখে ছিল যে। পীরের রাজ্যে মশা নাই প্রভৃতি কথা প্রচলিত হইয়াছিল। এমন কি তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক দিন পর্যন্ত খাজনাদির হার বৃদ্ধি হইলেও প্রজাগণ বিপদ আশঙ্কা করিয়া পীরের রাজ্য ছাড়িয়া ভিন্ন জমিদারের এলাকায় যাইতে সাহসী হইত না।" *(পাবনা হইতে প্রকাশিত ১৩২২ সালের ৭ই চৈত্র তারিখের সুরাজ পত্রিকা দ্রষ্টব্য)।*

আফজাল্ মহম্মদের নামানুসারে আফজালপুরের সৃষ্টি হয়। অনুমান ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ রজবালী সম্পত্তির মালিক হয়েন। তাঁহার সময়ে সাহেব উপাধির পরিবর্তে চৌধুরী ব্যবহার আরম্ভ হয়। তাঁহার সময়ে চৌধুরী বাড়ির বিশেষ উন্নতি ও জীর্ণ সংস্কার হয়। বেলকুচির সুপরিচিত বৈঠকখানা (আমখাস) তাঁহার আমলেই নির্মিত হইয়াছিল। বেলকুচির সান্নিধ্যে যে একটি উদ্যান বাটি নির্মিত হয়, তাহা **রজবনগর** নামে পরিচিত হইত। মেহেরালীর সময়ে তাঁহার বিষয় কর্মে অমনোযোগিতা হেতু সম্পত্তি নানারূপ দায়বদ্ধ হয়। প্রজাগণ খাজনা আদায় বন্ধ করে এবং অনেক রাজস্ব বাকি পড়ায় মেহেরালী সম্পত্তি ইস্তফা দিয়াছিলেন।

সিরাজগঞ্জের নিকটবর্তী সিমুলিয়া গ্রামের সিংহবংশীয় জনৈক ব্যক্তি বেলকুচির দেওয়ান ছিলেন। মেহেরালীর পত্নী দেওয়ানকে মুর্শিদাবাদে যাইয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। দেওয়ানজি তথায় যাইয়া দেখিবার ছলে ইস্তফা পত্রখানি হাতে লইয়া হঠাৎ মুখের ভিতর ফেলিয়া দিয়া গিলিয়া ফেলেন। এই অপরাধ জন্য তাঁহাকে গলদেশ পর্যন্ত মাটিতে পুতিয়া কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবার আদেশ হয়। কিন্তু তাঁহার কাতর ক্রন্দনে নবাব তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া মেহেরালীকে সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়া দিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিলে মেহেরালী তাঁহাকে ১৬ খানি গ্রাম পারিতোষিক দিয়াছিলেন। ঐ গ্রামগুলি অদ্যাপিও তাহার বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন।"

সিরাজালী চৌধুরী মহাশয় আনুমানিক ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রায় অশীতি বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনিই স্বীয় নামানুসারে বেলকুচির সান্নিধ্যে প্রথমে সিরাজগঞ্জ নামক বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। বাল্যে আদরে ও ঐশ্বর্যে লালিত পালিত হইয়া তিনি নবাবী আমলের সর্বপ্রকার আড়ম্বর ও জাকজমকে অভ্যস্ত

হইয়াছিলেন। রাজধানী বেলকুচিতে রাজ্য শাসনোপযোগী সর্বপ্রকার জাকজমক পরিলক্ষিত হইত। হস্তীপৃষ্ঠে হাওদাসহ প্রবেশ জন্য তিনি অতি উচ্চ গগনস্পর্শী তোরণদ্বার নির্মাণ করিয়াছিলেন। নবাব বাদশাহদিগের ন্যায় দরবার গৃহে তিনি উপবেশন করিলে তাঁহার পার্শ্বে দুইজন চামর ও আরাণী আদি লইয়া ব্যজন করিত। বিবিধ আসবাব ও সুগন্ধে তদীয় আমখাসাদি পরিপূর্ণ থাকিত। নানারূপ বিলাসিতা ও আড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি বিষয় কর্ম হইতে উদাসীন ছিলেন না কিংবা কর্তব্য হইতে বিচলিত হয়েন নাই। সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত ও উন্নতি জন্য তিনি মিঃ পুরভি (Mr. Purvi) নামক জনৈক ইংরেজ কর্মচারীকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুরভি সাহেবের চেষ্টায় বড়বাজু পরগণার সাত আনা অংশে বার্ষিক প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আদায় হইত।

নবাব মুরশিদকুলি খাঁর সময় হইতেই মুসলমান শাসনকর্তাগণ বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা হইতে দেশিয় মহাজনকে রক্ষা কল্পে ও দেশিয় ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি জন্য সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। সর্বশেষ নবাব মিরকাসিম বাংলার ব্যবসায়দিগকে রক্ষা করিতে গিয়াই ইংরেজ বণিকগণের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। বাংলার এতাদৃশ অবস্থা সময়ে উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং উন্নতিকল্পেই সিরাজালী চৌধুরী সাহেব সর্বপ্রথমে বিভিন্ন স্থান হইতে বহুদেশীয় মহাজন এবং পশ্চিমাঞ্চল হইতে মাড়ওয়ারী মহাজনদিগকে আনিয়া সিরাজগঞ্জ বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন এবং নামমাত্র করে তাহাদিগকে স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। অধুনাতন দেশের রাজা জমিদারগণ ব্যবসায়িগণকে সহায়তা ও উৎসাহদান করিয়া দেশে ধনাগমের পথ উন্মুক্ত করিতে বিশেষ প্রয়াসী নহেন ; স্থানে স্থানে অধুনা জমিদারগণের উৎসাহে দুই চারিটি মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা ব্যবসায়ের উন্নতি জন্য নহে কেবলমাত্র ভূম্যধিকারিগণের স্বীয় স্বার্থ, বিলাসিতা ও আমোদ প্রমোদ উপভোগাদি নিমিত্ত মাত্র ; তদ্ব্যতীত এই সমস্ত মেলায় দেশের কোনই উপকার হয় না। সিরাজগঞ্জ বন্দর প্রতিষ্ঠার এমত উদ্দেশ্য ছিল না। দেশের শতাধিক বৎসর পূর্বের রাজা জমিদারগণের প্রবৃত্তি ও উচ্চাভিলাষ এই বন্দর প্রতিষ্ঠার প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাতে অস্মদ্দেশীয় জমিদার ও ভূস্বামিগণের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। পরবর্তীকালে সিরাজগঞ্জের চটকলের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ বেরী সাহেব মহোদয় উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই যে সরকারি কার্য ইস্তফা দিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সিরাজালী চৌধুরী সাহেবের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। একমাত্র পত্নী বিবন বিবি ও একমাত্র কন্যা চাঁদ বিবিকে বর্তমান রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। বড়বাজু পরগণার ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের বিবরণে জানিতে পারা যায় এই পরগণার সাত আনা হিস্যায় সিরাজ আলী চৌধুরী সাহেব, ১৫ গণ্ডা হিস্যায় হরিব্রজ রায়, ⁄১০ হিস্যায় শিবনাথ ও রাধানাথ রায়, ৵৫ হিস্যায় কমলরাম ও গোকুলরাম, ৵৫ হিস্যায় জয়দেবের ৭ পুত্র এবং অবশিষ্ট ৵৫ হিস্যায় মামুদ সুফার পুত্র মহম্মদ জিয়ান মালিক ছিলেন। প্রকাশ সিরাজ আলী চৌধুরী সাহেবের "মৃত্যুর পর বিবণ বিবি আপনাকে সিরাজালীর বিধবা পত্নী বলিয়া সাত আনা অংশ দাবি করেন, কিন্তু জানখাতুন প্রকৃত পত্নী স্থির হওয়ায় তিনি তখন ঐ অংশ প্রাপ্ত হন।" ইহারাই সম্ভবত বউবিবি, বড়বিবি নামে অভিহিত হইতেন। কন্যা চাঁদবিবি দশ বৎসর কাল তদীয় সম্পত্তি ভোগ করিয়া গতাসূ হইলে তদীয় দুই কন্যা নুরন্নেছা ও খয়েরন্নেছা বিবি তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েন। সিরাজালী চৌধুরী সাহেব তাঁহাদিগকে আদর করিয়া ললিতা ও বিসখা নামে সম্বোধন করিতেন। মুসলমান জমিদার হইলেও তিনি হিন্দু কর্মচারিবর্গের প্রমোদার্থ দুর্গোৎসব জন্য বিশেষ আয়োজন বা তাহাতে সহায়তা করিতেন। তাঁহার জমিদারি হইতে অনেক ব্রহ্মোত্তর এবং শিবোত্তরাদি প্রদত্ত হইত বলিয়া জানা যায়। কালক্রমে তাঁহার সম্পত্তির অধিকাংশই নানা প্রকারে বিভক্ত হইয়া নানাস্থানে বহুরূপে

হস্তান্তরিত হইয়াছে। উপরোক্ত নুরন্নেছা ও খয়েরন্নেছা বিবিদ্বয় যথাক্রমে ঢাকা ও রংপুরে বিবাহিতা হইয়াছেন। অধুনা সিরাজগঞ্জ টাউনে রঙ্পুর জেলার ভাঙনী গ্রাম নিবাসী খাজে মহম্মদ এনায়েৎ করিম চৌধুরী সাহেবের কাছারি বাড়ি, টাঙ্গাইলের অন্তর্গত করিমাবাদ নিবাসী সৈয়দ আহম্মদ আলি সাহেবের কাছারি বাড়ি এক আনীর কাছারি এবং মৈমনসিংহ জেলার আমবাড়িয়া সন্তোষাদি গ্রামের ভূস্বামিগণ বর্তমানে সাত আনীর জমিদার বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। ২০।২২ বৎসর ধরিয়া ভাঙনের পর বেলকুচির বিখ্যাত জমিদার গৃহ ও তৎসহ তথাকার বিচিত্র কারুকার্য খচিত মসজিদ ও তোড়ণদ্বার সমস্তই ১২৯৯ হইতে ১৩০৪ সালে নদীগর্ভে নিপতিত হইয়াছে। কেবলমাত্র পুলিশ স্টেশন ও পোস্ট অফিস অধুনা দেলুয়া গ্রামে অবস্থিত থাকিয়া প্রাচীন স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।

৭. শিতলাই জমিদার বংশ ঃ

চাটমোহর থানার অন্তর্গত সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেলওয়ের শরৎনগর রেলস্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পূর্বাংশে শিতলাই সমাজ নামক বৃহৎ গ্রামের একটি পাড়া বিশেষ। এখানকার মৈত্র উপাধিক ব্রাহ্মণ জমিদার বংশ এই জেলায় সুপরিচিত। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী মহোদয়ার আমলে বিস্তৃত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গীয় চণ্ডীপ্রসাদ মৈত্র মহাশয় এখানে স্থায়ী হইয়াছিলেন। উপাধি বিশিষ্ট পণ্ডিত না হইলেও বিদ্যানুশীলন জন্য তাঁহার সবিশেষ খ্যাতি ছিল। ১১৭৩ সালে তদীয় পুত্র জগন্নাথের জন্ম হয়, তাহার পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম কালে চণ্ডীপ্রসাদ মানবলীলা সংবরণ করেন। বাল্যাবস্থার সুযোগ পাইয়া শিতলাই-এর নিকটবর্তী মাজগ্রাম নিবাসী তৎকালীন প্রতিপত্তিশালী বিশ্বাস উপাধিক ভূম্যধিকারী বিশ্বনাথ বিশ্বাস মহাশয় জগন্নাথের পিতৃত্যক্ত অনেক ভূসম্পত্তি কৌশলে আত্মসাৎ করেন।

জগন্নাথও পিতার ন্যায় সংস্কৃত শাস্ত্রবিশারদ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং অতিথি সৎকার ও হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখিয়া সাধারণভাবে কালাতিপাত করিতেন। তদীয় সৌম্যমূর্তি ও শান্ত প্রকৃতি দর্শনে অনেকে তাঁহাকে দৈবানুগৃহীত বলিয়া মনে করিত। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ও নানা বিপদাপদ কখনও তাঁহার ললাটে রেখাপাত করিতে পারিত না। তাঁহার লোকনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র নামে দুই পুত্র এবং কমলমণি নামে এক কন্যা জন্মে। পূর্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অর্থ অপেক্ষা স্বীয় পদমর্যাদা রক্ষা অধিক সম্মানজনক মনে করিতেন। উপরোক্ত বিশ্বনাথ বিশ্বাস মহাশয় কিছুতেই জগন্নাথকে বাধ্যানুগত করিতে সমর্থ না হইয়া পরিশেষে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন। যৎকালে জগন্নাথ স্বীয় পুত্রদ্বয় সহ অধ্যয়নে নিরত ছিলেন, তৎকালে স্বীয় মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তদীয় গৃহে দুই জন মুসলমান বাহক দ্বারা খাদ্য সামগ্রী প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণ গৃহে মুসলমান কর্তৃক প্রেরিত খাদ্য দ্রব্য দর্শনে সকলে স্তম্ভিত হইলেন। অভিমানী বালক লোকনাথ শান্ত, উদার হৃদয় ও ক্ষমাশীল পিতা কর্তৃক স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা লাভের সম্ভাবনা নাই জানিয়া নিজে কর্মে ব্রতী হইবেন সংকল্পে কতিপয় দিবস মধ্যে ভগবানের নাম স্মরণপূর্বক মাত্র পরিধেয় বস্ত্র সম্বল লইয়া স্বীয় সৌভাগ্য অন্বেষণে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

লোকনাথ মৈত্র মহাশয় কিয়দ্দিন জন্য নাটোরে অবস্থানপূর্বক কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া তথা হইতে রামপুর বোয়ালিয়া গমন করেন। তথায় ১২৩৪ সালে সার্টিফিকেট গ্রহণ করত মোক্তারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন। স্বীয় অধ্যবসায় ও ক্ষমতা প্রভাবে অত্যল্পকাল মধ্যে মোক্তারি ব্যবসায়ে প্রভূত ধনোপার্জন ও ইংরেজশাসক কর্তৃপক্ষগণ সহ বিশেষ সদ্ভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তৎ সহায়ে অনেক পৈত্রিক সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করেন ও পিতার আশীর্বাদভাজন হয়েন। ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ি থাকিয়া সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং লোকনাথ রামপুরায় ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেন। তিনি অনেক জমিদারগণের বেবন্দোবস্তি মহালসমূহ নিজ হস্তে লইয়া সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। পুঁঠিয়া নসীপুর প্রভৃতি স্থানের

জমিদারগণের তিনি পরামর্শদাতা ছিলেন। আদালত হইতে স্বনামী বেনামীতে অনেক নিলাম খরিদ করিয়া কালক্রমে তিনি অনেক স্থাবর সম্পত্তির মালিক ও পত্তনীদার হইয়া উঠেন। ১২৪০ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নী বিমলাসুন্দরীর মৃত্যু হইলে, উপরোক্ত বিশ্বনাথ বিশ্বাসমহাশয় উদীয়মান লোকনাথের সহ স্বীয় কন্যা সোনামুণি দেবীর বিবাহ দিয়া পূর্ববিবাদ মীমাংসা করত সন্ধি সংস্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র চন্দ্রনাথ নানা কারণে বাধ্য হইয়া লোকনাথের নিকট যাবতীয় সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়েন। তখন তেজস্বী, উচ্চাভিমানী ও উদ্যমশীল পুরুষ লোকনাথের বাল্য প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পের সিদ্ধিলাভ ঘটে। ইহাই তদীয় জীবনের প্রধান শিক্ষা।

কৌলীন্যপ্রথায় আস্থাবান লোকনাথ কুলীন ভাঙিয়া কাপ করিতে পারিলে গৌরবানুভব করিতেন। কালিয়াহরিপুর নিবাসী চন্দ্রশেখর সান্যালের সহিত স্বীয় কন্যা রাজরাজেশ্বরী দেবীর বিবাহ ব্যাপারে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের যাবতীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে যথাযোগ্য সম্মান এবং তদুপলক্ষে প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে "স্বর্ণ কমল" উপাধিলাভ করিয়াছিলেন।

সৎকীর্তি মধ্যে রাজশাহীতে "লোকনাথ স্কুল" নাম অবৈতনিক মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় এবং কাশীর রাজরাজেশ্বরী সত্র প্রতিষ্ঠা লোকনাথ মহাশয়ের সর্বপ্রধান কীর্তি। ১২৫৫ সালে তদীয় একমাত্র কন্যা রাজরাজেশ্বরী দেবীর মৃত্যু হইলে, তদীয় স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ তথায় তন্নামানুসারে এক ধাতু মূর্তি প্রতিষ্ঠাপূর্বক প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সম্পত্তি তদুদ্দেশ্যে দান করেন। অদ্যাপি তাহা হইতে কাশীতে উক্ত বিগ্রহের দৈনিক সেবা এবং ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র সেবাদি পরিচালিত হইতেছে। বাল্যে কষ্টে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বীয় প্রতিভায় অর্থোপার্জন করিয়া লোকনাথ স্বীয় নামানুসারে কর্মক্ষেত্র রাজশাহীতে দরিদ্র শিক্ষার্থীগণের সুবিধার্থে ১২৫৪ সালে একটি যে অবৈতনিক মধ্য ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন অধুনা ১৩২৭ সালে তাহা পুনরায় এই স্টেটের এককালীন দান সাত সহস্র টাকা অর্থ সাহায্যে উচ্চ ইংরাজি স্কুলে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে স্কুলটি স্বাধীন এবং বৈতনিক হইলেও শিতলাই স্টেট হইতে পূর্বপ্রথামত অদ্যাপি বার্ষিক ১২০০ বার শত পরিমাণ সাহায্য প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম ও শিক্ষা ব্যতীত সাধারণ জনহিতকর কার্যেও তিনি মনোযোগী ছিলেন। স্বীয় এলাকা রাজশাহীর তাহেরপুর অঞ্চলে বিলময় প্রদেশে জলপথে নৌকাদি চলাচলের সুবিধার্থ যে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি উক্ত অঞ্চলে "লোকনাথের দাঁড়া" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। তদীয় নানারূপ লোকহিতসাধন কার্য নিমিত্ত ১৮৫৪ গভর্নমেন্ট তাঁহাকে "রায়বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

১২৬১ সালের ১৯ কার্তিক লোকনাথের স্বর্গারোহণের পর তদীয় কনিষ্ঠা পত্নী দুর্গাসুন্দরী স্বামীর উইলের মর্মানুসারে চন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়কে দত্তক গ্রহণ করেন। তিনি শৌর্য বীর্য সম্পন্ন সুপুরুষ ছিলেন। অশ্বারোহণ ও শিকারপ্রিয়তা হেতু তিনি তাড়াসের জমিদার বনওয়ারী লাল রায় মহাশয় ও নাটোরের জমিদার মুন্সিমিঞা সাহেবের সহিত সবিশেষ পরিচিত ও সৌহার্দ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। চন্দ্রনাথ অতি তেজস্বী, কর্মঠ ও মল্লক্রীড়াপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী স্টেটের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলে কিয়দ্দিন মধ্যে রাজশাহীর জজ সাহেব বাহাদুরের আদেশে Mr. Macdonald নামক জনৈক ইংরেজ সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েন। সালিখা নিবাসী গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও কিয়দ্দিনের জন্য এই স্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৫ সালে জ্ঞানদাসুন্দরী নিজ হাতে জমিদারি গ্রহণ করিয়া প্রথমে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র নামক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার লোকান্তর হইলে, পুনরায় ১২৯৮ সালে স্টেটের বর্তমান মালিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় বল্লভপুরের গোস্বামী বংশ হইতে দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হন। ১৩১৩ সাল পর্যন্ত

স্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন থাকিয়া তৎপর যোগেন্দ্রবাবু স্বয়ং কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের গোস্বামী পরিবারে দ্বারপরিগ্রহের পর ইহার সময়ে শিতলাই গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক পাবনা শহরে (অধুনা) পদ্মাতীরে "শিতলাই হাউস" নামক সুদৃশ্য বাসভবন নির্মিত হইলেও, স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ নামক কুলবিগ্রহের দৈনিক সেবাপূজা ও অতিথি সৎকারাদির সুবন্দোবস্ত আছে। যোগেন্দ্রবাবু স্বধর্মপরায়ণ, সুধীর ও পাবনার যাবতীয় সদানুষ্ঠানে উদ্যোগী ও উৎসাহশীল।

৮. সলপ জমিদার বংশ ঃ

সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল লাইনের সলপ স্টেশন হইতে গ্রাম প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার সান্যাল উপাধিক ব্রাহ্মণ জমিদারগণ এই জেলায় প্রতিপত্তিশালী ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিচিত। ইহাদের পূর্ব নিবাস রাজশাহী জেলার নাটোরের অধীন উপিলসর গ্রাম। তথাকার বারেন্দ্র কুলিন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব নরনারায়ণ এই জেলার হাণ্ডিয়ালের নিকটবর্তী মাদারবারিয়া ঠাকুরদের বাড়িতে বিবাহ করিয়া কাপত্ব প্রাপ্ত হয়েন। নরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ বর্তমান সলপের নিকটবর্তী শ্রীবাড়ি গ্রামে বাস করেন। তাঁহার বাসস্থান অদ্যাপি প্রেমের ভিটা নামে পরিচিত। প্রেমনারায়ণের পুত্রত্রয় (১) রঘুনাথ, (২) কালীচরণ, (৩) জয়গোপালের বংশধর ও সন্তান সন্ততিগণ কাল সহকারে যথাক্রমে গোবিন্দপুর, সলপ ও মাটিনা নামক গ্রামত্রয়ে বাস করিতেছেন এবং সাধারণে সলপের সান্যাল বংশ বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকেন।

উপরোক্ত কালীচরণ সান্যাল মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী মহোদয়ার সময়ে নাটোর রাজসরকারে অতি বিশ্বস্ততার সহিত কার্য করিয়া তাহার নিকট হইতে পুত্রবৎ স্নেহ ও জয়কালী বিগ্রহ এবং তাহার সেবা পরিচালনার্থ কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ১২৮৫ সালে জয়কালী বিগ্রহ সলপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১২০৫ সালে উক্ত বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্মিত হয়। স্বর্গীয়া রাণী ভবানী প্রদত্ত ব্রহ্মাত্র সম্পত্তি অদ্যাপি কালীচরণের বংশধরগণ সম্ভোগ করিতেছেন।

কালীচরণের পুত্রদ্বয় গঙ্গাগোবিন্দ ও গৌরীশঙ্কর হইতে সলপের ছোট ও বড় তরফের উদ্ভব হয়। তাহাদের সন্তানগণই অধুনা সলপের জমিদার বংশ বলিয়া পরিচিত। অধিকাংশ স্থাবর সম্পত্তি কালীচরণের জীবদ্দশায় তাহার পৌত্রগণ কর্তৃক অর্জিত হয়। তাহাদের মধ্যে বড় তরফের কাশীনাথ, গোপীনাথ ও কৃপানাথ এবং ছোট তরফের জয়শঙ্কর সান্যাল মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাশীনাথ ধর্মপরায়ণ ছিলেন জন্য পূজার্চনাতেই অধিকাংশ সময় ক্ষেপন করিতেন। গোপীনাথ বিষয় কার্যাদি তত্ত্বাবধান করিতেন এবং তাহার প্রযত্নে অধিকাংশ সম্পত্তি অর্জিত হয় জন্য সমস্ত সম্পত্তির একচতুর্থাংশ তিনি প্রাপ্ত হয়েন। জেলা মৈমনসিংহের অধীনস্থ মধুগড়ের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সময়ে গোপীনাথ সান্যাল মহাশয় নাটোর রাজবংশের পক্ষে সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া উক্ত বিদ্রোহ দমন করেন।

সলপের জমিদার বংশে কৃপানাথের পুত্র **বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল** মহাশয় জনৈক প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন তাহার ন্যায় ধীমান ও কার্যক্ষম ব্যক্তি এই বংশে অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। প্রাচীনকালের লোক হইলেও তিনি আধুনিক কালোপযোগী মনস্বিতায় ভূষিত ছিলেন। তাহার সময়ে সলপের চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে নীলকরদিগের অত্যাচার আরম্ভ হয়। বৈকুণ্ঠনাথ নিকটবর্তী ৫।৭টি নীলকুঠি ভগ্ন ও ভূমিসাৎ করিয়া মিঃ কক্‌বরণ (Mr. Cockborn) নামক নীলকরকে তাহার কারবার বিক্রয় করিয়া স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। উৎপীড়িত প্রজাগণকে রক্ষা করিতে গিয়া মনোমোহন সান্যালের কারাদণ্ড হয় ও কারাগৃহেই তাহার জীবনান্ত হয়। এই সময়ে জমিদারির সুবন্দোবস্ত জন্য বৈকুণ্ঠনাথ মিঃ ডেবিড ফেগু (Mr. David Fago) নামক জনৈক ইংরেজকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন এবং তাহার নিকট

সবিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন। বৈকুণ্ঠনাথের জীবদ্দশাতেই সলপ জমিদার বংশের অন্তর্বিবাদের সূত্রপাত আরম্ভ হয়। তিনি তাহার পূর্বাভাস বুঝিতে পারিয়া ১২৮৩ সাল হইতে উপর্যুপরি মিঃ সেভি (Mr. Savi) ও মিঃ বেল চেম্বার্স (Mr. Belchembers) নামক শ্বেতাঙ্গদ্বয়কে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন ; কিন্তু তাহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তদীয় বার্ধক্য ও তাহার ভ্রাতষ্পুত্রগণের উদীয়মান অবস্থাতেই সলপ জমিদারির অবনতি ঘটে। বৈকুণ্ঠনাথের সময়ে মিঃ জন নিকোলস (Mr. John Nicholas) নামক জনৈক ইংরেজ কিয়দ্দিনের জন্য সলপে শিক্ষকতা করেন। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সান্যাল মহাশয়ের প্রযত্নে সলপে একটি মধ্য ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

জয়শঙ্কর সান্যাল মহাশয় ছোট তরফে অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন ; তিনি অধিকাংশ সময় রাজশাহীতে অবস্থান করিতেন। তিনি পুঁঠিয়া রাজের শঙ্করপুর পরগণার অংশ খরিদ করেন। ইহারই প্রযত্নে ফুলঝোর নদী তীরস্থ বাচিনা নামক স্থান হইতে সলপ পর্যন্ত যে একটি খাল কাটা হয় তাহাই ঘাটিনা খাল নামে পরিচিত। ইনি অতি প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার বলিয়া পরিচিত হইতেন। প্রবাদ তাহার অনেক মহিষ ছিল, তাহারা চতুষ্পার্শ্ববর্তী লোকের নানা অত্যাচার করিত। তৎকালে এতদঞ্চলের নিষ্কর্মা লোকদিগকে জয়শঙ্কর সান্যালের মহিষ বলিয়া উপহাস করিত।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার সান্যাল মহাশয়ের সহকারিতায় শ্রীদক্ষিণারঞ্জন সান্যাল মহাশয় সলপে একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহাই কালে ১৯০৫ অব্দে উচ্চ ইংরাজি স্কুলে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ইহাদের উদ্যোগে সলপে পল্লী হিতসাধন সভাসমিতি সংস্থাপন, হাটবাজার মেলাদির অনুষ্ঠান তথা জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা হয়। প্রজা বিদ্রোহকালে এই জমিদারবংশ বিশেষভাবে গভর্নমেন্টকে সহায়তা করেন। অধুনা ইহারা পূর্বের ন্যায় সঙ্গতিপন্ন এবং সচ্ছল অবস্থাপন্ন না থাকিলেও, পূর্বপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত জয়কালী, বুড়াশিব ও রাধাকৃষ্ণজিউ প্রভৃতি বিগ্রহের সেবা পূজাদি রীতিমত পরিচালনে এবং আতিথেয়তা প্রভৃতি বজায় রাখিতে বিশেষ যত্নবান।

এই জমিদার বংশের গোপীনাথ সান্যাল ও গৌরমোহন মৈত্র মহাশয়দিগের জমিদারি আমলের কঠোর শাসন জন্য এই বংশকে অনেকে জবরদস্তি জমিদার বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বংশীয় অনেকেই যে শারীরিক শক্তিশালী, বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন, তাহা ইহাদের কাহার কাহার উপরোক্ত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ ও ১২৮০ সালের প্রজাবিদ্রোহে লিপ্ত থাকাতেই প্রতীয়মান হইতেছে। ইহা এই বংশীয়দিগের পূর্বাধিকারিগণের শৌর্য, বীর্য ও বীরত্বের পরিচায়ক তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাদের পূর্ববর্তী অনেকে অসদুপায়ে অর্থোর্জন করিয়াছেন এবং কাহারও কাহারও দস্যুতা বা তৎসংস্রব থাকার কিম্বদন্তী আছে। Calcutta Review অবলম্বনে রাজশাহী জেলার ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন—"Several families in Salap and other villages in Rajshahi accumulated wealth by *Thangidari.*"

অর্থাৎ রাজশাহীর সলপ ও অন্যান্য গ্রামের অনেক পরিবার থালিদারী করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। *(রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)*

যে সময়ে ইহাদের প্রধান অভ্যুদয় কাল, তখন দেশে মুসলমান রাজত্বের অবসান এবং ইংরেজ অধিকারের প্রথমাবস্থায় অরাজকতা বর্তমান ছিল। দেশে সুশাসন ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তৎকালে স্থানে স্থানে বাঙালির বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ ও সুবিধা ছিল। তাহারা সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করিতে গিয়া কেহ কেহ কুপথগামী হইলে, তাহা জাতীয় চরিত্রের কলঙ্করূপে গণ্য হইতে পারে না, তৎসমুদয় ব্যক্তিগত দোষ মধ্যে পরিগণিত। অস্মদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের পূর্বাধিকারিগণের মধ্যে কেহ সাহস ও অকুতোভয়তা প্রদর্শন করিতে গিয়া ভ্রমবশত বিপথগামী হইলেও তাহাদের সৎসাহসাদি অধুনাতন চা বিস্কুট ভোজী জীর্ণতনু

বিশিষ্ট ভদ্রপদবাচ্য রুগ্নদেহির নিকট আবিলতাপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু একেবারে অগৌরবের বিষয় নহে। কিংবা প্রচলিত জনশ্রুতিকে একেবারে গোপন করিলে সত্যের অপলাপ হয়। এথাকার সান্যাল পরিবারের অনেকের বিশাল বপু, দীর্ঘজীবন, অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য এবং পরিবার বিশেষে বহু সন্তান সন্ততি দৃষ্টে সততই আনন্দানুভব হয় এবং পূর্বাবস্থায় কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনাতন ক্ষীণ দেহধারী ও অজীর্ণ রোগগ্রস্থ বংশধরগণ পূর্বের জনশ্রুতিতে ব্যথিত হইলেও সত্য কখন গোপন থাকিতে পারে না বা রাখা উচিত নহে। পূর্ব কাহিনী অনেক সময় অপ্রিয় হইলেও তাহাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত থাকে; কালক্রমে অবস্থান্তরে পূর্ব শৌর্যবীর্য অবজ্ঞেয় নহে।

সলপের সান্যাল ও স্থলের পাকড়াশি বংশ যথাক্রমে বারেন্দ্র ও রাঢ়ী শ্রেণীর বিভিন্ন সমাজস্থ ব্রাহ্মণ পরিবার হইলেও, ইহাদের মধ্যে বহুদিন হইতে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ বর্তমান থাকা জানা যায়। ইহা অস্মদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবার ও বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসার নিদর্শন। এই সলপ জমিদার বংশে আধুনিক কালে দীনেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় জনৈক সঙ্গীতজ্ঞ ও গীত বাদ্যাদিতে বিশারদ ছিলেন। এই বংশীয় অনেকেই শক্তি উপাসক এবং পূজার্চনাদিতে সবিশেষ নিষ্ঠাবান।

৯. স্থল পাকড়াশি বংশ ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় কুড়ি মাইল দক্ষিণে এবং স্থলচর নামক স্টিমার স্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান স্থল নামক পল্লীর পাকড়াশি উপাধিক রাঢ়ী শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ ভূম্যাধিকারিগণ এই জেলার ভূস্বামিগণ মধ্যে সুপরিচিত। যশোহর জেলার অধীন সোরশুনা নিবাসী গৌরীদাস তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় হরিদেব ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাদের আদিপুরুষ। তিনি কাশ্যপ গোত্রীয় সিদ্ধ শ্রোত্রীয় ছিলেন। গৌরীদাসের পুত্রত্রয় (১) হরিদেব, (২) রুদ্রদেব, (৩) রামদেব মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরিদেব জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পূর্বে জ্যোতিষগণের বিশেষ সমাদর ছিল। তাঁহারা হিন্দু রাজা, জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের নিকট হইতে বাৎসরিক ও মাসিক বৃত্তিলাভ করিতেন।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর আমলে নাটোররাজ রাজা রমাকান্ত স্বীয় অপরিণামদর্শীতাহেতু দেওয়ান দয়ারাম রায়ের চক্রান্তে রাজ্যচ্যুত হইয়া যৎকালে মুর্শিদাবাদে ইতিহাস বিশ্রুত জগৎশেঠের আলয়ে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন একদা হরিদেব ভট্টাচার্য মহাশয় মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হয়েন। রাজা বাহাদুর হরিদেব জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী জানিয়া তাঁহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তিনি গণনা দ্বারা জানিতে পারেন অচিরাৎ মহারাজের শুভগ্রহের উদয় হইয়া তিনি স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবেন। রাজা তৎশ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কিয়দ্দিন জন্য মুর্শিদাবাদে অবস্থান জন্য অনুরোধ করেন এবং গণনা সত্য হইলে সবিশেষ পুরস্কৃত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়েন।

অল্পদিন মধ্যেই জগৎশেঠের কৃতকার্যে নবাব দরবারে রাজা রামকান্ত সর্ববিষয়ে নিরপরাধ সাব্যস্ত হইয়া স্বরাজ্য লাভ করেন। রাজধানী হইতে প্রত্যাবর্তন কালে হরিদেব ভট্টাচার্যকে লইয়া নাটোরে আগমন করেন এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত পাবনা জেলাস্থ নিম্নলিখিত দ্বাদশটি মৌজা নাম মাত্র করে মৌরসী তালুক স্বত্বে প্রদান করেন। (১) স্থল, (২) গুয়ারেখী, (৩) দিঘীবাড়ি, (৪) পাথাইলকান্দি, (৫) কোণাবাড়ি, (৬) মিশ্রীগাতি, (৭) কোণাবাড়িশ্রী, (৮) বারবয়লা, (৯) গোবিন্দবাটি, (১০) থরপোতজিয়া, (১১) বেতিল সাতআনি এবং (১২) অর্জুন দিয়াড়।

স্থলে অবস্থান ঃ

নাটোর হইতে দুইজন পদাতিক সহ হরিদেব স্বীয় তালুকের অনুসন্ধান লইয়া তথায়

অবস্থান করিতে থাকেন। কালক্রমে তাঁহার সদ্‌গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া প্রজাগণ স্বত প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বর্তমান স্থলের নিকটবর্তী থল্‌ বা স্থল নামক মৌজায় ভদ্রাসন বাটি নির্মাণ পূর্বক স্থায়ীভাবে বাস করিতে অনুরোধ করেন এবং তদবধি হরিদেব তথায় বাস করিতে থাকেন। উক্ত গ্রাম কালক্রমে নদীগর্ভে পতিত হইলে তদ্বংশীয়গণ যিনি যে স্থানে গমন করিয়াছেন, তৎসমুদায় স্থানই থল বা স্থল সংযুক্ত নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপে স্থল নওহাটা, স্থল গোয়াইলবাড়ি প্রভৃতি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। হরিদেব রাজা জমিদারদিগের ন্যায় সবিশেষ সমৃদ্ধ না হইলেও উপরোক্ত মৌজাদির আয় দ্বারা স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। তিনি নিজ বাটিতে রাধাবল্লভ জিউ নামে যে ধাতুময়ী বিগ্রহমূর্তি, শিব, নারায়ণ ও গণেশ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাহা অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ কর্তৃক পূজিত হইতেছে।

সন্তান সন্ততি—পিতৃবিয়োগের ৫।৬ বৎসর মধ্যেই পুত্রগণ একান্নবর্তী থাকা অসুবিধাজনক বোধে পৃথকান্ন হয়েন। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র জোষ্ঠোত্তরসহ তালুকসমূহের এক চতুর্থাংশ এবং অবশিষ্ট চারি ভ্রাতায় বার আনা অংশ গ্রহণ করত স্বতন্ত্র বাসবাটি নির্মাণপূর্বক পৃথক পৃথক ভাবে বাস করিতে থাকেন। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের বাড়ি **বড় বাড়ি**, দ্বিতীয় রাজারামের বাড়ি **দক্ষিণ বাড়ি**, তৃতীয় বীরভদ্রের বাড়ি **মাঝার বাড়ি**, চতুর্থ মণিভদ্রের বাড়ি **নয়া বাড়ি** এবং কনিষ্ঠ তারাচাঁদের বাড়ি **উত্তর বাড়ি** নামে খ্যাত হয়। পঞ্চ সহোদর মধ্যে **দক্ষিণ বাড়ির** রাজারামের পৌত্র **রাম রতন** ভট্টাচার্য ও কনিষ্ঠ তারাচাঁদের পুত্র **শোভারাম** ভট্টাচার্য সবিশেষে বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও কার্যকুশল ছিলেন। এই দুই মহাত্মাই পাকড়াশি ও ভট্টাচার্য বংশের অভ্যুদয়ের কারণ। ইহাদের দ্বারা ক্রমে দক্ষিণ বাড়ি ও উত্তর বাড়ির সবিশেষ উন্নতি হয়। রামরতন ভট্টাচার্য মহাশয় নাটোর রাজধানীত অবস্থান করিতেন এবং শোভারাম ভট্টাচার্য মহাশয় জগৎশেঠের ভ্রাতা কলিকাতা নিবাসী কৃষ্ণমোহন শেঠের বাটিতে অতি সুনামের সহিত কার্য করিয়া বহু ধন সম্পত্তি অর্জন করেন।

পাকড়াশি আখ্যা—শোভারামের পুত্রদ্বয় ব্রজসুন্দর ও রামকোমল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপাধি বোধে জমিদারি শাসনসংরক্ষণ অসুবিধা বিবেচনায় তিনি স্বীয় পর্কটী গাঁই অনুসারে পাকড়াশি আখ্যা গ্রহণ করেন, কিন্তু ইঁহাদের অন্যান্য শরিক ও জ্ঞাতিবর্গ ভট্টাচার্য নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

হরিদেবের দ্বিতীয় পুত্র রাজারামের পৌত্র রামরতন ভট্টাচার্য হইতে ওহাটার ভট্টাচার্য পরিবারের উৎপত্তি হয়। এই বংশীয় তারকচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য ও নন্দলাল ভট্টাচার্য প্রভৃতি এক সময়ে সমুন্নত ভূস্বামী বলিয়া পরিচিত হইতেন। ইহারা সকলেই স্থলের পাকড়াশিগণের জ্ঞাতি ও শরিক।

শোভারামের পুত্রদ্বয় মধ্যে ব্রজসুন্দর পাবনা জেলার ডিহি সরাতৈলের মালিক পরাক্রান্ত সলাপের সান্যাল ও বগুড়া জেলার ডিহি আদগোলার মালিক লক্ষ্মীকোলার কাজিবংশকে শাসনাধীনে আনিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। শোভারামের জীবিতকালেই ব্রজসুন্দর ও রামকোমল পৃথকান্ন হয়েন। বিষয় সম্পত্তি সমস্তই ব্রজসুন্দরের কৃতিত্বে অর্জিত ও সুশাসিত হয়, তজ্জন্য শোভারাম জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজসুন্দরকে সমস্ত সম্পত্তি দুই আনা অংশ অধিক প্রদান করত তাঁহাকে ।।।৵ নয় আনা এবং রামকোমলকে সাত আনা অংশ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন ও তাহা হইতে পাকড়াশি বংশে নয় আনী ও সাত আনীর উদ্ভব হইয়াছে। শোভারাম নিজবাটিতে যে গোবিন্দদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ উক্ত বিগ্রহের সেবা পরিচালন করিতেছেন। ব্রজসুন্দর পত্নী দয়াময়ী দেবী প্রকৃতই দয়াময়ী ছিলেন। ব্রজসুন্দর সলপের সান্যাল বংশীয় গোপীনাথ সান্যাল মহাশয়ের নামে লক্ষাধিক পরিমাণ টাকার দাবিতে যে ডিক্রি হাসিল করেন, দয়াময়ী দেবীর অনুরোধক্রমে ব্রজসুন্দর ও রামকোমল এই দাবি একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন। এরূপ মহাদৃষ্টান্ত সহসা পরিলক্ষিত হয় না।

দয়ামযী দেবীর জীবিতকালেই স্থলে তদীয় পুত্র হরচন্দ্র পাকড়াশি মহাশয়ের মাতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ প্রস্তর নির্মিত যে দয়াময়ী কালিকাদেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার সেবা পূজা অদ্যাপি সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। উত্তরকালে রামকোমল পৌত্রী গিরিবালা দেবী মাতৃ নামে প্রস্তরময়ী কালিকামূর্তি জয়কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবত্র সম্পত্তি দ্বারা উক্ত বিগ্রহের দৈনিক সেবা পূজার সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

শোভারমের বংশই সমধিক উন্নতিশীল। এই বংশে যে সমস্ত সৎক্রিয়াশীল ও স্বধর্মনিরত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় **দুর্গানাথ পাকড়াশি** ও স্বর্গীয় সারদাপ্রসাদ পাকড়াশি মহাশয়দ্বয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রত্যেকেই সবিশেষ মাতৃভক্ত ও মাতৃ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় দানসাগর ও রূপার ষোড়যাদি এবং বিবাহাদি ব্যাপারে বহুবার বিধান করত কুলাচার্যগণকে আহ্বান করিয়া ইহারা সামাজিক ক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। সারদাবাবুর মাতৃ শ্রাদ্ধে সুবর্ণ সুখাসন, হস্তী, গো অশ্বাদি দান এবং কাশী, মিথিলা ও বঙ্গের নানা স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মিলন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রযত্নে পৈত্রিক সম্পত্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। অতিথিসৎকার ও পারিবারিক ক্রিয়া উপলক্ষে এই বংশীয় অনেকেই আপামরসাধারণের পরিচর্যা ও ভোজন ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। পুরুষের ন্যায় এই বংশীয় অনেক মহিলাগণও সদনুষ্ঠান প্রয়াসী। পাকড়াশি বংশে অনেক সুশিক্ষিত এবং কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বংশীয় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পাকড়াশি মহাশয় গীতবাদ্যাদি সঙ্গীত বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী।

এই বংশীয় অনেকেই শৈব শাক্তমতের উপাসক হইলেও ইহারা পূর্বাপর বিষ্ণুভক্ত। হরিদেব কর্তৃক রাধাবল্লভ বিগ্রহ এবং শোভারাম কর্তৃক গোবিন্দদেব মূর্তি স্থাপন হইতে বর্তমানে স্থলে হরিভক্তি প্রদায়নী সভা বৈষ্ণব সম্মিলনী আদি প্রতিষ্ঠা, বার্ষিক হরিবাসরাদির অনুষ্ঠান এবং বিগত কয়েক বৎসর হইল স্থলের বাবুগণের উৎসাহে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের মুসলমানগণ কর্তৃক হরি সংকীর্তনাদির প্রবর্তন সমস্তই পাকড়াশি বংশের বৈষ্ণব ধর্মে সবিশেষ নিষ্ঠার পরিচায়ক। এই পরিবারস্থ অনেকে অধুনাতন ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অনেকেই নানারূপ বৈতনিক ও অবৈতনিক রাজকীয় কার্যে লিপ্ত ও নানারূপে দেশবিদেশে সম্মানিত ; ইহাদের অধিকাংশই স্বধর্মনিষ্ঠ ও সদাচারী এবং দেবদ্বিজে ও পিতৃমাতৃ গুরুজনে ভক্তি পরায়ণ ; পাকড়াশি ও ভট্টাচার্য বংশের ইহা বিশেষত্ব। পাকড়াশি বংশে জ্যেষ্ঠপুত্রের জ্যেষ্ঠোত্তর প্রাপ্তি আদিপুরুষ হরিদেব পুত্র রামচন্দ্রের আমল হইতেই বর্তমান আছে। শোভারামের সময় হইতেই পিতা বর্তমানে পুত্রগণ মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ বণ্টনের আয়োজন পরিলক্ষিত হইতেছে।

ইহারা পুত্রকন্যার বিবাহে অনেকানেক কুলকার্য করিয়া স্বগ্রামে মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায়াদি অনেক কুলিন ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছেন। স্বকীয় পারিবারিক ব্যাপারাদিতে নানারূপ ব্যয়, স্বগ্রাম ও স্বীয় এলাকায় স্কুল চতুষ্পাঠী মোক্তবাদির প্রতিষ্ঠা ও তাহার সাময়িক উন্নতি এবং সাধারণ কার্যাদিতে চাঁদাদি ও সাহায্য দান ব্যতীত ইহাদের প্রযত্নে জেলা মধ্যে সর্বসাধারণের হিতকর কোন কার্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এই বংশীয় কেহ কেহ অনেককে অত্যধিক টাকার ঋণ হইতে মুক্তিপ্রদান ও প্রদানে সহায়তা করিয়া যে সহৃদয়তার পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্তিগত। জনসাধারণে তাহাতে কিছুমাত্র উপকৃত হয় নাই। স্থলের পাকড়াশি বংশের ভূসম্পত্তি অধুনা নওহাটা ভট্টাচার্য পরিবারের স্থাবর সম্পত্তি হইতে বেশি এবং পাকড়াশিগণ বড় জমিদার বলিয়া পরিচিত হইলেও, স্থলের অনেকেই অধমর্ণ এবং নওহাটার ভট্টাচার্যদিগের মধ্যে অনেকেই উত্তমর্ণ ও কয়েকজন ধনাঢ্য কুশীদজীবী মহাজন।

(খ) ভিন্ন জেলাবাসী প্রধান প্রধান জমিদারগণের তালিকা

জমিদার	মালিকের নাম	সাকিন	এই জেলায় কাছারি
১) ঠাকুর	শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দিং	কলিকাতা জোড়াসাঁকো	শাহজাদপুর, বাগাবাড়ি, জামিরতা, উমরপুর।
২) বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিং	ঢাকা মুরাপাড়া	শাহজাদপুর, কৈটোলা, কৈজুরি, আটঘরিয়া।
৩) করোটিয়া	ওয়াজিদ্‌আলী খান্‌পনি ওরফে চাঁদ মিঞা	মৈমনসিংহ করোটিয়া	শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ ও আটঘরিয়া
৪) নাটোর	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়	রাজশাহী	চাটমোহর
	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়	নাটোর	সুজানগর
৫) দিঘাপাতিয়া	শ্রীপ্রমদানাথ রায়বাহাদুর	রাজশাহী দিঘাপাতিয়া	সিলিমপুর, সাঁড়া, করঞ্জা, ভুলবারিয়া।
৬) বলিহার	শ্রীশরদিন্দুনাথ রায়	রাজশাহী	খিদিরপুর।
৭) কাশিমবাজার	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী		মালিফা
৮) লালগোলা	যোগেন্দ্রনাথ রায়	লালগোলা	পাবনা পত্তনী
৯) নবাবসাহেব	নবাব খাজে হবিবুল্যা	ঢাকা	রায়দৌলতপুর
১০) নড়াইল	কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর	যশোহর	গড়গড়ি
১১) নলডাঙা	প্রমথভূষণ দেবরায়	যশোহর	কামালপুর
১২) ছয়আনি	হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	টাঙ্গাইল	সিরাজগঞ্জ
		অলোয়া	কাজিপুর
১৩) বড় পাঁচ আনি	জানকীনাথ রায়চৌধুরী	সন্তোষ টাঙ্গাইল	নাটুয়ারপাড়া
১৪) ছোট পাঁচ আনি	প্রমথনাথ রায়চৌধুরী	সন্তোষ টাঙ্গাইল	সিরাজগঞ্জ
১৫) আমবারিয়া	হেরেম্বনাথ চৌধুরী	আমবারিয়া	সিরাজগঞ্জ
১৬) ধরাইল	বিনোদবিহারী চৌধুরী দিং	ধরাইল	শ্রীপুর
১৭) সাহা চৌধুরী	সতীশচন্দ্র চৌধুরী দিং	নাগপুর	খোকসাবাড়ি

তথ্যসূত্র

"The Agrarian Roots of 1873 in Pabna are very important, because it led to the exhaustive discuss on of the tenants right which culminated in the "Rayots Charter" the Bengal Tenancy Act. 1885" Imperial Gazetteer E. B. Assam P 285

"These Pabna Rent Disturbances of 1873 were really the origin of the discussion and action which eventually led to the emetment of the Bengal Tenancy Act of 1885." Bengal under the Lieut. Governors by C. E. Buckland P. 548

In Pabna Districxt, a very large number of cases were instituted in the Munsif Court, but there have been no other manifestation of ill will between the parties. The rayats, it was said, found the registration of Estates and Tenures under the Road Cess Act, a very great protection and almost always secured themselves with a copy of zamindar's return as soon as it was filed and refused to pay anything whatever beyond the rental there in stated. The Act in consequences became very popular among the cultivating classes.

Bengal Administration Report 1872/78.

[তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত]

পাবনা জেলার ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

পাবনা জেলার ইতিহাস।

চতুর্থ খণ্ড



শ্রীরাধারমণ সাহা বি, এল,

প্রণীত ও প্রকাশিত

পাবনা।

১৩৩৩

পাবনা গোবিন্দ প্রেসে
শ্রীতারাপদ চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ—১০০০—১৩৩৩ সাল।

মূল্য—এক টাকা মাত্র

উপক্রমণিকা

জেলার কৃষি ও উৎপন্ন দ্রব্য, শিল্প ও বাণিজ্য এবং শিক্ষাদি বিষয় সম্বলিত তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত জেলার চতুর্থ খণ্ড ইতিহাস প্রকাশিত হইল। পাবনার স্থানীয় দুইটি* প্রেসে মুদ্রিত জন্য এই খণ্ডের মুদ্রাঙ্কন বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে। ইহাতে মফঃস্বল প্রেসের মুদ্রাঙ্কন শিল্পের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং চেষ্টা করিলে পাবনার মুদ্রাযন্ত্রেও যে পুস্তক ছাপাকার্য চলিতে পারে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। যথাসাধ্য চেষ্টা সত্বেও পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে, আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্বক তজ্জন্য পুস্তকের উক্ত ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের তালিকা এবং বিবরণাদি একান্ত নীরস হইলেও, অনেক সময় তৎসমুদয় আবশ্যক বোধে উহা কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবেই লিখিত হইল। ধান ও পাট এই জেলার সর্বপ্রধান কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য। পাটের প্রসাদে অনেকে প্রতিপালিত হয় ; তজ্জন্য ইহার বিবরণ কিঞ্চিৎ বিস্তারিত রূপেই আলোচিত এবং পাবনার স্থানীয় পত্রিকা 'সুরাজ' হইতে ইহার চাষ আবাদের লাভ লোকসান সম্বন্ধে অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্বপ্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের একটি তালিকাও পরিশেষে প্রদত্ত হইয়াছে। বাগানজাত উৎপন্ন দ্রব্যগুলি পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। জলজাত দ্রব্য মধ্যে মাছ এই জেলার একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কেবলমাত্র মৎস্য চালানের মাশুল রূপে সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল লাইনের মোহনপুর স্টেশন হইতে বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা আদায় হইয়া থাকে। মৎস্য শিকার প্রণালী ও বিভিন্ন প্রকার জালের বিবরণ কিঞ্চিৎ বিবৃত হইল। নদীমাতৃক দেশে লোকের মৎস্য শিকারপ্রিয়তা হিন্দু ও মুসলমান সর্ব জাতিগণ মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুগণ স্থান বিশেষে সরস্বতীপূজা, বিজয়াদশমী ও বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্যে মৎস্যের পূজা ও ব্যবহার করিয়া থাকে। মুসলমানগণ সর্বত্রই অল্পবিস্তর লাঠি পলো ও নানাবিধ জাল লইয়া মাছমারা উপলক্ষে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে। বন জঙ্গলজাত দ্রব্য মধ্যে পাবনা সাধুপাড়া ও অন্যান্য পল্লীবাসী অনেকানেক মুসলমানগণ মৌচাক হইতে মধু আহরণ ও মোম প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাও জেলার একটি শিল্পজাত দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত।

শিল্পজাত দ্রব্য প্রসঙ্গে শিল্পজীবীগণের অবস্থা ও প্রকৃতি কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। পাবনার বস্ত্রশিল্প পূর্বাপর এবং মোজাগেঞ্জি অধুনা বঙ্গের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। লুপ্ত শিল্প মধ্যে চুড়ি ও বাসন (তৈজস) শিল্প এক সময়ে পাবনায় প্রধান ছিল। ইহার প্রচলন ও প্রসার আবশ্যক। ওজন বাজার দর প্রসঙ্গে স্থল ও বাগবাটির দুধের ওজন এবং পাবনার দুই শতে একশত আমের শত গণনা উল্লেখযোগ্য। বাণিজ্য প্রসঙ্গে জেলার স্থায়ী বাজার, প্রধান প্রধান হাট ও মেলাদির যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা একেবারে সম্পূর্ণ নহে। বাজার দর ও পারিশ্রমিকাদি সম্পূর্ণই আধুনিককালের প্রদত্ত হইল ; কেবলমাত্র চাউলের দর কিঞ্চিদধিক ৮০/৮৫ বৎসর পূর্বের দেওয়া গেল। সংক্ষেপে জেলার আমদানি রপ্তানিরও বিবরণ লিখিত হইল।

শিক্ষা হিসাবে পাবনা জেলা পূর্বাপর প্রসিদ্ধ ; সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান সংখ্যা এই জেলায় অপেক্ষাকৃত অধিক। জেলার স্কুল, ছাত্র ও শিক্ষিত জন সংখ্যা (থানা প্রতি) প্রদত্ত হইল। ৯৯/১০০ পৃষ্ঠার পাবনা সদরের স্ত্রী পুরুষ মোট শতকরা শিক্ষিত

* পাবনা, কোহিনুর প্রেসে—বছিরউদ্দিন বিশ্বাস কর্তৃক ১-৫৬ পৃষ্ঠা, গোবিন্দ প্রেসে—তারাপদ চৌধুরী কর্তৃক ৫৭-১৩২ পৃষ্ঠা, সূচীপত্রও নিবেদনাদি মুদ্রিত।

সংখ্যা এবং ভ্রম ক্রমে সিরাজগঞ্জ মহকুমার কেবলমাত্র শতকরা শিক্ষিত পুরুষ সংখ্যা শেষ কলামে প্রদত্ত হইয়াছে। কয়েকজন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের বিস্তারিত বিবরণ এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণের কেবলমাত্র নামের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। কবি ও সাহিত্যিকগণের যে সকল নাম ও পুস্তকাবলীর তালিকা দেওয়া গেল, তাহাই সম্পূর্ণ নহে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকানেক গ্রন্থকার মদীয় অজ্ঞাত থাকিতে পারেন। মুসলমান সমাজে পূর্বাপেক্ষা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজোত্তীর্ণ ডাক্তার ব্যতীত অনেকে আজকাল উকিল মোক্তারাদি রূপে এবং সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কেবলমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা হিসাবে বিবেচনা করিলে কাব্য উপন্যাসাদি অষ্টাদশ খানি ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থের লেখক সিরাজগঞ্জের ইসমাইল সিরাজি সাহেব এই জেলার লেখকগণের মধ্যে অদ্বিতীয়। জেলার সমগ্র কবি সাহিত্যিক ও সর্বপ্রকার গ্রন্থকারগণের সম্পূর্ণ পরিচয়াদি সহ তাহাদের লিখিত ও মুদ্রিত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সম্বলিত বিবরণ প্রকাশিত হইলে, জেলার শিক্ষা ও শিক্ষিতসমাজের বিস্তারিত বিবরণ সংগৃহীত হইবে। মনুসংহিতার টিকাকার প্রসিদ্ধ কুল্লুকভট্ট চাটমোহরের নিকবর্তী গুইগ্রামের অধিবাসী থাকার জনশ্রুতি আছে। তথায় "ভট্টের ভিটা, শিবমন্দির, পুষ্করিণী, দোলমঞ্চ ও চণ্ডীমণ্ডপের ভগ্নাবশেষ আছে।" জামালপুর, গুণাইগাছা, রঘুনাথপুরের ভট্টাচার্য, কালিয়া হরিপুরের মজুমদার, নাকালিয়ার বাগছী, পদমপালের চৌধুরী প্রভৃতি কুল্লুকভট্টের বংশসম্ভূত বলিয়াও কিম্বদন্তী আছে। ইহার তথ্য সবিশেষ আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মধ্যে মাত্র ২/১ জনের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত পরিচয় লিখিত হইয়াছে। বিদেশে পাবনাবাসী যিনি যে স্থানে যেরূপে প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাদেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল। উপরোক্ত বিবরণাদি সমস্তই জেলাবাসিগণের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই পুস্তকখণ্ডে সংগৃহীত বিবরণাদি দ্বারা জেলাবাসিগণের কিঞ্চিৎ মাত্র উপকার হইলে স্বীয় পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এই পুস্তক মধ্যে কেহ কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদ বা অন্যান্য যে কোন প্রকার ত্রুটি লক্ষ্য করিলে, তাহা অনুগ্রহপূর্বক জানাইলে বিশেষ উপকৃত ও বাধিত হইব নিবেদন ইতি।

পাবনা, কালাচাঁদপাড়া। বিনীত নিবেদন—

৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৩ সাল। শ্রীরাধারমণ সাহা

উৎসর্গ পত্র।

জেলার

দেশীয় ও বিদেশীয়,

হিন্দু ও মুসলমান

অধিবাসিগণের

করকমলে

পাবনা জেলার ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

সাদরে অর্পিত

হইল।

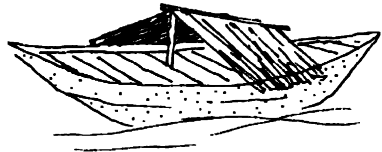
১৩৩৩

বিনীত—

গ্রন্থকার

প্রথম অধ্যায়

কৃষি ও উৎপন্ন দ্রব্য



প্রথম পরিচ্ছেদ—সাধারণ বিবরণ

ক. জমির প্রকৃতি ঃ

পাবনা জেলার জমি মৃত্তিকার প্রকৃতি ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা—চর, ভড়, ও বরিণ। পদ্মা ও যমুনাদি নদী গর্ভে নদী বাহিত মৃত্তিকায় গঠিত জমি চর নামে খ্যাত ; জেলার মধ্যবর্তী বিলময় প্রদেশের নিম্নভূমিকে ভড় এবং রায়গঞ্জ থানার উত্তরাংশের কতকস্থানের নাতি-উচ্চ ভূমিকে বরিণ বা খিয়ার বলে। উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে এই জেলার আবাদি জমি অধিকাংশই দো-ফসলি অর্থাৎ এক জমিতে বার্ষিক দুইবার বা দুইখণ্ড ফসল জন্মে। এক ফসলি জমি কম।

স্থান বিশেষে চর ও ভড় উভয়বিধ জমিতে দুইবার ফসল জন্মে। চৈত্র বৈশাখ মাসে যে জমিতে ধান অথবা পাট বুনানি হয়, ভাদ্র আশ্বিন মাসে তাহা উঠিয়া গেলে, তাহাতেই কলাই, মটর, সরিষাদির আবাদ হয়। কোন কোন স্থানে আউস আমন ধান একত্র বুনানি হয়, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে আউস উঠিয়া যায়, অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে আমন কাটা হয় ; বিলময় অঞ্চলের জমিতে স্থান বিশেষে কেবলমাত্র বৎসরে এক ফসল আমন ধান জন্মে। বরিণ বা খিয়ার জমিতে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে মাত্র রোপা বা রোয়া ধান্যের আবাদ হয়। ঈদৃশ জমির পরিমাণ এই জেলায় অতি কম। বাস্তু বা বসত বাটির জমিকে খোদ, তৎসলগ্ন পতিত জমিকে পালান এবং আবাদি জমিকে মাঠান কহে।

সাধারণত পলি মৃত্তিকাযুক্ত চর বা বিলের ধারের জোয়ান বা ক্রমগঠিত জমি অধিকতর উর্ব্বর ; প্রতি বিঘা জমিতে ৬০ সিক্কা ওজনের গড়ে সাত আট মন আউস ধান পাঁচ সাত মন আমন ধান জন্মে। এক ফসলি বিলময় প্রদেশের জমিতে কখনও কখনও নয় দশ মন পর্যন্ত আমন ধান জন্মিয়া থাকে। পাট বিঘা প্রতি সাধারণত ৫/৭ মন জন্মে ; তবে চর জমিতে ৯/১০ মন পর্যন্তও জন্মিয়া থাকে। মটর, কলাই ও অন্যান্য রবি শস্যাদি বিঘা প্রতি ৫/৬ মন জন্মে। স্থল বিশেষে কম বেশি দেখা যায়। শাহজাদপুর প্রভৃতি বিলময় নিম্নভূমির গভীর জল মগ্ন জমিতে ধান ও পাট কিছুই জন্মে না, কিন্তু তথাকার জমিতে বিনা চাষে বর্ষান্তে খেসারি, কলাই প্রভৃতি ছিটাইয়া আবাদ হয় ; তাহার ফসল অপেক্ষা ঘাসই বেশি গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। স্থানে স্থানে রাই, সরিযাদি, চলিত ভাষায় মাল, আবাদ হয়।,

খ. সার ঃ

এই জেলার কৃষকগণ সচরাচর জমিতে গোময় সার স্বরূপ ব্যবহার করে। কোন কোন স্থানে কৃষি বিভাগের উদ্যোগে খৈল ব্যবহারের চেষ্টা হইতেছে। খৈল বা অন্য কোন সার এ দেশের কৃষকগণ ব্যবহার করে না। কখনও কখনও তাহারা ক্ষেতে ধানের ক্ষেড় বা নাড়া ও পাট-কাঠি বা সোলা পোড়াইয়া দেয়, তাহাও অনেক স্থানে সারের কাজ করে।

গ. কৃষিকার্যে ব্যবহৃত দ্রব্য ঃ

সাধারণ কৃষিকার্যে ব্যবহৃত দ্রব্যজাত মধ্যে এই জেলায় কাঠের (১) লাঙল, (২) জোঁয়াল,

লৌহার, (৩) ফাল, বাঁশের (৪) মই এবং কাট ও লৌহ শলাকা বা খিল নির্মিত, (৫) লাঙল ব্যবহৃত হয়। (৬) নিড়াণী, (৭) কাচি বা কাস্তে, (৮) পাঁচন প্রভৃতি লৌহ নির্মিত দ্রব্য ক্ষেত নিড়ান ও শস্যাদি কাটার জন্য ব্যবহার হয়। লৌহ নির্মিত, (৯) কোদালী ও কাষ্ঠ নির্মিত (১০) ইঁটা-মুগুরও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। বাঁশের অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে, (১১) কুলা, (১২) চালুন শস্যাদি ঝাড়িতে, বেত্র নির্মিত, (১৩) ধামা, (১৪) কাঠা তাহা বহন ও পরিমাণে, এবং নল ও বাঁশ নির্মিত, (১৫) ডোল, (১৬) ডালি প্রভৃতি শস্যাদি সঞ্চিত রাখিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঘ. গবাদি ঃ

কৃষিকার্যের প্রধান সহায় গবাদির অবস্থা উন্নতির জন্য এ দেশের সাধারণ কৃষকেরা আদৌ মনোযোগী নহে। দামড়া বা বলদ দিয়া চাষ আবাদ কার্য চলে। পাবনা সদরে কোন কোন স্থলে মহিষও চাষে ব্যবহৃত হয়। দামড়ার অভাবে স্থানে গাভীও লোকে চাষ আবাদ কার্যে ব্যবহার করে। দামড়া বা বলদ এবং গাভী কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইলে এই জেলায় সাধারণত হালের গরু নামে পরিচিত হয়।

কাঁচা ঘাস, ভুষি, ক্ষেড় বা ক্ষ্যাড় (বিচালি) গবাদির প্রধান খাদ্য। দুগ্ধবতী গাভীর যত্ন বেশি, তন্নিম্নে গাড়ওয়ানদিগের দামড়া বা বলদের আদর, খুলুরাও ঘানির বদলকে কিঞ্চিৎ যত্ন করে, সর্বশেষে চাষে ব্যবহৃত গবাদির আদর ও যত্ন ; তাহা গৃহস্থ অপেক্ষা রাখাল বালকগণের উপর অধিক নির্ভর করিতে দেখা যায়। সময় সময় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বা জেলখানায় পশ্চিমদেশীয় ষাঁড় রাখিয়া গোধনকুলের উন্নতির চেষ্টা হয়, তাহা সাময়িক ও শহরে সীমাবদ্ধ। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কপালে বৃষোৎসর্গ ও বৃষপালন পাবনাদি স্থানে ক্বচিৎ দেখা যায়, পল্লীতে অতি বিরল। জেলা মধ্যে সময় সময় গবাদির সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও বেড়া, যে তিন স্থানে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের অধীনে পশু-চিকিৎসকগণ নিযুক্ত আছেন, তাহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া ঔষধ বিতরণ করেন। সময়ে তাহারাও প্রয়োজনানুসারে গবাদির চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

ঙ. কৃষির উন্নতি চেষ্টা ঃ

এ জেলার কৃষকগণ চাষ আবাদের বিশেষ উন্নতি প্রয়াসী নহে। সনাতন প্রথায় জমি চাষ, বৃষ্টির সাহায্যে চাষ আবাদ বুনানী ও জমিতে গোময় দ্বারা সার দিয়া শস্য উৎপাদন ভিন্ন, অন্য কোন উপায়ে অধিক ফসল জন্মাইবার চেষ্টা কিংবা ভিন্ন ভিন্ন জমিতে নানারূপ সার ফেলিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা কিংবা অল্প জমিতে প্রক্রিয়া বিশেষে অধিক ফসল লাভের আশা তাহারা আদৌ পোষণ করে না। আকাশের মেঘ বৃষ্টি ও নদী নালা বিল খালের জলপ্লাবন প্রভৃতির উপর এই জেলার কৃষিকার্য অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করে। সময়ে বারিপাত না হইলে, এ জেলার কৃষকেরা চাষ আবাদ করিতে পারে না। যে বৎসর বৃষ্টি বেশি হয় না, সে বৎসর ধান ও পাট ভাল জন্মে না। অন্য জেলার ন্যায় এখানে ক্ষেত্রে জল সেচনের ব্যবস্থা নাই কিংবা পূর্ত বিভাগের কোন কার্যাদিও এ জেলায় নাই। বড় বিল ও অন্যান্য বিলে স্থানে স্থানে কৃষকেরা নালা কাটিয়া যব ও গমের জমিতে সময় সময় জল দিয়া থাকে এবং খিয়ার অঞ্চলে ক্ষেতে আইল বাঁধিয়া জল বদ্ধ রাখিতে দেখা যায় বটে, তবে তাহা অল্প স্থানে সীমাবদ্ধ। জল অভাবে যেমন চাষ আবাদ নষ্ট হয়, তদ্রূপ অত্যধিক জল নিবন্ধন শাহজাদপুর থানা হইতে আরম্ভ করিয়া জেলার পূর্ব পার্শ্বস্থিত ভূভাগের কৃষি কার্যের অনেক অসুবিধাও আছে ; তৎপ্রতি গবর্নমেন্টের পূর্ত ও কৃষি উভয় বিভাগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

কৃষিকার্যের উন্নতিকল্পে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে গবর্নমেন্ট হইতে ঢাকা হেড অফিসের অধীনে পাবনায় একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খোলা হইয়াছে। পাবনা সদরে তজ্জন্য একজন ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালকারাল অফিসার ও তাহার অধীনে তিন জন ইনস্পেক্টর নিযুক্ত আছেন। তাহারা ধান, পাট, ইক্ষু আদির নূতন নূতন বীজ বা বেছন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইতে আনয়ন করিয়া

তাহা এই জেলার মৃত্তিকায় আবাদ জন্য আদর্শ পরীক্ষা কৃষিক্ষেত্রে ও জেলার মফঃস্বলের স্থানে স্থানে বপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা মফঃস্বলে ঘুরিয়া স্থানীয় শিক্ষিত লোকের সাহায্যে তাহাদের কার্য প্রসারে যত্নবান আছেন। তাহাদের আদর্শ ক্ষেত্রে আনীত শস্যের বীজ বা বেছন সর্বসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকে। তাহারা কৃষকগণকে ক্ষেত্রে নূতন প্রণালীতে ''ার দিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন।

এই জেলার কৃষিকার্যের উন্নতি জন্য সাধারণের চেষ্টায় সম্প্রতি যে কয়েকটি গ্রাম্য সমবায় কৃষিসমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে; তন্মধ্যে (১) দাশুরিয়া, (২) নাজিরপুর, (৩) দেবোত্তর, (৪) সুজানগর, (৫) তলট আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য। ইহা কয়েকজন মেম্বর লইয়া গঠিত। মেম্বরগণ জমি মেয়াদি বন্দোবস্ত লইয়া ও গবাদি ক্রয় করিয়া চাষ আবাদের কার্য পরিচালন করিতেছেন। কৃষিকার্যের উন্নতি জন্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে এই সকল গ্রাম্য সমিতিকে সাহায্য করা হইতেছে। নূতন নূতন প্রণালী অবলম্বনে কৃষির উন্নতি সাধন করা এই সকল সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। গবর্নমেন্টের আদর্শ ক্ষেত্রের কর্মচারিগণ এই সমস্ত গ্রাম্য কৃষিশালার কার্য পরিদর্শন ও তাহার উন্নতিকল্পে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

সিরাজগঞ্জে একজন এগ্রিকালচারাল সাবডিভিসনাল অফিসার নিযুক্ত আছেন। জেলার কৃষিকার্যের উন্নতিকল্পে গবর্নমেন্ট বার্ষিক প্রায় ৫৫০০ টাকা ব্যয় করেন।

আবাদিজমির পরিমাণ

	১৯২১/২২ খ্রিস্টাব্দ		১৯২২/২৩ খ্রিস্টাব্দ	
শস্য	একর	শতকরা	একর	শতকরা
খাদ্য শস্য ঃ				
ধান, আউস	২২৫১০০	২৩.৩৭	১৪০০০০	১১.০১
আমন	৪০০০০০	৪১.৭২	৫৬৬০০০	৪৪.৫৩
বোরো	—	—	৭৫০০	.৫৯
গম	৬২০০	.৬৪	১৬০০০	১.২৫
যব	—	—	১৬০০০	১.২৫
বুট	—	—	২০০০০	১.৫৭
মটরাদি	১৪৭৫০০	১৫.৪১	১২৪০০০	৯.৭৫
তৈল শস্য ঃ				
তিল	২৩৪০০	২.৪৬	৪০৫০০	৩.১৮
রাই সরিষাদি	৮৬৯৫৩	৯.০২	১১০০০০	৮.৬৫
মসিনা	—	—	৭৬০০	.৫৯
মসলা শস্য	—	—	৫৫০০	.৪৩
ইক্ষু আদি	৩৮০০	.৩৯	১০৯০০	.৮৫
পাট	৬৫৬২০	৬.৬৪	১২৬০০০	৯.৯৯
সোণ	—	—	২৯০০০	২.২৮
তামাক	—	—	৭০০০	.৫৫
ফসল বীজ	—	—	২০০০	.১৫
বিবিধ ঃ				
খাদ্য	—	—	৩০০০০	২.৩৬
অখাদ্য	—	—	৯৫০০	.৭৪
	৯.৪৮.৫৭৩		১২,৬৭,৫০০	

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষিজীবী ও তাহাদের অবস্থা

কৃষিজীবীদিগের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। হিন্দু সমাজের মধ্যে নমঃশূদ্র, কৈবর্ত (সাধারণত হালিয়া কৈবর্ত) এবং স্থলবিশেষে গোপ বা গোয়াল হালিয়া নৈ বা হালৈর ও নাপিতগণ নিজ হাতে চাষ আবাদের কার্য করিয়া থাকে। সিরাজগঞ্জ মহকুমার উত্তরাংশে নিমগাছি অঞ্চলে বুনা, সাঁওতালাদি জাতীয় লোকেরা কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জাতিগণ অনেকে পাইট মজুরাদি দ্বারা স্বয়ং কিংবা উৎপন্নের অর্ধাংশ ভাগ দিবার নিয়মে বর্গা প্রথাসূত্রে নিজ নিজ খাস খামার জমি চাষ আবাদ করাইয়া থাকে। আদমশুমারীর বিবরণে জানা যায় যে এই জেলার অধিবাসীগণ মধ্যে শতকরা ৬৮ জন লোক কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে।

সাধারণত কৃষিজীবী লোকের আর্থিক ও সাংসারিক অবস্থা উন্নত নহে। অধিকাংশ স্থলেই কৃষকগণের সমস্ত বৎসরব্যাপী পরিশ্রমলব্ধ অর্থ মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধেই নিঃশেষিত হয়। শস্য বিক্রি হইয়া গেলে ২/১ মাস মধ্যেই তাহাদিগকে পুনরায় উত্তমর্ণের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। ঋণমুক্ত চাষী প্রজার সংখ্যা অতি বিরল। সারা বৎসর কোন প্রকারে কাটাইলেও, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে অনেক অবস্থাপন্ন কৃষককেও মহাজনদিগের দ্বারস্থ হইতে হয়।

সচরাচর কৃষকেরা টাকা প্রতি মাসিক ।১০ আনা হারে সুদে টাকা কর্জ করে। স্থল বিশেষে মাসিক টাকা প্রতি ।০ এক আনা এমনকি গ্রামবিশেষে তদূর্ধ হারেও সুদ প্রচলিত আছে। কোন কোন স্থলে টাকায় খন্দ প্রতি ।১, ।১॥ সের হিসাবে ধরতা বা সুদ দিবার নিয়ম আছে। তদুপরি কৃষককুল স্থানে স্থানে এক কাঠা ধান কর্জ করিয়া ভাদ্র আশ্বিন মাসে তাহার বাবদ সুদ আসলে দেড় কাঠা হিসাবেও সুদ বা ধরতা দিবার নিয়মে খোরাকির ধান কর্জ করিয়া থাকে। এ প্রথা প্রায় জেলার সর্বত্রই অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারে সমস্ত বৎসরের রৌদ্র বৃষ্টি ও শীততাপক্লিষ্ট-পরিশ্রম লব্ধ অর্থেও চাষী লোকের দেনা পরিশোধ হয় না।

আজ কাল অনেক গ্রামে ভিলেজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বা গ্রাম্য সমবায় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কৃষিজীবীদিগের অনেক সুবিধা ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে অল্প সুদে টাকা পাওয়ার সুযোগ ঘটায়, অনেকে অত্যধিক ঋণ গ্রহণ করিতেছে। তদুপরি অধুনাতন নানাপ্রকার ব্যয় বাহুল্য ও বিলাসিতাপ্রযুক্ত কৃষকগণের মধ্যে অনেকেরই দূরদর্শিতার অভাব হেতু বর্তমান কালে শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইলেও কৃষকগণ কিছুতেই সাংসারিক খরচাদি সহজে সংকুলনপূর্বক সুখে স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না কিংবা স্বকীয় অবস্থা উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছে না।

নদী বিল প্রভৃতির চরে বসতি কৃষিজীবী প্রজার অবস্থা কথঞ্চিৎ স্বচ্ছল ; কিন্তু নদীর গতি পরিবর্তন ও ভাঙন এবং বিলাদিতে বার্ষিক অসময়ে জল প্লাবনাদি হেতু তাহাদেরও শস্যহানি প্রযুক্ত আর্থিক অবস্থা কিছুতেই শাতিশয় উন্নত বলা যায় না। তবে তাহারা উন্মুক্ত স্থানে বাস হেতু স্বাস্থ্যবান তদ্ধেতু সাধারণত বলিষ্ঠ, শ্রমশীল ও কর্মঠ।

কৃষিজীবীদিগের অবস্থা খারাপ হইবার কারণ

সাধারণের বিশ্বাস শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধিহেতু মধ্যবিৎ অবস্থাপন্ন লোক অপেক্ষা কৃষিজীবী লোকের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত ও স্বচ্ছল ; প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ঠিক নহে। নিম্নলিখিত কারণে চাষী লোকের অবস্থা খারাপ হইতেছে। যথা ঃ

(১) আধুনিক ব্যয় বাহুল্য ও বিলাসিতা হেতু কৃষিজীবী লোকের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে।

(২) সামান্য কারণে অযথা মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হওয়ায় অনেক স্থলে চাষী লোকেরা নিঃস্ব হইতেছে।

(৩) প্রজা ও জমিদার বা জোতদারগণ মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি হেতু কৃষককুল অনেকস্থলে অথবা বাকি খাজনার মোকদ্দমায় বিজড়িত হইয়া দেয় খাজানা অপেক্ষা অধিক খাজানা ও খরচা বহ. করিতেছে।

(৪) চাষী প্রজা অধিকাংশই নিরক্ষর জন্য জমিদারের নিম্নতন কর্মচারিবৃন্দ তাহাদের প্রদত্ত খাজানাদি অনেক সময় বাকি বকেয়াদিতে ওয়াশীল করিতেছে কিন্তু কিছুতেই প্রকৃত খাজনা পরিশোধিত হইতেছে না।

(৫) নিতান্ত দরিদ্র কৃষকগণও স্বীয় পুত্র কন্যার বিবাহাদিতে বহু ব্যয় বিধান করিয়া ক্রমে ঋণজালে নিপতিত হইতেছে।

(৬) গোধন কুলের কোনই উন্নতি না হওয়ায় কৃষকেরা প্রায় প্রতি বৎসরে চাষ আবাদ জন্য গবাদি খরিদ করিতে বাধ্য হয়। ইহাও তাহাদের ঋণজালের অন্যতম কারণ।

(৭) সর্বোপরি চাষী প্রজার অপরিণামদর্শিতা হেতু তাহাদের হাতে টাকার একান্ত অভাব প্রযুক্ত তাহারা অত্যধিক সুদে টাকা কর্জ করিয়া দৈনন্দিন ঋণজালে বিজড়িত হইতেছে।

এই জেলার জমির স্বত্বাধিকারী অধিকাংশ হিন্দু, কিন্তু সর্বত্রই প্রায় কৃষি ও প্রজা ও বর্গাদারগণ মুসলমান। প্রকৃত প্রস্তাবে অনেক স্থলেই তাহারা জমির মালিক নহে। চাটমোহরাদি থানার অন্তর্গত হাদল পার্শ্বডাঙা প্রমুখ গ্রামসমূহে হিন্দু মুসলমান মধ্যে বিগত কয়েক বৎসর মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় মুসলমান কৃষকগণ হিন্দু জোতদারগণের জমি চাষ আবাদ করিতেছে না ; ইহাতে মুসলমান কৃষি প্রজা ও বর্গাদার এবং হিন্দু জোতদার উভয়েরই অশেষ ক্ষতি হইতেছে। স্থলবিশেষে পরস্পর এরূপ বিবাদ কৃষিজীবীগণের অবস্থার উন্নতির বিশেষ অন্তরায়।

কৃষিজীবীদিগের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর ; ইহাদের অবস্থার উন্নতি ও পরিবর্তন জন্য দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কৃষিকার্যে অধিকতর মনোযোগী ও উদ্যোগী হওয়া একান্ত কর্তব্য। গবর্নমেন্টের উদ্যোগে এগ্রিকালচারাল (কৃষি) বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলেও, দেশের সর্বসাধারণ শিক্ষিত সমাজের সহানুভূতি ব্যতীত দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ কৃষিজীবীদিগের অবস্থার উন্নতি অসম্ভব ; সর্বদা চাষ আবাদে লিপ্ত সাধারণ বেশধারী চাষী লোককে অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিয়া তাহাদের সুখ দুঃখে সহায়তা ও সমবেদনা প্রকাশ ব্যতীত কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি সুদূর পরাহত। যতদিন পরস্পর এরূপ সহানুভূতি না জন্মিবে ততদিন তাহারা গাইবে যে—

"ছোট লোকের কামাই রে ভাই বড় লোকে খায়,
খায় আর দায় মোচড়ায় দুই দাড়ি
খাজনা না পা'লে পরে ফ্যালায় চা'র বাড়ি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—উৎপন্ন দ্রব্য

১. কৃষিজাত ঃ

(ক) ধান ঃ জেলার সর্বপ্রধান উৎপন্ন দ্রব্য এবং ইহা সর্বত্র অল্প বিস্তর আবাদ হয় ও জন্মে। সাধারণত এই জেলাজাত ধান্য চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, যথা— ১) আউস, ২) আমন, ৩) জলি, ৪) বোরো।

১. আউস ধান ঃ

সচরাচর উচ্চ ভূমিতে চৈত্র-বৈশাখ মাসে বুনালি এবং শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কাটা হয়। ইহার গাছ প্রায় দুই হইতে আড়াই হাত উচ্চ হইয়া থাকে। তাহাতে গবাদির জন্য উত্তম বিচালি বা খড় জন্মে এবং উহা ব্যবহারে দুগ্ধবতী গাভীর দুধের স্বাদ ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আউস ধানের সহিত নাতি-উচ্চ জমিতে অরহরাদি রবিশস্যও কখন কখন একত্র আবাদ হয়। জমিতে সামান্য জল জমিলেও আউসের কোন ক্ষতি হয় না। বৈশাখ মাসের প্রথমে বৃষ্টি, জ্যৈষ্ঠ মাসে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি, মাঝে মাঝে প্রখর রৌদ্র এবং আষাঢ় শ্রাবণে পরিমাণ মত বৃষ্টি হইলে আউস ধান ভাল জন্মে।

এই জেলায় উৎপন্ন আউস ধানের বিভিন্ন নাম যথা—(১) কালাবক্রি, (২) কালাগরিয়া, (৩) বাঁশগৈর, (৪) কাদনাশ, (৫) মুক্তাহার, (৬) নয়াচুর, (৭) টেপীশাল, (৮) সাটে, (৯) পক্ষীরাজ, (১০) গয়রা, (১১) ভাদ্‌মা, (১২) কট্‌কি, (১৩) পেচে মল্‌কা, (১৪) ব্যাঙ্গ চাপরি প্রভৃতি।

২. আমন ধান ঃ

নিম্নভূমিতে স্থলবিশেষে আউসের সহিত একত্রে বা পৃথকরূপে আবাদ হয়। আউস কাটা হইলে আমন ক্ষেতে থাকিয়া যায়। ক্রমশ জল বৃদ্ধি সহকারে আমনের গাছ বাড়িতে থাকে। একেবারে অধিক জল বাড়িয়া গাছ ডুবিয়া গেলে, বিলময় প্রদেশে অনেক সময় আমন ধানের বিশেষ ক্ষতি হয়। ধীরে ধীরে জল বৃদ্ধি হইলে ইহার কোন অনিষ্ট হয় না। স্থলবিশেষে আমনের গাছ ৩ হইতে ১০ হাত পর্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। জলের মধ্যে জন্মের জন্য ইহার গাছ আউসের গাছ অপেক্ষা মোটা হয়। যত অধিক জলে জন্মে, তত ইহার গাছ মোটা, ফসলের ফলন অর্থাৎ পরিমাণ এবং চাউলের স্বাদ বেশি হইয়া থাকে। গভীর বিলময় প্রদেশের উৎপন্ন আমনের বরণ জাতীয় ধান এবং তাহা হইতে জাত বরণের চাউল হইতে এ দেশের নাম বারেন্দ্র ভূমি হইয়াছে।

রায়গঞ্জ থানার অর্ন্তগত তাড়াস প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত প্রান্তরে বার্ষিক মাত্র এক ফসল আমন ধান জন্মে। বর্ষার জলমগ্ন ভূমির উপরিস্থিত সবুজবর্ণ শোভা এবং শরদাগমে হরিৎবর্ণ মাঠের দৃশ্য চিত্তাকর্ষক। কার্তিক মাসে বৃষ্টি হইলে আমন ধান ভাল জন্মে। স্থলবিশেষে আমনের জমিতে আশ্বিন কার্তিক মাসে ছিটাইয়া খেসারি মটরাদিরও আবাদ হইয়া থাকে। আমন ধানের গায় সূক্ষ্ম লম্বা লম্বা শুল থাকার জন্য ইহাতে কাঠার এবং দাঁড়ির উভয়বিধ মাপেই ওজনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সাধারণত আমন ধান আউস অপেক্ষা চিক্কণ ও মিহি হইয়া থাকে।

আমন ধানের এই জেলার ব্যবহৃত বিভিন্ন নাম ঃ (১) দিঘে, (২) কালাদিঘে, (৩) ভাউলে দিঘে, (৪) নয়াচুর, (৫) কাদনাশ, (৬) কাঁখ্যা, (৭) নলচ, (৮) বংশীরাজ, (৯) রাজমণ্ডপ, (১০) আরালিয়া, (১১) বরণ. (১২) কেচরাদাম, (১৩) সোনাউজিল, (১৪) ঝুল, (১৫) শুণি, (১৬) ভরেনাটা, (১৭) দলকচু, (১৮) সোনাদিঘে, (১৯) হরিগাছি, (২০) মানিকদিঘে, (২১) বয়জ, (২২) ফুলবেতে, (২৩) রোপা প্রভৃতি।

৩. জলি ধান ঃ

সচরাচর কর্দমাক্ত বিলের ধার এবং পদ্মা যমুনাদি বৃহৎ নদীর পলি মৃত্তিকাযুক্ত চর জমিতে জলি ধানের আবাদ হয়। পৌষ শেষে ও মাঘের প্রথমে সিক্ত আর্দ্র জলযুক্ত ভূমিতে আবাদ হয় জন্য ইহাকে জলিধান কহে। এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল কাটা হয় জন্য ঈদৃশ ধানের জমিকে জলি জ্যৈষ্ঠকর কহে। মাটি অধিক নরম থাকিলে স্থলে স্থলে জমিতে ধানের বীচ (বেছন) লেপিয়া আবাদ করিতে হয়, কিছু শক্ত হইলে সামান্য লাঙ্গলও দিতে হয়। মোটের উপর চাষে খরচ কম লাগে। চর জমিতে ঈদৃশ জলি ধানের জমি সাধারণত জমিদারগণ মাত্র এক ফসল অর্থাৎ অগ্রহায়ণ পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় পর্যন্ত বার্ষিক এক নির্দিষ্ট জমা ও নজরে পত্তন করিয়া থাকেন। প্রথমে মাত্র জমি বিলি করা হয়, তারপরে ফসল কাটার সময় নজরাদি আদায় হয় ; স্থলবিশেষে জমিদারগণ ধান ক্রোক দিয়া আপনাপন প্রাপ্য আদায় করিয়া লন। পাবনার সামিল পদ্মার চরে শিলাইদহের (নদীয়া) কাছারির অধীন কলিকাতার ঠাকুর জমিদারগণের এই প্রকারে বার্ষিক অনেক জলির জমি বিলি হইয়া থাকে। আউস আমন উভয় ধান সে সময় মহার্ঘ্য হইয়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে কৃষকগণ কষ্টে পতিত হয় ; তখন জলি ধানে তাহাদের অনেক সাহায্য হয়। ইহা সাধারণত আউস ধানের ন্যায় মোটা এবং গাছও তদ্রূপ। ইহার বিচালী বা খড়ে এক প্রকার ঘ্রাণ আছে। ইহার কোন বিভিন্ন নাম জানা যায় না।

৪. বোরা ধান ঃ

ইহাও বিল কিংবা নদীর চরে পৌষ মাঘ মাসে আবাদ হয়। বিশেষত ইহা এক স্থানে প্রথমে চারা দিয়া পরে তাহা উঠাইয়া জলি ধানের ন্যায় আর্দ্র ও সিক্ত জমিতে পুনরায় রোপণ করিতে হয় জন্য ইহাকে বোরো (ব+রোপন) ধান বলা হয়। (জেলার উত্তরাংশে বরিণ বা খিয়ার অঞ্চলে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বোরোর ন্যায় চারা লাগাইয়া যে ধানের চাষ হয়, তাহাকে রোপা ধান কহে ; ঈদৃশ রোপা ধানের আবাদ এ জেলায় অতি বিরল) ইহার আবাদেও জলির ন্যায় খরচ কম এবং ইহাও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে কাটা হয় জন্য কৃষকদিগের ইহা দ্বারা অসময়ে অনেক সহায়তা হয়। গাছ, চাউলের স্বাদ ও ফলন প্রায় জলি ধানের ন্যায়। জলির জমির ন্যায় বোরো ধানের জমি প্রায় বার্ষিক বিলি হয় না। ইহা রায়তগণ এক নির্দিষ্ট জমায় চাষ আবাদ পূর্বক ভোগ দখল করিয়া থাকে।

১৯২৩/২৪ খ্রিস্টাব্দে পাবনার আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে যে কৃষি প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে আউস আমনাদির ৭২ রকম ধান প্রদর্শিত হইয়াছিল।

খ. ভুরা—বৈশাখ শেষে অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে আবাদ হয়। ইহার গাছ আউস ধানের গাছ অপেক্ষা মোটা ও উচ্চ হয়। কেহ কেহ ইহার গাছ গবাদির খাদ্য রূপে ব্যবহার করে। ভুরা দানা (ফসল) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় সেজন্য ধান অপেক্ষা পরিমাণে বেশি বলিয়া বোধ হয়। ইহার গাছ ধানের গাছ অপেক্ষা সতেজ হয়। ইহাও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে কাটা হয়। জলি ও বোরো ধানের ন্যায় ইহাতেও কৃষকগণ অনেক সাহায্য লাভ করে। ইহাতে যে চাউল তৈয়ারি হয়, তাহা অতি মিহি সাবুদানার ন্যায়. কিন্তু তদ্রূপ সাদা নহে বা আহারে বিশেষ সুস্বাদু নহে কিন্তু লঘুপাক। ইহার আবাদ বেশি দেখা যায় না।

গ. কাউন—ইহাও ভুরা জাতীয়। ইহার আবাদও ভুরার সমসাময়িক। আহারে লঘুপাক, তজ্জন্য ইহার চাউল রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারও অধিক আবাদ হয় না।

পাট ঃ

ধানের পর পাট এই জেলার অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, ইহা সাধারণত কোষ্টা নামে পরিচিত। ধান গৃহস্থ ও কৃষকেরা বাৎসরিক খাদ্য ও বেছন স্বরূপ রাখিয়া অতিরিক্ত হইলে

তবে বিক্রি করে, কিন্তু পাট সকলেই অল্প বিস্তর যাহা পায় তাহা (১) জমিদারের খাজানা (২) মহাজনের ঋণ পরিশোধ, (৩) পুত্র কন্যার বিবাহাদি (৪) গবাদি খরিদ এবং (৫) সময় সময় নূতন জমি পত্তনাদি কারণে বিক্রি করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া থাকে।

এই জেলায় পূর্বে কেবলমাত্র ধানের আবাদই অধিক ছিল, পাটের আবাদ কম হইত ; তজ্জন্য ধানের নামে গ্রামাদির নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যথা ধানবিলা (রেলওয়ে স্টেশন), ধানবাঁধি, ধানুয়াঘাটা প্রভৃতি, কিন্তু পাটের নামে বিশেষ কোন গ্রামাদি দেখিতে পাওয়া যায় না।

পাট বলিয়া কোন জিনিসের আবাদ পূর্বে এদেশে থাকা জানা যায় না। সোণ, পাটুয়া, নালিতা, মেষ্টাদি দ্রব্যের উল্লেখ থাকা জানা যায়। পূর্বে সোণ এই জেলার প্রচুর পরিমাণে আবাদ হইত এবং এখনও হইতেছে। পাট বা কোষ্টা নামক জিনিসের আবাদ এদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।[১] পূর্বে কার্পাস বস্ত্রের অধিক ব্যবহার ছিল, তজ্জন্য তুলার চাষও অধিক ছিল, কিন্তু বৈদেশিক অবাধ বাণিজ্যের প্রভাবে চট থলিয়া, বস্তাদি তৈয়ার জন্য এদেশে কল কারখানা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সহকারে পাট ব্যবহার আরম্ভ হয়, তখন হইতে কৃষকগণ পাটের আবাদেও অধিক পরিমাণে মনোযোগী হইতে থাকে। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে জুটমিল বা চটকল স্থাপনের পর ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে পাটের আবাদ দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই জেলায় পাটের আবাদি জমির পরিমাণের কিরূপ সময় সময় হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, সরকারি বিবরণী হইতে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

পাট আবাদি জমির পরিমাণ

খ্রিস্টাব্দ	একর	খ্রিস্টাব্দ	একর
১৮৭২	১২২৯০০	১৯১১	২০১৫০০
১৮৮০	১০২৫০০	১৯১৬	২০৬১৪০
১৮৯০	২৫০০০০	১৯২০	২২৬০০০
১৯০০	১০৬০০০	১৯২১	৬৫৬২০
১৯০৫	২০০৬০০	১৯২২	১২৬০০০

(১) শ্রেণী বিভাগ—বঙ্গদেশে যে সমস্ত স্থান পাট জন্মে ঐ স্থানসমূহ পাঁচটি ব্যবসায়িক বিভাগে বিভক্ত ; পাবনা জেলায় উৎপন্ন পাট দ্বিতীয় অর্থাৎ সিরাজগঞ্জ বিভাগের অন্তর্গত। এই বিভাগ যমুনা নদীর উভয় পার্শ্বস্থিত প্রদেশ লইয়া গঠিত ; সিরাজগঞ্জ ইহার কেন্দ্রস্থল। এখানে পাবনা, ঢাকা, মৈমনসিংহ, বগুড়া, রঙ্পুর প্রভৃতি স্থানের পাট আমদানি হয়। গবর্নমেন্ট হইতে ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায়, পাবনা জেলার উৎপন্ন পাট নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

(Jutes in Bengal by Nibaran Chandra Choudhury, 1908.)

নাম	আবাদের স্থান	বিঘা প্রতি উৎপন্ন
১) কাঁকিয়া বোম্বাই	সিরাজগঞ্জ	৯।
২) দেশাল	”	৫।
৩) লালিতা (লালতা)	”	৮।
৪) তোষা	”	৭।
৫) ঐ সাদা	পাবনা	৬।
৬) বড় পাটা	”	৬।

[কাঁকিয়া বোম্বাই—অধিক লম্বা হওয়ার জন্য ইহার নাম বোম্বাই। ৬/৭ ফিট্ বা তদপেক্ষা অধিক জল মধ্যেও ইহা জন্মে। অন্যান্য পাট অপেক্ষা ইহার ফলন (উৎপন্নের পরিমাণ) প্রায় শতকরা ৫০ পঞ্চাশ গুণ বেশি, ওজনে হালকা, রঙ সাদা এবং অধিক দরে

বিক্রি হয় ; তজ্জন্য কৃষকেরা বিশেষত সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ইহারই অধিক আবাদ করে। গবর্নমেন্ট আসাম প্রদেশ হইতে বীজ (বেছন) আনিয়া অধিক জলমগ্ন জমিতে ইহার আবাদ জন্য চেষ্টা করিতেছেন।]

উপরোক্ত কয়েক প্রকার ব্যতীত পাবনায় উৎপন্ন পাটের বিভিন্ন নাম—(১) মেঘলাল, (২) ধলেশ্বরি, (৩) সাচি, (৪) বেলন, (৫) সাতনলা, (৬) ধামরাজ, (৭) গাণ্ডারী, (৮) কামারজানি প্রভৃতি।

পাট সাধারণত এই জেলায় দুই প্রকার ভূভাগে জন্মে। জেলার পূর্বাংশে অর্থাৎ হুরাসাগর নদীর পূর্ব হইতে যমুনা নদী পর্যন্ত প্রদেশ লইয়া প্রথম বিভাগ ধরা যায়। ইহা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস হইতে জলে ডুবিয়া যায়। এই ভূভাগে অধিকাংশ কাঁকিয়া বোম্বাই-এর আবাদ হয় ; সাদা দেশাল এবং লাল তোষাও দেখা যায়। হুরাসাগরের পশ্চিম হইতে জেলার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দ্বিতীয় বিভাগ ; ইহার অধিকাংশ স্থল উচ্চভূমি ; এখানে দেশাল ও তোষা পাটই বেশি জন্মে। এই জেলার সিরাজগঞ্জের পাট বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাতে শতকরা ৪০ হইতে ৮০ ভাগ হেসিয়ান (Hessian) এবং ২৫ হইতে ৬০ ভাগ ওয়ার্প (Warp) থাকে। এখানকার পাটে ১।। মন হইতে ৩।। মন পর্যন্ত গিলা বস্তা প্রস্তুত বা বাঁধা হয়। পাকা গাইট ৪ মন হইতে ৫ মন পর্যন্ত হইয়া থাকে। বিদেশে আমদানির পক্ষে (M) মার্কা পাট সুবিখ্যাত। ছোট গাইট ড্রাম, বড় গাইট্ বেল নামে পরিচিত হয়। কলে বাঁধা চতুষ্কোণ গাইট্ ব্যতীত দেশি প্রথায় দুই দিকে দুই জনে দেড় হাত পরিমাণ লাঠি সাহায্যে চাপ দিয়া বাঁধা বা আটা গোল বস্তার চলন পূর্বে বেশি ছিল, আজকাল প্রধান প্রধান বন্দরে ১।। হইতে ২।। মন ছোট ছোট গাইট্ই বেশি প্রচলিত হইতেছে। শুকনা পাট ৫ হইতে ৮/১০ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়।

(২) আবাদ—সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে ফাল্গুন চৈত্র মাসে এবং পাবনা সদরে বৈশাখ মাসের প্রথমে বৃষ্টি হইলে পাট আবাদ জন্য জমি তৈয়ার হয়। গোময় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সার কৃষকেরা ব্যবহার করে না। সদর অপেক্ষা সিরাজগঞ্জের মাটি দোয়াশ বিধায় অধিক রৌদ্রে পাটের গাছের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। গাছ আধ হাত পরিমাণ উচ্চ হইলেই ক্ষেতের প্রথম নিড়ান কার্য আরম্ভ হয়। ইহাতে কৃষকগণের বহু ব্যয় হয় এবং সেই সময় হইতে তাহারা সাধারণত মহাজনের নিকট ঋণাবদ্ধ হইতে থাকে। কোন কোন বৎসর নানা জাতীয় ফড়িং, পোকা, বিছা, চ্যাঙ্গা, উরচুঙ্গা এবং বর্তমানে লম্বা লম্বা একপ্রকার শামুকে পাট গাছের পাতা ও শীষ খাইয়া পাটের বিশেষ ক্ষতি করে। সময়ে "বালা" (অর্থাৎ গাছে এক প্রকার শিকর বাহির হইয়া) লাগিয়া অনেক অনিষ্ট করে। গরিব গৃহস্থগণ পাটের কচি পাতা খাদ্য স্বরূপ ব্যবহার করে ; পাতা সিদ্ধ এবং ভাজায় অনেকের দুই বেলার আহার চলে।

সাধারণত পাটের ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইলে, পাট কাটা শুরু হয়। ফল ধরিতে থাকিলে গাছ ক্রমশ শক্ত হইতে থাকে, তখন কাটিলে পাটের ফলন বেশি হয় না, একেবারে ফল পাকিয়া গেলে, পাটের বেছন ব্যতীত পাটের ফলন ও আইস ভাল হয় না। মাটি সমান করিয়া গাছ কাটার রীতিই সর্বত্র প্রচলিত, যে স্থানে অধিক জল হয় তথায় উপড়াইবার প্রথাও দেখা যায়। সদর অপেক্ষা সিরাজগঞ্জে যেমন প্রথমে চাষের প্রথা বা রীতি আছে, তদ্রূপ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় হইতে তথায় পাট কাটা ও ধোয়ার রীতিও প্রচলিত আছে ; সচরাচর রথের দিন হইতেই পাট অনেক সময় বাজারে আমদানি হয় এবং মহাজনেরা অনেকে ঐ দিনে শুভক্ষণে খরিদ বিক্রি আরম্ভ করে।

পাট কাটিয়া গৃহস্থগণ সাধারণত ছোট ছোট আটি বাঁধে। প্রথমে তাহারা পাতা সংযুক্ত উপরাংশ অন্য আটির ভারি নিম্নাংশ দিয়া ক্রমান্বয়ে পরপর ক্ষেতে লম্বা লম্বা পাতা ঝরিয়া পড়িবার জন্য কয়েক দিন ফেলিয়া রাখে। আটি বাধিবার পূর্বেও এইরূপ আগাগোড়া চাপা দিয়া ক্ষেতে ফেলিয়া রাখিবার রীতি আছে। পাতা ঝরিয়া পড়িলে পর জাগ দেওয়া হয়।

(৩) জাগ দেওয়া—আটিগুলি মাঠিয়াল, ডোবা আদি জলাশয়ে ফেলিয়া তাহার দুই দিকে দুইখণ্ড বাঁশ পুতিয়া তৎসহ অপর একখণ্ড বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে বাঁধিয়া যাহাতে আটিগুলি অন্তত আধ হাত পরিমাণ জলের নিচে ডুবিয়া থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখে। কখনও কখনও আটিগুলির উপর মাটির স্তর কাটিয়াও তাহা জলমগ্ন করিয়া রাখা হয়। বদ্ধ জলে সত্বরে ভাল জাগ আসে অর্থাৎ গাছের আঁশ পচিয়া থাকে, ইহাতে সচরাচর ১২/১৪ দিন লাগে। স্রোতের জলে ১৫ হইতে ২০ দিন পর্যন্তও আবশ্যক হয়। জাগের পাট পচিয়া যে দুর্গন্ধ উত্থিত হয়, তাহা স্বাস্থ্য পক্ষে বিশেষ অপকারক। স্রোতহীন বদ্ধ স্বচ্ছ জলে যেমন সত্বরে জাগ আসে, তদ্রূপ পাট ধোয়ার পক্ষেও সুবিধাজনক। ঘোলা কর্দমাক্ত জলে পাটের আঁশ বেশি নষ্ট হয় এবং রং খারাপ হইয়া থাকে।

(৪) ধোয়া—পাবনা সদর হইতে সিরাজগঞ্জে পাট ধোয়ারও কিছু বিশেষত্ব আছে। সদরে জাগ হইতে আটিগুলি ক্রমশ উঠাইয়া কৃষকেরা তাহা উচ্চ ভূমিতে বা বাড়িতে লইয়া আসে, তথায় তাহারা সংসারের স্ত্রী পুরুষ পরিজনবর্গ এবং পাইট মজুরাদি মিলিত হইয়া পাট ছুলিতে আরম্ভ করে। বাম হাতে প্রত্যেকটি গাছের একটি একটি করিয়া দক্ষিণ হাতে তাহার আঁশ ছড়াইয়া এক স্থানে গাদা করিয়া থাকে। পরে উক্ত গাদা হইতে ক্রমশ আঁশগুলি জলে ধুইয়া পরিষ্কার করতঃ পাট বাহির করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লয়। তখন ভালমন্দ পাট প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে একজন লোকে দৈনিক গড়ে প্রায় আধ মন পাট ধুইয়া পরিষ্কার করিতে পারে। সমস্ত দিন দুর্গন্ধময় অপরিষ্কৃত জলের মধ্যে বা ধারে দাঁড়াইয়া ও বসিয়া পাট ধোয়া কিরূপ আরামপ্রদ তাহা সহজে অনুমেয়।

সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে পাটের আটিগুলি জলের মধ্যেই একত্র করিয়া তাহার ধারে এক কোমর জলে দাঁড়াইয়া বা তাহার নিকটে নৌকাদি লাগাইয়া এক এক মুঠা পাট গাছ বাম হাতে লইয়া দক্ষিণ হাতে এক ফুট পরিমাণ লম্বা ব্যাটের ন্যায় কাঠ দ্বারা গাছের গোড়া হইতে এক তাত দূরে তাহা ভাঙিয়া লয়। পরে জলের মধ্যে দুই হাতে পাটের গাছগুলি সজোরে ৩/৪ বার নাড়া দিয়া পাটের গাছ হইতে আঁশগুলি বাহির করিয়া লয়। গাছের শাঁস (পাট কাঠি) জলের মধ্যেই পড়িয়া থাকে। পূর্বোক্ত প্রথায় একটি মাত্র শাঁস বাহির হয়, কিন্তু ইহাতে অনেকগুলি একত্র বাহির হইয়া থাকে। তবে সদরের পাট গাছের বেশি ডাল পালা থাকে সেজন্য এক একটি করিয়া ছাড়ানই সুবিধাজনক, সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের পাটে বেশি ডাল পালা না থাকায় শেষোক্ত প্রথায় ধোয়ার রীতি সহজসাধ্য। পৃথক পৃথক প্রকারে পাট ধোয়ার অপর কারণ সদরে সর্বত্রই উচ্চ ডাঙা জমিতে বসিয়া পাট ধোয় যায়, কিন্তু সিরাজগঞ্জের জলমগ্ন মাঠে উচ্চ ভূমি দুর্লভ। সে জন্য কৃষকেরা সত্বর সত্বর কাজ শেষ কবিবার জন্য এক এক বারে এক মুট গাছ লইয়া পূর্ব বর্ণিত প্রথায় পাট ধুইয়া থাকে। ইহা তথায় সুবিধাজনক, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহাদিগকে জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া পাট ধুইতে হয়। ইহাতে অর্ধভুক্ত কিংবা নিরন্ন কৃষককুলের স্বাস্থ্য কিরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে তাহা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেরই বোধগম্য।

(৫) খরচ—পাটের আবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া নিড়ান ও ধোয়া শেষ পর্যন্ত বিঘা প্রতি প্রায় ২৭৲ হইতে ২৮৲ টাকা পরিমাণ খরচ হইয়া থাকে। উৎপন্নের পরিমাণ প্রতি বিঘায় প্রায় ৫ হইতে ৮/৯ মন। পলি মৃত্তিকা যুক্ত চর জমি এবং সিরাজগঞ্জের স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট দোঁয়াশ জমিতে বিঘা প্রতি প্রায় ১০/১১ মনের অধিকও পাট জন্মে। তজ্জন্য সদর অপেক্ষা তথাকার জমি সময় সময় প্রতি বিঘা ৪ হইতে ৫ শত টাকা মূল্যেও খরিদ বিক্রি হয় এবং সাধারণ কৃষকেরা তথায় সহজে জমি খরিদ করিতে পারে ন।

(৬) বিক্রয় প্রথা—পাট সচরাচর দুই প্রকার প্রথায় বিক্রয় হয়। প্রথম প্রথায় গৃহস্থগণ আপনাপন প্রয়োজনানুযায়ী বাজার সওদার জন্য পাঁচ সের হইতে এক মন পর্যন্ত হাটে বাজারে লইয়া গিয়া নিজেরা বিক্রয় করে। কিংবা (১) ফড়িয়াগণ বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া গ্রামে গৃহস্থগণের

নিকট হইতে বাজার দরে খরিদ করে ; পরে তাহার খরিদা পাট (২) ব্যাপারিগণের নিকট কিছু লাভ রাখিয়া বিক্রয় করে। কখনও কখনও ব্যাপারিগণ হাটে বসিয়া চাটাই করিয়া গৃহস্থগেণর নিকটও খরিদ করে। ব্যাপারিগণ পরে তাহাদের খরিদা পাট (৩) মহাজনদিগের আড়, গোলা বা কুঠিতে বিক্রয় করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রথায় মহাজন, কুঠিয়াল বা বেলওয়ারগণ গৃহস্থদিগকে ফড়িয়া দালাল প্রভৃতির মারফতে পাট জন্মিবার পূর্বে দর সুস্থির করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে পাট দিবার চুক্তিতে অগ্রিম টাকা দাদন করে। তাহারা নির্দিষ্ট সময়ে স্বীকৃত দরে (সাধারণত বাজার অপেক্ষা কমে) মহাজনদিগের গোলাবাড়িতে পাট পৌছাইয়া দেয়। সিরাজগঞ্জের কোন কোন ইংরেজ সওদাগরগণ এরূপ চুক্তিতে পাট দিবার জন্য ফড়িয়া ও কৃষকগণের নিকট সময় সময় স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্রও লেখাইয়া লয়। এই প্রকার অগ্রিম দাদনে পাট খরিদ বিক্রয় প্রথা অতি কম হইলেও প্রচলিত আছে। ইহাতে সুবিধা অসুবিধা উভয়ই আছে। কৃষকেরা অগ্রিম টাকা লইয়া নিড়ানাদি সময়ে অর্থ সাহায্য পাইয়া উপকৃত হয়, কিন্তু বাজার দর অপেক্ষা অনেক সময় কম মূল্য পায়। আবার যদি অজন্মার বৎসর হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের দুর্দশার সীমা থাকে না, কারণ শ্রাবণ ভাদ্রে উক্ত প্রকারে অগ্রিম টাকার পরিমাণ পাট দিতে না পারিলে স্থলবিশেষে টাকা প্রতি মাসিক ।।৷ সের হইতে ।১ সের হিসাবে ধরতা (সুদ) কিংবা শতকরা মাসিক একটা নির্দিষ্ট সুদ দিবার নিয়ম থাকায় মহাজনেরা পর বৎসর সুদ আসল তলব করিয়া থাকে।

মহাজন, ব্যাপারী এবং কৃষকগণের মধ্যে খরিদ বিক্রির জন্য দালাল বা মধ্যস্থ ব্যক্তিগণ দর ঠিক করিয়া দেয়। তাহারা উভয় পক্ষের নিকট হইতে মনকরা কিংবা টাকা শতকরা কিছু কিছু পাইয়া থাকে। তাহারা বেচাল ও কেনাল পরস্পরকে পাটের প্রকৃত দর জানিতে দেয় না। উভয়ের নিকট যাইয়া নিজ নিজ মনোমত দর ঠিক করিয়া দেয় মাত্র। এই প্রকারে কৃষকেরা অনেক সময় প্রকৃত বাজার দর অবগত হইতে পারে না। আবার তাহারা আপনাপন দর দস্তুরের কথাবার্তা মৌখিক ঠিক না করিয়া এক জন অপরের হাতে হাত দিয়া সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও কথা দ্বারা পাটের দর সুস্থির করে। ইহাতে সমস্তই গোপন থাকে। অন্যেরা কিছু জানিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, অনেক সময় পাটের প্রকৃত দর জানিতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৭) আমদানি, রপ্তানি—

	আমদানি	রপ্তানি
খ্রিস্টাব্দ	মন	মন
১৮৭৭/৭৮	২৩,৫৪,০০০	৯,৮২,০০০
১৮৭৮/৭৯	২৭,৩৯,০০০	১৫,৩৬,০০০
১৮৭৯/৮০	৩২,৩৭,০০০	১৬,৯৭,০০০
১৮৭১/৭২	×	২,৪৫,৬৪৯
১৯২১/২২	×	১১,৩০,০০০

(৮) পাট আবাদে লাভালাভ—"এখন অনেক কৃষক ধান্যের চাষ কমাইয়া পাটের চাষ অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাতে নগদ টাকা হাতে বেশি আসে বটে, কিন্তু ধান্যের চাষ লোকবৃদ্ধি অনুপাতে কমিয়া যাওয়াতে ধান্যের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় নগদ টাকার বৃদ্ধিতে কোন লাভ হয় না।"

পাট আবাদের উপকারিতা ও অপকারিতা বিচারের ইহা সম্পূর্ণ উপযুক্ত স্থল নহে ; কিন্তু পাবনার স্থানীয় সাপ্তাহিক "সুরাজ" পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে "ধান বনাম পাট" শীর্ষক প্রবন্ধে এই জেলা এবং পার্শ্ববর্তী জেলার পাট আবাদে অধিকতর মনোযোগী কৃষককুলের অবস্থা

আলোচনাপূর্বক যে সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উল্লেখযোগ্য বিধায় তাহার সারাংশ "দেশের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধাংশে প্রবাসী—কার্তিক—১৩২৩ সংখ্যায় ৯৫ পৃষ্ঠায় সমর্থিত ও উদ্ধৃত হইয়াছিল। নিম্নে তাহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। ইহাতে পাট আবাদের লাভালাভ কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধি হইবে।

"বাংলাদেশে পাটের আবাদের প্রসার ক্রমেই বাড়িতেছে। এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক সর্বদাই বলিয়া থাকেন যে, পাটের অনুকম্পায় এদেশের কৃষিজীবী লোকের আর্থিক অবস্থা দিন-দিনই উন্নততর হইতেছে। এই বিশ্বাস বা অনুমানের মূলে আদৌ কোন সত্য আছে কিনা বিশেষভাবে তাহার আলোচনার আবশ্যক।

"লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল, একথা বলা যায় কিসে? ভাল মন্দ অবস্থার মাপকাঠি কি?

"কৃষিপ্রধান দেশমাত্রেই ৫/৭ বৎসর পরে এক একবার অজন্মা হইয়া থাকে। দেশে যতদিন বড়লোক থাকিবে, দুঃখেই হউক আর কষ্টেই হউক মুটে মজুরদের দিন এক রকমে চলিয়া যায়। কিন্তু কৃষিকার্যই যাহাদের জীবিকার্জনের একমাত্র সম্বল, ক্ষেত্রে শস্য না জন্মিলে তাহাদেরই সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হইয়া থাকে। কৃষিকার্যের জন্য হাল-লাঙ্গল, গরু বাছুর, বীজ, নিড়াইবার ও কাটিবার জন্য অর্থ প্রভৃতি অনেক জিনিসের দরকার হয়। দুর্ভিক্ষের বৎসরে অনেক কৃষকই হাল-লাঙ্গল প্রভৃতি বেচিয়া খাইতে বাধ্য হয়, সুতরাং দুর্ভিক্ষাবসানের পরও অনেক দিন পর্যন্ত তাহারা আর এই সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না। তবে কৃষকেরা সুজন্মার বৎসরেও যদি কিছু কিছু খাদ্যশস্য বা তৎবিক্রয়লব্ধ অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে, তবে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও তাহারা কোনও ক্রমে অনটনের বৎসর পাড়ি দিতে পারে। যে কৃষকের এই সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি অর্থাৎ যাহার ঘরে যত বেশি খাদ্যশস্য মজুত থাকে তাহার অবস্থা তত ভাল। বস্তুত একমাত্র ইহাই ভাল মন্দ অবস্থার একমাত্র মাপকাঠি।

"বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রথম বৎসরে পাটের বাজার একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছিল, তাহার ফলে, যুদ্ধারম্ভের পর এক মাস যাইতে না যাইতেই পূর্ববঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলার কৃষকদের ঘরে ঘরেই হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছিল। ইহার কারণ কি? পাটের আবাদে যদি কৃষকের অবস্থা ক্রমশই ভাল হইয়াই থাকে, তবে একমাস মাত্র পাট বেচিতে না পারায় তাহাদের এরূপ দুর্দশা হইবে কেন? ইহা কি অবস্থোন্নতিরই প্রকৃষ্ট পরিচায়ক? একথা কেহ বোধ হয় বলিবেন না যে ঐ বৎসরে বাংলাদেশে ধান জন্মে নাই; বরং সে বৎসরে ধানের আবাদ পুরাপুরি হইয়াছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পাটের আবাদে যদি লোকের অবস্থা ভালই হইবে অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব বৎসরে পাট বিক্রয় করিয়া লোকে যদি কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিত তাহা হইলে দেশে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও জমিদার মহাজনের ঋণ শোধ তো পরের কথা, নিজেদের উদরপূর্তির জন্যই তাহাদিগকে চক্ষে এরূপ সরিষার ফুল দেখিতে হইত না।

"পাবনা, মৈমনসিংহ, ঢাকা ও ফরিদপুর---বাংলাদেশের মধ্যে সাধারণত এই চারটি জেলাতেই সর্বাপেক্ষা বেশি পাটের আবাদ হইয়া থাকে।

"এই সকল স্থানে গেলে পাটোৎপাদনকারী কৃষকের বাড়িতে বড় বড় টিনের ঘর ও কাঠের খুঁটি দেখিয়া প্রথমত অনেকের মনেই ইহাদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে। কিন্তু একটু-অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে যে এই সমস্ত বড় বড় টিনের ঘর বাড়ি ঘোড়া নৌকা প্রভৃতি সমস্তই মহাজনের নিকট রেহানাবদ্ধ, অধিকাংশেরই দেনার পরিমাণ এত বেশি যে তাহা কোন কালে শোধ হইবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং এই সমস্ত বাড়ি-ঘরকে কৃষকদের বাড়ি ঘর না বলিয়া মহাজনদের বাড়ি-ঘর বলিলেই বোধ হয় ন্যায় বিচার করা

হইবে। পাটের আবাদে একসঙ্গে কতকগুলি টাকা পাইবার সুবিধা থাকাতে মহাজনগণ বেশ অনায়াসে কর্জ দিতেছে এবং কৃষকেরাও পাট হইলেই মহাজনদের দেনা শোধ করিয়া ফেলিব এই আশায় খুব উচ্চ সুদে কর্জ করিতেছে। সুতরাং ইহাতে কৃষকদের কর্জ করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িলেও উহাদের অবস্থার কিন্তু কোনও উন্নতি হইতেছে না ইহা নিশ্চয়।

"সর্বপ্রকার খরচপত্র বাদে পাট বা ধান হইতে কত লাভ থাকে তাহা কি কেহ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন? ধান বুনিয়া কোনও রকমে নিড়াইয়া দিতে পারিলেই কৃষকের সকল কাজ শেষ হয়। পরে পাকিলে ধীরে ধীরে কাটিয়া আনিয়া নিজেরাই মাড়াই প্রভৃতি করিয়া লইতে পারে। সুতরাং ধানের আবাদে নিজেদের পরিশ্রম ব্যতীত ঘর হইতে খুব বেশি অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। কিন্তু পাটের আবাদে কি তাই হয়? পাটের বুনানী হইতে বিক্রয় পর্যন্ত খরচের অন্ত নাই। অধিকাংশ জমিতেই অন্তত দুইবার নিড়ানি ও বাছট দিতে হয়। তারপর পাট কাটা, ধোয়া, শুকান তো এক মহামারী ব্যাপার। একদিন আগ-পাছ হইলেই সব নষ্ট হয়—সুতরাং যেরূপেই হউক উচ্চ-হারে মজুর রাখিয়া এই সমস্ত কাজ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

"প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকার পাট বিদেশে রপ্তানি হয়। পাটের অফিসের দারোয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া বড়বাবু পর্যন্ত সকলেই বেশ দু-পয়সা রোজগার করে, অথচ যে কৃষক পাট আবাদ করে সে অন্নাভাবে শুকাইয়া মরে। কেন এরূপ হয় তাহাও "সুরাজ" বুঝাইয়াছেন—

"আমাদের দেশে অধিকাংশ কৃষকেরই এমন অবস্থা নয় যে বাজার নরম দেখিলে দু'চার দিন পাট না বেচিয়াও পুঁজি হইতে সংসার চালাইতে পারে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে অধিকাংশ কৃষকই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে অতিরিক্ত সুদে মহাজনের নিকট টাকা কর্জ বা দাদন লইয়া পাটের আবাদ করিয়া থাকে। এই সকল মহাজন তীর্থের কাকের মত হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে এবং পাট ধোয়া আরম্ভ করিলেই তাহারা চারিদিক হইতে একেবারে পঙ্গপালের মত আসিয়া হাজির হয়। আষাঢ় মাসে জমিদারকেও কিছু দেওয়া হয় না। সুতরাং জমিদারের গোমস্তারাও একেবারে দুই কিস্তির তাগাদা লইয়া দেখা দেয়। এদিকে ঘরে প্রচুর পাট মজুত থাকিলেও, অধিকাংশ লোকের ঘরে এক সের চাউলও থাকে না। পাট বেচিবে তবে মুখে হাত উঠিবে। সুতরাং কৃষকদের পক্ষে তখন পাট বিক্রয় ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকে না। পাটের ব্যবসায়ীরা কৃষকদের এই দুর্বলতার খবর বেশ ভাল রকমেই জানে। সুতরাং তাহারা সকলেই কিছু না কিছু ঢিল কাটিতে থাকে। কাজেই বাজার অনেকটা নামিয়া যায়। সুতরাং কৃষকেরা যে দর পায়, তাহাতেই পাট বেচিয়া ফেলে। দেশিয় মহাজনেরা বা কোম্পানির বেতনভোগী ক্রেতা বা কমিশন এজেন্টরা এই সময়ে খুব অল্প দরে পাট কিনিয়া রাখে। শুধু তাহাই নহে। এই ক্রেতারা আবার নানা রকম বিশ্বাসী ও অভাবক্লিষ্ট কৃষকদের নিকট মনকরা অন্তত আট দশ সের পাট আদায় করিয়া থাকে। পরে এই পাট তাহারা উচ্চ দরে কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিয়া বেশ দু পয়সা লাভ করিয়া থাকে।"

কৃষগণের অবস্থা ছড়িয়া ব্যবসায়িগণের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পাটের ব্যবসায় দ্বারা এই জেলার সোহাগপুর, দেলুয়া, উল্লাপাড়া, সাতবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানের বৈশ্যসাহা, দোগাছি, সুজানগর বেড়া, নাকালিয়া প্রভৃতি বন্দরের তিলি জাতীয় মহাজনগণের অনেকে এবং স্থান বিশেষের মুসলমানগণ অনেকে কেহ মহাজন, কেহ ব্যাপারী, কেহ ফরিয়া প্রভৃতি রূপে কিঞ্চিৎ লাভবান হইয়াছেন। অনেকে অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি অল্পদিন মধ্যে স্বীয় অবস্থার সাতিশয় উন্নতি ও পরিবর্তন করিয়াছে। নিমগাছি ও তাড়াস অঞ্চলের অনেক বুনিয়া ও সাঁওতাল জাতিরা পাটের আবাদে কিছু টাকা পাইয়া বাড়িতে বড় বড় করগেট টিনের ঘর নির্মাণ করিয়াছে। এই জেলার বেড়া, সিরাজগঞ্জ, সাতবাড়িয়া আদি নানা স্থানের বন্দরে অনেক ইংরেজ সওদাগরগণও পাট খরিদ করিয়া ইহার

ব্যবসায়ে লাভবান হইয়াছেন। পাটের বাজার দর অন্যান্য জিনিসের দর অপেক্ষা অল্প সময় মধ্যে অধিক পরিবর্তন হয় সেজন্য অনেক মহাজন যেমন স্বল্প দিন মধ্যেই লক্ষপতি হইয়াছেন, অনেকের আবার ভাগ্যলক্ষ্মীর কল্যাণে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইতেছে ও হইয়াছে।

পাটের আবাদের কল্যাণে অনেকেই কিঞ্চিৎ লাভবান হইতেছেন ও অনেক গৃহস্থই ইহাতে সাময়িক কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়া থাকে। ইহাতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া আমাদের দেশের সাধারণ হাস্যরসিক গ্রাম্য কবি পাট সম্বন্ধে নানারূপ কবিতাদিও রচনা করিয়াছেন। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থ সিরাজগঞ্জের ইতিহাস হইতে তৎসম্বন্ধে একটি গান উদ্ধৃত হইল।

পাটের গান

ওরে আমার সাধের পাট
তুমি ছেয়ে আছ বাঙ্গলা মুল্লুক, বাঙ্গাল দেশের মাঠ।
যে দেশে যেখানে যাই, সেথায় তোমায় দেখ্‌তে পাই।
গ্রামে গ্রামে আফিস তোমায় পাড়ায় পাড়ায় হাট।
ধান ফেলিয়া তোমায় বোনে,
বাধা নিষেধ নাহি শুনে,
ছালায় ছালায় টাকা গোণে, চাষার বাড়ছে ঠাট।
যার ছিল না ছোনের কুঁড়ে
তার এখন বাড়ি জুড়ে
চৌচালা আট চালা কত ঝিল মিলে কপাট।
তোমার হলে অল্প ফলন,
কঠিন বড় খাজনা চলন,
রাজা প্রজা সবার দলন, বিষম বিভ্রাট।
সার্ভিয়া অস্ট্রিয়া লড়াই
আমরা নাহি তারে ডড়াই
তোমার হলে খরিদ বন্দ তাইতে গৌরাঙ্গ কাঠ।
মহাজন দেয় না টাকা
কিসে যায় আর বেঁচে থাকা,
পাঞ্জাব, মাদ্রাজে আকাল, বাঙ্গলা, গুজরাট।

সিরাজগঞ্জের ইতিহাস—৯০ পৃষ্ঠা।

ঘ. কলাই, মুগ মটর, বুট, মশুরাদি এই জেলার প্রধান রবি শস্য। মুগ কলাই সাধারণত পদ্মা, যমুনাদি নদীর চরে আশ্বিন কার্তিক মাসে জল নামিয়া গেলে ছিটাইয়া বুনানী হয়। বিলময় শাহজাদপুর অঞ্চলের সুবিস্তৃত প্রান্তর বা পাঁথারে খেসারি ছিটাইয়া আবাদ হয়। খেসারি বাজারে সর্বাপেক্ষা অতি কম মূল্যে বিক্রি হয় ; তজ্জন্য তথাকার খেসারি ফসল অপেক্ষা গবাদির খাদ্য রূপে ঘাস স্বরূপে বেশি বিক্রি হইয়া থাকে। এই জেলার মুগ সাধারণত হরিৎ বর্ণ ও সোনামুগ নামে অভিহিত হয়। ইহার ডাল অতি সুস্বাদু। সুজানগর, দাদাপুর প্রভৃতি গ্রামের পদ্মার চরে এবং হরিণাবাগবাটি আদি গ্রামের ইছামতী প্রভৃতি নদীর তীরস্থ মাঠে উত্তম সোনামুগ জন্মে। মটর চর জমি ও ভড় উভয়বিধ স্থানেই আবাদ হয়। মটর মাঘী (মাঘ মাসে উঠান) ও চৈতা (চৈত্র মাসে উঠান) ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে মাঘী মটরের ডাল সুসিদ্ধ হওয়ার জন্য আহারে সুস্বাদু। কাঠেঙ্গা, ডেমড়াদি অঞ্চলের মটর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বুট এই জেলার অতি অল্পই আবাদ হয়। সিলিমপুর, পাকুরিয়াদি অঞ্চলের বুট ভাল। মটর, খেসারি, মশুর, বুট প্রভৃতি সাধারণত চৈতালী শস্য বলিয়া পরিচিত। অরহর জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ় মাসে ধানের সঙ্গে আবাদ হয় এবং মাঘ ফাল্গুনে কাটা হয়, তাহাও চৈতালি মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এই সমস্ত চৈতালি আবাদ ও বিক্রয় করিয়া কৃষককুল আপনাপন সাংসারিক খাদ্য ও হাতে নগদ পয়সা সংগ্রহ করে। চৈতালি উঠিবার পরই হাতে নগদ পয়সা সংগ্রহ হয়, তজ্জন্য মুসলমান গৃহস্থগণের অনেকেরই ফাল্গুন চৈত্র মাসে পুত্র কন্যাদির বিবাহ হইয়া থাকে। মটর খেসারি আদির ভূসিতে গবাদির অনেক খাদ্য সংগ্রহ হইয়া থাকে। কলাই মটর খেসারি আদি এবং রাই সরিষা প্রভৃতি সমস্তই ভুষা মাল নামে পরিচিত হয়।

ঙ. সরিষা, রাই মসিনা, তিল প্রভৃতি তৈল প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত শস্যও এই জেলায় অল্প বিস্তর আবাদ হয়। সরিষাদি রবি শস্য ; কিন্তু মসিনা চৈতালি মধ্যে পরিগণিত ও সাধারণত তিসি নামে পরিচিত। শাহজাদপুরের বিলময় পাঁথারে রাই সরিষাদির আবাদ বেশি। ইহা সাধারণত "মাল" নামে আখ্যাত। তিল দুই প্রকার ঃ (ক) কৃষ্ণতিল—সাধারণত বর্ষার সময়ে বা পরে বুনানী হয় ; পৌষ মাসে কাটা হয় ; (খ) কাটতিল—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে আবাদ হয়, ভাদ্র আশ্বিনে কাটা হয়। কাটতিল খুলুয়া সাধারণত সরিষার সহিত মিশ্রিত করিয়া তৈলে ভেজাল দেয়। রাই সরিষাদির খৈল গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং ভাঙুরিয়া বেড়াদি অঞ্চল হইতে অনেক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতে দেখা যায়। সাঁড়া, সুজানগর, সাঁথিয়াদি থানার অনেক গ্রামে মসিনার আবাদ হয়। সুজানগর ধাপারি দুলাই প্রভৃতি হাটে অনেক মসিনা খরিদ বিক্রি হইয়া থাকে।

চ. ধনিয়া, কৃষ্ণজিরা, রান্ধুনী, পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, হলুদ আদি মসলা জাতীয় শস্যও এই জেলার কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে প্রধান। ধনিয়া সর্বত্রই অল্পবিস্তর আবাদ হয়, চর-জমিতেও ধনিয়া জন্মে। সাঁথিয়া সুজানগর, দুলাই, সাঁড়া প্রভৃতি থানার অনেক গ্রামে ইহা পাওয়া যায়। গাজনার বিল এবং সাতবাড়িয়া অঞ্চলে উত্তম কৃষ্ণজিরা জন্মে। পেঁয়াজ, রসুন প্রায় সকল গৃহস্থই বিক্রির জন্য না হউক নিজ খাদ্যরূপে ব্যবহার জন্য বাটির পার্শ্বে আবাদ করে। পেঁয়াজ দুই প্রকারে আবাদ হয়। প্রথম প্রথায় বেছন পৃথক চারা দিয়া তাহা উঠাইয়া পুনরায় আবাদি জমিতে লাগান হয় ; দ্বিতীয় প্রথায় এক একটি গোটা পেঁয়াজ সারি দিয়া তৈয়ারি জমিতে লাগান হয়। প্রথম প্রথাই সর্বত্রই বেশি দেখা যায়। পেঁয়াজের ন্যায় তাহার ফুলও যথেষ্ট বিক্রি হয়।

লঙ্কা মরিচ ধনী দ্ররিদ্র উভয় শ্রেণীর লোকেরই নিত্য প্রয়োজনীয় শস্য ; এই জেলায় সর্বত্র আবাদ হয়। ইহা দুই প্রকার—খেতাল ও গাছ মরিচ। খেতাল মরিচ মাঠান জমিতে সচরাচর আবাদ হয়। ইহার গাছ এক এবং কিংবা দেড় হাতের বেশি উচ্চ হয় না। কিন্তু চারিদিকে ডাল বিস্তৃত হয়। গাছ মরিচ বাটির পার্শ্বে ছায়াযুক্ত স্থানে আবাদ হয়। ইহা গাছ ২ হইতে ৩ হাত পর্যন্তও উচ্চ হয়। খেতাল মরিচ অপেক্ষা ইহার ঝাল বেশি। গাছের তলে জন্মে কিংবা গাছের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে সেজন্য ইহা গাছ মরিচ নামে খ্যাত। ইহার গাছ একবার লাগাইলে ২/৩ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। খেতাল মরিচের ফল সাধারণত নিম্ন দিকে ঝুলিয়া থাকে, কিন্তু গাছ মরিচের ফল উর্ধদিকে উঠিয়া থাকে জন্য ইহা সাধারণত "উব্‌দা" মরিচ নামেও পরিচিত হয়। এই দুই প্রকার মরিচ ব্যতীত "ধানে" মচির নামে অতিরিক্ত ঝাল বিশিষ্ট ক্ষুদ্র এক প্রকার মরিচ স্থানে স্থানে চাষ হয়। এমন স্থান নাই যেখানে লঙ্কা মরিচ পাওয়া যায় না ; তবে কৈজুরি, দাশুরিয়া ও কাশীনাথপুর হাটে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমদানি হয়।

লঙ্কার পর হলুদ এই জেলার মসলা শস্যের মধ্যে প্রধান। সাঁড়া থানার সাহাপুর, দিঘে, সিলিমপুর প্রভৃতি গ্রামে এবং আতাইকুলাদি অঞ্চলে ইহার অত্যধিক আবাদ হয়। দাশুরিয়ার হাটে ইহা সমধিক পরিমাণে আমদানি হয়। এই সব অঞ্চলের এবং পাবনার স্থানীয় মহাজনেরা ইহা বাঁধাই করিয়া মজুত রাখেন এবং ২/৪ বৎসর পর পরই ইহার ব্যবসায় বিস্তর লাভবান হয়েন। সদর ব্যতীত সিরাজগঞ্জে ইহার আবাদ বেশি হয় না।

হলুদ সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসে আবাদ হয়। দেড় হাত ফাঁক দিয়া অর্ধ হাত পরিমাণ উচ্চ মাটির আইল দ্বারা আবৃত করিয়া হলুদের বেছন বুনানী করিতে হয়। পুনরায় আষাঢ় শ্রাবণ মাসে তাহা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। জল জমিয়া গাছের অনিষ্ট বা আইল ডুবিয়া না যায় তজ্জন্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়। হলুদের গাছ সচরাচর ২ হাতেরও বেশি উচ্চ হয়। উর্বর জমিতে যত মাটি দিয়া আইলগুলি উচ্চ করিয়া দেওয়া যায়, হলুদের ফলন তত বেশি হয়। হলুদ শস্য হইলেও ইহা মূল জাতীয় উৎপন্ন দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। পৌষ মাঘে হলুদের গাছ শুকাইতে আরম্ভ হয়। তখন হইতে ইহা উঠান আরম্ভ হয়। একবার সিদ্ধ করা এবং পুনরায় তাহা রৌদ্রে শুকান অতি শ্রমসাধ্য কার্য। বেছনের মূল্য, জমি আবাদের খরচাদি লইয়া প্রতি বিঘা হলুদের জমিতে আবাদের খরচে প্রায় ২৫/২৬ টাকা পরিমাণ ব্যয় হয়। ইহার উপর খাজানা প্রায় ৪্ হইতে ৬্ টাকা পরিমাণ লাগে। প্রতি বিঘায় জমি অতি উৎকৃষ্ট হইলে গড়ে প্রায় ২৫/২৬ মন কাঁচা অর্থা ৫/৬ মন শুকনা হলুদ জন্মে। হলুদের বাজার দর প্রায় প্রতি দশ বৎসর পরপর মন প্রতি ৩/৪ টাকা হইতে ২০/২৫ টাকা পর্যন্তও হইয়া থাকে। কিন্তু বিগত ১৯১৪ অব্দের জার্মান যুদ্ধের পর হইতে ইহার বাজার অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯২২/২৩ অব্দে এই জেলায় হলুদ ৩৫ হইতে ৪০ টাকা মূল্যেও বিক্রি হইয়াছে। এক্ষণে বাজার দর ৮/৯ টাকা।

হলুদ ও ইক্ষু আবাদ করিয়া জমির উর্বরা শক্তি সহজে নষ্ট হয় সেজন্য এই উভয় জাতীয় শস্য আবাদি জমির খাজানা বেশি হইয়া থাকে। ধান ও পাট আবাদি জমির ন্যায় ক্রমাগত ২/৩ বার এই শস্যের আবাদ করিয়া তৎপর ইহার জমিতে অন্য কোন ফসল জন্মে না।

ছ. ইক্ষু—এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহা কুশুর নামে সচরাচর পরিচিত। সিরাজগঞ্জের জমি অধিকাংশই নিম্ন ভূমি বিধায় তাহা জলে ডুবিয়া যায় সেজন্য সদর মহকুমায়ই ইহার বেশি আবাদ হয়। পাবনা, সাঁড়া, সাঁথিয়া, সুজানগর প্রভৃতি থানায় ইহার আবাদ বেশি। মাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাস পর্যন্ত ইহার চাষ শেষ হয়। ইহাও হলুদের ন্যায় সারি সারি লাগাইতে হয়। তবে হলুদ বাগানে গাছের নিম্নেও অনেক সময় লাগান যায় কিন্তু ইক্ষু উন্মুক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মে না। শুকরের উপদ্রব ইক্ষু চাষের প্রধান অন্তরায়। ইহাদিগকে তাড়াইবার জন্য কৃষকগণকে সময় সময় ক্ষেতে উচ্চ বাঁশের উপর চালা (টোঙ্গ) বাঁধিয়া রাত্রিতে তথায় পাহারা দিতে হয়। বন্দুক ও গাঁঠে দ্বারা কিংবা অন্য কোন প্রকারে শব্দ না করিলে শুকরের উৎপাতে সমস্ত শস্য নষ্ট হয়। সাধারণত কৃষকেরা রাত্রিতে বাঁশের নির্মিত ঠকঠকি লইয়া টোঙ্গের উপর শরকি, ফালাদি হস্তে ক্ষেতে পাহারা দেয় এবং ঠকঠকির শব্দ করে।

জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া প্রথমে ইক্ষুর বেছনখণ্ড তাহাতে সারি দিয়া গাড়িতে হয়। তৎপর গাছ ২/২৷৷ হাত উচ্চ হইলে ২/৩টি গাছ একত্র করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে বাঁধিয়া দিতে হয়। যত বেশি গোড়ায় মাটি দেওয়া যায় এবং সোজা উচ্চ ভাবে গাছ বাঁধিয়া দেওয়া যায় ফসল তত বেশি হয়।

গুড়ের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া রায় বাহাদুর বি. সি. বসু মহাশয় তৎকৃত Report on Sugercane Industries in E. B. and Assam (1907) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে প্রাচীন শাস্ত্র পুরাণাদিতে ইক্ষু দণ্ড ও রসের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত ইক্ষুদণ্ডসমূহের মধ্যে রজনীর গ্রন্থে নিম্ন লিখিত চারি প্রকার ইক্ষুর বিবরণ আছে যথা—(১) পৌণ্ড্রেক্ষু—পৌণ্ড্রদেশের ইক্ষু প্রাচীন করতোয়া বিধৌত প্রদেশ অর্থাৎ বর্তমান রঙ্‌পুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি জেলাদিতে উৎপন্ন ইক্ষু। (২) বংশেক্ষু—বংশ ইক্ষু। (৩) শ্যামেক্ষু—পীতবর্ণ ইক্ষু। (৪) রক্তেক্ষু—লালবর্ণ ইক্ষু। ইহার মধ্যে পাবনা জেলায় শ্যামেক্ষু ও ছোট রক্তেক্ষু পাওয়া যায়।

এই জেলায় সাধারণত ধলসুঁদর (সাদা), কাজলা (লাল), খৈতা (ছাই) ইক্ষুর আবাদ হয়।

তন্মধ্যে ধলসুঁদর সর্বাপেক্ষা ভাল, ইহার ছাল নরম। সাধারণ ইক্ষু (কুশুর) প্রায় কিঞ্চিদুর্ধ ৪ হাত লম্বা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই জেলায় বোম্বাই কুশুর নামে এক প্রকার ইক্ষু পাওয়া যায়, তাহা সাধারণত মাঠের জমিতে চাষ হয় না। গৃহস্থের বাটিতে স্থান বিশেষে বুনানী হয়। ইহা সাধারণ কুশুর অপেক্ষা মোটা এবং প্রায় ৭/৮ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহার গাইট বা পোর অতি ঘণ।

ইক্ষুর চাষ সকল ফসলের চাষ অপেক্ষা কষ্টকর। কারণ ইহার বুনানী হইতে আরম্ভ করিয়া রস জাল দিয়া গুড় তৈয়ার করা অতি পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য। তজ্জন্য কৃষকেরা অনেক সময় বিরক্ত হইয়া বলিয়া থাকে—

হলুদ বোনে শাহাজাদা,
কুশুর বোনে হারামজাদা।

অর্থাৎ হলুদ বুনিয়া বেশি পরিশ্রম করিতে হয় না, কিংবা গরু ছাগলে ইহার তত উপদ্রব করে না। নবাবের ন্যায় ঘরে বসিয়া থাকা যায়, কিন্তু এক বৎসর কাল ক্ষেত্রে স্থায়ী কুশুরে আবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া রস জ্বালান পর্যন্ত বহু পরিশ্রম হয়। শুকর তাড়ান ও তাহা হইতে ক্ষেত রক্ষা করা অতি কঠিন। কুশুর ভাঙান ও রস জ্বালান অর্থ ও শ্রম উভয় সাধ্য।

কুশুর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছড়া প্রচলিত আছে—

মাঘে উনা, ফাগুনে দুনা ;
চৈতে মৌড়া মূল বৈশাখে নির্মূলি।

অর্থাৎ মাঘ মাসে মাড়াই করিলে গুড়ের ফলন কম হয়, ফাল্গুনে দ্বিগুণ ফলন হয়, চৈত্রে ঠিক পরিমাণ হয় এবং বৈশাখে সমূলে নষ্ট হয়।

এই জেলায় কুশুর ভাঙান জন্য কৃষকেরা সাধারণত রেনুক কোম্পানির (Renwick Company Ltd.) লোহার কল দ্বারা শীতকালে কুশুর ভাঙাইয়া রস ও গুড় তৈয়ারি করে। উক্ত কল এই জেলার মফঃস্বলের গ্রাম বিশেষে স্থানে স্থানে মজুত রাখা হয়। গৃহস্থগণ তথা হইতে কল ও তৎসহ রস জ্বালান জন্য লোহার আয়ত ক্ষেত্রাকার কড়াই ২৫/৩০ টাকা ভাড়ায় এক খন্দ জন্য লইয়া নিজে বা গ্রামের ৫/৭ জনে একত্রে কুশুর ভাঙাইয়া গুড় তৈয়ার করে। কুশুর ভাঙাইতে ও রস জ্বালানি সময়ে গৃহস্থগণকে দিবারাত্র পর্যন্ত সমভাবে পরিশ্রম করিয়া গুড় তৈয়ার করিতে হয়। ইহা তেমন শ্রমসাধ্য হইলেও ইহাতে আবার আবালবৃদ্ধবণিতা মিলিত হইয়া অনেক সময় আনন্দ উপভোগ করে।

গুড় এই জেলার একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা দুই প্রকার। (১) লোচা অর্থাৎ শক্ত দানাযুক্ত। (২) মাত অর্থাৎ জলীয় ভাগযুক্ত। এতদ্ব্যতীত যে চিটা গুড় পাওয়া যায় তাহা সাধারণত এই জেলায় জন্মে না, অন্যত্র হইতে আমদানি হয়। গুড় হইতে ভুরা গুড় নামেও এক প্রকার দানাযুক্ত গুড় তৈয়ার হয়। ৫/৬ মন লোচা গুড় মটকি গুড় নামে পরিচিত মাটিয়া কোলায় রাখা হয়। বেড়া. কৈর্জুরি হাটে বিস্তর গুড় আমদানি হয়।

জ. খেজুরে গুড় কৃষিজাত না হইলেও তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য জেলার ন্যায় পাবনায় খেজুর গাছ মাঠে আবাদ হয় না। ইহা কেবলমাত্র লোকের বাটির পার্শ্বে বা বাগানে অল্পবিস্তর আপনাপনি জন্মে বা অযত্নে রোপিত হয়। কেহ ইহার আবাদ জন্য বিশেষ যত্ন করে না। কিন্তু ইহার গাছে যে গুড় তৈয়ারি হয় তাহা একটি বিশেষ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইক্ষুর ন্যায় ইহাও সিরাজগঞ্জ মহকুমা অপেক্ষা সদরে অধিক দেখা যায়। যাহারা খেজুর গাছ কাটিয়া গুড় তৈয়ারি করে তাহারা সাধারণত গাছি নামে পরিচিত হয়।

গাছ ৪/৫ হাত উচ্চ হইলেই আশ্বিন কার্তিক হইতে তাহা কাটা আরম্ভ হইয়া চৈত্র পর্যন্ত খেজুরা পাটারি বা গুড় তৈয়ারি হইয়া থাকে। গাছের একদিকের ডালগুলি কাটিয়া ইংরাজি y

অক্ষরের ন্যায় চাঁছিয়া তাহার নিম্নদিকে একটি বাঁশের নল বসান হয়। এক বৎসর যে দিকে কাটা হয়, পর বৎসর গাছের অপর দিকে পুনরায় কাটা হয়। এইরূপ যতদূর পর্যন্ত গাছ ক্রমশ বড় হইতে থাকে ক্রমে ডালও ততই কাটিয়া ও গাছ চাঁছিয়া বৎসর বৎসর রস বাহির করা বা লাগান হয়। বাঁশের নলদ্বারা ক্রমে রস চোয়াইয়া একটি ভাঁড়ে পড়ে। সাধারণত পূর্বদিন গাছ কাটিয়া ভাঁড় লাগাইলে রাত্রিতে তাহাতে রস সঞ্চিত হয়। অতি প্রত্যুষে গাছিগণ তাহা পাড়িয়া লয়। সময় সময় দুষ্ট লোকেরা গাছের ভাঁড় হইতে রস চুরি করার জন্য গাছিরা তাহাতে কচুর ডাঁটাদি দিয়া রাখে। একদিন কাটিলে তিন দিন গাছ লাগান চলে, প্রথম দিনে কাটিবার পর যে রস পাওয়া যায়, তাহা জিরাণ রস নামে খ্যাত। দ্বিতীয় দিন কাটিবার পর যে রস পাওয়া যায়, তাহা দো-কাট রস এবং তৃতীয় দিনের পর যে রস হয় তাহা ঝরণা বা তেকাট রস নামে পরিচিত। তৎপর দিন যদি কোন কোন গাছে রস পাওয়া যায় তবে তাহা মাতা রস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। একটি গাছে গড়ে দৈনিক প্রায় ৭/৮ সের পরিমাণ রস পাওয়া যায়। প্রতি সের রস জ্বালাইলে প্রায় অর্ধ পোয়া পরিমাণ গুড় তৈয়ারি হয়। প্রত্যেক গাছে কার্তিক হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত ছয় মাসে প্রায় ৷৷৹ আধ মন পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা সাধারণত আজকাল গুড়ের দরে বিক্রয় হয়। গাছিগণ প্রত্যেক গাছের জন্য উক্ত ছয় মাস কাল গাছ কাটিয়া গুড় তৈয়ার নিমিত্ত উহার মালিকদিগকে ৷৹ আনা হইতে ৷৷৹ আনা পর্যন্ত খাজানা স্বরূপ দিয়া থাকে। সাঁড়া, সাঁথিয়া, আটঘরিয়া, সুজানগর প্রভৃতি পুলিশ স্টেশনের অধীন গ্রামসমূহে অধিক পরিমাণে খেজুরা গুড় বা পাটারি পাওয়া যায়। পাকুরিয়া, সিলিমপুর, আতাইকুলা ও সুজানগরাদি হাটে ইহা অত্যধিক পরিমাণে আমদানি হয়। সিরাজগঞ্জ মহকুমায় স্থানে স্থানে খেজুর গাছ থাকিলেও তদঅঞ্চলের লোকে গাছ কাটার পদ্ধতি অবগত নহে বা তাহারা গাছ কাটিয়া গুড় তৈয়ারি করে না।

ঝ. যব, গম (গোধুম) চিনা প্রভৃতি চৈতালী শস্যও এই জেলার স্থানে স্থানে আবাদ হয়। বিলময় প্রদেশের অনেক স্থলে কৃষকেরা গম আবাদ করে এবং নালা কাটিয়া ক্ষেতে জল সেচন করে। যব চর ও ভড় উভয় স্থানেই জন্মে। জলমগ্ন বিলময় অনেক স্থানে পূর্বে ধান একেবারেই আবাদ হইত না। ফরিদপুর পুলিশ স্টেশনের অনেক গ্রামে ২৫/৩০ বৎসর পূর্বে ধানের ভাতের পরিবর্তে চিনার চাউল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। এই তিনটি দ্রব্যই শীতের প্রারম্ভে আবাদ হয়, ফাল্গুন চৈত্র মাসে কাটা হয়। ইহাদের আবাদও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে অতি কম।

ঞ. সোণ সিরাজগঞ্জেই বেশি আবাদ হয়। সদরে ইহার চাষ নাই বলিলেই হয়। উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, রায়গঞ্জ প্রভৃতি থানার অনেক গ্রামে ফুলঝোড় নদীর তীরস্থ প্রদেশে ইহার চাষ অত্যধিক। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ইহার আবাদ আরম্ভ হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহা কাটা শেষ হয়। ইহাও পাটের ন্যায় ৪/৫ হাত উচ্চ হয়। সরিষার ফুলের ন্যায় ইহার গাছেও এক প্রকার হরিৎ বর্ণের ফুল হইয়া থাকে। পাটের ন্যায় ইহাও জলে ফেলিয়া পচাইতে হয়। তাহাতে ফুলঝোড় আদি নদীর জল স্থানে স্থানে পচিয়া বিবর্ণ হইতে দেখা যায়। ইহাও জলে জাগ দেওয়ার জন্য জল পচিয়া ভীষণ দুর্গন্ধময় হয় ও লোকের স্বাস্থ্য খারাপ করে। পাট অপেক্ষা ইহার আবাদ কম হয়, ইহা কেবল মোটা ও চিক্কন রশি বা গুণ তৈয়ারের জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সিরাজগঞ্জ ও নাকালিয়া অঞ্চলে সোণের সুতা, গুণ এবং স্থানে স্থানে ইহার সুতায় জাল তৈয়ারি হয়। পাট অপেক্ষা সোণ অধিক দরে বিক্রয় হয়। ইহার আঁশ পাট অপেক্ষা শক্ত ও শুভ্রবর্ণ।

ট. পান সম্পূর্ণ কৃষিজাত না হইলেও ইহা সাধারণত উন্মুক্ত স্থানে প্রথমে আবাদ করিতে হয়, কিন্তু রৌদ্র ও শীতের প্রকোপ হইতে ইহার গাছ বা লতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহার ক্ষেত্রকে আবরণযুক্ত করিয়া দিতে হয়, তন্মধ্যে লতাগুলিকে উঠাইবার জন্য বাঁশের কাবারি

দ্বারা চাল বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহা সাধারণত পানের বরোজ নামে খ্যাত হয়। চালির উপরিভাগে বোন বা খড় দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়। লতা ক্রমে বড় হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে ক্রমে টানিয়া নিচু করিয়া দিতে হয়।

অন্যান্য জিনিসের ন্যায় পান সকলের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইল পানের লতা হইতে নূতন পাতা বাহির হয় তাহা তখন নূতন পান বলিয়া পরিচিত হয় ; ক্রমে বর্ষা ও শীত অন্ত হইলে পাতা যতই বড় হয় ততই পান শক্ত ও মহার্ঘ হইতে আরম্ভ হয়, ফাল্গুন চৈত্র মাসে পান অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার আবাদ অতি ব্যয় ও শ্রমসাধ্য। বরোজে যে সমস্ত লোক কাজ করে তাহাদের দৈনিক মজুরি এক টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। একবার এক স্থানে বরোজ বাঁধিলে মাটি অনুসারে ৫/৬ বৎসর পর্যন্ত তথায় পানের আবাদ চলে, পরে আর সেখানে পান ভাল জন্মে না।

পাবনা সদরে রাজপুর, মহেন্দ্রপুর, কাঁকরকাটা, একদন্ত, লক্ষ্মীপুর, সিন্দুরী, রূপপুর এবং সিরাজগঞ্জের অধীন বাগবাটি, ধলধোব, পাঙাসি, মকিমপুর, চালা আদি গ্রামে বহু বারুজীবী (চলিত ভাষায় বারুই) জাতি পানের আবাদ ও ব্যবসায় দ্বারা উপজীবিকা নির্বাহ করে। এতদ্ব্যতীত বৈশ্য সাহা ও মুসলমান জাতীয়ও অনেকে পানের চাষ ও ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে।

সাধারণত পান ৫ গণ্ডায় এক গোচ এবং ২০ গণ্ডায় বা ৪ গোচে এক শত ধরা হয়। পান সচরাচর (১) ঝারা অর্থাৎ প্রত্যেকটিই ভাল, (২) সাফ্‌টা অর্থাৎ যাহার মধ্যে কাটা ছাটা আছে ও (৩) আঁচরা অর্থাৎ যাহা লতার উপরিভাগে জন্মে, এই তিন নামে পরিচিত। ৪০ শতে এক কুড়ি হিসাব ধরা হয়।

সাধারণ পান ব্যতীত গাছ পান নামে আর এক প্রকার পান স্থানে স্থানে দেখা যায়। তাহার লতা আম কাঁঠালের গাছে উঠাইয়া দেওয়া হয়। সে জন্য তাহা গাছ পান নামে খ্যাত হয়, কখনও কখনও সাঁচি পান নামেও তাহা পরিচিত হয়। তাহার পাতা পুরু ও তাহার স্বাদের বিভিন্নতা আছে। ইহা সর্বত্র পাওয়া যায় না।

ঠ. তামাক—সাধারণত মাঠে আবাদ হয় না। অল্প বিস্তর যাহা চাষ হয় তাহা গৃহস্থেরা আপনাপন বাটির পালানে (বাটির পার্শ্বস্থ জমিতে) নিজ নিজ ব্যবহার জন্য আবাদ করিয়া থাকে। সর্বত্রই অল্প বিস্তর দেখা যায়। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ হইতে শরতের শেষে চারা দেওয়া হয়, কার্তিক অগ্রহায়ণে জমি উত্তমরূপে আবাদ করিয়া চারা লাগাইতে হয়। তবে পানের পাতা কাঁচা ব্যবহৃত হয়, তামাকের পাতা ফাল্গুন চৈত্রে শুকাইয়া গেলে চূর্ণ করতঃ নালি বা চিটা গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে আইসে। সাঁথিয়া থানার অধীন ধুলাউড়ি প্রভৃতি হাটে অনেক তামাক আমদানি হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক হাটেই গৃহস্থগণ প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপন্ন তামাক বিক্রয় করিয়া বাজার সওদা করিয়া থাকে। পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জ উভয় অঞ্চলেরই স্থানে স্থানে যে তামাকের অল্প বিস্তর আবাদ হয়, তাহা দেশাল তামাক নামে পরিচিত। রথে পান চিনি দেওয়ার ন্যায় নবগ্রামে (নওগাঁয়ে) বিনোদরায় বিগ্রহের উদ্দেশ্যে তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা তথায় রামনবমী তিথির মেলায় তামাক ও কলিকা উপহার বা মানসিক প্রদান করে।

উপরোক্ত কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যতীত পটল, ঝিঙ্গা, কল্যা (উচ্ছে) ও মুখিকচু এবং তরমুজ, কাঁকর, খরমুজা, খেতাল শসা ও মৌআলু আদি আর যে সকল কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তৎসমুদয়ের বিবরণ তরকারি ও ফলমুলাদি প্রসঙ্গে পরে লিখিত হইবে। বিভিন্ন কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য, তাহা আবাদের ও ফসলের সময়, বিঘা প্রতি বেছন ও উৎপন্নের হার এবং বর্তমান বাজার দরের তালিকা প্রদত্ত হইল।

কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকা
১৩৩২ সাল

দ্রব্যের নাম	সময় আবাদ	সময় ফসল	বিঘা প্রতি হার বেহুন	বিঘা প্রতি হার উৎপন্ন	বাজার দর পাকী মন
১) ধান—					
(ক) আউস	চৈত্র-বৈশাখ	শ্রাবণ-ভাদ্র	১৫ সের	৯—১০ মন	৪।০
(খ) আমন	”	অগ্রহায়ণ	১০ ”	৭—৮ ”	৪।৵০
(গ) জলি	পৌষ-মাঘ	জ্যৈষ্ঠ	১০ ”	১০—১১ ”	৪।০
(ঘ) বোরো	”	”	১০ ”	৯—১০ ”	৪৲
২) ভুরা	বৈশাখ	শ্রাবণ	১ ”	৪—৫ ”	১।০
৩) কাউন	”	”	১”	” ”	১০৲
৪) পাট—					
(ক) নিম্ন জমিতে	ফাল্গুন-চৈত্র	আষাঢ়-শ্রাবণ	১॥ ”	৫—১০ ”	১৫৲
(খ) উচ্চ জমিতে	চৈত্র-বৈশাখ	শ্রাবণ-ভাদ্র	১॥ ”	৫—১০ ”	১৩৲
৫) কলাই—					
(ক) মাস কলাই	আশ্বিন-কার্তিক	পৌষ-মাঘ	৩ ”	২—৩ ”	৪৲
(খ) কালি কলাই	”	”	৩ ”	২—৩ ”	৪॥০
৬) মুগ	”	অগ্রহায়ণ	১ ”	২—৩ ”	৬॥০
৭) মটর	কার্তিক	মাঘ-চৈত্র	৬ ”	২—৩ ”	৬৲
৮) বুট	”	ফাল্গুন-চৈত্র	৩ ”	৩—৪ ”	৫৲
৯) খেসারি	”	”	৩ ”	২—৩ ”	৪৲
১০) মশুর	”	”	৩ ”	২ ”	৩৲
১১) অরহর	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	পৌষ-মাঘ	১ ”	২—৩ ”	৬৲
১২) সরিষা	কার্তিক	”	১ ”	৩ ”	৭৲
১৩) মসিনা	”	ফাল্গুন-চৈত্র	৩ ”	৩ ”	৬।০
১৪) তিল					
(ক) কৃষ্ণ তিল	”	মাঘ	১ ”	২ ”	১৩৲
(খ) কাট তিল	বৈশাখ	শ্রাবণ	৩ ”	২ ”	৬।০
১৫) ধনিয়া	কার্তিক	চৈত্র	১০ ”	৫—৬ ”	৪৲
১৬) কৃষ্ণজিরা	পৌষ	”	৩ ”	৩ ”	১৬৲
১৭) রাঁধুনী	বৈশাখ	আষাঢ়	১ ”	৪ ”	৬৲
১৮) জাউন	”	”	১ ”	৪ ”	১২৲
১৯) পেঁয়াজ	অগ্রহায়ণ	চৈত্র	।।০ দানা	৩০—৩৫ ”	:
২০) লঙ্কা (কাঁচা)	পৌষ	আষাঢ়	১০০০ চারা	১৫—১৬ ”	
২১) ইক্ষু	বৈশাখ	পৌষ-মাঘ	৩০০ ”	২০/০ গুড়	৭॥০
২২) যব	পৌষ	চৈত্র	১২ সের	৩ মন	২॥০
২৩) গম	”	”	১২ ”	৩ ”	৬৲
২৪) চিনা	”	”	৬ ”	৪ ”	৪৲
২৫) পান	কার্তিক	বৈশাখ	১৯২ পণ	×	×
২৬) তামাক	”	চৈত্র	৵০ছটাক	২ ”	১৩৲
২৭) হলুদ	জ্যৈষ্ঠ	মাঘ	৫ মন	১০—১২ ”	৯৲
২৮) সোন	কার্তিক	ফাল্গুন-চৈত্র	৫ সের	৩ ”	২৫৲

তরকারি জাতীয়

	দ্রব্যের নাম	সময় আবাদ	সময় ফসল	বিঘা প্রতি হার বেছন	বিঘা প্রতি হার উৎপন্ন	বাজার দর পাকী মণ প্রতি সের
১)	পটল	কার্তিক	বৈশাখ-আশ্বিন	×	×	৵০
২)	মুখিকচু	মাঘ	অগ্রহায়ণ-পৌষ	×	×	৵০
৩)	কল্যা (উচ্ছে)	পৌষ	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	×	×	৵০
৪)	ঝিঙে	চৈত্র	আষাঢ়-ভাদ্র	×	×	৴০

ফল জাতীয়

১)	তরমুজ	মাঘ	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ
২)	কাঁকর	"	"
	" (ভাদ্র)	বৈশাখ	ভাদ্র-আশ্বিন
৩)	খরমুজা	পৌষ	ফাল্গুন-চৈত্র
৪)	খেতাল শঁসা	বৈশাখ	আশ্বিন-কার্তিক

২. বাগানজাত ঃ

ক. ফল ঃ

১. **আম**—সাধারণত ছোট বড় নানা জাতীয় আম লোকের বাড়িতে ও বাগানে জন্মে। গোপালভোগ, ল্যাঙরা প্রভৃতি সুস্বাদু ও বৃহৎ আম স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে বাগানে জন্মে। মালদহের ফজলি আমের কলমের গাছও অনেক স্থানে বাগানে লাগান হয় এবং মিষ্ট, সুস্বাদু, রসাল ও টক বহু প্রকারের হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কাঁচমিঠা নামক এক প্রকার আম স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। সিরাজগঞ্জ অপেক্ষা সদরে বেশি আম জন্মে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝড়ে কাঁচা আম পড়িলে, লোকে তাহা টক ও আমচুর রূপে ব্যবহার করে। আমের শত গণনায় এই জেলায় ৫০ গণ্ডায় এক শত ধরা হয়। হাটে বাজারে এবং গ্রামে বহু স্থানে আম বিক্রয় হয়। এই জেলা হইতে ঢাকাদি পূর্বাঞ্চলে অনেক আম রপ্তানি হয় এবং এই জেলার মুসলমান পাইকেরগণ মালদহ আদি জেলা হইতে নানাপ্রকার ফজ্‌লি আম আমদানি করিয়া থাকে। বৎসর বিশেষে আমে সাদা ও কাল পোকা জন্মে।

২. **কাঁঠাল**—সর্বত্রই অল্প বিস্তর জন্মে ; সাঁড়া থানার অধীন সাহাপুর, পাকুরিয়া, দিঘা, রূপপুর প্রভৃতি গ্রামে ইহা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় ; তথা হইতে লোকে নৌকা গাড়ি যোগে ভিন্ন স্থানে লইয়া যায়। দাশুরিয়া হাটে অধিক পরিমাণে কাঁঠাল আমদানি হয়। রসাল ও গোটা (চা'লে) ভেদে ইহা দুই প্রকার। জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ পর্যন্ত ইহার আমদানি অত্যধিক। এতদ্ব্যতীত বারমাস কোন কোন গাছে কাঁঠাল পাওয়া যায়, তাহা বারুসে বলিয়া খ্যাত। কাঁচা অবস্থায় ইচড় রূপে এবং পাকা অবস্থার পর ইহার বিচি উৎকৃষ্ট তরকারি রূপে ব্যবহৃত হয়।

৩. **জাম**—ইহা দুই প্রকার। ১) কৃষ্ণ জাম ও ২) গোলাপ জাম। কাল জাম ছোট ও বড়। বড় জাম বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং ছোট জাম আষাঢ় শ্রাবণে জন্মে। ছোট জাম খুদে জাম নামে পরিচিত হয়। এতদ্ব্যতীত জামরুল নামে সাদা এক প্রকার জাম এই জেলার স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে জন্মে।

৪. **কলা**— ১) অনুপম বা সব্‌রি (মর্তমান), ২) মদ্‌না, ৩) বিচে, ৪) কাঁচা (আনাজি), ৫) কানাই বাঁশি, ৬) চিনি চাঁপা, ৭) ফান্‌স প্রভৃতি নামে কয়েক প্রকার কলা এই জেলায়

সর্বত্র সর্বদা পাওয়া যায়। শীতকালে কম জন্মে। স্থানে স্থানে লোকে কলার বাগান করতঃ বিস্তর অর্থ উপার্জন করে। কলার মোচা ও গাছের শাঁস (ভাদাল) উত্তম তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়। কলাপাতা শহরে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়।

৫. **নারিকেল**—সিরাজগঞ্জ অপেক্ষা সদরের অনেক স্থানে লোকের বাগানে অধিক পরিমাণে নারিকেল জন্মে। ইহা বার মাসে তের বাধা হিসাবে গাছে ফলিয়া থাকে। খুলনা, নোয়াখালি আদি দক্ষিণ দেশিয় নারিকেল অপেক্ষা এই জেলার নারিকেলে স্বাদ বেশি, মধ্যের সাদা অংশ অধিক পুরু, কিন্তু এদেশের নারিকেল আকারে ছোট। কাঁচা অবস্থায় ডাব রূপে নারিকেল অধিক পরিমাণে বিক্রয় হয়। ইহার পাতার ডাঁটা (খিল) ঝাঁটারূপে বাজারে প্রতি সের ৫ আনা দরে বিক্রয় হয়।

৬. **সুপারি**—স্থানে স্থানে অনেকের বাগানে দেশি সুপারি জন্মে।

৭. **পেঁপে**—গোলাকার ও লম্বা ভেদে দুই প্রকার পেঁপে অনেক স্থলে বাড়িতে ও বাগানে জন্মে। কাঁচা অবস্থায় তরকারি স্বরূপে এবং পাকা অবস্থায় উপাদেয় ফল রূপে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে ইহা হিন্দুগণ প্রায় ব্যবহার করিত না ; কিন্তু অধুনা সর্বজাতীয় লোকেরই ব্যবহারে আসিতেছে।

৮. **পেয়ারা**—নানাজাতীয় ছোট বড় পেয়ারা জেলার সর্বত্র পাওয়া যায়। ইহা সাধারণত গোলাকার ও মধ্যে সাদা হয় ; যে গুলির মধ্যে লাল ও ঈষৎ লম্বা হয়, তাহা আমসবরি নামে পরিচিত হয় ; ইহার গাত্র মসৃণ নহে।

৯. **বাদাম**—সাধারণত বাতাবি লেবু এই জেলায় বাদাম নামে পরিচিত ও সর্বত্র পাওয়া যায়। ইহা একটি উপাদেয় ফল এবং খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। তবে ইহা টক জাতীয় হইলে, ইহাতে জ্বর হয় বোধে অনেকে ইহা ব্যবহারে কুণ্ঠিত হয়। ইহার আকার ডাবের ন্যায় ও ওজনে ভারী। লোকের বাগানে অনেক জন্মে।

১০. **মখুর**—ইহাও লেবু জাতীয়, কিন্তু ইহার স্বাদ অতি মিষ্ট ; অনেকে ইহা যত্নসহকারে বাগানে লাগাইয়া থাকে।

১১. **বেল**—বেলগাছ অনেকে যত্নসহ বাড়িতে লাগায়। ইহার পাতা পুষ্প মধ্যে গণ্য, তজ্জন্য নিত্য প্রয়োজনীয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বেল পাকে ও অতি উপাদেয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্বত্র পাওয়া যায়। বেলের খোলা (মালই) হইতে চিথলিয়া (পাবনা) গ্রামের অনেকে সুন্দর ও সুক্ষ্ম মালা তৈয়ার করে। কাঁচা বেলে অনেকে মোরব্বা তৈয়ার করে, ছেলেরা ইহা হইতে আঠা বাহির করিয়া লয়।

১২. **আতা**—ইহা সাধারণত দুই প্রকার—১) আতাফল ও ২) লোনাফল। প্রথমটি আষাঢ় শ্রাবণে জন্মে : ইহা অতি সুমিষ্ট ও অধিক মূল্যে বিক্রি হয়। দাশুরিয়া ও একদন্ত হাটে ইহা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি ফাল্গুন চৈত্র মাসে জন্মে। আতা অপেক্ষা ইহার স্বাদ কম। উভয়ের গাছের পাতা অতিরিক্ত তিক্ত বিধায় ছাগল গরুতে ইহার গাছের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

১৩. **আনারস**—পাবনা সদরে দোগাছি, কুলনিয়া, দাশুরিয়া এবং সিরাজগঞ্জের নিকটবর্তী কোন কোন গ্রামে ও মফঃস্বলের অনেক পল্লীতে অনেক বাগানে প্রচুর আনারস জন্মে।

১৪. **লিচু**—অনেকে অতি যত্নসহকারে লিচুগাছ নিজ নিজ বাগানে লাগাইয়া থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাবনা শহরে অনেক লিচু আমদানি হয় এবং লোকে তাহা অতি আগ্রহের সহিত খরিদ করিয়া থাকে। রাত্রিতে বাদুড়াদির উপদ্রব হইতে লিচু রক্ষা কল্পে ইহার গাছ জাল দ্বারা আবৃত করিয়া থাকে এবং নানারূপ শব্দ করতঃ ইহার ফল রক্ষা করে। সাধারণত লিচু সুমিষ্ট, তবে কাঁচা হইলে ইহা টক হয়।

১৫. **তাল**—বাগানে অতি যত্নে না লাগাইলেও লোকের বাড়িতে ও নানাস্থানে অযত্নে

জন্মে। লাল ও কাল ভেদে তাল দুই প্রকার। সাধারণ তাল লালবর্ণ ও স্বাদে মিষ্ট কম। কাল তাল অধিক সুস্বাদু ও আকারে বড় হয়, সে জন্য হাড়ে তাল নামে পরিচিত। আষাঢ় হইতে ভাদ্র পর্যন্ত পাওয়া যায়।

১৬. **শসা**—সর্বত্রই অনেকে শসা নিজ নিজ বাটিতে ও বাগানে শসার গাছ লাগায়। বিশেষ উপাদেয় না হইলেও, লোকে ইহার জন্য অনেক খরচ করিয়া জাঙলা বা মাচাং বাঁধিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত মাটিতেও এক প্রকার খেতাল শসা লোকে আবাদ করে। আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্যন্ত ইহা সর্বত্র পাওয়া যায়। পাবনায় অনেক আমদানি হয়।

১৭. **কুল**—ইহা সাধারণত এই জেলায় বোরই (বদরিক) নামে পরিচিত। তন্মধ্যে লম্বা ও সুমিষ্ট কুল সচরাচর কুল-বোরই নামে পরিচিত। গোলাকার ঈষৎ টক জাতীয় কুল গোল-বোরই (টোপাকুল) নামে খ্যাত। কুলের গাছ, বিশেষত কুলবোরই-এর কলম লোকে অতি যত্নসহকারে নিজ নিজ বাগানে লাগায়। গোলবোরই সর্বত্রই পাওয়া যায়। ইহা সাধারণত পৌষ হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত জন্মে। কুলবোরই অল্পদিন স্থায়ী, মাঘ পরে ক্বচিৎ পাওয়া যায়। টোপাকুল টক জাতীয় সেজন্য লোকে ইহা অম্ল ও আচাররূপে ব্যবহার করে।

১৮. **দাড়িম্ব**—লোকের বাগানে ও বাটির গৃহ কোণে যে দাড়িম্বগাছ জন্মে তাহাতে সাধারণ দাড়িম্ব ফলিয়া থাকে, কিন্তু পোকা বেশি হয়।

১৯. **খেজুর**—গুড় ব্যতীত খেজুর গাছে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে খেজুর জন্মে।

খ. মূল ঃ

১. **আলু**—(ক) গোল আলু, (খ) মৌ-আলু, (গ) শাঁক আলু, (ঘ) সাগরকন্দ আলু, (ঙ) গোঁজ আলু প্রভৃতি নামে কয়েক প্রকার আলু এই জেলায় জন্মে। গোল আলুর চাষ অতি অল্প স্থানে সীমাবদ্ধ ; সাধারণত অনেকে আপনাপন বাগানে তরকারিরূপে কিয়ৎ পরিমাণে ইহার আবাদ করে। ইহা বিলাতি আলু নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। বিন্দি জাতীয় লোকেরা বাগানে ও বাটির পার্শ্ব মৌ-আলুর চাষ করে ; দেখিতে লাল বর্ণ জন্য ইহা রাঙা আলু নামেও খ্যাত হয়। মূল হইলেও ইহা উৎকৃষ্ট ফল ও তরকারি উভয় প্রকারে ব্যবহৃত হয়। শীতকালে অধিক আমদানি হয়। শাঁক আলু দেখিতে সাদা ও অতি উপাদেয় ফল মধ্যে গণ্য। শীতের শেষ হইতে গ্রীষ্মকালের শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়। সর্বত্র লোকের বাগানের বেড়া ও গাছের উপর ইহার গাছ উঠিয়া থাকে। বেড়া, সাধুগঞ্জ, ডেমড়া প্রভৃতি হাটে অধিক পরিমাণে মৌ-আলু জাতীয় সাদা এক প্রকার আলু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহা সাগরকন্দ আলু নামে পরিচিত। বাগান ব্যতীত চর জমিতেই ইহার অধিক আবাদ হয়। গোঁজ আলু নামে অভিহিত হয়। অধিক মাটির নিচে অতি বৃহদাকার ৩/৪ সের পরিমিত ভার ওজনের সাদা ও ঈষৎ লালবর্ণের এই আলু জন্মে। গাছের উপর ইহার লতা সহ ছোট ছোট গোলাকার ফল জন্মে ; তাহাও খাদ্য স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। এই ফল পুনরায় লাগাইলে তাহা হইতে গাছ জন্মে।

২. **পেয়াজ ও রসুন**—মসলা জাতীয় উৎপন্ন দ্রব্য হইলেও উভয়ই মূল জাতীয়। অনেক মুসলমান কৃষক অল্প বিস্তর আপনাপন বাগানে আবাদ করে।

৩. **আদা**—ইহা দুই প্রকার—সাধারণ ও আম-আদা ; সর্বত্র জন্মে।

৪. **কচু**—(ক) মুখিকচু, (খ) সোলাকচু—সাদা ও লাল, (গ) ঘটকচু, (ঘ) মানকচু, (ঙ) মৌলবিকচু প্রভৃতি কয়েক প্রকার কচু জেলার সর্বত্র জন্মে এবং খাদ্য স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত সাদা এক প্রকার কচু স্থানে স্থানে জন্মে ; ইহা দস্তল নামে পরিচিত। পাতা লাল ও কাল ভেদে আরও দুই প্রকার কচুর গাছ লোকের বাগানে শোভা বর্ধনার্থে জন্মে। তাহা লোকের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না। দাশুরিয়া হাটে উত্তম মুখিকচু আমদানি হয় ; পাবনা সদরের দোগাছি, নলধা, কোলাদি প্রভৃতি অঞ্চলে লালবর্ণের এবং সিরাজগঞ্জের অধিক

জলমগ্ন অনেক স্থানে সাদা ও ২ হাত পরিমাণ লম্বা সোলাকচু পাওয়া যায়। মান সর্বত্রই অল্প বিস্তর পাওয়া যায় ; ইহার আবাদ হয় না। সময় সময় ৩/৪ হাত লম্বা মানও হাটে বাজারে পরিলক্ষিত হয়। জঙ্গলে এক প্রকার কচু জন্মে তাহা মানকচুরি নামে পরিচিত ; ইহা অব্যবহার্য। সাধারণ কচুর ডাঁটা তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়।

৫. **ওল**—ইহাও কচু জাতীয় ; মৃত্তিকার প্রকৃতি ভেদে ইহার স্বাদের তারতম্য হয়। এদেশে ওলের চাষ হয় না ; লোকের বাড়ির পার্শে অনাদৃত অবস্থায় জন্মে। পাবনা সদর অপেক্ষা সিরাজগঞ্জের মাটিতে উত্তম ওল জন্মে।

৬. **মূলা**—পাবনা সদরে দোগাছি, চরতারাপুর প্রভৃতি স্থানে /২ সের পরিমাণ ওজনের লাল ও সাদা মোট মূলা জন্মে। শীতকাল ব্যতীত বর্ষা ও শরতেও ইহা অনেক জন্মে। ইহার মূল শাক ও উভয়ই উপাদেয় তরকারি রূপে ব্যবহৃত হয়।

৭. **এরারুট**—হিমাইতপুর নিবাস জনৈক চিকিৎসক নিজ বাগানে ইহার চাষ করিয়াছেন এবং ইহার মূল হইতে উত্তম রোগীর পথ্য প্রস্তুত করতঃ বিক্রি করিতেছেন।

৮. **চিনা বাদাম**—ইহাও অনেক স্থানে আবাদ হইতে দেখা যায়।

গ. তরকারি ঃ

১. **বেগুন**—সাধারণ লম্বা বেগুন জেলার সর্বত্র বাগানে ও কোথায় কোথায় ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে ; ইহা সয়লা বেগুন নামে পরিচিত। ছোট গোল ও ঈষৎ লম্বা মোটা এক প্রকার বেগুন স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে জন্মে ; ইহা লাফা বেগুন নামে পরিচিত। ইহা সুস্বাদু ও অধিক দরে বিক্রি হয় ; ইহার গাছের গায়ে, পাতায় ও বোঁটায় কাঁটা হয়। এক হাতের অধিক লম্বা কাল ও সাদা চিক্কণ এক প্রকার বেগুণ কোথায় কোথায় জন্মে, তাহা নলে বেগুন নামে খ্যাত। সাধারণত সাদা গোল ছোট এক প্রকার বেগুন স্থানে স্থানে জন্মে ; তাহা গুটে বেগুন নামে পরিচিত। ইহা এক গাছে অধিক পরিমাণ উৎপন্ন হয়। আষাঢ় শ্রাবণে চারা লাগাইলে কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বেগুন ফলিতে আরম্ভ হয়। শীতকাল হইতে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত বেশি, অন্যান্য সময়ে সাধারণভাবে বেগুন হাটে বাজারে আমদানি হয়। তিত বেগুন নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার বেগুন কোন কোন স্থানে জন্মে, তাহা খাদ্য অপেক্ষা ঔষধে অধিক ব্যবহৃত হয়।

২. **পটল**—সাধারণত কৃষিজাত হইলেও ইহা লোকের বাটির পালানে ও বাগানে অল্পবিস্তর জন্মে। পাবনা সদরের একদন্ত, আতাইকুলা, চরতারাপুর, সিলিমপুর, দাশুরিয়া, সাঁড়া প্রভৃতি অঞ্চলে অধিক পরিমাণে পটল আমদানি হয়। পাবনা অপেক্ষা সিরাজগঞ্জে ইহার আবাদ কম দেখা যায়। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ইহার শিকড় লাগাইলে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পটল উঠিত আরম্ভ হয়। পাবনা সদর হইতে অনেক পটল কলিকাতায় রপ্তানি হয়।

৩. **লাউ**—সাদা ও কাল বর্ণভেদে লাউ দুই প্রকার। ইহা সর্বত্র লম্বা ও গোলাকৃতি হইয়া থাকে। শরৎকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত অধিক পাওয়া যায়। লোকে ইহার গাছ বাঁশের মাচায় (জাঙ্গলা) ও গৃহাদির চালে উঠাইয়া দেয়। ইহার ফল তরকারিরূপে এবং পাতা ও ডাঁটা শাক স্বরূপে খাদ্যে ব্যবহৃত হয়।

৪. **কুমড়া**—মিট্-কুমড়া ও চাল-কুমড়া নামে দুই প্রকার কুমড়া (কুষ্মাণ্ড) এই জেলার সর্বত্র পাওয়া যায়। মিট্-কুমড়া সাধারণ ও বিলাতি কুমড়া নামে পরিচিত। ইহা বারমাস জন্মে, কিন্তু চাল-কুমড়া বর্ষা ও শরৎকাল পর্যন্ত পাওয়া যায়। ইহার গাছ লোকের গৃহের চালে অথবা মাচাঙ্গে (জাঙ্গলা) বাহিয়া যায় জন্য ইহা চাল-কুমড়া নামে অভিহিত হয়। পাকিয়া গেলে ইহার গাত্রে সাদা চুনের মত এক প্রকার রঙ জন্মে। মিট্-কুমড়ার গাছ অন্য গাছ, ঘরের চাল, জাঙ্গলা এবং মাটিতে সর্বত্র জন্মিয়া থাকে। ইহার ফুলও তরকারিরূপে লোকে ব্যবহার করে।

৫. **ছিম**—ইহা কাল সাদা ভেদে ৫/৬ প্রকার হইয়া থাকে। ঘৃতকাঞ্চন ছিম সর্বাপেক্ষা ভাল ; ইহার বর্ণ সাদা ও লাল মিশ্রিত এবং আহারে সুস্বাদু। শীতকালে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

৬. **পোল্লা**—মিট-পোল্লা অতি উপাদেয় তরকারি ; ইহাও সর্বত্র জন্মে।

৭. **উসি (চিচিঙ্গা)**—ইহা অতি লম্বা ও উভয় দিকে সরু হয় ; গায়ে সাদা সাদা দাগ থাকে।

৮. **ঝিঙা**—ইহাও পোল্লার ন্যায়। ইহা জাঙ্গলা, গাছে ও মাটিতে জন্মে, সর্বত্র পাওয়া যায়। লম্বা এবং ক্ষুদ্র ও গোলাকার ভেদে দুই প্রকার ঝিঙা সর্বত্র জন্মে।

৯. **কল্যা (উচ্ছে)**—ইহাও খেতাল তরকারি বিশেষ। তবে বাড়িতে লোকের বাগানে এক ফুট পর্যন্ত লম্বা এক প্রকার কল্যা জন্মে। ইহা বারমাস পাওয়া যায়, কিন্তু ক্ষেতাল কল্যা ফাল্গুন চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত অধিক পরিমাণে জন্মে।

১০. **কাঁকরোল**—ইহাও উত্তম তরকারি। অল্প বিস্তর সর্বত্র জন্মে।

১১. **বট্‌বটি**—ইহা নানা প্রকার—কাল, লাল ও সাদা তিনরূপ বট্‌বটি সাধারণত ব্যবহারে আসে।

১২. **ডাঁরস**—ইহা অনেক স্থানে জন্মে এবং তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়।

১৩. **সাজিনা**—ইহা ডাঁটা জাতীয় তরকারি সর্বত্র শীতকালে জন্মে। নাজিনা নামে আর এক প্রকার তরকারি স্থানে স্থানে জন্মে।

১৪. **কপি**—আজকাল অনেকেই বাগানে ফুলকপি ও বাঁধাকপির আবাদ করে। ওলকপি, সালগম, টমেটো প্রভৃতি ভিন্ন দেশিয় তরকারি ও অধুনা অনেকে নিজ নিজ বাগানে লাগাইয়া থাকে।

ঘ. আচার ও টক ঃ

১. **লেবু**—(ক) কাগজি, (খ) পাতি, (গ) গোরা, (ঘ) সরবতি প্রভৃতি নানাজাতীয় লেবু এই জেলার সর্বত্র পাওয়া যায়। গোল ও লম্বা আকারে কাগজি লেবু দুই প্রকার ; গোলাকার লেবু কাগজি নামে প্রচলিত ও সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং লম্বাগুলি কাগ্‌জা নামে পরিচিত, ইহা কম পাওয়া যায়।

২. **তেঁতুল**—লোকের বাড়িতে এবং বাগানে জন্মে। কাশীনাথপুর হাটে অত্যাধিক পরিমাণে আমদানি হয় এবং তথা হইতে অন্যত্র রপ্তানি হয়।

৩. **করঞ্জা**—লোকের বাড়িতে ও বাগানে অনেক স্থানে জন্মে।

৪. **কতবেল**—ইহার গাছও অনেক স্থলে দেখা যায়।

৫. **আমড়া**—সাধারণ ছোট ও বিলাতি বড় আমড়া অনেক স্থলে জন্মে।

৬. **আমলকি**—অধিক পরিমাণে না জন্মিলেও ইতস্তত ২/১টি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

৭. **বোয়াইল**—ইহার গাছ অতি বিরল। স্থানে স্থান জন্মে।

৮. **চালতা**—ইহাও অতি অল্প পরিমাণে জন্মে। ইহার ব্যবহার কম।

৯. **চাকোর**—ইহা সর্বত্র গৃহস্থের বাটিতে জন্মে।

১০. **কামরাঙা**—ইহা অনেকে বাগানে যত্নসহকারে লাগায়।

ঙ. শাক ঃ

১. **পালঙ**—মিঠা ও টক নামে দুই প্রকার পালঙ শাক শীতকালে জন্মে।

২. **পুঁই**—সাদা ও লাল দুই প্রকার পুঁই শাক লোকে বাগানে লাগায়।

৩. **খুঁড়ে**—সাধারণত নটে শাক এই জেলায় খুঁড়ে শাক নামে পরিচিত। ইহার নানাজাতীয় শাক ও ডাঁটা লোকে অতি উপাদেয় খাদ্যরূপে ব্যবহার করে।

৪. **বাথে**—এই শাকও উত্তম খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

উপরোক্ত কয়েক প্রকার শাক ব্যতীত এই জেলায় নানা প্রকার শাক শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি সর্বকালেই পাওয়া যায়। কচুর ডাঁটা ও পাতা উভয়ই শাক ও তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়। আশ্বিন মাসের ভূত চতুর্দশী তিথিতে চৌদ্দশাক খাইবার রীতি এই জেলায় প্রচলিত আছে।

৩. বনজাত ঃ

১. **বেত**—এই জেলার জঙ্গলাদিতে যে সকল দ্রব্য জন্মে ও যাহা মানুষের উপকারে লাগে, তন্মধ্যে বেত সর্বপ্রধান। ইহা দ্বারা বেতুয়া নামক জাতিগণ ধামা, কাঠা, ডালা আদি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। এতদ্ব্যতীত বেত অন্যত্র রপ্তানি করিয়া থাকে। জেলার সর্বত্রই ২/৪ ঘর বেতুয়া জাতির বাস আছে; তন্মধ্যে পাবনা বাজিতপুর ঘাটে কয়েকজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাস আছে। বেত খরিদ ও অন্যত্র চালান দেওয়াই ইহাদিগের সর্বপ্রধান ব্যবসায়। ধামা কাঠা আদি তৈয়ার ব্যতীত বেত অতি চিক্কণ করিয়া কাটিয়া তদদ্বারা অনেকে গৃহাদি নির্মাণ ও অন্যান্য বাঁধাই কাজে রশির পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করে। পাবনা রামচন্দ্রপুর, দোগাছি আদি অঞ্চলের অনেক মুসলমান বেত্র নির্মিত উত্তম "চেয়ার" "মোড়া" "বাক্‌স" এবং স্থানবিশেষের বেতুয়াগণ ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট "ঝাইল" ঝাঁপি আদি তৈয়ার করে।

২. **শিমুল তুলা**—অযত্নে জঙ্গলাদিতে শিমুল তুলার গাছ জন্মে। ইহা সাধারণত এদেশে মাদার গাছ নামে পরিচিত। শিমুল তুলা সর্বত্রই ফাল্গুন-চৈত্র মাসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাড়াস আউটপোস্টের অধীন নবগ্রাম বা নওগাঁঞের বাসন্তী অষ্টমী মেলার দিন তথায় বহু শিমুল তুলার আমদানি হয়। এই তুলা বালিশ ও বিছানাদি প্রস্তুত জন্য ব্যবহার করে; পূর্বে ইহা ২৲ ২৷৷৹ টাকা মণ দরে বিক্রি হইত, অধুনা ৯/১০ টাকা মণ দরে বিক্রি হইয়া থাকে।

৩. **ঝাউ**—পদ্মাদি নদীর চরে ৪/৫ হাত উচ্চ লাল ফুলযুক্ত এক প্রকার ঝাউ গাছ জন্মে, তাহা লোকের জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত লোকের বাগানে অতি উচ্চ এবং নাতিদীর্ঘ দুই প্রকার ঝাউ গাছ জন্মে তাহা মাত্র শোভাবর্ধন জন্য রোপিত হয়। চরজাত ঝাউ বিক্রি করতঃ গরিব দুঃখী অনেকে জীবিকার্জ্জন করে।

৪. **বন ও সানি**—চর জমিতে ঝাউ ব্যতীত বন ও সানি জন্মে, তাহা অনেকে গৃহ নির্মাণ কার্যে ব্যবহার করে। আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্যন্ত সানি এবং কার্তিক হইতে ফাল্গুন চৈত্র মাস পর্যন্ত বন পাওয়া যায়। সানি ছোট অবস্থায় গবাদির খাদ্য স্বরূপেও ব্যবহৃত হয়।

৫. **কাস্যা**—ইহাও সানি জাতীয় এবং চরাদি জমিতে জন্মে। সানি অপেক্ষা ইহার গোড়া কথঞ্চিৎ মোটা ও চেপটা হয়। ইহাও বনের ন্যায় গৃহাদি নির্মাণ ও গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

৬. **পাত্যাল**—জঙ্গলাদিতে ৮/১০ হাতলম্বা সুদৃঢ় নল জাতীয় এক প্রকার গাছ জন্মে তাহা পাত্যাল নামে অভিহিত। ইহা লোকে ঘরের বেড়া নির্মাণ জন্য ব্যবহার করে। বন অপেক্ষা ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও অধিক মূল্যে বিক্রি হয় এবং ইহাতে উই লাগে না। ইহার রং লাল।

৭. **নল**—স্থানে স্থানে জঙ্গলাদিতে ৫/৭ হাত লম্বা নল পাওয়া যায়। তদ্বারা চাটাই আদি তৈয়ারি হয় ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

৮. **সর**—জঙ্গলাদিতে বিশেষত জলের ধারে ইক্ষুর পাতার ন্যায় পাতা বিশিষ্ট সরগাছ নামে নল জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে তাহাও নলের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত কান্দাইল বা আন্দাইল নামক এক প্রকার বৃক্ষ জলের ধারে জঙ্গলাদিতে জন্মে তাহাও নলের ন্যায় অনেক কার্যে লাগে।

৯. **উলু খড়**—নিবিড় জঙ্গলে না জন্মিলেও, পতিত জমিতে পাবনা সদরের অনেক গ্রামে উলু খড় জন্মে; সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের ভূমি নিম্ন বিধায় তথায় ইহা কম জন্মে। ইহা দ্বারা লোকের বাসগৃহাদি নির্মিত হয় সেজন্য ইহা আপামর সাধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য।

ছোট খড় দ্বারা 'উজান' ছাউনিযুক্ত দীর্ঘদিন স্থায়ী এবং লম্বা খড় দ্বারা 'ভাটান' ছাউনিযুক্ত স্বল্পদিন স্থায়ী গৃহাদি নির্মিত হয়। ইহা আটি শতকরা ও হাজার হিসাবে বিক্রি হয়। পল্লীবাসিগণের অধিকাংশ বাসগৃহাদি উলুখড় দ্বারা নির্মিত হয়।

১০. **বাঁশ**—এই জেলায় সাধারণত ১) বড় বাঁশ, ২) জাওয়াবাঁশ, ৩) বাশ্নি বাঁশ, ৪) তরলা বাঁশ প্রভৃতি নামে কয়েক প্রকার বাঁশ লোকের বাগানে ও জঙ্গলাদিতে জন্মে। ইহা সর্বত্র পাওয়া যায়। সাঁড়া থানার অধীন বাঁশেরবাদা গ্রামে বাঁশের বাগান সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; রাধানগর, গুণাইগাছা, সালিখাদি অঞ্চলে অনেক বাঁশ বিশেষত জাওয়া বাঁশ অধিক দেখা যায়। ইছামতী নদীতীরস্থ গয়েশপুর, ইয়াকুবপুর, কুঁচিয়ামোড়া প্রভৃতি গ্রামে অধিক পরিমাণে বড়বাঁশ পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর এই সকল গ্রাম হইতে বহু বাঁশ লোকে 'মার' বাঁধিয়া বেড়া নাকালিয়াদি হাটে লইয়া শতকরা ৮/১০ টাকা হইতে ২৫/৩০ টাকা দরে বিক্রি করিয়া থাকে। পাবনা সদর অপেক্ষা সিরাজগঞ্জ মহকুমায় তরলা বাঁশের অধিক প্রচলন এবং পাওয়া যায়। জাওয়া ও বাঁশনি বাঁশ কেবলমাত্র 'কাবারি' ও বেড়াদিতে ব্যবহৃত হয়। তরলা বাঁশ দ্বারা বাঁশফোর, মুচি, ডোম, মেথর প্রভৃতি জাতিগণ নানাপ্রকার ডালা, কুলা, পাল্লা প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। উপরোক্ত বাঁশ ব্যতীত অনেকের বাগানে বিলাতি বাঁশ নামক এক প্রকার সরু বাঁশ জন্মে, তাহা বাগানের শোভাবর্ধনার্থ মাত্র, কোন কাজে আসে না। বাঁশের লাঠি সাধারণ গৃহস্থগণ ব্যবহার করে, ভদ্রপদবাচ্য লোকে ইহা স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করেন।

বৃক্ষাদি ঃ

(ক) **ফলবান**—১) আম, ২) কাঁঠাল, ৩) জাম, ৪) তেঁতুল, ৫) পেয়ারা, ৬) বেল, ৭) বাদাম, ৮) নারিকেল, ৯) সুপারি প্রভৃতি বৃক্ষ ফলবান বৃক্ষ মধ্যে গণ্য।

(খ) **তক্তা জন্য ব্যবহৃত**—ফলবান বৃক্ষের ১ম হইতে ৪র্থ পর্যন্ত বৃক্ষাদি বাদে। ১) শিমুল গাছ, ২) দেবদারু, ৩) পাঙ্গে, ৪) কদম, ৫) খড়, ৬) করই, ৭) রয়না, ৮) গরসুন্দর প্রভৃতি বৃক্ষ তক্তা জন্য ব্যবহৃত হয়।

(গ) **জ্বালানি কাঠরূপে ব্যবহৃত**—(ক) ও (খ) বিভাগের বৃক্ষাদি বাদে ১) বাবলা, ২) পীতরাজ, ৩) ডুমুর, ৪) বট, ৫) পাকুর, ৬) নাকর, ৭) সরা, ৮) বন্যা, ৯) পিঠামুকুর, ১০) সোনালু, ১১) নোনাফল, ১২) তমাল প্রভৃতি।

(ঘ) **বেড়া ঘেরা জন্য**—জিগা, ২) জামালকোটা (লাল ও সাদা), ৩) ফালতা মাদার, ৪) কেদার, ৫) চিতা, ৬) মেহেদি প্রভৃতি।

(ঙ) **রাস্তায় ছায়ার জন্য**—ফলবান আম, কাঁঠাল জাম আদি ও শীতল ছায়া বিশিষ্ট পাকুরাদি বৃক্ষ ব্যতীত ১) শাল, ২) কাঠবাদাম, ৩) পিচ্, ৪) লাল কৃষ্ণচূড়া, ৫) নানাপ্রকার পাহাড়ী ফুলের বৃক্ষ ডিস্ট্রিক্টবোর্ড হইতে রাস্তায় ছায়াদান জন্য লাগান হইয়া থাকে।

পুষ্পাদি ঃ

(ক) **বাগানজাত**—১) গোলাপ, ২) বেল, ৩) গন্ধরাজ, ৪) রজনীগন্ধা, ৫) জুঁই, ৬) চাঁপা (স্বর্ণ-চাঁপা ও গোবরে-চাঁপা), ৭) মালতি, ৮) চন্দ্রমল্লিকা, ৯) কুণ্ড, ১০) জাতি, ১১) জুতি গেঁদা (রক্ত ও হরিৎ), ১২) স্থলপদ্ম, ১৩) পলাশ, ১৪) কোরবি, ১৫) টগর, ১৬) কাঞ্চন (শ্বেত ও লোহিত), ১৭) অপরাজিতা, ১৮) কৃষ্ণচূড়া, ১৯) জবা (নানাপ্রকার), ২০) শেফালিকা, ২১) অতসি, ২২) দশমাচণ্ডি, ২৩) সূর্যমুখী, ২৪) তরুলতা, ২৫) কস্তুরি, ২৬) কুটরাজ প্রভৃতি নানা জাতীয় ফুল লোকের বাড়িতে ও বাগানে জন্মে। নানারূপ বিদেশিয় ফুলও অনেকে সাময়িক বীজ আনাইয়া লাগাইয়া থাকে।

(খ) **বনজাত**—১) শিমূল ফুল, ২) বনফুল, ৩) ঝাউয়ের ফুল (লাল), ৪) সানির ফুল (সাদা), ৫) সোণালু প্রভৃতি।

(গ) **জলজাত**—১) পদ্মফুল, ২) নাইল ফুল প্রভৃতি।

ভৈষজ্য বৃক্ষাদি :

ঔষধে ব্যবহারোপযোগী এই জেলায় উৎপন্ন বৃক্ষ লতাদি

১) অনন্তমূল, ২) আপাঙ্গ, ৩) আমলকি, ৪) আদা, ৫) বেল, ৬) ভাঁটি, ৭) ভারেণ্ডা, ৮) বন হল্‌দি, ৯) বিছুটি, ১০) বকুল, ১১) বহেরা, ১২) বাবলা, ১৩) বাবুরতুলসি, ১৪) ছাতিয়ান, ১৫) জয়পাল, ১৬) রেড়ি, ১৭) চাঁপা, ১৮) ধুতুরা, ১৯) ধনিয়া দেবদারু, ২০) গাব, ২১) গুলঞ্চ, ২২) ঘৃতকুমারী, ২৩) গন্ধভাদালে, ২৪) হিংচা (হেলঞ্চা), ২৫) হরিতকি, ২৬) হরজোড়া, ২৭) হলদি, ২৮) ইসনমূল, ২৯) জয়ন্তিয়া (জন্তি), ৩০) জবা, ৩১) জিরা, ৩২) জাউন, ৩৩) কল্পনাথ, ৩৪) কালধুতুরা, ৩৫) জাম, ৩৬) কতবেল, ৩৭) খয়ের, ৩৮) কাল্‌কাসুন্দে, ৩৯) কদম্ব, ৪০) ক্ষেত পাঁপড়া, ৪১) লঙ্কা, ৪২) মাদার, ৪৩) মোথা, ৪৪) মেহেদি, ৪৫) মসিনা, ৪৬) মেথি, ৪৭) নিম, ৪৮) নিসিন্দা, ৪৯) নাগকসী, ৫০) পালঙ্, ৫১) পুনর্ণবা, ৫২) ফাল্‌তে মাদার, ৫৩) পিপুল, ৫৪) পুদিনা, ৫৫) রক্তমাল, ৫৬) সাজিনা, ৫৭) সিজ, ৫৮) সোমরাজ, ৫৯) সোনালু, ৬০) একানী, ৬১) তুলসি, ৬২) তিল, ৬৩) টগর, ৬৪) টিউরি, ৬৫) কণ্টিকারী, ৬৬) ভুইচাঁপা প্রভৃতি নানাজাতীয় ঔষধে ব্যবহৃত বৃক্ষলতাদি এই জেলার বাগান ও জঙ্গলাদিতে জন্মিয়া থাকে। কবিরাজগণ তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৪. জলজাত :

(ক) **মৎস্য**—জল জাত দ্রব্যসমূহ মধ্যে মাছ এই জেলার একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা সাধারণত দুই প্রকার—১) নদীজাত ও ২) বিল বা পুষ্করিণী আদি বদ্ধ জলজাত।

১. **নদীজাত**—১) ইলিশ, ২) টাঁই, ৩) রোহিত, ৪) কাতলা, ৫) বোয়াইল, ৬) চাঁপলা, ৭) ফ্যাসা, ৮) চাঁদা (রূপচাঁদা ও সাধারণ), ৯) বাঁশপাতা, ১০) পাপদা, ১১) সুবর্ণ খরিকা, ১২) খরসোল, ১৩) আইর, ১৪) পাঙাস, ১৫) সেলং, ১৬) বাচা, ১৭) পুঁঠি (তিত ও সর), ১৮) ট্যাঙরা, ১৯) চিংড়ি (ইঁচা), ২০) বাঘাইর, ২১) মহাশৈল, ২২) মৃগাল (মিরকা), ২৩) গাং পিয়ালি, ২৪) চেলা, ২৫) কাঁক্‌লা, ২৬) বালে, ২৭) রায়েক, ২৮) মৌছি, ২৯) রিঠা, ৩০) কোরাইল, ৩১) চিথল, ৩২) তিনকাঁটা, ৩৩) তেলকুপি প্রভৃতি।

২. **বিলজাত**—১) কই, ২) জিয়াল, ৩) মাগুর, ৪) রুই (রোহিত), ৫) কাতলা, ৬) ফলি, ৭) বান (ছোট ও বড়) ৮) শৈল, ৯) গজার, ১০) টাকি (ঘা'ড়ে ও ছাতেন টাকি), ১১) খল্‌সে, ১২) কালবাউস্, ১৩) মৌছি, ১৪) ভেদা, ১৫) গাগর প্রভৃতি।

এই জেলার লোকের মৎস্যপ্রিয়তা কিরূপ তাহা পাবনা অঞ্চলের লোকের মাঘ মাসে স্বরস্বতী পূজা সময়ে এবং পরে মাঘী সপ্তমী তিথিতে ইলিশ মাছ পূজা হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই জেলার সাতবাড়িয়া, মাঝিপাড়া ও হিমাইতপুর প্রভৃতি পদ্মাতীরে এবং গোপালনগর প্রভৃতি বিল মধ্যবর্তী স্থানে বহু হালদার উপাধিধারী মালো জাতির বাস। তাহারা মৎস্য শিকার এবং পাবনা সদরে বহু নিকারি এবং সিরাজগঞ্জের নানাস্থানে আব্দাল নামে মুসলমান জাতিগণ মৎস্য বিক্রয় দ্বারা জীবিকার্জন করে। সিরাজগঞ্জ লাইনের দিলপনার মোহনপুর উল্লাপাড়া সাঁড়া প্রভৃতি অনেক স্টেশন হইতে অনেক মৎস্য বরফ সংযোগে কলিকাতা অঞ্চলে দৈনিক চালান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নিকারিগণ বহু টাকার ইলিশ মৎস্য কাটিয়া লবণ সংযোগে যশোহরাদি দক্ষিণাঞ্চলে এবং জলপাইগুড়ি রাবিসুরাদি অঞ্চলে নৌকা ও রেলযোগে চালান দিয়া থাকে। সাঁড়াঘাট গোয়ালন্দ এবং সিরাজগঞ্জ ঘাট হইতেও অনেক মাছ এই জেলা হইতে অন্যান্য জেলায় রপ্তানি হইয়া থাকে। সর্বপ্রকারে এই জেলা হইতে মোট প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার মাছ বিদেশে যায়। এতদিন কেবলমাত্র জালিক মালো প্রভৃতি ধীবর জাতি এবং নিকারি

পালার প্রভৃতি মুসলমানগণ মৎস্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল ; অধুনা ব্রাহ্মণ কায়স্থাদিও অনেকে অন্য স্থান হইতে সাঁড়া সিরাজগঞ্জ লাইনের বিল মধ্যস্থ অনেক রেল স্টেশন ও বিলের ধার হইতে মৎস্য চালান দিবার কারবার আরম্ভ করিয়াছেন।

মৎস্য শিকার বা মাছ মারা প্রণালী ঃ

নদীমাতৃক দেশে মৎস্যের প্রসঙ্গে এই জেলায় প্রচলিত তাহার শিকার প্রণালী অপ্রাসঙ্গিক নহে বোধে নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিত হইল ঃ

১. **বর্শী**—বাঁশের নলের সহিত নানা প্রকার সূত্র সংযোগে জার্মানি আদি ইউরোপীয় শিল্পপ্রধান দেশের নির্মিত বর্শী দ্বারা মাছ মারা বা ধরার প্রথা জেলার সর্বত্র ইতর-ভদ্র সর্বসাধারণের লোকের মধ্যে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সর্বসময়ে বিদ্যমান আছে। লোকে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নানাকার্য পরিত্যাগ করিয়া ছিপ, টোপ এবং চারাদি লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিয়া থাকে এবং সর্বকার্য ও আহার নিদ্রাদি পরিত্যাগপূর্বক ধ্যানমগ্নবৎ মৎস্য শিকারোদ্দেশ্যে জলাশয়ের ধারে সমস্ত দিন অতিবাহিত করে।

২. **পলো**—কার্তিক মাসের শেষ হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত বৎসরের ছয় মাস কাল পলো দিয়া মাছ মারিবার প্রথা এই জেলার প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে। সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে বিশেষত শাহজাদপুরের সন্নিকটস্থ গ্রামসমূহে পলো দিয়া মাছ ধরিবার নিয়ম অধিক ; প্রতি শনি মঙ্গলবারে এক বা ততোধিক গ্রামের বহু লোক একত্রিত হইয়া নিকবর্তী বা দূরবর্তী বিলাদি জলাশয়ে একখানি লাঠি, পলো ও হোচা লইয়া মৎস্য শিকার করিয়া থাকে। এক হাতে একটি শুঁচ মধ্যে মাছ গাঁথিয়া দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যায়। এতদুপলক্ষে অল্প সময় বিভিন্ন গ্রামবাসী বা স্বগ্রামবাসিগণের মধ্যে নানারূপ প্রতিযোগিতা বশতঃ ঝগড়াবিবাদ দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য সিরাজগঞ্জ পুলিশ হইতে ৫০/৬০ টাকা পর্যন্ত ব্যয়ে পাশ লইবার প্রথা প্রচলিত আছে। ফুলজোড়াদি নদীতে চট্‌কা দিয়া মাছ ধরার জন্যও পাশ লইতে হয়। মৎস্য শিকার নিমিত্ত বহু লোক একত্রিত হয় সে জন্য সমবেত লোকেরা "বাহুত" নামে পরিচিত হয়। গজনার বিলেও এমত মাছ মারা হইয়া থাকে।

৩. **চারু ধিয়ার আদি**—আষাঢ় হইতে কার্তিক অগ্রহায়ণ পর্যন্ত বর্ষা শরদাদি ঋতুতে জল বৃষ্টির মধ্যে পল্লীর সর্বত্র লোকে অল্পবিস্তর পরিমাণে বাঁশের 'সলা' বা চিক্কণ 'খিল' ও পাটের তাঁতিয়া কিংবা নৈ লতার নামক জঙ্গল জাত এক প্রকার সুদৃঢ় লতাদ্বারা নির্মিত ক্ষুদ্র বৃহৎ চতুর্ভুজ আয়তক্ষেত্র আকার প্রভৃতি নানা আকারের (ক) চারু, (খ) দোয়ার, (গ) ধিয়ার, (ঘ) বোচনা, (ঙ) সরগা, (চ) পাউস, (ছ) হোচ, (জ) খাদন প্রভৃতি দ্বারা বা স্রোতস্বতী জলাশয়ে মাছ মারিয়া থাকে। মৎস্যের লোভে লোকে শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ ভুলিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে এবং কর্দমে নিপতিত হইতেও কখনও কুণ্ঠিত হয় না ; এবং অনেক সময় রাত্রি জাগিয়া লোকে জলের ধারে পাহারা দিয়া থাকে। জলের ধারে বা মধ্যে পাতিয়া বা ফেলিয়া রাখিলে স্রোতসহ যাতায়াতে মাছ আপনাপনিই এই সকল চারু ধিয়ারাদিতে আবদ্ধ হইয়া যায় ; পরে লোকে তৎসমুদয় ঝাড়িয়া মাছ বাহির করিয়া লয় এবং নিজেরা খায় ও প্রতিবেশী দশজনকে বিভাগ করিয়া দেয়।

৪. **যুত, কুঁচ ও টেঁঠা**—আষাঢ় শ্রাবণ মাসে অতি বৃষ্টি সময়ে মৎস্যাদি যখন জলের স্রোতসহ উজান দিকে যাইতে আরম্ভ করে, তখন জলাশয়ের ধারে ধারে পল্লীবাসী অনেকে একত্র হইয়া দিবারাত্র উভয় সময়ে বিশেষত রাত্রিতে মহোল্লাসে যুতাদি লইয়া মৎস্য শিকার করে। অন্ধকার রাত্রিতেও অল্প জলের উপর স্রোতের টানে যখন মাছ চিৎ হইয়া ভাসিয়া উঠে, তখন মাছের শুভ্রবর্ণ বক্ষঃস্থলে আঘাত করিবার সুযোগ ঘটে। এই প্রকার মাছের স্রোতসহ গমনের নাম 'পিরাণ' বলিয়া কথিত হয়। সাধারণত এই সময়ে বোয়াইল আইরাদি

মাছ অধিক পাওয়া যায়। এমন কি জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীর অনেক স্থলে (দুলাই আদি অঞ্চলে) বাঘও মাছের লোভে বৃষ্টিতে জলের ধারে বসিয়া থাকে। একটি বাঁশের অগ্রভাগের প্রান্তে লৌহনির্মিত শলাকার সংযোগ ভেদে কোনটি যুত, কোনটি কুঁচ, কোনটি টেঁঠা নামে অভিহিত হয়। উপরোক্ত রূপে বৃষ্টির সময় ব্যতীত বিল পুষ্করিণী আদি জলাশয়ে মৎস্যাদি ভাসিয়া উঠিলে তাহার মাথায় ঘা দিয়া মারিবার প্রথা সর্বদা দেখা যায়।

৫. **চোঙ**—বাঁশের লম্বা লম্বা চোঙ জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া নদী ও বিলে বিশেষত বিলময় ভড় অঞ্চলে বাণ মাছ মারিবার প্রথা কোথায় কোথায় প্রচলিত আছে। লৌহনির্মিত শলাকার গোলাকার কাঁটা দ্বারা কর্দমাক্ত জলাদি মধ্যে বাণ মাছ মারার প্রথা স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

৬. **জিয়ালা**—চারি পাঁচ হাত লম্বা বাঁশের অগ্রভাগে সুদৃঢ় দড়ি বা সুতা দ্বারা বর্শী বাঁধিয়া তৎসহ ছোট ছোট টাকি আদি জীবিত মৎস্য অথবা অন্য কোন জীবন্ত কীটাদি ঝুলাইয়া নদী বা জলাশয়ের ধারে ঠিক জলের উপরিভাগের সমসূত্রে রাখিয়া দিলে যখন তাহাতে উক্ত জীবিত মৎস্য শব্দ করিতে থাকে, তখন তাহাকে আক্রমণোদ্দেশ্যে বৃহৎ মৎস্য আসিয়া ধরিলে উক্ত বর্শীদ্বারা বৃহৎ মৎস্যাদিও ধৃত হইয়া থাকে। ঈদৃশ প্রথায় প্রায় রুই, কাতলা, বোয়াইল মৎস্যাদি মারা পড়ে। ইহাকে জিয়ালা দেওয়া কহে।

৭. **তাগি**—কেবলমাত্র সূতার অগ্রভাগে ছোট বড় বর্শী গাঁথিয়া তাহাতে মৎস্যের খাদ্য সংযোগে জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া একজন লোক সূত্র হস্তে বসিয়া মাছ ধরার নাম তাগি দিয়া মাছ মারা।

৮. **হোচা**—একটি লোক বাঁশের অগ্রভাগে বাঁশের তৈয়ারি ত্রিভুজাকার (একদিকে খোলা) জালসদৃশ পাতলা পাত্র লইয়া তাহা জলে ফেলিয়া তাহার সম্মুখে পদদ্বয় দ্বারা জল ঘোলা করিতে থাকে, তখন মাছ ক্রমশ উক্ত পাত্র মধ্যে লুকাইয়া গেলে তাহা জল হইতে উঠাইয়া মাছ বাহির করিয়া লয়।

৯. **কাঠা**—বিলাদি সুদূর বিস্তৃত জলাশয়ে নৌকা ডুবাইয়া কিংবা জলের মধ্যে গাছের ডাল নিমজ্জিত করিয়া কিয়দ্দিন রাখিয়া দিলে তথায় মাছ চতুর্দিক হইতে একত্রিত হয়, তখন উক্ত নৌকাদি উঠাইয়া অথবা উক্ত স্থানসমূহের চারিদিক হইতে নৌকা ও জালাদি লইয়া সমস্ত মাছগুলিকে একত্র করিয়া ধরিবার নাম কাঠা দ্বারা মাছ মারা। পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জের অনেক স্থানেই এবম্প্রকারে 'কাঠা' দিয়া মাছ ধরিবার রীতি আছে।

১০. **জাল**—সূত্র ও সোনের তৈয়ারি নানারূপ জালদ্বারা মাছ ধরিবার রীতি জেলার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। জালিকগণ স্বয়ং জাল তৈয়ারি করে এবং কৈজুড়ি প্রভৃতি কোন কোন হাটে তৈয়ারি ক্ষুদ্র বৃহৎ জাল বিক্রি হয়। জাল দীর্ঘ দিন স্থায়ী করিবার নিমিত্ত জালিকগণ গাব ভিজান জলে তাহা রঙ করিয়া লয়। জাল দ্বারা মাছ ধরিবার প্রণালী ও তাহার গঠন অনুসারে পাবনা জেলায় জাল নিম্নলিখিত কয়েক নামে পরিচিত হইয়া থাকে, যথা—

(ক) **ছেকা জাল**—স্রোতস্বতী নদী তীরে দুইটি বাঁশের অগ্রভাগ বক্রাকারে বাঁকাইয়া তাহার বক্রস্থানে জাল বাঁধিয়া একটি লোক পরস্পার স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়া তাহা উঠাইলে তাহাতে মাছ ধৃত হয়, ঈদৃশ প্রথায় ব্যবহৃত জালের নাম ছেকা জাল।

(খ) **খেওয়া জাল**—দুইখানি বাঁশের মধ্য ত্রিভুজাকারে জাল বাঁধিয়া একখানি নৌকার উপর দাঁড়াইয়া নৌকা বাহিয়া যাইতে যাইতে বারম্বার জাল ফেলাইয়া ও উঠাইয়া মাছ শিকার করিতে যে প্রকার জাল ব্যবহৃত হয়, তাহাকে খেওয়া জাল কহে।

(গ) **বেড় জাল**—পদ্মাদি বহৎ নদী মধ্যে বহুদুর পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে বেড়া দিয়া চতুর্দিক হইতে তাহা ক্রমশ একস্থানে টানিয়া একত্র করিতে যে বৃহৎ জাল ব্যবহৃত হয় তাহার নাম বেড় জাল। ইহা বহিতে ২০/২৫ জন মাল্লার বাহিত লম্বাকৃতি ২/৩ খানি পান্‌সী নৌকার

আবশ্যক হয়। জালের সহিত এক ফুট পরিমাণ লম্বা লম্বা বাঁশ লাগান থাকে তাহা জলের উপর মালাকারে ভাসিতে থাকে এবং জালের নিম্নে লৌহের গুলি থাকে তাহার ভারে জাল অধিকদূর পর্যন্ত গভীর জলের নিচে পড়িয়া গেলে মাছ আবদ্ধ হইয়া থাকে। এই জালে টাঁই, রোহিত (রুই) প্রভৃতি বৃহৎ মৎস্যাদি ধৃত হয় এবং একবার জাল পাতিলে এক স্থানে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়।

(ঘ) **জালি জাল**—ইহা ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট ; ইহাতে ছোট মাছ মারা হয়।

(ঙ) **সাংলা জাল**—নৌকা বাহিয়া যাইবার কালে জালের গুচ্ছ একত্র করিয়া বারম্বার জল মধ্যে ফেলিয়া মাছ মারিতে যে জাল ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম সাংলা জাল।

(চ) **বাউলি জাল**—ইহার ছিদ্র বড়, ইহাতে বড় বড় মাছ ধৃত হয়।

(ছ) **খড়া জাল**—নদী বা বিল প্রভৃতি জলাশয়ের মধ্যে বাঁশ গাড়িয়া একটি নাতিবৃহৎ ত্রিভুজাকার বাঁশের মধ্যে জাল বাঁধিয়া পুনঃ পুনঃ একটি লোক উক্ত ত্রিভুজের মস্তকে দাঁড়াইয়া জাল নামান ও উঠান দ্বারা মাছ ধরিতে যে জাল ব্যবহৃত হয় তাহার নাম খড়া জাল। ইহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ মাছ ধৃত হইয়া থাকে।

(জ) **ডল্‌না জাল**—এই জাল ধনুকাকারে আড়াআড়ি দুইখানি কাঠিসহ বাঁধিয়া জলের মধ্যে রাখিয়া দিয়া একজন লোক তাহা সুতাদ্বারা দূরে বসিয়া ধরিয়া রাখে ; মধ্যে মধ্যে জলের কুল দিয়া খরসোলাদি ভাসমান মৎস্যাদি যাইবার সময় টানিয়া লইতে হয়।

(ঝ) **সুতা জাল**—অধিক স্রোতের জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য শিকার জন্য ব্যবহৃত জাল সুতা জাল নামে খ্যাত।

২) **কাঁকড়া**—বিল ও নদী উভয় স্থানেই পাওয়া যায় ; ইহাও মাছের ন্যায় অনেক লোক খাইয়া থাকে। হাটে বাজারে সর্বত্র পাওয়া যায়। কাঁকড়া ছোট বড় দুই প্রকার। তন্মধ্যে বড়গুলিই ব্যবহার্য।

৩) **কচ্ছপ**—১) 'কাছে' বা 'কাঠে' ও ২) 'দূরে' নামে কচ্ছপ দুই প্রকার। পদ্মা যমুনাদি নদীতে বিন্দি, ডুবুরু আদি জাতিগণ ঈষৎ শুভ্রবর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ কচ্ছপ মাছের ন্যায় মারিয়া লোকালয়ে বিক্রি করে ও অনেকে ইহার মাংস খাইয়া থাকে। বিল পুকুরাদি বদ্ধ জলাশয়ের সাধারণ ছোটজাতীয় কাল রঙ বিশিষ্ট কচ্ছপ 'দুরে' নামে খ্যাত, ইহাও লোকে বেশি খায়।

৪) **শামুক**—ক্ষুদ্র বৃহৎ শামুক সাধারণত বিল পুষ্করিণীতে বেশি জন্মে। বড় শামুক পোড়াইয়া চূর্ণকারগণ চুণ তৈয়ার করে ; তাহা খাদ্য ও ইমারতাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি লম্বা জাতীয় একপ্রকার শঙ্খ শামুকে জেলার অনেক স্থানে ক্ষেত্রাদিতে অনেক ফসল ও বৃক্ষাদি নষ্ট করিতেছে।

৫) **ঝিনুক**—পুকুর বিলাদিতে প্রাপ্ত ঝিনুক পোড়াইয়া চুণ তৈয়ার হয়।

৬) **মুক্তা**—চাটমোহর, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর প্রভৃতি থানার অনেক গ্রামে মাঘ ফাল্গুন হইতে চৈত্র পর্যন্ত কোন কোন নদী ও বিলাদিতে ঝিনুক মধ্যে মুক্তা বা মণি পাওয়া যায়। সচরাচর চূর্ণকার, বাগদি, মাটিয়ালাদি জাতিগণ ঝিনুক সংগ্রহ কালে উহা কুড়াইয়া থাকে। ইহার এক একটি সময় সময় ৫০/৬০ টাকা মূল্যেও বিক্রি হয়। দহকুলা, ভট্টাকাক, সান্তলা (উল্লাপাড়া) গোপালনগর (ফরিদপুর) ইদিলপুর (আটবাড়িয়া) ধুলাউড়ি (সাঁথিয়া) সোনামুখি (সিরাজগঞ্জ) প্রভৃতি স্থান ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

৭) **সোলা কচু**—সাদা ও লাল দুই প্রকার ; সর্বত্রই পাওয়া যায়।

৮) **নাইল**—বিলাদিতে নাইল জন্মে।

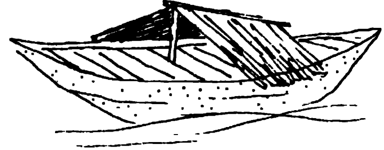
৯) **ড্যাঁপ**—বিলময় প্রদেশে অনেক স্থলে ড্যাঁপ পাওয়া যায়।

১০) **পদ্মফুল**—বিলজাত পদ্মফুল, পদ্মচাকা, পদ্মপাতা অনেক কাজে লাগে।

পূর্বে তুলার চাষ অধিক ছিল না ; ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে লোকে বাগানাদিতে তুলার গাছ লাগাইতেছে। বন্য লতাপাতা ব্যতীত অনেক সৌখিন লোকে বাগানে নানাবর্ণের পাতাবাহার গাছ লাগায়। কৃষিকার্যের সহায়তা জন্য ডিঃ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ভিন্ন দেশিয় ষাঁড় আনিয়া গোধন-কুলের উন্নতি আবশ্যক। কচুরি পানা ও শঙ্খ শামুকে কৃষিকার্যের অনেক ক্ষতি করিতেছে, তাহার বিহিত ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিল্প ও বাণিজ্য



প্রথম পরিচ্ছেদ—সাধারণ বিবরণ

ক. শিল্পের অবস্থা ঃ

পাবনা জেলা শিল্প হিসাবে বঙ্গের অনেক জেলা অপেক্ষা উন্নত বলা যাইতে পারে। অতি পুরাকাল হইতে এই জেলায় (১) বস্ত্রশিল্প—প্রসিদ্ধ, এই জেলার অনেকানেক গ্রামে বস্ত্র বয়নকারী হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির বাস পূর্বাপর বর্তমান আছে। হাণ্ডিয়ালের বিবরণ প্রসঙ্গে অবগত হওয়া যায় একমাত্র এখানেই কোম্পানির আমলের সমস্ত হিন্দুস্থানের চারি পঞ্চমাংশ রেশম আমদানি হইত এবং এখানকার চারি শতাধিক বৎসর উর্ধকালের প্রচলিত জগন্নাথ বিগ্রহের সেবা জনৈক তন্তুবায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই প্রবাদ। বর্তমান তাঁতিবন্দ যে এক সময়ে প্রকৃতই তন্তুবায় জাতির এক বন্দর বিশেষ ছিল তাহা এই গ্রামের নামেই প্রকৃষ্ট রূপে সূচিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অধুনা পাবনা সদরের সাদুল্যাপুর, সুজানগর, দোগাছি, পাবনা, শিবপুর, সিলিমপুর গ্রামে এবং সিরাজগঞ্জ মহকুমার বড়ধুল, ছোটধুল, বেতিল, এনায়েতপুর, সোহাগপুর, স্থল, শাহজাদপুরাদি পল্লীর অনেক স্থলে বহু বস্ত্র বয়নকারী মুসলমান কারিকর জাতির বাস আছে। স্থানে স্থানে তন্তুবায়, কাপালিক, যুগী আদি হিন্দু জাতিও অল্প বিস্তর বস্ত্র বয়ন কার্যে লিপ্ত আছে। বস্ত্র বয়ন ব্যতীত পাবনা সদর এবং শাহজাদপুরের অধীনস্থ এনায়তেপুর, খুক্‌নি আদি গ্রামে কাপড় প্রস্তুত উপযোগী সুতা রংকারক নীলকসানে (মুসলমান) নামক শিল্পজীবিগণের বাস আছে। একমাত্র পাবনা জেলা ব্যতীত পূর্ববঙ্গের অন্য কোন জেলায় সচরাচর এরূপ সূত্র রং করা হয় না। সরকারি বিবরণীতেই তাহা প্রকাশ যথা—In Eastern Bengal Pabna is only district where I saw yarns can be dyed locally for borders of Saries and Dhoties,—colour produced being two blue and red.

Reported by the Inspector—Industries and Resources. 1906-1907.

ভাবার্থ—পূর্ববঙ্গে একমাত্র পাবনা জেলাতেই ধুতি ও সাড়ির পাড় তৈয়ার জন্য নীল ও লাল বর্ণে সুতা রং করা হইয়া থাকে।

সিরাজগঞ্জের অধীন কালিয়া হরিপুর, তেথুলিয়া, কান্দাপাড়া প্রভৃতি পল্লীর (২) শীতলপাটি প্রস্তুত প্রণালী এবং উল্লাপাড়া থানার কোন কোন গ্রামের সোঁধা হইতে (৩) মাদুর তৈয়ারকরণ এই জেলার একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প বলা যায়। এই জেলার সাঁড়া, সাঁথিয়া, সুজানগরাদি পুলিশ স্টেশনের বহু গ্রামে ইক্ষুর আবাদ এবং তৎতৎ স্থানে গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলার অনেক গ্রামে সরিষার (৫) তৈল প্রস্তুতকারক খুলু জাতির বাস আছে। জেলার অনেক গ্রামে (৬) মৃত্তিকা শিল্পজীবী কুম্ভকার জাতির বাস আছে। তাহারা মৃত্তিকা নির্মিত হাঁড়ি, পাতিলাদি ও নানারূপ খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই জেলার অনেক গ্রামে (৭) লৌহ শিল্পজীবী হিন্দু-মুসলমান কর্মকারগণ দা, কুঠার ও পাতাম লোহাদি প্রস্তুত করে। সিরাজগঞ্জ ধানবাঁধি ও নাকালিয়াদি গ্রামে অনেক (৮) গুণ তৈয়ারি হয়,

তাহাও অতি উচ্চ দরে এবং আগ্রহসহকারে বিক্রয় হয়। (৯) কাষ্ঠ শিল্পজীবী সূত্রধরগণ কপাট জানালা প্রস্তুত করা ব্যতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকার নৌকা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সিরাজগঞ্জের অধীন কান্দাপাড়া গ্রামে কয়েক ঘর (১০) কাগজ শিল্পজীবী মুসলমান কাগ্‌জিগণ দেশিয় প্রথায় মোটা কাগজ তৈয়ার করিয়া থাকে। মুসলমান জাতীয় (১১) নলুয়াগণ নল হইতে নানাপ্রকার চাটাই ও ডোলাদি প্রস্তুত করিয়া জীবিকার্জন করে।

নীলকুঠির কার্য আমলে এই জেলার পদ্মা তীরস্থ নাজিরগঞ্জ, রতনগঞ্জ, দোগাছি, মাঝিপাড়া, মুন্সিদপুর, পাকুরিয়া, কুমেদপুর এবং সিরাজগঞ্জ মহকুমার অনেক গ্রামস্থ নীলকুঠি বর্তমান আছে। অদ্যাপি তৎতৎ স্থানসমূহে তাহার নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে।

খ. শিল্পের উন্নতি ও অবনতি ঃ

এই জেলার কৃষির ন্যায় শিল্পের উন্নতিকল্পে শিল্পজীবিগণও সবিশেষ চেষ্টিত নহে। সকলেই সনাতন প্রথায় আপনাপন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কোন প্রকারে জীবিতকাল অতিবাহিত করে। গবর্নমেন্ট হইতে কৃষিবিভাগের প্রবর্তিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খোলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তদ্রূপ শিল্পের প্রসার কল্পে কোনরূপ অনুষ্ঠান এই জেলায় বর্তমান নাই। ইতিপূর্বে ভারেঙ্গা গ্রামে ব্যক্তিবিশিষের যত্নে কারিকরগণের সাহায্যার্থে যে একজন স্পেশাল উইভিং ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, এক্ষণে উক্ত ইন্‌স্পেক্টর পদ উঠিয়া গিয়াছে।

সনাতন প্রথায় হস্তচালিত মাকুতে তন্তুবায় ও কারিকরগণ পূর্বে যেরূপ তাঁতের কাজ করিত এখনও তাহাই বিদ্যামান আছে। কেবলমাত্র ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পর হইতে দেশিয় তাঁতের সহিত সূত্র সংযোগে ফ্লাইসাটল্‌ নামক একপ্রকার ঠক্‌ঠকি তাঁতের প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে মাকু হাতে ঠেলিতে হয় না কিংবা পায়ের দ্বারাও কোন কাজ করিতে হয় না ; উক্ত সময় হইতে পাবনার শিল্পসঞ্জীবনী প্রমুখ মোজাগেঞ্জির কল প্রতিষ্ঠা এই জেলার বস্ত্র শিল্পের উন্নতির অন্যতম চেষ্টা। এই কয়েক বৎসর মধ্যে জেলার অনেক স্থলে বহু লোক মোজাদি তৈয়ারির জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তৎপূর্বে কেবলমাত্র তন্তুবায় ও কারিকরাদি জাতিগণই বস্ত্রশিল্পাদিতে নিযুক্ত থাকিত। কেহ কেহ চাকরি আদির মোহে আপনাপন জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিল বা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল, কিন্তু তখন হইতে এই কয়েক বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাকাদি আভিজাত্যভিমানী জাতিগণের মধ্যেও অনেকে এই সকল বয়নশিল্পাদির কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে এই জেলায় তন্তুবায়াদি হিন্দু অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী মুসলমান কারিকরগণ এই দেশিয় বস্ত্রশিল্পের প্রসার হেতু কথঞ্চিৎ উপকৃত হইয়াছে।

বর্তমানে দেশিয় বস্ত্র শিল্পের প্রসারমূলক চেষ্টা হইলেও পাবনা জেলার অবস্থা পূর্বে সেরূপ ছিল না তাহা সরকারি বিবরণী হইতে অনেকাংশে অবগত হওয়া যায়। যথা—"We find in 1891-92 a large increase in import ... ...Pabna with a census population of 1362392 took Rs. 2,00,000 worth piece-goods in that year, an increase of 14 p.c. as compared with import of 1890-1891. The former figure would give an average expenditure of Rs 1/7/0 per head and show that $^{9}/_{10}$ (ninethenth) of the inhabitants are clothed with produce of English and German looms." *Materials Condition of the Lower Order in Bengal. From 1881-82 to 1891-92. Page--16*

তাৎপর্য এই যে ১৮৯০/৯১ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় ১৮৯১/৯২ খ্রিস্টাব্দে পাবনা জেলার ১৩,৬২,৩৯২ জন লোক ২০,০০,০০০ টাকার কাপড়, অর্থাৎ জন প্রতি ১।৴৹ টাকার কাপড় বেশি লইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় দশভাগের নয় ভাগ অধিবাসী ইংরেজ ও জর্মান পরিচ্ছদে লজ্জা নিবারণ করে।

সাধারণত গরিব দুঃখীলোক সস্তা হিসাবে বৈদেশিক বস্ত্রাদির ব্যবহার করিলেও, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানগণ অধিক পরিমাণে দেশিয় তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্রাদি ব্যবহার করে। ইহাদের স্ত্রীলোক পুরুষ উভয়েই সাধারণত কট্‌কি গামছা, বা ধুতি, ডুমে, দোবরাআদি নামে দেশিয় তাঁতের প্রস্তুত মোট বস্ত্রাদি ব্যবহার করে। সূক্ষ্ম ও মিহি ধুতি চাদরাদি যাহা দেলুয়া শিবপুর, সুজানগরাদি প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রয়ের হাটে বিক্রয় হয়, তাহার অধিকাংশ রঙ্‌পুর, দিনাজপুর, কুমারখালি, ঢাকা, মৈমনসিংহাদি পাবনা জেলার বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় রপ্তানি হইয়া থাকে।

এই জেলার কালিয়া হরিপুরের কাগজ শিল্প এবং চাটমোহর গ্রামে বৈশ্য উপাধিক জাতিগণের আচরিত শঙ্খশিল্প পূর্বে অতিশয় প্রচলিত ছিল। সিরাজগঞ্জের অধীন সোহাগপুরাদি অঞ্চলের লাহারু ও কাচারু নামক জাতিগণের পরিচালিত চুড়ি বলয়াদি নির্মাণ প্রথা প্রচলিত ছিল ; বৈদেশিক নানারূপ চুড়ি আমদানি হইয়া উক্ত দেশিয় প্রথায় চুড়ি তৈয়ার প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। উপরোক্ত কাগজ ও শঙ্খশিল্প যাহা এখনও কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রাগুক্ত গ্রামসমূহে বিদ্যমান আছে তাহাও দেশের লোকের অনাদরে বা হতাদরে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। লুপ্তশিল্প মধ্যে এই জেলার দেশিয় প্রথায় চট বা ছালা তৈয়ারি প্রথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বে সোহাগপুরাদি অঞ্চলে এবং স্থলের নিকটবর্তী বালিপাড়া নামক গ্রামে এবং সুজানগর থানার অধীনস্থ রাণীনগর বাদাই প্রভৃতি গ্রামের নিকটস্থ অনেক পল্লীতে পাট হইতে যে চট তৈয়রি হইত এখনও তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্বে সিরাজগঞ্জে চটকল প্রতিষ্ঠিত থাকায় এবং কলিকাতার নিকটস্থ নানা স্থানের মিলের তৈয়ারি চট আমদানি হওয়ায়, সমস্ত দেশি ছালা ও চটের প্রচলন উঠিয়া গিয়াছে।

পাবনাতে ১৮৯১ অব্দে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কাষ্ঠ ও লৌহ শিল্প শিক্ষা বিভাগ বর্তমান আছে, কিন্তু এই স্কুল হইতে পরীক্ষোৎত্তীর্ণ কোন ছাত্রই আমিন ওভারসিয়ারী চাকরি ব্যতীত কাষ্ঠ কিম্বা লৌহ শিল্পকার্যে নিযুক্ত হয় না। সম্প্রতি এখানে যে একটি বয়ন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, তাহাতেও অনেক কাপড় তৈয়ারি হইতেছে। ইহাতে অনেক উপকার হইবে আশা করা যায়।

পাবনা সহরতলির শিবরামপুর নিবাসী মহম্মদ আজগর আলি নামক জনৈক কারিকর সন্তান বহু পরিশ্রমে ও যত্নে সম্প্রতি কাষ্ঠ নির্মিত তানাহাটা (Warping Drum) নামে যে একটি কল আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে ৩×২।। হাত পরিমিত স্থানে গৃহ মধ্যে বসিয়া রৌদ্র বৃষ্টি সর্ব সময়েই আবাল বৃদ্ধবণিতা ৫।৬ ঘণ্টায় তিন মোড়া সূতার কাপড় তৈয়ারির তানা প্রস্তুত করিতে পারে। এই কলের আবিষ্কার দ্বারা বস্ত্রবয়নকারিগণের মহদুপকার সাধিত হইয়াছে। ইহাতে দৈনিক ৪০।৪২ মাইল ঘুরিয়া পরিশ্রম করিতে হয় না। একটি সম্পূর্ণ কলের মূল্য ১৫ হইতে ২০ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার যে কোন অংশ খুচরাতেও বিক্রয় হইয়া থাকে। বহুল প্রচারসহ উৎসাহিত হইলে, ইহার দ্বারা বস্ত্র শিল্পজীবিগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

(গ) **পাবনায় ব্যবসায়**—রাজশাহী বিভাগের দক্ষিণ পূর্বাংশে পাবনা জেলা পদ্মা (গঙ্গা) ও যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) নামক বঙ্গের দুটি সর্বপ্রধান নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। তজ্জন্য এই জেলার প্রাকৃতিক অবস্থান, নদীপথে ব্যবসায় বাণিজ্যাদি হিসাবে সানুকুল। জেলার অভ্যন্তরেও করোতোয়া, যুলঝোর, আত্রাই এক্ষণে মৃতপ্রায় বরল ; চিকনাই আদি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদী সমূহের দ্বারা বৎসরে প্রায় ৮।৯ মাস নৌকাদি চলাচলের সুবিধা আছে। বাণিজ্যাদির সুবিধার্থ এইরূপ প্রাকৃতিক নদী সংস্থান পাবনা জেলায় বিশেষত্ব, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জেলার বিলময় প্রদেশের মৎস্যের ব্যবসার দ্বারা বিশেষত সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেললাইন খুলিবার পর

অনেকে দৈনিক মোহনপুর, দিলপসার ভাঙুরিয়াদি রেলওয়ে স্টেশন হইতে বহু টাকার মৎস্য কলিকাতায় চালান দিয়া লাভবান হইয়াছেন এবং হইতেছেন। এই ব্যবসায়ের উন্নতি দর্শনে মৎস্যজীবী ধীবর, হালদার ও নিকারি ব্যতীত আজকাল অনেকানেক ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতিগণও এই মৎস্য চালানের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন।

এই জেলার হাটবাজারে সর্বত্র আষাঢ় হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত পাট, ধান তৈলাদি সর্বপ্রকার পণ্যদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই জেলার প্রায় শতাধিক স্থায়ী বাজার, দুই শতাধিক অস্থায়ী হাট এবং অন্যূন ৫০।৬০ টি সাময়িক মেলায় বহুতর পণ্যদ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। এতৎ সমূহে এই জেলার উৎপন্ন দ্রব্য ও ভিন্ন স্থান আগত পণ্য সম্ভার এই জেলার মধ্যে বহু পরিমাণে কাটতি হইয়া থাকে। এই জেলায় বেড়া, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জাদি বন্দর পাট খরিদ বিক্রয়ের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই জেলার ব্যবসায় অতি বিস্তৃত, তৎপ্রযুক্ত এখানে কুণ্ডু, সাহা, বসাক, প্রামাণিক, পোদ্দারাদি উপাধিক বহু বৈশ্য জাতীয় মহাজন শ্রেণীর লোকের বাস আছে। সদিয়া, চাঁদপুর, সোহাগপুর, দেলুয়া, রাউতারা, চাটমোহর, দোগাছি প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্যজীবী বৈশ্য জাতির অবস্থা সমধিক উন্নত। সিরাজগঞ্জ বাণিজ্য হিসাবে প্রথম প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। এমনকি এখানকার সর্বপ্রথম নিযুক্ত মিঃ বেরী নামক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ইংরাজ জাতির জাতিগত সর্বপ্রধান উপজীবিকা ব্যবসায় হেতু এই সিরাজগঞ্জের বাণিজ্যের উন্নতি দর্শনে সরকারি চাকরি পর্যন্ত স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করিয়া পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন এবং তাহা হইতে তিনিই এখানে যে প্রসিদ্ধ চটকলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় দৈনিক ২২০০ লোক প্রতিপালিত হইত। তজ্জন্য প্রাচীনত্ব হিসাবে এই জেলায় জেলাবাসী ও সাধারণের বিশেষ কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকিলেও, পাবনার বিশেষত সিরাজগঞ্জের ইতিহাস বাঙালির অনেক শিক্ষণীয় বিষয় বর্তমান রহিয়াছে।

এই জেলার বস্ত্রশিল্প ও তাহার ব্যবসায়ে এখানকার তন্তুবায়াদি এবং মুসলমান কারিকরগণ চিরপ্রসিদ্ধ। এই জেলার দেলুয়া, কৈজরি, একদন্ড শিবপুর, সুজানগরাদি সমস্ত হাট হইতে সময় সময় সাপ্তাহিক প্রায় লক্ষাধিক টাকার কাপড় বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। অধুনা পাবনার শিল্পসঞ্জীবনী নামক যৌথকারবারের প্রচেষ্টায় একটি প্রধান ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তে পাবনার সম্প্রতি আরও মোজা গেঞ্জি প্রস্তুত জন্য যে সকল কারবার ও অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ হইয়াছে, আশা করা যায়, অনুষ্ঠানকারিগণ সৎপথে থাকিয়া ও সদভিপ্রায় লইয়া সর্বদা কার্যাদি পরিচালন করিলে, অচিরে পাবনার সুনামের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ধন সম্পদ বৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ ঘটিবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শিল্পজীবী ও তাহাদের অবস্থা

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই এই জেলায় অনেক শিল্পজীবী লোকের বাস আছে। হিন্দুগণ মধ্যে (১) তন্তুবায়গণ—সর্বপ্রধান বস্ত্রশিল্পী ; যোগী কাপালিগণও অনেকে কাপড় তৈয়ার করে। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি ১৯০৫ অব্দের স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাকাদি নানা জাতীয় হিন্দুগণও তাঁতের কার্যে লিপ্ত হইয়াছে। কাষ্ঠ শিল্প মধ্যে এই জেলায় বহু (২) সূত্রধর জাতির বাস আছে। তাহারা চৌকি, কপাটাদি ও ক্ষুদ্র বৃহৎ নৌকাদি নির্মাণ কার্যে সবিশেষ পারদর্শী। স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার নির্মাণ ও লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত

জন্য সোনার ও লোহার উভয় জাতীয় (৩) কর্মকার জেলার সর্বত্র অল্পবিস্তর বর্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে অনেক (৪) কাঁসারিও দেখিতে পাওয়া যায়। মৃৎ শিল্পী মধ্যে এই জেলার পাল উপাধিক বহু (৫) কুম্ভকারগণ জেলার সর্বত্রই অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত কুম্ভকার ও আচার্য জাতীয় অনেকে প্রতিমা প্রস্তুত ও পুতুলাদি চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শী (৬) চিত্রকর—স্থানে স্থানে ২।১ জন পরিলক্ষিত হয়।

মুসলমান সমাজে বস্ত্র শিল্পজীবী কারিকর জাতি সর্বাপেক্ষা বেশি ও সর্বপ্রধান। লৌহশিল্প, কাষ্ঠশিল্প কার্যেও অনেকে বিশেষ পারদর্শী। গোপালনগর ফরিদপুর অঞ্চলে "রসুয়া" নামক মুসলমান জাতীয় কতকগুলি কারিকর ও অন্যান্য স্থানে অনেকে উত্তম স্বর্ণ রৌপ্যের গহনাদি প্রস্তুত করিতে পারে। তৈল প্রস্তুতকারক খুলু জাতীয় মুসলমান এই জেলায় অনেক গ্রামে বিদ্যমান আছে। মুসলমানের মধ্যে অনেকে সোণ দ্বারা চিক্কণ ও মোটা গুণ তৈয়ারি করে। নলুয়াগণ এই জেলার স্থানে স্থানে নানাপ্রকার ডোলডালি চাটাই তৈয়ার করে। কান্ধাপাড়ায় ১৫।১৬ ঘর কাগজ প্রস্তুতকারক কাগ্‌জিগণের বাস আছে। উপরোক্ত শিল্পজীবিগণ সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। (১) যাহারা দ্রব্য বিশেষ দ্বারা কোন জিনিস স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া তাহা বিক্রয় দ্বারা জীবিকা অর্জন করে এবং (২) যাহারা কেবলমাত্র অন্যের বাড়িতে দৈনিক কার্য করিয়া পারিশ্রমিক স্বরূপ বেতনাদি গ্রহণ করে।

প্রথম শ্রেণী মধ্যে তন্তুবায়, কারিকর, খুলুআদি জাতিগণ ধরা যাইতে পারে। ইহারা স্বয়ং অর্থ ব্যয়ে বাজার হইতে দ্রব্যাদি ক্রয়ে যে সমস্ত জিনিস তৈয়ার করে ও তাহার উপস্বত্ব দ্বারা আপনার পারিশ্রমিক স্বরূপ যাহা পায় তাহাই মাত্র ইহাদের উপজীবিকা ; ইহাতে লাভ ও লোকসান উভয়ই হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যে যাহারা অন্যের বাটিতে বা নিজ গৃহে অন্যের দ্রব্যাদি লইয়া স্বীয় পরিশ্রমে কোন জিনিস তৈয়ার করে। সূত্রধর, কর্মকার, রাজমিস্তিরি প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। এতদুভয় শ্রেণীর শিল্পজীবিগণ মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীগণ অধিক পরিশ্রমী এবং তাহারা স্বীয় পরিশ্রমানুসারে অল্পবিস্তর কিঞ্চিৎ উপার্জন ও সঞ্চয়ে সমর্থ ; দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী মধ্যে অনেকেই আলস্য পরায়ণ এবং বিনা পরিশ্রমে অর্থ উপার্জনে যত্নবান। সুতরাং ইহাদের অবস্থা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীগণের ন্যায় স্বচ্ছল নহে। সাধারণত কৃষিজীবী অপেক্ষা এই জেলার শিল্পজীবী জাতিগণের অবস্থা কথঞ্চিৎ উন্নত। কিন্তু আলস্য হেতু তাহাদের অনেকে অধিক অর্থ উপার্জনে অসমর্থ ; কৃষিজীবীগণ সমস্ত বৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিলেও আকাশের মেঘ বৃষ্টি ও বাজারদরের উপর তাহাদের অদৃষ্ট নির্ভর করে ; তাহাদের কার্যের সাফল্য তাহাদের আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু শিল্পীগণ পরিশ্রম করিলেই কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিশ্রম বিমুখ বিধায় অন্যান্য দেশের ন্যায় ইহারা অধিক অর্থার্জনে সমর্থ হয় না। কৃষিজীবী অপেক্ষা শিল্পজীবী লোকের সংখ্যা অতীব কম, তদুপরি লোকের আলস্যতা নিবন্ধন সাধারণ লোকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন।

কৃষিজীবীগণ সাধারণত অধিকাংশ সময় ক্ষেত্রাদির কার্যে চাষ আবাদ ও শস্যাদি বিক্রয় জন্য হাটবাজারে কাজে লিপ্ত ও আবদ্ধ থাকে ; তন্নিমিত্ত তাহারা কোন প্রকার আমোদোৎসব কিংবা লোকের সহিত মিশামিশি করিতে অধিক সময় ক্ষেপন করিতে'পারে না। কিন্তু শিল্পীগণ তাহাদের নির্দিষ্ট সময়ে কার্য করা ব্যতীত অন্য সময়ে বিশেষ বিশেষ কার্যে ও আমোদ আহ্লাদে সময় ও মনোযোগ দিতে এবং লোকের সহিত অধিক পরিমাণে মিশিতে পারে। এই নিমিত্ত এদেশের কবি, হোলী যাত্রাভিনয়াদিতে তন্তুবায় নবশাকাদি জাতিসমূহকে অধিক লিপ্ত হইতে দেখা যায়। কান্দাপাড়া নিবাসী মথুর কর্মকারের এবং শাহজাদপুরের হাট কোম্পানি ও কাট কোম্পানির যাত্রাভিনয়ের দল বা সম্প্রদায়সমূহ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহাতে অনুমান হয় কৃষিজীবী অপেক্ষা শিল্পজীবীগণ কথঞ্চিৎ প্রফুল্লচিত্তে ও আনন্দে কালাতিপাত করে। ইহাদের নিরূপিত আয়ের পথই ইহার সর্বপ্রধান কারণ।

কৃষিজীবীগণের ন্যায় এই জেলার শিল্প ব্যবসায়ীগণের অবস্থাও বিশেষ স্বচ্ছল নহে। বস্ত্রজীবীগণ মধ্যে কারিকর জাতিগণ কয়েক বৎসর হইল, কথঞ্চিৎ উন্নতিলাভ করিয়াছে বটে, তাহাও বিশেষ বলা যায় না। শিল্পজীবীগণের অবস্থা খারাপ হইবার প্রধান কারণ তাহাদের পরিশ্রম বিমুখতা এবং দ্বিতীয় কারণ এ দেশিয় লোকের দেশজাত শিল্প দ্রব্যের প্রতি অমনোযোগিতা।

কৃষিজীবীগণের ন্যায় শিল্পীগণ এই জেলায় বিশেষ স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন না হইলেও, শিল্পীগণ কৃষক কুলের ন্যায় অধিক পরিমাণ ঋণগ্রস্থ নহে। তাহাদের নির্দিষ্ট আয় ব্যতীত একযোগে হাতে অধিক অর্থ সঞ্চিত হয় না, কিন্তু কৃষকগণ ভাদ্র আশ্বিন ও ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফসল সময়ে সাময়িক অর্থ পাইয়া অত্যধিক খরচ করে এবং হাল লাঙল, গবাদি খরিদ ও জমি পত্তনাদি জন্য ঋণগ্রস্থ হয়। তাহা পরিশেষ হইতে না হইতেই পুনরায় পুত্র কন্যার বিবাহে তাহাদের অপরিণামদর্শিতা হেতু অত্যধিক ব্যয় বাহুল্য প্রযুক্ত পুনরায় ঋণভার যুক্ত হইয়া থাকে। বাড়িতে করগেট টিনের গৃহাদি নির্মাণ ও চাকচিক্যযুক্ত হইলেও আষাঢ় শ্রাবণ মাসে খাদ্যের অভাবে শতকরা প্রায় ৯৯ জন কৃষককে মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। শিল্পীগণ গরিব অবস্থাপন্ন হইলেও তাহাদিগকে ইহাদের ন্যায় ঋণজালে জড়িত হইতে হয় না। কিংবা আপন অপরিণামদর্শিতা হেতু কষ্টভোগ করিতে হয় না। জমিজমা সংক্রান্ত নানাপ্রকার বিবাদে লিপ্ত হইয়াও অনেক সময় এদেশের কৃষকগণকে মোকদ্দমা আদিতে আইন আদালতে দৌড়াদৌড়ি করিয়া খরচান্ত হইতে হয় ; শিল্পজীবীগণের এই সমস্ত উপদ্রব নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একমাত্র আলস্যপরায়ণতাই এই জেলার শিল্পী ও কারিকরসমূহের অবস্থা উন্নত হইবার সর্বপ্রধান অন্তরায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—শিল্পজাত দ্রব্য

১. যন্ত্রচালিত শিল্প ঃ

(ক) মোজা, গেঞ্জি ও সোয়েটার—পাবনা শিল্পসঞ্জীবনীজাত গেঞ্জি ও সোয়েটার পাবনা জেলার আধুনিককালের কারখানাজাত শিল্পের মধ্যে সর্বপ্রধান। এতদ্ব্যতীত পাবনা সহরে ভারতমঙ্গল মিলস্ লিমিটেড, টেকস্টাইল মিলস্ লিঃ, সাহা ব্রাদার্সের হোসিয়ারি ফ্যাক্টরি প্রভৃতি নামধেয় আরও কয়েকটি মোজা গেঞ্জি ও সোয়েটার প্রস্তুতের কল ২।৩ বৎসর মধ্যে পাবনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৎসমুদয় হইতে নানাবিধ গেঞ্জি ও সোয়েটার দৈনিক তৈয়ার হইতেছে এবং দেশে ও বিদেশে বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। সিরাজগঞ্জে পূর্বে বঙ্গবিজয় ফ্যাক্টরি নামে যে একটি মোজা গেঞ্জির কল ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি তথায় একটি হোসিয়ারি মিলস্ লিমিটেড প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে।

পাবনার শিল্পসঞ্জীবনী কোম্পানি সর্বপ্রথম ১৩১২ সালে প্রতি অংশের মূল্যের একশত টাকা হিসাবে একলক্ষ টাকার মূলধনে প্রথমে মোজার কল লইয়াই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩১৩ সালে ফস্টার গেঞ্জির কল ও ১৩১৬ সাল ব্ল্যাকবারণ গেঞ্জির কল খরিদ করিয়া মোজা, গেঞ্জি ও সোয়েটার প্রস্তুত হইতে থাকে। প্রথম কয়েক বৎসর বিশেষ লাভ হয় না। ১৩২৩ সাল হইতে ডিভিডেন্ট বা লভ্যাংশ দেওয়া আরম্ভ হয়। ১৩২৬ ও ১৩৩১ সালে অংশ প্রতি সর্বোচ্চ ৩০ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। ১৩৩১ সালে ২৫৬১৯৭।৶১০ টাকা মূল্যের সুতা খরিদ

হয় ; ঐ সালে ২৮২১৫।৭ ডজন গেঞ্জি ও সোয়েটার প্রস্তুত হইয়াছে এবং ৪৬০৭৩১।৶/৯ টাকার গেঞ্জি ও সোয়েটার বিক্রয় হইয়াছে। প্রতি অংশের সাকুল্য টাকা ১৩২৭ সালে গ্রহণ করা হয়। পরে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার অংশ বৃদ্ধি করিয়া কোম্পানির মূলধন বর্তমানে দেড় লক্ষ ১৫০০০০ টাকা হইয়াছে। ২০০ দুই শত টাকা মাসিক বেতনের জনৈক বাঙালি ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে নানাশ্রেণীর প্রায় ১৫০ দেড়শত পরিমাণ লোক এই কোম্পানিতে কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। সমুদায় কারবারটি কোম্পানির নিজ বাটিতে অবস্থিত এবং ডিরেক্টর সভা কর্তৃক পরিচালিত। স্টিম ইঞ্জিনে কোম্পানির কার্য নির্বাহ হয়। পাবনার অন্যান্য গেঞ্জির কল অয়েল ইঞ্জিন সাহায্যে পরিচালিত হয়। তৎসমুদয়েও গড়ে প্রায় ২৫ পচিশ জন লোক দৈনিক জীবিকা অর্জন করে।

(খ) সিরাজগঞ্জের ইউরোপীয়, মারওয়াড়ি ও বাঙালি মহাজনদিগের অনেকের স্টিম ও অয়েল ইঞ্জিন সাহায্যে পরিচালিত কলে পাটের বড় ছোট গাইট বাঁধাই হয়। এতদ্ব্যতীত অনেক স্থলেই হাইড্রলিক প্রেসের সাহায্যে গাইট বাঁধাই হয়। পাবনা, বেড়া, উল্লাপাড়া প্রভৃতি পাট খরিদ বিক্রয়ের প্রতি কেন্দ্রস্থলেই এরূপ কল দেখা যায় ; ইহার সংখ্যা এই জেলায় ত্রিশটি পরিমাণ হইবে।

(গ) সিরাজগঞ্জ ও সাঁড়ায় বরফের কল প্রতিষ্ঠিত ছিল, সিরাজগঞ্জের কলটি উঠিয়া গিয়াছে। সাঁড়ারটি এখনও আছে। তথা হইতে মৎস্য চালান জন্য এই কল হইতে প্রস্তুত বরফ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত আজকাল পাবনায় কয়েকজন ছেলেদের খাদ্য জন্য মিষ্ট বরফের কল আনিয়া তাহা হইতে নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছে। কলে তৈয়ারি দিল্লির লাড্ডু উল্লেখযোগ্য। ইহা সমস্তই হস্তচালিত।

(ঘ) পাবনার দুইটি এবং সিরাজগঞ্জে তিনটি সোডাওয়াটারের কল প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা সম্পূর্ণই হস্তচালিত। প্রতিদিন ফাল্গুন হইতে আশ্বিন পর্যন্ত অধিক পরিমাণে সোডা তৈয়ার হয়। লোকে আজকাল তাহা বহুল পরিমাণে ব্যবহার করে।

২. হস্তচালিত গৃহশিল্প ঃ

১. বস্ত্রশিল্প—পাবনার তন্তুবায়, কাপালি ও কারিকরগণের পরিচালিত বস্ত্রশিল্প চিরদিন প্রসিদ্ধ। পাবনা সদরের দোগাছি, সাদুল্যাপুর, আমিনপুর এবং সিরাজগঞ্জের দেলুয়া, ছোটধুল প্রভৃতি অঞ্চলের সূক্ষ্ম ও মিহি উরাণী চাদর ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঢাকা মসলিনের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ। ইউরোপীয় ও বোম্বাই মিলের নানারূপ কাপড়ের আমদানি সত্ত্বেও পাবনার কাপড় সগৌরবে এখন পর্যন্ত বাজারে বিক্রয় হইতেছে।

পাবনাই ধুতি সাধারণত ৯×২ হাত লম্বা হয় ; ইহা পাবনা জেলার ধুতি নামে বাজারে পরিচিত। ইতিপূর্বে পাবনার কাপড়ের পা'ড় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। উরানী চাদর ৬×৩ হাত পরিমাণ হয়। দেলুয়া হাটে চওড়া পা'ড়যুক্ত শাড়ি পাওয়া যায়। ইহাতে জরির কাজও দেখা যায়। সাধারণ ধুতি এক জোড়া আজকাল ৫ টাকা হইতে ১৫ টাকা পর্যন্ত মূল্যে বিক্রিয় হয়। চাদর ১ খান ৩।৪ টাকা হইতে ২০।২২ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। জরির কাজ করা চাদর মারওয়াড়িগণ পাগড়ির জন্য ব্যবহার করে। পূর্বে মূল্য অনেক কম' ছিল। আজকাল দাম কিঞ্চিৎ বেশি হইয়াছে। কাপড় ব্যতীত কারিকরগণ বিছানার চাদর, সার্ট, কোট প্রভৃতি জামা প্রস্তুত উপযোগী নানাবিধ ছিট প্রস্তুত করে। আজকাল কারিকরের তৈয়ারি নানারঙের শাড়ি বহুল পরিমাণে তৈয়ারি হইতেছে ও অধিকাংশ লোকে ব্যবহার করিতেছে। সাধারণ মূল্য ৫ হইতে ৬ টাকা জোড়া বিক্রয় হয়। সাধারণত কৈজুরি, শাহজাদপুর, একদন্ত, সুজানগর, কাশীনাথপুর, আমিনপুর, বনগ্রাম, ডেমরা, ধুলাউরি, সিলিমপুর প্রভৃতি হাটে মোটা দেশি কাপড় আমদানি হয়। বেলুয়া হাটে অধিক পরিমাণে সূক্ষ্ম সুতার কাপড় আমদানি হয়। রঙ্পুর মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেলার পাইকারগণ এই সমস্ত স্থান হইতে কাপড় খরিদ করিয়া থাকে।

মুসলমান কারিকর ও হিন্দু তন্তুবায়গণ পাবনার এই বস্ত্রশিল্প বজায় রাখিয়াছে। সুতা সবই বিলাতি ও জাপানি, দেশি চরকা কাটা সুতার প্রচার ও ব্যবহার বহু পরিমাণে হইতেছে না।

সরকারি বিবরণী হইতে মোটামুটি জানা যায় এই জেলায় প্রায় ৯৫০০ সাড়ে নয় হাজার তাঁত আছে, তাহার মধ্যে তিন হাজার পরিমাণ ফ্লাইসাটল তাঁত। এই সমুদায় তাঁত হইতে বার্ষিক গড়ে অন্যূন ৭৫ পঁচাত্তর লক্ষ গজ কাপড় তৈয়ার হয়। এই জেলায় কারিকরদিগের জন্য ছয়টি কো-অপারেটিভ সমিতি বর্তমান আছে। সাধারণ কারিকরের দৈনিক উপার্জন গড়ে প্রায় দেড় টাকা পরিমাণ হইতে পারে।

তন্তুবায়গণ অপেক্ষা কারিকরগণ অধিক পরিশ্রমী এবং তাহারাই বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে স্বীয় অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি করিয়াছে। এরূপ অনুমান হয় নিম্নলিখিত গ্রামসমূহে নিম্নলিখিত সংখ্যক তাঁত পরিচালিত হইতেছে।

গ্রাম	তাঁতের সংখ্যা	গ্রাম	তাঁতের সংখ্যা
দেলুয়াদিগর	১৭০০	শিবপুর	২৫০
রাধুনীবাড়ি	৫০০	সাদুল্যাপুর	২০০
তামাই	৫০০	মানিকদির	২০০
সোহাগপুর	৫০০	আমিনপুর	১৫০
আসাননগর	৪০০	সাগরকান্দি	১৫০
রুকনাই	৩০০	রাঘবপুর	১০০
এনায়েতপুর	৩০০	সিলিমপুর	১০০
শাহজাদপুর	২০০	দোগাছি	১০০
বেজগাঁতি	২০০	বালুদিয়ার (চাটমোহর)	৫০

২. **পাটিশিল্প**—সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন, ঝাউল, তেথুলিয়া, কালিয়াহরিপুর, আটঘরিয়া আদি অঞ্চলে গুল্ম জাতীয় এক প্রকার বেত্র নির্মিত পাটি বা শীতল পাটি তৈয়ার হয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ইহা প্রস্তুতে সিদ্ধহস্ত। জঙ্গল বা বাগানে পাটির গাছ লাগান হয়; একবার গাছ লাগাইলে ৩।৪ বৎসর তাহা হইতে বেত কাটা চলে। চিক্কণ করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া ও গরম জলে সিদ্ধ করতঃ বেত পাটি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোক মধ্যে যাহারা পাটি নির্মাণে সিদ্ধহস্ত তাহাদের বিবাহে অধিক পাত্রপণ গৃহীত হয়।

পাটি ব্যবহারে মসৃণ, আরামপ্রদ ও সুশীতল। মাদুরের ন্যায় ইহাতে ছারপোকার উপদ্রব কম। সাধারণত ৫×৩ হাত পাটি ৩/৪ টাকা হইতে ২০/২২ টাকা মূল্যেও বিক্রয় হয়। অতি মিহি ও মূল্যবান পাটি সাধারণত সাদা ও আয়তনে অনেক ছোট হয়। অনেক সময় পাটিতে নানা কারুকার্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাটি ব্যতীত সোঁদা নামক গুল্ম দ্বারা উল্লাপাড়া অঞ্চলে মাদুর বা চলিত ভাষায় সপ তৈয়ার হইয়া থাকে। পুটিয়া হাটে ইহা অনেক পাওয়া যায়।

৩. **লৌহশিল্প**—প্রতি হাটে ও প্রায় অধিকাংশ পল্লীতে লৌহ কর্মকারের দোকান আছে। সাঁড়া পুলিশ স্টেশনের অধীন বাঁশেরবাধা গ্রামে অনেক হিন্দু মুসলমান লৌহ কর্মকারের বাস। ইহারা দা, কাচি, কুঠার, কোদাল, খোন্তা, পাচন, নিরানি আদি নির্মাণে সিদ্ধহস্ত। মথুরা ভারেঙ্গা অঞ্চলে পূর্বে অনেক নৌকা নির্মাণোপযোগী পাতাম লোহা ও পেরেক প্রস্তুতকারক বহু কর্মকারের বাস ছিল। এখন পর্যন্ত কৈজুরি হাটে উক্ত অঞ্চলাদি হইতে অনেক লৌহজাত দ্রব্য আমদানি হয়। সিরাজগঞ্জের উত্তরাঞ্চলে সুতানারা প্রভৃতি পল্লীতে দাও, খোন্তা, সরতা প্রভৃতি নানাবিধ লৌহ দ্রব্য নির্মিত হইয়া সিরাজগঞ্জ বাজারে অনেক বিক্রয় হয়। পাবনা টেকনিক্যাল স্কুলে অনেক প্রকার লৌহশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

৪. **কাষ্ঠশিল্প**—এই জেলার সোনামুখী মেলায় পূজার সময় বহু প্রকার তৈয়ারি কপাট

আদি আমদানি হয়। সলঙ্গা হাটেও ঈদৃশ অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়। দেলুয়াদি গ্রামের অনেক সূত্রধর নির্মিত ৭০/৮০ টাকা মূল্যের বহু কপাট উল্লাপাড়া মহাজনদিগের গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। পাবনা দোগাছি হাটে ও অনেকানেক গ্রাম্য হাটে দেশিয় কাষ্ঠ নির্মিত লাঙল ও তাহার সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি খরিদ বিক্রয় হয়। চৌবিল্যা এবং পুটিয়া হাটে বর্ষায় দৈনিক শতাধিক ছোট বড় কাষ্ঠ নির্মিত তেয়ারি নৌকা আমদানি হয়। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে কপাট, জানালাদি নানা কাষ্ঠ নির্মিত দ্রব্য এ জেলায় সূত্রধরগণ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

৫. **বেতশিল্প**—বেতুয়াগণ জঙ্গল হইতে বেত কাটিয়া ছোট বড় ধামা, কাঠা, ডালা, টুরি (কুন্‌কি) প্রভৃতি তৈয়ার করতঃ বিক্রয় করে। রামচন্দ্রপুর ও দোগাছি নিবাসী মুসলমানদিগের মধ্যে কয়েকজন কারিকর বেতের নির্মিত চেয়ার, মোড়া ও বাক্সদি নির্মাণ করিয়া বিক্রয় করে। সাধারণ চেয়ার ১।০ হইতে ২ টাকা পর্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হয়।

৬. **মৃৎশিল্প**—খুকনি, উল্লাপাড়া, মাঝিপাড়া, সিঙ্গা প্রভৃতি পল্লী হইতে মৃত্তিকা নির্মিত সাধারণ ব্যবহার উপযোগী হাড়ি, পাতিল, কলসি তৈয়ার হয় এবং হাটে বাজারে সর্বত্র পাওয়া যায়। অষ্টমনীয়া মৃজাপুরে দীর্ঘদিন স্থায়ী হাড়ি, পাতিল ও উত্তম কৃষ্ণবর্ণের চাড়ি পাওয়া যায়। কোলা ও গোবিন্দপুরে কুম্ভকারগণ এবং স্থানে স্থানে আচার্য ও সূত্রধরগণ সুন্দর প্রতিমাদি নির্মাণ করে। সাতেনতলি (ছাড়িয়ানতলি) প্রভৃতি অঞ্চলে কুম্ভকারগণ মৃত্তিকা নির্মিত অনেক প্রকার খেলনাদি প্রস্তুত করে। মেলা ও আড়ং আদিতে তাহা বহুল পরিমাণে বিক্রয় হয়। মৃৎশিল্প মধ্যে এই জেলার পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জ টাউনে ইট টালি আদি প্রস্তুত হয়। পাথুরিয়া কয়লা সংযোগে পাঝা পোড়ান হয়। পূর্বে মজুরি কম ছিল। ইটের দর কম ছিল, অধুনা ইটের দর বৃদ্ধি হইয়া ১০×৫×৩ ইঞ্চি পরিমাণ ইটের হাজার প্রতি ৩০ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে।

৭. **বংশ শিল্প**—বাঁশফোর, ডোম, মুচি, মেথর প্রভৃতি জাতিরা বাঁশ দ্বারা ডালা, ডালি, ঝুড়ি, পাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করতঃ জীবিকার্জন করে। সিলিমপুর ও দোগাছি হাটে বাঁশের তৈয়ারি চাটাই অনেক আমদানি হয়। বর্ষাকালে বাঁশের তৈয়ারি চারু, ধিয়ার আদি বহুল পরিমাণে বিক্রয় হয়। সর্বদা সর্বত্র হাটে বাঁশের নির্মিত পলো বিক্রয় হয়। তরল্লা বাঁশের ছিপ স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। বাঁশের তৈয়ারি লাঠি বিশেষ বিক্রয় না হইলেও অনেক ব্যবহৃত হয়।

৮. **চর্মশিল্প**—দেশিয় চর্মকারগণ ব্যতীত বেহারাদি পশ্চিমাঞ্চলের অনেক চামারগণ জুতা তৈয়ার ও মেরামত করে। দেশিয় চর্মকারগণ জুতা ব্যতীত স্থানে স্থানে ডুগি তবলা ও মথুরাঞ্চলের কেহ কেহ উত্তম মৃদঙ্গ তৈয়ার করে। দেশিয় মুচি ও ঋষি জাতীয় লোকেরা গো-মহিষাদির চামড়া থালিয়া ভিন্ন দেশ আগত মুসলমান বেপারিগণের নিকট অগ্রিম দাদন লইয়া চামড়া সরবরাহ করে।

৯. **সূত্রশিল্প**—পাট হইতে তাঁতিয়া সর্বত্র তৈয়ার হয়। এতদ্ব্যতীত নৌকা ও গাড়িতে মালপত্রাদি বহন জন্য পাট দ্বারা রশি (চলিত ভাষায় কাছি) প্রস্তুত হয়। নৌকা বহন জন্য সোণ দ্বারা নাকালিয়া, সাধুগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ ধানবাঁধিতে অতি উত্তম মোটা মিহি নানাপ্রকার গুণ তৈয়ার হয় এবং এই শিল্পদ্বারা বহু মুসলমান শিল্পী প্রতিপালিত হয়। ২/৩ গুণ পাক বিশিষ্ট গুণে মূল্য বেশি। ইহা সাধারণত ওজন দরে সময় সময় ২০/২২ টাকা মন হিসাবে বিক্রয় হয়।

কাপালিক জাতীয় স্ত্রীলোক পুরুষ অনেকেই সোহাগপুর আদি অঞ্চলে এলং বাদাই রাণীনগর প্রভৃতি গ্রামে পাটের সুতা বা তাঁতিয়া দ্বারা চট, ছালা এবং টাকা পয়সা রাখিবার খুতি ও থলিয়া তৈয়ার করে।

১০. **কম্বলশিল্প**—সাঁড়ায় পশ্চিম দেশিয় কয়েকঘর গণেরি জাতি কম্বল তৈয়ার করে।

১১. **শতরঞ্চশিল্প**—সিরাজগঞ্জের অধীন রাইপুরে শ্রীবিজয়গোবিন্দ রায় নামক জনৈক ব্যক্তির সূত্র নির্মিত শতরঞ্চ তৈয়ারির কারখানা আছে।

১২. **কাগজশিল্প**—সিরাজগঞ্জের অধীন কান্দাপাড়া গ্রামে সেখ উপাধিক কারিকরগণ দেশিয় প্রথায় কাগজ তৈয়ার করে। কালিয়াহরিপুরে নবাবী আমলে কাছারি থাকা কালে তাহারা নবাব সরকারের কাগজ সরবরাহ জন্য এখানে আনীত হয় এবং উক্ত কার্য জন্য ইহাদের পূর্বে জায়গির ছিল জানা যায়।

কাগজ প্রস্তুত প্রণালী—মেস্তা নামক পাট খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেশিয় চুণ কিংবা পাথুরিয়া চুণের সহিত ২/৪ দিন জলে ভিজাইতে হয়। তৎপর তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেকিতে চূর্ণ করত জলে ধুইলে চুণ বাহির হইয়া যায়। পাট ক্রমে নরম হয়। তখন ঐ নরম আঁশগুলি জলপূর্ণ একটা বড় জালাতে ৩/৪ দিন পুনরায় ভিজাইতে হয়। তৎপর ২।৩ হাত এক খণ্ড বাঁশের লাঠি দ্বারা ঘুটিতে হয়। যখন একেবারে কর্দমের ন্যায় হইয়া আসে, তখন যে আকারের কাগজ তৈয়ার করিতে হইবে, তৎপরিমাণ, সাধারণত ২০×২১ ইঞ্চি পরিমাণ বাঁশের চিক বা চালুনির উপর কর্দমপূর্ণ জালা হইতে পরিমাণ মত কতকাংশ উঠাইয়া চালুনি সমভাবে ঘুরাইতে হয়। সমানে ছড়াইয়া গেলে তখন তাহা হইতে উঠাইয়া কাগজের "তা"এর আকারে একখানা তক্তা বা পিড়ির উপর রাখিতে হয়। এই প্রকারে প্রয়োজনানুসারে উক্ত প্রকার ২৫/৩০ খান উপর্যুপরি রাখিয়া তাহার উপর আর একখানা তক্তা দিয়া চাপ দিলে ক্রমশ জলীয় ভাগ বাহির হইয়া যায়।

পরে কাষ্ঠ হইতে উঠাইয়া সমান মাটি দ্বারা লেপা বেড়ার সহিত কাগজের আকৃতি বিশিষ্ট "তা"এর আকারের প্রত্যেকখানা কাগজ পৃথক পৃথক ভাবে অতি সাবধানে ২/১ দিন ঝুলাইয়া রাখা হয় ; ইহাতে জলীয় ভাগ একেবারে শুকাইয়া যায়। হঠাৎ বেশি রৌদ্র না লাগে এমত ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিতে হয়। পরে উঠাইয়া উহার দুই পৃষ্ঠায় চাউলের গুড়া লাগাইলে মোটা কাগজ তৈয়ার হয়। পুনরায় মসৃণ প্রস্তর দ্বারা ঘসিয়া পালিস করিলে ভাল কাগজ প্রস্তুত হয়।

সাধারণত সাদা কাগজের অধিক প্রচলন ; লাল ও নীল রং মিশ্রিত করিয়াও অল্প কাগজ তৈয়ার হয়। ইহা নির্মাণে স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীর পরিশ্রম আবশ্যক হয়। এক জালা মসলায় সাধারণত ৪/৫ দিস্তা কাগজ তৈয়ার হয়। এই দেশিয় কাগজ একমাত্র সিরাজগঞ্জের দেশিয় ও মারওয়াড়ি ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহ ব্যবহার করে না। সিরাজগঞ্জের খলিফা পটিতে পাওয়া যায়। বাজারে সাধারণত ।৶০ হইতে ১৵০ আনা পর্যন্ত দিস্তা দরে এবং গ্রামে ॥৵০ হইতে ।৵০ দরে বিক্রয় হয়। কান্দাপাড়া ১২/১৪ ঘর কাগজ শিল্পী বর্তমান আছে। ইহারা এই দেশিয় শিল্প বজায় রাখিয়াছে। দেশে লেখাপড়ার চর্চা অধুনা বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু দেশিয় কাগজ শিল্পের কোনই উন্নতি হয় নাই। দেশিয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক।

১৩. **রঙশিল্প**—পাবনা ও এনায়েৎপুর অঞ্চলে লাল ও নীল রঙ দ্বারা সাদা বিলাতি ও জাপানি সুতা রঙ করিয়া মুসলমানগণ হাটে বাজারে বিক্রয় করে। ধীবর ও নিকারি আব্দাল জাতীয় লোকেরা গাবের ফল ঢেকিতে কুটিয়া জলে ভিজাইয়া নৌকা ও জাল রঙ করে, আজকাল আলকাতরা উক্ত কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে, গাবের চলন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। তবে কৈজরি শাহজাদপুর হাটে এখনও বিস্তর গাব বিক্রয় হয়। চর্মকারগণ বাবলার ফল ও আমগাছের উপর জাত ধারিয়া নামক পরগাছার ডাল জলের মধ্যে ভিজাইয়া চামড়া রঙ করে। এই জেলার স্থানে স্থানে সোনালি কুল গাছে এক প্রকার লম্বাজাতীয় ফল জন্মে তাহা হইতে উত্তম কৃষ্ণবর্ণ রঙ তৈয়ার হয়। কুসুম ফুল হইতেও একপ্রকার রঙ প্রস্তুত হয়।

১৪. **শঙ্খশিল্প**—চাটমোহরে বৈশ্যোপাধিক জাতিগণ বিভিন্ন স্থান হইতে শঙ্খ খরিদ করিয়া তাহাতে নানারূপ রঙ ও শিল্প কাজ করত উত্তম শাঁখা তৈয়ার করে। দেশের সাধারণ সধবা স্ত্রীলোকগণ পূর্বে ইহা অধিক ব্যবহার করিত। এক্ষণে বিদেশিয় চুড়ির প্রচলনে শাঁখা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

১৫. **নলশিল্প**—মুসলমান জাতীয় নলুয়াগণ নানাস্থানে হইতে নল সংগ্রহ করিয়া তদদ্বারা ডোল, ডালি, চাটাই (দরমা) প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। পাবনা রামচন্দ্রপুর, ফরিদপুর এবং সিরাজগঞ্জের রোহাবাড়ি পল্লীতে অনেক নলুয়া জাতির বাস আছে।

১৬. **তৈলশিল্প**—পাবনা জেলার প্রতি গ্রামেই ২/৪ ঘর তৈল প্রস্তুতকারক মুসলমান খুলু জাতির বাস আছে। ইহারা সরিষা, রাই, তিল, প্রভৃতি হইতে দেশিয় প্রথায় ঘানিতে গবাদি সাহায্যে তৈল প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। পাণ্ডাসি গ্রামে, ভাঙুরিয়া অঞ্চলে অনেক খুলু জাতি বাস করে। ভারেঙ্গা অঞ্চলে কতকগুলি হিন্দু তেলির বাস ছিল। খুলুরা দেশিয় কাষ্ঠের ঘানিতে তৈল প্রস্তুত করতঃ তৈল ও খৈল উভয়ই বিক্রয় করে। তৈলে ভেজাল দেওয়া প্রথা স্থানে স্থানে দেখা যায়। খৈল সাধারণত গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

১৭. **আতসবাজি শিল্প**—হিন্দু মালাকর ও স্থানে স্থানে মুসলমান কারিকরগণ বোম, হাওই, চরখি, তুরমি প্রভৃতি নানাপ্রকার আতসবাজি নির্মাণ করে। বিবাহ দীপান্বিতা ও সাময়িক উৎসবাদি সময়ে অনেক আতসবাজি তৈয়ার হইয়া থাকে।

১৮. **বিবিধ শিল্প**—ব্রাহ্মণ গৃহে পূর্বাপর স্ত্রীলোকেরা কার্পাস হইতে (ক) উত্তম উপবীত তৈয়ার করিয়া থাকে। আজকাল পুনরায় দেশে স্থানে স্থানে চরকার প্রচলন হওয়ায় তাহাতে কার্পাস সুতা তৈয়ার করিবাব প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

হিন্দু মুসলমান গৃহের মেয়েরা অনেকেই সুন্দর (খ) কাঁথা তৈয়ার করিতে পারে এবং ইতর ভদ্র সাধারণ সকলেই ইহা ব্যবহার করে। এদেশের হিন্দু মুসলমান গৃহে স্ত্রীলোকেরা অনেকেই পাট ও সূতা দ্বারা সুন্দর (গ) সিকা প্রস্তুত করিয়া গৃহ দ্রব্যাদি রক্ষা করে। হিন্দু স্ত্রীলোকগণ বিবাহ অন্নারম্ভাদি সময়ে এবং লক্ষ্মীপূজা পৌষ পার্বণাদি সময়ে চাউলের গুড়া জলে মিশ্রিত করিয়া কাষ্ঠের পিড়িতে, গৃহ দেওয়াল ও আঙ্গিনাদিতে নানারূপ (ঘ) আলিপনা দিতে সিদ্ধহস্তা। পাবনা হরিতলা গ্রামে অনেকে বেলের খোল দ্বারা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গলায় দিবার উপযুক্ত (ঙ) মালা তৈয়ার করে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কোন কোন গ্রামে কাষ্ঠের মালা তৈয়ার হয়। পাথর অথবা কাষ্ঠের উপর নানাবিধ শিল্পকার্য করত তাহাতে খাদ্য দ্রব্যাদি ছাপা দিবার জন্য নানাপ্রকার (চ) "সাজ" ও "সঞ্চ" এদেশের হিন্দু স্ত্রীলোকগণ স্থানে স্থানে তৈয়ার করে। মোদকগণও নানারূপ সাজ তৈয়ার করিয়া নানারূপ খাদ্য তৈয়ার করে।

লুপ্তশিল্প ঃ

১. **চুড়ি শিল্প**—এই জেলার লুপ্তশিল্পজাত মধ্যে সোহাগপুর, বাগবাটি আদি অঞ্চলের কাচারু এবং লাহারু জাতীয় লোকের আচরিত মৃত্তিকা ও লোহা নির্মিত চুড়ি বলয়াদি শিল্প এক সময়ে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা এক্ষণে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে।

২. **পিতল কাঁসা**—বাসন নির্মাণ প্রথা অতি পূর্বে এই জেলায় অতি বিস্তৃত ছিল। মালঞ্চি আদি গ্রামে পূর্বে অনেক কাঁসারি জাতির বাস ছিল। তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে মাত্র সিরাজগঞ্জের অধীনস্থ লক্ষ্মীপুর গ্রামে কয়েক ঘর কাঁসারি বাসন তৈয়ার করে।

৩. **রেশম শিল্প**—পূর্বে অরণকোলার নিকটবর্তী মুন্সিদপুর নামক স্থানে রেশমের কুঠি থাকা জানা যায়। এক্ষণে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। হাণ্ডিয়াল বন্দরে পূর্বে অনেক রেশম আমদানি হইত। আজকাল এই জেলার কোন স্থলেই রেশম তৈয়ার হইতে দেখা যায় না।

৪. **চিনি শিল্প**—পূর্বে পাল ও মোদকগণ পুকুরের সেওলা দিয়া গুড় ঢাকিয়া রাখিয়া অল্পবিস্তর বাঁটা চিনি তৈয়ার করিত। এক্ষণে নদীয়া জেলার অন্তর্গত পূর্বে পাবনা জেলার অধীনস্থ চিনিরকুঠি নামক স্থানে চিনি প্রস্তুত হইত বলিয়া জানা যায়।

৫. **নীল**—এই জেলার একটি প্রধান লুপ্ত শিল্প বলা যায়। পাবনায় সর্বসমেত পাঁচটি প্রধান কনসারন বা কুঠি এবং তদাধীনে প্রায় ৮০/৮২টি কুঠিতে নীলের কাজ চলিত। সমস্ত কুঠিই এক্ষণে ভূমিসাৎ হইয়াছে। কেবলমাত্র পাবনা মাঝিপাড়ার কুঠির দালান এখনও বর্তমান

আছে। অন্যান্য জেলার ন্যায় পাবনা জেলারও স্থানে স্থানে নীলকরগণের নানারূপ অত্যাচার হইত। দেশের প্রজা ও রায়তগণ তাহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া গভর্নমেন্ট সমীপে বহু আবেদন নিবেদন করিতেছিল। পাবনা জেলার পদ্মা যমুনা বরলাদি নদী তীরস্থ অনেক প্রধান প্রধান গ্রামে নীলকুঠি বর্তমান ছিল ; এমন কি ২/৪ ক্রোশ পর পরই স্থানে স্থানে নীলকুঠির কাজ চলিত। সলপ অঞ্চলে নীলকরদিগের সহিত তথাকার জমিদারগণের বিশেষ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। জেলার পশ্চিম উত্তর প্রান্তে কদাচিৎ নীলকুঠি পরিলক্ষিত হইত। প্রজাগণ, মজুরাদি ও তাহাদের পক্ষাবলম্বী ভূম্যধিকারিগণের প্রবল আন্দোলনের ফলে কুঠিয়াল সাহেবগণ তাহাদের কার্য বন্ধ করিতে বাধ্য হয়েন। দেশের সমবেত জনসাধারণের এই আন্দোলন নীল বিদ্রোহ বলিয়া পরিচিত হইত। পাবনা জেলার গ্রাম্য কবিদারগণ নীল হাঙ্গামা সময়ে যে সমস্ত ছড়া পাঁচালি রচনা করিয়াছিল নিম্নে তাহার একটি নমুনা দেওয়া গেল, ইহাতে তৎসময়ের অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। কবিতাটি ধানুয়াঘাটা নিবাসী শতাধিক বর্ষের ঊর্ধ্ব অধুনা জীবিত শ্রীমাঙ্গন সরকার নামক কবির দলের সরকার কর্তৃক রচিত। সমুদয় গানটি সে মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া শুনাইল।

নীল বিষয়ক গান

মুল্লুকের গুড়াগুড়ি, কবিতার শুরু করি
যা করেন গুরু ;
শুন কুঠালের সমাচার, কালিদহে কুঠি যার
ক্যানি সাহেব কাজ্যার কল্প শুরু
সে আউসের জমিতে বোনে নীল, সব রায়তের হল মুস্কিল,
সব রায়তের মনে অবিস্তর ;
দিলেতে পাইয়া ব্যথা, নালিশ করে কলিকাতা,
দরখাস্ত দিল তিন সায়াল ;
দরখাস্তে হল স্পষ্ট, লাটসাহেব হ'লো ব্যস্ত
বাংলাতে পাঠাল গব্নাল ;
গব্নাল এলো বাংলা পরে, ধুমাকলে নৌকা চলে,
বলবি কি সে নৌকা সাজের কথা।
তার দুই পাশে দুই চাকা ঘোরে চলে কেবল আগুন জোরে,
গোলই বাঁধা সোনা।
তার পাছা নায়ে নিশান গাড়া ধুমাকলে নক্কার পোরা
মধ্য নায়ে যান ব্যস্তপুরী
দোহাই ধর্ম অবতার, তুমি কর সুবিচার,
ঝাঁপ দিল সব ইছামতির জলে,
নায় থেকে গবনাল বোলে, আজ তোমরা ফিরে যাও ঘরে,
কালি আমি যাব পাবনা, তোমাদের নাইকো ভাবনা,
তজবিজ করব ৫/৭ দিবস পরে।
পাবনাতে মিছিল হ'লো, সব জমিদার জুটে এলো,
আর এলো ক্ষেতুপারার রায়।
বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী তাঁতিবন্দ যার বাড়ি
ফুলবাড়িরও দ্বারক সরকার যায়,
দুলাইর মুনসী সাহেব, নন্দী মহাশয় যার নায়েব
আর যান স্থলের পাকড়াশি।

মৌলবী আবদুল আলী ঢাকার সহর যার বাড়ি
সিরাজগঞ্জে হিস্যা যার আছে।
তাড়াসের ছোটবাবু কুঠাল দেখে বড়ই কাবু
ফরিদপুর সে দিয়াছে ইজারা।
বড় তর-ফ বনয়ারীলাল, যার ডঙ্কা চিরকাল ;
সাহেব মা'রে কল্প ছারখার ;
সে পুণ্যা করে জ্যৈষ্ঠ মাসে, আমলাগণ সব চতুষ্পার্শে,
আগে বাঁধে লাঠির আগায় ফুল।
ড্যামরা আছে ছালু সরকার, করতে দেয়না নীলের কারবার
লাঠি ধরে ডোমরার পচা রায়।
ডোমন গিরি সন্ন্যাসী বগুড়া জেলা যার বাড়ি
গোসাইদের গুরুদেব হয়।
হামকুড়ার মজুমদার, বিশিদের কারপরদাজ,
নাটোরের মহারাজা বড়ই সুখী তার প্রজা,
রতন বিশির দেখে করে ভয়।
রতন বিশি হুকুম দেয় কুঠি ভাঙে ডেমরার রায়,
কুঠি ভাঙে ফ্যালল জলে ;
পরদাওয়ালা শুনতে পায়, জজের কাছে খবর দেয়,
জজে সেই খবর পাল, অগ্নি সমান রাগ হল,
শুনল রতন বিশির কথা, জজে করে হেট মাথা
মোকদ্দমা করে ডিসমিস।।

দেশের কৃষি প্রজা সাধারণের বিরুদ্ধে স্থলে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া নীল বুনানীতে অস্বীকৃত হইয়া দল বদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের তৎকালীন অবস্থা নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে উপলব্ধি হয়। যথা—The evidence of popular excitement in the district is forthcoming in the following passage of Sir J. P. Grant's minute of 17th Sep. 1860, "I have myself just returned from an excurtion to Serajgunj on the Jamuna river where I went by watch for objects connected with the line of the Dacca Railway and wholly unconected with the Indigo matters. ...... I proceeded along the the Kumer and the Kaliganga, which rivers run in Nadia, Jessore and through the part of the Pabna District which lies south of the Ganges.

"Numerous crowds of rayats appeared at various places whose whole prayer was for an order of Government that they should not cultivate indigo. On my return a few days afterwards along the same rivers for some 60/70 miles both banks were literally lined with crowds of villagers claming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves ; the males who stood at and between the river side villages in little crowds must have collected from all the villages, at a great distance on either side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian officer to steam for 14 miles through a continued double street of supplicants for justice ; all were almost peaceful and orderly but also were plainly in

earnest. It would be a folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people, men, women and children has no deep meaning. The organisation and capacity for combined and simultaneous action in the cause, which this remarkable demonstration over so large an extent of the country proved, are subjects worthy of much consideration."

Bengal under Lieutenant Governors. P. 191/192

পাবনা সদর তৎকালে পাংশা নিবাসী ভৈরবচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অধীনে বন্দোবস্ত ছিল। তাহার সহিত কুষ্ঠিয়ার সন্নিহিত সালঘর মধুয়ার প্রসিদ্ধ নীলকর মিং ক্যানি সাহেবেব নানারূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। তৎসম্বন্ধে এদেশে নানারূপ ছড়া কবিতা প্রভৃতি প্রচলিত আছে। তিনি মিঃ ক্যানি সাহেবের বিরুদ্ধে বহুতর টাকার ডিক্রি হাসিল করিয়া পরিশেষে তাহাকে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই প্রকারে ক্রমশ এদেশের নীলকরগণের নানাস্থানের কুঠিতে নীলবুনানী বন্ধ হয় এবং তাহাবা কারবারাদি সমস্ত উঠাইয়া লইতে বাধ্য হয়েন।

খাদ্য শিল্প ঃ

চাটমোহরে মোদকগণ (১) রসকদম, (২) বাঘবসই, বাগবাটিতে (৩) সন্দেশ ও (৪) মোণ্ডা, পাবনায় (৫) রসগোল্লা, (৬) চমচম ও (৭) কাঁচাগোল্লা তৈয়ার হয়। চৌহালিতে শীল উপাধি জনৈক নরসুন্দর উৎকৃষ্ট সন্দেশ বসগোল্লা তৈয়ারিতে সিদ্ধহস্ত। শাহজাদপুরের পালেবা উত্তম রসগোল্লা, সন্দেশ ও মোণ্ডা প্রস্তুত কবে। সাদিয়া চাঁদপুরে কুড়ি জাতি মধ্যে অনেক ভাল (৮) পাণিতাওয়া তৈয়ার করিতে পারে। পাবনা সিরাজগঞ্জ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাজারবন্দরে উড়িষ্যা ও পশ্চিমা ব্রাহ্মণ ও দেশিয় ময়রাদি জাতিগণ (৯) জেলাপী, পাণিতাওয়া (১০) ছানাবড়া (১১) বুঁদা প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য তৈয়ার করিযা বিক্রয় করে। পাবনায় মুসলমানের মধ্যেও কয়েকজন সন্দেশ রসগোল্লাদি তৈয়ারিতে প্রসিদ্ধ। পাবনায় মুসলমান মধ্যে বহু দিন হইতে ১৫/১৬ জন কারিকর অতি সুন্দর (১২) পাঁউরুটি, (১৩) বিস্কুট, (১৪) ঝার প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া আসিতেছে। ইহা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিগণই বহুল পরিমাণে ব্যবহার করে।

বেতিল ও ছোট ধুলের ঘোষ এবং সদিয়া চাঁদপুরের কুড়িগণ উত্তম চন্দনচুর (১৫) দধি তৈয়ার করে। ভারাঙ্গার ঘোষেরা উৎকৃষ্ট খাসা সব্‌ক দধি ও হাটুরিয়া গ্রামের পালগণ উত্তম (১৬) ক্ষীর তৈয়ারিতে সিদ্ধহস্ত। চান্দাইকোণা, বনগ্রাম, চাটমোহর, কুঁচিয়ামোড়া প্রভৃতি স্থানে অত্যুৎকৃষ্ট (১৭) চিড়া পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে মোদক, পাল ও ময়রাগণ (১৮) খাগরাই, (১৯) মুরখি, (২০) বাতাসা, (২১) কদ্‌মা, (২২) খাজাদি তৈয়ার করে। নিশ্চিন্তপুরে (সুজানগর) সাহা জাতীয় অনেকে এক সের ওজনের (২৩) ফেণী বাতাসা প্রস্তুত করে। শাহজাদপুর কৈবট, ক্ষিদ্রচাপরি, মশীপুর প্রভৃতি গ্রামে কাপালিক, সাহা, কুড়ি আদি জাতিগণ চাউল গুঁড়া সিদ্ধ করিয়া শীতকাল হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত (২৪) ঝুরি নামে যে এক প্রকার সাদা খাদ্য তৈয়ার করে, তাহাও খাদ্যরূপে হাটে বাজারে এবং মেলাদিতে বহুল পরিমাণে বিক্রয় হয়। শীতকালে উৎপন্ন (২৫) গুড় ও (২৬) খেজুরাপাটারি প্রধান খাদ্য শিল্প।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—বাণিজ্যাদি

ব্যবসায়ী জাতি ঃ

১. **বৈশ্যসাহা**—পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জ মহকুমার হাটবাজার গোলা গঞ্জাদি সর্বত্র ব্যবসায়ী জাতি মধ্যে সাহা বা বৈশ্যসাহাগণ ধান, চাউল, পাট, কাপড়, মসলাদি সর্বপ্রকার পণ্য দ্রব্য ও কর্জা কারবার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহারা অধিক ব্যবসায়ে লিপ্ত। পাবনা অপেক্ষা সিরাজগঞ্জ মহকুমার, বিশেষত দেলুয়া, সোহাগপুর ও সদিয়া চাঁদপুরস্থ মহাজনগণ স্বভাবত মহাজনী দালালি প্রভৃতি কার্য সবিশেষ পারদর্শী।

২. **তিলি**—পাবনার অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা চাটমোহরে ও সাগরকান্দিতে এবং সিরাজগঞ্জের রাউতারায় অনেক তিলি মহাজনগণ নানাপ্রকার ব্যবসার দ্বারা দেশে ও বিদেশে বহু অর্থার্জন করে। ইহারা ব্যবসায়ী হিসাবে অতি সুদক্ষ।

৩. **তন্তুবায়**—পাবনার সদর ও সিরাজগঞ্জের অনেক গ্রামে বহু তন্তুবায় জাতির বাস ; ইহারা সকলেই বস্ত্রবয়ন ব্যতীত কাপড় ও সূতা বিক্রয় এবং অনেক স্থলে নানাবিধ দ্রব্য খরিদ বিক্রয়ে লিপ্ত। স্থানে স্থানে ইহাদের মধ্যেও বড় মহাজন আছেন।

৪. **মারওয়াড়ি**—সিরাজগঞ্জ, সাঁড়া, ঈশ্বরদি, সুজানগর প্রভৃতি বন্দরে অনেক পশ্চিম দেশিয় আগরওয়ালা, ওসওয়াল প্রভৃতি নানা শ্রেণীস্থ মারওয়াড়িগণ সর্বপ্রকার ব্যবসায় পরিচালন দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে।

৫. **ইংরেজ**—সিরাজগঞ্জ, উল্লাপাড়াদি বন্দরে রালি ব্রাদার্স, ল্যান্ডেন কার্ক প্রভৃতি ইংরেজ সওদাগরগণের পাট খরিদ বিক্রয়ের কারবার স্থল আছে। তাহারা বার্ষিক বহু টাকার পাট খরিদ করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকেন।

৬. **মুসলমান**—মুসলমানগণ মধ্যে অনেকে পাট ধান্যাদি নানাপ্রকার দ্রব্য খরিদ বিক্রয় করিয়া দিনপাত করে। ইহাদের মধ্যে বড় মহাজন সংখ্যা অপেক্ষা ব্যাপারি ফরিয়া সংখ্যাই অধিক। এতদ্ব্যতীত হাটেবাজারে দোকানদার পাইকের মধ্যে মুসলমানই অধিক। নিকারি পাঝারগণ মৎস্যের ব্যবসায় অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ করে।

৭ **বণিক**—পাবনা ও সিরাজগঞ্জের অনেক স্থলে সুবর্ণবণিক ও গন্ধবণিকগণ মহাজনী ও দোকানদারী আদি কারবারে লিপ্ত। ইহারা ব্যবসায়ী হিসাবে এই জেলায় অতি মুষ্টিমেয়।

৮. **বিবিধ**—অধুনা ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি জাতিগণও মহাজনি দোকানদারি আদি কার্যে অনেক স্থলে লিপ্ত আছেন। সিরাজগঞ্জেই ইহাদের সংখ্যা অধিক। কৈবর্ত নমঃশূদ্রাদি জাতিগণ মধ্যে অনেকে মহাজনি ব্যবসার দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে।

সাধারণ আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় সচরাচর পাইকের ব্যাপারী, ফরিয়া, দালাল মহাজনগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। ফরিয়াগণ গ্রামে বা হাটে বাজারে কৃষকগণের নিকট হইতে জিনিসাদি খরিদ করিয়া হাটেবাজারে স্থায়ী পাইকের ও ব্যাপারিদিগের নিকট অল্প অল্প মাল বিক্রয় করে, তাহারা অনেক মাল একত্রিত করিয়া অবশেষে মহাজন ও আড়তদারগণের নিকট একযোগে বিক্রয় করে। দালালগণ মহাজন এবং ব্যাপারি ও পাইকেরগণ মধ্যে খরিদ বিক্রয়ের দর দাম, সুস্থির এবং জিনিসের সন্ধান করিয়া দিয়া মন শতকরা বা টাকা শতকরা হিসাবে কিঞ্চিৎ লাভ করে। মহাজন ও ব্যবসায়িগণ খরিদা জিনিসাদি কলিকাতায় চালান বা গোলাজাত রাখিয়া পরে সুযোগ মত বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়। সাধারণ কৃষি বা জিনিস উৎপাদনকারিগণ মহাজনগণের নিকট বিক্রিত মূল্যের অনেক কম, এমন কি অনেক সময় অর্ধেক মূল্য পায়। সময় মত খরিদ ব্যতীত অগ্রিম দাদন দিয়া পূর্বে মূল্য স্থির করিয়া খরিদ প্রথা মহাজন হইতে ব্যাপারী এবং তাহা হইতে ফরিয়া ও কৃষকগণ মধ্যে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়।

প্রধান প্রধান স্থায়ী বাজার

পাবনা সদর

থানা—পাবনা

দৈনিক বাজার	বাণিজ্যস্থান	নদী	পণ্য দ্রব্য
পাবনা	পাবনা	ইছামতী	ধান, চাউল, কাপড়াদি।
মালঞ্চি	...	ঐ	মাছ, তরকারি, দুগ্ধাদি।
একদন্ত	একদন্ত	ঐ	মাছ, তরকারি, পাটাদি।
পাক্‌সি	...	পদ্মা	চাউল, ডাউল, মৎস্যাদি।
...	ধাপারি	ঐ	পাট, ভূষামাল, ধান।
সাঁড়া বাজার	...	পদ্মা	ধান, পাট, কাপড়, মাছ।
ঈশ্বরদি	...	...	ধান, পাট ও ভূষামাল।
গঙ্গা বাজার	...	ঐ	মাছ, ধান, পাট।
দাশুরিয়া	...	ঐ	ধান, পাট, হলুদ, গাভী।

থানা—চাটমোহর

চাটমোহর	চাটমোহর	বরল	ধান, চাউল পাটাদি
ভাঙুরিয়া	ঐ	ঐ	ঐ ঐ ঐ
ধনওয়রীনগর	ঐ	ঐ	ঐ ঐ ঐ
গোপালনগর	ঐ	ঐ	ঐ ঐ ঐ
ডেমরা	...	ঐ	ঐ ঐ ঐ

থানা—সাঁথিয়া ও সুজানগর

সাঁথিয়া	...	ইছামতী	ধান, চাউল, মাছ, তরকারি।
বনগ্রাম	...	...	ধান, চাউল, কাপড়াদি।
সুজানগর	সুজানগর	পদ্মা	পাট, ধান, চাউলাদি।
সাতবারিয়া	সাতবারিয়া	ঐ	পাট, ধান, মাছ, কাপড়াদি।
নাজিরগঞ্জ	নাজিরগঞ্জ	ঐ	ঐ

থানা—মথুরা (বেড়া)

বেড়া	বেড়া	ইছামতী	ধান, পাট, গুড়, কাঠ, বাঁশ।
নাকালিয়া	সাধুগঞ্জ	যমুনা	ধান, পাট, কাপড় ও অন্যান্য।
নগরবাড়ি	...	ঐ	ধান, পাট, কাঠ ও অন্যান্য।
মথুরা	...	ঐ	ধান, চাউল, পাট ইত্যাদি।

সিরাজগঞ্জ মহকুমা

থানা—সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ (কালীবাড়ি)		ধানবাঁধি	পাট, ধান, চাউল, লৌহদ্রব্য।
মনহারীপটি (গঞ্জ)	...	ঐ	পাট, ধান, কাপড়, টিন।
কোলবন্দর	কোলবন্দর	যমুনা	পাট, ধান, চাউল, কেরোসিন।
বাগবাড়ি	সোণগাছা	ইছামতী	মাছ, তরকারি, পাট, ধান্যাদি।
দেলুয়া	দেলুয়া	যমুনা	মাছ, তরকারি, দুধ, কাপড়াদি।
সোহাগপুর	...	...	ঐ
হকিমপুর	...	...	ধান, চাউল, মাছ, তরকারি।

থানা—রায়গঞ্জ

দৈনিক বাজার	বাণিজ্যস্থান	নদী	পণ্য দ্রব্য
চান্দাইকোণা	চান্দাইকোণা	ফুলঝোর	ধান, চাউল, পাট
রায়গঞ্জ	নল্কা	ঐ	ধান, পাট প্রভৃতি।
...	সাহেবগঞ্জ	ঐ	ঐ
ভূইএগ্রাগাতি	...	...	ধান, চাউল, পাট ইত্যাদি।
পাঙাসি	...	ইছামতী	ঐ
বুরকা	...	ফুলঝোর	ধান, চাউল ইত্যাদি।
ধানঘরা	ধানঘরা	ফুলঝোর	পাট, ধান, কাপড়াদি।

থানা—উল্লাপাড়া

উল্লাপাড়া	উল্লাপাড়া	ফুলঝোর	পাট, ধান, পাতিল, কাপড়াদি।
...	কালীগঞ্জ	...	পাট, সোণ ও অন্যান্য।
ঝাউল	কামারখন্দ	...	ধান, চাউল, পাট, মাছ।
ভদ্রঘাট	দশসিকা	...	ধান, পাট ও অন্যান্য।
সলপ	...	...	ধান, চাউল, মাছ, তরকারি।
সলঙ্গা	...	...	পাট, ধান, চাউল, গাভী।

থানা—শাহজাদপুর

শাহজাদপুর	শাহজাদপুর	কোণাই	ধান, চাউল, কাপড় ও খাদ্যদ্রব্য।
জামিরতা	...	হুরাসাগর	ঐ
পোরজনা	...	ঐ	ঐ
বেলতৈল	...	...	ঐ
পোতাজিয়া	...	...	ঐ
সোনাতনি	...	...	ঐ
চৌহালি	...	...	ধান, পাট, গাড়ি ও অন্যান্য।
বেতিল	...	...	ধান, মাছ, তরকারি, দুধ।
চাঁদপুর	...	...	ঐ
কান্দাপাড়া	...	...	ঐ

প্রধান প্রধান হাটের তালিকা
পাবনা সদর

পাবনা—দোগাছি (সোম—বৃহস্পতি) সিঙা (রবি—বৃহস্পতি) গয়েশপুর (রবি—মঙ্গল) দাপুনিয়া (সোম—বৃহস্পতি) মালিগাছা (সোম—বৃহস্পতি) মালঞ্চি (মঙ্গল—শুক্র) নাজিরপুর (রবি—বুধ) দুবিলা (সোম—শুক্র) খোর্দচাঁদপুর (শনি—মঙ্গল)।

সাঁড়া—পাকুরিয়া (সোম—শুক্র) সিলিমপুর (রবি—বুধ) বিলবাঘনী (রবি—বৃহস্পতি) মুলাডুলি (সোম—বৃহস্পতি) দাশুরিয়া (শনি—মঙ্গল) ঈশ্বরদি (সোম—শুক্র)।

আটঘরিয়া—দেবোত্তর (মঙ্গল—শুক্র) চান্দভা (শনি—বুধ) ভবানীপুর (বুধ—শনি) ফৈলজানা (মঙ্গল—শুক্র) একদন্ত (সোম—বৃহস্পতি) শিবপুর (রবি—বুধ) ইদিলপুর (মঙ্গল—শুক্র) শ্রীপুর (শনি—মঙ্গল)।

চাটমোহর—হরিপুর (রবি—বৃহস্পতি) মথরাপুর (রবি—বৃহস্পতি) অষ্টমনীষা (রবি—বৃহস্পতি) হাণ্ডিয়াল (সোম—শুক্র) ভাঙুরিয়া (মঙ্গল—শুক্র) শরৎনগর (সোম—বৃহস্পতি)।

ফরিদপুর—ফরিদপুর (মঙ্গল—শুক্র) গোপালনগর (রবি—বুধ) ডেমরা (রবি—বৃহস্পতি)।

সাঁথিয়া—সাঁথিয়া (বুধ—শনি) মাদপুরা (শনি—বৃহস্পতি) ধুলাউরি (সোম—শুক্র) কাশীনাথপুর (রবি—বৃহস্পতি) দুলাই (সোম—বৃহস্পতি) বনগ্রাম (শনি—মঙ্গল) আতাইকুলা (রবি—বুধ) গোপীনাথপুর।

বেড়া—বেড়া (শনি—মঙ্গল) নাকালিয়া (রবি—বুধ) রতনগঞ্জ (মঙ্গল—শুক্র) আমিনপুর (শনি—বুধ) বেনুপুর (বৃহস্পতি—শনি) কাজিরহাট (শনি—বুধ) বাদাই (সোম— শুক্র)।

সুজানগর—সুজানগর (রবি—বুধ) নিশ্চিন্তপুর (সোম—শুক্র) রাইপুর (শনি—মঙ্গল) খলিলপুর (রবি—বৃহস্পতি) নাজিরগঞ্জ (সোম—শুক্র) শান্তিপুর (রবি—বুধ) শ্যামগঞ্জ (রবি—বুধ)

সিরাজগঞ্জ মহকুমা

সিরাজগঞ্জ—খোকসাবাড়ি (শনি—বুধ) সোণগাছা (শনি—বুধ) ব্রহ্মগাছা (শনি—মঙ্গল) রতনকান্দি (বুধবার) সুপগাছা (রবি—মঙ্গল) মেছরা (রবি—বৃহস্পতি) ভদ্রঘাট (সোম—শুক্র) সয়দাবাদ (রবি—বুধ)।

কাজিপুর—কাজিপুর (সোম—শুক্র) নাটুয়ারপাড়া (রবি—বৃহস্পতি) সোণামুখী (রবি—বুধ) ভাণ্ডাঙা (মঙ্গল—বৃহস্পতি) গান্ধাইল (রবিবার)।

রায়গঞ্জ—পাঙাসি (শনি—মঙ্গল) আটঘরিয়া (মঙ্গল—শুক্র) রায়গঞ্জ (সোম—বৃহস্পতি) চান্দাইকোণা (শনি—মঙ্গল) ধানঘরা (রবি—বুধ) ভুইয়াগাঁতি (শনি—মঙ্গল) দেওভোগ (রবি—বুধ) নিমগাছি (সোম—বৃহস্পতি)।

তাড়াস—প্রতাপ (রবি—বৃহস্পতি) আমশরা (রবি—বুধ) বারুহাস (সোম—শুক্র) উলিপুর (শনি—মঙ্গল)।

উল্লাপাড়া—উল্লাপাড়া (সোম—শুক্র) কালীগঞ্জ (শনি—মঙ্গল) চৌবিলা (রবি—বৃহস্পতি) সলঙ্গা (সোম—শুক্র) সলপ (রবি—বৃহস্পতি) দৌলতপুর (রবি—বৃহস্পতি) বোয়ালিয়া (রবি—বৃহস্পতি) দহকুলা (সোম—বৃহস্পতি) মোহনপুর (রবি—বুধ) বাল্লপাড়া (শনি—মঙ্গল)।

কামারখন্দ—কামারখন্দ (রবি—বৃহস্পতি) তামাই (সোম—শুক্র)।

বেলকুচি—দেলুয়া (বুধ—শনি) মকিমপুর (রবি—বৃহস্পতি)।

চৌহালি—চৌহালি (সোম—বৃহস্পতি) স্থলনওহাটা (শনি—মঙ্গল)।

শাহজাদপুর—দরিয়াপুর (সোম—বৃহস্পতি) কৈজুরি (শুক্রবার) পোরজনা (রবি—বুধ) ভেড়াখোলা (সোম—বৃহস্পতি) তাল্‌গাছি (রবিবার) গাঁড়াদহ (বুধ—রবি)।

বিশেষ দ্রব্য আমদানি জন্য প্রসিদ্ধ হাট

কাপড়—দেলুয়া (বুধবার) শিবপুর (রবিবার) বনগ্রাম (মঙ্গলবার) কৈজুরি (শুক্রবার) সুজানগর (রবিবার) কাশীনাথপুর (রবিবার)।

গুড়—কৈজুরি ও বেড়া।

'নৌকা—চৌবিলা (বৃহস্পতিবার) ও পুঠিয়া।

গরু ঘোড়া—দোগাছি (বৃহস্পতিবার) দেবোত্তর (শুক্রবার) একদণ্ড (বৃহস্পতিবার) অরণকোলা (মঙ্গলবার) দুলাউরি (শুক্রবার) কাশীনাথপুর (বৃহস্পতি) মথুরাপুর (বৃহস্পতি) তালগাছি (রবিবার) সলঙ্গা (শুক্রবার) কামারখন্দ, ঘোরজান, প্রতাপ (বৃহস্পতি)।

সাধারণত সপ্তাহে দুই দিন লাগে, কোন কোন হাট একদিন বসে। সচরাচর খোলা জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চালা উঠাইয়া দোকানদারগণ আপনাপন পণ্যদ্রব্য সম্মুখে লইয়া বসে। ধান, চাউল, মাছ, তরকারি, লবণ তৈলাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রতি হাটে পাওয়া যায়। মফঃস্বলবাসী গৃহস্থগণ হাটে যাইয়া তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি খরিদ করে। সাধারণ হাটে ২/৪ জন স্থায়ী দোকানদার আছে, তদ্ভিন্ন কোন হাটে ধনীমহাজনের গোলাবাড়ি দেখা যায়। হাট সাধারণত জমিদারগণের ভূসম্পত্তি, তাহারা প্রত্যেক বিক্রেতাগণের নিকট তোলা বা খাজনা স্বয়ং আদায় করেন অথবা বার্ষিক ইজারাদারগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অনেকানেক হাটের পার্শ্বেই ২/৪ ঘর বারবণিতার বাস দেখা যায়।

মেলা ঃ

শাহজাদপুর—বার্ষিক বাসন্তী অষ্টমীর দিন হইতে মক্‌দুম্ সাহেবের মসজিদ প্রাঙ্গণে সাপ্তাহিক কাল স্থায়ী একটি বৃহৎ মেলায় অনুষ্ঠান হয়। পূর্বে এই মেলা প্রায় মাসাধিক কাল বসিত। প্রবাদ ইহা মক্‌দুম্ সাহেবের মৃত্যুদিনের স্মরণার্থে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান ১৩৩২ সাল হইতে মেলার দিন পরিবর্তিত হইয়া অষ্টমীর একমাস পূর্ব হইতেই মেলা বসিয়াছে। এই মেলায় পূর্বে অনেক ঘোড়া আমদানি হইত।

বেতিল—প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসে অমাবস্যায় সিদ্ধেশ্বরী পূজা উপলক্ষে নওহাটার ভট্টাচার্য বাবুদের উদ্যোগে বেতিল হাটখোলায় সপ্তাহকাল স্থায়ী বারইয়ারি মেলার অনুষ্ঠান হয়। এখানে পূজায় শূকর বলির প্রথা আছে। নানাদ্রব্য মধ্যে বহু মিঠাই বিক্রয় হয়।

চৌহালি—পৌষ মাসে স্থলের পাকড়াশি বাবুদের উদ্যোগে সিদ্ধেশ্বরী কালীপূজা উপলক্ষে এখানে প্রায় মাসাধিক কাল স্থায়ী মেলার অনুষ্ঠান হয়।

তাড়াস—ভাদ্র মাসে ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে পক্ষাধিক কাল স্থায়ী বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়। গীতাবাদ্যাদি ও অতিথিসৎকারাদি এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদায় জন্য বড় তরফ ও পূর্ব বাটি হইতে অন্যূন ১৪/১৫ হাজার টাকা খরচ হয়। মেলায় বাসন, কাপড়, মাদুরাদি নানা দ্রব্য আমদানি হয়। অনেক বাসন মেরামতকারী এই উপলক্ষে এখানে সমবেত হয়। বর্ষাকালে বিল মধ্যবর্তী স্থান হইলেও নানা স্থান হইতে নৌকায় বহু লোক সমাগম হয়। এই মেলা পাবনা জেলার মধ্যে সর্বথা উল্লেখযোগ্য। বড় তরফ হইতে সমাগত সর্বশ্রেণীর লোকদিগের জন্য চিঠিযোগে ভাণ্ডারখানা হইতে তিন দিন পর্যন্ত সিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সরস্বতী পূজা সময়েও এখানে বৃহৎ মেলা লাগে।

উল্লাপাড়া—পৌষ মাসে সলপের সান্যাল বাবুদের উদ্যোগে কালীপূজা উপলক্ষে মাসাধিক স্থায়ী যে মেলার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে অনেক মিঠাই, কাপড় ও মৃত্তিকা নির্মিত হাঁড়ি পাতিল বিক্রয় হয়।

সোনামুখী—দুর্গোৎসব সময়ে এখানে পক্ষাধিকাল স্থায়ী মেলার অনুষ্ঠান হয়, ইহাতে কাষ্ঠ নির্মিত নানা প্রকার দ্রব্যাদির আমদানি হয়।

সলঙ্গা—কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে সাপ্তাহিক কাল বৃহৎ বারইয়ারি মেলার অনুষ্ঠান হয়। কাষ্ঠ দ্রব্য অনেক পাওয়া যায়।

রাজনগর—জয়কালী পূজায় এখানে মেলা হয়। পূর্বে এখানকার প্রতিমা অতি উচ্চ হইত।

অষ্টমনীষা—জন্মাষ্টমীর পরবর্তী অমাবস্যায় এখানে কালীপূজা উপলক্ষে পক্ষাধিককাল স্থায়ী মেলা এবং বারুণী সময়ে নদীর অপর পারে কৃষ্ণকালী পূজায় মৃজাপুর গ্রামে সপ্তাহ কালব্যাপী মেলার অনুষ্ঠান হয়।

বোঁথড়—চড়কপূজা উপলক্ষে এখানে স্থায়ী বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়। এই মেলায় বহু পিতল কাঁসার নির্মিত বাসন বিক্রয় হয়।

খেতুপাড়া—দোলোৎসব সময়ে এখানকার রায় মহাশয়দিগের উৎসাহে ও উদ্যোগে সপ্তাহকাল স্থায়ী মেলার অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে অনেক মিঠাই, বাসন প্রভৃতি বিক্রয় হয়। গীতবাদ্যাদির ব্যবস্থাও দেখা যায়।

সাতবাড়িয়া—রটন্তিপূজার সময় কালীপূজার এখানে সপ্তাহকাল স্থায়ী বারইয়ারি মেলার অনুষ্ঠান হয়।

সাপুর—(চাটমোহর) আঙ্গারু (উল্লাপাড়া)—বৈশাখী বৃহস্পতিবারে এই দুইস্থানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সাহাপুরের মেলায় মুরগি ছাড়িয়া দিবার প্রথা আছে।

ইদিলপুর—কার্তিক মাসে কালীপুজা উপলক্ষে সপ্তাহকাল স্থায়ী বারইয়ারি মেলার অনুষ্ঠান হয়।

উপরোক্ত প্রধান প্রধান মেলা ও বারুইয়ারি পুজা উপলক্ষে উৎসবাদি ব্যতীত এই জেলার বারুণী ও অষ্টমী স্নান উপলক্ষে স্থানে স্থানে এক দিন স্থায়ী বহু আড়ঙের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে সাজ, বাতাসা, চিড়া, মুড়কি, নানারূপ খাদ্যদ্রব্য, মালঘুনসী খেলনাদি, মৃত্তিকা নির্মিত পুতুলাদি, হাড়ি পাতিল এবং বিদেশিয় নানারূপ চাক্যচিক্যপূর্ণ মনোহারি দ্রব্য বিক্রয় হয়।

স্থান স্থানে জমিদারগণের উদ্যোগে, কোথায় সাধারণের উদ্যোগে মেলার অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে যেমন দেশে সর্বসাধারণের আমোদ উৎসবের ও বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগ সুবিধা আছে, ইহাতে লোকের নানাপ্রকার অর্থনাশের সুযোগও দেখা যায়। এই সমস্ত মেলার সৌখিন লোকে পান সিগারেট ও মিষ্টান্নাদি ক্রয়ে বহু অর্থ ব্যয় করে। অনেক মেলায় জুয়া খেলার প্রথা আছে, এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ মেলায় অনেক বারবণিতার আবির্ভাব হয়। তৎপ্রযুক্তও লোকের অনেক ক্ষতি হয়। মেলাদির সহিত দেশিয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চেষ্টায় কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইলে এই সকল দ্বারা দেশের অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে।

বাজার ওজন ঃ

সাধারণত ৬০ জেলার যে সের প্রচলিত আছে তাহা কাঁচি সের নামে খ্যাত। সিরাজগঞ্জ, বেড়া, নাকালিয়া, উল্লাপাড়া প্রভৃতি বন্দরে ৮২॥৵৹, ৮৪॥৵৹ তোলায় এবং অধুনা পাবনা টাউনে ৮০ তোলায় যে সের ধরা হয়, তাহা পাকী সের নামে পরিচিত। স্থলবসন্তপুর অঞ্চলে ৮০ তোলার ওজনের চারি সের দুগ্ধের সের ধরা হয়, ইহা সাধারণত স্থলের সের নামে খ্যাত। বাগবাটিতেও দুগ্ধের ওজন আড়াই সেরে এক সের ধরা হয়। পাবনা সদরে আজকাল সমস্ত দ্রব্যাদি প্রায় ৮০ তোলার সেরে ওজন হইতেছে এবং সিরাজগঞ্জে চাউলাদি ৮২॥৵৹ দুধ ৯০ তোলা ব্যতীত অন্যান্য জিনিস ৬০ তোলার কাঁচি সেরে খরিদ বিক্রয় হয়। মফঃস্বলের সর্বত্রই এই কাঁচি সের প্রচলিত।

কৃষকের মাপ ঃ

উপরোক্ত ওজন প্রণালী ব্যতীত কৃষকদিগের মধ্যে ধান্যাদি কৃষি দ্রব্য ওজনের জন্য কোথায় ১০ সেরি, কোথায় ১৫ সেরি, কোথায় ৷৩ সেরি কাঠার মাপের প্রচলন আছে; সদরে প্রথম দুই প্রকার এবং সিরাগঞ্জাদি অঞ্চলে ৷২॥, ৷৩ সেরি ছোট কাঠার প্রচলন দেখা যায়। বড় কাঠার মাপ এইরূপ।

১০ বা ১৫ = ১ কাঠা	৪ মনে = ১ বিশ
৪ কাঠায় = ১ আড়ি	১৬ বিশে = ১ পটি
৫ আড়িতে = ১ মন	৪ পটিতে = ১ সলি

জমির মাপ ঃ

পূর্বে ২৩ ইঞ্চি হইতে ২৬ হাতের মাপ প্রচলিত ছিল। ইহা রামজীবনী হইতে মাপ বলিয়া পরিচিত। অধুনা সর্বত্রই ১৮ ইঞ্চি হাতের মাপ প্রচলিত হইয়াছে। ইউসুপসাহী পরগণায় পূর্বে

মক্‌দুম্‌ সাহেবের হাতের মাপ প্রচলিত ছিল। ইহা ২৬ ইঞ্চি অপেক্ষাও অধিক। মফঃস্বলে জমির পরিমাপ জন্য কোন স্থলে ৬ কোন স্থলে ৭ সাত কোন স্থলে ৭।।০ হাতের যে মাপ প্রচলিত আছে তাহার ৫ × ৬ নলে এক পাকীর মাপ ধরা হয়। ৮০ × ৮০ হাতে এক বিঘার মাপ পাকী অপেক্ষা বেশি।

বাজার দর (১৩৩২—চৈত্র) পাকী মন

চাউল, মোটা	৭্	হলুদ	৭।।০
" মিহি	৭৸০	ধনিয়া	৭্
" আতপ	৮।০	গম	৫্
ধান	৪।০	ময়দা	১০্
মটর	৩৸০	গুড়	১০্
মশুর	৩৸০	চিনি	১৫্
কলাই	৩।।০	লবণ	৩্
বুট	৪।।০	মরিচ	২০্
সোনামুগ	৯্	তৈল	২৮্
খেসারি	২৸০	গব্য ঘৃত (সর)	৩।০্
অরহর	৪।।০	দুগ্ধ ঐ	।০

চাউলের দর

১৮৫০ খ্রিঃ	১৮৬০ খ্রিঃ	১৮৭০ খ্রিঃ	১৯২৪ খ্রিঃ	১৯২৫ খ্রিঃ
।।৶০ ৸০	১।০ ১।৶	১।৶ ১।।০	৬্ ৬৸০	৬৸০ ৭্

শ্রমজীবী ও পারিশ্রমিক :

স্থানীয় শ্রমজীবী সকলেই মুসলমান। কৃষিকার্যে ক্ষেত নিরাণ জন্য আষাঢ় মাসে ও ধান, পাটকাটা ভাদ্র আশ্বিন মাসে দৈনিক মজুর নিযুক্ত হয়। লাঙল গরু ধার দিয়া পালাক্রমে একে অন্যের জমি চাষ করিবার রীতিও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। কৃষকের বাড়িতে আহারাদি ও পরিধেয় বস্ত্র গামছা বাদে অধুনা মাসিক পাঁচ ছয় টাকা বেতনে হালিয়া চাকর নিযুক্ত হইয়া থাকে।

দৈনিক দুই বেলা খোরাকি বাদে ক্ষেতের কাজে পাইটের মজুরি ৬ আনা হইতে ১০ আনা পর্যন্ত স্থানে স্থানে দিতে হয়। ফসল কাটার সময় ধানের কুড়ি আটিতে দুই আটি পারিশ্রমিক দিবার রীতি আছে। স্থলে স্থলে ইহার কম বেশি দেওয়া হইয়া থাকে। বর্গাদারগণ সাধারণত জোতদারগণের জমি নিজ লাঙলে চাষ আবাদ করিয়া উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ স্থল বিশেষে তদপেক্ষা কম বেশি অংশও পাইয়া থাকে। যমুনার চরে ঢাকাদি জেলা হইতে এবং পদ্মার চরে নদীয়া জেলা হইতে আসিয়া এই জেলায় অনেক পাইট মজুরগণ কাজ করে। এই জেলায় যাহাদের নিজের জমি নাই তাহারা ফসল সময়ে মৈমনসিংহ, ঢাকা ও বগুড়া, বাকরগঞ্জাদি জেলায় ধান কাটিবার জন্য যাইয়া থাকে। জেলার পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণের অনেকে রাজশাহী জেলার বিলাদিতে যাইয়াও ধান কাটে। সাধারণত চরের কৃষিজীবীগণ তাহাদের জমি ভাঙিয়া গেলে পাইট মজুরে পরিণত হয়। তখন তাহারা অনেকে মৃত্তিকা খননাদি ও পাট কলে কাজ করিয়া জীবিকার্জন করে। সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের অনেকে অধুনা রেললাইনে ও পাটের কুঠি গুদামে এবং অধুনা পাবনায় অনেকে মোজা গেঞ্জির কলে কাজ করিয়া থাকে। বাঙালি ব্যতীত অনেক বিহারাঞ্চলবাসী কুলি মজুর রেল লাইনে এবং মুটিয়ার কাজ করে, জেলার নানাস্থানে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার দেশিয় ও পশ্চিম দেশিয় কুলি খাটিয়া থাকে। বাঙালি অপেক্ষা পশ্চিমা কুলিগণ অধিক পরিশ্রমী ; ইহারা স্ত্রী পুরুষে কাজ করে।

পারিশ্রমিক (১৩৩২ সাল)

দৈনিক মজুর	॥৶৹—৷৹	উড়িয়া পাচক ব্রাহ্মণ	৮৲	১০৲
রাজমিস্ত্রির মাসিক	১৬—২৫৲	গ্রাম্য চৌকিদার	৭৲	৯৲
সূত্রধর ঐ	২৫—৩০৲	কনষ্টবল	১৮৲	২২৲
কর্মকার ঐ	ঐ — ঐ	পিয়ন	১৫৲	২০৲
মুসলমান চাকর ঐ	১২—১৪৲	সাধারণ মহুরি	১৫৲	২৫৲
পশ্চিমা চাকর মায় খোরাকি	৭৲—৮৲	কম্পোজিটর	১৫৲	২০৲

ব্যাঙ্ক ঃ

পাবনা—(ক) পাবনা ব্যাঙ্ক লিমিটেড (১২৯০)
(খ) পাবনা মডেল কোম্পানি (১৩০৫)
(গ) পাবনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক (১৩১৫)
(ঘ) নাকালিয়া ব্যাঙ্কিং ও ট্রেডিং কোম্পানি
(ঙ) কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক (১৩২৭)
(চ) আরবান ব্যাঙ্ক (১৯১১)
(ছ) পাবনা ধনভাণ্ডার (১৩০৪)।
সিরাজগঞ্জ—(ক) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক
(খ) লোন অফিস
(গ) আরবান ব্যাঙ্ক।

এতদ্ব্যতীত বড় পাঙাসি, মোহনপুর, অষ্টমনীষা, উধুনিয়া, চাটমোহর প্রভৃতি গ্রামে ব্যাঙ্ক বা ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে। ব্যাঙ্কের সুদ সাধারণত ৷৹ আনা হইতে ২৷৹ টাকা পর্যন্ত আদায় হয়। আমানতি টাকার সুদ ৷৹ হইতে ॥৶৹ পর্যন্ত দেওয়া হয়।

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি ঃ

সর্বপ্রথমে ১৯০৯ অব্দে ভারেঙ্গা গ্রামের রায়সাহেব শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রযত্নে এখানে কো-আপারেটিভ ইউনিয়ন প্রবর্তিত হয়। রাজশাহী বিভাগের মধ্যে পাবনা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

প্রধান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (১৯২১/২২) ঃ

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	মূলধন	সভ্যসংখ্যা	গ্রাম্য সমিতি
পাবনা	১০,৪৪,৫৫৩	৫৩৫	২৭৭
সিরাজগঞ্জ	২,৩৯,৫৯১	১৮০	১১১
শাহজাদপুর	১,৫০,৪৬২	৪৩	২৯
উল্লাপাড়া	৪৭৯০	২৪৫	৬৯

ঋণ গ্রহণ ঃ

(১) হাওলাত (২) খত বা তমশুক, (৩) হ্যান্ডনোট (৪) রেহেন (৫) বন্ধক মুলে হইয়া থাকে। সাঁড়া অঞ্চলে ও অনেক স্থানে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এক কাঠা ধান লইয়া ভাদ্র মাসে দেড় কাঠা দিবার প্রথায় দাদন লওয়া রীতি বর্তমান আছে। পূর্বে লোকে অন্যের অজ্ঞাতসারে আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য টাকা কর্জ লইয়া পরিশোধ করিত। অধুনা রেজেস্টারি দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াও লোকে প্রকৃত টাকা আদায়ে নানারূপ ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকে।

আমদানি—কেরোসিন তৈল, লবণ, বিলাতি সূতা, টিন, আলকাতরা, নানারূপ বিলাতি

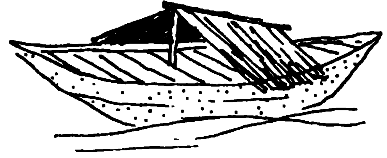
কম্বল, কাপড় ও খেলনাদি রঙ্পুরাদি জেলার ধান, মালদহ জেলার চাউল ও আম, বরিশাল জেলার নারিকেল এবং যাবাচিনি, আদল সুপারি, উত্তরা পশ্চিমা তামাক, গোলআলু (বিলাতি আলু) প্রভৃতি এই জেলায় সাধারণত ভিন্ন স্থান হইতে আমদানি হয়।

রপ্তানি—পাট ৭ই জেলা হইতে অনেক বিদেশে যায়। দেশি কাপড় গেঞ্জি বহুল রপ্তানি হয়। তেঁতুল এই জেলা হইতে অনেক কলিকাতা মৈমনসিংহ, ঢাকাদি জেলায় রপ্তানি হয়। বাল্লপাড়া, পোতাজিয়া, পোরজনা, জামিরতা, ভাঙ্গরিয়া, ভারেঙ্গা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ঘৃত বিদেশে যায়। সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল লাইনের উল্লাপাড়া মোহনপুর, ভাঙুরিয়া প্রভৃতি স্টেশন হইতে বহু বিলজাত মৎস্য, মুরগি হাঁস প্রভৃতি, দৈনিক কলিকাতায় চালান হয়। সলপাদি স্টেশন হইতে মুরগির ডিম অনেক ভদ্রলোক কলিকাতায় চালান দিয়া থাকেন। সুজানগর, সাতবাড়িয়া হইতেও অনেক মুরগি পাংশা দিয়া কলিকাতায় চালান যায়। পদ্মার ইলিশ মাছ সাঁড়া হইতে, সাতবাড়িয়া ও সাগরকান্দি হইতে বেলগাছি দিয়া কলিকাতায় রপ্তানি হয়। নিকারিগণ কাটা ইলিশমাছ ও তাহার ডিম লবণ যোগে বৃহৎ জালায় বিদেশে চালান দেয়। ছাগল, ভেড়া এই জেলার সিরাজগঞ্জের উত্তরাঞ্চলের ভদ্রঘাট, রতনকান্দি, কাজিপুর প্রভৃতি হাট হইতে অনেকে খরিদ করিয়া চালান দেয়। অরণকোলা, তালগাছি, চৌহালি প্রভৃতি হাট হইতে অনেক গো-মহিষ ঘোড়া প্রভৃতি ঢাকা, মৈমনসিংহাদি জেলায় রপ্তানি হয়। কালিয়া, কান্দাপাড়া, শাহজাদপুর, কাওয়াক, দাশসিকা, ভাঙুরিয়া, ঈশ্বরদি, চান্দভা, একদন্ত, দেবত্তোর প্রভৃতি স্থান হইতে বর্ষায় নৌকাযোগে অনেক হাড় এবং অন্যান্য সময়ে চামড়া মুসলমানগণ চালান দিয়া থাকে। দেশি গুড় বেড়া, নাকালিয়া ও সিরাজগঞ্জ হইতে অনেক রপ্তানি হয়। পাবনা, একদন্ত, আটঘরিয়া দেবোত্তর হইতে বহু বেত ও ধামা কাঠা এবং পাবনা গয়েশপুর ও কুচিয়ামোড় হইতে অনেক বাঁশ ঢাকাদি জেলায় যায়। পাবনা হইতে অনেক পটল কলিকাতা ঢাকা ও মৈমনসিংহাদি জেলায় রপ্তানি হয়।

তথ্যসূত্র

১. *"পাটের চাষ কত কালের" প্রবাসী, শ্রাবণ—১৩২৪। দ্রষ্টব্য*

তৃতীয় অধ্যায়



শিক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ—সাধারণ বিবরণ

সংস্কৃত চর্চা ঃ

প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষা এবং শিক্ষিতের সংখ্যা হিসাবে জেলা রাজশাহী বিভাগের, এমন কি, বঙ্গের অনেক জেলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গুণাইগাছা, সালিখা, মালঞ্চি, গাঁড়াদহ প্রভৃতি গ্রামে বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের বাস এবং অনেক পল্লীতেই বহু চতুষ্পাঠী দৃষ্টে জানা যায় এই জেলা পূর্বাপর সংস্কৃত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সাঁতৈল ও নাটোর রাজগণের চরমোৎকর্ষ সময়ে সাঁরোরা, সমাজ ও করজা প্রভৃতি গ্রামের পণ্ডিতবর্গ উক্ত রাজবংশ হইতে বিদ্যানুশীল জন্য ব্রহ্মোত্তরাদি লাভ করিয়াছিলেন। ঘুরকা নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় রাজা রামজীবনের সভাসদ ছিলেন এবং "পদাঙ্কদূত" রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'লঘু ভারত' ও 'গোবিন্দ নামামৃত' ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

আধুনিক শিক্ষা ঃ

বর্তমান সময়ে এই জেলার ভারেঙ্গা, তাঁতিবন্দ, হরিপুর, হাটুরিয়া, ক্ষেতুপাড়া প্রভৃতি পল্লীতে অনেকানেক শিক্ষিত লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। এই সমস্ত পল্লীর অনেকে দেশে ও বিদেশে ওকালতি ডাক্তারাদি ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কবি সাহিত্যিকগণ মধ্যে 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র লেখক স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন, 'রাঘব বিজয়' 'ত্রিদিব বিজয়' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় এবং 'মৃন্ময়ী' রচয়িতা গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদবারিধি পাবনা জেলার সুলেখক বলিয়া সুধী সমাজে পরিচিত।

গ্রাম্য কবি ও সঙ্গীতচর্চা হিসাবে এই জেলায় নীলরতন রায় ও ব্রজকিশোর দাস প্রভৃতি এবং কবিদার হিসাবে সাররকান্দির ভৈরব ঠাকুর মহাশয়দিগের নাম উল্লেখযোগ্য। এদেশের সাধারণ লোক অনেকেই কবি, হোলি, পাঁচালি প্রভৃতি গান রচনায় সিদ্ধহস্ত। মুসলমান সমাজে আরবি পার্শী ভাষাভিজ্ঞ অনেকানেক মৌলবি স্থান বিশেষে বর্তমান আছেন। ইহাদের মধ্যে সাধারণ লোকেরা অবসর সময়ে ভাষাণ জারি গান রচনা করিয়া নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শনে পারদর্শী।

ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত— ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে হার্ডিঞ্জ সাহেবের শিক্ষা নীতি প্রবর্তনের ফলে, পাবনায় একটি হার্ডিঞ্জ বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ; তৎপূর্বে পাবনার গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বর্তমান ছিল। তাহাতে তাল ও কলারপাতে লেখার প্রচলন ছিল। পাবনার খ্যাতনামা নাগরিক দিগম্বর সাহার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি কালে ১৮৫৩ অব্দে বর্তমান পাবনা জেলাস্কুলে পরিণত হইয়াছে। মফঃস্বলস্থ স্কুল সমূহ মধ্যে ১৮৫৮ অব্দে ভারেঙ্গায় সর্বপ্রথম মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬১ অব্দে চাটমোহর হাইস্কুল, ১৮৬৪ অব্দে স্থলে মধ্য ইংরাজি স্কুল, ১৮৬৫ অব্দে সলপ মধ্য বাংলা স্কুল এবং ১৮৬৯ অব্দে সিরাজগঞ্জে বি

এল স্কুল স্থাপিত হয়। এইরূপে ক্রমশ জেলার মধ্যে নানাস্থানে বিদ্যালয়াদি স্থাপিত হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনা এই জেলায় ৩০টি উচ্চ ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত আছে।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় ১৮৯৪ অব্দে পাবনা ইনস্টিটিউশন নামে পাবনায় যে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহাই তিনি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। ১৯০৫ অব্দ হইতে তিনি কলেজের স্বত্ব স্থানীয় কলেজ কমিটির হস্তে সমর্পণ করেন। তখন ইহার নাম "পাবনা কলেজ" হয়। ১৯১১ অব্দে তাড়াসের জমিদার স্বর্গীয় রায় বনমালী রায়বাহাদুর এককালীন ৫০ হাজার টাকা এবং গভর্নমেন্ট তৎপরিমাণ টাকা এই কলেজে দান করিয়া ইহার মহদুপকার করিয়াছেন। তখন হইতে এই কলেজ 'পাবনা এডওয়ার্ড' কলেজ নামে খ্যাত হইয়াছে। ১৯২৫ অব্দে এই কলেজে বি এস সি ক্লাসও খোলা হইয়াছে। এই কলেজে সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগ দুইই বর্তমান আছে। মাসিক ছাত্র বেতন ছয় টাকা। হিন্দু মুসলমান বোর্ডিংসহ রাধানগর নামক মহল্লায় সুদৃশ্য অট্টালিকা বলিতে বর্তমানে ইছামতী নদীর পশ্চিম তীরে কলেজ বাটি স্থানান্তরিত হইয়াছে। গভর্নমেন্ট স্কলার ব্যতীত পাবনা জেলাস্কুল ও সিরাজগঞ্জ বি এল স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ দুইটি গরিব ছাত্রকে মাসিক ৮৲ টাকা হিসাবে স্বর্গীয় বনমালী রায়বাহাদুরের স্টেট হইতে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা আছে।

১৮৬৫ অব্দে পাবনায় একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৮৭৩ অব্দে তাহা রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯১ অব্দে পাবনায় টেকনিকাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাবনায় ১৮৬৭ অব্দে হরিশচন্দ্র শর্মা (তলাপাত্র) মহাশয়ের যত্নে প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয় এক্ষণে গভর্নমেন্ট বালিকা বিদ্যালয় রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সিরাজগঞ্জের জ্ঞানদায়িনী মধ্য ইংরাজি স্কুল ও অমৃতলাল মাইনর স্কুল অতি প্রাচীন বলিয়া পরিচিত।

উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় সমূহ

স্কুলের নাম	১৯২০-২১	১৯২১-২২	স্কুলের নাম	১৯২০-২১	১৯২১-২২
পাবনা জেলা স্কুল	৩৫৫	৩৯৭	সোহাগপুর	২৫২	২০৬
			স্থলপাকড়াশি	২৬৫	২৬৪
সাহায্য প্রাপ্ত					
সিরাজগঞ্জ বি এল	৫১৯	৪৭৫	দৌলতপুর	২১৯	১২২
উল্লাপাড়া	২২৬	১৭৩	চাটমোহর	...	২৩৪
চৌবারিয়া	১৭৪	১১৯	পাবনা ইনস্টিটিউশন	৬০৪	৫৬৪
শাহজাদপুর	৩২৮	২২৭	বনয়ারীনগর	৩৪৪	৩১৩
পোরজনা	২১৫	১৭৩	সাঁড়া মারওয়াড়ি	৩২১	৩০৫
পোতাজিয়া	১২৩	১১৪	পাবনা ভিক্টরি	...	১৩৯
রাধানগর	১৪৮	১৪৪	শিতলাই	১৯৪	১১৪
সিরাজগঞ্জ ভিঃ	৪৮১	২৪২	বেড়া	১৭৬	১৫০
হরিণাবাগবটি	৩২৪	২১৬	নাকালিয়া	১৮৫	১৯১
মেঘাই	১৭৮	৯৪	ধোপাখোলা	১৪৪	১৭২
মেছরা	১৬১	৪৮	খলিলপুর	১৫০	১৬৫
সলপ	২৭২	১৯৮	পুরাণ ভারেঙ্গা	...	১৩১
মোহনপুর	১৩১	৫০	নূতন "		১১৯
জামিরতা	১৯৪	১৭৪	সাতবারিয়া	...	...

মধ্য ইংরাজি ও বাংলা স্কুল ঃ

৪৮টি মধ্য ইংরাজি স্কুল মধ্যে ২৭টি সাহায্যকৃত। ৫টি মধ্য বাংলা স্কুল মধ্যে ১টি খাস গবর্নমেন্টের অপর ৪টি সাহায্যকৃত। পাবনা বালিকা বিদ্যালয় মধ্য ইংরাজি এবং মহাকালী পাঠশালা মধ্য বাংলা।

প্রাইমারি স্কুল মধ্যে মাত্র ৭৩টি উচ্চ প্রাথমিক, অবশিষ্ট ১৫৬৮টি নিম্ন প্রাথমিক। ইহাতে গ্রামের ছোট ছোট বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিশেষ স্কুল সমূহ মধ্যে পাবনা ও শাহজাদপুর প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিতগণের জন্য দুইটি (১) গুরুট্রেনিং স্কুল বর্তমান আছে। এই জেলার (২) ৭টি টোল এবং বহু (৩) মক্তব আছে। (৪) পাবনা টেকনিক্যাল স্কুলে এপ্রেন্টিস বিভাগ, সার্ভে বিভাগ, আর্টিজান বিভাগ এবং (বি) ক্লাস বর্তমান আছে। বি ক্লাসে জেলাস্কুলের ছাত্রগণ সার্ভে ও সূত্রধরের কার্যাদি শিক্ষা করে। টেকনিক্যাল স্কুলে গভর্নমেন্ট ১৯১৫ অব্দে একটি (৫) বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়সহ সম্মিলিত। ১৯২১ অব্দে এই স্কুলে ২২ জন ছাত্র ছিল। বয়নবিদ্যা কাপড়ের আদর্শ ও সুতা বিশ্লেষণাদি এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলের জন্য কুড়িটি বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সভাপতিত্বে কমিটি কর্তৃক স্কুলটি পরিচালতি হয়।

মাদ্রাসা ঃ

১৮টি মাদ্রাসা মধ্যে সিরাজগঞ্জ সিনিয়র (১৮৯২) মাদ্রাসা সর্বপ্রধান। ৭টি নূতন ধরনের এবং ১০টি সাবেক আমলের ন্যায়। সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসা সম্প্রতি ২২৭৮৫ টাকা ব্যয়ে (২০০০০ টাকা গবর্নমেন্ট প্রদত্ত) নূতন বাড়িতে অবস্থিত হইয়াছে।

একজন ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর, দুইজন ডেপুটি ইনস্পেক্টর এবং ৫ জন সাব ইনস্পেক্টর জেলার মধ্য ইংরাজি বাংলা ও প্রাথমিক স্কুল সমূহ পরিদর্শন কার্যে নিযুক্ত আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—বিদ্যালয় ও শিক্ষিত সংখ্যা

(ক) বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যা ঃ

বিদ্যালয়ের শ্রেণী	১৮৭০—৭১		১৯০০—০১		১৯২০—২১		
	স্কুল	ছাত্র	স্কুল	ছাত্র	স্কুল	ছাত্র	ছাত্রী
উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়	১	১৬৭	১৮	৩৭১৩	৩০	৬০১৪	
মধ্য " "	১৫	৫৮৫	৩০	২০১১	৪৮	৩৭১২	১০৫
" বাংলা "	৪৫	১৮৭৫	১৮	৯০৩	৫	১৯১	১৩৮
উচ্চ প্রাথমিক "	...	...	১০৫	৪৭৮২	৭৩	৩৩৭৪	...
নিম্ন " "	...	..	৩৩৮	১২৩৩৩	১৫৬৮	২৫৯২৭	১২০৬৭
বিশেষ বিদ্যালয়	...	...	৮	২২৭	৩১	১৪৭৯	...
বিবিধ	৩	৬৯	..	...	৩	১৭১	...
মোট	৬৪	২৬৯৬	৬২৭	২৪২৯৬	১৭৫৮	৪১১৯০	১২৩১০

(খ) হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ঃ

স্কুল	১৮৭০—১৮৭১ মোট	১৮৭০—১৮৭১ হিন্দু ও অন্যান্য	১৮৭০—১৮৭১ মুসলমান	১৯০৪—১৯০৫ মোট	১৯০৪—১৯০৫ হিন্দু ও অন্যান্য	১৯০৪—১৯০৫ মুসলমান	১৯১৪—১৯১৫ মোট	১৯১৪—১৯১৫ হিন্দু ও অন্যান্য	১৯১৪—১৯১৫ মুসলমান
উচ্চ ইংরাজি—	১৬৭	১৫৯	৮	৩৬৮০	২৯০৯	৭৭১	৬৬০৯	৪২২১	২৩৮৮
মধ্য ঐ—	৫৮৫	৫৬৫	২০	২৪৬৭	১৬৩৪	৮৩৩	৪৮২৮	২৬৬৫	২১৫৩
ঐ বাংলা—	১৮৭৪	১৬১১	২৬৩	৭১৭	৪৬৮	২৪৯	৫১৮	৩৬৭	১৫১
উচ্চ প্রাথমিক—	...	...	...	৫৮৪৩	২৪২৮	৩৪১৫	৫৪৩১	২৩৬	৩০৬৮
নিম্ন ঐ—	...	...	...	১০৭২৫	৩৬২৬	৭০৯৯	২৩৬৩৫	৫৯৮৯	১৭৬৪৬
ট্রেনিং—	...	...	...	১২	২	১০	২৪	৩৮	১৬
ইন্ডাস্ট্রিয়াল—	...	...	...	৮০১	৮৫	১৩	১০৮	৮১	২৭
বিবিধ—	১৪৪	১৩৮	৬	৭২১	৬৩	৬৫৮	১৬৮৮	৩৭৬	১৩১২
মোট—	২৭৭০	২৪৭৩	২৯৭	২৪২৭৩	১২১৮৫	১৩০৮৮	৪২৮৪১	১৬০৮০	২৬৭৬১

(গ) শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যা ঃ

		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট শতকরা
পাবনা—	হিন্দু	৬৯৩৫	৫৪৩১	১৫০৪	২৭.৯
	মুসলমান	৩১৫৫	২৯৫০	২০৫	৩.৯
আটঘরিয়া—	হিন্দু	৭৮২	৬৯১	৯১	১৩.৩
	মুসলমান	৯১৮	৮৯৭	২১	৩.৮
সাঁড়া—	হিন্দু	২২৯৬	১৯৬০	৩৩৬	১৪.৭
	মুসলমান	১৫৬০	১৪৮৭	৭৩	৩.৬
চাটমোহর—	হিন্দু	২৯০৮	২৫০৩	৪০৫	১৭.৬
	মুসলমান	১৪৭০	১৪৩৩	৩৭	২.৩১
সাঁথিয়া—	হিন্দু	২৮০৯	২৪১১	৩৯৮	১৬.৩
	মুসলমান	১৬৮৮	১৬৪৮	৪০	২.১
ফরিদপুর—	হিন্দু	১৫৮১	১৪১৮	১৬৩	১১.৬
	মুসলমান	১৪২০	১৩৯৭	২৩	৩.৯
সুজানগর—	হিন্দু	৩৮৯৩	৩৪০০০	৪৯৩	১৫.৩
	মুসলমান	২০১৫	১৯৭৩	৪২	৩.৯
বেড়া—	হিন্দু	৪৮৮৫	৪২২৩	৬৬২	১৬.৩
	মুসলমান	১৭৯৫	১৭৫৮	৩৭	৬.৮
শাহজাদপুর—	হিন্দু	৫৬৫১	৪৭৭৪	৮৭৭	৩১.২
	মুসলমান	৪৭৮৫	৪২৫৫	৫৩০	৬.৬
চৌহালি—	হিন্দু	২৪৫৩	২১৯০	২৬৩	২৯.৩
	মুসলমান	২১৭০	২০৩০	১৪০	১০.৫
বেলকুচি—	হিন্দু	৩১৯৩	২৯১২	২৮১	২৬.১
	মুসলমান	২২৮০	২১৭৮	১০২	৮.৫
উল্লাপাড়া—	হিন্দু	২৯৬৫	২৬৮০	২৮৫	২৩.৫
	মুসলমান	৩৬১৫	৩৪৯৪	১২০	৬.৫
সামারখন্দ—	হিন্দু	৯৬০	৯৩৭	২৩	২.৩০৫
	মুসলমান	১৫৮৬	১৫২১	৬৫	৮.৭
সিরাজগঞ্জ—	হিন্দু	৭৩০৬	৬৩৪৫	৯৬১	৩০.৪
	মুসলমান	৪৮৪৪	৪৫৮৮	২৫৬	৭.৭
কাজিপুর—	হিন্দু	৭১৫	৬৮৯	২৬	১৪.৯
	মুসলমান	২৮২৯	২৭২৫	১০৪	৬.০৫
রায়গঞ্জ—	হিন্দু	২৮১৮	২৬১৫	২০৩	২১.৪
	মুসলমান	১৮৩০	১৭৯৯	৩১	৬.০৮
তাড়াস—	হিন্দু	২৭২	২৫০	২২	৬.২
	মুসলমান	৪১৯	৪১২	৭	৩.০৭
মোট—	হিন্দু	৫২৪২২	৪৫৪২৯	৬৯৯৩	১৫.৬
	মুসলমান	৩৮৩৭৯	৩৬৫৪৬	১৮৩৩	৩.৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সংবাদপত্র, লাইব্রেরি ও প্রেস

ক. সংবাদপত্র ঃ

পাবনা জেলায় শিক্ষিত সম্প্রদায়, এমন কি সুদূর পল্লীবাসী পর্যন্ত পূর্বাপর সংবাদপত্রের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া অতি পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকাদি প্রকাশে মনোযোগী আছেন। এই জেলা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদপত্র সমূহ প্রকাশিত হইত এবং এখনও কয়েকখানি প্রকাশিত হয়।

পাবনা দর্পণ—১২৭১ সালে পাবনা নিবাসী রামসুন্দর রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান কর্তৃক পাবনা হিতৈষী কোম্পানি অফিস হইতে মাসিক প্রকাশিত হইত।

স্বদেশ হিতৈষিণী—ঘোরাচরা (সিরাজগঞ্জ হইতে গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের আত্মীয় নীলমাধব রায় কর্তৃক এই পাক্ষিক প্রকাশিত হইত। ১৮৭৪/৭৫ অব্দে ইহার প্রচার বন্ধ হয়।

জ্ঞানবিকাশিনী—গুণাইগাছা (চাটমোহর) হইতে ভৈরবনাথ সিদ্ধান্ত মহাশয়ের সম্পাদিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকা চাটমোহর নিবাসী শ্রীধর রায় (কুণ্ডু) মহাশয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হইত।

আশালতা—সিরাজগঞ্জের উকিল শ্রীকৈলাশচন্দ্র বসু মহাশয়দিগের উদ্যোগে তথা হইতে চন্দ্রমোহন সেন মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত।

অণুবীক্ষণ—পাবনার প্রসিদ্ধ নাগরিক হরিশচন্দ্র শর্মা (তলাপাত্র) কর্তৃক এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। তদীয় সুযোগ্য সহধর্মিনী বামাসুন্দরী দেবী এই পত্রিকা প্রচলনের বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। অণুবীক্ষণ বন্ধ হইয়া গেলে তাহারই নামানুসারে বামাবোধিনী পত্রিকার সূত্রপাত হয়।

বার্তাবহ—মালঞ্চি (পাবনা) গ্রামের দিবাকর প্রেস হইতে তথাকার সরকার বাবুদিগের উদ্যোগে এই সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইত। (১৮৮২/৮৩) এখান হইতে ভ্রমর নামেও একখণ্ড মাসিক বাহির হইত।

বিজলি—দিলপশার হইতে এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত।

উষা—পাবনা হইতে মাসিক প্রকাশিত হইত।

জ্যোৎস্না—মাসিক, পাবনা হইতে প্রকাশিত হইত।

প্রতিনিধি—সাপ্তাহিক, সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত হইত।

পাবনা ও বগুড়া হিতৈষী—১৩০৯ সাল হইতে অদ্যাপি এই সাপ্তাহিক নিয়মিতরূপে পাবনা টাউন হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

সুরাজ—স্বর্গীয় কিশোরীমোহন রায় মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুরাজ পাবনা হইতে সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আরতি—দ্বৈমাসিক, পাবনা হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শাশ্বত সংবাদ—পাক্ষিক, পাবনা হইতে প্রকাশিত হয়।

খ. লাইব্রেরী ঃ

অধুনা সাধারণ পাঠাগার ও সংবাদপত্র পাঠের উপকারিতা এই জেলায় বিশেষ উপলব্ধি হইতে দেখা যাইতেছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা আজকাল বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ লেখাপড়া জানা লোকেরাও পড়িবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। পল্লীর অনেক স্থলে মৃত ও জীবিত লোকের নামে পাঠাগার সংস্থাপন অধুনা ছাত্র সমাজের মধ্যে বিশেষভবে পরিলক্ষিত হইতেছে। জেলায় কয়েকটি প্রধান সাধারণ পাঠাগারের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি (পাবনা)—কিশোরিমোহন স্টুডেন্ট লাইব্রেরি (পাবনা)—রজনীকান্ত পাঠাগার (পাবনা)—নৃপেন্দ্রনারায়ণ পাবলিক লাইব্রেরি (রাধানগর)—গোখেল মেমেরিয়াল লাইব্রেরি (হিমাইতপুর)—পল্লী হিতৈষী লাইব্রেরী (গুণাইগাছা)—শ্রীনাথ লাইব্রেরী (হরিপুর)—সারস্বত লাইব্রেরী (চাটমোহর)—পাবলিক লাইব্রেরী (নাকালিয়া)—সিরাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী—এডওয়ার্ড লাইব্রেরী (শাহজাদপুর)—শশীমোহন লাইব্রেরী (সদিয়া চাঁদপুর)—কেদার লাইব্রেরী (স্থল)।

গ. মুদ্রাযন্ত্র ঃ

পাবনা—(১) নববিকাশ প্রেস, (২) হিতৈষী প্রেস, (৩) সুরাজ প্রেস, (৪) শ্যামা প্রেস, (৫) সারদা প্রেস, (৬) কমলা প্রেস, (৭) সরস্বতী প্রেস, (৮) কোহিনূর প্রেস, (৯) গোবিন্দ প্রেস, (১০) বনওয়ারিনগর প্রেস।

সিরাজগঞ্জ—(১) ভিক্টোরিয়া, (২) লক্ষ্মী প্রেস, (৩) কমলা প্রেস, (৪) লাহিড়ী প্রেস, (৫) ভারতী প্রেস, (৬) সলপ সান্যাল প্রেস, (৭) গিরীশ প্রেস—স্থল নওহাটা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—পণ্ডিত, কবি ও সাহিত্যিকগণ

ক. সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ঃ

গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ—(১২২৭—১২৯৮ সাল) পিতা শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার, নিবাস বড় শালিখা (চাটমোহর), মুর্শিদাবাদ, কাসিমবাজারে সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন এবং স্মৃতি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। কলিকাতাবাসী স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রসময় দত্ত মহাশয়দ্বয়ের সহায়তায় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ লাভ করিয়া কালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১২৫৩ সালে জজ পণ্ডিত উপরোক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলে গোবিন্দকান্ত অস্থায়ীভাবে উক্ত কার্যে নিযুক্ত হয়েন। ১২৬৫ সালে পরিশেষে স্থায়ীভাবে উক্ত পদে বহাল হয়েন। কয়েক বৎসর পর উক্ত পদ একেবারে উঠিয়া গেলে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে ডেপুটি ম্যাঃ ও কাঃ পদে প্রথম মালদহে, ১২৭৭ সালে রাজশাহী, ১২৭৮ সাল নাটোর, বগুড়া ও পরিশেষে সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ৯ বৎসর কাল কার্য করার পর ১২৮৪ সালে সিরাজগঞ্জ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

ইহার (ক) "গোবিন্দ নামামৃত" সংস্কৃত ব্যাকরণ, (খ) "লঘু ভারত" নামক সংস্কৃত ইতিহাস, (গ) "রত্নাবলী" নামক স্মৃতিগ্রন্থ, (ঘ) "ভুবন বৃত্তান্ত" নামক পৌরাণিক ভূগোল নামক প্রকাশিত এবং পাষণ্ডদলন ব্রহ্মশতক প্রভৃতি অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী বর্তমান আছে। সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইয়া গোবিন্দকান্ত স্বীয় বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন এবং বহু দারিদ্রপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য রাজকার্যে লিপ্ত থাকিয়াও সাহিত্য চর্চা, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গবেষণা হইতে বিরত ছিলেন না ইহাই তদীয় জীবনের বিশেষত্ব।

যদুনাথ ন্যায়রত্ন—(১২৪০—১৩০৭ সাল) পিতা শ্রীনাথ পঞ্চানন নিবাস বাগবাটি (সিরাজগঞ্জ)—বাল্যে দিনাজপুরে অধ্যয়ন করতঃ স্মৃতি ও কাব্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়েন। ইহার তুল্য উপস্থিত কবিতা রচনায় পারদর্শী পণ্ডিত সহসা পরিলক্ষিত হয় না। দুই তিন জন লোককে একত্র বসাইয়া কবিতা রচনা করিয়া দিতে তিনি সমর্থ ছিলেন।

তৎপ্রণীত (ক) দায়ভাগ তত্ত্বাবলী— (খ) প্রবাস শতক— (গ) লুপ্তসংবৎসর নিরাসন—

(ঘ) ইন্দ্রায়ুধ দূত্‌ম্—(ঙ) যুধিষ্ঠির বংশাবলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্রায়ুধ দূতম্ অনেক স্থলে কালিদাসের মেঘদূতের ন্যায় প্রশংসার্হ, দায়ভাগতত্ত্বাবলীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া গবর্নমেন্ট তাহাকে জজপণ্ডিত নিযুক্ত করিতে চাহিলে তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হয়েন। সিন্ধিয়ার মহারাজা কোন সময়ে তাহাকে সভাপণ্ডিত পদে বরণ করিতে অনুরোধ করিলে, তাহাতেও তিনি স্বীকৃত হয়েন নাই। চিরদিনই তিনি পরমুখাপেক্ষী হওয়া অতি হেয় জ্ঞান করিতেন। মৃত্যুর পূর্বে বাগবাটির বৈদ্য জমিদারগণ পক্ষাশৌচ গ্রহণ করাতে তিনি তাহাদের সংস্রব পরিত্যাগপূর্বক "বৈদ্য রহস্য" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়—(১২৪৭—১৩৭৮ সাল) পিতা গৌরমোহন রায়—নিবাস ঘোরাচরা (সিরাজগঞ্জ)—বাল্যাবধি ইনি চিন্তাশীল ও ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ তাহার প্রথম জীবনের বিশেষত্ব। ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় বুৎপন্ন হইয়া কিছুদিন পুলিশ বিভাগে কাজ করেন। উক্ত পদ পরিত্যাগ করতঃ রঙ্‌পুর ইংরাজি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের প্রশংসাবাদ পাঠে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন এবং ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হয়েন। তিনি নববিধান ব্রাহ্মসমাজের একটি প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত প্রচার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। জন্মভূমির প্রতি তাহার ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করার প' তিনি স্বগ্রাম হইতে প্রকাশিত "স্বদেশ হিতৈষিণী" নামক পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন।

গৌরগোবিন্দ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সংস্কৃত শাস্ত্রে সাতিশয় পাণ্ডিত্য ছিল। তৎপ্রণীত সংস্কৃত টিকা ও বাংলা গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ তাহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, অধ্যবসায় এবং শ্রমশীলতার পরিচায়ক। তাহার (ক) গীতার সমন্বয়ভাষ্য (খ) বেদান্ত সমন্বয় (গ) গীতাপ্রসূতি (ঘ) ব্রহ্মগীতোপনিষেধ (ঙ) নবসংহিতার অনুবাদ (চ) ভাষ্যসঙ্গোমণী (ছ) বিশ্বাস বিবৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অমূল্য গ্রন্থ। তদীয় টিকা অতি মধুর, সরল ও জ্ঞানগর্ভ। "গীতা সমন্বয় ভাষ্য" ইংলন্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মনীষিগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। গৌরগোবিন্দ আজন্ম বঙ্গভাষার সেবক ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের "ধর্মতত্ত্ব" নামক পত্রিকার তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল সম্পাদক ছিলেন। (জ) শ্রীকৃষ্ণ জীবনী ও ধর্ম নামক গ্রন্থ, (ঝ) কেশবচন্দ্র জীবন চরিত (১১ খণ্ড) বঙ্গভাষায় (ঞ) গীতার সমন্বয় ভাষ্য ও বেদান্ত সমন্বয় প্রভৃতি তৎপ্রণীত বঙ্গভাষার অমূল্য গ্রন্থ। তাহার সমুদয় বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ডের মূল্য প্রায় পঞ্চাশ টাকার উর্ধ্ব। মাদ্রাজ প্রদেশে অবস্থান কালে তিনি তেলিগু ভাষা শিক্ষা করেন এবং উক্ত ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার করেন। ইংরাজি ভাষায়ও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। নববিধান সমাজের পরিচালিত World and New Dispensat'on নামক পত্রিকার কার্য তিনি অতি দক্ষতার সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন। সুলেখক ও সুপণ্ডিত ব্যতীত সুবক্তারূপেও তাহার সুনাম ছিল। স্থিরচিত্ততা, সত্য নিষ্ঠতা প্রকৃত অধ্যবসায়, সরলতা ও বৈরাগ্য তাহার নির্মল চরিত্রের প্রধানতম অলঙ্কার। শেষ জীবনে তিনি কলিকাতায় স্থায়ী হইয়াছিলেন।

গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ বারিধি—পিতার নাম স্বর্গীয় রাধামোহন রায়, কায়স্থ—নিবাস উধুনিয়া (উল্লাপাড়া)। জন্ম মাতুলালয় গয়েশবাড়ি (সাঁথিয়া)। বাল্যে রঙপুরে শিক্ষালাভ করেন। শৈশবাবস্থা হইতে তাহার চরিত্রের উচ্চ আদর্শ স্ফুরিত হয়। জ্ঞানানুশীলনই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল। সংসারের গুরুভার ও শারীরিক নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি বিদ্যাচর্চা হইতে কখনও বিরত হয়েন নাই। সমাজ সংস্কার বিষয়েও তিনি সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তৎপ্রণীত (১) হরিবাসের তন্ত্রসার তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী তাহাকে 'বিদ্যাবিনোদ বারিধি' উপাধি প্রদান করেন।

স্বদেশহিতৈষিতার অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি অভিনব জাতীয় গ্রন্থালোচনার দ্বারা জাতীয়

সাহিত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। (২) 'মৃন্ময়ী' তৎ প্রণীত মৌলিক গ্রন্থ ; ইহাতে তিনিই সর্বপ্রথমে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, নিউটনের বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষে ভাস্করাচার্য মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তৎপ্রণীত (৩) 'অষ্টাদশ বিদ্যা' (৪) লীলাবতী প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহার সংস্কৃতালোচনার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি বাংলায় (৫) "বারেন্দ্র কায়স্থ ঢাকুর" প্রণয়ন করেন। রঙপুরের কাঁকিনা রাজ স্টেটের তিনি প্রধান কর্মচারি ছিলেন। তৎপুত্র কিশোরীমোহন রায় মহাশয়ও সাহিত্যিক ছিলেন, তৎপ্রণীত ১) হামির, ২) কর্মফল উল্লেখযোগ্য।

কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের তালিকা

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (মুরকা) পদাঙ্কদূতম্—তারিণীকান্ত বিদ্যানিধি (সালিখা) ত্রিলিঙ্গ বোধকম্, অনুবাদ বোধকম্ সুনীতিবোধকম্- শশী তর্কবাগীশ (ঐ) কারিকা কুসুমাঞ্জলি ব্যাকরণ, কলির ভারত, তালাঙ্কবিধি, শ্যামাশতক, তত্ত্বমঞ্জরী—মুকুন্দচন্দ্র লাহিড়ী (ঐ) ত্রিপুরাসুর কাব্য, মহাশ্বেতা, বিজয় সঙ্গীত, ব্রিটিশ সঙ্গীত কাব্য—মুকুন্দরাম ন্যায়বাগীশ (পুকুরপার) ব্যবস্থা নির্ণয়, কুসুমাঞ্জলির টিকা—জানকীনাথ ন্যায়বাগীশ (ঐ) গোপীবিলাপ, কলাবতী কাব্য—তারিণীশঙ্কর সান্যাল (মাটিনা) বাঙ্গালা ব্যাকরণ—রামতোষণ তর্কালঙ্কার (হরিপুর) প্রাণতোষিণী তন্ত্রসার - ব্রজসুন্দর মৈত্র (নন্দনপুর) ব্রহ্মাণ্ড বিবৃতি, সংস্কৃত ব্যাকরণ—হেমচন্দ্র রায় (পাবনা) পরশুরাম চরিতম্, হৈহয় বিজয়ম্, রুক্মিণীহরণম্, সুভদ্রাহরণম্, সত্যভামাপরিগ্রহম, পাণ্ডব বিজয়ম্।

শ্রীশশীভূষণ স্মৃতিরত্ন (গুণাইগাছা)—ভৈরবচন্দ্র সিদ্ধান্ত (ঐ)—শিবরাম বাচস্পতি (সালিখা)—রতিকান্ত বিদ্যাসাগর (ঐ)— কাশীকান্ত সিদ্ধান্ত (ঐ)- শীতলচন্দ্র সার্বভৌম (ঐ) গঙ্গাকান্ত বিদ্যারত্ন (ঐ)—গোবিন্দচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ (ঐ)— মুকুন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (ঐ)—জয়দেব তর্কালঙ্কার (সারোরা)—কৃপানাথ সিদ্ধান্ত (পোতাজিয়া)—ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (সাতবাড়িয়া)—যাদবেশ্বর পঞ্চানন (গাঁড়াদহ)—প্রাণনাথ তর্কবাগীশ (জামিরতা)—যাদবেশ্বর তর্করত্ন (শাহজাদপুর)— জাহ্নবীচরণ স্মৃতিরত্ন (পুকুরপার)—হরিনারায়ণ কাব্যতীর্থ (ঐ)—সূর্যকান্ত শাস্ত্রী (ঐ)—যোগেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ (ঐ)—গোবিন্দচন্দ্র তর্কালঙ্কার (স্থল)—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (করঞ্জা) ভীমানন্দ ন্যায়ভূষণ (জামালপুর)—ভবানীচরণ বিদ্যারত্ন (ঐ) গুরুচরণ সরকার বিদ্যারঞ্জন (মালঞ্চি)।

খ. কবি ও সহিত্যিকগণ ঃ

১) গুরুপ্রসাদ সেন (ভাণ্ডারবাড়ি) পদ চিন্তামণিমালা, সতী বিলাপ। ২) রজনীকান্ত সেন (ঐ) বাণী, কল্যাণী, ছায়া, আনন্দময়ী, অভয়া, বিশ্রামামৃত। ৩) শশধর রায় (তলট) রাঘব বিজয়, ত্রিদিব বিজয়, উপনিষদ গ্রন্থাবলী পরবশতা। ৪) সত্যরঞ্জন রায় (ভারেঙ্গা) অবগুণ্ঠিতা, চক্ষুদান, রাজা দেবীদাস, বসন্তরায়, বৈশ্য সাহা জাতি। ৫) ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (ঐ) আলেখ্য, শোভাময়ী। ৬) প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী (ঐ) প্রমোদ, গায়ত্রী। ৭) যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (ঐ) গৌড় ও পাণ্ডুয়া। ৮) দুর্গানারায়ণ চৌধুরী (ঐ) সঙ্গীত কুসুমাঞ্জলি, কবিতা কলাপ। ৯) গোপালচন্দ্র সরকার (শক্তিপুর) আশাপথ। ১০) বরদাকান্ত রায় (ঐ) দুর্গাস্তোত্র। ১১) তারানাথ মজুমদার (মাজগ্রাম) মানস সরোজ, মাতৃভক্তি, কবিতাকুসুম, মানসকুসুম। ১২) রমাপ্রসাদ মৈত্র (নাকালিয়া) বাঙ্গালার ইতিহাস। ১৩) কৃষ্ণকিশোর রায় (শিবপুর) দুর্গালীলা তরঙ্গিনী, ব্রহ্মবিদ্যা। ১৪) হরচন্দ্র ভৌমিক (হাটুরিয়া) মর্তে পারিজাত। ১৫) যাদবচন্দ্র গোস্বামী (ঐ) কবিতামঞ্জরী, সুখপাঠ, সংক্ষিপ্ত-ভূগোল, বাঙ্গালা ব্যাকরণ। ১৬) হৃদয়নাথ গোস্বামী (ঐ) উন্মত্ত প্রলাপ। ১৭) দুর্গাচন্দ্র সান্যাল (বক্তারপুর) বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, মহামোঘল কাব্য, ভাষা বিজ্ঞান। ১৮) যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী (সদিয়াচাঁদপুর) আবেগ। ১৯) মধুসূদন সরকার (মালঞ্চি) সৌদামিনী বিরহতাপ। ২০) বিহারীলাল সরকার (ঐ) বাল্য রহস্য। ২১) মুকুন্দলাল সরকার (ঐ) প্রমরা

খেলা নাটক। ২২) হরিচরণ চক্রবর্তী (ঐ) ভদ্রোদ্বাহ কাব্য। ২৩) মোহিনীমোহন নন্দী, (পার্শ্বডাঙা) কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ, সঙ্গীত কুসুমাঞ্জলি, প্রেমামৃত সিন্ধু, বিসুচিকা বিধান, গুরুসত্য সঙ্গীত, প্রেম পুষ্পাঞ্জলি, বন্ধুবিলাপ, পকেট সঙ্গীত। ২৪) ললিতমোহন অধিকারী (পাকুরিয়া) হ্যামলেট। ২৫) নিরঞ্জন সান্যাল (সলপ) কল্যাণী। ২৬) শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সান্যাল (ঐ) ভারতবাণী। ২৭) বীরেন্দ্রনাথ রায় (পোতাজিয়া) রাবেয়া। ২৮) অনাদিচরণ তরফদার (দেওয়ানতলা) হিন্দুসমাজ ভক্তের ভগবান। ২৯) শশীভূষণ মজুমদার (গুয়াখরা) কর্মফল, চিত্রামঞ্জরী। ৩০) দিগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (কাওয়াখোলা) জাতিভেদ প্রভৃতি। ৩১) গোবিন্দ চৌধুরী (তাঁতিবন্দ) কমলাকামিনী, বিশ্রামলহরী, নুরজাহান, বিলাপমালা, বাঁশী। ৩২) রমেশচন্দ্র লাহিড়ী (ঐ) গৌড়েশ্বর নাটক। ৩৩) শ্রীমন্মনাথ চৌধুরী (ঐ) পরিত্যক্ত পল্লী। ৩৪) তারকগোবিন্দ চৌধুরী (ঐ) জমিদারি, শিক্ষা, মহাজনী শিক্ষা। ৩৫) যামিনীকুমার পাকড়াশি (স্থল) জমিদার নাটক। ৩৬) তারিণীশঙ্কর বাগছী (পোতাজিয়া) গীতাবলী, সৎসঙ্গ। ৩৭) গৌরনাথ নিয়োগী (তেঁতুলিয়া) আশামরীচিকা। ৩৮) শরচন্দ্র মৌলিক (হাতকোড়া) লক্ষ্মণের শক্তিশেল। ৩৯) তারিণীচরণ চৌধুরী (করঞ্জা) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, S. W. Ramsay as Scientist and Man, Modern Chemistry. ৪০) প্রিয়বল্লভ সরকার (মহেশপুর) কুসুমাঞ্জলি, আশা। ৪১) গোপিন্দ্রলাল রায়, পাবনা, মুস্তাফা কামাল পাশা, অঞ্জলি। ৪২) বঙ্কিমচন্দ্র রায় (ঐ) ইংলন্ডের ইতিহাস ৪৩) গিরিজাকান্ত রায় (ডেমরা) কণা। ৪৪) কুমুদনাথ চৌধুরী (হরিপুর) Sports in Jheels & Jungles. ৪৫) প্রমথনাথ চৌধুরী, চারইয়ারীকথা। ৪৬) হেমেন্দ্রলাল রায় (ফুলকোচা) ফুলের ব্যথা। (৪৭) বামাচরণ মজুমদার (দিলপশার) জমিদার। ৪৮) শচীন্দ্রমোহন সরকার (পাবনা) ফুলঝুরি। ৪৯) রাধাচরণ দাস (পাবনা) কবির স্বপ্ন। ৫০) প্রমদাগোবিন্দ চৌধুরী শকুন্তলাসম্ভব। ৫১) জগন্নাথ সরকার (পার্শ্বডাঙা) জমিদারি দর্পণ। ৫২) মাধবীলাল গোস্বামী ভক্ত জীবনী। ৫৩) সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক কবি মালঞ্চ।

আইন পুস্তক ঃ

প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী (পাবনা) Law of Confession. মহিমচন্দ্র সরকার (মালঞ্চি) Civil Procedure Code Evidence Act, Isolvancy Act, Specific R. Act. জাহ্নবীচরণ ভৌমিক (পাবনা) Law of Contribution & Reimbursement, Courtfees Act. অনুকূলচন্দ্র মৈত্র (পাবনা)—Law of Private Defence. মোহিনীমোহন চক্রবর্তী (পাবনা) —Succession Act. দীনেশচন্দ্র রায় (পাবনা) Indian Penal Code.

স্কুলপাঠ্য ঃ

যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী (সিরাজগঞ্জ) পাটিগণিত বীজগণিত প্রভৃতি। গোপালচন্দ্র সরার (চিথলিয়া)—প্রাথমিক পাটিগণিত। হরিবল্লভ মণ্ডল (পাকুরিয়া)—শিশু পাটিগণিত। ভোলানাথ সাহা (জগন্নাথপুর)—পাটিগণিত। শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (পরেলসাটিয়া)—পাটিগণিত শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী (পাবনা) বিবিধ বিজ্ঞান, পদার্থ পরিচয়, পাঠশালায় গণিত, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, জমিদারি মহাজনী। কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ ভৌমিক (গুণাইগাছা)।

স্ত্রীলোক কবি ও গ্রন্থকর্ত্রী ঃ

প্রসন্নময়ী দেবী (গুণাইগাছা) পূর্বস্মৃতি। তারিণীকালি দেবী (করঞ্জা) সতীশিক্ষা। অম্বুজাসুন্দরী গুপ্তা (ভাঙাবাড়ি) প্রীতি ও পূজা। সরলাবালা দাসী (মালঞ্চি) ভগিনী নিবেদিতা।

মুসলমান মহিলা ঃ

খয়েরুন্নেছা বিবি (হোসেনপুর) সতীর পতি ভক্তি।

ডাক্তারী পুস্তক ঃ

জগচ্চন্দ্র রায় (পাবনা)—ভৈষজ্য বিজ্ঞান ৫খণ্ড—(১৬), চিকিৎসা বিজ্ঞান ৪খণ্ড—(১৬), গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিজ্ঞান—(৪)

নীলাম্বর হুই (সিরাজগঞ্জ)—সদৃশ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান সূত্র, প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা, ভৈষজ্যতত্ত্ব, সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা প্রদর্শক প্রভৃতি।

রামচন্দ্র রায় (কাদোয়া)—ইনজেকসন ও কালাজ্বর চিকিৎসা

নগেন্দ্রমোহন চৌধুরী (তাঁতিবন্দ)—A Study on Materia Medica

সন্তকুমার চৌধুরী (হিমাইতপুর)—কুইনাইন প্রয়োগ।

মুসলমান গ্রন্থকার ঃ

নজিবর রহমান (সলঙ্গা)—আনওয়ারা, প্রেমের সমাধি, হোসেনগঙ্গ বামনী।

হরিবর রহমান (নাগডেমরা)—ভ্রান্তিবিলাস।

আমাছ আলী তালুকদার (রহমতগঞ্জ)—মানব জীবনের কর্তব্য।

তাহের খাঁ (ভুবনগাতি)—সমাজ ও সংস্কার।

হায়ৎ আলী খাঁ (শাহজাদপুর)—সাঁজের আলো, অশ্রুমালা।

মঃ মেহেরুল্লা (হোসেনপুর)—বাল্য বিবাহের বিষময় ফল। ইসলামী বক্তৃতামালা, সমাজ শিক্ষা, শ্লোকমালা।

মেহি বকস্ (রিয়াজ)—ছাত্র জীবনের কর্তব্য।

মুন্সী এনায়েতুল্লা (রোহাবাড়ি)—এনায়স্তুর রহমান।

ইসমাইল সিরাজী (সিরাজগঞ্জ)—উদ্বোধন, উচ্ছ্বাস, নব উদ্দীপনা, প্রেমাঞ্জলি, স্ত্রীশিক্ষা, আদবকায়দা শিক্ষা, তুরুস্ক ভ্রমণ, স্পেনবিজয় কাব্য, তারাবাই, রায় নন্দিনী, সুচিন্তা, ফিরোজা বেগমাদি।

মোঃ আলাউদ্দীন (চৌহালি)—অমর চরিত, হজরত পীর সাহেবের জীবনী, আ'হকমল ইসলাম।

মীরজা আমিনদ্দিন (তালিমনগর) তত্ত্বকথা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—বিশিষ্ট ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ

যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী—(১৩/১০/১৮৩৭—১০/০৭-১৯১১) স্বর্গীয় পিতাম্বর চক্রবর্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র যাদবচন্দ্র ইংরাজী ১৮৩৭ অব্দের ১৩ অক্টোবর মৈমনসিংহ জেলার ভাদোরা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যাদববাবু যে বংশে জন্মিয়াছিলেন উক্ত বংশীয় কৃষ্ণদেব বাগছী ভারেঙ্গায় রামেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের সহিত করণ করিয়া কাপত্ব প্রাপ্ত হয়েন। কৃষ্ণদেব সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদা দুর্গোৎসবে চৌধুরী মহাশয়দিগের পুরোহিত অশুচি হওয়ায় কৃষ্ণদেব তাহাদের পূজা করেন; তদবধি তিনি চক্রবর্তী উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। পূর্বে ইহাদের কখনও যাজনিক ব্যবসায় ছিল না। যাদবচন্দ্র তাহারই অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ পীতাম্বর চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র; পিতাম্বরের দুই ভ্রাতা পাবনায় মোক্তারি করিতেন এবং তিনি স্বয়ং চৌধুরী জমিদারগণের বাটিতে দেওয়ানি চাকরি করিতেন। তজ্জন্য অদ্যাপি চক্রবর্তী বাটি দেওয়ানজির বাড়ি নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

যাদবচন্দ্র প্রথম পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সাধারণ গুরু মহাশয়ের পাঠশালাতে বাংলা লেখাপড়া এবং পরে মুসলমান মুন্সীর নিকট গ্রামেই পারসি শিক্ষা করেন। তৎকালে অন্যান্য শিক্ষাসহ প্রত্যেক বালককেই প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় হস্তপদাদি প্রক্ষালন করতঃ নিজ নিজ অভিভাবকের নিকট পিতৃমাতৃ কুলের ৩/৪ পুরুষের নাম, গোত্র. গাই, বেদ, ও লক্ষ্মণাদি বিষয় অনুশীলন করিতে হইত। যাদবচন্দ্র এই প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাহারই ফলে তিনি পরিণত বয়সে বহুশ্রম ও ব্যয়ে "কুলশাস্ত্র দীপিকা", সঙ্কলন করেন।

বাংলা ১২২৫ সালে ১১শ বৎসর বয়ক্রমকালে যাদবচন্দ্র ইংরাজি শিক্ষা জন্য পাবনায় আসেন, তথায় পিতৃজ্যেষ্ঠ মোক্তার রামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া ১৯ বৎসর পর্যন্ত ইংরাজী স্কুল অধ্যয়ন করেন পরে নানারূপে পারিবারিক দুর্ঘটনা সত্ত্বেও কেবলমাত্র সাহসে ভর করিয়া পাঁচটি টাকা সম্বল লইয়া উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ ঢাকায় গমন করেন। তথায় স্বীয় উদ্যোগে ১৮৫৮ অব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ৮ টাকা জুনিয়ার স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয়েন। ঢাকা কলেজ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বাংলা রচনার জন্য কুচবিহার মহারাজার প্রদত্ত স্বর্ণপদক ও ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করায় তাহাকে একটি মেডেল দেওয়া হয়। তখন হইতে তাহার ভ্রাতা মাধবচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, গোপালচন্দ্রকে ঢাকায় আনাইয়া নিজ স্কলারশিপের আয় হইতে সকলকে পড়াইতে থাকেন।

এই সময়ে ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামের মাধবনারায়ণ রাম মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রেমদা দেবীর সহিত যাদবচন্দ্রের বিবাহ হয়। সুবৃহৎ পরিবারের সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া তিনি অদ্যাপি গৃহকর্ত্রী রূপে বিরাজ করিতেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হইয়া ১।। দেড় বৎসর কাল অধ্যয়নের পর যাদবচন্দ্র আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনে বাধ্য হইয়া নড়াইলে নব প্রতিষ্ঠিত ছোট আদালতের কেরানি পদ গ্রহণ করেন। এক বৎসর মধ্যে হেড ক্লার্ক পদে উন্নীত হইয়া পাঁচ বৎসর কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য করেন।

যাদবচন্দ্রের পিতৃব্যগণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন ; নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা করিয়া স্বপাকে আহার করিতেন। যাদবচন্দ্রেরও শৈশবকাল হইতে প্রগাঢ় ধর্মভাব ছিল, কিন্তু বাল্যেই মাতুলালয়ে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি দর্শন করিয়া ঐ সকল বিগ্রহের মানুষের মত পোশাক পরিচ্ছদাদি দর্শন করিয়া তাহাদের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে যাদবচন্দ্রের মনে গভীর অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। পাবনায় অধ্যয়নকালে তথাকার হরিশচন্দ্র শর্মা মহাশয়ের সহিত সর্বদা ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিয়া এবং অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণ বসুর পুস্তকাবলী পাঠে তাহার সন্দেহ দূঢ়ীভূত হয়। তখন বিক্রমপুরের নীলমণি সেন পাবনা স্কুলের ইনস্পেক্টর হইয়া আসেন এবং পাবনায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। যাদবচন্দ্র গোপনে ঐ সমাজে যাতায়ত করিতেন।

১৮৬৭ অব্দে যাদবচন্দ্র কুষ্টিয়ার Assessor ও Dy. Collector পদে উন্নীত হন। ১৮৬৮ অব্দে কালনার মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হন। তাহার কিছুদিন পরেই আইন পরীক্ষায় পাশ না হইলে ঐ পদে কেহ নিযুক্ত হইতে পারিবেন না এরূপ নিয়ম হওয়ায় তিনি পূর্বপদে ফিরিয়া যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। যাদবচন্দ্র তাহতে অসম্মত হইয়া Representation করায় কমিশনর মি বেন সাহেব বিনা পাশেই তাহাকে ঐ পদে থাকিবার অনুমতি প্রদান করেন। এই সময়ে কুচবিহার রাজস্টেট হইতে বঙ্গীয় গবর্নমেন্টের নিকট জনৈক উপযুক্ত কর্মচারি চাহিবায় গবর্নমেন্ট যাদবচন্দ্রকেই মনোনীত করিয়া পাঠান। তৎসূত্রে যাদবচন্দ্র মাসিক ৩০০ তিনশত টাকা বেতনে তথাকার ফৌজদারি আহেলকার পদে নিযুক্ত হন।

তিনি ক্রমে কুচবিহারে সিভিল জজ, সেসন জজ এবং কাউন্সিলের Judicial মেম্বর পদে উন্নীত হইয়া ১৮৯৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ২৯ বৎসর কাল কার্য করেন। তথায় দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। তজ্জন্য কমিশনার ও লাটসাহেব সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করেন এবং পরিশেষে তাহাকে "রায়বাহাদুর"

উপাধিতে ভূষিত করেন। কুচবিহার পরিত্যাগ কালে নানারূপ সভাসমিতি ও বিরাট জনতা ব্যতীত অনেকেই তাহার বিদায়কালে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যু হইলে ১৯১১ অব্দের ২৭ জুলাই তারিখে যে একখানি Extraordinary Gazette বাহির হয়, তাহাতে তাহার কার্যকালের বিবরণ ও প্রশংসাবাদ প্রকাশিত হয় এবং তাহার প্রতি সম্মানার্থ সেদিন কুচবিহার স্টেটের সমস্ত অফিসাদি বন্ধ থাকে।

তথা হইতে পেন্সান লইয়া স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের অনুরোধে যাদবচন্দ্র আসামের গৌরীপুরের জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়ের ম্যানেজারের কার্যগ্রহণ করেন। তাহার সময়ে কুমার প্রভাতচন্দ্র রাজা উপাধি লাভ করেন এবং দরবার উপলক্ষে স্বনামধন্য মিঃ কটন সাহেব প্রকাশ্য সভায় যাদবচন্দ্রের কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাজাবাহাদুর অতি অল্প সময় মধ্যে তাহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয় তাহাকে বেতনের অর্ধাংশ আজীবন পেনসন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল চাকরি করিবার পর অবসর গ্রহণ করিয়া যাদবচন্দ্র কলিকাতায় নিজবাটিতে কিছুকাল বাস করিয়া পরে দেওঘরে বাটি প্রস্তুত করিয়া সেখানেই অনেক সময় বাস করেন।

তাহার জীবিতকালেই ভারেঙ্গার চক্রবর্তী পরিবার সর্ববিষয়ে উন্নতি করিয়া পাবনা জেলা মধ্যে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। স্বীয় ভ্রাতা ও পুত্রগণের শিক্ষা নিমিত্ত যাদবচন্দ্র যেরূপ একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাহারা সকলেই নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাহার ভাতৃগণ মধ্যে মাধবচন্দ্র সবজজ হইয়াছিলেন ; কেশবচন্দ্র স্বগ্রামে ডাক্তারি করিতেন। গোপালচন্দ্র রঙপুরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। মনমোহন ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ হইয়া রায়বাহাদুর উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছেন। সর্ব কনিষ্ঠ মোহিনীমোহন চক্রবর্তী মহাশয় হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। কেশবচন্দ্র সমগ্র চক্রবর্তী পরিবারে যে উচ্চ আদর্শ ও কর্মোদ্যমের প্রাণ সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে এই পরিবারে সতের জন গ্র্যাজুয়েট হইয়াছেন। তাহার অনুকম্পায় পাবনা জেলার অনেকেই কুচবিহার রাজ স্টেটে প্রবেশ করিয়াছেন এবং পাবনার নাম উক্ত রাজ্যের সহিত নানারূপে বিজড়িত হইয়াছে। কেহ উকিল, মোক্তার, হাকিম, কর্মচারিরূপে তথায় প্রবেশ করিয়াছে। পাবনার অনেকে তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেও আরম্ভ করিয়াছে।

যাদবচন্দ্রের প্রাণ সর্বদাই পরের দুঃখে কাতর হইয়া উঠিত এবং আজীবন পরের সেবা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তিনি সর্বদাই বলিতেন যে---যে বিষয়ে মানুষের যথার্থ নিষ্ঠা থাকে এবং সেই আদর্শ জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নয়, তাহার সাধনা জীবনে সফল না হইয়া পারে না। তিনি বাল্যকাল হইতে নিজ পারিবারিক ও গ্রামের উন্নতি জন্য তথায় বালিকা বিদ্যালয়, স্কুল, পুস্তকালয়, ঔষধালয় এবং চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেকটিতেই তাহার জীবিত কালে সম্পূর্ণ অবস্থা দেখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছাত্র জীবনে গ্রামে প্রথমে সামান্য মাইনর স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। পেনসন প্রাপ্তির পর নিজেই তিনি সহস্র মুদ্রাব্যয়ে সেইটিকে এন্ট্রান্স স্কুলে পরিণত করেন। এই স্কুলটি যতদিন পর্যন্ত স্বাধীনভাবে চলিতে সক্ষম হয় নাই, ততদিন পর্যন্ত তিনি মাসিক ৬০্ টাকা পরিমাণে সাহায্য প্রদান করিতেন। বিদ্যালাভ ও অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিজ জন্মভূমির উন্নতি জন্য যাহা করা কর্তব্য আধুনিক কালে পাবনা জেলা মধ্যে একমাত্র যাদববাবু ভিন্ন সেরূপ অতি অল্প লোকই পরিলক্ষিত হয়। পরের উপকার কল্পে তিনি অর্থ ও সামর্থ উভয়ই অকাতরে উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন। সকলকেই তিনি নিজ আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন। এই কারণে সকলেই তাহাকে যেমন ভক্তি করিত, তেমনি ভালওবাসিত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পাবনা জেলা স্কুলের খোদবক্স নামক দপ্তরিকে সময়

সময় অর্থ সাহায্য করিতেন। তাহার ধর্ম বিশ্বাস উদার এবং সার্বজনীন ছিল। ব্রাহ্মধর্মে বাহ্যিক দীক্ষিত না হইলেও, তৎপ্রতি তাহার বিশেষ আস্থা ছিল এবং আজীবন নিজ গৃহে মাঘোৎসব করিতেন। হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক কৃত্রিমতা তাহার নিকট যেমন অসহ্য ছিল, ব্রাহ্মধর্মের সাম্প্রদায়িকতাও তিনি তদ্রূপ পছন্দ করিতেন না। সর্ব ধর্মের প্রতিই তিনি বিমুক্ত ভাবপোষণ করিতেন।

কেবলমাত্র রাজকার্যে তাহার জীবনের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল না। যাদবচন্দ্র সাহিত্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি বাংলায় (১) রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত (২) কুলশাস্ত্রদীপিকা এবং ইংরাজিতে (৩) Native Chiefs of India নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

সাধারণ অবস্থা ও প্রতিকূল ঘটনার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বীয় অধ্যবসায় ও সদুদ্দেশ্য লইয়া জীবন সংগ্রামে নিরত ব্যক্তিগণ কি প্রকারে জীবনে উন্নতি করিতে পারেন এবং কিরূপে ঈদৃশ মহাত্মা কর্তৃক পরে নিজ জন্মভূমির কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, ভারেঙ্গা নিবাসী যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের জীবনকাহিনী হইতে আমরা তাহাই শিক্ষা লাভ করি।

ঠাকুর শম্ভুচাঁদ ঃ

ইনি স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতা, অমানুষিক বিভূতি ও বাকসিদ্ধি প্রভৃতি গুণ প্রভাবে এবং গুরুসত্য ধর্মমত প্রচার দ্বারা পাবনা ও পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে অবতারকল্প সম্মান লাভ করেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তৎপ্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হয়েন। চাটমোহর থানার অন্তর্গত চিথলিয়া গ্রামে ১৭১০ শকে (১১৯৬ সাল) ১৫ আষাঢ় তারিখে শম্ভুচাঁদ মল্ল (ধীবর) বংশীয় যুগল কিশোর দাসের ঔরসে হররাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শুক্লপক্ষীয় শশীকলার ন্যায় যতই দিনদিন শম্ভুচন্দ্র বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, ততই তাহার মুখমণ্ডল ও হস্ত পদাদিতে নানারূপ অমানুষিক ঐশ্বর্য ব্যঞ্জক লক্ষ্মণাদি দেখিয়া জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের গৌরবানুভব করিতে থাকেন। শৈশবেই শম্ভুচাঁদের অসাধারণ ভগবদ্ভক্তি দর্শনে গ্রামবাসিগণ ও জ্যোতিষিগণের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশেষ আস্থাবান হইয়াছিলেন। যুগলকিশোরের কাশীনাথ ও শম্ভুনাথ নামে দুই পুত্র জন্মে। শম্ভুনাথ জগৎচন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হইলে পরে তাহার নাম শম্ভুচন্দ্র বা শম্ভুচাঁদ রূপে পরিণত হয় এবং সেই নামেই তিনি পরে সাধারণে পরিচিত হয়েন।

শম্ভুচাঁদ গ্রাম্য পাঠশালায় বর্ণমালাদি শিক্ষা করতঃ সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়াস পাইলে ধীরব জাতীয় বলিয়া কেহই তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে সম্মত হয়েন নাই। পরিশেষে জগদীশ বিদ্যালঙ্কার নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শম্ভুচন্দ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। অত্যল্পকাল মধ্যে সরলসাহিত্য, শ্রীমদ্ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তি রসাত্মক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শম্ভুচন্দ্র স্বীয় মেধাশক্তি প্রভাবে বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করেন।

জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত সিমুলনগ্রাম নিবাসী জগচ্চন্দ্র ঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ নীলাচল যাত্রাকালে স্বপ্নাদিষ্ট হয়েন যে, ভগবান জগন্নাথদেব "গুরুসত্য" ধর্ম প্রচারার্থ পাবনা জেলার অন্তর্গত চিথলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও জগচ্চন্দ্র তাহার দীক্ষাগুরু নিযুক্ত হইয়াছেন। এইরূপে জগচ্চন্দ্রের ভগবদ্দর্শন লাভ হইবে বুঝিয়া জগচ্চন্দ্র নানাস্থান পরিভ্রমণান্তর কালক্রমে চিথলিয়া গ্রামে উপনীত হইয়া শম্ভুচন্দ্রকে গুরুসত্য মন্ত্র প্রদানপূর্বক উক্ত ধর্মে দীক্ষিত করেন। পথিমধ্যে জগচ্চন্দ্র আত্রাই নদী গর্ভে বাঞ্ছারাম নামক জনৈক পাণ্ডুরোগ গ্রস্থ রোগীকে গুরুসত্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া রোগমুক্ত করায় উক্ত ধর্মের মহিমা ক্রমে বিস্তার লাভ করে। সর্বসাধারণ ও যুগলচন্দ্র হররাণী প্রভৃতির সাক্ষাতে জগচ্চন্দ্র প্রকাশ করেন যে, শম্ভুচন্দ্র সামান্য মানব নহে, ভগবানের অংশাবতাররূপে ধীবর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত করেন। তখন জগচ্চন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতি পরস্পর আলিঙ্গন করতঃ নৃত্য করিতে

লাগিলেন। ক্রমে বহুলোক পঙ্গপালের ন্যায় দেশ বিদেশ হইতে চিথলিয়ায় আগমন করিতে লাগিল এবং তিনিও তখন হইতে "ঠাকুর শম্ভুচাঁদ" নামে খ্যাত হইয়া উঠিলেন। তদবধি এখন পর্যন্ত তাহার বংশধরগণ ঠাকুর উপাধিতে আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন।

গুরুসত্য ধর্ম চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচালিত বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ। মহাপ্রভুর ধর্মে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে কিনা তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট উপদেশ নাই সেজন্য অনেকে ভ্রমে পতিত হয়েন। এই ধর্মে তাহাই সংশোধিত হইয়াছে। সংসার ত্যাগ এই ধর্মে নিষেধ। এতদ্ভিন্ন দুই ধর্মই এক। 'গুরু' অর্থে জগতীয় যাবৎ বস্তু অপেক্ষা গৌরবশালী অর্থাৎ গুরুসত্যে শব্দে সত্য সংকল্প অর্থাৎ একমাত্র সত্য দ্বারা যাঁহাকে পাওয়া যায়। মোটামুটি গুরুসত্য ভগবানের নাম মাত্র। গুরুসত্য নাম গ্রহণ, নিয়ত কীর্তন, স্মরণ জপাদি ব্যবহার এই ধর্মে আচরণীয়। এই ধর্মে দীক্ষিত হইতে হইলে আরও কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে হয়। সেই সেই নিয়ম প্রতিপালন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করতঃ এধর্মে দীক্ষিত হইতে হয়। ফলতঃ গুরুসত্য ধর্ম বৈষ্ণবধর্মের শাখা বা নামান্তর মাত্র।

জগচ্চন্দ্র ঠাকুর স্বীয় আসন্নকালে শিষ্য মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "হরিতে রতি গুরুসত্য ধর্মের মূলতত্ত্ব, ইন্দ্রিয় বিজয় তাহার মূল সাধন।" শম্ভুচাঁদকে বলিলেন, "এই দণ্ড কৌটাস্থিত মহদ্বস্তু এবং সাধনতন্ত্র নামক গ্রন্থ তুমি গ্রহণ কর।" ক্রমে যখন বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া আসিল, তখন 'আমি শম্ভুশরীরে লয় হইলাম, আমি শান্তিলাভ করিলাম শম্ভুনারায়ণ, শম্ভুনারায়ণ' বলিতে বলিতে শম্ভুচন্দ্রের ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া জগচ্চন্দ্রের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। সীমুলন হইতে বাটি প্রত্যাগত হইয়া শম্ভুচাঁদ মন্দির ও আসন নির্মাণপূর্বক গুরুসত্য ক্রমে উপাসনা ও সত্যধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই ধর্মমত 'কর্তাভজা' সম্প্রদায় নামক বৈষ্ণব ধর্মের শাখা ধর্মের অনুরূপ। কারণ উক্ত ধর্মেও 'গুরুসত্য' মন্ত্র প্রদান এবং শিষ্যগণ 'বরাতি' নামে খ্যাত হইয়া থাকে। *'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ১ম খণ্ড ১৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।*

শম্ভুচাঁদ মধ্যে মধ্যে ভক্তগণ সঙ্গে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে আশাসোটা আরাণীধ্বজপতাকা সহ অতি সমারোহে চতুর্দ্দশমৃদঙ্গ করতালাদি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহকারে সপ্তদশ সম্প্রদায় বিশিষ্ট সংকীর্তন দল লইয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তনের চেয়ে তাহার সংকীর্তন কোন অংশে হীন ছিল না। এই প্রকারে তিনি যখন যেখানে যাইতেন তথায় তাহার অসংখ্য শিষ্যগণ নানাবিধ উপচারে তাহার পূজা করিত।

দেখিতে দেখিতে শম্ভুচাঁদের বহু শিষ্য প্রশিষ্য জুটিয়া উঠিল। ক্রমে তিনি মন্ত্রদাতা গুরু হইয়া উঠিলেন। অচণ্ডাল ব্রাহ্মণ ও বহু মুসলমান পর্যন্ত তাহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া উঠিল। অসংখ্য অন্ধ, আতুর, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে তিনি রোগমুক্ত করিতে লাগিলেন। তাহার দণ্ডখানি মায়াদণ্ড স্বরূপ ; একবার মাত্র চালনে রোগী পীড়ার লঘুতা অনুভব করিতে লাগিল। নাস্তিকও তাহার গুণে মুগ্ধ হইত। ধুলি রোগিগণের সঞ্জীবনী ঔষধ ছিল। বাক্‌সিদ্ধি ও সর্বজ্ঞতা তাহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্র এবং সুদূর নেপাল, ভূটান, মণিপুরাদি অঞ্চলে তাহার অনেক ভক্তশ্রেণী দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

অনেকে তাহার সম্মানাদি দর্শনে ও শ্রবণে তৎপ্রতি শ্লেষবাক্যও প্রয়োগ করিতেন। পাবনা হইতে প্রকাশিত 'পাবনাদর্পনে' প্রকাশিত নিম্নলিখিত কবিতাংশে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় যথা—

"ভজরে মন গুরুসত্য কলিতে যার ঘোর মাহাত্ম্য
সকল ভুলে পাটনি জেলে
হয়েছে যার প্রেমে মত্ত
ভজরে মন গুরুসত্য।

কৃষ্ণ বিষ্ণু সব গিয়াছে, করাল দিলে পাটনির কাছে
বিরহিণী প্রাণে বাঁচে,
মদনের ঘোচে প্রভুত্ব
ভজরে মন গুরুসত্য।
পার করিতে ভবতরি, শম্ভু মাঝির আছে তরি,
হয়েছে পাটনি কাণ্ডারি,
দেখিয়ে দেয় প্রেমের তত্ত্ব,
ভজরে মন গুরুসত্য।"

নিরন্তর ধর্মোৎসবে পাপীর পাপমোচনে, রোগীর রোগশান্তি করিতে করিতে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়া যখন শম্ভুচাঁদ অন্তিমদশায় উপনীত হইলেন তখন স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সাধুচাঁদকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন আমি চলিলাম, সাধুচাঁদ আমার এই দণ্ড সাধনতন্ত্র নামক গ্রন্থ প্রভৃতি গ্রহণ কর, নিজ পুত্রগণকে যাবজ্জীবন ধর্মশিক্ষা দিবে। বয়ঃক্রমের শ্রেষ্ঠতা অনুসারে এই ধর্ম গদিতে, অধিকার জন্মিবে। ধর্মপ্রাণতায় যে জ্যেষ্ঠ তাহাকে আমি জ্যেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। ভক্তগণকে বলিলেন "এখন হইতে আমি আমার পুত্রে লীন থাকিব এবং বংশধরগণ ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শরীরে অবস্থান করিব কিন্তু যখন দেখিবে আমার বংশধরগণ কদাচারী হইয়াছে তখনই বুঝিবে আমি অন্য সাধু চরিত্রের বংশধরে সংক্রমিত হইয়াছি। *কাশীচন্দ্রতর্কবাগীশ প্রণীত হস্তলিখিত শম্ভুচরিতচন্দ্রিকা ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।*

১৭৮৩ শকের (১২৭৯ সাল) বৈশাখের শুক্ল একাদশীতে শম্ভুচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। তদীয় পত্নী ব্রজেশ্বরীও কতিপয় দিবস মধ্যে মানবলীলা সংবরণ করিলে উভয়কেই একটি গৃহে পাশাপাশি সমাধিস্থ করিয়া চিহ্ন স্বরূপ শিবলিঙ্গের ন্যায় দুইখণ্ড শ্বেত প্রস্তর তাহার উপর স্থাপন করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মের নিয়মানুসারে ত্রিসন্ধ্যা পবিত্র আচারবান পূজক দ্বারা পূজা সংকীর্তনাদি হইয়া থাকে। জগন্নাথক্ষেত্রের ন্যায় অন্নভোগাদি মহাপ্রসাদ বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। এখানে বিশেষ জাতিভেদ নাই সেজন্য জনৈক ভক্ত কবি লিখিয়াছেন—

"পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন শম্ভু পরশ রতন
উদয় হলেন শ্রীধাম চিথলিয়ায়।
দেখি একাকীর্ণ ছত্রিশ বর্ণ
অভিন্নেতে অন্ন খায়।
যেন পুণ্যতীর্থ পুরীক্ষেত্র
জগন্নাথ শম্ভুতে উদয়।"

অদ্যাপি ভক্তগণ চিথলিয়া গ্রাম উপস্থিত হইয়া তাহার মানসিক আদি প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমায় এখানে একটি বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়। বর্তমানে শম্ভুচাঁদের প্রপৌত্র সত্যালোচন ঠাকুর মহাশয় চিথলিয়ার মোহান্ত ; ভক্তগণ প্রদত্ত অর্থাদি প্রায় সমস্তই অতিথি সেবাদিতে ব্যয় হইয়া থাকে। ঠাকুর শম্ভুচাঁদ ত্যক্ত' সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর এবং তাহার পরবর্তীগণ ঐ স্টেটের সেবাইত স্বরূপে ঠাকুর ও মোহান্ত নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

পণ্ডিত নীলকমল গোস্বামী ও মাধবেন্দ্র দাস ভাগবৎভূষণ কর্তৃক 'শম্ভুলীলামৃত' নামক একখানি পদ্যে এবং কাশী তর্কবাগীশ কর্তৃক 'শম্ভুচরিত চন্দ্রিকা' নামে গদ্যে অন্য একখানি শম্ভুচাঁদের জীবন চরিত লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এই মহাপুরুষের একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত লিখিত ও মুদ্রিত হইয়া সাধারণে প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

সাধক ঃ

সাধক বা সাধুপুরুষ রূপে পাবনায় কেহ বিশেষ খ্যাত না হইলেও উধুনীয়া নিবাসী (ক) কৃষ্ণসুন্দর রায় মহাশয় তদীয় ভক্তিযোগপ্রভাবে সাধারণে প্রভুরায় বা রায়প্রভু নামে পরিচিত হইতেন। তাহার সম্বন্ধে বহু আলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রতি একাদশীতে হরিবাসর উপলক্ষে উধুনীয়ায় বহু লোক সমাগম হইত। হিন্দু মুসলমান কর্তৃক তিনি সমভাবে সম্মানিত হইতেন। মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কালে ব্রাহ্মণাদি পর্যন্ত অনেকে তদীয় চরণামৃত ও পদধুলি গ্রহণ করায় কেহ কেহ স্ব স্ব সমাজে আবদ্ধ থাকেন। তারাসের স্বর্গীয় বনমালি রায় বাহাদুরের তিনি শিক্ষাগুরু ছিলেন।

পাবনা নিবাসী বৈশ্যকুলোদ্ভব (খ) **কালাচাঁদ সাহা** ওরফে কৃষ্ণদাস বাবাজি পত্নীবিয়োগের পর বহুদিন বৃন্দাবাসী হইয়া গিরি গোবর্ধনে বাস করিতেন। তাহার ভজন সাধন গুণে অনেকে তৎপ্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। উপরোক্ত বনমালী রায় বাহাদুরের সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় ও সৌহার্দ্য ছিল।

তীর্থ বা পীঠস্থান—তীর্থ বা পীঠস্থানরূপে পাবনায় কোন স্থান সবিশেষ পরিচিত নহে ; কিন্তু এই জেলা এবং পার্শ্ববর্তী নানা স্থান হইতে রোগী, আর্ত ও বিপন্ন অনেকানেক হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী ও পুরুষ রোগের তাড়নায় এবং প্রাণের দায়ে দৈনিক ও বিশেষ বিশেষ তিথিতে জেলার নিম্নলিখিত স্থানসমূহে সমবেত হইয়া তথায় নানারূপ মানসিক ও পূজা প্রদানপূর্বক বিশ্বাসমূলে কেহ কেহ পূর্ণমনস্কাম হইয়া থাকে ও হইতেছে। এই সকল স্থানের উপাস্য দেবতা ও স্থান মাহাত্ম্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক বর্ণিত ও প্রচারিত হইলে এই ক্ষুদ্র জেলার এই সকল সুদূর পল্লীতে নানা স্থানে আরও অধিকতর লোকসমাগমে দেশের ইতরভদ্র সর্বসাধারণের অধিকতর ধর্মঅর্থাদি লাভের নানা সুযোগ ঘটিতে পারে। হিমাইতপুরে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে সৎসঙ্গ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবোলক্ষে এবং পাবনার উপকণ্ঠবর্তী রাধানগরে ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ৫৬ প্রহর এবং বর্তমানে ১৩৩২ সালের মাঘ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্যন্ত সহস্রাধিক প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তনোপলক্ষে বার্ষিক যে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে মফঃস্বলস্থ ও বিভিন্ন জেলা হইতে অনেক লোক সমাগম হইতেছে। এইরূপে নিম্নের স্থান কয়েকটির উপকারিতা ও মাহাত্ম্য সাধারণে প্রচারিত হইলে পুতসলিলা পদ্মা (গঙ্গা) ও যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) বিধৌত পাবনা জেলা নানা দিগ্দেশাগত সাধুমহাত্মাগণের পদধুলিতে পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

চিথলিয়া ঃ

ফরিদপুর পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত চিথলিয়া গ্রামে বার্ষিক দোল পূর্ণিমায় পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুরাদি বহু স্থান হইতে গুরুসত্য নামমাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া প্রায় দশ সহস্রাধিক হিন্দু মুসলমান নরনারী সমবেত হয়। ইহাদের মধ্য দর্শক ব্যতীত অনেকেই হিস্টিরিয়া, মৃগী, বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগীর সংখ্যাই অধিক ; এই সময়ে এখানে একটি বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়। অধুনা দেশে হাইড্রোপ্যাথী মতে যে নূতন চিকিৎসার সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে, তাহা যে আমাদের দেশে অতি পূর্ব হইতেই প্রচলিত আছে, তাহা এখানে সমাগত রোগীর ফলধূলি প্রসাদে আরোগ্যলাভ হইতে সূচিত হইতেছে। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে এই নিভৃত পল্লী হইতে প্রচারিত ধর্মমত অধুনাতন রেল স্টিমারে যাতায়াতে সুবিধার দিনে আরও বহু বিস্তৃত হইয়া পাবনা জেলার গৌরব বৃদ্ধি হইবে এবং অন্যান্য স্থানের দেবোত্তর সম্পত্তির মোহান্তের ন্যায় এথাকার মোহান্ত মহাশয়ের ও দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হইবে।

খাঁপুরা :

বেড়া পুলিশ স্টেশনের অধীন আত্রাই নদীর শাখা তীরে খাঁপুরা নামক প্রান্তে বহুদিন হইতে মহাকাল ভৈরবের পূজা প্রচলিত আছে। একখানি প্রতিমার কয়েকটি মৃণ্ময় মূর্তি মধ্যে মধ্যস্থলে মস্তকবিহীন (নিদ্রুষ্কা) যার উপরে শ্বেতবর্ণ বায়ুমূর্তির উপর রক্তবর্ণ দ্বিভূজ, দ্বিনেত্র, লোলজিহ্বা ও জটাভারযুক্ত বাম হস্তে পানপাত্র ও দক্ষিণ হস্তে নাভি পদ্ম হইতে নির্গত নাড়ী সমন্বিত মহাকাল ভৈরব মূর্তি বিরাজিত আছেন। ইহার দক্ষিণে দণ্ডায়মান পঞ্চানন শিবমূর্তি ও সিংহের উপর দণ্ডায়মানা চতুর্ভূজা কালিকামূর্তি ; বামে হরিৎবর্ণা কমলাভৈরবী নামে পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা ও সবুজ বর্ণের উন্মত্ত ভৈরব মূর্তিদ্বয় বিরাজিত। পৃথক আসনে সিংহের উপর উপবিষ্টা রণযক্ষিণী-মূর্তি বিরাজিতা আছেন।

মহাকাল ভৈরবের পূজা দিলে ও পাটা বা তক্তি মানসিক প্রদান করিলে বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা নারী পুত্রবতী হয়, এমত জনপ্রবাদ ও বিশ্বাস থাকায় বহুদিন হইতে প্রতি শনি মঙ্গলবারে বহু হিন্দু-মুসলমান নরনারী সন্তান কামনায় এখানে উপস্থিত হইয়া পূজা ও পাঁটা, মহিষ, কবুতরাদি নানারূপ মানসিক প্রদান করিয়া থাকে। এখানে একটি নিম্ব বৃক্ষতলে নবজাত শিশুর শিরমুণ্ডন পূর্বক কেশাদি প্রদান করে। বাসন্তী অষ্টমী এই প্রতিমার সংস্কার হয়। দামোর তন্ত্রোক্ত মতে দৈনিক পূজা হয়। প্রকাশ রতন চক্রবর্তী নামক জনৈক তান্ত্রিক সাধক কর্তৃক এই মূর্তি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ; ৫/৭ পুরুষ হইল তাহার দেহান্তর হইয়াছে। অধুনা তদীয় ভাগিনেয়ের ভাগিনেয় বংশীয় কদিমস্বরূপপুর নিবাসী রেবতীমোহন ভট্টাচার্যদিগর এখানকার মালিক ; মাহিনাভোগী উড়িয়্যা দেশিয় পূজক ব্রাহ্মণের উপর দৈনিক সেবার ভার ন্যস্ত।

যাইটগাছা :

আটঘরিয়া পুলিশ স্টেশনের অন্তঃপাতী যাইটগাছা গ্রামে নমঃশূদ্র জনৈক উৎসবচন্দ্র সরদারের বাটিতে বহু দিন হইতে মৃণ্ময়ী কালিকাদেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় দেবীর পূজাবসানে ভাবাবেশে সমাগত লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বলিবার প্রথা বর্তমান আছে। এতদুপলক্ষে প্রতি শনি মঙ্গলবারে এখানে বহুদূর দূরান্তর হইতে হিন্দু-মুসলমান নরনারী সমবেত হয়। ঈদৃশ ভাবাবেশে সমাগত লোকের বিষয় বলিবার প্রথা বার আসা নামে খ্যাত এবং যাঁহার বার আসে, তিনি সচরাচর বাঙ্গেলী নামে খ্যাত। পূর্বে উপরোক্ত সরকার মহাশয় পূজান্তে মন্দির বারান্দায় উপবিষ্ট হইয়া উপস্থিত লোককে আহ্বান করিয়া, কখনও জিজ্ঞাসিত হইয়া, কখনও বা অযাচিত হইয়া, তাহাদের নানারূপ ব্যাধি পীড়ার কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করিয়া দিয়া পূজার নির্মাল্য ও ধূলি প্রদান করিতেন। এক্ষণে তদীয় বংশধরগণের উপরোক্তরূপ বার আসিয়া থাকে এবং তাহারা উক্ত প্রকারে লোকের নানারূপ ব্যাধি পীড়ার চিকিৎসার উপায় নির্ধারণ করিয়া থাকে। অধুনা কয়েকবৎসর হইল, ইহাদের পুরোহিত বংশও নিজ বাটিতে পৃথক কালীমূর্তি স্থাপনপূর্বক বার আসার প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন। তথায়ও সাপ্তাহিক বহুলোক সমাগম হইতেছে। যাহা হউক, পাবনা জেলার যাইটগাছার বার ছয় সাত পুরুষ হইতে প্রচলিত আছে এবং অনেকে বিশ্বাসমূলে তথায় রোগাদি প্রতিকার কামনায় প্রতি শনি মঙ্গলবারে আগমন করিয়া নানারূপ সুফল লাভ করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক স্থানে যে সমস্ত কালীবাড়ি ও সাধু-মোহান্তের আড্ডা এবং পীর ফকির ও দরবেশের আস্তানায় অনেকে ব্যাধিপীড়ার প্রতিকারার্থ ও পুত্রকন্যাদির মঙ্গলকামনায় নানারূপ মানসিক ও পূজাদি প্রদান করিয়া থাকে, তাহাদের বিবরণ প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

অতিথিপরায়ণতা এদেশের প্রত্যেক পল্লীবাসীর গার্হস্থ্য ধর্ম মধ্যে পরিগণিত হয়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মুষ্টিমেয় ডাকবাঙলা ব্যতীত সাধারণ ধর্মশালাদি এদেশে বর্তমান নাই। এই জেলার

পল্লীপ্রান্তে অনেকানেক অতিথিপরায়ণ সদাশয় ও আদর্শ চরিত্র ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করতঃ দেশের লোকের সেবা করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাহাদের জীবনকাহিনী সাধারণে প্রকাশিত হইলে লোকের অনেক শিক্ষার উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে।? দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এতাদৃশ মহাত্মাগণের জীবনের ঘটনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য নিম্নে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির তালিকা প্রদত্ত হইল যথা—(১) জয়নাথ দাস—বেড়া, (২) অনুপচন্দ্র কুণ্ডু—গোবিন্দপুর (৩) রামকৃষ্ণ সরকার—ধানুয়াঘাট, (৪) গুপীনাথ গুন—ট্যাঙ্গাসিয়া, (৫) সুবলচন্দ্র ঘোষ—বাল্লাপাড়া, (৬) হারু সরকার—ভাদাস, (৭) হারানচন্দ্র সাহা— কাওয়াখোলা, (৮) যোগেন্দ্রনাথ সাহা চৌধুরী—সদিয়া চাঁদপুর।

প্রসিদ্ধ কথক ঃ

প্রসিদ্ধ কথক মধ্যে নাকাসিয়া নিবাসী প্রসন্ন কুমার শিরোমণি মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহুদিন কলিকাতা নারিকেলডাঙায় বাস করিয়া পাবনা ও বঙ্গের বহু স্থানে জনৈক প্রসিদ্ধ কথক ও সুগায়করূপে বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। বল্লভপুর নিবাসী রামসুন্দর গোস্বামী মহাশয় প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন; অধুনা তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পাবনা নিবাসী মুরারীমোহন গোস্বামী মহাশয়ও সুপ্রসিদ্ধ ভাগবৎ পাঠক বলিয়া সুধী সমাজে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কথক বর্তমান আছেন।

সংবাদপত্র সেবী ঃ

সংবাদপত্র সেবীর মধ্যে ভারেঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয় বর্তমানে Servant নামক ইংরাজি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। বনগ্রাম নিবাসী কৈলাশচন্দ্র সরকার মহাশয় বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত Telegraph নামক ইংরাজি সাপ্তাহিকের সম্পাদক ও অনেক পত্রিকার সংবাদদাতা। পাবনার স্থানীয় পত্রিকাগুলির পরিচালকগণের উদ্যম প্রশংসনীয়।

প্রসিদ্ধ বক্তা ঃ

প্রসিদ্ধ বক্তা রূপে সিরাজগঞ্জের—ইসমাইল সিরাজী সাহেবের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দারিদ্র্য নিবন্ধন স্কুল কলেজের উচ্চ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইলেও তিনি স্বীয় উদ্যমে ও যত্নে গৃহে নানাবিধ গ্রন্থাদি পাঠে মুসলমান সমাজে জনৈক প্রসিদ্ধ কবি, বাগ্মী ও সুলেখকরূপে পরিচিত হইয়াছেন। বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি বঙ্গের নানা স্থান পর্যটন করিয়াছেন। ১৯০৫ অব্দে বঙ্গভঙ্গের পর বিগত স্বদেশী আন্দোলন সময়ে তিনি অনেক স্থলে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন এবং 'অনলপ্রবাহ' নামক যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাহা আইনত রাজ বিদ্রোহাত্মক বিবেচিত হওয়ায় তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। বিগত তুরুস্ক ইটালি যুদ্ধকালে সিরাজি সাহেব তুরস্ক গমন করিয়া মহাবীর আনোয়ার পাশার সহিত পরিচিত ও স্বীয় কার্যকুশলতা জন্য মহামান্য তুরুস্ক সুলতান কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েন। ছাত্র সমাজে বন্ধু, সৎকার্যে উৎসাহদাতা, স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার ন্যায় অতি বিরল। বক্তৃতা দ্বারা তিনি স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ উপায়ও করিয়া থাকেন।

বর্তমানে ইহার বয়স মাত্র ৪৭ বৎসর। সদালাপী ও প্রিয়ভাষী সিরাজী সাহেবের বাক্যালাপে সাম্প্রদায়িকতা ও আত্মপ্রশংসাদি যে সকল সাধারণ দোষ পরিলক্ষিত হয়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে ও অভিজ্ঞতার ফলে কালে তাহা বিদূরিত হইলে, ইনি সর্বজনপ্রিয় নেতৃত্ব লাভে সমর্থ হইবেন এরূপ আশা করা যায়।

সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঃ

১) **নীলরতন রায়**—নিবাস পোতাজিয়া, কায়স্থ, সুগায়ক ও গীতরচয়িতা বলিয়া পরিচিত।

তৎপ্রণীত (ক) মেঘনাদবধ, (খ) মায়া-সীতাবধ, (গ) রামলীলা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তৎপুত্র বিধুরঞ্জন রায় প্রণীত (১) প্রহ্লাদচরিত, (২) রাবণবধ, (৩) প্রমিলা বিলাপ, (৪) প্রভাস মিলন, (৫) রত্নাকর উদ্ধার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ২) **ব্রজকিশোর দাস**—প্রকাশ্য ব্রজদাস, চৌকীবাড়ি বৈষ্ণব। প্রায় ৩৫/৩৬ বৎসর কাল ইহার যাত্রাভিনয়ের প্রসিদ্ধ দল বঙ্গের নানাস্থানে সুযশ অর্জন করিয়াছে। ৩) **মথুরানাথ কর্মকার**—কান্ধাপাড়া—ইহারও যাত্রাভিনয়ের দল ছিল। ৪) **অটলবিহারী সাহা**—ধুকুরিয়াবেড়া—১৫/১৬ উর্ধ্বকাল ইহার যাত্রাভিনয়ের দল 'বিজয়বসন্ত' প্রভৃতি পালা গান করিয়া দেশে বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

পাবনা নিবাসী **ভোলানাথ অধিকারী** মহাশয় প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের তেতাই গান তৎপ্রবর্তিত। তদীয় ভাগিনেয় **শীতাংশু জ্যোতি মজুমদার** প্রকাশ্য বকু বাবুও জনৈক সুগায়ক ; ইহার গানের অনেকগুলি গ্রামফোনের রেকর্ডরূপে গৃহীত হইয়াছে। পাবনা নিবাসী হরিপ্রসাদ রায়মহাশয় প্রসিদ্ধ কালওয়াত ছিলেন ; পুকুরপারের শ্রীমাখনলাল ভট্টাচার্য মহাশয়ও জনৈক কালওয়াত ; স্কুলের অখিলচন্দ্র পাকড়াশি মহাশয় বর্তমানে জেলা মধ্যে জনৈক গায়ক এবং বিখ্যাত পাখোয়াজ বাদক বলিয়া পরিচিত।

প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া মধ্যে বর্তমানে (ক) রামকমল ভট্টাচার্য, (পুকুরপার) (খ) গোপালচন্দ্র অধিকারী (দৌলতপুর), (গ) গোপালচন্দ্র পাল ও পোপালচন্দ্র অধিকারী (তেথুলিয়া), (ঘ) কানাই গুহ (সাগরকান্দি), (ঙ) যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (নয়াবাড়ি), (চ) কেদারনাথ মিস্তিরি (জগন্নাথপুর), (ছ) দুর্গাচরণ ঘোষ (পাবনা) প্রভৃতির ন্যায় উল্লেখযোগ্য।

কবিদার ঃ

কবিদার মধ্যে সাগরকান্দি নিবাসী ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় পাবনার বিখ্যাত কবিগায়ক ছিলেন, তদীয় পুত্র ও পৌত্রগণ এখনও কবি গান করেন। বরখাপুরে নিমাই দত্ত নামে জনৈক কবিদার ছিলেন। পাবনার রাধানাথ পাল এবং পারকোলার নমঃশূদ্র জাতীয় বড় হরি নামে কবিদারগণ, করঞ্জা নিবাসী উমাচরণ চৌধুরী ও নীলকৃষ্ণ দাস এবং যাইটগাছার ঈশ্বরচন্দ্র ভূইত প্রভৃতি অনেকানেক পল্লীবাসী কবি, হোলি পাঁচালী গানে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মনসামঙ্গল, রামমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল প্রভৃতি গীতাভিনয়েও অনেক হিন্দু এবং মুসলমানেরও কেহ কেহ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কবিদারগণের সহিত অনেক স্ত্রীলোক গান করিত এবং এখনও তাড়াসের ঝুলন সময়ে স্ত্রীলোক কবি গান গাইয়া থাকে।

পাবনা জেলায় প্রচলিত গান ঃ

১) **যাত্রাগান**—পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে রচিত এবং গ্রামের দশজনে মিলিত হইয়া সাধারণত সখের দল সৃষ্টি করতঃ গীত। ২) ভাসাণযাত্রা —সাধারণত শরৎ ও শীতকালে মুসলমানগণের অনেকে হিন্দু ও মুসলমানের শাস্ত্রীয় কোন ঘটনাবলম্বনে পাঁচজনে মিলিত হইয়া ভাসানযাত্রা গান করে। সচরাচর মনসার ভাসাণ গানই অধিক প্রচলিত। ৩) **জারি**—মুসলমান গৃহস্থেরা কোন আকস্মিক কিংবা কৌতুকাবহ ঘটনাদি অবলম্বনে জারিগান গাইয়া থাকে। প্রত্যুৎপন্নমতি সহকার আসরে বসিয়াই দলপতি বা বয়াতিগণ এই সকল গানের অধিকাংশ রচনা করে। দুই দলে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলে এই গান অনেক সময় অশ্রাব্য হইয়া উঠে। ৪) **কবি ও হোলী**—ইহাও জারির ন্যায় অনেক সময় উপস্থিত বুদ্ধি সহকারে আসরে রচিত হয়। কবি বারমাস, হোলী কেবলমাত্র দোলোৎসব সময়ে অধিক শুনিতে পাওয়া যায়। ৫) **কীর্তন ও সংকীর্তন**—মনোহর সই কীর্তন ও পদাবলী রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক এবং সংকীর্তন সাধারণত হরিলুট কিংবা নগর সংকীর্তন সময়ে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভৃতির গুণাবলী বর্ণনায় গীত হয়। ৬) **ধুয়া**—ইহাও জারির ন্যায় সাময়িক ও আকস্মিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ৭) **জাগ**—পৌষ মাঘ মাসে পল্লী বালক কর্তৃক গৃহস্থের বাড়িতে গীত।

ইহা সাধারণত মানিকপীরের গান নামে খ্যাত। **৮) বারাসা**—কৃষকগণ ক্ষেতে কাজ করিতে করিতে শ্রমোপনোদন জন্য এই গান করে। **৯) সারি**—নৌকা বাইজ কালে মাঝিরা তালে তালে সারি গান করে। দালানের ছাদ পিঠিবার সময়েও সারি গান হয়। পোতাজিয়ায় বিজয় দশমী দিনে সুসজ্জিত পান্‌সি নৌকার বাইজ ও সারি গানের বিশেষ ধুম আছে। সারি গানের একটি নমুনা—

"উমা ধনকে বিদায় দিয়ে কি লয়ে যাব গৃহে ;
সোনার কমল ভাসাইলাম জলেতে।
দশ দিন পুজলাম মায়কে বিল্ব জবা দিয়ে,
আজ বিজয় দশমী মায়ে ভাসাইলাম জলেতে।
ভাটান বাঁকে দিলাম জবা পুষ্প উজান ধায়।
আমি বিনা অভয় চরণ কেবা যেন পায়।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—সভা সমিতি ও প্রদর্শনী

প্রাদেশিক সম্মিলন—১৯০৭ অব্দে কবি সম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাবনায় এবং ১৯২৪ অব্দে মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। **উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন**—১৯১৪ অব্দে পাবনায় মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর সপ্তম অধিবেশন হয়। **জেলা সমিতি**—১৯০৮ অব্দে স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাবনায় জেলা সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। **কংগ্রেস কমিটি**—পাবনায় ও সিরাজগঞ্জে উভয় স্থানে এবং পল্লীর অনেক স্থানে কংগ্রেস কমিটির সভা সমিতির অস্তিত্ব বর্তমান ছিল ও আছে। এই সকল সমিতি হইতে চরকা প্রচার ও বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি নানারূপ দেশ হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল, প্রকৃত কর্মীর অভাবে এই সকল কেবলমাত্র নামে পর্যবসিত হইয়াছে। **হরিসভা**—পূর্বে পাবনা, চাটমোহরাদি স্থানে সাধারণত শীত কালে হরিসভা, ধর্ম সভাদির নানা অনুষ্ঠান হইত এক্ষণে তৎসমুদায় আর দেখা যায় না। **হিতসাধন মণ্ডলী**—পাবনায় শিতলাই জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে হিতসাধন মণ্ডলী নামে যে একটি সংগঠন বর্তমান আছে তাহা হইতে দরিদ্র রোগীর সেবা এবং বিনা খরচায় ইনজেকশন দিবার ব্যবস্থা আছে। **সাহিত্যসভা**—পাবনা কিশোরীমোহন স্টুডেন্ট লাইব্রেরীর উদ্যোগে পাবনায় বর্তমানে কিয়দ্দিন হইল একটি সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান চলিতেছে। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মিলনীর সময় তথায় জমায়েত উল উলেমা নামে এবং পাবনায় কয়েকবার মুসলমান সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী—১৮৯২/৯৩ অব্দে প্রথম পাবনায় টাউন হলে সর্বসাধারণের উদ্যোগে যে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়, তাহা বসন্ত মেলা নামে পরিচিত হইয়াছিল। তৎপর পাবনায় কয়েকবার এবং বেড়াতে ঐরূপ প্রদর্শনী খোলা হয়। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মিলনীর সহিতও একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ১৯২৩/২৪/২৫ অব্দে পাবনায় আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে পাবনার কৃষি ও শিল্প দ্রব্যাদির জন্যও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। **শিশুপ্রদর্শনী**—১৯২৪/২৫ অব্দ হইতে কয়েকবার পাবনায় শিশু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—পাবনাবাসী বিদেশে

হরিপুরের মৈত্র, হাটুরিয়ার রায়, তাঁতিবন্দের লাহিড়ী উপাধিক বহু ব্রাহ্মণ পরিবার রঙপুরে, ক্ষেতুপাড়ার রায়, লাহিড়ী প্রভৃতি ভদ্রবংশীয় অনেকে দিনাজপুর ও জলপাইগুড়িতে, এবং ভারেঙ্গা, হাটুরিয়া ও নাকালিয়ার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি কুচবিহারে সবিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। এই জেলার অনেকে উকিল মোক্তাররূপে নাটোর, রাজশাহীতে বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছেন। পাবনার তন্তুবায় সমাজ নাটোর, নওগাঁও ও রামপুর বোয়ালিয়ার ব্যবসায়ীরূপে তথাকার অনেকে উন্নতিসাধন করিয়াছেন। নাটোর জমিদারির সৃষ্টিকাল হইতে এখন পর্যন্ত এই জেলার অনেকেই রাজশাহী জেলার অনেকানেক ভূস্বামীগণের সম্পত্তি পরিচালন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং এখনও আছেন। নাকালিয়া নিবাসী (অধুনা কলিকাতা প্রবাসী) হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় রাজশাহীর লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবিরাজ ছিলেন। এই জেলার অনেকানেক ব্যবসায়ী মহাজন বাণিজ্য উপলক্ষে রঙ্পুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার প্রধান প্রধান বাজার ও বন্দরাদিতে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা বালিগঞ্জ প্রবাসী স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় ও তদীয় ভাতৃবৃন্দ বঙ্গের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক ও ব্যবহারাজীবী রূপে পাবনার নাম গৌরব মণ্ডিত করিয়াছেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বর্তমানে বঙ্গের জনৈক প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ও প্রধান জননায়ক। তাঁতিবন্দ নিবাসী প্রীতিভাজন নগেন্দ্রমোহন চৌধুরী কলিকাতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

বঙ্গের বাহিরে পাবনা জেলার প্রথিতনামা অধিবাসিগণ মধ্যে আগ্রা প্রবাসী **নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী** (১৮৪৩—১৯১৩) মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার পিতার নাম গৌরীকান্ত চক্রবর্তী, নিবাস পাবনা সালগারিয়া। বাল্যে পাবনায় শিক্ষালাভ করতঃ ক্রমে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে L.M.S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সরকারি ডাক্তার নিযুক্ত হয়েন। ইহার বিস্তৃত জীবনী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙালি" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবৃত আছে। তাহা হইতে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইল।

নবীনবাবু প্রথমে নৈনিতাল, পরে বুলন্দর শহর, তথা হইতে ১৮৭০ অব্দে মথুরায় যান। ইহার ৫ বৎসর পর আগ্রা মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ২৮ বৎসর কাল প্রশংসার সহিত কার্য করিয়া ১৯০৩ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন। "সৌজন্য, আতিথেয়তা ও চরিত্রবলে তিনি যে কেবল স্থানীয় অধিবাসী ও প্রবাসী বাঙ্গালিদিগের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন, তাহাই নহে ... তাহার চরিত্রের সুনাম আগ্রার সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র প্রদেশে এমন কি, রাজপুতানা, ভূপাল, রামপুর প্রভৃতি স্থানে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। জয়পুরের মহারাজা, ঢোলপুরের রাণা, ভূপালের বেগম, আভাগড়ের রাজাপ্রমুখ অনেকেই তাহার চিকিৎসাধীন হইতেন। ...গবর্নমেন্ট তাহার দরিদ্রসেবা ও সুচিকিৎসার গুণে আকৃষ্ট হইয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন" এবং "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। "Principle and Practice of Medicine নামক একখানি গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া তিনি তাহা বিবিধ ভাষায় প্রকাশ করেন। আগ্রা বঙ্গসাহিত্য সমিতি চিরদিন তাহার সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বহু বর্ষ পর্যন্ত উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন।"

মহিমচন্দ্র জোয়াদ্দার (১৮৩৫—১৯১১) মহাশয় পাবনা জেলার প্রবাসী মধ্যে বৃন্দাবন ও গোয়ালিয়রে সবিশেষ পরিচিত। তিনি সুজানগর পুলিশ স্টেশনের অধীন খলিলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা শিবনারায়ণ গুহ জোয়াদ্দার বৃন্দাবনে সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর মন্দির ও তথাকার জমিদারির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। মহিমবাবু ১৪ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে আগমন করেন। "সিপাহী বিদ্রোহের দুই বৎসর পূর্বে তিনি এখানে লালাবাবুর সদর কাছারির পেসকার নিযুক্ত হন। ... বৃন্দাবন লুণ্ঠন নিবারণার্থে মথুরার ম্যাজিস্ট্রেটকে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

১৮৬১ অব্দে বেরেলি সেন্ট্রাল জেলের দারোগার পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৩ অব্দে লালাবাবুর অনুপসহর কাছারির তহশীলদার নিযুক্ত হন। প্রায় ২৫ বৎসর অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্টেটের আয় বৃদ্ধি করেন। ...মহারাজা সিন্ধিয়া তাহাকে মোরারের তহশীলদার ও পরে Cantonment Magistrate পদ প্রদান করেন। তাহার কার্যদক্ষতা দেখিয়া মহারাজা তাহার উত্তরোত্তর পদ বৃদ্ধি করিয়া নায়েব সুবা (Asst. Dis. Collector)... (পরে) সুবা (Dis. Mag. and Collector) এবং শেষে Director of Land-records করিয়া দেন। ১৯১০ অব্দে তিনি গোয়ালিয়র রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাহার পুরাতন কর্মস্থান বৃন্দাবনে গিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।" *"বঙ্গের বাহিরে বাঙালি" ৫১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।* এখনও মহিমবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র হরেন্দ্রনাথ জোয়াদ্দার মহাশয় গোয়ালিয়ারে ইঞ্জিনিয়র পদে কাজ করিতেছেন।

যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৫৬—১৯২৩) মহাশয় সিরাজগঞ্জের পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত তেথুলিয়া নামক একটি পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১২ বৎসর বয়সে মৈমনসিংহ উচ্চ শিক্ষার্থ গমন করেন। তথা হইতে ছাত্রবৃত্তি লাভ করতঃ ক্রমশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার সিটি কলেজের গণিতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তথা হইতে ১৮৮৭ অব্দে তিনি আলীগড় কলেজে গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া যান এবং ২৮ বৎসর কাল তথায় শিক্ষাদান কার্যে লিপ্ত থাকিয়া প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলা বর্ণপরিচয়ের ন্যায় যাদববাবু প্রণীত পাটিগণিত ভারতের সর্বত্র নানাভাষায় প্রচলিত ও পরিচিত। আলীগড় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সিরাজগঞ্জ ধানবাধি নামক পল্লীতে একটি বাসস্থান নির্মাণ করতঃ তথায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন ; তিনি কিছুদিন সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত ছিলেন। গবর্নমেন্ট তাহার গুণে তাহাকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ ও শৈশবে তথায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া যাহারা কর্ম জীবনে সবিশেষ উন্নতিলাভ ও পাবনার সংস্রব একরূপ ত্যাগ করতঃ অন্যত্র স্থায়ী হইয়াছেন, তন্মধ্যে পাকুরিয়ার **উপেন্দ্রলাল মজুমদার** এবং পাবনা নিবাসী **প্রাণকৃষ্ণ আচার্য** মহাশয়দ্বয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্রবাবু ভারতের নানা প্রদেশে একাউন্টেন্ট পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অবসর গ্রহণান্তর কলিকাতায় স্থায়ী হইয়াছেন। প্রাণকৃষ্ণ বাবুও কলিকাতায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক, এক্ষণে তথায় স্থায়ী হইয়াছেন। উভয়েই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অধুনা জীবিত, ইহাদের উভয়ের বাল্য জীবনে সাধারণের অনেক শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় বিষয় নিহিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাবনা জেলার পোতাজিয়া নিবাসী ঈশানচন্দ্র রায়, মালঞ্চি নিবাসী মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং ভারেঙ্গা নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সুদূর বারাণসী ক্ষেত্রে চিকিৎসক রূপে বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছেন। পাকুরিয়া নিবাসী মজুমদার পরিবারস্থ জনৈক রামরতন মজুমদার ও তদীয় পুত্রগণ ভাগলপুরে সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। নাকালিয়া নিবাসী চক্রবর্তী পরিবারস্থ জনৈক চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও তদীয় পুত্রগণ দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদে ইঞ্জিনিয়ার ও কনস্ট্রাক্টর রূপে এবং উথুলি অঞ্চলের মুন্সি উপাধিক জনৈক ব্রাহ্মণ পরিবার ব্রহ্মদেশের পেগুতে কনট্রাক্টর ও প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবী এবং তাঁতিবন্দের শ্রদ্ধেয় শিশিরচন্দ্র লাহিড়ীমহাশয় হেনজাদায় এডভোকেট, করঞ্জা ও নগরবাড়ির অনেকে গৌহাটি ও তেজপুরে নানারূপে বিশেষ সুপরিচিত হইয়াছেন। ভবানীপুর নিবাসী স্বর্গীয় তারিণীচরণ সরকার মহাশয় বেহার প্রদেশস্থ সাহাবাদ জেলার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ; তিনি ডিহরী অঞ্চলে অনেক ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গের বাহিরে অনেকানেক শিক্ষিত পাবনাবাসী হিন্দু ও মুসলমান উকিল মোক্তারাদি রূপে স্বকীয় উন্নতিসহ পাবনার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এইরূপে যিনি দেশে বিদেশে যেখানেই যে অবস্থায় থাকুন 'জননী জন্মভূমিশ্চ সর্গাদপি গরীয়সী' জ্ঞানে সকলেরই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধি কামনায় বহুধা প্রধাবিত হয়, ইহাই ভগবানের নিকট একান্ত প্রার্থনা।

[চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত]

পাবনা জেলার ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড

পাবনা জেলার ইতিহাস।



পঞ্চম খণ্ড।



শ্রীরাধারমণ সাহা বি-এল

প্রণীত ও প্রকাশিত।



পাবনা।

(১৩৩৩)



পাবনা সরস্বতী প্রেসে
শ্রীগোপীকৃষ্ণ বসাক কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ--- ১৩৩৩---১০০০।

মূল্য---দেড় টাকা মাত্র

অবতরণিকা

প্রধান প্রধান পল্লীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত পাবনা জেলার ইতিহাস পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথম অধ্যায়ে সদর এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীনস্থ কতকগুলি গ্রামের স্থূল বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। পাবনা সদর স্টেশনের অধিবাসী হইলেও মফঃস্বলের অনেকানেক গ্রামে যথাসাধ্য ঘুরিয়া তৎ তৎ স্থানের বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি। সদর অপেক্ষা সিরাজগঞ্জের অধীনস্থ অনেক পল্লীতে স্বয়ং যাইতে সমর্থ হই নাই। অনেক সময় স্থানীয় লোকের নিকট পত্র লিখিয়া যথা সময়ে বা একেবারেই কোন উত্তর পাই নাই ; তজ্জন্য পাবনা সদরের ন্যায় সিরাজগঞ্জ মহকুমার গ্রামসমূহের বিস্তৃত বিবরণাদি প্রদানে অক্ষম হইয়াছি। যে সকল গ্রাম মদীয় ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রধান প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও অনেকানেক পল্লীর উল্লেখযোগ্য বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ অসন্তুষ্ট না হইয়া অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রামের উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ ঘটনাদির বিবরণ আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।

পাবনা ও সিরাজগঞ্জ উভয় স্থানের বিবরণ কথঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। সিরাজগঞ্জের বিবরণ প্রসঙ্গে অনেক বিষয় ইংরাজিতে লিখিত হইল। বিস্তারিত বিধায় তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না। গ্রাম বিশেষে প্রচলিত ছড়া বা জনশ্রুতি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আরও এরূপ অনেক কিম্বদন্তী স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। ইহাতে স্থান এবং ঘটনা বিশেষের পূর্ব বিবরণ অনেক নিহিত রহিয়াছে। গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমবেত উদ্যোগে এরূপ প্রচলিত জনপ্রবাদসমূহ সংগৃহীত হইলে জেলার অনেক প্রাচীন তথ্য অবগত হওয়া যাইবে এবং তাহা জেলার ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশের সহায়তা করিবে।

সমগ্র পুস্তকের এই খণ্ড মফঃস্বল প্রেসের যত্নে পাঁচ মাস মধ্যে মুদ্রিত হইল। চেষ্টা করিলে মফঃস্বলেও পুস্তক ছাপাকার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে এবং পাবনার মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনকারী শিল্পীগণের কৃতকার্যের পরিচয় প্রদান উদ্দেশ্যে পাবনা জেলার ইতিহাস পাবনাতেই ছয়টি প্রেসে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়া সুবিধা অসুবিধা উভয়ই ভোগ করিতে হইল। মফঃস্বলের মুদ্রাঙ্কণ কার্য কিরূপ হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও মদীয় অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে, সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক পুস্তকের এই ত্রুটি মার্জনা করিবেন। বর্ণাশুদ্ধি ব্যতীত স্থানে স্থানে যে সকল বিশেষ দোষ, যথা—আটঘরিয়া হইতে প্রায় ১ মাইল দক্ষিণে স্থলে, "উত্তরে" (৪৩ পৃষ্ঠা) "সাহাপুর" স্থলে পাকুরিয়া গ্রাম লস্করপুর পরগণার অন্তর্গত (৩৯ পৃষ্ঠা) প্রভৃতি যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয়ও মদীয় স্থানীয় অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ; এরূপ দোষাদি জন্য পাঠকবর্গ সমীপে আমি ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

গ্রামের ভৌগোলিক বিবরণ জন্য প্রসিদ্ধ স্থান বা পুলিশ স্টেশন হইতে তাহার দূরত্ব ও অবস্থান এবং প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণসহ স্থানীয় অধিবাসী, হাটবাজার ও প্রসিদ্ধ ঘটনাদির যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। স্থূল বিশেষে ভ্রম প্রমাদ ঘটে নাই এমত বলা যায় না। তজ্জন্য জেলাবাসী পাঠকবর্গ সমীপে বিনীত নিবেদন এই সকল গ্রাম্য বিবরণাদিতে কোন প্রকার ভ্রমাদি থাকিলে, তাহা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে লিখিয়া জানাইলে, তৎসমুদয় সাদরে ও কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত হইবে এবং বিশেষ উপকৃত ও বাধিত হইব ; নিবেদন ইতি।

পাবনা, কালাচাঁদপাড়া। — বিনীত নিবেদন—

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ সাল। — শ্রীরাধারমণ সাহা

উৎসর্গ পত্র।

জেলার

দেশীয় ও বিদেশীয়,

হিন্দু ও মুসলমান

অধিবাসিগণের

করকমলে

পাবনা জেলার ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড

সাদরে অর্পিত

হইল।

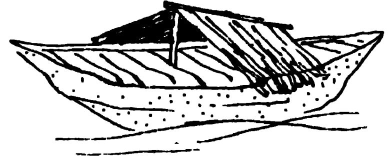
১৩৩৩

বিনীত—

গ্রন্থকার

প্রথম অধ্যায়

পাবনা সদর



প্রথম পরিচ্ছেদ—পাবনা

পাবনা ঃ

বর্তমান পাবনা টাউন ২৪° উত্তর অক্ষরেখা ও ৮৯° পূর্ব দ্রাঘিমার কলিকাতা হইতে পূর্ববঙ্গ রেলপথের ১৩৮ মাইল দূরে পদ্মাতীরে পাক্‌সি এবং ১১১ মাইল দূরে গোরাই নদী তীরে কুষ্টিয়া, উভয় রেল স্টেশন হইতে স্টিমারপথে প্রায় ১২ মাইল দূরে পদ্মার শাখা ইছামতী নদী তীরে অবস্থিত ; পাক্‌সির পরবর্তী স্টেশন ঈশ্বরদী জংশন হইতে মোটরগাড়ি যোগে পাবনা ১৬ মাইল দূর। পদ্মাতীরস্থ বাজিতপুর নামক স্টিমারঘাট হইতে পাকা বাঁধা রাস্তায় শহর প্রায় এক মাইলের উপর। এখানকার বায়ু মণ্ডলের **উষ্ণতা** সর্বোচ্চ ১০৬° এবং সর্বনিম্ন ৪৬° ; **বারিপাত** গড়ে অধিক ৭০ ইঞ্চি এবং কম ৪৬ ইঞ্চি পরিমাণ হইয়া থাকে।

শহরের অধিকাংশ অংশ ইছামতী নদীর উত্তর ও পূর্বাংশে অবস্থিত হইলেও, বর্তমান মিউনিসিপালিটির **সীমা** পাবনা, রাধানগর ও রামচন্দ্রপুরাদি পল্লী লইয়া গঠিত। ইহার পরিমাণফল পূর্বে ৫ পাঁচ বর্গ মাইলের উপর ছিল, এক্ষণে পদ্মায় অনেকাংশ ভাঙিয়া গিয়াছে। উত্তরে সালগাড়িয়ার প্রান্ত সীমা, পূর্বে দোহারপাড়া ও আরিপপুর, দক্ষিণে ইছামতী (এক্ষণে পদ্মা) পশ্চিমে ইছামতী পার আটুয়া, গোবিন্দা ও নারায়ণপুরাদি পল্লী দ্বারা শহর বেষ্টিত। শহরের মধ্যে স্ট্র্যান্ড রোড, জ্যাকসন রোড, কাঁলাচাঁদপাড়া রোড প্রভৃতি প্রধান **রাস্তা** ব্যতীত উত্তর দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত আরও কয়েকটি পাকা রাস্তা বিদ্যমান আছে। প্রায় ৪০ মাইল পথ বিস্তৃত রাস্তা সমূহ মধ্যে অনুমান ৯ মাইল পরিমাণ পাকা ইটে বাঁধা, অবশিষ্ট কাঁচা পথ ; মিউনিসিপালিটির তত্ত্বাবধানে নির্মিত ও রক্ষিত। শহরের মধ্যে পূর্বে নূতনবাজার, পুরাতন বাজার, রাধানগর বাজার, পৈলানপুর বাজার ও দেওয়ানগঞ্জ বাজার নামে পাঁচটি বাজার ছিল বলিয়া জানা যায় ; তাহার নিদর্শন অদ্যাপিও বর্তমান আছে। মিউনিসিপ্যালিটি হইতে রাঘবপুর মৌজায় ইতিপূর্বে বাজার লাগান হইয়াছিল, তাহা ১৯১০/১১ খ্রিস্টাব্দে উঠিয়া যায় ; পরে গবর্নমেন্ট হইতে পুনরায় ১৯২২/২৩ খ্রিস্টাব্দে ২০ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হয়, তাহাতেও মিউনিসিপালিটি বাজার সংস্থাপনে সমর্থ হয় নাই। সম্প্রতি শহরের পত্তনীদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে যে বাজাব আছে, তাহা শহরবাসীর পক্ষে অনুপযুক্ত ও সম্পূর্ণ সুবন্দোবস্তবিহীন।

মিউনিসিপ্যালিটির অধিবাসী সংখ্যা

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে—১৯২৭৪   ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে—১৯৩৪৩

হিন্দু	৯৭৮৪	=	পুরুষ	৫৪৬৫	স্ত্রী	৪৩১৯
মুসলমান	৯৪৬২	=	”	৪৮৬৪	”	৪৫৯৮
খ্রিস্টিয়ান	৮৩	=	”	১৫	”	৬৮
বৌদ্ধ	২	=	”	২	”	০
ব্রাহ্ম	৭	=	”	৪	”	৩
অন্যান্য	৫	=	”	২	”	৩
	১৯৩৪৩	=	পুরুষ	১০৩৫২	স্ত্রী	৮৯৯১

স্থানীয় হিন্দু অধিবাসী মধ্যে বাণিজ্যজীবী বৈশ্য সাহা ও তন্তুবায়াদি জাতির সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক ; কৈবর্ত, কর্মকার ও অন্যান্য নবশাক জাতির সংখ্যা মুষ্টিমেয় ; স্থানীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির সংখ্যা বেশি নহে ; চাকরি, জোতদারি, জমিদারি আদি ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির মধ্যে অনেকেই মফঃস্বল পল্লী হইতে সমাগত। স্থানীয় মুসলমানগণ মধ্যে বস্ত্রবয়নকারী কারিকর ও মৎস্য বিক্রয়কারী নিকারি ও পাঝার সংখ্যা অধিক। এতদ্ব্যতীত সুদূর পল্লী হইতে আগত কয়েক ঘর মুসলমান, ভূম্যধিকারীর বাস আছে। বিহারাদি পশ্চিমাঞ্চলবাসী চাকর ও ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যা দেশিয় পাচক ব্রাহ্মণ, জুতা প্রস্তুতকারী পশ্চিমা চর্মকার, খোট্টা ধোপা এবং পাল্কি বহনকারী বেহারার সংখ্যাও শহরে নিতান্ত কম নহে।

ইছামতী নদী, লক্ষ্মী সাগর (জুবলী ট্যাঙ্ক) এবং মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত আরও ৪/৫টি জলাশয় পাবনায় পানীয় জলের সম্বল ; ইছামতী মাত্র বৎসরে ২/৩ মাস স্রোতস্বতী থাকে, অন্য সময়ে শহরাংশে একেবারে শুকাইয়া যায়, মাত্র ২/৩ স্থানে সামান্য জল থাকে। এতদ্ব্যতীত শহরে স্নান ও পানীয় জলের জন্য বিশেষ কোন জলাশয় বর্তমান নাই। পদ্মা ভাঙিয়া পাবনার নিকটবর্তী হইলেও দক্ষিণাংশ ব্যতীত শহরের অন্যান্য অংশে বিশেষ জলকষ্ট অনুভূত হয়। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল মিউনিসিপ্যালিটির উদ্যোগে পাবনায় জলের কল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে।

পূর্বে ইছামতী নদী বারমাস প্রবাহিত থাকা কালে পাবনা একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর বলিয়া গণ্য হইত। এখানে যে ইংরেজ, ফরাসি, পর্তুগিজ আদি বৈদেশিক ব্যবসায়িগণের গতায়াত ছিল, তাহা পাবনায় জেলা সংস্থাপনের পূর্বে স্থানীয় খ্রিস্টানদিগের গোরস্থানে ১৮১২ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ যুক্ত T. Colombo নামেক জনৈক পর্তুগিজ বণিকের বণিতা Matildaর সমাধি স্তম্ভ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। তৎপরবর্তী নীলকুঠির কার্যকালে যে পাবনায় একটি প্রধান কুঠি বা কনসারণ ছিল, তাহা এখানকার মাঝিপাড়ার কুঠিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইছামতী নদী বন্ধ হওয়ায় বাণিজ্য হিসাবে পাবনা অনেকাংশে শ্রীহীন হইলেও, ১৯০৫/০৬ খ্রিস্টাব্দ হইতে পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী নামক যৌথকারবার ও তাঁতিবন্দের জনৈক জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রান্ত শিল্পসমিতি (পরে পাবনা হোসিয়ারি কোম্পানি) হইতে মোজা গেঞ্জি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হওয়ায় পাবনার বাণিজ্যের না হইলেও, শিল্পের উন্নতির অনেক সুযোগ ঘটিয়াছে। তৎকাল হইতে এ পর্যন্ত পাবনায় মোজা গেঞ্জির কারবার ক্রমশ বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং অনেকে এখানে বাটিতে মোজাদি বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বাজারে তাহা বহুল পরিমাণে কাটতি হইতেছে। সম্প্রতি সাহা ব্রাদার্স হোসিয়ারী ফ্যাক্টরি ও পাবনা টেক্সটাইল মিলস নামে আরও দুইটি মোজা গেঞ্জির কারখানা পাবনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপরোক্ত শিল্প সঞ্জীবনী ব্যতীত পাবনায় যৌথ কারবার মধ্যে যে পাঁচ ছয়টি ব্যাঙ্ক বা ঋণদান সমিতি বহুদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথা হইতে জমিদার ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সহজে ও সুপারিশে টাকা কর্জ লইয়া শীঘ্র শীঘ্র ঋণজালে বিজড়িত হইবার সুযোগ হওয়া ভিন্ন, তদ্বারা দেশে ধনাগমের প্রধান সহায়ক ব্যবসায়িগণের বিশেষ কোন সুবিধা বা সুযোগ ঘটে নাই।

শহরে প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ কালাচাঁদপাড়ায় জোড়বাঙলা নামে বিবিধ কারুকার্যখোদিত ইষ্টক নির্মিত একটি প্রাচীন দেবমন্দির বর্তমান আছে। ইহা প্রায় তিন শতাব্দীকাল পূর্বে ব্রজমোহন (কাহার মতে ব্রজবল্লভ) ক্রোড়ড়ী নামে পাবনার জনৈক কায়স্থ নাগরিক কর্তৃক নির্মিত বলিয়া বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধি চলিয়া আসিতেছে।

পদ্মা পাবনা হইতে পূর্বে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল : সম্প্রতি প্রায় ৮/৯ বৎসর মধ্যে এই নদী ক্রমশ ভাঙিয়া পাবনার সান্নিধ্যে আসিয়াছে। তজ্জন্য জল বায়ু অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হইলেও ডাক্তার কবিরাজের সংখ্যা পাবনায় এক্ষণে সর্বসমেত প্রায় ৪০ জনের উপর। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বাজিতপুর হইতে ভাঙিয়া পদ্মা প্রায় পাবনার দিকে দেড় মাইল

পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। ১৯১৭ অব্দে গবর্নমেন্ট হইতে খরিদা বাগছীর দরুণ নূতন সারকিট হাউস পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁধ আরম্ভ হইয়া ১৯২০ অব্দ পর্যন্ত গবর্নমেন্ট প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকা খরচ করেন। পুনরায় ১৯২১ অব্দে ১১৯০০০ টাকা ব্যয়ে উক্ত বাঁধের কার্য পরিসমাপ্তি হয়। পুনরায় প্রায় ৭৮০০০ টাকা ব্যয়ে মাঝিপাড়ার কুঠি পর্যন্ত প্রায় এক মাইল দীর্ঘ উক্ত বাঁধ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি তাহার পূর্বদিকে রামচন্দ্রপুর নামক গ্রামের অধিকাংশ সম্প্রতি ১৯২৬ অব্দে নদীগর্ভে নিপতিত হইয়া পদ্মা পাবনার সীমানা হইতে প্রায় দুই রশি মধ্যে আসিয়াছে। রাঘবপুর মৌজায় শিতলাই জমিদার মহাশয়ের সুদৃশ্য মূল্যবান বাসভবন নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পদ্মার এই ভাঙনের বিষয় ১৯০৯/১০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সাড়া ব্রীজের নির্মাণ কার্যে আরম্ভ হওয়া কালেই ইঞ্জিনিয়ারগণ কর্তৃক সূচিত হইয়াছিল এমত জানা যায়। শহরে পূর্বেও বর্ষার জলপ্লাবনে অনেক ক্ষতি করিত, তজ্জন্য নদীতীরস্থ সরকারি অফিসাদি রক্ষাকল্পে ১২৯৭ সালে কাছারি জেলখানাদি বেষ্টন করিয়া প্রায় এক মাইল বিস্তৃত নাতি উচ্চ একটি মৃৎ প্রাকার (Embankment) নির্মিত হইয়াছে।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলার অধীনে পাবনায় সর্বপ্রথম একটি মহকুমা স্থাপিত হইয়া এখানে একজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে এখানে একজন ডেপুটি কালেক্টর ও ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে একজন স্থায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পদ সর্ব প্রথম জারী হয়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে পাবনায় সর্বপ্রথম **মিউসিপ্যালিটি** প্রতিষ্ঠিত হয় ; ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে জেলা জজের পদ জারি হয়। স্থানীয় অফিসাদি মধ্যে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বর্তমান দ্বিতল জজকোর্ট, ফৌজদারি আদালত, ডিস্ট্রিক্টবোর্ড বা মিউনিসিপ্যাল অফিস, জেলখানা, পোস্টাফিস, জেলা স্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ; এতদ্ব্যতীত স্থানীয় টাউনহল, অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং নদীর পশ্চিম পারে রাধানগরে সুদৃশ্য প্রাঙ্গন ও সুন্দর নূতন অট্টালিকায় অবস্থিত এডওয়ার্ড কলেজ ও তৎসংশ্লিষ্ট হিন্দু মুসলমান ছাত্রাবাস দ্রষ্টব্য। জেলা স্কুল ব্যতীত পাবনা ইনস্টিটিউশন, রাধানগর বাজার একাডেমি (পাবনায় অবস্থিত), ভুবনময়ী হাইস্কুল নামে ৩টি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ; গোস্বামী মধ্য ইংরাজি স্কুল. বীণাপাণি পাঠশালা, গুরুট্রেনিং স্কুল, মহাকালী পাঠশালা এবং বালিকা বিদ্যালয় পাবনায় বর্তমান আছে। টেকনিক্যাল স্কুলে আমিন ও ওভারসিয়র ক্লাস ব্যতীত কয়েক বৎসর হইল একটি বয়ন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। স্থানীয় দর্শন টোল, সারস্বত টোল, মাদ্রাসা ও মক্তাবাদিতেও অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করে।

পাবনা অস্ট্রেলিয়ান মিশনের একটি বিশেষ কেন্দ্রস্থল ; এখানে উক্ত মিশনের জেনানা মিশনের প্রযত্নে একটি নারী প্রচারক বিভাগ প্রবর্তিত আছে। তজ্জন্য বহু অর্থব্যয়ে একটি দ্বিতল পাকা বাটি নির্মিত হইয়াছে। পাবনা কোর্টের তত্ত্বাবধানে সাধারণের বায়ু সেবনার্থ **কামিনী গার্ডেন** নামে প্রমোদ উদ্যানে একটি পাকা বাঁধা টেনিস কোর্ট ও ক্লাব প্রতিষ্ঠিত আছে।

উত্তরবঙ্গের সর্ব দক্ষিণাংশে রাজশাহী বিভাগের পাদদেশে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র পাবনা নগরী যে পূর্বাপর চিরদিন সাহিত্যিকগণের মর্যাদা ও স্মৃতি রক্ষাকল্পে মনোযোগী তাহা এই শহরের ছাত্র সমাজের উদ্যোগে এখানে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত, পরলোকগত সুরাজ সম্পাদক কিশোরীমোহন রায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত **কিশোরীমোহন স্টুডেন্ট লাইব্রেরী** এবং এই জেলার সুপ্রসিদ্ধ কান্তকবি স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত **রজনীকান্ত পাঠাগার** তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পাবনার ন্যায় এই ক্ষুদ্র শহরতলীতে সুদূর ১২৬০ সালের পূর্ব হইতে প্রথম প্রকাশিত **পাবনা দর্পণ** হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানে এখান হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত **পাবনা বগুড়া হিতৈষী** ও **সুরাজ** নামক দুই

খণ্ড সাপ্তাহিক এবং **আরতি** নামক দ্বৈমাসিক পত্রিকা এখানকার শিক্ষিত সমাজের সাহিত্যানুশীলনের বিশেষ পরিচয় বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্রগণের উদ্যোগে তথা হইতে পাবনা **এডওয়ার্ড কলেজ পত্রিকা** নামেও অর্ধবাংলা অর্ধইংরাজি একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত কবিতাংশ হইতে প্রকাশ পাবনাতে অতি পূর্বে রাসযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ সমারোহ হইত। যথা—

ব্রজ সাহার রাস, আরাধন দত্তের ফাস।
বদে বাকালির ছবি, নেধু সাহার কবি।।

বর্তমান সময়ে স্থানীয় জয়কালী বাড়ি, কাঁলাচাঁদ বিগ্রহের বাটি, নবসিংহজি বিগ্রহের ও কয়েকটি বৈষ্ণবের আখড়ায় এবং স্থানীয় কয়েজন মহাজনের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বাটিতে রাস-দোলাদি সাময়িক পর্বোপলক্ষে নানান উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জয়কালী বাড়িতে বার্ষিক রটন্তি পূজা এবং কয়েকটি স্কুল ও স্থানীয় অধিবাসিগণের কাহার কাহার বাটিতে সরস্বতী পূজার উৎসব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাবনা সাধারণত কালাচাঁদের মাটি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, পাবনার বিবরণ প্রসঙ্গে উক্ত বিগ্রহের বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক নহে, তজ্জন্য তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কালাচাঁদ বিগ্রহের ইতিবৃত্ত ঃ

পাবনা টাউনের রাঘবপুর মৌজায় একটি পাড়ার নাম কালাচাঁদপাড়া, এখানে অধিকারী উপাধিক কায়স্থগণের বাটিতে যে কালাচাঁদ বিগ্রহের দৈনিক সেবা প্রচলিত আছে, তাহা বহু দিনের প্রতিষ্ঠিত। ইহারা উক্ত বিগ্রহের সেবাইত সূত্রে দেবোত্তরাদি ভোগ দখল করতঃ এই বিগ্রহের সেবাদি পরিচালনা করিয়া থাকেন। প্রকাশ ইহারা বঙ্গাধিকারির বংশধর এবং কাটোয়ার সন্নিহিত খাজুরডিহির উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের মিত্রবংশ সম্ভূত এবং বাংলার সর্বপ্রথম কাননগো ভগবান রায়ের সন্তান বলিয়া পরিচিত। ভগবানের পর তাহার ভ্রাতা বঙ্গবিনোদ ও তৎপুত্র হরিনারায়ণ পুরুষাণুক্রমে বাংলার রাজস্ব বিভাগে কর্মচারি থাকা হেতু ইহারা **বঙ্গাধিকারী** উপাধি লাভ করেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে বাংলার প্রধান কাননগো পদ দ্বিধা বিভক্ত হইলে, উক্ত হরিনারায়ণ প্রথম বিভাগে এবং দেবকী সিংহের পুত্র রামজীবন দ্বিতীয় বিভাগে নিযুক্ত হয়েন। ঢাকা হইতে বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইলে, হরিনারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ তথায় গঙ্গার অপর পারে ডাহাপাড়ায় (ঢাকা হইতে আগত লোকের পাড়া) স্থায়ী হন। দর্পনারায়ণের ১ম পুত্র শিবনাথ ডাহাপাড়ায় অবস্থান করেন, ২য় পুত্র লোকনাথ চন্দ্রনা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে এই কালাচাঁদ বিগ্রহসহ পুনরায় পূর্বাঞ্চলে আসিয়া স্বীয় এলাকা বর্তমান পাবনা জেলার অধীন রোকনপুর পরগণাস্থ এই পাবনায় স্থায়ী হইয়াছিলেন। লোকনাথ স্বাত্বিক ভাবাপন্ন ছিলেন। তদ্ধেতু পাবনায় উক্ত বিগ্রহের সেবা পরিচালানার্থ কিঞ্চিৎ স্থাবর সম্পত্তি দিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনিই পাবনায় বর্তমান কালাচাঁদ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। তৎকালে সমস্ত রোকনপুর পরগণা দর্পনারায়ণ পুত্র উপরোক্ত অনাথ ও লোকনাথ উভয় ভ্রাতার সম্পত্তি ছিল। প্রকাশ এই রোকনপুর পরগণা তাহাদের সহোদরা ভগিনী রুক্মিণী দেব্যার নামানুসারেই প্রচলিত হইয়াছিল। বাংলার নবাব স্বীয় কর্মচারি দর্পনারায়ণের উক্ত কন্যার অন্নারম্ভে কতকগুলি পরগণা হইতে কিছু কিছু অংশ লইয়া একটি পৃথক পরগণা সৃষ্ট করতঃ তাহাই যৌতুক বা লৌকিকতা স্বরূপ কাননগো দুহিতাকে প্রদান করেন। তজ্জন্য এই পরগণার নাম বা অংশ এখনও অনেক স্থানেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই প্রকার দানের রীতি যে নবাবী আমলে প্রচলিত ছিল, তাহার পরিচয় এই জেলার বাগবাটির বৈদ্য জমিদার বংশের ইতিবৃত্তে 'কুড়ি টাকার গাতি' নামক মহালেও পাওয়া যায়।

উক্ত ভগিনী, রুক্মিণী দেব্যা, বালবিধবা হেতু শিবনাথ তাহার নামীয় সম্পত্তি নিজ দখলে ও হস্তগত রাখিবার মানসে তাহা কৌশলে নীলাম করাইয়া বাটির স্বীয় কর্মচারি ভূমিহার ব্রাহ্মণ বংশীয় বর্তমান লালগোলার মহারাজা বাহাদুরের মাতুল বংশীয় পূর্বাধিকারী জনৈক আত্মারাম রায়ের বণিতা দুলা দেব্যার বেনামীতে খরিদ করিয়া রাখেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজগণ বাংলার দেওয়ানি পদ লাভ করিবার সময় মহারাজা বাহাদুরের পূর্বপুরুষগণ মাতুলানীর নামীয় সম্পত্তি ওয়ারিশসূত্রে দাবি করেন এবং তখন হইতে এই রোকনপুর বঙ্গাধিকারিগণের হস্তচ্যুত হইয়া লালগোলার রাজবংশের করতলগত হইয়াছে। সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেও, প্রাগুক্ত লোকনাথ কর্তৃক পাবনায় আনীত ও প্রতিষ্ঠিত বর্তমান কালাচাঁদ বিগ্রহের সেবাপূজা পরিচালনার্থ পূর্বে যে সমস্ত দেবোত্তরাদি স্থাবর সম্পত্তি ও বার্ষিক বৃত্তি এবং পাবনা বাজার দৈনিক তোলাদি আদায়ের নিয়ম পূর্বাপর প্রচলিত ছিল, তাহারা কতকাংশ এখন পর্যন্ত বর্তমান আছে।

শিবনাথের বংশধর ডাহাপাড়ার কুমার প্রতাপনারায়ণ রায় এবং লোকনাথের বংশীয় পাবনার অধিকারী মহাশয়গণ এক বংশ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের বাটিতে এই কালাচাঁদ বিগ্রহের সেবা পরিচালন জন্য পাবনায় লালগোলার কাছারি হইতে পূর্বে বার্ষিক সাময়িক উৎসবাদি নির্বাহ জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। রাস ও দোলোৎসব সময়ে কালাচাঁদ বিগ্রহ প্রায় পক্ষাধিক কাল জন্য তথায় যাইতেন এবং প্রতি বৎসর পুণ্যাহদিনে সর্বপ্রথমে লালগোলার কাছারির নায়েব মহাশয় সসম্মানে কালাচাঁদ বিগ্রহের প্রণামী ও ভোগ প্রদান করিতেন। এই বিগ্রহের দৈনিক সেবা পরিচালন জন্য পাবনা বাজারে প্রত্যহ তরকারি মিষ্টান্নাদি বিক্রেতাগণের নিকট তোলা আদায়ের নিয়ম ছিল এবং এক্ষণেও আছে। এতদ্ব্যতীত অদ্যাবধি পাবনা বাজারের মহাজনগণ রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী ও পৌষ সংক্রান্তাদি পর্বদিনে এই বিগ্রহের সেবা জন্য অল্পবিস্তর বৃত্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। পাবনা লালগোলা রাজাবাহাদুরের খাসে থাকা কালে, তিনি এই বিগ্রহের বৃত্তি পার্বণী সমস্তই পূর্ববৎ প্রদান এবং বার্ষিক ক্রিয়াদিও নিষ্পন্ন করিতেন, কিন্তু পাবনার বর্তমান পত্তনীদার তাঁতিবন্দের জনৈক চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়াও এই বিগ্রহের বার্ষিক উৎসবাদি ও বৃত্তি বন্ধ এবং অপলাপ করিয়াছেন।

রাধানগর দিং ঃ

ইছামতির পশ্চিম তীরে পাবনা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত রাধানগর একটি প্রাচীন ভদ্রপল্লী। বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুর নামক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

বটগ্রাম দত্ত মধ্যে নারায়ণ নাম।
রাধানগর বাস কৈল গুণে অনুপম।।

সেন রাজত্বকালে কায়স্থ প্রভাব প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে যে, নারায়ণ দত্ত নামক জনৈক কায়স্থ মহাত্মা ১০২৮ শকাব্দে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় সন্ধিবিগ্রহিক প্রধান আমাত্য ছিলেন ; উক্ত "দত্ত মহাশয়ের বংশধরগণ আধুনিক পাবনা জেলার অন্তপাতী ইছামতী তীরে রাধানগর গ্রামে বাস করিতেছেন।" ঢাকুর বর্ণিত রাধানগর ও এই রাধানগর এক কিনা তাহা জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই ; তবে এই রাধানগরে দেব বংশীয় মজুমদার উপাধি বিশিষ্ট জমিদার বংশ ব্যতীত আরও মাত্র এক ঘর মজুমদার উপাধিক কায়স্থ বংশ বর্তমান আছেন, তাহারা ইহাদের অপেক্ষা বংশমর্যাদায় কুলীন এবং দত্ত বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

অধুনা পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ এখানে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে সুদৃশ্য অট্টালিকায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রাবাস সহ বিগত ১৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দ হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখানে পূর্বে দৈনিক দুই বেলা বাজার বসিত, এক্ষণে মাত্র কয়েকখানি দোকান ও ২/৩ জন চিকিৎসকের ঔষধালয় এবং নদীয়া জেলার আমলা সদরপুরের জমিদারগণের তহশীল কাছারি

বাড়ি বর্তমান আছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ মধ্যে সান্যাল, অধিকারী, মৈত্র উপাধিক ব্রাহ্মণ, রায় মজুমদারাদি উপাধি বিশিষ্ট তন্তুবায়, কর্মকার, কৈবর্ত, যুগী (চুর্ণকার) নরসুন্দর, মোদক (পাল) পাটনি প্রভৃতি নানা জাতীয় হিন্দু, বিহারী পশ্চিমা চর্মকার এবং খোট্টা ধোপা আদির এখানে বাস আছে। মুসলমান মধ্যে খুলু, নিকারি ও খলিফা (দরজি) সংখ্যা বেশি, বাসিন্দা ব্যতীত চাষী গৃহস্থের সংখ্যা কম।

বহুকালীয় ইষ্টক নির্মিত একটি প্রাচীন মঠাকার গৃহ কলেজ প্রাঙ্গনের অনতিদূর বর্তমান আছে। প্রাচীন মানচিত্রাদিতেও ইহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মুসলমানগণ ইহাকে মসজিদের অংশ বলিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু সহসা দেখিলে হিন্দুর মন্দির বলিয়াই অনুমান হয়। বহুদিন হইতে এখানে একটি বারইয়ারি কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত আছে; তথায় পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি সমারোহে কালীপূজা হইত, এখানে বার্ষিক চড়কপূজা সময়ে মেলাদির অনুষ্ঠান হয়। এখানে এবং নিকটবর্তী গোবিন্দা নামক গ্রামে অনেক যুগী (চুর্ণকার) ও নমঃশূদ্র জাতির বাস আছে, চৈত্র মাসে তাহারা ও অন্যান্য সকলে মিলিত হইয়া পাট ও দেউল পূজায় বিশেষ আমোদোৎসব উপভোগ করিয়া থাকে।

রাধানগরে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরাধিক হইতে স্থানীয় মজুমদার জমিদারগণের প্রতিষ্ঠিত একটি **অবৈতনিক মধ্যবাংলা** বিদ্যালয় ছিল, পরে উহা মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইলেও বহুদিন পর্যন্ত অবৈতনিক ভাবে চলিয়াছিল। জমিদারগণ ইহার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিতেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয় **রাধানগর মজুমদার একাডেমি** নামে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইবার সময় হইতে ইহা বৈতনিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইলেও, উক্ত জমিদারগণ এখন পর্যন্তও মাসিক প্রায় শতাধিক টাকা আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকেন। স্কুলের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফুল্লকুমার মজুমদার মহাশয় ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। রাধানগরের স্কুলবাটি নষ্ট হওয়ায়, ইছামতীর পূর্বপার পাবনার সালগাড়িয়া নামক পাড়ায় সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল ভাড়াটিয়া বাটিতে স্কুলটি স্থানান্তরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এখানে প্রাইমারি পাঠশালা ও সম্প্রতি কয়েক মাস হইল গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় নামে একটি বালিকা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। **নৃপেন্দ্রনারায়ণ লাইব্রেরী** নামে যে একটি সাধারণ পাঠাগার সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা মজুমদার বংশের জনৈক উদ্যোগী যুবার স্মৃতিরক্ষাকল্পে স্থাপিত।

শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নদিয়াবিনোদ গোস্বামী নামে জনৈক গোস্বামী সন্তান ওয়ারিশসূত্রে এখানে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া রাধানগরে স্থায়ী হইয়াছেন। সম্প্রতি ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তদীয় পুত্রের উপনয়নের উৎসবোপলক্ষে কলেজ প্রাঙ্গনে ৫৬ ছাপান্ন প্রহর কালস্থায়ী রাঢ়দেশীয় প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়াদিগের সঙ্গীত ও তদুপলক্ষে পাবনা জেলার মফঃস্বলস্থ অধিবাসী ও জেলার চতুঃপার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা হইতে বহু শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দের এবং সাধু মহাত্মাগণের সমাগমে ক্ষুদ্র রাধানগর পল্লী সপ্তাহাধিক কালের জন্য আনন্দোৎসবে মগ্ন ও মুখরিত হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে পাবনা ও ভিন্ন স্থানীয় বহু লোকে নানাপ্রকারে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং এমন কি স্থানীয় এবং পাবনার কতিপয় মহাজন ও ভদ্রসন্তানগণের আন্তরিক যত্নে ও আগ্রহে অসময়ে মুহূর্ত মধ্যে দ্বিসহস্রাধিক লোকের আহার্য সামগ্রী সংগ্রহ হইত। দোগাছি নিবাসী জগবন্ধু প্রামানিক মহাশয়ের দত্তকপুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রামাণিক (কুণ্ডু) মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত গোস্বামী মহাশয়কে কীর্তনীয়াদিগের পারিশ্রমিক প্রদানের অর্থ জন্য সাময়িক সাহায্য দানে স্বীকৃত হইয়া এই বিরাট আয়োজনে নিরত দারিদ্র ব্রাহ্মণের মহদুপকার সাধন ও নবীন বয়সেই স্বকীয় উদারতার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাড়াস, শিতলাই, পয়দা প্রভৃতি স্থানের ভূম্যধিকারীগণ বরেন্দ্রভূমির এই নিভৃত পল্লীতে একত্রীভূত রাঢ়দেশীয় প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া দলের সঙ্গীতামোদ উপভোগ এবং উপস্থিত দর্শক ও

শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয্য ও মহোৎসব দর্শন মানসে কয়েক দিবসাবধি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর উৎসাহ বর্ধন করিয়াছিলেন। হিন্দু ব্যতীত এই আনন্দোৎসবে কয়েকদল মুসলমান গায়ক সম্প্রদায়ও উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

রাধানগর মজুমদারদিগের বাটিতে বহুদিন হইতে বার্ষিক সমারোহে শারদীয় দুর্গোৎসব পূজা হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে আমোদোৎসবাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত যাত্রাভিনয় অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে।

মজুমদার বংশের বিবরণ ঃ

ইহারা কাণসোনার দেব বংশ বলিয়া বারেন্দ্র কায়স্থসমাজে পরিচিত। ইহাদিগের পূর্বপুরুষ জনৈক ধনীরাম বিশেষ মেধাবী ও তেজস্বী ছিলেন কিন্তু আলস্যপরায়ণতার ও বিষয় কর্মে সর্বদা উদাসীনতা প্রযুক্ত শৈশবে পিতৃ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া নিজ সৌভাগ্যান্বেষণে বাটি হইতে বহির্গত হন। কালক্রমে স্বকীয় বুদ্ধি প্রভাবে ও প্রচেষ্টায় নবাবী আমলে নাটোর রাজস্টেটের অভ্যুদয়কালে উক্ত রাজসরকারের অধীনে খাজঞ্চিরূপে প্রবেশ লাভ করতঃ উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন ও প্রভূত ধন সম্পত্তি অর্জন এবং মজুমদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কালক্রমে রাধানগরে বাসস্থান নির্মাণ করেন। বর্তমান রাধানগর মজুমদার জমিদার বংশীয় বারেন্দ্র কায়স্থগণ তাহারই বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

রঙ্পুর জেলার বঙ্গ বিখ্যাত ভবানী পাঠক নামক প্রসিদ্ধ দস্যুদলপতির দ্বীপান্তরের পরেও যখন উক্ত অঞ্চল দুর্দান্ত দস্যুগণের করতলগত ছিল এই মজুমদার বংশীয় শম্ভুনাথ, বিশ্বনাথ মজুমদার প্রভৃতি ঐ সকল দস্যু দমনে বহুপ্রকারে সহায়তা করিয়া বিশেষ যশস্বী ও ধনশালী হইয়াছিলেন। রাণী স্বর্ণময়ী স্টেটেও ইহাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তজ্জন্য ইহাদিগের অধিক সম্পত্তি রঙ্পুর জেলার অধীন বাহিরবন্দ পরগণাদিতে অবস্থিত। তথায় ইহারা একজন সমৃদ্ধ জোতদার ও জমিদার, পাবনায় ইহাদের স্থাবর সম্পত্তি অধিক নাই বলিয়া প্রকাশ। ধনাঢ্য জমিদার ও বিশেষ সম্পত্তিশালী না হইলেও, ইহারা পূর্বাপর শক্তির উপাসক ; নিজ বাটিতে বহুদিন হইতে সাতিশয় সমারোহে শারদীয় দুর্গোৎসব ব্যতীত, ইহাদের জমিদারির অধীন রঙ্পুর জেলাস্থিত চাঁপানি নামক তহশীল কাছারিতেও বহুকাল হইতে দুর্গোৎসবাদির সুবন্দোবস্ত আছ। ইহাদের বাটিতে পূর্বে অতি যত্নে অতিথি সৎকার এবং দান দাতব্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। মফঃস্বলের কোন কোন তহশীল কাছারিতে এখনও দেবসেবা ও ভোগোত্তরাদি জন্য ভূমিদানের নিদর্শন আছে।

দরিদ্র বিদ্যার্থিদিগের শিক্ষা বিষয়ে ইহারা জেলার মধ্যে সর্বপ্রথম নিজ গ্রামে অবৈতনিক মধ্য বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মজুমদার মহাশয়দিগের সময়ে উক্ত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে উহা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইবার সময় বৈতনিক স্কুলে পরিগণিত হইয়াছে। তথাপি এখনও উক্ত স্কুল জন্য প্রায় মাসিক শতাধিক টাকা ইহাদের স্টেট হইতে ব্যয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত রঙপুরে ইহাদের তহশীল কাছারির অধীনস্থ স্কুল পাঠশালাদিতে মাসিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় এডওয়ার্ড কলেজ রাধানগরে স্থানান্তরিত হওয়া কালে ইহারা মিউনিসিপ্যালিটির সীমান্তর্গত প্রায় পনের বিঘা পরিমাণ জমি বিনা নজরানায় মাত্র সামান্য খাজনায় কলেজ কমিটিকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। রাধানগরে বর্তমানে নৃপেন্দ্রনারায়ণ সাধারণ পাঠাগার নামে যে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও এই বংশীয় একটি উৎসাহী যুবকের স্মৃতি ও নামেই স্থাপিত। ইহা সমস্তই এই বংশের বিদ্যোৎসাহীতার পরিচায়ক। সঙ্গীতচর্চা এই বংশের একটি বিশেষত্ব। দুর্গোৎসব ও বারইয়ারি উপলক্ষে ইহারা যাত্রা ও নাটকাভিনয়ে বহুদিন হইতে অভ্যস্থ ও ব্যয়শীল। অনেকদিন পর্যন্ত পোতাজিয়া নিবাসী মৃত বিধুরঞ্জন রায় মহাশয় রাধানগর মজুমদাদিগের যাত্রাভিনয়ের দলপতি ছিলেন।

অপরিণামদর্শীতা ও নানা প্রকার উশৃঙ্খলতাপ্রযুক্ত এই বংশীয় কেহ কেহ অকালে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল ইহাদের অর্ধেকাংশের মালিক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মজুমদার মহাশয়ের দত্তক পুত্র সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী স্বীয় গুরুদেবের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীগুরু মঠ নামে একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন; তাহাতে ইহাদের গুরুদেবের প্রতিমূর্তির দৈনিক পূর্জার্চনাদি হইয়া থাকে।

মিউনিসিপ্যালিটির বাহিরে রাধানগর সংলগ্ন নুরপুর, গাঙ্গকুলা ও সিঙ্গা এই তিনটি পাড়া সাধারণত সিঙ্গা নামে পরিচিত। ইহাও একটি বারেন্দ্র কায়স্থপ্রধান পল্লী বলিয়া প্রসিদ্ধ; এখানেও মৈত্র, চক্রবর্তী আদি উপাধিক ব্রাহ্মণ, রায়, মজুমদার আদি কায়স্থ, কুম্ভকার, (কুমার), গোপ (গোয়ালা), কর্মকার, নরসুন্দর প্রভৃতি হিন্দু সমাজান্তর্গত সমুদয় জাতি এবং নিকারি পাঝারপ্রমুখ অনেক মুসলমানের বাস আছে। গ্রামে সাপ্তাহিক রবি ও বৃহস্পতিবারে হাট বসে। এখানকার রায় উপাধিক বারেন্দ্র কায়স্থ ভূম্যধিকারিগণের বাটিতে বহুদিন হইতে গোবিন্দ বিগ্রহের দৈনিক সেবা পূজা প্রচলিত আছে। উক্ত বিগ্রহের বার্ষিক রথযাত্রা উপলক্ষে গ্রামের হাট খোলার বিশেষ সমারোহে মেলাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই গ্রাম বৈষ্ণবদিগের আখড়ায়ও সময় সময় নানা প্রকার সাময়িক আনন্দোৎসব হয়।

হিমাইতপুর দিং ঃ

পাবনা শহর হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছাতনি, হিমাইতপুর, প্রতাপপুর এবং তৎপশ্চিমাংশে নাজিরপুরাদি পদ্মাতীরস্থ পরস্পর সংলগ্ন কয়েকটি গ্রাম পূর্বাপর ভদ্রপল্লী বলিয়া পরিচিত। গ্রামগুলির অধিকাংশ পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। প্রতাপপুরের নাম ব্যতীত কোন অংশই বর্তমান নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিমাইতপুর সংলগ্ন ছাতনি গ্রামাংশে মোঘল আমলে রাজা মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত ছাওনি বা সেনানিবেশ ছিল বলিয়া প্রকাশ। কালক্রমে ছাওনি শব্দের "ও" ছাতনির "ত" রূপে পরিণত হইয়াছে। ইতিপূর্বেও যে এই গ্রামের নাম ছাওনি বলিয়া কথিত হইত, তাহা বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম পাবনা জেলা অংশের মুসলমান আমলের একমাত্র ভূম্যধিকারিণী মহারাণী সর্বাণী ও তৎপরবর্তী নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী প্রদত্ত ব্রহ্মত্রাদির দানপত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমানে এই সেনানিবেশের স্থান কোটাবাড়ি বা কোটার ভিটা নামে পরিচিত বা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কোট শব্দ দুর্গ অর্থে ব্যবহৃত হইত যথা—দেবকোট, নাগকোট; ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে এই স্থান লইয়া হিমাইতপুরের চৌধুরী বংশীয় রামানন্দ চৌধুরী ও বরকাতুল্যা ফকির মধ্যে রাজশাহীতে যে মোকদ্দমা হয়, তাহার ফয়সালাতেও কোঠাবাড়ি, কোঠার ভিটা এমত উল্লেখ আছে; এখানে জঙ্গলাকীর্ণ যে মৃত্তিকাস্তূপ বর্তমান রহিয়াছে, তাহা পূর্বে ইষ্টকাকীর্ণ ছিল। ইহাতে বোধ হয়, মোঘল আমলে এইস্থানে সৈনিকপুরুষদিগের আবাসস্থান জন্য পদ্মাতীরস্থ ভূখণ্ডে কোট বা সেনানিবাস নির্মিত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। আবার হিমাইতপুর গ্রামে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, মানসিংহের দ্বাবিংশ অনুচরের মধ্যে হিম্মত খাঁ নামক জনৈক সেনানী কর্তৃক অধ্যুষিত পল্লী কালক্রমে হিমাইতপুর নামে পরিচিত হইয়াছে। এখানে এখনও খাঁ পাড়ার নিদর্শন আছে।

হিমাইতপুরে চৌধুরী উপাধিক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাক, বৈশ্যসাহা ও নরসুন্দরাদি হিন্দুর প্রায় সমস্ত জাতি ও বহু মুসলমানের বাস আছে। হিমাইতপুর ও প্রতাপপুর পরস্পর সংলগ্ন উভয় পল্লীতেই মৎস্যজীবী হালদার ও দাসাদি উপাধি বিশিষ্ট বহু জালিক জাতির বাস আছে। অধিকসংখ্যক নৌ-জীবী ধীবর জাতির বাস হেতু নিকটস্থ পল্লী বিশেষ মাঝিপাড়া নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত এখানে অনেক মৃৎ শিল্পজীবী কুম্ভকার ও দুগ্ধব্যবসায়ী গোপ বা গোয়ালা জাতির বাস আছে। হিমাইতপুরের চৌধুরী মহাশয়গণ রাণী ভবানী প্রদত্ত অনেক দেবত্রাদি উপভোগ করিয়া থাকেন। ইহারা এথাকার প্রাচীন ভূম্যধিকারী বলিয়াও

পরিচিত। ইহাদের পূর্ব বৃত্তান্তে জানিতে পারা যায়—ঢাকা জেলার অধীনস্থ বলিয়া গ্রাম নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য ভাদুড়ির বংশধর মোহনবল্লভ ভাদুড়ি নামক জনৈক মহাত্মা মুসলমান অধিকারকালে একদা দেশভ্রমণোপলক্ষে বাটি হইতে বহির্গত হইয়া বর্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত চাটমোহর থানার অধীনস্থ হরিপুর গ্রামে উমানন্দ নিয়োগী নামক জনৈক বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণের গৃহে ঘটনাক্রমে অতিথি হইয়াছিলেন; তথায় অবস্থানকালে বাধ্য হইয়া স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে উক্ত নিয়োগী মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহান্তে কুলীনভঙ্গে কাপত্ব প্রাপ্ত হন এবং তদবধি দেশে না ফিরিয়া এই হরিপুরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। মোহনবল্লভ বিবিধ শাস্ত্র-বিশারদ সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন; উমানন্দ নিয়োগী মহাশয়ের উদ্যোগে ও চেষ্টায় তিনি হরিপুর নিবাসী তৎকালীন সাঁতৈলরাজ মহারাজ রামকৃষ্ণের দেওয়ান হরিপুর চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুষ রামদেব চৌধুরী মহাশয়ের সুপারিশক্রমে উক্ত রাজদরবারে পরিচিত হন। রাজাবাহাদুর মোহনবল্লভের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া বিশেষ সমাদর করেন। তৎকালে বিবিধ শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলী সাঁতৈলের রাজ সরকার হইতে যে গুণানুসারে ব্রহ্মত্রাদি প্রাপ্ত হইতেন, তাহার নিদর্শন এই জেলায় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের গৃহে অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত প্রাচীন দলিলাদিতে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মোহনবল্লভ ভাদুড়ির স্বীয় পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রানুশীলন জন্য উক্ত রাজসরকার হইতে বাজুরস নাজিরপুর পরগণায় কয়েকখানি মৌজা ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হইয়া এই হিমাইতপুরে স্থায়ী হইয়াছিলেন। কালক্রমে তাহার সন্তান সন্ততিগণ স্বকীয় অবস্থার উন্নতি সহকারে চৌধুরী আখ্যা লাভ করেন এবং হিমাইতপুর, ছাতনি ও প্রতাপপুরাদি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বসতি বিস্তার করিতে থাকিলেও ইহারা হিমাইতপুরের চৌধুরী নামে পরিচিত।

নিকটবর্তী নাজিরপুর গ্রামে লাহিড়ী, সান্যাল, মজুমদার, অধিকারী, বাগছী, আদি উপাধি বিশিষ্ট বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং ভুইঞা উপাধিক অনেক মাহিষ্য জাতির বাস দেখা যায়। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন দীর্ঘিকা বর্তমান আছে; পদ্মাতীরস্থ এই গ্রাম কালে অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিগণিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন মানচিত্রাদিতে রাজশাহী আদি অঞ্চলে যাতায়াত জন্য পাবনা হইতে পদ্মাতীর দিয়া পাবনা রাজশাহী রোড নামক যে একটি প্রাচীন রাস্তা নাজিরপুর হইয়া রামপুর বোয়ালিয়া পর্যন্ত অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, তার কোন অংশই এখানে এক্ষণে বর্তমান নাই। পূর্বে পদ্মা দূরে থাকিলেও অধুনা নদী এই গ্রামের অনেকাংশ গ্রাস করিয়াছে এবং অনেক ইষ্টকালয়াদি নদী গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এখানে বহু মুসলমান জাতির বাস আছে। অতিপ্রাচীন সময় হইতে, এখানে ইহাদের একটি প্রসিদ্ধ দরগাহ বর্তমান ছিল, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ নদীগর্ভে নিপতিত হইয়াছে। এই দরগাহের অনেক পিরপাল জমি নির্দিষ্ট আছে। কামারজানির ঘূর্ণিপাক হইতে উত্থিত একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর এখানে রক্ষিত আছে। বৈষ্ণবদিগের একটি আখড়াও নাজিরপুরে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে।

হিমাইতপুর বহুদিন হইতে যে একটি পোস্টাফিস আছে, তাহা বর্তমানে কাশীপুরে অবস্থিত। পূর্বে এখানে কালীবাড়িতে সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে একটি হাট বসিত, তাহা এক্ষণে পুরাণ কুঠিবাড়িতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। নাজিরপুরেও প্রতি রবিবার ও বুধবারে হাট লাগিয়া থাকে। বর্তমান সময়ে কাশীপুরে শনি ও মঙ্গলবারে যে হাট বসে, তাহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং এখানে ধান, পাট ও ভূষা মালাদি বহু পণ্য দ্রব্য আমদানি হয়।

সম্প্রতি বিগত কয়েক বৎসর হইল পদ্মাতীরস্থ এই হিমাইতপুর গ্রামে শিবচন্দ্র মহাশয়ের পুত্র অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের অলৌকিক প্রতিভা এবং সদনুষ্ঠান প্রসাদে এখানে সৎসঙ্গ নামে এক অভিনব ধর্মানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা সাধারণের নিকট সৎসঙ্গ আশ্রম নামে পরিচিত। ইনি সাধারণত রাধাস্বামী নামক পশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ ধর্মানুষ্ঠানের আচরিত সাধন প্রণালী প্রচার করিয়া থাকেন। তিনি বলেন "যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে, তাই ধর্ম।

ধর্ম কখনও বহু হয় না, ধর্ম একই। হিন্দুধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং... কোনও মতের সঙ্গে কোনও মতের প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই, ভাবের বিভিন্নতা।" ইহার ধর্মমত ও সাধনপ্রণালী যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচিত হইবে। সংক্ষেপত ইহা সৎনাম, সৎসঙ্গ ও সৎগুরু সহায়ে নাদযোগ সাধনদ্বারা আত্মোন্নতি।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমপূর্ণ ব্যবহার ও উপদেশগর্ভ বাক্যালাপে এবং তদীয় জননী পূজনীয়া মনমোহিনী দেব্যার গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া বাংলা, উড়িষ্যা ও ব্রহ্মদেশবাসী বহুলোক এই অনুষ্ঠান ও আশ্রম প্রচারিত অভিনব প্রণালীর দীক্ষা ও ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। অত্যল্পকাল মধ্যে অনেকানেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই ধর্মমতে বিমুখ ও দীক্ষিত হইয়া ভিন্ন জেলাবাসী হইলেও এখানে স্থায়ী ইষ্টক নির্মিত পাকা ইমারতাদি নির্মাণপূর্বক কেহ কেহ সপরিবারে বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন। তদ্ধেতু এই আশ্রম পার্শ্ববর্তী পল্লীগ্রামের জমিও শহরের ন্যায় অত্যুৎচ্চমূল্যে বিক্রিত হইতেছে।

পরলোকগত দেশ পূজা চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় সপরিবারে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করণান্তর মৃত্যুর পূর্বে দার্জিলিংঙে যাত্রাসময়ে কিয়দ্দিনের জন্য এই আশ্রম বাটিকায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

এই আশ্রমের শিক্ষিত শিষ্যমণ্ডলীর প্রযত্নে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলি এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১) তপোবন বিদ্যালয় ; ২) বিশ্ব-জ্ঞান-কেন্দ্র অভিনব বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ; ৩) বৈদ্যুতিক কারখানা ; ৪) দাতব্য কবিরাজি টোট্‌কা চিকিৎসালয় ও তৎসংলগ্ন ভেষজ্যোদান ; ৫) দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ; ৬) অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসালয় ; ৭) ধীবর সমবায় সমিতি ; ৮) সৎসঙ্গ ব্যাঙ্ক ; ৯) সৎসঙ্গ পাঠাগার ; ১০) সৎসঙ্গ পুস্তক প্রচার বিভাগ ; ১১) সৎসঙ্গ কুটির শিল্প বিভাগ।

বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের অনেকস্থলে এই আশ্রমের আদর্শে এই সৎসঙ্গের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। পল্লীর উন্নতিকল্পে বিভিন্ন গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। তপোবন বিদ্যালয়ের কার্যকরী বিভাগ হইতে সাবান, দেশিয় উদ্ভিদ হইতে নানাবিধ রং, গ্লাস হইতে আয়না তৈয়ার, তাঁতের কাপড় এবং উদ্ভিদের নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে। বিশ্ব বিজ্ঞান কেন্দ্রের গবেষণাগার হইতে বিদ্যুৎ, উদ্ভিদ জীবন ও প্রাণশক্তি সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের গবেষণাসহ নূতন বায়ুচালিত বৈদ্যুতিক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং বিনা তারে টেলিফোনের যন্ত্রাদি নির্মিত হইয়াছে। মুক্তাগাছার জমিদার যতীন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী মহাশয় বিজ্ঞানাগার নির্মাণকল্পে দশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ঐ অর্থে একটি ল্যাবরেটেরি নির্মিত হইতেছে। সদা ভঙ্গশীল খরস্রোতা পদ্মানদীর উপকণ্ঠবর্তী পল্লীপ্রান্তে এই আশ্রম বাটিকায় অল্পদিন মধ্যে অনেকগুলি ইষ্টক নির্মিত অট্টালিকাদি প্রস্তুত হইয়াছে এবং উল্লিখিত নানারূপ অনুষ্ঠানের কল্যাণে নানাদিক দেশিয় শিষ্যমণ্ডলী ও দর্শকগণের সমাগমে ধর্ম ও কর্মের সম্মিলনে ব্রাহ্মণের নির্জন ও শান্তিপূর্ণ আশ্রম বাটিকা জনবহুল নানা অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়া এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

এই আশ্রমের সংস্রবে কাশীপুর সরস্বতী প্রেস হইতে **শাশ্বত সংবাদ** নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হইত। এক্ষণে উক্ত প্রেস পাবনায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। উক্ত পত্রে সৎসঙ্গ ধর্মমতের আলোচনা এবং শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও কলাবিদ্যাদি সম্বন্ধীয় মৌলিক তথ্যপূর্ণ বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত এবং উক্ত আশ্রম হইতে তৎসমুদয় কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইত। উহাতে এখনও অনেক নূতন নূতন তথ্যাদির আলোচনা হইয়া থাকে। সৎসঙ্গের কার্যাদির প্রসার হেতু হিমাইতপুরে একটি পোস্টাফিস থাকা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র আশ্রমের কার্যনির্বাহ জন্য সৎসঙ্গ নামে একটি নূতন পোস্টাফিস এখানে স্থাপিত হইয়াছে।

প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে তালনবমী তিথিতে শ্রীমন ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে এখানে দরিদ্র নরনারায়ণের সেবা ও সংকীর্তনাদিতে যোগদান নিমিত্ত পাবনা জেলা, বঙ্গ ও অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান বহু শিষ্য ও দর্শকমণ্ডলী এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত দৈনিক এখানে অতিথি সৎকারাদির ব্যবস্থা আছে। মোটের উপর এই আশ্রম হইতে প্রচারিত ধর্মমত এবং এখান হইতে অনুষ্ঠিত কার্যাবলী সর্বথা সফলতাসহকারে প্রচারিত হইলে যে, দেশে ধর্ম ও অর্থের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাবনা জেলার মুখ গৌরবমণ্ডিত হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বেলুড়, দক্ষিণেশ্বরাদি স্থান ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এবং এই জেলার গুরুসত্য ধর্ম প্রচারক চিথলিয়ার ঠাকুর শম্ভুচাঁদের বার্ষিক জন্মোৎসবাদির ন্যায় হিমাইতপুরেও ঠাকুরের এই জন্মোৎসব পাবনা জেলা ও ভিন্ন জেলাবাসিদিগের পক্ষে বার্ষিক এক আনন্দোৎসবে পরিগণিত হইবে।[১]

হিমাইতপুরাদি গ্রামে পূর্বে যে কতিপয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির বাস ছিল, তাহা নিম্নলিখিত কবিতাংশ হইতে সূচিত হইয়া থাকে। যথা—

প্রতাপপুরে রামসুন্দর ঈশান নাজিরপুর।
তিনগাছার ঘনশ্যাম, এরা তিনই অসুর।।

রামসুন্দর—রামসুন্দর চৌধুরী, **ঈশান**—ঈশানচন্দ্র মজুমদার, **ঘনশ্যাম**—ঘনশ্যাম চোবে। সাতিশয় ধনবান না হইলেও ইহাদের প্রত্যেকেরই সবিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা প্রত্যেকেই স্বীয় কৌশলে ও নানারূপ কুচক্রজাল বিস্তারপূর্বক বহু লোককে আজ্ঞাধীন রাখিতে সমর্থ ছিলেন।

মালঞ্চি, পয়দা দিং ঃ

পাবনা হইতে প্রায় ৪ চারি মাইল পূর্বোত্তরে ইছামতী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত মালঞ্চি গ্রাম একটি প্রাচীন বারেন্দ্র কায়স্থপ্রধান পল্লী বলিয়া পরিচিত। সাধারণত নলমুড়া, ভুরভুরা ও মালঞ্চি একত্রে এক মালঞ্চি নামেই খ্যাত হইয়া থাকে। খাস মালঞ্চিতে লাহিড়ী, অধিকারী, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য প্রভৃতি উপাধিক ব্রাহ্মণ, রায় সরকার উপাধিক কায়স্থ, সূত্রধর, বৈশ্য সাহা আদি হিন্দু এবং নলমুড়াতে বহু মৎস্য ব্যবসায়ী নিকারি পাঝার প্রমুখ বহু মুসলমানের বাস। পূর্বে এখানে ২০/২২ ঘর তন্তুবায় ও ১৫/১৬ ঘর কাঁসারি জাতির বাস ছিল। তাহারা যথাক্রমে উৎকৃষ্ট কাপড় ও তামা, পিতল, কাঁসার জিনিস তৈয়ার করিত।

মালঞ্চির বর্তমান সরকার উপাধিক বারেন্দ্র কায়স্থগণ এখানকার প্রথিতনামা ও অবস্থাপন্ন ভূম্যধিকারী বলিয়া পূর্বাপর পরিচিত। স্থাবর সম্পত্তি অনেকাংশে বর্তমানে ইহাদের হস্তচ্যুত হইলেও, জমিদার বলিয়া ইহাদিগের এখনও বিশেষ খ্যাতি আছে। ইহারা এক সময়ে প্রতিপত্তিশালী ও সর্ববিষয়ে অগ্রবর্তী ছিলেন। পাবনা অঞ্চলে মুদ্রাযন্ত্র সর্বপ্রথম ইহাদের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সরকার জমিদারগণের উৎসাহ ও যত্নে পরিচালিত দিবাকর প্রেস নামক মুদ্রাযন্ত্র হইতে পূর্বে **বার্তাবহ** নামক একখণ্ড সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। উক্ত প্রেস অবশেষে উঠিয়া গেলে তাহাই স্থানান্তরিত হইয়া ক্রমে পাবনায় বর্তমান ছাপাখানাদির সূত্রপাত করিয়াছে।

এই সরকার পরিবারস্থ ভূতপূর্ব সবজজ স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র সরকার মহাশয় বহু বিস্তৃত দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের টিকাকারক ; এতদ্ব্যতীত ইহার প্রকাশিত আরও কয়েকখানি আইন পুস্তকের টিকা অতি সমাদরে বাজারে বিক্রি হইয়া থাকে। ইঁহারই নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানে ইহার পুত্রগণ কর্তৃক পরিচালিত কলিকাতার প্রসিদ্ধ M. C. Sarcar & Co. নামক পুস্তক বিক্রয়ের দোকান এক্ষণে তথায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং তথা হইতে

বার্ষিক বহু প্রকার পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে। মহিমবাবুর পুত্রগণের মধ্যে একজন মুন্সেফ এবং একজন উকিল আছেন। সরকার জমিদারগণের বাটিতে পূর্বে বিশেষ সমারোহসহ দোল-দুর্গোৎসবাদির অনুষ্ঠান হইত। এই সরকার বংশ ব্যতীত এখানে আরও কয়েক ঘর সরকার উপাধিক কুলীন কায়স্থ ছিলেন, তাহারা এক্ষণে ভিন্ন স্থানে গিয়াছেন। পূর্বে মালঞ্চি গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মনীষী অধ্যাপকগণের বাস ও এখানে কয়েকটি প্রসিদ্ধ চতুস্পাঠি ছিল বলিয়া জানা যায়। এখনও এখানে ভট্টাচার্য ও গৃহাচার্য প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস আছে। কালে এখানে যে সমৃদ্ধিশালী লোকের বাস ছিল, এখানকার অদ্যাপি জঙ্গল মধ্যে পরিদৃশ্যমান ভগ্ন অট্টালিকা সমূহ ও জঙ্গল মধ্যে ইতস্ততঃ লুক্কায়িত দীর্ঘিকাদিতে তাহা সূচিত হইয়া থাকে। এই গ্রাম নিবাসী মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় কাশীতে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ বলিয়া পরিচিত হইতেন। মালঞ্চির গোবিন্দ্রচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বঙ্গদেশে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। উপরোক্ত মহিমবাবু ব্যতীত মালঞ্চির অনেকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশেষ বিশেষ কার্যোপলক্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। সরকার বংশীয় শ্যামলাল সরকার মহাশয় নাটোরে এবং কৃষ্ণলাল সরকার মহাশয় দিঘাপতিয়া স্টেটের দেওয়ান ছিলেন। অমৃতলাল সরকার মহাশয় চিত্রাঙ্কন বিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রথম জীবনে ভোগবিলাসে লিপ্ত থাকিয়া শেষে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করতঃ বাজার সন্নিকটস্থ তদীয় উদ্যান বাটিকায় একটি প্রস্থর নির্মিত শিবলিঙ্গ মূর্তি স্থাপন করেন। মালঞ্চির লাহিড়ী বংশীয় রুদ্রকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ও দিঘাপতিয়া স্টেটের দেওয়ান ছিলেন; অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তি সেবায় তিনি বিশেষ মুক্তহস্ত ছিলেন, দৈনিক বহু লোককে অন্নদানে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। শেষ জীবনে তিনি রিক্ত হস্তে কাশীধামে গমন করিয়া দিঘাপতিয়া রাজের অনুগ্রহে জীবিতকাল অতিবাহিত করেন। হরিশচন্দ্র লাহিড়ী নামেও এখানে একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন।

এখানে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি প্রাইমারি বিদ্যালয়, দৈনিক বাজার ও সাপ্তাহিক শুক্রবার মঙ্গলবারে হাট এবং একটি পোস্টাফিস বর্তমান আছে। এইটি বর্তমানে ভুড়ভুরার সীমানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। বাজারের সমীপবর্তী গ্রামের সাধারণ কালীবাড়িতে পূর্বে অতি সমারোহে বারুণী সময়ে বারইয়ারি পূজা ও তদুপলক্ষে নৃত্যগীতাদির সবিশেষ অনুষ্ঠান হইত।

মালঞ্চি হইতে প্রায় দেড় মাইল পূর্বোত্তরাংশে **রহিমপুর** ও **পয়দা** পরস্পর সংলগ্ন দুইটি গ্রামই বারেন্দ্র কায়স্থ প্রধান প্রাচীন গ্রাম। রহিমপুর বর্তমানে একেবারে জঙ্গলাকীর্ণ ও সম্পূর্ণ বাসের অনুপযুক্ত। এক সময়ে এই গ্রামে বহু বারেন্দ্র শ্রেণীর অগ্রণী কায়স্থগণের বাস ছিল। এখানে এখনও জঙ্গল মধ্যে রায় ও মজুমদার উপাধিক ২।১ ঘরের বাস আছে। এক সময়ে এখানকার রায়, নন্দী মজুমদার উপাধিক কায়স্থগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও সমৃদ্ধ ছিলেন। জানা যায় রহিমপুরের কেলীকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয় রাজশাহী জেলার সদর স্টেশন মুরশিদাবাদের অধীন মুরাদাবাদে থাকা কালে (১৭৮৩ খৃঃ) ওকালতি করিতেন; আইন ব্যবসায়ে তর্ক-বিতর্ক করিতে হয় জন্য চলিত ভাষায় তিনি বাগদণ্ডের বা বাগ্‌ডম্বরের উকিল বলিয়া পরিচিত হইতেন। তৎকালীন ওকালতিতে তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। এই গ্রামের ব্রজকান্ত রায় মহাশয় সাবেক জুনিয়াবি সিনিয়ারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পদবীতে সরকারি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তদীয় সহোদর গৌরকান্ত রায় তাড়াস মুৎসদ্দী তরফে দেওয়ানি কার্য করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। এখানকার রায় পরিবারস্থ জনৈক যাদবানন্দ রায় পাবনার একজন বিশিষ্ট উকিল ছিলেন। রায় পরিবারের বাটিতে গোপীনাথ বিগ্রহের দৈনিক সেবা প্রচলিত ছিল। উক্ত বংশ বিলুপ্ত হওয়ায় বিগ্রহটি **বাদেখালি** আখড়ায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, সম্পত্তি তাহাদের ভাগিনেয় কুলের মজুমদারগণ ভোগ করিতেছেন। রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত গ্রামের বাহিরে ইষ্টক নির্মিত বর্তমানে কণ্টকাদিতে সমাচ্ছন্ন দোলমঞ্চ ও নিবিড় জঙ্গলাদির অভ্যন্তরে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত

সুবৃহৎ দীর্ঘিকাদি জলাশয়ে এখানকার পুর অধিবাসীগণের প্রাচীন ক্রিয়াকলাপের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

নিকটবর্তী পয়দা একটি কায়স্থ জমিদার প্রধান গ্রাম বলিয়া পরিচিত। রায় উপাধিক বর্তমান ভূম্যধিকারী মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতামহ চৈতন্য রায় মহাশয় এক সময়ে এখানে অতি তেজস্বী ও প্রতিপত্তিশালী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহারা বিশেষ সাত্বিক ও পরম বৈষ্ণব বলিয়া এই বংশের অশেষ খ্যাতি আছি। ইহাদের বাটিতে শতাধিক বৎসরের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ মূর্তির দৈনিক সেবাপূজা প্রতিষ্ঠিত আছে। দান দাতব্য ও অতিথি সৎকার বিষয়ে এই বংশ পূর্বাপর প্রসিদ্ধ। পাবনায় এ ভি স্কুল নামক মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের পাকা গৃহ নির্মাণ সময়ে এই জমিদার স্টেট হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। প্রকাশ ইহাদের পূর্বপুরুষ কুচবিহার রঙ্‌পুরাদি অঞ্চলে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে চাকুরিজীবী ছিলেন ; তিনি তৎকালোচিত বিধি ব্যবস্থাহীন "জোর যার মুল্লুক তার" ধনোপার্জন করিয়া পরিশেষে বহু স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। পাবনা জেলায় ইহাদের সম্পত্তি বেশি নাই, রঙ্‌পুরাদি উত্তরাঞ্চলেই ইহাদের জমিদারি আদি স্থাবর সম্পত্তি অত্যধিক। পূর্বে পয়দায় একটি সাপ্তাহিক হাট বসিত ; এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামে মাত্র ২।৩ ঘর কায়স্থ, ২।১ বৈশ্য সাহা রাজবংশী এবং কতিপয় মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন লোকালয় বিদ্যমান নাই। জমিদার প্রধান স্থান হইলেও মালঞ্চি হইতে পাবনা পার্শ্বডাঙা রোডের অবস্থা এখানে অতীব শোচনীয়।

নিকটবর্তী **সেখুপুর** গ্রামে এক সময়ে নন্দী উপাধি বিশিষ্ট বহু বারেন্দ্র কায়স্থগণের বাস ছিল ; ইহা এক্ষণে জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

মালঞ্চির নিচে ইছামতী নদীর পূর্বপারে **রাজাপুর, মহেন্দ্রপুর** আদি কয়েকটি জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীতে পূর্বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বারুজীবী ঘোষ প্রভৃতি বহু হিন্দু জাতির বাস ছিল। এক্ষণে ২।৩ ঘর ব্রাহ্মণ ও কয়েক ঘর বারুজীবী জাতি মাত্র রাজাপুরে বাস করে। এখানকার রায় উপাধিক ব্রাহ্মণগণ নায়সী (নন্দনাবাসী) গাঁই নিরাবিল পঠির শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ রাজশাহী জেলায় তাহেরপুরের রাজবংশসম্ভূত বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহাদের পূর্বপুরুষ জনৈক মুকুন্দনারায়ণ রায় রাজা কংসনারায়ণের সময়সাময়িক। মুসলমানদিগের সহায়তা করায় ইনি উক্ত রাজা কর্তৃক নির্বাসিত হন এবং তজ্জন্য সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক পূর্বাঞ্চলে আসিয়া বাস করেন, কালক্রমে ইছামতী তীরস্থ তৎকালীন সমৃদ্ধ মালঞ্চি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। ক্রমশ নদীর অপর পারে স্থায়ী হন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে কুলীনত্বের হিসাবে উদয়াচল অস্তাচল নামে প্রবাদের মধ্যে তাহেরপুর রাজের অস্তাচলের প্রবাদের ন্যায় ইহাদের অস্তাচল সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহাদের বাটিতে দোল দুর্গোৎসবাদির পূর্বে বিশেষ সমারোহ হইত। ইহাদের উদ্যোগে রাজাপুরে একটি সাধারণ কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় প্রতি বৎসর চড়ক পূজার মেলাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই রায় বংশে অনেক শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি জন্মিয়াছেন। এই বংশীয় কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় পাবনায় পূর্বে উকিল ছিলেন। তৎপুত্র মতিলাল রায় এম এ এক্ষণে গভর্নমেন্টের অডিটার নিযুক্ত আছেন।

গয়েশপুর দিং ঃ

পাবনা হইতে প্রায় ছয় মাইল পূর্বাংশে ইছামতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত গয়েশপুর, ইয়াকুবপুর, সালাইপুর. জালালপুর, হামিদপুর এবং নদীর উত্তর পারে ইস্‌মালী (ইসলামপুর) আদি নামে পরস্পর সংলগ্ন কয়েকটি প্রাচীন পল্লীর অবস্থান ও নাম দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই সমুদায় গ্রাম পূর্বতন মুসলমান অধিকারকালে ও তাহাদের প্রাধান্য সময়ে স্থাপিত অথবা উক্ত রাজত্বকালে পাঠানাদি আমলে তাহাদের বিজয়চিহ্নস্বরূপ হিন্দু নামের পরিবর্তে প্রাদেশিক শাসনকর্তা কিংবা বিজয়ী সৈন্যধ্যক্ষগণের নামানুসারে রূপান্তরিত অথবা তাহাদের

কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নিবিড় জঙ্গল মধ্যে ইয়াকুবপুর ও গয়েশপুর গ্রামে এখনও কয়েকটি ইষ্টক নির্মিত ভগ্ন মসজিদ স্তূপ ও তাহার ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। জানা যায় ইয়াকুব গ্রাম সংলগ্ন চক্‌লখাই নামে যে একটি সিদ্ধ নিষ্কর এখনও বর্তমান আছে তাহা এখানে জনৈক খাঁ উপাধি বিশিষ্ট মুসলমান বংশের কার্যবিশেষের পারিতোষিকরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। মোঘল আমলে ইসলাম খাঁর বঙ্গশাসন সময়ে (১৬০৮—১৩ খৃঃ) ইছামতী নদীর তীরে গয়েশপুর এবং একদন্ত মধ্যবর্তী ত্রিমোহিনী নামক স্থানে যুদ্ধাভিনয় হইয়াছিল এমত জানা যায়। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় ১৩২৯ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসী পত্রিকায় বাঙ্গালায় স্বাধীন জমিদারের পতন শীর্ষক প্রবন্ধে এবং পাবনা জেলার জমিদার দমন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, জনৈক মুশা খাঁ উক্ত মোঘল সেনাপতি ইসলাম খাঁর সহিত তৎকালে এই জেলার ইছামতী নদীতীরে ও অন্যান্য স্থানে যুদ্ধাভিনয়ে লিপ্ত ছিলেন এবং তাহাকে দমন উদ্দেশ্যে এই জেলায় এতদঞ্চলে বাদশাহী সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছিল। এই সমুদয় পাঠান নামাত্মক পল্লীসমূহ হইতে বোধ হয়, সম্ভবত এতদঞ্চলে তৎকালে বিদ্রোহী পাঠান সরদারগণ বাস করিতেন অথবা বাদশাহী সৈন্যদলের প্রধান সেনানিগণ তখন হইতে এই সমুদয় পল্লীতে স্থায়ী হইয়াছিলেন সে জন্য তাহাদের নামানুসারেই এই সকল পল্লীর এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

এই সকল পল্লী অধিকাংশই এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ ও প্রায় লোকশূন্য। স্থানে স্থানে ২।৪ ঘর মুসলমান ও ক্বচিত ২।১ জন্য হিন্দু পরিবারের বসতি আছে ; তাহাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন, তনু শীর্ণ ও মন উৎসাহহীন ; জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীর স্বাস্থ্যহীনতাই এই গ্রামসমূহের জনশূন্যতার প্রধান কারণ। একমাত্র গয়েশপুর ব্যতীত অন্যান্য পল্লীগুলির অবস্থা অতীব শোচনীয় ও উৎসন্ন প্রায়। গয়েশপুরে শনি মঙ্গলবারে একটি হাট বসে। পূর্বে এই হাট সাতিশয় প্রবল ছিল। হিন্দু অধিবাসী মধ্যে এখানে সরকার, কর, ভুইএগ্র আদি উপাধিক কায়স্থ, গোস্বামী, অধিকারী, মৈত্র খ্যাত ব্রাহ্মণ এবং সাহা উপাধিক কয়েকঘর বৈশ্যজাতির বাস আছে। অন্য হিন্দু সংখ্যা মুষ্টিমেয়। মুসলমানগণ মধ্যে পূর্বে গয়েশপুর ও ইয়াকুবপুর উভয় গ্রামেই বহু বস্ত্রবয়নকারী কারিকর, খুলু আদির বাস ছিল। এক্ষণে তাহাদের সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে। জনসংখ্যার হ্রাসহেতু লোকালয় জঙ্গলে পরিণত হইতেছে, চাষী গৃহস্থগণ হাল-লাঙলের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাঁশ কাটাদি পাবনা বাজারে নগদ মূল্যে বিক্রি করিয়া জীবিকার্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং ক্রমে মাঠান জমির অধিকাংশ পতিত থাকিয়া উলুখড়ের জমিতে পরিণত হইতেছে। এই সমুদয় গ্রামে বহু বাঁশ জন্মে, প্রতি বৎসর বর্ষাকালে লোকে তাহা “মার” বাঁধিয়া বেড়া নাকালিয়াদি অপ্তলে লইয়া গিয়া শতকরা ৮/১০ টাকা হইতে ২৫/৩০ টাকা দরে বিক্রি করিয়া থাকে। ইছামতী নদী ভিন্ন অন্য কোন জলাশয়ের জল ব্যবহারোপযোগী নহে ; তাহাও নদী ক্রমশ ভরট্ট হইয়া যাওয়ায় বিশেষ জলকষ্ট অনুভূত হয়। গয়েশপুরে সরকারপাড়া, করপাড়া, ভুঁইএগ্রপাড়া, হালুটে পাড়া নামে কয়েকটি পাড়া বর্তমান আছে।

গয়েশপুর গ্রামে কাণসোনার দেব বংশীয় সরকার উপাধিক কায়স্থগণ ঢাকা জেলার অধীনস্থ প্রসিদ্ধ পল্লীর ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের শিষ্য। প্রবাদ ইঁহাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ অতিশয় দুর্দান্ত ও অত্যাচারী ছিলেন। উক্ত পল্লীর ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের জনৈক মহাত্মা ইছামতী নদী দিয়া গমন সময়ে উক্ত সরকারদিগের জনৈক পূর্বপুরুষ কর্তৃক পথে আক্রান্ত হন, কিন্তু তদীয় সাহস ও অসাধারণ ক্ষমতা দর্শনে উক্ত সরকার মহাশয় পরিশেষে উক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের গুণাবলী প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ পূর্বক শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। উক্ত ভট্টাচার্য বংশীয় কাশীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় দিব্য ভাবাপন্ন হইয়া তপস্যা নিরত থাকিতেন। পূর্বে সরকার মহাশয়দিগের বংশে পুত্র সন্তান জীবিত থাকিত না, তজ্জন্য উক্ত ভট্টাচার্য মহাশয় এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন সংস্থাপনপূর্বক নানারূপ যাগযজ্ঞাদি সাধন করায়

এক্ষণে উক্ত বংশে পুত্র সন্তান জীবিত থাকে বলিয়া জানা যায়। উক্ত আসন এখনও এখানে বর্তমান আছে। এই সরকার বাবুদিগের প্রতিষ্ঠিত আখড়া ও তাহাদিগের দত্তা বৈষ্ণবোত্তরাদি এখনও গয়েশপুর ও চৈত্রহাটি গ্রামে বর্তমান আছে। এই সরকার বংশীয় যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত এক খণ্ড প্রাচীন দলিল দৃষ্টে জানা যায় মণ্ডল উপাধিক ইহাদের জনৈক পূর্বপুরুষ পরগণে বাজুচপ্ল সরকার মহম্মদাবাদ মৌজে গয়েশপুর মধ্যে খানাবাড়ি দিগর ॥৹ আট পাকি জমি খানাবাড়ি জন্য সৎকার্যের পুরস্কার স্বরূপ ইনাম বা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দলিলে ৪টি সিলমহর আছে, তন্মধ্যে ৩য়টি স্পষ্ট বুঝা যায়, তাহাতে মহম্মদ সাহ সুজা, ১০৯৩ লিখিত আছে, অন্য তিনটি অস্পষ্ট, দলিলের শেষে ৯৩।২৩ আশ্বিন লিখিত আছে, তাহা ১০৯৩ কি ১১৯৩ তাহা বুঝিতে পারা যায় না। দলিলের পার্শ্বে "ইন্দ হয় গাই খায়, মুসলমান হয়, হারাম হাএ" এমত লিখিত আছে। দলিলের শিরোভাগে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সহায় লিখিত আছে ইহাতে বোধ হয় ইহা কোন হিন্দু অথবা মুসলমান বাদশাহের নিযুক্তীয় হিন্দু কর্মচারি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।

গয়েশপুর গ্রামের করপাড়ায় শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের একটি আখড়া বা দেবালয় বর্তমান আছে। ইহার জন্য কিয়ৎপরিমাণে দেবত্র জমি নির্দিষ্ট আছে। পূর্বে অতি সমারোহে এই বিগ্রহের রথযাত্রা ও গয়েশপুরের হাটখোলায় গোষ্ঠযাত্রার উৎসবোপলক্ষে বিশেষ সমারোহ হইত।

দোগাছি দিং ঃ

পাবনা হইতে প্রায় ৪ চারি মাইল দক্ষিণ পূর্বাংশে পদ্মাতীরে অবস্থিত দোগাছি একটি প্রাচীন পল্লী। এখানে তিলি জাতীয় বহু ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মহাজনের বাস। এতদ্ব্যতীত মজুমদার, অধিকারী, চক্রবর্তী উপাধিক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ হিন্দু ও বস্ত্রবয়নকারী বহু কারিকর ও সাধারণ মুসলমানের বাস আছে। দোগাছি সংলগ্ন কুলনা নামক পাড়ায় পূর্বে বহু তন্তুবায় জাতির বাস ছিল এবং এক্ষণেও অল্প পরিমাণে আছে। এখানকার উরাণী চাদর এক সময়ে অতি সমাদরে বিক্রি হইত। পাবনাজাত পাবনাই ধুতি যাহা ইতিপূর্বে অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া বাজারে প্রচলিত ছিল, তাহার অধিকাংশই দোগাছি হইতে আমদানি হইত ; এখানকার ধুতি ও চাদর ঢাকাই মসলিনের সহিত প্রতিযোগিতায় বিক্রি হইত।

দোগাছিতে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার হাট লাগিয়া থাকে। বৃহস্পতিবারে গো মহিষাদি আমদানি হয়। এখানকার হাটে ধান, পাট, তরকারি আদি নানাবিধ দ্রব্য খরিদ বিক্রি হইয়া থাকে। এখানে তাঁতে প্রস্তুত বহু দেশিয় গামছা ও চাদরাদি পাওয়া যায়। পদ্মানদীতে এই গ্রামের অনেকাংশ ভাঙিয়া গিয়াছে। হাটখোলা ও মহাজনদিগের কয়েকটি গোলাবাড়ি পদ্মাগর্ভে নিপতিত হইয়াছে। কুণ্ডু বাবুদিগের সাহায্যে ও সাধারণের চেষ্টায় পরিচালিত যে একটি দেবালয় এখানে বর্তমান আছে, তাহাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামে একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় ও পোষ্টাপিস বহুদিন হইতে বিদ্যমান আছে। এখানে বিশেষত কুলনা নামক পাড়ায় অনেকগুলি প্রাচীন দীর্ঘিকা বর্তমান আছে।

দোগাছি গ্রাম এক সময়ে ভূষণা পরগণার সুপ্রসিদ্ধ সীতারাম রায়ের ভূসম্পত্তির অন্তর্গত ছিল, তাহার নিদর্শন তৎপ্রদত্ত ব্রহ্মত্রাদির দানপত্রে জানিতে পারা যায়। লিখিত আছে—"পাবনা দোগাছি প্রভৃতি স্থলে সীতারাম রায়ের পুষ্করিণী দেখা যায়। পাবনার ভোলানাথ অধিকারী মহাশয়ের গৃহে তাহাদের বাটির বিগ্রহের দেবত্র সম্পত্তির দলিল ছিল। সেই দলিল মধ্যে দোগাছি গ্রাম মধ্যে ১২ বিঘা নিষ্কর সম্পত্তি সীতারাম রায়ের ছিল। ঐ জমি বার্ষিক ৮ টাকা করে রামকুমার তন্তুবায়ের মধ্যে জমা ছিল। সে পাট্টা এই ঃ—

"ইয়াদি কিদ্দ শ্রীরামকুমার তন্তুবায় সুচরিতেষু কস্য শুভ পাট্টা পত্র মিদং সন ১২৬৭

সালাব্দে লিখিনং কার্যাঞ্চাগে জেলা পাবনার দোগাছি গ্রামে চক চারাতলায় রাজা সীতারাম রায় দত্তা গোপীনাথ ঠাকুরের ১২ বিঘা জমি তোমাকে ৮ টাকা জমায় দিলাম। ইহার সীমা সরাদ্দ ঠিক রাখিয়া নিরূপিত কর আদায় করিবে। খাজনা আদায়ে শৈথিল্য করিলে আইন আমলে আসিবে। এতদর্থে কবুলিয়ত গ্রহণে পাট্টা দিলাম সন সদর ৮ চৈত্র।

এই দলিলে স্বাক্ষর আছে ৩টি নাম। ১মটি অপাঠ্য, অপর ভোলানাথ ও গোবিন্দচন্দ্রের নাম পড়া যায়। ইহাতে সাক্ষী আছেন হরিশ্চন্দ্র শর্মা, মহিমচন্দ্র জোয়াদ্দার ও গোপালচন্দ্র সরকার। *(শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য কৃত "রাজা সীতারাম রায় ২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।")*

কুলনা নামক পাড়ায় ক্ষত্রিয় বংশীয় কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নামক জনৈক ভূম্যধিকারীর বাস ছিল। তাহার ভূসম্পত্তি নানা প্রকার মামলা মোকদ্দমায় তদ্বীয় বংশধর মৃত প্রাণনাথ রায় মহাশয়ের সময়ে বিনষ্ট হইয়াছে। এখনও তাহাদের সুবৃহৎ দীর্ঘিকাদি ও ইষ্টক নির্মিত দ্বিতল অট্টালিকা বর্তমান আছে। দোগাছির মহাজন ব্যবসায়ী কুণ্ডু বাবুরা এই রায় বংশীয়দিগের ভূসম্পত্তি খরিদ করিয়া জমিদার পদবীতে উন্নীত হইয়াছেন। কুলনাতে অতি প্রাচীন সময় হইতে সাধারণ উদ্যোগে পরিচালিত একটি বিগ্রহের আখড়া প্রতিষ্ঠিত আছে।

দোগাছি হইতে প্রায় ১ মাইল পূর্বাংশে **চিথলিয়া** গ্রামেও বহু শিক্ষিত ব্যক্তির বাস আছে। পূর্বে এখানে বহু সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়িগণের বাস ছিল। এখানকার পাল উপাধিক মহাজনদিগের বহু বিস্তৃত কাট ও মুগী চাউলের কারবার ছিল। মজুমদার উপাধিক ব্রাহ্মণগণেরও পূর্বে কারবার থাকা জানিতে পারা যায়। এখানকার মজুমদার বংশও বিশেষ প্রসিদ্ধ ও বহু স্থানে বিস্তৃত। এই বংশেই কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাল মজুমদারগণের পূর্বে বহু কারবারি সায়ায়ের নৌকা ছিল। মাহিষ্য জাতীয় সরকার পরিবার চিথলিয়ায় বিশেষ শিক্ষিত। এই বংশীয় গোপালাচন্দ্র সরকার মহাশয় নানা স্থানে দক্ষতার সহিত গভর্নমেন্টের স্কুলের হেড মাস্টারি পদে কাজ করার পর রাজশাহী বিভাগের স্কুলসমূহের দ্বিতীয় ইনস্পেক্টর পদবীতে উন্নীত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কয়েক বৎসর হইলে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

এখানকার পাল বাবুদের বাটিতে বার্ষিক শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে পূর্বে অতি সমারোহ হইত। এই গ্রামের সাধারণের উদ্যোগে একটি নাট্যাভিনয়ের দল আছে। দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী ও দুর্গোৎসবাদি পর্বোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে এই সখের দল কর্তৃক নানাপ্রকার আমোদ উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পাল বাবুদিগের পরিচালিত একটি ঠাকুরবাড়িতে রাধাগোবিন্দ মূর্তির দৈনিক সেবাপূজার বন্দোবস্ত আছে। উক্ত বিগ্রহের বার্ষিক রথযাত্রা উপলক্ষে চিথলিয়ায় বিশেষ সমারোহ ও মেলা লাগিয়া থাকে। দোগাছির ন্যায় পদ্মা এই গ্রামটিকেও অনেকাংশে উদরসাৎ করিয়াছে।

ভাউডাঙা দিং ঃ

দোগাছি হইতে প্রায় ১॥ দেড় মাইল পূর্বাংশে **ভাঁড়ারা** এবং তৎপূর্বাংশে ভাউডাঙা নামে দুই প্রাচীন পল্লীতে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও হিন্দু পরিবারের বাস আছে। ভাঁড়ারার খাঁ উপাধিক মুসলমানগণ এখানকার প্রাচীন জমিদার বলিয়া পরিচিত। ইহাদের পূর্বপুরুষ জনৈক আছালত খাঁ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিজরী ১১৭৬ সালের ইষ্টক নির্মিত একটি পাকা মসজিদ ইহাদের বাটি সংলগ্ন পদ্মাতীরে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এই খাঁ জমিদারগণের প্রদত্ত অনেক জায়গিরের নিদর্শন আছে। গ্রামে মুসলমানের বাস অধিক। কুলা চালুন আদি প্রস্তুতকারক "ঋষি" নামক মুচি জাতীয় অনেকগুলি লোক দোগাছি ও ভাঁড়ারার সান্নিধ্যে বাস করে। বাঁশ ও বেত্রাদি নির্মিত দ্রব্য তৈয়ার ইহাদের ব্যবসায়। এখানে সাপ্তাহিক রবিবার ও বুধবারে হাট লাগিয়া থাকে। ভাঁড়ারা সংলগ্ন ভাউডাঙা গ্রামে রায়, মৈত্র উপাধিক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং গোপ (গোয়াল), হালদার, রাজবংশী প্রভৃতি হিন্দু এবং অনেক মুসলমানের বাস আছে। পূর্বে

এখানে একটি প্রধান নীলকুঠি ছিল। তাহাতে এখানকার রায় উপাধিক ব্রাহ্মণগণ দেওয়ানি কার্য করিতেন বলিয়া জানা যায়। এই রায় বংশীয় ব্রাহ্মণগণ এক সময়ে এখানে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ইহারা পূর্বে ফরিদপুর জেলাস্থ মেঘনা নামক গ্রামে বাস করিতেন। ইহাদের গৃহে বাদশাহী আমলের প্রদত্ত পারসি অক্ষরে লিখিত একখণ্ড প্রাচীন দলিল আছে তাহাতে ইহাদিগকে কয়েকটি পরগণা প্রদানের উল্লেখ আছে। ইহারা কালে অতি সম্মানী বংশ ও বিত্তশালী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এক সময়ে কয়েক পরগণায় রাজা বলিয়াও খ্যাত হইতেন। কালক্রমে ইহারা স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ নামক ইহাদের কুলদেবতা সহ আসিয়া প্রথমে ভাঁড়ারায় পূর্বে স্থায়ী হন, পরে ভাউডাঙা গ্রামে বসতি বিস্তার করিয়াছেন। ভাঁড়ারার খাঁ জমিদারগণের সহিত ইহাদের পূর্বে বিশেষ সদ্ভাব ও প্রীতি ছিল।

ভাউডাঙায় প্রতি রবিবার ও বুধবারে একটি হাট লাগে ; এখানে একটি প্রাইমারি পাঠশালা বর্তমান আছে। রায় পরিবারের বাটির পার্শ্বে ও গ্রামে অনেকগুলি প্রাচীন দীর্ঘিকা বর্তমান আছে। নিকটবর্তী **হরিতলা দেবালয়** প্রভৃতি পদ্মাতীরস্থ গ্রামে বহু মৎস্যব্যবসায়ী ধীবর জাতি বাস করে। হরিতলা বর্তমান সময়ে ধান্য চাউলাদি খরিদ বিক্রয়ের এক প্রধান বন্দর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এখানে ভিন্ন জেলাবাসী ঘোষ ও মুসলমানগণের কয়েকটি আড়তে ধান্যাদি সর্বদা আমদানি হয়। এখানকার বাজারে গঙ্গা পূজা উপলক্ষে বারইয়ারি পূজার বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে।

দুবিলা দিং ঃ

পাবনা হইতে প্রায় ৮ আট মাইল দক্ষিণ পূর্বাংশে সুজানগর মথুরা রোডের উপর অবস্থিত দুবিলা একটি বন্দর বা গোলা বিশেষ। এখানে প্রতি রবিবারে ও বুধবারে একটি সাপ্তাহিক হাট লাগে। ধান, পাট, পটলাদি নানাপ্রকার দ্রব্যাদি আমদানি হয়। এখানে একটি পোস্টাপিস আছে। সরস্বতী পূজা সময়ে এখানে একটি বারইয়ারি মেলা বসিয়া থাকে। কয়েকজন ডাক্তারের ঔষধালয় ও অনেকগুলি দোকান আছে।

নিকটবর্তী কোলাদি গ্রামে ভৌমিক উপাধিক কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও কয়েক ঘর কায়স্থ প্রমুখ হিন্দু ও অনেক মুসলমানের বাস আছে। দুবিলা হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বে **সাদুল্যাপুর** গ্রামে অনেক বস্ত্র বয়নকারী কারিকরের বাস আছে ; তাহারা দেশিয় তাঁতে বহু প্রকার কাপড় ধুতি চাদরাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই গ্রামে জোয়াদ্দার উপাধিক কয়েক ঘর বর্দ্ধিষ্ণু মাহিষ্য জাতির বাস। ইহাদের মধ্যে অনেক অধুনা শিক্ষিত হইয়া নানাস্থানে কর্মোপলক্ষে বিদেশে বাস করিতেছেন। এই গ্রাম পূর্বে পদ্মার অতি নিকটবর্তী ছিল ; গ্রামপার্শ্ববর্তী পদ্মার সোতায় তাহার চিহ্ন বর্তমান আছে, এক্ষণে নদী এখান হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে।

কুঁচিয়ামোড়া দিং ঃ

শাঁখারিপাড়া, কুচিয়ামোড়া, নন্দনপুর প্রভৃতি কয়েকটি একত্র সংলগ্ন গ্রাম বা পাড়া সাধারণত এক কুঁচিয়ামোড়া নামেই পরিচিত হইয়া থাকে। এই গ্রামে কালে অতি সমৃদ্ধ ও বহু জনবহুল ছিল বলিয়া বোধ হয়। এখানকার জঙ্গল মধ্যে প্রাচীন দীর্ঘিকাদি ও ভগ্ন অট্টালিকাদিতে তাহার নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে। কুঁচিয়ামোড়া গ্রামে দৈনিক বাজার ও সাপ্তাহিক মঙ্গলবার ও শনিবারে হাট লাগে। শাঁখারিপাড়া গ্রামে একটি পোস্টাপিস বহুদিন হইতে বর্তমান আছে।

কুঁচিয়ামোড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ পাল, কায়স্থ এবং বৈশ্যসাহা জাতীয় লোকের বাস আছে। ইহা যে কালে একটি বৃহৎ গ্রাম ছিল, তাহা এই গ্রামের শাঁখারিপাড়া নামক এক পাড়া অংশ হইতে প্রতীয়মান হয়। কুঁচিয়ামোড়া গ্রামে বৈশ্য সাহা বংশীয় স্বর্গীয় বনওয়ারীলাল সাহা চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের ঠাকুর বাড়িতে দৈনিক অতিথি সৎকারাদির ব্যবস্থা আছে। এখানে রাসদোলাদি পর্বোপলক্ষে সাময়িক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।

কুঁচিয়ামোড়া গ্রামের সাহা উপাধিক ভূম্যধিকারিগণ বৈশ্য বংশোদ্ভব হইলেও বহুদিন হইল ইহারা জমিদার বলিয়া এখানে পরিচিত আছেন। ইহাদের পূর্ব বিবরণে জানিতে পারা যায় যে, কামদেব সাহা নামক ইহাদের জনৈক পূর্বপুরুষ বাণিজ্য উপলক্ষে পশ্চিমাঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া পরিশেষে এই গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। কার্পাস ও শস্যাদি ক্রয় বিক্রয়াদি বৈশ্য জনোচিত ব্যবসায়াদিতে ইহাদের সবিশেষ উন্নতিলাভ ঘটে। রাজশাহী, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ ফরাসডাঙা প্রভৃতি স্থানে পূর্বে ইহাদের কারবার স্থল ছিল।

ক্রমশ অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে উক্ত কামদেব সাহার পৌত্রগণ জমিদারি ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। অবস্থা বিপর্যয়ে ইহাদের বর্তমানে বাণিজ্যাদি কারবার বন্ধ হইয়াছে, এক্ষণে কেবলমাত্র একটি ভূম্যধিকারী বংশ বলিয়া ইহারা খ্যাত হইয়া থাকেন।

স্বগ্রামে দেবালয় স্থাপন, জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা, রথনির্মাণ, নানাপ্রকার দেবক্রিয়া এবং অতিথিসৎকার জন্য ইহারা বিশেষ মুক্তহস্ত ও প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি গ্রামে স্বর্গীয় বনওয়ারীলাল সাহা চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ি তাহার ধর্মপ্রবণতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই বিগ্রহ বাটিকার সেবাদি ব্যয় নির্বাহার্থ তিনি রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের নামে বার্ষিক প্রায় ১৫০০ পনর শত টাকা আয়ের স্থাবর সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে ইহারা বহু শরিকে বিভক্ত হইয়াছেন। কোন কোন সরিক বিলুপ্ত ও আর্থিক হিসাবে একেবারে নিঃস্ব হইয়াছেন। ইহাদের বাটির নির্মাণ প্রণালী দৃষ্টে অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানে ইহাদের নিবাস সূচিত হইয়া থাকে।

নিকটবর্তী নন্দনপুর গ্রামে মৈত্র উপাধিক ব্রাহ্মণ বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এই বংশীয় জনৈক ব্রজসুন্দর মৈত্র মহাশয় পুলিশ বিভাগে কার্য করিয়া অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ড বিবৃতি নামক একখানি খগোল ও ভূগোল বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মৈত্র বংশের বাটিতে ইষ্টক নির্মিত দ্বিতল অট্টালিকা সমূহ এক্ষণে ক্রমে জনশূন্য হইয়া শৃগালশার্দূলাদির আবাস ভূমিতে পরিণত হইতেছে।

দাপুনিয়া দিং ঃ

পাবনা হইতে প্রায় ৭ সাত মাইল পশ্চিমে সাঁড়া সিলিমপুর রোডের উপর দাপুনিয়া গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটি পোস্টাপিস এবং সাপ্তাহিক রবিবার ও বুধবারে হাট আছে। চৌধুরী, অধিকারী ও মজুমদারাদি কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, কর্মকার, বৈশ্যসাহা, নাপিত প্রমুখ হিন্দু ও অনেকগুলি মুসলমানের বাস আছে। হাটের উপর কয়েকজন দোকানদারের কারবারি গোলাঘর ও কয়েকজন চিকিৎসকের ঔষধালয় বর্তমান আছে।

নিকটবর্তী পদ্মার শাখা রত্নাই নামক স্রোতস্বতীর তীরে গোঁসাইরামপুর (পাবনা হইতে প্রায় ৬ মাইল পশ্চিমে) একটি প্রাচীন পল্লী ; এখানকার গোস্বামীগণ অদ্বৈত বংশোদ্ভব। ইহারা প্রায় চারিশত বৎসর হইল এখানে স্থায়ী হইয়াছেন। ইহাদের বহু শিষ্য ও তাহাদের প্রদত্ত অনেকানেক ব্রহ্মোত্তরাদি বর্তমানে আছে। সীতা অদ্বৈত নামক বিগ্রহাদি ইহাদের বাটিতে দৈনিক পূজিত হইয়া থাকে। বার্ষিক বৈশাখী সংক্রান্তি তিথিতে এখানে মহোৎসব ও নানা প্রকার আমোদাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে পূর্বে ইহাদের অনেক শিষ্য ও দর্শকবৃন্দ উপস্থিত হইত ইহাদের পূর্বপুরুষের গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়া অনেকে ইহাদিগকে যে বহু ভূসম্পত্তি ব্রহ্মোত্তরাদি দান করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন অদ্যাপিও ইহাদের গৃহে প্রাপ্ত তিন শতাধিক বৎসরের ঊর্ধ্বতন সময়ের লিখিত দলিলাদিতে সূচিত হইয়া থাকে। এই বংশীয় জনৈক জগন্নাথ গোস্বামী মহাশয়ের অলৌকিক গুণগরিমায় বিমুগ্ধ হইয়া স্থলচর মানব ব্যতীত জলচর **কুম্ভীর** পর্যন্ত তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। প্রবাদ তাহার সময় হইতে তদীয় পুত্র পৌত্রাদি পর্যন্তও এই বংশের কুম্ভীর শিষ্য ছিল ; ইহাদের বাটিতে বিগ্রহাদির দৈনিক পূজার্চনাদিতে সময়ে সময়ে গীত ও বাদ্য যন্ত্রাদির শব্দে নিকটবর্তী রত্নাই নামক নদীর

ডামস হইতে কুন্তীর শিষ্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইত। গোস্বামীগণ তাহাদিগকে মন্ত্র প্রদান করিতেন এবং প্রবাদ আছে যে ইহাদের বাটিতে পূর্বে কোন ক্রিয়া কর্মোপলক্ষে আবশ্যকমত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একটি ফর্দ লিখিয়া নিকটবর্তী জলাশয় তীরে রাত্রিতে রাখিয়া দিলে, তাহা সময় মত আপনাপনি আসিয়া উপস্থিত হইত, কার্য সমাধান্তে পুনরায় তাহা তথায় পৌঁছাইয়া দিতেন। একদা বাটির জনৈক পরিচারিকা উক্ত প্রকারে প্রদত্ত দ্রব্যাদি মধ্যে একটি বাটি লুক্কায়িত রাখার পর হইতে পুনরায় আর ঐ প্রকার দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না। একশত বৎসর পূর্বেও এই নিয়মে তাহারা অনেক দ্রব্য সরবরাহ করিতেন বলিয়া জানা যায়। ইহাদের বর্তমানেও ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি নানা জাতীয় শিষ্য আছে। তবে পূর্বতন গুণগ্রামের আর সেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। গ্রামে এক্ষণে ইহারা ব্যতীত কয়েক ঘর কৈবর্ত ভিন্ন অন্য কোন হিন্দুর বাস নাই ; অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সাঁড়া

সাঁড়া ঃ

সাঁড়া, বামণগ্রাম, রাজারবাজার প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী বা পাড়া সাধারণত এক সাঁড়া নামেই পরিচিত হইয়া থাকে। পাক্‌সি রেলওয়ে স্টেশন হইতে সাঁড়া প্রায় ১।। মাইল পশ্চিমে পদ্মাতীরে অবস্থিত। ইতিপূর্বে এখানে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল লাইনের পদ্মার পশ্চিম পারস্থ দামুকদিয়াঘাট নামক স্টেশন হইতে যাত্রীগণ পারাপার জন্য ফেরিস্টিমার স্টেশন ছিল ; হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মিত হইবার পর হইতে আরোহিগণের জন্য স্টেশন এখান হইতে উঠিয়া গিয়াছে, এক্ষণে মাত্র মাল গুদাম এবং মাল ও মৎস্যাদি চালান জন্য বুকিং অফিস এখানে বর্তমান আছে। বর্তমানে বামণগ্রাম নামক পাড়ায় পাটনা সার্ভিসের যে স্টিমার স্টেশন আছে, তাহা সাঁড়াঘাট স্টেশন নামে খ্যাত।

সাঁড়ায় পুলিশ স্টেশন, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস বর্তমানে আছে। পূর্বে এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল, তাহা সম্প্রতি ঈশ্বরদিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। মারওয়াড়িগণের উদ্যোগে পরিচালিত এখানে যে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় আছে, তাহা "সাঁড়া মারওয়াড়ি ইনস্টিটিউসন" নামে পরিচিত। এখানে দৈনিক বাজার বসে। মারওয়াড়ি মহাজন ও দেশিয় কারবারি লোকের এখানে দোকান ও আড়ত আছে। বামণগ্রামে সাপ্তাহিক শনি মঙ্গলবারে একটি হাট বসিয়া থাকে। স্থানীয় অধিবাসী মধ্যে গোয়ালা, হলদার আদি হিন্দু ও মুসলমান জাতির বাস আছে। এতদ্ব্যতীত মালপত্রাদি আমদানি রপ্তানি হেতু বহু পশ্চিম দেশিয় হিন্দু ও মুসলমান কুলি এখানে বাস করে। দুই তিন ঘর পশ্চিম দেশিয় গর্নেরি জাতি এখানে বহুদিন হইতে বাস করে এবং তাহারা পূর্বাপর অন্যান্য কার্যাদি সহ ভেড়ার লোম হইতে উত্তম কম্বল তৈয়ারি করিয়া থাকে ; বামণ গ্রামে বহুদিন হইতে একটি বরফের কল প্রতিষ্ঠিত আছে।

পূর্ববঙ্গীয় রেলপথে সাঁড়াঘাট পূর্বে একটি প্রসিদ্ধ স্টেশন বলিয়া গণ্য হইলেও বার্ষিক পদ্মার গতি পরিবর্তন হেতু প্রায় প্রতি বৎসর নদীর ভাঙন জন্য স্টেশনের স্থান পরিবর্তন করিতে হইত এবং নদী পারাপার নিমিত্ত আরোহিগণের ও মালপত্রাদি যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা হইত। প্রায় ৩০ বৎসরকাল চেষ্টার পর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে পাক্‌সিতে ব্রিজ নির্মাণের পর হইতে উক্ত অসুবিধা সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়াছে।

ঈশ্বরদি—পূর্ববঙ্গীয় রেলপথে অধুনা কলিকাতা হইতে ১৪৩ মাইল এবং পাক্‌সি ব্রিজ হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত ঈশ্বরদি একটি প্রধান জংশন। ঈশ্বরদি নামক গ্রামের কতকাংশ রাজশাহী জেলায় অবস্থিত হইলেও রেল স্টেশন ও বাজারাদি সম্পূর্ণই পাবনা জেলার সীমার অন্তর্গত। ঈশ্বরদি সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল লাইনের মুখপাত্র। পাবনা যাতায়াতে এখান হইতে মোটরাদি সর্বদা গতায়াত করে। সাঁড়াঘাটে আরোহিগণের অবতরণ জন্য স্টেশন উঠিয়া যাওয়ায় তথাকার অনেক মহাজন ও ব্যবসায়িগণ এখানে আপনাপন কারবারাদি স্থাপন করিয়াছেন এবং মারওয়াড়িগণের অনেকে এখানে পাকা দ্বিতল গৃহাদি নির্মাণ করিয়াছেন।

এখানে একটি মাইনর স্কুল আছে। সম্প্রতি তাহা উচ্চ ইংরাজি স্কুলে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। খাস ঈশ্বরদি গ্রামে কয়েক ঘর চাষী কৈবর্ত বা মাহিষ্য প্রমুখ হিন্দু ও মুসলমান ব্যতীত কোন স্থায়ী অধিবাসী নাই। স্টেশন নিকটবর্তী স্থান সমূহে মাত্র ব্যবসায়ী মহাজন ও রেলওয়ে আফিসের কর্মচারিবৃন্দের বাসস্থান ব্যতীত ডাকবাঙ্‌লা, পোস্টাপিস, রেলওয়ে ডিসপেন্সারী আদি বর্তমান আছে। স্থানীয় পুকুর ইন্দারা ব্যতীত রেলওয়ে ওয়াটার ওয়ার্কস বর্তমান আছে। তাহাই এখানকার পানীর জলের প্রধান অবলম্বন। এখানে বৃষ্টির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একটি রেন্‌গেজ্ বর্তমান আছে। নিকটবর্তী মৌবারিষা নামক পাড়ার ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কর্মকার, নাপিতাদি হিন্দু এবং অনেক মুসলমান জাতিগণের বাস আছে। এখানে দিঘা নিবাসী সাহা (কুণ্ডু) বাবুদিগের একটি তহশীল কাছারি বাড়িতে প্রতি বৎসর শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ঈশ্বরদি সংলগ্ন পাত্‌লেখালি আদি গ্রামে যশোহর জেলার ভূষণা পরগণার প্রসিদ্ধ সীতারাম রায়ের প্রদত্ত দেবোত্তর ভূমিপ্রদানের নিদর্শন বর্তমান আছে। যথা—"পদ্মার অপর পারে বর্তমান পাবনা জেলার কিয়দংশ তাহার (সীতারাম রায়ের) অধিকার ভুক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ আছে। বর্তমান পাক্‌সি রেল স্টেশনের সন্নিকটে পাক্‌সিয়া, পাতলেখালি প্রভৃতি গ্রামে মোট ৮২।।৹২ কাঠা জমি সীতারাম তাহার দৌহিত্রদিগের গৃহে নিজ প্রতিষ্ঠিত দেব বিগ্রহের জন্য দেবোত্তর দিয়াছিলেন। .....কালাচাঁদ, রাধামাধব রাধিকা, লক্ষ্মী জনার্দন, গণেশ, দশভূজা ও সর্বমঙ্গলা এই কয়েকটি দেব বিগ্রহের জন্য রাজা সীতারাম পরগণে নাজিরপুরে পাক্‌সিয়া গ্রামে ১৭।।১, পাতলেখালি গ্রামে ৪৫।৹ এবং অন্য কয়েকটি গ্রামে ২০।১ একুনে ৮২।।৹২ জমি নিষ্কর দেন। ১২২৫ সালে তাহার দৌহিত্র ভৈরবচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র সেন সেবার জন্য বিগ্রহগুলি এবং উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি সীতারামের পূর্বতন গুরুবংশীয় কোড়ক্‌দি নিবাসী গৌরমোহন ভট্টাচার্যকে সমর্পন করেন। ....ফরিদপুর রুকুনী নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল মৈত্র মহাশয় এক্ষণে ঐ সম্পত্তির অধিকারী। তাহার নিকট সনন্দখানি আছে।" *সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ প্রণীত "যশোহর খুলনার ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।*

পাক্‌সি—কলিকাতা হইতে ১৩৮ মাইল দূরে পদ্মাতীরে পাবনা জেলা মধ্যে অবস্থিত পাক্‌সি নামক রেলওয়ে স্টেশনটি বিশেষ প্রসিদ্ধ না হইলেও, এখানে পদ্মাবক্ষে সুবিখ্যাত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও উক্ত সেতুসংক্রান্ত আফিসাদির অবস্থানহেতু এই ক্ষুদ্র স্টেশনের নাম বিশেষ সুপরিচিত। স্টেশনটি সম্পূর্ণই রূপপুর নামক গ্রামের সীমা মধ্যে অবস্থিত, কেবলমাত্র রেলওয়ে আফিসাদি এবং বাজার ও রেলওয়ে কর্মচারিবৃন্দের বাসস্থলাদি পাক্‌সি নামক দ্বিতল অট্টালিকা সম উচ্চ এবং ক্ষুদ্র পাহাড়বৎ ভূমির উপর অবস্থিত স্টেশনটিতে বিশেষ কোন জাকজমক নাই, কিন্তু ইহার সোপাণাবলীতে মালপত্র সহ আরোহণে যাত্রীগণের বিশেষ অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি এখানে অধিকাংশ ট্রেন অধিকক্ষণ অবস্থিতি না করায় এখানকার যাত্রীগণের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। স্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে পাক্‌সি রেলওয়ে বাজার, রেলওয়ে ডি টি এস আফিস, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আফিস, রেলওয়ে দ্বিতল হসপিটাল, রেলওয়ে স্কুল, রেলওয়ে লাইব্রেরী আদি এবং রেলওয়ে কর্মচারিবর্গের

ক্ষুদ্র বৃহৎ পাকা এবং টিনে ও সোণ খড় নির্মিত গৃহাদি লইয়া পাক্‌সি একটি ক্ষুদ্র অভিনব পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। এখানে একটি পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউজ হইতে বৈদ্যুতিক আলো তৈয়ারির বন্দোবস্ত আছে। পদ্মাতীরবর্তী হইলেও, রেলওয়ে জলের কলের বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে। এখানে দৈনিক বাজারে মৎস্য তরকারি ফল মূল দধি দুগ্ধাদি সর্বপ্রকার খাদ্যাদি আমদানি হয়। মৎস্য সুরক্ষার জন্য বাজারে গ্লাস কেস দ্বারা আবরণের বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে। আফিসাদিতে যাতায়াত জন্য এবং লোকের গমনাগমনের সুবিধার্থ স্থানে স্থানে যে সকল নাতি উচ্চ মৃত্তিকা ও পাথুরিয়া কয়লার গুড়া সংযোগে এখানে রাস্তাদি নির্মিত হইয়াছে, তাহা কোন সহরের রাজবর্ত্ম অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। মরুভূমি সদৃশ চরভূমি ও নিবিড় জঙ্গলাদিকে যে ইংরেজগণ সুদৃশ্য ও সুরম্য হর্ম্যমালা পরিশোভিত নগরে পরিণত করেন, বর্তমান পাবনা জেলাতে এই পাক্‌সি নামক পদ্মাতীরস্থ স্টেশনের উপকণ্ঠবর্তী আধুনিক ক্ষুদ্র পল্লীতে তাহার নিদর্শন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে ; রেলওয়ে ব্রিজ নির্মাণকালে ১৯০৯ সাল হইতে অদ্য পর্যন্ত কুলী মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নোচ্চ কর্মচারিবর্গের সংখ্যাদিতে এখানকার জনসংখ্যা অনেক ক্ষুদ্র শহরের লোক সংখ্যা অপেক্ষাও বেশি বলিয়া বোধ হয়। জানা যায় ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এখানে গড়ে দৈনিক প্রায় ২৪,৪০০ লোক কেবলমাত্র ব্রিজ নির্মাণ কার্যে উপস্থিত থাকিত ; এতদ্ব্যতীত তাহাদের খাদ্যাদি সরবরাহ জন্য দোকানদার ও মহাজনাদির কর্মচারি লইয়া এখানে বহু জন সমাগম হইত, ব্রিজ নির্মাণকালে অস্থায়ীভাবে যে সকল পাকা কাঁচা গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে স্থায়ীভাবে নানা কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। বর্তমান সময়ে এক্ষণে হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, বাঙালি, পাঞ্জাবী ও বিহারি কুলি মজুরাদি নানা জাতীয় লোক সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। মৎস্য দুগ্ধ খাদ্যদ্রব্য সমূহ এখনও কিঞ্চিৎ সুলভ আছে ; স্থানীয় স্বাস্থ্য, পানীয় ও জলবায়ু অতি উত্তম। নিকটবর্তী অনেক দূরবর্তী স্থানসমূহ সমস্তই রেলওয়ে বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ লোকের বাস জন্য কোন স্থান কাহাকেও স্থায়ীভাবে পত্তন করেন না কেবলমাত্র মাসিক ভাড়া দিবার বন্দোবস্ত আছে।

রূপপুর, দাদাপুর প্রভৃতি নিকটবর্তী কয়েকটি পদ্মাতীরস্থ গ্রামের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। এই গ্রামগুলির নিকটবর্তী চরভূমিতে বহু পরিমাণে বুট ও সোনামুগ জন্মে। রূপপুরে একটি মুসলমান বালিকা বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ডিস্ট্রিক্টবোর্ড ও গভর্নমেন্ট হইতে সাহায্য দানের সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। শীঘ্রই এই স্কুলটির জন্য একটি পাকা গৃহ নির্মিত হইবে আশা করা যায়।

সাঁড়া থানার বিশেষত দিঘা, সিলিমপুর, রূপপুরাদি অঞ্চলের অধিবাসিগণ বিশেষ মামলা মোকদ্দমা প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের জন্য পাবনায় একটি মুন্সেফ আদালত গড়ে সাপ্তাহিক প্রায় ৪ চারি দিন কাজে আবদ্ধ থাকে। এই রূপপুর অঞ্চলে অনেক ডাকাইতি আসামিগণের বাস।

পাকুরিয়া—পাক্‌সি রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় দুইমাইল পূর্বোত্তরে অবস্থিত পাকুরিয়া এক সময়ে পদ্মার অতি নিকটবর্তী ছিল ; বর্তমানে নদী এখান হইতে ৪ চারি মাইল অধিক দূরে সরিয়া গিয়াছে। এই গ্রামের মজুমদার উপাধিক ব্রাহ্মণ বংশ অতি প্রসিদ্ধ ; এতদ্ব্যতীত তিলি জাতীয় বহুলোকের এখানে বাস ; এখানে বহু সূত্রধরাদি হিন্দু ও অনেক মুসলমানের বাস আছে। এখানকার অধিবাসীগণ অনেকেই পূর্বতন কুমেদপুর ও কুরুরিয়া নামক প্রাচীন পল্লীর অধিবাসী ছিল, উক্ত গ্রামগুলি পদ্মায় ভাঙিয়া গেলে তথা হইতে অনেকে এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন।

এখানকার মজুমদার বংশীয় অনেকে শিক্ষিত হইয়া চাকরি উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন। ভূতপূর্ব স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ মজুমদার ও তদীয় ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ মজুমদার পি আর এস মহাশয় এবং ভাগলপুর প্রবাসী শরচ্চন্দ্র মজুমদারদিগের

এখানকার মজুমদার বংশ সম্ভুত। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রবাসী হইলেও ইহাদের অনেকের এই অঞ্চলে ভূসম্পত্তি আছে। কুরুরিয়া নামক গ্রামের ধনাঢ্য কৃপানন্দ সাহা নামক জনৈক তিলি জাতীয় মহাজনের বংশধরগণ এখানে বাস করিতেছেন। তদ্ব্যতীত এখানে মণ্ডল, সাহা উপাধিক অনেক তিলি জাতির বাস আছে। পূর্বে এই গ্রামে একটি নীলকুঠি ছিল, উক্ত স্থানে এক্ষণে জনৈক মজুমদার পরিবার বাস করেন। এখানে একটি মাইনর স্কুল বর্তমান আছে ; ইতিপূর্বে উক্ত স্কুল কিয়দ্দিনের জন্য উচ্চ ইংরাজি স্কুলে পরিণত হইয়াছিল এবং স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগে ইহার জন্য পাকা গৃহাদিও নির্মিত হইয়াছিল. এই গ্রামে সাপ্তাহিক শুক্রবার ও সোমবারে একটি হাট বসিয়া থাকে। স্থানীয় স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে, কিন্তু উপযুক্ত পানীয় জল এখানে বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। এতদঞ্চলে মুগ, মটর, বুট, হলুদাদি অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শীতকালে অনেক খেজুরা পাটারি গুড়ের আমদানি হয়। এ প্রদেশে কাঁঠাল পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। মূল্যও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক সুলভ।

পাকুরিয়া সংলগ্ন **সাহাপুর** একটি সুবৃহৎ পল্লী ; ইহা দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় ৩×৪ মাইল হইবে। এখানে সাহা উপাধিক বৈশ্য জাতীয় সচ্চিদানন্দ সাহাদিগরের প্রদত্ত অনেক ব্রহ্মোত্তর ও দেব সেবা ইতিপূর্বে প্রচলিত ছিল। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত জলাশয়াদি এবং নানারূপ সাধারণ হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া জানা যায়। এখানে রায়, মজুমদার, চক্রবর্তী ও অধিকারী উপাধিক ব্রাহ্মণ, ২০।২২ ঘর তিলি জাতি প্রমুখ হিন্দু এবং ৩০।৩২ ঘর বস্ত্র বয়নকারী কারিকর প্রমুখ মুসলমানের বাস আছে। নিকটবর্তী তিলকপুর নামক পাড়া হইতে কারিকর জাতীয় জনৈক মুসলমান সন্তান আরবি ভাষায় এম এ পাশ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত আছেন।

পাকুরিয়া গ্রাম লস্করপুর পরগণার অন্তর্গত ; ইহা রাজশাহী জেলার পুঠিয়া রাজের এলাকাভুক্ত। এই গ্রামের নিকটবর্তী প্রদেশে পূর্বে পদ্মা বিস্তৃত ছিল। প্রাকৃতিক অবস্থা দৃষ্টে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় ; ইহার সীমা পদ্মার অপর পারস্থিত নদীয়া জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত আছে বলিয়া জানা যায়। এই গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণে সর্বত্র দধির মাথা খাইতে চাহিতেন। পুঠিয়া রাজ স্টেট হইতে তাহাকে ভূমি দান বা ব্রহ্মত্র প্রদান করিবার প্রস্তাব হইলে, ভূমি দানের পরিবর্তে যাহাতে তিনি সর্বত্র নিমন্ত্রণে দধির মাথা পাইবার অধিকারী হন, তজ্জন্য প্রার্থনা প্রকাশ করায় তাহাকে উক্ত রায় স্টেটে তাহার স্বীয় অভিপ্রায় মত যে সনন্দ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা এখনও এই গ্রামের জনৈক চক্রবর্তী পরিবার গৃহে বর্তমান আছে শুনিতে পাওয়া যায়। সাহাপুরেও বাঁশ ও কাঁঠাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে একটি দৈনিক বাজার ছিল, তাহার নিদর্শন অদ্যাপি বর্তমান আছে। কাঁঠালের বাগান ও তাহার উৎপত্তি এই গ্রামের বিশেষত্ব। পাকুরিয়া সিলিমপুরাদি হাটে ইহা অধিক পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে।

দিঘা সিলিমপুর দিং—পাবনা সিলিমপুর রোডের ধারে পাবনা হইতে দিঘা প্রায় ১০ মাইল দূরবর্তী ; এখানে চৌধুরী, সান্যাল, লাহিড়ী আদি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং ৪০।৪২ ঘর তিলি, নাপিত আদি হিন্দু এবং মুসলমান গৃহস্থের বাস আছে। গ্রামটি জঙ্গলাকীর্ণ। সিলিমপুরে দিঘাপতিয়া রাজার একটি কাছারি বাড়ি বর্তমান আছে। এই মৌজা উক্ত রাজ সরকারের পূর্বাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ দয়ারাম রায় মহাশয় সর্বপ্রথম নাটোর রাজ স্টেট হইতে স্বীয় কার্যের পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সিলিমপুরে সাপ্তাহিক রবিবারে ও বুধবারে একটি হাট বসে। এই হাটে মুগ মটরাদি রবি শস্য, গামছা কাপড়াদি এবং বহু প্রকার তরকারি ও আম কাঁঠালাদি ফল মূল আমদানি হয়। দিঘা গ্রামে একটি মধ্য ইংরাজি স্কুল এবং পোস্টাপিস বর্তমান আছে।

সিলিমপুরের ১ মাইল পূর্বে **বাঁশেরবাদা** নামক গ্রামে বহু কর্মকার, হালিয়া লৈর জাতির বাস আছে। এখানকার মণ্ডল উপাধিক হালিয়া লৈর জাতীয় অনেকে শিক্ষিত ; ইহাদের মধ্যে

কয়েকজন ডাক্তার এবং একজন বি এল উকিল আছেন। এতদ্ব্যতীত এখানে অনেক তিলি, কায়স্থ, ব্রাহ্মণাদি জাতির বাস আছে, এখানেও একটি মধ্য ইংরাজি স্কুল আছে। এখানকার কর্মকারগণ লৌহ নির্মিত নানা প্রকার দা, কুঠারাদি নির্মাণে সিদ্ধহস্ত।

দাশুরিয়া দিং—পাবনা হইতে ১২ মাইল পশ্চিমাংশে পাবনা ঈশ্বরদি নামক পাকা রাস্তার ধারে অবস্থিত দাশুরিয়া একটি প্রসিদ্ধ হাট বা ব্যবসাস্থল বলিয়া বহুদিন হইতে পরিচিত। এখানে প্রতি শনিবারে ও মঙ্গলবারে বৃহৎ হাট লাগিয়া থাকে। ইহাতে এতদঞ্চলের পাট, ধান, মটর, খেসারি আদি বহু পণ্যদ্রব্য এবং তরকারি ফল মূলাদি খাদ্য দ্রব্য আমদানি হয় ; এখানকার মুখি কচু ও ভাদ্র মাস জাত কাঁকর বা ফুটি অতি উপাদেয় এবং অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দ্রব্যাদি সর্বত্র রপ্তানি হইয়া থাকে। হলুদ এখানকার একটি বিশেষ পণ্য দ্রব্য। শনিবার হাটে অনেক গো-মহিষাদি আমদানি হইয়া থাকে। এখানে ডাক-বাঙলা ও একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বর্তমান আছে। হাটের উপর কয়েকজন মহাজনের কারবারি দোকান ও আড়তবাড়ি এবং কয়েকখানি কাপড়ের দোকান আছে।

অধিবাসীগণ মধ্য তিলি, কর্মকার ও কুম্ভকারাদি জাতির বাস আছে। অধিকাংশই মুসলমান। কয়েকটি পুরাতন পুষ্করিণী ব্যতীত পানীয় জলের বিশেষ কোন সুবিধা নাই। এখানে সাধারণের উদ্যোগে একটি বারওয়ারি মেলা উপলক্ষে কালী পূজাদির অনুষ্ঠান জন্য করগেট টিনের নির্মিত সুবৃহৎ মন্দির ও নাট মন্দিরাদি বর্তমানে আছে। বর্তমান সময়ে পাবনা হইতে এখানে মোটর গাড়ি সংযোগে আসিবার বিশেষ সুবিধা আছে। দাশুরিয়া হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্বোত্তরে কালিকাপুরে **মার্মি** নামক গ্রামে রাণী ভবানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুবিস্তৃত জলাশয় ও শিবমন্দির বর্তমান আছে। উক্ত মন্দিরে এখনও নাটোর রাজ স্টেট হইতে দৈনিক পূজার বন্দোবস্ত পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে।

দাশুরিয়া হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমোত্তরাংশে **অরণকোলা** নামক দিঘাপতিয়া রাজার এলাকাভুক্ত গ্রাম একটি প্রসিদ্ধ হাট বলিয়া পাবনা জেলা ও নিকটবর্তী অন্যান্য অনেক জেলাংশে পরিচিত হইয়া থাকে। এখানে কার্তিক অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষার প্রাক্কাল পর্যন্ত বহু দূরদূরান্তর হইতে নানাজাতীয় গো-মহিষ ও অশ্বাদি আমদানি হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর ঢাকা মৈমনসিংহাদি জেলার পূর্বাঞ্চল হইতে বহু গরু খরিদ-বিক্রয়কারী পাইকের ও মহাজনগণ এখানে আসিয়া সমাগত হইয়া থাকে। প্রতি মঙ্গলবারে গো-হাটা লাগিবার নিয়ম আছে। কিন্তু এখানে প্রায় সোমবার দিন হইতেই বহু গবাদির আমদানি হয়। এই হাটে জমিদারের বিশেষ আয় আছে। প্রতি হাটে প্রায় দুই তিন হাজার, কোন কোন সময় তদপেক্ষা অধিকতর গো-মহিষাদি আমদানি হয়। হাটের নিচে একটি বহুদূর বিস্তৃত জলাশয় আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় এইখানে পূর্বে নদীর অংশ ছিল ; ইহাতে অনুমান হয় এইস্থান দিয়া পূর্বে পদ্মানদী প্রবাহিত হইত, তাহাতে কোল পড়িয়া অবশেষে গ্রাম উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহা কালে অরণ্যে পরিণত হইয়া পরিশেষে উক্ত গ্রাম অরণ্য বা অরণকোলা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই গ্রাম বর্তমান ঈশ্বরাদি জংশন হইতে প্রায় ২ মাইল পূর্বাংশে অবস্থিত।

ধাপারি দিং—সাঁড়াঘাট হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে পদ্মানদীর কোলের তীরে অবস্থিত ধাপারি বহু প্রকার জিনিসাদি খরিদ বিক্রয়ের একটি প্রধান বন্দর। এখানে কয়েক ঘর মারওয়াড়ি এবং দেশিয় মহাজনদিগের কারবারি গোলা ও আড়ত আছে। প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবারে হাট বসে। কলাই মটর খেসারি পাট হরিদ্রাদি প্রভৃতি জিনিসপত্র এখানে আমদানি রপ্তানি হয়। নিকটবর্তী সাহেববাজার নামক স্থানেও পূর্বে ওয়াটসন্ কোম্পানির এলাকায় হাট বসিত, উক্ত স্থান নদীতে ভাঙিয়া যাওয়ায় স্থায়ী মহাজনেরা উঠিয়া ঈশ্বরদিতে আপনাপন কারবারস্থল স্থানান্তরিত করিয়াছে ; নিকটবর্তী অন্য এলাকাভুক্ত স্থানে প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবারে হাটটি এক্ষণেও লাগিতেছে।

এই গ্রাম সংলগ্ন **বিলবাগনি** নামক পাড়ায় ভূমিহার ব্রাহ্মণ বংশীয় পাঁড়ে, চৌধুরী উপাধিক কয়েক ঘর ভূম্যধিকারীর বাস আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে ২৫।২৬ ঘর ধীবর ও ১৫।১৬ ঘর নলিয়া জাতির বাস আছে। এখানে নল-নির্মিত বহু চাটাই ডোলাদি নির্মিত হয় এবং মৎস্যাদি কলিকাতা চালান জন্য তাহা অনেকে খরিদ করিয়া থাকে। ধাপবারি হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে মাঝপাড়া, আরামবারিয়া প্রভৃতি পাবনার একান্ত পশ্চিমসীমাসংলগ্ন কয়েকটি গ্রামে বিশেষত আরামবারিয়াতে জালিক নমঃশূদ্র ও মুসলমান জাতীয় বহুলোক সূত্রধরের কার্য করে এবং তাহারা দেশিয় বাবলা কাঠের দ্বারা উত্তম গাড়ির চাকা তৈয়ার করিয়া থাকে। গো-মহিষাদির গাড়ি নির্মাণ জন্য বহুদূর হইতে লোকে তাহা ক্রয় করিয়া লয়। এমন কি সময় সময় ২ দুই হাজার পরিমাণ চাকাও বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। এই সমস্ত চাকার মূল্য পূর্বে ৮/১০ টাকা ছিল, এক্ষণে তাহা ২০/২২ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। জালিকগণ এখানে বর্ষাসময়ে সমারোহে গঙ্গা পূজার যে অনুষ্ঠান করে, তদ্‌পলক্ষে এখানে পক্ষাধিককাল একটি মেলা বসে। ইহা হইতে এখানে গঙ্গাবাজার নামে একটি স্থানে কয়েকবৎসর হইল বিশেষ সমারোহ হইতেছে। এখানে তাঁতিবন্দ জমিদারগণের একটি কাছারিবাড়ি বর্তমান আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—আটঘরিয়া

আটঘরিয়া—পাবনা হইতে ৮ আট মাইল পশ্চিমোত্তরে চাটমোহর রোডের উপর অবস্থিত আটঘরিয়া নামক পল্লীতে একমাত্র পুলিশ স্টেশন ব্যতীত অন্য উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। পূর্বে চাটমোহরগামী পথিকগণ এবং সময় সময় সরকারি ডাক বিভাগের কর্মচারিগণ এই সমস্ত অঞ্চলের দুর্বৃত্ত চোর ডাকাইতগণ কর্তৃক আক্রান্ত ও নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইত সে জন্য বিগত কয়েক বৎসর হইল এখানে একটি পুলিশ স্টেশন স্থাপিত ও তজ্জন্য একটি সুদৃশ্য পাকা ইষ্টকালয় নির্মিত হইয়াছে। গ্রামের জনসংখ্যা অতি বিরল ; মাত্র ২।৩ ঘর কায়স্থ, ঘোষ, নরসুন্দর, মাহিষ্যাদি, হিন্দু, তদ্ব্যতীত অধিকাংশই মুসলমান, তাহাও মুষ্টিমেয়।

দেবোত্তর—আটঘরিয়া হইতে প্রায় ১ মাইল উত্তরে চাটমোহর বোর্ডের উপর দেবোত্তর গ্রাম অবস্থিত। ইহার অধিবাসী সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয়। মাত্র ২/৩ ঘর রায় মজুমদার উপাধিক কায়স্থ ও এক ঘর কৈবর্ত ব্যতীত স্থানীয় হিন্দু নাই বলিলেই চলে। কেবলমাত্র এখানে হাটের উপর ২/৩ জন ভিন্ন স্থানীয় হিন্দু দোকানদারের কারবারি দোকান ঘর আছে মাত্র। এখানে প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবারে একটি হাট লাগে। ধান, পাট, মটরাদি নানাপ্রকার রবিশস্য এবং নানাবিধ ফল মূল তরকারি আমদানি হয়। এখানে শীতকালে চারিদিক হইতে বহুল পরিমাণে পাটারি গুড়ের আমদানি হয়। প্রতি শুক্রবারের হাটে অনেক গো-মহিষাদি খরিদ বিক্রি হয়। এখানে একটি পোস্টাপিস বর্তমান আছে। প্রকাশ এই গ্রামটি নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর সময়ে নিকটবর্তী মুনিদহ পল্লী নিবাসী রামকান্ত মজুমদার নামক জনৈক বারেন্দ্র কায়স্থ ভদ্র সন্তানকে তদীয় পারিবারিক বিগ্রহ সেবার ব্যয় নির্বাহার্থ দেবোত্তর স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য তদবধি এই গ্রামের নাম দেবোত্তর বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

চান্দভা- আটঘরিয়া পুলিশ স্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমাংশে গ্রামটি অবস্থিত। এই গ্রামে কয়েকঘর পাল এবং সরকার, বিশ্বাস উপাধিক পৌণ্ডরিক জোতদার জাতির বাস। তদ্ব্যতীত নিকটস্থ পাড়া লক্ষ্মণপুরে সরকার, মিত্রাদি উপাধিক কয়েকঘর কায়স্থ, নরসুন্দর,

মালাকারাদি হিন্দুর বাস আছে। এতদ্‌ভিন্ন সমস্তই মুসলমান। গ্রামটি একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তীরে অবস্থিত। এখানে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে এবং বুধবারে একটি করিয়া হাট বসে। এই হাটে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে পূর্বে প্রচুর পরিমাণে দেশিয় মোটা চাউলাদি আমদানি হইত ; এখনও অনেক ধান্যাদি আমদানি হয়।

মূলগ্রাম—চিক্‌নাই নদী তীরে অবস্থিত। এই গ্রামে একটি হাট বহুদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানেও বহু ধান্যাদি আমদানি হইত। এখানে তলাপাত্র, মজুমদার উপাধিক কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে, অবশিষ্ট সমস্তই মুসলমান। নিকটবর্তী **আটলঙ্কাও** একটি বহুদূর বিস্তৃত মৌজা। এখানে একটি হাট আছে। পূর্বে এই সমস্ত অঞ্চলে বহু পরিমাণে দেশিয় মোটা চাউল আমদানি হইত, এক্ষণে দেশে পাটের চাষ বেশি হওয়ার জন্য চাউলের আমদানি রপ্তানি দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। মূলগ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে **পাঁচুরিয়া** একটি প্রাচীন পল্লী বলিয়া পরিচিত হয়। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন দীর্ঘিকাদি বর্তমান আছে। একটি স্থান **ডাহুক বা ডাকু** রাজার বাটির স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রকাশ সাঁতৈল রাজবংশীয় জনৈক ভূম্যধিকারীর এখানে পূর্বে বাস ছিল। এই গ্রাম পূর্বে উক্ত রাজবংশের এলাকাধীন ছিল এবং গুণাইগাছা আদি গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণগণের এই গ্রামে সাঁতৈল রাণী সর্বাণী দেবী কর্তৃক প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর এখনও আছে। এখানে একটি পুরাতন বর্তমানে জলহীন দীর্ঘিকা **রাণীরপুকুর** নামে খ্যাত হয়। উপরোক্ত "ডাহুক" রাজা ও "রাণী" কে ছিলেন তাহা সবিশেষ জানা যায় না। সম্ভবত কোন ব্যক্তি ডাকাইতি আদিতে লিপ্ত থাকা প্রযুক্ত ধনাঢ্য হইয়া পরিশেষে রাজা আখ্যালাভ করেন। অন্য ডাকু রাজা বা ডাহুক রাজা বলিয়া পরিচিত হইতেন। কেহ কেহ এই রাণীর পুকুরকে রাণী সর্বাণী বা সত্যবতীর প্রতিষ্ঠিত জলাশয় বলিয়া নির্দেশ করেন। উভয়ই সাঁতৈল বংশের রাজমহিষী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই গ্রাম ভাতুরিয়া পরগণার অন্তর্গত তপ্পে চাপিলার অধীন বলিয়া জানা যায়। লোকমুখে এখনও উক্ত হইয়া থাকে—

তিন তপ্পে ভাতুরিয়া
ব্যাস, কুসুম্বী, চাপিলা।

এই পাঁচুরিয়া গ্রাম যে উক্ত ভাতুরিয়ার রাজবংশ সাঁতৈল রাজের এলাকাধীন ছিল, তাহা প্রাচীন দলিলাদিতে প্রমাণিত হইয়া থাকে। আরও কিম্বদন্তী আছে যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে পাঁচুরিয়া বলিয়া যে অপবাদ ঘোষিত আছে, তাহা এই গ্রামের পূর্বকালীন সাঁতৈল বংশীয় জনৈক মহাত্মার ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যাদি পঞ্চ মহাপাতক হইতেই উদ্ভব হইয়াছিল, তৎসময় হইতেই এই স্থানের নাম পাঁচুরিয়া বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে।*

* পাঁচুরিয়া সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, তথাকথিত ডাহুক বা ডাকু রাজা একদা মদিরা পানে সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন। কালীপূজার বলির জন্য আনিত একটি মহিষ কোনক্রমে পলাইয়া গেলে বলি সময়ে রাজভৃত্যগণ একটি বৃষ আনিয়া হাজির করে, পুরোহিত উৎসর্গ সময়ে বৃষকে মহিষ ভ্রমে উৎসর্গ করিয়া বলি দেওয়াকালে তাঁহার সম্প্রদানকালীন ভুল বুঝিতে পারিয়া চিৎকার করিতে থাকে। উন্মত্তপ্রায় রাজা তখন পুরোহিতের নিষেধ না মানিয়া **বৃষকে** বলি দিতে আদেশ করিলে **পুরোহিত** নিরুপায় হইয়া বৃষসহ যূপকাষ্ঠে নিপতিত হন। রাজাজ্ঞায় উভয়েরই বলি হয়, তখন অন্তঃপুরে সংবাদ পৌছিলে, **রাণী ও রাজমাতা** দ্রুতবেগে বলি স্থানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে ভর্ৎসনা করিলে **উন্মত্ত রাজা** তখন উভয়কে হত্যা করিয়া পরিশেষে আত্মগ্লানিজনিত ক্ষোভে নৌকারোহণে কুঠারাঘাত করত আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এইরূপে একের সুরাপান জনিত পাপে পাঁচজন হত্যা হইয়াছিল। সেজন্য এই বংশে পাঁচুরিয়া দোষের উৎপত্তি বলিয়া পরিকীর্তিত হয় এবং যে স্থানে রাজা কুঠারাঘাতে জীবনলীলা শেষ করেন তাহা বিল কুরুলিয়া নামে কথিত হয। ইহা হরিপুর এবং সাঁতৈল উভয় গ্রাম সংলগ্ন।

গোররী দিং—প্রাচীন আত্রেয়ী নামক নদীর তীরে অবস্থিত পাবনা হইতে প্রায় ১০ মাইল পশ্চিমোত্তরে গোররী ও নদীর অপর পারে চাটমোহর পুলিশ স্টেশনের অধীন ফৈলজানা নামক পল্লী দুইটিই এ প্রদেশের বাণিজ্য কেন্দ্র বিশেষ। উভয় গ্রামেই অনেক সাহা উপাধিক ব্যবসায়ী বৈশ্য জাতির বাস আছে। এতদ্ব্যতীত হোড়আদি উপাধিক কয়েক ঘর কায়স্থ ও অন্যান্য হিন্দু জাতি ফৈলজানা নামক পল্লীতে বাস করে। ফৈলজানাতে সপ্তাহে প্রতি শুক্রবারে ও মঙ্গলবারে একটি হাট বসিয়া থাকে। এখানে কয়েকজন ডাক্তারের ঔষধালয় ও অনেকগুলি মহাজনের কারবারি গোলাঘর আছে। পবিত্র আত্রেয়ী নদীর তীরে এখানে প্রতি বৎসর বারুণী স্নান উপলক্ষে চতুর্দিক হইতে বহু যাত্রীগণের সমাগম হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে এখানে একটি মেলার অনুষ্ঠান হয়।

একদন্ত—পাবনা হইতে প্রায় ১০ মাইল উত্তর পূর্বাংশে ইছামতী নদীতীরে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বিশেষ। এখানে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে যে হাট লাগিয়া থাকে, তাহাতে বহুদূর হইতে নানাবিধ দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানি হয়। প্রতি সোমবারে পূর্বে অতি প্রত্যুষে বেলা প্রায় ৭টার সময়েই বহু দূরবর্তী স্থান হইতে বস্ত্রবয়ণকারিগণ দেশিয় তাঁতে প্রস্তুত নানাবিধ ধুতি, শাড়ি, তহফন ও ছিটের কাপড়াদি লইয়া উপস্থিত হইত। ঐ সকল কাপড় এই জেলার ও রঙ্পুরাদি উত্তর বঙ্গীয় এবং কুমারখালি অঞ্চলের বহু স্থানের পাইকের ও খরিদ্দারগণ ক্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়া যাইত। প্রকাশ প্রতি সোমবারে কোন কোন হাটে ৩০ হইতে ৪৫ হাজার টাকা পরিমাণ দেশিয় কাপড় এই হাটে খরিদ বিক্রি হইত। পাবনা হইতে বহু নীলকসানে নামক সূত্র রঙকারিগণ লাল ও কাল বর্ণের সুতা হাটে বিক্রি করিত। পাবনার বহু মহাজন এই হাটে সূতার চালান দিত। সম্প্রতি দুই বৎসর হইল নানা গোলাযোগে এখানকার কাপড়ের হাট ভাঙিয়া ইছামতীর তীরস্থ এখান হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বাংশে **শিবপুর** নামক কারিকর প্রধান গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছে, তথায় এক্ষণে উক্ত প্রকারে কাপড়ের হাট লাগিতেছে। এই কাপড়ের ব্যবসায়ে বিগত কয়েক বৎসর হইল এতদঞ্চলের কারিকরগণের বিশেষ সুবিধা ও উন্নতি ঘটিয়াছে। এই সমস্ত কাপড় অধিকাংশই ভিন্ন স্থানের লোকে ব্যবহার করে সে জন্য বিদেশে চলিয়া যায়, এই সকল কাপড় মুসলমান ভিন্ন হিন্দুগণ বেশি ব্যবহার করে না। যাহাতে দেশের এই সকল মোটা ও দীর্ঘকাল স্থায়ী বস্ত্রাদির বহুল ব্যবহার হয় এবং দেশের বস্ত্রবয়ণকারিগণ অধিক উৎসাহ পাইয়া সস্তায় নানারূপ উৎকৃষ্ট কাপড় তৈয়ার করিতে পারে, আমাদের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের তৎপ্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক।

খাস একদন্ত গ্রামের কয়েকঘর চক্রবর্তী, গোস্বামী উপাধিক ব্রাহ্মণ, তিলি, বৈশ্যসাহা এবং অন্যান্য হিন্দুর বাস আছে। এখানে অনেক বারুজীবী জাতির বাস হেতু একটি পাড়ার নাম বারইপাড়া বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে। কাপড়ের ন্যায় এখানে অনেক পানেরও আমদানি হয়। প্রতি বৃহস্পতিবারের হাটে একদন্তে একটি গোহাটা লাগিয়া থাকে ; জানা যায় এই হাটে অন্যান্য হাট অপেক্ষা অধিক চোরা গরু বিক্রি হয়। এখানে একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় এবং কয়েকজন ডাক্তারের ঔষধালয় বর্তমান আছে ; এদ্ব্যতীত সম্প্রতি কয়েক মাস হইলে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের সাহায্যে একটি কবিরাজি ঔষধালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট একজন কবিরাজ নিযুক্ত হইয়াছেন। এখানে পাট ভুষামাল পত্রাদিও প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়। নিকটবর্তী **চৌকিবাড়ি** নামক গ্রামের কয়েকজন ঘোষ উপাধিক মহাজনের এখানে কারবারি গোলাঘর ও আড়তবাড়ি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালীপূজা উপলক্ষে সময় সময় এখানে বারওয়ারি মেলাদির অনুষ্ঠান হয়। নানাকারণে সম্প্রতি এই দীর্ঘকাল স্থায়ী হাটের অনেক অবনতি ঘটিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—চাটমোহর

চাটমোহর—পাবনা সদর স্টেশন হইতে উত্তর পশ্চিমাংশে বরল নামক নদী তীরে অবস্থিত চাটমোহর একটি সুবৃহৎ প্রাচীন গ্রাম। বর্তমান সময়ে এখান হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে মাজগ্রাম নামক স্থানে সাঁড়া সিরাজগঞ্জ লাইনের একটি রেলওয়ে স্টেশন নির্মিত হইয়াছে। প্রকাশ এই পল্লীর নাম পূর্বে ছোট মহাল বা ছোট্ট মহাল বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া বর্তমান চাটমোহরে পরিণত হইয়াছে।

স্থানটি বিশেষ বাণিজ্য প্রধান বলিয়া পূর্বাপর পরিচিত হইয়া থাকে। এখান বহু তিলি জাতীয় ব্যবসায়িগণের বাস। গ্রামের দুইপ্রান্তে নূতন বাজার ও পুরাতন বাজার নামে দুইটি পৃথক বাজার বর্তমান থাকা সত্বেও অনেক তিলি মহাজনদিগের বাটিতে বিশেষত পুরাণ বাজারে নানাবিধ পণ্য দ্রব্যাদি খুচরা ও পাইকারি ক্রয় বিক্রয়ার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এখানকার ন্যায় ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকা শোভিত এবং স্থানে স্থানে ঋজু ও বক্রাকারে পাকা রাস্তা বেষ্টিত পল্লীগ্রাম এই জেলার মফঃস্বলে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই গ্রামের অংশ বিশেষ এক সময় নগর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে এখানকার লোক সংখ্যা ও পূর্বতন জাকজমকের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। শাঁখা প্রস্তুতকারী বৈশ্য উপাধিক অনেক বণিক জাতির এখানে বাস আছে। এখানকার তৈয়ারি শাঁখা একটি শিল্পজাত দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। পূর্বে ইহার বহুল প্রসার ছিল ; এক্ষণেও অল্পবিস্তর প্রস্তুত হয়। খাদ্য দ্রব্য মধ্যে এখানকার পাল ও মোদগকগণ কর্তৃক তৈয়ারি রসকদম, সন্দেশ, চম্ চম্, বরফি, খাগরাই অতি প্রসিদ্ধ ও সুখাদ্য।

মুসলমান রাজত্বকালে মোঘল আমলে এখানে পাঠানদিগের একটি কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া বোধ হয়। এক সময়ে এতদঞ্চলে যে পাঠানদিগের অধ্যুষিত ভূভাগে পরিণত ছিল, তাহা এখানকার কাজিপাড়ায় মাসুম খাঁ নামক জনৈক কাক্সাল জাতীয় পাঠান সেনানী কর্তৃক হিজরি ৯৮৯ সালে নির্মিত মসজিদ ও সমাজ গ্রামের পাঠান আধিপত্য সময়ের নির্মিত মসজিদাদিতে জানিতে পারা যায়। এখানে খাঁ, কাজি, মীর, খোতিব আদি উপাধিক বর্তমানে দরিদ্র কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশীয় বহু মুসলমানের বাস আছে। এই সমস্ত মুসলমানের অধিকাংশই পশ্চিমদেশীয় মোঘল পাঠানদের বংশধর তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখানে একটি পাড়া এখনও আফ্রাদপাড়া নামে পরিচিত; ইহাতে বোধ হয় এখানে আফ্রিদি দেশিয় অধিবাসিগণেরও বাস ছিল।

বর্তমান সময়ে এখান একটি পুলিশ স্টেশন, সাবরেজিস্টারি অফিস, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস, পার্শ্বডাঙা নিবাসী শম্ভুনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শম্ভুনাথ উচ্চ ইংরাজি স্কুল নামে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় (এক্ষণে ইহার নাম নাটোর রাজ স্টেটের পূর্বাধিকারী চন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নামে "চন্দ্রনাথ শম্ভুনাথ" নামে প্রচলিত হইবার চেষ্টা হইতেছে) বর্তমান আছে। এদ্ব্যতীত এখানে প্রাইমারী পাঠশালা ও মক্তবাদি বর্তমান আছে। স্থানীয় মহাজনদিগের প্রতিষ্ঠিত চারিটি দোলমঞ্চ একস্থানে পুরাণ বাজারের পল্লীর মধ্যে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বলরামী দোল উপলক্ষে নানারূপ উৎসব ও সাপ্তাহিককাল মেলা অনুষ্ঠিত হয়। একটি মহাপ্রভুর আখড়া এবং মদনগোপাল ও বাধাবল্লভ বিগ্রহবাটির রাসদোল উপলক্ষে সাময়িক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে চাটমোহর সাধারণের উদ্যোগে একটি হরিসভার অনুষ্ঠান হইত। তিলি অধিবাসীগণের অধিকাংশই বৈষ্ণব এবং গোস্বামীদিগের শিষ্য, ইহাদের অনেকের বাটিতে সময়ে ভাগবৎ পাঠ ও কথকতাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

এই গ্রামের মহাজন শ্রেণীর লোকের অনেকেই ব্যবসায়ী মহাজন ও কুসীদজীবী। তজ্জন্য ইহারা অপেক্ষাকৃত কৃপণ স্বভাব ; দেশের ও দশের কাজে ইহারা অর্থব্যয়ে বিশেষ কুণ্ঠিত ;

কমলার কৃপা থাকিলেও এতদিন ইহাদের মধ্যে সরস্বতীর অনুগ্রহ বিশেষ ছিল না। সম্প্রতি কয়েকজন শিক্ষিত যুবক এই মহাজন শ্রেণীর মধ্যে দেখা যাইতেছে এবং একটি জলাশয়ও ২/৩ বৎসর হইল জনৈক মহাজনের অর্থে খনিত হইয়াছে। এমন সুন্দর পল্লীর বিলি ব্যবস্থার দোষে এবং স্থানীয় শিক্ষিত ও উদ্যোগী ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি অধিবাসির এখানে অভাব হেতু গ্রামটির বাহ্যিক বর্তমান কালপোযোগী নানা বিষয়িনী উন্নতিমূলক কোন বিশেষ অনুষ্ঠান দেখা যায় না।

গুণাইগাছা, সালিখা দিং—চাটমোহর নূতন বাজার হইতে প্রায় এক ক্রোশ পূর্বে বরল নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত সালিখা, গুণাইগাছা নামে একত্র অবস্থিত দুইটি গ্রাম অতি প্রাচীন সময় হইতে সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পল্লী বলিয়া এই জেলার মধ্যে পরিচিত। এখানে অনেক দিন হইতে ব্যাকরণ সাহিত্য স্মৃতি ন্যায় প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রাদির আলোচনা ও অনুশীলন হইয়া আসিতেছিল। নিম্নলিখিত ছড়া হইতে এথাকার পণ্ডিতগণের শিষ্য প্রশিষ্যের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

"হরির গদা, গদার জয়
জয়ের বিশে' লোকে কয়।"

প্রকাশ হরিহর তর্কালঙ্কার নামে এখানে একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, গদাধর তর্করত্ন তাহারই ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন। নিকটবর্তী সাঁরোরা গ্রাম নিবাসী জয়দেব তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত তর্করত্ন মহাশয়ের ছাত্র। আবার জয়দেবের ছাত্র বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় ন্যায়শ্যাস্ত্রের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তৎকৃত সাহিত্য দর্পণের টিকা অতি প্রসিদ্ধ। এই পণ্ডিতগণের নামে উপরোক্ত প্রচলিত ছড়া এখনও এখানে শুনিতে পাওয়া যায়।

এই প্রদেশের সাঁরোয়া জালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে পূর্বে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। জালেশ্বরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এক সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। গুণাইগাছা কোন কোন পণ্ডিতের বাসস্থান এখনও "সিদ্ধান্ত বাড়ি", "ন্যায়বাগীশের বাড়ি" বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত বাড়ির অধিকাংশ ব্যক্তিই সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। অবসর প্রাপ্ত সবজজ রায় বাহাদুর যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের বাড়ি অদ্যাপিও 'সিদ্ধান্ত বাড়ি' নামে খ্যাত। এই বাড়ির মুকুন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, কাশীকান্ত সিদ্ধান্ত, শীতলচন্দ্র সার্বভৌম, গঙ্গাকান্ত বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। অনেকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকতা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের অনেকে গ্রামে নিজ টোলে বহু ছাত্র রাখিয়া শিক্ষাদান করতঃ পুত্রবৎ স্নেহে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, তাহা হইতে উপরোক্ত ছড়ার প্রচলন হইয়াছিল।

গুণাইগাছা অপেক্ষা সালিখাতেই অনেক পণ্ডিতের বাস ছিল। এখানে 'লঘু ভারত' প্রণেতা গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাস। তিনি সাবেক জজ পণ্ডিত ছিলেন, পরে সিরাজগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে অবসর গ্রহণ করেন। এখানেই "প্রাচীন ভারতে বাণিজ্য, ত্রিলিঙ্গ বোধকম" প্রভৃতি প্রণেতা তারিণীকান্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এখানেই 'গুরুসত্য ধর্ম' প্রচারক শম্ভুচাঁদের জীবনী লেখক ও নিস্পৃহ পণ্ডিত কাশীচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাসস্থান ছিল। এখানকার জনৈক রামকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের দ্বার পণ্ডিত ছিলেন।

এই সমস্ত গ্রামের পণ্ডিত মণ্ডলীর বিদ্যানুশীলন ও ন্যায় সাহিত্যাদি চর্চা সমধিক উন্নত ছিল। যখন বঙ্গের সর্বত্র আজকালিকার মত সর্বত্র সংবাদপত্রের উপকারিতা লোকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তখনই উপরোক্ত 'সিদ্ধান্ত বাটির' ভৈরবচন্দ্র সিদ্ধান্ত প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চেষ্টায় ও উদ্যোগে এই ক্ষুদ্র পল্লী হইতে 'জ্ঞানবিকাশিনী' নামে একখণ্ড সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। পণ্ডিতের আধিক্য, জ্ঞানানুশীলনের প্রাবল্য ও ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতির

চর্চার জন্য গুণাইগাছা গ্রামের নাম যথার্থ সার্থক হইয়াছিল বলিতে হইবে। কারণ গ্রামের নাম দোগাছি, তালগাছি, সুপগাছা, ব্রহ্মগাছা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, এথাকার লোকের পণ্ডিত ও গুণরাশির প্রাবল্যহেতু গ্রামের নাম গুণাইগাছা বা গুণের গাছ রাখিয়া যথার্থই স্থানের মাহাত্ম্য বজায় রাখা হইয়াছে।'

সাঁতৈল রাজার উন্নতি সময়ে এই প্রদেশের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উক্ত রাজ সরকার হইতে বহুবিধ বৃত্তি ব্রহ্মোত্তরাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাটোরের দত্তাও অনেক ব্রহ্মোত্তর আছে, রাণী ভবানীর দত্তাও অনেক দলিল এখানে দেখা যায়। এথাকার ব্রাহ্মণের অধিকাংশই ব্রহ্মোত্তরজীবী সুতরাং গ্রামে জমিদারের বিশেষ লাভ নাই। তথাপিও বিদ্যোৎসাহী রাজশাহী জেলার জোয়ারীর বিশি জমিদার মহাশয় সোনাবাজু পরগণা বাটোয়ারা কালে অর্থ ব্যয় করিয়াও এই সালিখা গ্রাম নিজ ছাহামে রাখিয়াছিলেন।

এই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদিগের হস্তলিখিত অনেক পুস্তক আছে। দুঃখের বিষয় গ্রামের অনেকে আবার তাহা সম্যক অবগতও নহেন। আমাদিগকে আবার তাহা তাহাদিগকে শুনাইতে হয়। যাহাদের নিকট প্রাচীন পুথি কিংবা প্রাচীন দলিলাদি আছে, তাহা লোককে দেখাইতেও অনেকে সঙ্কোচ মনে করেন। যে কয়েকখানা দলিল ও প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক দেখিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাতে ধারণা এই যে এই সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর সন্তান সন্ততিগণ চেষ্টা করিলে অনেক পুরাকীর্তি এখনও রক্ষা হইতে পারে।

গুণাইগাছার বর্তমান 'মজুমদার' উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের পূর্বতন উপাধি 'ঢোল' ছিল বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ ইহাদের পূর্বপুরুষ আদিশূর আনিত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধর দাবু মিশ্রের সন্তান। রাজা কংসনারায়ণের সময়ে ইহার এদেশে আইসেন। ইহাদের পূর্বপুরুষ উক্ত রাজ সরকারের ব্রাহ্মণ ভোজনের সময়ে লোককে ডাকিয়া একত্র করা সহজসাধ্য নহে জন্য ঢোল বাজাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ইহাদের ঢোল আখ্যা হয় ; পরবর্তীকালে চাকুরিকার্য উপলক্ষে মজুমদার উপাধি লাভ হইয়াছে। এখনও ইহাদের জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধবদিগের অনেকের ঢোল উপাধি বর্তমান আছে।

প্রকাশ এই প্রদেশের ব্রাহ্মণমণ্ডলী পূর্বে নিকটবর্তী শুই গ্রামে অধিবাসী ছিলেন। সাঁতৈল রাজবংশে পাঁচুরিয়া দোষ ঘটিলে (আবার কেহ বলেন চাটমোহর মূলগ্রাম নিকটবর্তী পাঁচুরিয়া গ্রাম হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ এতদঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।) এখনও গুণাইগাছার অনেক ব্রাহ্মণের গৃহে পাঁচুরিয়া গ্রামে ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্তির দলিল আছে দেখা যায়।

যাহা হউক, এই প্রদেশে পূর্বে বহু দিগ্‌বিজয়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল ; তাহাদের শাস্ত্রালোচনা জ্ঞানানুশীলন প্রভৃতি দর্শনে এ দেশের তৎকালীন হিন্দু রাজা জমিদারগণ তাহাদের সমাদরের ত্রুটি করেন নাই। বহু ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর দানে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, তাহা প্রাচীন দলিল পত্রাদিতে জানা যাইতেছে। ইহারা পূর্বে বিদেশিয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তর্ক বিচার মীমাংসার প্রশ্নকালে উত্তরপত্র অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন বলিয়া জানা যায়। এখানেই মফঃস্বল পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে পাণিনী ব্যাকরণের আলেচনা হইত। এই সালিখা গুণাইগাছার ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যাহারা যাজন ব্যবসায়ী তাহাদের অনেকেই নিকটবর্তী হরিপুর গ্রামের চৌধুরী বংশের পুরোহিত। এই সমস্ত কারণে অনেকে বলেন সালিখা গুণাইগাছা **পাবনার নবদ্বীপ**।

শুনা যায় প্রাচীন সময়ে মুনি ঋষিগণ নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে বসিয়া শাস্ত্রাদি আলোচনা ও বেদবেদান্ত চর্চায় দিনপাত করিতেন। আমাদের দেশের বরল নদীর উন্মুক্ত প্রান্তরক্ষেত্র পার্শ্বে বংশকুঞ্জসমূহের নাতিঘন স্নিগ্ধ ছায়াতলে বাস করিয়া কত নিস্পৃহ দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত আজন্ম বিদ্যানুশীলন করিয়া কালের নিভৃতকালে জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছেন ; এই ব্রাহ্মণ পল্লীর সমাবেশ ও বসতি পদ্ধতি দেখিলে সততই মনে আনন্দানুভব হয়। ইহারা দারিদ্র্যকে উপহাস

ও উপেক্ষা করিয়া বিদ্যাচর্চাই জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করিতেন এবং কাব্যশাস্ত্রবিনোদনে ও ন্যায়ের মীমাংসায় পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন। এখনও এখানে দুই চারিজন যাহারা কেবলমাত্র যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা লইয়া আছেন তাহাদিগকে আপাতত দৃষ্টিতে গরিব বোধ হইলেও তাহারাই সুখী ও স্বাধীন বোধ হয়, আর যাহারা কথঞ্চিৎ চাকুরিজীবী কিংবা অট্টালিকাবাসী তাহারই শান্তিহীন ও অসুখী। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ যেমন কৃষ্ণনগরের রাজা মহারাজার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন, আমাদের দেশের এই অঞ্চলের পণ্ডিতমণ্ডলীর কালে এক সময়ে সাঁতৈল, নাটোর রাজার আশ্রয়ে সেইরূপ ছিলেন, কেবল আমাদের আলোচনা ও তৎপ্রবৃত্তির অভাবে অ.মরা তাহা জানিতে সক্ষম নহি। খোঁজ ও অনুসন্ধান করিলে আমাদের দেশের এই সমস্ত গ্রাম এবং সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে গাড়াদহ, কাওয়াখোলা, শিয়ালখোল, বাগবাড়ি প্রভৃতি স্থানেও নবদ্বীপ মিথিলাদি প্রসিদ্ধ স্থানের ন্যায় দিগন্তবিশ্রুত পণ্ডিত সমাজের আবির্ভাব ছিল দেখিতে পাওয়া যায়।

সালিখা সাধারণত বড় সালিখা. ছোট সালিখা ও মধ্য সালিখা এই তিনটি মৌজায় বিভক্ত। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ভট্টাচার্য, বাগছি, সান্যাল, লাহিড়ী, মজুমদার, মৈত্র আদি উপাধিক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সংখ্যা অতি বিরল ; অন্য হিন্দু জাতির সংখ্যাও কম, এমন কি নাই বলিলেও চলে। মুসলমান সংখ্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাত্র কয়েক ঘর তৈল প্রস্তুতকারক খুলু জাতির বাস আছে।

সালিখা অপেক্ষা গুণাইগাছাই বর্তমান সময়ে বর্ধিষ্ণু বা জন বহুল। এখানে একটি পাকা মন্দির ও পুষ্করিণী সম্বলিত বারইয়ারি কালীবাড়ি আছে, তথায় সর্বসাধারণের উদ্যোগে প্রতিবৎসর কার্তিক মাসে অতি সমারোহে বারইয়ারি পূজা হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত গ্রামের হিন্দু অধিবাসীগণ পূর্বে বিবাহের পণের এক চতুর্থাংশ দান করিত ; তাহাই জমা হইয়া এই পূজার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হইত এবং পূজা উপলক্ষে এই প্রদেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ অতি পরিতোষ সহকারে ভোজন ও সর্বসাধারণে গীতবাদ্যাদি আমোদ উৎসব উপভোগ করিত। এখনও তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন বর্তমান আছে।

চাটমোহর নূতন বাজার হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমাংশে সাঁরোরা নামক পল্লী এক সময়ে পণ্ডিত প্রধান বলিয়া পরিচিত ছিল। এখানকার জনৈক জয়দেব তর্কালঙ্কার নামক পণ্ডিত সাঁতৈল রাজসভাসদ ছিলেন। প্রবাদ তিনি রাজবংশীয় রাজা রামকৃষ্ণের জন্য পাত্রী মনোনয়নপূর্বক বিবাহ সম্বন্ধ সুস্থির করিতে গিয়া নির্বাচিতা কন্যা ডেমরা রায় বংশীয়া রুদ্রাণী দেবীকে স্বয়ং বিবাহ করিয়া বসিয়াছিলেন সে জন্য লজ্জায় উক্ত রাজদরবারে আর মুখ দেখাইতে পারেন নাই। এখানকার জনৈক পণ্ডিত শৃগাল কুক্কুরাদির ডাকের অর্থ বোধ করিতে সক্ষম ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। নরখালি নামে প্রাচীন করতোয়া তটে একটি স্থান বর্তমান আছে. তথায় একদা শ্মশানে ভাসমান একটি মৃতদেহে সোনার অঙ্গুরী বর্তমান ছিল, একটি শৃগাল উক্ত অঙ্গুরী উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া ডাকায় পণ্ডিত মহাশয় তাহার ব্যাখ্যা করিলে, তৎশ্রবণে জনৈক ছাত্র অধ্যাপকের বাক্যের সত্যতা প্রমাণ উদ্দেশ্যে ও অঙ্গুরী লোভে মৃতদেহের স্পর্শে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক গুণাবলীতে পরিশেষে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল।

হরিপুর— চাটমোহর রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় ৬ মাইল উত্তর পূর্বোক্তর কোণে এবং চাটমোহর পুরাণ বাজার হইতে প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে পাবনা জেলার পশ্চিম সীমা সংলগ্ন বরল নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত হরিপুর একটি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ভদ্রপল্লী বলিয়া পরিচিত। ইহা সাধারণত জোনাইল হরিপুর নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ গ্রামটি প্রায় পূর্ব পশ্চিমে তিন মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত। পূর্বে দুই তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলের অবস্থিত ইহা যে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বা বাণিজ্য কেন্দ্রস্থল ছিল। তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইহার দক্ষিণ দিকে যে বিস্তৃত কুরুলিয়া বিল বর্তমান দেখা যায়, তাহা পূর্বে বিল ছিল না ; দুটি তিনটি নদীর মোহনা বা সঙ্গমস্থল ছিল ; কালে নদীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়া ক্রমশ বিলে পরিণত হইয়াছে। গ্রামের মধ্য দিয়া এখনও যে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর চিহ্ন বর্তমান আছে, তাহা ট্যাঙরাদহ বা কাহার মতে পানিয়াগাড়া নামে আত্রাই (আত্রেয়ী) নামক নদী হইতে বহির্গত হইয়া সিঙ্গাইল গ্রামের নিকট গাঙ্গগড় নামক নদীর সহিত মিলিত ছিল। এক্ষণে এই নদী অংশের চিহ্ন একরূপ বিলুপ্ত প্রায়, মাত্র স্মৃতিবাহী নিম্নভূমি বর্তমান আছে।

বর্তমানে গ্রামটি ক্রমশ জঙ্গলাকীর্ণ হইতেছে বটে, কিন্তু একসময় সাঁতৈল রাজবংশের উন্নতিকালে উক্ত রাজ্যের আশ্রিত হরিপুর একটি প্রধান পল্লী মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই গ্রাম হিন্দু সমাজান্তর্গত সমস্ত জাতি এবং মুসলমান আদি সর্বপ্রকার অধিবাসী পরিপূর্ণ ছিল। এখন পর্যন্ত একমাত্র বৈদ্য ও তিলি বৈশ্যাদি মহাজন শ্রেণীর ব্যবসায়ী জাতি ব্যতীত সর্বপ্রকার হিন্দু জাতির বাস আছে ; ব্রাহ্মণ সংখ্যাই অধিক। ইহাদের বাস গ্রামের মধ্যস্থলে, গ্রামের চতুর্দিকে, কোল, কোনাই, মাটিয়াল, বাগদী, জিয়ানী প্রভৃতি জাতিগণের আবাসস্থল। এই সমস্ত বাধ্যানুগত যোদ্ধৃজাতিগণ পরিবেষ্টিত পল্লীর সংস্থান দৃষ্ট মনে হয় গ্রামখানি পূর্বে সত্যই একটি সুদৃঢ় পরিখা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত পল্লীতে পরিণত ছিল।

শুনিতে পাওয়া যায় এখানে পূর্বে প্রায় সাত শতাধিক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ম্যালেরিয়া কলেরাদি মহামারিতে লোক সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইয়াছে ও ক্রমশ হইতেছে। মৈত্র, লাহিড়ী, বাগছি, সান্যাল আদি উপাধিক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কেহ কেহ চৌধুরীগণ কর্তৃক ভিন্ন স্থান হইতে আনীত। বর্তমানে হরিপুরের চৌধুরী বংশ এখানকার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশ বলিয়া পরিচিত হইলেও, ইতিপূর্বে এখানে নিয়োগী উপাধি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জমিদারগণ বাস করিতেন এবং এই গ্রামের প্রায় দুই অংশে তাহাদের স্বত্ব আছে বলিয়া জানিতে পাওয়া যায়।

গ্রামে দৈনিক বাজার ও সাপ্তাহিক হাট বসে। বাজারের উপর সাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইষ্টক নির্মিত মন্দির বিশিষ্ট এবং সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরযুক্ত কালীবাড়িতে বার্ষিক বারইয়ারি কালীপূজা উপলক্ষে পূর্বে অতি সমারোহ হইত। উৎপন্ন দ্রব্য মধ্যে এখানে উত্তম বরণ ধান্য পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য মধ্যে এখানে প্রস্তুত কাঁচাগোল্লা, চম চম, বরফি ও সন্দেশ অতি প্রসিদ্ধ ; গবাদি পালনোপযোগী বিলজাত কাঁচা ঘাস এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং বহুদূর হইতে লোকে আসিয়া তাহা এখান হইতে কাটিয়া লয়।

স্থানীয় বারইয়ারি কালীবাড়ি ব্যতীত গ্রামের মধ্যে মৃত উমেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়দি:গব প্রতিষ্ঠিত একটি কালীবাড়িতে পাষাণময়ী কালিকা মূর্তি স্থাপিত আছে। লাহিড়ী বংশ এক্ষণে বিলুপ্ত ; এখানকার মৈত্র বাবুদের উপর উক্ত বিগ্রহের দৈনিক সেবা পূজার ভার ন্যস্ত আছে। গ্রামের একাংশে কদমতলী, কালিয়াগাড়ি প্রভৃতি নামে জঙ্গলাকীর্ণ কয়েকটি প্রাচীন দীর্ঘিকা ও তৎপরিস্থিতি বাঁধা ঘাটের উপর শিব লিঙ্গ মূর্তি স্থাপিত আছে। এতদ্ব্যতীত অনেকের বাটিতেও শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রামে মৈত্র পাড়া, সান্যাল পাড়া, চৌধুরী পাড়া, জীয়ানী পাড়া প্রভৃতি নামে জাতি নির্বিশেষে আবাসস্থান সমূহের নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে। এই গ্রামে তিন শতাধিক বৎসরের ঊর্ধকাল সময়ের রোপিত আম্র কাঁঠালের ৬/৭ হাত বেড় বিশিষ্ট প্রাচীন বৃক্ষাদি পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম ক্রমশ নিবিড় জঙ্গলে ও বন্য বরাহ শার্দুলাদির আবাসভূমিতে পরিণত হইতেছে। পরিত্যক্ত ইষ্টকালয় ও জঙ্গলাদিতে সর্প-দংশন ভয় এখানে অত্যধিক। গ্রামের প্রায় অধিকাংশ সমৃদ্ধিশালী লোকের বাড়িতেই সম্মুখে এবং পশ্চাতে পুকুরাদি জলাশয় বর্তমান আছে, কিন্তু সংস্কার অভাবে তাহা জঙ্গলাকীর্ণ বিধায় এখানে পানীয় ও স্নানার্থ জলের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। যে দুই একটি সুবৃহৎ ব্যবহার উপযোগী পুষ্করিণী আছে, তাহাও তাহাদের মালিকগণের মধ্যে দ্বন্দ্বকলহাদি নিবন্ধন একের ঘাটে অন্যের বা তৎসম্পর্কীয়

লোকের নামা ও জলপানাদি কার্য করা নিষিদ্ধ। একটি পুকুরের এক পার্শ্বে ৩/৪টি পৃথক পৃথক ঘাট বাঁধা দৃষ্টে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হয়।

পূর্বে এই গ্রামটি সর্বায়বসম্পন্ন ছিল ; এখন কতকাংশে আছে বলিয়া বিবেচনা হয়। তবে পূর্বের ন্যায় জনসংখ্যাধিক্য নাই, দিন দিন লোকসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইতেছে। পূর্বে এখানে নদীর সঙ্গমস্থলে সমাজ বাস উপযোগী হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ সম্প্রদায়ের বাস, সর্বপ্রকার খাদ্যাদির প্রাচুর্য, চতুর্দিকস্থ শস্য শ্যামল কৃষিক্ষেত্রের উন্মুক্ত বায়ু, বহু পণ্ডিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তির অবস্থান ছিল। ক্ষেতের ধান, বাগানের ফল মূল তরকারি, বিল ও নিজ নিজ পুকুরের মাছ এবং বাড়িতে অনায়াসে প্রতিপালিত গাভীর দুগ্ধাদি পানাহারপূর্বক সর্বদা সুখ শান্তিতে বাস করিয়া এখানকার লোকে প্রকৃতই বলিত "এমন সুখের দেশ কি আর আছে।" অধুনা গ্রামের যাহারা কৃতি সন্তান ও সুশিক্ষিত তাহারা কর্মোপলক্ষে বিদেশগামী এবং দেশের প্রতি সর্বথা উদাসীন। যাহারা বাটিতে অবস্থান করেন, তাহারা আলস্যপরায়ণ, অল্প বিস্তর ঋণভার জড়িত এবং সামান্য কারণে নানারূপ কলহ ও মামলা মোকদ্দমাদিতে লিপ্ত।

পূর্বে এতদঞ্চলে তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ চর্চা ও অনুশীলন হইত। এই গ্রামে অদ্যাবধি সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বংশধরের বাস আছে। প্রকাশ তাহারও জন্মস্থান এখানেই ছিল। প্রবাদ তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ; তিনি "তন্ত্রসার" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ-রচনা করেন। তিনি বিশেষ তান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিলেন এবং বনদুর্গাপূজা তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তদীয় বংশধর এখানকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহার খড়দহ অঞ্চলের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস নামক জনৈক শিষ্য এবং স্বীয় নামানুসারে **প্রাণতোষিণী** তন্ত্রসার নামে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তান্ত্রিক প্রধান স্থান বলিয়া পরিচিত হইলেও চৌধুরী বংশীয় হরি মৈত্র ও যাদবানন্দ মৈত্র মহাশয়দ্বয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। যাদবানন্দ সাধারণত যাদু কীর্তনীয়া নামেই পরিচিত হইতেন সে জন্য হরিপুরের চৌধুরী বংশ এখন পর্যন্তও যাদু কীর্তনীয়ার বংশধর বলিয়াই আখ্যাত হইয়া থাকে।

এখানকার চৌধুরী বংশের স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ চৌধুরী বঙ্গের প্রধানতম বিচারালয় মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (মিঃ জে. চৌধুরী) শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ চৌধুরী মহাশয়গণ উক্ত বিচারালয়ের ব্যবহারজীবী। ইহাদের অন্য ভ্রাতা একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। সকলেই বিলাত প্রত্যাগত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিবিশিষ্ট। ইহাদের পিতা স্বর্গীয় দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয় গবর্নমেন্টের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আশুবাবুর প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চৌধুরী ইউরোপ প্রবাস ও তথাকার শিক্ষার ফলে জনৈক ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রামের মৈত্র বংশীয় ও আরও অনেক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া রঙপুরে ও অন্যান স্থানে বিদেশে বহুদিন হইতে ওকালতি করিতেছেন। এতগুলি শিক্ষিত লোকের জন্মস্থান হরিপুরে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর মধ্য ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইত। সম্প্রতি বিগত ১৯২৫ অব্দ হইতে একটি বিদ্যালয় এখানে স্থাপন জন্য চেষ্টা হইতেছে। বর্তমানে গ্রাম্য দলাদলি ও তজ্জনিত নানা প্রকার মামলাদি এখানকার সর্ববিধ উন্নতির প্রধান অন্তরায়। এ বিষয়ে গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি সবিশেষ আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক।

চৌধুরী বংশের বিবরণ ঃ

হরিপুরের চৌধুরী সাতোটার মৈত্র ও অম্বর ওঝার বংশধর। এই বংশীয় রঘুনন্দের পুত্র হৃষিকেশ পাঠান রাজত্বকালে নবাব সরকারে চাকরি করিয়া **মজুমদার** উপাধি লাভ করেন, অত্যল্পকাল মধ্যে প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন জন্য পরে **চক্রবর্তী** নামেও অভিহিত হইতেন। তিনি মৈত্র গাঁঞি ছিলেন জন্য তৎপুত্র **মৈত্র** নামে খ্যাত হইতেন। হৃষিকেশের পুত্র হরি মৈত্র

ও যাদবানন্দ মৈত্র উভয়েই বৈষ্ণব ছিলেন। যৎকালে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক চৈতন্য মহাপ্রভুর হরি সংকীর্তনে বঙ্গদেশ প্লাবিত হয়, তখন উভয় ভ্রাতা তাহার প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হইয়া উক্ত ধর্ম প্রচার উপলক্ষে এতদঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন। উভয়েই সুগায়ক ও কীর্তনীয়া বলিয়া পরিচিত হইতেন। তৎকালে সাঁতৈল হরিপুর প্রভৃতি স্থান তান্ত্রিক প্রধান ছিল। হরিপুরে নিয়োগী উপাধিক ব্রাহ্মণ জমিদারের বাস ছিল। তাহারা বলপূর্বক যাদবানন্দের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। মৈত্র বংশ নিরাবিল কুলীন ব্রাহ্মণ, বিবাহান্তে যাদবানন্দ কুলীন ভঙ্গে কাপ হইলেন দেখিয়া হরি মৈত্র দেশে ফিরিলেন, নিয়োগীগণের নিকট কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি পাইয়া যাদবানন্দ এখানে স্থায়ী হইলেন। ক্রমে যাদবানন্দ সাঁতৈল রাজার অধীনে আদায়কারী চৌধুরাই বা সামন্তরাজ হইয়া চৌধুরী আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন এবং সোনা বাজু পরগণার খারিজা মহালের কর্তৃত্বলাভ করিলেন। যাদবানন্দের পুত্র কাশীনাথ চৌধুরী নবাব সরকারে চাকুরি করত রাই রাঁইয়া উপাধিলাভ করেন। তখন হইতেই হরিপুর চৌধুরীবংশের সবিশেষ উন্নতি হয় এবং তিনিই জ্যেষ্ঠ পিতামহের নামানুসারে স্বীয় বাসস্থানকে হরিপুর আখ্যা প্রদান করেন।

যাদবানন্দ পরম বৈষ্ণব হইলেও তৎকালে এদেশে তান্ত্রিকতার প্রতিপত্তি থাকা হেতু কাশীনাথের পুত্র চতুষ্টয় রামদেব প্রভৃতি শাক্ত হইয়াছিলেন। রামদেব অতিশয় বুদ্ধিমান, ক্ষমতাশালী ও ধার্মিক ছিলেন ; তিনি সাঁতৈল রাজ রামকৃষ্ণ সান্যালের দেওয়ান ছিলেন সেজন্য হরিপুরের চৌধুরীগণ পূর্বোক্ত যাদু কীর্তনীয়ার বংশধর রামদেব দেওয়ানের সন্তান বলিয়া পরিচিত। রামদেবের পঞ্চপুত্র হইতে পাঁচ ঘর চৌধুরী শাখার উৎপত্তি হয়। সোনাবাজু পরগণার খারিজা মহালের আয় বাদে, পরগণা খাট্টা এবং অন্যান্য পরগণার আদায় তহশীলে প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা বার্ষিক রামদেবের আয় ছিল।

যৎকালে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে বঙ্গের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, তখন আনুমানিক ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব আদায়ের ত্রুটি প্রযুক্ত মুর্শিদকুলি খাঁর আদেশে সৈয়দ রেজা খাঁ সাঁতৈল আক্রমণ করেন এবং রাজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া বিচক্ষণ দেওয়ান রামদেবকে তদীয় গদি প্রদানে ইচ্ছুক হইলে রামদেব তাহাতে স্বীয় মনিবের বিত্ত গ্রহণে অস্বীকার করত তথাকার শ্যাম রায়, রাধাকৃষ্ণ ও মঙ্গলচণ্ডী নামক বিগ্রহাদি লইয়া হরিপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। অদ্যাবধি উক্ত বিগ্রহগুলি চৌধুরী গৃহে পূজিত হইতেছে। রামদেব প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ২৫/২৬ বিঘা বিস্তৃত সুবৃহৎ দীর্ঘিকা অদ্যাপি বর্তমান আছে। চৌধুরী বাটিতে ভবানীশ্বর শিবলিঙ্গ ও মঙ্গলচণ্ডী বিগ্রহমূর্তি একটি বিচিত্র কারুকার্য খোদিত মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছেন।

রামদেবের পুত্র নয়নচাঁদ চৌধুরী নাটোর রাজসরকারে দেওয়ানি চাকরি করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি চাকরি উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ বড় নগরে বাস করিতেন। তৎপুত্রগণ হরিপুরে নয়াপাড়া নামক পল্লীতে বাসস্থান নির্মাণ করতঃ তথায় সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। তখন নাটোর রাজশাহী জেলার সদর স্টেশন ছিল ; হরিপুর অঞ্চলে একটি জেলখানা ছিল ; প্রবাদ নয়াবাড়ির পুকুর কয়েদিগণ কর্তৃক খনিত হইয়াছিল। এক্ষণে নয়াবাড়ির চৌধুরী বংশ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। নাটোরের সুপ্রসিদ্ধা রাণীভবানী প্রদত্ত চৌধুরী বংশীয় অনেকের বহু ভূসম্পত্তি বর্তমান আছে। চৌধুরী বংশে "দান, গদাধর, ফুলে রূপরাম" বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। ১১৪৬ ও ১২৮৬ সালের দুই খণ্ড দলিল দৃষ্টে জানা যায় উক্ত গদাধর চৌধুরী মহাশয় সান্যাল ও চৌধুরীদিগকে ব্রহ্মত্রভূমি দান করিয়াছিলেন। রূপরাম চৌধুরী বহু কুলীন ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিয়া কুলীনভঙ্গে কাপ করিয়াছিলেন।

কালীকান্ত চৌধুরী মহাশয় নাটোরে দেওয়ান ছিলেন। তিনি সোনাবাজু পরগণার সিকি অংশ খরিদ করেন। তৎপুত্র স্বর্গীয় দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। স্যর আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ তদীয় কয়েক ভ্রাতা কলিকাতা বালিগঞ্জের প্রবাসী। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় স্বগ্রামে একটি নূতন বাটি নির্মাণ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় আশু বাবু পিতার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ পাবনার দর্শন টোলের জন্য একটি পাকা গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য উক্ত টোলগৃহ দুর্গাদাস দর্শন টোল নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

পার্শ্বডাঙা দিং—পাবনা হইতে ১৫ মাইল উত্তরাংশে পাবনা পার্শ্বডাঙা রোডের উপর অবস্থিত পার্শ্বডাঙা একটি ক্ষুদ্র পল্লী। সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল লাইনের গুয়াখারা স্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল দুরে অবস্থিত এই গ্রামটি চৌধুরী উপাধিক বৈশ্য জাতীয় জমিদারগণের নিবাস জন্য প্রসিদ্ধ। গ্রামে একটি পোস্টাফিস ও মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় বর্তমান আছে। এখানে সাপ্তাহিক একটি হাট বসে। গ্রামের হিন্দু অধিবাসীগণ মধ্যে সরকার, নন্দী, দাস উপাধিক কয়েক ঘর কায়স্থ, এক ঘর ব্রাহ্মণ, ৫/৭ ঘর সাহা উপাধিক বৈশ্য, কয়েক ঘর নমঃশূদ্রাদি জাতির বাস আছে; মুসলমান জন সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। নিকটবর্তী **সজনাই** নামক পল্লীতে কয়েক ঘর কর্মকার, নরসুন্দর কায়স্থাদি জাতির বাস।

জমিদার প্রধান গ্রাম বলিয়া পরিচিত হইলেও এই গ্রামের উন্নতি জন্য এখানকার লোকের কোন প্রকার চেষ্টা দেখা যায় না। পূর্বে জমিদার বাবুদিগের বাটিতে বাসন্তি দুর্গোৎসবাদি সময়ে বিশেষ সমারোহ ও আমোদ উৎসবের অনুষ্ঠান হইত, এক্ষণে বিলাসিতার উপকরণ বিশেষ নাট্যাভিনয়াদির আয়োজন উদ্যোগ থাকিলেও এখানে তাহা সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া বোধ হয় না। পূজাপার্বনাদির উৎসব এখান হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেই হয়। কয়েক বৎসর হইল স্বর্গীয় প্রসন্ননাথ চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে যে একটি গোপাল বিগ্রহের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে দৈনিক সেবা পূজার ব্যবস্থা আছে।

নিকটবর্তী **বনগ্রাম জামালপুরাদি** গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির বাস আছে। এতদঞ্চলে ধীবর জাতীয় অনেকে উত্তম চিড়া প্রস্তুত করে। জামালপুরে চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য উপাধিক ব্রাহ্মণ মণ্ডলী মধ্যে পূর্বে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব ছিল। এক্ষণে অনেকেই বিদেশগামী ও চাকুরিজীবী। জামালপুরের সিংহ উপাধিক কায়স্থ বংশ এক সময়ে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। এই সমস্ত গ্রামে উত্তম বরণ চাউল আমদানি হইত। বিগত কয়েক বৎসর হইল এখানকার জমি চাষ আবাদ হইতেছে না। সেজন্য জোতদার ও বর্গাদারগণ উভয়ে কষ্টে পতিত হইয়াছে।

হান্ডিয়াল দিং—চাটমোহর নূতন বাজার হইতে প্রায় ৬ মাইল উত্তরে প্রাচীন করতোয়া তীরে অবস্থিত হান্ডিয়াল একটি প্রাচীন পল্লী; বর্তমান ভাঙুরিয়া রেল স্টেশন হইতে প্রায় ৪ চারি মাইল দূর; ইহার পূর্ব নাম হারিয়াল বা হরিয়াল ছিল। পূর্বে এখানে পুলিশ স্টেশন এবং নাটোর জেলা থাকা সময়ে এখানে সদর আমিনের কোর্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত এখানে পুলিশ স্টেশন ছিল বলিয়া জানা যায়।

চলন বিলের পূর্ব পারে অবস্থিত হান্ডিয়াল গ্রাম বাণিজ্য হিসাবে বঙ্গদেশ মধ্যে একটি প্রধান বন্দর বলিয়া পরিগণিত ছিল। সমুদায় হিন্দুস্থানে যত রেশম আমদানি হইত, তাহার চারি পঞ্চমাংশ এক হান্ডিয়াল বন্দরে পাওয়া যাইত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে এখানে রেশম ও তুলাদি নির্মিত জিনিস খরিদ বিক্রয়ের কুঠি ছিল বলিয়া জানা যায়। এখানে নানা দেশিয় বণিকগণের সমাগম ও স্থানীয় অধিবাসীগণের আধিক্য হেতু এখানকার জমির খাজানা বিঘা প্রতি ৬০ টাকা হইতে ৮০ টাকা পর্যন্ত ধার্য ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচায়ক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। করতোয়া নদীর অবস্থা পরিবর্তন হেতু এই স্থানের অবস্থা ক্রমশ হীন হইতে থাকে। এখানে পূর্বে বহু তন্তুবায় গোপ বণিক, বৈশ্য, তিলি আদি বহু ব্যবসায়ী জাতির বাস ছিল। কালক্রমে মহামারী ও পুষ্করাদিতে বহুলোক মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং অনেকে বিশেষত তিলি সম্প্রদায় চাটমোহরাদি অঞ্চলে গিয়া বাস করিতে থাকে। ফলে এই স্থান ক্রমে হতশ্রী হইতে থাকে। শুনিতে পাওয়া যায় এক সময়ে

এখানে সাত শতাধিক গোয়ালা জাতির বাস ছিল, তাহার কেহই এক্ষণে বর্তমানে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এখানে প্রত্যেক জাতিই চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন দেব মন্দির ও জলাশয়াদি দৃষ্টে জানা যায় সকলেই এখানে স্বধর্মানুরত ছিলেন; ঘোড়পাড়ায় গোপীনাথের মন্দির, পোদ্দার পাড়ার বিগ্রহের সেবা, সাহা পাড়ার দোলমঞ্চাদি এখানে ।বশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঘোষপাড়ার মন্দির একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু স্থানটি অদ্যাপি ঘোষের ঠাকুর বাড়ি বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। পোদ্দারপাড়ার গোপীনাথের মন্দির এখনও জঙ্গলমধ্যে তৃণ কণ্টকাকীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া নীরবে অতীত কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। নিবিড় জঙ্গলমধ্যে সুন্দর কারুকার্য খোদিত মঠ ও প্রাচীনকালের আদর্শে ইষ্টক নির্মিত বাঙ্‌লাদি দর্শনে দর্শকের মনে স্বতঃই এক অভিনব ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ হাণ্ডিয়ালের জগন্নাথদেবের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের প্রস্তর গাত্রে খোদিত লিপি দৃষ্টে জানা যায়, ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ভবানীপ্রসাদ দাস কর্তৃক এই মন্দিরের একবার জীর্ণ সংস্কার হইয়াছিল। ইহাতে অনুমান হয় তাহার বহু পূর্বে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। একমাত্র তাড়াস গ্রামের মন্দির ব্যতীত ইহার তুল্য প্রাচীন দেব মন্দির এই জেলার আব কুত্রাপি সহসা দৃষ্টি গোচর হয় না। জগন্নাথ বিগ্রহের রথযাত্রা ও পুষ্পযাত্রা উপলক্ষে এখানে বহুদূর হইতে যাত্রিগণের সমাবেশ হইয়া থাকে। হাণ্ডিয়ালের মহাপ্রভুর আখড়াও বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ইহা এখানকার ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বিলুপ্ত সেবাইতগণের পরিত্যক্ত বিগ্রহের আশ্রয়স্থলে পরিণত হইয়াছে।

এখানকার বুড়াপীরের দরগাহ অতি প্রসিদ্ধ; ইহা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক সম্মানিত; স্থানটি অতি মনোরম। ইহার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য পূর্বে প্রায় দেড় শতাধিক বিঘা পরিমাণ পীর পাল জমি নির্দিষ্ট ছিল, এক্ষণে মাত্র ২০/২৫ বিঘা জমি বর্তমান আছে। প্রবাদ মজলেস্ থরসি নামক জনৈক ধর্মাত্মা কর্তৃক এই দরগাহ স্থাপিত হয়। জঙ্গল মধ্যে ইষ্টক ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত এই দরগাহ সংলগ্ন ক্ষুদ্র মসজিদটি এখানকার প্রাচীন মুসলমান কীর্তির সাক্ষ্যদান করিতেছে। এক সময়ে এখানে যে মুসলমানগণও সাতিশয় বর্ধিষ্ণু ও প্রতিপত্তিশালী ছিল, বর্তমান সময়ে খাঁ পাড়া, মিঞাপাড়া, কাজিপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবাসস্থলসূচক স্থানসমূহ হইতে তাহা উপলব্ধি হইতেছে। এখনও কোন কোন স্থলে সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের বংশধরসমূহ হীনাবস্থায় বাস করিতেছেন।

হাণ্ডিয়ালে শেঠের বাঙ্‌লা নামে একটি ইষ্টক নির্মিত ও বিচিত্র কারুকার্য খোদিত নাতি উচ্চ বাঙ্‌লা গৃহ বহুদিন হইতে জগৎশেঠের বাঙ্‌লা ও তৎসংশ্লিষ্ট বাটি শেঠের কুঠিবাড়ি বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ইহা এক্ষণে জনৈক মুকুন্দলাল সাহা মহাশয়দিগের দখলে আছে। বাঙ্‌লাটির খোদিত লিপি দৃষ্টে জানা যায় ইহা ১৭০১ শকাব্দ (১৭৭৯ খ্রিঃ) ব্রজরাম দাসের পুত্র কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। এখানে ইতিহাস বিশ্রুত জগৎশেঠের কুঠি বাড়ি ছিল বলিয়া প্রবাদ। পূর্বে সাতিশয় ধনাঢ্য ব্যক্তি মাত্রেই শেঠ বা জগৎ শেঠ উপাধি হইত। এই সাহা উপাধিক মহাজনদিগের পূর্বপুরুষগণও হয়ত কালে সাতিশয় ধনশালী থাকায় তাহাদেরও শেঠ উপাধি লাভ অসম্ভব নহে। কিংবা ইহাদের পূর্বপুরুষ এই স্থানে প্রকৃত জগৎ শেঠের কুঠির কার্যাধ্যক্ষ থাকাও অসম্ভব নহে। পূর্বে হাণ্ডিয়ালে শীতলাই, পার্শ্বডাঙা, কাসিমপুর ও ওয়াটসন কোম্পানির এক একটি জমিদারি কাছারি বর্তমান ছিল। প্রতি বৎসর পূণ্যাহ দিনে উক্ত কাছারি চতুষ্টয় হইতে নায়েবগণ এই কুঠি বাড়ির পূর্বাধিকারী ও ইহাদিগের পূর্বপুরুষ জনৈক দুর্গাসুন্দর সাহা মহাশয়ের সময় পর্যন্ত সসম্মানে এই কুঠি বাড়িতে যাইয়া পুণ্যাহ করিত এবং পুষ্পমালা ও পানাদি প্রদান করিত। এক্ষণে এই প্রথা লোপ পাইয়াছে। পূর্বে হাণ্ডিয়ালে পোদ্দার উপাধিক সুবর্ণ বণিক জাতির বাস ছিল এবং এখনও কয়েক ঘরের বাস

আছে। এখানে সিদ্ধেশ্বরীতলা বলিয়া একটি মন্দির বর্তমান আছে।

গ্রামটি বর্তমান সময়ে ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ; এখানে পূর্বে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। প্রবাদ এথাকার বাঘের ভয়ে পূর্বে দিবা ১২টা হইতে ৩টার মধ্যে হাট ভাঙিয়া যাইত। এক্ষণে প্রতি সোমবারে ও শুক্রবারে সাপ্তাহিক হাট লাগে। ধান, চাউল, সরিষা আদি পণ্য দ্রব্য আমদানি হয়। অধিবাসী মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যা বেশি। অনেক প্রাচীন দীর্ঘিকা জঙ্গলাদি বর্তমান আছে, কিন্তু তাহার জল ব্যবহারোপযোগী নহে। করতোয়া নদীর জল কথঞ্চিৎ ব্যবহার্য। গ্রামে সামান্য একটি পাঠশালা ও একটি অফিস বর্তমান আছে।

সমস্ত হান্ডিয়াল পরগণা পূর্বে ভক্তরাম সরকার নামক জনৈক কায়স্থ জমিদার মহাশয়ের ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি অতি সমৃদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহার সময়ে জগন্নাথ বিগ্রহের সেবার অনেক সুবন্দোবস্ত ও উন্নতি হয়। তাহার দোর্দণ্ডপ্রতাপের বিষয় অদ্যাপি এতদঞ্চলে প্রচলিত ছড়া হইতে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

ভক্তরামের শক্ত ঠেলা।
আন্দিরামের ডাক।।

আন্দিরাম—মাজগ্রাম নিবাসী বিশ্বাস বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভক্তরাম সরকার নিঃসন্তান পরলোকগমন করায় তদীয় সম্পত্তি নিকটবর্তী বল্লভপুর নিবাসী জনৈক গোস্বামী সন্তান তৎপ্রতিষ্ঠিত গোপাল বিগ্রহ সব প্রাপ্ত হয়েন। অদ্যাবধি উক্ত গোস্বামী বংশধরগণ উক্ত সম্পত্তি ভোগদখল করতঃ উক্ত বিগ্রহের সেবা পরিচালন করিতেছেন।

হান্ডিয়ালের নিকটবর্তী প্রায় দেড় মাইল দূরে দক্ষিণপূর্বাংশে **বাঘলবাড়** নামক একটি প্রাচীন পল্লীতে পূর্বে অনেক ধনাঢ্য সুবর্ণ বণিক জাতির বাস ছিল। এখানে এখনও অনেক বাঁধা ঘাট বিশিষ্ট সুবৃহৎ দীর্ঘিকা এবং দ্বিতল অট্টালিকাদি জঙ্গল মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কালে এই গ্রামে অতি সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের বাস ছিল, এক্ষণে একেবারে জনশূন্য হইয়াছে। মাত্র বুনা ও নিম্ন শ্রেণীর কয়েক ঘর লোকের বাস।

বল্লভপুর—অতি প্রাচীন গ্রাম, এখানকার গোস্বামীগণ অতি পুরাকাল হইতে এখানে বাস করিতেছেন। ইহারা অদ্বৈত বংশোদ্ভব ঠাকুর নরোত্তমের সন্তান বলিয়া পরিচিত। প্রবাদ নরোত্তম ঠাকুর ব্রহ্মচারী অবস্থায় দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে ধাতুময়ী গোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হন এবং স্বপ্নাদিষ্ট হয়েন যে, পাবনা জেলার হান্ডিয়াল পরগণায় হান্ডিয়াল গ্রাম নিবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্তী মহাশয়ের কন্যা ভাগ্যবতীর সহিত তাহার পরিণয় হইবে এবং তাহাকে তথায় যাইতে হইবে। তথা হইতে তিনি হান্ডিয়ালাভিমুখে যাত্রা করিয়া অনুসন্ধান ফলে পরিশেষে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়েন। কালে ভাগ্যবতীর সহিত বিবাহ হয় এবং তিনি তথায় স্থায়ী হন। তাহার স্বীয় কোন সন্তান জন্মে নাই। তদীয় অনুজত্রয়ের বংশ হইতে স্থল, হান্ডিয়াল ও বল্লভপুরের গোস্বামী পরিবারের সৃষ্টি হয়।

কোন সময়ে নরোত্তম ঠাকুর এদেশে আগমন করেন তাহা সঠিক জানা যায় না, এই মাত্র জানা যায় তাড়াস জমিদার বংশীয় জয়কৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় ও তদীয় বংশধরগণ যৎকালে ঢাকার নবাব সরকারে চাকুরি করিতেন, তখন পর্যন্ত তাহারা শিবভক্ত ও শৈব ছিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের এদেশে আবির্ভাব হইলে, তদীয় বৈষ্ণব ধর্ম এতদঞ্চলে প্রচার ফলে, উক্ত তাড়াস বংশীয় কায়স্থ পরিবার শৈবধর্ম পরিত্যাগপূর্বক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হইয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে এই গোস্বামী বংশ এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছেন। এই গোস্বামী বংশীয় অনেকের এ জেলায় ও অন্যান্য জেলায় বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি নানাজাতীয় শিষ্য বর্তমান আছে। হান্ডিয়ালের পূর্বতন জমিদার ভক্তরাম সরকার এই বংশের শিষ্য ছিলেন।

এই বংশে অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নিকটবর্তী **হামকুড়া** গ্রামে নিবাসী

এই গোস্বামী পরিবারস্থ স্বর্গীয় রাধামোহন গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের টিকা প্রস্তুত করতঃ যশস্বী হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই বংশের অনেকেই বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলোচনাদিতে সবিশেষ পারদর্শী। বর্তমানে পাবনা প্রবাসী শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন গোস্বামী মহাশয় এই গোস্বামী পরিবারস্থ এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া সুধী সমাজে পরিচিত।

হান্ডিয়াল হইতে প্রায় এক মাইল উত্তর পশ্চিমাংশে হাঁসুপুর একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানকার ভট্টাচার্য উপাধিক ব্রাহ্মণগণ শিষ্য ব্যবসায়ী। ইহারা শাক্ত মতাবলম্বী; অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি ও রাজা মহারাজা ইহাদের পূর্বপুরুষগণের অলৌকিক গুণাবলীতে ইহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের বাটিতে পঞ্চমুণ্ডী আসন, ইষ্টক নির্মিত দেবী মন্দির ও শিব মন্দির আদি বিশেষ দর্শনযোগ্য ছিল। এক্ষণে তৎসমুদায় ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে। এই ভট্টাচার্য পরিবারে পূর্বে দান দাতব্য ও নানারূপ ক্রিয়াকলাপের বিশেষ সমারোহ ছিল। এক সময়ে ইহারা সেরপুর (বগুড়া) নিবাসী গিরি উপাধিক গোস্বামী ও পুঠিয়া রাজের সহিত প্রতিযোগিতা সহকারে অনেক সমারোহ ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতেন বলিয়া নিম্নলিখিত ছড়া প্রচলিত হইয়াছিল। যথা—

হাঁসুপুরের কীর্তি ভারি,— দানেতে ডোমন গিরি,
মরি মরি পুঁঠার মন্দির

হাঁসুপুরের জঙ্গল মধ্যে অনেক সুবৃহৎ জলাশয় বর্তমান আছে। এখানে সান্যাল, মৈত্রাদি, উপাধিক ব্রাহ্মণ ও মাহিষ্য দাস আদি হিন্দু জাতির বাস ছিল, ক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইতেছে। মুসলমান সংখ্যাও সামান্য, হান্ডিয়ালের ন্যায় এই গ্রামও ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ। এই গ্রামের এক স্থানে নিম্নলিখিত শ্লোক খোদিত এক খণ্ড প্রস্তর ফলক একটি বৃক্ষতলে পতিত আছে। তাহার উপর লোকে দুধ ও তৈলাদি সময় সময় নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ইহার বঙ্গভাষার লিখন প্রণালীর বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। শুনা যায় পূর্বে ইহা এই স্থানে ছিল না, অন্যত্র হইতে এখানে আনা হইয়াছে। ইহা একটি মন্দির গাত্রের প্রস্তর ফলক বিশেষ বলিয়া বোধ হয়। শ্লোকটি এই—

বৈশ্বানরগ্রহপয়োনিধিশীতরশ্মিযুক্তং শকাব্দ
মনু সৌধমধোক্ষজায়। মন্দাকিমীপুলিনসঙ্গ
বিবিক্ত মৌলিং। শ্রীরামচন্দ্রের সুকৃতি ব্যতরদ্বিচিত্রিম।

শ্রীবিষ্ণুদাস তনয়ঃসুনয়প্রধান সাবিত্র্যসু...
তয় যমিবাগ্নীভুবং ভবানী। শ্রীরামচন্দ্রসুমতিনিবতম...
মুরারে প্রাসাদমেতমমৃত দ্যুতি চুম্বি চূড়ম।

১৪৯৩

অষ্টমনীষা—চাটমোহর থানার অন্তর্গত করতোয়া ও আত্রেয়ী নদীর নিম্নাংশ গুমানী নামক নদীর সঙ্গম স্থলে বর্তমান সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল লাইনের ভাঙুরিয়া স্টেশন হইতে পশ্চিমে প্রায় তিন মাইল দূরে মাঠিয়াদহ নামক স্রোতস্বতীর তীরে অবস্থিত অষ্টমনীষা একটি প্রাচীন পল্লী। ইহা বহুদিন হইতে বারেন্দ্র কায়স্থ প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্তমান সময়ে এখানে রায়, মজুমদার, বিশ্বাস উপাধিক কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, মালো আদি হিন্দু জাতির বাস। মুসলমান সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।

এখানে দৈনিক বাজার এবং সাপ্তাহিক রবিবার ও বৃহস্পতিবারে হাট লাগিয়া থাকে এবং পাট, ধান ও নানাপ্রকার ভুষামাল প্রভৃতি অনেক পণ্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানি হয়। এখানকার বারেন্দ্র কায়স্থগণের অনেকের বাড়িতে দৈনিক ঠাকুর সেবা ও অতিথি সৎকারাদির ব্যবস্থা আছে। এই গ্রামের কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় কুচবিহার রাজ স্টেটের আহেলকারের (ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট) পদবীতে চাকরি করিতেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি উক্ত রাজ স্টেটের দেওয়ান পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি কয়েক মাস হইল তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রকাশ মোঘল রাজত্বকালে বঙ্গের ষষ্ঠ সুবেদার রাজা মানসিংহ (১৫৮৯-১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ) যখন এই জেলার মরিচপুরাণাদি গ্রামে সেনানিবেশ পরিদর্শন মানসে এতদঞ্চলে আগমন করেন, তখন অষ্টমনীষা গ্রামের বারেন্দ্র কায়স্থ বংশীয় গোপীকান্ত রায় মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় শ্রবণে তাহাকে কাননগু দপ্তরে নিযুক্ত করেন এবং তাহার প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া ও কার্যে সাতিশয় প্রীত হইয়া স্বীয় গ্রামখানি তাহাকে নামমাত্র করে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ঢাকুরে লিখিত আছে—

"সমাজ প্রধান মধ্যে অষ্টমুনীষা গ্রাম।
উত্তম ক্রিয়াতে ব্যাখ্যা হইলা প্রধান।।

যবে মানসিংহ রাজা বঙ্গেতে আইলা।
উত্তম জানিয়া বংশ সম্মান করিলা।।
কাননগু দপ্তর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালাতে হয়।
সে দপ্তরে চাকরি কৈলা গোপীকান্ত রায়।।
নেউগী খেতাব দিলা সন্তুষ্ট হইয়া।
নিজ গ্রাম খানি দিলা মিলিক লিখিয়া।"

এই গোপীকান্ত রায় বংশীয় সুবুদ্ধি খাঁ ও কমল খাঁ মুসলমান আমলে বক্‌সি ওয়াদার কার্য করিয়া খাঁ উপাধি লাভ করেন। তাহাদের নামানুসারে জায়গিরের বিভিন্ন নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। মরিচপুরাণাদি অঞ্চলে এখনও তাহাদের নামীয় **সুবুদ্ধি মরিচ** ও **কমল মরিচ** (অর্থাৎ সুবুদ্ধি খাঁ ও কমল খাঁ কর্তৃক পরিচালিত সেনানিবাস) তাহাদের নাম ও কৃতকার্যের চিহ্ন ঘোষণা করিতেছে। "সুবুদ্ধি খাঁর বংশীয় রমেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি **অষ্টমনীষার** নিউগীপাড়ায়, কমল খাঁর বংশীয় শিবচন্দ্র রায় **মৈদামদীঘি** গ্রামে এবং গৌরগোপাল রায় প্রভৃতি এক্ষণে বগুড়া শিব বাটিতে বাস করিতেছেন। সুবুদ্ধি খাঁ ও কমল খাঁর খাঁ উপাধি হইলেও তাহাদের পুত্রগণ হইতেই রায় উপাধি পরিলক্ষিত হইতেছে। **খাঁ** উপাধি হইতে **রায়** উপাধি হিন্দুত্ববোধক অথবা তৎপরবর্তী ব্যক্তি **রায়রাইঞা** উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই রায় উপাধি হওয়া সম্ভবপর।" *কায়স্থ পত্রিকা—আষাঢ়—১৩১৫ সাল।*

অষ্টমনীষার অপর পারে করতোয়া (এক্ষণে সামান্য খাত বিশেষ) নদীর তীরে মৃজাপুরও একটি বন্দর বিশেষ। এখানে বারুণী স্নান সময়ে প্রায় সাপ্তাহিক কালস্থায়ী একটি মেলার অনুষ্ঠান হয়। মৃজাপুর, বেলগাছি, বিশ্বনাথপুর প্রভৃতি কয়েকটি পরস্পর সংলগ্ন গ্রামে বহু মৃৎশিল্পজীবী কুম্ভকার জাতির বাস আছে। ইহারা মৃত্তিকা নির্মিত নানাবিধ বাসন ও পাতিল প্রস্তুত করে এবং তাহা নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। বিশ্বনাথপুর ও মৃজাপুরে অনেক প্রতিমা চিত্রকরের বাস আছে, তাহারা পূজার সময় অনেক দুর্গোৎসবের প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। বেলগাছি ও মৃজাপুরের উভয় স্থানেই বহুবিধ পাতিল ও কৃষ্ণবর্ণ ছোট বড় চাড়ি প্রস্তুত হয়, তাহা এই জেলায় ও অন্যান্য অনেক স্থলে রপ্তানি হইয়া থাকে। নিকটবর্তী কোলা নামক পাড়ায় পূর্বে অনেক ব্রাহ্মণ ও কুম্ভকারের বাস ছিল।

ভাঙুরিয়া দিং—সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল লাইনে ভাঙুরিয়া একটি প্রধান স্টেশন। পাট ও ভুয়া মালপত্রাদি আমদানি রপ্তানি জন্য বরল নদী তীরে স্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটি ঘাট স্টেশন ও মাল গুদামাদি বর্তমান আছে। নদীর উত্তর ও দক্ষিণ উভয় তীরে মহাজনদিগের অনেক কারবারি গোলা ও আড়ত ঘর এবং গুদাম আছে। দক্ষিণপারস্থ বাজার ভাঙুরিয়া নামে

খ্যাত ছিল, এক্ষণে শরৎনগর নামে পরিচিত হইয়া থাকে। উভয় পারেই সাপ্তাহিক হাট বসে এবং পাট, ধান, মটর খেসারি আদি নানাবিধ মাল এবং মৎস্যাদি আমদানি হয়।

পার ভাঙুরিয়ায় পার্শ্বডাঙা জমিদার বাবুদিগের তহশীল কাছারি বাড়ি বর্তমান আছে। সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেললাইন নির্মিত হইবার সময় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে উক্ত স্থান পার্শ্বডাঙা স্টেটের স্বর্গীয় শরচন্দ্র সাহা চৌধুরী মহাশয়ের নামানুসারে শরৎনগর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এবং নদীর পার হইতে প্রায় একমাইল উত্তরে শরৎনগর নামে একটি রেলওয়ে স্টেশনও নির্মিত হইয়াছে।

স্থানীয় স্বাস্থ্য ও পানীয় জল অতি উত্তম ; এবং পাবনা ও সিরাজগঞ্জ উভয় দিক হইতে প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিধায় এখানে একটি মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল। নানা কারণে তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। দৈনিক বাজার বসে না বটে, কিন্তু বরল নদীতীরবর্তী বলিয়া এখানে প্রত্যহই সময় সময় অধিক পরিমাণে নানাবিধ মৎস্যাদি আমদানি হইয়া থাকে।

দিলপশার—একটি প্রাচীন বারেন্দ্র কায়স্থ প্রধান পল্লী বলিয়া পরিচিত। গ্রামটি সাঁড়া সিরাজগঞ্জ লাইনের দিলপশার রেলস্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমোত্তরে সম্পূর্ণ বিল মধ্যে অবস্থিত। এখানে মজুমদার, রায় উপাধিক কায়স্থ, ঘোষ, হালদার প্রভৃতি হিন্দু ও অল্পাধিক মুসলমান জাতির বাস। মজুমদারগণের অনেকে পূর্বে বিশেষ অবস্থাপন্ন ও সমৃদ্ধ ছিলেন ; ইহারা এখানকার ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিচিত হইতেন, এক্ষণে ইহাদের অনেক ভূসম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছে। অধুনা ঘোষ বা গোপ জাতিগণ এখানে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও অবস্থাপন্ন। এতদ্ব্যতীত সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেললাইন খুলিবার পর এতদঞ্চলের মৎস্যব্যবসায়ী অনেক ধীবর জাতিও মোহনপুর, দিলপশার, ভাঙুরিয়া আদি স্টেশন হইতে দৈনিক বহু মৎস্য কলিকাতায় চালান দিয়া তাহাদের অবস্থার অনেক উন্নতি করিয়াছে।

রায় উপাধিক কায়স্থ পরিবার গৃহে দৈনিক ঠাকুর সেবার বন্দোবস্ত আছে। গ্রামের বাহিরে সাধারণের পরিচালিত কালীবাড়িতে সুদৃশ্য করগেট টিনের নির্মিত মন্দির ও নাটমন্দিরে এখানকার ঘোষদিগের উদ্যোগে আষাঢ় মাসে অতি সমারোহে বার্ষিক বারইয়ারি কালীপূজা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে কবি গান ও নানারূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যত্র জালিকগণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত যে একটি বারইয়ারি কালীবাড়ি আছে, তথায়ও পূজাদি হইয়া থাকে।

সমাজ শীতলাই দিং—শরৎনগর রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমোত্তরে সমাজ একটি সুবিস্তৃত প্রাচীন পল্লী। সমাজ নামের অর্থ হইতে গ্রামের অবস্থা অনেকাংশে উপলব্ধি হয়। এই সমাজ ও নিকটবর্তী সিদ্ধিনগর, মরিচপুরাণ, বাঘলবাড়, ড্যাফলচড়া প্রভৃতি গ্রাম সমূহ এক সময়ে বহু জনবহুল পল্লীতে পরিণত ছিল। এতদঞ্চলে এক সময়ে হিন্দু সমাজের শীর্ষ স্থানীয় বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের বাস ছিল। সুবিস্তৃত দীর্ঘিকা ও ভগ্ন মসজিদাদিতে এই প্রদেশের প্রাচীন সমৃদ্ধি অদ্যাপি সূচিত হইয়া থাকে।

সমাজ গ্রামে প্রচলিত নিম্নলিখিত গ্রাম্য কবিতাংশ হইতে এথাকার অবস্থা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এক সমাজের আঠার পাড়া,
ছয় বুড়ি পুকুর তার নয় বুড়ি গাড়া,
চারিদিকে চারি পুকুর মাঝখানে এক মসজিদ।

এই আঠার পাড়া মধ্যে আমিনপাড়া, কাজিপাড়া, মিঞাপাড়া, চালাপাড়া, তাঁতিপাড়া, রাজপাড়া, শিতলাই, পাটনীপাড়া, চৌধুরীপাড়া, দক্ষিণপাড়া, প্রভৃতি। এই সমস্ত পল্লী উপপল্লীর অবস্থানুসারে সমাজ গ্রামের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। শিতলাই সমাজ

হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। এই স্থান মধ্যেই অনেকানেক বৃহদাকার পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। জনমানব শূন্য প্রান্তর মধ্যে বিল পার্শ্ববর্তী এই সমস্ত প্রাচীন দীর্ঘিকাদির অনেকগুলিতে সময় সময় বৃহাদাকার কুম্ভিরাদি পরিলক্ষিত হয় ; মাঠে গবাদি চরিতে থাকিলে উহারা তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যায়।

সমাজ গ্রামে অধুনা মাত্র তালুকদার উপাধিক ব্রাহ্মণ, সরকার উপাধিক কয়েক ঘর কায়স্থ, কতকগুলি জালিক এবং কতিপয় মুসলমানের বাস, পূর্বে এখানে যে এক সময়ে পাঠান বংশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের বাস ছিল, তাহা এথাকার প্রাচীন মসজিদ দৃষ্টে সহজে অনুমেয়। এই মসজিদটি হিজরী ৯৫৮ সালে (১৫৫২ খ্রিঃ) ইতিহাস বিশ্রুত সের শাহের পুত্র সুলতান সমিরের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। প্রবাদ আছে বাংলার নবাবের জনৈক আত্মীয় এই প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া, পরিশেষে এতদঞ্চলে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং কালে এখানে স্থায়ী হইয়াছিলেন। তাহার সময়ে এই মসজিদ নির্মিত হয়।

শীতলাই গ্রামের মৈত্র উপাধিক জমিদার বংশ এই জেলায় বর্তমান সময়ে সবিশেষ পরিচিত। স্বর্গীয় লোকনাথ মৈত্র মহাশয় এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এখানেও বহুদূর বিস্তৃত একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা বর্তমান আছে। সম্প্রতি এখানে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে একটি পোস্টাফিস ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় বর্তমান আছে।

সমাজ হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে **মরিচপুরাণ** নামে একটি পল্লী বর্তমান আছে। ইহার সংলগ্ন চণ্ডীপুর গ্রামে একটি সুপ্রাচীন মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রাম পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি গ্রাম নন্দী মরিচ, গাছমরিচ. বৃদ্ধমরিচ, খানমরিচ, কমলমরিচ, সুবুদ্ধিমরিচ প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। মুরচা অর্থ সেনানিবাস। প্রবাদ মরিচপুরাণে মোঘল রাজত্ব সময়ে বাদশাহী সেনানিগণের জন্য যে স্কান্দাবার বর্তমান ছিল, বাংলার মোঘল সুবেদার রাজা মানসিংহের সময়ে এখানকার উক্ত সেনা নিবাস উঠাইয়া বগুড়া জেলার সেরপুরে স্থানান্তরিত করা হয়, তজ্জন্য উক্ত সেরপুর মুরচা (মুর্চা) সেরপুর নামে অভিহিত হয় এবং এই জেলার এই স্থানের মুর্চা বা সেনানিবাস পুরাণ মুর্চা বা মরিচ পুরাণ নামে পরিচিত হইতে থাকে। নন্দী মরিচ, খানমরিচ, সুবুদ্ধিমরিচ. কমলমরিচ প্রভৃতি পল্লী উপপল্লীগুলি ব্যক্তিবিশেষের বাদশাহী সৈন্য বিভাগে কার্য বিশেষের পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত জায়গিরের নাম বিশেষ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। অষ্টমনীষার রায় বংশীয়দিগের পূর্বপুরুষ সুবুদ্ধি খাঁ, কমল খাঁ প্রভৃতি পূর্বে বকসি ওয়াদার কার্য করিয়া যে লাখেরাজ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই কালে সুবদ্ধি মরিচ কমল মরিচ নামে পরিচিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। বর্তমান সময়ে এই সমুদয় পল্লীগুলি একেবারে জনশূন্য এবং ব্যাঘ্রাদি বন্য জন্তুর আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। জানা যায় পূর্বে এতদঞ্চলে বহু বন্য মহিষাদিও দেখা যাইত। এখান হইতে কিয়দ্দুরে **সুলতানপুর** নামে একটি পল্লীতে একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা ও একটি গ্রাম্য পাঠশালা বর্তমান আছে। পূর্বে করতোয়া নদী এই সমস্ত পল্লীর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল ; তৎকালে এই সমস্ত পল্লী সাতিশয় সমৃদ্ধশালী জনপদে পরিগণিত ছিল বলিয়া এতদঞ্চল সুলতান বাদশাহগণের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইয়াছিল ; কালে নদীর গতির পরিবর্তনের সঙ্গে গ্রামগুলি হতশ্রী হইয়া ক্রমে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।

ধানুয়াঘাটা—চিকনাই নদীর তীরে ইহা একটি বন্দর বিশেষ। এখানে রাজশাহী জেলার জোয়ারী গ্রাম নিবাসী বিশি উপাধিক ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র বিশি মহাশয়দিগের একটি কাছারি বাড়ি বর্তমান আছে। এখানে সাপ্তাহিক হাট লাগিয়া থাকে। ধান চাউল পাট আদি পণ্যদ্রব্য আমদানি হয়। নিকটবর্তী হাদল গ্রামে একটি মাদ্রাসায় বহু মুসলমান ছাত্র অধ্যয়ন করে। সম্প্রতি এই মাদ্রাসার উদ্যোগে "রৌসন হেদায়েৎ" নামে একখণ্ড মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ফরিদপুর

ফরিদপুর—ভাঙুরিয়া রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় ৫ মাইল পূর্বাংশে বরল নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ফরিদপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। তাড়াসের জমিদার স্বর্গীয় বনওয়ারীলাল রায় মহাশয় শিকার উপলক্ষে এই নদী তীরস্থ তদীয় তহশীল কাছারিতে আসিয়া সময় সময় অবস্থান করিতেন এবং স্থানটি স্বাস্থ্যকর এবং মনোরম বিধায় এখানে ক্রমে স্থায়ী কাছারি বাড়ি স্থাপন করেন। কালক্রমে তাহার উদ্যোগে স্থানটির অনেক উন্নতি হয় এবং তদীয় আমলা কর্মচারি প্রভৃতির অবস্থান হেতু এই স্থানের নাম বনওয়ারিনগরে পরিণত হইয়াছে। তিনি এখানে বিনোদরায় নামক বিগ্রহের জন্য একটি সুদৃশ্য দেবালয় ও কাছারিবাড়ি আদি সম্বলিত চতুর্দিকে পরিখা বেষ্টিত একটি বাসভবন নির্মাণ করেন। ইহা এক্ষণে তাড়াসের বড় তরফের পাবনা জেলাস্থ ভূসম্পত্তি জন্য সদর কাছারিতে পরিণত হইয়াছে।

এখানে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসী মধ্যে সরকার উপাধিক কায়স্থ, কুম্ভকার ও অনেক মৎস্য ব্যবসায়ী জালিক জাতির বাস আছে। এতদ্ব্যতীত এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই বিদেশিয় তাড়াস স্টেটের কর্মচারি। এখানে অনেক নলিয়া জাতির বাস আছে। তাহারা দেশ বিদেশ হইতে অনেক প্রকার নল সংগ্রহ করিয়া চাটাই, ডোল আদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। অধিকাংশ অধিবাসীই বিদেশিয় তাড়াস স্টেটের কর্মচারি। দৈনিক বাজার ব্যতীত সপ্তাহে মঙ্গলবার ও শুক্রবারে এখানে একটি বৃহৎ হাট লাগিয়া থাকে। দেশিয় হিন্দু মুসলমান ব্যবসায়িগণ ব্যতীত এখানে মারওয়াড়ি কয়েক ঘর মহাজনের কারবারি দোকান ও গোলা আছে।

এখানে পুলিশ স্টেশন, পোস্টাফিস, ডাক বাঙ্লা, একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় এবং জমিদারগণের উদ্যোগে ও অর্থে পরিচালিত একটি দাতব্য চিকিৎসালয় বর্তমান আছে। পূর্বে এখানে বৈশাখ মাসে একটি মেলা লাগিত। এক্ষণে সাধারণের উদ্যোগে বাজারের উপর শারদীয় দুর্গোৎসব জন্য একটি পাকা মন্দির নির্মিত হইয়াছে। বিনোদ রায় নামক বিগ্রহালয়ে দৈনিক পূজা অর্চনা এবং অতিথি সেবাদির বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে।

ফরিদপুরের নদীর পর পারে পার-ফরিদপুর নামক পল্লীতে একটি পাকা মসজিদ আছে। তথায় অনেক মুসলমানের বাস। ফরিদপুর হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে **চিথলিয়া** নামক গ্রামে গুরুসত্য ধর্ম প্রচারক ধীবর জাতীয় ঠাকুর শম্ভুচাঁদের সমাধি মন্দির বর্তমান আছে; তথায় প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমার সময় তদীয় জন্মোৎসব উপলক্ষে পাবনা ব্যতীত ঢাকা, ময়মনসিংহাদি পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহ হইতে অনেক যাত্রী ও দর্শকবৃন্দের সমাগম হইয়া থাকে।

গোপালনগর—ফরিদপুর হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বে বরল নদীর দক্ষিণ তীরে গোপালনগর একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্র পল্লী বলিয়া পরিচিত। এখানকার মজুমদার পরিবার গ্রামে সমধিক প্রসিদ্ধ। মজুমদার ব্যতীত ভট্টাচার্য তালুকদার উপাধিক ও অন্যান্য ব্রাহ্মণাদির বাস আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে মৎস্যব্যবসায়ী অনেকানেক জালিক জাতির বাস। গ্রামের দক্ষিণ সীমা সংলগ্ন পাড়ায় "রসুয়া" নামক মুসলমান জাতীয় অনেক সোনারুপার গহনা প্রস্তুতকারক কর্মকারের বাস আছে। গ্রামে দৈনিক বাজার এবং রবিবার ও বুধবারে সাপ্তাহিক হাট বর্তমান আছে। প্রজা বিদ্রোহকালে এখানে মজুমদার বাটিতে অনেক উপদ্রব হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র গ্রামে অনেক শিক্ষিত লোকের বাস। কিন্তু অনেক সময় সামান্য কারণে পারিবারিক কলহ ও মামলাদিতে লিপ্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

ডেমরা—নাগ ডেমরা ও রায় ডেমরা নামক দুইটি পল্লীই বরল নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। বরল নদী হইতে প্রবাহিত ধুলাউরি নামক খালের ধারে রায় ডেমরা, তথা হইতে প্রায় ১ মাইল পূর্বাংশে নাগ ডেমরা অবস্থিত।

রায় ডেমরা নিবাসী রায় পরিবার এখানকার জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের পূর্ব বিবরণে জানিতে পারা যায় যে—**চক্রবর্তী** উপাধিক স্বর্ণদেব ঠাকুর নামে জনৈক তান্ত্রিক মতাবলম্বী বামাচারী ব্রাহ্মণ ইহাদের পূর্বপুরুষ বরল নদীর তীরে জপ তপস্যাদির সুবিধা বিবেচনায় এইস্থানে স্থায়ী হন। উত্তরকালে তদ্বংশীয় রামচন্দ্র চক্রবর্তী নামক জনৈক মহাত্মা নবাবী আমলে চাকরি আদি কার্যের ফলে বহুল স্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও রায় উপাধি লাভ করেন, তদবধি ইহাদের রায় উপাধি হইয়াছে। তিনি তদীয় পৌত্রী সর্বাণী দেবীকে সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের সহ বিবাহ দেন। তদবধি এই বংশীয় অনেকে উচ্চ রাজ স্টেট হইতে নানা প্রকারে অনেক স্থাবর সম্পত্তি লাভ করেন। এই বংশীয় অনেকে প্রাচীনকালে সবিশেষ ভোক্তা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রকাশ যে এই বংশীয় জনৈক মহাত্মা তৎকালে ভোজনের শেষে আধ মন মধু আহারে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাহারই পুরস্কার স্বরূপ বেড়ার নিকটবর্তী শম্ভুপুরা নামক মৌজাখানি উক্ত রাজ সরকার হইতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বংশীয় অনেকে সাতিশয় বলশালী ও কর্মঠ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। বিশেষ ধনশালী না হইলেও ডেমরার জমিদার এতদঞ্চলে অতিশয় প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। ইহাদের এজমালী তহশীলাদি জন্য একটি কাছারি আছে। তাহাদের আদায়াদি জন্য সময় সময় কমন্ ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া থাকে। উক্ত এজমালি তহশীল হইতে একটি নির্দিষ্ট ব্যয়ে পালাক্রমে বার্ষিক শরিক বিশেষের বাটিতে শারদীয় দুর্গোৎসব পূজা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

পূর্বে সামর্থ থাকিলেও এখানে কাহার বাটিতে ইষ্টক নির্মিত পাকা বাড়ি নির্মাণের প্রথা ছিল না জন্য অনেকের বাড়িতে মাটিয়া কোটা দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল ২/১টি বাড়িতে দালান নির্মিত হইয়াছে। এখানে বাজারের উপর যে বারইয়ারি কালীবাড়ি আছে, তাহা কাঁচা ইষ্টক নির্মিত।

গ্রামে ব্রাহ্মণ ব্যতীত ২৫/২৬ ঘর জালিক, নমঃশূদ্র, কর্মকার, তিলি, মালাকর আদি হিন্দু ও অনেক মুসলমানের বাস আছে। এখানে একটি পোস্টাফিস, মধ্য ইংরাজি স্কুল, দৈনিক বাজার ও সাপ্তাহিক রবিবার ও বৃহস্পতিবারে হাট বসিয়া থাকে। ভাদ্র মাসে এখানে সমারোহে কালীপূজা উপলক্ষে পক্ষাধিককাল স্থায়ী বারইয়ারি মেলাদির অনুষ্ঠান হয়। পূর্বে এখানে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ও কয়েকটি টোল ছিল বলিয়া জানা যায়।

অধুনা আমাদের দেশে শারীরিক পরিশ্রম অভদ্রোচিত কার্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। শুনা যায় ডেমরা রায় বংশীয় অনেকে বিশেষত কণক রায় মহাশয় প্রভৃতি রাজশাহী পাবনার সদর স্টেশন থাকা সময়ে তথায় মোকদ্দমা করিয়া একদিনে হাটিয়া বাড়িতে আসিতে সমর্থ ছিলেন। যেমন ভোক্তা ছিলেন বলিয়া এই রায় বংশীয় অনেকে প্রসিদ্ধ ছিলেন, সেইরূপ এই বংশীয় অনেক গৃহিণী রন্ধনাদি কার্যে অতি ক্ষিপ্রা বা সিদ্ধ হস্তা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাহার নিদর্শন আজিও দুর্গোৎসব সময়ের রন্ধনাদি ব্যাপারে কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হয়। এখানে এখনও উড়িয়া পাচকের বিশেষ প্রবেশাধিকার লাভ ঘটে নাই। এই রায় বংশীয় অনেকে বোধ হয় পূর্বে কিঞ্চিৎ স্বার্থপর ছিলেন, তজ্জন্য নিম্নলিখিত ছড়ার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, যথা ঃ

নয়া পারার চক্রবর্তী, ডেমরার রায়।
আপনার থুয়ে (রাখিয়া) পরের খায়।।

আজকাল রায় বংশীয়গণ বহু শরিকে বিভক্ত হইয়াছেন এবং অনেকে বিভিন্ন স্থান বাস করিতেছেন। ডেমরা খালের অপর পারে তিলকচন্দ্র কুণ্ডু নামক জনৈক তিলি জাতীয় মহাজনদিগের বাটিতে দুর্গোৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহারা এক সময়ে সাতিশয় বর্ধিষ্ণু মহাজন বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহাদের কারবার হইতে রাওতাড়ার কুণ্ডু বাবুদের উন্নতিলাভ ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

নাগডেমরাও একটি সুবৃহৎ গ্রাম ; এখানে মুসলমান সংখ্যাই অধিক। রাজু সরকার ও ছালু সরকার নামক মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয় পাবনা জেলার প্রজা বিদ্রোহের কালে এতদঞ্চলে বিদ্রোহীগণের নেতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাহারা যে এক সময়ে এখানে সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিলেন, তাহাদের বাটিস্থ ভগ্ন দ্বিতল অট্টালিকাদিতে তাহার নিদর্শন অদ্যাপি বর্তমান আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—সাঁথিয়া

সাঁথিয়া—পাবনার সদর স্টেশন হইতে ২১ মাইল দূরে বেড়া রোডের ধরে ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত সাঁথিয়া একটি ক্ষুদ্র পল্লী। এখানে পাল, মাহিষ্য, দাস, অগ্রদাণী ব্রাহ্মণ, গোয়ালা প্রভৃতি হিন্দু জাতি ও মুসলমানের বাস। দুলাই হইতে পুরাতন পুলিশ স্টেশন উঠিয়া এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখানে একটি পোস্টাফিস, ডাক বাঙ্‌লা ও দৈনিক বাজার বর্তমান আছে। সাপ্তাহিক বুধবার ও শনিবারে হাট বসিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বারুণী গঙ্গাস্নান সময়ে এখানে কালীপূজা উপলক্ষে সাপ্তাহিককাল স্থায়ী মেলার অনুষ্ঠান হয়। ইছামতী হইতে সাঁথিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া ঘুঘুদহের বিল পর্যন্ত একটি খালবাহির হইয়াছে, তাহা সাঁথিয়ার জোলা নামে পরিচিত হয়। প্রকাশ দুলাই নিবাসী স্বর্গীয় আজিমদ্দিন চৌধুরী সাহেবের সময়ে তাহার উদ্যোগে যাতায়াতের সুবিধার্থ এই খালটি কাটা হইয়াছিল।

করঞ্জা দিং—ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত পাবনা হইতে প্রায় ২৩ মাইল দূরে বেড়া রোডের ধারে **তলট** ও **করঞ্জা** উভয় গ্রামই অতি প্রাচীন ভদ্র পল্লী বলিয়া পরিচিত। এই করঞ্জা বা করঞ্জ নামক গ্রামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধ লিখিত আছে—"ধর্মপাল দেবের রাজ্যকালে স্বর্ণরেখ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে বরেন্দ্রভূমি **করঞ্জ** নামক একখানি গ্রাম **শাসন** স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। স্বর্ণরেখের উত্তর পুরুষ "হরিচরিত" নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "হরিচরিত" কাব্যের একখানি পুথি নেপালে নেপালরাজ্যের গ্রন্থাগারে আবিষ্কার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে স্বর্ণরেখের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। *"রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "বাঙ্গালার ইতিহাস" ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।*

শাসন, বিষয় প্রভৃতি প্রাচীনকালের হিন্দু রাজাদিগের প্রদত্ত লাখেরাজাদি নিষ্কর ভূমি বিশেষ, এই করঞ্জ বা করঞ্জা গ্রাম বরেন্দ্র ভূমিতে অবস্থিত বলিয়া জানা যাইতেছে। পাবনা জেলার এই করঞ্জা এবং পূর্বোক্ত সুপ্রাচীন করঞ্জ নামক শাসন অভিন্ন কিনা তাহা সঠিক জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই ; তবে এতৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের কিঞ্চিৎ যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে এই করঞ্জা ও হরিচরিত বর্ণিত করঞ্জ শাসন অভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

এখানকার সিদ্ধেশ্বরী দেবীর দৈনিক পূজা ও প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় পূজা উপলক্ষে মেলা অতি প্রসিদ্ধ। এই গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ মণ্ডলী এবং এই দেবী ও তাহার সেবাইতগণ সম্বন্ধে জানা যায়—"কাশ্যপ গোত্রীয় দিবাকর ওঝা এই গ্রামে বাস করিতেন ; দিবাকরের পৌত্র মঙ্গল ওঝা প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি মর্যাদা সংস্থাপন সম্বন্ধে উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর সহায়তা করেন। দিবাকরের সময় হইতে এই গ্রামে কুলীন শ্রোত্রীয় প্রভৃতি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। ... ... এই গ্রামে রাজারাম ব্রহ্মচারী নামে একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি তপস্যার ফল স্বরূপ প্রস্তরময়ী (?) সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে

ইছামতীর উত্তরে পারে মরিসা গ্রামের উত্তর দিকে ভিটাপাড়া নামক স্থানে প্রাপ্ত হন। তথা হইতে দেবীকে লইয়া নিজ বাটিতে স্থাপন ও দেবীর সেবা পূজাদির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মচারী বংশীয় সাধক প্রবর কালী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সময়ে দেবীর নাম জন-সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। এই স্থানটি পিঠস্থানের ন্যায় আদৃত ছিল। দেশদেশান্তর হইতে ভক্তগণ আগমন করতঃ দেবীকে পূজোপচার প্রদান করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারী মহাশয় বহু দেবোত্তর ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে অমাবস্যা তিথিতে সরিষার ভিটায় ও করঞ্জা গ্রামে পূজা অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। সিদ্ধেশ্বরী পূজা উপলক্ষে পূর্বে জ্যৈষ্ঠ মাসে দেড় মাস কাল স্থায়ী মেলা লাগিত। করঞ্জার মেলা অতি প্রসিদ্ধ ছিল। পাবনা হইতে প্রকাশিত *"সুরাজ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।*

দিঘাপতিয়া রাজার অধীনে এখনও এই বিগ্রহের সেবা পরিচালন জন্য অনুমান ৭/৮ খাদা জমির উপসত্ত্ব ও মানসিকাদি হইতে দেবীর দৈনিক পূজা পার্বণাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী বংশ লুপ্ত প্রায় ; মাত্র রাজারামের প্রপৌত্রীর দৌহিত্র লাহিড়ী বংশজ জনৈক ব্যক্তি এবং তাহার প্রপৌত্রের দৌহিত্র চরমপুরের গোস্বামীগণ এখন দেবীর সেবাইত। গ্রামের বাহিরে বার্ষিক সিদ্ধেশ্বরী পূজার জন্য যে একটি মেলা স্থান আছে, তথায় প্রতিবৎসর মৃত্তিকা নির্মিত একখানি প্রতিমায় স্ত্রী-পুরুষের মূর্তি সম্বলিত স্কন্ধদেশ বিহীন একটি বিকটাকার মূর্তির পূজা হয়। ইহা দামোদর তন্ত্রোক্ত মূর্তি বিশেষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই সিদ্ধেশ্বরী পূজায় শূকর মহিষাদি বলির ব্যবস্থা আছে। করঞ্জা গ্রামে বহুদিন হইতে মৈত্র, লাহিড়ী, সান্যাল, চৌধুরী আদি উপাধিক বহু বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস আছে। ইহাতে অনুমান হয় "করঞ্জা" নামক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সমাজের যে গাইএর উল্লেখ আছে, তাহা এই করঞ্জা গ্রাম হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয়ও তৎকৃত উক্ত পুস্তকের ৮১ পৃষ্ঠায় উক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন।

করঞ্জা গ্রামে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কায়স্থ, ভুইমালি, সূত্রধর, জালিক, নাপিত, কর্মকার, পাল প্রভৃতি নানা জাতীয় হিন্দু এবং মুসলমানের বাস। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত প্রসন্ননাথ লাহিড়ী মহাশয় ব্রাহ্মণ বংশীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হইয়াও আজ প্রায় চারি বৎসর হইল নিজ হাতে হাল লাঙলের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা একটি সৎসাহসের পরিচয় সন্দেহ নাই। করঞ্জা গ্রামে দিঘাপতিয়া রাজার একটি কাছারিবাড়ি বর্তমান আছে। গ্রামের অবস্থা শোচনীয় ; বর্ষাকালে যাতায়াত সুকঠিন। এখানে একটি বৃহৎ পাঠশালা আছে।

নিকটবর্তী **তলট** গ্রামেও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণাদি জাতির বাস। এক সময়ে এখানকার দোলোৎসব অতি প্রসিদ্ধ ছিল। তদুপলক্ষে এখানেও মেলার অনুষ্ঠান হইত। এখানকার রায় উপাধিক ব্রাহ্মণ পরিবার সমধিক প্রসিদ্ধ। এই বংশীয় গিরিধর রায় মহাশয় রাজশাহীতে মোক্তার ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে রাজশাহীর কয়েকটি জমিদারের দেওয়ানি আদি কার্য পরিচালন করিয়াও যশস্বী হইয়াছিলেন। তদীয় পুত্র রাজশাহীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল এবং বর্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট শশধর রায় মহাশয় বঙ্গের জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক বলিয়া সুধী সমাজে পরিচিত। তলটে রায় বাড়িতে একটি মঠে শিবলিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্বে এখানে বাজার ও মধ্য বাংলা স্কুল বর্তমান ছিল। এক্ষণে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামে কর্মকার, নমঃশূদ্র, জালিকাদি হিন্দু ও মুসলমানের বাস আছে।

এই করঞ্জা ও তলট গ্রামের কয়েকজন খ্যাতনামা পুরুষ তাহাদের নানারূপ সৎকার্যাদি ও অর্থ সমৃদ্ধি হেতু বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশে অদ্যাপি জানিতে পারা যায়।

তারাচাঁদ পুরাণে, গুরুপ্রসাদ ভোজনে।
চাঁদরায় কৃপণে, গিরিধর দালানে।
রাধামোহন বচনে।

তারাচাঁদ—তারাচাঁদ মৈত্র (করঞ্জা), **গুরপ্রসাদ**—গুরুপ্রসাদ চৌধুরী (করঞ্জা), **চাঁদরায়**—চন্দ্রধর রায় (তলট), **গিরিধর**--গিরিধর রায় (তলট)। **রাধামোহন**—রাধামোহন অধিকারী (করঞ্জা)।

করঞ্জার নিকটবর্তী গাঙভাঙা নামক বিল মধ্যে একস্থানে একটি মৃত্তিকা স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রাচীন সময়ের একটি দুর্গ বিশেষের অংশ সদৃশ। এই দ্বীপাংশে একটি পুকুর ও একটি ইন্দারা বর্তমান আছে। এখানে পূর্বে কোন সমৃদ্ধশালী লোকের বাস ছিল কিংবা সুদুর বিস্তৃত জলরাশি মধ্যে ইহা একটি আশ্রয়স্থল স্বরূপ ছিল বলিয়া অনুমান হয়। প্রবাদ উহা গর্জন রায় নামক জনৈক পশ্চিম দেশিয় ক্ষেত্রী জাতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তির বাস ছিল।

হাপানিয়া দিং—পাবনা হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ দূরে বেড়া রোড হইতে অর্ধ মাইল দূরবর্তী হাপানিয়া একটি প্রাচীন পল্লী। ইহা সাধারণত বৈষ্ণব হাপানিয়া নামে পরিচিত। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শিষ্য ও পার্ষদ গৌরাঙ্গ দাসের পুত্র শ্যামমোহন দাস ঠাকুর এই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা এবং হাপানিয়া বৈষ্ণব বংশের আদি পুরুষ। এই গৌরাঙ্গ দাস সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে শাখা গণনাতে উল্লেখ আছে—"নর্তক গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গদাস"। প্রবাদ আছে যে শ্যামমোহন দাস খেতুরি গ্রামের নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অনুষ্ঠিত উৎসব সময়ে প্রতিবৎসর তথায় উপস্থিত হইতেন এবং তদীয় ঘরণী জাহ্নবী গোস্বামিনীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তদীয় আদেশ মত শ্যামরায় নাম রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ মূর্তি প্রস্তুত করতঃ তাহার সেবা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন। তৎকালে বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশে বিশেষভাবে প্রচার হইত। উক্তধর্ম প্রচার কল্পে শ্যামমোহন ঠাকুর কালক্রমে এতদ্দেশে আগমন করতঃ প্রথমে নিকটবর্তী নারায়ণপুর নামক পল্লীতে বাস করিতে থাকেন, পরে শ্যামপুর নামক স্থানে এবং পরিশেষে হাপানিয়া গ্রামে স্থায়ী হন। শ্যামমোহন দাস ঠাকুরের বৈষ্ণব ধর্মে প্রগাঢ় আস্থা ও ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া জাহ্নবী দেবী দীক্ষাকালীন তাহাকে পূর্ব উপাধির পরিবর্তে বৈষ্ণব উপাধি প্রদান করেন। তদবধি তাহার ও তদ্বংশীয়গণের বৈষ্ণব গোঁসাই উপাধি লাভ হইয়াছে।

শ্যামমোহনের ঔরসে চারিপুত্র জন্মে এবং তাহার গুণাবলী ও ধর্মনিষ্ঠা প্রভাবে বহুলোক আসিয়া কালে এখানে বাস করিতে আরম্ভ করায় গ্রামখানি ক্রমে বর্ধিষ্ণু পল্লীতে পরিণত হইয়া উঠে। শ্যামমোহন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ তদ্বংশীয় হাপানিয়ার বৈষ্ণবগণ কর্তৃক এখনও সেবিত হইতেছে। সাময়িক উৎসবাদি মধ্যে পূর্বে রথযাত্রার উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইত। প্রায় মাইলাধিক বিস্তৃত স্থান লইয়া ১০ দিন কাল স্থায়ী মেলা বসিত এবং সময়ে তদুপলক্ষে বহুলোক সমাগম ও আনন্দ উৎসব হইত। এক সময়ে লোকের ভিড়ে দুইটি লোক রথতলে নিপতিত হইয়া মারা যায়, তন্মধ্যে একটি লোকের নাম ভারতী ছিল, তাহা হইতে এখনও প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে—

গঙ্গারাম ছুতোর বাঁকা, রথ গর্‌লো বার চাকা,
রথের উপর সারথি, পড়ে মর্‌লো ভারতী।।

এই ঘটনার কিছুদিন পর হইতে রথযাত্রার মেলা উঠাইয়া দিয়া সেবাইত গোস্বামিগণ চৈত্র পূর্ণিমা হইতে দিবসত্রয় বলরামী দোল উপলক্ষে সাপ্তাহাধিক কালস্থায়ী মেলার অনুষ্ঠান করিতেছেন। ইহাতেও পূর্বে যাত্রা কবি আদির বিশেষ আমোদ উৎসব হইত, এক্ষণে কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে।

এই গ্রামে বৈষ্ণব উপাধিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। এখানে

বাগছি, গোস্বামী, চক্রবর্তী আদি নানা পদবী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও হিন্দু সমাজান্তর্গত বহু প্রকার জাতির বাস ছিল ও এখনও কতকাংশে আছে। এই গ্রামে কালীকান্ত শিরোমণি নামক জনৈক পণ্ডিত ছিলেন ; তদীয় পুত্র গঙ্গাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ও একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ বলিয়া পরিচিত হইতেন।

বিশেষ ধনাঢ্য না হইলেও এই গ্রামের প্রাচীন অধিবাসীগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী এবং এখানে বসতি সংখ্যা অতিশয় ঘনসন্নিবিশিষ্ট ছিল বলিয়া দেশে দস্যুতস্করাদির প্রাদুর্ভাব থাকা সত্ত্বেও পূর্বে এই গ্রামে চোর ডাকাইতের বিশেষ কোন উপদ্রব ছিল না। কেবলমাত্র একবার নিকটবর্তী ধুলাউরি গ্রামের নীলকুঠির প্রধান কর্মচারি কুমারখালি নিবাসী নারায়ণ মজুমদার নামক জনৈক সচতুর ব্যক্তি অন্যান্য কতিপয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকসহ এথাকার কৃষ্ণ বাগছি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পরিবার গৃহে গভীর রাত্রিতে বরযাত্রী ছলে প্রবেশ করিয়া এই গ্রামে ডাকাইতি করিয়াছিলেন। এই গ্রামে ঈদৃশ কার্য অসম্ভব বিবেচনায় এদেশের গ্রাম্য হাস্য রসিক পল্লী কবিদারগণ যে পল্লীগাথা রচনা করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি রাখাল, কৃষক এবং নৌকাবাহী দাড়ি মাঝিগণ কর্তৃক সানন্দে গীত হইয়া থাকে। ইহা হইতে নারায়ণ মজুমদার ব্যতীত এই জেলারও অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের এই ডাকাইতি সংস্রবে লিপ্ত থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। গানটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই ; মাত্র কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে জানা যায় নারায়ণ মজুমদার মহাশয় পরিশেষে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

হাপানে ডাকাতি করে এমন সাধ্য কার,
বিনা নারায়ণ মজুমদার,
ধন্য নারায়ণ মজুমদার।
ধুলাউরির কুঠির দেওয়ান এরা ডাকাতের সরদার।
*আগে **নারায়ণ**, পাছে **কালী**, সাথে **রামরুদ্র** ভুঁইয়া।*
***নবীন সন্ন্যাসী** আর **কান্ত মালের** ধুইএগ্রা।*
... ...
নারাণের হাতে দড়ি পায়ে বেড়ি।
নন্দ বলে এখন আমি কি করি।।
নারাণের ভগ্নি কেঁদে কয়।
শেষ কালেতে ঠাকুর দাদার বেরি পল' পায়।

ইছামতী নদী তীরে অবস্থিত **সোনদহ** নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে **ঠাকুর ভক্তের** সমাধি বর্তমান আছে। প্রকাশ হাপানিয়া গ্রামের ঠাকুর শ্যামমোহন দাসের ভক্তরাম নামে জনৈক শিষ্য অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন জন্য তিনিও সাধারণত ঠাকুর ভক্ত নামে পরিচিত হইতেন। তাহার অলৌকিক গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে তাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। মৃত্যুর পর তাহার এই গ্রামে সমাধি হয় ; তদীয় ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী এখনও এখানে উপস্থিত থাকে ; দোল পূর্ণিমা সময়ে এখানে অতি সমারোহে দোলোৎসব হইয়া থাকে।

বেড়া বন্দরের প্রায় দেড় ক্রোশ পশ্চিমে **সোনাতলা** নামক গ্রামে কালাকৃষ্ণ দাস ঠাকুরের আশ্রম ছিল এবং এখনও উক্ত আশ্রমের ভগ্নাবশেষ ভিটা ও পুষ্করিণী বর্তমান আছে। এই কালাকৃষ্ণ দাস ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পার্ষদ ছিলেন। ইহার নিবাস বর্ধমান জেলার কাটোয়া সন্নিহিত আকাইহাট গ্রামে ছিল। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গোপাল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ইহাকে দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করেন এবং ইনি তাহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—"কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। যার সঙ্গে লইয়া কৈল দক্ষিণ গমন।" কালাকৃষ্ণদাসকে কালিয়া কৃষ্ণদাসও বলে। শ্রীনিত্যানন্দ

প্রভু ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুরোধ কেবলমাত্র ইহাকে সঙ্গে লইয়াই মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। "শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু ইহাকে সর্বশক্তি সঞ্চার করায় ইহার সর্বজ্ঞতা, ও বাক্‌সিদ্ধি জন্মিয়াছিল। ইনি সর্বদা কলিহত জীবকে অভয় প্রদান করিতেন। জলে, স্থলে, কাহাকেও ভয় ক৷িতেন না। যথা—জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে—"কুম্ভির বাঁধিয়া আনে কালিয়া কৃষ্ণদাস। দেখিয়া নিত্যানন্দ করিলা উল্লাস।" মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর হরিনাম প্রচার করিতে আসিয়া ইনি এই জেলার সোনাতলায় স্থায়ী হন। এই গ্রামের পূর্বনাম নাম **ভাদুটি মথুরাপুর**। কালাকৃষ্ণ ঠাকুর ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভাদড়গ্রামী ব্রাহ্মণ ছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ দ্বাদশী তিথিতে ইহার তিরোভাব হয়, তজ্জন্য অদ্যাপি উক্ত তিথিতে সোনাতলায় তিরোভাব মহোৎসব হইয়া থাকে। ইহার দুই পুত্র মোহনদাস ও গৌরাঙ্গ দাস হইতে সোনাতলা চোমরপুর, ছেচানিয়া, করঞ্জা, পোতাজিয়া প্রভৃতি স্থানের গোস্বামী পরিবারের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা সকলেই শিষ্য ব্যবসায়ী এবং ইহাদের অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য শূদ্র শিষ্য বর্তমান আছে।

হাপানিয়া, সোনাতলা ও সোনদহ প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যাইতেছে যে মহাপ্রভুর সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পরে পাবনা জেলার এই সমস্ত অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচার হইয়াছিল। উক্ত ধর্ম প্রচার উপলক্ষে এতদ্দেশে আগমন করিয়া পশ্চিম বঙ্গীয় অনেক বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকগণ এই জেলার স্থানে স্থানে বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব হাপানিয়ার দক্ষিণ ও সোনদহের উত্তরে **দানামুদে** গ্রামও একটি প্রাচীন ভদ্র পল্লী বলিয়া পরিচিত। এখানকার চৌধুরী পরিবার কাশ্যপ গোত্রীয় মঙ্গল ওঝার সন্তান এবং সিদ্ধ শ্রোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ইহারা বড়ইচরা নিবাসী প্রাচীন চৌধুরী জমিদার বংশ সম্ভূত। ইহাদের কোন কোন জ্ঞাতিবর্গ সিরাজগঞ্জের মোতালক বালাবাড়ি গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহারা প্রাচীন জমিদার ; ইহাদের অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে রেজা খাঁর কঠোর রাজস্ব আদায়ের ফলে ইহারা মাত্র নিজ গ্রাম দানামুদা গ্রামের জমিদারি স্বত্ব স্বীয় হস্তে রাখিয়া অন্যান্য সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি ইহাদের অনেক ভূসম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়াছে। এই চৌধুরী বংশীয় বৈদ্যনাথ চৌধুরী মহাশয় দুলাই নিবাসী স্বনামখ্যাত মুসলমান ভূম্যধিকারী আজিমদ্দিন চৌধুরী সাহেবের এবং ওয়াটসন কোম্পানি প্রভৃতি জমিদারি স্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তদীয় পুত্রদ্বয় মধ্যে চন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কিছুদিন শিক্ষা বিভাগে কার্য করার পরে জমিদারি সেরেস্তায় প্রবেশ করেন ; পরিশেষে নাটোর রাজ স্টেটে অতি সুনামের সহিত অনেক দিন পর্যন্ত কার্য করার পর ৬৬ বৎসর বয়সে পেনস্‌ন সহ অবসর গ্রহণ করিয়া পাবনায় স্থায়ী হইয়াছেন ; তদীয় অপর ভ্রাতা শ্যামাচরণ চৌধুরী মহাশয় বহু দিন স্বগ্রামে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া বার্ধক্য হেতু স্বীয় ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

আতাইকুলা—পাবনা হইতে বেড়া রোডের ধারে ১২ মাইল দূরে ইছামতী তীরে অবস্থিত আতাইকুলা একটি ক্ষুদ্র বন্দর বিশেষ। এখানে দৈনিক বাজার ও সাপ্তাহিক রবিবার ও বুধবারে হাট লাগিয়া থাকে। ধান, পাট, গুড় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য আমদানি হয়। দেশিয় হিন্দু ও মুসলমান ব্যতীত ২/৩ জন মারওয়াড়ি মহাজনের এখানে দোকান ও গোলাঘর বর্তমান আছে। গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাকাদি জাতির বাস আছে। এখানে বহুদিন হইতে অস্ট্রেলিয়ান মিশনারিদিগের একটি প্রচার বিভাগের শাখা আছে। উক্ত মিশন হইতে পূর্বে চতুঃপার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহ হইতে সমাগত রোগিগণকে ঔষধ দিবার ব্যবস্থা আছে; পূর্বে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ হইত ; তৎপর প্রত্যেক রোগীকে এক খান জ্বালানিকাষ্ঠ দিয়া ঔষধ লইতে হইত। এক্ষণে বিগত জার্মান যুদ্ধারম্ভের পর ঔষধাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতি শিশি ঔষধের মূল্য বাবদ ৩ আনা হিসাবে দিতে হয়। তবে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক রোগীকে কিছু কম দিতে হয় এমত

জানা যায়। মোটের উপর এই মিশনের চিকিৎসা দ্বারা এতদঞ্চলের গরিব দুঃখীর অনেক সাহায্য হইয়া থাকে। এখানে ইষ্টক নির্মিত পাকা এবং করগেট টিনের নির্মিত দুইটি ডাকবাঙ্লা আছে। পূর্বে একটি পুলিশ আউট পোস্ট ছিল; এক্ষণে তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

অধুনা আতাইকুলা হইতে কিঞ্চিদধিক এক মাইল দূরে বোয়াইলমারি নামক গ্রামের পশ্চিমে প্রাচীন আত্রাই বা আত্রেয়ী নদীর মৃত খাতের চিহ্ন বর্তমান আছে। কিন্তু পূর্বে তাহা ছিল না। সম্ভবত আতাইকুলার পার্শ্ব দিয়া ইছামতী নদী সহ আত্রেয়ী নদীর সঙ্গম ছিল। তজ্জন্য আত্রেয়ীকুলা বা আত্রাইকুল হইতে আতাইকুলা নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে, অনেকে এরূপ বলিয়া থাকে। তবে আত্রাই নদীর পবিত্রকুলে অনেক দিন হইতে দশহরা বারুণী আদি পর্বদিনে স্নানোপলক্ষে এই জেলার স্থানে স্থানে যে সমুদায় মেলাদির অনুষ্ঠান হয়, তন্মধ্যে আতাইকুলার নিকটবর্তী মাদপুরা নামক পল্লী অংশে এখনও বারুণী স্নানোপলক্ষে বহুদিন হইতে মেলাদির অনুষ্ঠান হয় এবং তদুপলক্ষে নানা দেশিয় যাত্রী ও দোকানদারগণের সমাগম হইয়া থাকে।

ভুলবারিয়া—পাবনা হইতে প্রায় ১৫ মাইল পূর্বোত্তরে ইছামতী নদী তীরে ভুলবারিয়া একটি বন্দর বিশেষ। এখানে দৈনিক বাজার বসিয়া থাকে। গ্রামে দিঘাপতিয়া রাজার একটি তহসীল কাছারি বর্তমান আছে। হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, পাল ও অন্যান্য জাতি এবং মুসলমানের বাস। সম্প্রতি গ্রামের কতিপয় উৎসাহী যুবকবৃন্দের উদ্যোগে এখানে একটি পল্লী হিতসাধন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে; এক্ষণে তাহা হইতে কালাজ্বর ম্যালেরিয়া নানারূপ ব্যাধির চিকিৎসাদির আয়োজন হইতেছে।

খেতুপাড়া দিং—পাবনা হইতে প্রায় ৯ নয় ক্রোশ পূর্বোত্তরে খেতুপাড়া একটি প্রাচীন ভদ্রপল্লী। এখানে রায়, মৈত্র, ভাদুড়ী, ভৌমিক, লাহিড়ী আদি উপাধিক অনেক ব্রাহ্মণের বাস। তন্মধ্যে কালিয়াই বংশীয় রায় পরিবার বিশেষ প্রসিদ্ধ। কায়স্থ কিংবা নবশাকাদি জাতি এখানে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মুসলমান সংখ্যা কম। মাত্র গ্রামের বাহিরে কয়েক ঘর কোড়া নামক জাতির বাস আছে। এই গ্রামে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ অধিবাসী সংখ্যা সর্বোপেক্ষা বেশি। প্রত্যেক পরিবারেই পরিজন সংখ্যা অত্যাধিক, প্রত্যেকেরই ৫/৭টি করিয়া পুত্র সন্তান এবং তন্মধ্যে অনেকেই নানাপ্রকারে সুশিক্ষিত। এরূপ বহু পরিজন বিশিষ্ট পরিবার কোন গ্রামে সহসা পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই বর্তমানে বিদেশে প্রবাসী। দেশে কেহ অবস্থান করেন না। রাজশাহী, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর আদি জেলায় এই গ্রামের অনেকে স্থায়ীভাবে বাস করেন; তজ্জন্য গ্রামখানি ক্রমে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। গ্রামে অনেক প্রাচীন ও সুবৃহৎ পুষ্করিণী বর্তমান আছে, সংস্কার অভাবে তাহার জল ব্যবহারযোগ্য নহে, সেজন্য এখানে জলকষ্ট বিশেষ অনুভূত হয়।

এই গ্রামের দোলোৎসব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রায় পরিবারস্থ জনৈক রাধাকৃষ্ণ রায়ের রামেশ্বর ও রাজেন্দ্র রায় নামক পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বামেশ্বরের আট পুত্র এবং রাজেন্দ্রের সাত পুত্র হইতে দুই বাড়িতে যথাক্রমে **আট আনী** ও **সাত আনীর** শরিকের উদ্ভব হইয়াছে। উক্ত শরিকদ্বয়ের বাটিতে যথাক্রমে রাধাগোবিন্দ ও মদনমোহন নামক রাধাকৃষ্ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানকার দোলোৎসবে উক্ত বিগ্রহদ্বয়েরই অর্চনা হয়।

এই বিগ্রহদ্বয় আটআনি ও সাতআনির শরিকগণের বাটিতে দৈনিক পালাক্রমে পূজিত হইয়া থাকেন; ৪/৫টি মৌজার এজমালী আয় প্রায় দুই হাজার টাকা দ্বারা উভয় শরিকগণের স্থাবর সম্পত্তির গবর্নমেন্ট রাজস্ব দেওয়া হয় এবং প্রতিবৎসর উভয় আনীর যে শরিকের পালিতে উভয় বিগ্রহের দোলের উৎসবের ভার পড়ে, উভয় আনির সেই শরিকদ্বয় উক্ত এজমালি স্টেট হইতে প্রত্যেক একশত টাকা হিসাবে দুই শত টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এজমালী সম্পত্তির আদায় তহশীল জন্য উভয় আনী হইতে কার্যকারক নিযুক্ত আছে। ইহার আয় সাধারণ সাহায্য ও জনহিতকর কার্য ভিন্ন শরিকগণের নিজ নিজ কোন কার্যে ব্যবহার

হইবার রীতি নাই। কোন শরিক এজমালী কার্যাদি যথা, দোল, দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া সম্পাদনে অসমর্থ হইলে তাহাকে এই এজমালী তহবিল হইতে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা আছে। এই এজমালী মৌজাগুলির নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি দেবোত্তর বলিয়া উৎসর্গীকৃত না হইলেও, রায় পরিবারস্থ স্বর্গীয় মহাত্মাগণের কার্যাদির সুবন্দোবস্ত গুণে ইহার উদ্দেশ্য দেবোত্তর বা দেব সেবাদি উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং এখনও তাহা ইহার ব্যবহারাদি কার্য দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। সম্প্রতি অনেকানেক শরিকগণ নানা অজুহাতে উক্ত এজমালী সম্পত্তি দেবোত্তর স্বরূপে গণ্য হইতে পারে না এমত ব্যবহারে প্রয়াসী হইয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর দোলোৎসব সময় এই বিগ্রহদ্বয়ের মৃত্তিকা নির্মিত উত্যুচ্চ দোলমঞ্চ বাঁধা জন্য এজমালী স্টেটের অধীনে প্রায় ১৬ বিঘা পরিমাণ জমি জনৈক ভুঁইমালী পরিবারের মধ্যে চাকরাণ নির্দিষ্ট আছে। দোল পূর্ণিমার দিন সমারোহে রাধাগোবিন্দ ও মদনমোহন বিগ্রহদ্বয়ের গ্রামের মধ্যে কীর্তনাদি সহ পরিভ্রমণের ব্যবস্থা ও দুই আনীর পালানুসারে মধ্যে উক্ত দিনের সেবাইতগণের বাটিতে উভয় বিগ্রহের মহোল্লাসে সেবা ও পূজার রীতি আছে।

দোলমঞ্চের নিকটে জয়দুর্গা নামক মৃন্ময়ী কৃষ্ণবর্ণ বিগ্রহমূর্তি একখানি করগেট টিনের নির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিখানি সিংহবাহিনী। উভয় দিকে ডাকিনী যোগিনী মূর্তি বিরাজমানা। সম্পূর্ণ মূর্তিখানি উচ্চতা প্রায় চারি হাত পরিমাণ হইবে। সাধারণত গ্রামের মধ্যে ব্যাধি মহামারি আদি দেখা দিলে এই মূর্তির পূজা হইয়া থাকে।

এই গ্রামের গৌরনারায়ণ রায় নামক রায় পরিবারস্থ জনৈক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত জেলাবাসী শিক্ষক পাবনা জেলা স্কুল ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় সর্বপ্রথম হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। পূর্বাপর এই গ্রামের অনেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার কবিরাজ এই গ্রামের অনেকেই আছেন, কিন্তু সকলেই বিদেশে প্রবাসী, দেশের প্রতি উদাসীন, তদ্ধেতু গ্রামের অনেক বাড়ি ক্রমশ জঙ্গলে পরিণত হইতেছে। স্থানীয় স্কুল ও পানীয় জলের একান্ত অভাব। সম্প্রতি এই গ্রাম নিবাসী বর্ধমান রোনাল্ডস মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক তথাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক সুরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের অর্থানুকুল্যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

রায় পরিবারস্থ স্বর্গীয় পার্বতীচরণ রায় মহাশয়ের অবস্থা গ্রামে সমধিক উন্নত। তদীয় পুত্রগণের অনেকে শিক্ষিত এবং কয়েকজন পাবনার উকিল। ইহাদের বাটিতে সাধারণ দৈনিক ঠাকুর সেবার মন্দিরাদি ব্যতীত একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। জমি জমার উপসত্বাদি ব্যতীত স্বর্গীয় রায়মহাশয় এতদঞ্চলে জনৈক কুশীদজীবী মহাজন বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন।

গ্রামে দৈনিক বাজার লাগে না বটে, তবে প্রত্যহ দোলমঞ্চের নিকট সুবিস্তৃত প্রাঙ্গনে দুধ ও পানাদি অনেক দ্রব্য আমদানি হয়। প্রতিবৎসর দোল পূর্ণিমার সময় এখানে সপ্তাহকাল স্থায়ী মেলার অনুষ্ঠান হয়। ইহা এতদঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই মেলা উপলক্ষে নানা স্থান হইতে মহাজন ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণ নানা জাতীয় খাদ্য ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি লইয়া উপস্থিত হয়। এতদুপলক্ষে যাত্রা গান ও কবি আদি নানা আমোদাদি অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় অনেক দোকানদারদিগকে আহার্যাদি দিবারও ব্যবস্থা আছে। পাইকপাড়া, বনগ্রাম ও বেড়া আদি স্থানের দোকানদারগণ এই মেলায় বহু টাকার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। মেলার অনুষ্ঠান দ্বারা যে আয় হয়, তদ্দ্বারা গীতাদি ও দোলের অনেক ব্যয়ভার সংগৃহীত হইয়া থাকে।

খেতুপাড়ার উত্তর সীমা সংলগ্ন পাড়া গোলাবাড়ি বা **গোলাবাড়ি খেতুপাড়া** নামে পরিচিত হয়। রায় পরিবার সুবৃহৎ থাকা সময়ে এককালে ইহাদের গোলাবাড়ি এখানে অবস্থিত থাকায় এই পল্লীর নাম গোলাবাড়িতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। এখানে

পূর্বে বহু কর্মকার ও কায়স্থাদি জাতির বাস ছিল। এক্ষণে কয়েক ঘর স্বর্ণকারের বাস আছে। এতদ্ব্যতীত মুসলমান সংখ্যা অধিক।

আত্রাই নদী প্রবাহিত থাকা সময়ে নিকটবর্তী **বনগ্রাম, গাঙহাটি, পাইকপাড়া** অতি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী বলিয়া পরিচিত ছিল। ইছামতী নদী মোঘল আমলে কাটিয়া বাহির করিয়া দিবার পর হইতে আত্রাই নদী ক্রমশ শুষ্ক হইয়া যাইতে আরম্ভ হওয়ায় এই সমস্ত পল্লী ধীরে ধীরে শ্রীহীন হইতে থাকে। শুনা যায় এই সমস্ত অঞ্চলে মৎস্যজীবী বহু ধীবর জাতির বাস ছিল। আত্রাই নদীতে এক সময়ে এই অঞ্চলে বহু ইলিশ মাছের আমদানি হইত। পাইকপাড়া গ্রামে খেতুপাড়া রায় পরিবারস্থ পাইক বরকন্দাজাদির বাসস্থান বা চাকরাণ জমি নির্দিষ্ট ছিল, সেজন্য উক্ত নামে পরিচিত হইয়া থাকে। এক্ষণে পাইকপাড়ায় মাত্র মুসলমান ও কয়েক ঘর বাণিজ্যজীবী বৈশ্য জাতির বাস ; তাহারাও বগুড়া আদি কারবারি স্থানের প্রবাসী। বনগ্রাম একটি বাণিজ্য স্থান বলিয়া পরিচিত হইত। বর্তমানে এখানে সাপ্তাহিক শনি মঙ্গলবারে হাট লাগে এবং ইক্ষু, ধান, পাট, সরিষা, মটরাদি দ্রব্য আমদানি হইয়া থাকে। এখানে অনেক দেশিয় কারিকরের তৈয়ারি ধুতি ও গামছা বিক্রয়ার্থ পার্শ্ববর্তী বস্ত্রশিল্পী প্রধান গ্রামের কারিকরগণ বিক্রয়ার্থ প্রতি হাটে আনিয়া থাকে। প্রতি শনিবারে এখানে গোহাটা লাগে। গ্রামে একটি পোস্টাফিস আছে। এখানে সাহা উপাধিক মহাজন ও কর্মকারাদি হিন্দু জাতির বাস।

ধুলাউরি—পাবনা হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তর পূর্বাংশে পুরাণ সিরাজগঞ্জ রোডের ধারে ইছামতী নদী তীরে ধুলাউরি গ্রাম অবস্থিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ও নীলকুঠির প্রধান কেন্দ্রস্থল বা কন্সারন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এক্ষণে এই স্থানের অনেক অবনতি হইয়াছে। মাত্র সোমবার ও শুক্রবারে সাপ্তাহিক হাট লাগে। গ্রামে হিন্দু মধ্যে মাত্র এক ঘর ঘোষ ও এক ঘর নাপিত ব্যতীত মুসলমান ও নলিয়া জাতির বাস। পূর্বে এখানে ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা থাকায় ২/১ ঘর মারওয়াড়ি মহাজনের কারবার ছিল, এক্ষণে তাহা বিলুপ্ত প্রায়। এখানে তাড়াসের বড় তরফের একটি কাছারি আছে। ধুলাউরি, গ্রাম সন্নিহিত ইছামতী নদীতে ঝিনুক মধ্যে বহুমূল্য মতি পাওয়া যায় ; নলিয়া জাতিগণ তাহা জল মধ্য হইতে উঠাইয়া লয়। মতি রাখিয়া ঝিনুকগুলি চুণকারদিগের নিকট বিক্রি করিয়া দেয়। এইরূপে প্রতি বৎসর পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত বহু টাকার মতি বিক্রি হইয়া থাকে। ইহার এক একটি সময় সময় তোলা প্রতি ৩০৲—৪০৲ টাকা হিসাবে বিক্রি হইতে দেখা যায়। ধুলাউরিতে পূর্বে একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল ; এক্ষণে তাহা উঠিয়া গিয়া একটি মাদ্রাসা মাত্র বর্তমান আছে।

ছাতক দিং—পাবনা হইতে প্রায় ২৫ মাইল পূর্বে আত্রাই নদী তীরে অবস্থিত ছাতক একটি প্রাচীন পল্লী। বর্তমান সময়ে এখানে মাত্র কয়েক ঘর সাহা উপাধিক বৈশ্য, মালাকার প্রভৃতি হিন্দু এবং কতকগুলি মুসলমানের বাস। সমস্ত গ্রামখানি সাতিশয় জঙ্গলাকীর্ণ। এখানে উত্তর দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত একটি সুদীর্ঘ জলাশয়ের নিদর্শন বর্তমান আছে, তাহা রাজা বসন্ত রায়ের পুকুর বলিয়া পরিচিত। এতদ্ব্যতীত জঙ্গল মধ্যে একটি মৃত্তিকাস্তূপ উক্ত রাজবাটির অবস্থান ভূমি বলিয়া খ্যাত। এখানে এখনও উক্ত রাজবাটির বৈদ্যনাথের গাছ বিদ্যমান আছে।

পাবনা জেলায় কোন রাজা মহারাজার বাস থাকা জানা যায় না। এই জেলার ভারেঙ্গা নিবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন রায় মহাশয় "রাজা দেবীদাস" নামক যে একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি ছাতক গ্রামকে উক্ত রাজা দেবীদাসের নিবাসস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকাশ রাজা দেবীদাস নামান্তরে ঠাকুর কুশলী গৌড় নগর সন্নিহিত কালিয়া গ্রাম নিবাসী ভীম ওঝার বংশধর। "ভীম ওঝা সম্রাট বল্লালসেনের পুরোহিত ছিলেন। বল্লালের হড্ডিকা সংস্রব ঘটিলে তিনি কালিয়া গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক বর্তমান পাবনা জেলার এই ছাতক বাসী হইয়াছিলেন। তদ্বংশীয়গণ কালিয়াই গোষ্ঠী নামে খ্যাত হইয়া থাকেন। ভীমের প্রপৌত্র অনন্তরাম বাঙ্লা ওঝা রাজা লক্ষ্মণ সেনের গুরু ছিলেন। তিনি

সিন্দুরী ও শাখিনী এই দুই পরগণা নিষ্করক্সপে গুরুদক্ষিণা পাইয়া বহু সংখ্যক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এই স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্বংশীয়দের তুল্য পুরাতন জমিদার বাংলা দেশে আর দেখা যায় না। পাঠান রাজ্যারম্ভে ইহারা রায় উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। গৌড় বাদশাহদিগের সময়ে বসন্তরায় আট পরগণার রাজা হইয়াছিলেন। ইহারা কুলীন ব্রাহ্মণ সমৃদ্ধ রাজা ছিলেন। মুসলমান রাজধানী হইতে বহু দূরবর্তী থাকায় আপন চত্বরে তাহাদের স্বাধীন রাজার ন্যায় সর্ব বিষয়ে প্রাধান্য ছিল"। *স্বর্গীয় দুর্গাচরণ সান্যাল প্রণীত "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" ১৫২/১৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।*

প্রবাদ আছে রাজা দেবীদাসের পুত্রগণের অত্যাচারবশত বাংলার তৎকালীন পাঠান সুলতান সুলেমান কেরাণী (১৫৬৩-৭২ খ্রিঃ) ছাতক আক্রমণ করেন। অষ্টাদশ "রাজ পুত্রদের মধ্যে ঠাকুর কেশবনাথ রায় ও ঠাকুর কাশীনাথ মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিয়া বাঁচিয়াছিলেন। তাহাদের সন্তানগণ পাবনা জেলার আমিনপুরের মিঞা এবং ঢাকা জেলায় এলাচিপুরের মিঞা।" রাজভক্ত ভোলা নাপিত, কাহারও মতে ভগবান দাস, নামক ভৃত্য আপনপুত্র বলিয়া ঠাকুর কালিদাস, ঠাকুর চণ্ডীদাস ও ঠাকুর নরোত্তম নামক তিন রাজপুত্রকে রক্ষা করিয়াছিল। "বর্তমান সময়ে সমস্ত কালিয়াই গোষ্ঠীই এই দিন জনের সন্তান" বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন।

বসন্ত রায়ের পুত্র রাজীব রায় কর্তৃক আনীত রাঢ় দেশিয় জনৈক শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে কাশীনাথপুর সন্নিহিত শিবপুরের মৈত্র বংশের উদ্ভব হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ঘটক ও ভট্টগণের বিদ্রূপাত্মক কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ঘটক কবিতা— *"খাট খুট ঠাকুরটি গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।*
গাই গোত্র কিছু নাই রাজীব রায়ের শালা।"

ভট্ট কবিতা— *"গঙ্গাপারের মৈত্র ঠাকুর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।*
পরিচয়ের মধ্যে কেবল রাজীব রায়ের শালা।।"

রাজীব রায়ের ১ম পুত্র রাম রায়ের পৌত্র নরনারায়ণ সর্ব প্রথমে ছাতক হইতে **বাগে** বাস বাড়ি নির্মাণ করেন ; তাহার সন্তান সন্ততি হইতে বাগের রায় বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। ইনি অতিশয় বদান্য ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তজ্জন্য আজিও এতদঞ্চলে শুনিতে পাওয়া যায়—

রাজার মধ্যে নরনায়ারণ আর সব রাণী,
গাঙ্গের মধ্যে গঙ্গাজল আর সব পানি।

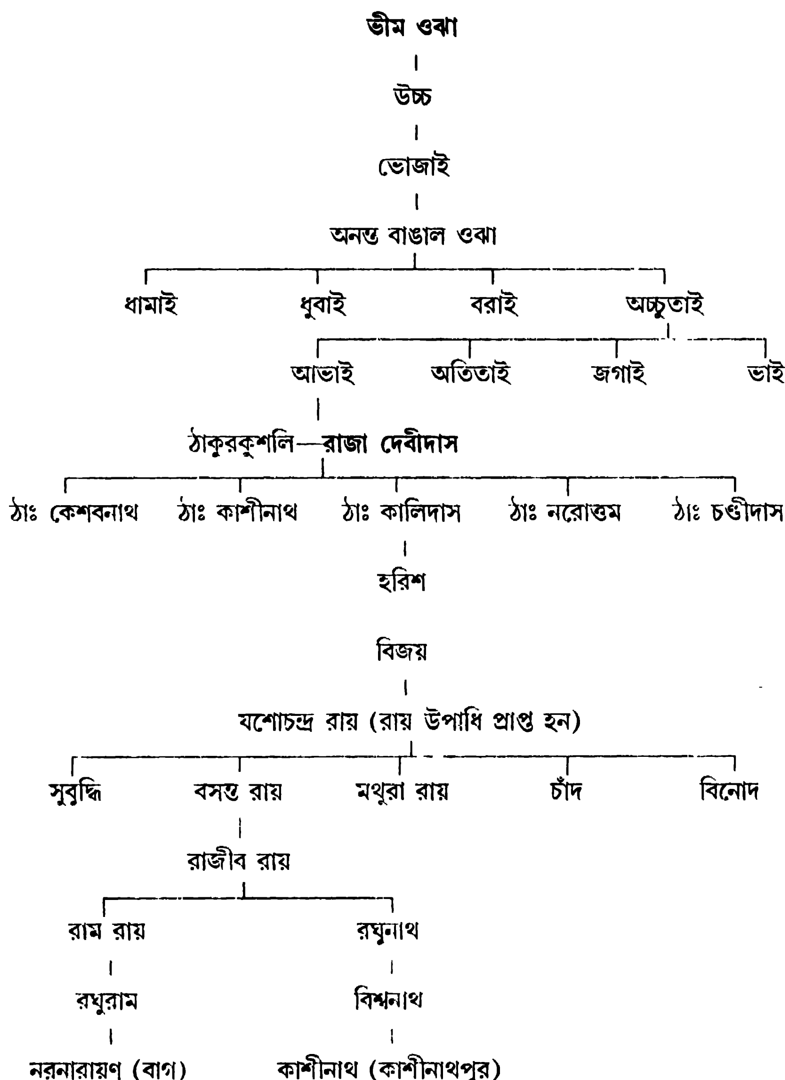
ইহার প্রদত্ত অনেক ব্রহ্মোত্তর, ভোগোত্তর, পীরাণ, লাখেরাজ, মহাত্রাণ প্রভৃতি প্রদানের প্রসিদ্ধি আছে। তদীয় বংশধরগণের অনেকে হীনাবস্থায় পতিত হইলেও, দয়া দাক্ষিণ্যাদি হইতে চ্যুত হয়েন নাই। রাজীব রায়ের ২য় পুত্র রঘুনাথ রায়ের পৌত্র কাশীনাথ হইতে কাশীনাথপুরের রায় বংশের উৎপত্তি ও উক্ত স্থানের নামকরণ হইয়াছে। বসন্ত রায়ের ভ্রাতা **মথুর** রায় হইতে মথুরার ঠাকুর বংশ স্থাপিত হইয়াছে।

ছাতক গ্রাম সংলগ্ন **বরাট**ও একটি প্রাচীন গ্রাম। রাজা দেবীদাসের সময়ে ছাতক মুসলমান কর্তৃক ধ্বংস হইলে, তৎকালীন সম্রাট কতকগুলি মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষকে লাখেরাজাদি নিষ্কর ভূমি প্রদানে এখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করেন। এক্ষণেও বরাট গ্রামে উক্ত লাখেরাজাদি আরাজি লাখেরাজ প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া থাকে। মীর শব্দ অগ্রগামী সৈন্য অর্থেও প্রয়োগ হইত। এখানে এখনও মীর, চৌধুরী আখ্যাত অনেকগুলি মুসলমানের বাস আছে। ইহাতে বোধ হয় তৎকালে এতদঞ্চলে উক্ত প্রকারে মুসলমান সমাজের বসতি বিস্তার ঘটিয়া থাকিবে। **কাবারিখোলা** একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ, সাহা আদি হিন্দু এবং মুসলমান জাতির বাস ; দৈনিক বাজার আছে। বারুণী সময়ে আত্রাই নদী তীরে একটি মেলার অনুষ্ঠান হয়।

ছাতক এক্ষণে জনশূন্য জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এক সময়ে আত্রাই নদী

তীরে এই গ্রাম অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে কালিয়াই বংশীয় রায় উপাধিক ভূম্যধিকারিগণ বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের তুল্য রাজা উপাধিতে আখ্যাত হইয়া সম্মানিত হইতেন এবং এখানে প্রবল প্রতিপত্তি সহ রাজদণ্ড পরিচালন করিতেন। কালক্রমে রাজা দেবীদাসের পুত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রযুক্ত ছাতক নবাব সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই জেলার কাবারিখোলার মল্লিক, ভারেঙ্গার চৌধুরী, হাটুরিয়ার রায়, ভৌমিকগণ ঠাকুর চণ্ডীদাসের সন্তান; বাগ, কাশীনাথপুর, খেতুপাড়া, রসালপুর, শঙ্করপাশার রায়গণ ঠাকুর কালিদাসের সন্তান এবং সাঁড়াসিয়া বেলতৈল, ব্রাহ্মণগ্রাম, সাফল্লা, বাগমাড়া, শিবপুর প্রভৃতি স্থানের রায়গণ ঠাকুর নরোত্তমের সন্তান বলিয়া পরিচিত। কালিয়াই বংশীয়গণ এই জেলায় বহু বিস্তৃত বিধায় নিম্নে একটি বংশ লতিকা প্রদত্ত হইল।



কাশীনাথপুর দিং—পাবনা হইতে পূর্বদিকে প্রায় ২৬ মাইল দূরে আত্রাই নামক নদী তীরে অবস্থিত কাশীনাথপুর একটি প্রাচীন ভদ্র পল্লী। এখানকার রায় উপাধিক ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ; ইহারা ছাতক নিবাসী রাজা দেবীদাসের বংশধর এবং কালিয়াই গোষ্ঠী সম্ভূত। এই বংশীয় অনেকে দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং সুপুরুষ বলিয়া পরিচিত। আজকাল এ দেশের লোকে মধুপুর, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে স্বাস্থ্য পরির্তন জন দৌড়াদৌড়ি করিয়াও অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছেন ; কিন্তু এই পবিত্র আত্রাই নদীর তীরভূমিস্থ ও বাগ কাশীনাথপুরাদি গ্রামের ইতর ভদ্র জাতি নির্বিশেষে সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের মধ্যে অনেকেই পূর্বে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যে ও উৎফুল্ল মনে সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত এবং দীর্ঘ জীবনলাভে সমর্থ হইত। এক্ষণে ক্রমশঃই লোকে হীনবল ও অল্পায়ু এবং রুগ্ন দেহে কোন প্রকারে জীবন যাপন করিতেছে। নদী অবরুদ্ধ হওয়ায় এ প্রদেশের স্বাস্থ্য অনেকাংশ খারাপ হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়। কাশীনাথপুরেও বৈদ্যনাথতলা বলিয়া একটি স্থানে পূজা হইয়া থাকে।

কাশীনাথপুরে বর্তমানে সাপ্তাহিক রবিবারে ও বৃহস্পতিবারে হাট লাগে। বৃহস্পতিবারের হাটে অনেক গো মহিষাদি আমদানি হইয়া থাকে। এই হাটে অনেক তেঁতুল পাওয়া যায়। অনেকে তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। পার সাটিয়াখোলা দিং পাড়ায় অনেক কারিকরের বাস আছে। কাশীনাথপুরের হাটে অনেক দেশিয় কারিকরের প্রস্তুত বহুবিধ কাপড়াদিও খরিদ বিক্রি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লঙ্কা মরিচ ও পটলাদি বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

পাইকরহাটি গ্রাম কাশীনাথপুর হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে লাহিড়ী, রায়, মৈত্র, বিশ্বাস, ভৌমিক, চক্রবর্তী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ও দাস, সরকারাদি উপাধি বিশিষ্ট কায়স্থগণের বাস। মুসলমান সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। গ্রামে একটি পোস্টাফিস, মধ্য ইংরাজি স্কুল ও একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। ছোট একটি বাজার আছে। এখানকার বিশ্বাস পরিবার সমধিক প্রসিদ্ধ। এই বংশীয় অনেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। এই পরিবার প্রমথনারায়ণ বিশ্বাস মহাশয় রুরকী কলেজ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাশ করিয়া সরকারি টেলিগ্রাফ বিভাগে পাটনায় ইঞ্জিনিয়ার রূপে নিযুক্ত আছেন।

এই গ্রামের ভৌমিক বংশীয় লালবাগের উকিল দ্বিজেন্দ্রনাথ ভৌমিক বি. এল. মহাশয় বাড়ি হইতে কার্যস্থানে গমনকালে বিগত ১৩৩২ সালের আশ্বিন মাসের হালসা স্টেশনের রেলওয়ে সংঘর্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় গবর্নমেন্ট তদীয় মাতাকে দুই হাজার, তাহার স্ত্রীকে ৩৪ চৌত্রিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ এবং ভ্রাতা ও ভাগিনেয়কে চাকরি দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। নসীপুরে উক্ত ভৌমিক মহাশয় সাতিশয় লোকপ্রিয় ছিলেন, তজ্জন্য তথায় তাহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে "দ্বিজেন্দ্র মেমোরিয়াল লাইব্রেরী" নামক একটি পাঠাগার স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—বেড়া

বেড়া—পাবনা হইতে ২৬ মাইল পূর্বে ইছামতী নদী তীরে অবস্থিত বেড়া বর্তমান সময়ে একটি সুবৃহৎ বন্দর। ইহার পূর্বাংশ দোরতাগ্রাম মধ্যে এবং পশ্চিমাংশ বনগ্রাম মধ্যে অবস্থিত। ইহার কিছু উত্তর পশ্চিমাংশে ইছামতী নদী হুরাসাগর ও বরল নামক নদীদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, তজ্জন্য উক্ত স্থান বেড়া ত্রিমোহিনী নামে পরিচিত হয়।

বেড়া বন্দরের সম্পূর্ণ বাজার স্থানটি প্রায় এক মাইলের অধিক লম্বা এবং সম্পূর্ণই ইছমতী নদীর উত্তর পারে অবস্থিত। এখানে দেশিয় হিন্দু-মুসলমান বাঙালি মারওয়াড়ি দোকানদার আড়তদার ব্যতীত অনেক সময় ইংরেজ সওদাগরগণ পাট খরিদ উপলক্ষে সমাগত হইয়া থাকেন। রেলি ব্রাদার্স ও ল্যান্ডেন ক্লার্ক কোম্পানির পাট খরিদ জন্য কর্মচারি আদি স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত আছে। পাবনা জেলা ব্যতীত ফরিদপুর, ঢাকা আদি জেলার অনেকানেক মহাজন বহুদিন হইতে স্থায়ী ভাবে এখানে ব্যবসায় বাণিজ্যাদি কারবার উপলক্ষে বাস করিতেছেন। এখানে দৈনিক বাজার ব্যতীত শনি মঙ্গলবারে যে সুবৃহৎ হাট লাগিয়া থাকে, তাহাতে বহুবিধ দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। সিরাজগঞ্জের নিচেই সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় জন্য বেড়া দ্বিতীয় বন্দর বলা যাইতে পারে। ধান, পাট, গুড়াদি পণ্যদ্রব্য ব্যতীত এখানে বহুবিধ দেশিয় কারিকরের প্রস্তুত কাপড়াদি পাওয়া যায়। বেড়ার নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে নানাপ্রকার খেলনাদি বিক্রয়কারক সানদার (বেদে জাতীয়) নামক মুসলমান জাতীয় খুচরা জিনিস বিক্রেতাগণের বাস আছে।

পাবনা হইতে নূতন সিরাজগঞ্জ রোডে গো-গাড়িতে অথবা বর্ষাকালে নৌকাযোগে বেড়া যাওয়া যায়। সাঁড়া-সিরাজগঞ্জ রেললাইনের ভাঙুরিয়া নামক রেলওয়ে স্টেশন হইতে বৈশাখ মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ পর্যন্ত স্টিমারযোগে যাতায়াতের সুবিধা আছে। এখানে ডাকবাঙ্‌লা, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, সাবরেজেস্টারি অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়াদি বর্তমান আছে। সম্প্রতি কয়েকবৎসর হইল মথুরা গ্রাম যমুনা নদীতে ভাঙিয়া যাওয়ায় তথা হইতে পুলিশথানা এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসী মধ্যে সুবর্ণবণিক, কর্মকার, কয়েকঘর কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি হিন্দু ও মুসলমানের বাস। ব্যবসায় বাণিজ্যাদি উপলক্ষে এখানে সর্বদা দেশিয় ও ভিন্ন জেলাবাসী হিন্দু মুসলমানের জনসংখ্যায় বন্দরটি সর্বদা মুখরিত থাকে। স্থানীয় বাজার মধ্যে কালীপূজা উপলক্ষে বারইয়ারি পূজাদি হইয়া থাকে।

এক সময়ে এখানে মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল, নানা কারণে তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। এখানে কয়েকবার মেলা ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এখানে কয়েকটি জমিদারের তহশীল কাছারি বর্তমান আছে। এই বন্দরটিতে বাজার মধ্যে একটি পাকা বাঁধা রাস্তা আছে। সাধারণের উদ্যোগে এখানে মিউনিসিপ্যালিটির বন্দোবস্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইছামতী নদী বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে স্রোতস্বতী না থাকায় এখানে জলকষ্টও সময় সময় অনুভূত হইয়া থাকে। এই বন্দরের কিছু দূরে মোহনগঞ্জ নামক স্থানে এক সময়ে একটি প্রধান নীলকুঠি বর্তমান ছিল।

হাটুরিয়া—বেড়া হইতে ৩ তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমাংশে হাটুরিয়া একটি প্রাচীন পল্লী। এখানে রায়, ভৌমিক, মৈত্র, বাগছি, উপাধিক ব্রাহ্মণগণের বাস। এখানে পণ্ডিত উপাধিক এক ঘর ব্রাহ্মণ পুরোহিত বংশ বলিয়া পরিচিত। পূর্বে এখানে চক্রবর্তী উপাধিক ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন বংশ বলিয়া পরিচিত হইত। বাগছি পরিবার গ্রামের জমিদার বংশ বলিয়া খ্যাত। এই গ্রামের অনেকে সুশিক্ষিত ; ওকালতি ডাক্তারি আদি ব্যবসায়ে এখানকার অনেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ। দেশে এবং রঙ্‌পুরাদি উত্তরবঙ্গের অনেক স্থানে এই গ্রামের অনেকেই বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তিলাভে সক্ষম হইয়াছেন। এখানকার গোস্বামী উপাধিক ব্রাহ্মণদিগের বাটিতে বহু কালীয় ইষ্টক নির্মিত একটি বাঙ্‌লা আছে, তাহা শ্যামরায় নামক বিগ্রহের দেবমন্দির রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে আচার্য উপাধিক ব্রাহ্মণও আছে।

জগন্নাথপুর হাটুরিয়ার সীমাসংলগ্ন বলিয়া উভয় গ্রাম একত্রে পরিচিত হইয়া থাকে। গ্রামে একটি পোস্টাফিস আছে তাহা চক চাপরি নামে পরিচিত। এখানে একটি ছোট দৈনিক বাজার আছে। এখানকার পালেরা উত্তম ক্ষির এবং ঘোষেরা উত্তম খাসা দধি তৈয়ার করে। জগন্নাথপুরে

বাণিজ্যজীবী অনেক বৈশ্য, বণিক, কর্মকার জাতির বাস। এথাকার রাস্তা গলি হালটাদি অতি নিচ জন্য বর্ষাকালে নৌকা ব্যতীত যাতায়াত কঠিন। নৌকা ব্যতীত চলাচল অসম্ভব, অন্য সময়েও নানা অসুবিধা ; গ্রামে একটি মধ্য ইংরাজি ও একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। শীতকালে হাটুরিয়া গ্রামে কৃষ্ণবর্ণ জয়দুর্গা মূর্তির পূজা উপলক্ষে হাটুরিয়া গ্রামে মেলার অনুষ্ঠান হয়।

সাধুগঞ্জ দিং—েড়া হইতে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণাংশে সাধুগঞ্জ একটি প্রধান বন্দর। সাধারণত **নাকালিয়া** নামক বাজারের দক্ষিণাংশই সাধুগঞ্জ নামেই পরিচিত হইয়া থাকে। নাকালিয়ায় নূতন বাজার, পুরাণ বাজার নামে দুইটি বাজার আছে। পুরাণ বাজারে বহু মহাজনের দোকান ছিল। ইহার কতকাংশ বর্তমানে হুরাসাগর বা যমুনা নদীতে ভাঙিয়া নদী গর্ভে পতিত হইয়াছে ও হইতেছে।

নাকালিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি আদি নবশাক, বৈশ্যসাহা, বণিক প্রভৃতি হিন্দু ও অনেক মুসলমান জাতির বাস আছে। এখানে অনেক প্রসিদ্ধ কবিরাজ জন্মিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। চক্রবর্তী পরিবার কবিরাজ বংশধর বলিয়া বিখ্যাত। স্বর্গীয় আনন্দ কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র রাজশাহীর (অধুনা কলিকাতার) হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী কবিরাজ মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত। ঐ বংশীয় কৃপানাথ কবিরাজ মহাশয়ও জনৈক সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। গ্রামের অনেকে কুচবিহার, রঙ্পুর, ভাগলপুরাদি বিদেশে সাতিশয় প্রতিপত্তি ও সুনামের সহিত ওকালতি মোক্তারি আদি ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। এখানকার চক্রবর্তী পরিবারের অনেকে হায়দ্রাবাদে ইঞ্জিনিয়ারাদি আছেন। নাকালিয়া সাধুগঞ্জ একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান বলিয়া পরিচিত। এখানে ধান, চাউল, মুগ, পাট, মরিচ, হলুদ প্রভৃতি নানাজাতীয় দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। পাট খরিদ জন্য এখানে দুই তিনজন দেশিয় মহাজন এবং ইংরেজ সওদাগরগণের আড়ত ও কুঠি বর্তমান আছে। এখানে কুণ্ডু উপাধি বিশিষ্ট অনেক মহাজন পাটের ব্যবসায়াদিতে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছেন। নাকালিয়ার মুসলমান জাতীয় অনেক কারিকরগণ সোণ দ্বারা যে গুণ তৈয়ারি করে, তাহা দেশে বিদেশে অতি সমাদরে বিক্রি হইয়া থাকে ; ইহা এথাকার একটি প্রধান শিল্প দ্রব্য। এতদ্ব্যতীত নাকালিয়া গ্রামে অনেক বস্ত্র শিল্পজীবী কারিকর জাতির বাস আছে, তাহারাও অনেক দেশিয় কাপড় ছিট প্রভৃতি তৈয়ার করে এবং এথাকার হাটে আমদানি হইয়া থাকে।

নাকালিয়াতে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, পাঠশালা, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস বর্তমান আছে। এখানে রথযাত্রার উৎসব অতি প্রাচীন এবং ইহাতে অতি সমারোহ হইয়া থাকে। নাকালিয়া সংলগ্ন সাঁড়াসিয়া, পেচাখোলা প্রভৃতি পল্লীতে অনেক ভদ্র পরিবারের বাস আছে। নাকালিয়া গ্রামের কুণ্ডু উপাধিক মহাজনগণের অনেকে পূর্বে বস্ত্রশিল্পজীবী ছিলেন, তজ্জন্য তাহারা তন্তুবায় বলিয়া পরিচিত হইতেন।

নাকালিয়াতে কৃষ্ণকালী পূজা উপলক্ষে একটি বারইয়ারি মেলার অনুষ্ঠান হয়। সাধুগঞ্জে একটি স্টিমার স্টেশন আছে, তথা হইতে গোয়ালনন্দ, সিরাজগঞ্জ এবং বর্ষাকালে ভাঙুরিয়া উল্লাপাড়াদি সাঁড়া সিরাজগঞ্জের রেলওয়ে স্টেশনে যাতায়াত করা যায়।

সিন্দুরী রূপপুর—আত্রাই নদী তীরে কাশীনাথপুর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পূর্বোত্তরাংশে সিন্দুরী একটি প্রাচীন গ্রাম। এক সময়ে এই সিন্দুরী ও তন্নিকটবর্তী রূপপুর অতি প্রসিদ্ধ জনপদে পরিণত ছিল। সিন্দুরী ও শাখিনী নামক পরগণাদ্বয় লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তদীয় গুরুদেব বংশীয় অনন্তরাম বাঙাল ওঝা গুরুদক্ষিণা স্বরূপ নিষ্কর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সিন্দুরী গ্রামে অধিকারী বংশীয় ব্রাহ্মণদিগের বাটিতে বহুদিন হইতে রথযাত্রার বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে এখানে সামান্য দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ, বারুজীবী প্রভৃতি নবশাখ ও মুসলমানের বাস। এখানে একটি বাজার বর্তমান আছে। রূপপুর গ্রামেও অনেক বারুজীবী কায়স্থাদি হিন্দু ও অনেক মুসলমানের বাস।

নাটোররাজ রামজীবন এক সময়ে সিন্দুরী বাজারের পশ্চিমাংশে একস্থানে নিজ বজরায় বিচরণ করিতেছিলেন। তৎকালীন রাজাদিগের বাদশাহী সাজসজ্জায় আকৃষ্ট হইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক পূর্ণ কুম্ভাদি লইয়া রাজার অভ্যর্থনা ও সন্দর্শন মানসে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। রাজাবাহাদুর উক্ত স্থানের নাম **নয়ান সুখের ঘাট** আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি বর্তমান আছে।

প্রবাদ আছে তৎকালে রাজা রামজীবন এই স্থান ছাতক রাজবংশীয় তৎকালীন নয়াবাড়ি নিবাসী রাজীব রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ মানসে জনৈক অমাত্যকে প্রেরণ করেন। উক্ত রায় মহাশয় প্রাচীন ভূম্যধিকারী এবং নাটোররাজ আধুনিক ভূস্বামী বিধায় সামান্য অমাত্যের আহ্বানে আপনাকে অপমানিত বোধে তৎকালে রামজীবনের সহ সাক্ষাৎ করেন নাই। ইহাতে উদীয়মান নাটোররাজ রঘুনন্দনের সহায়তায় কালিয়াই বংশীয়দিগের ৮ পরগণা জমিদারি আত্মসাৎ করিয়া লয়েন।

কাশীনাথপুর হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ পূর্বাংশে শিবপুর গ্রাম অবস্থিত। এথাকার মৈত্র বংশ ছাতকরাজ বসন্ত রায়ের পুত্র রাজীব রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ রাজীব রায় এই মৈত্র বংশীয়দিগের পূর্বপুরুষ **শ্রীমুখ** মৈত্র নামক জনৈক মহাত্মাকে সাতটা নামক স্থান হইতে আনিয়া এখানে স্থায়ী করিয়াছিলেন। আবার অন্য একটি বিবরণে জানিতে পারা যায় যে "বসন্ত রায়ের পুত্র রাজীব রায়, গয়াতীর্থ হইতে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণকে তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীদ্বয় সহ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের দুইটি ভগিনী পরম সুন্দরী ছিল। রাজা সেই শিবচন্দ্রের "চট্টোপাধ্যায়" উপাধি স্থলে "মৈত্র" উপাধি করিলেন। তাহার দুই ভগিনীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন। সেই পরিচয়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ঘরে শিবচন্দ্রের বিবাহ দিলেন এবং তাহাকে একটি গ্রাম তালুক করিয়া দিলেন। তাহারই সন্তানেরা শিবপুরের মৈত্র নামে খ্যাত। শিবচন্দ্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পরিচয় কিছুই জানিতেন না।" তজ্জন্য ঘটকগণ এবং ভট্টগণ বিদ্রূপ করিয়া যে কবিতা বাঁধিয়াছিল তাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

শিবচন্দ্রের বিবাহ সময়ে অনেকে আপত্তি করায় রাজীব রায় কহিলেন, "কাশ্যপ গোত্র কুলীন ব্রাহ্মণ রাঢ়ী হইলেই চাটুর্যে হয়, বারেন্দ্র হইলেই মৈত্র হয়। শিবচন্দ্রকে যখন বারেন্দ্র করা হইল তখন ইহার মৈত্র উপাধি হওয়াই উচিত"। *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—১৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।*

এই শিবপুরের মৈত্র বংশীয় অনেকে প্রসিদ্ধ গামছামোড়া দলের সর্দার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মৈত্র বংশজ গিরিধর মৈত্রের পুত্র লক্ষ্মীচন্দ্র মৈত্র এবং তদীয় ভ্রাতা গঙ্গাধর মৈত্রের পুত্র জগচ্চন্দ্র মৈত্র গামছামোড়া দলের নেতা ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। প্রথমে একটি গুরুতর অপরাধ লক্ষ্মীচন্দ্রের ১৪ বৎসর কারাদণ্ড হয়, পুনরায় বাটি আসিয়া কয়েক বৎসর বাস করার পর অন্য একটি অপরাধে দ্বীপান্তরিত হন। ১৮/১৯ বৎসর তথায় বাস করার পর বিদেশে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। জগচ্চন্দ্রও জনৈক দলপতি ছিলেন। ইহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এই প্রদেশে তৎকালে পথিকগণকে গলায় গামছা দিয়া মুখ বাঁধিয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করা হইত। নৌকাপথে যাতায়াত কালে গামছামোড়ার দল লোকের নৌকার নিকট একত্রিত হইত, হরিলুট দিবার ভান করিয়া লোককে ডাকিয়া আনিত এবং গীতবাদ্যাদির শব্দ মধ্যে লোকের মুখ বাঁধিয়া মারিয়া ফেলিত ও মুখে গঙ্গাজল দেওয়ার ভাণ করিত। অন্যেরা সংকীর্তন হইতেছে মনে করিয়া বিপন্ন লোকের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে পারিত না। ঠগি নিবারণ সময়ে যখন মৈমনসিংহাদি জেলায় ঠগি অফিস স্থাপিত হয় তৎসঙ্গে এই জেলার এ অঞ্চলের অনেক ধৃত হইয়া নানাপ্রকারে দণ্ডিত হইতে থাকে ; তদবধি এ দেশের এতাদৃশ অত্যাচার ক্রমে নিবারিত হইতে থাকে।

উপরোক্ত লক্ষ্মীচন্দ্র মৈত্র দিগরের অত্যাচার ও উদ্ভাবনী শক্তি দর্শনে দেশের গ্রাম্য কবিগণ যে সকল ছড়া ও কবিতা তৈয়ার করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি এই প্রদেশে শুনিতে পাওয়া যায়—

লক্ষ্মীচন্দ্র জগচ্চন্দ্র মরি ভক্ত কি হরির।
যত চাড়াল বামন সুতার মিলে একটা
যুক্তি করলে স্থির।।
যত চাঁড়ালের ছেলে ধানের ক্ষেতের যাই বলে।
দিয়ে ধাপ্‌পা তাদের সেই সময়ে নৌকাতে তোলে।।
গোলকা চাঁড়াল তামাক সাজে, মোনা সুতার বানায় নল।
বাহবা মন্‌সেফের হদ্দ গামছা মোড়ার দল।।
যত ইংরেজি ভোজ বাজী বিদ্যা সব করলে রসাতল।
বেঁধে খালি হাড়ির মুখ এ বড় কৌতুক,
ভোলা ডাক্‌ত সকলে এসে হরির লুট ধরুক।
শেষে গলায় গামছা দিয়ে সবার মুখে ঢালে গঙ্গা জল।।

শিবপুরের মৈত্র বংশীয় স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় ইংরাজিতে সিনিয়ার স্কলার ছিলেন। তিনি পাবনা, হুগলি, বগুড়া ইত্যাদি স্থানে গবর্নমেন্ট স্কুলের হেড মাস্টারি চাকরি করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ও জনৈক প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

ভারেঙ্গা—বর্তমান সময়ে পাবনা জেলায় ভারেঙ্গা একটি সুপ্রসিদ্ধ পল্লী। গোয়ালন্দ হইতে স্টিমার যোগে নূতন ভারেঙ্গা নামক স্টিমার স্টেশন হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে অবস্থিত। বকচর নামক পল্লী নূতন ভারেঙ্গা নামে পরিচিত এবং নগরবাড়ি স্টিমার স্টেশন হইতে পুরাণ ভারেঙ্গা বা নলকোলা নামক পল্লী প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমান রাজনারায়ণপুর নূতন ভারেঙ্গা হইতে প্রায় তিন মাইল।

বর্তমান সময়ে ভারেঙ্গার ন্যায় সুশিক্ষিত জনবহুল পল্লী এই জেলার কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানকার চৌধুরী পরিবার প্রাচীন জমিদার এবং চক্রবর্তী বংশ আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। এখান পূর্বে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাস এবং কয়েকটি চতুষ্পাঠি ছিল। মফঃস্বলস্থ গ্রামসমূহ মধ্যে ভারেঙ্গায় সর্বপ্রথমে বাংলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আধুনিক শিক্ষিত এম. এ., বি. এ. উপাধিধারী শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা এই গ্রামে জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি।

চক্রবর্তী পরিবারস্থ কুচবিহারের ভূতপূর্ব সিভিল জজ স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও অর্থানুকুল্যে এখানে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়াদি স্থাপিত হয়। এই সমস্ত কার্যে তিনি স্বয়ং বহু অর্থ ব্যয়ে স্বগ্রামের উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। স্থানীয় ইংরাজি স্কুলটি যতদিন পর্যন্ত স্বচ্ছল অবস্থায় পরিণত হয় নাই, ততদিন পর্যন্ত তিনি ইহার জন্য স্বয়ং মাসিক প্রায় শতাধিক টাকার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই গ্রামে চৌধুরী, চক্রবর্তী, ঘটক, রায় আদি উপাধিক ব্রাহ্মণ সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। এতদ্ব্যতীত কর্মকার, বাণিজ্যজীবী বৈশ্য বণিক আদি নানা জাতীয় হিন্দুর বাস। মুসলমান অধিবাসী মধ্যে কল্যাণপুর নামক পাড়ায় অনেক বস্ত্র শিল্পজীবী কারিকর জাতির বাস ছিল। দেশিয় এই সকল শিল্পীগণকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানকল্পে মাদ্রাজ প্রদেশস্থ মিঃ পিল্লাই নামক জনৈক সরকারি পরিদর্শক বহুদিন পর্যন্ত এই গ্রামে নিযুক্ত ছিলেন। মফঃস্বলস্থ গ্রামসমূহ মধ্যে ভারেঙ্গাতেই সর্বপ্রথম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে একমাত্র

ভারেঙ্গা গ্রামে একটি পোস্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস বর্তমান ছিল। সাধারণত কল্যাণপুর ও তারানগর নামক পাড়া এক ভারেঙ্গা নামে অভিহিত হইত। যমুনা নদী ক্রমশ এই জেলার পূর্বাংশ গ্রাস করিয়াছে এবং ভারেঙ্গার কল্যাণপুর নামক প্রধান পাড়া সম্পূর্ণ বর্তমান সময়ে নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। কেবলমাত্র তাড়ানগর নামক পাড়ার কিয়ৎ অংশ বর্তমান আছে। এখানকার চৌধুরী বংশ নদী ভঙ্গ হেতু তাহাদের পূর্ব নিবাসস্থল ভারেঙ্গা পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বীয় বাসস্থান নির্মাণ করিলেও তাহাদের বর্তমান আবাসস্থলকে প্রাচীন পল্লীর নামানুসারে পরিচিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। **বকচর নামক পল্লী নূতন ভারেঙ্গা, নলকোলা নামক পল্লী পুরাণ ভারেঙ্গা** এবং নাটিয়াবাড়ি নামক **পল্লী** রাজনারায়ণপুর নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই ভিন্ন ভিন্ন পোস্টাফিস, হাটবাজার, বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরাণ ভারেঙ্গায় পোস্টাফিস ব্যতীত একটি টেলিগ্রাফ অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজনারায়ণপুর গ্রামটি এই স্থানের মধ্যে বাজার ও বসতি সংখ্যা হিসাবে কিয়ৎ পরিমাণে জাকজমকশালী ও সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হইয়াছে। বকচর সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। এই গ্রামত্রয়ের প্রত্যেক স্থানের অধিবাসিগণই আপন আপন গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু সময় সময় অত্যধিক আস্ফালন জন্য নানারূপ অপ্রীতিকর ঘটনাও সংঘটিত হইয়া থাকে।

প্রকাশ, ভারেঙ্গার স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পিতা পীতাম্বর চক্রবর্তী মহাশয় চৌধুরীবাবুদের বাটিতে দেওয়ান ছিলেন, তজ্জন্য অদ্যাবধি চক্রবর্তী মহাশয়দিগের বাটি দেওয়ানজীর বাটি বলিয়া বিখ্যাত। এখানকার চৌধুরী পরিবারস্থ হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় কুচবিহার রাজ স্টেটে আহেলকার পদে কার্য করার পর তথাকার সিভিল জজের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তথা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বর্তমানে নাটোর রাজ স্টেটের দেওয়ান পদে নিযুক্ত আছেন। চক্রবর্তী পরিবারস্থ যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পুত্র দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় গৌরীপুর রাজ স্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত আছেন ; তদীয় ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বিহারের জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তদীয় অপর ভ্রাতা সিতেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বহরমপুরের লুনাটিক এসাইলামের ডাক্তার ছিলেন। সিতেশবাবু জনৈক শ্বেতাঙ্গ রমণীর পাণী গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাদববাবুর ভ্রাতা মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় অতি পূর্বে সবজজ পদবীতে কার্য করিতেন। এই ভারেঙ্গা গ্রামের ঘটক পরিবারস্থ সুরেশচন্দ্র ঘটক মহাশয় বর্তমান সময়ে ঢাকা নগরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত এই গ্রামের অনেকে উকিল মোক্তার ব্যবহারজীবীরূপে ও মুন্সেফাদি রাজপদে নিযুক্ত থাকিয়া দেশে বিদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই গ্রামের ভূতপূর্ব হরসুন্দর তর্কালঙ্কার নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয় বর্তমান সময়ে সারভ্যান্ট নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সুলেখক ব্যতীত শ্যামসুন্দরবাবু একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী।

ভারেঙ্গার চৌধুরী পরিবারস্থ কালাচাঁদ বিগ্রহ নামক কুলদেবতা বর্তমান সময়ে পালাক্রমে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে সাময়িক নীত হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত চৌধুরীবাবুদের বাটিতে দোল দুর্গোৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থানের কালিয়াই বংশীয়দিগের স্থাবর সম্পত্তি নানাপ্রকারে হস্তচ্যুত হইয়াছে, কিন্তু ভারেঙ্গার চৌধুরী পরিবারের ভূসম্পত্তি এখনও কথঞ্চিৎ ইহাদের করতলগত রহিয়াছে। ভারেঙ্গা গ্রামের অধিবাসী মধ্যে অনেকেই আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া দেশে বিদেশে নানারূপে সুনাম অর্জন করিয়াছেন, এবং এই গ্রামের অনেকেই বিদেশবাসী হইয়াও স্বীয় গ্রামের উন্নতি জন্য সবিশেষ চেষ্টিত. ইহাই এথাকার অধিবাসীগণের বিশেষত্ব। নদী ইহাদের গ্রামের চিহ্ন বিলোপসাধনে অগ্রসর হইলেও, ইহারা গ্রামের ও দেশের নাম বজায় রাখিতে সবিশেষ প্রয়াসী। স্বর্গীয় যাদববাবুর

প্রতিষ্ঠিত ভারেঙ্গা একাডেমী এখন পর্যন্তও সিংহাসন নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই গ্রামের অনেকেই কবি সাহিত্যিক হিসাবে বঙ্গীয় সুধী সমাজে সুপরিচিত। সুদূর বারাণসী ক্ষেত্রেও এই গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নাম চিকিৎসক হিসাবে সুবিখ্যাত। সর্ব বিষয়ে ভারেঙ্গা পাবনা জেলার মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নগরবাড়ি দিং—যমুনা নদী তীরে নগরবাড়ি, পুকুরপার, ধোপাখোলা মহারাজপুর, প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী অতি প্রাচীন সময় হইতে সুপ্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র পল্লী বলিয়া পরিচিত ছিল। এই সমস্ত গ্রামে অনেকানেক ভদ্র পরিবারে বাস ছিল। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল যমুনা নদীতে এই সকল গ্রামের অধিকাংশ স্থলই ভাঙিয়া গিয়াছে। মাত্র পুকুরপার গ্রামের কিয়দংশ বর্তমান আছে।

নগরবাড়ি, পুকুরপার ও রামনগরাদি গ্রামে **মথুরার ভট্টাচার্য** পরিবারের অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের বাস ছিল। ইহারা ছাতক নিবাসী রাজা বসন্ত রায়ের ভ্রাতা মথুরানাথ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মথুরা রায়ের ঠাকুর বা **মথুরার ঠাকুর** বংশ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। ইহাদের পূর্ব বিবরণে জানিতে পারা যায়—মথুরানাথ রায় মহাশয় হরিহর তর্কালঙ্কার নামক জনৈক পণ্ডিতের অদ্ভুত ক্ষমতাদর্শনে তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত মহীশালার ভট্টাচার্যদিগের বাটিতে মাহেশ্বরী দেবীর সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করেন এবং পাগলা, নগরবাড়ি, চকমেলাদি, রামকৃষ্ণ বাড়ি, সন্ন্যাসীবাধা, ছোনকা, কালিকাপুর প্রভৃতি কয়েকটি মৌজা খারিজা তালুকস্বরূপ দান করত কালিকাপুর গ্রামে স্থাপন করেন।

হরিহর ঢাকা জেলার অধীনস্থ খল্লী নামক গ্রামের দেবকীনন্দন ভট্টাচার্য মহাশয়ের ছাত্র বা শিষ্য ছিলেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় একদা মানস পূজাকালে অধ্যাপকের পূজাপদ্ধতির ভ্রম প্রদর্শন করেন, তদবধি উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ই শিষ্যের নিকট পরাভব স্বীকার করতঃ স্বয়ং তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। এই বংশে পরবর্তীকালে অনেকানেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কৃতবিদ্য মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলেই শাস্ত্রানুশীলনে ও শিষ্য ব্যবসায়ে নিরত থাকিতেন। এই জেলার কালিয়াই বংশীয়দিগের সকলেই এবং তাঁতিবন্দ আদি গ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবার ইহাদের শিষ্য। নাটোর রাজ সরকার হইতে এই বংশীয় অনেকের অনেক ভূসম্পত্তি ব্রহ্মত্রাদিরূপে নির্দিষ্ট আছে। লিখিত আছে—"হরিহর অত্যন্ত পণ্ডিত ও তাপস ছিলেন। সর্বদাই ভ্রমণে রত থাকিতেন এবং নির্জন প্রদেশ ভাল বাসিতেন। প্রবাদ এই যে, হরিহর আত্রেয়ী নদীর ধারে তপস্যা করিতেন। একটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া সূর্য্যাতপ হইতে হরিহরকে রক্ষা করিত। ইহা দেখিয়াই হরিহরের স্থানে মথুর রায় দীক্ষিত হন। হরিহরের সন্তানেরাই মথুরার ভট্টাচার্য নামে খ্যাত। ইহাদের ব্রাহ্মণ ভিন্ন শিষ্য নাই। অদ্যাপি ইহারা শূদ্র বা বৈদ্যের দান গ্রহণ করেন না।" *গৌড়ে ব্রাহ্মণ—মহিমচন্দ্র মজুমদার কৃত। ১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।* কিন্তু অধুনা কালধর্ম বশে পুকুরপারের প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য বংশীয় কেহ কেহ চাকরি আদি গ্রহণ দ্বারা শূদ্রবৃত্তি এবং কাষ্ঠাদি পণ্যদ্রব্যের ব্যবসাদিতে লিপ্ত হইয়া বৈশ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন।

ধোবাখোলার দৈনিক বাজার অতিশয় প্রাচীন ও সুবৃহৎ ছিল। উক্ত বাজার ও এখানকার স্টিমার ঘাট ভাঙিয়া যাওয়ায় বাজারাদি সমস্তই বর্তমান পুকুরপার নামক গ্রামাংশে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পাট ও কাষ্ঠাদি ব্যবসায়ের জন্য নগরবাড়ি পূর্বাপর প্রসিদ্ধ ; ইহা এতদঞ্চলে একটি বৃহৎ বন্দর। ধোবাখোলার বাজার স্থানীয় সাহা চৌধুরীদিগের পূর্বপুরুষগণের ব্যবসায়ের স্থান ও তাহাদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ধোবাখোলার সাহাচৌধুরী বংশীয় মহাজনগণ এখানকার ভূম্যধিকারী রূপে পরিচিত হইতেন। নিকটবর্তী নুরনগর বেতাই প্রভৃতি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত নীলকুঠি এবং এই গ্রামের ইহাদের পূর্বতন বাসভবনাদি এবং চতুর্দিক ইষ্টকদ্বারা বাঁধা পুকুরাদি ও বড় বাগান নামক উদ্যানাদি

সমস্তই নদী গর্ভে বিলীন হইয়াছে। ইহারা বর্তমানে বহু শরিকে বিভক্ত হইয়াছেন, এখনও অনেকের ভূসম্পত্তি কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমান আছে। ইহাদের পূর্ব পুরুষগণ মধ্যে কৃষ্ণমঙ্গল সাহা মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবাদ নাটোরে ব্যবসায়াদিতে লিপ্ত থাকিয়া এবং উক্ত রাজবাটিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া বাণিজ্যাদিতে ইহাদের বিশেষ উন্নতিলাভ ঘটে। কালে রাজশাহী জেলার বিয়াঘাট পরগণা এবং এই জেলার সিন্দুরী পরগণার কতকাংশ ও তরফ কালিকাবাড়িদিগর খরিদ করিয়া ইহারা অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তাহা হইতেই ইহারা জমিদার শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া উঠেন। এই বংশীয়গণ নবাবী আমলে ঢাকা জেলার অধীনস্থ সাভার চাকলার চাকলাদার ছিলেন। কালক্রমে প্রথমে কালিকাপুর এবং পরে ধোবাখোলায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

পুকুর পারে একটি পোস্টাফিস আছে। ধোবাখোলায় করোনেশন হাই স্কুল নামে যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে যমুনা নদীর প্রবল ভাঙনের ফলে গতপতদিয়া নামক পল্লীতে অবস্থিত হইয়াছে।

রতনগঞ্জ দিং—বাদাই জোলা ও আত্রাই নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত রতনগঞ্জ একটি প্রাচীন পল্লী। গ্রামে ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী আদি উপাধিক ব্রাহ্মণ, কয়েক ঘর কায়স্থ, সাহা, কুণ্ডু, উপাধিক ব্যবসায়ী প্রভৃতি হিন্দু জাতি ও অনেক মুসলমানের বাস। এখানে সাপ্তাহিক মঙ্গলবার ও শুক্রবার হাট বসিয়া থাকে। গ্রামে তেঁওতা জমিদারদিগের একটি কাছারি বাড়ি আছে। এখানে একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় ও বাজার বর্তমান আছে।

প্রবাদ নবাব আলীবর্দী খাঁর সময়ে তিনি ঢাকা নগরে গমনকালে এখানে অবতোরণপূর্বক নামাজ করেন এবং তদুপলক্ষে এখানকার মসজিদের মোল্লা ও খতিবদিগকে তৎকালে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। অতি পূর্বে এই গ্রামে বহু তুলা ধনকর ও চিরকুঠি জাতির বাস ছিল। এই গ্রামে নরসুন্দর সমাজে অনেক কবিরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এথাকার উমানাথ শীল নামক জনৈক কবিরাজ একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই গ্রামের ভট্টাচার্য বংশে অনেক পণ্ডিত ও বর্তমান ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রামের দক্ষিণ দিকে বাদাই জোলা এবং পূর্বে আত্রাই নদী অবস্থিত থাকায় এখানকার জল নিকাশের প্রাকৃতিক বিশেষ সুব্যবস্থা থাকায় গ্রামখানি জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও অনেক পল্লীগ্রাম অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর এবং পূর্বে আরও ছিল। এই গ্রামের চক্রবর্তী উপাধিক ব্রাহ্মণদিগের বাটিতে সিদ্ধেশ্বরী নামক কালিকা দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার দৈনিক সেবা পূজা ও সাময়িক উৎসবাদির জন্য বহুদিন হইতে নানারূপ দেবত্রাদি নিষ্কর ভূমি নির্দিষ্ট আছে। স্বাস্থ্যকর বিধায় এই গ্রামে সাধারণত কলেরা ও বসন্তরোগ অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা অতি কম হইয়া থাকে।

এই গ্রামের দক্ষিণদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর। আত্রাই নদীর অপর পারে ত্রিমোহিনী নামক স্থানে বর্তমানে একটি দৈনিক বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের দুধের ওজন ১২০ তোলায় এক সের ধরা হইয়া থাকে।

মাসুন্দিয়া রতনগঞ্জ হইতে প্রায় দেড় মাইল দুরে আত্রাই নদীর তীরে উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এখানে দৈনিক বাজার বসিয়া থাকে। গ্রামে সাহা উপাধিক অনেকগুলি বৈশ্য জাতির বাস। এখানে মিঞা, মিরজা উপাধিক অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের বাস আছে। বাজারে বহু পাট আমদানি হয়। এখানে একটি পোস্টাফিস আছে; পূর্বে এখানে যে একটি সার্কেল স্কুল ছিল বর্তমানে তাহা মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত হইয়াছে। নিকটবর্তী **রূপগঞ্জ** পল্লীতে অনেক বারুজীবী, সাহা, সূত্রধরাদি হিন্দু ও বহু তৈল প্রস্তুতকারী খলু জাতীয় মুসলমানের বাস আছে।

মথুরা দিং—এই গ্রাম এক্ষণে যমুনা নদীতে বিলীন হইয়াছে। বর্তমান সময়ে নগরবাড়ি স্টিমার স্টেশন হইতে অর্ধমাইল উত্তরে গাধুলীপাড়া নামক স্থানে যে বন্দর স্থাপিত হইয়াছে; তাহাই মথুরা হাট বা মথুরা নামে পরিচিত হইয়া থাকে। পূর্বে মথুরা নামক গ্রামে একটি পুলিশ স্টেশন ও বাজার বর্তমান ছিল। এখানে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে অতি সমারোহে মেলাদি অনুষ্ঠিত হইত। এখানে জেলা ফরিদপুরের অধীনস্থ মানিকদহ নিবাসী বিপিনবিহারী রায় দিগরের তহশীল কাছারি বাড়ি বর্তমান ছিল। বর্তমান সময়ে ভাগ্যকুলের কুণ্ডু বাবুগণ তদীয় সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। প্রথমে মথুরা ভাঙিয়া কিছুদিন বেনুপুর নামক গ্রামে যে বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাও ভাঙিয়া ক্রমে বর্তমানে গাধুলীপাড়া ঝাউকান্দা আদি পল্লীর সন্নিকটে মথুরা বন্দর স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখানে সাপ্তাহিক হাট বসিয়া থাকে।

সাফল্লা নামক যমুনা তীরস্থ গ্রামও একটি প্রাচীন পল্লী। এখানকার রায় পরিবার সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বংশীয় স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ রায় মহাশয় এতদঞ্চলে এক সময়ে জনৈক কালওয়াত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি হিন্দু ও অনেক মুসলমানের এখানে বাস। বর্তমান সময়ে এই গ্রামের অধিকাংশ নদীগর্ভে নিপতিত হইয়াছে।

পেঙ্গুয়া বা (পেঙ্গে) নামক একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্র পল্লীতে রায়, মজুমদার উপাধিক ব্রাহ্মণ, গুহ, চন্দ আদি উপাধিক কায়স্থাদি হিন্দু এবং অনেক মুসলমানের বাস। এই গ্রামের হরিমোহন চন্দ মহাশয় সামান্য কেরাণী হইতে স্বকীয় উদ্যম ও যত্নবলে রাজশাহী বিভাগের কমিশনরের পারসনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় দার্জিলিংয়ের প্রসিদ্ধ 'Lowis Sanitarium' নামক পান্থনিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। এই পেঙ্গুয়া গ্রামের হরসুন্দর মজুমদার মহাশয় শিলিগুড়িতে ওকালতি করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং মানিকদহের বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের পাবনা জেলাস্থ অনেক ভূসম্পত্তি তিনি খরিদ করিয়াছেন।

রঘুনাথপুর দিং—মথুরা রোডের উপর অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপর রঘুনাথপুর একটি প্রাচীন পল্লী। এখানকার ভট্টাচার্য পরিবার সমধিক প্রসিদ্ধ; এখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমানের বাস। গ্রামে একটি মধ্য ইংরাজি স্কুল আছে। নিকটস্থ পল্লী **শ্রীনিবাসদিয়া** নিবাসী দাস উপাধিক কায়স্থ বংশীয় ভূম্যধিকারী পরিবার এতদঞ্চলে বর্তমান সময়ে সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী। ইহারা তালুকদারী আদি ব্যতীত ব্যবসায়াদিতেও মনোযোগী। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পাট আদি পণ্যদ্রব্যের ব্যবসাদিতে লিপ্ত আছেন। ইহাদের এলাকাস্থিত কাজিরহাট নামক স্থানে ইহারা সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল একটি হাট স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের এক শরিক পূর্বপুরুষের নামানুসারে **প্রতাপপুর** নামক একটি পল্লী সংস্থাপন করিয়াছেন। এই গ্রাম সংলগ্ন ঘোপসিলন্দাও একটি ভদ্রপল্লী; এখানে সোম, ঘোষ আদি উপাধিক অনেক কায়স্থাদি ভদ্র পরিবারের বাস আছে।

বর্তমান বেড়া থানার অধীন আমিরাবাদ, মীরপুর, খাঁপুর, কাজিরহাট প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী প্রায় পরস্পর নিকটবর্তী। ইহাদের নাম দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এতদঞ্চলে এক সময়ে প্রাচীন মুসলমান বংশের বাস ছিল। এখনও মাসুন্দিয়া, তালিম বা তালিপ নগরে মিরজা, মীর, কাজি প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট বহু মুসলমান বংশের বাস আছে। পূর্বে এই সমস্ত পল্লীর অধিকাংশ ঢাকা জেলাব অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধুনা দরিদ্র ও হীনাবস্থায় পতিত হইলেও এতদঞ্চলের অনেক মুসলমান পরিবার যে সদ্বংশজাত তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কাহারও কাহারও গৃহে প্রাচীন দলিলাদিও থাকা সম্ভবপর। এই সমস্ত অঞ্চলের বিস্তারিত বিবরণ সংগৃহীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। দেশের শিক্ষিত ও এতদঞ্চলের ভূম্যধিকারিগণের দৃষ্টি এই সমস্ত বিবরণ সংগ্রহে আকৃষ্ট হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

এতদঞ্চলে **দড়িস্বরূপপুর** নামক পল্লীতে পুলিশের একটি আউটপোস্ট আছে। ঐ সমস্ত পল্লী পাবনা হইতে বহুদূরে অবস্থিত বিধায় মোকদ্দমাকারিগণের পাবনা সদরে যাতায়াত

বিশেষ অসুবিধাজনক। শাহজাদপুরে ফৌজদারি আদালত এবং পাবনায় দেওয়ানি এলাকা নির্দিষ্ট থাকায় এই সমস্ত পল্লীর লোকের যে কি প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের তাহা বোধগম্য নহে। এক সময়ে বেড়ায় মহকুমা স্থাপনের কথা হইয়াছিল, তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। বোধহয়, মধ্যবর্তী স্থান ও চতুর্দিকস্থ দূরত্ব হিসাবে বেড়ায় মহকুমা স্থাপিত হইলে সর্বসাধারণের পক্ষে অনেক সুবিধা ঘটিতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—সুজানগর

সুজানগর—পাবনা হইতে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্বে পদ্মানদী তীরে অবস্থিত সুজানগর একটি প্রধান বন্দর। পূর্বে পদ্মা বাজারের অতি নিকট ছিল; বর্তমানে নদী প্রায় এক মাইল সরিয়া গিয়াছে। এখানে দেশিয় হিন্দু মুসলমান মহাজন ও আড়তদার ব্যতীত অনেক মারওয়াড়ি মহাজনদিগের কারবার আছে। সপ্তাহে রবিবার ও বুধবারে এখানে একটি বৃহৎ হাট লাগিয়া থাকে। পাট, ধান ও দেশিয় কারিকরের প্রস্তুত বহুবিধ কাপড় আমদানি হয়। দৈনিক বাজারে মৎস্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়।

এখানে পোস্টাফিস, সাবরেজেস্টারি অফিস, পুলিশ স্টেশন ও ডাকবাঙ্লা বর্তমান আছে। তাঁতিবন্দ জমিদারগণের কয়েক তরফের কয়েকটি কাছারি ও নাটোর রাজার কাছারি বর্তমান আছে। স্থানীয় অধিবাসী মধ্যে ভাদুড়ি, অধিকারী উপাধিক ব্রাহ্মণ, কর্মকার, হালদার এবং বাণিজ্যজীবী বহু সংখ্যক তিলি জাতির বাস। মুসলমান মধ্যে নিকারি এবং এই গ্রাম সংলগ্ন মাণিকদির গ্রামে বহু বস্ত্রবয়নকারী কারিকরের বাস। প্রবাদ মোঘল আমলে শাহ সুজা একদা ঢাকা গমন সময়ে পদ্মাতীরে এখানে কিয়ৎদিনের জন্য অবস্থান করেন, তখন হইতে এই স্থানের নাম সুজানগরে পরিণত হইয়াছে। এখানকার সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় ভাদুড়ি উপাধিক ব্রাহ্মণগণ এই বিগ্রহের সেবাইত। প্রবাদ সাধারণ বারইয়ারি কালী পূজা হইতে এই স্থানে কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। নলডাঙার রাজার সময় হইতে এই কালীবাড়িতে সেবা পূজা পরিচালন জন্য প্রায় এক হাজার বিঘা দেবত্র ভূমি এবং তরফ সুজানগর মৌজার প্রায় এক হাজার টাকা আদায়ের স্থাবর সম্পত্তি নির্দিষ্ট আছে। ভাদুড়ি বংশীয়গণ এখন পর্যন্ত তাঁতিবন্দ জমিদার মহাশয়দিগের অধীনে তাহা ভোগ করিতেছেন। চন্দ্রকান্ত আচার্য নামক সুজানগর থানার জনৈক দারোগা মহাশয়ের উদ্যোগে ও প্রযত্নে এই কালীবাড়ির মন্দিরাদির সংস্কার ও অনেক উন্নতি সাধন হয়। পূর্বে সুজানগরে কয়েকটি টোল ও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। এথাকার মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়টিকে বর্তমানে উচ্চ ইংরাজি স্কুলে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। সুজানগর বাজারে মারওয়াড়িদিগের একটি ঠাকুর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

পদ্মা নদী এখানে হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাওয়ায় এখানে সাধারণের জলকষ্ট বিশেষ অনুভূত হয়। এখানকার ধনাঢ্য কুণ্ডু বাবুদের বাটিস্থ পুকুরাদি সর্বসাধারণের ব্যবহার পক্ষে নিষিদ্ধ। গ্রামে জনৈক গণিকা কর্তৃক খনিত একটি ইন্দারা দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছে। পাবনা হইতে নাজিরগঞ্জ রোডে সুজানগর গোষানাদিতে যাতায়াত করা যায়। সম্প্রতি সকালে বিকালে পাবনা হইতে মোটরগাড়ি যাতায়াত করিতেছে।

সুজানগরের নিকটবর্তী চর তারাপুর নাটোর মহারাজার এলাকাভুক্ত। এই গ্রাম অতি বৃহৎ

পল্লী, ইহা ২০/২২টি পাড়ায় বিভক্ত। সুজানগর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে মথুরাপুর নামক গ্রামে মজুমদার, চক্রবর্তী উপাধিক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি হিন্দু এবং মুসলমানের বাস। এখানকার মজুমদারগণ বিশেষ কলহপ্রিয়।

সাতবারিয়া দিং—সুজানগর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে পদ্মাতীরে সাতবারিয়া একটি প্রধান বন্দর নাজিরগঞ্জ রোডের উপর অবস্থিত। সাধারণত কন্দর্পপুর, সিন্দুরপুর, ডাঙিপাড়া, ফকিৎপুর, সিংহনগর, তারাবারিয়া, হরিরামপুর নামক সাতটি পাড়া সাতবারিয়া বা সপ্তবাটিকা নামে পরিচিত হইত। ইহার কতকাংশ পদ্মানদীতে ভাঙিয়া গিয়াছে।

স্থানীয় অধিবাসী মধ্যে অধিকারী, আচার্য, মজুমদার আদি উপাধিক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বাণিজ্যজীবী বৈশ্য এবং মৎস্যজীবী হালদার উপাধিক বহু ধীরব জাতির এখানে বাস। এখানকার জালিক জাতিগণের অনেকে সমৃদ্ধ ; এবং উমেশচন্দ্র হালদার মহাশয় এম-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া স্কুল বিভাগে সরকারি কার্যে নিযুক্ত আছেন। বড় গোলা ও ছোট গোলা নামে পূর্বে সাতবারিয়াতে দুইটি বাজার বর্তমান ছিল ; এক্ষণে গ্রাম সহ বড় গোলা ভাঙিয়া গিয়াছে। বাজারে সাধারণের উদ্যোগে সমারোহে কালীপূজা হইয়া থাকে। পাট খরিদ বিক্রির জন্য সময় সময় ইংরাজ সওদাগরের কর্মচারিবৃন্দও এখানে আসিয়া থাকে। গ্রামটি পদ্মায় ভাঙিয়া যাওয়ায় নূতন স্থানে গ্রাম বসিতেছে। এখানে একটি পোস্টাফিস ও পাটনা সার্ভিসের স্টিমার স্টেশন আছে। ব্যবসায় হিসাবে সাতবারিয়া পূর্বে বিশেষ সমুন্নত ছিল, এখনও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ভাল, তবে নদীর গতি পরিবর্তন হেতু অনেক অসুবিধা হইয়াছে।

সাতবারিয়ার নিকটবর্তী **হেমরাজপুর, মোমরাজপুর (নিশ্চিন্তপুর), কাদোয়া** প্রভৃতি নামে কয়েকটি ভদ্র পল্লী বর্তমান আছে। হেমরাজপুর গ্রামটি আধুনিক। ইহা গঙ্গাগোবিন্দ মজুমদার নামক জনৈক কায়স্থ কর্তৃক গাজনার বিলের পশ্চিমদিকে প্রতিষ্ঠিত। তিনি নবাব সরকারে নলডাঙায় রাজার সহায়তা করিয়া নামমাত্র করে কয়েকটি মৌজার বন্দোবস্ত লয়েন এবং এতদঞ্চলে বাস করিবার অনুমতি পাইয়া এই গ্রাম স্থাপন করেন ; তদবধি এখানে বাস করিতে থাকেন। উত্তরকালে তদ্বংশীয়দিগের সহিত উক্ত রাজপরিবারের মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায়, নলডাঙা হইতে তাঁতিবন্দের জমিদারগণের সহিত এতদঞ্চলের সমুদয় ভূসম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। কালে কোন সময়ে তাঁতিবন্দের জমিদারগণের সহিত মজুমদার বংশীয়দের বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাঁতিবন্দ হইতে হেমরাজপুর আক্রান্ত হয় এবং মজুমদার বংশীয় সরকারদিগের বাটি লুণ্ঠিত হয় ; তৎকালে সরকার বাটিতে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ মূর্তিদ্বয় তাঁতিবন্দে স্থানান্তরিত হইয়াছিল ; অদ্যাবধি উক্ত বিগ্রহ তাঁতিবন্দে পূজিত হইতেছে। সরকার বাটিতে একটি পুরাতন শিবমন্দির বর্তমান আছে।

মোমরাজপুর প্রকাশ্য নিশ্চিন্তপুর একটি গণ্ডগ্রাম ; এখানে কুশীদ বাণিজ্যজীবী বৈশ্য জাতীয় মহাজন সংখ্যাই অধিক। গ্রামে একটি বাজার বর্তমান আছে। এখানে খেজুর গুড়ের উত্তম এবং এক সের পরিমাণ ওজনের ফেনী বাতাসা তৈয়ার হয়। এখানকার পোদ্দার উপাধিক বৈশ্য জাতীয় অনেকে কুশীদ বাণিজ্য দ্বারা বিশেষ ধনশালী হইয়াছেন।

কাদোয়া গ্রাম কুড়ি কাদোয়া, বড় কাদোয়া, কিস্তি কাদোয়া ও জোত কাদোয়া এই কয়েকটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত এবং জমিদারগণের সেরেস্তায় হুদা কাদোয়া নামে পরিচিত। গ্রামটি প্রাচীন ; এখানে অনেকগুলি প্রাচীন দীর্ঘিকা বর্তমান আছে। পূর্বে এখানে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও তান্ত্রিক সাধকগণের বাস ছিল। এথাকার স্বনাম খ্যাত স্বর্গীয় তিতু ভুএগ্রা মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারের চাকরি করিয়া সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন। তিনি এখানে রায়, পাল, গোঁসাই, চক্রবর্তী আদি বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসিগণ আনিয়া গ্রামে স্থাপনপূর্বক গ্রামের উন্নতি সাধন করেন। কাদোয়ার গোস্বামী পরিবারের স্বর্গীয় কানাইলাল গোস্বামী মহাশয় কবি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

কবি কানাইলালের অন্যান্য কবিতা মধ্যে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তরুণ জ্বরের রোগী যদি কলা মিঠাই খায়।
পেটে তার পিলে জন্মে থাকে নাভির বাঁয়।।
হাত পাও জ্বালা করে কামড়ায় দুই হাটু।
চোক মুখ পুড়ে যায় পেছাব করে কটু।।
হয় কথা লয় করে ঘন খায় পাণি।
বাত পিত্ত জ্বরের কথা কয় যে গুমানি।।
লেচকের পরে যদি রুগী হা করে।
ঝাড়া ফেরার গুবজু ভূমিত যদি বেঙ্গা ধরে।।
নিঝুম মারে থাকে পরে ডাক্‌লি না দেয় সাড়া।
নয়ান দুটি রক্তিমাকার আসমানের তারা।।
কুড়ান বলে জুড়ান ভাই এই যুক্তি সার।
দনে' ছাড়ে চল্ল রুগী দাওয়াই খাওয়াই কার।।

এখানকার মৈত্র বংশে এক সময়ে বাইশ জন কৃতি সন্তান বিদ্যমান ছিলেন। সে জন্য ঐ বংশটি বাইশ কলমের বংশ বলিয়া পরিচিত হইত। উক্ত বংশ এক্ষণে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। কাদোয়া গ্রামে কালী বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় পাঠশালা এবং নৈশ বিদ্যালয় বর্তমান আছে। এখানে সাপ্তাহিক একটি হাট আছে। কালীবাড়িতে বার্ষিক অতি সমারোহে দোলোৎসব হয়। এই গ্রামের রায় পরিবারস্থ রামচন্দ্র রায় মহাশয় জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক এবং তিনি কয়েকখানি ডাক্তারি বহি প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদঞ্চলের অনেক কাজে তিনি অগ্রণী।

সাতবাড়িয়া হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে নাজিরগঞ্জ রোডের তীরে অবস্থিত **রাইপুর খেতুপাড়া** একটি প্রাচীন পল্লী। খেতুপাড়া গ্রামে এক সময়ে সদর আমিনের কোর্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত কোর্ট স্থানান্তরিত হইয়া পাবনায় মুন্সেফ কোর্টাদি দেওয়ানি বিচারালয় ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ওই খেতুপাড়া, গোলাবাড়ি খেতুপাড়া হইতে পৃথক করিবার জন্য রাইপুর এখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্তী হইলেও উভয় গ্রাম একত্রে রাইপুর খেতুপাড়া নামে পরিচিত হয়। রাইপুরে এক সময়ে বাগছি আদি বহু ব্রাহ্মণগণের বাস ছিল। খেতুপাড়ায় শিকদার, পাট্টাদার আদি উপাধিক বঙ্গজ কায়স্থগণের বাস আছে। নিকটবর্তী মালিফা গ্রামেও সেন উপাধিক কায়স্থগণ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। এখানে মহারাজা মনীন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের কাছারি বর্তমান আছে।

নিকটবর্তী ফকিৎপুর গ্রাম প্রায় ৩০/৩৫ ঘর নমঃশূদ্র জাতির বাস। এথাকার সরদার উপাধিক জনৈক নমঃশূদ্র পরিবারের বাটিতে দুর্গোৎসবের প্রতিমার সমস্ত মূর্তিগুলির যোদ্ধৃবেশের বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। তাঁতিবন্দের বিজয়বাবুর স্টেট হইতে ইহাদের বাটিতে দুর্গোৎসবের জন্য কয়েক পাখি জমি নিদ্ধব নির্দিষ্ট আছে।

নাজিরগঞ্জ দিং—পাবনা হইতে দক্ষিণ পূর্বাংশে প্রায় ২৪ মাইল দূরে সুজানগর নাজিরগঞ্জ রোডের উপর পদ্মা তীরে অবিস্থত নাজিরগঞ্জ একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। প্রকাশ ইংরেজ রাজত্বকালের প্রাক্কালে তারপুল্যা নামক নাটোর কালেক্টরির জনৈক নাজির কর্তৃক স্থাপিত গ্রাম জন্য ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। পূর্বে এখানে একটি প্রধান নীলকুঠি ছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। বর্তমানে সাপ্তাহিক সোমবারে ও শুক্রবারে হাট বসিয়া থাকে। শুক্রবারের হাটে গো-মহিষাদি আমদানি হয়। এখানকার বাজারে ধান, পাট, মটর কলাই প্রভৃতি পাওয়া যায়। কয়েকজন মহাজনের দোকান এবং সাগরকান্দি ও তাঁতিবন্দের

জমিদারগণের কাছারি বাড়ি বর্তমান আছে। সাধারণের উদ্যোগে বাজারে বারইয়ারি শারদীয় দুর্গোৎসব পূজায় মেলা ও গীত বাদ্যাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

নাজিরগঞ্জের পূর্বাংশ সংলগ্ন **বরখাঁপুর** একটি প্রাচীন গ্রাম। এথাকার দোবে উপাধিক ভূস্বামীগণ বহুদিন হইতে এখানে প্রসিদ্ধ। দোবে, তেওয়ারি প্রভৃতি উপাধিক কয়েকঘর পশ্চিমা ব্রাহ্মণ বহুদিন হইতে এখানে বাস করিতেছেন। ইহাদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাবীরের গাছ নামে একটি বট বৃক্ষ সাধারণ কর্তৃক সসম্মানে পূজিত হইয়া থাকে। এখানে একটি বৃক্ষতলে পূর্বে মুসলমানদিগের গাড়ির বাঁশ নামান হইত। এতদুপলক্ষে মেলাদির অনুষ্ঠান হইত ; এখন আর গাজির বাঁশ এদেশে বড় উঠিতে দেখা যায় না। বরখাপুর নাম সাদৃশ্য হেতু কেহ কেহ এই গ্রামকে বরখান গাজি কর্তৃক বা অহার সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করেন।

বরখাপুরের জোয়াদ্দার উপাধিক কায়স্থ বংশীয় বাঞ্ছারাম জোয়াদ্দার নামক এক ব্যক্তি ডাকাইতি উপলক্ষে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এতদঞ্চলেও পূর্বে গামছামোড়া দলের প্রাদুর্ভাব ছিল। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব পণ্ডিত কুঞ্জলাল গুপ্ত প্রণীত "মধুকপো বা জীবনযজ্ঞ" নামক পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠায় এই গ্রামের বাঞ্ছারাম জোয়াদ্দার সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে—"বাঞ্ছারাম বড়লোকের সাজসজ্জায় একখানি পানসি নৌকায় থাকিত তাহার আসবাব দেখিয়া একজন বড়লোক বলিয়া বোধ হইত। ... বাঞ্ছারাম যাত্রীদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য খুব বাবুয়ানা চালে চলিত।" শিবপুরের মৈত্রদিগের ন্যায় ইহারাও গামছামোড়া দিয়া এবং হরিলুট দিবার ভান করিয়া জলপথে যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত।

ডাকাইতেরা লোককে প্রতারিত করিবার জন্য অন্য এক কৌশল বিস্তার করিত। জানা যায় "একজন থালীদারের নাম ছিল ফকিরচাঁদ বণিক। বাড়ি ছিল গোবিন্দপুর (সাগরকান্দির নিকটে) তখন দেশে বিলাতি ঘুন্‌সি ছিল না। সোণের সুতা কাল করিয়া তাহাতে গাবের আটা দিয়া পাকা রং করিয়া বেণেরা বিক্রি করিত। ইতর ভদ্র তাহাই কোমরে দিত। ফকিরচাঁদ ডাকাইতির স্থানের নিকট এক নৌকা লইয়া রাত্রিতে অপেক্ষা করিত এবং নৌকায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জেলেদের ন্যায় ঘুনসির সুতী পাকাইত। কেঁহ যদি জিজ্ঞাসা করিত এ কাহার নৌকা, সে উত্তরে বলিত, ফকিরচাঁদ হালদারের নৌকা। লোকে মনে করিত জেলেরা নৌকা ভাড়া খাটিয়া যাইতেছে।"

"বাঞ্ছারাম হুগলি জেলে থাকিত। পূজার ২/১ মাস পূর্বে আরও ডাকাইত ধরাইয়া দিব বলিয়া স্বগ্রামে আসিত এবং অনেক ধনী লোককে ভয় দেখাইয়া কিছু আদায় করিয়া সেই টাকায় আমোদ আহ্লাদ করিয়া পূজার পর আবার হুগলিতে যাইত।"

নাজিরগঞ্জে নিকটবর্তী **হাটখালি** নামক পল্লী লাঠিয়াল জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার অনেক মুসলমান এখনও অনেক জমিদার গৃহে লাঠিয়াল সরদার স্বরূপে চাকরি করিয়া থাকে। পূর্বে এখনকার হিন্দু মুসলমান উভয় জাতি মধ্যেই অনেক লাঠি খেলায় সিদ্ধহস্ত ছিল।

হাসামপুর গ্রাম নাজিরগঞ্জের পূর্ব সীমা সংলগ্ন। এখানে ঘোষ ও বসু উপাধিক কয়েক ঘর প্রসিদ্ধ বঙ্গজ কায়স্থ ও মুসলমানের বাস। এই সমস্তপল্লী এককালে পদ্মার তীরে অবস্থিত ছিল ; এক্ষণে নদী অনেকদূরে সরিয়া গিয়াছে। এতদঞ্চলের রাস্তাদির,অবস্থা অতীব শোচনীয়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্তৃপক্ষ ও সাধারণের দৃষ্টি এই সকল পথের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। সামান্য ব্যয়ে এই অভাব অভিযোগের নিরাকরণ হইতে পারে। কেবল উদ্যোগহীনতার অভাবেই লোকে গতায়াতে কষ্ট পায়।

নাজিরগঞ্জ হইতে এক মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত **কামারহাট** একটি ভদ্র পল্লী. এখানে বিশ্বাস. ভৌমিক, উপাধিক কায়স্থ জাতির বাস। ব্যবসায়ী জাতির মধ্যে এখানে সাহা, পোদ্দার উপাধিক বহু বৈশ্য জাতির বাস। এখানে সাধারণের উদ্যোগে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বার্ষিক বারইয়ারি পূজা উপলক্ষে আমোদ উৎসব ব্যতীত এখানে দৈনিক পূজা হইয়া থাকে।

সাগরকান্দি—সাধারণত বড়ুরিয়া, গোয়ালকান্দি, গোবিন্দপুর, সাগরকান্দি প্রভৃতি ৩/৪টি পরস্পর সংলগ্ন পল্লী বা পাড়া এক সাগরকান্দি নামে পরিচিত ও পাবনা সদর স্টেশন হইতে প্রায় ২৭ মাইল পূর্বে নাজিরগঞ্জ মথুরা রোডের উপর অবস্থিত। সাগরকান্দি গ্রামে ৫০/৫২ ঘর বস্ত্র বয়নকারী কারিকরের বাস। দৈনিক বাজারে অনেক কাপড় আমদানি হয়। উপরোক্ত কয়েকটি পল্লীতে অধুনা বাণিজ্য ব্যবসায়ী প্রায় তিন শতাধিক তিলি জাতীয় মহাজনের বাস, ইহারা সকলেই কুশীদ বাণিজ্যাদিতে লিপ্ত। বড়ুরিয়া নামক পাড়ায় পোদ্দার সাহা উপাধিক অনেক মহাজনের বাস। পদ্মা তীরস্থ এই গ্রামে ব্যবসায়ী জাতির বাস দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সাগরকান্দি এক সময়ে প্রকৃতই বৃহৎ নদী বা সাগরতীববর্তী একটি প্রধান বন্দর ছিল। এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক এবং প্রতিমা চিত্রকর বহু পালের বাস আছে। সাগরকান্দির দত্ত উপাধিক বঙ্গজ কায়স্থ জমিদারবংশ এতদঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী। এই দত্ত পরিবারের বিবরণে জানিতে পারা যায়—ইহাদের পূর্বপুরুষ স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, গুরুচরণ দত্ত প্রভৃতি ইস্টার্ন বেঙ্গল রেল লাইন নির্মাণকালে কনট্রাক্টারি আদি কার্য করিয়া অনেক অর্থ উপার্জন করেন এবং তখন হইতে ইহারা অনেক স্থাবর সম্পত্তি খরিদ করিয়া জমিদার বলিয়া গণ্য হয়েন। প্রজা বিদ্রোহকালে এই জমিদার গৃহে অনেক অত্যাচার হয় বলিয়া প্রকাশ। গোবিন্দবাবুর দৌহিত্রগণ কলিকাতার সম্পত্তি লইয়া এখানকার সম্পত্তির অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে স্বর্গীয় গুরুচরণ দত্ত ও তদীয় ভ্রাতা জানকীনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয়ের পুত্রগণই সাগরকান্দির দত্ত জমিদার বলিয়া পরিচিত। জানকিবাবুর পুত্রগণের মধ্যে অনাদিকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে এই গ্রাম একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় অতিথি সেবাদির সুবন্দোবস্ত আছে। অনাদিবাবুর কনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন।

গোবিন্দপুরের কুণ্ডু পরিবার মধ্যে স্বর্গীয় অনুকূল কুণ্ডু মহাশয়েঃ ন্যায় দানশীল ও মহানুভব ব্যক্তি এতদঞ্চলে অতি অল্প পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এই পাড়ায় সান্যাল, ভাদুড়ি আদি ব্রাহ্মণ, দাস, দত্ত, উপাধিক কায়স্থ, কুণ্ডু ও অনেকগুলি গন্ধবণিক জাতির বাস। বড়ুরিয়া নামক পাড়ায় সেন, শিকদার উপাধিক অনেক কায়স্থ পরিবারেরও বাস। সাগরকান্দিব ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় পাবনা ও নিকটবর্তী অনেক জেলায় একজন প্রসিদ্ধ কবিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ত্রিপুরা আগরতলাদিতে তাহার বিশেষ সম্মান ছিল। তদীয় পুত্র ও পৌত্রগণ এখনও কবিদার ও কীর্তনীয়া বলিয়া পরিচিত। তাহারা কেহ এখানে এবং কেহ সিন্দুরী গ্রামে গিয়া বাস করিতেছেন।

সাগরকান্দি হইতে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে **সোলাকুড়া, সাগতা, বাগলপুর** প্রভৃতি পল্লী বিল গণ্ডহস্তীর পূর্ব দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এই সমস্ত গ্রাম দাস, পাল, সরকার, ঘোষ প্রভৃতি উপাধিক বহু বঙ্গজ কায়স্থগণের বাস। এই সকল গ্রামে ও রাণীনগর বাদাই প্রভৃতি গ্রামে বহু কাপালিক জাতির বাস আছে। ইহাদের অধিকাংশই বর্তমানে চাষ আবাদ কার্যে লিপ্ত। অনেকে পূর্বে বস্ত্রশিল্পজীবী ছিল। এখন পর্যন্তও অনেকে পাট দ্বারা দেশিয় প্রথার উত্তম চট ও ছালা তৈয়ার করে। এতদঞ্চলে বাদাই একটি প্রসিদ্ধ হাট বা বন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে সোমবার ও শুক্রবারে একটি বৃহৎ হাট বসিয়া থাকে। বিলগণ্ডহস্তী মধ্যে সারিরভিটা নামে কয়েকটি উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপে আজকাল অনেক বসতি হইয়াছে।

খলিলপুর—নাজিরগঞ্জ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে খলিলপুরে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, পোস্টাফিস এবং সাপ্তাহিক রবিবার ও বৃহস্পতিবারে হাট আছে। এথাকার মহিমচন্দ্র গুহ জোয়াদ্দার মহাশয় গোয়ালিয়র, বৃন্দাবনে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তদীয় ভ্রাতস্পুত্র হরেন্দ্রনাথ জোয়াদ্দার এক্ষণেও তথায় ইঞ্জিনিয়ার পদে কার্য করিতেছেন। পূর্বে খলিলপুর ফরিদপুর জেলার মানিকদহ নিবাসী বিপিনচন্দ্র রায় মহাশয়ের এলাকাভুক্ত ছিল।

বর্তমানে বিগত কয়েকবৎসর হইল তদীয় জমিদারি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চৌদ্দরশি নিবাসী রমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় খরিদ করিয়াছেন। নূতন মালেকগণ সহ এথাকার প্রজা সাধারণের নানারূপ মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়া পরিশেষে পুলিশের গুলিতে এথাকার কয়েকজন প্রজা নিহত হয়। সম্প্রতি উক্ত বিবাদ অনেকাংশে মীমাংসা হইতেছে।

দুলাই—পাবনা সদর স্টেশন হইতে প্রায় ১৯ মাইল পূর্বাংশে মথুরা প্রান্তের উপর বিলগণ্ডহস্তী বা গাজনা বিলের উত্তর পারে অবস্থিত দুলাই একটি সুবৃহৎ পল্লী। এখানে পূর্বে পুলিশ স্টেশন ছিল, তাহা উঠাইয়া মথুরায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। অতি পূর্বে এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় বর্তমান ছিল, তাহা এখন উঠিয়া গিয়াছে। বর্তমানে অধিবাসী সংখ্যা মধ্যে কতকগুলি বস্ত্র শিল্পজীবী কারিকর, চাষী গৃহস্থ এবং কয়েক ঘর বাণিজ্যজীবী, সাহা, মালাকর, কৈবর্তাদি হিন্দুর বাস আছে। গ্রামে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে সাপ্তাহিক একটি হাট আছে। পূর্বে ইহা অতি প্রসিদ্ধ হাট বলিয়া পরিগণিত ছিল। বর্তমানে এখানে একটি ডাকবাঙলা আছে। পূর্বে একটি সাবরেজেস্টারি অফিস ছিল, তাহা সুজানগরে উঠিয়া গিয়াছে।

গ্রামটি অতি বৃহৎ। এখানকার ন্যায় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সুন্দর রাস্তা পল্লী গ্রামের কুত্রাপি সহসা দৃষ্টি গোচর হয় না। এমন কি ভাদ্র মাসেও কাঁচা রাস্তায় ঘোড়া গাড়ি যাতায়াতে কোন অসুবিধা হয় না। ক্রমে এই সকল রাস্তা জঙ্গলাদিতে আচ্ছন্ন হইতেছে। মালিকগণের মধ্যে অনেকেই এই গ্রাম পরিত্যাগ করায় গ্রামটি একেবারে হতশ্রী হইয়াছে এবং সর্ব বিষয়ে ইহার অবনতি ঘটিতেছে।

দুলাই গ্রাম পাবনা জেলার বর্তমান সময়ের একমাত্র মুসলমান ভূম্যধিকারী সুপ্রসিদ্ধ আজিমদ্দিন চৌধুরী সাহেবের নিবাসস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ। এথাকার জমিদার বাটির ন্যায় বাস ভবন এই জেলার কোন ভূস্বামির ছিল না ও নাই। ইহা প্রাচীন রাজা বাদশাহের আবাসস্থলের ন্যায় চতুর্দিকে জলরাশি পরিপূর্ণ পরিখা বেষ্টিত : প্রবেশ পথের সম্মুখে দুই দিকে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণভূমি ও ফুলের বাগান ; তৎপর নহবৎখানা সম্বলিত সিংহদ্বার, তথায় দুই দিকে দুইটি কামান রক্ষিত। তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই উপাসনার জন্য মসজিদ এবং নাতি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। তাহার পার্শ্বে বাটির অন্যান্য অংশ এবং কাছারি বাটি আদি। এবম্প্রকার শৃঙ্খলাবদ্ধ সমৃদ্ধিশালী বাসস্থল যে মালিকগণের অনুপস্থিতি হেতু ক্রমে জঙ্গলাদিতে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা দেখিলে দর্শকেরই কষ্টানুভব হয়।

এই গ্রামের অনেক অংশ জঙ্গলাদিতে পরিপূর্ণ। দিবাভাগে যাতায়াতে ভয়ের সঞ্চার হয়। গ্রামের মালিক চৌধুরী বংশীয় অনেকেই পাবনা ও স্থানান্তরে বাস করেন। গ্রামের কোন উন্নতির জন্য ইহারা সবিশেষ চেষ্টিত নহেন। জলাশয় মধ্যে কয়েকটি পুষ্করিণী ব্যতীত আত্রাই নামক নদীর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। এখানে ভিন্ন স্থান হইতে অধিবাসী আনিয়া স্থাপন করিলে ও জঙ্গলাদি কাটার ব্যবস্থা করিলে গ্রামের অনেক উন্নতি হইতে পারে।

দুলাই হইতে প্রায় দুইক্রোশ পশ্চিমে জোড়পুকুরিয়া নামক পল্লীতে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি হিন্দু জাতির বাস আছে। এখানকার ভৌমিক উপাধিক ব্রাহ্মণ বংশ সবিশেষ প্রসিদ্ধ ; ইহাদের অনেকে পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত আছেন। এই পরিবাক বামাচরণ ভৌমিক মহাশয় পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন। সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তদীয় ভ্রাতম্পুত্র হেমচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় অধুনা পাবনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। এই বংশীয় কেহ কেহ আজকাল আবগারি বিভাগ হইতে লাইসেন্স লইয়া এই জেলার স্থানে স্থানে মদ গাঁজাদি বিক্রয়ের কারবার আরম্ভ করিয়াছেন।

তাঁতিবন্দ—পাবনা হইতে ১২ মাইল পূর্বে মথুরা রোডের উপর অবস্থিত তাঁতিবন্দ পাবনা জেলার মধ্যে একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্র পল্লী। এখানকার চৌধুরী উপাধিক বারেন্দ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ জমিদার বংশ পাবনা জেলা মধ্যে সাতিশয় প্রসিদ্ধ। পূর্বে এখানে বহু বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়

জাতির বাস ছিল, সম্ভবত তজ্জন্য তাঁতির বন্দর বা তাঁতিবন্দ বলিয়া এই গ্রামের এরূপ নামকরণ হইয়াছে। প্রবাদ এক সময়ে এখানকার তন্তুবায়গণ ঢাকা মসলিন অপেক্ষাও অধিক মিহি (চিক্কণ) চাদর প্রস্তুত করিতে পারিত। অধুনা এখান হইতে তন্তুবায় সম্প্রদায় একেবারে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

এই গ্রামের লাহিড়ী, মৈত্র, বাগছি, রায় আদি উপাধিক ব্রাহ্মণগণ সকলেই চৌধুরী জমিদারগণ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এখানে আনীত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত এখানে কায়স্থ, মালাকর, কৈবর্তাদি নানা জাতীয় হিন্দু এবং মুসলমানের বাস আছে।

ভারেঙ্গার ন্যায় পাবনা জেলা মধ্যে এথাকার অনেকেই সুশিক্ষিত। পূর্বে এখানে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু এথাকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অমনোযোগিতা হেতু এবং উপযুক্ত ছাত্র সংখ্যা অভাব প্রযুক্ত তাহা উঠিয়া গিয়াছে। অধুনা একটি মধ্য ইংরাজি স্কুল বর্তমান আছে।

গঙ্গাসাগর, দুর্গাসাগর নামে জলাশয় এবং দৈনিক একটি ছোট বাজার, পোস্টাফিস, দাতব্য চিকিৎসালয় বর্তমান আছে। এথাকার শারদীয় দুর্গোৎসবে বিজয়বাবুর সময়ে বিশেষ সমারোহ হইত। নিম্নলিখিত কবিতাংশে তাঁতিবন্দের অনেক বিষয়ের বিবরণ জানিতে পাওয়া যায়।

তাঁতিবন্দের ঐক্য। মহেশ চৌধুরীর বাক্য।।
ধরলা বিলের ব্যাঙ্। পূর্ণ মৌলিকের ঠ্যাঙ্।।
বিজয়বাবুর ঘড়ি। রাধানাথ কবিরাজের বড়ি।।
ঈশ্বর অধিকারীর জপের মালা। বিশ্বাস করে কোন্ শালা।।

তাঁতিবন্দের ছোট ও বড় দুইটি দোলমঞ্চ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উভয় মঞ্চদ্বয়ই ইষ্টক নির্মিত। বড়টি গুরুগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক ১২৫০ এবং ছোটটি ১২৪৮ সালে বরদাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়দিগের কর্তৃক নির্মিত হয়, তাহা উক্ত মঞ্চদ্বয়ের গাত্রের খোদিত লিপি দৃষ্টে জানা যায়। যথা—

বড় দোলমঞ্চ—শকাব্দা ১৭৬৫ সন ১২৫০ বিখ্যাতোপেন্দ্র পৌত্রেণ গঙ্গাগোবিন্দ সুনুনা নির্মমে গুরুগোবিন্দ শর্মণোপেন্দ্রমন্দিরম্।

ছোট দোলমঞ্চ—শকাব্দা ১৭৬৩ সন ১২৪৮ তারিখ ১৭ শাকের বহ্নি সিন্ধুক্ষিতি পরিমিতে কার্তিকে কারু বাল বোধিযুও পদাম্বুজ যশমনং বেদবৃন্দে সুরাধ্যেঃ শ্রীআরাধনেন...... শ্রীগোবিন্দ শর্মণঃ সুখনাশ বরদা নির্ম্মমে মন্দির গঙ্গাগোবিন্দ সুন্দর দিনয়াচিত সুন্দর সুপ্রাসাদাৎ শ্রীমাধবঃ।

চৌধুরী বংশীয় স্বর্গীয় বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের সময়ে তাঁতিবন্দ শারদীয় দুর্গোৎসব জন্য সবিশেষ বিখ্যাত ছিল। তাহার সময়েই পাবনা জেলার এই ক্ষুদ্র পল্লীতে ভারতের তদানীন্তন রাজ প্রতিনিধি **লর্ড মেও** সাহেব বাহাদুরের শুভাগমন হইয়াছিল। এথাকার অধিবাসিগণ পূর্বে পরম সুখে ও নানারূপ আনন্দোৎসবে কালাতিপাত করিত। বর্তমানে এখানকার লাহিড়ী, চৌধুরী আদি শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের সকলেই পাবনা টাউনে ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করায় তাঁতিবন্দ গ্রামের অবস্থা দৈনন্দিন শোচনীয় হইতেছে। তজ্জন্য "পরিত্যক্ত পল্লী" প্রণেতা এথাকার শ্রীমন্তনাথ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"গ্রাম্য পথে চলে নাকো গজ-তুরঙ্গম
জাগরিত নাহি হয় জন কোলাহলে।
সঙ্গীহারা পথগুলি যেন একে একে পড়েছে ঘুমায়ে।
প্রকৃতি করুণা করি যেন ঢাকিয়াছে লতাগুল্ম দিয়ে।

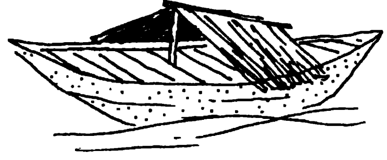
ভয়ে ভয়ে চলে নর কভু দিবাভাগে ;
দুর্বল মলিন কান্তি তা'রা, জীর্ণ শীর্ণ ম্যালেরিয়া জ্বরে।"

তথ্যসূত্র

১. *এই আশ্রম সম্বন্ধীয় উপরিউক্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাদির উদ্ভাবন এবং নানাবিধ তথ্যাদির আবিষ্কারাদির বিষয় সমস্তই ঠাকুর মহাশয়ের সহোদর ভ্রাতা পাবনার উকিল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের অনুগ্রহে তৎকর্তৃক প্রদত্ত লিখিত বিবরণী হইতে সংগৃহীত ও বিবৃত হইল।*

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিরাজগঞ্জ মহকুমা



প্রথম পরিচ্ছেদ—সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ ঃ

পাবনা জেলার একমাত্র মহকুমার কেন্দ্রস্থল সিরাজগঞ্জ ২৪° ২৬' ৫৮" উত্তর অক্ষরেখা ও ৮৯° ৪৭' ৫" পূর্ব দ্রাঘিমায় যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) নদীর তীরে অবস্থিত। বারিপাতের পরিমাণ সিরাজগঞ্জে প্রায় ১১৮ ইঞ্চি। বায়ু মণ্ডলের উষ্ণতা সর্বোচ্চ ৯৪ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ৫১ ডিগ্রি।

গোয়ালন্দ হইতে স্টিমার যোগে এবং কলিকাতা হইতে পূর্ববঙ্গ রেলপথে দার্জিলিং হিমালয় লাইনের ঈশ্বরদি নামক জংশন হইতে সাঁড়া সিরাজগঞ্জ যাতায়াতে সুবিধা। কলিকাতা হইতে সিরাজগঞ্জ ঘাট স্টেশন রেলপথে ১৯৭ মাইল দূর ; তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৩৶৫ এবং ঈশ্বরদি জংশন হইতে সিরাজগঞ্জ বাজার ৫১ মাইল দূর। সিরাজগঞ্জ টাউনে সিরাজগঞ্জ (রাইপুর) সিরাজগঞ্জ বাজার, সিরাজগঞ্জ কোর্ট এবং সিরাজগঞ্জ ঘাট বা কোল বন্দর নামে চারটি রেলওয়ে স্টেশন বর্তমান আছে। ইহার মধ্যে বাজার স্টেশনটি সর্বসাধারণের যাতায়াত পক্ষে সুবিধাজনক, কিন্তু স্টেশনটির উন্নতির জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির একান্ত অভাব।

বেলকুচির স্বনামধন্য মুসলমান জমিদার স্বর্গীয় সিরাজালী চৌধুরী সাহেব কর্তৃক বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতিকল্পে সর্বপ্রথমে তদীয় নামানুসারে বেলকুচির সান্নিধ্যে সিরাজগঞ্জ বন্দর স্থাপিত হয়। তিনি বহু ত্যাগ স্বীকার করতঃ অতি অল্প খাজানায় স্থান প্রদান করিয়া ভিন্ন স্থান হইতে বহু মারওয়াড়ি মহাজন আনিয়া এখানে স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭৭৮/৭৯ অব্দের মেজর রেনেল কৃত মানচিত্রে সিরাজগঞ্জের উল্লেখ নাই, তাহাতে বেলকুচি গ্রামই বৃহদাকারে প্রদর্শিত হইয়াছে ; উহাতে যমুনা নামক নদীও তাহার প্রায় ৪/৫ ক্রোশ পূর্ব দিক্ দিয়া প্রবাহিত ছিল দেখা যায়। বর্তমানে বেলকুচির আসল অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। দেলুয়া ও সোহাগপুর গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত পুলিশ স্টেশনে ও দেলুয়ায় অবস্থিত পোস্টাফিসের নামে মাত্র ইহার নাম জাগরূক রাখিয়াছে। তখন জিনাই নামক একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বেলকুচির নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। কালক্রমে যমুনা নদী ধীরে ধীরে পাবনা জেলার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই নদীর বিবরণে জানিতে পারা যায় ইহা ১৮০৯ হইতে ১৮৩০ অব্দ মধ্যে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে এবং ক্রমে পাবনা জেলার দিকে আসিয়াছে। সুতরাং ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের পর হইতে সিরাজগঞ্জ বন্দর প্রতিষ্ঠার সময় ধরা যাইতে পারে।

প্রথম বন্দর বর্তমান বন্দর হইতে প্রায় ৩/৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ক্রমশ যমুনা নদীর গতি পরিবর্তন হেতু সরিয়া দুইবার ভাঙিবার পর বর্তমান ভূতেরদিয়ার নামক স্থানে এই তৃতীয় বন্দর স্থাপিত হইয়াছে। সমস্ত বন্দরটি নদীর দিয়ারা জমির উপর স্থাপিত। এখন পর্যন্ত ইহার পশ্চিম সীমা দিয়ার বৈদ্যনাথ নামে পরিচিত। সুতরাং স্থান হিসাবে সিরাজগঞ্জ অতিশয় প্রাচীন নহে বা এখানে অতি প্রাচীনত্ব সূচক কিছুই নাই। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যে

অত্যধিক উন্নতি হেতু সিরাজগঞ্জের নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূর্বতন প্রথম প্রতিষ্ঠিত বন্দরটি প্রায় যমুনা নদীর অপর পারে বা নদীগর্ভে পতিত হইয়াছে।

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জ থানা মৈমনসিংহ হইতে পাবনা জেলায় সামিল হয়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে মৈমনসিংহ হইতে কতকগুলি মৌজা পৃথক করিয়া সিরাজগঞ্জে প্রথমে একটি মহকুমার সদর স্টেশন স্থাপিত হয়। ১৮৬৯ অব্দের ১ এপ্রিল হইতে এখানে সর্বপ্রথম মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হইয়াছে। ১৮৭৫ অব্দে মৈমনসিংহ হইতে আরও ৬৫০ মৌজা সিরাজগঞ্জের সীমাভুক্ত হয়।

সিরাজগঞ্জ সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত ; সিরাজগঞ্জ টাউন বা **টানবন্দর** এবং তথা হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে যমুনা তীরে অবস্থিত **কোল বন্দর**। টাউন বা টানবন্দর ধানবাধির নদীর পূর্বপারে ধানবাঁধি ও আমলাপাড়া এবং নদীর পশ্চিমপারে গঞ্জ, এই দুই ভাগে নদীর দ্বারা বিভক্ত। ধানবাঁধি ও গঞ্জ উভয় পারেই ব্যবসায়িগণের দোকান আড়তাদি ও বাজার বিদ্যমান আছে, তবে গঞ্জেই অনেকানেক বড় বড় মহাজনের গদিবাটি ও আড়তাদি বর্তমান আছে, ধানবাধিতে দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দোকানাদি অবস্থিত মাত্র। বর্ষা সময়ে আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন পর্যন্ত সিরাজগঞ্জের যাবতীয় মহাজনী কারবারও বাণিজ্যাদি গঞ্জে নির্বাহিত হয় ; কার্তিক হইতে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস পর্যন্ত নদী শুকাইয়া যায় সেজন্য বাণিজ্য ঘটিত সমস্ত কারবার কোলবন্দরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত প্রতিবৎসর মহাজনদিগকে তথায় অস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণ করিতে হয়। কোলবন্দরেও প্রতিবৎসর দৈনিক বাজারাদি স্থাপিত হয় ; তথায় কোন মিউনিসিপ্যালিটি আদির বিশেষ বন্দোবস্ত হয় না। স্টিমার হইতে মাল পত্রাদি ও যাত্রিগণের অবতরণ জন্য অস্থায়ী স্টেশন ও মাল গুদামাদি বার্ষিক নির্মিত হয় এবং কখন কখন তাহাও সাময়িক পরিবর্তন করিতে হয়।

কোলবন্দর হইতে প্রায় ৫ পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত বর্তমানে টাউনের **পরিমাণ** প্রায় ১১ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে কুড়িপাড়া, খোকসাবাড়ি পূর্বে যমুনা নদী ; দক্ষিণে কান্দাপাড়া, রামগাতি ; পশ্চিমে ফুলবাড়ি, দিয়ার বৈদ্যনাথ প্রভৃতি। অধিবাসী সংখ্যা ১৮৭১/৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৮৮৭৩ জন ছিল, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে উহা ২৪৭৭৭ জন হইয়াছিল, এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ২৫৫১৮ জন হইয়াছে।

	১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ			১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ		
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	৮২০০	৫০৯৮	৩১৪২	১০৩৩৬	৬০৫১	৪২৮৫
মুসলমান	১০৬৫৪	৫২১৬	৫৪৩৮	১৪৯৯৬	৭৫৪৪	৭৪৫২
খ্রিস্টান	১৩	১৩	—	৩৭	২৩	১৪
ব্রাহ্ম	০	০	০	১৪২	১৩৩	৯
অন্যান্য	৬	৬	—	৭	৫	২
	১৮৮৭৩	১০৩৩৩	৮৫৪০	২৫৫১৮	১৩৭৫৬	১১৭৬২

সিরাজগঞ্জ টাউন আধুনিককালে বাণিজ্য প্রসাদে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে সুতরাং এথাকার প্রাচীন স্থায়ী অধিবাসী কেহই নহে। হিন্দু মুসলমান অধিকাংশ লোকেরা ভিন্ন স্থান হইতে বিষয় কার্য ও ব্যবসায়াদি উপলক্ষে আসিয়া কালক্রমে এখানে স্থায়ী হইয়াছেন। সিরাজগঞ্জ বন্দরে হিন্দু অধিবাসীগণ মধ্যে বাণিজ্যজীবী রায়, প্রামাণিক, সাহা উপাধিক বৈশ্য জাতীয় মহাজন ও বণিক জাতি এখানে সর্বাপেক্ষা বেশি। তন্নিম্নে মারওয়াড়ি সম্প্রদায়। ধানবাঁধি মৌজা শিবনাথপুর ও গয়লা নামক পাড়ার ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি নানা জাতীয় লোকের বাস। ইহাদের অধিকাংশ চাকরিজীবী ও উকিল মোক্তার। ধানবাঁধি কালীবাড়ি বাজার রোডের উভয়

পার্শ্বস্থ বিপণী শ্রেণীর সাইনবোর্ড দর্শনে অনুমান হয়, সিরাজগঞ্জে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ব্রাহ্মণাদি জাতীয় ব্যবসায়ীর সংখ্যা অত্যধিক। এখানকার অনেক ডাক্তার কবিরাজ, হাকিমাদির মধ্যে রায়, সেন, গুপ্ত, দাসগুপ্তাদি উপাধিক বৈদ্য বংশজ কবিরাজের সংখ্যাও যথেষ্ট। ধানবাঁধি ও আমলাপাড়া নামক পাড়ায় প্রবাসীগণ প্রায়ই সপরিবারে বাস করে। নদীর অপর পারে ফরিরাপটি, কাইয়াপটিতে অধিকাংশ মহাজনদিগের কেবলমাত্র গদিবাড়ি, গুদাম ঘর ও আড়তাদি অবস্থিত ; তথায়ও প্রবাসীদিগের পারিবারিক অনেক বাসস্থান আছে।

সাধারণত সিরাজগঞ্জে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। ব্যবসায় উপলক্ষে বহু কারবারি মহাজন লোকের বাস হেতু কুলী মজুর মাঝি মাল্লা বেপারি দালাল প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মুসলমান সংখ্যা এখানে বেশি ; এতদ্ব্যতীত মনোহারীপটি ও খলিফাপটিতে অনেক বড় বড় দোকানদার মুসলমানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। দেশিয় হিন্দু মুসলমান মারওয়াড়ি মহাজন ও ইংরেজ সওদাগরগণের আড়ত ও কুঠিতে কার্যোপলক্ষে পশ্চিম দেশিয় কুলী মজুর বহুল পরিমাণে এখানে বাস করে। মারওয়াড়ি সম্প্রদায় এখানে পূর্বাপর ব্যবসায় উপলক্ষে বাস হেতু গঞ্জের একাংশ মারওয়াড়ি পটি নামে পরিচিত হয়।

ধানবাঁধি নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বর্ষাকালে কেবলমাত্র এবং সাধারণত মিউনিসিপ্যালিটি ও নাগরিকগণ কর্তৃক খনিত ক্ষুদ্র বৃহৎ কূপ ইন্দারা এখানকার পানীয় জলের প্রধান অবলম্বন। এখানকার মৃত্তিকা স্বভাবত বালুকাময় তজ্জন্য এইস্থানে পুকুর দীর্ঘিকাদি জলাশয় খননের অনুপযুক্ত। যে দুটি চারিটি পুকুর বর্তমান আছে তাহাতে বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে জল থাকে না। উপরোক্ত কূপ ইন্দারা ব্যতীত সিরাজগঞ্জে স্নান ও পানীয় জলের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক খনিত অনেকগুলি ইন্দারা ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়গণের বাটির প্রাঙ্গনে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। নামে মাত্র এইগুলি সরকারি রাস্তায় খনিত।

সিরাজগঞ্জ টাউনে (১) কাঁইয়াপটি রোড, (২) করিয়াপটি রোড (৩) কাপড়িয়াপটি, (৪) মাছিমপুর রোড, (৫) পোস্টাফিস রোড, (৬) ধানবাঁধি রোড, (৭) কুঠিয়ালপটি রোড, (৮) মেছুয়াবাজার রোড, (৯) কালীবাড়ি রোড, (১০) বাসনীয়াপটি রোড প্রভৃতি নামে কয়েকটি বড় মিউনিসিপ্যাল রাস্তা বর্তমান আছে। এখানকার অধিকাংশ রাস্তা কাঁচা, মাটিতে বাঁধা, তজ্জন্য বর্ষাকালে কর্দমাদি জন্য যাতায়াতে বিশেষ কোন কষ্টানুভব না হইলেও গ্রীষ্মাদি সময়ে লোক চলাচলে বিশেষ অসুবিধাজনক। কাইয়াপটি ও ফরিয়াপটির রাস্তা অতীব সরল, সুদীর্ঘ এবং সুপ্রশস্ত। রাস্তাগুলির অধিকাংশই উত্তর দক্ষিণ বাহিনী। মিউনিসিপ্যালিটি সীমা মধ্যে প্রায় ২৫/২৬ মাইল রাস্তা মধ্যে মাত্র ৩ মাইল পথ ইষ্টক নির্মিত পাকা বাঁধা। শহরে ধানবাঁধি নামক পাড়ায় ও গঞ্জে মেছুয়াবাজার নামে যে দুইটি বাজার আছে, তন্মধ্যে ধানবাঁধির কালীবাড়ির বাজার মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে এবং মেছুয়াবাজার গঞ্জের বাজার নামে স্থানীয় জমিদারগণ কর্তৃক পরিচালিত। উক্ত বাজারদ্বয় ব্যতীত ধানবাঁধি নদীর উপরিস্থ ইলিয়ট ব্রীজের ধারেও অনেক দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে।

দেশিয় হিন্দু মুসলমান মহাজন ব্যতীত বিদেশিয় মারওয়াড়ি ও ইরেজ বণিকগণের এখানে যে সকল মহাজনী ফারম আছে, তন্মধ্যে ইংরেজ সওদাগরগণ মধ্যে (i) Messrs. Rali Brothers & Co., (ii) Messrs. Landale & Clerk Ld. (iii) Mesrs. M. David & Co. Ld. (iv) Messrs. Chittagong & Co. Ld. (v) Messrs R. Sim & Co. Ld. প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। মারওয়াড়ি ফারম মধ্যে (ক) নিমচাঁদ হরেক চাঁদ, (খ) বুধসিং বালচাঁদ, (গ) টীকনচাঁদ দান সিং দুগর, (ঘ) জ্ঞানচাঁদ মানিকচাঁদ সেটিয়া সর্বপ্রধান। হিন্দু বাঙালি মহাজনগণ মধ্যে (১) লোকনাথ ভীমচরণ রায়, (২) দেবনাথ কালিদাস চৌধুরী, (৩) শ্রীদামচন্দ্র রাধাবল্লভ চৌধুরী, (৪) চন্দ্রনাথ আনন্দ সাহা, (৫) হরলাল ষোড়শীলাল সাহা (৬)

কেদারনাথ সাহা প্রভৃতি নামীয় ফারম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত খলিফাপটিতে অনেকগুলি কাটাকাপড ও জুতার দোকানাদিতে অনেক মুসলমান ব্যবসায়িগণ কারবার পরিচালন করিয়া থাকেন, নানা প্রকার ফল বিক্রয় জন্য অনেকগুলি পেশওয়ারি মুসলমানের দোকানও এখানে বর্তমান আছে। মহাজন ও দোকানদার ব্যতীত এখানে বহু দেশিয় মুসলমান ও পশ্চিম দেশিয় কুলি মজুরগণ এখানকার বাণিজ্যের প্রসাদে দৈনিক অর্থ উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। পশ্চিম দেশিয় অনেক কুলি মজুর ও দোকানদারগণ যে সমস্ত স্থান সপরিবারে বাস করে, তাহা বেহারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী বা বস্তি তুল্য প্রতীয়মান হয়।

এখানে ইংরেজ ও মারওয়াড়ি বড় বড় মহাজনদিগের কারবার থাকায় গবর্নমেন্টের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের একটি শাখা অফিস বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, সিরাজগঞ্জ লোন অফিস নামেও কয়েকটি ব্যাঙ্ক বর্তমান আছে।

মহকুমা টাউন হইলেও সিরাজগঞ্জ অনেক ক্ষুদ্র জেলা শহর অপেক্ষাও বৃহত্তর এবং কোন অংশে জেলার কোন টাউন অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। এমন কি পাবনা টাউন হইতে কোন অংশে হীন বা আয়তনে ক্ষুদ্র নহে। পাবনা মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রফল প্রায় মাত্র ৫ বর্গ মাইলের বেশি নহে, কিন্তু সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রফল ১০ বর্গ মাইলের অধিক। সিরাজগঞ্জে ফরিয়াপটি, মনোহারী পটিতে জমির মূল্য অত্যধিক। খাজানা রাস্তার সম্মুখে এক হস্ত বার্ষিক ।॰ হইতে ৷৷॰ হিসাবে ধার্য হইয়া থাকে। মূল্যও প্রায় বিঘা প্রতি ১০০০ হইতে ৪০০০ পর্যন্ত হইয়া থাকে।

এখানকার স্বাস্থ্য অন্যান্য অনেক শহর অপেক্ষা ভাল। ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই হয়। এখানে ডাক্তার কবিরাজের সংখ্যা অন্যান্য শহর অপেক্ষা অনেক বেশি, তাহা হইলেও ইহাদের শহরে বেশি ডাক নাই। ইহাদের অনেকেই চতুস্পার্শ্ববর্তী গ্রামেই বেশি চিকিৎসা করিয়া থাকেন। এখানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার চর্চা অধিক বলিয়া বোধ হয়। এথাকার নীলাম্বর হুই নামক জনৈক প্রাচীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের প্রচেষ্টায় অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তৈয়ার হইয়াছেন।

শহরের জল নিকাশের জন্য যাবতীয় ড্রেনাদি এখানকার খাল ডোবাদিতে সংযুক্ত আছে। এই সমস্ত খাল সিরাজগঞ্জের একটি বিশেষত্ব। মাটি কাটিয়া বাড়ি তৈয়ারিতে এই সমস্ত খালের উৎপত্তি হয়। শহরে একটি মিউনিসিপ্যাল দাহক্ষেত্র এবং একটি কবরস্থান আছে।

কার্তিক অগ্রহায়ণ মাস হইতে ব্যবসায়িগণ কোলবন্দরে তাহাদের শাখা দোকান আড়তাদি নির্মাণ করিতে থাকে। তথায় করগেট টিনের নির্মিত নূতন চালা ছাপড়া আদি অস্থায়ী ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। তথায়ও দৈনিক বাজার বসে ; লোকের আহারীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। মহাজনগণের প্রত্যেক আড়ত ও ফারম হইতে প্রত্যহ কোলবন্দরে লোক যাতায়াত করে। ইহাতে অনেক সুবিধা অসুবিধা উভয়ই আছে। তবে রেল লাইন নির্মিত হওয়ায় লোকের অসুবিধা কিয়ৎপরিমণে হ্রাস হইয়াছে।

পূর্বে সিরাজগঞ্জ আসিতে হইলে, সাধারণত এখানে স্টিমারযোগে পৌছিতে হইত। সুতরাং স্টিমার হইতে যমুনার চর ভূমির উপরিস্থিত কোলবন্দরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করগেট টিনের চালা ছাপড়াদির প্রথম দৃশ্য বঙ্গ বিশ্রুত সিরাজগঞ্জ সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা উৎপাদন করিত। দুর হইতে বাণিজ্যাদি জন্য সিরাজগঞ্জের যত নাম শুনিতে পাওয়া যাইত, এখানকার কোলবন্দরে স্টিমার হইতে অবতরণ করিলে আরোহিগণের মনে বালুকাময় ভূমির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী গৃহাদি সন্দর্শনে মনে সহসা এক নিরাশার সঞ্চার করিত। তজ্জন্যই সিরাজগঞ্জের নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়--

"Sir George Campbell once referred to Sirajganj as 'a town without houses, and such is the appearence which it presents to the eye of the voyager

on the Brahamputra river. From the deck of his steamer the passenger can at once perceive that he has reached a place where trade is active. Small boats collected together in little fleets are approaching the mart from the north : larger vessels are departing from the other entrance of the natural harbour, and making for Calcutta. On the shore, crowds of coolies are busy in landing open hanks of jute, packing them into drums and reshipping the fibre in this from on board the flats and the other craft bound for the South. If it is the hour of the daily bazar, the brokers and local merchants are collected in light boats and are busily effecting their purchases. The bright head dresses of the Kayas or Marwaris, from the native state of the Marwars are sufficiently numerous, which is not much increased by the white dress of the Bengali mahajan, or the riding costume and the sola (pith) hat of the European. The signs of a large and keen traffic are unmistakable.

"The strangeness of the sight consists in this, that the scene of so much commercial energy is laid amidst a waste of sands, where there is not a tree to afford shade, and barely a shed to give shelter. Some five miles from the mart, two factory chimneys may be seen rising above a line of trees ; and these indicate the position of the real town of Sirajgunj. Between their homes and the bazar, all engaged in the trade have to go and come daily over their great extent of open char. It will be easily understood that this is no pleasant journey in the hot season, when the glare of the sun is reflected from the sand, which is blown in clouds by the strong wind then prevailing. A great number even of the poorest classes consider it necessary to keep ponies, in order to perform it with the less fatigue. Early in June comes a relief. The river rises, flooding the sterands on which the bazar had been held. If fills up and renders navigable a small channels through the town of Sirajgunj itself, for the next four months, trade is carried on with every convenience close to doors of the merchants. In October, the bazar shifts again to some new spot, the nearest natural haven formed by the floods of the previous season on the bank of Jamuna. When we add that between the desertion of one bazar and the formation of another there is often an interval of weeks during which business in almost suspended. It is will be clear that Sirajgunj has its disadvantage as a port." *B. D. G—Pabna by S. O'Malley. P 128-129.*

সিরাজগঞ্জ পূর্বাপর বাণিজ্য জন্য প্রসিদ্ধ। সিপাহী বিদ্রোহকালে এই বন্দর ইহার সমৃদ্ধি হেতু ঢাকা হইতে সিপাহিগণ কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা হইয়াছিল। তৎকালে এখানকার নব নিযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বেরি সাহেব বিদ্রোহকালে এখানে গবর্নমেন্টের পক্ষে কর্মচারি নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সরকারি কার্যালয় ও তাহার কুঠি সাবধানতার সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। এই মিঃ বেরি সাহেব সিরাজগঞ্জের তৎকালীন বাণিজ্যের সাতিশয় উন্নতি দর্শনে এখানে পাটের বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কালক্রমে তাহার উক্ত কারবার হইতে এখানকার প্রসিদ্ধ চট কলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই কল সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—The first Subdivisional officer being the Deputy Magistrate named Barry........ Mr. Barry established

one of the first jute presses at Sirajgunj. He resigned Government service to open a general commission business and to work a hand screw which he had constructed for pressing jute into bales for export. On his return to Europe (where he eventua''y became M. P. for Cork), he sold the good-will of his business to a company for spining and weaving jute, which he promoted. This company went into liquidation in 1867, there being no funds to complete the buildings of the factory. As new company, called the Sirajgunj Jute Co. (Limited) purchased for Rs. 1,65,000 the works, which had originally cost Rs. 7,80,000 completed their construction and opened the factory in 1869. The buildings were shattered by the earthquake of 1897 ; after which the company, the agents of which at that time were Andrew Eule & Co., removed its business. The site was sold to Babu Hemchandra Choudhury and part of it was subsequently acquired for the railway station."

Bengal District Gazatteer—Pabna. By S. O'Malley. P. 127.

ভাবার্থ সিরাজগঞ্জের সর্বপ্রথম নিযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বেরি সাহেব গবর্নমেন্টের চাকরি ইস্তফা দিয়া কমিশনের কারবার করিবার ও পাটের গাইট বাঁধিবার জন্য হস্তচালিত একটি স্ক্রু চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বিলাত যাইবার পর পাট দ্বারা চট বুনিবার জন্য একটি কোম্পানির নিকট তাহার কারবারের উপস্বত্ব বিক্রয় করেন। উক্ত কোম্পানি ১৮৬৭ অব্দে ফেল পড়িয়া যাওয়ায় সিরাজগঞ্জ জুট মিল নামে অন্য একটি নূতন কোম্পানি ৭,৮০,০০০ টাকা মূল্যের কারবার ১,৬৫,০০০ মূল্যে খরিদ করিয়া যে কল গৃহাদি নির্মাণ করে, তাহা ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে বিনষ্ট হইয়া গেলে কোম্পানির কার্যাদি বন্ধ হইয়া যায়। অবশেষে স্থানটি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় খরিদ করেন এবং কতক রেল স্টেশন জন্যও গৃহীত হয়।

জানা যায় এই চট কলের কার্যকালে সিরাজগঞ্জে দৈনিক প্রায় ২২০০ জন লোক ইহার দ্বারা প্রতিপালিত হইত। এতদ্ব্যতীত ইহাতে মালপত্রাদি সরবরাহ করিয়া স্থানীয় ও ভিন্ন স্থানীয় বহু মহাজন, ব্যাপারি, ফরিয়া, দালাল, গারওয়ান প্রভৃতিও গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিত। সিরাজগঞ্জের এই সুবৃহৎ অনুষ্ঠানের কার্যাদি বিলুপ্ত হইলে, তৎকালে এখানকার অনেক লোকজন মধ্যে কিয়দ্দিন পর্যন্ত হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। সিরাজগঞ্জ আধুনিক স্থান বিধায় এখানে প্রাচীনত্ব জ্ঞাপক উল্লেখযোগ্য বা দর্শনযোগ্য কোন পদার্থ না থাকিলেও এথাকার এই চটকল এক সময়ে বঙ্গদেশে বিশেষ সুপরিচিত ছিল এবং এখানে প্রাচীন কিছু জ্ঞাতব্য না থাকিলেও সিরাজগঞ্জের বাণিজ্যের উন্নতি দর্শনে অশেষ ক্ষমতাপূর্ণ সরকারি কার্য পরিত্যাগ করিয়া বিদেশিয় শ্বেতাঙ্গ রাজ কর্মচারি যে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা অধুনাতন চাকরি প্রিয় বঙ্গবাসিগণের নিকট বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্বে সিরাজগঞ্জই একমাত্র বঙ্গদেশের মধ্যে কলিকাতার নিম্নে পাট বিক্রয়ের সর্বপ্রধান বন্দর বলিয়া পরিচিত হইত। এখানে পাবনা জেলা ব্যতীত পূর্বাঞ্চলের ঢাকা, মৈমনসিংহ, সিলেট, গোয়ালপাড়া, উত্তরে বগুড়া, রঙ্‌পুর, কুচবিহারাদি বিভিন্ন জেলাদি হইতে পাট আমদানি হইত এবং তাহা এখানে কাঁচা গাইট বাঁধিয়া মহাজনেরা কলিকাতায় চালান দিত। সমস্ত বঙ্গদেশে যত পাট আমদানি হইত, এক সিরাজগঞ্জেই তাহার প্রায় এক চতুর্থাংশ পাওয়া যাইত এবং এখান হইতে বিদেশে রপ্তানি হইত। আধুনিককালে নারায়ণগঞ্জ পাট খরিদ বিক্রয়ের বন্দর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তথাপি আজিও উক্ত বন্দর ব্যতীত

কলিকাতার নিম্নেই বঙ্গে পাট খরিদ বিক্রয় জন্য সিরাজগঞ্জ একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে। পূর্বে স্টিমার যোগে গোয়ালন্দ হইয়া পাট চালান হইত; এক্ষণে সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল লাইন খুলিবার পর হইতে মালপত্রাদি শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতা পৌছিতে পারিতেছে, তজ্জন্য ব্যবসায়িগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

১৮৭১—১৮৭২ অব্দের বঙ্গ শাসনকালের কার্য বিবরণী হইতে জানা যায় উক্ত অব্দে সিরাজগঞ্জ বন্দর হইতে ৩২,০৬,০০৩ টাকা মূল্যের ২,৪৫,৬৪৯ মণ পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। সিরাজগঞ্জ হইতে নদী পথে নিম্নলিখিত রূপে পূর্বে পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

১৮৭৭—৭৮ খ্রিঃ	১৮৭৮—৭৯ খ্রিঃ	১৮৭৯—৮০ খ্রিঃ
৯,৮১,০০০ মন	১৫,৩৫,০০০ মন	১৬,৯৭,৬০০ মন

পাট ব্যতীত সিরাজগঞ্জ হইতে ধান, চাউল, মটর, খেসারি আদি পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয় এবং এখান বিদেশ হইতে আগত লবণ, কেরোসিন তৈল, করগেট টিন, কাপড়াদি বহু দ্রব্য আমদানি হইয়া থাকে। গঞ্জ ও কোলবন্দর পরস্পর প্রায় ৪/৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত বিধায় এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাজন ও ব্যবসায়িগণ ঘোড়া ও বলদের উপর চাপাইয়া অনেক পণ্যাদি একস্থান হইতে স্থানান্তরে বহন করিয়া থাকে। বর্ষা সময়ে যমুনা নদীর জল বাড়িলে কোলবন্দরের ক্রয় বিক্রয়াদি গঞ্জে স্থানান্তরিত হয়। ইহাতে বার্ষিক স্থান পরিবর্তন জন্য মহাজনগণের বিশেষ অসুবিধা হয়।

পূর্বে ধানবাঁধি নদীতে কোন প্রকার পুল ছিল না। তজ্জন্য বর্ষাকালে এথাকার ব্যবসায়াদি কোলবন্দর হইতে উঠিয়া গঞ্জে স্থানান্তরিত হইলেও নদী পারাপারে লোকের বিশেষ অসুবিধা হইত। স্থানীয় এই অভাব দুরীকরণার্থ সিরাজগঞ্জের ভূতপূর্ব মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বিটসন্ বেল সাহেব মহোদয়ের ঐকান্তিক যত্নে ও চেষ্টায় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৪৫,০০০ টাকা ব্যয়ে ধানবাঁধি নদীবক্ষে বঙ্গের তৎকালীন ছোট লাট সার চার্লস ইলিয়ট সাহেব বাহাদুরের নামানুসারে **ইলিয়ট ব্রিজ** নির্মিত হইয়াছে। এই অর্থের প্রায় ৩০০০ টাকা মিঃ বেল সাহেবের উদ্যমে সিরাজগঞ্জের অনেক মহাজনদিগের নিকট সংগৃহীত চাঁদা হইতে এবং ১৫,০০০ টাকা পাবনা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্য হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। লাটসাহেব বাহাদুরের নামানুসারে এই ব্রিজ কথিত হইলেও এখন পর্যন্ত সিরাজগঞ্জের অনেকেই ইহা মিঃ বেল সাহেবের কীর্তি বলিয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে ঘোষণা করিয়া থাকে। ১৮৯৭ অব্দের ভূমিকম্পে এই ব্রিজটির উভয় পার্শ্বস্থ ভূমির অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জের স্বাস্থ্য অনেকানেক স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল; এখানে ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই চলে। সিরাজগঞ্জে তাড়াসের বনমালী রায় মহাশয়ের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত স্কুল, মহাজনদিগের উদ্যোগে স্থাপিত ভিক্টোরিয়া স্কুল নামে দুইটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, জ্ঞানদায়িনী মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়, দুইপারে দুইটি বালিকা বিদ্যালয় বর্তমান আছে। এখানে জুনিয়ার ও সিনিয়ার নামে দুইটি মাদ্রাসা বহুদিন হইতে বর্তমান আছে। সম্প্রতি কয়েকবৎসর হইল সিনিয়ার মাদ্রাসার জন্য উত্তম পাকা গৃহাদি নির্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এখানে মক্তবাদিও বর্তমান আছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়াদির প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র মুসলমান পরিবারে বিনা খরচে বাসস্থান ও আহার্য পাইয়া থাকে। ইহা সিরাজগঞ্জের মুসলমান সমাজের বিদ্যানুশীলনের সহায়তাকল্পে বিশেষত্ব। এইরূপে ছাত্রগণকে পাঠ্যাবস্থায় সাহায্য দান এখানে ছাত্র জায়গির রাখা বলিয়া খ্যাত হয়।

মুসলমান প্রধান স্থান হইলেও এখানে একমাত্র পির সাহেবের দরগাহ ব্যতীত সিরাজগঞ্জে কোন ইষ্টক নির্মিত দরগাহ বা মসজিদ বর্তমান নাই। ইহা এখানকার মুসলমান সমাজের একটি বিশেষ অভাব বলিয়া অনুমিত হয়। হিন্দুদিগের বিগ্রহালয় মধ্যে ধানবাঁধিতে কালীবাড়ি, গোবিন্দজীর বাড়ি গঞ্জে মহাপ্রভুর আখড়া, বাঁকারায়ের আখড়া, নরসিংজির আখড়া প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য। কালীবাড়িতে কার্তিক মাসে কাত্যায়নী পূজা এবং আষাঢ় মাসে রথোপলক্ষে সমারোহ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মনোহারীপঠিতে লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে প্রায় সাপ্তাহিক কাল স্থায়ী মেলাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মারওয়াড়িগণেরও একটি বিগ্রহালয় ও খ্রিস্টান মিশনারিদিগের ট্যাসম্যানিয়ান মিশনেরও ভজনালয় বর্তমান আছে।

সরকারি অফিসাদি মধ্যে এখানে দেওয়ানি ফৌজদারি কাছারি, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফিস এবং বর্তমান পাবনা বগুড়া সেটেলমেন্ট অফিসাদি উল্লেখযোগ্য। এখানে পোস্টাফিস ব্যতীত গবর্নমেন্টের একটি খাস টেলিগ্রাফ অফিস বর্তমান আছে। এদ্ব্যতীত সাহেবদিগের একটি ক্লাব হাউজ ও ক্রীড়া ভূমি এবং এখানে জুবিলি পার্ক নামে একটি প্রমোদ উদ্যান বর্তমান আছে।

পুনঃপুনঃ নদীভঙ্গ হেতু পূর্বে সিরাজগঞ্জে অধিক পরিমাণে ইষ্টক নির্মিত পাকা গৃহ বর্তমান ছিল না। বিগত ৩০ বৎসর মধ্যে অনেক পাকা গৃহাদি নির্মিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে সিরাজগঞ্জ হইতে **আশালতা** নামে এক খণ্ড মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত, তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কমলা প্রেস হইতে **পরিচারক** নামে যে একখণ্ড সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত তাহাও বন্ধ হইয়াছে। এখানে ডাকবাঙলা, হাসপাতাল ও কতকগুলি মুদ্রাযন্ত্রাদি বর্তমান আছে। পূর্বে এখানে একটি বরফের কল ছিল। তাহা সম্প্রতি উঠিয়া গিয়াছে।

এখানে দুইটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, দুইটি মাদ্রাসা, একটি মধ্য ইংরাজি স্কুল, দুইটি বালিকা বিদ্যালয় বর্তমান আছে। সম্প্রতি আরও একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইতেছে। একাধিক স্কুল, মাদ্রাসা ও বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও এখানে একটি কলেজের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী ও ভূম্যধিকারিগণ উদ্যোগী হইলে এথাকার এই অভাব অচিরে বিদূরিত হইতে পারে।

সিরাজগঞ্জ পূর্বে বেলকুচির প্রসিদ্ধ চৌধুরী উপাধিক মুসলমান জমিদার বংশের জমিদারি ছিল। উক্ত বংশের ভূসম্পত্তি কালক্রমে নানা অংশে বিভক্ত হইয়া বর্তমানে তাহা নানা স্থানের জমিদারগণ খরিদ করিয়াছেন। এই শহরে মৈমনসিংহ জেলার সন্তোষের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় দীনমণি চৌধুরাণী মহাশয়াদিগের কয়েকটি কাছারি ৮ গণ্ডার কাছারি, ।৵ আনীর কাছারি আদি নামে পরিচিত হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে করটিয়ার খাঁ সাহেবের কাছারি, আমবারিয়া নিবাসী স্বর্গীয় হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ও অন্যান্য আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদারগণের কাছারি বাড়ি বর্তমান আছে।

পূর্বে সিরাজগঞ্জে ব্যবসায়ী ও ভিন্ন দেশিয় লোকেরা সপরিবারে বাস করিতেন না। প্রবাদ আছে এখানে পূর্বে প্রায় সাত শত বিরাশি ঘর বারবণিতার বাস ছিল। তাহাদের উপর জমিদারগণের বিশেষ শাসন ছিল। এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে। ইহা সিরাজগঞ্জের স্থানীয় অধিবাসিগণের নৈতিক উন্নতির পরিচায়ক তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সিরাজগঞ্জে অনেক ইউরোপীয় মহাজনের বাস; তজ্জন্য এখানে যে সমস্ত মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিযুক্ত হন, তাহারা অধিকাংশই ইংরেজ বা সিভিলিয়ান্। এখানকার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটগণ মধ্যে মিঃ নোলেন, মিঃ ব্রেট, মিঃ বিটসন বেল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাগবাটি ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে ৯ মাইল পশ্চিমোত্তরে ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত বাগবাটি একটি প্রাচীন পল্লী। সাধারণত হরিণা, বাগবাটি, হরিণাগোপাল, নওদা হরিণা নামক সুবৃহৎ পাড়া চতুষ্টয় এক হরিণা বাগবাটি নামে পরিচিত হইয়া থাকে। এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, গোপ, কর্মকার, কুম্ভকার, গন্ধবণিক, তিলি, সূত্রধর, কাচারু, নমঃশূদ্র আদি সর্বপ্রকার হিন্দু এবং বহু মুসলমান জাতির বাস।

গ্রামে জমিদার বাবুদের বাটি সংলগ্ন প্রাঙ্গনে মাছ তরকারি দুগ্ধাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের

দৈনিক বাজার এবং কিয়দ্দুরে কুড়াগাছা নামক স্থানে সাপ্তাহিক বৃহৎ হাট বর্তমান আছে। গ্রামের ৩/৪টি পুরাতন পুকুরাদি মধ্যে রুদ্রাণী চৌধুরাণী কর্তৃক খণিত পুকুর এবং সর্ব সাধারণের হিতার্থে প্রদত্ত স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন মহাশয়ের পত্নী বিনোদবালা গুপ্তা, স্বর্গীয় জগবন্ধু রায় মহাশয় এবং হরিমোহন দত্ত (বণিক) কর্তৃক খনিত তিনটি ইন্দারা স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীগণের পানীয় জলের প্রধান অবলম্বন। চণ্ডীপ্রসাদ ও কালীচরণ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী কালীকালিকা দেবী সেবাপূজা স্থানীয় জমিদারগণ কর্তৃক পালাক্রমে পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর বাসন্তী অষ্টমীর সময়ে এখানে একটি বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। স্থানীয় গিরিধারী নামক বিগ্রহের আখড়া ও তাহার সেবা পূজা পরিচালন জন্য জমিদার বাবুদের স্টেট হইতে বৃত্তি ও স্থাবর সম্পত্তি নির্দিষ্ট আছে। প্রতিবৎসর অষ্টম দোল সময়ে এখানে অতি সমারোহ হইয়া থাকে ; ইহাতে নানাস্থানে হইতে লোক সমাগম হয়। পূর্বে এখান শীতলা দেবীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষে প্রায় মাসাধিককাল স্থায়ী মেলার অনুষ্ঠান হইত।

এথাকার জমিদার বংশসম্ভূত হরিশচন্দ্র রায় মহাশয় দিগরের প্রচেষ্টায় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে যে একটি মধ্য ইংরাজি স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাই অতঃপর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রমাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের উদ্যোগে দীনেশচন্দ্র রায় দিগরের সহায়তায় উচ্চ ইংরাজি স্কুলে পরিণত হইয়াছে। এই স্কুল সংক্রান্ত একটি ছাত্রাবাসও স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার ছাত্রগণের সহিত ব্যায়ামক্রিড়াদিতে প্রতিযোগিতা নির্মিত অম্বিকাচরণ মেমোরিয়াল শিল্ড নামে একটি পুরস্কার প্রচলিত আছে, তদুপলক্ষে বার্ষিক এখানে সাতিশয় উৎসাহ ও উদ্যোগ হইয়া থাকে।

বাগবাটির অঞ্চলে অতি উত্তম সন্দেশ ও সোনামুগ পাওয়া যায়। পূর্বে এতদ্দেশে অনেক চুড়ি তৈয়ার হইত। এখন পর্যন্ত এই সমস্ত অঞ্চলে কাচারু, সাহারু নামক জাতি সমূহের বাস আছে। বৈদেশিক শিল্পের প্রতিযোগিতা প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় এই শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। বাগবাটি অঞ্চলে উত্তম ধান পাওয়া যায়। এখানে দুধের ওজন সাধারণ ৬০ জেলার ওজনের)২॥০ আড়াই সেরে এক সের ধরা হইয়া থাকে।

এই গ্রামের ব্রাহ্মণগণের অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে স্থানীয় জমিদারগণ কর্তৃক আনীত। এখানকার ব্রাহ্মণ সমাজে অনেক কৃতবিদ্য পণ্ডিত জন্মিয়া ছিলেন। ইহাদের মধ্যে যদুনাথ ন্যায়রত্ন ও কৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামের যাদবচন্দ্র রায় মহাশয় একজন সাহিত্যিক ; "বৈষ্ণবধর্ম তত্ত্বমালা" ও "অম্বষ্ঠ বৈদ্যরঞ্জিকা" তাহার রচিত। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির বাস আছে।

বাগবাটি গ্রামে বহুদিন হইতে একটি সূত্রধর বংশ বাস করিয়া আসিতেছে। ইহাদের পূর্বপুরুষ যাদুরাম সূত্রধর ও ভবানীরাম সূত্রধর নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে ১০৭৩ সালে ১১ মাঘ তারিখের লিখিত সনন্দমূলে সূত্রধর সমাজের সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য ও সম্মান জন্য যে একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা এখনও তাহাদের গৃহে বর্তমান আছে। তন্মূলে এখনও তাহারা তাহাদের স্বীয় সমাজে জন, প্রামাণিক প্রভৃতির মর্যাদা উপভোগ করিয়া আসিতেছে।

বাগবাটির জমিদারগণ ষষ্ঠীধর গুপ্তের বংশধর বলিয়া পরিচিত। ইহারা প্রায় ১৩/১৪ পুরুষ হইল এই গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাদের পূর্ব নিবাস সিরাজগঞ্জের নিকটবর্তী কালিয়া হরিপুর গ্রামের সান্নিধ্যে পাইকষা গ্রামে ছিল। তথাকার নবাবের ফৌজদার আদি কর্মচারিবর্গের সহিত নানারূপ সংঘর্ষে ইহাদের পূর্বপুরুষ উক্ত গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক তথা হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইহারা বড় বাজু পরগণার ./৫ অংশের জমিদারি খরিদ করিয়া এবং নবাব সরকারে চাকরি করতঃ রায় উপাধি লাভ করিয়াছেন।

ষষ্ঠীধর গুপ্তের পৌত্র জনৈক যাদবানন্দ রায় মহাশয় মুর্শিদকুলি খাঁ নবাবী আমলে বাকি

রাজত্ব নিমিত্ত ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। উক্ত মন্ত্র জপ করত তিনি সসম্মানে তৎকালে সৈয়দ রেজা খাঁ কর্তৃক তথা কথিত "বৈকুণ্ঠ" নামক নরককুণ্ড পার হইবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। তন্নিমিত্ত বাটি প্রত্যাবর্তন করতঃ ধাতুময়ী যে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ মূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি তাহার বংশধরগণ কর্তৃক পূজিত হইতেছে। এই বংশীয় কৃষ্ণদেব রায় মহাশয় কোন সময়ে মুর্শিদাবাদ নবাব বাটিতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া ২০ টাকা দর্শনী প্রদান করিয়াছিলেন, নবাব পক্ষ হইতে প্রতিদান স্বরূপ তাহাকে একখানি গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা কালে **কুড়ি টাকার গাঁতি** নামে পরিচিত হইয়াছিল। তাহার বার্ষিক আয় অধুনা এক হাজার টাকার অধিক এবং এখনও তাহা এই জমিদার বংশ ভোগ করিতেছেন। কৃষ্ণদেব রায় মহাশয় নিজ বাটিতে যে নাড়ুয়া গোপাল বিগ্রহমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি তদ্বংশীয় কর্তৃক পূজিত হইতেছে।

বাগবাটি অঞ্চলে পৌষ মাসে প্রচলিত পল্লী বালকগণের মানিকপীরের গান মধ্যে নিম্নলিখিত কবিতাংশ—

"সোনা মিএগ্রা মরে" গেল শব্দ গেল দূর,
ধান লোটে, চাল লোটে, আর লোটে গাই।
পঞ্চাশ শব্দে লুঠে নীল লিখা জোখা নাই।।

....

কেহ গেল আটিয়া, কেহ গেল বগুড়া
জন চারি পাঁচ ভূঁই প্যাদা আইল সাজিয়া।।
তাহা দেখি সুখু রায় গোপালে মানে চূড়া।
বাগবাড়িয়া খাড়া হইল পূর্ণিমার চান্দ।
দশ আনী ছয় আনী বাটিয়া নিল ছাম।।

—হইতে প্রকাশ বগুড়া জেলার বাণিয়াগাঁতি প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের মালিক সোনামিএগ্রা নামক জমিদারের মৃত্যু হইলে বাগবাটির জমিদারগণের পূর্বপুরুষ তাহা দখল করেন এবং তাহারাই নবাব সরকারে জমিদার বলিয়া গণ্য হয়েন এখন পর্যন্ত উপরোক্ত কৃষ্ণদেবের বংশধরগণ ॥.৷৹ দশ আনী এবং জয়দেবের বশধরগণ ।.৵ ছয় আনীর জমিদার নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

এই জমিদার বংশীয়দিগের অনেকেই পূর্বাপর বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত এবং পরম বৈষ্ণব। ইহাদের বংশাবলীতে প্রত্যেকেরই প্রায় বিষ্ণুর নামজ্ঞাপক নাম দেখা যায়। ইহাদের গৃহে রক্ষিত চিত্রাদিতে ইহাদের পূর্বপুরুষগণের সাত্ত্বিক প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। অতিথি সৎকার ও দান দাতব্যাদি জন্য ইহারা প্রসিদ্ধ। অধুনাতন পারিবারিক মামলা মোকদ্দমাদির হস্ত হইতে ইহারাও মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

পিপুলবাড়িয়া ঃ

বাগবাটি গ্রাম সংলগ্ন পিপুলবাড়িয়া গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার সহিত নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংস্রব প্রযুক্ত ইহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইল। এখানে **পীরগাছা** নামে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। বাগবাটির জমিদারগণের সন্তানাদির পাঁচ বৎসর বয়ক্রমকালে শিরমুণ্ডন করতঃ চুল, সন্দেশ, দুধ, কলা ইত্যাদি সিন্নি ও মানসিক দিবার রীতি পূর্বপার প্রচলিত আছে। এই সিন্নি দিবার জন্য তাহাদের প্রদত্ত জমি ও সেবাইতের বন্দোবস্ত আছে। উক্ত গাছের নিম্নে মাটির তলদেশ পর্যন্ত একটি খাতের চিহ্ন বিচিত্র ইষ্টকদ্বারা বাঁধা আছে।

প্রবাদ একদা জনৈক ঘোষ দুগ্ধভার লইয়া এই বৃক্ষতল দিয়া গমনকালে এখান হইতে "আমাকে দুগ্ধ দাও" বলিয়া ডাক শুনিতে পায়, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া হতবুদ্ধি ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে "কে আমার নিকট দুগ্ধ চাহিল", তখন একটি বালক উক্ত পীর গাছের তল হইতে বলে "আমাকে দুগ্ধ দাও, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে।" তখন ঘোষ তাহাকে দুধ দিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে দিতে দিতে সমস্ত দুগ্ধ নিঃশেষিত হইলে প্রণিপাতপূর্বক করজোড়ে জিজ্ঞাসা করে "আপনি কে? দয়া করিয়া আমাকে বলুন", তখন বালক সহসা অদৃশ্য হইয়া যায়। ঘটনার কয়েকবৎসর পর জনৈক মুসলমান ফকির আসিয়া এখানে বাস করিতে থাকে, তদবধি ইহার নাম পীরগাছা নামে খ্যাত হইয়াছে।

ঘোড়াচড়া দিং ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে ৭ মাইল পশ্চিমোত্তরে সোনামুখী ট্র্যাকের ধারে ঘোড়াচড়া একটি প্রাচীন ভদ্র পল্লী। বর্তমানে হিন্দু আদিবাসী মধ্যে কতিপয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সাহা, নরসুন্দর ও মালাকর এবং মুসলমান জাতির বাস। এক্ষণে এখানকার মুসলমান সমাজ বর্ধিষ্ণু, পূর্বে বৈদ্যবংশ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য প্রসিদ্ধ বক্তা ও সুলেখক বৈদ্য বংশোদ্ভব গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া এথাকার মুখোজ্জল করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বপুরুষ নীলমাধব রায় মহাশয় সর্বপ্রথমে এতদঞ্চলে নিভৃত পল্লীপ্রান্তে প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্বে মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বর্তমান সময়ের স্বরাজ ও স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্বে এই সুদূর পল্লী প্রান্ত হইতে "স্বদেশ হিতৈষিণী" নামধেয় একখণ্ড পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। ১৮৭৪/৭৫ খ্রিস্টাব্দে উক্ত পত্রিকা বন্ধ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। নীলমাধব রায় মহাশয় উক্ত পত্রিকার প্রিন্টার এবং জনৈক চন্দ্রকুমার সেন মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। এখনও এখানে গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবন ও সুবৃহৎ দীর্ঘিকা বর্তমান আছে।

কুলকোচা, খোকসাবাড়ি, বেজগাঁতি, বৈদ্যদোগাছি, ব্রহ্মগাছা, বাসুরিয়া প্রভৃতি গ্রামসমূহ বৈদ্য সমাজ প্রধান বলিয়া পরিচিত। খোকসাবাড়িতে সাপ্তাহিক হাট এবং নাগরপুরের "সাহা চৌধুরী" উপাধিক জমিদারগণের একটি পাকা কাছারিবাড়ি বর্তমান আছে। বেজগাঁতি গ্রাম বৈদ্য প্রধান। এখানে অনেক প্রসিদ্ধ কবিরাজগণের বাস ছিল। তন্মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র সেন ও গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়গণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মগাছা ও **বাসুরিয়া** পৃথক পৃথক গ্রাম হইলেও পরস্পর সংলগ্ন এবং সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ১১/১২ মাইল পশ্চিমোত্তর ইছামতী নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। বর্তমানে এই গ্রামদ্বয় সাতিশয় প্রসিদ্ধ না হইলেও পূর্বে নদী তীরস্থ এই গ্রামগুলি সাতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। এতদঞ্চলে পূর্বে অধিক পরিমাণে বস্ত্রশিল্পীর বাস ছিল। প্রবাদ এক সময়ে ইংরেজ বণিকেরাও এখানে আসিয়া দেশিয় তাঁতের কাপড় খরিদ জন্য তন্তুবায় ও কারিকরগণকে অগ্রিম দাদন প্রদান করিয়া কাপড় খরিদ করিতেন। এক্ষণে বাসুরিয়া গ্রামে একটি সাপ্তাহিক হাট বর্তমান আছে। হিন্দু অপেক্ষা বর্তমানে মুসলমান সংখ্যা অত্যাধিক ব্রহ্মগাছায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

দত্তবাড়ি ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ৮/৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত দত্তবাড়ি একটি সুবৃহৎ প্রাচীন পল্লী। বর্তমানে এখানকার অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান হিন্দু মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকঘর নরসুন্দরের বাস। মুসলমান সমাজে এখানে অনেকগুলি অবস্থাপন্ন তৈল প্রস্তুককারক খুলু জাতীয় লোকের বাস আছে। পূর্বে এখানে একটি নীলকুঠি ছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান আছে।

কালিয়া হরিপুর দিং ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমাংশে অবস্থিত হরিপুর অতি প্রাচীন পল্লী ; কালিয়া গ্রামে মুসলমান আমলে নবাবের কাছারি বাড়ি ছিল। হরিপুর গ্রামের মজুমদার উপাধিক ব্রাহ্মণ বংশ সমধিক প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত এখানে মৈত্র, সান্যাল, চক্রবর্তী উপাধিক ব্রাহ্মণ, কর্মকার, পাটিয়াল প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমানগণের বাস। প্রতিবৎসর চৈত্র পূর্ণিমায় এখানে অতি সমারোহে বারইয়ারি কালীপূজা হইয়া থাকে। এখানকার ও নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামের লগ্নাচার্য ও সাহাদিগের উদ্যোগে প্রতিবৎসর চৈত্র মাসে অতি সোৎসাহে পাটপূজা ও দেউলোৎসব হইয়া থাকে। প্রকাশ কালিয়া গ্রামে পূর্বে নবাবের কাছারি থাকা সময়ে এথাকার "হুই" উপাধিক কায়স্থগণ তথায় কার্যকারক ছিলেন। এখানকার নবাব কাছারি হইতে বর্তমান সময়ে নিকটবর্তী কান্দাপাড়া নিবাসী কাগজ প্রস্তুতকারী "কাগজিগণ" আনীত হইয়াছিল এবং উহারা পূর্বে উক্ত শিল্প দ্বারা জীবিকার্জন করিত। প্রবাদ উহাদের উক্ত কাছারি হইতে অনেক লাখেরাজ জমি জমাও বর্তমান ছিল। বর্তমান সময়ে কান্দাপাড়ায় মুসলমান জাতীয় ১২/১৪ ঘর কাগজ প্রস্তুতকারী শিল্পীর বাস আছে। দেশে আজকাল লেখাপড়ার চর্চা ও শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশিয় এই কাগজ শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই।

সয়দাবাদ ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে সয়দাবাদ একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। গ্রামটি যমুনা নদীর একটি শাখা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে দৈনিক বাজার এবং অনেক ধনাঢ্য বাণিজ্যজীবী সাহা জাতীয় লোকের বাস। এখানকার সাহা চৌধুরী উপাধিক ব্যবসায়িগণ সিরাজগঞ্জে এক সময়ে প্রসিদ্ধ মহাজন বলিয়া পরিচিত হইতেন এবং ইহাদের গদিবাড়ি এক সময়ে তথায় বড় গোলা নামে খ্যাত হইত। এক সময়ে ইহারা প্রসিদ্ধ ধনকুবের বলিয়া পরিচিত ছিলেন ; ইহাদের পূর্বনিবাস এই গ্রামের পূর্ব দিকস্থ বীরহাটি গ্রামে ছিল, উক্ত গ্রাম নদীগর্ভে নিপতিত হইলে ইহারা এখানে নূতন বসতি বিস্তার করিয়াছেন। ইহাদের বংশে স্বর্গীয় ললিতমোহন সাহা চৌধুরী মহাশয় এতদঞ্চলে ও সিরাজগঞ্জে এক সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন এবং প্রবাদ আছে কমলার সুদৃষ্টি হেতু তিনি সাহা সমাজের মধ্যে বল্লালসেন তুল্য সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পূর্বে সিরাজগঞ্জের ইহাদের বড় গোলায় অধুনাতন ব্যাঙ্কের ন্যায় নানারূপ হুণ্ডি বরাত প্রভৃতি মহাজনদিগের অনেক টাকা কড়ি আদান প্রদান ও আমানতাদির কারবার চলিত। বর্তমানে ইহাদের অবস্থা অনেকাংশে হীন হইলেও, ইহাদের বাটিতে দৈনিক বিগ্রহ সেবা এবং অতিথিঅভ্যাগতের সমাদরাদির ব্যবস্থা বর্তমান আছে। ধনকুবের হইলেও ইহাদের মধ্যে পাকা ইমারত নির্মাণ প্রথা পূর্বাপর বর্তমান না থাকায় ইহাদের বাটিতে কোন ইষ্টকালয় বর্তমান নাই বটে, কিন্তু টিনের ঘরের বিশেষ পরিপাট্য পরিলক্ষিত হয়।

এই গ্রামে চক্রবর্তী উপাধিক ব্রাহ্মণ, সূত্রধর এবং মুসলমানগণ মধ্যে অনেক করিগর জাতির বাস আছে। অনেকে বলেন এখানে পূর্বে বহু অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানদিগের বাস ছিল, তজ্জন্য এই গ্রামের নাম সৈয়দ আবাদ হইতে সয়দাবাদরূপে পরিণত হইয়াছে। এখানে প্রতি বৎসর বারুণী গঙ্গাস্নান উপলক্ষে একটি মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

কাওয়াখোলা ঃ

সিরাজগঞ্জ কোলবন্দর সংলগ্ন কাওয়াখোলা একটি সুবৃহৎ প্রাচীন পল্লী। এখানে অনেক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। অধুনা এখানকার ভট্টাচার্য পরিবার সমধিক প্রসিদ্ধ। হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে এখানে বহু তন্তুবায় কর্মকার, বৈশ্যসাহা, জালিক ও নানা শ্রেণীর হিন্দুজাতি ও

অনেক মুসলমানের বাস আছে। এই গ্রামের হারাণচন্দ্র সাহা মহাশয় অতিথি পরায়ণতার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন : এখনও তাহার বংশধরগণ পালাক্রমে অতিথি সৎকার করিয়া থাকেন। এই গ্রামে অনেক তন্তুবায়ের বাস হইলেও অনেকে বয়নকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং নানারূপ ব্যবসায় ও চাকুরিতে লিপ্ত হইয়াছেন। এখানে একটি সাপ্তাহিক হাট লাগিয়া থাকে। গ্রামখানি সুবৃহৎ এবং নানা শ্রেণীস্থ অধিবাসী পূর্ণ হইলেও স্থানীয় উন্নতি জন্য গ্রামবাসিদিগের বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায় না।

বয়রা গ্রাম কাওয়াখোলার উত্তরাংশে অবস্থিত। এখানে একটি প্রসিদ্ধ হাট আছে ; তথায় নানা প্রকার যে সমস্ত দ্রব্যাদি আমদানি হয় তন্মধ্যে এখানকার ডাউল অতি প্রসিদ্ধ ও বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। সিরাজগঞ্জ বন্দরে যত প্রকার ডাউল আমদানি হয়, তাহার অধিকাংশ এই হাট বয়রা গ্রাম হইতে প্রস্তুত হয়। এই গ্রামের অনেক সাহা উপাধিক ব্যবসায়িগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘোড়ার উপর চাপাইয়া মটর মশুর খেসারির ডাউল ও ভূষি সিরাজগঞ্জ বন্দরে আমদানি করে এবং তাহার ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জন করে।

রাইপুর সিরাজগঞ্জ সংলগ্ন গ্রাম, এখানকার মিঞা উপাধিক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশ অতিশয় প্রসিদ্ধ। ইহারা এক সময়ে এতদঞ্চলে সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বর্তমান সময়ে এখানে যে একটি রেলওয়ে স্টেশন নির্মিত হইয়াছে, তাহাই সিরাজগঞ্জ স্টেশন নামে পরিচিত।

রাণীগ্রাম ঃ

সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি সংলগ্ন রাণীগ্রাম একটি প্রাচীন পল্লী। এথাকার রায় উপাধিক বৈদ্য বংশীয় ভূম্যধিকারিগণ এতদঞ্চলে প্রাচীন বংশ বলিয়া পরিচিত। পূর্বে ইহারা সমস্ত বড়বাজু পরগণার মালিক ছিলেন। মুর্শিকুলি খাঁর কঠোর রাজস্ব আদায় প্রথার ফলে এই বংশীয় জনৈক রাধারাম রায় মুর্শিদাবাদে ধৃত হইলে, তদীয় আত্মীয়বর্গ সম্পত্তির অর্ধাংশের বিনিময়ে বেলকুচির চৌধুরী বংশীয় মুসলমান জমিদারগণের পূর্বাধিকারী আফজাল মহম্মদ নামক জনৈক ধর্মাত্মার সহায়তায় তাহাকে কারামুক্ত করেন। তদবধি উক্ত পরগণার অর্ধাংশ ইহাদের হস্তচ্যুত হইয়া তাহা হইতে বেলকুচির মুসলান জমিদারবংশের উৎপত্তি হয়। ইহাদের সম্পত্তি কালক্রমে অনেকাংশে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের অনেকে বর্তমানে নিঃস্ব অবস্থাপন্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহারা ইহাদের পূর্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত ধাতুময়ী গোবিন্দজি নামক বিগ্রহের দৈনিক সেবা পূজা ও বার্ষিক ক্রিয়াকলাপ পূর্ববৎ বজায় রাখিয়াছেন। রাণী গ্রামে ইহাদের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন মঠে কয়েকটি শিবলিঙ্গমূর্তি স্থাপিত আছে। অধুনা এই বংশীয় অনেকেই চাকরিজীবী হইলেও ইহারা প্রাচীন ভূম্যধিকারী বলিয়া পূর্বাপর খ্যাত হইয়া আসিতেছেন। এখানকার ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য অনেক হিন্দু. ইহাদের কর্তৃক ভিন্ন স্থান হইতে আনীত মুসলমান সংখ্যাও এখানে যথেষ্ট। এই গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারস্থ জনৈক ব্যক্তির উদ্যোগে এখানে একটি মোজা গেঞ্জির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল ইহা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কাজিপুর ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ১৬ মাইল উত্তরে কাজিপুর একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। বর্তমানে এখানে একটি পুলিশ স্টেশন ও দাতব্য চিকিৎসালয় বর্তমান আছে। পূর্বে এখানে একটি সাবরেজেস্টারী অফিস ছিল, তাহা সম্প্রতি গান্দাইলে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখানকার হিন্দু অধিবাসিগণ মধ্যে তরফদার উপাধিক কায়স্থ পরিবার এবং কতকগুলি জালিক বা ধীবর জাতির বাস। এতদ্ব্যতীত মুসলমান সংখ্যাই বেশি। দৈনিক বাজার ও সাপ্তাহিক হাট আছে। শীতকালে এখানে একটি মেলার অনুষ্ঠান হয়।

এখানে সন্তোষের ভূম্যধিকারিণী স্বর্গীয়া রাণী দীনমণি চৌধুরাণী মহাশয়ার তহশীল কাছারি বাড়ি বর্তমান আছে। এখানকার মধ্য ইংরাজি স্কুলটি তাহার স্টেটের সাহায্যে পরিচালিত।

কাজিপুর নাম হইতে প্রকাশ পূর্বে এতদ্বঞ্চলে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের বাস ছিল। পূর্বে এখানে মুসলমান আমলে কাজির বিচারালয়াদি অথবা কাজি উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বাস ছিল তজ্জন্য এই স্থানের এরূপ নামকরণ হইয়াছে। এখান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দক্ষিণে **মেছরা** নামক পল্লীতে অনেক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান গৃহস্থের বাস আছে। তাহাদের উদ্যোগে জমিদারগণের সহায়তায় এখানে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে টাঙ্গাইলের অধীনস্থ আওলা নিবাসী কায়স্থ জমিদারগণের তহশীল কাছারি বর্তমান আছ। পূর্বে সুপগাছা নামক স্থানে একটি পুলিশ স্টেশন ছিল, তাহাই এক্ষণে কাজিপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

সোনামুখী ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ১৭ মাইল পশ্চিমোত্তরে সোনামুখী পাবনা ও বগুড়া জেলার মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। এখানে ও নিকটবর্তী ভানুডাঙা নামক স্থানে শারদীয় দুর্গোৎসব সময়ে অতি সমারোহ পক্ষাধিককাল ব্যাপী একটি সুবৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই মেলায় অনেক কাষ্ঠ নির্মিত দ্রব্যাদি আমদানি হয়। এখানে লৌহ শ্রমজীবী কর্মকারগণের বাস আছে। এখানকার অনেক জলাশয়ে ঝিনুক মধ্যে মতি পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—রায়গঞ্জ

রায়গঞ্জ ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ১৯ মাইল পশ্চিমে ফুলঝোর নদীর পূর্বপারে অবস্থিত রায়গঞ্জ একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে নানা জাতীয় হিন্দু ও মুসলমানের বাস। এতদঞ্চলে পূর্বাপর বহু বস্ত্রবয়নকারী মুসলমান কারিকরগণের বাস আছে। তজ্জন্য রায়গঞ্জ গ্রাম কাপড়িয়া রায়গঞ্জ নামে পরিচিত হইয়া থাকে। পূর্বে এখানে অনেক বিদেশিয় বণিক কাপড় খরিদ জন্য সমাগত হইত। অধুনা এখানে একটি পুলিশ থানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

রায়গঞ্জের নিকটবর্তী **লাহোর** নামক পল্লীতে অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাস। এখানকার সান্যাল বাগছি, উপাধিক ব্রাহ্মণগণ জমিদার বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন।

ধানঘরা ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ১৮ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে ফুলঝোরা নদীর পূর্বপারে অবস্থিত ধানঘরা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। **ঝাপরা** একটি পৃথক গ্রাম হইলে উভয় পল্লীদ্বয়ই একত্র পরিচিত এবং অতি প্রাচীন গ্রাম বলিয়া খ্যাত হয়। গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান লোক সংখ্যা প্রায় সমান। হিন্দু মধ্যে অধিকাংশ সাহা, মোদক প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতিই অধিক। মুসলমান মধ্যে এখানে অনেক কারিকর জাতীয় লোকের বাস। ব্রাহ্মণ কায়স্থ সংখ্যা অতীব কম। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে অনেকেই এখানে বাণিজ্যের কল্যাণে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। নদীতে বন্দরের অনেকাংশ ভাঙিয়া ইহার অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। এখানে চিকিৎসক সংখ্যা অনেক ; সাপ্তাহিক দুই দিন হাট ও দৈনিক বাজার লাগিয়া থাকে।

যাবতীয় পণ্য দ্রব্যাদি মধ্যে ধান, পাট, লবণ, মরিচ, গুড় প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য আমদানি হয়। বর্ষাকালে পাট খরিদের সময়ে অনেক মহাজনদিগের এবং কুঠিয়ালগণের পাট এখান হইতে খরিদ হয়। এখানে একটি পাঠশালা বর্তমান আছে। নদীর পশ্চিম পারে একটি ডাকবাঙলা নির্মিত হইয়াছে। এই সমৃদ্ধিশালী বন্দরে স্থানীয় লোকের উদ্যোগে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এখান হইতে চান্দাইকোণা, রায়গঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েকটি রাস্তার সংযোগ আছে। সিরাজগঞ্জ হইতে এখানে যাতায়াতে রাস্তার অসুবিধাও বিদূরিত হওয়া আবশ্যক।

করিলাবাড়ি ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত করিলাবাড়ি একটি প্রাচীন পল্লী। এখানে অনেক প্রাচীন কীর্তিকলাপের নিদর্শন মধ্যে কয়েকটি দীর্ঘিকা বর্তমান আছে। এখানকার নিয়োগী উপাধিক কায়স্থ বংশ সমধিক প্রসিদ্ধ। কথিত আছে পূর্বে এতদঞ্চলে অনেক দস্যু ও তস্করাদির বাস ছিল। এই নিয়োগী পরিবারস্থ জনৈক স্বর্গীয় কমলাকান্ত নিয়োগী মহাশয় নবাবী আমলে উক্ত দস্যু দমনের সহায়তাপূর্বক এতদঞ্চলে অনেক ভূসম্পত্তি জায়গির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত জায়গির সমূহ এক্ষণে কমলাকান্ত স্টেট বা সম্পত্তি নামে পরিচিত হইয়া থাকে। উক্ত কমলাকান্ত নিয়োগী মহাশয় জঙ্গল পরিষ্কার কালে একটি প্রাচীন মন্দির মধ্যে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত বিগ্রহ গোপীনাথ নামে পুনঃ প্রচলিত করিয়া তাহার সেবাপূজা পরিচালনার্থ যথাযোগ্য যে দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্দারা অদ্যাপি উক্ত বিগ্রহের সেবা পরিচালিত হইতেছে। গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া পূর্বে একটি স্রোতস্বতী প্রবাহিত ছিল ; অধুনা ইহার খাত বর্তমান আছে। বর্তমান সময়ে এখানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অধিক। গ্রামটি ক্রমে পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হইতেছে।

পাঙাসি ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় আট মাইল পশ্চিমে ইছামতী নামক নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পাঙাসি একটি প্রাচীন গ্রাম। ইহা সাধারণত হাট পাঙাসি ও গ্রাম পাঙাসি নামে পরিচিত হইয়া থাকে। হাট পাঙাসিতে ব্যবসায়িগণের দোকান এবং কারবার স্থান বর্তমান আছে। পাট খরিদ বিক্রয় জন্য ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া খ্যাত। গ্রাম পাঙ্গাসিতে কুশীদ বাণিজ্যজীবী অনেক বৈশ্য জাতির বাস। ইহাদের অনেকেই পূর্বে অতি অবস্থাপন্ন ও সমৃদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইতেন। এখানে অনেক ধনাঢ্য খুলু জাতির বাস। তাহারা প্রচুর পরিমাণে উত্তম তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকে। হাট পাঙাসি বর্ষা সময়ে পাট খরিদ বিক্রি জন্য নানাস্থানের ব্যবসায়ীগণের সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এখানে সাপ্তাহিক হাট এবং দৈনিক বাজার বসিয়া থাকে। সিরাজগঞ্জ বগুড়া রোড এই গ্রাম ভেদ করিয়াছে।

চান্দাইকোণা ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমোত্তর কোণে চান্দাইকোণা ফুলঝোরা নদীর দক্ষিণ তীরে পাবনা জেলার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। ইহার কতকাংশ বগুড়া জেলার মধ্যেও অবস্থিত। হাটের মধ্যস্থলে একটি স্থান উভয় জেলার সীমা নির্দেশক একটি স্তম্ভ প্রোথিত আছে। গ্রামটি ফুলঝোর নদী হইতে নির্গত একটি খালের পূর্বাংশে অবস্থিত, হাটখোলা ও বন্দরটি সমস্তই এই খালের পশ্চিম পারে অবস্থিত। এই গ্রামে অনেক গন্ধবণিক জাতির বাস। ইহারা সকলেই বাণিজ্য ব্যবসায়ী এবং এই সমাজের কৃষ্ণলাল দত্ত (চৌধুরী) মহাশয় স্থানীয় ধনাঢ্য মহাজন এবং ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিচিত। তাহার বাটিতে দৈনিক দেবসেবা ও অতিথি সেবাদির বন্দোবস্ত আছে। এতদ্ব্যতীত ইহার উদ্যোগে ও যত্নে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত এথাকার একমাত্র উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়টির অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

চান্দাইকোণায় সাপ্তাহিক একটি প্রকাণ্ড হাট বসিয়া থাকে। ইহাতে বহু দ্রব্যাদি আমদানি হইয়া থাকে। এখানে অনেক হাড়ি পাতিল ও উত্তম চিঁড়া পাওয়া যায়। এখানে বহুল পরিমাণে ধান আমদানি হয়। পাবনা জেলার সদিয়াচাঁদপুর, সোহাগপুর প্রভৃতি গ্রামের ও অন্যান্য বহু স্থানের মহাজনদিগের কারবারী আড়ত ও গোলাদি বর্তমান আছে। এখানে অনেক দেশিয় কাপড়াদি পাওয়া যায়। ব্যবসায় কেন্দ্র হিসাবে চান্দাইকোণা পাবনা জেলার পশ্চিমোত্তরাংশে একটি প্রধান ও প্রসিদ্ধ বন্দর। ধানঘরা হইতে চান্দাইকোণা রাস্তাটির অবস্থা কথঞ্চিৎ ভাল হইলেও, সিরাজগঞ্জ হইতে ধানঘরা পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক নহে। এখানে বাজার ও স্থানীয় বিদেশিয় মহাজনগণের আড়তাদি সংলগ্ন পল্লীতে অনেক বারবণিতার বাস দেখা যায়।

চান্দাইকোণার নিকটবর্তী **কোদলা** একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে পূর্বে চৌধুরী উপাধিক বঙ্গজ কায়স্থগণের বাস ছিল। এথাকার গোস্বামী পরিবার বহুদিন হইতে এখানে বাস করিতেছেন। ইহাদের আগরতলার মহারাজার প্রদত্ত অনেক ব্রহ্মাত্র সম্পত্তি আছে। এই গ্রাম এক সময়ে শ্রীপাট কোদলা নামে পরিচিত হইত।

আটঘরিয়া ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ১৪ চৌদ্দ মাইল পশ্চিমে ফুলঝোর নদীর পূর্বপারে অবস্থিত আটঘরিয়া একটি প্রাচীন ভদ্রপল্লী। এখানকার চক্রবর্তী পরিবার গ্রামের জমিদার ; ইহাদের পরিচালিত একটি মধ্য ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার ও করোটিয়ার খাঁ সাহেবের কাছারি বাড়ি বর্তমান আছে। সুবর্ণবণিক, কৈবর্ত, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি হিন্দু এবং মুসলমানের এখানে বাস। সাপ্তাহিক একটি হাট লাগিয়া থাকে।

নদীর অপর পারে প্রায় এক মাইল দূরে **ঘুরকা** নামক পল্লী অতি প্রাচীন, এখানে পূর্বাপর অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস আছে। এখানে নাটোররাজ রাজা রামজীবনের সভাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমের বাস ছিল। তিনি "পদঙ্কদূতম" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। গ্রামে দৈনিক বাজার ও সাপ্তাহিক হাট লাগে। গ্রামখানি সুবৃহৎ, জঙ্গলাকীর্ণ এবং এখানে ব্যাঘ্রের বিশেষ উপদ্রব আছে।

ভুঁইয়াগাতি ঃ

ফুলঝোর নদীতীরে ভুঁইয়াগাতি একটি বৃহৎ পল্লী। এখানে অনেক বর্ধিষ্ণু কৈবর্ত জাতির বাস আছে। দৈনিক বাজার ও সাপ্তাহিক হাট বসে। এথাকার বাজার প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে লাগিয়া থাকে ; ইহা এথাকার বিশেষত্ব। ধানঘরা, নিমগাছি ও সিরাজগঞ্জ রায়গঞ্জ রোডের এখানে পরস্পর সংযোগ হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ৯ মাইল পশ্চিমে **নলকা** ঝুলঝোর তীরে পাট খরিদ বিক্রয়ের জন্য একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বিশেষ। এখানে বর্ষাকালে অনেক পাট আমদানি হইয়া থাকে এবং নিকটবর্তী সাহেবগঞ্জও একটি বন্দর। সোনগাছি নামক গ্রামে এই জেলার ইদানিন্তন কালের প্রসিদ্ধ ডাকাইত মহর খাঁর বাস ছিল, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মহর খাঁ পাবনায় ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছে। তাহার উদ্যোগে নলকা একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, নদীর অপর পারে সলপের আশুতোষ লাহিড়ী নামক জনৈক ভদ্রলোক যে একটি হাট সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা আশুগঞ্জ নামে পরিচিত।

তাড়াস ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ পশ্চিমে বিল চলন মধ্যে অবস্থিত তাড়াস একটি প্রাচীন গ্রাম। অনেকে বলেন পূর্বে ইহা অতি দুর্গম ছিল জন্য এখানে আসিতে লোকে শঙ্কিত হইত, তজ্জন্য তড়াস বা ভীতিসঙ্কুল এই স্থানের নাম কালক্রমে তাড়াস নামে অভিহিত হইয়াছে।

এখানে গোস্বামী, চক্রবর্তী উপাধিক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্তাদি নানা জাতীয় হিন্দু এবং মুসলমানের বাস। জমিদার প্রধান স্থান হইলেও গ্রামের বর্তমান অবস্থা সমধিক উন্নত নহে। বহু প্রাচীন দীর্ঘিকা বর্তমান স্বত্বেও এখানে অধিবাসীগণের বিশেষ জলকষ্ট আছে বলিয়া বোধ হয়। গ্রামটি জঙ্গলাকীর্ণ এবং ম্যালেরিয়া প্রধান।

তাড়াসের বার্ষিক ঝুলনোৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদুপলক্ষে বড় তরফ ও পূর্ব বাটির নন্দীর তরফের বার্ষিক প্রায় ১৫/১৬ হাজার টাকা খরচ হইয়া থাকে এবং পক্ষাধিক কাল স্থায়ী মেলার অনুষ্ঠান হয়। বড় তরফ হইতে তিন দিন জন্য সমাগত দর্শক ও পণ্ডিত মণ্ডলীর আহার্য বাবদ সিধা এবং ব্রাহ্মণগণের বিদায় দিবার ব্যবস্থা আছে। পূর্ববাটিতে বিশেষ সিধার ব্যবস্থা না থাকিলেও পণ্ডিত বিদায় ও সঙ্গীতাদির বন্দোবস্ত আছে।

গ্রামে দৈনিক বাজার, একটি ডাক বাঙ্‌লা, পোস্টাফিস, পুলিশ স্টেশন ও দাতব্য চিকিৎসালয় বর্তমান আছে। স্থানীয় লোকের চেষ্টায় গ্রামের বর্তমান স্কুলটিকে উচ্চ ইংরাজি স্কুলে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। বড় তরফের গোবিন্দজী ও রসিকরায়, পূর্ববাটিতে গোপাল বিগ্রহ এবং নন্দীর তরফ ও মুৎসদ্দির তরফের বলভদ্রের দৈনিক সেবা ও অতিথি সেবাদির বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে। এথাকার ভগ্নপ্রায় একটি জোড়বাঙ্‌লার গাত্রে ১৬৬১ শকাব্দের খোদিত লিপি দৃষ্টে জানা যায় এখানে পূর্বে নাগ উপাধিক কায়স্থগণের গোপীনাথ নামক বিগ্রহের সেবা বর্তমান ছিল। বলরাম রায় কর্তৃক খনিত কুঞ্জবন নামক একটি সুবৃহৎ জলাশয় এখনও বর্তমান আছে। স্থানীয় মহাপ্রভুর আখড়ায় পিতল নির্মিত একখানি দশভূজা মূর্তি বর্তমান আছে। এখানকার কপিলেশ্বর শিব মন্দির ও তন্নিকটবর্তী কালিকা দেবী মন্দির অতি প্রাচীন। বড় তরফ ও পূর্ববাটিস্থ কর্মচারিবর্গের প্রচেষ্টায় এখানে কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর নির্মিত বাসুদেব মূর্তি রক্ষিত আছে। পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রামে এখনও অনেকানেক প্রাচীন বিগ্রহ মূর্তি সমূহ সময় সময় পাওয়া যায়। সামান্য উদ্যোগ করিলে এই সকল মূর্তি সংগৃহীত হইয়া তাড়াসে একটি মিউজিয়াম বা যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং দেশের অনেক প্রাচীন কীর্তিচিহ্ন রক্ষিত হইতে পারে ; এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাড়াসের নিকটবর্তী ভাদাস নামক পল্লীতে এক সময়ে হারু সরকার নামক অতিথি পরায়ণ জনৈক মুসলমান গৃহস্থের বাস ছিল। তাহার জন্য এই গ্রাম এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কোহিত ঃ

তাড়াসের এক মাইল পশ্চিমাংশে কোহিত নামক প্রাচীন পল্লী অবস্থিত ; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের বেণী পঠির কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজ প্রতিষ্ঠাতা বেণী রায় মহাশয়ের নিবাস এই কোহিত নামক গ্রামে ছিল বলিয়া জানা যায়। এখন পর্যন্ত এখানে তাহার পুকুর ও বাসস্থানাদির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। অধুনা এখানে হিন্দু অধিবাসী নাই, কেবলমাত্র কয়েক ঘর মুসলমানের বাস আছে।

বিনসরা বেহুলার পিতা বাছো বণিকের বাসভূমি বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এখানে একটি পাকা ইন্দারা মধ্যে অনেকে দুধ ও নানা প্রকার মানসিক নিক্ষেপ করিয়া থাকে। অধুনা এখানে মাত্র কোণাই, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির বাস আছে।

কোহিতের দক্ষিণে **দীঘি সগুনা ও মাগুড়া** বিনোদ নামক বিল মধ্যবর্তী গ্রামে সান্যাল উপাধিক ব্রাহ্মণ এবং সরকার উপাধিক কায়স্থ জাতির বাস আছে। চলন বিল মধ্যবর্তী **পিপলা** নামক গ্রামে নিয়োগী উপাধিক কায়স্থগণের বাস ছিল। তাড়াসের পূর্ব দক্ষিণে **প্রতাপ** একটি প্রসিদ্ধ হাট জন্য সুপরিচিত। তাড়াসের নিকটবর্তী **অলিপুরে** একটি প্রকাণ্ড হাট লাগিয়া থাকে। পূর্বে এ সকল অঞ্চলে অনেক দস্যু ভয় ছিল। এক্ষণে এই সকল স্থান অনেক নিরাপদ হইয়াছে।

নিমগাছি ঃ

তাড়াস হইতে প্রায় তিনক্রোশ উত্তরে নিমগাছি অতি প্রাচীনতম পল্লী। ইহা সাধারণত বিরাট রাজার দক্ষিণ গো-গৃহ বলিয়া জনপ্রবাদে বহু দিন হইতে পরিচিত। মহাভারতোক্ত বিরাট ভবনের বিবরণে মৎস্যদেশ উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ মথুরা সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। উত্তর বঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের কার্য বিবরণী (১৩৭১) ৮৩ পৃষ্ঠায় বিনোদবিহারী রায় মহাশয় "রাজা বিরাট ও মৎস্যদেশ" নামক প্রবন্ধে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় বগুড়ার ইতিহাস লেখক প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত "রাজা বিরাট ও মৎস্যদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া মোটামুটি দেখাইয়াছেন যে, "১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত এই মৎস্যদেশ রাজা বিশ্বসিংহ (কুচবিহারের রাজবংশের পূর্ব পুরুষ) কর্তৃক কল্পিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গকে পাণ্ডব বর্জিত দেশ এই অপবাদ হইতে মুক্ত করাই তাহার উদ্দেশ্য .... অতএব উত্তরবঙ্গ মহাভারতোক্ত প্রকৃত বিরাট দেশ বা মৎস্যদেশ নহে, কল্পিত মৎস্যদেশ"।

"ভবানীপুর কাহিনী" ও "ভবানীপুর মাহাত্ম্য" নামক পুস্তকদ্বয় পাঠে জানিতে পারা যায় বল্লাল প্রতিষ্ঠিত বর্তমান বগুড়া জেলাস্থ ভবানীপুর নামক পীঠস্থানের উত্তরাংশে কমলাপুর নামক স্থানে সেন রাজগণ ২০০ বৎসর স্বাধীন রাজারূপে এবং দুইশত বৎসর পাঠান রাজ্যারম্ভে করদ বা সামন্তরাজরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। নিমগাছি উক্ত সেন রাজ্যান্তর্গত ছিল ; অচ্যুতসেন ঐ বংশীয় শেষ নরপতি। গৌড়েশ্বর পাঠান সুলতান ফিরোজ পুত্র সুলতান বাহাদুর শাহের সহিত যুদ্ধজয়ের নিদর্শনস্বরূপ তিনিই এখানকার **জয়সাগর, প্রতাপদীঘি,** উদয়দিঘি নামক সুবৃহৎ দীর্ঘিকাসমূহ খনন করাইয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধাভিনয় ১৫৩৩/৩৪ খ্রিস্টাব্দের সমকালে সংঘটিত হইয়াছিল এবং পূর্বোক্ত কুচবিহারের মহারাজ বিশ্ব সিংহ কর্তৃক উত্তরবঙ্গ ও কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত লুপ্ত পীঠস্থানসমূহের উদ্ধার সাধনও ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ভবানীপুরও একটা পীঠস্থান মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় নিমগাছি ও তদুত্তরাংশস্থিত স্থানসমূহে বিরাট রাজার গো-গৃহের অবতারণাদি সমস্তই প্রাগুক্ত কল্পিত মৎস্যদেশ বলিয়াই অনুমান হয়।

নিমগাছির হাট হইতে প্রায় ১।। মাইল উত্তরাংশে একস্থানে প্রায় ২০/২২ হাত উচ্চ একটি মৃত্তিকা স্তূপ মধ্যে ধরণীগর্ভে একটি প্রাচীন অট্টালিকার নিদর্শন আবিদ্ধৃত হইয়াছে। এই স্থান সাধারণত বুরুজ নামে খ্যাত হইয়া থাকে। উপরে বৃহদাকার বটবৃক্ষাদি জন্মিয়াছে, নিম্নে বাসোপযোগী ইষ্টকালয় ও তাহার দরজার চিহ্নাদি বর্তমান আছে। নিমগাছি অঞ্চলে প্রচলিত নিম্নলিখিত কবিতাংশ—

শীতল সাহা খোঁড়ে নিমগাছি।
টাকার নামে ....।।

হইতে প্রকাশ ঝাপড়া নিবাসী জনৈক শীতলচন্দ্র সাহা ধনরত্নাদি প্রাপ্তির আশায় ইহার কোন স্থান খনন করিয়াছিলেন। জানা যায় সিরাজগঞ্জের ভূতপুর্ব মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নোলন সাহেবের আমলে বনওয়ারিবাবুর সময়েও এই বুরুজের স্থান খনিত হইয়াছিল।

নিমগাছিতে স্থানে স্থানে ৮/১০ হাত উচ্চ কতকগুলি মৃত্তিকা স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। একটির উপরিভাগ ৭।। × ১।। × ১।। হাত পরিমিত স্থাপত্য শিল্প পরিশোভিত একখানি বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ড পতিত রহিয়াছে। ইহা একটি দরজার উপরিভাগে অবস্থিত প্রস্তরখণ্ড বিশেষ। ইহার গাত্রে উপর্যুপরি তিনটি মূর্তি খোদিত আছে। মূর্তিত্রয় পরস্পর সমানুপাতিক। যেটি সর্বোপরি সেটি তন্নিম্নটির আয়তনে দ্বিগুণ। সর্বনিম্নটি প্রথমটির চতুর্গুণ ; শেষোক্তটির মস্তকে উষ্ণীষ, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে হার, বাহুতে বলয় বর্তমান আছে। দেখিলে সহসা ধ্যানী

বুদ্ধ মূর্তি বলিয়াই বোধ হয়। মধ্যটির স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ শিবলিঙ্গমূর্তি ও নানাপ্রকার প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি দর্শনে অনুমান হয় এই প্রদেশে পূর্বে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল, পরে বৌদ্ধতান্ত্রিকতা কালে এদিকে শৈবধর্মের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কাল সহকারে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র অতীতের সাক্ষী স্বরূপ এই সকল মূর্তিগুলি রৌদ্র বৃষ্টির আক্রমণ সহ্য করিয়া স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং বর্তমানে আমাদের নিকট অতীত যুগের কাহিনীসমূহ নীরবে ঘোষণা করিতেছে।

নিমগাছিতে স্থানে স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি, স্থানে স্থানে মৃত্তিকা স্তূপ ও তদুপরি প্রস্তর নির্মিত প্রাচীন অট্টালিকাদির নিদর্শন, বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ইষ্টক নির্মিত প্রাচীন রাজবর্ত্মের চিহ্ন এবং একস্থানে একটি খাতের উপর ইষ্টক নির্মিত সেতুর ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কালে এই স্থান অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ও সুরম্য হর্ম্যমালা পরিশোভিত নগরে পরিণত ছিল।

নিমগাছির নিকটবর্তী মাধাইনগরে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে এই সমস্ত প্রদেশ এক সময়ে সেনরাজগণের অধিকারভুক্ত ও তাহাদের লীলাভূমিতে পরিণত ছিল। সিরাজগঞ্জের কবিরাজ গোপীচন্দ্র সেন মহাশয় এই তাম্রশাসনের যে পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাতে মাধাইনগরের উত্তর সীমা "বিরাজনগর" বলিয়া নির্দেশ করেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্তও এখানে একটি স্তূপ বুরুজ নামেই পরিচিত হইতেছে। এমতাবস্থায় বোধ হয় এই "বিরাজনগর" ও "বুরুজ" শব্দ হইতে কালে লোক মুখে এই প্রদেশকে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসস্থল বিরাটনগরের সহিত কল্পিত হইয়াছে। এই কল্পনা হইতে নিমগাছিতে এখন পর্যন্ত কোন কোন স্তূপ "বিরাট রাজার স্কুল", কোনটি "নাট্যশালা" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেছে। প্রাচীন করতোয়ার মৃত খাত এখন পর্যন্ত "কীচকখালি" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "জয়সাগর" নাম দৃষ্টে পাল বংশীয় জয়পাল প্রভৃতির লীলা নিকেতন বলিয়া এই ভূভাগকে নির্দেশ করিয়াছেন, জয়সাগর প্রসঙ্গে তাহা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

যাহা হউক, নিমগাছির এই বিরাটনগর মহাভারতোক্ত বিরাট ভবন না হইয়া ইহা পাল অথবা সেন রাজাগণের বা অন্য কোন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির আবাসস্থল বিরাটনগর রূপেই হউক, কিংবা অন্য কোন রাজা মহারাজার আবাসস্থল ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্বে এই প্রদেশ দিয়া করতোয়া নদী প্রবাহিত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে মৃত খাতের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। নদী প্রবাহিত থাকা কালে করতোয়া তটস্থ নিমগাছির এই প্রদেশের বহুস্থানে প্রাচীন কীর্তি বর্তমান ছিল। নদীর গতি পরিবর্তন নিবন্ধন এই সকল জনপদ ও পল্লীসমূহের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কীর্তি সমূহ ক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। উপযুক্ত লোকের হস্তে চেষ্টার ভার পড়িলে ও সবিশেষ উৎসাহিত হইলে এবং দেশের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইলে আমাদের এই ক্ষুদ্র জেলার অনেক পুরাতত্ত্ব ও অভিনব রহস্য উদঘাটিত হইতে পারে। এই সমস্ত স্থানের অবস্থা পরিদর্শন করিলে স্বতঃই মনে নূতন ভাবের উদয় হয়। তজ্জন্য "সুরাজ" পত্রিকায় রায়গঞ্জের অধীনস্থ লাহোর গ্রাম নিবাসী রমেশচন্দ্র ভাদুড়ি মহাশয় নিমগাছির সম্বন্ধে আবেগভরে লিখিয়াছন "এই বিস্তৃত স্থানে কত ভগ্ন মন্দির, কত রাজবাড়ি, দীর্ঘিকা পুরাকালের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া কোন সাধকের পথপানে চাহিয়া আছে।"

পূর্বে নিমগাছিতে বন্য মহিষ ও ব্যাঘ্রাদির বিশেষ উপদ্রব ছিল। দিবাভাগে এথাকার জঙ্গলময় পথে যাতায়াত সুকঠিন ছিল। তাড়াসের সুযোগ্য ভূম্যাধিকারী বনওয়ারিলাল রায় মহাশয়ের শিকার ফলে এথাকার বন্যজন্তুর অত্যাচার অনেকাংশে হ্রাস হয়। তিনি সাঁওতাল পরগণা হইতে অনেক মুণ্ডা, বুনা, মাহাতো, ওরাওন প্রভৃতি জাতিগণকে এখানে আনয়ন

করিয়া স্থাপন করেন ; তাহারা এখানকার অনেক জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে। এই সমস্ত জাতি ভিন্ন মাত্র স্থানে স্থানে ২/১ ঘর চাষী মুসলমানের বাস ভিন্ন এতদঞ্চলে কোন হিন্দু জাতির বাস নাই।

নিমগাছি হাটের নিকটে ভোলা দেওয়ানের দরগা এখানে অতি প্রসিদ্ধ। ইহা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক সম্মানিত। তাড়াস, বলিহার প্রভৃতি জমিদারগণের স্টেট এই দরগাহের চেরাগি নিমিত্ত পীরপাল জমি নির্দিষ্ট আছে। প্রকাশ সত্যনারায়ণ সাহা নামক জনৈক ব্যবসায়ীর ভোলা নামক একটি ভৃত্য ছিল। হাটে যাইবার পথে সে ব্যাঘ্র মূর্তি ধারণপূর্বক জঙ্গলে প্রশে করে। ইহা তাহার ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার পর যে স্থানে ভোলা ব্যাঘ্র মূর্তি ধারণপূর্বক জঙ্গলে প্রবেশ করে, তথায় এই দরগাহ নির্মিত হইয়াছে। তজ্জন্য অদ্যাপি ব্যাঘ্র ভীতি নিবারণ জন্য এই দরগাহে লোকে সসম্মানে সিন্নি ও মানসিক প্রদান করিয়া থাকে।

বর্তমান সময়ে এখানে একটি সাপ্তাহিক বড় হাট, তাড়াস জমিদারগণের তিন সরিকের কাছারি এবং কয়েকটি মহাজনের দোকান ঘর বর্তমান আছে। এই প্রদেশের অবস্থা বর্তমান সময়ে অতি স্বাস্থ্যকর। স্থানে স্থানে প্রাচীন জলাশয় বর্তমান আছে। সংস্কার ব্যতীত তাহার জল অব্যবহার্য। তবে স্থানে স্থানে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কয়েকটি ইন্দারা বর্তমান আছে। ব্যবসায় হিসাবে নিমগাছি অতি উত্তম স্থান। একমাত্র যাতায়াতের রাস্তার অভাব ভিন্ন এই প্রদেশ বাসের পক্ষে অতীব স্বাস্থ্যকর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। জমিদারগণ সামান্য চেষ্টা করিলেই এ প্রদেশে অনেক বসতি বিস্তার ঘটিতে পারে। তবে তাহারা সাধারণ প্রজা অপেক্ষা ভদ্রলোক প্রজা পছন্দ করেন না এমন শুনিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর নিমগাছি এক্ষণে সম্পূর্ণ বাসোপযোগী স্থান তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই প্রদেশে মুণ্ডা, ওরাওন জাতিসমূহ মধ্যে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ডাল পূজা ও পচাই নামক দেশিয় মদ্যপান এবং স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া আমোদ উৎসবাদি প্রচলিত আছে। ইহা ইংরেজগণের বল ড্যান্সিং-এর অনুরূপ না হইলেও কতকাংশে তাহার সহিত সাদৃশ্য আছে। অধুনা এই সমস্ত জাতি মধ্যে অনেকে চাষ আবাদ ও পাটের ব্যবসায়ের কল্যাণে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। অনেকের বাড়িতে করগেট টিনের গৃহাদি বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষার জন্যও ইহারা পূর্বাপেক্ষা উৎগ্রীব হইয়াছে।

বারুহাস ঃ

তাড়াসের প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে বারুহাস গ্রামে জঙ্গল মধ্যে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। ইহার গাত্রে বিচিত্র শিল্প কার্যের অনেক নিদর্শন আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে দেলবর খাঁ নামক জনৈক সমৃদ্ধ মুসলমান গৃহস্থের বাটিতে একটি সুদৃশ্য ইষ্টক নির্মিত মসজিদ ও দ্বিতল পাকা ইমারত বর্তমান আছে। এই সমস্ত অঞ্চলে পূর্বে অতিশয় দস্যু ভয় ছিল।

কাঁটাবাড়ি ঃ

পাবনার পশ্চিম সীমা সংলগ্ন বিল মধ্যে কাঁটাবাড়ি নামক গ্রামে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত সূর্য মূর্তি নামে একটি প্রাচীন মূর্তি অমৃতলাল সরকার নামক জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোকের বাড়িতে বিদ্যমান আছে। ইহা এখানকার সামান্য করগেট টিনের চালা মধ্যে রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে গরুড় বাহন একটি বাসুদেব বা বিষ্ণু মূর্তিও বর্তমান আছে। এই গ্রামে কয়েকটি প্রাচীন দীর্ঘিকার নিদর্শন আছে। এখানে রুদ্র, সরকার আদি উপাধিক কয়েকঘর কায়স্থের বাস।

তালম ঃ

পাবনা জেলার পশ্চিমোত্তর সীমায় তালম নামক বিল মধ্যবর্তী গ্রামে প্রায় ২৫/২৬ হাত

উচ্চ মৃত্তিকা স্তুপের উপর প্রায় দুই হাত উচ্চ এবং দুই হাতের অধিক বেড় বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত একটি শিবলিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার উপরিভাগে পূর্বে মন্দির ছিল, তাহা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। তালম রাজশাহী ও পাবনা জেলার প্রাকৃতিক সীমা ভাদাই বা ভদ্রাবতী নামক একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী নদী তীরে অবস্থিত। এই সমস্ত পল্লী একমাত্র জলকষ্ট ভিন্ন সর্বাংশে স্বাস্থ্যকর।

প্রকাশ নাটোরের সুপ্রসিদ্ধা রাণী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরীর প্রযত্নে এখানকার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। নাটোর রাজধানী হইতে এখান পর্যন্ত একটি উচ্চ মৃত্তিকা নির্মিত রাস্তা বা জাঙ্গালের চিহ্ন বর্তমান আছে। চতুস্পার্শ্ববর্তী স্থানের লোকের অধিকাংশই মুসলমান, হিন্দু অধিবাসী নাই বলিলেই হয়।

নবগ্রাম ঃ

হাণ্ডিয়াল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরাংশে তাড়াস পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত প্রাচীন করতোয়া নদী তীরে নবগ্রাম বা নওগাঁও একটি প্রাচীন পল্লী। পূর্বে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল ; বর্তমানে এই গ্রাম একেবারে জনশূন্য, মাত্র কয়েক ঘর মুসলমান ও বুনা জাতীয় কতকগুলি লোকের বাস ভিন্ন এখানে অন্য কোন লোকালয় বিদ্যমান নাই। শ্রীশ্রীবিনোদরায় নামক বিগ্রহ বাটিতে তাহার সেবা জন্য নিযুক্তীয় কামরূপ জেলার একজন ব্রাহ্মণ এবং ঠাকুর বাড়ি সংলগ্ন এক ঘর বৈষ্ণবের বাস ভিন্ন অন্য কোন হিন্দু জাতির বাস এখানে নাই। সমুদয় গ্রামখানি প্রায় দুই মাইলের অধিক বিস্তৃত। এখানে সুলতান নসরৎ শাহের সময়ের হিজরী ৯৫২ অব্দে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ এখনও অক্ষত অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। শ্রীশ্রীবিনোদরায় নামক বিগ্রহবাটি সংলগ্ন একটি মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময় প্রায় দুই হাত উচ্চ একটি শিবলিঙ্গমূর্তি বিদ্যমান আছে।

প্রতি বৎসর রামনবমী দিনে করতোয়াতটে এখানে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা শা সরিপের মেলা নামে অভিহিত হয়। পূর্বোক্ত মসজিদটি এখানে সাধারণত মামার মসজিদ নামে খ্যাত ; এতদ্ব্যতীত এখানে অন্য একটি মসজিদ ভাগিনেয়ের মসজিদ নামে খ্যাত। এই মসজিদদ্বয়ের সহিত অনেক কিম্বদন্তী কালক্রমে বিজড়িত হইয়াছে। পূর্বে এখানে ক্রয় বিক্রয়ের বন্দর থাকা সময়ে এখানে অনেক বাণিজ্যজীবী জাতির বাস ছিল, একটি ইষ্টকস্তূপ এখনও আটিয়ার সাহা মহাজনদিগের বাসস্থল বলিয়া পরিচিত হয়। এখানে একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা ভাণ সিংহের (রাজা মানসিংহের ভ্রাতা) দীর্ঘিকা এবং প্রায় এক মাইলাধিক বিস্তৃত ইষ্টক নির্মিত প্রাচীন রাজবর্ত্ম ভাণ সিংহের রাস্তা বা জাঙ্গাল নামে খ্যাত হয়।

বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত জঙ্গলময় প্রান্তর ক্ষেত্রে এখানে বহু শিমুল গাছ আছে। নবমীর মেলা উপলক্ষে এখানে অনেক শিমূল তুলা আমদানি হয়। নদী অবরুদ্ধ হইলে সমৃদ্ধিশালী জনপদ কিরূপে শ্রীহীন হয়, নবগ্রাম তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—উল্লাপাড়া

উল্লাপাড়া ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ফুলঝোর নদী তীরে উল্লাপাড়া একটি প্রধান বন্দর। নয়ানগাঁতি নামক স্থানে অবস্থিত রেলওয়ে স্টেশন হইতে বন্দরটি প্রায় দুই মাইল

পশ্চিমে ; ঘোষগাঁতি নামক স্থানে মালপত্রাদি জন্য একটি ঘাট স্টেশন আছে। এখানে ঝিকরা নামক পাড়ায় সাহা মহাজনদিগের পরিচালিত একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ; মাদ্রাসা, থানা ডাকবাঙ্‌লা, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস এবং ইউনিয়ন বোর্ড বর্তমান আছ। এক সময়ে এখানে সাবডিভিসন স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল। বাজারে একটি বিগ্রহালয় বর্তমান আছে। দৈনিক বাজার ও সাপ্তাহিক হাট বসিয়া থাকে। বর্ষা সময়ে এই বন্দর হইতে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মন পাট কলিকাতা রপ্তানি হয়। স্থানীয় অধিবাসী অধিকাংশ মুসলমান, হিন্দু সংখ্যা অতি কম ; এতদঞ্চলে অনেক কুম্ভকার জাতির বাস। পূর্বে ঘোষগাঁতি নামক স্থানে অগ্রহায়ণ মাসে কালীপূজা উপলক্ষে মেলা বসিত, ইহা এক্ষণে কুঠিপাড়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। নিকটবর্তী কালীগঞ্জ পূর্বে একটি বন্দর ছিল, তজ্জন্য এখন পর্যন্ত উল্লাপাড়া কালীগঞ্জ উল্লাপাড়া নামেই পরিচিত হইয়া থাকে। রেলওয়ে স্টেশন নিকটবর্তী দুর্গানগর নামক পল্লীতে তালুকদার উপাধিক ব্রাহ্মণগণের বাস। ইহারা স্থানীয় জমিদার নামে পরিচিত। ইহারা তালগাছি হাটের গোমহিষাদি খরিদ বিক্রয়ের জন্য বহুদিন হইতে ইজারদারী করিতেছেন।

মোহনপুর ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ২২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমাংশে মোহনপুর একটি ভদ্র পল্লী। ইহা সাধারণত এখানকার লাহিড়ী পরিবারের নামানুসারে লাহিড়ী মোহনপুর নামে খ্যাত হয়। এখানে লাহিড়ী, রায়, মজুমদার, সান্যাল উপাধিক ব্রাহ্মণ, দাস, সরকার উপাধিক কায়স্থ, গোপ, কর্মকার, পাল, নাপিত প্রভৃতি নবশাখ, নমঃশূদ্রাদি হিন্দু ও মুসলমানের বাস। লাহিড়ী পরিবারস্থ স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, পোস্টাফিস ও মোহনপুর ট্রেডিং অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং লিমিটেড নামে যৌথ কারবার এখান বর্তমান আছে। দৈনিক বাজার ও বুধবারে এখানে বৃহৎ হাট বসিয়া থাকে। বর্ষা সময়ে অনেক পাটের আমদানি হয়। দৈনিক মোহনপুর রেলওয়ে স্টেশন হইতে কলিকাতায় বহুল পরিমাণে মাছ, দুধ, ছানা এবং কাছিম রপ্তানি হইয়া থাকে। এই স্টেশন হইতে বার্ষিক প্রায় ৪০ হাজার টাকা একমাত্র মাছ চালানের জন্য মাশুল আদায় হইয়া থাকে।

গ্রামের উদ্যোগী যুবকগণের উৎসাহে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর নিবারণ কল্পে সমিতি স্থাপিত হইয়াছে ; ইহা হইতে জঙ্গলা পুষ্করিণী আদি পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। এখানে জনৈক নমঃশূদ্র পরিবারের বাড়িতে নৈশ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লাহিড়ী পরিবারস্থ গোপালদেব বিগ্রহের দোলোৎসব উল্লেখযোগ্য। জনৈক লাহিড়ী পরিবার গৃহে ভবতারিণী নামক পাষাণময়ী কালিকা দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

নরসিংহ পাড়ায় বহুদিন হইতে সিদ্ধেশ্বরী নামে প্রাচীন বিগ্রহ মূর্তি বিরাজমান আছে। মোহনপুরের পূর্বাংশে **বাল্লপাড়া** নামক গ্রামে বহু গোপ জাতির বাস। এখানে উত্তম খাটি ঘৃত পাওয়া যায়। এতদ্দেশে **পূর্বদেওলিয়াও** একটি প্রাচীন ভদ্র পল্লী ; এথাকার রায় উপাধিক কায়স্থ পরিবার অতি প্রাচীন, ইহাদের বাটিতে দৈনিক বিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে।

সলঙ্গা ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় নয় ক্রোশ পশ্চিমে ফুলঝোর হইতে প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তীরে অবস্থিত সলঙ্গা একটি প্রধান বন্দর। এখানে সাপ্তাহিক সোমবার ও শুক্রবারে বৃহৎ হাট বসিয়া থাকে। শুক্রবারের হাটে অনেক গো-মহিষাদি আমদানি হয়। পাট, ধান্যাদি খরিদ বিক্রয় জন্য সলঙ্গার হাট অতি প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক ব্যবসায়ীর দোকান আছে। শীতকালে কালীপূজা উপলক্ষে এখানে পক্ষাধিককাল স্থায়ী একটি বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়। এই মেলায় ও বাজারে অনেক কাষ্ঠ নির্মিত দ্রব্যাদি আমদানি হয়। সিরাজগঞ্জ হইতে এখান পর্যন্ত রাস্তাটির অবস্থার উন্নতি হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এখানে তাড়াসের রায় বাহাদুরের ও শিতলাই জমিদারগণের কাছারি বাড়ি বর্তমান আছে। সম্প্রতি ধানঘরা হইতে সাবরেজেস্টারী অফিস এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখানে একটি ডাকবাঙ্‌লা আছে। এইস্থানে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর উচ্চ ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সলঙ্গার প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে **চৌবিলা** কাষ্ঠ নির্মিত নৌকা বিক্রয় জন্য একটি প্রসিদ্ধ হাট ছিল। এখানে পোরজনার ভাদুড়ি বাবুদের কাছারি বর্তমান আছে। সম্প্রতি **পুটিয়াতে** অনেক নৌকা আমদানি হইয়া থাকে।

এখান হইতে নিকটবর্তী হাটি **কুমরুল** বা কুমিল্লী গ্রামে ভাদুড়ি বংশের প্রতিষ্ঠিত কারুকার্য খোচিত নবরত্ন মন্দির এক্ষণে বিনষ্ট। পূর্বে ভাদুড়ি, লাহিড়ী, সান্যাল উপাধিক ব্রাহ্মণ ও অনেক কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দুর বাস ছিল, তাহাদের কেহই এক্ষণে এখানে বাস করে না।

সলপ ঃ

সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল লাইনের সলপ স্টেশন হইতে গ্রাম প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। ক্ষুদ্র পঞ্চক্রোশী মোজাই সাধারণত সলপ নামে পরিচিত হয়। এখানকার সান্যাল পরিবার প্রতিপত্তিশালী জমিদার বলিয়া পরিচিত। গ্রামের মধ্য দিয়া একটি খাল প্রবাহিত ও কয়েকটি প্রাচীন দীর্ঘিকাও বর্তমান আছে, তথাপি এখানে জলকষ্ট অনুভূত হয়।

এখানে দৈনিক বাজার, সাপ্তাহিক হাট, পোস্টাফিস, টেলিগ্রাফ অফিস ও একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় বর্তমান আছে। সান্যাল বাবুদের প্রতিষ্ঠিত জয়কালী বাড়িতে প্রস্তরময়ী কালিকা দেবীমূর্তি ও শিবলিঙ্গ মূর্তি বহুদিন হইতে বর্তমান আছে। এখানে দৈনিক পূজা এবং রটন্তি আদি সাময়িক পার্বণ ও উৎসব অতি সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। স্থানীয় হিন্দু অধিবাসী মধ্যে এখানে ব্রাহ্মণ, কর্মকার ও কয়েক ঘর মাঝি এবং মুসলমানের বাস। সান্যাল বাবুদিগের উদ্যোগে সম্প্রতি এখানে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সান্যাল বংশীয় কতিপয় শিক্ষিত ও উদ্যোগী যুবকগণ কাপড়, ধান চাউলাদির ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইতিপূর্বে পল্লী হিতসাধন সমিতি আদির এখানে উল্লেখ থাকিলেও বর্তমানে গ্রামের উন্নতিকল্পে স্থানীয় লোকের বিশেষ কোন উৎসাহ ও উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। সলপের নিকটবর্তী রামনগরে **ফনী** উপাধিক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস আছে।

উধুনিয়া ঃ

দিলপসার অথবা মোহনপুর রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে উধুনিয়া একটি প্রাচীন ভদ্র পল্লী। এখানকার সিংহ উপাধিক কায়স্থ পরিবার সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রকাশ ইহাদের পূর্বপুরুষগণ মধ্যে জনৈক শিবসিংহ নবাব আলিবর্দি খাঁর সময়ে এদেশে আগমন করেন। ইহারা নবাবের সহায়তায় অনেক জায়গির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজ সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ইহার কতকাংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া ইহাদিগকে ইহাদের গৃহে দৈনিক পূজিত গোপাল বিগ্রহের সেবা নিমিত্ত যে মাসহারা প্রদান করিয়াছিলেন, এখনও এথাকার সিংহবংশ তাহা মাস মাস উপভোগ করিতেছেন। রাজশাহী কালেক্টরি হইতে এক্ষণে মাসিক ২৩।।৫ পাই ইহারা পাইয়া থাকেন.

এখানে শিতলাই জমিদারের কাছারি বাড়ি, সাপ্তাহিক রবিবার ও বুধবারে হাট এবং একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় বর্তমান আছে। এই গ্রামের কায়স্থ বংশীয় কৃষ্ণসুন্দর রায় মহাশয় তদীয় সাত্ত্বিক প্রকৃতি ও ভক্তিযোগ নিমিত্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

চৈত্রহাটি ঃ

উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় ৭/৮ মাইল পশ্চিমে চৈত্রহাটি একটি প্রাচীন পল্লী। বহুদিন হইতে এখানে সিদ্ধেশ্বরী নামে একটি কালিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রবাদ ইহা জনৈক সুরত রাজার সময়ে স্থাপিত বলিয়া অদ্যাপি তাহার নামে দৈনিক পূজার সংকল্প হইয়া

থাকে। গ্রামে অনেক প্রাচীন সুবৃহৎ দীর্ঘিকা বর্তমান আছে। কতকগুলি মাহিষ্য জাতি ভিন্ন অন্য কোন হিন্দুর বাস নাই। পুরাতন গ্রাম হইলেও চতুর্দিকস্থ অবস্থা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত নহে। রাজশাহী জেলার ধরাইল জমিদারগণ কর্তৃক দেবীর পূজাদির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

নিকটবর্তী রামকৃষ্ণপুর নামক গ্রামে অনেক প্রাচীন ও সুবৃহৎ দীর্ঘিকা বর্তমান আছে। উনু খাঁর দিঘি নামক জলাশয়টি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই গ্রাম অতিশয় জঙ্গলময় এবং এখানে ব্যাঘ্র সর্পাদির বিশেষ উপদ্রব।

জামতৈল ঃ

কামারখন্দ পুলিশ স্টেশন অন্তর্গত জামতৈল একটি প্রাচীন পল্লী। এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্যসাহা প্রভৃতি হিন্দু এবং অনেক মুসলমানের বাস। কামারখন্দে একটি পুলিশ স্টেশন ও সাপ্তাহিক হাট বর্তমান আছে। নিকটবর্তী দশসিকা একটি বন্দর বিশেষ।

ঝাউল ঃ

কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশনের ১ মাইল দক্ষিণে ঝাউল একটি প্রধান বাজার ও বাণিজ্য স্থান। এখানে বাণিজ্যজীবী অনেক বৈশ্য সাহা জাতীয় মহাজনের বাস। প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীগোপালদেব বিগ্রহের গোষ্ঠ যাত্রা উপলক্ষে বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—শাহজাদপুর

শাহজাদপুর ঃ

উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন হইতে পাবনা সিরাজগঞ্জ রাস্তায় প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণে শাহজাদপুর পাবনা জেলা মধ্যে একটি প্রাচীন গ্রাম। ইহা খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে মক্‌দুম্ সাহেব নামক জনৈক পারস্য দেশিয় মুসলমান ধর্মপ্রচারক কর্তৃক স্থাপিত; তিনি রাজবংশোদ্ভব ছিলেন জন্য শাহজাদা আখ্যায় অভিহিত হইতেন। বর্তমান সময়ে এখানকার খোন্দকার উপাধিক মুসলমানগণ তদীয় ভাগিনেয় খেজনুর সাহেবের বংশধর বলিয়া পরিচিত।

শাহজাদপুরে বর্তমান সময়ে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাস। হিন্দু অধিবাসী মধ্যে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ, রায় উপাধিক ক্ষেত্রী, তন্তুবায়, দেওয়ান উপাধিক সাহা, গোপাদি নবশাক এবং খাঁ, মিএগ উপাধিক অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাস। বস্ত্রবয়নকারী কারিকর সংখ্যাও এখানে অনেক। দৈনিক বাজার, সাপ্তাহিক সোমবার ও শুক্রবারে বৃহৎ হাট বসিয়া থাকে। এখানকার হাটে বহুল পরিমাণে দেশিয় কাপড় আমদানি হয়। খাদ্যদ্রব্যাদি মধ্যে এখানে উত্তম দধি ও ছানার দ্রব্যাদি মধ্যে পালের প্রস্তুত সন্দেশ রসগোল্লা পাওয়া যায়। মাছ তরকারি পর্যাপ্ত ছিল, এক্ষণে মহার্ঘ। এথাকার তৈয়ারি চাউল কথঞ্চিৎ মোটা। স্থানীয় অধিকারী ও গোস্বামী উপাধিক ব্রাহ্মণ গৃহে দৈনিক কালাচাঁদ ও গোপীনাথের সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্ব্যতীত সাময়িক কালীপূজা উপলক্ষে বারইয়ারি পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এখান উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, মাইনর স্কুল ও মক্তবাদি এবং একটি গুরুট্রেনিং স্কুল বর্তমান আছ। সদরের বর্তমান বেড়া থানার কতকাংশ ও উল্লাপাড়ার কতকাংশে লইয়া

শাহজাদপুরে একটি রুরাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ব্যতীত এখানে বেঞ্চ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বর্তমান আছে। বহুদিন পর্যন্ত এখানে মুন্সেফ কোর্ট বর্তমান ছিল। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে অগ্নিদাহে কোর্ট গৃহ ভস্মীভূত হওয়ায় মুন্সেফী এখান হইতে সিরাজগঞ্জে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বঙ্গের প্রসিদ্ধ ফিরিঙ্গি কবিওয়ালা এন্টনী সাহেবের পুত্র এক সময়ে এখানে মুন্সেফ ছিলেন। থানার সম্মুখে অবস্থিত স্তম্ভে নিম্নলিখিত খোদিত লিপিতে জানা যায় মৃত্যুর পর তাহাকে এখানে সমাধি দেওয়া হয়।

Secred
To the memory of
Mr. Anthoney De. Lemos
munsif
obit 22nd june, 1854
aged 48 years.

শাহজাদপুরে পুলিশ ইনস্পেক্টর অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, ঠাকুর জমিদার কাছারি গৃহে এডওয়ার্ড পাবলিক লাইব্রেরি ; তথায় সরকারি অফিসারগণের অবস্থান জন্য দ্বিতল ডাকবাঙলা বা পান্থনিবাস বিদ্যমান আছে। এখানে কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটের ঠাকুর জমিদার, ঢাকা জেলার মুরাপারার বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, মৈমনসিংহের করটিয়ার খাঁ উপাধিক মুসলমান জমিদার, চাপড়ি কমন ম্যানেজার প্রভৃতি জমিদারগণের কাছারি বর্তমান আছে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজোত্তীর্ণ কয়েকজন ডাক্তার এখানে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। এখানে কাকের অত্যন্ত উপদ্রব · এমন কি ছোট ছোট বালকগণের মুখ হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া থাকে।

খাস শাহজাদপুর পাঠানপাড়া, চুনিয়াখালিপাড়া, আঁধারকোঠা, কাগজিটোলা, কাজিপাড়া প্রভৃতি ১৪টি পাড়া বা মহল্লায় বিভক্ত। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের Journal of theAsiatic Society of Bengal, Part I, No 3. পত্রিকায় মৌলবী আবদুলওয়ালী নামক জনৈক ভদ্রলোক On the Antiquity and Traditions of Shahazadpur শীর্ষক প্রবন্ধে এখানকার অনেক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত বিবরণ ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে শাহজাদপুর সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই বিবরণী হইতে জানা যায় ইমান শহরের অধিপতির পুত্র পিতার আদেশে তদীয় ভাগিনী ও ভাগিনেয়ত্রয় সমভিব্যাহারে ইসলামধর্ম প্রচারকল্পে ভারতে আসিয়া কালক্রমে শাহজাদপুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কালক্রমে হিন্দু দেশাধিপতির সহিত তাহাদের বিবাদে তিনি ও তদীয় অনুচরবর্গের অনেকে নিহত হন। তাহাদের কবর স্থান গঞ্জ শহিদন বা শহিদগঞ্জ নামে অদ্যাপি শাহজাদপুরে পরিচিত হইয়া থাকে। প্রকাশ শাহজাদা মক্‌দুম্ সাহেবের নামানুসারে শাহজাদপুর এবং তদীয় অনুচর প্রধান ইউসুপ সাহেব নামানুসারে ইউসুফসাহী পরগণার নামকরণ হইয়াছিল। মক্‌দুম্ সাহেবের হাত্তের মাপ (বর্তমানে প্রায় ৩০ ইঞ্চি পরিমাণ) পূর্বে ইউসুপসাহী পরগণায় প্রচলিত ছিল। মক্‌দুম্ সাহেবের ভাগিনেয় খেজনুর সাহেবের সন্তানগণ খোন্দকার উপাধি বিশিষ্ট ও তাহারাই এখানকার মসজিদের মোতয়ালীস্বরূপ ইহার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বর্তমান সময় পর্যন্ত গবর্নমেন্টের অধীনে আনুমানিক প্রায় ৭২২ বিঘা লাখেরাজ জমি ভোগ দখল করিতেছেন। মৌলবি আবদুলওয়ালী সাহেবের মতে মক্‌দুম্ সাহেব হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে (১২০৩ খ্রিস্টাব্দ) এখানে স্থায়ী হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করেন। মক্‌দুম্ সাহেব কে এবং তিনি কোন দেশীয় ছিলেন, তৎসম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ডে মক্‌দুম্ সাহেবের মসজিদ প্রসঙ্গে তাহা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। উপরোক্ত মৌলবী সাহেবের মতে তিনি ইরান বা তুরান দেশিয় ছিলেন।

মক্‌দুম্‌ সাহেব কর্তৃক এখানকার মসজিদ নির্মিত হয়। বহুদিন হইতে মসজিদ প্রাঙ্গনে বসন্ত অষ্টমীর দিন হইতে মাসাধিককাল স্থায়ী একটি মেলার অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। এই মেলায় অনেক ঘোড়াদি আমদানি হইত। অধুনা মেলাটি মাত্র সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। বর্তমান ১৩৩২ সালে দিন পরিবর্তন করিয়া বসন্ত অষ্টমীর একমাস পূর্বে এই মেলা অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিতেছে। দরগাহ পাড়ায় লেঙসা পীরের দরগাহ নামে একটি স্থান আছে, তথায় লোকে মৃত্তিকা নির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘোড়া মানসিক স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকে।

পাঠান আমল ব্যতীত মোঘল আমলেও শাহজাদপুর একটি প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইসলাম খাঁ বঙ্গশাসনকালে শাহজাদপুর তুক্‌মাক খাঁ নামক জনৈক সেনানীর জায়গির ছিল বলিয়া জানা যায়। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে তদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে দারিয়াপুর নামক পাড়ায় খাঁ উপাধিক যে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের বাস আছে তাহাদের অনেকে উক্ত মোঘল রাজত্বকালের কর্মচারিবর্গের বংশধর হওয়া বিশেষ সম্ভব। ১৩২৯ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসী নামক মাসিক পত্রিকায় অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খাঁর সহিত শাহজাদপুরের জমিদার রাজা রায়মহাশয়ের সহিত যে যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল, তাহা পাবনা জেলার জমিদারের দমন প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে এতৎসমূহ পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত মক্‌দুম্‌ সাহেবের মসজিদ ব্যতীত শাহজাদপুরে চাপড়ি কাছারি বাড়ির সম্মুখে দুই শতাধিক বৎসরের একটি মসজিদ বর্তমান আছে। অধুনা এখানে যে একটি বয়নবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে তাহা হইতে উত্তম কাপড় তৈয়ার হইতেছে। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শাহজাদপুরের সন্নিহিত শক্তিপুর পারকোলা প্রভৃতি পল্লীতেও অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাস। শক্তিপুরে রায় উপাধিক বৈদ্যবংশ প্রাচীন জমিদার বলিয়া পরিচিত। ইহাদের বাটিতে একটি প্রাচীন মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে—

শাকেহসুনাক বাণেন্দুমিতে শ্রীকৃষ্ণ চতুষ্টয়ে।
বৈদ্য শ্রীচন্দ্রখানেন নির্মিতং হরি মন্দিরম্‌।।

প্রকাশ ইহারা প্রাচীন জমিদার বিধায় দুর্গোৎসব পূজায় ভূম্যধিকারী গৃহের মৃত্তিকার প্রয়োজন হইলে, নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা ইহাদের গৃহ হইতে তাহা লইবার রীতি আছে। পারকোলায় চাকি উপাধিক ধনাঢ্য কায়স্থ পরিবার বিশেষ পরিচিত। ইহাদের বাটিতে দৈনিক বিগ্রহ সেবা ও অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্যার সুব্যবস্থা আছে।

গাড়াদহ ঃ

উল্লাপাড়া স্টেশন হইতে প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণে গাড়াদহ একটি প্রাচীন ভদ্র পল্লী। এখানে নাগ উপাধিক কায়স্থ জমিদারগণ সবিশেষ পরিচিত। ইহাদের পূর্ব পুরুষ জনৈক নিত্যানন্দ নাগ নবাব সরকারে রাজস্ব বিভাগে কার্য করিয়া জমিদারি অর্জন করেন। বর্তমান সময়ে ইহারা বড় মধ্যম ছোট এই তিন শরিকে বিভক্ত। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহের একটি ঠাকুর বাড়িতে দৈনিক পূজা ও অতিথি সেবাদির বন্দোবস্ত আছ।

এই গ্রাম অনেক পাড়ায় বিভক্ত। এখানকার লাহিড়ী, মৈত্র, বাগছি, ভট্টাচার্য, সান্যাল উপাধিক ব্রাহ্মণগণ নাগ বাবুদের আনীত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত মজুমদার, নন্দী, রায়, সরকারাদি কায়স্থ, চুর্ণকার ও নবশাক জাতীয় হিন্দু ও অনেক মুসলমানের বাস। পূর্বে এখানে অনেক টোল ও বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতের বাস ছিল। বর্তমানে এখানে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। নাগপরিবারস্থ যাদবচন্দ্র নাগ মহাশয় জনৈক কীর্তন গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। গ্রামে শনি ও বুধবারে সাপ্তাহিক হাট,

পোস্টাফিস বর্তমান আছে। মজুমদার জমিদার বর্তমানে দিনাজপুর বাস করিতেছেন। মালাকর, আচার্য ব্রাহ্মণ, কুণ্ডু, নরসুন্দর, কর্মকার প্রভৃতি হিন্দুর ক্রমে বংশ লোপ পাইতেছে।

গ্রামে ৫/৬টি পুকুর বর্তমান আছে কিন্তু কয়েকটির জলই পানের অযোগ্য হইয়াছে। গ্রামের পূর্বধার দিয়া করতোয়া নদী প্রবাহিত। ঐ নদী ক্রমে ভরট্ট হইয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মকালে সোণ জাগ দিয়া জল নষ্ট করিয়া দেয়।

গ্রামে পূর্বে বারইয়ারি হরিপূজা ও কালী পূজায় অত্যন্ত ধুম হইত এখন পূজা উঠিয়া গিয়াছে। ১২/১৩ বাড়ি দুর্গোৎসব পূজা হইত। বিজয়ার দিন মেলা লাগিত, মুসলমানগণ নৌকা বাইজ দিত। এখন তাহারা তাহা বন্ধ করিয়াছে। গ্রামের দক্ষিণবাড়ি অর্থাৎ ভট্টাচার্য বাড়িতে দুর্গোৎসবের সময় পাকের জন্য এবং নাগের বাড়িতে ঢাকের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাহার প্রচলিত একটি কবিতা আছে—

নাগের বাড়ির ঢাক দক্ষিণ বাড়ির পাক।

পোতাজিয়া দিং ঃ

শাহজাদপুর হইতে ২॥ মাইল দক্ষিণপশ্চিম পোতাজিয়া বারেন্দ্র কায়স্থ প্রধান পল্লী। মৃত্তিকাখননে বিল মধ্যে গ্রাম নির্মিত জন্য এখানে ২/৪ ঘর বসতি লইয়া এক একটি পাড়া সৃষ্টি ; তদ্ধেতু এখানে অনেক প্রাচীন দীঘি ও ২২টি পাড়ার নিদর্শন আছে। মক্‌দুম্‌ সাহেবের সময়ে এখানে আসিয়া তাহার পোত প্রথমে আওজায় (লাগায়) তাহা হইতে এই গ্রামের নাম পোতাজিয়া বলিয়া খ্যাত। নদীমাতৃক বিল মধ্যে বাস হেতু এখানকার আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই অল্পবিস্তর নৌকা চালনায় সিদ্ধহস্ত। বিজয় দশমী দিনের সুসজ্জিত পানসি নৌকার বাইজ ও সারিগান বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ।

গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, ডাকঘর, বাজার ও হাট বর্তমান আছে। বহু শিক্ষিত ভদ্র কায়স্থ ব্যতীত এখানে ব্রাহ্মণ, কর্মকার, গোপ, তিলি প্রভৃতি নানা জাতীয় হিন্দু ও মুসলমানের বাস। শ্রীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটিতে দয়ামাধব নামক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত বাসুদেব মূর্তি দৈনিক পূজিত হয়। স্বর্গীয় গোবিন্দরাম রায় কর্তৃক নির্মিত এথাকার নবরত্ন মন্দির এক সময়ে সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বহু গাভী থাকাপ্রযুক্ত এথাকার জনৈক ঘোষ পরিবার হাজারি ঘোষ নামে পরিচিত।

বল্লালী আমল হইতে পোতাজিয়ার নন্দী বংশীয় কায়স্থ পরিবারের বাস ; তৎ সম্বন্ধে "ঢাকুরে" লিখিত আছে—

ভৃগুনন্দী সুত অতি গুণ যুত
শ্রীকানু মাধব নাম।
বল্লার (?) ছাড়িয়া গেল পোতাজিয়া
সমাজ বসতি গ্রাম।

রাউতারা পোতাজিয়া হইতে এক মাইল দক্ষিণে বরল নদী তীরে অবস্থিত। এখানে সাহা, কুণ্ডু, মণ্ডল ও চৌধুরী উপাধিক বহু ধনাঢ্য তিলি জাতির বাস। দিনাজপুরাদি উত্তরবঙ্গের অনেক স্থানে ব্যবসায়ের কল্যাণে ইহারা অনেকেই উন্নত হইয়াছেন। এখানকার স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পিতামহ রাজকিশোর সাহা মহাশয়ের বহু বিস্তৃত কারবারে ঢাকা জেলার তেঁওতা নিবাসী বৈদ্য বংশীয় জমিদারগণের পূর্বপুরুষ জনৈক পাঁচু সরকার নামক মহাত্মা উক্ত কারবারের প্রধান কর্মচারি ছিলেন। একদা তিনি মালিকের বিনা অনুমতিক্রমে অনেক তামাক খরিদ করিয়া প্রথমে তৎকর্তৃক তিরস্কৃত হয়েন। তৎপর উক্ত খরিদ আশাতিরিক্ত ৫৬ হাজার টাকা লাভ হইলে উক্ত সমুদায় লভ্যাংশই তিনি পুরস্কার লাভ করেন। তাহা হইতেই কালে তিনি জমিদার পদবী লাভ করেন। এই মহাজন বংশের অবস্থা অধুনা অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও তাহাদের

বাটিতে রাধারমণ জিউ নামক বিগ্রহের দৈনিক সেবার ব্যবস্থা আছে। এই গ্রামের সুরথলাল চৌধুরী মহাশয়ের বাটিতে দৈনিক বিগ্রহ সেবা ও দোল দুর্গোৎসবের বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে।

পোরজনা দিং ঃ

শাহজাদপুর হইতে ৪ মাইল পূর্বাংশে পোরজনা একটি ভদ্র পল্লী। এখানে লাহিড়ী, ভাদুড়ি, সান্যাল উপাধিক ব্রাহ্মণ, কর্মকার, তন্তুবায়, ঘোষ, মালো, সাহা আদি হিন্দু ও মুসলমান এবং এক মাইল দূরে পুটিয়া নামক গ্রামে অনেক কায়স্থ জাতির বাস। গ্রামে দৈনিক বাজার, পোস্ট টেলিগ্রাফ অফিস, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ব্যাঘ্র ও নানা জাতীয় পক্ষী সম্বলিত একটি পশুশালা বর্তমান আছে। একটি প্রাচীন মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামখানি ক্ষুদ্র, ইহার উন্নতি জন্য গ্রামবাসিদিগের অন্যান্য স্থানের ন্যায় কোন উদ্যম নাই।

এখান হইতে তিন মাইল পূর্বে **জামিরতা, গুদিবাড়ি** প্রভৃতি কয়েকটি সুবৃহৎ পল্লীতে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান আছে। গ্রামে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির বাস। জামিরতায় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস, হাটবাজার বর্তমান আছে; পূর্বে এখানে নীলকুঠি ছিল।

কৈজুরি—এখান হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তরাংশে অবস্থিত। প্রতি শুক্রবারে এখানে একটি সুবৃহৎ হাট বসিয়া থাকে। তাহাতে বহু দেশি মোটা কাপড়, লঙ্কামরিচ, লৌহ নির্মিত দ্রব্য ও গুড় আমদানি হয় এখানে বন্দোপাধ্যায় জমিদার বাবুদের একটি কাছারি বর্তমান আছে। গ্রামে বাগছি মৌলিক উপাধিক ব্রাহ্মণ ও নানা জাতির হিন্দুর বাস।

স্থল দিং ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে ২০ কুড়ি মাইল দক্ষিণে এবং স্থলচর স্টিমার স্টেশন হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে বর্তমান স্থল গ্রাম একটি ভদ্র পল্লী। এখানকার পাকড়াশি উপাধিক জমিদারবংশ সাতিশয় প্রসিদ্ধ। গ্রামে ডাকঘর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, চতুষ্পাঠী ও অদূরে ডাক বাঙ্‌লা বর্তমান আছে। এখানকার জমিদারবাবুদের পূর্বপুরুষগণের মৃতদেহের সৎকার ভূমির উপর স্থানে স্থানে ইষ্টক নির্মিত শিবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি পাষাণময়ী কালিকা দেবী মূর্তিরও দৈনিক সেবা পূজার বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে। অধুনা ইহাদের উদ্যোগে স্থলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক নামে যৌথকারবার, জমিদারি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও স্থল উইভিং অ্যান্ড স্পিনিং কোম্পানি লিমিটেড প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় কেবলমাত্র হাটবাজার ব্যতীত, স্থল পাবনা জেলা মধ্যে একটি আদর্শ পল্লীতে পরিণত হইয়াছে।

গোয়াইলবাড়ি নামক মৌজায় অধিকারী উপাধিক বঙ্গজ কায়স্থগণের বাটিতে শ্রীশ্রীগৌরনিতাই নামক দারুময় বিগ্রহমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বার্ষিক ফাল্গুনী পূর্ণিমার পর অষ্টম দোল উপলক্ষে এখানে অতি সমারোহ ও ৮/৯ হাজার লোক সমাগম হয়। এই অধিকারী বংশ শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ ৬৪ মোহান্তের অন্যতম স্বর্গীয় কবিচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের বংশধর বলিয়া পরিচিত। পাবনা ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে ইহাদের নবশাখ ও সাহা আদি নানা জাতীয় শিষ্যশ্রেণী আছে।

নওহাটা স্থলের এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার ভট্টাচার্য পরিবার স্থলের পাকড়াশি জমিদারগণের জ্ঞাতি ও শরিক। এখানে একটি মধ্য ইংরাজি স্কুল, পোস্টাফিস, সাপ্তাহিক শনি ও মঙ্গলবারে হাট এবং দৈনিক দুধের বাজার আছে। নওহাটার ভট্টাচার্য পরিবারে অনেক ধনাঢ্য কুশীদজীবী মহাজন আছেন।

পূর্বে স্থল নামে কোন মৌজা ছিল না, ইহা আধুনিক। মাত্র থল নামে একটি মৌজা

উল্লিখিত হইত। ভট্টাচার্য ও পাকড়াশি পরিবারের আদিপুরুষ হরিদেব ভট্টাচার্য মহাশয় প্রথমে এদেশে আসিয়া থলেই প্রথম বাস করেন, উক্ত স্থান কালে নদী গর্ভে নিপতিত হইলে, তদ্বংশীয়গণ কেহ বসন্তপুর, কেহ গোয়াইলবাড়ি, কেহ নওহাটা নামক মৌজাদিতে বাস করিতে আরম্ভ করেন ; তন্নিমিত্ত উক্ত কয়েক স্থানের নামসহ প্রথমে থল, পরে কালক্রমে স্থল, শব্দ ব্যবহৃত হইতে থাকে। এখন পর্যন্ত নওহাটার ডাকঘর স্থল-নওহাটা পোস্টাফিস নামেই পরিচিত। বসন্তপুর গোয়াইলবাড়ি নওহাটার ভট্টাচার্য ও স্থলের পাকড়াশিগণ সকলেই বর্তমানে এক থল বা স্থল সমাজ সমাজন্তর্গত বলিয়া পরিচিত।

স্থল নওহাটা প্রভৃতি অঞ্চলে দুধের ওজন চারি সেরে এক সের ধরা হইয়া থাকে। ইহা এতদঞ্চলের বিশেষত্ব। স্থলের নিকটবর্তী মাকরা, ঠুঁটিয়া, পাঁচিল, যুশখোলা প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের প্রায় ৫/৬ শত মুসলমান স্থলের বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে বৈশাখ মাসে হরিবাসর ও উপলক্ষে ও অন্যান্য সময়ে আজ প্রায় ৮/৯ বৎসর হইল হরি সংকীর্তন করিয়া আসিতেছে। ইহারা প্রায় ১৫/১৬ বৎসর হইল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের অধীনস্থ ফুকরহাটি নিবাসী শা জালালউদ্দিন নামক জনৈক ধর্মাত্মার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া মাংসাদি একরূপ বর্জন করিয়াছে। নামাজ করে না, মাথায় লম্বা চুল রাখে এবং গুরদত্ত মন্ত্র জপ করে এবং ইদুজ্জোহা ইদলফেতর প্রভৃতি পর্ব দিনে অষ্ট প্রহর হরিনাম সংকীর্তন করে। স্থলের বৈষ্ণব সম্মিলনী ও হরিবাসরে ইহারা যোগদান করতঃ পাকড়াশি বাবুদের সহ একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কীর্তন গান ও ভগবতাদি শ্রবণ করে এবং তাহারা ঈদাদি উপলক্ষে উক্ত গ্রামসমূহের অষ্টপ্রহর সময়ে তথায় নিশঙ্কচিত্তে গমন করিয়া থাকেন। ইহা এ প্রদেশে হিন্দু মুসলমানের এক অপূর্ব সম্মিলনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। ইহাদের সকলেই বাটুয্যে জমিদারের প্রজা। শাহজাদপুরে নানারূপ মোকদ্দমাদিতেও ইহারা আপন সংকল্পচ্যুত হয় নাই।

স্থল হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে ঘাঁটাবাড়ি, বাওইখোলা, শক্তিধরপুর, উথুলি আদি পল্লী অতি প্রাচীন। শক্তিধরপুরে রাজা বসন্তরায়ের বাটি থাকার কিম্বদন্তী আছে। এখানে একটি অতি প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন আছে। বসন্তরায় যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বলিয়া পরিচিত। তিনি এক সময়ে বাংলার স্বাধীন ক্ষমতা পরিচালনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন ; নিকটবর্তী বসন্তপুর সম্ভবত তাহারই নামের স্মৃতিবহন করিতেছে। সিরাজগঞ্জের উত্তরাংশে আরও অনেক পল্লীতে তাহার নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

চৌহালি ঃ

স্থলচর স্টিমার স্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে চৌহালিতে একটি পুলিশ স্টেশন ডাকঘর, মাদ্রাসা, রেজেস্টারী আফিস, দৈনিক বাজার, সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে হাট লাগে। সোমবারে গো হাটা, বর্ষায় এখানে অনেক পাট আমদানি হয়। এখানে অনেক শিক্ষিত মুসলমানের বাস।

সোহাগপুর দিং ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে সোহাগপুর মহাজন প্রধান পল্লী। এখানে বাগছি, চক্রবর্তী আদি ব্রাহ্মণ, সাহা চৌধুরী প্রভৃতি বৈশ্য, কাপালিক ও অনেক হিন্দুর বাস। ইহাদের অনেকে পূর্বে নয়াপাড়ার অধিবাসী ছিল। এখানে দৈনিক বাজার, দাতব্য চিকিৎসালয়, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রভৃতি বর্তমান আছে। গ্রামে ফুটবল খেলার বিশেষ ধুম আছে।

দেলুয়া এখান হইতে এক মাইল উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত। এখানে প্রামাণিক সাহা প্রভৃতি উপাধিক বহু বৈশ্য জাতির বাস ; সকলেই ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য। এখানকার গঙ্গাধর প্রামাণিক মহাশয় কলিকাতার লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। গ্রামে কর্মকার, চক্রবর্তী, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির বাস। ইহাদের অনেকেই পূর্বে বেলকুচির অধিবাসী ছিলেন। চক্রবর্তী বাটিতে রথযাত্রায়

সমারোহ হয়। দেলুয়া দেশি সূক্ষ্ম বস্ত্র বিক্রয়ের হাট জন্য সুবিখ্যাত। বেলকুচি পুলিশ স্টেশন দেলুয়া হাটে অবস্থিত।

সদিয়াচাঁদপুর ঃ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ১৫ মাইলের দক্ষিণ যমুনা হইতে নিঃসৃত একটি খালের পূর্ব ও পশ্চিমপারে অবস্থিত সদিয়া ও চাঁদপুর বিভিন্ন পল্লী হইলেও এক সদিয়াচাঁদপুর নামে খ্যাত। এখানে দৈনিক বাজার, মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় ও "রাধারমন জিউ" নামক সাধারণে পরিচালিত একটি বিগ্রহালয় বর্তমান আছে। বার্ষিক দোল ও রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে অতি সমারোহ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বৈশাখ মাসে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মহাজনদিগের উদ্যোগে হরিবাসর ও অষ্টপ্রহর কীর্তনাদির বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। সদিয়া অপেক্ষা চাঁদপুরে মহাজন সংখ্যা অধিক। এখানকার "বৃন্দাবন বলরাম সাহা" নামীয় কারবার সুদূর ১২৫১ সাল হইতে বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ঐ বংশীয় "উদয়চাঁদ চন্দ্রশেখর সাহা"(প্রামাণিক) নামীয় ফারমও অতি প্রসিদ্ধ। নাটোর, কলম ও চান্দাইকোণা, সিরাজগঞ্জ, কলিকাতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বন্দরে এই ফারমের আজও কারবার চলিতেছে। নানা স্থানে বহু বিস্তৃত কারবার স্থাপন, দালালী ও মহাজনী করিয়া এই চাঁদপুর গ্রামের মহাজন শ্রেণীর লোকেরা প্রকৃতই চাঁদসওদাগরের নাম বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পিতলের বাসন খরিদ বিক্রয় এই গ্রামের মহাজনদিগের বিশেষত্ব। ইহারা সোহাগপুরের নিকটবর্তী লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কাঁসারিদিগকে অগ্রিম দাদন প্রদানে দ্রব্যাদি লইয়া দেশে ও বিদেশে বিক্রি করিয়া থাকেন। এই গ্রামে চন্দ্রশেখর প্রামাণিক মহাশয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। তদীয় পুত্র যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জনৈক খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। তিনি গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের বাড়িতে দুর্গোৎসব পূজায় বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে। এই গ্রামে শশীমোহন প্রামাণিক নামীয় আরও কয়েকটি বাসন খরিদ বিক্রয়ের ফারম আছে।

গ্রামের যুবকবৃন্দের উদ্যোগে এখানে একটি নাটকাভিনয়ের দল বহুদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার কনসার্ট পার্টির বাদ্যাদি অতীব প্রশংসনীয়। ব্যবসায়ী জাতির প্রত্যেক বিভাগেই হিসাব নিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। যোগেন্দ্রবাবুদের গৃহে প্রায় শতাধিক বৎসর মধ্যে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সন তারিখ যুক্ত একটি জমা খরচ বর্তমান আছে। আবার দেওয়ানতলা নামক নিকটবর্তী পল্লীতে এই ব্যবসায়িবৃন্দের বালকগণ মিলিত হইয়া প্রায় পাঁচ শতাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া যে একটি যাত্রাভিনয়ের দল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহার সমস্তই আমোদপ্রমোদ নিঃশেষ না করিয়া বার্ষিক সুদে খাটাইয়া বর্তমানে উক্ত টাকা প্রায় আড়াই হাজার টাকায় পরিণত করিয়াছে। ইহাই বর্তমান দেওয়ানতলা যৌথকারবারে পরিণত হইয়াছে।

এই গ্রামে বার্ষিক ষড়ভূজ কালী পূজা উপলক্ষে বারইয়ারি মেলার অনুষ্ঠান হয়। প্রতি চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে অতি সমারোহ চড়ক পূজার মেলা বসিয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায় এখনও এতদঞ্চলে পিঠ ফোড়ানের ব্যবস্থা আছে।'এই গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এখানে একটি পাকা দাহ ক্ষেত্র নির্মিত আছে। গ্রামে সাহা সংখ্যা অধিক, ব্রাহ্মণ কায়স্থ সংখ্যা অতি অল্প, কয়েকঘর নমঃশূদ্র ব্যতীত অবশিষ্ট মুসলমান।

গোলইখালি—একটি পণ্ডিত প্রধান পল্লী। এখানে কয়েকঘর রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। এখানকার "যামিনী চতুস্পাঠি" ও "যামিনী লাইব্রেরী" জনৈক পণ্ডিত মহাশয়ের নামামুসারে স্থাপিত। এখানকার চন্দ্রনাথ চূড়ামণি মহাশয় জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

ছোটধুল নামক গ্রাম নদীতে ভাঙিয়া যাওয়ার পরে তথাকার অনেক কাপালিকাদি বস্ত্রবয়নকারী জাতিগণ চাপড়ি গ্রামে বাস করিতেছে। এই গ্রাম বহু পাড়ায় বিভক্ত। এখানে জনৈক কাপালিক গৃহে অতি উত্তম ও মিহি দেশি কাপড় ও চাদর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দৌলতপুর ঃ

সাধারণত দৌলতপুর দুইটি ; একটি রায় দৌলতপুর, অন্যটি খুকনী দৌলতপুর নামে খ্যাত। প্রথমটি উল্লাপাড়া থানায়। দ্বিতীয়টি শাহজাদপুর থানার অধীনে। বৈদ্যবংশীয় রায় পরিবারের নামানুসারে রায় দৌলতপুর পরিচিত।

খুকনী দৌলতপুর একত্র পরিচিত হইলেও উভয় গ্রাম প্রায় দেড়মাইল দূরে অবস্থিত। এই দৌলতপুরেও রায় উপাধি ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস আছে। প্রজাবিদ্রোহের প্রসিদ্ধ নেতা ঈশানচন্দ্র রায় মহাশয় এই গ্রামের অধিবাসী। এখানে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, দৈনিক বাজার, চতুস্পাঠি বর্তমান আছে। স্থানীয় অধিবাসী মধ্যে ব্রাহ্মণ, কর্মকার, কায়স্থ, সাহা প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান।

এই গ্রামে নবকান্ত সিদ্ধান্ত নামক জনৈক জ্যোতিষীর বাস ছিল। এখানে মিত্র মজুমদার উপাধিক বঙ্গজ কায়স্থ বংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত পিতল নির্মিত দশভূজা মূর্তির দৈনিক সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবাদ এই অঞ্চলে যাতায়াতের রাস্তার অবস্থা অতীব কদর্য। তজ্জন্য অনেক সময় এদিকের লোকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। দৌলতপুরে ঢোল ও সানাই বাজনায় সিদ্ধ হস্ত অনেক বাদ্যকরের বাস আছে।

খুকনিতে অনেক কুম্ভকার জাতির বাস ; ইহারা বিভিন্ন স্থান হইতে বার্ষিক বহু টাকার মাটি খরিদ করিয়া থাকে। বারুণী আদি সময়ে অনেক পাতিল বিক্রয় করে। এই সময়ে এ প্রদেশের মুসলমানগণ পাতিল ভরিয়া খাজা বাতাসা ক্রয় করে ও জামাই নিজ বাটিতে আনয়ন করে।

সোনাতনী ঘোরজান তেঁথুলিয়া প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতি প্রধান। বেলতৈল সরাতৈল প্রভৃতি গ্রামেও অনেক ভদ্র পরিবারের বাস আছে।

[পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত]

পাবনা জেলার ইতিহাস

ষষ্ঠ খণ্ড

পাবনা জেলার ইতিহাস।

———(※)(০:০)(※)———

(ষষ্ঠ খণ্ড)



শ্রীরাধারমণ সাহা বি-এল

প্রণীত ও প্রকাশিত।

পাবনা।

১৩৩৩

পাবনা গোবিন্দ প্রেসে—শ্রীতারাপদ চৌধুরী কর্তৃক ১—৩ ফর্মা, সূচিপত্র ও নিবেদন
সরস্বতী প্রেসে—শ্রীগোপীকৃষ্ণ বসাক কর্তৃক ৪—১৫ ফর্মা মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ—১০০০—১৩৩৩ সাল।

মূল্য—এক টাকা মাত্র

মুখবন্ধ

আদমসুমারি, দেশের অবস্থা ও শাসনসংরক্ষণাদির বিবরণ সম্বলিত পাবনা জেলার ইতিহাস ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা তিন গুণের অধিক। লোক সংখ্যাদির সমস্ত অঙ্ক আদমসুমারির বিবরণ হইতে গৃহীত, তাহাতে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ মুদ্রাকর দোষ ঘটিয়াছে; আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ পুস্তকের এই ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

১৯০১ অব্দ হইতে ১৯২১ অব্দ পর্যন্ত ২০ বৎসর মধ্যে জেলার জাতিবিশেষের লোকসংখ্যার কিরূপ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, প্রত্যেক জাতির সংখ্যা দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইল। বর্ণমালা অনুসারে কতিপয় প্রধান জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তসহ জেলার মধ্যে তাহাদের বসতি প্রধান গ্রাম, প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সৎকীর্তি এবং সামাজিক আচার ব্যবহারাদির স্থূল বিবরণ লোকমুখে শুনিয়াই লিপিবদ্ধ হইল; ইহাতে বহু ভ্রমাদি হওয়া অবশ্যম্ভাবী! আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি তৎপতি অধিকতর আকৃষ্ট না হইয়া তাহা সংশোধন জন্য ধাবিত হইবে।

হিন্দু সমাজে প্রধানত ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি জাতি এবং মুসলমান সমাজে খোন্দকার ও খাঁ, মিরজা, মিএগ্র ও ভূইএগ্র প্রভৃতি উপাধিক পরিবার সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বংশজ বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন। মাকরায় ভূইএগ্রগণ মোঘল আমলের বার বা বড় ভূইএগ্রার বংশধর বলিয়া পরিচিত। ইহাদের অনেকে অধুনা সাধারণ পুলিশ কর্মচারি রূপে দরিদ্র অবস্থায় পরিণত হইলেও ইহাদের সুদীর্ঘ অবয়ব ও উপাধি সমস্তই প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের পরিচায়ক। শৈব শাক্ত বৈষ্ণবাদি ধর্মমত ব্যতীত এই জেলার চিথলিয়ার শম্ভুচাঁদ প্রচলিত "গুরুসত্য ধর্ম" ও হিমাইতপুরের আশ্রম প্রবর্তিত "সৎসঙ্গী" ধর্মমত উল্লেখযোগ্য। জেলার সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা ও হিন্দু সমাজে প্রচলিত ব্রতপূজাদি ও ক্রীড়া কৌতুকাদির স্থূল বিবরণ লিখিত হইল।

শাসন সংরক্ষণাদি প্রসঙ্গে প্রত্যেক বিভাগের সংখ্যাদি সমস্তই প্রায় সরকারি গেজেটিয়ার হইতে সংগৃহীত। জেলার সদর রাজস্ব অপেক্ষা কোর্ট ফি স্ট্যাম্প আদি বিক্রয়ের আয় অধিক। ইহা দেশে মোকদ্দমা বৃদ্ধির পরিচায়ক। দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় বিভাগের কার্য বিবরণী হইতে তাহা সূচিত হইতেছে। প্রত্যেক পোস্টাফিসের অধীনস্থ গ্রামসমূহের যে তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা একেবারে নির্ভুল নহে।

এই জেলার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মধ্যে এতদিন পরস্পর বিশেষ সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বর্তমান ছিল। বিগত ২/৩ বৎসর হইল হাদল গোয়ালগ্রাম অঞ্চলে ও পার্শ্বডাঙা সজনাই প্রভৃতি গ্রামে বর্গা জমির চাষ আবাদ লইয়া কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল। উহা প্রশমিত হইতে না হইতে পুনরায় বিগত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর পাবনায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার ফলে মফঃস্বলের অনেক স্থলে হিন্দু দেবদেবী মূর্তি ভগ্ন হইয়াছে। বিগত ৩০ জুন রাত্রিতে পাবনা শহরের বিভিন্ন মন্দির হইতে কয়েকখানি কালিকাদি দেবী মূর্তি দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক অপহৃত হয়। প্রকাশ্য রাস্তায় ভগ্নাবস্থায় পর দিবস ১ জুলাই বৃহস্পতিবারে মূর্তিগুলি দেখিতে পাইয়া শহরের হিন্দু অধিবাসীগণ তৎসমুদায় বিসর্জন জন্য এক মিছিল বাহির করেন। উক্ত মিছিল বাজার মধ্যে খলিফা পটিতে মসজিদের নিকট দিয়া গমনকালে মুসলমানগণ যাইতে নিষেধ করায় যে বিবাদ ও হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তাহার অব্যবহিত পর হইতেই পাবনা শহরে মফঃস্বলের অনেক

গ্রামে সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রবলতর হইয়াছে। ফলে পাবনা বাজার শুক্রবার ও শনিবার একরূপ বন্ধ হইয়া থাকে। সুজানগর, আতাইকুলা, কৈজুরি, শ্রীপুর, ধোপাঘাটা, ভুলবারিয়া, গয়েশবাড়ি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামের স্থানে স্থানে দিবাভাগে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদিগের ঘরবাড়ি ও দোকানাদি লুণ্ঠিত হইতে থাকে। আটঘরিয়া ও সাঁড়া থানার অনেক গ্রামে লুটতরাজ ও নানা অত্যাচার হইয়াছে। পাবনা শহর ও মফঃস্বলের উক্ত গ্রাম সমূহের অবস্থা গুরুতর বিবেচনায় রাজশাহী বিভাগের কশিনর সাহেব বাহাদুর স্বয়ং পুলিশের ডেঃ ইঃ জেনারেল সাহেব মহোদয় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সহ ৪ জুলাই তারিখে পাবনায় আগমন করতঃ উভয়েই স্বয়ং মফঃস্বলের অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছেন। পার্শ্ববর্তী জেলা হইতে অতিরিক্ত পুলিশ, গুরখা ও সামরিক পুলিশাদি পাবনায় আনীত হইয়াছে। চরতারাপুরে সুজানগর হাট লুটের তদন্ত উপলক্ষে পুলিশ বাধ্য হইয়া গুলি চালাইয়াছে। ফলে কয়েকজন আহত হইয়া পাবনায় আনীত হইয়াছে। এ পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাধিক আসামী ধৃত হইয়া পাবনায় আসিয়াছে। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট Mr. Hollow সাহেবের এজলাসে শহর ও মফঃস্বলের দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামীগণের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। গবর্নমেন্টের আদেশে পাবনা থানা, আটঘরিয়া ও সাঁথিয়া থানার কতকগুলি ও সুজানগর গ্রামে এক বৎসর জন্য পিউনিটিব পুলিশ অবস্থানের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। তদন্ত এখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই, প্রায় প্রত্যহই মফঃস্বল হইতে আসামী ধৃত হইয়া শহরে প্রেরিত হইতেছে। মোকদ্দমাদি সমস্তই বিচারাধীন এবং এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখনও সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই। হিন্দুগণ ধনপ্রাণ ও সম্ভ্রমাদি লইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়াছেন, বঙ্গের ও ভারতের অনেক স্থলে সহানুভূতিসূচক সভাদির উল্লেখ সংবাদ পত্রাদিতে জানা যাইতেছে। লুণ্ঠিত ও বিপন্ন হিন্দুদিগের সাহায্যেরও ব্যবস্থা হইতেছে। মুসলমানগণ মধ্যে অভিযুক্ত আসামীগণের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালন জন্য স্থানে স্থানে চাঁদা ও মুষ্টিভিক্ষাদি সংগৃহীত হইতেছে। মোটের উপর এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে জেলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং পরস্পর হিংসা ও বিদ্বেষের যে নূতন ভাবের উদ্রেক হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অচিরে বিদূরিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

পাবনা "অন্নদাগোবিন্দ পালবিক লাইব্রেরীর" কর্তৃপক্ষগণ আমাকে অবৈতনিক সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া উক্ত লাইব্রেরী হইতে পুস্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদানে আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাদের নিকট বাধিত থাকিলাম। এই কয়েক খণ্ড পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ কালে পাবনা ও বগুড়ার সেটেলমেন্ট অফিসার Mr. H. C. Philpot, I.C.S. ও Mr. D. Macpherson I.C.S. মহোদয়গণ সাক্ষাৎকারে প্রত্যেকেই আমার কার্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ আমাকে একশত টাকা করিয়া হাওলাত স্বরূপ সাময়িক অর্থ সাহায্য প্রদানে আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন ; তজ্জন্য আমি তাহাদের প্রত্যেকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। পাবনার উকিল জাহ্নবীচরণ ভৌমিক মহাশয় সময় সময় হাওলাত স্বরূপ আমার যখন যে পরিমাণ টাকার আবশ্যক হইয়াছে তাহা সাময়িক প্রদানে সবিশেষ উপকার করিয়াছেন ; সেজন্য আমি তাহার নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড মুদ্রিত হওয়া কালে তাড়াসের জমিদার রাধিকাভূষণ রায় মহাশয় তাহাদের স্টেট হইতে ১৫০ টাকা এবং তাড়াস পূর্ববাটির হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ১৫ টাকা ও তদীয় কর্মচারি শ্রীশচন্দ্র সিংহ মহাশয় ১০ টাকা, ভূতপূর্ব সেটেলমেন্ট অফিসার পাবনা নিবাসী তীর্থনাথ সাহা মহাশয় ৫০ টাকা, খেতুপাড়া নিবাসী ডাক্তার সুরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী মহাশয় ২৫ টাকা, রাউতারা নিবাসী সুরথলাল চৌধুরী মহাশয় ১০ টাকা, তাঁতিবন্দের জমিদার ক্ষিরোদগোবিন্দ চৌধুরীদিগর তাহাদের স্টেট হইতে ১০ টাকা এবং মদীয় সহাধ্যায়ী নবগৌরাঙ্গ বসাক মহাশয় ৩০ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়া আমার কার্যের যে সহায়তা

করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাহাদের প্রত্যেকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। গবর্নর অভ্যর্থনা কমিটিব সভ্যগণও আমাকে ২৫ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই পুস্তক খণ্ড চতুষ্টয় মুদ্রিত হওয়া কালে যিনি আমাকে যে কোন প্রকার সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

পরিশেষে পাঠকবর্গ সমীপে বিনীত নিবেদন পুস্তক খণ্ডগুলি মধ্যে বর্ণিত বিষয়ের ভ্রম ত্রুটি ও স্থানে স্থানে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে তজ্জন্য তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন এং ভ্রমাদি আমাকে জানাইলে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইব। এই পুস্তক কয়েক খণ্ড জেলা বাসিগণের কিছুমাত্র উপকারে আসিলেও স্বীয় পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব, নিবেনদ ইতি।

পাবনা, কালাচাঁদপাড়া। বিনীত নিবেদন—

১ আগস্ট, ১৯২৬। **শ্রীরাধারমণ সাহা**

উৎসর্গ পত্র।

জেলার

দেশীয় ও বিদেশীয়,

হিন্দু ও মুসলমান

অধিবাসিগণের

করকমলে

পাবনা জেলার ইতিহাস

ষষ্ঠ খণ্ড

সাদরে অর্পিত

হইল।

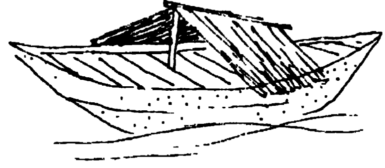
১৩৩৩

বিনীত—

গ্রন্থকার

প্রথম অধ্যায়

আদম-সুমারি



প্রথম পরিচ্ছেদ—সাধারণ বিবরণ

ক. প্রাচীন অধিবাসী ঃ

পাবনা নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র নামক জনপদের অধিবাসী পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র নামধেয় জাতিগণের নামানুসারে এই জেলার নামকরণ হইয়াছে। এই পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র জাতিই নামান্তরে পোদ, পুঁড়া বা পুঁড়ো জাতি ; সাধু ভাষায় পৌণ্ডরিক বা পুণ্ডরীক নামক জাতিসমূহ জেলার স্থানে স্থানে এখনও বাস করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎকৃত বিবিধ প্রবন্ধের "অনার্য্য বাঙালি" শীর্ষক প্রস্তাব প্রসঙ্গে পুণ্ড্র হইতে ক্রমে কিরূপে পুঁড়া বা পুঁড়ো শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও ইতিপূর্বে প্রাচীন ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

এই জেলার সাঁড়া পুলিশ স্টেশনের অধীন দাদাপুর, দাপুনিয়া, আটঘরিয়া পুলিশ স্টেশনের অধীন চান্দভা এবং সুজানগর পুলিশ স্টেশনের অধীন বাদাই, রাণীনগর প্রভৃতি পল্লীতে এখনও বহু সংখ্যক পুঁড়া বা পৌণ্ড্রিক জাতিগণের বাস আছে। সাঁথিয়া পুলিশ স্টেশনের অধীন একটি পল্লী এখনও পুণ্ডরিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সম্ভবত এতদঞ্চলেও পূর্বে বহু পুঁড়াদি জাতির বাস ছিল। এতদ্বতীত পাবনা টাউনে ১৮৫০ অব্দের রেভিনিউ সার্ভে নক্সায় বাজুরস নাজিরপুর পরগণায় ৮৬ নম্বরে বাজে পাবনা নামক মৌজাও Boundary Commissioner's তালিকান্তর্গত ১০০ নম্বরে Pudeh Pabna বা পোদে পাবনা নামে উল্লেখিত হইয়া থাকে।

পোদ, পুঁড়া বা পুঁড়ো জাতি যে বঙ্গের অতি প্রাচীন বা আদিম অধিবাসী তাহা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিবিধ প্রবন্ধের "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে এবং উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় ১৩০৯ সালের ভাদ্র মাসের সাহিত্য পত্রিকায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু ইহাদিগকে অনার্য আখ্যা প্রদান করিলেও ইহারা নিচ কুলোদ্ভব নহে, তাহা অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বর্তমানে এই জেলায় এই জাতিসমূহ কৃষি বাণিজ্যাদিতে লিপ্ত ; ইহাদের ব্যবসায় ও আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে ইহাদিকে কোন ক্রমেই হীন বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা যে বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় জাতি এবং কালক্রমে অনার্য সংস্রবে বা যুগধর্মে জাতিভেদ বর্জিত বৌদ্ধাদি ধর্মাশ্রয়ে ইহাদের পাতিত্য ঘটিয়াছে, তাহাও দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এই পোদ, পুঁড়া বা পুঁড়ো জাতিগণ যে এই জেলার আদিম বা প্রাচীন অধিবাসী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত এই জেলার স্থানে স্থানে চান্দাল, চাঁড়াল, নমঃশূদ্রাদি আখ্যায় পরিচিত যে সমস্ত জাতির বাস আছে, তাহারাও পূর্বে রাজশাহী ও মালদহ জেলার চন্দেল বা চাঁদলাই নামক স্থানের অধিবাসী ছিল বলিয়া জানা যায়। ইহারা পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র দেশের অধিবাসী বলিয়া পরিচিত হইত। কালক্রমে বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ঘটিলে ইহারা ক্রমে পূর্ববঙ্গে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তজ্জন্য ফরিদপুর, নদিয়া, পাবনাদি জেলায় বর্তমানে অধিক সংখ্যক নমঃশূদ্র জাতির বাস দেখা যায়। এই জেলায় ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০-এর উর্ধ্ব ছিল। ইহারা পূর্বতন পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র

নামক জাতিগণের নামান্তর মাত্র, বর্তমানে এই জেলার নানাস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছে। ইহারাও এই জেলার প্রাচীন অধিবাসী।

কালক্রমে বঙ্গে আর্য সভ্যতার বিস্তার হেতু ব্রাহ্মণাদি জাতিসমূহের বসতি বিস্তার ঘটিয়াছে। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবু বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে "কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিবার পূর্বে দুইশত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম বাস অর্থাৎ খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য ভূমি ছিল।" তৎপর পাল ও সেন রাজত্ব সময়ে ক্রমে গৌড়বঙ্গে ক্রমশ ব্রাহ্মণাদি জাতিগণের স্থানে স্থানে বাস ও কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে কুলীন ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের বসতি বিস্তার ঘটিয়াছে, তখন হইতে এই জেলারও স্থানে স্থানে তাহাদের আগমন হইয়াছে বলিয়া জানা যাইতেছে।

এই জেলার করঞ্জ নামক গ্রামখানি পাল রাজত্বকালে স্বর্ণরেখ নামক জনৈক মৈত্র উপাধিক ব্রাহ্মণ ধর্মপালদেবের নিকট শাসন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। রায়গঞ্জ থানার অধীনস্থ নিমগাছি ঘুরকা, মাধাইনগরাদি পল্লী সেন রাজত্ব সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর আবাস ভূমিতে পরিণত ছিল। মাধাইনগরে প্রাপ্ত মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই জেলার বিভিন্ন গ্রামের কালিয়াই বংশীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠাতা ভীম ওঝা সম্রাট বল্লাল সেনের পুরোহিত ছিলেন। বল্লালের হড্ডিকা সংস্রব ঘটিলে তিনি কালিয়া গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক বর্তমান পাবনা জেলার আত্রাই নদী তীরবর্তী ছাতক গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। এই বংশীয় ব্রাহ্মণগণ এই জেলায় অতি প্রাচীন বংশ বলিয়া পরিচিত। এতদ্ব্যতীত এই জেলার পোতজিয়ার রায় পরিবারস্থ বারেন্দ্র কায়স্থগণের পূর্ব পুরুষ ভৃগু নন্দী মহাশয় বল্লাল সেনের সভাসদ ছিলেন। তাহার সন্তানসন্ততিগণও বল্লালী মর্যাদা অবহেলা করিয়া এই জেলার পোতাজিয়া, অষ্টমনীষা আদি গ্রামে বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন। রায়গঞ্জ থানার অধীনস্থ নিমগাছির বিবরণে জানিতে পারা যায় বঙ্গদেশ মুসলমান অধিকৃত হইলে কিয়দ্দিন পর্যন্ত উক্ত অঞ্চলে করতোয়া প্রদেশে সেন রাজবংশীয় অচ্যুত সেন স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সিরাজগঞ্জাদি অঞ্চলের বৈদ্য জাতি প্রধান গ্রাম সমূহ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তৎকাল হইতেই এই সমস্ত অঞ্চলে বৈদ্য জাতির অত্যধিক সংখ্যা এবং তাহাদের মধ্যেও প্রাচীন ভূম্যধিকারী বংশ পূর্বাপর বর্তমান রহিয়াছে। সেন রাজগণ বৈদ্য ছিলেন কি কায়স্থ ছিলেন তাহা লইয়া নানামত থাকিলেও এতদঞ্চলের বৈদ্য সমাজে পূর্বাপর ভূম্যধিকারী বংশ বর্তমান আছে। ইহারাও যে এই জেলার অতি প্রাচীনতম অধিবাসী তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

খ. বর্তমান অধিবাসী ঃ

হিন্দু সমাজান্তর্গত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে এই জেলার মথুরার ভট্টাচার্য পরিবার সাতিশয় সম্মানার্হ। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে সালিখা, সারোরা, হরিপুর, ভারেঙ্গা, কাশীনাথপুর প্রভৃতি গ্রামের ব্রাহ্মণগণ বহুদিন হইতে সুপ্রসিদ্ধ। গুণাইগাছা, সিদ্ধিনগর, কাওয়াখোলা, গাঁড়াদহ প্রভৃতি পল্লীতে অতিপূর্বে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ছিল ; জামিরতা, গুদিবাড়ি প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণগণ সামাজিক হিসাবে সাতিশয় কুলীন বলিয়া খ্যাত ; ইহারা ঘটকগণের মুখে কুলীনের মধ্যে সুমেরু পর্বত বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। হাণ্ডিয়াল বল্লভপুরাদি গ্রামের গোস্বামী পরিবার অদ্বৈত সন্তান ঠাকুর নরোত্তমের বংশধর বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শিষ্য ও পার্ষদ গৌরাঙ্গ দাসের পুত্র শ্যামমোহন দাস ঠাকুর হইতে হাপানিয়ার বৈষ্ণব উপাধিক ব্রাহ্মণ পরিবারের সৃষ্টি হইয়াছে।

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজ মধ্যে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত কোদলা নামক গ্রাম নিবাসী গোস্বামী পরিবার এবং স্থল সমাজান্তর্গত স্থল, বসন্তপুর গোয়ালবাড়ি নওহাটার পাকড়াশি ও ভট্টাচার্য পরিবারস্থ ব্রাহ্মণগণ এ জেলায় অল্পদিন হইতে স্থায়ী হইলেও সমধিক প্রসিদ্ধ।

কায়স্থ সমাজে পোতাজিয়া, অষ্টমনীষা, দিলপসার, রহিমপুরাদি গ্রামের বারেন্দ্র কায়স্থগণ

এই জেলায় সুবিখ্যাত ; সাগরকান্দি, হাসামপুর, হাটখাঞ্জি, খলিলপুর, দৌলতপুরাদি গ্রামসমূহের বঙ্গজ কায়স্থগণও এই জেলায় সুপ্রসিদ্ধ। ব্যবসায়ী জাতি মধ্যে কুণ্ডু, সাহা, প্রামাণিক উপাধিক তিলি তন্তুবায়াদি নবশাক, পোদ্দার, সাহা প্রামাণিকাদি উপাধিক বৈশ্য সাহা বা বণিক জাতি এই জেলার প্রায় সর্বত্রই অল্প বিস্তর দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের অধিকাংশই বাণিজ্যাদির সুবিধার্থ নদীতীরস্থ গ্রামে বাস করে। এতদ্ব্যতীত কর্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধরাদি শিল্পী জাতিও এই জেলার অনেকানেক গ্রামে বাস করে। মৎস্যজীবী ধীরব জাতি এই জেলার পদ্মাদি নদীতীরবর্তী গ্রামসমূহে স্থানে স্থানে বহুল পরিমাণে বাস করে।

কালক্রমে দেশে মুসলমান অধিকার ঘটিলে ধীরে ধীরে যখন বঙ্গে মুসলমান জাতিগণ বসতি বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতে এই জেলার শাহজাদপুর গ্রামে সর্ব প্রথমে খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মুসলমানগণ আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুলতানপুর, সমাজ, নবগ্রামের মসজিদাদি দর্শনে প্রতীয়মান হয় যে পাঠান আমল হইতে এই সমস্ত পল্লী মুসলমানগণের অধ্যুষিত ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। চাটমোহরে পাঠানপাড়া, আফ্রাদপাড়া প্রভৃতি পাঠান নামাত্মক স্থানসমূহ হইতে জানা যায় এখানেও পাঠান জাতিগণ এক সময়ে সমধিক প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। এখানকার মাশুম খাঁর মসজিদ তাঁহাদের কর্তৃকই নির্মিত হইয়াছিল। বাগ, মিরজাপুর, মাসুন্দিয়া প্রভৃত গ্রামের মিরজা, বেগ উপাধিক বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার মোঘল বাদশাহ আরঙ্গজেবের অনুজ দারার পুত্র সোলেমান ওরফে টর্ণুবেগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত সয়দাবাদ, সৈয়দপুর, আমিরাবাদ, খাঁপুরা, কাজিপুর, কাজিটোল, মীরপুর প্রভৃতি পল্লীসমূহের নাম দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই সমস্ত পল্লীতে পূর্বে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের বাস ছিল। পাঠান মোঘল আমলে এই সকল পল্লী অনেকাংশে সদ্বংশজাত মুসলমান কর্মচারি সৈন্যাধ্যক্ষগণের ক্রীড়া ভূমিতে পরিণত ছিল।

গ. মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ ঃ

হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান জাতির সংখ্যা এই জেলায় প্রায় তিনগুণ বেশি। হিন্দু ৩৩৪৩৩২, মুসলমান ১০৫৩৫৭১। গড়ে মুসলমান সংখ্যা প্রায় শতকরা ৭৭ জন ধরা যায়। এই মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ নির্দেশে অনেকে বলেন, এ দেশের মুসলমানগণের অধিকাংশ ধর্মান্তরিত হিন্দু জাতি। এই কারণ বিস্তারিত আলোচনার ইহা উপযুক্ত স্থল না হইলেও, পাবনা ও তৎপার্শ্ববর্তী বগুড়া এবং ঢাকাদি জেলায়ও প্রায় শতকরা ৮০ জন মুসলমানের বাস ; তজ্জন্য এই সংখ্যাধিক্যের কারণ কিঞ্চিৎ স্থূলতঃ নিম্নে আলোচিত হইল।

প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "বাঙ্গলার অনেক লোকেই মুসলামান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর কৃষিজীবী লোক ; রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণীর হইবে তাহা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত অল্প সংখ্যক রাজ অনুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময় মধ্যে এত বিলম্বিত লাভ করিবে ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে ইহাই সিদ্ধ।"

বঙ্গদর্শন—অগ্রহায়ণ ১২৮৭ সাল।

মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ প্রসঙ্গে বগুড়া জেলার ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন "আফগান সৈনিকেরা স্বদেশ হইতে পত্নী সমভিব্যাহারে এদেশে আসেন নাই। এ দেশিয় রমণীগণের গর্ভে তাহারা সন্তান উৎপাদন করিয়া প্রজা সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ যাহাদের বৃত্তি কৃষিকার্য ছিল না তাহাদের অনেকেই পলায়ন করে, কিন্তু সাধারণত কেওট্, চাঁদলা, কোচ, মেচ প্রভৃতি প্রজাগণ কৃষিকার্যই যাহাদের প্রধান উপজীবিকা তাহারা ভূমি ছাড়িয়া দেশান্তর যাইতে পারে নাই। বগুড়া জেলার মুসলমানগণের মাতৃভাষা বাঙ্গলা—ইহারা অধিকাংশই একদা হিন্দু ছিলেন। অল্পদিন হইল মুসলমান হইয়াছে।" *সাহিত্য—পৌষ ১৩০৯ সাল।*

লিখিত আছে যে—"অনার্য জাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত হইয়া পূর্ববাঙ্গলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তন্নিমিত্ত তৎপ্রদেশের অধিবাসীরা বহু পরিমাণে অনার্য বংশ সম্ভূত বলিয়া হিন্দু সমাজে অতি নিচ শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিল। এরূপ হীনাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগের সময় দেশের রাজার সহিত স্বধর্মী হইতে তাহারা উৎসাহ সহকারে যাইবে ইহা আশ্চর্য নহে।" *রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বাংলার ইতিহাস"।*

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে কেহ কেহ ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়াছে এরূপ উক্তিতে মুসলমান সমাজের অনেকে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন। তাহাদের অনেকে বলেন যে উচ্চ শ্রেণী অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ধর্মবিশ্বাসী হইয়া ত.হারা সহসা ধর্মান্তর গ্রহণে স্বীকৃত হয় না। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই সহজে লোভে পড়িয়া অনেক সময় ব্যভিচার ও অনাচার গ্রস্ত হয় ; সুতরাং মুসলমানগণের অনেকে হিন্দু হইতে মুসলমান হইলেও তাহারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্মবিপ্লবে বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল, তজ্জন্যই কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনিতে হইয়াছিল। মুসলমান অধিকার কালে রাজবংশ ও রাজধানী পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন হেতু নব নব রাজবংশ ও নূতন নূতন স্থানে রাজধানী স্থাপন হেতু বঙ্গে অনেক বিদেশিয় সৈন্যসামন্ত, শিল্পী, রাজ-অমাত্য ও পারিষদবর্গের আগমন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক মোহন্ত, গির, গিরি, পুরী প্রভৃতি উপাধিক ব্রাহ্মণগণ আদৌ বিবাহ করেন না, তজ্জন্য তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত অত্যল্পকাল পর পরই সাধারণত মুসলমানগণ এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ স্থান ত্যাগ হেতু, সহজেই তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতি ও উত্তরোত্তর বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ছোলতান ১৬ নভেম্বর ১৯২৩।২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শেষোক্ত কারণগুলির কিয়দংশ সত্য হইলেও, মুসলমান অধিকার কালের অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের এদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, হিন্দু রাজ্যাবসানে যখন পাঠান প্রমুখ মুসলমানগণ ক্রমে এদেশে রাজ্য বিস্তার করেন, তখন তাহাদের রাজ্য ও ধর্ম বিস্তার একসঙ্গেই চলিয়াছিল। এদেশে যত বৈদেশিক জাতিগণ আগমন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমে হয় ধর্ম, না হয় বাণিজ্য ব্যপদেশে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছেন। ধর্মপ্রচারক বা ব্যবসায়ীগণকে বিদেশে রক্ষার্থ আসিয়া পরে বৈদেশিক রাজশক্তি, এদেশে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। পাবনা জেলার শাহজাদপুর নামক পল্লীতে মক্‌দুম্ সাহেবের আক্রমণ ও তথায় তৎকর্তৃক এথাকার মসজিদ নির্মাণ এদেশে মুসলমান অধিকারের প্রাক্কালীয় ধর্ম প্রচারের উৎকৃষ্টতর প্রমাণ।

মুসলমান আগমণের পূর্বে দেশমধ্যে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম লইয়া ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পর বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল, ব্রাহ্মণগণ তাহাদের স্বীয় রক্ষণশীলতা প্রযুক্ত আপন মত অক্ষুণ্ণ রাখিতে বৌদ্ধগণ ও হিন্দু সমাজের অপরাপর জাতিগণকে স্বদলে আনয়ন জন্য তাহাদের সহিত বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। তাহারা সুযোগ পাইলেই অহিংসাবাদ প্রচারক বৌদ্ধদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন। পাবনার উত্তর পশ্চিমাংশে নিমগাছি ও তন্নিকটবর্তী বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় এবং পাবনার পূর্ব প্রান্তবর্তী ঢাকা জেলার বিক্রমপুর রামপাল প্রভৃতি অঞ্চলে অতি পূর্বকাল হইতে বহু বৌদ্ধধর্মালম্বী জাতির বাস ছিল, তাহা চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায়। পাল রাজত্বকালেও যে মৎস্যঘাতী কৈবর্ত জাতিগণের উপর অনেক অত্যাচার হয়, তাহা কৈবর্ত নায়ক ভীম ও দিব্যকের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। পাবনা জেলার উক্ত কৈবর্ত নায়কগণের বিদ্রোহকালের চিহ্ন অদ্যাপি সিরাজগঞ্জের উত্তর পশ্চিমাংশে ভীমের জাঙ্গাল, ভীমের ডাইঙ্গ প্রভৃতিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

বিধর্মীগণকে স্বধর্মে দীক্ষিত করাও পাঠান ধর্ম প্রচারকগণের একটি প্রধান কার্য ছিল। তাহারা বলে, ছলে, কৌশলে এবং প্রলোভনে হিন্দুগণকে স্বধর্মে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিত।

মুসলমানগণ পৌত্তলিকার বিরুদ্ধবাদী। ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণ মূর্তিপূজক না হইলেও পাল রাজত্বকালে তাহাদের তান্ত্রিকতা নিবন্ধন বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে শৈবধর্মের উপাসক হইয়া উঠিলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিবপূজাপদ্ধতির অধিক প্রচলন হইয়াছিল। এই জেলার নিমগাছি ঘুরকা আদি অঞ্চলে আজিও স্থানে স্থানে বৃক্ষাদিতলে তাহার চিহ্নস্বরূপ রাশিকৃত শিবলিঙ্গমূর্তি পরিলক্ষিত হয়।

মুসলমানগণ কালে অনেক হিন্দু দেবদেবীর উপর অত্যাচার বা তাহা ধ্বংস করিয়াছেন। এই জেলার নহসিংহ পাড়ার নাককাটি ঠাকুরাণী নামে পরিচিত সিদ্ধেশরী দেবী তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখিত হইতে পারে। হিন্দুর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিরীহ বৌদ্ধগণের উপর তাহাদের অত্যাচার অধিক ছিল। বৌদ্ধ মঠ মন্দিরে বহু কালীয় ধনরত্নাদি সঞ্চিত ও লুক্কায়িত থাকিত তল্লাভে মুসলমান সৈন্যগণ বৌদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের মঠ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিত। তখন দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল যে, কেহ বৌদ্ধধর্মের নাম পর্যন্ত করিতে পারিত না। মুসলমান শাসন ক্রমে বদ্ধমূল হইলে তাহারাও হিন্দু বৌদ্ধ উভয়কেই কলা-কৌশলে স্বধর্মে টানিতে লাগিলেন। বৈদেশিক রাজশক্তি পরিপুষ্ট পাঠান ও ব্রাহ্মণগণ একত্রিত হইয়া বৌদ্ধধর্মালম্বী জাতিসমূহকে নানারূপে আক্রমণ করিলেন।

যাহারা ব্রাহ্মণের বশ্যতা স্বীকার করিল, তাহারা নবশাক বা নবশাখ (নূতন শাখা) জাতিতে পরিণত হইল; আর যাহারা তাহা স্বীকার করিল না, তাহারা দেশ হইতে তাড়িত বা সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া অনাচরণীয় জাতিতে পরিগণিত হইল। আর কেহ কেহ রাজানুকম্পা লাভ প্রত্যাশায় নবাগত উদীয়মান বৈদেশিক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিল। ধর্মান্তর গ্রহণের বিশেষ কারণ একদিকে ব্রাহ্মণ সমাজের উৎপীড়ন, অত্যাচার ও সামাজিক অস্পৃশ্যতার জন্য ঘৃণা, অপরদিকে রাজানুপালিত মুসলমান পীর ফকির, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতির তাড়না, প্রলোভন ও প্ররোচনা উভয় পক্ষের ঘাত, প্রতিঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া দলে দলে বৌদ্ধ ধর্মালম্বী জাতিগণ অনেকেই মুসলমান হইয়াছিল। যাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল না, তাহারা মুসলমান রাজ জাতির কি প্রকার স্তুতিগান করিত তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থকার রমাই পণ্ডিতকৃত শূন্যপূরাণের নিম্নলিখিত কবিতাংশে সূচিত হইয়া থাকে। যথা—

যতেক দেবতাগণ সব হয়ে এক মন
আনন্দেতে পরিল ইজের।
ব্রহ্মা হইল মহম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকম্বর
আদম্ফ সুলপানী।
গণেশ হইল গাজি কার্তিক হইল কাজি
ফকির হইল যত মুনি ॥

খ্রিস্টান মিশনারিগণ যেমন নিম্নশ্রেণীস্থ জাতিগণ মধ্যে ঔষধ বিতরণে বা ভিক্ষাদানে ধর্ম প্রচারের সুবিধা পান, তদ্রূপ মুসলমান কাজি ফৌজদারগণের সহায়তায় মুসলমান ধর্ম প্রচারকরা তৎকালে নানারূপ প্রলোভন ও প্ররোচনা দ্বারা উচ্চ নিম্ন বিশেষত নিম্নশ্রেণীস্থ অত্যাচারিত ও দলিত হিন্দু বৌদ্ধ জাতিগণকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের বর্তমান মুসলমানদিগের পূর্বপুরুষগণ মধ্যে অনেকেই যে পূর্বে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহা ইহাদের পোশাকপরিচ্ছদ ও নানারূপ চালচলনেই সূচিত হয়। এই জেলায় মুসলমানগণের অনেকে কাছা দিয়া কাপড় পরিধান করেন না। অনেকে দাড়ি রাখেন বটে, গোঁপ ও শিরমুণ্ডন করিয়া থাকেন। আরব ও পারস্য দেশিয় মুসলমানগণের মধ্যে ইজার পরিধানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীন ব্রহ্মদেশবাসিদিগের মধ্যে কাছা না দিয়া লুঙ্গি পরিবার রীতি দেখা যায়। মস্তক মুণ্ডন এবং গোঁফদাড়ি না রাখিয়া তাহা পরিত্যাগকরণ, "নাড়ামুড়ো" বা মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর চিহ্নমাত্র। ইহাতেও স্পষ্ট অনুমান হয়, এতদ্দেশীয় মুসলমানগণের অনেকেই ধর্মান্তরিত বৌদ্ধজাতি।

এই জেলার চাটমোহর থানার হাণ্ডিয়াল প্রভৃতি স্থানে ও অন্যান্য আরও অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায় মুসলমানগণের অনেকে লক্ষ্মীপূজা করে এবং শ্রাবণ মাসে মনসা পূজায় মালসাদি প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক হিন্দুর আচার ব্যবহার মুসলমান সমাজের অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হয়, এতৎ সমূহ সমস্তই তাহাদের পূর্বতন হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত থাকার নিদর্শন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—লোকসংখ্যা

১. হ্রাসবৃদ্ধি ঃ

বিগত ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের লোক গণনানুসারে পাবনা জেলার মোট লোকসংখ্যা ১৩৮৯৪৯৪ জন স্থিরীকৃত হইয়াছে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম লোকগণনা কালে এই জেলার মোট লোকসংখ্যা ১২১১৫৭০ জন ছিল, ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়া ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তাহা ১৪২৮৫৮৬ জন হইয়াছিল। তখন হইতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসরে এই জেলার লোকসংখ্যা হ্রাস হইয়া ১৩৮৯৪৯৪ জনে পরিণত হইয়াছিল। ১৯১১ অব্দে পাক্‌সিতে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মাণকার্য হেতু তথায় বিদেশিয় লোক নিযুক্ত থাকা প্রযুক্ত ওই খ্রিস্টাব্দে লোক সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু সাঁড়া-পুলিশ স্টেশন ব্যতীত অন্যান্য থানায়ও লোক সংখ্যা উক্ত দশ বৎসরে কেবল মাত্র রায়গঞ্জ থানা ব্যতীত অন্যান্য সর্বত্রই ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি কারণে অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে।

স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় লোকসংখ্যারই হ্রাস ঘটিয়াছে ; তন্মধ্যে পরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক সংখ্যা ৮৩২৪ জন অধিক কমিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১৯৯২২ জন অর্থাৎ শতকরা ৫.৭ জন এবং মুসলমানের সংখ্যা ১৯৫০৭ জন অর্থাৎ শতকরা ১.৮ জন হ্রাস হইয়াছে। মোটের উপর ১৯১১ হইতে ১৯২১ অব্দ পর্যন্ত দশ বৎসরে এই জেলার লোকসংখ্যা শতকরা ২.৭ জন কমিয়াছে ; অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেড়া পুলিশ স্টেশনের অধীনস্থ গ্রাম সমূহে শতকরা ১১.৭ জন হ্রাস হইয়াছে। পদ্মা যমুনা নদীদ্বয়ের ভাঙনও জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ।

২. বসতি সংখ্যা ঃ

এই জেলার প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে ৮২৮ জন লোকের বাস ; সদরে প্রতি মাইলে ৭০৬ জন এবং সিরাজগঞ্জে ৮৩৭ জন বাস করে। রায়গঞ্জ থানায় প্রতি বর্গ মাইলে সর্বাপেক্ষা কম ২৮১ জন এবং শাহজাদপুর থানায় প্রতি বর্গ মাইলে ১৪৫৫ জন লোকের বাস।

যমুনা, হুরাসাগর এবং পদ্মা ও যমুনা মধ্যবর্তী চরভূমি অতি উর্বর ; তজ্জন্য অন্যান্য স্থান অপেক্ষা শাহজাদপুর, চৌহালি, কাজিপুর, বেড়া প্রভৃতি পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত চরজাত ভূমিতে প্রতি বর্গ মাইলে অত্যধিক লোকের বাস আছে।

৩. প্রবাসী ও নিবাসী ঃ

এই জেলায় অন্যান্য স্থানের প্রবাসী এবং এই জেলার নিবাসী লইয়া জেলার মোট অধিবাসী সংখ্যা ১৯২১ অব্দে ১৩৮৯৪৯৪ জন। এই জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা নানা কার্যোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিদেশে বা পাবনার বাহিরে প্রবাসে বাস করে তাহাদের সংখ্যা ৭০৩০৭ জন ; আর বিদেশবাসী যাহারা কাজকর্মোপলক্ষে পাবনা জেলার অভ্যন্তরে বাস করে তাহাদের মোট সংখ্যা ৪৫৭২৫ জন। বিগত দশ বৎসরে পদ্মা ও যমুনা নদীদ্বয়ের ভাঙন হেতু এই জেলার অনেকে নদীয়া, রঙপুর, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গিয়াছে ; পূর্বে সিরাজগঞ্জ চটকলে

বহুলোক কাজ করিয়া বাঙালি ও পশ্চিম দেশিয় অনেকেই প্রতিপালিত হইত। এতদ্ব্যতীত এই জেলায় অনেক বিদেশিয় মুসলমান বেহারা, পশ্চিমা চাকর, পাচক ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া নানাপ্রকারে অর্থোপার্জন করে এবং প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্য অনেকেই বলিয়া থাকে—

"যে আসে পাবনা তার নাই ভাবনা"

বিভিন্ন প্রকার লোকসংখ্যা

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
পাবনাবাসী নামে পরিচিত	৭১৯৪২২	৬৯৪৬৫৪	১৪১৪৪০৭৬
পাবনায় নিবাসী	৬৭৮০৬১	৬৬৫৭০৮	১৩৪৩৭৬৯
পাবনাবাসী বিদেশে	৪১৩৬১	২৮৯৪৬	৭০৩০৭
বিদেশবাসী পাবনায়	২৮৬৪১	১৭০৮৪	৪৫৭২৫
পাবনায় অধিবাসী	৭০৬৭০২	৬৮২৭৯২	১৩৮৯৪৯৪

	পাবনাবাসী ভিন্ন জেলায়	ভিন্ন জেলাবাসী পাবনায়		পাবনাবাসী ভিন্ন জেলায়	ভিন্ন জেলাবাসী পাবনায়
বর্ধমান	১৭২	১৪২	রাজশাহী	১০৩৬১	৪২৯৪
বীরভূম	৪৩	৩১	দিনাজপুর	১৬২৪	১৪১
বাঁকুড়া	১৩	৫৯	জলপাইগুড়ি	৬৫১	৪৪
মেদিনীপুর	১৫৯	৪৬	দার্জিলিং	৪২৮	১৭
হুগলি	৯১	৯৪	রঙ্পুর	১৯১০৪	৩০৮
হাওড়া	১৮৪	৪১	বগুড়া	১০৯৩৪	২০৪৯
২৪ পরগণা	১২৯৮	২১৬	মালদহ	২৪২	৭১
কলকাতা	২২৮৮	২২১	ঢাকা	২৯৫১	৪৪৭৭
নদিয়া	২৮১৬	৯৪০০	মৈমনসিংহ	৮০৫৩	৪০৩২
মুর্শিদাবাদ	২৭৫	২৯৯	ফরিদপুর	৬৯৯৯	২৫৪৩
যশোহর	১৯১	৬৯২	বাকরগঞ্জ	৬৬	৪১৫
খুলনা	৫৭	১০২	ত্রিপুরা	৭২	৩০২
নোয়াখালি	৯	৩৮৭	চট্টগ্রাম	১৮	২৫৯

প্রতি দশ বৎসরের লোকসংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল

	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২
পাবনা	১৩৮৯৪৯৪	১৪২৮৫৮৬	১৪২১৩৯৫	১৩৬২২২৫	১৩১১৬৪৯	১২১১৫৭০
হ্রাসবৃদ্ধি	-৩৯০৯২	+৭১৯১	+৫৯১৭০	+৫০৫৭৬	+১০০০৭৯	

পুরুষ ও স্ত্রী

পুরুষ	৭০৬৭০২	৭২৩৫৯১	৭০৯৮৪৮	৬৭৭৭৪১ ,	৬৪৮২৫৮	৬০২৪৮৭
স্ত্রী	৬৮২৭৯২	৭০৪৯৯৫	৭১১৫৪৭	৬৮৪৪৮৪	৬৬৩৩৯১	৬০৯০৮৩

ধর্মাবলম্বী

		হিন্দু	ব্রাহ্ম	জৈন	বৌদ্ধ	মুসলমান	খ্রিস্টান	প্রেতোপাসক	মোট
১৯২১	পুরুষ	১৬৮৩৪৭	১০	৩৪৮	৪	৫৩৭৪৩৫	২১৫	৩৪৩	৭০৬৭০২
	স্ত্রী	১৬৫৯৮৫	৬	১০১	০	৫১৬১৩৬	২৪০	৩২৪	৬৮২৭৯২
		৩৩৪৩৩২	১৬	৫৪৯		১০৫৩৫৭১	৪৫৫	৬৬৭	১৩৮৯৪৯৪
১৯.১		৩৫ ২৫৪	বিবিধ---	৩৪		১০৭৩০৭৮	৫০০	৪০৬	১৪২৮৫৮৬

থানা প্রতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লোকসংখ্যা

পাবনা সদর

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	
মোট জেলা	১২১১৫৭০	১৩১১৬৪৯	১৩৬২২২৫	১৪২১৩৯৫	১৪২৮৫৮৬	১৩৮৯৪৯৪	পুলিশ স্টেশন
পাবনা	১৮০০৩৮	১৮৯৬৪৮	১৮৬২২৭	১৯৭৯৭৩	২০৪০৮৪	১০৪৯৪২	পাবনা
						৩০২১৭	আটঘরিয়া
						৫৯৫০২	সাঁড়া
চাটমোহর	১২৬৮২৮	১৩৩৪৬৭	১৩৪১২৭	১২৯৩৫০	১৩০৫৯৬	৭৫৫৮৩	চাটমোহর
						৫০৩০৯	ফরিদপুর
দুলাই	১৫০৯৩৬	২৮২৪৬	১৮৪১৪৫	১৭০৮৮২	১৬৯৯৫০	৭৪৬৪২	সাঁথিয়া
						৭৮০৩৭	সুজানগর
মথুরা	৯৪৪১৭	১০২৪৮৬	৯০৭০২	৮৮৫৪৪	৯৪৬৩৬	৮৩৬০২	বেড়া
	৫৫৫০১৯	৬০৪০৪৭	৬০০৪৮৮	৫৮৬৭৪৯	৫৯৯২৬৬	৫৫৮৮৩৪	

সিরাজগঞ্জ মহকুমা

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯৯১	১৯২১	
শাহজাদপুর	২০১২৫৩	২২০৪১১	২৪০৭৫৬	২৬১৮৯৬	২৫৬৩৩৬	১৬০০৪৫	শাহজাদপুর
						৫৪৮৫৯	চৌহালি
						৭৪২০২	বেলকুচি
উল্লাপাড়া	১৬১৮৫৫	১৭১৭১১	১৮৪৩৮৫	১৯২২৬৮	১৯৪৪৪৬	১২৯৯৬	উল্লাপাড়া
						৪৩০৪২	কামারখন্দ
সিরাজগঞ্জ	২২১০৪৩	২১৯১৮৫	২৩৮১৫৩	২৬৪১৮০	২৭০১৬৮	১৫৭০৬৫	সিরাজগঞ্জ
						৯৬১১৫	কাজিপুর
রায়গঞ্জ	৮২৪২৪	৯২৩৭৪	৯৮৯১০	১১০৩৬৮	১০৮৩৭০	৮০৫৬	রায়গঞ্জ
						৩০৯৮০	তাড়াস
	৬৬৬৫৭৫	৭০৩৬৮১	৭৬১৯০৪	৮৩৩৭১২	৮২৯৩২০	৮৩২৬৬০	

পরিমাণ ফল ও লোকসংখ্যা

পাবনা সদর

পুলিশ স্টেশন	ক্ষেত্রফল বর্গমাইল	মৌজা সংখ্যা	বাড়ি সংখ্যা	লোক সংখ্যা ১৯১১	লোকসংখ্যা ১৯২১	পুরুষ সংখ্যা	স্ত্রী সংখ্যা	বর্গমাইলে লোকসংখ্যা	থানা
পাবনা	১০১	২০০	২১৯০৬	২০৪০৮৪	১০৪৯৪২	৫৫১২২	৪৯৮২০	৮০১	পাবনা
আটঘরিয়া	৬৮	১১৭	৬৯৯২		৩০২১৭	১৫৮৭৭	১৪৩৪০	৪৪৪	
সাঁড়া	৮০	১১৩	১৩১৪৩		৫৯৫০২	৩০৮৫৯	২৮৬৪৩	৭৪৪	
চাটমোহর	১২০	১৯২	১৬৬৬৩	১৩০৫৯৬	৭৫৫৮৩	৩৯১৪৩	৩৬৪৪০	৬৩০	চাটমোহর
ফরিদপুর	৯	৫৬	৯৭৫৮		৫৭৩০৯	২৬০৯২	২৪২১৭	৫১৯	
সাঁথিয়া	১২৩	১৫৭	১৬৬৩৪	১৬৯৯৫০	৭৪৬৪২	৩৮২৩০	৩৬৪১২	৬০৭	দুলাই
সুজানগর	১০০	১৪৪	১৩৭৫২		৭৮০৩৭	৩৯৯৩৭	৩৮১০০	৭৮০	
বেড়া	৭০	১১৫	১৭১৭৯	৯৪৬৩৬	৮৩৬০২	৪১০০০	৪২৬০২	১১৯৪	মথুরা
	৮৮৯	১০৯৪	১১৬০২৭	৫৮৯২৬৬	৫৫৬৮২৪	২৮৬২৬০	২৭০৫৭৪	৭০৬	

সিরাজগঞ্জ মহকুমা

পুলিশ স্টেশন	ক্ষেত্রফল বর্গমাইল	মৌজা সংখ্যা	বাড়ি সংখ্যা	লোক সংখ্যা ১৯১১	লোকসংখ্যা ১৯২১	পুরুষ সংখ্যা	স্ত্রী সংখ্যা	বর্গমাইলে লোকসংখ্যা	থানা
শাহজাদপুর	১১১	১৯১	২৭৬৫৮	২৫৬৩১৬	১৬০৩৪৫	৭৯৫২৭	৮০৮১৮	১৪৪৫	শাহজাদপুর
চৌহালি	৪০	৬৯	৯৩৩১		৫৪৮৫৯	২৬৭৪৫	২৮১১৪	১৩৭১	—
বেলকুচি	৫৪	১১৭	১২৮৮৯		৭৪২০২	৩৬৬৬১	৩৭৫৪১	১১৫৯	—
উল্লাপাড়া	১৭৮	২৮৫	২৪৪৫৯	১৯৪৪৪৬	১২৯৯৯৫	৬৬৫৬৩	৬৩৪৩৩	৭৩০	উল্লাপাড়া
কামারখন্দ	৪০	৪৮	৭৫৫৫		৪৩০৪২	২১৫৩৯	২১৫০৩	১০৭৬	—
সিরাজগঞ্জ	১৩৫	২২১	২৮৪১৮	২৭০১৬৮	১৫৭০৬৫	৮০১৫৮	৭৬৯০৭	১১৬৩	সিরাজগঞ্জ
কাজিপুর	১০৪	৮৭	১৪২০৭	—	৯৬১১৫	৪৯৬৫৮	৪৮৪৫৭	৯৪৩	—
রায়গঞ্জ	৯৬	২৪১	১৫৫৮৪	১০৮৩৭০	৮১০৫৬	৪২০৬৮	৩৮৯৮৮	৮৪৪	রায়গঞ্জ
তাড়াস	১২১	১৮৪	৬২২৪	—	৩৩৫৮০	১৭৫২৩	১৬৪৬৭	২৮১	—
	৮৮৯	১৪৪৩	১৪৬৩২৫	৮২৯৩২০	৮৩২৬৬০	৪২০৪৪২	৪১২২১৮	৯২৭	

জাতি হিসাবে প্রতি থানার লোকসংখ্যা ঃ পাবনা সদর

	হিন্দু		মুসলমান		খ্রিস্টান		অন্যান্য	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
মোট জেলা	১৬৮৩৪৭	১৬৫৯৮৫	৫১৭৪৩৫	৫৩৬১৩৬	২১৫	২৪০	৭০৫	৪৩১
পাবনা—	১৩২৮০	১১৫২৯	৪১৮১৯	৩৮২১৭	১৫	৬৮	৮	৬
আটঘরিয়া—	৩১৮৪	২৭৬৭	১২৬৮৮	১১৫৭২	৫	১	-	-
সাঁড়া—	৮৫০৬	৭১৫৫	২২১৮৮	২১৩৪৩	১৩৩	১৩১	৩১	১৪
চাটমোহর—	৮৪৪৯	৮১৪৬	৩০৬৮৪	২৮২৯০	১০	৩	-	১
ফরিদপুর—	৭১০৩	৬৫৯৫	১৮৯৭৫	১৭৬১৩	১	-	৮	৯
সাঁথিয়া—	৮৩৭৩	৮৮৫২	২৯৮৫০	২৭৫৪৮	৫	১	-	১
সুজানগর—	১২৭৩২	১২৭৫২	২৭১৬৮	২৫৩১৯	৪	৪	৩৩	২৫
বেড়া—	১৪২২০	১৫৮৭০	২৬৭৪৬	২৬৭২০	৪	২	৩০	১০
	৭৫৮৫১	৭৩৬৬৬	২১০১১৮	১৯৬৬২২	১৭৮	২২০	১১৮	৬৭

সিরাজগঞ্জ মহকুমা

	হিন্দু		মুসলমান		খ্রিস্টান		অন্যান্য	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
শাহজাদপুর—	১৫২৯৮	১৬১০০	৬৪২২৬	৬৪৭১৫	২	৩	১	-
চৌহালি—	৭৪৬৫	৮৩৮১	১৯২৭৪	১৯৭৩৩	-	-	২	-
বেলকুচি—	১১১৫০	১২৩৪১	১২৫১০	২১৯৯	-	-	২	-
উল্লাপাড়া—	১৩০৬৪	১২৪৩৬	৫৩৪৭৫	১০৯৯৭	-	-	২৪	-
কামারখন্দ—	৪০৬৫	৪৩৫৮	১৭৪৭৪	১৭৪৫	-	-	-	-
সিরাজগঞ্জ—	২০৬৩০	১৯৪৫৩	৫৯৩৫৯	৫৭৪৯	২৭	১৪	১৪২	১১
কাজিপুর—	৪৬১৩	৪২৯৮	০০২৬	৫৪৫৫	-	-	১৯	৫
রায়গঞ্জ—	১২১৯৯	১১২৬৪	১৯৫৬৭	২৭৪৯৩	৮	৩	২৯৪	৩২৮
তাড়াস—	৪০১২	৩৬৮৮	১৩৯০২	১২৬১৯	-	-	১০৯	১২০
	৯২৪৯৬	৯২৩১৯	৩২১৩১৭	৩১৯৫১৪	৩৭	২০	৫৯২	৪৬৫

বিভিন্ন জাতীয় লোকসংখ্যা

	পুং	স্ত্রী	১৯২১ মোট	১৯০১ মোট		পুং	স্ত্রী	১৯২১ মোট	১৯০১ মোট
ওরাওন	১৯০৮	১৫৮৪	৩৩৯২	—	চাষাধোবা	২৭৫	২৪৫	৫২০	১৮৬৬
কাপাসী	২৩৯৮	২২৫৪	৪৬৫২	৫২৭৮	চামার	১৯৪০	১৪৫১	৩৩৯১	২৫৯৫
কামার	৩৭১৯	৩৫৫৭	৭২৭৬	৬৬৯২	ডোম	১৮৯	১৫[illegible]	৩৪৫	-
কায়স্থ	১৪৯২৬	১৫০০৫	২৯৯৩১	৩০৪৪৭	তাঁতি	২০৩৪	২০১৯	৪০৫৩	৪০২০
কুমার	৫২১০	৫২৫৮	১০৪৬৮	১১১১৬	তাম্বুলি	৭২	৫৭	১২৯	-
কাছার	১২৪৯	৩৭৯	১৬২৮	১৮৯৫	তিয়র	৪৯০	৫০৯	৯৯৯	-
কুর্মি	২৫৩৩	১৬০৭	৪১৪০	৩৩৭৬	তিলি	৪১৯৮	৪৫৭৯	৮৭৭৩	৯৪৪৭
কৈবর্ত				২২৪৬৭	দোসাদ	৪০৭	১৯৮	৬১৫	১৮৬৬
চাষি মাহিষ্য	৯১৪৪	৮৯০০	১৮০৪৪	-	ধোবা	৬০৩	৫৯৭	১২০০	-
আদি	২৩৮১	২৫১৯	৭২৮১	-	নমশূদ্র	২২২৩৭	২২৩৮৩	৪৪৬২০	৪৯১৯৪
কুলু	৮১	৪৬	১২৭	-	নাপিত	৫২০৪	৫০১১	১০২১৫	১০৬০৮
কোচ	১০০	৯৭	১৯৭	-	নুনিয়া	৭৮৩	৩৬১	১১৪৫	১১৮৩
কাওয়া	১	২	৩	-	পাটনি	১৫৬৬	১৭৪৩	৩৩০৯	৩৪৬৯
গন্ধবণিক	৯০৪	৯৮৯	১৮৯৩	২১২৭	পোদ(পৌণ্ড্র)	২	১	৩	
গায়ালা	৩৯১৮	৩৯১০	৭৫২৮	১২৩৯৪	ভুঁইমালি	২৬৭২	২৬১৭	৫২৮৯	৫০০১
ভুইয়া	৪১০	৩৩৭	৭৪৮		সদগোপ	১৩১৪	১২৫৫	২৫৬৯	
ভূমিজ	৩০৭	৩৫৭	৬৬৪		সাঁওতাল	৩৩৭	৩২৩	৬৬০	১৩০৯
ময়রা	৬৮৩	৬৪২	১৩২৫	১৪৫৫	সাহা	১২৪৮১	১৩৯২৮	২৬৪০৯	
মাল	৬৮১	৫০৫	১২৮৬		সুবর্ণবণিক	৬১২	৬৫৪	১২৬৬	১৪২০
মালি	৬৯৯	৭৫৭	১৪৫৬	১০৪৫	শুঁড়ি	১৮৪	৪৫	২২৯	-
মালো	১৪০৯৪	১৬৭৯০	৩০৮৮৪	৩২০৮১	শূদ্র	২৪	-	২৪	-
মুচি	৩০৯৮	২৪১০	৫৫০৮		সূত্রধর	৬২২০	৬০৮০	১২৩০০	১২৬২৩
মুণ্ডা	৪৬৭	৩৯৩	৮৬০		সোনার	৩০	১৮	৪৮	-
যুগী	৪৭১	৩৯৪	৮৬৫	১০২৭	হারি	২৫১	২৩৩	৪৮৪	-

	পুং	স্ত্রী	১৯২১ মোট	১৯০১ মোট		পুং	স্ত্রী	১৯২১ মোট	১৯০১ মোট
রাজপুত	৬৬৩	২৩৫	৮৯৮	১৬৬১	বিবিধ	৯৬০৩	৭৫১৪	১৭১১৪	-
রাজবংশী	৭১০৩	৭১৩৯	১৪২৪২	১৬১০৪	বেহারা	৪৫	৩৮৭	৮০২	১৩৯৭
লোহার	২৪	১৬	৪০		জোলা	৫৯২২	৫৫০৪	১১৪২৬	৮৩৯২৩
বাউরি	১৬১	১৮৭	৩৪৮		খুলু	৩২০৪	৩০৭৭	৬২৮০	২৫৭৪২
বাগদি	১২০৫	১২৭৭	২৪৮২	৩৩৫৭	নিকারি	৯৮০	৮৭১	১৮৫২	২২৬৪
বারুই	১৩৯৭	১৩০৫	২৭০২	২৭১১	পাঠান	৭২৪৬	৬৭৯	১৩০৩৭	৯৩৪৩
ব্রাহ্মণ	১১৮৬৬	১০৬৫৯	২২৫২৫	২১৮২৪	সৈয়দ	১৯৫৪	১৯৬৮	৩৯২২	২৬৫৭
বৈষ্ণব	২৪১১	৪২৫০	৬৬৬১	৮৭৬১	সেখ	৫১৬০১৫	৪৯৫৯৯৩	১০১২০০৮	৯২৮১২
বৈদ্য	৯১১	২৯৭	১২০৮	১৬৮০	বিবিধ	১৬৯০	১৫৪৪	৩২৩৪	

অবিবাহিত ও বিবাহিত লোকসংখ্যা

	অবিবাহিত			বিবাহিত			বিপত্নীক	বিধবা মোট
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	সংখ্যা	সংখ্যা
সর্ব ধর্মাবলম্বী	৩৭৯৪১২	২৩৭১৬০	৬১৬৫৭২	৩০৬১২৯	৩০৬৯৫৬	৬১৩০৬৫	২২১৬০	১৩৮৬৯৬
হিন্দু	৮৭৬৪৬	৪৮৯০৩	১৩৬৫৪৯	৭১৫৭৫	৬৮৩৫৭	১৩৯৯৩২	৯১২২	৪৮৭২৫
মুসলমান	২৯১৩১৮	১৮৭৯৬৫	৪৭৯২৮৩	২৩৪১৩৬	২৩৮২৯০	৪৭২৪২৬	১১৯৮১	৮৯৮৮১

অশিক্ষিত ও শিক্ষিত লোকসংখ্যা (১৯২১)

	শিক্ষিত			অশিক্ষিত			ইংরেজি শিক্ষিত		
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
সর্ব ধর্মাবলম্বী	৮২৩৫৯	৮৯৪৩	৯১২৯৪	৬২৪৩৪৩	৬৭৩৮৫২	১২৯৮১৯৫	১৮৫৭৫	৪৯৭	১৯০৭২
হিন্দু	৪৫৪২৯	৬৯৯৩	৫২৪২২	১২২৯১৮	১৫৮৯৯২	২৮১৯১০	১২৮৪০	২৯০	১৩১৩০
মুসলমান	৩৬৫৪৬	১৮৩৩	৩৮৩৭৯	৫০০৮৮৯	৫১৪৩০৩	১০১৫১৯২	৫৬৪৫	১৪৮	৫৭৯৩

ব্যাধিগ্রস্ত লোকসংখ্যা

	মোট	উন্মাদ	মুকবধির	অন্ধ	কুষ্ঠ
পুরুষ	১৮৩০	৩৮৭	৬৮১	৬৪৭	১৪০
স্ত্রী	১৩৮৯	৩০০	৫৪৩	৫১৭	৫২
	৩২১৯	৬৮৭	১২২৪	১১৬৪	১৯২

শিক্ষিত হিসাবে প্রতি থানার লোকসংখ্যা (পাবনা সদর)

পুলিশ	শিক্ষিত		ইংরাজী শিক্ষিত	
স্টেশন	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
পাবনা	৮৩৮১	১৭০৯	৩২২৫	১২৭
আটঘরিয়া	১৫৮৮	১১২	১৫৫	১
সাঁড়া	৩৪৪৭	৪০৯	১১৭৮	৩৭
চাটমোহর	৩৯৩৬	৪৪২	৯৩৩	১১
ফরিদপুর	২৮১৫	১৮৬	৬৭২	৬
সাঁথিয়া	৪০৫৯	৪৩৮	৭৬০	৯
সুজানগর	৫৩৭৩	৫৩৫	৯৭১	১৬
বেড়া	৫৯৮১	৬৯৯	১৪৮১	৩২
	৩৫৫৮০	৪৫৩০	৯৩৭৫	২৩৯

সিরাজগঞ্জ মহকুমা				
শাহজাদপুর	৯০২৯	১৪০৭	২২৪৭	১০৭
চৌহালি	৪২২০	৪০৩	৯৩৩	১২
বেলকুচি	৫০৯০	৩৮৩	৭৩৫	১২
উল্লাপাড়া	৬১৭৫	৪০৫	১১২৬	৯
কামারখন্দ	২৪৫৮	৮৮	৩৭৩	৩
সিরাজগঞ্জ	১০৯৩৩	১২২৭	১৭৩৩	৫১
কাজিপুর	৩৪২৪	১৩০	৩৭০	—
রায়গঞ্জ	৪৪২৪	২৩৪	৫৪৭	৫
তাড়াস	৬৬২	২৯	৪৮	—
	৪৬৩৯৫	৪২৯৮	৯১১০	১৯৯
মোট জেলা	৮২৩৫৯	৮৯৪০	১৮৫৭৫	৪৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিভিন্ন জাতি ও সমাজ

বিগত আদমসুমারির বিবরণে এই জেলার হিন্দু সমাজে প্রায় ষাট প্রকার এবং মুসলমান সমাজে প্রায় সাত প্রকার জাতি থাকা জানিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে হিন্দুর লোকসংখ্যা হিসাবে নমঃশূদ্র জাতি সর্বপ্রথম, মালো দ্বিতীয়, কায়স্থ তৃতীয়, সাহা চতুর্থ, ব্রাহ্মণ পঞ্চম, চাষীকৈবর্ত ষষ্ঠ এবং রাজবংশী সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া থাকে। মুসলমানগণ মধ্যে শেখ প্রথম এবং পাঠানগণ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া থাকে।

বর্ণমালা হিসাবে কতিপয় জাতির বিবরণ

কপালি—পাবনা জেলার কপালি জাতির সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজারের অধিক। ইহারা সাধারণত কপালি বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহারা গুজরাট অঞ্চলের কপোল বেনিয়া বংশের এক শাখা বলিয়া খ্যাত। তথা হইতে বঙ্গে আগমন করতঃ কৃষি কাজের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া ইহাদের অনেকেই কৃষিকার্যে লিপ্ত হইয়াছেন।

পাবনা সদরে বাদাই, রাণীনগর, বিল্লাঢাঙ্গি, ভাদরভাগ, শ্রীপুর, বড়ুরিয়া, ঘনশ্যামপুর, মালঞ্চি প্রভৃতি গ্রামে এবং সিরাজগঞ্জের অধীন সোহাগপুর, চাপড়ি, সয়দাবাদ, চান্দাইকোণা, মালিপাড়া, তারুটিয়া, দাদনপুর, মুরাদপুর, সন্তোষা, বামনদি, মীরপুর প্রভৃতি পল্লীতে অনেক কপালি জাতির বাস আছে। পাটের তন্তু হইতে চট এবং সূত্র হইতে উৎকৃষ্ট ও মিহি বস্ত্র বয়ন ইহাদের কাহার কাহার ব্যবসায় আছে। কৃষিকার্য ইহাদের উপজীবিকা, ইহারা বিনয়ী ও সদাচারী, ইহারা সকলেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী, বর্তমানে এই সমাজে এই জেলায় অনেকে সুশিক্ষিত হইয়াছেন। এই সমাজের সোহাগপুরের নিবাসী ব্রজবাসী সরকার, বি এ ও রামলাল সরকার বি এল, মহাশয়ের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত।

কামার—পূর্বে স্বর্ণ ও লৌহ শিল্পীদিগের স্বর্ণকার (সোনার) ও লৌহকার (লোহার) এই দুইটি উপাধি বর্তমান ছিল। বল্লালী আমলে স্বর্ণকারদিগের পাতিত্য ঘটিলে লৌহকারগণেরই অনেকে স্বর্ণকারের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কর্মকার কোন জাতিবিশেষের উপাধি নহে।

বাংলা ভিন্ন সর্বত্রই সোনার ও লোহার উপাধি বর্তমান আছে। পাবনা জেলার গোপালনগরে (ফরিদপুর) 'রসুয়া' নামক মুসলমান জাতি, বাগবাটির (সিরাজগঞ্জ) ভুইমালি জাতি, পাবনা রাধানগরে কৈবর্ত জাতি, হাণ্ডিয়াল ও অন্যান্য অনেক গ্রামে সাহা প্রভৃতি নানা জাতীয় অনেকে স্বর্ণ রৌপ্যাদির গহনা প্রস্তুত করিয়া থাকে। পাবনা টাউনে, হিমাইতপুরে, বনগ্রামে, বাঁশেরবাধা, বোড়ামারা, গোপীনাথপুর, তারানগর প্রভৃতি গ্রামে এবং সিরাজগঞ্জের অধীন পোরজনা, কান্দাপাড়া, দেলুয়া, বাগবাটি, গাড়ুদহ, দৌলতপুর (খুকনি) প্রভৃতি পল্লীতে অনেক কর্মকারের বাস।

এই জেলার কর্মকারগণের রাঢ়ী শ্রেণী মধ্যে দশপাড়া ও বারেন্দ্র মধ্যে পাঁচপাড়া সমাজ প্রচলিত আছে। আজকাল কর্মকার উপাধির পরিবর্তে অনেকে চৌধুরি, জোয়ার্দার, সরকার প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেছেন। বিগত লোক গণনাকালে ইহারা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া দাবি করিয়াছেন। কিন্তু গোপাল ভট্টকৃত "বল্লাল চরিত্রে" উত্তর খণ্ডে ১২৮ শ্লোকে বর্ণিত আছে—

"তৈলিকাদ্বারজীবায়াং কর্মকার হ্যভূৎসুতঃ।"

কর্মকারগণ নবশাক শ্রেণীভুক্ত, ইহাদের বিধবাগণ মাছ খায়। স্বর্ণকারগণ সামাজিক হিসাবে নিম্নশ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হইলেও এই জেলায় স্বর্ণকার ও লৌহকারে পুরোহিত ব্রাহ্মণ এক ও অভিন্ন।

কায়স্থ—এই জেলায় কায়স্থ জাতির সংখ্যা ত্রিশ হাজারের বেশি ছিল; বিগত ১৯২১ অব্দে হ্রাস হইয়া ২৯৯৩১ জন হইয়াছে। ইহার মধ্যে বারেন্দ্র কায়স্থ সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। তন্নিম্নে বঙ্গজ, রাঢ়ী শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীর কায়স্থ সংখ্যা এই জেলায় অতি মুষ্টিমেয়। পোতাজিয়া, অষ্টমনীষা, উধুনীয়া, তাড়াস, মালঞ্চি আদি গ্রাম বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ প্রধান এবং হাসামপুর, খলিলপুর, সাগরকান্দি, নাঘলপুর, দৌলতপুর, বেলতা, গোয়াইলবাড়ি, বাঁশবাড়িয়া, সৈয়দপুর প্রভৃতি পল্লী বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ প্রধান। রাঢ়ী শ্রেণীর কায়স্থগণের বাস এই জেলায় কচিৎ পরিলক্ষিত হয়। মাত্র চাকরি ও ব্যবসায়াদি উপলক্ষে কেহ কেহ স্থানে স্থানে বাস করেন। এতদ্ব্যতীত বায়াত্তরা কায়স্থ নামে যে কায়স্থ স্থানে স্থান বর্তমান আছেন তাহারা বারেন্দ্র ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের গরিব ও নিম্নশ্রেণীর সহিত ক্রমশ বৈবাহিক সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন।

জমিদারি, জোতদারি ও চাকরি কায়স্থগণের প্রধান উপজীবিকা। ওকালতি, মোক্তারি, ডাক্তারিতেও ইহারা পারদর্শী। বারেন্দ্র কায়স্থগণের অনেকেই পূর্বাপর শিক্ষিত, সদাচারী, দেবদ্বিজে ভক্তি-পরায়ণ এবং স্বাত্ত্বিক-প্রকৃতিসম্পন্ন। বারেন্দ্র কায়স্থপ্রধান পল্লীমাত্রেই অনেকের বাটিতে দৈনিক দেবসেবা ও অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা আছে। সকলেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এবং গোস্বামীগণের শিষ্য। অন্যান্য জাতিগণ অপেক্ষা কায়স্থ সমাজে অধিকাংশ লোক শিক্ষিত ও চতুর। তজ্জন্য ইহারা সাধারণের নিকট কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন।

বঙ্গে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ প্রতিষ্ঠাতাগণের অগ্রণী ভৃগুনন্দীর সন্তান কানু ও মাধব নন্দীর সময় হইতে এই জেলায় তদ্বংশীয়গণের বাস এবং বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের সংখ্যা এখানে সর্বাপেক্ষা বেশি তজ্জন্য **বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ইতিহাস** সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল। ১০১০ শকে (১০৮৮ খ্রিঃ) বল্লাল সেন কায়স্থ সমাজের পঠীবন্ধনে উদ্যত হইলে তদীয় সভাসদ ভৃগুনন্দী রাজদত্ত মর্যাদা অবহেলা করিয়া মুরহর চাকি ও নরহরি দাসের সহিত মিলিত হইয়া বারেন্দ্র ভূমের রাজা শিবনাগের পুত্র শৈলকূপা (যশোহর) নিবাসী কর্কট নাগ এবং সরগ্রাম (পাবনা, সাঁথিয়া) নিবাসী জটাধর নাগের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

যথা— "দাস নন্দী চাকি নাগে সহায় করিয়া।
বল্লালের যত জেদ দিলেক ভাঙিয়া।।"

"এই সময়ে গৌড়ীর কতিপয় কায়স্থ সমাজের দক্ষিণ রাঢ়ীয় শিখিধ্বজ দেবের বংশজাত বুধদেব ও কুলদেব এবং পুরুষোত্তম দত্তের বংশজাত নারায়ণ দত্ত ও উত্তর রাঢ়ীয় ব্যাস সিংহের পুত্র পরীক্ষিত সিংহ তাহাদের সমাজ পরিত্যাগ পূর্বক ভৃগুনন্দী সহিত মিলিত হন।"

কৃষ্ণবল্লভ রায় প্রণীত "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ" ৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই সাতঘর মিলিত হইয়া যে সমাজ সংস্থাপিত হয়, তাহাই বঙ্গে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ নামে খ্যাত। এই সমাজে দাস, নন্দী, চাকি তিন ঘর সিদ্ধ অর্থাৎ কুলীন এবং দেব, দত্ত, নাগ, সিংহ চারি ঘর সাধ্য অর্থাৎ মৌলিক যথা—

"তিন ঘর সিদ্ধভাব নন্দী চাকি দাস।
নাগ সিংহ দেব দত্ত সাধ্যেতে প্রকাশ।"

উপরোক্ত সাত ঘর ব্যতীত বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ সাড়ে সাত ঘর বলিয়াও বর্ণিত হইয়া থাকেন। যথা—

"সাত ঘর লয়ে মাত্র পঠী বদ্ধ হইল।
পরেতে অর্ধেক ভাগ সরমা পাইল।।"

"শ্রুত হওয়া যায় নাটোর ডাঙাপাড়া গ্রামে শর্মার বংশ আছে। শর্মা যে সমাজে গৃহীত হয় নাই, তাহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু এই ব্যক্তির নাম নরসুন্দর ছিল বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে বাস্তবিকই নাপিত জাতি বলিয়া থাকে। ইহা যে অনভিজ্ঞতা ও ঈর্ষামূলক কথা তাহাতে সন্দেহ নাই।" *"ঢাকুর সমালোচনা" গোবিন্দবিনোদ বারিধিকৃত। ৫০-৫১ পৃষ্ঠা।*

পূর্বে এই জেলার নিম্নলিখিত গ্রামসমূহে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের বসতি ছিল। (১) **দাসবংশ** : ময়দানদীঘি, পাবনা, মালঞ্চি, চৌপাকী, ঘরগ্রাম, কুমিল্লী। (২) **নন্দীবংশ**—রহিমপুর, হামকুড়া, মহেশরৌহালী, আটঘরিয়া, পোতাজিয়া, অষ্টমনীষা, ভুতিয়া, কামারগ্রাম। (৩) **চাকিবংশ**—অষ্টমনীষা, দিলপশার, রহিমপুর, নলমুড়া, সিমলা, গোবিন্দপুর, মহেশরোহালী, চাচকিয়া, হমরাজপুর। (৪) **দেববংশ**—তারাস, চড়িয়া। (৫) **দত্তবংশ**—সেখুপুর, রাধানগর। (৬) **নাগবংশ**—সরগ্রাম, গয়েশবাড়ি, গাঁড়াদহ, মালঞ্চি, সিঙ্গা, নরনিয়া, ঘুরকা। (৭) **সিংহবংশ**—উধুনিয়া, জামালপুর, বাবুলদহ।

বারেন্দ্রভূমিতে কায়স্থ সমাজের প্রভাব পূর্বাপর বর্তমান থাকা জানা যায়। নাগবংশীর জটাধর নাগ এই জেলার সোনাবাজু ও তারাউজিল পরগণার মালিক ছিলেন। নারায়ণ দত্ত লক্ষ্মণ সেনের সন্ধিবিগ্রহিক অমাত্য ছিলেন। দেববংশীয় শুকদেব তালুকদার প্রভৃতি নবাব সরকারে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নন্দীবংশীয় গোপীকান্ত নিয়োগী আকবর বাদশাহের সময়ে বাংলার কাননগু পদে নিযুক্ত ছিলেন। তদ্বংশীয় সুবুদ্ধি খাঁ ও কমল খাঁ সৈনিক বিভাগে কার্য করিয়া স্বীয় নামানুসারে জায়গির লাভ করিয়াছিলেন। সিংহ বংশীয়দিগের মধ্যে উধুনিয়ার সিংহ অতি প্রসিদ্ধ। জামালপুরের সিংহ বংশ এক সময়ে সবিশেষ উন্নত ছিলেন। ইহারা দোল দুর্গোৎসব ও রথযাত্রাদিতে সুনাম অর্জন করেন। ইহাদের প্রযত্নে জামালপুরে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনীত হন ও ব্রহ্মত্রাদি প্রাপ্ত ছিলেন।

এই জেলার বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ অতি সংকীর্ণ; জেলার পূর্বাংশে যমুনা নদীতীরস্থ প্রদেশেই এই সমাজ বসতি গ্রামসমূহ বেশি। দৌলতপুর নিবাসী মিত্র মজুমদার বংশ আধুনিককালে এ জেলায় বাস করিতেছেন। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দশভূজা মূর্তির দৈনিক সেবা উল্লেখযোগ্য। গোয়াইলবাড়ি নিবাসী অধিকারী মহাশয়দিগের বাটিতে প্রতিষ্ঠিত গৌরনিতাই

বিগ্রহের বার্ষিক দোলোৎসব সবিশেষ দর্শনযোগ। সাগরকান্দির অনাদিকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের আন্তরিকতায় তথায় রাধারমণ জিউ নামক যে একটি বিগ্রহালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও সর্বথা উল্লেখযোগ্য। বারেন্দ্র কায়স্থগণ অপেক্ষা বঙ্গজ কায়স্থগণ অনেক গরিব। চাকরিজীবীর সংখ্যাই বঙ্গজ সমাজে অত্যধিক। জমিদার ও তালুকদার এই সমাজে মুষ্টিমেয়। গোয়াইলবাড়ি নিবাসী অধিকারী উপাধিক কায়স্থগণের মন্ত্র শিষ্য আছে। ইহা তাহাদের পূর্বতন আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠাসূচক।

পাবনা জেলায় বারেন্দ্র ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের অনেকে সম্প্রতি ১২/১৪ বৎসর হইল উপবীত গ্রহণ এবং দ্বাদশ দিবস অশৌচান্তে ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ প্রথা গ্রহণ করিয়াছেন। উপবীত গ্রহণকারী কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। উপবীত গ্রহণ জন্য হিন্দু সমাজে বিশেষত ব্রাহ্মণ সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। নানা প্রকার দলাদলি এমন কি পাবনায় তদুপলক্ষে নানারূপ দেওয়ানি মোকর্দমা পর্যন্ত হইয়াছে। উপবীত ও অনুপবীত কায়স্থ মধ্যে বিবাহাদি উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণপূর্বক পরিণয়াদি নিষ্পন্ন হইতেছে।

বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে অধিকাংশ লোকের চেহারা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, সুন্দর ও সুশ্রী লোকসংখ্যা এই সমাজে অতীব বিরল। অনেকের ভীমকায় সুদীর্ঘ অবয়ব পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গজ সমাজেও বিশেষ সুন্দর কান্তি স্ত্রী পুরুষ লোক সংখ্যা অন্যান্য জাতির ন্যায় সহসা দৃষ্টি গোচর হয় না।

কুম্ভকার—সাধারণত কুম্ভকার কুমার নামে পরিচিত। পাবনা জেলায় ইহাদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় সাড়ে দশ হাজার। পূর্বে আরও বেশি ছিল, ক্রমশ ইহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। মৃত্তিকা দ্বারা হাড়ি, পাতিল, কলসি, ভাঁড় প্রভৃতি নির্মাণ ইহাদের সর্বপ্রধান ব্যবসায়। সকলেই পাল উপাধিক। কেহ কেহ মিষ্টান্নাদি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতঃ মোদকের কার্যে লিপ্ত আছে। পাবনা সদরে সিঙা, শালগাড়িয়া, মাঝিপাড়া, কোলা, মৃজাপুর, গোবিন্দপুর, প্রভৃতি গ্রামে এবং সিরাজগঞ্জের অধীন খুকনি, সনাতনী, উল্লাপাড়া, ঘুরকা, ঝাপড়া, ধানঘরা, বাগবাড়ি, মিলমসিল, পাঙাসি, নওহাটা, সারটিয়া, সাতেনতলী, বেতিল প্রভৃতি পল্লীতে অনেক কুম্ভকারের বাস।

এই জেলার কুমারগণ শিরস্থান, মাঝস্থান, চন্দনসার, চৌরাশি, দাসপাড়া প্রভৃতি কয়েক বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত। হিমাইতপুরে চৌরাশি উপাধিক কুম্ভকারগণের সামাজিক প্রাধান্য জন্য নবাবী সনন্দ আছে শুনিতে পাওয়া যায়। কুপ খনন জন্য জেলা মধ্যে স্থানে স্থানে যে সমস্ত কুম্ভকারগণ শীতকাল হইতে বৈশাখ জৈষ্ঠ পর্যন্ত মৃত্তিকা দ্বারা পাট ও চাড়ি তৈয়ার করে, তাহারা সাধারণত নদিয়া জেলা হইতে আগত, জেলাবাসী তন্মধ্যে মুষ্টিমেয়।

কুম্ভকারগণ শিল্পীজাতি। বল্লাল চরিতে বর্ণিত আছে—

ঘৃতাচি বিশ্বকর্ম্মনো নব পুত্রাশ্চ শিল্পিনঃ
মালাকার কর্ম্মকার শাঙ্খকার কুবিন্দাঃ
কুম্ভকার কাংসকার ষড়েতে শিল্পীনাং বরাঃ।
সূত্রধারশ্চিত্রাকার স্বর্ণকারস্তথৈবচ।।
পতিতাস্তে ব্রহ্মশাপাদযাজ্যাস্তেন হেতুনা।

কিন্তু কুম্ভকারগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—

পট্টকারাচ্চ তৈলিক্যাং কুম্ভকার বভুব।

কৈবর্ত—পাবনা জেলায় কৈবর্ত জাতির সংখ্যা পূর্বে এক পর্যায়ে প্রায় ২২ (বাইশ) হাজারের অধিক প্রদর্শিত হইত। বিগত ১৯২১ অব্দের লোকগণনা কালে চাষি কৈবর্ত (মাহিষ্য) সংখ্যা ১৮০৪৪ এবং আদি কৈবর্ত সংখ্যা ৭২৮২ জন প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই জেলায় কৈবর্তগণ আচরণীয় ও অনাচরণীয় (অর্থাৎ যাহাদের সমাজে জল চল ও অচল) ভেদে দুই প্রকার। উভয় সম্প্রদায় মধ্যে দাস, প্রামাণিক সরকার, জোয়াদ্দার, বিশ্বাস আদি উপাধি বর্তমান আছে। জল আচরণীয় কৈবর্তগণ হালিক বা মাহিষ্য নামে ইদানিং পরিচিত হইতেছেন। ইহারা অধিকাংশই কৃষিজীবী ; এই সমাজে অধুনা শিক্ষিত সংখ্যা অধিক। চাকরি ও কৃষিকার্যে অনেকেই লিপ্ত। জল অনাচরণীয় কৈবর্তগণ সাধারণত কৈবর্ত নামে পরিচিত। ব্যবসায় বাণিজ্য ও চাকরি আদিতে অনেকে লিপ্ত। জালিক নামে খ্যাত হইলেও কেহ আজকাল মৎস্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত নহেন।

হালিক জালিক নামে খ্যাত হইলেও কৈবর্ত জাতি দুই প্রকার এমত কোনও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সহসা দৃষ্টি গোচর হয় না। কেবলমাত্র জানা যায়

"ক্ষত্র বীর্য্যেন বৈশ্যায়াম কৈবর্ত পরিকীৰ্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবর সংসর্গাৎ ধীবর পতিত ভূবি।"

—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।

ইহাতে উপলব্ধি হয়, কৈবর্ত জাতি আদিতে এক ছিল, পরে তীবর বা মৎস্য ব্যবসায়ী জাতিগণের সংসংসর্গে পতিত হইয়াছেন। যাহারা বৈশ্য জনোচিত কৃষিকার্য বা বাণিজ্যাদিতে লিপ্ত আছেন, তাহাদের কেহ হালিক, কেহ কৈবর্ত প্রভৃতি নামেই পরিচিত হইতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎকৃত বিবিধ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"দাস, ধীবর, কৈবর্ত এক, এক্ষণে বাঙ্গালার কৈবর্ত মধ্যে কতক চাষী কৈবর্ত, কতক জেলে কৈবর্ত, পূর্বে সকলেই ধীবর ছিল সন্দেহ নাই।" এই মত হালিক বা মাহিষ্যগণ ভ্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করেন।

পূর্বে উভয় সম্প্রদায় এক ছিলেন কি পৃথক ছিলেন, তাহা সমাজতত্ত্ববিদগণের বিচার্য, তবে জালিক কৈবর্ত ও হালিক কৈবর্তগণ উভয়েই আর এই জেলায় কৈবত বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন না, উভয়ে মাহিষ্য নামে বিখ্যাত হইতে প্রয়াসী এবং সভাসমিতি ও আন্দোলন সমস্তই মাহিষ্য নামে পরিচিত এবং জালিক কৈবর্তগণ আপনাদিগকে আদি কৈবর্ত বলিয়া লোকগণনায় তাহাদিগকে জাতি পর্যায়ে নির্দেশ করিয়াছেন, পূর্বোক্ত তালিকায় তাহা সহজে দ্রষ্টব্য।

পাবনা জেলায় সাদুল্যাপুর, নাজিরপুর, চিথলিয়া, ফুলবাড়ি, নলছা প্রভৃতি গ্রামে হালিক কৈবর্ত এবং পাবনা, রাধানগর, নাকালিয়া, ধানবাঁধি, ভুইএাগাঁতি প্রভৃতি গ্রামে জালিক কৈবর্তের বাস বেশি। এই সমাজস্থ শাহজাদপুরের নদীপারস্থিত কুমিরগোয়ালিয়া গ্রামের অধিকারী উপাধিক কয়েক পরিবার শিষ্য ব্যবসায়ী। তাহাদের পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, মৈমনসিংহাদি কয়েক জেলায় অনেক মন্ত্রশিষ্য আছে। ইহা তাহাদের পূর্ববর্তীগণের ধর্মজগতে উৎকর্ষ লাভের পরিচায়ক তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কৈবর্ত সমাজে হালিক সম্প্রদায়ের জল সমাজে আচরণীয় হইলেও, তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ সমাজে চল নহেন। তাহারা বর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত। এমনকী, হালিকগণ ইতিপূর্বে তাহাদের পুরোহিতের জল পান করিতেন না; সম্প্রতি স্থলে স্থলে গ্রহণ করিতেছেন। পাবনা বাজারে হালিক বা মাহিষ্য দাসের একখানা মিষ্টান্নের দোকান আছে। তাহাতে হালিক দাসের পুরোহিত ব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার নাই, ব্রাহ্মণ কেহ আসিলে তিনি বাহিরে আসন পাইয়া থাকেন। বল্লালী আমল হইতে তাহাদের কৃতকার্যের পুরস্কারস্বরূপ হালিক দাসগণের সামাজিক উন্নতি ও অরুণোদয়কালীন প্রথম দর্শনীয় ব্যক্তি ভুইমালীকে পুরোহিত প্রাপ্তির চিরপ্রচলিত কিংবদন্তীতে হালিক কৈবর্তগণ অধুনা দুঃখিত হয়েন ; কিন্তু তাহারা বরং সমাজের আচরণীয় হইয়া নিজ পুরোহিতের পাণ্ডিত্যের মোচনে এত দিন কেন সমর্থ হয়েন নাই, তাহা হিন্দু সমাজের পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্ক বলিতে হইবে এবং ইহা প্রচলিত জনশ্রুতির সত্যতাই নির্দেশ করিতেছে।

জালিক কৈবর্তগণের সহিত আদি সম্পর্ক ত্যাগ ও পুরোহিত সমস্যা পরিহারকল্পে আজকাল হালিক কৈবর্তগণ মাহিষ্য নামে পৃথক জাতি প্রদর্শন করিতে ও স্বতন্ত্র শাস্ত্রীয় যে সকল রচনাদি উদ্ধৃত করিয়া জাতীয় পুস্তিকা পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটিতে ক্ষত্রি. হইতে বৈশ্য গর্ভে মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি জানা যাইতেছে। তাহা হইলে কৈবর্ত মাহিষ্য উভয়েই বর্ণশঙ্কর মধ্যে পতিত হইয়াছেন। পূর্বে পাবনাদি অঞ্চলে মাহিষ্য নামে কোন জাতির পরিচয় পাওয়া যাইত না, পশ্চিমবঙ্গে "মাইতি" জাতি থাকা জানা যাইত মাত্র। উন্নতি সকল জাতির আবশ্যক, সামাজিক দোষাদি স্খালনপূর্বক রক্ষণশীল উন্নতি সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল অপেক্ষা সর্বথা শ্রেষ্ঠ ও প্রশংসনীয়।

চাষ আবাদ ও ব্যবসায়াদি সমস্তই বৈশ্যত্বের লক্ষণ। কৈবর্ত জাতির উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই জেলায় এই দুইটি প্রধান বৃত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল সাদুল্লাপুর নিবাসী জোয়াদ্দার উপাধিক জনৈক হালিক কৈবর্ত পরিবার আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করত উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহারা দ্বাদশ দিন অশৌচ পালন ও ত্রয়োদশ দিনে ক্ষত্রিয়াচার মতে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন।

পাল রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গে যে "কৈবর্ত বিদ্রোহ" উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ফলে কতক দিন পর্যন্ত পাল রাজগণকে বিতাড়িত করিয়া কৈবর্ত জাতি বারেন্দ্র ভূমিতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মৎস্যশিকারী রাজবংশী জাতি কৈবর্ত জাতির এক পর্যায় কি না তাহা বিশেষ বিবেচ্য। কিয়দ্দিন বারেন্দ্র ভূমি রাজশক্তি পরিচালনা হেতু তাহাদের রাজার বংশ বা রাজবংশী উপাধি হইয়াছে কি না তাহাও সর্বথা প্রণিধানযোগ্য। উত্তর বঙ্গীয় রাজবংশী জাতি পার্বত্য প্রদেশে লুক্কায়িত ক্ষত্রিয় বলিয়া অনুমিত হইয়া তাহারা সমাজে আজকাল আচরণীয় হইয়াছে। পাবনা জেলার কৈবর্ত জাতির ন্যায় রাজবংশী জাতির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, প্রায় ১৪ হাজারের উপর। ইহাদের অনেকে মৎস্যজীবী। আধুনিক শিক্ষা স্রোত এই সমাজে প্রবেশ করিলে ইহারাও উন্নতি প্রয়াসী হইবে সন্দেহ নাই।

গন্ধবণিক—ব্যবসায় ভেদে বণিক জাতি যে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত তন্মধ্যে গন্ধবণিক জাতি অন্যতম। পাবনা জেলায় ইহাদের সংখ্যা প্রায় দ্বিসহস্রের অধিক ছিল, সম্প্রতি হ্রাস হইয়া ১৮৯৩ জন হইয়াছে। পাবনা, হাটুরিয়া, জগন্নাথপুর, নাকালিয়া, বেড়া, চান্দাইকোণা, ভুইএগ্রাগাঁতি, বাগবাটি, সিরাজগঞ্জ টাউনে অনেক গন্ধবণিক জাতির বাস। সাধারণ মসলাদি ও গন্ধদ্রব্য, মনহারি জিনিসাদি ক্রয় বিক্রয় ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গন্ধেশ্বরী পূজা করে। ব্যবসায়ী হিসাবে ইহারা এ জেলায় বিশেষ উপযুক্ত লোক, কিন্তু ইহাদের পরিচালিত বিস্তৃত কোন ব্যবসায় এই জেলায় বর্তমান নাই। চান্দাইকোণায় কৃষ্ণলাল দত্ত (চৌধুরি) মহাশয় এই সমাজে একজন প্রসিদ্ধ মহাজন ও জমিদার। তাহার পূর্বপুরুষ মাধবচন্দ্র দত্ত মহাশয় ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করত বাটিতে রাধামাধব নামক বিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তথায় অতিথিসৎকারাদি ও সাময়িক উৎসবাদির সুবন্দোবস্ত আছে। সকলেই দত্ত উপাধিক এবং বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। আকৃতিতে এই জাতীয় অধিকাংশ লোক কৃষ্ণবর্ণ।

গোপ—হিন্দুদিগের মধ্যে যাহারা গো-পালন, গোরক্ষা ও দুগ্ধাদি দ্রব্যের ব্যবসায় লিপ্ত, তাহারা সাধারণত গোপ বা গোয়াল নামে পরিচিত। এই জেলায় ইহাদের কেহ কেহ চাষ আবাদেও লিপ্ত। এই জেলায় এই জাতির সংখ্যা প্রায় ১২ হাজারের উপর ছিল। এক্ষণে হ্রাস হইয়া ৭৫২৮ জন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাবনা জেলায় সদ্‌গোপ নামে অন্য আর এক শ্রেণীর হিন্দু জাতি আছে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ২৫৬৯ জন।

সদরের রামচন্দ্রপুর, ব্রজনাথপুর, নলদহ, ভাটডাঙা, হিমাইতপুর, দিলপসার প্রভৃতি গ্রামে এবং সিরাজগঞ্জের অধীন পোতাজিয়া, দহকুলা, বাল্লপাড়া, পোরজনা, জামিরতা, বেতিল,

কান্দাপাড়া প্রভৃতি পল্লীতে অনেকানেক গোপ জাতির বাস। ইহাদের সকলেই দধি দুগ্ধাদি দ্রব্যের জিনিস তৈয়ার করিয়া এবং ঘৃতাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। স্থানে স্থানে মহাজনী তেজারতি কারবারও কাহার কাহার পরিলক্ষিত হয়। একদন্ত, চৌকিবাড়ি অঞ্চলে কয়েক ঘর ধণাঢ্য মহাজন শ্রেণীর গোপ জাতির বাস। তাহারা নানাবিধ ভূষামাল খরিদ বিক্রয়ের কারবার করিয়া থাকেন। পোতাজিয়ার জনৈক ঘোষ পরিবারে বহু গাভী থাকা প্রযুক্ত তাহারা হাজারী ঘোষ নামে পরিচিত হয়েন। এই জাতীয় অনেকে আজকাল লেখাপড়ায় অগ্রসর হইয়াছেন। অনেকে ওকালতি, ডাক্তারি, আদি ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। গোপজাতি সাধারণত নিরীহ, কর্মঠ, পরিশ্রমী ও বিনয়ী ; সকলেই স্বধর্মপরায়ণ। মোহনপুর, দিলপশার, বাল্লপাড়া, পোরজনাদি অঞ্চলে ঘোষেরা অতি উত্তম গব্য ঘৃত প্রস্তুত করে এবং তাহা নানা স্থানে রপ্তানি হয়। পাবনাই গব্য ঘৃতের বিশেষ সুনাম আছে। এতদ্ব্যতীত মোহনপুর ও দিলপশার রেলওয়ে স্টেশন হইতে অনেকে আজকাল অনেক দুধ ও ছানা কলিকাতায় চালান দিয়া থাকে। শাহজাদপুরাদি অঞ্চলের পাথারে ঘোষদিগের গবাদি চারণ জন্য বাথান বা আরাণ বার্ষিক স্থাপিত হয় ও তথায় বহু গাভি রক্ষিত হয়।

গোপালন ও কৃষিকার্য উভয় বৈশ্য বর্ণোচিত বৃত্তি বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু বল্লালচরিত, উত্তর খণ্ডে বর্ণিত আছে—

"গোপ নাপিত ভিল্লাশ্চ তথা মোদক কুবরৌ।
তাম্বুলী স্বর্ণকারৌ চ তথা বণিক জাতয়
কলাবেতানি সৎশূদ্রা পুরাণে পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৭০"

ইহাতে বোধহয় গোপজাতি বৈশ্য বর্ণান্তর্গত পরে সৎশূদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এবং সদগোপও তাহা হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে। গোপজাতি নবশাক শ্রেণীর অন্তর্গত। এই জেলায় ইহাদের বিধবাগণও মৎস্যভোজী।

তন্তুবায়—পাবনা জেলার তন্তুবায় বা চলিত ভাষায় তাঁতি জাতির সংখ্যা মোটামুটি প্রায় চারি হাজারের উপর। তন্তুবায় সমাজে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই শ্রেণী বিভাগ আছে। বারেন্দ্র শ্রেণীর সকলেই বস্ত্রবয়ন কার্যে এবং রাঢ়ী শ্রেণীর সকলেই কেবলমাত্র কাপড়, সুতা ক্রয় বিক্রয়াদি মহাজনী ও তেজারতি কারবারাদিতে লিপ্ত। বারেন্দ্র সমাজে রায় প্রামাণিক প্রভৃতি এবং রাঢ়ী সমাজে প্রামাণিক, সাহা প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত আছে। আজকাল উভয় সম্প্রদায়ই বসাক উপাধি ধারণ করিতেছে। গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রণীত "বঙ্গীয় জাতিমালা" পাঠে জানা যায়—পূর্বে যাহারা বাণিজ্য কার্যে লিপ্ত হইতেন তাহারা "বসুক" নামে পরিচিত হইতেন। "বসু" অর্থ ধন উপার্জনকারী। আরব্য পারস্য ভাষায় "বো সোক" শব্দ তুলা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইতালি ভাষায় তুলার এক নাম "শেঠ"। যাহা হউক বসাক শব্দ বাণিজ্যজীবী বৈশ্য জাতি জ্ঞাপক বোধে তন্তুবায়গণ আজকাল বেশি এই উপাধি গ্রহণ করিতেছেন। পাবনা জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলায় তন্তুবায়দিগের শেঠ উপাধি আছে। শেঠ ও বসাক বাণিজ্যজীবী জাতির উপাধি।

দোগাছি, পাবনা, রাধানগর, বনবারিয়া, কাওয়াখোলা, ঘুরকা, দেলুয়া, বড়ধুল প্রভৃতি গ্রামে বর্তমানে অধিক পরিমাণে তন্তুবায় জাতির বাস। পূর্বে হাণ্ডিয়ালে তন্তুবায় জাতির অনেকের বাস ছিল। প্রকাশ এখানকার জগন্নাথ বিগ্রহ তন্তুবায় জাতির প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে নদিয়া জেলার অন্তর্গত খোরসেদপুরের গোপীনাথ বিগ্রহের সেবাও তন্তুবায় জাতীয় পাবনা নিবাসী জনৈক কল্যাণ রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকাশ। এই বিগ্রহের বার্ষিক স্নানযাত্রার উৎসব প্রসিদ্ধ। এই তিথিতে পাবনা শালগাড়িয়া বনবাসী উপরোক্ত কল্যাণ রায় বংশীয় দুর্গানাথ রায়

মহাশয় প্রতি বৎসর স্নানযাত্রা দিনে বিগ্রহের পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করিতেন এবং এখনও তাহার একজিকিউটারগণ তাহা দিয়া আসিতেছে। এই বিগ্রহসেবা পরিচালনের জন্য স্থাবর সম্পত্তি আদি সমস্ত ঠাকুর জমিদারগণের হস্তগত হইলেও, পূর্ব প্রথা মত বার্ষিক এখন পর্যন্ত পাবনার তন্তুবায় জাতীয় জনৈক পরিবারের উপর ক্রিয়ার অঙ্গ বিশেষ পরিচালনের ভার অর্পিত থাকা পাবনার তন্তুবায় কর্তৃক এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জনশ্রুতি সর্বত্র সমর্থিত হইতেছে।

তন্তুবায় জাতি, অতি শান্ত, ধর্মভীরু এবং আমোদ উৎসবাদিতে বিশেষ উদ্যোগী। পাবনার অনেকের বাটিতে শারদীয় দুর্গোৎসবে বিশেষ সমারোহ হয়। ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে পাবনার অনেক তন্তুবায় রাজশাহী জেলার নাটোর, নওগাঁ ও রামপুর বোয়ালিয়ায় বাস করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে বিশেষ ধনাঢ্য। অধুনা তন্তুবায় সমাজে অনেকে আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন। ওকালতি, ডাক্তারি আদি ব্যবসায়ে অনেকে লিপ্ত হইয়াছেন। পাবনা কালাচাঁদপাড়া নিবাসী কৃষ্ণানন্দ প্রামাণিক মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র নবগৌরাঙ্গ বসাক মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ" নামক সর্বোচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া অধুনা ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত আছেন।

পূর্বে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র সমাজে পরস্পর বিবাহাদি প্রথা ছিল না, সম্প্রতি ২।১টি দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। তন্তুবায় সমাজে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ লোক সুশ্রী ও সুন্দর অবয়ব বিশিষ্ট। সকলেই সদাচার সম্পন্ন, বৈষ্ণব ও গোস্বামীদিগের শিষ্য। ইহাদের বিধবাগণ মধ্যেও অনেকে আমিষভোজী আছে। নাকালিয়া অঞ্চলে বস্ত্র বয়নকারী কতকগুলি তন্তুবায় জাতি অধুনা চৌধুরী আদি উপাধি গ্রহণ করতঃ তিলি বা কুণ্ডু জাতিদিগের সহিত মিলিত হইতেছেন। শাহজাদপুরে এক শ্রেণীর তন্তুবায় জাতি থাকে বলিয়া জানা যায়, তাহারা নবশাক মধ্যে গণ্য নহে কিংবা তাহাদের জল চল নহে বলিয়া প্রকাশ।

তিলি—পাবনা জেলায় তিলি জাতির সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা ৮৭৭৩ জন প্রদর্শিত হইয়াছে। পাবনা সদরে দোগাছি, চাটমোহর, পাকুরিয়া, দিঘা, সাহাপুর, সুজানগর, সাগরকান্দি প্রভৃতি গ্রামে এবং পোতাজিয়া, রাউতারা, তেলিজানা, ঘুরকা, চান্দাইকোণা প্রভৃতি পল্লীতে বহু তিলি জাতির বাস। সাধারণত নিরামিষা ও আমিষা দুই শ্রেণী ইহাদের মধ্যে বর্তমান থাকা জানা যায়। যাহাদের মধ্যে বিধবা স্ত্রীলোক মাছ খায় তাহারা আমিষা বলিয়া পরিচিত।

কুণ্ডু, সাহা, মণ্ডল, চৌধুরী প্রভৃতি উপাধি তিলি সমাজে প্রচলিত। চাটমোহরেই বর্তমানে এই জাতীয় লোকের অধিক বাস। ইহাদের সকলেই ব্যবসায় সিদ্ধহস্ত। তেজারতি কারবারে ইহারা প্রসিদ্ধ কুশীদজীবী। ইহাদের ন্যায় হিসাবী জাতি বাঙালির মধ্যে সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। সকলেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ও গোস্বামীদিগের শিষ্য, এবং দেবদ্বিজে ভক্তি পরায়ণ। চাটমোহরে নগর মধ্যে এক স্থানে পাশাপাশি ৩/৪টি দোলমঞ্চ এই জাতির ধর্ম প্রবণতার সাক্ষ্যদান করে। রাউতারা গ্রামে জগৎচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটিতে ও সুরথলাল চৌধুরী মহাশয়ের বাটিতে দৈনিক বিগ্রহ সেবাদি এবং দোগাছি গ্রামে শ্যামসুন্দর জিউ নামক সাধারণের বিগ্রহালয়টি এই জাতীয় লোকের ধর্মনিষ্ঠার বিশেষ পরিচায়ক।

রাউতারায় কুণ্ডু পরিবারস্থ স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়দিগের কারবার হইতে ঢাকা জেলার অধীনস্থ তেওতা নিবাসী বৈদ্য জাতীয় ভূম্যধিকারী পরিবারের উৎপত্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সাধারণত হিসাবী ও অর্থলোভী তিলি জাতির গৌরবের বিষয়। সাগরকান্দি গোবিন্দপুর নিবাসী অনুপচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় এই সমাজে জনৈক ধর্মাত্মা ও বদান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অতিথিসৎকারাদিতে তাহার বিশেষ সুনাম ছিল। ডেমরা নিবাসী মণ্ডল উপাধিক জনৈক কুণ্ডু পরিবারও এক সময়ে বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।

এই সমাজে অনেকেই আজকাল আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া ওকালতি ডাক্তারি আদি ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন। কুলীন বারেন্দ্র কায়স্থ্ সমাজের ন্যায় তিলি সমাজে সাধারণত সুশ্রী স্ত্রীলোক পুরুষের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। লম্বাকৃতি লোক সংখ্যা অপেক্ষা খর্বাকৃতি লোক এই সমাজে অধিক পরিলক্ষিত হয়। তিলিগণ সাধারণত তিলি বা তৈলী বলিয়া পরিচিত। জাতি স্থানে ইহারা অনেকে কেবলমাত্র "তৈ" শব্দ ব্যবহার করে। ইহারা নবশাক শ্রেণীর অন্তর্গত। যথা—

গোপমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুলাল কর্মকারশ্চ নাপিত নবশায়কা॥

কিন্তু ইহারা আদমসুমারিতে আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া দাবি করিয়াছেন। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"বৈশ্যাত্তু শূদ্রকন্যায়াং জাতৌ তাম্বুলীতৈলিকৌ। ৩৮" *বৃহদ্ধর্ম পুরাণ।*

আবার বল্লালচরিতে লিখিত আছে—

"গোপালিন্যাং বারজীবাত্তৈলিকসা চ সম্ভবঃ"। ১২৮

ধোবা—পাবনা জেলায় প্রায় ১২০০ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পাটনা মুঙ্গেরাদি জেলার বেহারী খোট্টা ধোবাও অনেক আছে। তাহা হইলে বাঙালি দেশি ধোবা জেলাবাসীর পক্ষে অতি সামান্য। এই জাতি দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। ইহারা হিন্দুর বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে এবং কাপড় পরিষ্কার জন্য অত্যাবশ্যকীয়, অথচ এই জাতীয় লোক সংখ্যা হ্রাস সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। সাধারণ গরিব হিন্দু মুসলমান সকলে নিজেরাই স্বহস্তে কাপড় পরিষ্কার করিয়া ব্যবহার করে, কিন্তু মধ্যবিত্ত ও অবস্থাপন্ন লোকেরা ধোবার সাহায্য ব্যতীত পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিষ্কারের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে। ৫/৭ গ্রাম লইয়া মাত্র স্থানে স্থানে ২/১ জন রজকের বাস। তাহারও আবার দেশিয়দিগের মধ্যে কার্যক্ষম পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক সংখ্যাই বেশি। ইহাদের মধ্যে বিবাহ করিতে না পারিয়া অনেকে একেবারে নির্বংশ হইয়া যাইতেছে। ধোবার নিকট কাপড় কাচিতে দিয়া আজকাল বিশেষত শহরে বড় বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয়। পূর্বাপেক্ষা অধুনা কাপড় পরিষ্কার জন্য শতকরা প্রায় ৫্ হইতে ৬্ পর্যন্ত দর উঠিয়াছে। পাবনায় ধোবাগণ সভা করিয়া দেশি কাপড় পরিষ্কার করিতে অধিক পারিশ্রমিক লইবে এরূপ সম্ভাবনাদি অনেকবার গৃহীত হইয়াছে।

নমঃশূদ্র—এই জেলায় নমঃশূদ্র জাতির সংখ্যা পূর্বে প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হাজারের অধিক ছিল। বর্তমানে অনেক কমিয়া ১৯২১ অব্দের লোকগণনায় ৪৪৬২০ জন প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক সংখ্যা ১৪৬ জন বেশি।

পাবনা সদরের সজনাই, হাটগ্রাম, মানানগাঁও, হাদল, মৈদ. ধানুয়াঘাটা, পাবনা, গোবিন্দা, সাতবাড়িয়া নিকটবর্তী ফকিৎপুর ও দাশুরিয়া অঞ্চলের কোন কোন গ্রামে এবং সিরাজগঞ্জের অধীন গোপালপুর, আগুরিয়া, নন্দলালপুর, কাশীনাথপুর প্রভৃতি পল্লীতে বহু সংখ্যক নমঃশূদ্র জাতির বাস। শাহজাদপুর থানার গ্রামবিশেষেই অনেক নমঃশূদ্রের বাস।

এই জেলায় নমঃশূদ্রগণ সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যথা (১) হালিয়া (যাহারা চাষ আবাদে লিপ্ত) (২) জালিয়া (যাহারা মৎস্য শিকারাদিতে লিপ্ত) এবং (৩) করাতি (যাহারা কাঠ ফাড়িবার বা করাতের কার্যে লিপ্ত। এতদ্ব্যতীত অনেকে দোকানদারি আদি ব্যবসায়েও লিপ্ত আছে। এই জেলায় নমঃশূদ্রগণ মধ্যে দাস, মণ্ডল, প্রামাণিক, সরদার প্রভৃতি উপাধি ব্যতীত যাহারা মৎস্য শিকারে লিপ্ত তাহাদের আতাইকুলা অঞ্চলে কাঁড়াল উপাধি দৃষ্ট হয়। সাধারণত হালিয়া ও করাতিগণ জালিয়া বা কাঁড়ালগণ অপেক্ষা সামাজিক হিসাবে কুলীন

বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাদের মধ্যে মহাভারতোক্ত যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন প্রভৃতি নাম অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। ইহাদের গার্হস্থ্য জীবনে স্থানে স্থানে অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দৃষ্ট হয়। অনেকের বাটি ঘর অতি পরিষ্কার।

ইহারা সাধারণত পরিশ্রমী, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় এবং সাহসী। অনেকে চাকরি আদিতে লিপ্ত হইলেও চাষআবাদ ইহাদের সর্বপ্রধান উপজীবিকা। সুশ্রী না হইলেও সুপুরুষ ও স্ত্রী ইহাদের মধ্যে অনেক আছে। আজকাল ইহারা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের প্রস্তুত অন্নাদি খাইতে সম্মত হয় না। ইহাদের মধ্যে সামাজিক পঞ্চায়েতে শাসন প্রথা বিশেষ কঠোর। বিধবা বিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই এবং বিধবার রীতিমত কঠোর ব্রহ্মচর্যও এই সমাজে বর্তমান নাই। পূর্বে হিন্দু সমাজের কঠোর শাসন ছিল ; নমঃশূদ্র সমাজের পুষ্করিনী উৎসর্গ সময়ে মন্ত্রোচ্চারণে সহায়তা করা হেতু জনৈক মৈত্র উপাসিক ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজে পতিত হইয়াছিলেন। এখন তদীয় বংশধর সেলুন্দহাটের নিকট বাস করিতেছেন। নমঃশূদ্র জাতির ব্রাহ্মণ মধ্যে সলপে রামরতন বর্ণক নামে জনৈক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নমঃশূদ্র জাতীয় সরদার উপাধিক ষাইটগাছা নিবাসী জনৈক পরিবারে বহুদিন হইতে কালী পূজান্তে "বার আসা" বা ভাবাবেশে ভূত ভবিষ্যতাদি জ্ঞাপন করিবার প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। তজ্জন্য প্রতি শনি মঙ্গলবারে যাইটগাছায় নানা স্থানের বহু হিন্দু মুসলমান সমবেত হয়।

নমঃশূদ্র ও চাঁড়াল বা চণ্ডালগণ এক পর্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে। চাঁড়াল বলিলে অসন্তুষ্ট হয়। অনেকে বলেন, রাজশাহী ও মালদহাদি জেলার কিয়দংশ চান্দলাই বা চন্দেল বলিয়া পরিচিত। তাহা হইতে কথিত জেলার চান্দলাই নামক পরগণার নামকরণ হইয়াছে। তথ্যকার অধিবাসীগণ চন্দেল বা চান্দাল নামে অভিহিত হইত ; তাহারা কালক্রমে পূর্ববঙ্গে গিয়া চাঁড়াল বা নমঃশূদ্র আখ্যায় খ্যাত হইয়া বাস করিতেছে। ইহা অনুমান মাত্র।

উভয় জাতির একত্ব বা পৃথকত্ব সম্বন্ধে সমাজতত্ত্ববিৎগণ বিবেচনা করিবেন। ইহাদের পৃথকত্ব সম্বন্ধে এই মাত্র জানা যায় শূদ্র পিতার ঔরসে ব্রাহ্মণ মাতার গর্ভেজাত বর্ণশঙ্কর জাতি পূর্বে চণ্ডাল বলিয়া পরিচিত হইত।

যথা — "শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণী গর্ভচ্চণ্ডালস্য চ সম্ভবঃ।" —*বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।*

"ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেন পতিতঃ জার দোষতঃ।
সদ্য বভূব চণ্ডাল্ সর্ব্বস্যায়মহাশুচি।
উদ্ধতো নির্দ্দয়শ্চৈব জল্লাদো ঘাতকর্ম্মকৃৎ॥" ---*পরশুরাম সংহিতা।*

ইহাতে বোধ হয় শূদ্র পিতার ঔরসেই ব্রাহ্মণ মাতার গর্ভজাত ব্যক্তি চণ্ডাল নামে খ্যাত হইত এবং ইহারা সাধারণত উদ্ধত স্বভাব এবং রাজাজ্ঞায় দণ্ডনীয় ব্যক্তির বধকরণ ইহাদের কার্য ছিল। কিন্তু নমঃশূদ্রগণের অনেকেই আজকাল নিম্নশ্রেণীস্থ বলিয়া বিবেচিত হইলেও সকলেই কাশ্যপ গোত্র বলিয়া জানা যায়। ইহাতে অনুমান হয় ইহারা মুনি সন্তান বা ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে জাত। গোত্র সাধারণত পিতৃপুরুষানুযায়ী হওয়াই সম্ভবপর।

হিন্দু সমাজে নমঃশূদ্র জাতি অতি হীন চক্ষে পরিলক্ষিত হয় জন্য অধুনা তাহারা হিন্দুসমাজে নানারূপ সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জের মিশনারী সাহেবগণের সহায়তায় তাহাদের মধ্যে ২/৪ জন শিক্ষিত ব্যক্তির পাবনা বগুড়ার সেটেলমেন্ট অফিসে চাকুরি হইয়াছে এবং নমঃশূদ্র সমাজের শিক্ষাবিস্তার জন্য খ্রিস্টান প্রচারকগণ কথঞ্চিৎ সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া পাবনার হিন্দু সমাজে কথঞ্চিৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। মিশনারি প্রচারকগণ নমঃশূদ্র প্রধান গ্রামসমূহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ বিষয়ে অনেক চেষ্টাও করিতেছেন।

নিদ্রিত হিন্দু সমাজ রক্ষণশীলতায় আড়ষ্ট ; স্বীয় উন্নতি জন্য সহসা সচেষ্ট হইবেন না, অথচ দেশিয় অথবা বিদেশবাসী দ্বারা অন্যের উপকার হয় তাহাও সহসা সহ্য করিতে পারিবে না। ইহা এদেশের সনাতন প্রথা। কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলিবেন "চাণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ।" এক্ষেত্রে রাজশাহী জেলার জোয়ারি নিবাসী হাইকোর্টের উকিল শৈলেশনাথ বিশি, বি এল মহাশয় সম্প্রতি তাঁহার পাবনা জেলাস্থ ধানুয়া ঘাটা কাছারির অধীনস্থ হাদলাদি গ্রামের নমঃশূদ্রগণের সহিত হরিসংকীর্তনান্তে জলযোগ গ্রহণে প্রয়াসী ও প্রস্তুত হইয়া যে সৎসাহস ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অস্মদেশীয় হিন্দু সমাজের নিকট সর্বথা প্রশংসনীয় না হইলেও, অনুকরণীয় তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

নমঃশূদ্র পরিবারে বিবাহ করিতে অনেক টাকা পণ লাগে, তজ্জন্য অধিক বয়স পর্যন্ত অনেকে বিবাহ করিতে পারে না এবং পণ লোভে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় অনেক সময় অধিক বয়সের পুরুষ সহ অল্প বয়স্কা কুমারীর বিবাহ হওয়ায় তাহার বিষময় ফলে অনেক নমঃশূদ্র পরিবার বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই সমাজে শিক্ষা অধিকতর বিস্তৃত হয় নাই। হিন্দু জাতি মধ্যে এই জেলায় ইহাদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক ; হিন্দুদিগের মধ্যে ইহারাই অধিকতর কৃষিজীবী ; কৃষি প্রধান দেশের এই জাতিকে রক্ষা ও তাহাদের উন্নতিকল্পে হিন্দু সমাজের সকলেরই সমবেত চেষ্টা করা কর্তব্য।

নাপিত—পাবনা জেলায় নাপিত জাতির সংখ্যা ১০২১ জন ধরা হইয়াছে। ক্ষৌর কার্যই ইহাদের সর্বপ্রধান ব্যবসায়। ইহারা সাধারণতঃ নরসুন্দর বা সভাসুন্দর বলিয়া পরিচিত। প্রতি গ্রাম বা ২/৪ গ্রাম লইয়া ২/১ ঘর নাপিতের বাস আছে। এই সমাজে দাস, প্রামাণিক সরকারাদি উপাধি বর্তমান আছে। পাবনা টাউনে সর্বাপেক্ষা অধিক নরসুন্দর জাতির বাস। সিরাজগঞ্জে ভিন্ন জেলাবাসী দেশিয় অনেক নাপিত আছে। দেশিয় ব্যতীত বেহারাদি পশ্চিম দেশিয় নাপিতও এই জেলায় পাবনা সিরাজগঞ্জ ও স্থল বিশেষে পল্লী প্রান্তেও ক্ষৌরকার্য করিয়া জীবিকার্জন করে।

পাবনা জেলার নরসুন্দর সমাজের অনেক সভাসমিতি স্থাপন করিয়া তাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই সমাজে রতনগঞ্জ গ্রামে শীল উপাধিক কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ জন্মিয়াছিলেন এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবিরাজ বলিয়া তাহাদের সুনাম ছিল। শাহজাদপুরে ডাক্তারিতে জনৈক শীল মহাশয় সুনামার্জন করিয়াছেন। ভাঙাবাড়ি অঞ্চলে আদাচাকী গ্রামের জনৈক নরসুন্দর চৈতন্য চরিতামৃতাদি বৈষ্ণব গ্রন্থ ব্যাখ্যায় পারদর্শী ও সাত্ত্বিক প্রকৃতি থাকা হেতু তিনি পণ্ডিত ভক্ত নামে অভিহিত হইতেন।

নরসুন্দর জাতি নবশাক শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং জাতৌ নাপিতমোদকৌ। ৩৬
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

"শূদ্রকন্যাসমুৎপয়ো ব্রাহ্মণেন সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দোসো হ্যসংস্কারোস্তু নাপিতঃ। ১১ অঃ
পরাশর সংহিতা।

পাটনি—পাবনা জেলার পাটনি জাতির সংখ্যা ১৯২১ অব্দে ৩০০৯ জন ধরা হইয়াছে। ডেমরা, নাগডেমরা, বেড়া প্রভৃতি গ্রামে ও শাহজাদপুর অঞ্চলে বহু পাটনি জাতির বাস। এই জেলার পাটনিগণ ব্যবসায় ভেদে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যথা — (১) ঘাট মাঝি (যাহারা খেওয়া ঘাটে অথবা নৌকাদি চালনে মাল্লার কার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।) (২) ব্যবসায়ী বা শিল্পজীবী (যাহারা বাঁশের কুলা ডালা, ডালি প্রভৃতি

তৈয়ার করিয়া তাহা বিক্রয় দ্বারা জীবিকার্জন করে।) (৩) নিম্নশ্রেণী (যাহারা সাধারণত শূকর পালন, চারণ ও তাহা বিক্রয় দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করে। বেড়া শম্ভুপুরা ও শাহজাদপুরের কতকাংশে এই শ্রেণীর পাটনি সংখ্যা অত্যধিক।

পাটনি আধুনিক নাম, সম্ভবত পারণী শব্দ হইতে ইহা উৎপন্ন। ইহারা এতদিন পাটনি বলিয়াই পরিচিত হইত। এক্ষণে কেহ কেহ তরণী দাস নামে খ্যাত হইতে চাহে এবং বেড়া অঞ্চলের ঘাট মাঝি শ্রেণীর পাটনিগণের উদ্যোগে ও জেলার কতিপয় ব্রাহ্মণাদির প্রচেষ্টায় পাটনিগণ আপনাদিগকে মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ইহারা মাহিষ্য সমাজসঞ্জীবনী সমিতি নামধেয় সভা আদি সংস্থাপনপূর্বক নানা স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মতামত সম্বলিত পুস্তিকাদিও প্রকাশ করিয়াছে। পাটনি নামক কোন জাতিবিশেষের উল্লেখ পুরাণাদিতে সহসা পরিলক্ষিত হয় না। তবে ইহারা নৌজীবী ও খেওয়া ঘাটে লোক পারাপার ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

মালি—মালাকর বা মালি জাতির সংখ্যা এই জেলায় ১৪৫৬ জন। কাগজ ও সোলার দ্রব্যাদি প্রস্তুত এবং খাতা বহি ও আতসবাজি তৈয়ার আদি মালাকার জাতির সাধারণ উপজীবিকা। বিবাহাদি উৎসব সময়ে নানারূপ সাজ, সরঞ্জাম জন্য সোলা ও কাগজ দ্বারা ছবি ও পুতুলাদি তৈয়ারিতেও ইহারা পারদর্শী। পাবনা, দোগাছি ও সিরাজগঞ্জের অধীন ধানঘরাদি অঞ্চলে অনেক এবং জেলার নানা স্থানে অল্পবিস্তর ২/১ ঘর মালাকার জাতি দেখা যায়। আতসবাজি মধ্যে ইহারা নানারূপ বোমাদি বিস্ফোরক দ্রব্যাদি তৈয়ারও করিতে পারে। আজকাল এই জাতীয় সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। অনেক মুসলমান ইহাদের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে।

মালাকার জাতি নবশাক জাতির অন্তর্গত, কিন্তু বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সুতো মালাকরস্তথামুবেঃ।" ৩৭

মালাকারগণ সাধারণত মালি নামে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত ভুইমালি নামে আর এক জাতি এই জেলায় বাস করে, তাহাদের সংখ্যা ৫২৮৯ জন। এই জাতীয় লোক সংখ্যা কিঞ্চিৎ বর্ধিত হইয়াছে। ইহারা সমাজে পতিত, মালাকরদিগের ন্যায় ইহাদের জল সমাজে আচরণীয় নহে। এই জাতীয় লোক ৫/৭ গ্রাম লইয়া গড়ে ২/৪ জন দেখিতে পাওয়া যায়। বাগবাটি অঞ্চলে অনেক আছে ; তথায় ইহারা কেহ কেহ কর্মকারের কাজ করে।

ইহারা সাধারণ গৃহস্থের বাটিতে দৈনিক সংমার্জনার কার্য ও হিন্দু ক্ষেতি গৃহস্থের ফসলাদি বর্গাদারগণের বাটি হইতে আদায় করিয়া থাকে। পারিশ্রমিক বাবদ প্রতি ৮০ কাঠায় ৫ (পাঁচ) কাঠা হিসাবে ফসলের ভাগ পাইয়া থাকে। বিবাহাদি সময়ে বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। অনেক ধনী গৃহস্থ ও জমিদার গৃহ হইতে ইহাদের জীকিকার্থ স্থানে স্থানে চাকরান জমিও নির্দিষ্ট আছে।

মালো—হিন্দুগণ মধ্যে এই জাতি সংখ্যা হিসাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহাদের সংখ্যা এই জেলায় ক্রমশ হ্রাস হইয়া অধুনা ৩০৮৮৪ জন হইয়াছে। পদ্মা যমুনাদি নদীর নিকটবর্তী গ্রামসমূহে ইহাদের অত্যাধিক বাস। ইহারা সকলেই মৎস্যজীবী। সদরের হিমাইতপুর, সুজানগর, সাতবাড়িয়া, গোপালনগর, ধানুয়াঘাটা, হাটুরিয়া, মোহনগঞ্জ, হরিপুর, ধুলাউরি, বোথর প্রভৃতি গ্রামসমূহে এবং সিরাজগঞ্জের অধীন পোরজনা, নন্দলালপুর, হরিনাথপুর, বাচরা, রায়দৌলতপুর, পঞ্চক্রোশী, চান্দাইকোণা আদি পল্লীতে অনেক মালো জাতির বাস। ইহারা সাধারণত মল্ল জাতির অংশবিশেষ বলিয়া পরিচিত। চলিত ভাষায় মালো বলিয়া ইহারা জাতি স্থানে অনেকে লিখিয়া থাকে তাহা সঠিক নহে। রাজপুতনাদি অঞ্চলে

ঝালওয়ার নামক স্থানে অনেক ক্ষত্রিয় জাতির বাস। ইহারা সম্প্রতি নানারূপ সামাজিক আলোচনা দ্বারা আপনাদিগকে উক্ত পশ্চিমাঞ্চলবাসী ক্ষত্রিয়দিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়াসী হইয়া আপনাদিগকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কর্ণ, বিকর্ণ, অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেবাদি মহাভারতোক্ত নাম নমঃশূদ্র জাতির ন্যায় অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সম্প্রতি কয়েক বৎসর পূর্বে হিমাইতপুর গ্রামে নানা স্থানের লোক লইয়া ইহাদের কাশিমবাজারের মহারাজার সভাপতিত্বে এক বিরাট সামাজিক সভা হইয়াছিল। তাহাতে ইহাদের সমাজ হিতকর ও উন্নতিবিধায়ক অনেক বিষয় আলোচিত হয়। পূর্বে এই জাতির অনেক স্ত্রী হাটে বাজারে মাছ বিক্রয় করিত, নানারূপ আন্দোলনের ফলে তাহারা এক্ষণে আর হাটে বাজারে বাহির হয় না। ইহারা পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, সরল প্রকৃতি এবং অতি নিরীহ। ইহাদের বাসগৃহ অনেকের সামান্য হইলেও অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সমস্ত স্থান অপেক্ষা সাতবাড়িয়া গ্রামেই অত্যধিক মালো বা হালদার জাতির বাস। অনেকের অবস্থাও স্বচ্ছল। লেখাপড়া হিসাবে ইহাদের মধ্যে অনেকে আজকাল উন্নত। সাতবাড়িয়া নিবাসী উমেশচন্দ্র হালদার মহাশয় গণিতে এম. এ. পাশ করিয়া গভর্নমেন্টের শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত আছেন। ইহাদের মধ্যে সামাজিক পঞ্চায়েতে শাসন প্রথা বর্তমান আছে। সকলেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ও মালাধারী। কৃষকগণ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চাষ করিলে জমিতে তাহাদের একটি স্থায়ী স্বত্ব জন্মে, কিন্তু ইহারা আজীবন নৌকায় বাস করিয়া মৎস্য শিকার করতঃ জীবিকার্জন করে, কিন্তু জলে ইহাদের কোন স্থায়ী স্বত্ব জমিদারগণ প্রদান করেন না। ইহারা বার্ষিক কিংবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নদী বা জলাশয় বিশেষ বন্দোবস্ত লইয়া মৎস্য শিকার করে। এই জাতীয় লোক সর্বদা উন্মুক্ত স্থানে বাস হেতু সাধারণত স্বাস্থ্যবান, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, সুন্দর ও গৌরবর্ণ লোক সংখ্যা অতি বিরল।

ফরিদপুর পুলিশ স্টেশনের অধীনস্থ চিথলিয়া নিবাসী ঠাকুর শম্ভুচাঁদ এই মালো ধীবর জাতির মধ্যে বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। তৎকর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মের শাখা গুরু সত্য ধর্মমত প্রচার, তাহার দেহান্তর হইয়াছে, তথাপি তদীয় নাম মাহাত্ম্যে অদ্যাপি প্রতিদিন ও দোল পূর্ণিমা দিনে নানারূপ ব্যাধি নিরাকরণার্থ চিথলিয়ায় বহু লোকের সমাগম হয়।

মুচি চামার—এই জেলায় মুচি সংখ্যা ৫৫০৮ এবং চামার সংখ্যা ৩৩৯১ জন। মুচিগণ সাধারণত মৃত গো মহিষাদির চামড়া সংগ্রহ করতঃ বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জন করে। কেহ কেহ বেত্র নির্মিত দ্রব্যাদি নির্মাণ ও বেতের ব্যবসায়াদি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তজ্জন্য ইহারা বেতুয়া মুচি বা বেতুয়া নামে অভিহিত হয়। যাহারা বেতের ব্যবসায়ে লিপ্ত তাহাদের অবস্থা আজকাল উন্নত। পাবনার সান্নিধ্যে পুরাণকুঠিবাড়িতে (বাজিতপুরে) অনেক অবস্থাপন্ন বেতুয়া জাতির বাস আছে। সাধারণত এই শ্রেণীর অবস্থা অতি দরিদ্র, কিন্তু ইহারা ব্যবসায়ে উন্নতি করতঃ ইষ্টক নির্মিত ইমারতাদি নির্মাণে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে আজকাল শিক্ষিতও হইতেছে।

মুচিদিগের মধ্যে এক শ্রেণী ঋষি নামে পরিচিত। ইহারা বাঁশ ও বেত্র নির্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুতি করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। সময় সময় চামড়াদিও সংগ্রহ করে। পাবনা দোগাছি অঞ্চলে ও জেলার নানা স্থানে এরূপ অনেক মুচির বাস দেখা যায়। ইহাদের দশ রাত্র্যাশৌচ প্রথা বিদ্যমান আছে। তজ্জন্য এদেশে প্রচলিত প্রবাদ আছে—চাঁড়াল বামন মুচি, দশ রাত্রিতে শুচি।

এই জেলায় চামার সংখ্যা ৩৩৯১ জন প্রদর্শিত হয় বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিহার প্রদেশের পাটনা, মুঙ্গের, আরা, বালিয়া প্রভৃতি জেলার অনেক পশ্চিমা চামারও এই জেলায় আজন্ম বাস করতঃ চর্মপাদুকা ও বিনামাদি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। দেশিয় চামারদিগের পুরুষেরা এই জেলায় স্থানে স্থানে উত্তম ও দীর্ঘদিন স্থায়ী জুতা তৈয়ারি ব্যতীত

মথুরাদি অঞ্চলের অনেকে সুন্দর মৃদঙ্গ বা খোল তৈয়ারিতে সিদ্ধহস্ত। অনেক স্থলের চামারগণ ডুগি তবলাদি নির্মাণ করিতে পারে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণকে সাধারণত হিন্দু মুসলমান বাড়িতে সুতিকা গৃহে ধাত্রীর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়।

মুণ্ডাদিং—রায়গঞ্জ থানার অধীন অনেক গ্রামে মুণ্ডা (৮৬০), ওয়াওন (৩৯২), সাঁওতাল (৬৬৯), কুর্মি (৪১৪০), ভূমিজ (৬৬৪) প্রভৃতি কতকগুলি জাতির বাস। ইহাদের অধিকাংশই সাঁওতাল পরগণা নিবাসী, এ দেশে অল্পদিন হইল অনীত। ইহাদের মধ্যে কুর্মি জাতি সাধারণত মাহাতো নামে পরিচিত। ইহাদের অধিকাংশই অধুনা চাষাবাদের কার্যে লিপ্ত। এতদ্ব্যতীত উক্ত অঞ্চলে ইহাদের মধ্যে তাঁতি, গোয়ালা, বুনা, তুরি প্রভৃতি নামেও কতক সম্প্রদায় বর্তমান আছে। এই সকল জাতি মধ্যে কুর্মি মাহাতোগণ কথঞ্চিৎ সদাচারী এবং তাহাদের জল হিন্দু সমাজে চল। প্রকাশ তাড়াসের বনওয়ারীলাল রায় মহাশয়ের আমলে নিমগাছি নামক অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে পরিষ্কার কল্পে তিনিই সাঁওতাল ও বুনা জাতীয় অনেককে এ প্রদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সাধারণত ওরাওণ ও ভূমিহার নামক জাতি ব্যতীত সকলেই শান্ত ও সরল প্রকৃতি। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র কুর্মি মাহাতোদিগের মধ্যে শবদাহ সময়ে ধোপা, নাপিত প্রভৃতি সহ শ্মশানে যাওয়ার ও দ্বাদশ রাত্র্যাশৌচ প্রথা বর্তমান আছে। পশ্চিমা পাঁড়ে ব্রাহ্মণ ইহাদের পুরোহিত। মৃতের বাড়িতে প্রথম দিন ধোপা, নাপিত ও ব্রাহ্মণ একত্র হইয়া বাস করিবার রীতি আছে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে এই সকল জাতিগণ মধ্যে ডালপুজা ও পচাই নামে মদ্য পানে স্ত্রী পুরুষে মিলিত হইয়া আমোদ প্রমোদ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে কোন কোন স্থলে জিমূতবাহন পূজা বা জিতাষ্টমী পূজা প্রথা বর্তমান আছে। আজকাল পাটের চাষ আবাদের কল্যাণে ইহাদের অনেকের অবস্থা উন্নত। লেখাপড়া শিক্ষায় ইহাদের মধ্যে অনেকে অগ্রসর হইয়াছে। নিমগাছিতে ইহাদের একটি পাঠশালা আছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি মধ্যে নিকা প্রথা বর্তমান আছে। অনেকের বিশেষত মাহাতোদিগের মধ্যে কান ফোড়ানোর রীতি আছে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে পরিশ্রমী।

বারুই—পাবনা সদরের কাঁকরকাটা, ফকিরপুর, লক্ষ্মীপুর, একদন্ত, সিন্দুরী, রূপপুর প্রভৃতি পল্লী এবং সিরাজগঞ্জের অধীন ধলডোব, চালা, দেলুয়া, মকিমপুর, সোহাগপুর, রাজাপুর, ভানুডাঙা, বারুইভোগ প্রভৃতি গ্রামে অনেক বারুজীবী জাতির বাস। ইহারা আপনাদিগকে বৈশ্য বারুজীবী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পাবনা জেলায় ইহাদের সংখ্যা ২৭০২ জন। ইহারা নবশাক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহধর্মপুরাণে লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণাচ্ছূদ্র কন্যায়াং বারুজীবী বভূব।" ৩৭
"ব্রাহ্মণস্যতু তাম্বুলাং পুত্রোৎসৌ বারুইস্মৃতঃ।
তাম্বুল ব্যবসায়ী চ কলৌ সচ্ছূদ্রবৎ স্মৃতঃ। ১৫২

বল্লালচরিত উত্তরখণ্ড

ব্রাহ্মণ—পাবনা জেলায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা ২২৫২৫ জন। ইঁহার মধ্যে পুরুষসংখ্যা স্ত্রীলোক অপেক্ষা ১২০৭ জন বেশি। অন্যান্য জাতির ন্যায় ব্রাহ্মণ হ্রাস না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই জেলার ব্রাহ্মণ সমাজে বারেন্দ্র সংখ্যাই অত্যধিক। ইহাদের অধিকাংশই আদিশূর কর্তৃক কনৌজ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচিত দিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে বাগছী, ভাদুড়ী, লাহিড়ী, মৈত্র ও সান্যাল পরিবার সমধিক প্রসিদ্ধ ও কুলীন। এতদ্ব্যতীত বারেন্দ্র সমাজে ভট্টাচার্য, মজুমদার, বিশ্বাস, রায় জোয়াদ্দার, চক্রবর্তী, অধিকারী ও চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিও বর্তমান আছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই কুলীন শ্রোত্রীয় ও কাপ উভয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে কালিয়াই বংশীয়গণ অতি প্রাচীন বংশ। ইহারা মহারাজ বল্লাল সেনের পুরোহিত বংশ বলিয়া পরিচিত। তাহার হুড্ডিকাসংশ্রব ঘটিলে ইহাদের পূর্বপুরুষ কালিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পাবনা জেলায় আত্রাই নদী তীরস্থ ছাতক গ্রামবাসী হয়েন। তদীয় পুত্র অনন্তরাম ব্রাহ্মণ ওঝা দক্ষিণস্বরূপ মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময়ে এই জেলায় সিন্দুরী ও শাখিনী নামক দুই ভুক্তি দক্ষিণাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদীয় বংশধরগণ মধ্যে ছাতক নিবাসী রাজ্য দেবীদাস পাঠান আমলে সিন্দুরী আদি আট পরগণার রাজা বলিয়া পরিচিত হইতেন। তদীয় অষ্টাদশ পুত্রের অত্যাচার বশত ছাতক মুসলমান সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং যুদ্ধে অনেকে নিহত হয়, কেবলমাত্র তিন পুত্র জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্য কর্তৃক রক্ষিত হয় ও দুই পুত্র মুসলমান ধর্ম গ্রহণে জীবিত থাকেন। বৃহস্পতিবারে যুদ্ধযাত্রা করিয়া রাজা দেবীদাসের পুত্রগণের কেহ নিহত ও কেহ পরাজয় লাভ করেন। তদ্ধেতু অদ্যাবধি কালিয়াই বংশীয়দিগের মধ্যে বৃহস্পতিবারে কোন শুভ কার্যের অনুষ্ঠান হয় না। এই বংশীয় বসন্ত রায়, রাজীব রায় ও মথুর রায় প্রভৃতি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। রাজীব রায় মহাশয় রাঢ়দেশ হইতে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ আনিয়া শিবপুরের মৈত্র বংশ প্রতিষ্ঠা ও মুসলমান সংসর্গে বাসকারী গঙ্গারাম মৈত্র কর্তৃক "ভূষণাপঠির" কুলীন ব্রাহ্মণকে হিন্দু সমাজে আশ্রয় প্রদান করিয়া এ দেশিয় হিন্দু সমাজে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। এই বংশীয় মথুরানাথ রায় মহাশয় পাবনা জেলার সুপ্রসিদ্ধ "মথুরার ঠাকুর" বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই ঠাকুর বংশে হরিহর তর্কালঙ্কার নামক জনৈক তাপস বা রামাইতের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বাংলায় নবাব আমলে বর্গীর হাঙ্গামা কালে অনেক মারহাট্টি সন্ন্যাসী তাহাদের সহ এ'দেশে আগমন করেন। পাবনা জেলার সন্ন্যাসী বাধা প্রভৃতি স্থানে ও যমুনার অপর পারে মৈমনসিংহের সন্ন্যাসীগঞ্জ নামক স্থানে অনেক সন্ন্যাসী স্থায়ী হইয়াছিলেন। উপরোক্ত ঠাকুর পরিবার উক্ত সন্ন্যাসীদিগের বংশধর কি না তাহা বিবেচনাধীন। এই বংশে অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা সকলেই শিষ্য ব্যবসায়ী, কাহারও ব্রাহ্মণ ভিন্ন শিষ্য ছিল না ও নাই। অধুনা ইহারা সরকারি চাকুরি ও কাষ্ঠাদি পণ্য দ্রব্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন। করঞ্জা গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ সমাজ অতি প্রসিদ্ধ। সুপ্রাচীন পাল রাজত্বকালে এখানকার মৈত্র বংশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সালিখা গুনাইগাছা, সিদ্ধিনগর, স্থল, সমাজ প্রভৃতি পল্লীর ব্রাহ্মণ সমাজেও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের আবির্ভাব ছিল। ইহারা অনেকে সাঁতৈল রাজ কর্তৃক প্রতিপালিত হইতেন। মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মণ সমাজে এখানকার ব্রাহ্মণমণ্ডলী পাণ্ডিত্য ও বিদ্যানুশীলন জন্য পূর্বাপর বিশেষ সুনাম ছিল। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলন সময়ে জালেশ্বর নিবাসী কৃষ্ণজয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। শিয়ালকোল, কাওয়াখোলা, গাঁড়াদহ প্রভৃতি পল্লীতে অকে চতুস্পাঠীধারী পণ্ডিতের বাস ছিল। ইহারা শাস্ত্রানুশীলন জন্য সবিশেষ খ্যাত ছিলেন। হাণ্ডিয়াল বল্লভপুর এবং হাপানিয়া সোনাতলা প্রভৃতি পল্লীতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারকালে অনেক গোস্বামী পরিবারের বাস ঘটিয়াছিল। বাগবাটি আদি অঞ্চলে একসময়ে বহু পণ্ডিতের বাস ছিল। তন্মধ্যে স্বর্গীয় যদুনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত রাঢ়ীসমাজস্থিত ব্রাহ্মণ মধ্যে স্থল সমাজস্থ স্থল, গোয়ালবাড়ি, নওহাটা প্রভৃতি পল্লীস্থিত ব্রাহ্মণগণ, কোদালা নিবাসী গোস্বামী পরিবার এবং গোলইথালি নিবাসী কয়েক ঘর পণ্ডিত বংশ সমধিক প্রসিদ্ধ ও এই জেলায় বিশেষ পরিচিত।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণই এ দেশে ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত হয়। ইহারা অন্যান্য জাতিগণ অপেক্ষা অত্যধিক শিক্ষিত, মার্জিতরুচি সম্পন্ন এবং স্বভাবত সদাচারী। ইহাদের

আদর্শে ও দৃষ্টান্তে সকল কার্যেই অন্যান্য জাতিগণ পরিচালিত হয়। ব্রাহ্মণজাতির প্রধান উপজীবিকা অধ্যয়ন ও অধ্যপনা। পূর্বে এই জেলায় ভদ্রপল্লী মাত্রেই বহু টোল ও অধ্যাপকের বাস ছিল। কোনও কোনও গ্রাম প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নামানুসারে কথিত ও পরিচিত হইত যথা —সিদ্ধান্তবাগমারা, গ্রামবিশেষের কোনও কোনও বাড়িতে বহুল পরিমাণে পণ্ডিত ও অধ্যাপকের বাস ছিল, তজ্জন্য তাহাদের বাড়ি অদ্যাপি "সিদ্ধান্তবাড়ি" ন্যায়বাগীশবাড়ি প্রভৃতি নামে খ্যাত হইয়া থাকে ; সালিখায় এ দৃষ্টান্ত আজিও বর্তমান আছে। এক্ষণে টোলের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি এই জেলায় হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ, বি এ, পরীক্ষাত্তীর্ণ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা হিসাবে এই জেলার ভারেঙ্গা, হরিপুর, হাটুরিয়া, তাঁতিবন্দ ও খেতুপাড়া প্রভৃতি পল্লীসমূহে অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস। এই সমস্ত পল্লীর ব্রাহ্মণাদি মধ্যে অনেকেই ওকালতি মোক্তারি ডাক্তারি আদি ব্যবসায়ে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং জেলা মধ্যে ও জেলার বাহিরে অনেকে সুনাম অর্জনে সমর্থ হইয়াছেন। এই জেলার ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় মধ্যে তাঁতিবন্দ, পোরজনা, শিতলাই, সলপ, স্থল প্রভৃতি গ্রামের জমিদারগণ সকলেই ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত ; এতদ্ব্যতীত অনেকানেক গ্রামের প্রধান প্রধান তালুকদার জোতদারগণ মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ সমাজান্তর্গত এবং ব্রাহ্মণগণ এইরূপে জেলার অধিকাংশ ভূসম্পত্তির মালিক। ব্রাহ্মণ সমাজে শিক্ষিত সংখ্যা অধিক বিধায় অফিস আদালতে এবং ওকালতি মোক্তারি ডাক্তার কবিরাজ প্রভৃতি ব্যবসায় ক্ষেত্রে সর্বত্র ব্রাহ্মণ সংখ্যা অধিক। পাবনা ও সিরাজগঞ্জে অনেকানেক কুলীন ব্রাহ্মণাদি সর্বপ্রকার ব্যবসায় ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। পাবনা অপেক্ষা সিরাজগঞ্জে চক্রবর্তী, চাটুয্যে, ভট্টাচার্য উপাধিক ব্রাহ্মণ দোকানদারের সংখ্যা অধিক পরিলক্ষিত হয়। আজকাল জমিজমা লইয়া অনেক ব্রাহ্মণগণ নিজ হস্তে চাষ আবাদে লিপ্ত হইয়াছেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান নিজ হাতে তাঁতের কার্যে ও মোজা গেঞ্জির কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। সয়দাবাদ নিবাসী চক্রবর্তী পরিবার ও করঞ্জ নিবাসী লাহিড়ী পরিবারস্থ কেহ কেহ নিজ হাতে লাঙল ধরিয়া চাষ আবাদ কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন। উপরোক্ত বিবরণানুসারে উপলব্ধি হইতেছে যে অধুনা এই জেলার ব্রাহ্মণ সমাজের অনেকানেক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি সকল বর্ণের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ সমাজে বৈষ্ণব সংখ্যা অপেক্ষা শাক্ত ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অধিক। সদাচারী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সংখ্যা যজনযাজন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ব্যতীত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে মুষ্টিমেয় ও বিরল। একমাত্র স্থল নওহাটা ব্যতীত অন্য কোথায় এম এ, বি এ উপাধিকারী ব্রাহ্মণ মধ্যে সন্ধ্যাবন্দনাদির বিশেষ প্রচলন পরিলক্ষিত হয় না। সর্বত্রই মুসলমানের প্রস্তুত পাঁউরুটি বিস্কুট এবং সায়ং প্রাতে চা বিস্কুট সোডা লেমনেড ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি জাতিগণ মধ্যেই অনেকেরই আহারে অরুচি জন্মে।

ব্রাহ্মণ সমাজে গ্রহাচার্যগণ এই জেলার স্থানে স্থানে যে ২/৪ জন পরিলক্ষিত হয় তাহাদের সকলেই অতি দরিদ্র অবস্থাপন্ন এবং সকলেই অন্নারম্ভ বিবাহাদি শুভকার্যের লগ্নাদি নির্ধারণ ও কোষ্ঠী প্রস্তুত ও বিচার প্রভৃতি কার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। ইহাদের সকলেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত এবং সমাজে অচল। এই জেলার গ্রহাচার্য ব্রাহ্মণ সমাজে দৌলতপুর নিবাসী নবকান্ত সিদ্ধান্ত, খন্দবাড়ির নিবাসী হৃদয়নাথ তর্করত্ন, স্থলনওহাটা নিবাসী রামরূপ বিদ্যারত্ন, বড়ধুলের কেবলরাম বাচস্পতি, রায়হাটির শম্ভুনাথ শিরোমণি এবং তেলিজানার শিবচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

জল অনাচরণীয় জাতিগণের ব্রাহ্মণগণ মধ্যে এই জেলায় নানারূপ জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। তাহারা নানারূপ সভা সমিতি সংস্থাপন করিয়া ও তাহাতে গৃহীত মন্তব্যাদি

পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়া সামাজিক উন্নতি বিষয়ক নানা আন্দোলনে লিপ্ত হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বয়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ সংরক্ষিণী সমিতির উদ্যোগ ও কার্যবিবরণী উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত পাবনায় কিয়দ্দিনের জন্য যে ব্রাহ্মণ সভা বিদ্যমান ছিল তাহা হিন্দু সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাই এক্ষণে হিন্দুসভা নাম ধারণ করিয়াছে।

বৈদ্য—পাবনা জেলায় বৈদ্য জাতির সংখ্যা ১২০৮। ইহার মধ্যে পুরুষ সংখ্যা স্ত্রীলোকের কিঞ্চিদধিক তিনগুণ। এই জাতির সংখ্যাও পাবনায় অনেক হ্রাস হইয়াছে। সিরাজগঞ্জের অধীন বাগবাটি, ভাঙাবাড়ি, রাণীগ্রাম, কুলকোচা, ঘোরাচরা, যোগনালা, খোকসাবাড়ি, সোনদহ, ব্রহ্মগাছা, বাসুরিয়া, শক্তিপুর, পঞ্চক্রোশী, জামতৈল, বৈদ্যদোগাছি প্রভৃতি স্থানে বৈদ্যজাতির সংখ্যা অত্যধিক। পাবনা সদরে বৈদ্যসংখ্যা অতি কম। নাজিরগঞ্জ অঞ্চলে মাত্র কয়েক ঘরের বাস ছিল। পাবনা টাউনে ২/১ ঘর মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সিরাজগঞ্জ টাউনে দাশগুপ্ত, সেনগুপ্ত, রায় আদি উপাধিক বৈদ্য বংশীয় অনেক চিকিৎসকের বাস। ইহারা ডাক্তারি ও কবিরাজি উভয় ব্যবসায়েই লিপ্ত।

রাণীগ্রামের রায় উপাধিক বৈদ্যগণ পূর্বে সম্পূর্ণ বড়বাজু পরগণার মালিক ছিলেন। এক্ষণে ইহাদের সম্পত্তি অনেকাংশে হস্তান্তরিত এবং অবস্থা পূর্বের ন্যায় স্বচ্ছল নাই। অধুনা অনেকেই চাকুরি ব্যবসায়ী। গরিব হইলেও ইহাদের পূর্বপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্তি ও গোবিন্দবিগ্রহের দৈনিক সেবা পরিচালনের সুব্যবস্থা আছে। হরিণাবাগবাটির রায় উপাধিক ভূম্যাধিকারিগণের অবস্থা অধুনা বৈদ্য সমাজে কথঞ্চিৎ উন্নত এবং ভূস্বামী হিসাবে তাহারাই স্বচ্ছল ও প্রতিপত্তিশালী। ইহাদের বাটিতেও কুলবিগ্রহ গোপাল ও রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি আদির দৈনিক সেবা পূজার বিশেষ সুব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত গ্রামে ইহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীকালিকাদেবীর সেবাপূজার ব্যবস্থা আছে। খোকসাবাড়ি নিবাসী রায় মহাশয়গণ বৈদ্য সমাজে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই জেলার সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের বৈদ্য সমাজে কেহ কেহ চাকুরিজীবী কিংবা চিকিৎসা ব্যবসায়ী হইলেও, অনেকেরই বেশি না হইলেও কিয়ৎপরিমাণে ভূসম্পত্তি বর্তমান আছে। ইহাদের সকলেরই বাসস্থল ও ভদ্রাসনবাটি অল্পবিস্তর ফলপুষ্পোদ্যানে পরিশোভিত এবং সাধারণত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; সহসা দেখিলেই অন্যান্য জাতীয় হিন্দুদিগের বাটি হইতে পৃথকত্ব সহজে অনুভূত হয়। শক্তিপুরের রায় উপাধিক বৈদ্যগণ প্রাচীন বংশ বলিয়া পরিচিত। ঘোরাচরা নিবাসী গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয় পাবনা জেলার বৈদ্য সমাজে পরিচিত। বৈদ্য জাতির মধ্যে সাধারণত শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অত্যধিক। ইহাদের প্রযত্নেই ঘোরাচড়া নাম ক্ষুদ্র পল্লী হইতে সর্বপ্রথমে "স্বদেশ হিতৈষিনী" নামধেয় একখণ্ড পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত।

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের নিম্নেই বৈদ্য জাতিগণের স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগকে কেহ "অম্বষ্ঠ সংখ্যক ব্রাহ্মণ" কেহ "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" কেহ "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। বৈদ্যগণ সাধারণত অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্বে অধিকাংশই চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। অম্বষ্ঠ জাতি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যাকন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।

মনুসংহিতা—১০ম অধ্যায়—৮ম শ্লোক

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষিজীবো ভবেৎ সোঽপি তথৈব আগ্নেয় বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনী বৃত্তিকোবাপি চিকিৎসা শাস্ত্র জীবিকঃ ॥

উষণাসংহিতা

বৈদ্য জাতিগণ মূলত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা অম্বষ্ঠ জাতি যাহাই হউন, কিঞ্চিদধিক ৪৫/৪৬ বৎসর পূর্বে এই জেলার বৈদ্যগণ মধ্যে দ্বিজাতির লক্ষণস্বরূপ উপনয়ন সংস্কার ছিল না এবং ইহারা শূদ্রবৎ ৩০ দিন অশৌচ গ্রহণ করিতেন। প্রকাশ লক্ষণসেনের সময়ে পূর্ববঙ্গের বৈদ্যগণ উপবীত বর্জন করিয়াছিলেন। ১২৮৮ সালের আষাঢ় মাসে সিরাজগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন করিয়াছেন। ওই সময় হরিণাবাগবাটির "জমিদার কৃষ্ণবন্ধু রায় ও জগবন্ধু রায় মহাশয়দ্বয় বহু অর্থ ব্যয় এবং যত্ন ও চেষ্টা করিয়া নবদ্বীপ, পূর্বস্থলী ও কোড়কাদি প্রভৃতি স্থান হইতে নানা শাস্ত্রভিজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিত মহাশয়দিগকে আহ্বান করিয়া হরিণাবাগবাটি গ্রামে এক বিরাট সভা করেন। ....সিরাজগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যগণ আবহমান কাল হইতে চূড়াকরণের সময় উপবীত গ্রহণ করিতেন এবং গায়ত্রী জপ করিতেন কিন্তু রীতিমত উপনয়ন সংস্কার ছিল না। এই সময় হইতে ইহাদের রীতিমত উপনয়ন সংস্কার চলিয়া আসিতেছে।"

"ষষ্টিধর গুপ্তবংশাবলী ও বৈদ্যজাতির ইতিহাস" জগদীশচন্দ্র রায় বি-এল প্রণীত ১০/১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপনয়ন সংস্কার হইলেও পক্ষাশৌচ গ্রহণ ইহাদের পূর্ব বর্ণিত মত "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" "কর্ণাটক্ষত্রিয়" কিংবা "অম্বষ্ঠসংজ্ঞক ব্রাহ্মণ" আদি জাতির পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। এই অশৌচ গ্রহণ প্রথা বাংলার বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ সংজ্ঞার মধ্যে থাকা কিংবা তাহা জ্ঞাপনার্থ গুপ্তশর্মা, সেনশর্মা, দাসশর্মা আদি উপাধি ধারণ প্রভৃতি মত প্রচারকারিগণের নিকট সর্বথা প্রণিধানযোগ্য।

এই জেলার বৈদ্যগণ মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী এবং সকলেই সাত্ত্বিক প্রকৃতি। ইহারা সাধারণত শান্ত, নিরীহ, সদাচারী, স্বধর্মপরায়ণ ও সুশিক্ষিত। সকলেই সদালাপী এবং অল্প বিস্তর স্বাস্থ্যবান।

বৈষ্ণব—বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতি ব্যতীত পাবনা জেলায় বৈষ্ণব বা বৈরাগী জাতির সংখ্যা ৬৬৬১ জন। ইহাদের মধ্যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোক সংখ্যায় ১৭৩৯ জন অধিক। ইহাদের সংখ্যা পূর্বে আরও বেশি ছিল এক্ষণে অনেক হ্রাস হইয়াছে। স্থানে স্থানে পল্লীপ্রান্তে অনেক আখড়াধারী বৈষ্ণব বা মোহান্তের বাস আছে এবং অনেকে ওই সমস্ত মোহান্তের সম্প্রদায় বা দলভুক্ত বলিয়া পরিচিত হয়। পাবনা, রামজীবনপুর, (সুজানগর) চরাডাঙা প্রভৃতি গ্রামে এবং সলপাদি অঞ্চলে কয়েকজন মোহান্তের আখড়া পরিলক্ষিত হয়। চলিত ভাষায় পুরুষগণ বাবাজি এবং স্ত্রীলোকগণ মাতাজি নামে পরিচিত হয়। হিন্দু সমাজের স্ত্রীপুরুষ, বিশেষত স্ত্রীজাতি নানা কারণে সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সাধারণত আখড়াধারী মোহান্ত কর্তৃক ভেক গ্রহণ করতঃ সুসংস্কৃত হইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। মোহান্তগণ সাধারণত চেলা রাখে। ইহারা স্থানে স্থানে গৌর নিতাই, রাধাকৃষ্ণ মূর্তি কিংবা জগন্নাথ বিগ্রহের মূর্তি স্থাপন করিয়া সেবা পূজাদিও পরিচালন করে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেহ কেহ মাথায় লম্বা চুলও রাখে ও সমস্ত শরীর আবৃতকারী অতি মলিন তৈলসিক্ত আলখেল্লা ব্যবহার করে। ইহারা সাধারণত বাউল সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়। মৃত্যুর পর অনেকের সমাধি বা সমাজ দেওয়া হয়। তাহা দৈনিক সসম্মানে অনেক সময়ে পূজিত হয়। চিথলিয়ার ধীবর জাতীয় ঠাকুর শম্ভুচাঁদের সমাধি এতৎ সমূহ মধ্যে সর্বপ্রধান। বৈষ্ণবাদিগের অনেকে এ দেশের অনেক সাধারণ ইতর ভদ্র লোককে শ্রীক্ষেত্র ও বৃন্দাবনাদি তীর্থক্ষেত্র লইয়া যায় এবং সাঁথিয়া বা পথ প্রদর্শক নামে পরিচিত হয়। আজকাল রেল স্টিমারের কল্যাণে ইহাদের সঙ্গ অনেকে পরিহার করিয়াছে। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটি আয়ের পথ। সময় সময় জেলার অনেক স্থানে বৈষ্ণব সম্মিলনী বা সাধু ভাণ্ডারা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে জেলাবাসী ও ভিন্নস্থানবাসী অনেকানেক বৈষ্ণব একত্রিত হইয়া নানারূপ নৃত্য গীতাদি আনন্দোৎসব সম্ভোগ করে।

সাহা—পাবনা জেলায় বিগত ১৯২১ সালের আদমসুমারিতে বৈশ্য জাতীয় সাহাগণের সংখ্যা ২৬৪০৯ জন গণিত হইয়াছে। পূর্বে সাহা ও শুঁড়ি এক পর্যায়ে প্রদর্শিত হইত। এক্ষণে শুঁড়ি সংখ্যা এই জেলায় ২২৯ জন। অধুনা উভয় জাতি পৃথক পৃথক লিখিত হয়। সাহা কোন জাতি বাচক শব্দ নহে। তিলি তন্তুবায়াদি জাতিগণ মধ্যেও এই জেলায় সাহা উপাধি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ইহা উপাধি বাচক মাত্র। অধিকাংশ স্থলে এই সাহাগণ পূর্বে জাতি স্থানে সৌ বা সৌ সাহা বলিয়া অভিহিত হইতেন। এক্ষণে সর্বত্রই জাতি স্থানে বৈশ্য শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। বিগত ১৯১১ সালের আদমসুমারি হইতে ইহারা বৈশ্য সাহা ও বৈশ্য বারেন্দ্র সাহা ইত্যাদি আখ্যায় গণিত হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

পাবনা সদরে টাউন, হিমাইতপুর কুঁচিয়ামোরা, নিশ্চিন্তপুর, সাতবারিয়া, গোররী, হাদল, পার্শ্বডাঙা, ইদিলপুর, সাহাপুর, বেড়া, জগন্নাথপুর, আলোকদিয়ার, ধোবাখোলা, সাগরকান্দি প্রভৃতি পল্লী এবং সিরাজগঞ্জের অধীনস্থ সিরাজগঞ্জ টাউন, সোহাগপুর, দেলুয়া, সদিয়াচাঁদপুর, দৌলতপুর, বয়রা, কাওয়াখোলা, রাজাপুর, মকিমপুর, ঝাউল, তেথুলিয়া, সয়দাবাদ, পাঙাসি, ধানঘরা, পোরজনা, বেতকান্তি, সোনাতনি, উল্লাপাড়া প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু গ্রামে বৈশ্য সাহা জাতির বাস। ইহারা সকলে নানাবিধ পণ্যদ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত। পাবনা অপেক্ষা সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের সাহা মহাজনগণ ব্যবসায়ী হিসাবে সাতিশয় উন্নত। সিরাজগঞ্জ টাউনে পাবনা জেলা ব্যতীত ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি ভিন্ন জেলা হইতে আগত অনেক সাহা মহাজনের বাস বা কারবার স্থান আছে। এই জাতিগণ আজন্ম ব্যবসায়ে লিপ্ত সেজন্য ইহাদের মধ্যে অনেকেই অতি সামান্য অবস্থা হইতে অতি অল্প সময়ে সবিশেষ ধনাঢ্য হইয়া থাকেন। ঘোরশাল নিবাসী স্বর্গীয় হরিনাথ সাহা, পাবনা নিবাসী রাজেন্দ্রনারায়ণ সাহা এবং সিরাজগঞ্জ প্রবাসী ঢাকা আমতা নিবাসী প্রসন্নকুমার সাহা মহাশয় প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পার্শ্বডাঙা জমিদার বংশের পূর্বপুরুষগণও অতি পূর্বে সামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন।

সাহা জাতীয় সকলেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ এবং সদাচারী। ইহাদের গৃহাদি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহারা অধিকাংশ গোস্বামিদিগণের শিষ্য। অনেকের বাটিতে রাধাগোবিন্দ, রাধামোহন, মদনমোহন, রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রভৃতি যুগলমূর্তির সেবা পূজা প্রচলিত আছে। পাবনা ও সিরাজগঞ্জে মহাজনদিগের ঈশ্বর বৃত্তি আদিতে পরিচালিত নরসিংহজি, মহাপ্রভু প্রভৃতি কয়েকটি বিগ্রহের আখড়া বা বিগ্রহ আলয় বর্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের বাটিতে প্রায় সর্বত্রই কথকতা ভাগবতাদি পাঠ উপলক্ষে নানারূপ মহোৎসবাদির সাময়িক ও বার্ষিক অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। সাহা সমাজে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই প্রধান সম্প্রদায় বর্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত ইহার অন্তর্গত নানা পঠি বিভাগ আছে। বারেন্দ্রগণ সাধারণত সামাজিক হিসাবে আপনাদিগকে কুলীন মনে করে। বারেন্দ্র সমাজে এই জেলায় ধনী সংখ্যা অধিক। রাঢ়ী সমাজের আচার ব্যবহার বারেন্দ্রদিগের ন্যায় সর্বত্র সুসংস্কৃত নহে। মহাজনী তেজারতি প্রভৃতি সাহাদিগের জাতীয় প্রধান ব্যবসায়। অধুনা এই জেলায় ইহাদের মধ্যে অনেকে ওকালতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এম এ, এম বি, এল এম এস, বি এল প্রভৃতি উপাধি সংখ্যা ইহাদের মধ্যে অধুনা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দু সমাজে ইহারা ধন সম্পদ বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক জাতি হইলেও ইহাদের ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি হেতু ঈর্ষামূলেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, ইহারা ব্রাহ্মণাদি জাতিগণের নিকট সর্বত্র বিশেষ সমাদৃত নহেন। অধুনা বৈশ্য সমাজ বা সম্মিলনী নামে পাবনা ও সিরাজগঞ্জে ইহারা নানারূপ সভা সমিতি স্থাপন করিয়া সামাজিক ও বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বাঙ্গীন উন্নতি প্রয়াসী হইয়াছেন। এই সমাজের সোহাগপুর নিবাসী চৌধুরি পরিবারের জনৈক যুবক দুই বৎসর হইল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বিদেশি ব্যবসায় কেন্দ্র পরিভ্রমণপূর্বক

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিনা আপত্তিতে সমাজে গৃহীত হইয়াছেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অন্তর্গত ইহা সাহা জাতির সামাজিক উদারতার পরিচায়ক। সভা সমিতির আন্দোলনের ফলে এই জেলার সাহা সমাজের বিশেষ কোনও সুফল হয় নাই, তবে এই জেলার কীর্তিখোলা (চৌহালি) নিবাসী ব্রজেন্দ্রকুমার রায় বি. এল. মহাশয় অন্যান্য জেলাবাসীর ন্যায় বৈশ্যত্বের লক্ষণ স্বরূপ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

সাহা জাতীয় সকলেই এই জেলায় বৈষ্ণব মতাবলম্বী। ইহারা সকলেই হরি সংকীর্তন প্রিয় ; চৌহালি থানার অধীন উরাপাড়া নামক গ্রামে কীর্তনিয়া উপাধিক জনৈক সাহা পরিবারের বাস। ইহাদের মধ্যে পূর্বে অনেকে হরিনাম কীর্তনে প্রথম গান আরম্ভ করিয়া দিতেন জন্য জমিদারগণ ইহাদের প্রামাণিক আখ্যা প্রদান করেন। উরাপাড়া নিবাসী কৃষ্ণমঙ্গল কীর্তনিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ফোটা তিলক ধারণ ও হরিনামের মালা জপ ইহাদের মধ্যে বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। শৈব শাক্ত সংখ্যা ইহাদের মধ্যে অতি বিরল। কেবলমাত্র বেলকুচি পুলিশ স্টেশনের অধীন রাজনগর নিবাসী রাজকৃষ্ণ সাহা মহাশয় জনৈক তান্ত্রিক মতাবলম্বী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহার পরিবারে কালিদয়াল, শিবদয়াল প্রভৃতি নাম দৃষ্টি গোচর হইত। রাজনগরে পূর্বে কালীপূজার বিশেষ সমারোহ ছিল। পার্শ্বডাঙার সাহা সম্প্রদায় মধ্যে অনেকেই শাক্ত মতাবলম্বী। শম্ভুনাথ চৌধুরি মহাশয় প্রতিষ্ঠিত কাশীর ভুবনেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠা এই সমাজে শাক্ত মতের নির্দশন।

এই জাতি মধ্যে রাধাবল্লভ, রাধাবিনোদ, রাধারমণ প্রভৃতি বৈষ্ণবাত্মক নামই অধিক প্রচলিত। সাহা, পোদ্দার, প্রামাণিক, চৌধুরি, রায় খাঁ, প্রভৃতি উপাধি এই সমাজে অধিক প্রচলিত। শাহজাদপুরে দেওয়ান উপাধি জনৈক পরিবারের বাস আছে। ইহারা সকলেই ব্যবসায়ী বিধায় অতি হিসাবী ও অনেকেই কৃপণাশয়, তবে অতি সঞ্চয়ী ব্যক্তিগণের সন্তান সন্ততিগণ প্রায়ই বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দোষে দূষিত। ইহারা শিক্ষা হিসাবে বঙ্গের সমুদায় জাতিগণ মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেও, অন্যান্য জাতিগণের নিকট সাধারণত অশিক্ষিত ও বুদ্ধিহীন বলিয়াই বিবেচিত। যে জাতি এক টাকা দুই টাকা মূলধন লইয়া লক্ষ মুদ্রা উপার্জনে সমর্থ, তাহা সাহা জাতির পক্ষে কম বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। সাহাগণ বিদ্যোৎসাহিতা ও শিক্ষার উদারতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। ইহাদের সিরাজগঞ্জ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের বড় বড় আড়ত বাটিতে বহু ভিন্ন জাতীয় ছাত্রগণ বাস ও আহার করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে। পূর্বে ইহাদের নিজ সমাজ মধ্যে উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ না থাকিলেও ইহারা বহু বিদ্যালয়াদি স্থাপন ও পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। চাটমোহরের শম্ভুনাথ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও সোহাগপুর হাইস্কুল, পাবনা জেলা স্কুলের বোর্ডিং গৃহ প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। উল্লাপাড়া মহাজনদিগের পরিচালিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও সিরাজগঞ্জের ভিক্টোরিয়া স্কুল ইহাদের সমবেত চেষ্টায় স্থাপিত।

ইহাদের মধ্যে অনেকেই সাধারণত সৎপথে থাকিয়া ধনোপার্জন করেন, কেহ অসদুপায়াবলম্বন করেন না। ইহাদের মধ্যে বাবুয়ানাও যথেষ্ট এবং স্ত্রীলোকের গহনাদি ব্যবহার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক। সুন্দর ও সুশ্রী স্ত্রীপুরুষ এই সমাজেও অধিক। ইহারা সাধারণত ব্যবসায়ই অধিক ভালবাসে, চাকরি করিলেও সাধারণত স্বজাতি মহাজন ভিন্ন অন্যের দাসত্ব প্রায়ই করে না। সকলেই স্বাধীন ব্যবসায় প্রিয়।

সাধারণত সাহা ও শুঁড়ি এক পর্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে। যাহারা শুণ্ড দ্বারা মদ্য প্রস্তুত করে ও তাহার ব্যবসায় অবলম্বন জীবিকা নির্বাহ করে তাহারাই শুঁড়ি আখ্যায় অভিহিত। সাহা কোন জাতি বাচক শব্দ নহে, ইহা উপাধিবাচক মাত্র। এই জেলা নিবাসী কোন সাহা জাতীয় লোক মদ্য প্রস্তুত বা তাহার কারবারে লিপ্ত নাই। নদিয়াদি পশ্চিম বঙ্গীয় কোন কোন জেলার

সাহা উপাধিক কতিপয় প্রবাসী ব্যক্তি এই জেলায় মদ গাঁজার দোকান করিত মাত্র। তাহারাও প্রায়ই ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য জাতির ভেণ্ডারগণ কর্তৃক অপসারিত হইয়াছে। অধুনা এই জেলাস্থ কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি জাতিগণের অনেকেই আবগারি বিভাগ হইতে লাইসেন্স লইয়া পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জের অনেক স্থলে হাটেবাজারে মদ গাঁজা বিক্রয়ে লিপ্ত আছেন। এই জেলাবাসী সাহা জাতিগণের সকলেই সাহা, সাউ, সাউলোক, সৌ বা সৌলোক বলিয়া পরিচিত হইতেন। উত্তরকালে আদমসুমারি উপলক্ষে নানা আন্দোলনের ফলে পূর্ববঙ্গীয় সৌসাহা বা সৌলোকগণ আপনাদিগকে বৈশ্য এবং পশ্চিমবঙ্গীয় শৌণ্ডিকগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "সাহা জাতি সনাতন বৈশ্য এবং শৌণ্ডিক জাতি মূলে ক্ষত্রিয়, মদ্য ব্যবসায়ে বৈশ্য, ভূষামাল বিক্রয়ী খন্দসাহা ও মদ্য ব্যবসায়ী শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) দুই স্বতন্ত্র জাতি। অধুনা উভয় জাতিই বৈশ্য বলিতেছে।"

নারায়ণচন্দ্র সাহা কৃত "বৈশ্য খন্দসাহা ও শৌণ্ডিক"। ভূমিকাংশ

সাহাজাতির অনেকে ষণ্ড বা যাঁড়ের উপর পণ্যদ্রব্য লইয়া হাটে বাজারে বিক্রয় করিত। এই সাহা সমাজে পাবনা জেলায় বাল্দিক বা বলদে পঠী নামে সাহাদিগের মধ্যে এক পঠী দেখা যায়। সিরাজগঞ্জের উত্তরাংশে হাট বয়রা গ্রামে সাহাদিগের মধ্যে ছোট ছোট ঘোড়ার উপর মালপত্র বহনের প্রথা অদ্যাপি বর্তমান আছে। উত্তরকালে ষণ্ড বা বলদ অভাবে উহারা ঘোড়ার সাহায্য লইয়াছে। এই ষণ্ড বা যাঁড় বাহিত পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা সাহাজাতি কালক্রমে শুণ্ডি বা শুঁড়ি বা শৌণ্ডিক জাতির সহিত নামের উচ্চারণ সাদৃশ্য একত্রীভূত হইয়াছে। তজ্জন্য কুষ্টিয়া নিবাসী রামলাল সাহা মহাশয় লিখিয়াছেন—

"শৌণ্ডিকের অপভ্রংশ শুঁড়ি সবে বলে।
এ কারণ শুঁড়ি সাহা তাহারা সকলে।।
সাহসাহা, শুঁড়িসাহা ভিন্ন ভিন্ন হয়।
অন্য লোকে নাহি জানে দুই এক কয়।।"

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সংকলিত "বৈশ্য কাণ্ড" এবং সুবিখ্যাত পরিব্রাজক স্বর্গীয় ধর্মানন্দ মহাভারতীকৃত "সিদ্ধান্ত সমুদ্র" গ্রন্থাদি পাঠ করিলে এই জাতির বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

সুবর্ণবণিক—পাবনা জেলার সুবর্ণবণিক সংখ্যা ১২৬৬ জন ; অন্যান্য জাতির ন্যায় ইহাদের সংখ্যাও অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে। পাবনা টাউন, গোবিন্দপুর, শাহজাদপুর, ঝাউল, চাঁদপুর, কালিয়াহরিপুর, বিয়ারা প্রভৃতি স্থানে অনেক সুবর্ণবণিক জাতির বাস। ইহারা সাধারণত বাণিজ্য কারবারাদিতে লিপ্ত। ব্যবসায় হিসাবে বণিক জাতি নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—

"গান্ধিক শাঙ্খিক কাংসক মণিকারক।
সুবর্ণজীবিকশ্চৈব পঞ্চেতে বণিকস্মৃতা।।"

পরশুরাম সংহিতা।

ইহারা সকলেই বৈশ্য বর্ণান্তর্গত এবং হিন্দুসমাজে আচরণীয়, কেবলমাত্র সুবর্ণবণিকগণ সমাজে অনাচরণীয়। প্রবাদ বল্লাল সেনের সময়ে ইহাদের ধন সম্পদ হেতু ইহারা রাজার অপ্রিয়ভাজন হইয়া সমাজে পতিত হইয়াছেন।

সূত্রধর—পাবনা জেলার সূত্রধর সংখ্যা বর্তমানে ১২৩০০। পূর্বে আরও বেশি ছিল। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ সংখ্যাই বেশি। সর্বত্রই প্রায় ২/৪ ঘর সূত্রধর বা সুতার জাতির বাস। অধুনা দেলুয়া নিবাসী বেলকুচির সূত্রধরগণ প্রসিদ্ধ কারিকর। দেশিয়

নানাপ্রকার নৌকা নির্মাণ, কপাট, জানালা, লাঙলাদি প্রস্তুত ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। কাষ্ঠ শিল্পী হিসাবে ইহারা সমাজের অত্যাবশ্যকীয় জাতি। ইহাদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস হইতেছে। অধুনা অনেক মুসলমান সূত্রধরের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে। আরাম বাড়িয়া, মাজপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক নমশূদ্র, জালিক ও মুসলমান জাতিগণ বাবলা কাষ্ঠ দ্বারা গো-গাড়ির চাকা তৈয়ার করে। এতদঞ্চলে ইহা বহুল পরিমাণে বিক্রয় হয়। সূত্রধর জাতির মধ্যে স্থলবিশেষে অনেক সুগায়ক ও সাধক পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণত নিরীহ ও সরল প্রকৃতি।

যোগী—যোগী বা চলিত ভাষায় যুগী জাতির সংখ্যা এই জেলায় ৮৬৫ জন। ইহাদের সংখ্যা পূর্বে এক হাজারের উপর ছিল। পাবনা রাধানগর, পোতাজিয়া, বড়ধূল, ধানঘরা, লাহোর প্রভৃতি গ্রামে অনেক যোগী বা যুগী জাতির বাস। বর্তমানে স্থানে স্থানে ইহারা চূর্ণকারের ও বাদ্যকারের ব্যবসায়ে লিপ্ত। স্থানে স্থানে কেহ কেহ দোকানদারি মহাজনি কারবারেও লিপ্ত। অধুনা ইহাদের সামাজিক আচার ব্যবহার সবিশেষ উন্নত নহে। ইহারা সকলেই জাতি স্থানে "নাথ" বলিয়া উল্লেখ করে। রুদ্র মহাদেব হইতে জাত বলিয়া ইহাদের সকলেই শিব গোত্রীয়। ইহারা দেউল পূজায় অধুনা প্রচ্ছন্ন ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম বজায় রাখিয়াছে।

উপরোক্ত কয়েকটি প্রধান জাতি ব্যতীত এই জেলায় কুড়ি, হালিয়াদৈর, বিন্দি প্রভৃতি জাতি আছে। কুড়ি জাতি সম্ভবত মোদক ও ময়রা জাতির মধ্যে গণ্য। ইহাদের সংখ্যা এই জেলায় ১৩২৫ জন। সুজানগর পুলিশ স্টেশনের অধীন কুড়িপাড়া ও শাহজাদপুরে অনেক কুড়ি জাতির বাস।

হালিয়াদৈর নামক জাতি এই জেলায় বাঁশেরবাধা এবং নাজিরগঞ্জ অঞ্চলে অধিক বাস করে। ইহারা সাধারণত কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ইহাদের জল সমাজে চল নহে। ইহাদের মধ্যে মণ্ডল, শ্রীমানি, দাস সরকারাদি উপাধি বর্তমান আছে। অনেক ধনাঢ্য মহাজনও ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। ইহারা সাধারণত নিরীহ ও সরল প্রকৃতি। ইহাদের আজকাল অনেকে শিক্ষিত হইয়া ওকালতি ডাক্তারি আদি ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন। ইহারা সম্ভবত লোকগণনায় সদ্গোপ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। এই জাতির সংখ্যা এই জেলায় ২৫৬৯ জন।

মুসলমান—পাবনা জেলায় মোট মুসলমান জাতির সংখ্যা ১০৫৩৫৭১ জন। সেখ, সৈয়দ, পাঠান, খুলু, নিকারি, জোলা (কারিকর) বেহারা প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ মুসলমানগণ মধ্যে লোক গণনায় প্রদর্শিত হয়। সাধারণত মুসলমান মধ্যে কৃষক, কারিকর, নিকারি, নলুয়া প্রভৃতি শ্রেণীই অত্যধিক। এতদ্ব্যতীত বাঁশফোর, বাদিয়া, সানদার প্রভৃতি যে সকল নিম্ন শ্রেণীর লোক দেখা যায়, তাহারা মুসলমান সমাজে বিবিধ পর্যায়ে গৃহীত হয়।

কাহার কাহার মতে, এদেশের সাধারণ মুসলমানগণ মধ্যে অনেকেই ধর্মান্তরিত হিন্দু জাতি। এই জেলার মুসলমান মধ্যে অনেকের হিন্দু নাম যথা গোপাল প্রামাণিক, অনেকের 'ভক্ত' প্রভৃতি উপাধি, অনেকের হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস ও অনেকের হিন্দু রীতিনীতি দৃষ্টে ইহা কতকাংশে সত্য বলিয়া বোধ হয়।

মুসলমান অধিকারকালে পাঠান আমলে ছাতকের কালিয়াই বংশীয় রাজা দেবীদাসের পুত্রদ্বয় ঠাকুর কেশবনাথ ও ঠাকুর কাশীনাথ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন, তাহা হইতেই পাবনা আমিনপুরের মিঞা ও ঢাকা এলাচিপুরে মিঞা বংশের উদ্ভব হয়। মোঘল আমলে শাহজাদপুরের জমিদার রাজা রায়ের পুত্র রঘু রায় তথাকার জায়গিরদার তুকমাক খাঁ কর্তৃক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। পাঠান আমল হইতে পাবনা জেলার শাহজাদপুরে পল্লী প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গাধিকার কালের সমকালেই উক্ত পল্লীতে শাহাজাদা মক্‌দুম্ সাহেবের অবস্থান জানা যায়। নবগ্রামে সুলতান

হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নসরৎ শাহের পুত্র সময়ে নির্মিত মসজিদ, সমাজ গ্রামে শের শাহের পুত্র সুলতান সলিম বা সমির শাহের সময়ে নির্মিত মসজিদ এবং চাটমোহরে মাশুম খাঁর সময়ের প্রাচীন মসজিদাদি দৃষ্টে জানা যায় পাঠান আমলে এ দেশে অনেকানেক মুসলমান স্থায়ী হইয়াছিলেন। পাবনার শাহজাদপুর, মরিচপুরাণ, চাটমোহর, পাঠানপাড়া, আফ্রাদপাড়া, সয়দাবাদ বা সৈয়দাবাদ এবং সদরের জালালপুর, হামিদপুর ইয়াকুপপুর, ইসমালিপুর প্রভৃতি পল্লী দৃষ্টে অনুমান হয় পাঠান আমলে এই জেলার বহু স্থানে অনেক মুসলমান বীরপুরুষ এবং সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র পরিবারের বসতি বিস্তার ঘটিয়াছিল। তাহাদের বংশধরগণই কালক্রমে নিঃস্ব অবস্থায় পরিণত হইয়া সাধারণ মুসলমান বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। অধুনা ছাতক, বরাট, বাগমৃজাপুর, মাসুন্দিয়া, আমিনপুর, তালিমনগর, আমিরাবাদ প্রভৃতি পল্লীতে মিরজা উপাধিক যে সাধারণ মুসলমানের বাস, তাহাদের অনেকে মোঘল আমলে এক সময়ে আরঙ্গজেবের সহোদর দারার পুত্র সোলেমান ওরফে টনুবেগের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইত। ইহাদের মিরজা উপাধিই উচ্চ বংশের পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকস্থলে উচ্চ বংশীয় মুসলমানের বাস আছে।

এ জেলার মুসলমানগণ মধ্যে সুন্নি সংখ্যাই অধিক। হিন্দুগণ অপেক্ষা মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস ও রোজা নামাজ আবালবৃদ্ধ সকল শ্রেণী মধ্যেই সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, প্রকৃত ধর্মভাব সকলের মধ্যে আছে বলিয়া বোধ হয় না। পূর্বে গাজির বাঁশ তোলার প্রথা অধিক পরিমাণে স্থানে স্থানে দেখা যাইত। নাজিরগঞ্জে সবিশেষ ধুম ছিল, এক্ষণে এই প্রথা অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে সাধারণত মোল্লাগণ পারিবারিক সর্বকার্যে ধর্মক্রিয়ার সহায়ক। মুসলমান সমাজে এই জেলার স্থানে স্থানে ফারাজি সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। তাহারা লম্বা চুল রাখে এবং সাধারণ কাপড় অপেক্ষা তহবন অধিক ব্যবহার করে।

মুসলমান সমাজে সাধারণ শ্রেণী মধ্যে শিক্ষার একান্ত অভাব। কৃষি প্রধান দেশে ইহারা দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ইহাদের অবস্থার উন্নতি একান্ত আবশ্যক। অধুনা মুসলমানদিগের শিক্ষাকল্পে পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যয় বিধানের ব্যবস্থা সরকার ও ডিস্ট্রিক্টবোর্ড হইতে হইতেছে দেখিয়া অনেকে ঈর্ষান্বিত হয়েন। কিন্তু মফঃস্বলবাসিদিগের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে, এদেশের অধিবাসিগণের আরও কি পরিমাণে শিক্ষার আবশ্যক তাহা সহজে উপলব্ধি হয়। তবে শিক্ষা প্রাপ্ত বা অর্ধ শিক্ষিত অনেক মুসলমানগণ সময় সময় তাহাদের অপরিণামদর্শীতা হেতু ভ্রমে পতিত হইয়া স্থানে স্থানে নির্বুদ্ধিতা ও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদির যে ভাব প্রদর্শন করেন, তাহা তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা ও সহৃদয়তার অভাব প্রযুক্ত। তজ্জন্য দেশের সাধারণ লোককে অশিক্ষিত রাখা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। সাধারণ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানগণ মধ্যে সকলেই নানা কারণে যেরূপ গরিব অথচ অত্যধিক ব্যয়শীল তাহাতে ইহাদের অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতি জন্য ইহাদের মধ্যে নানা বিষয়ক শিক্ষা একান্ত আবশ্যক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়

ক. শৈবশাক্ত মত ঃ

এই জেলার ব্রাহ্মণ সমাজে অধিকাংশ স্থলেই শৈবশাক্ত ধর্মমত প্রচলিত। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের সংখ্যা এই জেলায় অতি বিরল। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বৈষ্ণব সংখ্যা বেশি হইলেও বিবাহাদির পূর্বে কালীপূজা প্রথা অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হয়। শিবপূজা ও

শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা সর্বজাতীয় লোকের মধ্যেই দেখা যায়। যোগী বা নাথ ও কাপালিকগণ অনেক স্থলেই শিব উপাসক।

খ. বৈষ্ণব মত ঃ

হাণ্ডিয়াল বল্লভপুরের গোস্বামী, হাপানিয়ার বৈষ্ণব ও স্থান বিশেষের গোস্বামী উপাধিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্রাহ্মণ সমাজে বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি কম। কায়স্থ, নবশাক, বৈশ্যসাহা, মালো, নমঃশূদ্রাদি জাতিসমূহ প্রায় সকলস্থলেই বৈষ্ণবধর্ম মতাবলম্বী। এই সকল জাতিগণ মধ্যে মালা তিলক শিখাধারণ, হরিসংকীর্তন এবং গোস্বামীগণের নিকট বৈষ্ণব মতে দীক্ষা গ্রহণ প্রথা বর্তমান আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে এই জেলায় কয়েকটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) চিথলিয়া নিবাসী ধীবর জাতীয় ঠাকুর শম্ভুনাথ কর্তৃক প্রবর্তিত "গুরুসত্য" মতাবলম্বী অনেকে এই জেলায় বিদ্যমান আছে।

(২) পাবনা ও শাহজাদপুরে শ্রীহট্ট জেলার অরুণাচলস্থ ঠাকুর দয়ানন্দের প্রবর্তিত প্রাণগৌর নিত্যানন্দ উপাসক অনেক শিষ্য বর্তমান আছে।

(৩) বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত বাউল সম্প্রদায় ভুক্ত অনেক বৈষ্ণব বা চলিত ভাষায় বৈরাগী শ্রেণীও জেলায় অনেক স্থলেই বিদ্যমান আছে।

(৪) আখড়াধারী মোহান্তগণের অধীনে স্থানে স্থানে যে সাধারণ বৈষ্ণব বা চলিত ভাষায় বাবাজি মাতাজি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সমস্তই চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বৈষ্ণব মতাবলম্বী।

গ. সৎসঙ্গী মত ঃ

পাবনা হিমাইতপুর নিবাসী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় কর্তৃক সংসঙ্গ নামে যে এক নতুন মত প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা অনেকাংশে পশ্চিমাঞ্চলের রাধাস্বামীপন্থিগণের আচরিত উপাসনা পদ্ধতির অনুরূপ। এই মতে সন্নাম, সৎগুরু ও সৎসঙ্গ প্রভাবে নাদ যোগদ্বারা আত্মোন্নতির জন্য ইহা সাধারণে সৎসঙ্গী নামে পরিচিত। ইহাতে পূজার্চনা কিংবা জাতিভেদ কিছু নাই। হিমাইতপুরে এই আশ্রম সংস্রবে নানা আড়ম্বরপূর্ণ অর্থোন্নতি ও সমাজসংস্কারের অনুষ্ঠানও চলিতেছে। ফলত এখানে ধর্ম অর্থাদি লাভের আশায় আকৃষ্ট হইয়া দেশস্থ ও বিদেশস্থ অনেকে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি এখানকার শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে নানা মতভেদ হইয়াছে এমত অবগত হওয়া যায়।

ঘ. ব্রাহ্মধর্ম মত ঃ

সর্বপ্রথম পাবনা শহরে ১৮৫৬ অব্দে সরকারি কর্মচারীগণের প্রযত্নে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের চেষ্টা হয়। ১৮৬৪ অব্দে দ্বিতীয়বার চেষ্টা হইলে ইহাতে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ১৮৭৭ অব্দে প্রায় ১০ জন ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া পাবনায় সমাজ গঠন করেন। তৎকালে পাবনার প্রসিদ্ধ নাগরিক হরিশচন্দ্র তলাপাত্র মহাশয় ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাহাকেও সামাজিক ও ব্যবসায়িক নানারূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। প্রতি বুধবারে উপাসনা হইতে থাকে। ১৮৮১-৮২ অব্দে ক্রমে পাবনায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে মন্দিরাদি নির্মিত হয়। বিদেশি হাকিম ও কর্মচারিগণ মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে ক্রমে ক্রমে সবিশেষ উদ্যোগ ও চেষ্টা করেন। এইরূপে সিরাজগঞ্জেও ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। এই জেলায় ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১৫ জন মাত্র পরিলক্ষিত হয়। জেলাবাসিদিগের মধ্যে ব্রাহ্ম সংখ্যা কম, ভিন্ন জেলাস্থ প্রবাসী ব্রাহ্ম সংখ্যা এখানে অধিক। ঘোড়াচরা নিবাসী গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয় নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের জনৈক আচার্য ছিলেন।

ঙ. খ্রিস্টান ধর্মমত ঃ

পাবনার অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট মিশন ও সিরাজগঞ্জে ট্যাসম্যানিয়ান মিশনের প্রচারকগণ খ্রিস্টধর্ম মত প্রচার করিয়া থাকেন। এই জেলার মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীস্থ নানা জাতীয় হিন্দুগণ খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী হইয়াছে। মোট খ্রিস্টান সংখ্যা বর্তমানে ৪৫৫ জন। পাবনার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রচার জন্য একটি জেনানা মিশন প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৮৯০ অব্দে পাবনায় স্থায়ী মিশনারী নিযুক্ত হয়েন।

চ. জৈন বৌদ্ধমত ঃ

সাঁড়া, সুজানগর ও সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত মারওয়াড়ি ও আগরওয়ালাগণ ব্যবসায় উপলক্ষে বাস করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে জৈন ধর্মাবলম্বী। এই সমুদয় জৈন ধর্মমতাবলম্বী জাতির সংখ্যা ৫৪৯ জন।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা এই জেলায় বেশি দেখা যায় না, ইহাদের সংখ্যা মাত্র ৪ জন। এতদ্ব্যতীত এদেশে যোগী, নাথ উপাধিক যে সমস্ত জাতি বাস করে, তাহাদের দেউলপূজা ও চড়ক উৎসবাদিতে অনুষ্ঠিত প্রথাদি সমস্তই প্রাচীন বৌদ্ধাচারের নিদর্শন। সরগ্রামের ভবানী, উধুনিয়ার চৈতন্য ভৈরবী, নরসিংহপাড়া ও চৈত্রহাটির সিদ্ধেশ্বরী প্রভৃতি যে সমস্ত বিগ্রহমূর্তি বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের আচরিত অবলোকিতেশ্বর মূর্তির নিদর্শন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জেলার স্থানে স্থানে নাটাই পাটাই পূজা এবং পাষাণচতুর্দশী পূজাও প্রাচীন বৌদ্ধাচারের চিহ্ন।

ছ. প্রেতোপাসনা ঃ

পাবনা জেলায় ৬৬৭ জন প্রেতোপাসক।

জ. মুসলমান ধর্ম ঃ

এই জেলায় মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে সুন্নি সংখ্যা অধিক। ফারাজি সংখ্যাও নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। হানাফী, লা মুজহারী, রফাদিয়ান আদি সম্প্রদায়ও স্থানে স্থানে বর্তমান আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ — লোকের আকৃতি প্রকৃতি ও উপজীবিকা

আকৃতি ঃ

অধুনা এই জেলার হিন্দু ও মুসলমান সর্ব জাতীয় লোক মধ্যে সচরাচর এবং ১৮ ইঞ্চি হাতের কিঞ্চিদধিক ৫ (পাঁচ) ফুট উচ্চ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ৬ ফুট উচ্চ ও দীর্ঘকায় লোক সংখ্যা আজকাল ক্রমশ হ্রাস হইতেছে। পুলিশ বিভাগে কনস্টেবল নিযুক্ত সময়ে সাধারণত পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি হইতে ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত উচ্চ লোক গৃহীত হয়।

প্রাচীন লোকের মধ্যে ছয় ফুটের অধিক উচ্চ লোক দৃষ্টিগোচর হইত। বাগ, কাশীনাথপুর, খেতুপাড়া, ডেমরা, সলপ, স্থল প্রভৃতি পল্লীর ব্রাহ্মণ পরিবারে, পোতাজিয়াদি গ্রামের বারেন্দ্র কায়স্থ বংশে, অন্যান্য নানাস্থানে নবশাকাদি জাতি ও নমশূদ্র সমাজে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ে সাধারণত অনেক দীর্ঘকায় বিশাল বপু বিশিষ্ট পুরুষ বর্তমান ছিল। আধুনিক লোকের আকৃতি ও শারীরিক বল উভয় হ্রাস হইয়াছে ও হইতেছে।

কিঞ্চিদধিক ৪০/৫০ বৎসর পূর্বে চৌহালি পুলিশ স্টেশনের অধীন বাওইখোলা শক্তিধরপুর গ্রামে মৃত্তিকা খননকালে ভূগর্ভে সাত হাত দীর্ঘ মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। চাটমোহোর কাজিপাড়ায় বৃষ্টি সময়ে জনৈক মুসলমান গৃহে ঐরূপ সাত হাত পরিমিত কঙ্কাল বাহির হইয়াছিল। হাকিমপুর (সুজানগর) পুষ্করিনী খনন কালে সম্প্রতি ২/৩ বৎসর হইল পাঁচ হাতের উর্ধ্ব একটি নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ লোক পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি জাতি মধ্যে অধিকাংশ লোক গৌর ও শ্যামবর্ণ। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে কৃষ্ণবর্ণ লোকই অধিক। তন্তুবায়, বৈশ্য, সাহা, সুবর্ণবণিক মধ্যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষ গৌরবর্ণ ও সুশ্রী। মুসলমান সমাজে কারিকর শ্রেণী মধ্যে সুশ্রী স্ত্রী পুরুষ সংখ্যা অধিক। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দরাকৃতি বিশিষ্ট। কৃষিকার্যে লিপ্ত মুসলমান মধ্যে অধিকাংশই কৃষ্ণকায়।

প্রকৃতি ঃ

এই জেলায় শিল্পী ও কারিকর শ্রেণীস্থ জাতিগণ মধ্যে অধিকাংশ আলস্যপরায়ণ ও শ্রম বিমুখ। দেশিয় কুলি মজুর শ্রেণীর লোক সকলেই সাধারণত অধিক পরিশ্রম করিতে চাহে না। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশের নানারূপ উন্নতি জন্য অগ্রসর, কিন্তু প্রকৃতি কর্মীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। স্বীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধিসহ ইহাদের অধিকাংশ স্বগ্রাম ও স্বদেশের প্রতি আসক্তিশূন্য ও ভিন্নস্থানের প্রবাসী হইতে ইচ্ছুক। যাহারা সচরাচর দেশে অবস্থান করেন তাহাদের অনেকেই নানা দলাদলিপ্রিয় ; তদ্ধেতু দেশের উন্নতি সুদূর পরাহত। শিক্ষিত লোকের যতদিন দেশের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি না হইবে ততদিন দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব। ব্রাহ্মণাদি জাতিগণ এই জেলায় অধিক শিক্ষিত হইলেও সাধারণ অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের ন্যায় ফৌজদারি না হউক দেওয়ানি মোকদ্দমায় অধিক লিপ্ত।

সাধারণ মুসলমান এই জেলায় অতি নিরীহ। চাষী গৃহস্থ মধ্যে কেহ কেহ বিশেযত উল্লাপাড়া থানার অধীন কর্ণসুতি ও শাহজাদপুর থানার অধীন কৈজুরি অঞ্চলে পাঁচিল আদি গ্রামের অনেকেই উগ্র প্রকৃতি ও দুষ্ট স্বভাব বিশিষ্ট। সাঁড়া পুলিশ স্টেশনের অধীনস্থ রূপপুরাদি অঞ্চলেও অনেক কলহ বিবাদপ্রিয় লোকের বাস। ব্যবসায়ী জাতিগণ সাধারণত শান্ত ও নিরীহ; তিলি বৈশ্য সাহা জাতিগণের অনেকেই সাতিশয় হিসাবী ও অর্থলোলুপ, কায়স্থ সমাজের (উচ্চ নিম্ন) সর্বশ্রেণী মধ্যে অনেকে কুটবুদ্ধি সম্পন্ন ও চক্রান্তকারী। ব্রাহ্মণ সমাজে অনেকেই অতি বিনয়ী ও উদার প্রকৃতি, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশই স্বার্থপর। সরকারি চাকুরিজীবীদিগের মধ্যে সর্বজাতীয় লোকই ক্ষমতাপ্রিয় ও অধিক অর্থলোভী।

অধুনা ছোট বড় করিয়া চুলকাটা, হাতে রিস্টওয়াচ বাঁধা ও গরদের চাদর আদি ব্যবহার করিয়া বাবুগিরি ও বিলাসিতা মধ্যে গণ্য, কিন্তু পূর্বে তদ্রূপ ছিল না, নিম্নের কবিতাংশে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় যথা—

আসা সোটা আরাণী বাইওয়ালি মিশ্রিদানা
চুরি বাবুরি ছোরানি এই কয়টি বাবুয়ানা।

উপজীবিকা ঃ

ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির মধ্যে অনেকে ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগী এবং চাকরিজীবী। অনেকে অধুনা ব্যবসায়াদিতে লিপ্ত। বৈশ্য সাহা তিলি কৈবর্তাদি বাবসায়ী জাতি ও কর্মকার, তন্তুবায়, সূত্রধরাদি শিল্পীগণ স্বকীর্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অনেক স্থলে চাকুরি ওকালতি

ডাক্তারি আদিতে অগ্রসর হইতেছে। হালিয়া কৈবর্ত, হালিয়া লৈর, নমঃশূদ্র, গোপাদি হিন্দুজাতিগণ ও সাধারণ মুসলমান সচরাচর কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকার্জন করে। কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পকার্য ব্যতীত অধুনা শিক্ষিত সমাজের অনেকে ব্যাঙ্ক, কলকারখানাদি নানারূপ যৌথ কারবারের উপসত্বভোগী। সাধারণ মুসলমানগণ কৃষি ও স্থানে স্থানে শিল্পজীবী হইলেও শিক্ষিত মুসলমানবর্গের অধিকাংশই চাকুরিপ্রিয়। উচ্চ নিম্ন সকল শ্রেণীর মুসলমানই শিক্ষিত হইলে জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সরকারি বেসরকারি চাকুরি অধিক ভালবাসে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—জীবজন্তু

গৃহপালিত জন্তু ঃ

দুগ্ধবতী (১) গাভী, আবাদ বুনানী জন্তু (২) বলদ বা দামড়া ও (৩) মহিষ অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়িতে বর্তমান আছে। শকটাদি চালনকার্যেও দামড়া এবং মহিষ ব্যবহৃত হয়। শ্রাদ্ধাদিতে ধর্মের (৪) ষাঁড় ছাড়িয়া দেওয়া আজকাল কমিয়া যাইতেছে। এ দেশের গাভী সাধারণত ৩/৪ সের পর্যন্ত দুধ দেয়। ইহা অপেক্ষা অধিক দুধ বিশিষ্ট পশ্চিমদেশ আগত ভাগলপুরী (বোগদা) গরু এ জেলার অনেক হাটে আমদানি হয়। (৫) পাঁঠা ও (৬) খাসি সাধারণত খাদ্য জন্য ব্যবহৃত হয়। (৭) বক্‌রি বা ছাগল দুধ জন্য পালিত হয়। (৮) মেষ বা ভেড়া কোনও কোনও গৃহস্থের বাটিতে দেখা যায়। (৯) অশ্ব আরোহণ ও গাড়ি বহন জন্য লোকে পোষণ করে। মুষ্টিমেয় জমিদার গৃহে আরোহন ও শিকার নিমিত্ত (১০) হাতি পালিত হয়। ডোম, মুচি ও পাটনি জাতীয় লোকেরা খাদ্য (১১) শূকর পালন করে। পশ্চিমা খোট্টা ধোবাগণ ভার বহন জন্য (১২) গর্দভ পোষণ করে। টম, টেনি নামক বিলাতি (১৩) কুকুর বাবুদিগের হাতে শিকল বন্ধ থাকে ও মাছ মাংস রুটিতে উদরপূর্তি করে, ভোলা, বাঘা তিলকে প্রভৃতি নামে দেশিয় কুকুর গৃহস্থের বাটিতে এক মুষ্ঠি উচ্ছিষ্ট অন্ন পারিতোষসহ আহার করিয়া দিবারাত্র প্রভুর দ্বার রক্ষা করে। (১৪) বিড়াল প্রায় সকল গৃহস্থের বাটিতে দেখা যায়। (১৫) নকুল বন্য জন্তু হইলেও অনেকে পুষিয়া থাকে। (১৬) বানর কচিৎ গৃহস্থের বাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। (১৭) হরিণ কেহ কেহ পালন করে। (১৮) খরগোস কাহার কাহার বাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। (১৯) বিলাতি ইন্দুর কেহ কেহ যত্নসহকারে পোষণ করে।

বন্য জন্তু ঃ

গ্রাম বিশেষের জঙ্গলাদিতে সাধারণ ও মধ্যমাকার (১) ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়। নিমগাছি, হাণ্ডিয়াল, মরিচপরাণ, সাঁইপাই কুয়াবাসী, প্রভৃতি গ্রামে পূর্বে ব্যাঘ্রের বিশেষ উপদ্রব ছিল। অধুনা কুঁচিয়ামোরা, ঘুরকা প্রৃতি পল্লী ব্যাঘ্রভীতি জন্য প্রসিদ্ধ। (২) মহিষ অধুনা গৃহপালিত হইলেও, পূর্বে এ দেশে (৩) হরিণ পাওয়া যাইত। হরিণাবাগবাটি (সিরাজগঞ্জ) ও হরিণডাঙা (সুজানগর) প্রভৃতি নাম হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। (৪) জেলার সর্বত্রই বন্য বরাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উৎপাতে কৃষকগণের ক্ষেত্রের ধান ইক্ষু আদি ফসলের অনেক ক্ষতি হয়। (৫) শৃগাল (৬) খাটাস (৭) কৈলঘোঁট, (৮) কেঁদো (ছোট কাল ব্যাঘ্র) প্রভৃতি বন্য জন্তু সর্বত্রই অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। (৯) সজারু ও উদ্ (১১) গাড়া, স্থল বিশেষ বর্তমান আছে।

জলজন্তু ঃ

হুরাসাগর, কুলবোরাদি পদ্মা যমুনা বৃহৎ নদীতে এবং সমাজ প্রভৃতি বিল মধ্যবর্তী অনেকানেক প্রাচীন গ্রামের পুরাতন দীর্ঘিকাদিতে বহু কুম্ভীর দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাসময়ে সাধারণ নদীতে এবং পদ্মাদি বৃহৎ নদীতে (২) শিশুক বিরাজমান। কুম্ভীর সদৃশ দীর্ঘাবয়ব লেজবিশিষ্ট এবং মাথায় ঘটযুক্ত (৩) ঘরিয়াল পদ্মা যমুনা নদীতে বর্তমান আছে। কোনও কোনও স্থানে (৪) বাঁশিয়াল দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট বড় (৫) কচ্ছপ সমস্ত নদীতে এবং বিলাদিতে বর্তমান আছে। (৭) বাঘাইর মাছ মৎস্য জাতীয় হইলেও জলজন্তু বিশেষ।

পক্ষী ঃ

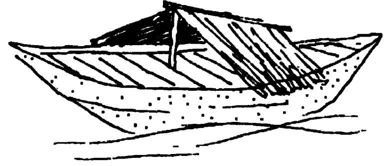
কাক, চড়ুই, শালিক, খঞ্জন, ঘুঘু, চিল, দইরাজ, বুলবুল, পারাবত, কোকিল, হাড়িচাঁচা, সাতভায়রা, হোলদে পাখি, চাতক প্রভৃতি সাধারণত লোকালয়ে দেখা যায়। বাজ, শকুনি, গৃধিনী, গাংশালিক, গোচর্খ্যা, মহিষাকবুতর, ফেঁচক্যা, ডাহুক (ডাক) প্রভতি মাঠে ঘাটে জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। মাছরাঙা, ঘোগ, পানিকাওর প্রভৃতি নদী, বিলাদি জলাশয় তীরে বাস করে, পেচক, ভুতুম, বাদুড়, কোকপক্ষী, চোকগৈল পক্ষী প্রভৃতি নিশাচর মধ্যে গণ্য এবং রাজহাঁস, পাতিহাঁস, কুক্কুট (মুরগি) গৃহপালিত পক্ষী মধ্যে গণ্য।

শিকারি পাখি—পদ্মাদি নদী চর এবং বিলাদিতে নানা জাতীয় বক, চখা, বেঙ্গীহাঁস, বেলেহাঁস, দিগরহাঁস, বাঙালহাঁস, চিনাহাঁস, ত্রিশূল সরালি, চা (নানারূপ), কোদালা, রামশালিক, ভেওয়া, কোদালে হাড়গিলা প্রভৃতি শিকার উপযোগী যে সমস্ত পাখি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে চকা ও হারগিলা ব্যতীত অন্য সমস্তগুলিই লোকের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। চকা সাধারণত মুসলমানগণই অধিক খায়। শিকারপোযোগী যাবতীয় পাখিই জলাশয় তীরে, চরে অথবা বিলে দেখিতে পাওয়া যায়। মাঠে অথবা জঙ্গলে ঘুঘু, মোসে কবুতর বা পারাবত অনেক পাওয়া যায়।

সর্প ঃ

এই জেলায় সাধারণত নানা জাতীয় গোখুরা, দাঁরাজ, নানা জাতীয় বোড়া, ঘরমোহিনী, সখিনী, কেউটা, লাউজাল, বিবরিয়া, বোড়া, চন্দ্রবোড়া, ধোড়া প্রভৃতি বহু প্রকার সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কতক ফনা বিশিষ্ট এবং কতক ফনা বিহীন। স্থানে স্থানে জঙ্গলে ও জলাশয়ে কালাই সাপ নামক এক প্রকার ১৪/১৫ হাত লম্বা এবং ২/৩ ফুট বেড় বিশিষ্ট সাপ সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত সাপ অনেক সময় ছোট ছোট বাদুড় ও বকরি পর্যন্ত গিলিয়া ফেলে। তজ্জন্য ইহারা সচরাচর অজগর নামে পরিচিত। সাধারণত রৌদ্র ও বর্ষা সময়ে এই সমস্ত সাপ বাহির হয়। এই সমস্ত সর্পের সমস্তই সরীসৃপ এবং বুকে হাটিয়া চলে, কিন্তু এতদ্ব্যতীত এ দেশের অনেক জঙ্গলে গুই সাপ নামক চতুস্পদবিশিষ্ট সাপ আছে। বাৎসরিক সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা ১ম খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় বার্ষিক প্রায় দুই শতাধিক লোক সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়



দেশের অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ—সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা

সামাজিক ঃ

বহু কুলীন ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি হিন্দু জাতি এই জেলার অধিবাসী। কেবলমাত্র রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পল্লীবাসী সাধারণে অশিক্ষিত পদবাচ্য ইতর ভদ্র জনসাধারণ ব্যতীত নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকেই প্রাচীন সামাজিক আচার নিয়ম বর্জিত, সদাচার, ধর্মাভাব ও ক্রিয়াকলাপ শূন্য। সমাজসংস্কার, সামাজিক উন্নতির চেষ্টা, বিবাহাদিতে পণপ্রথা নিবারণের আন্দোলন সর্ব সমাজে পরিলক্ষিত হইলেও অধুনা কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন আচারপদ্ধতির নানারূপ পরিবর্তন প্রয়াসী হইয়া অনেক স্থলে সন্ধ্যাবন্দনাদি বিবর্জিত হইলেও, শিক্ষিত মুসলমান সমাজে নামাজাদি প্রথার বিশেষ হ্রাস হয় নাই।

সামাজিক শাসন জন্য একঘরে করিয়া দুষ্কৃতের দণ্ডবিধান প্রথা দেশ হইতে একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। হিন্দুর মালো, নমঃশূদ্রাদি জাতিগণ মধ্যে ইহা কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হইলেও উচ্চবর্ণীয় জাতি মধ্যে আজকাল কেহ কাহাকে গ্রাহ্য করে না। মুসলমান মধ্যে সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে স্থানে স্থানে এখনও যে 'মালত' প্রথা বর্তমান আছে, তাহা গ্রাম্য দলাদলি বিশেষ। কিঞ্চিদধিক ৭০ বৎসর পূর্বে 'পাবনা দর্পণ' নামক পত্রিকার সম্পাদক পাবনা নিবাসী রামসুন্দর রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান কেবলমাত্র মদ্যপান অপরাধে সমাজচ্যুত হইয়া পাবনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নমঃশূদ্র সমাজের কোন পুষ্করিণী উৎসর্গ কালে কেবলমাত্র মন্ত্রোচ্চারণে সহায়তা করিয়া জনৈক মৈত্র উপাধিক সদ্‌ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত হইয়াছিলেন। তদ্বংশীয়গণ এখনও সোলন্দ হাটের নিকট বর্তমান আছে। এতদ্‌ সমুদায়ই পূর্বের সামাজিক কঠোর শাসনের পরিচায়ক। পুত্র কন্যার বিবাহে ও শ্রাদ্ধাদিকালে সামাজিক ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ নিদর্শন বর্তমান থাকিলেও আজকাল গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ এবং কলিকাতায় বিবাহাদি দিবার প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় এবং চাকরি আদি উপলক্ষে অনেকেই বিদেশে প্রবাসী থাকা প্রযুক্ত দেশের ও সমাজের চিরপ্রচলিত বিধি ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত হইতেছে। হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোবা, নাপিত শ্রেণী মধ্যে দাদা, খুড়াদি মৌখিক সম্বোধন ও নানারূপ প্রীতিপূর্ণ ভাব এবং গ্রাম্য সম্পর্ক সমাজ হইতে প্রায়শঃ অন্তর্হিত হইয়াছে। সাধারণ মুসলমানগণ মধ্যে এখনও ভাই, চাচা প্রভৃতি গ্রাম্য মৌখিক সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ বর্তমান আছে। পাঠান আমলে ছুৎমার্গ পরিহারকল্পে ব্রাহ্মণগণ জলপূর্ণ হুকায় তামাক খাওয়ার পরিবর্তে নস্যগ্রহণ প্রথার প্রবর্তন করেন এমত জানা যায়। অধুনা ডাক্তারি ঔষধ ও সোডা লেমনেড আদির কল্যাণে প্রাচীন ভাব কি প্রকারে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। হিন্দু সমাজ মধ্যেই উচ্চ নিম্ন সর্বশ্রেণীর জন্য পূর্বে বিভিন্ন আসন নির্দিষ্ট হইত, অধুনা স্কুল কলেজে সর্বজাতির সন্তানগণ একত্রে উপবেশনে অভ্যস্ত হইতেছে। বিগত কয়েক বৎসর হইল স্থলের হরিবাসরে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে সংকীর্তন উপলক্ষে একাসনে উপবিষ্ট হইতে কোন রূপ দ্বিধা বোধ করিতেছে না। ইহাও সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন।

নৈতিক ঃ

পূর্বে হিন্দু মুসলমান সমাজে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকই স্বীয় উন্নতিসহ সাধারণ জনহিতকর কার্যে অধিক মনোযোগী হইত ; তাহারই ফলে এই জেলায় জয়সাগর, প্রতাপদিঘি, উদয়দিঘি, উনুখাঁর দিঘি প্রভৃতি জলাশয়াদির চিহ্ন বর্তমান আছে। সৎকার্যে ও ধর্মক্রিয়ায় পূর্বে লোকের অধিক প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই জেলায় স্থানে স্থানে নবরত্ন মন্দির ও নানাস্থানে মসজিদ আদি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত আজকাল এই জেলায় বিরল। দেশের ও দশের উপকারার্থে অধুনা নানারূপ সভাসমিতির আয়োজন পূর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে বটে, তবে ইহাতে পূর্বের ন্যায় ব্যক্তিগণের আন্তরিকতার অভাব। সমবেত চেষ্টায় জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষাদিতে লোকের বিপদাপদ হইতে রক্ষার প্রবৃত্তি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের দশের ও জনহিতকর কার্য করিয়া পূর্বের রায় বাহাদুর, খাঁন বাহাদুর উপাধি লাভ করিতে হইত, আজকাল তাহা তদপেক্ষা সহজ প্রাপ্য হইয়াছে।

অতিথিসেবা ও লোককে অন্নদান সর্বত্র পূর্বে অধিক ছিল। মফঃস্বলে অধিক থাকিলেও পাবনায় অতি কম। পূর্বে পাবনায় কাঁচাখড়ের ঘরে বাস করিয়া উকিল মোক্তারগণ দরিদ্র শিক্ষার্থীগণকে আহার্য ও বাসস্থান দানে সহায়তা করিতেন ; অধুনা পাবনা দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা পরিশোভিত হইলেও বিদ্যার্থীগণের অনেক স্থলেই স্থানাভাব ঘটিয়া থাকে। সিরাজগঞ্জের আড়ত আদিতে ছাত্র রাখা ও মুসলমান সমাজে জায়গির রাখার প্রচলন আছে।

অধুনা অধিকাংশ লোক স্বীয় উন্নতিসহ স্বীয় পারিবারিক গৃহাদির সৌন্দর্যাদি লইয়া ব্যস্ত। সম্পত্তিশালী হইলেই অনেক স্থলে লোকে অন্যের সম্পত্তি গ্রাসের জন্য লালায়িত। পরের জমি কৌশলে পত্তনী লইয়া তাহাকে উচ্ছেদসাধনে প্রয়াসী। পাবনায় এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইহা আধুনিক নীতির পরিবর্তন। সামান্য কারণে জমি জমা সংক্রান্ত মোকর্দমা আজকাল জেলায় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। স্বীয় অর্থে নিজ নিজ পরিবারের নামে সম্পত্তি খরিদ কিংবা ব্যবসায় পরিচালনাদি বেনামী কারবার পরিচালনে এবং মুসলমান সমাজে সাধারণত স্ত্রীর নামে হেবানামা অথবা দেনমহর জন্য দলিল সম্পাদন কার্যে এই দেশের লোকের নীতির কিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়। নৈতিক উন্নতির প্রভাবেই অধুনা সিরাজগঞ্জের গণিকা সংখ্যা হ্রাস ঘটিয়াছে।

আর্থিক ঃ

পূর্বে ১৯১১/১২ অব্দে পাবনা জেলায় ৫০৬৫৯ টাকা ইনকাম ট্যাক্স আদায় হইত ১৯২০/২১ সালে তাহা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়া ১০০২৩২ টাকা আদায় হইয়াছে। ইহাতে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলা যায় না। বিদেশিয় লোক এই জেলাব স্থানে স্থানে কারবার করিয়া লাভবান হইতে পারে, তাহাতে দেশিয় লোকের সামান্য পারিশ্রমিক লাভ ব্যতীত অবস্থার কিছুই পরিবর্তন হইতে পারে না।

এই জেলায় ভূম্যধিকারীগণের অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল নহে। তাহাদের অধিকাংশই অল্প বিস্তর ঋণভার জড়িত। পাবনা ও সিরাজগঞ্জের অনেক ব্যাঙ্কে তাহাদের অনেকেই দায়ী। সাধারণ কৃষিজীবীগণের অবস্থাও সন্তোষজনক নহে তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। ব্যবসায়ী জাতিগণ মধ্যে তিলি, তন্তুবায়, সাহা প্রভৃতি সমাজের আর্থিক অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত। শিল্পজীবীগণ কিঞ্চিৎ স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন হইলেও তাহারা বিশেষ সমৃদ্ধ নহে। সাধারণ মধ্যবিত্ত হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ গরিব। এ দেশের লোক কী প্রকার দরিদ্র তাহা বিগত জার্মান যুদ্ধের সময় এদেশের লোকের বস্ত্রাভাবের বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জেলার অনেক গ্রামে এখনও কাবুলিগণ শীতকালে সামান্য মূল্যের শীতবস্ত্র ভাদ্র মাসে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ মূল্যে পাইবার চুক্তিতে বিক্রয় করিয়া থাকে। পাবনার "সুরাজ" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত **দেশের কথা** শীর্ষক প্রবাসী— ভাদ্র—১৩২৫ সাল দ্রষ্টব্য।

"From a Correspondent

Ullapara, Pabna, May 20, 1918

A young cultivator of the village Rakhalgachi in the jurisdiction of Ullapara Police Station in the district of Pabna, has committed suicide. It is revealed in the investigation held by the police into the cause of his death that the deceased could not supply his wife with a cloth which she badly needed. The investigating Sub-inspector Babu Bibhuti Mohan Bose, out of compassion paid to the wretched widow one rupee which he had with him to help her for purchasing a cloth." *vide. Bengalee 7.6.1918*

তাৎপর্য উল্লাপাড়া থানার রাখালগাছি গ্রামের জনৈক কৃষক স্বীয় পরিবারকে বস্ত্র প্রদানে অক্ষম হইয়া আত্মহত্যা করে। দারোগাবাবু তদন্তকালে বিধবাটিকে কাপড় খরিদ জন্য একটি টাকা প্রদান করেন।

পাবনা জেলা ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে সানুকল এবং এখানে নানারূপ সুবিধা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এ জেলার তিলি, সাহাদি জাতিগণ ব্যতীত অন্যান্য জাতিগণ মধ্যে কেহই বিশেষভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত নহে। শিল্পকার্যের অনেক সুবিধা থাকিলেও শিল্পীগণ আলস্যপরায়ণ, ব্রাহ্মণাদি জাতিগণ আভিজাত্যাভিমানী। মুসলমানগণ মধ্যে অনেক ফরিয়া ব্যাপারী সাধারণ পাইকের বর্তমান থাকিলেও বড় ধনাঢ্য মহাজন কেহ নাই। শিক্ষিত মুসলমানের সকলেই চাকুরি প্রয়াসী, সিরাজগঞ্জ বেড়াদি বন্দরের অধিকাংশ মহাজন বিদেশবাসী প্রবাসী, তাহাদের উপার্জিত অর্থ জেলার বাহিরে চলিয়া যায়। জেলার আর্থিক অবস্থার তাহাতে কিছুতেই উন্নতি হয় না। অধুনা পাবনায় মোজা গেঞ্জি প্রভৃতি জন্য যে সমস্ত যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে দেশে ধনাগমের পথ বিশেষ উন্মুক্ত না হইলেও ইহাতে অনেকের জীবিকার্জনের পথ সুগম হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক দ্বারা লোকের অনেক উপকার হইলেও পাবনায় বহুদিন হইতে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ও ধনভাণ্ডারাদি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে দেশের আর্থিক বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই বরং দেশের জমিদার ও মধ্যবিত্ত লোক তদ্বারা অধিক ঋণজালে বিজড়িত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—লোকের সুখ শান্তি

অধুনা নানা কারণে আর্থিক অশান্তি বর্তমান থাকিলেও সর্বত্র নিঃশঙ্কচিত্তে বসবাসের ও নিরাপদে পথেঘাটে যাতায়াতের অনেক সুবিধা ঘটিয়াছে। পূর্বের ন্যায় দেশব্যাপী অরাজকতা অনেক হ্রাস হইয়াছে। পাবনা জেলার চলন বিল মধ্যে পূর্বে শ্যামরামা নামক দুইজন প্রসিদ্ধ জলদস্যুর বিশেষ উপদ্রব ছিল ; তাহারা পাবনা, বগুড়া ও রাজশাহী জেলার সীমা মধ্যে ডাকাইতি করিত। রায়গঞ্জ থানার পিল্লা নামক স্থানে তাহাদের যে আশ্রয়স্থল ছিল, তাহা অদ্যাপি শ্যামারামার ভিটা বলিয়া খ্যাত। দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় তৎকৃত 'সামাজিক ইতিহাসে' ৭০/৭১ পৃষ্ঠায় শ্যামারামাকে বারেন্দ্র কায়স্থ এবং "তাহাদের বংশীয়রা এখনও অষ্টমনীষা গ্রামে বাস করিতেছে" এমত নির্দেশ করিয়াছেন। চলন বিলের মধ্যে পণ্ডিতা ডাকাইত বা পণ্ডিত সা নামে ও জনৈক ব্যক্তি অনুপনারায়ণ মুনসির সহায়তায় পাবনা ও বগুড়া জেলা মধ্যে জলপথে ও স্থলপথে ডাকাইতি করিয়া লোকের উপর নানা অত্যাচার

করিত। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে ধৃত হইয়া তাহার যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। অনুপ মুনসি ও তদীয় ভ্রাতা নাটোর জেলে নয় বৎসর জন্য কারাদণ্ড ভোগ করে। আবার জানা যায়, মোঘল আমলে বেণী রায় নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ চলন বিল মধ্যে নানা জাতীয় চেলা জোটাইয়া তাহাদের সহ ডাকাইতি করিত। তাহাকেও লোকে পণ্ডিত ডাকাইত বলিত। তাহার বাসস্থান তাড়াসের পশ্চিমে কোহিত নামক গ্রামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। পূর্বে পদ্মাদি নদীপথে আরাকান প্রদেশস্থ মগ জাতীয় দস্যুগণ এ দেশিয় লোকের উপর সময় সময় নানা অত্যাচার করিত তাহা সাধারণত **মগ আক্রমণ** বলিয়া পরিচিত। ইহাদের অত্যাচার হইতে দেশের লোককে রক্ষা কল্পে দেশিয় ভূম্যধিকারীগণ স্থানে স্থানে লোককে যে সকল জায়গির দান করিত, তাহা অদ্যাপি 'মগ জায়গির' নামে খ্যাত হয়। পাবনা হইতে প্রায় ৬ মাইল পশ্চিমাংশে পদ্মার চরে কামালপুর নামক গ্রামে এরূপ জায়গিরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গামছামোড়া দলের প্রাদুর্ভাব পাবনা জেলার পূর্বাংশে যমুনা নদী তীরে অনেক গ্রামে থাকা জানা যায়। শিবপুরের মৈত্র বংশ **গামছামোড়া** দলের অধিনায়ক ছিলেন। নাজিরগঞ্জ বরখাপুরেরও কাহার কাহার গামছামোড়া দলে লিপ্ত থাকার প্রসিদ্ধি আছে।

আধুনিক কালের এই জেলার প্রসিদ্ধ ডাকাইত মধ্যে নলকা নিবাসী **মহর খাঁ** নামক মুসলমান জাতীয় ডাকাইত সবিশেষ পরিচিত। ১৯০০ অব্দে পাবনায় বিচার হইয়া তাহার যাবজ্জীবন দীপান্তর হইয়াছে। বর্তমানে দেশে পুলিশ বিভাগের কঠোরতা সত্ত্বেও এই জেলার উল্লাপাড়া ও শাহজাদপুর থানার কতকাংশে অনেক চোর ডাকাইতের বাস। পাবনার দায়রা মোকদ্দমায় এই সমস্ত স্থানের অধিবাসীই অধিক আসামি হইয়া থাকে। রূপপুরের (সাঁড়া) অনেকেও সময় সময় ডাকাইতি মোকদ্দমায় লিপ্ত হইয়া থাকে।

জলপথে ও স্থলপথে উভয়ত্রই অধুনাও চুরি ডাকাইতির প্রাদুর্ভাব আছে বটে, তবে পূর্বে যেমন সর্বসাধারণ লোকে যথাতথা গমনাগমন ও নির্বিঘ্নে বসবাসের অসুবিধা ভোগ করিত, এক্ষণে তাহা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—প্রাকৃতিক বিপ্লবাদি

জলপ্লাবন ঃ

১২৭৬ সালের জলপ্লাবনে পাবনার বিশেষ ক্ষতি হয়। ১২৯৭ সালে পাবনা সদরে ইছামতীর জলপ্লাবনে শহরের অনেক পাকা কাঁচা রাস্তা ভাঙিয়া যায়। সরকারি কাছারি গৃহ রক্ষাকল্পে ইছামতী নদীর তীর দিয়া শহরের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের কতক স্থানে এক মাইল বিস্তৃত একটি অ্যাম্বাঙ্কমেন্ট নির্মিত হয়। ১৩১৩ সালে এইজেলার পুনরায় অতিবৃষ্টি নিবন্ধন ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছিল। তাহাতে সমগ্র জেলার বিশেষ অনিষ্ট হয়। ১৩৩০ সালে ভাদ্র আশ্বিন মাসে জলপ্লাবনে জেলার অনেক ফসল ও লোকের গৃহাদি বিনষ্ট হয়। সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেললাইন ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই জলপ্লাবনে গৃহহীন নিঃস্ব ব্যক্তির সাহায্যার্থে মাননীয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় পাঁচ শতাধিক মুদ্রা সাহায্য করেন।

দুর্ভিক্ষ ঃ

১৮৭৪ অব্দে নৈসর্গিক অবস্থা বিপর্যয়ে আউস আমন ধান সাধারণ বৎসর অপেক্ষা

অর্ধেক এবং রবি শস্য ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ মাত্র জন্মে জন্য পাবনা জেলার ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই সময় চাউল প্রতি মন চারি টাকার উপর দরে বিক্রয় হইতেছিল। গভর্নমেন্ট হইতে ৮৩০০০ টাকা সাহায্য দান এবং ২৮০০০ টাকায় রাস্তাদি নির্মাণ কার্য সমাধা হইয়া মোট ১১১০০০ টাকা দুর্ভিক্ষ সময় ব্যয় হয়। তৎপূর্বে ১৮৬৯-৭০ অব্দে (১১৭৬ সালে) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তখন টাকায় ১২-১৩ সের চাউল বিক্রয় হইয়াছিল।

বিগত ১৯২১ অব্দে জার্মান যুদ্ধ কাল হইতে দেশে সর্বপ্রকার জিনিস অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এমনকী, এই জেলার অনেকে কচু খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে। "পাবনা বগুড়া হিতৈষী" বলেন—"পাবনা জেলার প্রায় সমগ্র লোকের মধ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বহু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবার অনাহারে দিন যাপন করিতেছে। কৃষক ও মজুরদল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। কোনও স্থানে একটি টাকাও ধার মিলিতেছে না। ঘটি, বাটি, লাঙল, গরু প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া এতদিন কোনরূপ দিন যাপন করিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে কিছুতেই মিলিতেছে না। কোনও কোনও স্থানে কচুও মেলাও ভার হইয়া উঠিয়াছে। দুই তিনদিন অনশনে থাকিয়া তাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতেছে।"

প্রবাসী—আশ্বিন—১৩২২ সাল দ্রষ্টব্য

১৩২৬ সালে চাউলের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া মোটা চাউল যখন আট টাকা মন দরে বিক্রয় হইতে থাকে, তখন পাবনা টাউন হলে সভা করিয়া বাজার দর কমান ও সুস্থির করা জন্য নানা আয়োজন হয়, কিন্তু তাহাতে কোনও সুফল হয় নাই। অধুনা পাবনা বাজারে মোটা চাউল ৭।৹ দরে খুচরা বিক্রয় হইতেছে। ক্রমে লোকে সকল অবস্থা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছে।

ঝটিকাবর্ত ঃ

১২৬৯ সালে ২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে নিম্নবঙ্গের প্রবল ঝড়ে পাবনা জেলার অনেক ক্ষতি হয়। ইহা সাধারণত 'জৈষ্ঠ্য ঝড়' নামে খ্যাত। তাহার দুই বৎসর পরে ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসে ভীষণ ঝটিকাবর্ত পাবনা জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়। ইহাতে পাবনার বিশেষ অনিষ্ট হয়। ইহা সাধারণত 'আশ্বিনা ঝড়' নামে খ্যাত। ১৮৭২ অব্দে ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ঝড়ে পাবনা ও সিরাজগঞ্জের অনেক অনিষ্ট সাধিত হয়। লোকের বাড়ি ঘর অনেক ভূমিসাৎ হয়। ১৩২৪ সালের আশ্বিন মাসে, লক্ষ্মী পূর্ণিমার দুই দিবস কাল স্থায়ী প্রবল বাত্যা ও বৃষ্টিতে পাবনা সদরের অনেক ক্ষতি হয়।

ভূমিকম্প ঃ

১৮৪২ অব্দের ভূমিকম্প এই জেলায় অনেক ক্ষতি করে। ১২৯২ সালে রথযাত্রার দিন সকালে ও বিকালে দুইবার ভূমিকম্পে পাবনার অনেক অনিষ্ট করিয়াছে। ১৩০৪ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বেলা পাঁচটার সময় যে প্রবল ভূমিকম্প হয় তাহাতে পাবনার অন্যান্য ক্ষতি মধ্যে সিরাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ জুটমিল একেবারে বিনষ্ট হয় এবং তথাকার ইলিয়ট ব্রিজ বক্রাকার ধারণ করে। এই ভূমিকম্প কালে এই জেলার অনেক নদী ও জলাশয় গর্ভ হইতে ছাই, কৃষ্ণবর্ণ বালুকারাশি উত্থিত হয়। নদী বিল প্রভৃতির তলদেশ অনেক স্ফীত হইয়া উঠে এবং কোন ক্ষুদ্র নদী একেবারে জলশূন্য হইয়া যায়। অনেক কূপ, ইন্দারা একেবারে বন্ধ হয়। সিরাজগঞ্জের ইতিহাস হইতে নিম্নে ভূমিকম্পের একটি গান উদ্ধৃত হইল।

সাধের ভূমিকম্প এসে পড়লো খসে
দিন দুনিয়া এক সমান।
ছুটলো বুঝি দোজকের কামান।

কত পাহাড় ফেটে ভেসে এল বান　　মহিষ গরু মরে ধরল উজান।
ব্রহ্মপুত্র যমুনার পানি পদ্মার জল ধরিছে উজান।
এখন বুঝি যায়রে পরাণ
চর পড়ে ত নদী ধরল্ উজান।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ — ক্রীড়া ও ব্রতপূজা

ক্রীড়া ঃ

মালাম ঃ

পাবনা জেলায় ৩০ আশ্বিন ‘গারসির’ দিন বলিয়া পরিচিত। এই দিনে সাধারণ হিন্দু মুসলমানগণের অনেকেই কুস্তি ও মল্ল ক্রীড়াদি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই মল্ল ক্রীড়া সচরাচর এই জেলায় “মালাম” নামে খ্যাত এবং যাহারা ইহাতে বিশেষ অভ্যস্ত তাহারা “মাল” নামে অভিহিত হয়। লক্ষ্মীকোল গ্রামে এখানে অনেকের “মাল” উপাধি বর্তমান আছে। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবার গৃহে মাল বা মল্লগণ ওই দিনে নানারূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে।

লাঠিখেলা ঃ

পাবনা জেলার লাঠিখেলা প্রসিদ্ধ ; হাটখালির লাঠিয়ালগণের বিশেষ সুনাম আছে। উপরোক্ত গারসি ও মহরম সময়ে সর্বত্রই লাঠিখেলার প্রচলন আছে। সাধারণত মুসলমানগণ এই খেলায় অভ্যস্ত। পূর্বে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুও এই খেলায় প্রসিদ্ধ ছিল

নৌকাবাইচ ঃ

নদীবহুল দেশে নৌকাচালনে এ দেশের মফঃস্বলের লোক বিশেষ অভ্যস্ত। দুর্গোৎসব সময়ে পোতাজিয়া গ্রামের নৌকাবাইচ প্রথা ও পানসি নৌকার সাজ ও সারি গানের আমোদ বহুদিন হইতে প্রচলিত। শাহজাদপুর কৈজুরি প্রভৃতি হাটে যাইতে হাটুরিয়া নৌকার বাইচ ও প্রতিযোগিতার অনেকে প্রমোদ উপভোগ করে।

মাছমারা ঃ

পলো লইয়া মাছমারা এ দেশের লোকের একটি প্রাচীন আমোদ। মহিষের সিঙা বাজাইয়া সকলে একত্রিত হয় এবং একখানি লাঠি ও পলো কাঁধে বিল জলাশয়াদিতে “বাহুত” নামে শতাধিক লোক একত্রিত হইয়া মাছ ধরে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রথায় মাছমারা ও ধরিবার প্রথা যথা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

ঘুড়ি উড়ান ঃ

এ দেশে বালকগণ মধ্যে শীতকালে ডবল ও একুরা (১) চিলা ঘুড়ি বা চলিত ভাষায় ঘুন্নি উড়ান প্রথা আছে। ইহা একটি প্রধান ক্রীড়া বা আমোদ মধ্যে গণ্য। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ছোট বড় (২) কোঁয়ারা (৩) ঢাউস (৪) সাপ (৫) বাক্স (৬) ফেচকা (৭) কাছে, নামধেয় নানা প্রকার ঘুড়ি উড়ানের আমোদ সর্বত্রই অল্পবিস্তর প্রচলিত। চিলাঘুড়ি কেবলমাত্র গুটি সুতায় এবং অন্যান্য সবগুলি গুণ বা কাটিমের সুতা দ্বারা উড়ান হয়।

বিবিধ ক্রীড়া ঃ

হাডুডুডু বা হৈলডুবি অনেক স্থলে প্রচলিত। ডাণ্ডাগুলি, কড়িখেলা, লাটিমকাচ্চা প্রভৃতি

বালকগণ মধ্যে, তাস আবালবৃদ্ধবণিতা এবং পাশা দাবা যুবক ও বৃদ্ধগণ মধ্যে দেখা যায়। তুরমি খেলা কোথায় কোথায় প্রচলিত আছে। মেলাদিতে জুয়াখেলা হয়। চান্দাইকোণায় পৌষ পার্বণ সময়ে চিঠি খেলায় বিশেষ সমারোহ আছে। অধুনা স্কুল কলেজে ক্রিকেট খেলা বেশি দেখা যায় না, ফুটবল খেলাই অধিক সময় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। ফুটবল ম্যাচ অনেকস্থলেই দেখা যায়। টেনিস খেলাও শিক্ষিতগণ মধ্যে প্রচলিত আছে।

ব্রত পূজাদি ঃ

ইটকুমারী পূজা—ফাল্গুন মাসে স্থানে স্থানে বালক বালিকাগণ মধ্যে এই পূজা প্রচলিত। মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিন মৃৎবেদীর উপর কদলী বৃক্ষ রোপণ করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় আলোকজ্জ্বল প্রদীপ প্রদানে সিমূল, পাঙ্গে প্রভৃতি গাছের ফুল দ্বারা ইহার পূজা হয়। সাধারণত শীতলা দেবীর উদ্দেশ্যে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় বটে, তবে পূজার মন্ত্র—

‘ইটাকমরের মাও (মা) লো ভিটা বাঁধে’ দে
তোর ছাওয়ালের বিয়ে হবি সাজনে আনে’ দে
....
এবার যাওরে ঠাকুর তুমি ফোঁট পচার নিয়ে
আর বার আইস ঠাকুর তুমি শঙ্খ সিন্দুর নিয়ে”

মধ্যে ঠাকুর আখ্যা হইতে ইহা দেবী উদ্দেশ্যে না হইয়া কোন দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত পূজা বিশেষ বলিয়াই অনুমান হয়।

মনসা পূজা—শ্রাবণ মাসে নাগ পঞ্চমী তিথিতে সর্পাঘাত নির্বারণ জন্য ঘট মালসাদি দ্বারা মনসা পূজা এ দেশে প্রচলিত আছে। এই পূজায় মুসলমানগণ অনেক স্থলে যোগদান করে এবং তাহাদের অনেকে এই পূজায় মনসামঙ্গল গান করিতে থাকে।

দুর্গোৎসব পূজা—পাবনায় দুর্গোৎসব পূজায় বিশেষ সমারোহ হয়। পাবনা টাউনে সাহা, তন্তুবায়দিগের বাড়িতে ও সোহাগপুরে এই পূজার সমারোহ আছে। সাধারণত হরিৎবর্ণ দশভূজা মূর্তির পূজা সর্বত্র দেখা যায়। কিন্তু স্থলনওহাটার হরিদেব বংশীয় সকলের বাড়িতেই কৃষ্ণবর্ণ ভগবতী মূর্তির পূজা হয়।

পাবনা জেলায় দুর্গোৎসব পূজার যে একটি রূপক গল্প বহুদিন হইতে শুনিতে পাওয়া যাইত ইহাতে পাবনার স্থল বিশেষের দুর্গোৎসব পূজার সমারোহ অবগত হওয়া যায়। গল্পটি এই—একদা মহামায়া সদলবলে সাঁড়াঘাটে অবতরণ করিয়া কে কোথায় যাইবেন তাহা সুস্থির ও পরামর্শ করিতেছেন। **ভগবতী** কহিলেন “আমি তাঁতিবন্ধ যাইব, তথায় বিজয়গোবিন্দ চৌধুরি, আমাকে অতি সমাদর করে।” **লক্ষ্মী** বলিলেন, “আমি পাবনা শালগাড়িয়া লক্ষ্মী প্রামাণিকের বাড়িতে একদিন থাকিয়া পরে পার্শ্বডাঙায় যাইব।” এইরূপে ভগবতী ও লক্ষ্মী আপন গন্তব্য স্থান নির্ণয় করিলে সরস্বতী গণেশাদি তখন নৌকা ভাড়া করিয়া পদ্মা ভাটি দিতে আরম্ভ করিলেন। **সরস্বতী** বলিলেন, “আমি ভারেঙ্গায় যাইব, তথায় পিতাম্বর চক্রবর্তী মহাশয়ের পুত্রগণ আমার পরম ভক্ত।” **কার্তিক** কহিলেন, “আমি ভারেঙ্গার নিকট গোপীনাথপুরে থাকিব, তথাকার শূদ্র যাজক ব্রাহ্মণগণের অনেকেরই পরিবার নাই। বা বিবাহ করে না। আমার দশাও তদ্রূপ।” **গণেশ** কহিলে, “আমি এবার পোরজনায় যাইব, কারণ সকল দেবতার পূর্বে পূজাপ্রাপ্তি আমার সনাতন প্রথা ও ভোগের আগে প্রসাদ পাওয়াও আমার সুচির অভ্যাস, সেখানে গেলে ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্বেই খাবারের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং পোরজনা আমার অতি প্রিয় স্থান হইবে।” **শিব** কহিলেন, “আমি কোথায়ও যাইব না, বরাবর সাফাল্লায় যাইব। তথায় হরিপ্রসাদ (হরিপ্রসাদ রায়) আমার পরম ভক্ত ; সে উত্তম কালওয়াত ও হামানদিস্তায় গাঁজা শোধন করতঃ আমার ভোগে লাগায় এবং দৈনিক একতোলা ছয় আনা

আফিম আমার মৌতাতের জন্য বরাদ্দ করিয়া থাকে।" **ষাঁড়** কহিলেন, "আমি প্রভুর নিকট বাগকাশীনাথপুরেই থাকিব, কারণ আমি তথায় নিজ মনে বিচরণ করিতে পারিব, হিসাব নিকাশের কিংবা বিদ্যা বুদ্ধির ধার ধারিব না।" **নন্দী** কহিলেন, "আমি বেশি দূরে গেলে, আমার বলদটা রাখে কে, সুতরাং আমি সাগোতা গ্রামে দেওয়ানজি ভগবান পালের বাড়িতেই থাকিব।" **সর্প** বলিল, "আমি একেবারে তাড়াস মরিচপূরাণ অঞ্চলে চলিয়া যাইব আমার কোন দিন আহার হইলেও চলে, না হইলেও চলিবে। সেখানে পূজার কোনও বাড়াবাড়ি নাই, তথায় পোকামাকড় ধরিয়া খাইব।" **অসুর** বলিল, "আমি সলপ যাইব, তথায় শৌর্য-বীর্যের আধিক্য আবশ্যক।" **সিংহ** বলিল, "আমি শিবপুর দিয়া রূপপুরের নিকটেই থাকিব, কারণ অন্যের ঘাড়ে কামড় না দিলে আমার চলিবে না।"

চৈতপূজা ও দেউলোৎসব—এই জেলার সর্বত্রই চৈত্র সংক্রান্তিতে চৈতপূজা বা পাটঠাকুর পূজা প্রথা প্রচলিত আছে। সাধারণত বারুণি গঙ্গাস্নানের দিন হইতে এদেশের যোগী নমঃশূদ্র ও পল্লীর নানাজাতীয় হিন্দুগণ মিলিত হইয়া এই উৎসব আরম্ভ করে ও সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যায় কাষ্ঠনির্মিত "পাট" তৈল সিন্দুর সিক্ত করিয়া পূজা করে। এই পূজায় ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ব্যতীত নবশাক জাতি ও উপরোক্ত জাতিগণই অধিক যোগদান করে। সর্বাপেক্ষা বোঁথড় গ্রামে এই পূজার ধূম বেশি। হবিষ্যান্নভোজী সন্ন্যাসীগণ ধুপতি হাতে নিম্নলিখিত গান আবৃত্তি করে—

(বল ভাই) "হরগৌরীনাথ পার্বতীনাথ
শিব শিব মহাদেব।"

স্থলবিশেষে অনেকে বোলান বা বালাকি গান করে এবং ঢাকের বাদ্যসহ কেহ কালী, কেহ শিবমূর্তি ধারণপূর্বক তালে তালে নৃত্য করিয়া থাকে। চৈত্র সংক্রান্তি দিনে চড়কপূজায় পিঠ ফোড়নের প্রথা সদিয়াচাঁদপুর অঞ্চলে এখনও বর্তমান থাকা শুনিতে পাওয়া যায়। এই চৈতপূজা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্মাচার বলিয়া অনুমিত হয়।

বিবিধ পূজা—এই জেলায় বট ও অশ্বত্থ তলে গ্রামের প্রান্ত ভাগে (১) পঞ্চানন্দ **গাছ** পূজা হয়। এই পূজায় সদ্যজাত শিশুর কেশ কর্তন ও শিরঃমুণ্ডন হইয়া থাকে। স্থলে স্থলে শরাবৃক্ষ তলে (২) সিদ্ধেশ্বরীতলা আছে, তথায়ও লোকে এইরূপ পূজা দিয়া থাকে। (৩) নিমগাছি অঞ্চলে ভাদ্র মাসে **ডাল** পূজার বিশেষ উৎসব আছে। পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে (৪) **বাস্তু পূজার** উৎসব ভূম্যধিকারিগণ মধ্যে প্রচলিত। জালিক ও মহাজন শ্রেণী কর্তৃক দশহরা ও অন্য সময়ে (৫) **গঙ্গাদেবীর** পূজা হয়। পোতাজিয়া শাহজাদপুর অঞ্চলে কলেরাদি মহামারী উপস্থিত হইলে মাঠের মধ্যে (৬) **হাওয়া** দেবীর পূজা প্রথা প্রচলিত আছে। গো কূলের উন্নতিসাধন জন্য এ দেশের হিন্দু-মুসলমানদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে গাভী প্রসবান্তে পরবর্তী রবিবারে ঢ্যাওপাড়ান এবং একমাস পরে (৭) **গো-রক্ষনাথের** পূজা বা ধারশোধ দেওয়া প্রথা এই জেলার সর্বত্র প্রচলিত আছে। সন্ধ্যাকালে প্রতিবেশিদিগকে একত্রিত করিয়া গাভীর দুগ্ধের খিরসা ও মিষ্টান্নাদি দিবার রীতি এবং বাগলাডু খাইবার প্রথা অনেক স্থলেই প্রচলিত আছে। এই পূজার প্রচলিত ছড়া সাধারণত গোরক্ষনাথের পাঁচালি নামে পরিচিত। *ইহার বিস্তারিত বিবরণ জন্য প্রবাসী—কার্তিক ১৩২৯ সাল ও প্রবাসী—পৌষ—১৩২৮ সাল দ্রষ্টব্য।*

কালী পূজা জেলার সর্বত্র প্রচলিত। সর্বত্রই চতুর্ভুজা দক্ষিণাকালিকা মূর্তির পূজা হয়। শ্মশানকালী দ্বিভুজা, সদিয়া চাঁদপুরে ষড়ভুজা কালিকা পূজা হয়। কলেরাদি মহামারী সময়ে রক্ষাকালী পূজা এদেশে প্রচলিত আছে। অগ্রহায়ণ মাসে যে নাটাই পাটাই পূজা এই জেলার নানাজাতিগণ মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধাচারের নিদর্শন বলিয়া অনুমিত।

উৎসব—রথযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, পুষ্পদোল, লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকপূজা, বাসন্তীপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে এই জেলার স্থানে স্থানে বিশেষ আমোদ উৎসব হইয়া থাকে।

নষ্টচন্দ্রা ও হরিতালিকা দিনে বালকগণ যে কৌতুক ও আমোদ উপভোগ করে তাহা অনেক সময় লোকের অনিষ্টকারক।

ব্রত—এই জেলার ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি, নবশাক এবং সাহা সম্প্রদায় মধ্যে অমাবস্যা ব্রত, যমপুকুর, পুণ্যপুকুর, অশোকষষ্ঠী, জামাইষষ্ঠী, চাপড়ষষ্ঠী, সাবিত্রী, রামনবমী, সম্পদনারায়ণ, জন্মাষ্টমী, মঙ্গলচণ্ডী, শুভচণ্ডী, কুলাইচণ্ডী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি ব্রত পূজাদি সর্বত্র বিদ্যমান আছে। কার্তিক মাসে আকাশ প্রদীপ দেওয়া এবং পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিনে গাভী ছাড়িয়া দিবার ও তাড়ানের প্রথা বর্তমান আছে।

বাসগৃহ—সাধারণত পল্লীবাসী উলুখড় নির্মিত 'বাঙ্গালা' 'চৌরী' কাঁচাগৃহে বাস করে। কেনেস্তারা ও করগেট টিনের গৃহ ৩০/৩৫ বৎসর মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। ধনী লোক দালানে বাস করে। অতি পূর্বে এ দেশে মাটি কোঠা প্রচলিত ছিল। অধুনা ডেমরায় কোঠার নিদর্শন আছে। কপাট জানালার ব্যবহার সর্বত্রই আছে। গরিব লোক চাটাই নির্মিত বেড়া বা ঝাঁপ কপাটের পরিবর্তে ব্যবহার করে।

পরিচ্ছদ—ধুতি, চাদর, সার্ট, কোর্ট, সাধারণ ব্যবহৃত পরিচ্ছেদ। মোজা, গেঞ্জি, সোয়েটার, শাল, আলোয়ান, বালাপোষ, দেশি চাদর ও খদ্দরের চাদর শীতের ব্যবহার্য। উকিল মোক্তারগণ ও অফিসারগণ কোর্ট-প্যান্ট ও চোগা চাপকান ব্যবহার করেন। মুসলমানের মধ্যে অনেকে পায়জামা, চাপকান, সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকের অনেকে প্যান্ট চোগাচাপকান মজলিস দরবারে ব্যবহার করেন। ধুতি, গামছা সাধারণ গৃহস্থের সর্বদা ব্যবহার্য পরিধেয়। চাদর, দোহরাদি তাহারা শীতকালে ও অন্য সময়ে ব্যবহার করে। শাড়ি, সেমিজ, বডি, লেডিগেঞ্জি, স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ। সাধারণ মুসলমান স্ত্রীলোকেরা দেশি তাঁতে তৈয়ারি দোবরা নামক মোটা কাপড় ব্যবহার করে।

পাগড়ি ক্কচিত ব্যবহৃত হয়। মুসলমানের ইতর ভদ্র সকলেই নানারূপ টুপি ব্যবহার করিয়া থাকে। সাধারণ লোকেরা সচরাচর ব্যবহার না করিলেও নামাজ সময়ে ব্যবহার করে।

খাদ্য ও স্বাস্থ্য ঃ

খাদ্য—দেশি মোটা বরণ ও আউস ধান-জাত চাউল এ জেলার লোকের প্রধান খাদ্য। আজকাল দেশি চাউল কম পাওয়া যায়, মালদহ নবাবগঞ্জের চাউল সর্বত্র আমদানি হইতেছে। নানাপ্রকার মৎস্য ও ডাউল এবং তরকারি খাদ্যের উপকরণ। দুগ্ধাদি গব্য দ্রব্য অধুনা শহরে ক্রমশ মহার্ঘ্য জন্য সকলের পক্ষে উপযোগী নহে। রুটি লুচি এ দেশের লোক কম ব্যবহার করে। বিবাহাদি ব্যাপারে নিমন্ত্রণে লুচিমিঠাই ব্যবহারের প্রচলন আছে। খিচুরি পোলায়াদিও স্থলে স্থলে খাওয়ার রীতি আছে। মাংসাদি মধ্যে পাঁঠা, খাসি, মুরগি আদির ব্যবহার বেশি।

রুটি, বিস্কুট, চা, সোডা লেমনেড অধুনা সর্বত্র প্রচলিত। মদ্যপান অল্পবিস্তর দেখা যায়। নিমগাছি অঞ্চলে মুণ্ডাজাতীয় লোকের মধ্যে পচাই নামক দেশিয় প্রথায় তৈয়ারি মদ্যপানের অধিক রীতি আছে। মদ্য গাঁজা আফিমাদি বিক্রয় হইতে এই জেলায় বার্ষিক গড়ে দুই লক্ষাধিক টাকা গভর্নমেন্টের আয় আছে। তামাক সিগারেট বিড়ি সর্বত্র প্রচলিত।

স্বাস্থ্য—এই জেলার স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ নহে। ১৮৯৭ অব্দের ভূমিকম্প হইতে এই জেলার স্বাস্থ্য অনেকাংশে উন্নত হইয়াছিল। এই জেলার অনেকস্থল বিল নদী নালা বেষ্টিত জন্য বার্ষিক পশ্চিমাংশ হইতে পূর্বাংশ দিয়া জলরাশি বহির্গত হইয়া যায় সে জন্য স্বাস্থ্যের অনেকাংশে উন্নতি হয়। ইহাতে দেশের জমিও সারবান হয়। কিন্তু জলের গতি বন্ধ হইয়া বিলাদিতে পরিণত হইলে দেশে নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে। দেশের লোকে নানাপ্রকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চলনবিল বড়বিলের মধ্যে ও করতোয়া প্রদেশস্থ নিমগাছি, হাণ্ডিয়াল, বাঘলবার, সিদ্ধিনগর প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক স্থলে বহু প্রাচীন দীঘি, পুষ্করিণী, মন্দির মসজিদ ও পাকা ইষ্টকালয়াদি দর্শনে অনুমিত হয়, পূর্বে এই সমস্ত স্থান অতি স্বাস্থ্যকর ছিল। তথায় অনেক সমৃদ্ধশালী

লোকের বাস ছিল। কালে তথাকার স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় কালক্রমে তথাকার অবনতি ঘটিয়াছে।

ব্যাধি—(১) ম্যালেরিয়া জ্বর এই জেলার ব্যাধি মধ্যে সর্বপ্রধান। ইহাতে বার্ষিক গড়ে হাজার করা ২৬.৬০ জন মারা যায়। কালাজ্বর অধুনা দেখা যাইতেছে। (২) কলেরা সাধারণত শরৎ ও গ্রীষ্মকালে অধিক দেখা দেয়। বার্ষিক গড়ে হাজার করা ১.৯২ জন মরে। কোনও কোনও সময়ে গ্রাম বিশেষে শতকরা ৫০/৫২ জন লোকও মরিতে দেখা যায়। (৩) বসন্ত খোযপাচড়া প্রভৃতি ব্যাধি এই জেলার সর্বত্র দেখা যায়। বসন্ত কোনও সময় সংক্রামক আকার ধারণ করে। (৪) আমাশয় কোনও কোনও সময় সংক্রামক হইয়া থাকে। হুরাসাগর নদীর পূর্বপার হইতে যমুনা নদী পর্যন্ত জেলার উত্তর দক্ষিণ সমস্ত ভূ-ভাগই অল্প বিস্তর (৫) গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগের প্রাদুর্ভাব আছে।

অধুনা এই জেলার সর্বত্রই কালাজ্বর অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে। ডাক্তাররা ইহার প্রতিকারার্থ কেবলমাত্র ইনজেকশন ব্যবহার করিতেছেন। একটি রোগী জন্য সময় সময় প্রতিবারে ২ টাকা হইতে ৪ টাকা খরচে ৩০-৩৫টি ইনজেকশন লইয়াও অনেকে সুফল পাইতেছেন না। পাবনা হিতসাধনমণ্ডলীতে বিনা খরচে ইনজেকশনের ব্যবস্থা আছে।

বসন্ত রোগের প্রতিশোধক টিকা দেওয়া জন্য ডিঃ বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ব্যবস্থা আছে। সাধারণত ছোট বালকগণের জন্য টিকা দেওয়া বাধ্যকর। সচরাচর লোকে বসন্ত ব্যাধি না হইলে টিকাদি লইতে চাহে না। ১৯১৬-১৭ (৬২০৭২), ১৯১৭-১৮ (৫৯৫২১), ১৯১৮-১৯ (৮৩৬০২), ১৯২০-২১ (৫৩৭৪১) জন লোকের টিকা দেওয়া হয়। প্রথম তিন বৎসরে বসন্তরোগ বেশি হয় জন্য টিকা দেওয়া অধিক দেখা যায়। ইহার পূর্বে চারি বৎসরে এবং তাহার পূর্ব চারি বৎসরেই টিকা গৃহীত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশ কম জানা যায়।

ডাক্তার কবিরাজ সংখ্যা এই জেলায় নিতান্ত কম নহে। পাবনা ও সিরাজগঞ্জে অনেক এম বি, এল এম এস প্রভৃতি ডাক্তার এবং অনেক পল্লীতে ছোট বড় নানা জাতীয় ডাক্তার বর্তমান আছে। হিন্দু ব্যতীত মুসলমান মধ্যে এই জেলায় মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা ডাক্তার কেহই নাই। পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও বেড়া প্রভৃতি স্থানে গবাদি চিকিৎসা জন্য ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে পশু ডাক্তার নিযুক্ত আছে।

৭০-৭২ বৎসর পূর্বে মাত্র পাবনা (১৮৫৩), দুলাই (১৮৫৫) এবং সিরাজগঞ্জে (১৮৬৯) তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় বর্তমান ছিল। এক্ষণে এই জেলায় ১৩টি বর্তমান আছে। তাহা সমস্তই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও অন্যান্য সাহায্যে পরিচালিত। পাবনায় হাসপাতালে স্থায়ী রোগী জন্য ২৭টি এবং সিরাজগঞ্জে ৩০টি বিছানা আছে। তাহাতে ১৯২০ অব্দে যথাক্রমে ৪১৬ ও ৫৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটি হইতে পাবনায় ঐ অব্দে ১৫০০ টাকা এবং সিরাজগঞ্জে ৩২০০ টাকা সাহ্যায্য দান করা হইয়াছিল।

দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহ (১৯২০)

নাম	ডিঃ বোর্ড সাহায্য	গভর্নমেন্ট	চাঁদা	অন্যান্য	মোট আয়	মোট ব্যয়	বাহিরের রোগী
পাবনা সদর	২৩৩০	১২৮০	৭১১	...	১৩১৯৪	১০৪৮৩	২৯৫৭৮
সিরাজগঞ্জ	১৯৩৬	৬৫৪৪	২৩৮৯	...	১৫১১৪	১৪৫৯৪	১৯৪৪২
সোহাগপুর	১২০৭	৩৩	৩৬০	...	১৬০০	১৬০০	৬৩৪৫
স্থলবসন্তপুর	৪৩১	৪৭	..	...	৪৭৮	৪৬৩	২০৮৪
কাজিপুর	১৪৮	৪৫	১৮	...	২১১	২০৩	২২৫৯
শীতলাই	৮১৬	...	৩৯৮	...	১২৩৩	১২০২	৪৬১১

নাম	ডিঃ বোর্ড সাহায্য	গভর্নমেন্ট সাহায্য	চাঁদা	অন্যান্য	মোট আয়	মোট ব্যয়	বাহিরের রোগী
তাড়াস	১২৪৪	২৫	৪৮৭	...	১৭৬৯	১৭৩৪	৬৭৯৪
শাহজাদপুর	১৪৩৫	১৩৯৩	৪৪০	...	৩২৮২	৩২২৪	২০৭৭৪
বেড়া	৬৫৯	৯৬	৩৩০	...	১৬৩১	১৫১৩	৮৯৩৩
তাঁতিবন্দ	১১৬০	২২৯	৩৬৪	...	১৭৭৬	১৭১২	১১১০৭
রায়গঞ্জ	৯১৮	১৭	৪৬০	...	১৪৫৮	১৩৩৪	১১৮৫৩
চাটমোহর	১০৩২	...	৩০৫	...	১৩৪২	১৫৩৪	৪৫০০
ভারেঙ্গা	১১২২	১৬	২০৩	...	১৪৬৬	১৪৮৯	৪৩৮৫

কতিপয় প্রচলিত কথা

অগা	মূর্খ	ঘসি	শুষ্কগোময়
আজা	মাতামহ	ঘিলু	মস্তিষ্ক
আঁঠ্যা	উচ্ছিষ্ট	চলা	কাষ্ঠখণ্ড
আমসরবী	পেয়ারা	চুকা	টক
আরঙ	মেলা	চ্যাগার	বেড়া
ইল্লত	আবর্জনা	চিক্ষুর	চিৎকার
উরচুঙ্গা	আরসোলা	ছাওয়াল	ছেলে
উর‍্যাৎ	উরুদেশ	ছ্যাপ	থুথু
ওয়ারা	সস্তা	ছ্যাও	ভাঙাডাল
কচলান	মাজা	জালি	কচি
কনে	কোথায়	জুত	সুবিধা
কল্লা	দুষ্ট	ঝোমা	তন্দ্রাবস্থা
কায়্যা	কাক	টুণ্ডা	হস্তপদবিহীন
কিরা	দিব্য, শপথ	ডাঙ্গর	বড়
কুঁই	আঁঠি	ডুগডুগে	লালবর্ণ
কুত্যা	কুকুর	তখিৎ	খোজ
কুদুরকি	দুষ্টামি	তাঁতে	পাটের রশি
কুয়্যা	কুপ, কুয়াসা	থোয়া	রাখা
কেডা	কে	ধামা	বেতের ঝুড়ি
কোষ্টা	পাট	নাখাল	মত
ক্যান	কেন	পালাম	বাড়িসংলগ্ন জমি
ক্যাবল	কেবল	প্যাঁক	কাদা
ক্যামন	কি প্রকার	পোনা	মাছের বাচ্চা
খড়ি	জালানি কাষ্ঠ	ফাল	লম্প
খাষ্টে	ময়লা	ফোঁট	ফোঁড়া
খ্যাড়	উলুখড়	ভাও	দর
খাম	বরের খুটি	ব্যাল	বেল
গতর	শরীর	বুল্ল	বলিল
গরমা	অসার	বাড়ি	আঘাত
গবদা	মূর্খ	রয় রয়	ধীরে ধীরে

আচার ব্যবহার—হিন্দুসমাজে পূর্বে কন্যাপণ দিতে হইত। এক্ষণও নিম্নশ্রেণী মধ্যে এই প্রথা বর্তমান আছে। কিন্তু ভদ্রসমাজে পাত্র পণ ক্রমশই অনেকাংশে অধিক প্রচলিত হইয়াছে। পূর্বে বিবাহ বাসরে পাত্র ও কন্যাপক্ষ মধ্যে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ হইত, এক্ষণে তৎপরিবর্তে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষে প্রীতি উপহার প্রদান প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ভদ্রসমাজে বরযাত্রীগণের আব্দার ও উৎপাতে এবং চা, বিস্কুট, সোডা, লেমোনেড সরবরাহ করিতে কন্যা কর্তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। নিম্নশ্রেণীর জাতিগণ মধ্যে এতাদৃশ অত্যাচার বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। মুসলমান সমাজেও আতসবাজি ব্যবহার ও প্রীতি উপহার দিন দিন প্রবেশ করিতেছে। হিন্দুর পুরোহিত অপেক্ষা মুসলমানের মোল্লাগণের আকাঙ্ক্ষা কম।

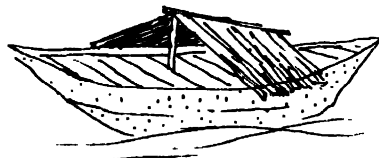
নামকরণ—হিন্দুসমাজে সকলেই পুত্র কন্যার দুইটি করিয়া নাম রাখে; একটি চলিত বা ডাক নাম, অপরটি ভাল নাম। জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠী প্রস্তুত সময়ে দুইটিই ব্যবহৃত হয়। নদীবহুল দেশে মৎস্যের নামে অনেকে পুত্র কন্যার নাম রাখে পুঁটি, ভেদি, ট্যাঙ্গর। হিন্দু মধ্যে রাধাবল্লভ, পার্বতীশঙ্কর, কালিদাস প্রভৃতি মুসলমান মধ্যে মহম্মদ, ইয়াকুব প্রভৃতি নামকরণ প্রথা প্রচলিত আছে।

শোকপ্রকাশ—সাধারণ লোক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরত শোকপ্রকাশ করে। ভদ্রবংশীয় হিন্দু মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে ধীরে ও নীরবে শোকপ্রকাশ করে। সাধারণ শ্রেণীর লোক উচ্চরবে মৃত ব্যক্তির গুণাবলী কীর্তন করতঃ যে ক্রন্দন করে তাহা দূর হইতে গীতধ্বনি বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সংস্কার—এ জেলার লোকের নানারূপ সংস্কার মধ্যে (১) ভূতে পাওয়া বা ধরা এবং ব্রহ্মদৈত্য আনা, (২) নমশূদ্র, পাটনি ও স্থল বিশেষে মুসলমান মধ্যে বার আসা (৩) অন্যের উন্নতি বা ব্যাধি পীড়ায় ঈর্ষামূলে চোক দেওয়া (৪) রাত্রিতে দোকানদারগণের কোনও কোনও দ্রব্য যথা হলুদ, মধু, হরিতকি আদি বিক্রয় না করিবার সংস্কার প্রধান।

তৃতীয় অধ্যায়

শাসন-সংরক্ষণাদি



প্রথম পরিচ্ছেদ—সাধারণ শাসন বিভাগ

অধুনা পাবনা জেলার শাসন কার্যের সুবিধার্থে পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জ মহকুমা এই দুই সাবডিভিসনে বিভক্ত। পূর্বে পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও কুমারখালি এই তিনটি পাবনার সাবডিভিসন ছিল। ১৮৭১ অব্দে কুমারখালি নদীয়া জেলার সামিল হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ মহকুমার কার্য অধিক জন্য ১৯১২ অব্দে বেড়ায় মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব হইয়া, তাহা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়, কিন্তু সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেললাইন খুলিবার পর প্রথমে উল্লাপাড়া, পরে ভাঙুরিয়ায় নতুন সাবডিভিসন স্থাপন জন্য নানা প্রস্তাব হইয়া পরিশেষে মতদ্বৈধতা ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় সমুদায় প্রস্তাবটি স্থগিত হইয়াছে।

পাবনার সরকারি ইমারত ও আফিসাদি রক্ষাকল্পে এখানে পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের জনৈক সাবডিভিসনাল অফিসার নিযুক্ত আছেন। পাবনা ও সিরাজগঞ্জে দুইজন কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর, পাবনা সদরে জনৈক Uncovenanted ম্যাজিস্ট্রেট ও সিরাজগঞ্জে Convenanted ম্যাজিস্ট্রেট এবং শাহজাদপুরে Rural ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নামে জনৈক Uncovenanted অফিসার নিযুক্ত আছেন।

ক. ফৌজদারি বিভাগ ঃ

ফৌজদারি শাসন ও বিচার জন্য অধুনা পাবনায় জনৈক ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ (পাবনা ও বগুড়া উভয় জেলার জন্য) অ্যাডিশনাল সেসন জজ, ১ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ১ সাবডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট, দশ জন প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিঃ এবং একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত পাবনা, সিরাজগঞ্জ, শাহজাদপুর ও উল্লাপাড়ায় ২০ জন অবৈতনিক ম্যাজিঃ মধ্যে ৯ জনের একাকী বসিবার ক্ষমতা আছে।

ম্যাজিঃ ও কালেক্টার পদে একই অফিসার ফৌজদারি ও রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়া পাবনা সদরে তিনজন ডেপুটি ম্যাজিঃ ও জনৈক সাব ডেপুটি ম্যাজিঃ ও কালেক্টরের সহায়তায় সকল কার্য-পরিচালন করেন। সিরাজগঞ্জের সাবডিভিসনাল অফিসার কর্তৃক দুইজন ডেপুটি ম্যাজিঃ ও কালেক্টর এবং একজন সাব-ডেপুটি ম্যাজিঃ ও কালেক্টরের সহায়তায় তথাকার যাবতীয় কার্য নিষ্পন্ন হয়। ডেপুটি ও সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদিগেরও শাসন ক্ষমতা আছে। সদরে ও সিরাজগঞ্জে দুই জন কাননগু নিযুক্ত আছেন।

ফৌজদারি কার্য বিবরণী

মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সংখ্যা

আদালত	১৯০১	১৯১১	১৯২০
সেসন কোর্ট	৪০	৪১	৫৭
সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেট	২৬২৩	১৬৬৩	২১৭৯
অবৈতনিক ঐ	৬৩০	২৭৭	৭৭৬

অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা

সেসন কোর্ট	৮০	১২১	১৬৩	
সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেট	৩১৭২	২৭৮০	৩৭৮৬	
অবৈতনিক ঐ	৯৮২	৪৩০	১২৪২	
১৯১৯-২০	ক্ষেত্রফল	লোকসংখ্যা	মোকদ্দমা	সেসন কেস
পাবনা	৭৮৯	৫৫৭০০০	১৫৪৮	১৮
সিরাজগঞ্জ	৮৮৯	৮৩৩০০০	২৩১৭	২৭

সিরাজগঞ্জ মহকুমার ফৌজদারি ও রেভিনিউ কার্যাদি সদর অপেক্ষা অনেক বেশি। সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত পাবনায় সাতজন, সিরাজগঞ্জে ৬ জন, শাহ্জাদপুরে ৪ জন, উল্লাপাড়ায় ৪ জন এবং সাঁড়া ২ জন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নির্দিষ্ট আছেন।

(খ) দেওয়ানি বিভাগ

দেওয়ানি বিচার জন্য পাবনায় ডিস্ট্রিক্ট জজ, দুই জন সাবজজ, তিনজন মুনসেফ এবং সিরাজগঞ্জে তিনজন মুনসেফ নিযুক্ত আছেন। পূর্বে শাহ্জাদপুরে ও রায়পুর খেতুপাড়ায় মুনসেফী ছিল।

দেওয়ানি বিচারালয়ের কার্য বিবরণ

মূল মোকদ্দমা			ছোট আদালত			আপিল	
মুন্সেফ	সাবজজ	জজ	মুন্সেফ	সাবজজ	সাবজজ	ডিঃ জজ	
১৯০১	৪২৯৯	১৩২	১০	৪৯২৮	...	৪৬৩	৬১
১৯১১	৬৭৭০	৮৭	৩১	৭২০৪	১০২৩	৩৫৪	২৩৩
১৯২০	৯২৫০	১৬১	১৭	৫৭১৬	১২৬১	২৭৯	৪৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—রাজস্ব বিভাগ

পরগণার নাম ও থানা হিসাবে অবস্থান ঃ

(১) আটিয়া—চৌহালি, সাঁথিয়া, শাহজাদপুর, (২) আমিরাবাদ —বেড়া (৩) বাজুচপ্প—আটঘরিয়া, পাবনা, সাঁথিয়া, সুজানগর (৪) বেলগাছি—সুজানগর (৫) ভব ফতেজঙপুর —পাবনা (৬) দাতিয়া জাহাঙ্গীর—রায়গঞ্জ (৭) বাজুরস মহবতপুর—আটঘরিয়া, সাঁড়া (৮) বাজুরস নাজিরপুর—আটঘরিয়া, পাবনা, সাঁড়া (৯) ভাতুরিয়া—আটঘরিয়া, চাটমোহর, তাড়াব (১০) বিরহামপুর—বেড়া, সাঁথিয়া, সুজানগর (১১) ইসলামপুর- পাবনা, সাঁড়া, সুজানগর (১২) কাগমারি—কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ (১৩) কাটারমহাল—চাটমোহর, রায়গঞ্জ, তাড়াস, উল্লাপাড়া (১৪) মিমনসাহী—রায়গঞ্জ, তাড়াস (১৫) গয়হাটা—উল্লাপাড়া (১৬) গঙ্গারামপুর—চাটমোহর (১৭) হাণ্ডিয়াল—চাটমোহর (১৮) কান্তনগর—সাঁড়া (১৯) কাসিমপুর—বেড়া (২০) খাট্টা—পাবনা (২১) কর্কালয়- সাঁড়া (২২) লস্করপুর—সাঁড়া (২৩) লোকনাথপুর— সাঁড়া (২৪) নসিরসাহী—সুজানগর (২৫) নাজির এনায়েতপুর—সুজানগর (২৬) নিজবাজুরস —সাঁড়া (২৭) প্রতাপবাজু—আটঘরিয়া (২৮) পুখুরিয়া—সিরাজগঞ্জ (২৯) রোকনপুর— পাবনা (৩০) সাহাউজিল—সাঁড়া (৩১) শেলবর্ষ—তাড়াস

(৩২) সুজাবাদ—বেড়া (৩৩) তারাগুনিয়া—সাঁড়া (৩৪) উখাউনরপুর—উল্লাপাড়া (৩৫) মহম্মদসাহী—সুজানগর (৩৬) সিন্দুরী—বেড়া, সাঁথিয়া, সুজানগর (৩৭) সোনাবাজু—আটঘরিয়া, চাটমোহর, ফরিদপুর (৩৮) সুলতানপ্রতাপ—বেড়া, সাঁথিয়া (৩৯) ইউসুপনগর—পাবনা, সাঁথিয়া (৪০) ইউসুপসাহী—বেলকুচি, চৌহালি, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, কামারখন্দ (৪১) বড়বাজু— সিরাজগঞ্জ, রায়গঞ্জ, (৪২) কাগমারি—কাজিপুর।

এই জেলায় ১৯২০-২১ অব্দে মোট ১৯৬৬টি তৌজি মহাল বাবদ ৪০৩১৬২ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৮১৪টি স্থায়ী ৬৮টি অস্থায়ী মহাল এবং ৮৪টি খাস মহাল। পৃথক নামজারি মহাল ৪৬১৩টি।

সার্ভে সেটেলমেন্ট ঃ

সর্ব প্রথমে পাবনা জেলায় ১৮৫০/৫১ অব্দে মৌজাওয়ারী যে জরিপ হয় তাহাতে মাত্র লাঠি ব্যবহার হয় জন্য ইহা লাঠাকাঠার মাপ এবং থাকবস্ত নামে খ্যাত। ১৮৫৩-৫৪ অব্দে রাজস্ব নির্ধারণকল্পে যে জরিপ হয় তাহা রেভিনিউ সার্ভে নামে পরিচিত। ১৮৬৭-৬৮ অব্দে বঙ্গের নদ-নদী জরিপ সময়ে এই জেলার নদী তীরস্থ ভূভাগের যে জরিপ হয় তাহা দিয়ারা সার্ভে নামে অভিহিত হয়। ১৯১১-১৯১৬-১৯১৯ অব্দে যথাক্রমে ফরিদপুর, মৈমনসিংহ ও রাজশাহী জেলার দিয়ারা সার্ভের সময় এই জেলার পদ্মা ও যমুনা নদী তীরস্থ কতক ভূমি জরিপ হইয়াছিল। ১৯২০ অব্দ হইতে পাবনা বগুড়া সেটেলমেন্ট উপলক্ষে এই জেলার সমস্ত ভূ-ভাগের যে সেটেলমেন্ট কার্য আরম্ভ হইয়াছে তাহা এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই।

রোড সেসাদি

১৯২০-২১ অব্দে ২০০৮টি মহালের জন্য ১১৮৬০৮ টাকা রোড সেস নির্দিষ্ট ছিল। ইহার মধ্যে ৪৫টির রাজস্ব নাই (Revenue Free Estate) এবং ১৭টি নিষ্কর (Rent Free Lands) পূর্বে রোড সেস আইন (১৮৭১ সালের দশ আইন) জারি সময়ে এই জেলার মোটামুটি খাজনা ১৫,১৪,৭৫৫ টাকা ধরা হয়। ইহা এক্ষণে ১২৮৭৪৯১ টাকা বৃদ্ধি হইয়া ২৮০২২২৬ টাকায় ধার্য হইয়াছে।

জেলার রাজস্বাদি (টাকায়)

রাজস্ব আদায়	**১৯১১/১২**	**১৯১৫/১৬**	**১৯২০/২১**
সদর রাজস্ব	৪০৩৬৬৮	৪১১২৭৬	৪০৩১৬২
স্ট্যাম্প বিক্রি	৪৬১৬৭৮	৪৮২৭৫২	৫২৭৬৬৭
ইনকাম ট্যাক্স আদায়	৫০৬৫৯	৫৪৪৮২	১০০২৩২
আবগারি বিভাগ	১৯৪২০২	২০০৭০৪	২০০৬১৬
আফিম	১৫৭৪১	১৮১৩৬	২৪১৩০
অন্যান্য	৪৬৬৪	১০৭৪	১৫৯৩৩
রোড সেসাদি	১৩৫৭২৮	১৩৮৯২০	১৩৭৮৯৫
	১২৬৬৩৪০	১৩০৭৬৪৪	১৪০৯৬৩৫
স্থায়ী মহাল সংখ্যা	**১৭৯০**	**১৮১০**	**১৮১৪**
দাবি	৩৫৮৭৬৪	৩৬৫৫৩৭	৩৬৪৯১৫
আদায়	৩৫৮৬৫৮	৩৬৪৪২০	৩৬২৬০৯
অস্থায়ী মহাল সংখ্যা	৭৩	৬৭	৬৮
দাবি	২৫৬১৭	২৫১৭৩	২৬৮১৯

	১৯১১/১২	১৯১৫/১৬	১৯২০/২১
আদায়	২৪৯৮১	২৪২৯৫	২৩৭৯২
খাস মহাল সংখ্যা	৬১	৬৪	৮৪
দাবি	৩৩৪১০	৩৭৩০১	৫০৭৪১
আদায়	২০০২৯	২১৪৯৩	১৬৭৬১
রোড সেস মহাল সংখ্যা	৫৮৪৮	৬১১১	২০০৮
দাবি	১৫২৫২৬	১৬০৮৭৪	১৬১২৬৬
আদায়	১৩৫৭২৪	১৪৩৫৯৯	১৩৭৮৯৫

স্ট্যাম্প বিক্রয়ের আয় (টাকায়)

	১৯০০/০১	১৯১০/১১	১৯২০/২১
কোর্ট ফি স্ট্যাম্প	২৪৩৪৮৫	৩৬৪০৫৮	৪১২১৯০
সাধারণ স্ট্যাম্প	৭৮৯১৬	৯৯৫০৫	১১৫৪৭৭
	৩২২৪০১	৩৬৫০৮৩	৫২২৬৬৭

ইনকাম ট্যাক্সের আয়

	১৯০০/০১	১৯১০/১১	১৯২০/২১
করদাতার সংখ্যা	২১৮১	৮৭৬	৫৫৪
মোট আদায়	৫৩৫২৬	৪৭৬৮৯	১০০২৩২

আবগারির আয় (টাকায়)

১১২৭৬৬	১৮৮০০২	২২৪৭৪৬

(১৮৭০/৭১) আয় মোট ব্যয়

আয়	পাঃ—শিঃ—পেঃ	ব্যয়	পাঃ—শিঃ—পেঃ
সদর রাজস্ব	৩২০৮২—৬—০	বিচার বিভাগ	৩১৩৮—১০—১
স্ট্যাম্প	৮৮৪১—০—০	ফৌজদারি বিভাগ	৫১১০—০—০
আবগারি	২৬০৪—১৮—০	কালেক্টরি	১৩৭৬—১০—০
আফিম	১৩০২—১২—০	ডাক্তারখানা	১৩৩৭—৬—০
ইনকাম ট্যাক্স	৬৯৮৪—২২—০	পুলিশ বিভাগ	৭৮৬৮—৮—০
রেজেস্টারি	২৪৮—৫—১০	জেল বিভাগ	৫৪৮—১০—০
লোকাল ফান্ড	১০৩—৪—০	শিক্ষা বিভাগ	১৫৬৭—২—১০
গুদারা	২০৯—০—০	পাবলিক ওয়ার্কস	৪৯—১১—৪
ফৌজদারি জরিমানা	৯৭৩—৩—৮	ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ,	১১৬৮—৮—০
পোস্ট অফিস	৬০৬—৬—৪	পেন্সান	১৩৭—১৭—৭
	৫৩৮৫৫—১১—	সুদ	৪২—১৩—০
		মোকদ্দমাদি	৬৭—৬—০
		বিবিধ	৩০২—১৪—০
			২২৭১৬—১৭—৯

	১৯১৫/১৬		১৯২০/২১	
	আদায়	ব্যয়	আদায়	ব্যয়
সদর রাজস্ব	৪৩১,১৭৯	৮৪০২৫	৪,৬১,১৪১	৭১,৪৯৭
ইনকাম ট্যাক্স	৪৯,৪১১	১৯৮১	৭৮,৯৬৫	৪,৩৩৯
আবগারি	২,১৮,৮৪০	১৩,৬০৭	১,৬১,১১৭	২১,১৯৫
স্ট্যাম্প বিক্রি	৪,৮২,৭৫২	১২,৮৪৫	৪,৮৪,৩৮৭	১০,৩৩০
	১,১০,৮২,১৩২	১,১১,৪৫৮	১১,৮৬,৬১০	১,০৭,৩৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিবিধ বিভাগ

ক. পুলিশ বিভাগ ঃ

১৯২০ অব্দে পাবনায় একজন সুপারিন্টেডেন্ট, একজন সহকারি সুপারিন্টেডেন্ট, ৫ জন ইনস্পেক্টর, ৫৩ জন সাবইনস্পেক্টর, ৬১ জন হেড কনস্টবল, ৪৮৩ জন কনস্টবল, মোট ৬০৫ জন পুলিশ অফিসার এই জেলার শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত সদরে চারিটি থানার আটটি পুলিশ স্টেশনে এবং সিরাজগঞ্জের চারটি থানার নয়টি পুলিশ স্টেশনের অধীনস্থ গ্রামসমূহে নিম্নলিখিত মত চৌকিদার ও দফাদার নিযুক্ত আছে।

থানা	পুলিশ স্টেশন	চৌকিদার	দফাদার	থানা	পুলিশ স্টেশন	চৌকিদার	দফাদার
পাবনা	পাবনা	১৬২	১৫	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	১৭৫	১৭
	আটঘরিয়া	৬৯	৬		কাজিপুর	১৩২	১১
	সাঁড়া	১২৩	১১	শাহজাদপুর	শাহজাদপুর	১১৬	১৭
চাটমোহর	চাটমোহর	১৯৬	৮		চৌহালি	৮৪	১০
	ফরিদপুর	৯৪	৯		বেলকুচি	১০১	৮
সাঁথিয়া	সাঁথিয়া	১৬২	১৬	রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ	১৬১	১৩
	সুজানগর	১৩০	১২		তাড়াস	৬৮	৫
মথুরা	বেড়া	১৪১	১৪	উল্লাপাড়া	উল্লাপাড়া	২২৭	২২
		১০৭৭	১০১		কামারখন্দ	৭২	৫
						১১৩৬	১০৯

এই জেলায় জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ অধিক। জল ও স্থল উভয়ত্রই চুরি ডাকাইতি সংঘটিত হইয়া থাকে। ১৯০০ অব্দে মহয় খাঁর ডাকাইতি মোকদ্দমার পর ১৯২০ সালে অনেক ডাকাইতি আসামীর মধ্যে ৪ জনের শাস্তি হয়, ৩২ জনের মুচলেকা লওয়া হয়। ইহারা পাবনা, রাজশাহী, মৈমনসিংহাদি জেলায় ১৭/১৮ স্থান ডাকাইতি করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

বর্তমানে এই জেলার পাবনায় ১০১টি এবং সিরাজগঞ্জে ১০৯টি মোট ২১০টি চৌকিদারি ইউনিয়ন আছে। Village Self Government Act এই জেলায় জারি হওয়ার পর এ পর্যন্ত কোন স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয় নাই। মাত্র বেড়া, চাটমোহর, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়ায় ইউনিয়ন কমিটি প্রতিষ্ঠিত আছে।

পূর্বে হান্ডিয়ালে থানা ছিল, তাহা উঠিয়া চাটমোহরে, অরণকোলা থানা সাঁড়ায়, খেতুপাড়া

থানা উঠিয়া প্রথমে দুলাই, পরে সাঁথিয়ায়, আতাইকুলা আউট পোস্ট উঠিয়া সাথিয়ায়, সুপগাছার আউট পোস্ট উঠিয়া কাজিপুরে, মালদহ হইতে আউট পোস্ট উঠিয়া মথুরায় গিয়াছিল, তাহা উঠিয়া বর্তমানে বেড়ায় উপস্থিত হইয়াছে; অধুনা দরি সরিপপুরে একটি পুলিশের ঘাটি আছে।

খ. রেজেস্টারি বিভাগ ঃ

পাবনা সদরে চারটি এবং সিরাজগঞ্জে ছয়টি মোট দশটি সাবরেজেস্টারি অফিস হইতে বার্ষিক নিম্নলিখিত মত দলিল রেজেস্টারি এবং তাহা হইতে নিম্নের হিসাব মত আয় ও ব্যয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই জেলার পাবনা সদরে সাতটি ও সিরাজগঞ্জে আটটি মোট যে পনেরটি মুসলমান ম্যারেজ রেজেস্টার অফিস আছে তাহা প্রথম খণ্ডে লিখিত হইয়াছে।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দ

অফিস	রেজেস্টারি দলিল সংখ্যা	সাধারণ ফিস	অন্যান্য ফিস	মোট আয়	ব্যয়
পাবনা	৪৭০৬	৫৬৬৬	৩৩০৭	৯০০৩	১১০৩৫
চাটমোহর	৩৯২৫	৩৬৫৮	২৩৩	৩৮৯১	২৬০০
সুজানগর	২৩৪১	২৪৬০	৪৪২	২৯০২	২৩৩২
বেড়া	৪০৩১	৩৬২৯	৪১৬	৮০৪৫	২৮৮৫
সিরাজগঞ্জ	৮২৪৮	৭১৭১	২০৮৭	৯২৫৮	৩০১৭
উল্লাপাড়া	৮৬৫৯	৭০৪২	৫৮৩	৭৬২৫	৩২৪৭
সলঙ্গা	২১৮৫	১৭৭৩	১৪৩	১৯১৬	১১৯২
শাহজাদপুর	৬১৮৪	৪৮৯৬	৩৬১	৫২৫৬	২৭৮০
স্থল	৫৭৫৪	৪৫৭৯	৩১৯	৪৮৯৮	৩৫২৬
ধানঘরা	১৯৮৬	১৬১২	১২১	১৬৪২	১২২২
	৪৭৯১৯	৪২৪৯৫	৮০৪২	৫০৫৩৭	৩৩৮০৬

গ. জেল বিভাগ ঃ

পাবনায় ২৩৫ জন কয়েদির জন্য একটি সদর জেল এবং সিরাজগঞ্জ ও শাহজাদপুরে জেল আছে। কয়েদি সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

	পাবনা		সিরাজগঞ্জ		শাহজাদপুর	
	১৯১১	১৯২১	১৯১১	১৯২১	১৯১১	১৯২১
পুরুষ	১৯৮	২০২	৪৯	৫০	৫	৮
স্ত্রী	৭	৭	৩	৪	৪	৩
মোট	২০৫	২০৯	৫২	৫৪	৯	১১
দৈনিক গড	২২৫.৬১	১৯৪.৯৮	২৪.২৮	২৬.০৫	৪.৬৫	৬.৩৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—স্বায়ত্বশাসন

ক. ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচন ঃ

পাবনা ও বগুড়া জেলায় একত্রে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১ জন অমুসলমান সভ্য

নির্বাচনের অধিকার আছে। ১৯২০ অব্দে ৪ জন সদস্য মনোনীত হয়েন। ১৩৫০৩ জন ভোটার মধ্যে ৪০৩৯২ (শতকরা ৩২ জন) ভোট প্রদান করে সর্বোচ্চ ২৮১১ ভোটে স্যর আশুতোষ চৌধুরী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েন।

সমগ্র পাবনা জেলা হইতে একজন মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচন জন্য ১৩৮১৪ জন ভোটার মধ্যে ১৯২০ অব্দে ১৭০৩ জন ভোটার অর্থাৎ শতকরা ১২৩ ভোট প্রদান জন্য উপস্থিত হয়। সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৫৬৯ জনের ভোট পাইয়া পাবনায় উকিল মৌলবী ওয়াছিম উদ্দিন খান বাহাদুর সাহেব পাবনার মুসলমানগণের পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় সভা নির্বাচিত হয়েন।

বিগত ১৯২৩ অব্দেও চারি জন মনোনীত প্রার্থী মধ্যে যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত মহাশয় পাবনা ও বগুড়া জেলার অমুসলমান পক্ষে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন। সমগ্র পাবনা জেলার মুসলমান পক্ষে দুইজন মনোনীত প্রার্থী মধ্যে পাবনার উকিল মৌলবী আব্দুল গফুর সাহেব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

খ. ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ঃ

পূর্বে রোড সেস্ কমিটি দ্বারা জেলার রাস্তাপথের নির্মাণ ও মেরামত কার্যাদি পরিচালিত হইত। ১৮৮৫ অব্দে ৮ জন নির্বাচিত এবং ৮ জন মনোনীত মোট ১৬ জন সভ্য লইয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সভাপতিত্বে পাবনায় সর্বপ্রথম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ অব্দে ২৪ জন সভ্য লইয়া যে নূতন বোর্ড গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে এক তৃতীয়াংশ মনোনীত ; ৭ জন সদর লোকালবোর্ড এবং ৯ জন সভ্য সিরাজগঞ্জ লোকালবোর্ড হইতে নির্বাচিত। ঐ অব্দ হইতে বেসরকারি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইতেছেন এবং পাবনার উকিল মৌলবী ওয়াছমউদ্দিন আহম্মদ খান বাহাদুর সাহেব বেসরকারি নির্বাচিত বে-সরকারি সভাপতি।

রাস্তাদি নির্মাণ ও পরিদর্শন জন্য জনৈক ইঞ্জিনিয়ার, পাবনায় ২ জন ও সিরাজগঞ্জে ১ জন ওভারসিয়ার এবং চাটমোহর, উল্লাপাড়া, ও সিরাজগঞ্জ লোকাল বোর্ডের অধীনে একজন করিয়া সাবওভারসিয়ার নিযুক্ত আছেন।

পাবনা সদরে ২৫টি ও সিরাজগঞ্জে ৪৫টি মোট ৭০টি খেওয়া ঘাট হইতে ১৯২১/২২ অব্দে ৩৬৮৩৬ এবং পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জের মোট ৫৭০টি খোয়ার হইতে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ১০৭১৫ টাকা আয় হইয়াছিল। ডিঃ বোর্ড হইতে তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত এবং দশটি হাসপাতালে সাহায্য প্রদত্ত হয়। বোর্ড হইতে উদয়পুর গ্রামে একটি মধ্য বাংলা বিদ্যালয়, ৯৩টি নিম্নপ্রাথমিক স্কুল পরিচালিত হয়। ৩৫টি মধ্য বাংলা বিদ্যালয়, ৬৮টি উচ্চ প্রাথমিক এবং ১০৭১টি নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা ডিঃ বোর্ড হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ১৯২০/২১ অব্দে ৩৪ মাইল ইষ্টক নির্মিত পাকা এবং ৬৯০ মাইল কাঁচা রাস্তা বর্তমান ছিল। পাবনায় ও সিরাজগঞ্জে প্রত্যেক স্থানেই পূর্বে বার জন সভ্য লইয়া একটি লোকাল বোর্ড গঠিত ছিল ; এক্ষণে ১৯২১ অব্দ হইতে ১৮ জন সভ্য লইয়া উভয় স্থানেই লোকাল বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ১৯২১ অব্দ পর্যন্ত পাবনা জেলায় কোন বোর্ড গঠিত হয় নাই ; তবে বেড়া, চাটমোহর, শাহজাদপুর ও উল্লাপাড়ায় ৪টি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের মোট আয় ব্যয়

	১৯০০/০১	১৯০৫/০৬	১৯১০/১১	১৯২১/২২
আয়	১০৫০৭৮	১৫৫০৫৫	১৬৩৮২৬	২৬০৮৪৭
ব্যয়	১০৮৫০০	১২৩২১৭	১৪১৯১৩	২৮৩২১৩

গ. মিউনিসিপ্যালিটি ঃ

১৮৬৯ অব্দে সিরাজগঞ্জে এবং ১৮৭৬ অব্দে পাবনায় সর্বপ্রথম মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উভয় স্থানের মিউনিসিপ্যালিটির পরিমাণ ফল যথাক্রমে সাড়ে এগার এবং পাঁচ বর্গমাইল ধরা হইয়া থাকে। উভয়ত্রই মনোনীত ও নির্বাচিত সভ্য সংখ্যা আঠার জন ছিল ; সম্প্রতি ১৯২৫ অব্দ হইতে পাবনায় সভ্য সংখ্যা ২৪ জন হইয়াছে।

১৯২০-২১ অব্দে পাবনায় শতকরা মাসিক আয়ের উপর ৷৵/৪ আনা হিসাবে এবং বাড়ি ভাড়ার উপর টাকা প্রতি মাসিক /৫ পয়সা হিসাবে ৩,৯১০ জন করদাতার অর্থাৎ শতকরা ৯০ জন অধিবাসীর নিকট ও অন্যান্য বাবদ মোট ৩২৯৭৬ টাকা অর্থাৎ জন প্রতি প্রায় ১৷৵৹৬ আনা গড়ে ট্যাক্স আদায় হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির মোট ৩২ মাইল রাস্তা মধ্যে ৬ মাইল ইষ্টক নির্মিত পাকা। এখানে মোট প্রায় ২২৩ জন ভোটার মধ্যে ইলেকশন সময়ে শতকরা প্রায় ৭৫ হইতে ৮০ জন উপস্থিত হইয়া থাকে।

সিরাজগঞ্জে ১৯২০-২১ অব্দে শতকরা মাসিক আয়ের উপর ১ টাকা এবং মাসিক বাড়ি ভাড়ার উপর টাকা প্রতি /৫ আনা হিসাবে ৪১৭৬ জন করদাতার অর্থাৎ শতকরা ১৬ জন অধিবাসীর নিকট ২৮৬২৮৲ টাকা অর্থাৎ জন প্রতি গড়ে প্রায় ৷৵৹৪ পাই ট্যাক্স আদায় হইয়াছে। অনেক মহাজনের বাস হইলেও এখানকার অনেক রাস্তা এখনও কাঁচা বালকাময়।

লোকসংখ্যা	১৮৭২	১৮৯১	১৯০১	১৯২১
পাবনা	১৫৭৩০	১৬৪৮৬	১৮৪২৫	১৯৩৪৩
সিরাজগঞ্জ	২১০৪৮	২৩২৬৭	২৩১১৪	২৫৫১৮

	১৯০০	১৯১১	১৯১৫	১৯২০
পাবনা—				
আয়	২২৯২১৲	২৬২৫২৭৲	৩৩৭৪৫৲	৫৪৪০৩৲
ব্যয়	১৯৭৬৫৲	২৪৮৭৩৲	৩৮৩৭২৲	৩৩১২৬৲
সিরাজগঞ্জ—				
আয়	১৯৭৩৭৲	২৩৩২২৲	৩০১৫৭৲	২৮৪৯৫৲
ব্যয়	১৭৭৩৯৲	২১৬৬৭৲	২৩৫৪৪৲	২৬৬৪২৲

ডিস্ট্রিক্টবোর্ড

আয়	১৯২০/২১	১৯২১/২২	ব্যয়	১৯২০/২১	১৯২১/২২
পথকর	১৬৩৯১২৲	১৫৪১৫৩৲	রাস্তা নির্মাণাদি	১০৬৫৲	১২০৮২১৲
সুদ	৯৬২৲	৮৯৮৲	খোয়ার	৪৩১৲	৫৫৭৲
খোয়ার	১০৭১৫৲	১০৩৪২৲	শিক্ষা	৩১৪৯১৲	৯৪৬৩৫৲
খেওয়া	৩৮৬১১৲	৩৬৮৩৬৲	চিকিৎসা	৯৩৩০৲	২৯২৫১৲
শিক্ষা	৫১৫৬৮৲	৫৫৪৯২৲	বিজ্ঞান	৬৬১৮৲	৭০২৪৲
চিকিৎসা	৩৮৩৲	২৩১৭৲	দেনা	৬২৭৩৲	..
বিজ্ঞান	৮৪৲	৯৫৲	ছাপাখরচ	২২৪১৲	১৮৬
দেনা	২২০১৪৲	...	পেনসনাদি	২৮২৯৲	২৮৫৭
বিবিধ	৬৩৭৲	২৬৪৲	অফিস খরচাদি	৩২০১৲	১৫৭৪৪৲
মোট	২৮৬৪৮৬৲	২৬০৮৪৭৲	মোট	২৮৫০৭১৲	২৮৩২১৩৲

পোস্টাফিস ও তদধীনস্থ গ্রামের নাম ঃ

আতাইকুলা—আতাইকুলা, আলকচর, কুঠিপাড়া, গোবিন্দপুর, চক্‌বায়সা, জগন্নাথপুর, দরি জগন্নাথপুর, দয়ারামপুর, দাপুনিয়া, দেবোত্তর, পাটনিপাড়া, বাজুচপপুর, বিলবারিয়া, বোয়াইলমারি, ভাটিগোসাইপাড়া, মঙ্গলগ্রাম, মাদপুরা, সরাডাঙি, সোনাবারিয়া।

একদন্ত—আমিরপুর, উগ্রগর, একদন্ত, কুমিল্লী, গঙ্গারামপুর, গোপালপুর, গুরুবাসী, চণ্ডীপাসা, চাচকিয়া, চান্দাই, চালা, চৌবারিয়া, চৌকিবাড়ি, জমাইখিরি, জোয়ারদহ, ডেঙ্গারগ্রাম, ত্রিমোহনী, নরজান, নিয়ামতপুর, পরাণপুর, মহেশপুর, যাত্রাপুর, রামনগরপাড়া, বোগাদি, শিবপুর, ষাইটগাছা, সলইপুর, হিদাসখোল।

দাপুনিয়া—কাকরকোলা, কামারগ্রাম, গোঁসাইরামপুর, চক্‌কাচনা, চরদাদপুর, চাঁদপুর, ছয়ঘরিয়া, টিকরি, চরকাতরা, চরখোকরা, চরমাদপুর, ঠক্‌ঠকিয়া, ঠকপাড়া, তবলপুর, তিনগাছা, দরিকামালপুর, দাদপুর, দুর্গাপুর, দাপুনিয়া, দিগসাইল, পাঁচবারিয়া, বাঙাবারিয়া, বাঁশেরবাদা, বেঙগাড়া, বেজপাড়া, ভাজপাড়া, মাদপুর, মিরজাপুর, রাখালগাছি, রূপপুর, সাহাদিয়ার, সোমসপুর, হাতা।

দুবিলা—কাঠালি, কোলাদি, খালিসপুর, গোয়াইলবাড়ি, চর দরি ভাউডাঙা, টাটিপাড়া, দরিভাউডাঙা, দাসপাড়া, দুবলিয়া, পারচিথলিয়া, পাটুয়া, ফারাদপুর, ভাউডাঙা, লক্ষ্মীকোল, বালিয়াডাঙি, বিজরামপুর, শ্রীকোল, শ্রীরামপুর, সাদুল্যাপুর, হাপানিয়া।

দোগাছি—আরঙ্গাবাদ, আরিয়াবাধা, কায়েমকোলা, কুলনিয়া, কৃষ্ণপুর, খয়েরশুতি, খোর্দচাঁদপুর, গামুয়াভাড়ারা, ঘোড়দহ, চকপুকুর, চকগঙ্গাধর, চকদুবলিয়া, চরভারারা, চরবাসুদেবপুর, চররাণীনগর, চরসদিরাজপুর, চরপীরপুর, রামবল্লভপুর, চরমধুপুর, চররাধাকান্তপুর, চরকুলনিয়া, চিথলিয়া, জহিরপুর, ডিক্রিরচর, [illegible]লাবারিয়া, দিগলকান্দি, দুপখোলা, দেবালয়, দোগাছি, ধোপাঘাটা, নলদহ, নাওদারা, নাছিপাড়া, নিমতলা, পিপয়ি, ভাড়ারা, মহাদেবপুর, মনোহরপুর, মাদারবারিয়া, মুকুন্দপুর, মুনীষপুর, রাঘবপুর, লড়িবাঁটা, বকসীপুর, বাউলচরা, শ্রীপুর, হরিনারায়ণপুর, হলুদবারিয়া।

মালঞ্চি—আকবপুর, ইসমাইলপুর, কবিরপুর, কাকরকাটা, কামারগ্রাম, গয়েশপুর, গজমতিকুণ্ডা, জালালপুর, নলমুড়া, নস্করপুর, পয়দা, পারনলমুড়া, ফকিরপুর, বহলবারিয়া, বাদিয়াখালি, বাসুদেবপুর, বেড়াপাড়া, ভবানিপুর, ভুরভুরিয়া, ভুরামপাড়া, মহেন্দ্রপুর, মালঞ্চি, রহিমপুর, রাজাপুর, লস্করপুর, সাহাদিয়ার, সালাইপুর, সেখপুর, হয়দারপুর, হামচিয়াপুর, হারিবারিয়া।

শাঁখারিপাড়া—কাঁকলাখালি, কাঠালবারিয়া, কাছারপুর, কামারডাঙা, কুচিয়ামোড়া, কৈজুরি, গঙ্গারামপুর, গুরুবাসী, চরমপুর, চরপাড়া, চরশ্রীপুর, তেলিগ্রাম, দমদমা, দরিনন্দনপুর, দরিশ্রীকোল, দুর্গাপুর, ধরমগাঁও, ধলিপাড়া, নন্দনপুর, পদ্মলোচনপুর, পুষ্পপাড়া, পীরগাছা, পীরপুর, মাদপুর, মাদারগাছি, রাণীগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, লোহাগাড়া, বনগ্রাম, বোয়াইলমারি, শাঁখারিপাড়া, শিমুলচড়া, সবুরদিয়ার, শ্রীপুর, সারদিয়া, সোনাপুর, স্বরূপপুর, হাপানিয়া।

হিমাইতপুর—আফরী, কাশীপুর, কুমিরগাড়ি, গাছপাড়া, গোপালপুর, চরকৃষ্ণদিয়ার, চরভবানীপুর, ছাতিয়ানী, চরসানিরদিয়ার, চরউদয়পুর, চরজয়ানপুর, নাজিবপুর, পাটকাবাড়ি, প্রতাপপুর, বারইপাড়া, বাহাদুরপুর, বিলভেদুরী, বৈকুণ্ঠপুর, মনসারপুর, রামানন্দপুর, হিমাইতপুর।

সাঁড়া—গোয়ালপাড়া, গোপালপুর, চান্দারিপাড়া, ঝন্দিয়ার, পিয়ারপুর, ফিসঘাট, মরাদাপাড়া, যুক্তিতলা, রাঘবপুর, বকসিপুর, বামনগ্রাম, সাঁড়া, সিভিলহাট, হোসেনবাগ।

ঈশ্বরদি—অরণকোলা, আরকান্দি, ইস্টা, ঈশ্বরদি, কোটারদিয়ার, টেঙ্গরি, থাকচক্‌, নরচিয়া, ভুতাগাড়ি, ভেলুপাড়া, মউবারিয়া, মাজগ্রাম, মাখনগ্রাম, শ্রীরামগাড়ি, হিমাইপাড়া।

দাশুরিয়া—আটঘরিয়া, কাচুয়া, কোলেরকান্দি, খিদিরপুর, গঙ্গানাথপুর, গোকুলনগর, গোয়ালবাথান, চরবহরপুর, চরমিরকামারি, দরবেশপুর, দাশুরিয়া, দুবলাচরা, ধুলাতি, নওদাপাড়া, নিকরহাটা, পূর্ণকলস, ভারইমারি, মাজপাড়া, মারিম, মিরকামারি, রমেশপুর বাজার, রামচন্দ্রপুর, বড়সাদিয়া, বরইচরা, বাশিপাড়া, শ্রীপুর, শ্যামপুর, সরইকান্দি, সঙ্গতিয়া, সুলতানপুর, শেখপাড়া।

দেবোত্তর—অভিরামপুর, আটঘরিয়া, উজানগ্রাম, উত্তরচক, কদমডাঙা, কাশীনাথপুর, কোদালিয়া, চাঁদপুর, চাঁদভা, দরবিল, দরিকামালপুর, দেবোত্তর, ধলেশ্বর, নাগদহ, নারায়ণপুর, পুস্তিগাছা, ফলিয়া, ভোজন্দ্রাপুর, মতিগাছা, মাটিয়াবাড়ি, মিয়াপাড়া, মুনিদহ, রঘুনাথপুর, রাইপুর, রাধাকান্তপুর, রাণীগ্রাম, রামচন্দ্রপুর, রামনগর, রোস্তমপুর, বরুবিয়া, বারইপাড়া, বিলকুলা, বিশ্রামপুর, শ্রীকান্তপুর, সবডাঙা, সরাডাঙা, কলাবারিয়া, সাহাপুর।

ধাপারি—আসনা, আরামবারিয়া, ইলসামারি, কোমরপুর, গোকুলনগর, গোয়ালপাড়া, ধাপারি, বিলবাগনি, মহাদিমচর, মাজদিয়া, মাজপাড়া, সাদিপুর, সিমলচরা, সুখেরচক।

পাক্‌সি—পাক্‌সি, (বিভিন্ন পাড়া) রূপপুর।

পাকুরিয়া—কানাইনগর, কৈকুণ্ডা, চররূপপুর, জয়নগর, দাদাপুর, দিয়ারবাঘল, নরুল্লাপুর, পাকুরিয়া, মহাদেবপুর, মানিকনগর, লক্ষ্মীকুণ্ডা, বাহিরচর, সাহাপুর, বিরাহিমপুর।

দিঘা—আওতাপাড়া, কদিমপাড়া, কামালপুর, গড়গড়ি, চরকাতরা, চরকুরুলিয়া, চরগড়গড়ি, চরদইপাড়া, তেলিসোড়া, দিঘা, প্রাণনাথপুর, বাটকেমারি, বাবলচরা, বিলকাদা, রামচন্দ্রপুর, রামনাথপুর, শিবরামপুর, শিলিমপুর।

চাটমোহর—চাটমোহর, বালুচর, বোথর, চিরাইল, ছোটশালিখা, দলঙ্গ, গুয়াখরা, কুমারগাড়ি, নূতন বাজার, রামনগর, শাররা, আনকুটা, আটলঙ্কা, বাসুদিয়া, বাংলা, বাহাদুরপুর, বামনগ্রাম, ভবানীপুর, চাকুওলি, দিলালপুর, দাঁতিয়া, ধানবিলা, ঘসিখোলা, হাসাইখোলা, হগলবারিয়া, কামালপুর, কয়রাপাড়া, কাঠালবাড়িয়া, কানটুলি, কয়রাবারিয়া, কেশবপুর, কুবিরদিয়ার, লোপাটিয়া, নড়াইলধালি, নেউতিগাছা, নেঙরিকৃষ্ণরামপুর, রতনপুর, সাহাপুর, শিবপুর, পাচুরিয়া।

অষ্টমনীষা—অষ্টমনীষা, বরদানগর, বেলগাছি, বিন্নাবাড়ি, বওসাঘাট, ব্রহ্মপুর, চরমথুরাপুর, চরপাড়া, চরপৈলানপুর, চিনাভাতকুরা, ডাহাপাড়া, ধনকানিয়া, গয়ারনগর, গজারমারা, গোবিন্দপুর, হরিহরপুর, ঝপঝপিয়া, কেরোকোলা, কুকরাগারি, লামকান, মথুরাপুর, মোউহাট, নাটাবারিয়া, নুরনগর, সেনগ্রাম, সাহানগর।

আদাবারিয়া, বানিয়াবহু, বাঁশবারিয়া, বাঁশুরিয়া, ভঙ্গজোলা, বিষ্ণুপুর, বিশ্বনাথপুর, বাবইহাট, চকভবানীপুর, গাদাইহুপসী, গারুপুর, ঝিনাইগাড়ি, জন্‌কা, কাছিছেড়া, কলকতি, কয়রা, মৃজাপুর, নওবারিয়া, পরমানন্দপুর, পাটুল, পুকুরপার, রঘুরামপুর, রূপসী, সিঙ্গগাড়ি।

গুণাইগাছা—বড় শালিখা, বড় গুয়াখড়া, গুয়াখড়া, জালেশ্বর, কুঠি শালিখা, মল্লিকচক, পারশালিখা, বিজপাড়া, বামনগ্রাম, বোয়াইলমারি, হিয়ালদহ, জাবরকোল, কৃষ্ণপুর, মধ্য শালিখা, পাথাইলহাট, রামচন্দ্রপুর, শুইগ্রাম, সন্তোষপুর, শুয়ারভাঙা, জগতলা, গুণাইগাছা।

হাণ্ডিয়াল—হাসুপুর, বল্লভপুর, দেতলবারিয়া, খরপুকুর, দরাপপুর, বেজহাতিয়ালা, স্থল, ভেঙ্গরি, বেলাই, রামনগ্রাম, ছাইকোলা, কাঠেঙ্গা, লাঙ্গলমোরা, চারুয়ালিন, দিঙ্গলগাড়া, চরমধুপুর, কাবারচর, নলিন, চরছাইকোল, নলডাঙা, মারুয়া, তেহাপাড়া, বাগলবার, হামকুড়া, মহেশরোহালি, মদনমোহনপুর, মণিরভিটা, মিয়াপাড়া, রায়নগর, করাতকামলী, মিসনুখার, সুলতানপুর, খানমরিচ, মরিচপুরাণ, হেলচর, মুণ্ডমালা, মহিষবাথান, ঘোরবেলাই, দাসবেলাই, সারঘাটি, কেশবপুর, চণ্ডীপুর, বেরাইনগর, জগদীশপুর, গগণপুর, কৈহোগলবাদ, পুণ্যরাধালি, বড়হাওনি, তরণিপুর।

হরিপুর—আদগ্রাম, আগশুঙ্গাইল, বুড়িপাড়া, বোয়াইলমারি, ভারত, বরণি, চরইকল, চণ্ডীপুর, চামটা, চৌমোহন, ধুলাউরি, দাসপাকিয়া, দাড়ীকুশী, দিঘাইর, ধরাইল, দিয়ারপাড়া, গোপালপুর, গরফা, হরিপুর, জোনাইল, জনলিপুর, কাটাখালি, মল্লিকপট, মানইর, মোশুলিপুর, নাজিরপুর, সরাবারিয়া, শ্রীধরপুর, সোনভা, শুঙ্গাইল, সোনগ্রাম, তেবারিয়া, পাঁচবারিয়া, রামপুর, কুশমাইল।

পার্শ্বডাঙা—আলমনগর, আলীপুর, আরিগাঙ্গাইল, অর্জুনপুর, ববেড়কোনা, বোয়ালিয়া, বনগ্রাম, চণ্ডীদুয়ার, চাটরা, হাটগ্রাম, জামালপুর, খোটাবারি, খিতাভাগা, কৃষ্ণপুর, মধুরগাতি, পবাখালি, পার্শ্বডাঙা, রাউতকান্দি, সজনাই, শ্রীদাসখালি, টেঙ্গরজানি, বলরামপুর, বালুদিয়ার, বালুঘাটা, রাইখোলা, বালদিমারা, চকধারিপুর, চকমারাম, ধামাইগাটা, দিঘুলিয়া, ফলিয়া, ফৈলজানা, ফুলবারি, হাদল, গোয়ালগ্রাম, গররি, জগন্নাথপুর, ঝরঝরিয়া, কেশবপুর, কালিকাপুর, কাচিয়া, কদমতলি, কুয়াবাসী, কৈলমহাল, কচুগাড়ি, লক্ষ্মীপুর, মসিয়ামোরা, মেঘারপাড়া, মৈদ, পাইকপাড়া, সুজাপুর, সাইশাই, তারাপাশা, নইনগর।

শিতলাই—বেজপলিয়াথ, বানিয়াবহু, ছাইঘাটি, চুরকজা, রানী, চক্‌দিঘি, দরপপুর, ধর্মগাছা, দহরিগ্রাম, গদাইরূপসী, হাসামপুর, জয়ঘর, জয়রামপুর, কোলা, করতকান্দি, খন্দবারিয়া, মাজগ্রাম, মহরকপুর, মোকাখালি, নন্দীমরিচ, নিমাইচরা, শিতলাই, সমাজ, সাতবারিয়া, সিদ্ধিনগর, শিবরামপুর, কুমিল্লী।

বনওয়ারিনগর—পার ফরিদপুর, রামনগর, বিলবকরি, দেওভোগ, বেতওয়ারা, ভাঙাবাড়ি, হাগড়াগাড়ি, কেচুয়াপাড়া, কৃষ্ণনগর, লক্ষ্মীকোল, চিথলিয়া, বেসনালিয়া, খলিসাদহ, খাগরবারিয়া, সাভার, সাগরকান্দি, ভেরামারা, চরপাড়া, চককয়া, কালিকাদহ, মাদারনগর, নেচরাপাড়া, পাতিলাপাড়া, ফুলদহ, সিমলতলা, টিয়াপাড়া।

ডেমরা—ডেমরা, ভাঙাদহ, নাগডেমরা, পাথাইলহাট, নারিন্দা, খিদ্দরৈগ্রাম, বহলবাড়ি, বাউসগাড়ি, লক্ষ্মীপুর, চাপরি, ডহরজানিপুর, ধুলাউরি, ভবানীপুর, চরপাড়া, রামকান্তপুর, ফুলবাড়ি, মদনবারিয়া, সেন্দিঘলিয়া, সিলন্দহ, সোনাকন্দ. শুকপাল, ডাকবারিয়া, খন্দপুরা, কালিয়ান, মাজট, রতনপুর, বিলচন্দক, খাগুরিয়া, সেন্দিঘলিয়া, সিলন্দহ।

গোপালনগর (পাবনা)—গোপালনগর, সোনাহারা, রাউতনাগদহপাড়া, পাঁচুরিয়াবাড়ি, বাদল, মানানগ্রাম, মঙ্গলগ্রাম, কুচলিয়া, বন্নাকান্দি, ভুতিয়াপাড়া, ব্রেধাপাড়া, হারোডাঙা, চরপাড়া, চকচাচকিয়া কাশীপুর, দহকালাদহ, মাশুয়াকাটা, দেবোত্তরপাড়া, গোলকাটা, দত্তপুঙ্গলি, মধ্যপুঙ্গলি, পাচপুঙ্গলি, নারায়ণপুর, বৈরাপাড়া, কানাই, আজকান্দি, বাসুরিয়া, জন্তিয়ার, কানিয়াকৈর, সুজা, কাজিটোল, পরিন্দাপুর।

নরদহ—আলুকদয়ার, বৃসলঙ্গী, বরওয়ানী, ভবানীপুর, চাপরী, চরপাড়া, চৌবায়িয়া, ধুলাউরি, ডহরজানি, হরিপুর, কাশীনাথপুর, গশোবারি, মঙ্গলগ্রাম, মাদারবারিয়া, নরদহ, নূতনপাড়া, ফুলবাড়ি, পাকাসিয়া, পিরহাটি, রাউতি, তারাখদা, রমাকান্তপুর।

সাঁথিয়া—আমস, বিলমহিষারচর, ভবানীপুর, বন্দিরামরচর, চমরণুর, দৌলতপুর, গোপীনাথপুর, গাগরাখালি, হরিকাহন, হুইখালি, হেঙ্গুয়া, কাজিপুর, কোনাবারিয়া, কোলইচরা, লক্ষ্মীপুর, নওআলি, সাঁথিয়া, সালঘর, সৈয়দপুর, শিবরামপুর, সাত আনিরচর, বোয়াইলমারি।

ধোপাদহ—চকমধুপুর, দয়ারামপুর, এলঙ্গী, গোপালপুর, হলুদঘর, খানমামুদপুর, মটকা, মন্মথপুর, মেলিয়াপুর, নারিয়াগদা, প্রাণগোপালপুর. পরাট, পুটিগারা. পাঁচকান্দি, রুদ্রগাতি, সলঙ্গি, তেথুলিয়া, ভাটপারাখান, মামুদপুর, ধোপাদহ, কাসিয়াবারি, কুমিরবোয়ালিয়া, চরপুটিগারা, ক্ষিদ্রহলুদঘর।

নন্দনপুর—সুরাপ, সোনাদহ, সুন্দরকান্দি, বিয়ানাপাড়া, রাঙামাটি, আলকদিয়ার, ভিন্নগ্রাম, চরপারাতেঁতুলিয়া, চৌবারিয়া, চুলকুটি, দেওগ্রাম, ফকিরপুর, তেথুলিয়া, গণেশপুর, জোরগাছা,

যুগীবারী, কৃষ্ণপুর, কুলাগাও, ক্ষিদ্রহাপানিয়া, খুরিবারিয়া, হাপানিয়া, শ্যামপুর, হাটবারিয়া, হাট হাটবারিয়া, মহেশপুর, নন্দনপুর, পাকুরিয়া, পাতাবিলা, পিয়াদহ, পুরাণপাড়া, তেঁতুলিয়া, পুষ্পপাড়া, পাইকষা, রামচন্দ্রপুর, রাউতি, শঙ্করপাশা।

দুলাই—দুলাই, বাদরপুর, চরগোবিন্দপুর, আত্রাইশুকা, বিষ্ণুবারিয়া, পাগলা, কলাগাছি, শিবরামপুর, বিরাহিমপুর, কল্যাণপুর, দুর্গাপুর, আল্লাদি, চণ্ডীপুর, হেহেদিনগর, জোরপুখুরিয়া, চিনাখরা, আন্দারকোটা, বামনদি, রাইশিমূল, শান্তিপুর, ঘোরাদহ, তেরিলা, খোর্দরাপুর, পাইকপাড়া, বাগনেমি, চরদুলাই, বাতুল, সারিরভিটা, চরবারিয়া, চরদুর্গাপুর, পিত্রীপাড়া, বিলদিঘা।

খেতুপাড়া—বগপুরা, বালিয়াডাঙা, বিষ্ণুপুর, চরমাছখৈর, চকগোপীনাথপুর, চক্‌বাপাট্টা, ধতালপুর, গোলবারি, গোয়ালবারিয়া, গঙ্গারামপুর, গৌরীপুর, ঘুঘুদহ, হোসেনপুর, ইকরজানা, সলইচরা, মাছখালি, মাজগ্রাম, পাইকপাড়া, রায়েকমারি, খেতুপাড়া।

বনগ্রাম—বনগ্রাম, রসালপুর, ভদ্রখোলা, মামুদপুর, চরথদ্রখোলা, চাঁদপুর, মেওয়াপুর, গাঙহাটি, চরপাড়া, বালিয়াডাঙি, রেওয়াপুর, কুমিরগারি-পদ্মাবিলা, ভৈরবপুর, ভবানীপুর, হোগলাভাঙি, বহলবারিয়া, বামনডাঙা, বেতারিপাড়া, হোইজোর, জৈলগারী, যশমগুদুনিয়া, রাজপুর, সরদারপুর, কিসমত দহরপাড়া।

কাশীনাথপুর—কাশীনাথপুর, শিবপুর, হরিদেবপুর, বরাটছাতক, দারিয়াপুর, ইন্দ্রাপুর, গোপালপুর, কাবারিখোলা, খৈজুরা, নানিপাড়া, আত্রাইশুকা, সাটিয়াখোলা, আহম্মদপুর, রোয়াকিয়া, ফকিরপুর, মরিচপুরাণ, মৈস্থা, নয়াবারি, টাঙ্গরি, মানুসারা, কপাজকান্দা, দক্ষিণচর।

পাইকরহাটি—পাইকরহাটি, আফরা, পুন্দিয়া, মহিষাখোলা, বাইটোলা, দত্তপাড়া, বরগ্রাম, শ্মশানারী, রামখাদ্রবাড়ি, করিয়াল, কুসিয়ানা, বাগজানা, নন্দীসুধা, সগুনপাড়া, শামুখজানী, শ্রীধরকণা, উত্রাইল।

রাজনারায়ণপুর—বসন্তপুর, চরকান্দি, দাঁতিয়া, মহিমানগর, নন্দীয়ারা, রাজনারায়ণপুর।

তাঁতিবন্দ—তাঁতিবন্দ, অচরাডাঙি, বেরাদুলিয়া, চণ্ডীপুর, চৈত্রহাটি, হুদারপাড়া, কৈবিলা, কামারদুলিয়া, কাজিপুর, ক্রোকদুলিয়া, ফুলালদিয়া, রামজীবনপুর, তারাবারিয়া, উদয়পুর।

সাতবারিয়া—সাতবারিয়া, সিংহনগর, সিন্দুরপুর, কন্দর্পপুর, শ্যামনগর, নারুহাটি, হরিরামপুর, গোপীলপুর, ডাঙিপাড়া, ভাটপাড়া, খেতুপাড়া, মাচপাড়া, দিয়ারপাড়া, তিলমাদিরা, মালিফা, বিলমাদিরা, ভিটবিলা, নিশ্চিন্তপুর, মোমরাজপুর, ফকিরপুর, কাদোয়া, তারাবারিয়া, জনকোলা, কুরিপাড়া, হেমরাজপুর, মজিৎপুর, চরলক্ষ্মীপুর, গোপালপুর, কাঁচারি, খয়রাণ, দুর্গাপুর, সাহাপুর, উপেন্দ্রনগর, মাণিকহাট, গাবগাছি, কাকিয়ান, দাসপাড়া, তৈলকুণ্ডা, রামচন্দ্রপুর, বনকোলা, উলটচণ্ডীপুর, টেঙ্গমারা, রাঘবপুর, বিন্নাডাঙি।

সুজানগর—সুজানগর, ভবানীপুর, মথুরাপুর, নারায়ণপুর, রাধানগর, বারইপাড়া, মধুপুর, বলরামপুর, খাঁরপাড়া, নেউগিরবনগ্রাম, মানিকদির, কৃষ্ণপুর, ভায়না, চলনা, চরতারাপুর, মঠপাড়া, গোকুলপুর, আরিয়াডাঙি, চকসরাই, রাণীনগর, হোগলাডাঙি।

বেড়া—বনগ্রাম, বেড়া, সালিখাপাড়া, চরপাড়া, হাতিগারা, নলিয়াপাড়া, নূতনপাড়া, মৈত্রবাদা, করঞ্জা, সরিষা, সোনাতলা, দত্তকান্দি, সানিলা, জোরদহ, ভেতপাড়া, বঙ্গবেরিয়া, বড়শিলা, পাটগাড়ি, চয়রা, আমাইকোলা, বাচামারা, পাইখন্দ, পায়না, শম্ভুদিয়া, ভোরাখোলা, চিথুলিয়া, দেওয়ান, তারাতিয়া, আন্দারমানিক, ভায়না, ভেটোগারিয়া, চরবাইন্না, ধুনাইল, গোবিন্দপুর, জামাইপাড়া, করসালিখা, পারপাইখন্দ, সন্তোষবায়া, মঙ্গলগ্রাম, পানিসাইল, আটিয়াপাড়া, বরদিয়া, মেলাদিয়া।

তলট—ছেঁচানিয়া, কেচুয়ান, তলট, তেঘরিয়া।

নাকালিয়া—নাকালিয়া, চরনাকালিয়া, চরপেচাখোলা, হরিরামপুর, মালচকপাড়া,

নয়ানপুর, পেচাখোলা, সাধুগঞ্জ, আগসিমুলিয়া, আরালিয়া, আসরবপুর, বাঁশা, চান্দাইর, চরসারাসিয়া, বাঙলা, চরউমিরপুর, ধুপালিয়া, দত্তকান্দি, মল্লিকপুর, মেনিদিয়া, শৈলজানা, সারাসিয়া, ঐ বাজার, সলঙ্গি, মধ্য সিমুলি, উমীরপুর, শৈলখালি।

চকচাপরি—চাকলা, দমদমা, দুদুলিয়াকোল, হাটুরিয়া, জগন্নাথপুর, খগছরা, মোহনগঞ্জ, নলডাঙা, পাঁচুরিয়া।

নূতন ভারেঙ্গা—বকচর, বাতিয়াখরা, দিঘলকান্দি, জয়নগর, কৈটোলা, মানিকনগর, মরিচাপাড়া, নূতন ভারেঙ্গা, সিমুলিয়া।

পুকুরপার—ভাঙুরিয়া, বরইচরা, ধরপাড়া, ধোপাকোলা, কাথিয়া, মহারাজপুর, নগরবাড়ি, পুকুরপার, তারাটিঙ্গরা, গঙ্গাদিয়া, বিনোদপুর, গনপথদিয়া, গজারিয়া, কদিমী, খলসি, লক্ষ্মীপুর, রামনগর, সরিপপুর, সুলতানদিয়া, নূতননগর।

কালিকাবাড়ি—কালিকাবাড়ি, দরিস্বরূপপুর, ভবানীপুর, খাঁপুর, নূতনহাট, পাইকন্দ, কাজিস্বরূপপুর, রাজধরদিয়া, গোপালপুর, বেতাই, শুকলিয়া, পুরাণভবানীপুর, ইয়ারপুর, কাঁচাদিয়া, নতিপুর, ধালা, খয়েরকান্দি, পট্টভাঙা, চরবিষ্ণুদিয়া, দাসপাড়া, জয়কৃষ্ণপুর, চরমহিষকোলা, কাঁচাদিয়া।

খলিলপুর—খলিলপুর, হাসামপুর, মুরারীপুর, সাগোজ, সোলাকুরা, শঙ্খদাহ, মোল্লাকান্দি, পুটিগারা, কুমুরিয়া, ঘরগ্রাম, বুলচন্দ্রপুর, বরভারিয়া, পরাণপুর।

নাজিরগঞ্জ—নাজিরগঞ্জ, বরখাপুর, মহবতপুর, চররাণীনগর, নরসিংহপুর, নারায়ণপুর, বালিয়াডাঙি, গোপালপুর, ভাদরবাঘ, সৈদপুর, দুরিয়া কামালপুর, হাকিমপুর, কামারহাট, যাত্রাপুর, গোয়ারিয়া, নয়াগ্রাম, মাছপাড়া, মোহনপুর, উদয়পুর, মালিফা, হাটখালি, ইন্দ্রজিতপুর।

মাসুন্দিয়া—আমিরাবাদ, আবদুল সুকুর, বামনদি, ভুএগ্রাপাড়া, চরযদুপুর, দয়ালনগর, ফকিরকান্দি, গোবিন্দিয়া, দরি মালঞ্চি, কদিম মালঞ্চি, খামারপাড়া মালঞ্চি, মাসুন্দিয়া, কাজি মাসুন্দিয়া, মহিষকোল, পাইখন্দ, রতনগঞ্জ, রূপপুর, শিতলপুর, শ্যামপুর, ত্রিমোহনী, তাকিমনগর, চরদুর্গাপুর, দরিদর, কামারপুর, রামনারায়ণপুর, বালন্দরি।

সাগরকান্দি—আমিরাবাদ, বরুরিয়া, বাদাই, বামনপুর, বরুরিয়া ভাতসালা, ভাটিকায়া, ভুরকালিয়া, চরগোবিন্দপুর, গোবিন্দপুর, হাবাজপুর, যদুপুর, কদমতলী, কয়া, লাখেরাজ, মুধিয়ারকান্দি, পিয়ারপুর, পিরানীতলা, রাণীনগর, পুকুরনিয়া, সাগরকান্দি, সাতানি, তালিপনগর টাকিগাড়া, ঠাকীরাণপাড়া, শ্যামগঞ্জ, গোয়ালকান্দি, শ্যামসুন্দরপুর, বালিয়াডাঙি, দেবজানী, কুঠিবাড়ি, সাতানিপাড়া, দরিচর, চরদুর্গাপুর, চরনন্দলালপুর।

পুরাণভারেঙ্গা—ভবানীপুর, দেওনাই, গাগ্রাজানী, জোয়ারিয়া, মথুরা, মুলকান্দি, নলকোলা, পুরাণভারেঙ্গা, পেঙ্গুয়া, চর পেঙ্গুয়া, সিংহাসন।

নলকোলা (আমিনপুর)—নলকোলা (আমিনপুর), সাখিনী, মির্জাপুরবাগ, সিন্দুরী, সৈদপুর, কয়া, একরামপুর, সন্ন্যাসীবাদা, দয়ারামপুর, চককৃষ্টপুর, তুরফুলিয়া, চরপাড়া, চকভরিয়া।

রঘুনাথপুর—দাঁতিয়া, ঘোপসেলন্দা, যদুপুর, কৃষ্ণপুর, মধুপুর, নটাখোলা, প্রতাপপুর, রঘুনাথপুর, রাণীগ্রাম, রাসাকপুর।

সাফল্লা—চর ভারেঙ্গা, চকপাড়া, ধলথোপ, ঘাসিহাটা, ঘিয়ার, মাদলা, মারেচপাড়া, মাসখালি, নেউগিপাড়া, রাখসা, সাফল্লা, তারপাশা।

সিদ্ধান্তবাগমারা—বাগমারা, বিলচাটরা, বাগমারা, বাজার, হাজরাপাড়া, বক্তারপুর, বোশামারা, সিংহাসন, সাতানিপাড়া।

ভারেঙ্গা—ভারেঙ্গা, বাতাসি, বাগসোয়া, গোপীনাথপুর, কল্যাণপুর, পেঙ্গুয়া, তারানগর।

সিরাজগঞ্জ—আঠারটুকুরপাড়, বাণিয়াগাতি, বাগাদহ, বাহিরগোলা, বৈদ্যবাড়ি, বনবারিয়া,

বড়পিয়ারী, বিয়ারা, বেতিয়া, বানিয়াবাড়ি, বঙ্গপল্লী, বরঅল্লুদেবপুর, বরকান্দি, ভাঙাবাড়ি, বাসুনীয়াবিয়ারা, বিন্দুপাড়া, বাইটকামারি, বড় কয়েরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বেটাচকন্দ, ছোটপিয়ারি, চিথলিয়া, চরবনবাড়িয়া, চররাইপুর, চাকলাপাড়া, চক্‌সিয়ালকোল, চণ্ডালয়ারা, চরখোকসাবাড়িয়া, কোনবন্দর, ছোটকয়রা, চন্দ্রকণা, চরপাড়া, কতকোপদাসপুর, দৌলতপুর, দোয়াতবাড়ি, দোগাছি, ধুবাপাড়া, দিয়ারধানঘরা, দিয়ারবৈদ্যনাথ, ধানঘরা, ধুলিয়াটা, দিয়ারপাঁচিল, একদন্ত, গুণেরগাতি, গয়লা, ঘুরকা, হাটবয়রা, হলদিয়া, জামুয়া, জানপুর, জিয়ারপাড়া, কালীপুর, কাওয়াখোলা, কাটাখালি, জিলারপাড়া, খোকসাবাড়ি খিদ্রিয়ান, খালিসকুড়া, কৈসাআটাবিয়ারা, কোপদাসপাড়া, কুড়িপাড়া, কাশীনাথপুর, কুশাহাটা, খুবিবিয়ারা, খোট্টা, কাদাই কল্যাণী, খোর্দশিয়ালকোল, মৌসুমী, মদনগাতি, মালসাপাড়া, মজুমদারবিয়ারা, মাসিমপুর, মামুদপুর, মোরগাঁও, নদাসালিয়াবাড়ি, নন্দতেলকুপি, নগরকান্দি, পুটিবাড়ি, পাকুরিয়া, পাইকপাড়া, পশ্চিমপাড়া, রাণীগ্রাম, রামগাতি, রোহাবাড়ি, রাইপুর, সালিসবাড়ি, সামাভিটা, শিবনাথপুর, ছাতিয়ানতলী, শিয়ালকোল, সলঙ্গা, সয়াগোবিন্দ, শুটকিয়াবাড়ি।

কাজিপুর—কাজিপুর, কবিহার, কুনকুনিয়া, গোরাবেড়, গদাগাড়ি, চালতাডাঙা, ডোমপাড়া, দুরগালিয়াপাড়া, পাইকরটালি, পীরগাছা, বরইটালি, বর্শীভাঙা, ভবানীপুর, মানিকপাতাল, মেঘনাই, মেরারবাড়ি, মাথাইলচাপড়, রোহাবাড়ি, রসিকপুর, লক্ষ্মীপুর, সাউতলা, সিমুলদিয়ার, সাতকয়াহাতসিরু, হাজরাবাটি, আলমপুর, শ্যামপুর, জোরগাছা, জগৎসিংহ, নাটওয়ারপাড়া, তেকানি ফুলজড়, মাইজবাড়ি, শিমুলতলা. হাতগাছা, কালিকাপুর, কুড়িপাড়া, কুরালিয়া, খুদবন্দি, খুকসিয়া, খাসারপাড়া, গান্ধাইল, চিলগাছর, টিকরিবিল, দুবলাই, নয়াপাড়া, পাটগ্রাম, বাওইখোলা, বারইটোলা, বারিপাটুল, বিয়ারা, ভেরুয়া, মৈসামুড়া, উদগাড়ি, উল্লাপাড়া, রতনকান্দি, কাচিপুর, বেতগাড়ি, কুলকুনিয়া, সিঙ্গারাবাড়ি, ধিনকুড়িয়া, ফকিরপাড়া, বড়ইটুলি, বেলতৈল, মাশুয়াকান্দি, মেঘাই, মাণিকপাটুল, ধুলাউরি, বাজনুঠাটা. বাদুয়ারপাড়া, বিশুরিগাছা, মেওয়াখোলা, যুক্তিগাছা, শ্রীপুর, হাটগাছা, সিন্নরচর, মৈসধারা, খাসপিরি, গন্দারভাগ, বিলচলুল, কান্তনগর, খুদবন্দি, চরভরঙ্গী, চরসিগ্রাবাড়ি, পিয়াজপাড়া, বিরভুরাঙ্গী, বীরসিংগ্রাবাড়ি, বেতগাড়ি, ভুরাঙ্গী, মাশকান্দি।

কালিয়াহরিপুর—হরিপুর, শুমকুরিয়া, আরিয়ামসান, বালুকাল, বাগবাড়ি, বাইলপাড়া, বাওইতরা, ভুএগ্রাপাড়া, বড়হামকুরিয়া, চাঁদপুর, চরকালিয়া, চুনিয়াহাটি, চালা, চাকুলি, চরনারায়ণবাড়ি, চরবড়কান্দি, দেড়কালিয়া, কালিয়াহরিপুর, কৃষ্ণপুর, কান্দা, কাজিপুর, কালিয়াকান্দাপাড়া, কয়ালগাতি, খিদিরকালাগাতি, জরিলা, ঝাউল, জগৎগাতি, মাইশুরা, মাথাভাঙা, মৌলবিপাড়া, মামুদাখোলা, নৈলসাপাড়া, নরেনবাড়ি, পাইকযা, রজবনগর, শিবনাথপুর, সারাজপুর, সারাটিয়া, তেঘরি, তেথুলিয়া।

গান্ধাইল—একদালা, আলমপুর, আড়িয়ামোহন, বাজিটোলা, বাহুকা, বসপাটা, বাইসখোলা, বয়রা, বেতগাড়ি, বেড়াচর, বিশারদিদার, চিলগাছা, চাকদাপুর, চড়পাড়া, ডিগ্রিচর, দেডুয়া, দুবলে, গান্ধাইল, গাঞ্জারিয়া, গাজিয়াবাড়ি. গোপালনগর, হাজরাটি, কুরলিয়া, কুমকুমিয়া, কাচিহারা, কালিকাপুর, খুকসিয়া, লক্ষ্মীপুর, মেরারপাড়া, মসিয়ামুরা, পিকুলবারিয়া, পাটগ্রাম, রূপারবেড়, সিঙ্গরাবাড়ি, সোনামুখি, সাতটিকরি, সুপগাছা, টিকরামিতা, ভেনুবাসী, এদ্রা।

মেছরা—আফনিয়া, আদিত্যপুর, আমানুচর, বাহুকা, বলরামপুর. বঙ্কুগাড়ি, বড়বারিয়া, বিলদুয়ারিয়া, বেতুয়া, ভাটপিয়ারি, বিষ্ণুপুর, বয়রাবাড়ি, চরঝুরকিলা. চরিমেরা, চরখারুয়া, ছাননগর, চরসাঁচালিয়া, দহিয়াল, গতিরাচর, ঘাটিয়ারচর. গোরীনাথপুর, ঘোষপাটুল, ইস্টালি, জয়কৃষ্ণপাড়া. ঝুকিল, ঝুমরখুলসা, কলিছা, কেসুয়াহাটা, খরনা, খাসপাড়া, খাসএকডালা, খিদিরপুর, কুলিপাড়া, মানিকখিয়ার, মাটিকোরা, মুহিয়ারপুর, নিসাঙ্করা, নওয়ারপাড়া,

পারমেসরু, প্রস্তকুড়ি, পোলাসতলি, পোটল, রয়নাগড়, সাঁচালিয়া, সিমযা, সুপাগাছা, সুশীমিছরি, তোরাকান্দি, তেঙ্গলাহাহা, রাকসা।

সলঙ্গা—আঙ্গারু, আলিয়াদহ, বনবারিয়া, বরইগাতি, বসিংগাছা, বাসুদেব বিরাট, বেতুয়া, ভরমাহানী, ভেঙ্গনাই, ভূতিয়াচর, রাউলতলা, বুদ্ধরচর, ভারনগর, চকিপাড়া, চরবেড়া, চৌরিয়াআজির, চৌরিয়া, চিনাখরা, দাদনপুর, দত্তকসা, ধোপাকান্দি, ধুপিল, ধুপিলচর, গাজা, গোপীনাথপুর, গুয়ারচর, ঘুপট, হবিবপুর, হরিণচরা, হাসানপুর, হাটি, ইছিদহ, জগজীবনপুর, চণ্ডালপাড়া, ঝাউল, কদিমভোগ, কাঁচিয়ারচর, কাশীনাথপুর, কুমারগাতি, কুটাপারচর, মাগরা, মালতিনগর, মানিকদিয়ার, মসিয়াকান্দি, মথুরাপুর, মমিনসাহী, নৈমুরী, নবপাড়া, পাগলা, পাটধারী, পুস্থিগাছা, রহিমাবাদ, রামনগর, রাণীনগর, রাউদহ, রুহাপাড়া, সাতকুমি, সাতইয়ারা, সতরবারিয়া, সিঙ্গা, সলঙ্গা, শ্রীরামেরপাড়া, তেলকুপী, উত্তরপাড়া, ভর ছত্রপতি।

বাগবাটি—ধনিচর, হরিণা, মালিয়াগাতি, হরিপুর, দত্তবাড়ি, গজারিয়া, পিছলবারিয়া, পানিবাড়ি, আমিনপুর, বিলপাকুরিয়া, ভেওয়ামারা, বেল্লবাড়ি, শ্যামপুর, খোর্দবয়রা, গোবিন্দপাতাল, একডালা, বয়রা, চরবয়রা, ব্রহ্মগাছা, কয়রা, জলাগাতি, বুদ্ধরগাতি, সুবর্ণগাতি, হাসনা, বেনুপুর, চরদকলিয়া, রাজারামপুর, চরব্রাহ্মণগাছা, গোবিন্দপুর, তেবারিয়া, এলঙ্গি, হারানগাতি, বাসুরিয়া, হামনদামন, নয়াপাড়া, বৈদ্যধরপুর, কানগাতি, পোরাবাড়ি, সরাতৈল, দুর্গাপুর, আকবয়রা, চরমিরাখর, কামারগাতি, বেলমালি, সেনপাড়া, বাদুয়াবাড়ি, ফুলবয়রা, দুবরচর, চরজলাগাতি, উপারদের, চরখামারগাতি, রামদিবা, ধুলাউরি, নওদাহরিনা, সিংহিরচর, বাগবাটি।

ফুলকোচা—বেজগাতি, ভুরভুরিয়া, ব্রাহ্মণগাতি, চরআটা, চরসোনাগাছা, চরব্রাহ্মণগাতি, ডাকাতিয়াবাড়ি, ফুলকোচা, গারুদহ, ঘোরাচরা, গোপীলপাড়া, জয়নগর, ঝিনাইগাতি, খাগা, নান্দিনা, নওদাফুলকোচা, পেচিবাড়ি, রাঙানিয়াগাতি, সোনাগাছা, সাহানগাছা।

রায়গঞ্জ—আবাদিয়া, বেথুয়া, বালাকিপুর, চাঁদপুর দাসেওরা, গনগট, ঝাপড়া, কারনাবাড়ি, কাজিপুর, মহেশপুর, মল্লিকচাঁদ, নিচিনপুর, রামতিতা, সানলি, বাগুরিয়া, লক্ষ্মীয়কাল, মকিমপুর, রত্না, হাসিল ভূইএগাতি, ইছলাচণ্ডী, সিয়ানগোপ, দেওভোগ, নিমগাছি, আকাইজানি, আন্দ্র, বাকাই, বিনোদপুর, বাইটফামারি, ভুগত, বাশুল, দশেওরা, ধলিয়ান, ধামইনগর, ফরিদপুর, গোপালপুর, গরতা, হাজিপুর, খরিতলা, ফুলা, ফুলতলা, রূপাখরা, রাজাপুর, শ্রীরামপুর, সামেরঘোণা, সোনাকান্দি, শিকারপুর, দাতিয়া, সোরাইদহ, সরাই, দুর্গাপুর, জোলাগাতি, তাবারিপারা, লক্ষ্মীকোল, মাজপুর, পাইকপাড়া, দুমরাই, লাঙলযোবা, মারদিয়া, রঘুনাথপুর, সামনাই, দুর্গাপুর, হারণি, ইসলা, আকরা,

হাটি কুমরুল—হাটি, কুমরুল।

আটঘরিয়া—আটঘরিয়া, আঙ্গারু, বিলচণ্ডী, বাঁশুরিয়া, বিষ্ণুপুর, চকগোবিন্দপুর, দাদপুর, দরবস্ত, ফরিদপুর, ঘুরকা, গোপীনাথপুর, জয়ানপুর, জগন্নাথপুর, কুমারপুর, মিত্রতেঘরি, নলছা, পোদ্দারপাড়া, রায়পাড়ানলছা, রামপুর, রায়হাটি, সাহেবগঞ্জ, স্থানসিংহপুর, তেলিজানা, ভিখনপুর।

তাড়াস—তাড়াস, আসানবারিয়া, কাজিপুর, ধপ, খুটিগাছা, ঘলচরিয়া, কহিত, উলিপুর, রসিন, শাগুন, সদগুণা, বিনসরা, ঘরগ্রাম, ভাদাস, কুষ্টিয়া, আলকদিয়াব, মাঝিরা, ছনবারিয়া, পাইকর্নিলি, বলবা, গুয়ারেখি, বিধিমাগুরা, লালুয়া, গোরীপাড়া, গুরমা, দেশিগ্রাম, ভরাট, দিঘি, কুসুম্বী, ব্রীথাচন, সিলং, সুবরা, খররুলা, সান্দুরিয়া, বারুহাস, চকরসুলা, গুরপিপল, সাভোর, কলুপাড়া, তেথুলিয়া, সরাবাড়ি, রঘুনিলী, গুট্টা, পুলা, রামকৃষ্ণপুর, মাকরসোনা, সান্দ্রা, কালিদার্সনিলী, মানিকছাপর, মাসদক্ষিণা, শ্রীকৃষ্ণপুর, কুশাবাড়ি, দিঘরিয়া, গোয়ালগ্রাম, গাণ্ডিপুর, রাধাকান্তপুর, গাইলজানি, চরকুশাবাড়ি, মনোহরপুর, মহিষনুটি, হরিসন, মাদারজানি,

সরতান, মাগুরা, তালম, বানিয়াবউ, পরিল, কাঞ্চনশ্বর, বোয়ালিয়া, খরখরিয়া, লাঙ্গলমোরা, তেপুলিয়া, সাখুয়াদিঘি, ফুলসন মানসর, সালোপাড়া, বিন্নাবাড়ি, রাণীরহাট, মাটিয়ামালিপাড়া, যোগীরগাতি, মাগুরাবিনোদ, লন্টা, বিসনহালী, মথুরা, আসানগর, কামারসর, কলামুসা, পামরৌহালী, স.দিপাড়া, সাগলাই, স্বরূপপুর, নাদোসৈদপুর, গাতিপুর, নবগ্রাম, মালসিন, বিলাসপুর, মাধাইনাগর, কুন্দইল, কানসোন, হামকুরা, শিখনপুর, তেথুলিয়া, বস্তুল, দেবিলা, ঝরঝরি, সনধরিয়া, পাণ্ডু, দেবীপুর, সাচনদিঘি, খাসলপুর, খরশ্যামপুর, পাঙ্গুরিয়া।

পাঙাসি—আলুকদিয়া, ভজনদাসগাতি, বামনবারিয়া, বহালী, বাগদমারী, ভাতরিয়া, বারইভয়, বেশপাড়া, বৈকণ্ঠপুর, বেগনাই, রোয়ালিয়াচর, চকনাডোমর, চাঁকল, চরকালিদাসগাতি, চকনার, চরকালিয়াবিল, ডেঙ্গীদওগরগাতি, ধানঘরপার, ধিতপুর, দেউলমুরা, ধর্মদাসগাতি, গোবিন্দপুর, গারুদহ, গদগাভি, গঙ্গারামপুর, গোপালপুর, গোবিনপুর, গ্রামপাঙাসি, হাতেমহাসিল, ইছামতী, জানকীগাতি, কুতবগাতি, কুলিয়াবাড়ি, কোটাল, পঞ্চ, খেতবগাতি, ময়েদারগাতি, মাছুয়াকান্দি, মুক্তারগাতি, মনোহরপুর, মতেখারু, নিজাবগাতি, নমদাসালনা, নাজমসালুলা, নতহরেনা, নরনা, পাচটীকর, পাঙাসি, পেজবপুর, পামসরগাতি, রাজপুর, সিংহেরগাতি, শ্রীদাসগাতি, সবলুসা।

উল্লাপাড়া—চরঘাটিনা, ইনায়েতপুর, ঝিকরা, ঐ বন্দর, কাওয়াক, ঘোষগাতি, খলিপাড়া, কুঠিবাজার, উল্লাপাড়া, বরায়া, বাখুয়া, নগ্রহা, পণগ্রহা, বোয়ালিয়া, ভূতগাছা, ব্রহ্মকপালিয়া, চালা, চরসাতবারিয়া, পূর্বদেউলিয়া, শ্রীকোল, তেতুঁলিয়া, ভদ্রকোল, বেতুয়া, ভেতুকান্দি, ফলিয়া, হাটদেলুয়া, মাগুরাডাঙা, পুকুরপাড়, পূর্ণিমাগাতি, পুঠিয়া, সইবারিয়া।

আমডাঙা—আলুকদিয়া, আমডাঙা, চকআলুকদিয়া, খাসচরজামালপুর, পোড়াঘটি, বাদুল্লাপুর, বাগদহ, পাঁচলা, রসিদপুর, সরাতৈল, তারুটিয়া।

বড়হর—বালরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, গুয়াগাতি, কালীগঞ্জ, মত্রীপাড়া, নবান্নপাড়া, চিলরপাড়া, দখলবারিয়া, দুর্গাপুর, তেথুলিয়া, পেচেরপাড়া, রাঘববারিয়া, রন্যাকান্দি, সদাই।

গয়হাটা—বাঙাল্লা, বানিয়াকৈর, বিনায়কপুর, চণ্ডালগাতি, চয়রা, চেঙ্গটিয়া, ধরাইল, গঙ্গারামপুর, কালাসিংপাড়া, খোসালপুর, কৃষ্ণপুর, মধুকোলা, মহেশপুর, মোহনপুর, মোরদহ, পিয়ারপুর, প্রতাপ, শামলাইদহ, সিমলা, আইলগ্রাম, বরইগাতি, ভয়রা, চন্দ্রগাতি, দিঘলগ্রাম, ফরিদপুর, হাসরা, কোয়ালবেড়, মানিকদিয়ার, নিয়োগীপাড়া, বাস্থলিয়া, রামাইলগ্রাম, সেনগাতি, ভরফভৈয়রা, ভেঙ্গরি, ব্রাহ্মঘিয়ালা, চরইমারি, চৌবিলা, দাদপুর, দাহাপাড়া, ফলিয়া, গোয়াইলবের, গোয়ালজানি, শ্রীরামপুর, গয়হাটা, পারকুলা।

দুর্গানগর—ব্রজপুর, ভট্টকাক, ধলসাবাড়ি, দুর্গানগর, দরিপাড়া, পরালগাতি, হেমন্তবাড়ি, কোণাবাড়ি মণ্ডলজানি, মনোহরা, নেওরাগাছা, নেরছা, নন্দীগাতি, নয়ানগাতি, পাইকপাড়া, পারসনতলা, রাঙলিয়া শ্যামপুর, শ্রীফলগাতি, সেনগাতি, শিবপুর, সিংহগাতি, উল্লাপাড়া স্টেশন।

মোহনপুর—আগমোহনপুর, লাহিড়ী মোহনপুর, ভাদলাইকান্দি, আগকয়রা, বাল্লপাড়া, বামনগ্রাম, বঙ্কিরট, বৈলতৈল, ভাগলপুর, ভাটবেড়া, বর্ধনগাছা, চণ্ডীপুর, চক্‌সা, চকহরিপুর, চিনাধুকুরিয়া, চাচকিয়া, দহকুলা, দুহডাঙা, দত্তপাড়া, এলঙ্গজানি, কয়রা, কামখোলা, কৈবর্তগাতি, মহিষাখোলা, মধুপুর, মুলবেড়া, নন্দীবেড়া, নন্দ, পাতিয়াবেড়া, রুদ্রগাতি, রাজমান, রাখালগাছি, বাউতান, রতনদিয়া, সাতবিলা।

ভাঙুরিয়া—ভাঙুরিয়া, ঐ রেল স্টেশন, মেদা, পাটুলিপাড়া, শরৎনগর রেলওয়ে স্টেশন, ঐ বাজার, সারুটিয়া, সুজাপাড়া, ভবানীপুর, মগুতোষ, পাথরঘাটা, পারভাঙুরিয়া, ব্রীলাহিড়ীবাড়ি, কৈডাঙা।

গাড়াদহ—বিলারৈল, বাতিয়ারপাড়া, ভৈরব, বেড়াডাঙা, ব্রজবালা, বনগ্রাম, বাওসাগাড়ি,

বাজারপটি, চরতারাবাড়িয়া, চরআঙারি, চরনবীপুর, চিথলিয়া দয়বর্গাপুর, দুর্গাদহ. গাড়াদহ, গোপীনাথপুর, হরিরামপুর, হলদিঘর, জুগিনীবাড়ি জঙ্গলীপুর, জগন্নাথপুর, কুমারগাড়া, কাশীনাথপুর, কায়েমকোলা, কায়েমপুর, মহেশপুর, মাকরকোলা, মুরাটিয়া, মসীপুর, মরিচা, নবীপুর, পারমনোহরা, শ্যামবারিয়া, সরাতৈল, সরারূপপুর, তিলগাছা, তেকোপাড়া।

উধুনিয়া—উধুনিয়া, বাবুলদহ, দিঘলগ্রাম, গারুইল, হাটউধুনিয়া, আড়ুয়াপাঙাসি, আগগয়হাটা, বড় পাঙাসি, চক পাঙাসি, দোগাছি, কৈলবেড়, খাদুলি, নরসিংহপাড়া, সৈয়দপুর, শুকলহাট, শুকলাই, শ্রীপাঙাসি, অঞ্চলগাতি, বামনগ্রাম, বলাইগাতি, বলাইকান্দি, বাগুয়ান, মোগনিয়া, খাদুলী, বগুড়া, বেতকান্দি, বাগমারা, দিলপসার, মহেশপুর, মাদারবারিয়া, কমপুর, টেহরি।

বড় পাঙাসি—বড় পাঙাসি।

সলপ—আরবাকি, বেলুনিয়া, বেতবাড়ি, বেতকান্দি, ভাবকী, বৈষ্ণবপাড়া, চরলক্ষ্মীপুর, চরলক্ষ্মীকোল, চর সগুণা, চরপাড়া, ঘাটিনা, গোবিন্দপুর, গোপীনাথপুর, হাড়িভাঙা, ঝালকাটি, কানসোনা, কালীপুর, কোনাবাড়ি, কাশীনাথপুর, ঘামারউল্লাপাড়া, লক্ষ্মীকোল, লক্ষ্মীপুর, মাদারপাড়া, মতিকোরা, মোহনপুর, নলসোঁদা, পেস্টক, রামগাতি, রামনগর, সগুনা, সলপ, শঙ্করহাটি, সেখপাড়া, সাতবারিয়া, সোনতলা, শুঁড়িধুপিলা, সরাতৈল, শিববারিয়া, তারাবারিয়া, আদাচাকি, ভাঙাবাড়ি, বানিয়াগাতি, বেশুপুরা, বেন্নাবিল, বেড়াখয়রা, বয়রাকারী, চন্দনগাতি, দেলুয়াকান্দি, গাবগাছি, গরবাড়ি, জিধুরী, কামারপাড়া, নিশিবউরা, সালদিয়ার, সেননগর, সুবর্ণসরা, তামাই, সেনগাতি, বরুপুর, ব্রাহ্মণগাও, দৌলতপুর, ধুলগাগরাখালি, ধুকুরিয়াবেরা, গয়লাকান্দি, গোপালপুর, ঝানগরা, যোগীবারি, কলাগাছি, কল্যাণগাছি, কান্দাপাড়া, খুকনি, লক্ষ্মীপুর, মৌপুর, মেটুয়ানী, সাতলক্ষ্মী, সোনামুই. ট্যাঙ্গাসিয়া।

যোগনালা—যোগনালা।

খুকনি—খুকনি, যোগীবারী, ঝানঘরা।

রায়দৌলতপুর—বলরামপুর, বনবারিয়া, ভদ্রকোল, চৌবারী, দমদমা, গোয়ালপাড়া, জোতবাড়ি, কাজিপাড়া, মনারপুর, পঞ্চক্রোশী, পাথরপারা, রায়দৌলতপুর, রোশুনপুর, সলপ রেল স্টেশন, সোয়াকোলা।

শাহজাদপুর—ছয় আনীপাড়া, দরগাপাড়া, ঘোষপাড়া, ক্ষেত্রলোটা, রূপপুর, ভেরুয়াদহ, দারিয়াপুর, কেন্দাপাড়া, কাশীপুর, মণিরামপুর, শক্তিপুর, বাদলবাড়ি, বড়বিল, চরপ্রাণনাথপুর, চরনরনিয়া, কোকিলামণি, কুমিরগোয়ালিয়া, মাদলা, নাগরদলা, নরনিয়া, পারকোলা, প্রাণনাথপুর, পুকুরপাড়, রাইপুর, রামবাড়ি, রতনকান্দি, সেকিতকান্দি, সেরখালি. শ্রীফলতলা, শ্রীপুর।

নরনিয়া—বাতিয়া, বাচামারা, চরবাতিয়া, চরনরনিয়া, চরটেপরি, ফকিরপাড়া, জুগিনিদহ, কাশিয়াখোলা, নরিনা, নরবিলা, নারায়ণদহ, নওকৈর, নাহিপুর, তারাটিয়া, টেপ্রী।

পোতাজিয়া—আঙ্গারু, আলকদিয়ার, বাঘাবাড়ি, বয়রা, ভাইমোরা, বিশাখোল, চিনানৈর, চেমচি, চুলখরি, চরচিথলিয়া. ডোমবারিয়া, হারিয়া, গঙ্গাপ্রসাদ, খামারসাউলিয়া, মনুমোরা. নুনদহ, নুকলি, পোতাজিয়া, রাউতারা, রামকান্তপুর. রামখরনা, সিলাচাপতি, সাকতলা, তিয়ারবান্দা।

জামিরতা—আরাভাটপাড়া, কেচুপাড়া. গুদিবাড়ি, গোপীয়াখালি, জগতলা. জোতপাশা. জামিরতা, লক্ষ্মীদিয়াকান্দি, বালিয়াটা, গালা, হাতকোড়া, কাশীপুর, বাসুরয়া, বয়রা. চরদুগালি. খরনা, মানকুরা. রূপবাটিয়া।

সোনাতনী—সোনাতনী, জুজখোলা, বানতৈর, কান্দাঘোরজান, কৈরট, বামনদি, বড়বাতৈর, ঘোরমারা, দায়কান্দি, বড়, চামতারা, বাদরকোল, চরদিটপুর, বালিয়াকান্দি, ঝানকান্দি.

ছোটচানতারা, জয়খোলা, বড় খোরজান, হাটঘোরজান, দরগাবাড়ি, ভাট দিঘলিয়া, হোরদিঘলিয়া, পাইকদিঘলিয়া, বৈষ্ণবদিঘলিয়া, মাকরা, বড়পাখিরা, কুরসি।

বিনোটিয়া—বিনোটিয়া, সিমুলকান্দি, রতনদিয়া, বাংলা, গোপালপুর, দেওয়ান তারাটিয়া, বিয়ানপুর, ধালাই, স্বরূপপুর, মাজজান, ফকিরপাড়া।

মীরকুটা—আরকান্দি, আরমাশুকা, অন্দপুর, বাগুটিয়া, ব্রহ্মশুকা, বীরবউনিয়া, বাঁশা, চাঁদইর, চরভারেঙ্গা, বদগুকান্দি, দগুকান্দি, দিলদারপুর, ধুপলিয়া, ঘুশুরিয়া, হাতাইল, হাপানিয়া, হিজলিয়া, জোতপাড়া, খাস কাওয়ালীয়া, কুরকিপাড়া. কোদালিয়া, মিটুরনী, মধ্য সিমুলিয়া, মধুপুর, মিনিয়াদহ, পুখুরিয়া, পাথরাইল, পয়লাপাড়া, পাচ সিমুলিয়া. পাচুরিয়া, রাধুনীবাড়ি, শৈলজানা, শৈলখানি, শোলঙ্গী, শুলকীপাড়া, শালদহ।

পোরজনা—বাচরা, বড় মহারাজপুর, চর পোরজনা, হরিনাথপুর, হর্ষখোলা, খিদ্রপুটিয়া, নন্দলালপুর, পোরজনা, পুটিয়া, রাইবাচরা, বোরাকাচুটিয়া, ভৈরবপাড়া, বাজুটিয়া, চরপটিয়া, দায়া, জীগরবারিয়া, কুঠিবাড়ি, কৈলরচর, বাইখোলা, চরবাচরা, ছোট মনোহরপুর, কাকুরিয়া, রাণীখোলা, উলটাদব।

বেলতৈল—আগবেড়া, বেলতৈল, বালাবাড়ি, বাঁশবারিয়া, বেতকান্দি, বিন্নাগাছি, চরবাবইখোলা, চরবেলতৈল, চরবেতকান্দি. চর কাদাই, চৌবারিয়া, চেঙ্গটাচর, ধর জমতৈল, গোপীনাথপুর, ঘোরসান, কাদাই, কালীপুর, খাগদিরার, লোচনাপাড়া, মালতিডাঙা, মুলকান্দি, নুকালি, সাতবারিয়া, (খাস) সরাতৈল, শিবরামপুর, তেলকুপী, ফরিদপাঙাসি।

ভেকাগোপালগঞ্জ—আরকান্দি, ভেকাগোপালগঞ্জ, বাতখোলা, চরকৈজুরি, ধুলিয়াবাড়ি, দাদপুর, ডোমনাপাড়া, ছোটবাড়ি, গোপালপুর, হাটপাঁচিল, জয়পুর, জালালপুর, কৈজুরি, কাছুয়া, কুচিয়ামোড়া, পাথলিয়াপাড়া, পাফরতলা, রূপসী, সৈদপুর, সোনাতলা, সাহেবপাড়া, ঠুথিয়া, পাঁচিল, উথুলি।

স্থল—এক্রামপুর, বসন্তপুর, কোচগ্রাম, দিঘলকান্দি, গোহাইলবাড়ি, যুগীরঘোপা, লাঙ্গলমুড়া, পয়ানসাটিয়া, সাসাতারপারা, স্থলচর, তেঘরি, উরাপাড়া।

চালুহাড়া—বৈশাবাড়ি, বরাঙ্গাইল. বচরগাতি, বড়পাখিয়া, চরা পাচিল. চালুহাড়া, ফুলহাড়া, হৈপাড়া, কাটারবাড়ি, কৌলিয়া, করুয়াখালি, মুরাদপুর, মণ্ডলভোগ, নূতনপাড়া, সেখপাড়া, তেঘরি, সাগরকান্দি।

স্থলনওহাটা—স্থলনওহাটা।

শক্তিসঞ্চারিণী—

বেলকুচি—বেলকুচি, বনগা, চয়বাসুরিয়া, চালা, দেলুয়া, চর দেলুয়া, দারিয়াপুর, জিয়ালা, ক্ষিদ্রমাটিয়া, লক্ষ্মীপুর, মগুলা. নয়াপাড়া, রতন কান্দি, রাণীপাড়া, সোহাগপুর, সাপুর।

বড়ধুল—আলকদিয়া. বড়ধুল, বেরিনাবাড়ি, চরবেল, চরগয়লা, হোসেন. ছোট ধুল, গোলইখালি, কীর্তিখোলা, খিদির, কালীবাড়ি, তারাবারিয়া।

সদিয়াচাঁদপুর—চাপরি, মৌউহালি, সদিয়া, শঙ্করহাটি, উল্লাপাড়া. গোপচাপরি, ক্ষিদ্রচাপরি, মালাকর চাপরি, দেওয়ানতলা, সোনকলসি, গহেরপাড়া, বিঘিবাতিটা. গোলাবাড়ি, গোপীনাথপুর, ইজারাপাড়া, খিদির, পবাণচাঁদপুর।

বেতিলহাটখোলা—এনাতপুর. আসাননগর, আরাসরা, আরঙ্গাবাদ, ব্রাহ্মণগ্রাম, বসনবাড়ি, বংশখৈদ্দ, বেখারা, চরপাড়া. ডিগ্রিপাড়া. সোলাকুলা, তেবারিয়া, শিবপুর, ধরপাড়া. গোপরেখী, গোপীনাথপুর, জৈনবাড়ি, খোকসাবাড়ি. খামারগ্রাম, কুঠিপাড়া, কান্দাপাড়া. মদনপুর, মাধবপুর, মেঘমিত্রা, মেঘাগ্রাম।

সয়দাবাদ—সয়দাবাদ।

রাজাপুর—রাজাপুর, আমবারিয়া. আগরিয়া, চাউগ্রাম, দত্তবাড়ি, চক বয়রা, মকিমপুর,

রেলগাছি, ঠাকুরপাড়া, বয়রাপাড়া, টেংরাখালি, নাককাটা, মাইলঝাল, সারাটিয়া, হাট সারাটিয়া, পচা সারাটিয়া, চর মাঝাইল, সমসপুর, চর সমসপুর, রানধুনীবাড়ি, শ্রীবাড়ি, গাছাবাড়ি, বড় সিমুল, কালীবাড়ির চর, সয়দাবাদ, দুখিয়াবাড়ি, মুনিবাড়ি।

নলকা—নলকা, ভদ্রঘাট, চণ্ডিদাসগাতি, চণ্ডালগাতি, দোমুর, গজারিয়া, ভদ্রঘাট ডুমুরবড়বারিয়া, দুমুরিছা, ডুমুরুঞ্চা, পদমপাল, রহিমপুর, ধোপাপাড়া, জোয়ালভাঙা, চরপাদমপাল, দেওভাঙা, ছোটহামাকুরা, বহুটি, চরবহুটি, বেটহাটা, কোনাগাতি, ধুকুরিয়া, দক্ষিণধুকুরিয়া, সরাচণ্ডী, কোণাবাড়ি, কয়লাগাতি, কুঠিরচর, চরকারনগর, মথুরাপুর, বৈদ্যদোগাছি, ধমকোলা, বনকারী, মুখবেলাই, চরদোগাছি, সৈয়দগাতি, ক্ষিদ্রভদ্রঘাট, জঙ্গীলাগাতি, দেরারি ভদ্রঘাট সেনগাতি, এরন্দহ, দাদুরপাড়া, পাচ এরন্দহ, হাট কান্দা, হরেগাতি, তারুটিয়া, বাদুল্যাপুর, রশিদপুর, চররশি, বাগুন্দা, সরাতৈল, আমডাঙা, বড়ঘলি, ডিয়ারহাটি, উদয়কৃষ্ণপুর, খাসেরচক, চরবাগন্দা, উলীপুর, আলুকদিয়া, চক আলুকদিয়া, পাচিদা, আশুগঞ্জ, রতনকান্দি।

বৈদ্যজামতৈল—আলুদিয়ার, বৈদ্যাজামতৈল, বরকান্দি, বড়স্থল, বাঁশবারিয়া, ভিয়ারচর, চালাসবাজপুর, চর টেপ্রায়ল, চর ধোপাকান্দি, চৌধুয়ার, ধোপাকান্দি, ধুনচি, দশসিকা, ধলেশ্বর, ধোপাকান্দি, গোপালপুর, গজাবাড়ি, হায়দারপুর, হলুদকান্দি, কামারখন্দ, কর্ণসুতি, হালুয়াকান্দি, কোরা, কৃষ্ণদিয়ার, কুরারে উদয়পুর, কয়লাগাতি, কাজিপুর, কোণাবাড়ি, কাশীয়াহাটা, ময়নাকুলা, নন্দিনাবিয়ারা, পেশচরপাড়া, পাকুরিয়া, সাবাজপুর, সাকুরজিপাড়া, সেগ্রাইল, পাঠানপাড়া, মামুদপুর, শ্যামপুর।

পাবনা বাজার, ইলিয়ট ব্রিজ প্রভৃতি আরও যে কয়েকটি পোস্টাফিস আছে তাহাতে ডেলিভারি হয় না।

পোস্টাফিসের কার্য বিবরণী (১৯২৫—২৬)

বার্ষিক প্রায় লক্ষাধিক টাকা স্ট্যাম্প বিক্রয় ব্যতীত

মোট আয় ব্যয়

মাস	মনিঅর্ডার ফি	ইনসিরও ফি	রেজিস্ট্রেশন ফি	মোট আয়	মোট ব্যয়
এপ্রিল	৩৪৪৫	১৩৬০	৪৭৮ ॥৵৹	৫২৮৩ ॥৵৹	১০২৯০
মে	৩২৫৪	১৪৭৬	৫৪৫৵৹	৫২৭৫৵৹	১০৪০২
জুন	৩৪১৫	১৩৪০	৫৪৬ ॥৵৹	৫৩০১ ॥৵৹	১০৭১১
জুলাই	৩২৪৪	৯৭৭	৫১৬৵৹	৪৭৩৭৵৹	১০৫৫৭
আগস্ট	৪০৮৭	১৪৮৬	৫৮৮	৬১৬১	১০৫২০
সেপ্টেম্বর	৬৬১০	২০৫৬	৫৩৪।৹	৯২০০।৹	১০৪৫১
অক্টোবর	৫৪১৩	২৩০৩	৫১০৵৹	৮২২৬৵৹	১০৭৪৯
নভেম্বর	৫৩৭৪	১৭০০	৫৯৫ ॥৹	৭৬৬৯ ॥৹	১০৫৩৩
ডিসেম্বর	৫৭৮১	১৮০৯	৬০৫।৹	৮১৯৫।৹	১০৬৯১
জানুয়ারি	৬২০৪	২৩০২	৫৩৩ ।৵৹	৯০৫৯ ।৵৹	১০৬২৩
ফেব্রুয়ারি	৫১২৮	২৩৫৫	৬২৫ ॥৹	৮১০৮ ॥৹	১০৬৯১
মার্চ	৬১৯৭	২২১৪	৬২৮ ॥৵৹	৯০৩৯ ॥৵৹	১০৪৩৪
মোট	৫৮১৫২	২১৩৭৮	৬৭২৭ ॥৵৹	৮৬২৫৭ ॥৵৹	১২৬৬৫২

সমাপ্ত

সিরাজগঞ্জের ইতিহাস

সিরাজগঞ্জের ইতিহাস

মৌলবি মোখ্‌তার আহ্‌মদ-সিদ্দিকী
রাজসাহী বিভাগের মাদ্রাসা স্কুল সমূহের
স্পেশিয়াল সব্‌ইনস্পেক্টর কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত

সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

সন ১৩২২ সাল

মূল্য ।./০ আনা

Printed by Abinash Chandra Mandal
At the Siddeswar Machine Press
13, Shibnarayan Dass's Lane, Calcutta

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত মৌলবি মোওয়াজ্জম আলি খাঁ সাহেব

খেদ্‌মতেষু

জনাব খাঁ সাহেব,

আমি "সিরাজগঞ্জের ইতিহাস" লিখিতে প্রয়াস পাইলাম। সিরাজগঞ্জ সব্‌ডিভিশনের মুসলমানগণের মধ্যে যিনি সর্বগুণালঙ্কৃত ও সর্বজন-সমাদৃত, আমার ইচ্ছা, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তক উপহার দেই।

বিদ্য, বুদ্ধি, ধন, ঐশ্বর্য, ধর্মানুরাগ, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি যাবতীয় সদগুণে আপনাকে ভূষিত পাইয়া, এই পুস্তক আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম, আশা করি, উপেক্ষিত হইবে না।

খাদেম

এম. এ. সিদ্দিকী

ভূমিকা

আমার বাড়ি চট্টগ্রাম জেলাতে। স্কুল-মাদ্রাসা পরিদর্শকরূপে কিছুকাল ধরিয়া এখানে আছি মাত্র। সিরাজগঞ্জের ইতিহাস লেখা আমার পক্ষে কঠিন। এই ব্যাপারে আমি যে কৃতকার্য হইতে পারিব না ইহা স্থির নিশ্চিত। তথাপি বিদেশিয় লোকের লেখা বলিয়া অনাদৃত না হইলে কৃতার্থ হইব।

এখানে সিরাজগঞ্জের দোষ ও গুণ যাহা আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা—দোষগুলি সংশোধিত হইবে ও গুণগুলি আদর্শ হইয়া উত্তরোত্তর তাহার বৃদ্ধি পাইবে।

এই পুস্তক লিখিতে যাঁহাদের নিকট নানা বিষয়াদি অবগত হইয়াছি, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে বাধ্য রহিলাম।

বিনীত

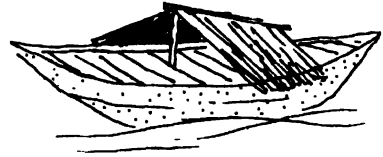
এ. এ. সিদ্দিকী

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১.	ভৌগোলিক বিবরণ চতুঃসীমা, আয়তন, থানা ও আউটপোস্ট	৫৪৭
২.	ঐতিহাসিক বিবরণ সিরাজগঞ্জ নামের উৎপত্তি, সিরাজআলি চৌধুরী কে ও কিরূপে বন্দর স্থাপিত হইল, পূর্বে সিরাজগঞ্জ স্থানটি কী ছিল, মহাজনগণ ও জমিদারগণ পরস্পরের বিবাদ, বেরি সাহেবের মধ্যস্থতা, সিরাজগঞ্জ টাউন, নিমগাছি, জয়সাগর ইত্যাদি ইত্যাদি। সিরাজগঞ্জ কোন্ সময়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক মহকুমায় পরিণত হয়, বগুড়া, পাবনা, মালদহ ও রাজশাহী প্রভৃতি জেলার সীমা নির্দেশ ইত্যাদি। বর্ষাকালে চলাচল, চাষ আবাদ উৎপন্ন দ্রব্যাদি।	৫৪৭
৩.	জলবায়ু ও সেন্সাস রিপোর্ট	৫৫০
৪.	সিরাজগঞ্জ হিন্দুপ্রধান স্থান	৫৫১
৫.	মুসলমানগণের উপাধি ও বংশ নিদর্শন	৫৫২
৬.	মুসলমানগণের আচার ব্যবহার, তদীয় দোষ-গুণ	৫৫২
৭.	মুসলমানী দরগাহ শাহজাদপুর ও শাহমক্‌দুম সাহেব, জঙ্গিপীর, বোরহানগাজি, শাহ কামাল ও তাঁহার স্ত্রীর গর্ভজাত সর্প-পুত্রের গল্প ইত্যাদি।	৫৫৪
৮.	হিন্দু-দেবালয় বা মন্দির রানী ভবানীর মন্দির, বিশ্বকর্মা নির্মিত হাটি কুমরুলের নবরত্ন মন্দির, রামনাথ ভাদুড়ি, চৈত্রহাটি মন্দির প্রভৃতি।	৫৫৬
৯.	জমিদার	৫৫৬
১০.	ব্যবসায় কারিকর, ছোটধুলের চাদর টাকা লগ্নি কারবার, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও তাহার বিশেষ উপকারিতা, কালিয়াকান্দা পাড়ার কাগজ।	৫৫৬
১১.	সাধারণ অবস্থা পাটের কারবারে লোকের অবস্থার স্বচ্ছলতা, অপরিণামদর্শী চাষাগণ, সাইকেল ব্যবহারের প্রচুরতা, সিরাজগঞ্জবাসিগণ বাল্যবিবাহে পটু প্রভৃতি।	৫৫৭
১২.	বিদ্যাশিক্ষা বিদ্যাশিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ, বালক ও বালিকা শিক্ষা ও উচ্চ-ইংরেজি স্কুল হইতে প্রাইমারি ও মক্তব বিদ্যালয়, জুনিয়ার মাদ্রাসা, বিদ্যালয়ের সংখ্যা, মক্তবের উপকারিতা উপলব্ধি ও তাহার প্রচুরতা শিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রী এবং তদীয় সংখ্যা-মৌলবি আবদুচ্ছোবাহান মাহমুদ এম. এস. সিং বাবু যাদব চক্রবর্তী পাটিগণিত ও বীজগণিত প্রণেতা।	৫৫৭
১৩.	ভাষা	৫৫৮
১৪.	সিরাজগঞ্জ টাউন (১) ইহার আয়তন, লোকসংখ্যা, মিউনিসিপ্যালিটির আয় ও ব্যয়, মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠাকাল, টেক্সদাতার সংখ্যা, সিরাজগঞ্জ পুরাতন স্থান নয়, প্রভৃতি—। (২) সরকারি অফিসার। (৩) সরকারি আফিস।	৫৫৮

(৪) বিদ্যালয়, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বালক ও বালিকাগণের সংখ্যা। (৫) সদাগরি আফিস, পুরাতন জুট মিল, স্টিমার কোম্পানি, মিশন হাউস। (৬) ঔষধালয়, সরকারি হাসপাতাল, লেডি ডাক্তার, ইনডোর আউটডোর রোগীর সংখ্যা, প্রাইভেট ডিসপেন্সারি, প্রাইভেট ডাক্তার, কবিরাজ ও হাকিমগণের সংখ্যা ও তাঁহাদের পারদর্শিতা। (৭) বিভিন্ন দোকান ও বাজার। (৮) বর্ষাকালে টাউনের মনোরম দৃশ্য। (৯) দর্শনযোগ্য জিনিস। (১০) যাতায়াতের সুবিধা। রেল-কোম্পানি, মসজিদ।

১৫. প্রসিদ্ধ কবি, প্রসিদ্ধ বক্তা ৫৬৩
১৬. যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও করতোয়া নদী প্রভৃতি ৫৬৪
১৭. বন্দর ও কারবারের স্থান ও প্রসিদ্ধ মেলা ও হাট ৫৬৫
১৮. উৎপন্ন দ্রব্য ও পাটের বিস্তারিত বিবরণ। পাটের উৎপত্তি, ইহার চাষ ইত্যাদি, পাট বিক্রয় প্রথা ৫৬৬
১৯. কাগজ প্রস্তুত প্রণালী, ধান, মৎস্য, দ্বিপদ জন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদি ৫৬৯
২০. ওজন ও মাপ ৫৭১
২১. ঐতিহাসিক ঘটনা ৫৭২
২২. কলকুঠি ৫৭৫
২৩. ভূমিকম্প ৫৭৭
২৪. ইলিয়েট ব্রিজ ৫৭৭
২৫. ভূমিকম্পের ধুয়া ৫৭৮
২৬. তুফান বা প্রবল ঘূর্ণিবার্তা ৫৭৮
২৭. নানা কথা ৫৭৯
১. সিরাজগঞ্জ মহকুমা সৃষ্টি, এরিয়া ও বাড়িঘরের সংখ্যা
২. ইহার চতুঃশাখা
৩. ইহার সড়কসদর রাস্তা
৪. বন্দরের উপর একত্রিত নৌকার হিসাব
৫. ইহার পূর্বতন ও বর্তমান দ্রব্য ও মূল্যাদির তারতম্য ও বর্তমানে দুর্ভিক্ষ সিরাজগঞ্জের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক
৬. মোহর খাঁ ডাকাত নেদু আকন্দ ও কাদিরা ভূত প্রভৃতি
৭. সিরাজগঞ্জের ডাক্তারি
৮. মওলানা কারামত আলী সাহেব মরহুম ও মুসলমানি সরিয়ত
৯. বেলকুচি ও সুধাগাছা
১০. দেওয়ার সাহনুর সাহেব
১১. রাণীগ্রাম ও বাগবাড়ির জমিদারগণ
১২. হিন্দু মুসলমান হাইস্কুল
১৩. জাবে মসজিদ
১৪. সংবাদপত্র
১৫. বোর্ডিং
১৬. মৌলবি আফজল আলি খাঁ ও মৌলবি মতিওর রহমান সাহেব
২৮. নিজ কথা ৫৮৩
২৯. পাটের গান ৫৮৩



প্রথম অধ্যায়
ভৌগোলিক বিবরণ

বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত রাজশাহী বিভাগস্থ পাবনা জেলার একটি মহকুমার নাম "সিরাজগঞ্জ"।

চতুঃসীমা ঃ

পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রধানতম শাখা যমুনা নদীটি উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে ধাবিত হইয়াছে। ইহার অপর পারে ময়মনসিংহ জেলা। পশ্চিমে রাজশাহী ও বগুড়া জেলা এবং পাবনা সদর মহকুমার কিংয়দংশ। উত্তরে বগুড়া জেলা, দক্ষিণে পাবনা সদর মহকুমা।

সিরাজগঞ্জ মহকুমাটি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫০ মাইল ও পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ৩০ মাইল বিস্তৃত, দেখিতে প্রায় ত্রিকোণাকার। এই মহকুমাতে চারিটি থানা বা পুলিশ স্টেশন ও পাঁচটি আউটপোস্ট আছে। ১. সিরাজগঞ্জ ২. রায়গঞ্জ, ৩. উল্লাপাড়া, ৪. শাহজাদপুর—এই চারিটি থানা এবং ১. কাজিপুর, ২. বেলকুচি, ৩. কামারখন্দ, ৪. তাড়াস, ৫. চৌহালি—এই পাঁচটি আউটপোস্ট।

ঐতিহাসিক বিবরণ ঃ

সিরাজগঞ্জ এই নামটিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কোন মুসলমান ব্যক্তি হইতে এই নামের সৃষ্টি। ইহার সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, প্রায় শতাধিক বর্ষ অতীত হয়, সিরাজআলি চৌধুরী নামক কোন খ্যাতনামা মুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক স্থাপিত বন্দর বলিয়া ইহার নাম সিরাজগঞ্জ হইয়াছে।

বর্তমান সিরাজগঞ্জের ১২ মাইল দক্ষিণপূর্বদিকে যমুনার তীরে বেলকুচি নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে আবদাল মহম্মদ শাহ নামে একজন দরবেশ ছিলেন। সম্ভবত তিনি পশ্চিম দেশিয় লোক। শুনিয়াছি তিনি বলখী অর্থাৎ বলখদেশবাসী ; কিন্তু একথার প্রমাণ কিছু নাই। মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বড়বাজু পরগণাটি যাহা সরকার বাজুহার মধ্যে সর্বপ্রধান বাজু ছিল, এবং যাহার রাজস্ব পূর্বে ৪১৭৮১৪০ দাম ১০৪৪৫৩।।০ আনা নির্দিষ্ট ছিল বলিয়া আইনে আকবরী গ্রন্থে দেখা যায় ; এই বাজুটি সম্পূর্ণই তাঁহার ছিল বলিয়া প্রকাশ এবং কাহারও মতে এই পরগণাটির আট আনা অংশ তাঁহার ছিল। পরে এক আনা কোনক্রমে আবদালপুরের মিঞাগণকে দেওয়া হইলে, তিনি বাকি সাতআনির মালিক ছিলেন এবং তাঁহারই কর্তৃক সাতআনির জমিদারির সৃষ্টি হয়। তাঁহার সমাধি বেলকুচিতে ছিল ; লোকে ইহাকে পীরের দরগাহ বলিত। শুনা যায়, যেখানে সাতআনির জমিদারির কাছারি আছে, সেই স্থানে এইরূপে একটি দরগাহ আছে এবং হিন্দু-মুসলমান সকলে সিন্নি দিয়া থাকে। এই শাহসাহেব বিবাহ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা আলিমামুদ সাহেবের পুত্র ফয়েজ আলি ঐ বিষয়ের অধিকারী হন এবং ফয়েজ আলির মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রজব আলি ও পৌত্র মেহের আলি যথাক্রমে এই সম্পত্তি ভোগ করেন। মেহের আলির মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সিরাজ আলি এই সম্পত্তির অধিকারী হন। ইনি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন এবং এই শহরটি স্থাপন করিয়া, স্বীয় নামে সিরাজগঞ্জ নাম প্রদান করেন। ইহা যমুনাতীরে স্থাপিত হয় এবং ক্রমাগত দুই বার নদী ভাঙিয়া পশ্চিমে স্থানান্তরিত হইয়া বর্তমান স্থানে ধানবান্ধি নদীর তীরে স্থাপিত হইয়াছে। পূর্বে এই স্থানটুকুকে লোকে "ভূতের দেয়ার" বলিত।

সিরাজ আলি চৌধুরীর পুত্র হয় নাই; কেবল চাঁদবিবি নাম্নী এক কন্যা ছিল। বগুড়ার আহছনজ্জমা চৌধুরীর সহিত তাহার বিবাহ হয়, ইহা হইতে নুরন্নেছা ও খায়রন্নেছা নাম্নী দুইটি যমজ কন্যা জন্মে; তাহারা সিরাজআলি চৌধুরী সাহেবের বড়ই প্রিয়পাত্রী ছিলেন। শুনা যায়, সিরাজআলি সাহেব আদর করিয়া তাহাদিগকে ললিতা ও বিশাখা বলিয়া ডাকিতেন।

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে সিরাজ আলি চৌধুরী সাহেব বেলকুচিতে সমাধিস্থ হন। তাঁহারই কারণে এই বেলকুচি স্থানটি অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। শুনা যায়, এখানে ২৭টি চৌকিদার ছিল এবং ভদ্র ব্যবহারোপযোগী সকল রকমের লোক যথা—নাপিত, ধোপা, চাকর, খানসামা, হাড়ি, মুচি প্রভৃতি এস্থানে পাওয়া যাইত। প্রবল যমুনা স্রোতে ইহার ভগ্নাবশেষ পর্যন্ত এখন দেখা যায় না। হায়! সময়ের পরিবর্তন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, দুইবার নদী ভাঙাতে সিরাজগঞ্জ শহরটি বর্তমান স্থানে ভূতের দিয়ার নামক গ্রামে ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান দিয়া স্থাপিত হইয়াছে। যখন দ্বিতীয়বার নদী ভগ্ন হয়, তখন মহাজনগণ এখানে বন্দর করিতে অনিচ্ছুক হইয়া শাহজাদপুর থানার দেওয়ানতলা নামক স্থানে বন্দর বসাইতে চেষ্টা করেন, এবং তথায় ঘরবাড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মালিকগণ কিছুতেই মহাজনদিগকে বাধ্য করিতে না পারিয়া, তৎকালীন জুটমিলের কর্তা শ্রীযুক্ত বেরী সাহেবের শরণাপন্ন হন। ইনি মিষ্টবাক্যে ও নানা প্রলোভনে মহাজনদিগকে বাধ্য করিয়া পুনরায় এখানে বন্দর আনয়ন করেন। সেই হইতে আজ পর্যন্ত টাউনটি বর্তমান স্থানে অবস্থিত আছে।

সিরাজগঞ্জ টাউনটি পুরাতন স্থান নয়। ১৮০৩ সনে সিরাজ আলি চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু হয়। এই হিসাবে এখনও দেড়শত বৎসর অতীত হয় নাই। পূর্বে যমুনা নদীটি তাড়াস নিমগাছি হইতে ময়মনসিংহ সেরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম পার হইতে পূর্ব-পার যাইতে খেওয়ার মাশুল দশ কাহন কড়ি লাগিত, তাই এই সেরপুর দশ কাহনিয়া সেরপুর নামে খ্যাত। সিরাজগঞ্জ যমুনার হাল পয়স্তি চড় বলিয়া, এখানে ইমারতাদি এত দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নিমগাছি স্থানটি অতিশয় পুরাতন ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সিরাজগঞ্জ টাউন হইতে প্রায় ২০ মাইল পশ্চিমে তাড়াস আউটপোস্টের অন্তর্গত এই নিমগাছি স্থানটি অবস্থিত। ভোলা দেওয়ানের দরগাহ নামে এখানে একজন মুসলমান দরবেশের সমাধি আছে। এই দরগাহ সম্বন্ধে অন্যত্র লিখিত হইল।

এতদ্ব্যতীত এখানে আরও কতকগুলি পুরাতনকীর্তি বর্তমান আছে। জয়সাগর নামে একটি দিঘি আছে। তাহার পরিধি প্রায় অর্ধ মাইল। ইহার চারি পাড়ে তিনটি করিয়া বারটি পাকা ঘাট ছিল। এই ঘাটগুলি এখন দেখা যায় না। নিম্নে দাবিয়া গিয়াছে; এই বারটি স্থান এখনও পাড় হইতে নিচু হইয়া আছে। ইহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা শুনা যায়। ঐ দিঘিতে চতুষ্পার্শ্বের মাটি পড়িয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে, মধ্যে অল্প পরিমাণ স্থানে জল আছে।

ইহা ছাড়া এখানে আরও ছোট ছোট কতকগুলি দিঘি ছিল, ঐ সকলের চিহ্নাদি বর্তমান আছে। এই নিমগাছিতে ছোট ছোট পাহাড়ের মত কতকগুলি উচ্চ ভিটি আছে। শুনিয়াছি, ঐগুলি প্রত্যেকটি এক একটি দালান ছিল। একটি ভিটির উপরে উঠিয়া দেখিলাম, একখণ্ড প্রস্তর হস্ত ৫ × $\frac{১}{৪}$ দীর্ঘ প্রস্থ পরিমিতি ভিটিটির চূড়াতে অর্ধপ্রোথিতভাবে রহিয়াছে। প্রস্তর খানা কারুকার্য বিশিষ্ট। কয়েকটি ছোট বড় মূর্তি উহাতে দেখা গেল, মূর্তিগুলি দেখিলে বৌদ্ধমূর্তি বলিয়া বোধ হয়।

এখানে আর একটি বিষয় আশ্চর্যজনক যে, নিমগাছি গ্রামটি যথা তথা ইষ্টকময়। এখানে এমন কম স্থান পাওয়া যায়, যেখানে দুই হস্ত পরিমিত স্থান খুঁড়িলে শতাধিক ইষ্টক পাওয়া যায় না। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থান পূর্বে কোন বড় লোকের বাড়ি-ঘর বা শহর ছিল। হিন্দুগণের মতে এই স্থানটি মহাভারত লিখিত বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহ ছিল। বিরাট

রাজা খুব ঐশ্বর্যশালী রাজা ছিলেন ; দ্বাপরযুগে তাঁহার আর্বিভাব। তিনি অসংখ্য গরু-ঘোড়া পালন করিতেন। প্রসিদ্ধ বিরাট নগর, ঘোড়াঘাট প্রভৃতি তদীয় বাড়ি-ঘর। পাণ্ডব বংশীয় যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা পত্নীসহ যখন অজ্ঞাতবাসে থাকেন, তখন এই বিরাট রাজারই অতিথি হন এবং নিজে. প্রতিপত্তি দেখাইয়া প্রত্যেকে রাজ দরবারের এক একটি রাজপদ লাভ করেন। পরে পরিচয় হইলে বিরাট রাজার কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুনপুত্র অভিমুন্যুর বিবাহ হয়। এখানে অর্জুনবৃক্ষ নামে একটি পুরাতন বৃক্ষ আছে ; কথিত আছে, অর্জুন তাঁহার তীর ধুনক ঐ বৃক্ষে বাঁধিয়া অপরিচিতভাবে বিরাট ভবনে যান।

জয়সাগর সম্বন্ধে এই কিংবদন্তী আছে যে, বিরাট রাজা যখন এই দিঘি খনন করেন, অনেক সাধ্য সাধনাতেও কোন মতে জল ওঠে না। তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া যখন একদিন নিদ্রাভিভূত হন, তখন স্বপ্নে দেখিতে পান, জয়কুমার নামক রাজপুত্র ঐ দিঘিতে বিল্বপত্র রাখিয়া দিলে তাহাতে জল উঠিবে। এই স্বপ্নের পর দেখিলেন, কোন রাজপুত্র বিবাহ করিয়া নব পাত্রীসহ আসিতেছেন ; তখন বিরাট রাজা তাঁহাকে এই ঘটনা জানাইলে তিনি বিল্বপত্রসহ দিঘিটির মধ্যবর্তী স্থানে যান এবং বিল্বপত্র দিঘিতে রাখামাত্র এমন সজোরে জল উঠিতে আরম্ভ করিল যে, তিনি তথা হইতে পাড়ের উপর উঠিয়া আসিতে সময় পাইলেন না, ডুবিয়া রহিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী অভিশাপ দিয়াছিলেন, "যে ভাই আমাকে আমার স্বামী ভোগ হইতে বঞ্চিত করিল, এই দিঘির জলও যেন কাহারও ভোগে আসে না।" তখন হইতে এই দিঘির জল একপ্রকার বিস্বাদযুক্ত ও ব্যবহারের অযোগ্য ছিল। এই জয়কুমার কে এবং তাহার পত্নীই বা কে ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই।

এইরূপে সিরাজগঞ্জ স্থাপিত হইলে, কি প্রকারে ও কোন্ সময়ে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কর্তৃক মহকুমায় পরিণত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১৭৬৫ খ্রিঃ অব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ কর সংগ্রহের ভার অর্পিত হয়, এবং ১৭৯৩ খ্রিঃ অঃ কোম্পানি কর্তৃক জমিদারি সমূহের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমাধা হয়। এই অষ্টাবিংশ বৎসর মধ্যে দেশের সীমায় বহু পরিবর্তন ঘটে। সিরাজগঞ্জ পাবনা জেলার অন্তর্গত রাজশাহী বিভাগের এলাকাধীন। পূর্বে এই রাজশাহী বহুদূর ব্যাপিয়া ছিল এবং বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বপ্রধান জেলা ছিল। পশ্চিমে ভাগলপুর এবং পূর্বে ঢাকা পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ছিল এবং পদ্মা নদীর দক্ষিণে চাকলা রাজশাহী নামে একটি বিস্তীর্ণ, ভূখণ্ড ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভুখণ্ডটি এখন মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, বর্ধমান ও বীরভূমের মধ্যে পড়িয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রাজশাহী হইতে অনেক স্থান পৃথক হইয়া অন্য জেলাভুক্ত হয়।

১৮১৩ খ্রিঃ অব্দে রাজশাহী হইতে রোহনপুর ও চম্পাই থানা এবং দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া হইতে কয়েকটি থানা লইয়া বর্তমান মালদহ জেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। আবার ১৮২১ খ্রিঃ অব্দে রাজশাহী হইতে আদমদিঘি, নওখিলা ও সেরপুর এবং দিনাজপুর হইতে লালবাজার, খেতলাল ও বদলগাছি এবং রঙপুর হইতে গোবিন্দগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ থানা সমূহ লইয়া বগুড়া জেলার সৃষ্টি হয়। ইহার ৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮২৯ খ্রিঃ অব্দে রাজশাহী হইতে শাহজাদপুর, মথুরা ও পাবনা এবং যশোহর হইতে কয়েকটি থানা লইয়া পাবনা জেলার সৃষ্টি হয়। ১৮৩৯ খ্রিঃ অব্দে রায়গঞ্জ থানা রাজশাহী হইতে বগুড়ার সহিত যুক্ত হয়। ১৮৫০ খ্রিঃ অব্দের পরই যমুনা ও দাকোবা নদীদ্বয় প্রবল হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদীর গতি মন্দ হইয়া যায় এবং তাহাতে বিচারকার্যের বহু বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হয়। এই বিশৃঙ্খলা হেতু সদর দেওয়ানি আদালতের অন্যতম জজ শ্রীযুক্ত মিল্‌স সাহেব তদন্তের জন্য আসেন ; তাঁহার তদন্ত অনুসারে ১৮৮৫ খ্রিঃ ১২ জানুয়ারি হইতে যমুনা ও দাকোব নদীদ্বয় রাজশাহীর পূর্ব সীমা নির্দিষ্ট হয় এবং এইরূপে ইহার পরিবর্তন হইয়া ভাদাই নদী ইহার দক্ষিণ সীমা নির্ধারিত হয়। (আশালতা)

এতএব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পাবনা জেলা সৃষ্টি হওয়ার ন্যূনকল্পে প্রায় ৩০/৪০ বৎসর পূর্বে সিরাজগঞ্জ বন্দর স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সিরাজগঞ্জ ১৮৭৫ খ্রিঃ অব্দের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর সবডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদের গতি পরিবর্তিত হইয়া যমুনা (যবুনা) নদীর সৃষ্টি হয় ও সিরাজগঞ্জ নদীর পশ্চিম তটে আসিয়া ময়মনসিংহ হইতে খারজি হয়। (ময়মনসিংহের বিবরণ) কিন্তু শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসুর (আশালতা পত্রিকা লেখক) লিখন অনুসারে ১৮৬৬ খ্রিঃ অব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি হইতে সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ হইতে পৃথক হইয়া পাবনা জেলাভুক্ত হয়। তিনি লিখিয়াছেন "Vide Hunter's Statistical account of Pabna and Bogura" অতএব ইহা বিশেষত বিশ্বাসযোগ্য। ১৮৭১ খ্রিঃ অব্দে রায়গঞ্জ থানাটি বগুড়া হইতে পৃথক হইয়া পাবনা জেলাভুক্ত হইয়াছে।

এই মহকুমাটি বর্ষাকালে প্রায় বন্যা-প্লাবিত হয় ও তখন নৌকা বিনা যাতায়াত চলে না। পশ্চিমদিকে বগুড়া সংলগ্ন কয়েকটি মাত্র গ্রাম ছাড়া প্রায় সর্বত্রই পলিমাটি। ইহার মাটি অতিশয় উর্বরা। অধিকাংশ স্থলে পাটের চাষ হয়। মুগ, মুসুর, কলাই, সরিষা, মটর, অরহর, তিসি, কাউন ও অন্যান্য ফসলাদি বিস্তর জন্মে। ধানের আবাদ লোকে তত করে না, স্থানে স্থানে যেখানে ধানের চাষ হয়, যথেষ্ট ফলে। আউস ও আমন উভয় ফসল একত্র বুনে ; আউসের সময় আউস ধান্য বাছিয়া কাটিয়া, আমনের সময় পর্যন্ত আমন রাখিয়া দেয়। আমন বুনিবার নির্দিষ্ট সময়ে ভূমি জল-প্লাবিত থাকে বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ করিয়া থাকে।

লোকজনের যাতায়াতের জন্য বর্ষাকাল অতিশয় সুবিধাজনক। সাধারণত মেয়েছেলেরা এই সময়েই নাইহর (পিত্রালয় গমনাগমন) করিয়া থাকে। নিজ বাড়ির সিঁড়ি হইতে নৌকাতে চড়িয়া শত মাইল দূরে অন্য বাড়িতে সিঁড়ির উপর গিয়া অনায়াসে নামিয়া থাকে। এক পাও হাঁটিতে হয় না। কিন্তু গরু-মহিষের এই বর্ষা কয়েকমাস বিষম কষ্ট হয়। গোয়ালঘর হইতে অনেক স্থানে বাহিরও হইতে পারে না। খড়, ঘাস প্রভৃতি একই স্থানে ইহাদিগকে যোগাইতে হয়।

জলবায়ু ঃ

এই মহকুমাস্থ সিরাজগঞ্জ থানাটি রাজশাহী বিভাগস্থ কয়েকটি জেলার মধ্যে স্বাস্থ্যকর বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু রায়গঞ্জ থানাটি বিশেষত পশ্চিম প্রান্তে তাড়াস স্থানটি অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়া প্রধান। ১৯১১ সালের ভারতীয় সেন্সর রিপোর্টে ওমেলী সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

"There are extra ordinary variation of density in the population. The Sahazadpur Thana supporting 1209 and Raygange only 490 persons per square mile. The latter (Raygange) is an unhealthy tract over which malaria has a hold and moreover the large lake known as chalan bil occupies a considerable portion of it."

অর্থাৎ সিরাজগঞ্জের জনসংখ্যাতে বিষম পার্থক্য আছে। প্রতি বর্গ মাইলে শাহজাদপুর থানাতে ১২০৯ জন এবং রায়গঞ্জ থানাতে কেবল ৪৯০ জন অধিবাসী। পরবর্তীটি অর্থাৎ রায়গঞ্জ থানাটি অস্বাস্থ্যকর স্থান, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ইহার উপর হইয়া থাকে এবং চলন বিল একটি প্রকাণ্ড জলাশয় ইহার অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া আছে। এই রিপোর্টে অন্যত্র লিখিত আছে।

Malaria, writes the District Magistrate, is a permanent scourge and has its strongert hold in the thanas Santhia (formerly Dulai) and Chatmohor of the Sadar Sub-Division and in Raygange and Ullapara in the Sirajang Sub-Division. Thana Pabna in the Sadar Sub-Division is not free from its

ravages. This is due mostly to the existence of a number of bills of various size in the interior, in most of which water lies stagnant almost all the year round, except in years of excessive flood.

অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট লিখিতেছেন, "ম্যালেরিয়া এখানে একটি স্থায়ী শাস্তিস্বরূপ। সদর সব ডিভিসনের সাঁথিয়া (পূর্বকার দুলাই) ও চাটমোহর এবং সিরাজগঞ্জ সবডিভিসনের রায়গঞ্জ ও উল্লাপাড়া থানাগুলির উপর ইহার ভয়ানক আক্রমণ হয়, পাবনা থানাটিও ইহার হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। ইহার বিশিষ্ট কারণ এই যে, এই জেলায় অভ্যন্তরে বিভিন্ন আকারের অনেকগুলি বিল বর্তমান আছে। কেবলমাত্র বিষম বন্যাবর্ষ ব্যতীত অনেকগুলিতে সারা বৎসর ধরিয়া নিশ্চলভাবে জল জমা হইয়া থাকে।"

এই মহকুমায় স্থানে স্থানে গলা ফুলা রোগ বিস্তর দেখা যায়। যমুনার পার্শ্ববর্তী স্থানে এই রোগ অপেক্ষাকৃত অধিক।

লোকের সংখ্যা ঃ

গত সেন্সরের (লোক-গণনার) সময় নিম্নলিখিত অনুসারে দেখা যায় ঃ

থানা	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	হিন্দু	মুসলমান
সিরাজগঞ্জ	২৭০১৬৮	১৩৬৩৮৭	১৩৩৭৮১	৫২৯১৬	২১৭০৩৯
রায়গঞ্জ	১০৮৩৭০	৫৫৭৬৪	৫২৬০৬	২৯৩১০	৭৯৭০৩
উল্লাপাড়া	১৯৪৪৪৬	৯৭৯০৬	৯৬৫৪০	৪২১১৮	১৫২৩২০
শাহজাদপুর	২৫৬৩৩৬	১২৬৪০১	১২৯৯৩৫	৬০৩৬৯	১৯৫৯৫৯
	৮২৯৩২০	৪১৬৪৫৮	৪১২৮৬২	১৮৫৭১৩	৬৪২৯৯১

সেন্সস রিপোর্টে দেখা যায় ১৮৯১-১৯০১ সন পর্যন্ত সিরাজগঞ্জের জনসংখ্যা শতকরা + ৯.৪২ হিসাবে বাড়ে, আবার ১৯১০ হইতে ১৯১১ পর্যন্ত - .০৫৭ হিসাবে কমে। ১৯০৩, ১৯০৬ ও ১৯১০ এই সনে বিষম বন্যা-প্লাবন ঘটে, ইহার মধ্যে ১৯০৬ সনের বন্যাতে শস্যের বিস্তর ক্ষতি করে এবং ১৯১০ সনের প্লাবন যদিও অধিক দিন স্থায়ী ছিল না, কিন্তু তাহা অতীব কষ্টদায়ক ছিল। এই দশ বৎসরের চারি বৎসর জন্মসংখ্যা হইতে মৃত্যু-সংখ্যা অধিক ছিল।

শেষ গণনাতে সমস্ত পাবনা জেলার লোকসংখ্যা ১৪২৮৫৮৬ জন অর্থাৎ পূর্ব-গণনার সংখ্যা হইতে মাত্র ৭১৯১ জন অধিক ; কিন্তু সারাঘাটের পুল নির্মাণকার্যে ৭১৫৪ জন লোক ছিল, ইহাদের অধিকাংশ বিদেশিয়। এই হিসাবে পাবনা সদর মহকুমায় জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ২ জন বৃদ্ধি ও সিরাজগঞ্জে প্রায় আটজনকে দেখায়। সারা পুল-নির্মাণ কার্যে আগত বিদেশিয় লোক বাদ দিলে, পাবনা সদর মহকুমার লোকসংখ্যাতেও বৃদ্ধি দেখা যাইত না।

সিরাজগঞ্জ হিন্দুপ্রধান স্থান ঃ

পূর্বলিখিত তালিকা অনুসারে সিরাজগঞ্জে মুসলমানের সংখ্যা এত অধিক হইলেও ইহা একটি হিন্দু প্রধান স্থান। তাহার কারণ এই ঃ

১. এখানে প্রায় জমিদারগণ হিন্দুজাতীয়, তাহাদের প্রভুত্ব ও আধিপত্য এত অধিক যে, অধীনস্থ প্রজাবর্গ জমিদারগণকেই একরকম সর্বেসর্বা মনে করে ; ইংরেজ গভর্নমেন্টকে অনেকে চেনে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জমিদারগণকে ইহারা "আমাদের মনিব" এই বলিয়া প্রকাশ করে। এখানকার প্রজাবর্গের শত ধনসম্পত্তি থাকিলেও নিজ জমিদারগণকে অতিশয় ভক্তি করে।

২. এখানকার মুসলমানগণ অধিকাংশ অশিক্ষিত ও চাষ আবাদকারী এবং অন্যদিকে হিন্দুগণ সংখ্যাতে কম হইলেও প্রায় শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ।

মুসলমানগণের উপাধি ও বংশ নিদর্শন ঃ

এখানে মুসলমানগণ নিম্নলিখিত উপাধিধারী। যথা ঃ

মণ্ডল, প্রামাণিক, সরকার, তালুকদার, বিশ্বাস, মল্লিক, খাঁ, মুন্সি, মির, খোন্দকার ও সেখ ইত্যাদি।

খোন্দকার ও সেখ এই দুইটি বংশ নিদর্শন এবং অপরগুলি পূর্বকার রাজা মহারাজা ও নবাবগণ কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি।

উচ্চবংশীয় মুসলমান অর্থাৎ সৈয়দ, সিদ্দিকি, ফারুকি, হাকেমি প্রভৃতি অতি বিরল। কিন্তু শাহজাদপুরের মুসলমানগণের মধ্যে অনেক ভদ্র ও উচ্চবংশীয় লোক আছেন। শুনিয়াছি এই স্থানে অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষা উচ্চবংশীয় হিন্দুর সংখ্যা অধিক।

মুসলমানগণের আচার ব্যবহার ঃ

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সিরাজগঞ্জ একটি হিন্দুপ্রধান স্থান। এই কারণে অধিকাংশ মুসলমানগণ, প্রতিবেশী হিন্দুজাতির আচার-ব্যবহার অনুকরণ করে ও করিতে ভালবাসে। যথা ঃ

১. ইহারা প্রায়ই টুপি বা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে না। শিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে পর্যন্ত এরূপ দেখা যায় যে, অন্য সময়ের কথা দূরে থাকুক, ঈদের নামাজ (বাৎসরিক উপাসনা) পড়িতে যাওয়ার নিমিত্ত অন্যের নিকট টুপি ধার চায়।

২. ধুতি, শার্ট কোট প্রভৃতি (ঠিক যেন বাবুসাজ) ইহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক পোশাক।

৩. কাঁসা ও পিতলের থালা-বাটি ইহাদের ব্যবহার্য ও প্রিয় বস্তু। চিনামাটির বা কড়ির বাসন, পেয়ালা অনেকের বাড়িতে খুঁজিলেও পাওয়া যায় না।

৪. নারিকেলের হুঁকা ইহারা ব্যবহার করে। যাহারা অবস্থাপন্ন বা সম্পত্তিশালী তাহাদের বাড়িতে ভদ্র ব্যবহারের জন্য ঐরূপ নারিকেল হুকা, রূপাতে জড়াও করিয়া ২০/২৫ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া রাখে।

৫. হিন্দুদের ন্যায় তৈলমর্দন করিয়া স্নানান্তে আহার করে। স্নান না করিয়া আহার করে না। এমন কি, যদি কাহাকেও খাওয়ার জন্য আদর করিতে হয়, তবে বলে "এখানে স্নান করুন, বা তৈল আনিয়া দেই" এই কথাতেই খাওয়ার জন্য আদর করিতেছে বুঝা যায়।

৬. নামাজ, রোজা প্রভৃতি ফরজকার্যাদি (যাহা না করিলে নিশ্চয়ই পরকালে শাস্তিভোগ করিতে হইবে) অনেকেই করে না। বরং ঐ সমস্ত কাজের নিয়মাদি পর্যন্ত অনেকে জানে না।

৭. মুসলমানী পর্বাদিতে (যথা ঈদ, মহরম ইত্যাদি) ইহাদের আমোদ উৎসব তত দেখা যায় না। অনেকে ঐ সব উৎসবের খবর পর্যন্ত রাখে না। কিন্তু হিন্দু পর্বাদির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। দুর্গাপূজার সময় নিকটবর্তী হইলে এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই উৎসুকচিত্তে তাহার প্রতীক্ষায় থাকে। পূর্ব হইতে টাকা পয়সা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে ও নূতন ও ভাল পোশাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে এবং যথেষ্ট আমোদের সহিত পূজার মেলাতে উপস্থিত হয় ও কেহ কেহ যোগদান করে।

৮. আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সারা বৎসর ছাড়িয়া এই দুর্গাপূজার সময় মুসলমানগণ স্ব স্ব কন্যাগণকে তাহাদের স্বামীগৃহ হইতে নাইহর করায়, ও জামাতাদিগকে নিজ বাড়িতে আনাইয়া উৎসবের সহিত খাওয়ায় ও কাপড়চোপড় দেয়। শুনিলাম, শাহজাদপুরের মুসলমান ভদ্রলোকেরা পূজার সময় কন্যা-জামাই ভোজন, কাপড়চোপড় আদানপ্রদান উঠাইয়া দিয়াছেন। পবিত্র ঈদের সময় তাহারা সর্বপ্রকার আমোদউৎসব করিয়া থাকেন। মুসলমানদের পক্ষে ইহা বিশেষ আনন্দের কথা। তজ্জন্য তাহারা প্রশংসার পাত্র।

৯. অনেক মুসলমানের নাম বিশেষত স্ত্রীলোকের নাম হিন্দুর নামানুসারে রাখিতে দেখা যায়।

১০. বেদাত কার্যাদি (যাহা হজরত রসুলের সময় ছিল না) মুসলমান প্রধান স্থানাদির ন্যায় এখানে তত প্রচুর নাই। কোন কোন স্থানে নিম্নলিখিত কার্যাদির প্রচলন দেখা যায় ঃ

(১) গাজির চোমড় উঠান।

(২) উদ্ধা:বিবির সিন্নি মানস।

(৩) মুস্কিলবিবির সিন্নি মানস।

(৪) সুপুছনীর পান গুয়া শোধ।

(৫) মানিকপীরের সিন্নি মানস।

(৬) মাদারের বাঁশ তোলা।

(৭) এক দিনের গান করা ইত্যাদি।

১১: বেদাতকার্যাদি তত না থাকিলেও, সিরিককার্যাদি (যাহাতে আল্লাতালার শক্তির সহিত অন্যের শক্তিকে শরিক বা অংশীদার করা হয় ও যাহাতে লোকের ইমান থাকে না ও মুসলমানের মুসলমানী থাকে না) এরূপ কার্যাদির প্রচলন প্রচুর, বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলে তাড়াস, নিমগাছি, চান্দাইকোণা প্রভৃতি স্থানে ; যথা (১) বাস্তীপূজা, (২) লক্ষ্মীপূজা, (৩) সরস্বতী পূজা, (৪) ভবানীপুরের মন্দিরে পাঁটা দেওয়া ইত্যাদি।

১২. মুসলমানগণ আপন আপন ছেলে-মেয়েগণকে খেলনার জন্য পুতুল কিনিয়া দিয়া থাকেন। আক্ষেপের বিষয়, ইহারা বুঝে না যে, পুতুল ব্যবহার মুসলমানের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১৩. এখানকার লোকের একটি কুরীতি এই যে, বাহ্য পাইখানার জন্য ইহারা কোন নির্দিষ্ট স্থান রাখে না। ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত, এরূপ লোকের বাড়িতেও ইহার কোন বন্দোবস্ত দেখা যায় না, সিরাজগঞ্জ স্থানটি পাহাড় জঙ্গল শূন্য একটি সমতল স্থান, আড়াল ও নির্জন জায়গা এখানে অতি বিরল। এই অবস্থায় ইহার একটা বিশেষ বন্দোবস্ত না থাকাতে, লোকেরা কতদূর কষ্ট পায় ও লজ্জাহীনতা দেখান হয়, ইহা বলা বাহুল্য। প্রায় স্থানীয় লোকগণ পশ্বাদির ন্যায় প্রকাশ্য স্থানে খোলা মাঠে এরূপভাবে বসিয়া যায় যে, তাহাদিগের দিকে অন্যের দৃষ্টি করা ও সেই স্থান দিয়া চলা ভয়ানক লজ্জাজনক বোধ হয়। বাহ্য পাইখানা যাওয়ার কথাটা "ঘাটে যাওয়া" বা "মাঠে যাওয়া" প্রভৃতি কথাতেই ব্যক্ত করে। যাহারা নদীর ধারে বাস করে, নদীর ধারে বা ঘাটে যাওয়া এবং যাহারা নদী হইতে দূরে থাকে, মাঠে যাওয়া তাহাদের অভ্যাস ; এইজন্য "ঘাটে যাওয়া বা মাঠে যাওয়া" কথাতেই প্রকাশ করে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, উহা মুসলমানের পক্ষে বিশেষ দোষের কারণ বটে। তবে ইহাদের মধ্যে গুণ যে নাই তাহা নহে, গুণও বিস্তর আছে। জগতের নিয়ম সর্বতোভাবে প্রশংসিত বা সর্বাতোভাবে কলঙ্কিত কোন বস্তুই নাই। যেখানে ফুল সেখান কাঁটা বা কাহারও পক্ষে গুণ ও কাহারও পক্ষে দোষ। গুণাবলীর মধ্যে প্রধানত ঃ

(১) ইহারা সাধারণত অতিথিসেবক ও সরল স্বভাবাপন্ন।

(২) ইহারা জীবন্ত প্রাণ। ইহাদের প্রাণে বল আছে ও হৃদয়ে স্ফূর্তি আছে। অশিক্ষিত সাধারণকে যদি কোন বিয়য়টি ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে ও উৎসাহ পায়, সহসা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। এইগুণ আছে বলিয়াই, আমি ইহাদের ভাবী উন্নতির আশা করি।

উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি গতবার যখন প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির অধিবেশনের প্রস্তাব হয়, সিরাজগঞ্জের মত স্থানে যে ইহা হইতে পারিবে, আমার মোটেই আশা ছিল না। কিন্তু পরে আমি নিজে দেখিলাম, অল্পকালের মধ্যেই ইহারা অনেক প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। সমিতি যদি এখানে বসিত, ইহারা সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে পারিত বলিয়া আমার বিশ্বাস।

(৩) সিরাজগঞ্জ সিনিয়ার মাদ্রাসাটির কল্যাণে এখানে অনেক মৌলবি বাহির হইতেছেন ও উল্লিখিত দোষগুলি ক্রমে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মুসলমানী দরগাহ—এখানে দরগাহাদি তত প্রচুর দেখা যায় না। নিম্নলিখিত কয়েকটি সম্বন্ধে আমি জ্ঞাত হইয়াছি।

১. শাহ আব্দাল মাহমুদের দরগাহ—সিরাজগঞ্জ টাউনে।

২. জঙ্গীপীরের দরগাহ—বাদলবাড়ি শাহজাদপুরে।

৩. শাহ্ মক্‌দুমের দরগাহ্—শাহজাদপুরে।

৪. শাহ কামালের দরগাহ—ভুঁইয়া নান্যাতে।

৫. ভোলা দেওয়ানের দরগাহ—নিমগাছিতে।

৬. দেওয়ান শাহনুরের দরগাহ—দেওয়ান তারটিয়াতে।

শাহজাদপুর এই মহকুমাতে একটি প্রসিদ্ধ থানা। এখানে একজন রুরাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট ও একটি ব্রাঞ্চ কোর্ট আছে। ইহা অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমানের বসতি। শাহ মক্‌দুমের দরগাহটি এখানে বর্তমান। অনেক ভদ্র ইতর হিন্দু মুসলমান এবং বিদেশিয় অনেক ধার্মিক মুসলমানগণ ইহার জেয়ারতে সাক্ষাৎলাভে আসেন। এই দরগাহ্ সংলগ্ন একটি প্রকাণ্ড পাকা মসজিদ ও ইষ্টকনির্মিত প্রাচীর প্রভৃতি দেখিলেই ইহা যে বাস্তবিক একজন মহাপুরুষের মাজার, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ইনি "শাহ মক্‌দুম্ এমনি" অর্থাৎ এমন প্রদেশ ইহাতে আগত দরবেশ বলিয়া প্রকাশ। "শাহজাদপুর" এই নামটি এই শাহ সাহেবের বংশজ নাম।

জঙ্গী পীর সাহেব উল্লিখিত মক্‌দুম্ সাহেবের একজন এয়ার অর্থাৎ বন্ধু বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত গরম ছিল বলিয়া মক্‌দুম্ সাহেব তাহার স্থান নিজ আস্তানা হইতে দূরে নদীর অপর পারে করিয়া দিয়াছেন বলিযা শুনা যায়।

কথিত আছে, শাহ মক্‌দুম্ সাহেব এমনের রাজপুত্র বা শাহাজাদা ছিলেন। তিনি ফকির হইয়া রাজধানী হইতে বর্হিগত হন এবং এই শাহজাদপুরের নিকটবর্তী পোতাজিয়া নামক স্থানে প্রথম তাঁহার জাহাজ নোংগর করেন। এই পোতাজিয়াতে নাকি তাঁহার একটি দরগাহ আছে। পরে এই শাহজাদপুরে আসিয়া নিজ সহচরগণসহ তীরে অবতরণপূর্বক স্থায়ীভাবে আস্তানা পত্তন করেন। হিন্দুরাজাদিগের সঙ্গে তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। এক সময়ে সকলে সমবেত উপাসনায় লিপ্ত আছেন অর্থাৎ জামাত করিয়া নমাজ পড়িতেছিলেন, এই অবসরে হিন্দুগণ তাঁহাদের মস্তকচ্ছেদন করে এবং শাহ মক্‌দুম্ সাহেবের পবিত্র মস্তক খণ্ড লইয়া চলিয়া যায়। ইহাতে মুসলমানমণ্ডলী ক্রোধান্ধ হইয়া, প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত হইলে, হিন্দুরাজা অনন্যোপায় হইয়া, তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে এক বৃহৎ জায়গির প্রদান করেন। এই সমস্ত জমি অদ্যাবধি তাঁহার বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন ও তাঁহাদের খাসদখলে আছে। শাহজাদপুরে যে দরগাহটি আছে, তাহাতে শাহ মক্‌দুম্ সাহেবের দেহমাত্র প্রোথিত আছে। এই দরগাহের ব্যয় নির্বাহার্থে গভর্নমেন্টের অধীনে অনেক তালুক আছে।

প্রতিবৎসর হিন্দুদের রামনবমীর সময় এখানে একটি প্রকাণ্ড মেলা লাগে। এই মেলা মাসেককাল স্থায়ী থাকে এবং বহু লোকের সমাগম হয় ও এখানে বহুবিধ দ্রব্যাদি ও অনেক ঘোড়া খরিদ বিক্রি হয়।

হরিচরণ বসু মহাশয় লিখিতেছেন, "মহাত্মা রামশঙ্কর সেনের মতে বোরহানগাজি (গাজিপীর) ও এই মক্‌দুম্ শাহ এক ব্যক্তি। শাহ মক্‌দুম্, জরিপ করার জন্য এখানে প্রেরিত হন ; তাঁহার গজ—"সেকেন্দারী গজ" বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার পিতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুলতান সেকেন্দার শাহ। ইহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত গাজির গীত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গাজির গীত

পোড়া রাজা গয়েসুদ্দি, তার পুত্র—সমসুদ্দি,
তাঁর পুত্র শাহ সেকেন্দার।
তার বেটা বোরহান গাজি, খোদাবন্দ মুলুকের রাজি,
কলিযুগে যাঁর অবতার।।

সিরাজগঞ্জ টাউনের উপর যে দরগাহটি বর্তমান, ইহা শাহ আব্দাল মাহমুদ সাহেবের দরগাহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যে আব্দুল মাহমুদ বলিয়া শুনা যায় ; কিন্তু মুসলমানী সরিয়তের হুকুমানুযায়ী আব্দুল মাহমুদ নাম নিষিদ্ধ। এক শিক্ষিত আরবী ভাষাজ্ঞ লোকের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার নাম আব্দাল মাহমুদ। ইহা অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। আবার "মৈমনসিংহের বিবরণ" লেখক মহাশয় তাঁহার নাম আফজল মহম্মদ" বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহাও প্রমাণ সাপেক্ষ ; কেন না, তাঁহার ভ্রাতার নাম আলি মহম্মদ।

যাহা হোক এই দরগাহ সম্বন্ধে বিবরণ এই যে এই শাহ আব্দাল মাহমুদ সাহেব বেলকুচিতে সমাধিস্থ হন (পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে)। তাঁহার ভক্ত লোকগণ তাঁহার প্রকৃত সমাধিস্থ কিছু মাটি বা অন্য কোন জিনিস আনিয়া এখানে একটি কৃত্রিম দরগাহ স্থাপন করিয়াছে। পূর্বে ইহার অবস্থা বেশ আড়ম্বর বিশিষ্ট ছিল, কিন্তু ১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পে দালান প্রভৃতি ভাঙিয়া অবস্থা শোচনীয় হইয়া গিয়াছে। এখানে নূতন ভাবে একখানা দালান প্রস্তুত হইয়াছে। একজন খাদেম এখানে সদাসর্বদা থাকেন। লোকজনের সমাগমপূর্বে যত অধিক ছিল এখন তত নাই। সিরাজগঞ্জ সিনিয়র মাদ্রাসা হইতে যত মৌলবি বাহির হইতেছেন, উত্তরোত্তর এই সমাগম তত হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস এখানে কিছু সিন্নি দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পুরাতন লোকজনের মুখে এই দরগাহের ও এই শাহ সাহেবের বহু কারামতের (অলৌকিক ঘটনাবলী) কথা শুনা যায়।

ভুঁইয়া নান্যাতে যে শাহ কামালের দরগাহ আছে, তথায় আমি নিজে গিয়াছি ও জিয়ারত করিয়াছি। ঐ গ্রামের পূর্বপ্রান্তে একটি মঠের মধ্যবর্তী এক বিঘা পরিমাণ একটি উচ্চ ভিটি আছে। ইহার চতুর্দিকে আটটি গাবগাছসহ কামালের মাজারটি এই ভিটিতে আজকাল পতিত অবস্থায় আছে। শুনিলাম, পূর্বে ইহা পাকা ইট দ্বারা আবৃত ছিল ; কিন্তু এখন দাবিয়া গিয়াছে ও ইটের চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে। অনেক মুসলমান এখানে হিন্দুদের মত দুধকলা ঢালিয়া দেয় ও কেহ কেহ সন্ধ্যার সময় বাতি দিয়া থাকে। এই শাহ সাহেব সম্ভবত পশ্চিম হইতে (অনেকের মতে বাগদাদ হইতে) আসিয়া এখানে আস্তানা করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচটি পুত্র ছিল। প্রথম পুত্রের নাম "হুর কামাল"। শাহ সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করিতে গেলে না কি তাহা ছয় ভাগ হইয়া পড়ে। এইরূপ কয়েকবার হইলে, তাঁহারা আপন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কারণ কি? মাতা বলিলেন, তাঁহার গর্ভে একবার একটি সর্প জন্মিয়া বাহিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ছয় ভাগের এক ভাগের মালিক কেহ থাকিলে তিনি তাঁহার ভাগ লইয়া যান।"

তখন কোথা হইতে একটি সর্প আসিয়া, একটি ভাগের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়। তখন অপর পাঁচ ভ্রাতা ঐ ভাগটি বণ্টন করিয়া রাখেন। এখন পর্যন্ত ঐ গ্রামে তাঁহার বংশধরগণ বর্তমান আছেন। তাঁহারা শাহ কামালের সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন ও জমিদারগণের মত (এখনও সামান্য যাহা কিছু আছে) কালেক্টরিতে রাজস্ব দিয়া থাকেন। তাঁহার সম্পত্তি দুই মহালে ভুক্ত। পাঁচ ভ্রাতার অংশ ৷৷ /২৷৷ - ক্রান্তি এক মহাল ও ৵১৩। —ক্রান্তি অন্য মহাল ভুক্ত হইয়া পৃথকভাবে চলে। এবং বড় নম্বর ও ছোট নম্বর রূপে কথিত হয়। ছোট নম্বরের নাম—"আলহিদা মহাল" বলিয়া গ্রামে প্রকাশ। আল্লার কাজ সবই সম্ভবপর।

প্রকাশ যে, শাহ্ সাহেবের সপ্তবিংশতি পুরুষের বংশধরগণ এখনও বর্তমান আছেন। এই হিসাবে অনুমান করা যায় যে, প্রায় আট শত বৎসর গত হইতেছে, শাহ সাহেব এই দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

হিন্দু দেবালয় বা মন্দির—এখানে নিম্নলিখিত কয়েকটি দেবালয় আছে বলিয়া অবগত হইয়াছি।

১) নবরত্ন মন্দির — হাটি কুমরুলে।
২) রাধাগোবিন্দ রায় ও জয়কালী মন্দির — তাড়াসে।
৩) দেবী দুর্গা মন্দির — রায়পুরীতে।
৪) রাণী ভবানী মন্দির — ভবানীপুরে।
৫) কালী বাড়ি মন্দির — সিরাজগঞ্জ টাউন।
৬) কালী বাড়ি মন্দির — রাজনগর কালীবাড়ি।
৭) চৈত্রহাটিতে কালীবাড়ি — চৈত্রহাটিতে।

এই মহকুমাতে পশ্চিমসীমায় একটি বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিশালী মন্দির আমি দেখিয়াছি। উহা রাণী ভবানীর মন্দির নামে প্রসিদ্ধ। স্থানটি অতিশয় মনোরম ও বহু যাত্রীর সমাগমস্থল। কিন্তু উহা বগুড়া জেলার অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়।

নবরত্ন মন্দিরটি রামনাথ ভাদুড়ি নামক কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া শুনিয়াছি। ইহাকে নবরত্ন কেন বলা হয়, এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, ইহার নয়টি তালা উপর্যুপরি ছিল, আজকাল নিম্নে দাবিয়া গিয়া কেবল নবম তলই দৃশ্যমান। অন্য মতে ইহার ভিতর নয়টি প্রসিদ্ধ মূর্তি ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনিয়াছি, এই মন্দিরটি বিশ্বকর্মা-শিল্পী নির্মিত তৈল ও ঘৃত ভাজা ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত। রামনাথ ভাদুড়ির না কি একখানা লেজ ছিল।

রাধাগোবিন্দ রায় ও জয়কালী মন্দির উভয়টি তাড়াসের জমিদার কর্তৃক প্রতিপালিত। এই দুই মন্দিরের নামে ও ইহাদের ব্যয় নির্বাহার্থ পৃথক জমিদারি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

চৈত্রহাটি মন্দিরে লোকে বোয়াল মৎস্য দিয়া থাকে।

জমিদার—সিরাজগঞ্জ মহকুমাতে ছোট বড় প্রায় ১৮টি প্রসিদ্ধ জমিদার আছেন বলিয়া অবগত হইয়াছি। তাহাদের প্রায় সকলেই হিন্দু জাতীয়।

নিম্নলিখিত কয়েকজন উল্লেখযোগ্য।

১) রায় বনমালী রায় বাহাদুর প্রায় ৫ লক্ষ টাকা আয় — তাড়াস।
২) বাবু যোগেশচন্দ্র ভাদুড়ি ও বাবু কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ি — পোরজনা।
৩) বাবু শ্রীশচন্দ্র ধর — পোতাজিয়া।
৪) পাকড়াশি জমিদারগণ — স্থল বসন্তপুর।
৫) পাকড়াশি জমিদারগণ -- শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল — সলপ
৬) পাকড়াশি জমিদারগণ — উমাশঙ্কর মৈত্র — হরিপুর।

মুসলমান জমিদারগণের মধ্য দুইটি বাড়ি উল্লেখযোগ্য।

১) মিঞা বাড়ি—রায়পুর সিরাজগঞ্জে। পূর্বে এই বাড়ির অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক ছিল এবং বেশ প্রতিপন্ন জমিদার ছিলেন। অধুনা অতীব শোচনীয়।

২) মুন্সী এলাহীবক্স সাহেব—ধুবীল।

এই সাহেব একজন ধর্মপরায়ণ মুসলমান জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ব্যবসায়—সিরাজগঞ্জে মুসলমানগণের মধ্যে অনেক কারিকর (বস্ত্রবয়নকারী) আছে। ইহারা যে সমস্ত কাপড় প্রস্তুত করে, তাহা নানা দেশে রপ্তানি হয়। ছোট বুলের চ বিশেষ

উল্লেখযোগ্য এবং উহা বাজারে চড়া দরে বিক্রিত হইয়া থাকে। কারিকর শ্রেণীর লোকগণের অবস্থা সাধারণত স্বচ্ছল। ইহারা ভাল মুসলমান এবং ইহাদের মধ্যে পর্দা প্রথার সুন্দর নিয়ম আছে।

হিন্দুগণের মধ্যে সাহা সম্প্রদায় অনেক আছে। ইহারা প্রায়ই বড় মহাজন ও ধনী। ইহাদের টাকা লগ্নি-কারবার আছে। সুদের হার শতকরা মাসিক ২ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্যন্ত শুনিয়াছি। এই সুদের কারবারে দরিদ্র মুসলমানগণ নিঃশেষিত হইয়া, মহাজনগণের অবস্থা দিন দিন পুষ্ট হইতেছে। সাহা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক জমিদারও আছেন। সিরাজগঞ্জ টাউনে দেবনাথ সাহা, ব্রজেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি কয়েকজন সাহা সম্প্রদায়ী বিশেষ ধনী ও প্রসিদ্ধ লোক বর্তমান। সুদের হাত হইতে দরিদ্রগণকে রক্ষা করিবার জন্য, দয়ালু গবর্নমেন্ট এই মহকুমাতে কয়েকটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক খুলিয়া দরিদ্রদিগকে রক্ষা করিতেছেন।

সিরাজগঞ্জ টাউনের এক মাইল দক্ষিণে কালিহাকান্দাপাড়া নামক স্থানে মহাজনদিগের খাতার জন্য খুব ভাল কাগজ প্রস্তুত হয়, উহা বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। এই কাগজের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে লিখিবার সময় ব্লটিং কাগজের আবশ্যক হয় না। লিখিবামাত্র কালী শুকাইয়া যায়। মারওয়াড়ি ব্যবসায়িগণ ইহা খুব পছন্দ করেন।

সাধারণ অবস্থা ঃ—এখানকার হিন্দু মুসলমানগণ সাধারণত অবস্থাপন্ন। সংসারনির্বাহার্থে তাহারা অধিক ভাবনা বা চিন্তা করেন না বলিয়া বোধ হয়। বিশেষত মুসলমানগণ প্রায়ই অপরিণামদর্শী। ইহারা টাকা পয়সা বিস্তর লাভ করে, পাটের চাষে ইহাদের সাধারণ অবস্থা অতি স্বচ্ছল করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যখন ভাদ্র আশ্বিন মাসে প্রচলিত চড়া দরে পাট বিক্রয় করিয়া আনিয়া, থলিয়া ভরা টাকা হাত করে, তখন একরূপ ভালমন্দ বিবেচনা শূন্য হয় ও এক টাকার দ্রব্য পাঁচ টাকাতে ক্রয় করিতে দ্বিধা বোধ করে না। একটি সামান্য ইলিশমাছ এক টাকা দেড় টাকাতে অসঙ্কুচিত চিত্তে কিনিয়া ফেলে। অথচ ভদ্রলোক বা চাকুরি ব্যবসায়ীগণ ঐ মাছটি দশ আনা এগার আনা দিয়া কিনিতেও সাহস করে না। চাউল, ডাইল, মৎস্য ও দুগ্ধ ইহাদের প্রাত্যহিক খাদ্য। মাংস অপেক্ষা মাছই সাধারণবর্গ ভালবাসে। অনেক সময় মৎস্যের নিমন্ত্রণাদি মুসলমানদিগের মধ্যেও হইতে দেখা যায়। গ্রামস্থ অনেকেই আজকাল সাইকেল, গ্রামোফোন প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছে। সিরাজগঞ্জ টাউনে যত সাইকেল ও গ্রামোফোনের দোকান আছে, অনেক ছোট জেলা টাউনে বোধ হয় তত নাই। ইহা অবশ্য এই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ। ছেলেগণকে "বিবাহ" শব্দের অর্থ বুঝিবার পূর্বেই ১০/১২ বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতেই, প্রিয়তম অপরিণামদর্শী পিতাগণ পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের ভাবী উন্নতির পথ রুদ্ধ করিতে ইহারা বড়ই পটু।

বিদ্যাশিক্ষা ঃ—সুখের বিষয় এই যে, এদেশবাসী অধিকাংশ মুসলমানই পূর্বে অশিক্ষিত ছিল ও শিক্ষার মর্যাদা বুঝিত না বটে, কিন্তু আজকাল ইহাদের মধ্যে লেখাপড়ার এত ঝোঁক হইয়াছে যে, অল্পদিন (অন্যূন দশ বৎসর) মধ্যে এই দেশটি শিক্ষিত মুসলমানের স্থান বলিয়া গৌরব করিতে পারিবে, ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস। প্রাইমারি পাঠশালা ও মক্তব হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয় প্রভৃতিতে এ পর্যন্ত মুসলমান ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক ছাত্র কলেজে শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে। এই উদ্বোধন কেবল বালকগণের মধ্যে নয়, মুসলমান বালিকারাও গ্রামে গ্রামে পাঠশালা মক্তবে শিক্ষা পাইতেছে। শাহজাদপুর সার্কেলের চরবেলতৈল, মোর্মাল ও চৌহালি এবং সিরাজগঞ্জ সার্কেলের মেঘাই ও হোসেনপুর বালিকা বিদ্যালয়াদি হইতে বালিকাগণ শিক্ষিতা হইয়া বাহির হইতেছে। এই মহকুমাস্থ বিদ্যালয়াদি নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে কাহার না মনে আনন্দের উদ্রেক হয়।

ইংরাজি বিদ্যালয়	১২
মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়	২৬
মধ্য বাংলা বিদ্যালয়	৫
উঃ প্রাঃ পাঠশালা	৬৮
নিম্ন প্রাঃ পাঠশালা	৩১৫
বালিকা বিদ্যালয়	১৯২
মোট	৫৮৮

মক্তব ঃ—জুনিয়ার মাদ্রাসা ও মক্তবাদি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এখানে মক্তবের সংখ্যা এত অধিক যে, এই রাজশাহী বিভাগের বাকি ৭টি জেলার কোন জেলাতে এত অধিকসংখ্যক নাই। বালক মক্তব ৭৭, বালিকা মক্তব ৮৭। বাস্তবিকই মুসলমান বালক-বালিকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শুধু পাঠশালা স্থাপন অপেক্ষা মক্তব পাঠশালা (Maktabs) স্থাপন করা যে অধিকতর উপকারী, বোধ হয় এখানকার লোকগণ তাহা উপলব্ধি করিয়াছে। তাহাতে পাঠাশালার নিয়মে ও ঠিক ঐ হারে বাংলা অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষা হয় ও তৎসঙ্গে সামান্যরূপ আরবী, উর্দু ও কোরাণ পড়া প্রভৃতিতে শিক্ষালাভ করিতে পারে।

শিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা ঃ— রিপোর্টে প্রকাশ সিরাজগঞ্জ মহকুমাতে শিক্ষিত পুরুষ ৪২১৫৩, শিক্ষিতা স্ত্রীলোক ২৪২৮ জন। ইংরেজি শিক্ষিত পুরুষ ৫৬৪৮, ইংরেজি শিক্ষিতা স্ত্রীলোক ৪৫ জন।

মৌঃ আবদুচ্ছোবাহান মাহমুদ সাহেব ও বাবু যাদব চক্রবর্তী মহাশয় ঃ— এখানে মৌলবি আবদুচ্ছোবাহান মাহমুদ এম. এস. সি সাহেবের বিষয় উল্লেখ করা সঙ্গত বোধ করি। এই মৌলবি সাহেব মুসলমান বিদ্যার্থীগণের মধ্যে রত্ন-বিশেষ।

এন্ট্রান্স হইতে আরম্ভ করিয়া এম. এস. সি পর্যন্ত প্রতি পরীক্ষায় ইনি কলিকাতা ইউনির্ভাসিটিতে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। গতবার এম. এস-সি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, ইউনির্ভাসিটির পক্ষ হইতে তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহার বাড়ি এই টাউন হইতে দুই মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। সিরাজগঞ্জবাসী ছাত্রগণ তাঁহার দ্বারা গৌরব করিতে পারেন। বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় যাঁহার প্রণীত পাটিগণিত ও বীজগণিত ভারতবর্ষব্যাপী হইয়াছে, তিনিও এই টাউনবাসী। এখন তিনি আলিগড় কলেজের গণিতাধ্যাপক।

ভাষা ঃ— এখানকার অধিবাসীগণ যে বাংলাভাষী ইহা বলা বাহুল্য। শিক্ষিত টাউনবাসী লোকগণ সাধুভাষা ব্যবহার করেন। কিন্তু, সাধারণ ব্যক্তিদের কথাতে অনেক অপভ্রংশ আছে ও একঘেয়ে ধরনের। ইহাদের একটি প্রকৃতি এই যে, ইহারা প্রায়ই "অ" কে "র" ও "র" কে "অ" উচ্চারণ করে ; যথা "আম" কে "রাম" ও "রাম" কে "আম"। ইহার তাৎপর্য কি, বুঝিলাম না। "শ" কে "হ" যথা "শোলা" কে "হোলা" এইরূপও বলিয়া থাকে।

সিরাজগঞ্জ টাউন ঃ— সিরাজগঞ্জ টাউনটি এক মহকুমা হইলেও সমৃদ্ধিতে পাবনা জেলা টাউন বা অন্যান্য ছোট জেলা টাউন হইতে উৎকৃষ্ট। আয়তনে ইহার মিউনিসিপ্যালিটি প্রায় ১৪ বর্গ মাইল। পূর্বপশ্চিম হইতে উত্তর দক্ষিণ প্রান্ত অপেক্ষাকৃত লম্বা ; লোকসংখ্যা ২৪৭৭৭ ; তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ১১৫৪২, পুরুষ ১৩২৩৫। কমিশনার সাহেবের ১৯১২-১৩ সনের রিপোর্টে দেখা যায়, ইহার বার্ষিক আয় ২৩৬৪৮ টাকা ও বার্ষিক ব্যয় ২২৩৩১ টাকা। ১৮৬৯ সনের ১ এপ্রিল হইতে এই মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৭৬ অব্দে স্থাপিত, অর্থাৎ সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির ৭ বৎসর পর পাবনা মিউনিসিপ্যালিটির জন্ম হয়। এখানে টেক্সদাতার সংখ্যা ৩৭৩০ জন অর্থাৎ জনসংখ্যার হিসাবে শতকরা ১৫ জন।

সিরাজগঞ্জ স্থানটি ইহার প্রাকৃতিক অবস্থাদি দেখিলেই বোধ হয়, যেন ইহা অপ্রাচীন ও আধুনিক। বাস্তবিক তাহাই। ১৮৭৫ সনের ৩১ মার্চ অবধি ইহা ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর সাবডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাড়াস হইতে সেরপুর টাউন (ময়মনসিংহ) পর্যন্ত স্থানটি পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের জল মধ্যে ছিল। তাড়াস হইতে সেরপুর যাইবার কালীন এই বিস্তৃত জলভাগ পার হইতে দশ কাহন কড়ির প্রয়োজন হইত, তাই ঐ সেরপুর "দশ কাহনে সেরপুর" বলিয়া কথিত হয়।

ব্রহ্মপুত্র নদের গতি পরিবর্তিত হইয়া, তাহার একটি সংকীর্ণ শাখা যাহা "যমনু" নামে অভিহিত, তাহা ময়মনসিংহের ও পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের নিকট দিয়া অতি খরস্রোতে দক্ষিণ দিকে বাহিয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রের বিস্তৃত জলরাশি কমিয়া সঙ্কীর্ণ শাখা যমুনায় পরিণত হয় ; এবং উহা মধ্যবর্তী স্থান দিয়া বাহিয়া যাওয়ায়, সিরাজগঞ্জটি নদীর পশ্চিমপারে পড়ে ; তাই উহা ময়মনসিংহের কালেক্টরির তৌজি হইতে খারিজ হইয়া, পাবনা কালেক্টরির তৌজির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সরকারি আফিসার ঃ

এখানে সদা সর্বদা একজন সিভিল সার্ভিস পাশ ইংরেজ আফিসার থাকেন। ইনি সবডিভিসনাল আফিসার বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। এছাড়া একজন ডেপুটি কালেক্টার, একজন সবডেপুটি কালেক্টার, তিনজন মুন্সেফ, একজন ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, একজন পুলিশ ইনসপেক্টার, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন, একজন সাবরেজিস্টার, একজন ম্যারেজ রেজিস্টার, একজন স্কুল ডেপুটি ইনস্পেক্টার, একজন স্কুল সবইনস্পেক্টার ও একজন পশু চিকিৎসক এখানে থাকেন।

সরকারি আফিস ঃ

১) ফৌজদারি। ২) আদালত। ৩) সব্‌রেজিস্টারি আফিস। ৪) পুলিশ আফিস। ৫) মিউনিসিপ্যাল আফিস। ৬) লোকালবোর্ড আফিস। ৭) জেলখানা। ৮) স্কুল ডেপুটি ইনসপেক্টার আফিস। ৯) স্কুল সব ইনসপেক্টার আফিস। ১০) আবগারি ডিপো। ১১) পোস্ট আফিস। ১২) টেলিগ্রাফ আফিস। ১৩) ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল। ১৪) থানা।

বিদ্যালয় ঃ

এখানে একটি সিনিয়ার মাদ্রাসা বর্তমান। রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলার মধ্যে ইহাই একমাত্র মাদ্রাসা কলেজ ও মুসলমানগণের গৌরবস্থল। দুইটি হাইস্কুল, —যথা, ১) বি. এল. ও ২) ভিক্টোরিয়া, উভয় স্কুল সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। বি. এল স্কুলের জন্য একখানা নূতন দালান প্রস্তুত হইযাছে, আকারে ও আয়তনে উহা দর্শনযোগ্য জিনিস।

এই টাউনে ৩টি মধ্য ইংরাজি স্কুল, ৯টি বালক প্রাইমারি ও ৮টি বালিকা প্রাইমারি বিদ্যালয় আছে। ইহাদের মধ্যে সিরাজগঞ্জ আর্বান, হোসেনপুর ও বানিয়াপটি বালিকা বিদ্যালয় এই তিনটি উল্লেখযোগ্য।

মুসলমান ছাত্রসংখ্যা উল্লিখিত বিদ্যালয়াদিতে প্রায় অর্ধেক হইতেও অধিক। ছাত্রসংখ্যা যে পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে, অবিলম্বে আর একটি হাইস্কুল খোলা নিতান্ত প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, **এখানে কোন মুসলমান ছাত্রাবাস বা বোর্ডিং হাউস নাই**। এই কারণে অনেক ছাত্র বিস্তর কষ্ট ভোগ করিতেছে।

টাউনে ছাত্রসংখ্যা ঃ

মুসলমান	হিন্দু	সমষ্টি
৩৬১ +	০ =	৩৬১ সিনিয়ার মাদ্রাসা
২১২ +	৩৯০ =	৬০২ বি, এল, হাইস্কুল
১৭৭ +	৩৬৩ =	৫৪০ ভিক্টোরিয়া হাই
৭৫০ +	৭৫৩ =	১৫০৩

	মুসলমান	হিন্দু	সমষ্টি
বনিয়াপটি মধ্য-ইংরাজি স্কুল	১৪৩ +	১৯২	৩৩৫
ইস্‌লামিয়া মধ্য-ইং	১৩৩ +	৬	১৩৯
গয়লা বা অমৃতলাল মধ্য-ইং	১৬ +	৪৯	৬৫
	২৯২ +	২৪৭ =	৫৩৯
বালক প্রাইমারি	২৯৩ +	১১৯ + খ্রিস্টঃ ২ =	৪১৪
বালিকা প্রাইমারি	২৩০ +	১০১ =	৩৩১
	৫২৩ +	২২০ =	৭৪৫

সমষ্টি মুসলমান	১৫৬৫
হিন্দু	১২২০
খ্রিস্টান	২২
	২৮০৭ জন

সওদাগরি আফিস ঃ

সিরাজগঞ্জ টাউনটি পাটের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্বে এখানে একটি জুটমিল বা চটের বা পাটের কল ছিল। শ্রীযুক্ত ওমেলী সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায়, তাহাতে দৈনিক প্রায় ২০০০ লোক কাজ করিত। ১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পে তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। আজকাল তাহার ভগ্নাবশেষ বর্তমান আছে। ইদানীং জুটমিল না থাকিলেও পাটের ইটের প্রেস বা বাঁধিবার কল অনেক আছে। মৌসুমের সময় বিস্তর লোক এই কাজে খাটে। এই পাটের কারবারে এখানে অনেক ইংরেজ ও দেশিয় সওদাগরের আফিস আছে; নিম্নলিখিতগুলি প্রসিদ্ধ।

১) চিটাগাঙ্গ কোম্পানি। ২) রেলি ব্রাদার্স। ৩) ডেভিড কোং। ৪) ল্যানডেইল কলার্ক। ৫) গ্রেগরী। ইহারা ইংরেজ সওদাগর।

১) গোবিন্দ গায়ন। ২) সুবল চান্দ। ৩) বালুবাবু বা কৃষ্ণবন্ধু প্রভৃতি বাঙালি সওদাগর।

এতদ্ব্যতীত স্টিমার কোম্পানির এজেন্টের আফিস, লোন আফিস ও বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এইগুলি বেসরকারি আফিস এবং খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারক একটি মিশন হাউসও আছে।

ঔষধালয়—এই টাউনে এত অধিক সংখ্যক ঔষধালয় আছে যে, বোধ হয় অনেক জেলা টাউনে তত নাই। আজকাল সর্বসমেত ৩৫টি ঔষধালয় বর্তমান। ৮টি এলোপ্যাথিক, ১১টি হোমিওপ্যাথিক, ১২টি কবিরাজি, ৩টি হাকিমী, ১টি চাঁদসি।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং কবিরাজ ইহাদের মধ্যে অনেক আছেন। এখানকার সরকারি ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য। কিছু দিন হইল, জানানা হাসপাতালের সৃষ্টি হইয়াছে ও ইহার আরও উন্নতি হইতেছে। মৌলবি ফজলের রহমান খাঁ সাহেব এল, এম, এস্ অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ও মিসেস আর ডায়েস, লেডি ডাক্তার আজকাল আছেন, উভয়েই

প্রশংসনীয়। এখান আরও ২ জন এল. এম. এস. প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। লেডি ডাক্তারের জন্য পাকা কোয়ার্টার প্রস্তুত করিতে প্রায় ৪০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯১৩ সনে এই হাসপাতাল হইতে ভিতরে ও বাহিরে (ইনডোর ও আউটডোর) যথাক্রমে ৫৫২ ও ২৪৯৪৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। হাসপাতালে পুরুষের জন্য ২২ খানা ও স্ত্রীলোকের জন্য ৪ খানা বিছানা আছে।

এখানে সাইকেল নূতন বিক্রি ও মেরামতকরণের জন্য দোকান ৭ খানা, কলের গানের দোকান ৪ খানা, বরফের কল একটি, প্রেস বা ছাপাখানা ২টি ও পুস্তকালয় ৪টি উল্লেখযোগ্য।

বাজার—এই টাউনে ৩টি বাজার দৈনিক বসে যথা — ১) কালীবাড়ি। ২) বড়বাজার। ৩) কোল বাজার।

বর্ষাকালে এই টাউনের দৃশ্য অতি মনোহর হয়। টাউনের মধ্য দিয়া ধানবান্দি নদী নামে যে খালটি পূর্বপ্রান্তস্থিত যমুনা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, উহার উভয় পারে বর্ষার সময় অপূর্ব শোভা ধারণ করে। বিশেষত ইলিয়ট ব্রিজটির উপর আসিয়া দৃষ্টিপাত করিলে, মনে অপূর্ব আনন্দের উদ্রেক হয়। সহস্রাধিক নৌকা এই নদীতে আমদানি হইয়া একত্রিত ভাবে থাকে ও উভয় পারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাটের গুদাম হইতে বিস্তর লোক পাটের বিভিন্ন কার্যে লিপ্ত থাকে, দেখিতে অতি মনোরম।

মসজিদ—এই টাউনে পাকা মসজিদ একটিও নাই। কয়েকটি পাকা মেঝে ও টিনের ছাদযুক্ত মসজিদই মাত্র বর্তমান। শুনা যায়, কায়েমী জমি পাওয়া যায় না বলিয়া, এতদিন এই অভাবটুকু রহিয়া গিয়াছে। এবার হোসেনপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ বক্তা মুন্সি মহম্মদ মেহেরউল্লা সাহেবের যত্নে ও উৎসাহে মুন্সিবাড়িতে একটি পাকা মসজিদ হইতেছে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দায়েমুল্লা মিঞা এই মসজিদের জন্য জমি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। উভয় সাহেবান এই মহৎ সৎকার্যের জন্য প্রশংসাভাজন।

যাতায়াতের সুবিধা—সিরাজগঞ্জে স্টিমারযোগে যাতায়াত হইয়া থাকে। প্রতিদিন ২ খানা স্টিমার আসাম দিক হইতে গোয়ালন্দ অভিমুখে এবং ২ খানা গোয়ালন্দ হইতে আসামের দিকে চলে। এই চারিখানা জাহাজ এই টাউনের পূর্ব-উত্তর প্রান্তে ৩ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত "সিরাজগঞ্জ" নামক স্টেশনে লাগিয়া থাকে। এতদিন সিরাজগঞ্জে রেল হইয়াছিল না, সুখের বিষয় এবার রেলওয়ে কোম্পানিও সুদৃষ্টিপাত করিয়া সারা—সিরাজগঞ্জ লাইন মঞ্জুর করিয়াছেন ; কার্য প্রায় অর্ধেক হইয়া আসিয়াছে। আশা করা যায়, বৎসরেক পর হইতে রেলের লাইন খোলা হইবে।

সিরাজগঞ্জ বারে ৩৭ জন উকিল ও ৪৫ জন মোক্তার বর্তমান। তাহাদের মধ্যে মুসলমান উকিল ২ জন ও মুসলমান মোক্তার ৫ জন।

দর্শনযোগ্য জিনিস এখানে তত কিছু নাই। ১) ইলিয়ট ব্রিজ। ২) জুবিলী গার্ডেন। ৩) পাবনা রোড। ৪) বি. এল. স্কুল—এই কয়েকটি বলা যাইতে পারে। সিরাজগঞ্জ স্থানটি পুরাতন নয় (পূর্বে বলা হইয়াছে)। এই কারণে পুরাতন ইমারতাদি নাই। ধানবন্দি নদীর পশ্চিমপারে মারওয়াড়ি পট্টিতে কতকগুলি ইস্টক নির্মিত দালান প্রভৃতি দেখিতে মন্দ নয়। রেললাইন খোলা হইলে, এই টাউনের অবস্থা আরও ভাল হইতে পারে।

উপাধিধারী ব্যক্তিগণ—সিরাজগঞ্জ মহকুমাটি এত প্রসিদ্ধ হইলেও গভর্নমেন্ট উপাধিপ্রাপ্ত লোক এখানে ছিলেন না। অতীব সুখের বিষয় এই যে, গত নিউয়ার্স ডে (জানুয়ারি, ১৯১৪) উপলক্ষে দয়ালু ও ন্যায়বান গভর্নমেন্ট নিম্নলিখিত দুইজন উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন।

১) রায় বাহাদুর বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি, নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা ও স্বদেশ হিতৈষিতা

গুণে তিনি এই উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ উকিল, গভর্নমেন্ট প্লীডার, সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি। তাঁহার আমলে মিউনিসিপ্যালিটি সরকারি ডাক্তারখানার, কালীবাড়ি বাজারের ও পূর্বোল্লিখিত প্রসিদ্ধ বি. এল. হাই-স্কুলের বহুল উন্নতি হইয়াছে।

২) খান বাহাদুর, ডাক্তার মৌলবি এলাহি বক্স সাহেব। ইনি একজন হিন্দুস্থানী লোক, কিন্তু বর্তমানে সিরাজগঞ্জ টাউনে বাড়ি করিয়া, পরিবারবর্গ সহ এখানেই বাস করিতেছেন। আজকাল ইনি নোয়াখালি জেলার সিভিল সার্জন। এইরূপ উচ্চপদস্থ লোক হইলে তাঁহার ন্যায় অমায়িক, ধর্মভীরু ও সাধুস্বভাবাপন্ন লোক অতি বিরল। তাঁহার ১ম ও ২য় পুত্রগণ যথাক্রমে বি-এ-বি-এল ও এম-এস-সি। তাঁহারাও তাঁহাদের পিতার অনুরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট।

প্রসিদ্ধ কবি—সিরাজগঞ্জের আর একটি গৌরবের বিষয় এই যে, প্রসিদ্ধ কবি পরলোকগত বাবু রজনীকান্ত সেন মহাশয়ও সিরাজগঞ্জবাসী লোক ছিলেন। সিরাজগঞ্জ টাউন হইতে ন্যূনাধিক ১০ মাইল ব্যবধানে ভাঙাবাড়ি নামক গ্রামে তাঁহার বাড়ি। আধুনিক বাঙালি কবিগণের মধ্যে তিনি কবি জগতের চন্দ্র বা সূর্য ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার "বাণী" নামক বহিখানি হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি কবিতা পাঠকবর্গের গোচরে আনা যাইতেছে।

১) **সখা**

আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে,
নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
চির-আদরের বিনিময়ে, সখা
চির-অবহেলা পেয়েছ ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দুহাত পসারি
ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ।
"ও পথে যেয়ো না ফিরে এস" বলে
কানে কানে কত ক'য়েছে ;
(আমি) তবু চ'লে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।
(এই) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসিমুখে তুমি ব'য়েছ ;
(আমার) নিজ-হাতে গড়া বিপদের মাঝে
বুকে করে নিয়ে র'য়েছে।

২) মিশ্র কানেড়া—একতালা

তোমারি

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দু'নয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হাহারব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ-চাওয়া,

তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে,
তোমারি সান্ত্বনা, শীতল সৌরভ।
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত,
জানিয়ে জানে না এ মোহ-হত চিত,
আমারি ব'লে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন
ভাঙ্গ এ অহমিকা, এ মিথ্যা গৌরব।

৩) *আলেয়া মিশ্র—তেওরা*

নিরুত্তর

ডাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে ;
দেখবো সে উপাধি নিলে, ক'টা "কেন'র জবাব শিখে।

ধরা কেন কেন্দ্র-পানে, ছোট বড় সবকে টানে,
বোঁটা-ছেঁড়া ফলটি কেন, দেয় না যেতে অন্যদিকে।
কোকিল কেন কুহু বলে, জোনাকিটে কেন জ্বলে,

রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির মিলে, কেন ফুটায়ে কুসুমটাকে?
চিনি কেন মিষ্টি লাগে, চাতক কেন বৃষ্টি মাগে,
চাকোর চায় চন্দ্রমাকে, কমল কেন চায় রবিকে?
বায়ু কেন শব্দে বহে, অনল-শিখা কেন দহে,
চুম্বক কেন লৌহ টানে, টানে না মনি মানিকে?
ইক্ষু কেন সুরস এত, নিম্‌টে কেন এমন তেতো,
ময়ূর কেন মেঘের ডাকে, মেলে মোহন পুচ্ছটাকে?
কান্ত বলে আছে জেনো, "কেন"র "কেন" সত্য "কেন",
যাও, নিখিল 'কেন'র মূলকারণে, সে রেখেছে কালের খাতায় লিখে।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কবি ও সাহিত্যসেবী হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে জন্মিয়া এই মহকুমার গৌরবর্ধন করিতেছেন, ও তাহাদের রচিত পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়া বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে। তাহাদের মধ্যে মুন্সি মহম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গদ্য ও পদ্য উভয়রূপ রচনাতে তাঁহার অধিকার রহিয়াছে। তাঁহার রচনার একটি বিশেষত্ব এই দেখা যায় যে, তাহাতে তাঁহার জাগ্রত প্রকৃতির ন্যায় একরূপ জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত হয়। আরও প্রশংসার বিষয় এই যে, কেবল লিখনী শক্তির জন্য তিনি যশোভাগী নন বরং বাগ্মীতাগুণেও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইহা কি আরও অধিক গৌরবের বিষয় নয় যে, মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্যচর্চার উদাসীনতার জগতে দুইটি মুসলমান মহিলা গ্রন্থকর্তার উদ্ভব এই সিরাজগঞ্জের মধ্যেই দেখা যাইতেছে? মোসম্মাৎ খায়রন্নিছা মরহুমার 'সতীর পতিভক্তি' ও মোসম্মাৎ রাহুতন্নেছা মরহুমার 'দেবী রাবেয়া' নামক পুস্তকদ্বয় ইহার পরিচায়ক।

প্রসিদ্ধ বক্তা—ইহাও সিরাজগঞ্জের গৌরব বলা যায় যে, এই মহকুমাবাসী ইস্‌লামপ্রচারক মুন্সি মহম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব ও উপরোক্ত মুন্সি মহম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজি সাহেব, প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া বঙ্গের সর্বত্র পরিচিত। সমাজসংস্কারোদ্দেশ্যে উভয়েই বহু পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন ও যত্ন নিতেছেন। উভয়ের বাড়ি সিরাজগঞ্জ টাউনের উপর।

নদী—এই মহকুমাতে দুইটি চলতি নদী আছে অর্থাৎ সারাবৎসর ধরিয়া তাহাতে নৌকা প্রভৃতি যাতায়াত করিতে পারে। প্রথমটি যমুনা নামে প্রসিদ্ধ। এই যমুনা (যবুনা) নদীটি এই মহকুমার পূর্বপ্রান্তে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত ও বিখ্যাত ব্রহ্মপুত্র নদের প্রধানতম শাখা। অপরটির নাম করতোয়া নদী। এইটি বহুদূর উত্তর দিক হইতে রঙপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলার মধ্য দিয়া, এই মহকুমার পশ্চিম প্রান্তস্থিত চাঁদাইকোণা নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে ও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামাদিতে অভিহিত হয়। যথা—ফুলজোড়, হুরাসাগর, ইছামতী প্রভৃতি।

যমুনা নদীর উৎপত্তি—যমুনা নদীটি এই মহকুমাতে প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধিশালী। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে 'ময়মনসিংহের বিবরণ' লেখক মহাশয় নিম্নলিখিত রূপ লিখিয়াছেন—

"অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যবুনা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।... ১৭৭৮ সনে রেনেল সাহেব তাঁহার মানচিত্র প্রকাশ করেন, ঐ মানচিত্রে যবুনার উল্লেখ নাই। ইহার ৩০ বৎসর পর, বুকানন-হেমিল্টন, ময়মনসিংহ জেলা জরিপ করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যবুনার বিষয় প্রথম অবগত হওয়া যায়। সুতরাং এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়কে যবুনার উৎপত্তিকাল অনুমান করা যাইতে পারে। "যমুনা" এতদ্দেশ্যে" "যবুনা" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ইহা 'জনায়ী' নামে পরিচিত থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র খালের ন্যায় প্রবাহিত হইত। ব্রহ্মপুত্র তখন বিশালাকায় মহাস্রোত। ইহার পর দাওকোবার নিকট ব্রহ্মপুত্রের মুখ পলি পড়িয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, ক্ষুদ্রতোয়া "জনায়ী" নদীতে ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয়। ....বর্ষাকালে যমুনা প্রস্থে ৪/৫ মাইলও হইয়া থাকে।"[১]

করতোয়া নদী—এই নদীটি চাঁদাইকোণা হইতে এই মহকুমাতে আরম্ভ করিয়া ধানগড়া, রায়গঞ্জ প্রভৃতি স্থানাদির মধ্য দিয়া নলকার উত্তর পর্যন্ত "করতোয়া" নামে, নলকার উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে নবীপুর পর্যন্ত "ফুলজোড়" নামে ও নবীপুর হইতে শাহজাদপুর, কইজুড়ি প্রভৃতির মধ্য দিয়া দক্ষিণপূর্বদিকে "হুরাসাগর" নামে অভিহিত হইয়া, সদর মহকুমাস্থ বেড়ানাকালিয়া হইয়া যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। নলকা হইতে এই নদীর একটি শাখা, পাঙাসি ও বাগবাড়ির নিকট দিয়া উত্তরাভিমুখে কাজিপুর তেকানীর নিকট যমুনার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, ইহা "ইছামতী নামে পরিচিত" (এই ইছামতী সদর মহকুমাস্থ ইছামতী হইতে পৃথক)।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি খাল আছে; ঐগুলি উক্ত নদীগুলির শাখাপ্রশাখা মাত্র। বর্ষাকাল ভিন্ন ঐ সমুদয় প্রায় শুষ্ক হইয়া যায় ও অনেকস্থানে জুতা পায়ে যাওয়া আসা চলে।

করতোয়া নদীটিও ব্রহ্মপুত্রের শাখা বই নয় এবং গঙ্গা যমুনার ন্যায় হিন্দুগণের নিকট পবিত্র। হান্টার সাহেব তাঁহার একাউন্টস-এ লিখিতেছেন "The Karatoa was once a river of First class size... a river of such size that it gained a reputation for holiness, as we learn from the Puranas scracely second to the Ganges."

অর্থাৎ করতোয়াটি এককালে প্রথম শ্রেণীর আকারবিশিষ্ট ছিল ও পুরাণ হইতে জানা যায় যে, পবিত্রতার জন্য ইহা প্রায় গঙ্গার ন্যায় প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

বন্দর ও কারবারের স্থান—সিরাজগঞ্জ মহকুমাতে নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রসিদ্ধ বন্দর ও নানা কারবারের স্থান।

যমুনা নদীর ধারে—১) সিরাজগঞ্জ টাউন; ২) সিরাজগঞ্জকুল বন্দর—এইগুলিতে বিস্তর পাটের ও ধান চাউলের এবং যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির কারবার হয় ও এই কারবার বারমাস স্থায়ী। ৩) দেলুয়া বেলকুচি; ৪) চৌহালি—পাটের কারবার প্রচুর। ধান চাউলও বহু খরিদ বিক্রি হয়।

করতোয়া নদীর ধারে—

৫) চাঁদাইকোণা—ইহা এই মহকুমার পশ্চিম প্রান্তে বগুড়া সংলগ্ন পাট, ধান, চাউল প্রভৃতি বহু আমদানি হয়। খিয়ার হইতে এস্থানে গাড়ি বোঝাই করিয়া বহু মনের পাট, নানারূপ ধান ও চাউল বিক্রয়ার্থে আসিয়া থাকে। (আঁঠাল ও শক্ত মাটি বিশিষ্ট ভূমিকে "খিয়ার" বলা হয়। বগুড়ার পশ্চিমপ্রান্ত ও রাজশাহী খিয়ার।)

৬) ধান গড়া ও ৭) ভুঁইয়াগাতিতে পাটের কারবার প্রচুর।

৮) নল্‌কা—এই স্থানটি সিরাজগঞ্জ টাউন হইতে নয় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার জমিদারি কাছারির বর্তমান নায়েব মুন্সি মহম্মদ ইব্রাহিম হোসেন সাহেব, এই বন্দর সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ জানাইয়াছেন—"এখানে খিয়ার ও অন্যান্য বহুদূর হইতে ধান, চাউল, পাট আমদানি হয়। বড় বড় বহু মহাজন আছেন। এখানে হইতে ধান, চাউল সিরাজগঞ্জে রপ্তানি হয়। মৌসুমের সময় সিরাজগঞ্জের বড় বড় মহাজনদের পাটের খরিদ্দারগণ এখানে আসিয়া পাট খরিদ করেন। ইহা ছাড়া কলিকাতা হইতে পাট খরিদের জন্য লোক আসে। প্রায় দুই লক্ষ আড়াই হাজার মণ চাউল, পঁচিশ হাজার মণ ধান এখানে খরিদ বিক্রি হয়। সরিষা, তিসি, বুট, মুগ, মসুর প্রভৃতি বহু আমদানি হয় ; সরিষা ও তিসি খরিদের জন্য কলিকাতার বড় বড় মার্চেন্টদের খরিদ আসে।"

৯) উল্লাপাড়া—সিরাজগঞ্জ টাউন হইতে প্রায় ১৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ফুলজোড় নদীর ধারে অবস্থিত। বহু বড় বড় মহাজন এখানে আছেন ও বিস্তর পাটের কারবার হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া এখানে বেঞ্চ আফিস, থানা, উচ্চ ইংরেজি স্কুল, সবরেজিস্টারি আফিস, ম্যারেজ রেজিস্টারি আফিস, পোস্টাফিস, ডাকবাঙ্‌লা প্রভৃতি বর্তমান। প্রস্তাবিত সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেললাইন নির্মাণ উপলক্ষ্যে এখানকার আরও বহুল উন্নতি হইতেছে।

১০) শাহজাদপুর—সিরাজগঞ্জ টাউন হইতে বার ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে হুরা সাগরের ধারে অবস্থিত। এই সবডিভিসনের মধ্যে এই স্থানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাবনা জেলাতে আর একটি মহকুমা হওয়ার প্রস্তাব চলিতেছে ; ঐ মহকুমা সম্ভবত এখানেই হইবে। কারবারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ না হইলেও এখানে বহু পাটের খরিদ-বিক্রি হয়। রুরাল ম্যাজিস্ট্রেটের আফিস হইতে নিম্নতম সমুদায় আফিস এখানে বর্তমান। উচ্চ-ইংরেজি স্কুল, মধ্য ইংরেজি স্কুল, জুনিয়ার মাদ্রাসা, গুরু ট্রেনিং স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল ও কয়েকটি প্রাইমারি বিদ্যালয় এই স্থানে বিরাজিত। ডাকবাঙ্‌লা নাই, কলকাতার ঠাকুর জমিদারদের দ্বিতল পাকাদালানে গভর্নমেন্ট আফিসারদিগকে থাকিতে দেওয়া হয় ও তাহাতে বিনা খরচে ডাকবাঙ্‌লার কথঞ্চিৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এখানে দু বেলার একটি বাজারও আছে। পূর্বোল্লিখিত প্রসিদ্ধ শাহ মক্‌দুম সাহেবের প্রশংসিত "মজার" বা সমাধিমন্দির এখানেই বিরাজমান।

প্রসিদ্ধ হাট—নিম্নলিখিত হাটগুলি এখানে প্রসিদ্ধ। পাঙাসি, পোড়াবাড়ি, বলরামপুর. কান্দাপাড়া. কাজিপুর ও সোনামুখী প্রভৃতি হাটগুলিতে পাটের আমদানি ও খরিদ বিক্রি হয়। তালগাছির হাট গরুর আমদানির জন্য বিখ্যাত। এই হাটে এত অধিক সংখ্যক গরুবাছুর আসিয়া থাকে যে, কোন কোন সময় তাহার সংখ্যা দুই হাজার আড়াই হাজারও হইয়া থাকে। কালিহাকান্দাপাড়া, চৌহালি, বয়রা ও কমরখন্দের হাটগুলিতেও বিস্তর গরু আমদানি হয়. দেলুয়া ও কইজুরির হাটে দেশিয় তাঁতি কারিকরদের তৈয়ারি বহু কাপড় আমদানি হয়। চৌবিলার হাট নৌকার আমদানির জন্য প্রসিদ্ধ—হাটের দিন এখানকার হাজার হাজার নৌকার দৃশ্য অতি মনোরম। সলঙ্গার হাট এই সবডিভিসনে বিশেষতর বিখ্যাত। ইহাতে মহিষ, গরু. ভেড়া, ছাগল, বিক্রয়ার্থ আসে ; পাট, ধান কলাই, বুট প্রভৃতি সর্ববিধ দ্রব্য আমদানি হয়। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত এই হাটে খরিদ বিক্রি

হয়। নিমগাছির হাটটি অতি পুরাতন এবং তজ্জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। খিয়ারের লোকেরা পাট, ধান, চাউল প্রভৃতি আমদানি করে। দেওভোগের হাটে বহু ধান আসিয়া থাকে। এই সবের প্রত্যেকটিতে ও ইহা ছাড়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাটগুলিতে পাটের খরিদ বিক্রি, মাছ, তরকারির ন্যায় সাধারণ একটি নিয়ম।

প্রসিদ্ধ মেলা—সলঙ্গা, নল্‌কা, উল্লাপাড়া, কাজিপুর, সোনামুখী, শাহজাদপুর, চৌহালি ও তাড়াস প্রভৃতি স্থানাদিতে হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে প্রত্যেক বৎসর মেলা লাগিয়া থাকে। এই সমস্ত মেলা ন্যূনাধিক একমাস কাল স্থায়ী হয়। বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন জেলা হইতে বহু দোকান ও নানা দ্রব্যের আমদানি হইয়া বেচাকেনা হইয়া থাকে। নানারূপ খেলার ও বিশ্রী আমোদপ্রমোদের প্রলোভনাদির আড্ডা বসিয়া দেশের টাকা পয়সা লুঠ করে। এই মেলাগুলির অধিকাংশই কালীপূজা উপলক্ষে, তাড়াসের মেলা ঝুলন উপলক্ষে ও শাহজাদপুরের মেলা রামনবমী উপলক্ষে বসিয়া থাকে। অষ্টমী-স্নানোপলক্ষে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে মেলা লাগে। ১) ভুঁইয়াগাতি, ২) কলিহাকান্দাপাড়া, ৩) নল্‌কা, ৪) শাহজাদপুর, ৫) সুবর্ণসরা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মেলাগুলি কিন্তু একদিন মাত্র স্থায়ী হয় ও হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতীয় লোকের বহু সমাগম হয়। কোন কোন মেলাতে ১৫/২০ হাজার পর্যন্ত লোক জমা হইয়া থাকে। শাহজাদপুরের মেলাতে ঘোড়ার আমদানি ও সোনমুখীর মেলাতে কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্যাদির আমদানি প্রচুর। দুর্গাপূজার সময় ভাসান-যাত্রার দিন সিরাজগঞ্জ টাউনের উপরও একটি মেলা বসে। কিন্তু লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে এই টাউনের উপর যে মেলাটি লাগে, তাহা বিশেষতর প্রসিদ্ধ। সিরাজগঞ্জের বিখ্যাত হরিমোহন দত্ত ও চন্দ্রমোহন সাহা মহাশয়দের লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে এই টাউনের উপর লক্ষ্মীপূজার দিন হইতে তিনদিন যাবৎ একটি মেলা লাগিয়া থাকে। ইহাতে এত লোকের সমাগম হয় যে, এই তিনদিন যাবৎ বড় বাজারের রাস্তা দিয়া চলাচলের পথ থাকে না। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রঙপুর প্রভৃতি জেলা হইতে দর্শকবৃন্দ আসিয়া থাকে। সার্কাস, বায়স্কোপ, যাত্রা প্রভৃতি নানারূপ খেলা কলিকাতা ও অন্যান্য বিখ্যাত টাউন হইতে আসিয়া মেলায় আগত জনবৃন্দের চক্ষু স্নিগ্ধ করে।

এই মেলাগুলির উপস্থিতিতে অর্থাদির শ্রাদ্ধ হইয়া একদিকে দেশের অপকার করে বটে, কিন্তু অপরদিকে দেখিতে গেলে, স্বদেশি বিদেশি দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানির সুবিধা হয়, নানা দেশিয় লোকের পরস্পরের সাক্ষাৎলাভ হয় ও সওদাগর মহাজনগণের ব্যবসায়ে প্রচুর সাহায্য করে।

উৎপন্ন দ্রব্য—সিরাজগঞ্জ মহকুমাটি পাটের উৎপন্ন ও কারবারের জন্য বঙ্গদেশের মধ্যে বিখ্যাত। কৃষিজাত ভূমিগুলির অধিকাংশেই পাটের চাষ হয়। এখানে পাটের অন্য নাম কোষ্ঠা। এই কোষ্ঠার কারবারে নিম্নপদস্থ কৃষক শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমোচ্চপদস্থ মহাজন জোতদার, তালুকদার পর্যন্ত লিপ্ত থাকে এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকের অর্থোপায়ের সুবিধা করে। বলা বাহুল্য যে, কৃষকগণের টাকাতেই দোকানদার, সওদাগর, মহাজন, উকিল, মোক্তার, আমলা, পেয়াদা, তালুকদার জমিদার যাবতীয় শ্রেণীর লোকের বাহাদুরি। সিরাজগঞ্জের বিষয় লিখিতে গেলে কোষ্ঠা সম্পর্কে কিছু লেখা অসঙ্গত নয়।

মহাভারতের সময় বা তাহার পূর্ব হইতে ভারতবর্ষে পাট উৎপন্ন হইয়াছে। সপ্তদশ এবং অষ্টদশ শতাব্দীতে বহু পরিমাণ পট্টতন্তু, দেশের কাজকারবারের জন্য ও বিদেশে মালামাল রপ্তানির ছালা, চট ও রজ্জু প্রস্তুতের জন্য উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তখন পর্যন্ত পাটের তত রপ্তানি হইত না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কারবারের পরীক্ষার জন্য কতকগুলি জাহাজ পাটের তন্তু লইয়া বিদেশে রপ্তানি হয়, এইগুলি নীত-দেশসমূহে বিশেষ আগ্রহের সহিত গৃহীত হইয়াছিল ও তাহাতে বিদেশিয় লাভবান বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু

তখন গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে এই বাণিজ্যে কোনরূপ বিশেষ সহানুভূতি দৃষ্ট হয় না ও ঐ সময় হইতে প্রায় ৩০ বৎসর পর্যন্ত পাটের এই বিদেশিয় বাণিজ্যের কোণরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। ১৮২৮-২৯ সনে ন্যূনাধিক ৭০ মন পাট রপ্তানি হইয়াছিল মাত্র। এই বৎসর হইতে পাটের বাণিজ্য ক্রমে উন্নতি লাভ করে।

ইহার পর পাঁচ বৎসরে গড়ে ন্যূনাধিক ৫০৬৮ মন ও পর পাঁচ বৎসরে কমবেশি ১৩৪৯৬ মন পাট রপ্তানি হইয়াছিল। এইরূপে উন্নতি হইয়া ১৮৪৩-৪৪ সন হইতে ১৮৪৭-৪৮ সন পর্যন্ত রপ্তানি পাটের পরিমাণ প্রায় ৪৬৮১১ মন পর্যন্ত দাঁড়ায়। এইরূপে ইংলন্ডের লোকে এই পণ্যের আদর ক্রমশ বাড়াইতে লাগিল ও দেশিয় লোকে তাহাদের আবশ্যক পরিমাণে যোগাইতে লাগিল। কিন্তু রুশদেশে উত্তম শন উৎপন্ন হওয়ায় ও যুক্তিসঙ্গত মূল্যে তাহা বিক্রিত হওয়ায়, ইংলন্ডের লোকের পক্ষে তাহা বিশেষত সুবিধাজনক ছিল ; সুতরাং সুদূর ভারতবর্ষ জাত পাটের জন্য তত অধিক লালায়িত ছিল না। কিন্তু ১৮৫৪-৫৫ সনের রুশযুদ্ধ এই কাবরারের পক্ষে অতীব ফলপ্রসূত প্রমাণিত হয়। রুশ-জাত শনের আমদানি বন্ধ হয় ; ইংলন্ডের কলওয়ালারা আবশ্যকীয় তন্তুর অভাবে পড়ে ; সুতরাং শনের পরিবর্তে পাটের আবশ্যকতা অনুভব করে। পাট, শনের ন্যায় উত্তম জিনিস, সস্তাদরে প্রাপ্তব্য এবং ইংরেজরাজে দেশ যত অধিক পরিমাণের আবশ্যক, উৎপন্ন হইতে পারে ; এই সুবিধা পাইয়া ইংলন্ডের কলওয়ালাগণ পাটের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং বঙ্গদেশীয় কৃষকবর্গের কৃষিজাত পাটের আদর বিশেষ পরিমাণে বাড়িয়া যায়। ফল কথা, এই সময় হইতে ১৮৬৭-৬৮ সন পর্যন্ত পাটের রপ্তানির পরিমাণ প্রায় আট গুণ বাড়িয়া যায় এবং পরে ১৮৭২-৭৩ সনে ১৪৫১১৩৮ মন পাট রপ্তানি হয়। ১৮৭১-৭২ সনের পাটের উচ্চমূল্যতা ও অত্যাগ্রহ কৃষকবর্গকে প্রলোভনে পতিত করে ও পর বৎসর শতকরা ৩০ একর বৃদ্ধি জমিতে পাটের চাষ হয়। কিন্তু ক্রেতাগণ তত অধিক পাট হজম করিতে পারিল না ; পাটের বাজার ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং কৃষকবর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হঠাৎ পাটের চাষের জমির পরিমাণ ১৮৭২ সনের ব্যবহৃত ৯২৫৮৯৯ একর হইতে ১৮৭৩ সনে ৫১৭১০৭ একর জমি মাত্র হয়। মোটের উপর পাটের চাষ এই ভাবে উন্নত হইয়া সিরাজগঞ্জ মহকুমাটি এই কারবারের জন্য সারা বাংলার মধ্যে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে।

পাটের চাষ—পৃথিবীর মধ্যে যে সমস্ত দেশ উষ্ণ প্রধান এবং যে দেশে সময়োচিত প্রচুর বারিপাত হয়, সে সমস্ত দেশেই পাটের চাষ সম্ভব। এজন্য অন্যান্য দেশে কিয়ৎ পরিমাণে জন্মিলেও বঙ্গদেশ পাট চাষের যেরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্র, সেরূপ পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। দোয়াস বা আঁটাল জমিতে পাট চাষ হইতে পারে ; কিন্তু বালুকাময় এবং কঙ্করময় জমিতে ইহার চাষ সম্ভব নয়। পাটের পক্ষে প্রচুর বারিপাত আবশ্যক হইলেও, প্রথমাবস্থায় অত্যাধিক বৃষ্টি যথেষ্ট হানিকর। পাট বুনিবার পূর্বে মৃত্তিকার নিম্নস্তর পর্যন্ত ধূলিবৎ করা আবশ্যক। পাটের বীজ, সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও পুষ্ট বৃক্ষ হইতে সংগ্রহ করা কর্তব্য। বীজের উপর ভবিষ্যৎ গাছের দৈর্ঘ্য অনেকটা নির্ভর করে। পূর্ববঙ্গে চৈত্রমাসে সাধারণত পাট বোনা হয়। কর্ষিত হইলে, বীজগুলি ছাই বা মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বিঘা প্রতি দুই সের হইতে ৪ সের পর্যন্ত বীজ লাগিতে পারে। বীজ ছড়াইয়া দিবার পর, একবার উত্তর-দক্ষিণ ও একবার পূর্ব-পশ্চিমে চাষ দিতে হয় ও মই দিয়া জমি সমান করিতে হয়। এ প্রণালীতে চারাগুলি সমানভাবে জন্মায় ও পরে নিড়াইবার বিশেষ সুবিধা হয়। বীজ বুনিবার ৫/৬ দিন মধ্যেই গাছ বাহির হয়। ১৫ দিনের মধ্যে একটু শক্ত হইলে একবার নিড়ান আবশ্যক। ইহার সহিত মৃত্তিকাও আলগা করিয়া দিতে হয়। স্থলবিশেষে দুই হইতে চারিবার নিড়ান আবশ্যক। গাছ ঘন হইলে, পাতলা করিয়া দিতে হয়। সাধারণত দুইটি গাছের ব্যবধান

অর্ধহাত হওয়া কর্তব্য ইহা বলিয়া আবার বেশি পাতলা করিলে গাছ ভাল বাহির হয় না ও পাট ভাল হয় না। সাধারণত চারি মাসের পর পাট কাটিবার উপযুক্ত সময়। পাট গাছ ফল ধরিতে আরম্ভ করিলেই, পাট গাছ কাটা কর্তব্য। অগ্রে কাটিলে পাটের আঁশ চিকন হয় ও ওজন কমিয়া যায়। ফল পাকিবার পরে কাটিলে, পাটের রং খারাপ হয়। পাটগাছগুলি মাটি হইতে ২/১ ইঞ্চি ছাড়িয়া কাস্তে দ্বারা কাটা হয়। সাধারণত পাটগাছ ৭/৮ ফুট উচ্চ হয়। অনেকস্থলে ৪/৫ ফুট জলে ডুবিয়া থাকে। দৈনিক ১ টাকা পর্যন্ত মজুরি লইয়া, চাষীরা জলে ডুবা পাট কাটে। পাট কাটা হইলে, তাড়া বাঁধিয়া ক্ষেত্রে রাখিয়া দেওয়া হয় এ সময় উহার শুষ্ক পত্র ঝরিয়া পড়ে। তাহার পর মাথা কাটিয়া পুনরায় তাড়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিলে, সমস্ত পত্র ঝরিয়া পড়ে ও জলে নিমজ্জিত করিবার উপযোগী হয়। পরিষ্কার জলে নিমজ্জিত হইলে আঁশ উজ্জ্বল হয়। নিমজ্জনের পক্ষে স্রোত জল অপেক্ষা বদ্ধ বা ঈষৎ চলন্ত জল ভাল। ইহাতে পাটের আঁশ ভাল হয়। পাট পচিতে ১০/১২ দিন হইতে এক মাস সময় লাগে, বেশি পচিলে পাটের রং খারাপ হইয়া যায়; এইজন্য ১০/১২ দিন পরে প্রত্যহ এক এক আটি পাট খুলিয়া দেখিতে হয়। যদি পাট সহজে ছাড়িয়া যায়, তবেই বুঝিবে পাট পচিয়াছে ও কাচিবার উপযুক্ত হইয়াছে। উপযুক্তরূপে পচা হইলে, বংশদণ্ড সাহায্যে গোড়ার দিকটা ভাঙিয়া লইয়া হস্তের দ্বারা পাট খুলিয়া লইতে হয় ও উত্তমরূপে ধৌত করিয়া নিংড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। ভিজা পাট একদিন গাদা করিয়া রাখিলে ও পরদিন রৌদ্রে শুকাইতে দিলে রং আরো উজ্জ্বল হয়।

বঙ্গদেশে সাধারণত দুই প্রকার পাটের চাষ হয়। এই দুই রকম পাটই সর্বোৎকৃষ্ট। মিঠা পাট এবং তিক্ত পাট। মিঠা পাট সাধারণ পশ্চিমবঙ্গে ও তিক্তপাট পূর্ববঙ্গে জন্মায়। তিক্তপাটের গোড়ায় ২/৩ হাত জল দাঁড়াইলেও নষ্ট হয় না। মিঠাপাটের ফল লম্বা ও বীজ হরিৎবর্ণ, তিক্তপাটের ফল গোলাকার ও বীজ মেটে রংয়ের। মিঠার মূল পাতলা ও লম্বা, তিক্ত পাটের মূল মোটা ও ক্ষুদ্র।

ব্যবসায়ীদের নিকট উভয় পাটের নিম্নলিখিত বিভাগ দৃষ্ট হয়ঃ

১) উত্তরীয়, ইহা রঙপুর ও জলপাইগুড়ির "হিউতি" ও "ভাদোই"।

২) সিরাজগঞ্জী (ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমাংশের পাট)—ইহা (ক) "কাকিয়া বোম্বাই" (খ) "দেশি" (গ) "তোমা"।

৩) নারায়ণগঞ্জী—ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশের পাট—ইহা "বোরান" বা "বড়পাট"।

৪) ফরিদপুরী—"সৎপাট"।

৫) দেশি—কলিকাতার নিকটবর্তী প্রদেশের ও হুগলির "দেশি পাট"।

৬) মেস্তা—দাক্ষিণাত্য প্রদেশে উৎপন্ন পাট।

পাট চাষে লাভালাভ—জমি অনুসারে পাটের চাষের খরচ কমবেশি হয়। বিঘা প্রতি সাধারণত ১০/১২ টাকা খরচ পড়ে। ইহাতে অন্যূন ৫ টাকা মন পাট উৎপন্ন হয়। সুতরাং ৭ টাকা হিসাবে মন হইলেও পাটের বিঘা প্রতি ২৫ টাকা লাভ থাকে। প্রায় পাটের মন ১০ টাকার অধিক হয়। সুতরাং উৎকৃষ্ট পাট জন্মিলে, বেশি লাভ থাকা সম্ভব।

সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মাদারীপুর, চাঁদপুর, ডেমরা ও চিৎপুর প্রভৃতি স্থান পাটের প্রধান বাজার।

সিরাজগঞ্জে যে পাট উৎপন্ন হয়, ইহা ছাড়া পার্শ্ববর্তী ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলাসমূহের অধিকাংশ পাটের খরিদ বিক্রিও সিরাজগঞ্জে হইয়া থাকে। ইহার কারণ আমার বিবেচনা মতে এই, পূর্বে সিরাজগঞ্জে টাউনের উপর কলকুঠি নামে যে বিখ্যাত ও অতি সমৃদ্ধিপন্ন চটের কল ছিল, তাহাতে বহু পাটের আবশ্যক হইত এবং সেইজন্য এইসব জেলার পাটও এখানে

আসিত। কলকুঠি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরও পূর্বপ্রথা বর্তমান থাকিয়া এখানকার পাটের কারবার অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দেশিয় বিদেশিয় বহু পাটের কোম্পানির ও মহাজনগণের আফিসাদি এখানে বর্তমান (পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে)। এই পাটের কারবারে সাধারণের অবস্থার এত অধিক উন্নত হইয়াছে যে, অস্বচ্ছলাবস্থাপন্ন লোক এখানে কম পাওয়া যায়। প্রায় গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় বহু টিনের ঘর-দরজা একমাত্র এই পাটের অনুগ্রহেই দেখা যায়। (বহির শেষে পাটের গান দ্রষ্টব্য)।

বিক্রয় প্রথা—এখানে পাটের বিক্রয়ের প্রথা নিম্নলিখিত রূপে প্রচলিত ঃ—কৃষকগণ তাহাদের নিজ নিজ পাট নিকটবর্তী হাটে বিক্রয়ার্থে আনে ; বেপারিরা নগদ টাকা দিয়া ঐ সমস্ত পাট কিনিয়া নৌকাতে করিয়া তাহাদের ইচ্ছামত যে কোন বন্দরে মহাজনের নিকট আনিয়া থাকে ও তাহাদের কাছে বিক্রয় করে, আবার মহাজনগণ সিরাজগঞ্জ বন্দরে ইউরোপীয় বণিকগণের নিকট বা কলিকাতাতে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে। সাধারণত বেপারিরা মহাজনগণের নিকট যাহা বিক্রয় করে, তাহাতে মধ্যস্থ একব্যক্তি থাকে, তাহার নাম "দালাল"। কেনাবেচা নৌকার উপরই প্রায় হইয়া থাকে। পাটের মালিক বেপারি বেচারা নৌকার এক পার্শ্বে বসিয়া থাকে, এদিকে দালালের মধ্যে মহাজনের মধ্যে কথাবার্তা চলে। মহাজন, দালাল হইতে কত পাট ও কোনখানকার পাট ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে ; দালাল পাটের নমুনা দেখায় ও উভয়ে কাপড়ের নিম্নে হাত রাখিয়া হস্তাঙ্গুলির ইঙ্গিতে দরদাম ঠিক করে, এদিকে মুখে নানারূপ কথাবার্তা হয়, এ বলে তাহা হইবে না, ও বলে খুব হইবে ইত্যাদি ; আসল দর কিন্তু কাহারও মুখে প্রকাশ নাই। এইরূপে উভয়ের কথাবার্তা হইয়া দর ঠিক হইয়া গেলে, দালাল চলিয়া যায়। বেপারি "দর ঠিক হইয়াছে" এইমাত্র শুনে, কত হারে ও কি মূল্যে সে কিছুই জানে না। পরে মহাজনকে বিক্রিত পাটের নমুনাস্বরূপ একমুঠা পাট দিয়া দিলে মহাজনও চলিয়া যায়। পরিশেষে বেপারি তাহার আনীত পাটগুলি মহাজনের দোকানে লইয়া আসে। সেখানেও এই হতভাগ্য বেপারি অনেক সময় প্রতারিত হয় ; কেন না, অনেক মহাজন অনেক সময় বলিয়া থাকে "এই পাট নমুনার মত উত্তম পাট নয় বা সঠিক দর নির্দিষ্ট হয় নাই" ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ বলিয়া, তাহাকে মহাজনের ইচ্ছামত মূল্যের এক হিসাব দেয়। দালাল কিন্তু কখনও দর কি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবে না ; যদি কেহ এরূপ প্রকাশ করে, তজ্জন্য তাহাকে শাস্তিভোগ করিতে হয়। দালাল, বেপারির নিকট হইতে নগদ টাকা পায় না, পাট দেওয়ার সময় হিসাব পায় ও ১৪ দিন বা ২০ দিন পর টাকা পাইয়া থাকে। পাটের বিক্রি কারবারে যাচনদার, বেপারি, দালাল, মহাজন ও আড়তদার প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যকারকগণ হইয়া থাকে। মহাজনগণ সাধারণত বন্দর সমূহে স্থায়ীভাবে আড্ডাতে থাকে ও ইহাদের অধিকাংশ মারওয়াড়ি। মারওয়াড়িগণকে এখানে কাঁইয়া বলে।

এই প্রথা ছাড়া নগদ কেনাবেচা বা অগ্রিম টাকা দেওয়ার নিয়মও প্রচলিত আছে।

কাগজ প্রস্তুত প্রণালী— মেস্তাপাটের কাগজ প্রস্তুত হয়। কালিহাকান্দাপাড়া নামক গ্রামে এখনও কাগজ প্রস্তুত হইয়া মহাজনদের খাতাতে লাগে (পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে)। নিম্নলিখিত প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে, যথা—পাটকে পাথুরিয়া চূণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৮/১০ দিন জলে ভিজাইয়া রাখে, যখন কিছু পরিমাণে নরম হইয়া আসে, তখন উহাকে ঢেঁকির সাহায্যে গুঁড়া করিয়া, পরিষ্কার জলে ভালরূপে ধৌত করে, যাহাতে চূণগুলি দূরীভূত হয়। তৎপরে জলে পূর্ণ একটি বড় জালাতে ঐ সমুদয় গুঁড়া পুরিয়া একগজ লম্বা ও একইঞ্চি পরিমাণ প্রস্থ কাঠার দ্বারা যথেষ্টরূপে ঘুঁটিতে হয়। যখন কাদার ন্যায় হইয়া আসে তখন যে সাইজের কাগজ প্রস্তুত করিবে, ঐ আকারের একখানা বাঁশের সরু চালনী জালাতে ডুবাইয়া

কিছু পরিমাণ কর্দমাক্ত জিনিস উঠাইতে হয় ও তাহাতে এরূপভাবে ঘুরাইতে হয়, যাহাতে চালনীতে কাদাগুলি সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে। তখন ইহাকে চালনী হইতে কাগজের তা এর আকারে সাজাইয়া কয়েক মিনিটকাল একখানা তক্তার উপর রাখিয়া দিবে, যেন জলগুলি শুকাইয়া যায়। পরে তাহাকে ছায়ামুক্ত মাটির দেওয়ালে লাগাইয়া দিবে ও পরিশেষে রোদে ভালরূপে শুকাইবে। হঠাৎ রোদে শুকাইতে দিলে ইহার ক্ষতি হয়। সর্বশেষে আতপচাউলের কিছু পরিমাণ গুঁড়া ইহার উপর ছড়াইয়া দিয়া, কোমল বুরুসের দ্বারা মার্জিত করিয়া, পুনরায় শুকাইতে হয়। ব্যবহারের পূর্বে মসৃণ পাথর দিয়া ঘসিয়া লইতে হয়।

ধান—পূর্বে বলিয়াছি, এই মহকুমাতে ধানের আবাদ তত প্রচুর হয় না। পাটের চাষে এখানকার কৃষকগণের যে লাভ দাঁড়াইয়াছে ও পূর্বে লিখিত হইয়াছে, উহার উপর নির্ভর করিয়া, অধিকাংশ লোক ধান জন্মানর চেষ্টা করে না। তাহারা বলে, উচ্চ দরে পাট বিক্রিত হইলে, ঐ টাকা দিয়া ধান-চাউল কিনিয়াও অনেক টাকা হাতে থাকে ; ধান বুনিলে খাওয়া চলিবে বটে, কিন্তু এই লাভ পাওয়া যাইবে না। এই কারণে অধিকাংশ লোকে (কৃষকগণের মধ্যে পর্যন্ত) ধান-চাউল কিনিয়া দিনপাত করে। এখানে যে ধান কথঞ্চিৎ পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহা আউস ও আমন এই দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত। আউস ও আমন উভয় ধানের বীজ বৈশাখ মাসে ছিটিয়া ভাদ্র মাসে আউস ও অগ্রহায়ণ মাসে আমন কাটে। রোপা ধান্য এ অঞ্চলে হয় না, পশ্চিমপ্রান্ত সীমায় বগুড়া সংলগ্নস্থানে অল্প পরিমাণ জমিতে মাত্র রোপা ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। আউসের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবিধ নামের ধান্য এ অঞ্চলে জন্মে--

আউসের মধ্যে যথা—রোয়াইল, পক্ষিরাজ, মুক্তার, মরিচপাল, চাপানই. গেমী, বেউরকানি, কালগাইরা, কালামাণিক, মাইটা, ঠাকুরভোগ, বেগুণবীচি. গডপা, খরাইল, জামিয় ছোপ. গায়রা, ও নাড়াইলা ঝোপা।

আমনের মধ্যে যথা—ধলাঢেপা, পাহাড়িয়া ঢেপা. ইদাঢেপা, লালঢেপা, পুঁইটাঢেপা, পাঁড়ুলীঢেপা, আশ্বিনীঢেপা, ঝিঞ্জাসাইল, বাঁশীরাজ, শোভারাজ, কাঁকিয়া, শোনাজুল, কোড়লকাঁদি, লক্ষ্মীকাজল, জলকাতরা, দিঘা, পুঁইয়ামাগুরী, আড়ালিয়া. কেঁছড়, ঘোঁড়াবাই, জগডালা. পাখরা, কইতরমণি, বাঘরাজ, আইড়াবাতো, মানকস্তুরী, রাজমণ্ডল ও হাঁস্কোল।

বাঁশীরাজ ও জলকাতরা এখানকার চিকন ধান্য। শেষোক্ত হাঁস্কোল ধান্যের গাছ প্রায় ১০/১২ হাত উচ্চ হয়। বন্যার জল যতই অধিক হোক না কেন, ইহাকে ডুবাইতে পারে না। এই ধান্য সম্বন্ধে কৃষকদের মুখে শুনিয়াছি।

ধানের উক্তি—

বলে বান ভাই হাঁস্কোল,
শুনে যা মোর এক বোল,

হাঁস্কোলের উক্তি—

যতক্ষণে শুনব তোর বোল,
মেলব আমি আমার একটা পোল।

কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাট ও ধান ছাড়া বুট, অড়হর, মটর. কলাই, সরিযা, তিসি, কাউন. চিনা. শন ও শকরকন্দ আলু বিস্তর জন্মে। তরমুজ ও ক্ষিরা তত বেশি জন্মায় না।

মৎস্য--নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের মাছ এই মহকুমার বিলে, খালে ও নদীতে পাওয়া যায়। যথা---মছি, দাড়কা, কড়াপুটি, খসিয়া, ছাতিয়ান, শোল, নন্দই, কাঁকিলা, ইচা. বাইলা, টেঙরা. বাইজা, বালুচাটা, নওলা, মির্কা, কই, মাগুর, জিওল, চেং, ফলি, চিতোল. খরসল্লা, পাপ্‌তা, চাঁপিলা, ভোল, বাচা, ঘারুয়া, রায়েক. ভাংনা, বাট্‌কা, গুজা, ঘাঁঘর, কাঁইয়া, রিঠা,

বাম্‌, গোচই, দাড়াই, কাঁইয়াকাটা, কালবোস, গোলশা, গোরকুঁইয়া, ফেসা, বাঁশপাতারী, চেলা, সুখনখালি, বোয়াল, আইর, ভেটকি, শেলং, কাতল, রুই, গজার, পাঙাস, ইলিশ, ঢাইং ও বাঘাইর। বাঘাইর মাছ এক একটি এত বড় হয় যে, তাহার কোনটি বহন করিতে চারিজন লোক আবশ্যক করে। এই মাছ অন্যান্য স্থানাদিতে দেখা যায় না ; সামুদ্রিক মৎস্যাদির মধ্যেও ইহা দেখি নাই।

চতুস্পদ জন্তু—ঘোড়া, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল। খরগোসও কোন কোন সময় দৃষ্ট হয়।

হিংস্র জন্তু—শূকর, শেয়াল, খাটাশ, বনবিড়াল এইগুলিই সচরাচর দেখা যায়।

সময় সময় ক্বচিৎ বাঘও দেখা যায়। এখানে পাহাড় জঙ্গল না থাকাতে হিংস্র জন্তু তত নাই। নিমগাছির জঙ্গলে পূর্বে বাঘ ও হরিণ দেখা যাইত, আজকাল তথায়ও অনেক আবাদ হইয়া গিয়াছে। সর্প এখানে কম নাই, প্রতিবৎসর সর্পাঘাতে বহুলোকের মৃত্যু হয়। বর্ষার সময় যখন সর্বস্থান বন্যার জলে পরিপূর্ণ হয়, তখন বিষাক্ত সাপগুলি লোকের বসতভিটির আশ্রয় লয় ও তখন বিশেষ ভয় হয়। গোক্ষুর বা জাতি সাপের সংখ্যা অধিক।

পক্ষীজাতি—হাঁস, মোরগ, কবুতর, ঘুঘু, হরিয়েল, চাহা, শালিক, বক, কাক, চিল, শকুন, দোয়েল, কোকিল, হলদে পাখি, টিয়া, চখা, পেচক, বুলবুল, চড়ুই, বাবুই ইত্যাদি পক্ষীজাতির মধ্যে দেখা যায়।

উদ্ভিদ ও ফলবৃক্ষ—বট, পাকুর, আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, কুল, লেবু, কলা, কামরাঙা, আতা, বাঁশ, বেল, পেঁপে ও আনারস ইত্যাদি জন্মে। কিন্তু সুপারি, নারিকেল, খর্জুর, তাল প্রভৃতি বৃক্ষ এখানে অতি বিরল।

তরকারির মধ্যে লাউ, কুমড়া, বেগুন, মূলা উচ্ছে, ঝিঞে, শশা, কচু প্রভৃতি বিস্তর জন্মে ও দেখা যায় ; কিন্তু পটোল, বিলাতি আলু, কপি, কাকরোল, ছিম এই সব জিনিস এখানকার লোকে তত জন্মায় না। আমার বিশ্বাস এখানকার ভূমি উক্ত তরকারিগুলির পক্ষে অনুপযুক্ত নয়। কিন্তু কৃষকগণের এ বিষয়ে তত যত্ন নাই। গভর্নমেন্টের কৃষিবিভাগ হইতে এখানে একটি আদর্শ বাগান (Model Farm) হইলে, বোধ হয় বড়ই উপকার হইত। এখানকার কৃষকগণ যাহা উৎপাদন করে. পরমদয়ালু আল্লা-প্রদত্ত জমির উর্বরতা হইতেই মাত্র ; উপযুক্ত সার দেওয়া বা কৃষি বিজ্ঞানানুযায়ী ভূমির উর্বরতা অর্জন করা প্রভৃতি কার্যে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

ওজন ও মাপ—এখানে দ্রব্যাদির ওজনে দুই রকম নিয়ম প্রচলিত ; পাকা ও কাঁচা। পাট, ধান, চাউল ও দুগ্ধ এইগুলি পাকা ওজনে ও বাকি সমস্ত জিনিসাদি কাঁচা ওজনে বিক্রিত হয়। আবার পাকা ওজনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জিনিসের পৃথক পৃথক ওজন প্রচলিত। সাধারণত পাকা ওজন আশি তোলায় সের ও কাঁচা ওজন ষাট তোলায় সের হইয়া থাকে ; কিন্তু এখানে নিম্নলিখিত রূপে সেরের প্রচলন দেখা যায়।

জিনিস	স্থান	ওজন
পাট	প্রায় সর্বত্র	৮৪॥৵০ আনা তোলা
ধান, চাউল	ঐ	৮২ তোলা
অন্যান্য দ্রব্য	ঐ	৬০॥৬২ তোলা
দুগ্ধ	সিরাজগঞ্জ টাউন	৯০ সাধারণের নিকট
ঐ	ঐ	১০৫ গোয়ালার নিকট
ঐ	স্থলবসন্তপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসহ	২৫০/২৬০ তোলা
ঐ	সেননগর, চন্দনগাঁতি প্রভৃতি স্থানে	১১৫/১২০ তোলা

দুগ্ধের ওজন সর্বত্রই সাধারণ ওজন হইতে বড় ও গোয়ালার ওজন সাধারণ প্রচলিত ওজন হইতে অনেক গুণ বড়। চৌহালি ও স্থলবসন্তপুর প্রভৃতি স্থানের দুগ্ধের ওজন দেখিলে অবাক হইতে হয়। এক সের ৪/৫ সেরের সমান ও এক সের দুগ্ধ এসব স্থানে টাকার উপরেও সময়ে বিক্রিত হয়। কথিত আছে, এখানকর পাকড়াশি জমিদার পরিবারে কোন সময় এক ঠাকুরাণী ছিলেন, তাহার একটি মস্ত লোটা ছিল, তিনি সেইটাকে তাহার সের বলিতেন ও এক সের দুধের জন্য ঐ লোটা পাঠাইতেন। বিক্রেতাকে তাহার ঐ লোটা ভরিয়া এক সের দুধ দিতে হইত। ইহাতেই দুধের ওজন এখানে এইরূপ হইয়াছে। ওজনের নির্দিষ্ট হিসাব না থাকাতে অনেক সময় ক্রেতাগণকে ঠকিতে হয় বিশেষত দুধ লইয়া। গোয়ালারা গ্রামের মধ্যে যাইয়া অশিক্ষিত গরিব গ্রামবাসী হইতে যথেচ্ছারূপে দুগ্ধ মাপিয়া তাহাদের ক্ষতি করিয়া থাকে। গভর্নমেন্ট হইতে সর্বত্র ওজনের একটি নির্দিষ্ট হার হইলে, এসব বিভ্রাট দূরীভূত হইত। সিরাজগঞ্জ টাউনে ও প্রায় অন্যান্য স্থানেও দুধটা খাঁটি ও নিষ্কলঙ্ক পাওয়া যায়। মাছ সচরাচর ওজনে বিক্রয় হয় না।

ওজনের তালিকা

৪ পোয়াতে — এক সের	
৫ পোয়াতে — এক ধারা	ধান চাউল প্রায়
৮ ধারা — এক মণ	এইরূপের ওজন।

জমির মাপ সচরাচর নিম্নলিখিত তালিকানুসারে এখানে দেখা যায়—

৪ কড়ি বা কানিতে	এক গণ্ডা।
সাড়ে সাত গণ্ডায়	এক পাখি।
ষোল পাখিতে	এক খাদা।

আটিয়া পরগণার সাতআনি স্টেটে এক বাহু হাতের ১৪ হাত ১৪ অঙ্গুলি নলের ৬+৫ নলে এক পাখি হইয়া থাকে। অন্যান্য জমিদারবর্গের মধ্যেও বিভিন্ন মাপ প্রচলিত আছে; কিন্তু সাধারণত ১৮ ইঞ্চি হাতের ১৪ হাত ১৫ অঙ্গুলি নলের ৬+৫ নলে এক পাখি হয়।

ঐতিহাসিক ঘটনা ঃ

সিরাজগঞ্জ স্থানটি বিখ্যাত হইলেও ইহাতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অতি বিরল; এমন কি, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্থানটি পুরাতন নয়, পুরাতন ঘটনা কোথা হইতে ঘটে? অথবা ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া প্রভৃতির ন্যায় ইহা কোন আমলে রাজধানী ছিল না, বা দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ইত্যাদির ন্যায় কোন বড়লোক, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি এখানে নাই বা ছিল না; ইতিহাস প্রসিদ্ধ কথা সিরাজগঞ্জ সম্বন্ধে কি লেখা যায়? এই জন্যই বোধ হয় এ পর্যন্ত সিরাজগঞ্জের বা পাবনা জেলার কোন ইতিহাস কোনও লেখক মহাশয়ের দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। তবে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে এখানে যে প্রজাবিদ্রোহ ঘটে তাহা উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্রোহ প্রজা ও জমিদারদিগের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল, সুতরাং জমিদারি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

এক্ষণে যে সব বৃহৎ জমিদারি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই ইংরেজদিগের সৃষ্টি। ইংরেজগণই জমিদারদিগকে ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী করিয়াছেন, কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে এইরূপ ছিল না। যে সময়ে ভারত স্বাধীন বা হিন্দু রাজগণের অধীন ছিল, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শিলাদিত্য, হর্ষবর্ধন প্রভৃতি নৃপগণ যখন ইহার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তখন প্রজাগণই ভূমির প্রকৃত অধিকারী ছিল, এবং রাজাগণ প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেন বলিয়া, জমির উৎপন্ন ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিতেন। এই

রাজভাগের নাম "কর"। হিন্দু রাজত্বের পর মুসলমান অধিকার। খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমান অধিকারে আইসে ও তদবধি মুসলমানগণ সার্ধ পাঁচশত বৎসর এই দেশ শাসন করেন। ইহাদিগের সময়েও প্রজাগণই ভূমির প্রকৃত স্বত্ত্বাধিকারী ছিল। এই মুসলমান বাদশাহগণও প্রজাদিগের নিকট হইতে উৎপন্ন ফসলের কিয়দংশ কর স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। এই অংশের নাম "খেরাজ"। ১৫৫৬ খ্রিঃ অব্দে জগদ্বিখ্যাত মোঘলকুল-তিলক আকবর বাদশাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য অনেকগুলি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া যান। (আজকালও অনেক বিষয়ে আকবরী আইন প্রচলিত আছে) হিন্দুরাজ তোড়লমল তাঁহার রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সমস্ত প্রদেশটি একরূপ মাপকাঠি দ্বারা জরিপ করাইয়া, পরিমাণ ঠিক করেন ও কি প্রকারের ফসল উৎপন্ন হয় তাহা ঠিক করিয়া, জমির অবস্থানুসারে তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর খেরাজ নির্ধারণ করিয়া দেন। ১৫৮২ খ্রিঃ অব্দে এইরূপ বাংলা প্রদেশের বন্দোবস্ত সাধিত হয় এবং ইহার খেরাজ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু রাজ্যের ক্রমিক বিস্তারের সহিত প্রত্যেক প্রজার নিকট খেরাজ আদায় করা কঠিন হইয়া উঠে ; সুতরাং তজ্জন্য তৃতীয় ব্যক্তির সহিত ইজারা বন্দোবস্তের আবশ্যক হয়। এই ইজারাদারগণ কিঞ্চিৎ উপস্বত্ব পাইয়া, প্রজাদের নিকট খেরাজ আদায় করিয়া সরকারে দাখিল করিতে থাকে। মুসলমান সম্রাটগণ ক্রমশ হীনবল হইয়া পড়িলে, এই ইজারাদারগণ নির্দিষ্ট খেরাজ অপেক্ষা অধিকতর আদায় করিতে লাগিলেন এবং সরকারে যৎকিঞ্চিৎ দিয়া, বাকি আত্মসাৎ করিতে থাকেন। এই সময় হইতে এই ইজারাদারগণই একরূপ জমিদার বলিয়া গণ্য হইলেন কিন্তু এ পর্যন্ত ভূমিতে ইহাদের কোন স্বত্ব ছিল না। ১৭১২ খ্রিঃ অব্দে তদানীন্তন সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ, সমগ্র বাংলাদেশকে ত্রয়োদশ চাকলাতে বিভক্ত করেন এবং খেরাজ আদায় জন্য প্রত্যেক চাকলাতে এক একজন তহসিলদার নিযুক্ত করেন। হিন্দুগণ আদায় কার্যে দক্ষ বলিয়া ইহাদিগকেই এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং মুসলমানগণ হীনবল হইলে ইহারা প্রজাদের উপর অযথা উৎপীড়ন করিয়া অতিরিক্ত খেরাজ ও নানাবিধ আবওয়াব ও খরচা আদায় করিতে লাগিলেন এবং প্রজাগণও অত্যন্ত উৎপীড়িত ও বহুবিধরূপে দুর্দশাগ্রস্ত হইতে লাগিল।[২]

এই বিশৃঙ্খল সময়ে ইংরেজগণ এই বাংলাদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। তাহারা প্রথম ভূমির প্রকৃত স্বত্ত্বাধিকারী কে, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না ; তখন বাধ্য হইয়া জমিদারদের সহিত তাহাদের মেয়াদী বন্দোবস্ত ইজারাবিলি করিতে হইল। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে দশ সনের জন্য জমিদারগণের সহিত এইরূপে ইজারা বন্দোবস্ত হইল। ইহাকে "দশসালা বন্দোবস্ত" বলে। ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষীয়গণ এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন ; সুতরাং ১৭৯৩ সনে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া জমিদারগণই ভূমির প্রকৃত অধিকারী বলিয়া ইংরাজ-গভর্নমেন্ট স্বীকার করিলেন এবং সেই হইতেই জমিদারদিগেরও অধিকার প্রকৃত প্রস্তাবে সাধিত হইল।[৩]

এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বা তাহার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোন কাগজপত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে লোক পরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, পাবনা জেলা সংস্থাপিত হওয়ার সময় নাটোরাধিপতি এই সমগ্র প্রদেশের অধিপতি ছিলেন, বৃটিশ অধিকারের পূর্বে, নাটোরে রঘুনন্দন রায় নামে এখজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে, ইনি পূর্বে পুঁটিয়ার রাজার শালগ্রামাদি বিগ্রহের পূজক ছিলেন। কপালগুণে তিনি রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া, রাজার সেরেস্তায় লেখাপড়া শিক্ষা পাইলেন। দেয় করের অনাদায় হেতু, নবাব সরকার হইতে পুঁটিয়া-রাজকে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার আদেশ হইলে তৎপরিবর্তে রাজা রঘুনন্দনকে মুর্শিদাবাদ পাঠান। তিনি নিজ বুদ্ধি ও কৌশল গুণে নবাবের

আদেশ রহিত করাইতে সমর্থ হইলেন, এবং সৌভাগ্যবশত খোদ নবাবের সুনজরে পড়েন ও নাটোরে ফেরৎ না আসিয়া মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে থাকতে আদিষ্ট হন। বলা বাহুল্য যে, পরে তিনি নিজগুণে "রায় রায়ান" উপাধিতে ভূষিত হন ও যথেষ্ট জমিদারি প্রাপ্ত হন। তাঁহার প্রাপ্ত জমিদারিগুলি তদীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে লিখিত হয়। এই উন্নতিকালে অসমর্থ জমিদারবর্গের জমিদারিও রামজীবনের নামে লিখিত হইতে থাকে। শুনা যায়, তখন তাহার দেয় করের সমষ্টি ৫২৩৬০০০ টাকা। ও আদায় দুই ক্রোরেরও অধিক হইয়াছিল, এই হেতু নাটোররাজকে লোকে রায়ান্ন লক্ষের জমিদার বলে। কিছুকাল পরে মহারাজ রামকৃষ্ণ নাটোরের রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন ও পূজা অর্চনাতেই প্রায় সময় কাটাইতেন ; রাজকার্যে কিছুমাত্র মনোযোগী ছিলেন না। সুতরাং ক্রমে তাহার বিশাল জমিদারি নিলাম হইতে লাগিল। অনন্যোপায় হইয়া, তদীয় সুযোগ্য স্ত্রী রাণী ভবানী নিজ কর্মচারিগণকে স্ব স্ব নামে নিলাম ডাকিয়া রাখিতে বলিলেন। তন্মতে কর্মচারিগণ নিলাম ডাকিতে লাগিলেন। পরে এই বেনামী জমিদারি তাহাদের নিজ সম্পত্তি হয় ও তাহারা বড় জমিদার বলিয়া গণ্য হন।

সিরাজগঞ্জের মধ্যে ইসপশাহী পরগণা বিখ্যাত। ইহাও পূর্বে নাটোরের অন্তর্গত ছিল এবং উপরোক্ত কারণে সেই বংশের গৌরব হ্রাস হইলে, ঐ পরগণার অংশ ভিন্ন ভিন্ন জমিদার ক্রয় করেন। ইহাদের মধ্যে কলিকাতার ঠাকুর জমিদারগণ, ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, সলপের সান্যালবাবুরা, স্থলের পাকড়াশিবাবুরা এবং পোরজনার ভাদুড়িবাবুরা প্রধান।

এই সমস্ত নব-জমিদারগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে অন্যায় ও অতিরিক্ত ভিক্ষা এবং কর প্রার্থনা করিলে, প্রথম হইতেই প্রজাদের সহিত অনৈক্য ও মনোবাদ উপস্থিত হয়। কিছুকাল এরূপ গোলমাল অতিবাহিত হইলে, পুনরায় জমিদারগণ ১৮৭২ খ্রিঃ অব্দে খাজানা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন এবং হাতের মাপ কমাইয়া একান্দাজ জরিপ করাইয়া জমির পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি করেন এবং ইহাও প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতে গভর্নমেন্ট কর্তৃক যে সমস্ত কর ধার্য হইবে, তাহা সমস্তই প্রজাগণকে দিতে হইবে। ইহার অব্যবহিত পরে পাবনা জেলায় রোড সেস আইন প্রবর্তিত হওয়ায়, অনেক জমিদার উপরোক্ত শর্তে প্রজাগণ হইতে কলিয়ত রেজেস্ট্রি করাইয়া লয়েন। প্রথম অনেক প্রজাই ইহাতে সম্মত হইয়াছিল ; কিন্তু ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে কোন কোন প্রজা দেওয়ানি আদালতে জয়লাভ করাতে, প্রজাগণ এক পরামর্শ হয় ও বর্ধিত খাজানা ও অতিরিক্ত কর দিতে অসম্মত হয়। ইহাই বিদ্রোহের মূল কারণ।

ক্রমে এই বিদ্রোহীদলের সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং জুন মাসের মধ্যে সমগ্র ইসপশাহী পরগণা এই বিদ্রোহী দলভুক্ত হয়।

এই জেলায় শাহজাদপুর থানার মধ্যে দৌলতপুর নামে একটি গ্রাম আছে। তথাকার রায় বংশ অতি প্রাচীন। এই বংশে ঈশানচন্দ্র রায় নামে একজন বুদ্ধিমান ও সুচতুর লোক ছিলেন। হুড়াসাগর নদীতীরস্থ বেতকান্দি গ্রাম লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারগণের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল, কিন্তু তাঁহারা প্রবল ও ধনী জমিদার, কিছুতেই দম্য নহেন, সুতরাং ঈশানবাবু অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। তিনি এই বিদ্রোহী দলের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে তাহাদের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় মহাত্মা পি. নোলেন বাহাদুর সিরাজগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ইনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল ও দয়ালু ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাহাদিগকে নির্দিষ্ট খাজানা আদালতে দাখিল করিয়া দিতে বলেন এবং কোনরূপ আইন বিরুদ্ধ কার্য বা অত্যাচার করিতে নিষেধ করেন। পূর্ব হইতেই রাজা রামজীবনের হাত এদেশে প্রচলিত ছিল। উহা

আঠার ইঞ্চি হাতের সওয়া দুই হাত হইবে। প্রজাগণ এই হাতের মাপে যে জমা হইয়াছিল, তাহারই হিসাবমত নিজ নিজ খাজানা আদালতে দাখিল করিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় সত্তর খানা গ্রাম জুন মাসে জোটবদ্ধ হয় এবং এই বিদ্রোহীদল অনেক বাড়িঘর লুঠ ও গ্রাম দগ্ধ করিতে লাগিল।[৪] কথিত আছে, ইহারা রাত্রিতে মহিষের সিঙা ফুকাইয়া ভয় প্রদর্শন করিত ও নিজ দলে ভুক্ত হওয়ার জন্য অপর লোকজনকে আহ্বান করিত। জুন মাসের শেষের দিকে অনেক বিদ্রোহী দূত চতুর্দিকে প্রেরিত হইয়াছিল, যাহাতে বাহিরের লোক তাহাদের দলভুক্ত করাইয়া দলপুষ্ট হয়। জুলাই মাসের পহেলা পর্যন্ত ২৬৯টি গ্রামের অধিবাসীগণ একজোট হইয়া প্রকাশ্যভাবে গভর্নমেন্টকে জানায় যে, তাহারা জমিদারগণের অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিরাজগঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী পর্যন্ত এই বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

৪ জুলাই তারিখে গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে এই আদেশ প্রচলিত হইল যে প্রজাগণ যেন বিদ্রোহদল ছাড়িয়া দেয় এবং নিজ নিজ দুঃখ কাহিনী পৃথকভাবে বর্ণনা করে। অবিলম্বে নিকটস্থ জেলা হইতে ৪০ জন পুলিশ প্রহরীসহ একজন ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রেরিত হইলেন। মাননীয় ছোট লাট বাহাদুরের আদেশ অনুসারে, গোয়ালন্দ হইতে একদল শস্ত্রধারী পুলিশসহ পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আগমন করেন। কুষ্টিয়াতে একশত জন উত্তম শস্ত্রধারী পুলিশ সৈন্য জনৈক এঃ সুপারিন্টেন্ডের অধীন অবস্থান করিতে থাকে, যেন আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইতে পারে। এই সমস্ত উপায়ে এবং স্থানীয় কর্মচারীগণের যত্নে অতি সত্বরই বিদ্রোহ বহ্নি নির্বাপিত হইল। হাঙ্গামার অপরাধে ইহাতে ৩০২ জন লোক ধৃত হইয়াছিল। ইহাদের অনেকেই প্রায় একমাস হইতে দুই বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিল।

উপরোক্ত উপায়াদিতে বিদ্রোহ-বহ্নি নির্বাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই ঘটনার শেষ ফল অনেকদিন গড়াইয়াছিল। ১৮৭৬ সনের ৪ জুন তারিখে এই সংস্রবে আবার দুইজন লোকের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল। ইহা বাবু দুর্গানাথ সান্যাল মহাশয়ের কর্মচারিগণ ও কৃষকদের মধ্যেই ঘটিয়াছিল। এই ব্যাপারে পরে, গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে বিশজন পুলিশ কনস্টেবলসহ দুইজন হেড কনস্টেবল ছয় মাসের জন্য বিরোধীয় গ্রাম সমূহের জন্য বিশেষভাবে স্থাপিত হয় এবং ইহাদের খরচ গ্রামবাসিগণ হইতে লওয়া হয়। এই ভাবেই ক্রমে পুনরায় শান্তি বিরাজ পাইতে লাগিল।

কলকুঠি—কয়েকবার বলা হইয়াছে, সিরাজগঞ্জ মাত্র একটি সবডিভিসন হইলেও অনেক ছোট জেলা হইতে অধিকতর প্রসিদ্ধ। ইহার খ্যাতির একমাত্র কারণ পাটের কারবার। সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে সিরাজগঞ্জ পাটের প্রধানতম বাজার ও কারবার স্থান। পাঠক বলিতে পারেন কি, কি জন্য সিরাজগঞ্জ স্থানটিতেই পাটের কারবার এত অধিক? একমাত্র কলকুঠিই ইহার মূল সহায়।

সিরাজগঞ্জ টাউনের মধ্যে মাছিমপুর নামক গ্রামে চট ও ছালা প্রস্তুতের জন্য প্রকাণ্ড ও অতীব আড়ম্বরবিশিষ্ট একটি কারখানা ছিল। এখানকার লোকে ইহাকে কলকুঠি বলিত। ১৮৫৭ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে ইহা ধ্বংসীভূত হইয়া গিয়াছে। আজকালও তাহার ভগ্নাবশেষটুকু দেখিলে, ইহা যে এককালে কি বিরাট ব্যাপার বিশিষ্ট কারখানা ছিল সহজে অনুমান করা যায়।

মিস্টার বেরী নামক একজন বিচক্ষণ ইংরেজ কর্তৃক ইহার সৃষ্টি। এই সাহেব প্রথমত কিছুদিনের জন্য এই সিরাজগঞ্জে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। (পরে স্বীয়গুণে তিনি আয়ারল্যান্ডের কর্ক প্রদেশস্থ বণিক সভার মেম্বার হন।) স্বাধীন ব্যবসা ও কারবার খুলিবার ইচ্ছা করিয়া, তিনি গভর্নমেন্টের চাকুরি পরিত্যাগ করেন। সিরাজগঞ্জে থাকিয়া তিনি বিদেশে

রপ্তানির জন্য পাট বাঁধিবার কতকগুলি হস্তযন্ত্র নির্মাণ করান ও কারবার আরম্ভ করেন। ক্রমে ইহার এত অধিক উন্নতি হইতে লাগিল যে, তিনি ইহাকে চট প্রস্তুতের একটি বড় কারখানাতে পরিণত করার উপযোগী করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহাকে বিলাতে প্রত্যাবর্তন করিতে হওয়ায়, তাঁহার এই উন্নতিশীল কারবারটি একটি কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। কোম্পানি কারবারটি ক্রয় করিয়া, এই বিরাট কারখানার জন্য উপযুক্ত দালানাদি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু এই ব্যাপার সমাধার উপযুক্ত টাকা কোম্পানির হাতে না থাকাতে আরব্ধ দালানাদি ঋণদাতাগণের হস্তে যায়। পরে অন্য একটি কোম্পানি এই কারবারটিকে তাহার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম সহ দুই লক্ষ সাড়ে সাত চল্লিশ হাজার টাকাতে কিনিয়া লয় এবং এই নূতন কোম্পানির নাম "সিরাজগঞ্জ জুট কোম্পানি লিমিটেড" রাখা হয়। প্রথমে এই জুট কোম্পানি নয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার মূলধনে কারখানা আরম্ভ করেন ; কিন্তু পরে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ হইতে উন্নতি করিয়া, ইহার মূলধন সাড়ে তের লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইয়াছিল। মালিকগণের এরূপ পরিবর্তনকালে কারবার সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই, বরং ক্রমশ ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইহার দালান নির্মাণকার্য শেষ হয় ও ঐ সনে এই বিরাট কার্য নবনির্মিত দালানে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত খোলা হয়। দালানটিতে পনের হাজার হন্দরের লৌহকার্য ও পাঁচ লক্ষ ঘনফুটের ইষ্টককার্য হইয়াছিল। একজন ইউরোপীয় সুপারিন্টেন্ডেন্টের অধীনে বিলাতি কলে বিলাতি ধরনের বাষ্পের জোরে ইহাতে সুতাকাটা, চটবুনন ও ছালা সেলাই কার্য চলিত। প্রায় ১২০০ হইতে ১৫০০ নানা রকমের লোক দৈনিক এক সময় খাটিত। বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক ও বালক উচ্চদরের কার্যে পর্যন্ত নিযুক্ত ছিল। দৈনিক বার ঘণ্টা ইহার কল চলিত। নিযুক্ত ব্যক্তিগণ অদলবদল ভাবে দিনে দুই বেলা খাটিত। রিপোর্টে দেখা যায়, ১৮৭৪-৭৫ সনে এই কারখানা হইতে ১০৪৫৭০ মন ছালা স্টিমার যোগে কলকাতায় রপ্তানি হইয়াছিল। বিভিন্ন কারবারের জন্য দালানটি ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল।

কার্য	লম্বা (ফিট)	প্রস্থ (ফিট)	উচ্চতা (ফিট)	একসময়ে নিযুক্ত ব্যক্তি (জন)
১) বেচিং হাউস	১৩৩	৩৬	১৬	৮০
২) প্রপেয়ারিং হাউস	১২৭	৪৭	১৬	১০৭
৩) টিজিং হাউস	২৬	৩৬	১৬	৮০
৪) উইভিং রুম	২২৫	১১৮$\frac{৩}{৪}$	১৬	৪৯০
৫) স্পিনিং রুম	১২৭	৯৪$\frac{২}{৩}$	১৬	১৬৮
৬) সেকসিউইং হাউস	১৮০	৪৫	১৬	৫২০
	৮১৮	৩৩৭$\frac{৩}{৪}$	১৬	১৪৪৫

উভয় বেলাতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৪৪৫ এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৮৯০ জন। এতদ্ব্যতীত কুলিমজুর প্রভৃতি যে কত ছিল, তাহার নির্দিষ্ট হিসাব নাই। সর্বসমেত প্রায় ৪০০০ হইবে।

ছালা বুননকার্যে যাহারা খাটিত, তাহারা কাজ হিসাবে মজুরি পাইত এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ মাসিক বেতনে নিযুক্ত ছিল। এই কারখানার দুইটি চিমনি বাজারের পাঁচমাইল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইত।

এই কারখানা বর্তমানকালে সিরাজগঞ্জ টাউনের অবস্থা কিরূপ ছিল, পাঠক বিবেচনা করুন। স্যার জর্জ ক্যাম্বেল বাহাদুর তাঁহার লিখিত ১৮৭৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের বিবরণে সিরাজগঞ্জ সম্বন্ধে লিখিতেছেন ঃ "স্টিমারের ডেকের উপর হইতে আরোহীগণ অনুভব করিতে পারে যে, তাহারা একটি কাববাব স্থানে পৌঁছিয়াছে। ছোট ছোট [illegible]কগুলি নৌকা

একত্রিতভাবে উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে কারখানার দিকে অগ্রসর হইতেছে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকাসমূহ অন্য দিক হইতে আগমন করিয়া ডায়মন্ডহারবারের ন্যায় বন্দরে ভিড়িতেছে। কূলের উপর কুলিদের জনতা; কেহ পাটের খোলা বোঝা নামাইতেছে, কেহ প্যাক করিতেছে, কেহ শা জাহাজের ফ্লাটের উপরে বস্তার বোঝা ফেলিতেছে এবং কতকলোক দক্ষিণদিকে কারখানার দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। বাজারের সময় হইলে দেখা যায়, দালাল ও বেপারিগণ নৌকা লইয়া একত্রিত হইয়া তাহাদের কেনাবেচাতে ভয়ানক ব্যস্ত। কাঁইয়া মারওয়াড়িদের পাগড়িগুলি, মহাজনগণের সাদা পোশাক ও ইউরোপীয়ানদের শোলার টুপি, এই জনতাকে আরও সুন্দর দৃশ্যে পরিণত করে। এই দৃশ্যের অভিনবতা ইহাতে আরও অধিকতর হয় যে, এই বাণিজ্য পটু স্থানটি ছায়াশূন্য বিস্তৃত বালুকাভূমির মধ্যেই রহিয়াছে, যেখানে ছায়া প্রদানের একটি বৃক্ষমাত্র নাই, বা আশ্রয় লওয়ার কোন সুবিধা নাই। বাজারের পাঁচ মাইল দূর হইতে কারখানার দুইটি চিমনি বৃক্ষশ্রেণীর অগ্রভাগের উপর দিয়া দণ্ডায়মান আছে দেখা যায়। কারবারে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রত্যহ এই বিস্তৃত চরের উপর দিয়া আসা যাওয়া করিতে হয়।"

ভূমিকম্প—১৮৯৭ সনের ১১ জুন বা বাংলা ১৩০৪ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩০ তারিখ শনিবার যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে অনেক জেলারই বহুল ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু সিরাজগঞ্জের পক্ষে ইহা অধিকতর ক্ষতি করিয়াছিল। কলকুঠির বর্ণনাতে বুঝিতে পারিলেন, কতকগুলি লোক ঐ কারখানার কল্যাণে নিজ নিজ জীবিকা সংগ্রহ করিত ও ইহা দ্বারা এই শহরটির কতদূর জাঁকজমক ছিল, কিন্তু এই ভূমিকম্পে এই কলকুঠিকে যাবজ্জীবনের ন্যায় ধ্বংস করিয়া দেয়। বেলা অপরাহ্ন ৫টা ১১ মিনিটের সময় কম্প আরম্ভ হয়, দেড় মিনিটকাল ইহা সজোরে স্থায়ী ছিল, এই সময়ের মধ্যে কত লোকের যে জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হইল, কত লোক স্ত্রী-পুত্র হারা হইয়া পথের ভিখারি হইল, তাহার ইয়ত্তা কে করে। শুনিয়াছি, এই দারুণ কম্পের সময় কারখানা বন্ধ হইয়াছিল না, কল চলিতেছিল। কম্পের অনুভবে স্টিমের জোর বাড়াইয়া দেওয়া হয় ও দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ভিতরে কতলোক যে ছিল ও কতলোক বিনাশ হইল তাহা অনুমানের উপর নির্ভর করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এই কলকুঠির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বলিতে গেলে একরূপ সিরাজগঞ্জের পূর্বগৌরবও লোপ পাইয়াছে।

এই ভূমিকম্পের ফলে সিরাজগঞ্জেও অন্যান্য স্থানাদির ন্যায় আরও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। কত লোক বিভিন্ন স্থান হত ও আহত হইয়াছিল, এবং কত দালান কোঠার ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার একটি নির্দিষ্ট তালিকা পাওয়া যায় নাই। শুনিয়াছি ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরে একটি গুজব এই রটিয়াছিল যে, ব্রহ্মপুত্রের জল আসিয়া সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিবে, জল প্লাবন ও দ্বিতীয় মহাপ্লাবন ঘটিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। লোকে এই ভয়ে কলাগাছ কাটিয়া ভেলা নির্মাণের জন্য পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল।

ইলিয়ট ব্রিজ—এই বিষম ভূমিকম্পের ক্ষতির আর একটি নিদর্শন এখনও সিরাজগঞ্জে বর্তমান আছে। ইহা ইলিয়ট ব্রিজের বর্তমান বক্র আকৃতি। সিরাজগঞ্জ টাউনটির মধ্য দিয়া ধানবান্ধি নামক যে খালটি যমুনা হইতে বাহির হইয়া টাউনের দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে ও যাহার ফলে এই টাউনটি পূর্বপার ও পশ্চিমপার দুই পারে বিভক্ত হইয়াছে; পূর্বে এই নদীর উপর পাকাপাকি ভাবে বারমাসের জন্য কোন পোল ছিল না। বর্ষার সময় দুইখানি খেয়া নৌকা থাকিত, ঐ নৌকা যোগে লোকগণের যাতায়াত হইত। ইহাতে লোকের কতদূর অসুবিধা যে হইত, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগস্ট তারিখে মাননীয় স্যার চার্লস এলফ্রেড ইলিয়ট তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুরের শুভ আগমন উপলক্ষে তাঁহারই

হাতে এই খালটির উপর একটি ব্রিজের বুনিয়াদ পড়ে। মহাত্মা বিট্‌সনবেল সাহেব তখন সিরাজগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নে এই পোলটি নির্মিত হইয়া আজ পর্যন্ত ইহা সিরাজগঞ্জের একটি মহা কল্যাণকর দর্শনযোগ্য জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ব্রিজটি দীর্ঘে ১৮০ ফুট ও প্রস্থে ১৬ ফুট। ৪৫০০০ টাকা ইহার জন্য ব্যয় হইয়াছিল। এই ১৮০+১৬ ফুট দীর্ঘ প্রস্থ ব্রিজটির সমতল পাটাতনগুলির পরিমাপ। ইহা ছাড়া উভয়পারের ইষ্টকনির্মিত খিলান ও তাহার বাহুদ্বয় অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূমিকম্পের পূর্বে এই ব্রিজটি সমতল ছিল, কিন্তু বর্তমান বক্র আকার ভূমিকম্পের কারণই হইয়াছে। ইহার নাম ও সন তারিখ পশ্চিমের খিলানটিতে লিখিত আছে।

এই ভূমিকম্প উপলক্ষে অনেক প্রকার ধুয়া এদেশীয় কৃষকেরা বাঁধিয়াছিল ; নিম্নে তাহার একটি পাঠকের সম্মুখে রাখিতেছি ঃ

ভূমিকম্পের ধুয়া

১৩০৪ সনেতে ভূমিকম্পেরই বিধান।
ছাড়ে গুড়গুড়ি আর কম্পমান, হুঁস ছিল না না ছিল জ্ঞান,
রসুল বলে ছোবহান, তুমি কর মোর উন্মতের আছান,
গায়েব বুঝি আজ করল ছোবহান।
দারুণ ভূমিকম্প এসে, পড়ল খসে,
দিন দুনিয়ার আসমান ; গায়েব বুঝি করল্‌ ছোবহান।
কত পাহাড় ফেটে ভেসে এল বান,
ব্রহ্মপুত্র, যমুনার পানি, পদ্মার জল ধ'রেছে উজান।
নদীর হাঙ্গর উঠে কয়, কুমীর দোস্তজী,
এখন বুঝি যায় রে পরাণ।
চর পড়ে ত নদী ধর্‌ল উজান।
পাহাড় পর্বত ভাংছে কত, ফিরিঙ্গির কলকুঠি দালান।
গায়েব বুঝি আজ করল ছোবহান।

তুফান বা প্রবল ঘূর্ণিবার্তা—১৮৭২ সনের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে পাবনা জেলাতে একটি মহা ঘূর্ণিবাত হইয়াছিল। পূর্বাহ্ন বেলা ১১টা হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ন ৪টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত অনবরত এই তুফান চলিতেছিল। মধ্যে বিশ মিনিট কাল ইহার প্রকোপ কিছু কমিয়া পুনরায় ৫টা হইতে ৬টা পর্যন্ত চলিতে থাকে। সমস্ত জেলাতে ইহার সমধিক ক্ষতি হইয়াছিল। সিরাজগঞ্জ মহকুমাতে ইহা দ্বারা হত লোকের সংখ্যা অধিকতর হইয়াছিল। তদানীন্তন সবডিভিসনাল আফিসার মহোদয়ের রিপোর্টে দেখা যায়, ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৃতদেহগুলি বরাবরই ভাসিয়া যাইতেছিল। ১১১ খানা নৌকা পূর্ণ বোঝাইসহ ডুবিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার তালিকা বাহির হইয়াছিল ; কিন্তু এই তালিকা বহির্ভূত অনেক নৌকা এই তুফানের ৩ দিন পর পর্যন্ত উত্তোলিত হইয়াছিল। ইহাতে সবডিভিসনাল আফিসার সাহেবের বাঙলা ছাদশূন্য হয় ; সিরাজগঞ্জের সমুদায় গভর্নমেন্ট আফিস ও থানা পড়িয়া যায় ; কাগজাদি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সিরাজগঞ্জ ময়মনসিংহ ডাক নৌকা ডুবিয়া ৩ জন লোক জলমগ্ন হয়। "রাজমহল" নামক স্টিমারের উপরের পাটাতন সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। "শিমলা" নামক স্টিমার ও ৫ খানা ফ্লাট জাহাজ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত ১৮৫৪ সনের মে মাসে ; ১৮৬৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ও ১৮৬৭ সনের নভেম্বর মাসে এক একবার বহু হানিকর তুফান এই জেলাতে ঘটিয়াছে।

নানাকথা ঃ

১. ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সিরাজগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ইহার এরিয়া বা ক্ষেত্রফল ছিল, ১০৩১ বর্গমাইল, গ্রাম ছিল ১৪৯২টি, বাড়ি ছিল ১০০৮২০টি, লোকসংখ্যা ছিল ৬৫৬৫৭৫ জন।

২. সিরাজগঞ্জ টাউনের উত্তরে কুড়িপাড়া, জিয়ারপাড়া ও কাওয়াখোলা, দক্ষিণে কান্দাপাড়া ; পূর্বে যমুনা নদী ও চণ্ডালবয়রা এবং পশ্চিমে দেয়ার বৈদ্যনাথ ও ফুলবাড়িয়া গ্রাম।

৩. সিরাজগঞ্জ টাউনে বারটি সড়ক বা সদর রাস্তা আছে ; যথা ঃ ১) কাইয়াপট্টি, ২) ফড়িয়াপট্টি, ৩) মাছিমপুর, ৪) কাপুড়িয়াপট্টি, ৫) মেছুয়াবাজার, ৬) দালালপট্টি, ৭) বাসুনিয়াপট্টি, ৮) কালীবাড়ি, ৯) পোস্ট আফিস রোড, ১০) কুঠিয়ালপট্টি, ১১) মসলাপাড়া রোড, ১২) ধানবান্ধা রোড। এই বারটি টাউন স্ট্রিট বা শহরের রাস্তা। ইহা ছাড়া পাবনা রোড, চাঁদাইকোণা রোড, কাজিপুর রোড প্রভৃতি রাস্তাগুলি টাউনের মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে পাবনা, চাঁদাইকোণা ও কাজিপুর পর্যন্ত গিয়াছে এবং তথা হইতে বিভিন্ন জেলাতে মিলিয়াছে।

৪. কারবারের সময় সিরাজগঞ্জ বন্দরের উপর কত নৌকা থাকে, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে মিউনিসিপ্যাল কমিটির পক্ষ হইতে দুইবার নৌকা গণনা হইয়াছিল, ১৮৭৩ সনের ৩১ আগস্ট তারিখ ১৪৩৬ খানা এবং ১৮৭৪ সনের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে ১১৮৫ খানা নৌকা দেখা গিয়াছিল।

৫. একশত বৎসর পূর্বে কি রকম ছিল জানি না। ৬৫ বৎসর পূর্বের সহিত বর্তমান বৎসরের তুলনা করিতে গেলে, কেবল এক চাউলের দাম ৬/৭ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে পাঁচ সিকা হইতে এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা ও ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে এক টাকা ছয় আনা হইতে এক টাকা সাড়ে আট আনা ছিল। কিন্তু এ বৎসর (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে) ছয় টাকা হইতে ছয় টাকা বার আনা দেখা যাইতেছে। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষকালে অর্থাৎ ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে চারি টাকা পর্যন্ত ও বিহার দুর্ভিক্ষ কালে অর্থাৎ ১৮৭৩ সনের নভেম্বর হইতে ১৮৭৪ সনের অক্টোবর পর্যন্ত সিরাজগঞ্জে চাউলের মন তিন টাকা পাঁচ আনা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব বৎসর যথাক্রমে এক টাকা ছয় আনা ও এক টাকা সাত আনা মন ছিল। আশ্চর্যের বিষয় দুর্ভিক্ষ বলিয়া প্রকাশ্যে হাহাকার এখন শুনিতেছি না। তবে সর্বসাধারণের কষ্টের যে একশেষ হইয়াছে ও দরিদ্রগণ যে অনাহারে রহিয়াছে, স্বচক্ষে দেখিতেছি। পাট বিক্রি কারবার আরম্ভ হওয়ার ঠিক প্রারম্ভে বর্তমান ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ঘোষণা হয় ও পাট রপ্তানি বন্ধ হয়। এই যুদ্ধের কারণে সাধারণভাবে সমস্ত জগতে অসুবিধা ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু সিরাজগঞ্জবাসীর পক্ষে বিশেষরূপে ক্ষতিজনক দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের প্রধান ব্যবসা পাট বিক্রি ও পাটের কারবার। সুতরাং ইহাদের ক্ষতি অন্যান্য স্থান হইতে অধিকতর। এই সম্বন্ধে অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন, কেবল এই বহির শেষের দিকে যে পাটের গানটি দেওয়া গেল তাহাই যথেষ্ট।

৬. মোহর খাঁর নাম শুনেনি এরূপ লোক সিরাজগঞ্জে বা পার্শ্ববর্তী জেলাতে বিরল। এই মোহর খাঁ একজন প্রসিদ্ধ ডাকাত। সিরাজগঞ্জের সাত মাইল পশ্চিমে ভদ্রঘাট নামক এক গ্রামে এই মোহর খাঁর বাড়ি ছিল। শুনিয়াছি, পাবনা জেলার ও পার্শ্ববর্তী বগুড়া, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ জেলার কতকগুলি লোক উহার দলভুক্ত ছিল। দলভুক্ত হইয়া স্থানে স্থানে ডাকাতি করিত। এই ডাকাতি কার্যে তাহার সঙ্গীদের উপর নাকি তাহার এই আদেশ ছিল যে, কখনো যেন স্ত্রীলোকের উপর ও বালক-বালিকাগণের উপর হাততোলা না হয় এবং নিরাশ্রয় দরিদ্রগণের উপর কোনরূপ অত্যাচার না হয়। কোন ডাকাতি সংস্রবে পলাতক হইয়া স্ত্রী-

পুত্রসহ মক্কা সরিফ চলিয়া যায় ও সেখানে ধুমধামে বাড়ি করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি স্থাপন করে, এমন কি সরিফের নিকটও নাকি যাতায়াত করিত। মক্কা সরিফ যাওয়ার কালে তদীয় দুই স্ত্রীর এক স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছিল ও অন্য স্ত্রী পুলিশের পাহারায় আটক ছিল। তাহার স্ত্রীকে নেওয়ার উদ্দেশ্যে পুনরায় কলকাতা আসিলে, পূর্ব ব্যবসা ডাকাতিক্রমে ধরা পড়ে ও বাংলা ১৩০৬ সনের প্রসিদ্ধ পাবনা-ডাকাতি মোকদ্দমাতে (Pabna gang Case) বিচার হইয়া তাহার ও তদীয় অনেক দলভুক্ত সঙ্গীদের দ্বীপান্তর কারাবাস হয়। ইহাদের কয়েকজনের নাম যথা ঃ

১) মোহর খাঁ—সর্দার, ২) নজু আকন্দ, ৩) মাহমুদ আলি আকন্দ, ৪) দুধু মণ্ডল, ৫) জাহেরদ্দী, ৬) মাগন খাঁ, ৭) মেহের সরকার, ৮) বীরু মণ্ডল ইত্যাদি ইত্যাদি—দলভুক্ত সঙ্গী।

তাহার অসাধারণ শক্তি ও বুদ্ধির কাহিনী শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

এই মহকুমাস্থ রায়গঞ্জ থানার দেশিগাঁও নিবাসী নেদু আকন্দ এবং শাহজাদপুর থানাস্থ করশালিকা নিবাসী কাদিরা ভূত ইহাদেরও বহু নাম শুনা যায়। প্রথমোক্ত নেদু আকন্দ একজন জোতদার ছিলেন। তাহার বাড়িতে দালান ও হাতি ছিল ; অতিথিসেবার জন্য ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাড়িতে প্রকাণ্ড মোসাফের খানা (সরাই) ছিল। যে কোন সময়ে যতজনই হোক না কেন মোসাফের (অতিথি) আসিলে যথানিয়মে সেবা করিতেন। তিনি নাকি বলিতেন যে "হাতি না রাখিলে মোসাফেরের খানা বহন করিবে কে" (বলা বাহুল্য যে, "মোসাফের" অর্থ অতিথি এবং "খানা" পার্শী হইলে ইহার অর্থ ঘর আর উর্দু হইলে ইহার অর্থ আহার। উচ্চারণানুসারে উভয় খানার বিশেষ পার্থক্য আছে।)

কাদিরা ভূতের প্রকৃত নাম আবদুল কাদির। নিজ কার্যাবলী দ্বারা ইনি "ভূত" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ তাহার কার্যাদি ভূতের কার্যাদির ন্যায় ছিল, এই জন্য লোকে তাহাকে ভূত বলিত। এখনও তাহার পুত্রগণ ভূত উপাধিতে পরিচিত হইতেছে। তাহার জোত জমি যে তত অধিক ছিল তাহা নয় ; কিন্তু সাহস ও ক্ষমতাগুণে দেশের মধ্যে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনিও একজন প্রসিদ্ধ অতিথিসেবক ছিলেন। কথিত আছে, রাত্রিতে চিনা কাটিতে যাইয়া, কোন সন্ন্যাসীকে ধরিয়া সারারাত চিনার বোঝার সহিত বাঁধিয়া রাখেন ও ভোরের প্রাক্কালে ছাড়িয়া দেন। সন্ন্যাসী ফেরত যাইয়া রাত্রিতে তাহাকে ভূতে ধরিয়া ছিল বলিয়া প্রকাশ করে। পরে জানা গেল, সন্ন্যাসীকে আবদুল কাদের ভূত ধরিয়াছিল। সেই হইতেই এই ভূত উপাধি।

বার হইতে ষোল বৎসর অতীত হইল, এই উভয় ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৭. এদেশে মারওয়াড়িগণকে "কাঁইয়া" ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত বলবান লম্বালম্বা লোকগুলিকে 'সর্দার' বলে। প্রথমোক্তগণ ব্যবসায়ী ও শেষোক্তগণের প্রায়ই জমিদারি কাছারির চৌকিদার, বরকন্দাজ। ১৮৭২ সনের লোকগণনাতে সিরাজগঞ্জের মিউনিসিপ্যালিটির সীমানাতে এই দুই রকমের (কাঁইয়া ও সর্দার) লোকের সংখ্যা ৩৫৪৫ জন ছিল। ঐ সনে সমগ্র পাবনা জেলাতে ৬৬ জন দেশিয় খ্রিস্টানের মধ্যে সিরাজগঞ্জ থানাতে ৪৯ জন ছিল।

৮. সুপ্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক মওলানা কারামত আলি সাহেব মরহুমের কল্যাণে পূর্ববাংলার প্রায় সকল স্থানে মুসলমান ধর্মের উন্নতি হইয়াছে ও মুসলমানগণের মধ্যে সরিয়ত জারি হইয়াছে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের পর ইনি পূর্ববাংলাতে পদার্পণ করেন ও প্রথমে বরিশাল জেলাতে সরিয়ত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তদন্তে জানা যাইতেছে, তিনি সিরাজগঞ্জের কোন কোন স্থানেও পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় রঙপুর প্রভৃতি জেলার ন্যায় সর্বপ্রথমে তিনিই সিরাজগঞ্জে সরিয়ত জারি করেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিন্ত যে, তাঁহার সরিয়ত প্রচারের

প্রবাহে সিরাজগঞ্জী মুসলমানগণও বিচলিত হইয়াছিল এবং পরে তাঁহার শিষ্যবর্গের দ্বারা যথেষ্টরূপে ধর্মসংস্কার হইয়াছে। নিম্নলিখিত মুন্সি মৌলবিগণের দ্বারাও সিরাজগঞ্জে সরিয়ত সংস্কার হইয়াছিল ; যথা—

সাঁচালিয়া গ্রাম নিবাসী—১) কাজি কায়েমুল্লা সাহেব, ২) কাজি নছিমুদ্দীন সাহেব, ৩) নেজু মোছল্লী সাহেব, ৪) ঘোড়াচড়া নিবাসী মুন্সি নাজেমুদ্দীন সাহেব, ৫) মেছড়া নিবাসী মুন্সি নইমুদ্দিন সাহেব, ৬) হিন্দুস্থানী মুন্সি এনায়তুল হক ও ৭) তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৌলবি সেরাজুল হক সাহেবান, ৮) মহাদেবপুরের খোন্দকার বসিরউদ্দিন সাহেব, ৯) গণারগাতির মৌলবি খোদাবক্স সাহেব, ১০) সুপ্রসিদ্ধ মওলানা কারামত আলি সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মওলানা মোছলেহউদ্দিন সাহেব। সিরাজগঞ্জে অদ্যাপি তাঁহার সমাধি বর্তমান, ১১) নওয়াখালি জেলার মওলানা আবদুল বাকি সাহেব। ইনি সিরাজগঞ্জ সিনিয়ার মাদ্রাসার স্থাপক। তাঁহার সমাধি মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে বর্তমান, ১২) মাছিমপুরের মৌলবি জিয়াউদ্দিন সাহেব।

উপরোক্ত সাহেবানদের ন্যায় আরও কয়েকজন ধর্ম সংস্কারক কর্তৃক সিরাজগঞ্জে মুসলমানী সরিয়তের উন্নতি হইয়াছে।

৯. ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মহাত্মা হন্টার সাহেবের বিবরণে দেখা যায়—তখন পর্যন্ত বেলকুচিও একটি টাউন ছিল এবং সুপগাছা ও পাঙাসি রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত আউটপোস্ট ছিল।

১০. শাহজাদপুর থানাতে দেওয়ান তারটিয়া গ্রামটি হুরাসাগর নদীর তীরে অবস্থিত। দেওয়ান সৈয়দ লাহনুর সাহেব মরহুম এই গ্রামেই তাঁহার আস্তানা পত্তন করেন। শাহজাদপুরের শাহ মক্‌দুম্‌ শাহের মরহুমের পরেই তিনি পশ্চিম হইতে এদেশে পদার্পণ করেন। তাঁহার বর্তমান বংশধরগণ (যাঁহারা এখনও দেওয়ান তারাটিয়া গ্রামে অবস্থাহীনরূপে বর্তমান আছেন) তাঁহাকে মহাত্মা হজরত হাসন বসরি রাঃ সাহেব মরহুমের পৌত্র বা প্রপৌত্র বলিয়া প্রকাশ করেন ; ইহা কতদুর সত্য জানি না। যাহা হউক, তিনি এদেশে অবিবাহিতরূপে অল্প বয়সে আসিয়াছিলেন। শাহ মক্‌দুম্‌ মরহুমের জেয়ারতে সময় সময় যাওয়া আসা করিতেন। শাহজাদপুর থানায় নরিনা নামক গ্রামে সৈয়দ শাহ ঈসা নামে কোন দরবেশ ছিলেন। তিনি পরিবারবর্গ সমেত এখানে বাস করিতেন। মহাত্মা শাহ মক্‌দুম্‌ সাহেব, দেওয়ান শাহনুর সাহেবের বিবাহ নরিনা গ্রামে শাহ ঈশ সাহেবের বাড়িস্থ কোন কন্যার সহিত কর‍াইয়া দেন। এই উপলক্ষে নরিনা গ্রামের সহিত দেওয়ান তারাটিয়া গ্রামের সম্বন্ধ। দেওয়ান শাহনুর সাহেবের নাকি দুইটি কুমির (কুম্ভীর) ছিল। উহাদিগকে দেওয়ান সাহেব সোনামিএগ্রা ও বোচামিএগ্রা নামে ডাকিতেন। এই কুমির দুইটি দেওয়ান সাহেবের মৃত্যুর অনেক দিন পর পর্যন্ত ঐ গ্রামে নদীতে থাকিত ও দরকারবশত দেওয়ান সাহেবের বাড়ি পাহারা দিত। পরে তাঁহার বাড়িস্থ কোন চাকরানীর অত্যাচারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। দেওয়ান সাহেব কর্তৃক সোনামিএগ্রা, বোচামিএগ্রা প্রভৃতি নাম রাখা সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে, তাঁহাকে নবাগত পশ্চিমদেশীয় লোক বলিয়া বিশ্বাস করিতে সন্দেহ জন্মে। বাকি আল্লাহতালাই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। দেওয়ান সাহেবের সমাধিটি এখন নদীতে ভাঙিয়া লুপ্ত হইয়াছে।

নরিনা গ্রামে এখনও নাকি একখানা পাথর আছে। লোকেরা তথায় সিন্নি ও দুধ দিয়া থাকে। কথিত আছে, ঐ গ্রামে কোন কালে তাহারা সাত ভাই দরবেশ ছিলেন। কোন রাত্রিতে আকাশের দিকে ভয়ানক শব্দ হইতে থাকে। সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা করতালি প্রদান করিলে, ঐ শব্দ বন্ধ হয় ও আকাশ হইতে ঐ পাথরখানা ভূমিতে পতিত হয় ও অদ্যাপি বর্তমান আছে। সেখানে ঐ পাথর উপলক্ষে অদ্যাপি চৈত্রমাসে ২/৩ দিনের জন্য একটি মেলা লাগে।

১১. সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে রাণীগ্রাম নামে এক গ্রাম আছে। এই গ্রামের

রায়বংশ অতি প্রাচীন। তাহারা পূর্বে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। শ্রীযুত হরিচরণ বসু মহাশয় লিখিত বিবরণে জানা যায়, এই বংশে রাধারাম রায় নামে একজন প্রবল জমিদার ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবগণকে গ্রাহ্য করিতেন না ও নিরূপিত করপ্রদানে অসম্মত ছিলেন। বাকি করের হেতু নবাব সরকার তাহাকে ধৃত করিয়া মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ করেন। বড় বাজু পরগণাটি তাহার ছিল। মহাত্মা আবজাল মাহমুদ সাহেবের দ্বারা তিনি কারামুক্ত হইলে, এই বড়বাজু পরগণার অর্ধাংশ তাহাকে প্রদান করেন। কিন্তু আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই পরগণার মালিকের মধ্যে কেবল আবজাল মাহমুদ সাহেবের নামই লিখিত দেখা যায় বলিয়া, ময়মনসিংহের বিবরণ লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন। যাহা হউক, এই রাধারাম রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাহার বংশধরগণ ক্রমশ হীনবল হইয়া পড়িলে, তাহারা এই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে লাগিলেন এবং বাগবাটির রায় মহাশয়গণ ও খোক্‌শাবাড়ির সাহা চৌধুরী প্রভৃতি তালুকদারগণ এই সম্পত্তি ক্রয় করিয়া জমিদাররূপে গণ্য হইলেন।

জমিদারগণের মধ্যে বাগবাড়ির রায় মহাশয়গণের নাম দেওয়া নিতান্ত সঙ্গত ছিল। ভুলক্রমে তাহা ছুটিয়া গিয়াছে। তাহারা প্রসিদ্ধ জমিদার ও প্রজাবৎসল। একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুলও তাহাদের বাড়িতে বহুদিন যাবৎ আছে।

১২. সিরাজগঞ্জের মধ্যে ১. বি এল, ২. ভিক্টোরিয়া, ৩. বাগবাড়ি, ৪ উল্লাপাড়া, ৫. সলপ, ৬. শাহজাদপুর, ৭. পোতাজিয়া, ৮. পোরজনা, ৯. জামিরতা, ১০. স্থলবসন্তপুর, ১১. সোহাগপুর প্রভৃতি হাইস্কুল হিন্দু জমিদার ও বাবুগণ কর্তৃক পরিচালিত। ১২. একমাত্র চৌবাড়ি হাইস্কুলটি মুসলমান তালুকদার ও মুসলমান গরিব ভদ্রমণ্ডলী কর্তৃক নূতন স্থাপিত হইয়াছে।

১৩. সিরাজগঞ্জে জামে মসজিদ বা বড় মসজিদ বলিতে গেলে, ধানবান্ধী নদীর পশ্চিমপারে বড় বাজারের পার্শ্বে যে মসজিদটি বর্তমান আছে, তাহাকেই সাধারণত বুঝায়। এইটিও পাকা মসজিদ নয় ; কিন্তু টিনের ছাদ ও বেড়া যুক্ত এবং পাকা মেজবিশিষ্ট একটি প্রশস্ত মসজিদ। মোছল্লীগণের (উপাসক) প্রাচুর্য ও ঘরের সংকীর্ণতা বিবেচনায় স্থানীয় যত্নশীল লোকগণ ইহাকে বড় করিতে মনে করিয়া, সামনের দিকে ইষ্টক দ্বারা পাকা করিয়া বাড়াইতেছেন। এই বর্ধিত স্থানটি পাকা হইতেছে। এই বৃদ্ধি কাজটি সমাপ্ত হইলে, মোছল্লীগণের একটি অভাব দূরীভূত হইবে। মিরশকুর আলী সাহেব ইহার পূর্বতন খাদেম। বর্তমানে মুন্সি জয়নুদ্দীন তালুকদার সাহেব ইহার জন্য বিশেষ যত্ন নিতেছেন। সুতরাং তিনিও প্রশংসার পাত্র।

১৪. পূর্বে "দেশহিতৈষিণী" নামে একখানা সংবাদপত্র সিরাজগঞ্জ হইতে বাহির হইত। ঐ পত্রিকা কয়েক বৎসর মাত্র বর্তমান থাকিয়া ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। অধুনা কোন সংবাদপত্রিকা এখান হইতে বাহির হয় না।

১৫. এখানে মুসলমান ছাত্রাবাস বা বোর্ডিং হাউস না থাকাতে মুসলমান ছাত্রগণের অনেক অসুবিধা হয়। এই বিবেচনা করিয়া বিগত কয়েক মাস হইতে বি এল হাইস্কুলে ইহারও বন্দোবস্ত হইয়াছে। ৫/৬টি ছাত্র এখন ঐ বোর্ডিং-এ আছে। আগামীতে ইহার জন্য গৃহাদি প্রস্তুত হইয়া যথোচিত সুবিধাজনক হইবে আশা করি।

সমাগত বিদেশিয় মুসলমান, ভদ্রমণ্ডলীর জন্যও এরূপ একটি স্থান হওয়া কর্তব্য। সাধারণ হোটেল ভদ্রলোকের স্থান নয় ; আবার ডাকবাঙলাও সকলের পক্ষে সাজে না। এই অসুবিধার প্রতিকারের চেষ্টা অনেক বড় বড় স্থানেও তত দেখা যায় না। আজকাল বিদেশিয় কোন ভদ্রলোক সিরাজগঞ্জে আসিলে, প্রায় সমাজসেবক বিখ্যাত মোক্তার মৌলবি, আফ্‌জল আলী খাঁ সাহেবের বাসায় অথবা পূর্বপ্রশংসিত মুন্সি মেহেরউল্লা সাহেব ইসলাম প্রচারকের বাড়িতে

স্থান পাইয়া থাকেন। প্রশংসিত মৌলবি আফজল আলি খাঁ মোক্তার সাহেবের ন্যায় উদার হৃদয় ব্যক্তি বাস্তবিকই প্রশংসার পাত্র। নিজ শরীর ও পকেটের পয়সা খরচ করিয়া সমাজের সেবা করিতে তাঁহার মত লোক কম দেখা যায়। সিরাজগঞ্জে মুসলমানগণের মধ্যে এরূপ অন্যতম প্রশংসাভ.জন লোক মৌলবি মতিওর রহমান সাহেব। ইনি সিরাজগঞ্জ থানার ম্যারেজ রেজিস্টার ও অনারেরি ম্যাজিস্ট্রেট। সমাজসেবা তাঁহার প্রধান গুণ।

নিজ কথা—ভূমিকাতেই আমি পূর্বে নিবেদন করিয়াছি যে, সিরাজগঞ্জে দোষ ও গুণ যাহা দেখিলাম ও পাইলাম, তাহা এই উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিতেছি, যাহাতে ক্রমশ দোষগুলি সংশোধিত হইবে ও গুণগুলি আদর্শরূপ হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আচার ব্যবহারের বর্ণনাতে আমি আমার মুসলমান ভ্রাতাগণকে কিছু তীব্র রূপে আক্রমণ করিয়াছি। ইহা দেখিয়া হয়ত তাহারা আমাকে তীব্রতর রূপে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু আমি বলিতেছি, আমার উদ্দেশ্য সৎ এবং স্বীকারও করিতেছি যে আমার লিপি কিছু তীব্র হইয়াছে। হইতে পারে বর্ণিত দোষগুলির অনেকগুলি তাহারা স্বাস্থ্যের বা পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য করিয়া অথবা মিতব্যয়িতার খাতিরে পালন করিতেছেন। যেহেতু মুসলমানপ্রধান স্থানাদিতে ঐ সমস্ত রূপ প্রচলন নাই ; এজন্য আমি ঐগুলিকে দোষের মধ্যে গণ্য করিয়াছি। দ্বিতীয়ত ঐ সমুদয়ের প্রচলন ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। অধুনা কেবল ইতরগণের মধ্যেই ঐ সকলের প্রচলন দেখা যায়।

এদেশীয় মুসলমানগণ এ বিষয়ের জন্য বিশেষরূপ প্রশংসাভাজন যে, মুসলমান ছাত্রগণকে জায়গির প্রদানে ও তাহাদের আহার যোগানে ইহারা যেরূপ উদারতা প্রকাশ করেন, অন্যান্য স্থানে এত দেখা যায় না। সিরাজগঞ্জ টাউনের মাদ্রাসা, হাইস্কুল ও মধ্য ইংরেজি স্কুলের মুসলমান ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন জায়গিরে থাকিয়া পড়িতেছে। এতগুলি ছাত্রকে জায়গির দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। এই জায়গিরদাতাগণের কেহ কেহ এরূপও আছে যে, নিজে মজুরী করিয়া দিনপাত করিতেছে অথচ ছাত্র জায়গির দিতে পরাঙ্মুখ নয়। বিশেষ উদারতা!!!

উদার হৃদয় পাঠকগণ! আমার এই লিপিকাতে দোষ দেখিলে ক্ষমা করিবেন এবং ভুল থাকিলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হইতে পারে মত অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন ; এই আশার উপর প্রথম সংস্করণ আজ সমাপ্ত করিলাম।

নিম্নলিখিত গানটি ১৩২১ বা ১৮ ভাদ্র তারিখের ইসলাম রবি পত্রিকাতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

পাটের গান

ওরে আমার সাধের পাট।
তুমি ছেয়ে আছ বাঙ্গালা মুলুক, বাঙ্গালা দেশের মাঠ।
যে দেশে যেখানে যাই, সেথায় তোমায় দেখতে পাই,
গ্রামে গ্রামে আফিস তোমার, পাড়ায় পাড়ায় হাট।
ধান ফেলিয়ে তোমায় বোনে,
বাধা নিষেধ নাহি শুনে,
ছালায় ছালায় টাকা গোনে, চাষার বাড়ছে ঠাট।
যার ছিল না ছনের কুঁড়ে
তাহার এখন বাড়ি যুড়ে,
চৌচালা আট চালা কত ঝিলমিলি কপাট।

তোমার হ'লে অল্প ফলন,
কঠিন বড় খাজানা চলন,
রাজা প্রজা সবের দলন, বিষম বিভ্রাট।
সার্ভিয়া অস্ট্রিয়ার লড়াই,
আমরা নাহি তারে ডরাই,
তোমার হ'ল খরিদ বন্ধ, তাইতে "গৌরাঙ্গ" কাঠ।
মহাজন দেয় না টাকা,
কিসে যায় আর বেঁচে থাকা,
পঞ্জাবে, মান্দ্রাজে আকাল, বাঙ্গালা গুজরাট।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস (সৌরভ)

তথ্যসূত্র

১. *একসময়ে ব্রহ্মপুত্র এক সুবিশাল নদ ছিল। মুসলমান রাজত্ব সময়ে ইহার প্রশস্ততা স্থানে স্থানে ৮/১০ মাইলেরও অধিক ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিক মুন্সি মেনহাজুদ্দিন সাহেব লিখিয়াছেন, তৎকালে (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার তিনগুণ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যমুনার উৎপত্তি হইয়া গতির পরিবর্তন হওয়ায়, প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র তাহার সে বিশালত্ব হারাইয়াছে। ১৮৭৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে গভর্নমেন্ট একবার ওভার্সিয়ার নিযুক্ত করিয়া, ব্রহ্মপুত্রের সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল, বিশেষ ফল কিছু হয় নাই। অশোকাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র তীর্থরাজ বলিয়া আখ্যাত হয়, সেই দিনের ব্রহ্মপুত্র স্নান হিন্দুর একটি পরম পবিত্র কার্য। "ময়মনসিংহের বিবরণ"*

২. *মুসলমানগণ হইতে বহু শত বৎসর পূর্বে হিন্দুগণ রাজত্ব হারাইয়াও কেন যে মুসলমানগণ সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও হিন্দুগণ জমিদার হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ইহার কারণ পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিয়া লইবেন।*

৩. *Vide Nrishingha Ch Mukherjee's book of Zamındari accounts.*

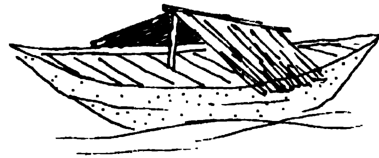
৪. *শুনা যায়, ঈশানবাবুকে বিদ্রোহী দল তাহাদের রাজা মনোনীত করিয়া ছিল। ঈশানবাবু তাহাদের রাজা হইয়া দস্তুরমত মন্ত্রী শান্ত্রি প্রভৃতি রাখিয়াছিলেন।*

সংযোজন

সূত্র

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার ঃ পাবনা ১৯৯০
লোকসাহিত্য ২য় খণ্ড---আশরফ সিদ্দিকী
বাংলার লোকসাহিত্য—আশুতোষ ভট্টাচার্য
লোকসঙ্গীত রত্নাকর---আশুতোষ ভট্টাচার্য
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র—৪র্থ খণ্ড—বিনয় ঘোষ
সংবাদ প্রভাকর ঃ ১২৬১
সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ - স্বপন বসু
Statistical Account of Bengal—W. W Hunter
উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িকপত্র—১-৯ খণ্ড মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত

সংযোজন



সাধারণ বিবরণ ঃ

পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত উপজেলা সমূহের আয়তন ও জনসংখ্যা ঃ ১৯৮১

জেলার নাম	উপজেলার নাম	আয়তন বর্গ মাইল	জনসংখ্যা
পাবনা জেলা	১. পাবনা সদর	১৪৫	৩,৪৫,৬৫০
	২. চাটমোহর	১৪৩	২,১২,৫৫১
	৩. ঈশ্বরদি	১০৪	২,১১,৪৮০
	৪. আটঘরিয়া	৭২	১,০৪,১৫১
	৫. বেরা	১০৩	১,৬২,৫২১
	৬. সুজানগর	১৩৫	১,৭৮,৫৯১
	৭. ফরিদপুর	৮৩	১,২৫,৬৯৫
	৮. সাথিয়া	১২৮	২,১১,৮৭৪
সিরাজগঞ্জ জেলা	১. সিরাজগঞ্জ সদর	১২৬	৩,৩৯,৭৩০
	২. শাহজাদপুর	১২৫	৩,৩৭,৮১৬
	৩. উল্লাপাড়া	১৬০	৩,১০,৯৪৫
	৪. চৌহালি	৯৪	১,০৭,১৪৯
	৫. কাজিপুর	১৪৩	২,১২,৮১০
	৬. বিলকুচি	৬৩	১,৮৫,৯৩৯
	৭. রায়গঞ্জ	১০৩	১,৮০,৫৯৩
	৮. কামারখন্দ	৩৬	৮৫,৪১৪
	৯. তারাস	১১৬	১,০৫,৪৬২

নদনদী ঃ

অতীতের মত এখনও পাবনার অন্যতম দুটি নদী—পদ্মা এবং যমুনা। পদ্মা হল গঙ্গা এবং যমুনা হল ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ। সারা বছর দুটি নদীই নাব্য—বড় বড় নৌকা ও স্টিমার যাতায়াত করতে পারে। এ দুটি নদী ছাড়াও বরাল ও হুরাসাগর নদী পথে ৪ টন ওজনের নৌকা চলাচল করে সারা বছর। বেশ কিছু নদী জেলার অভ্যন্তরে ছড়িয়ে আছে। এইসব নদী বর্ষায় এখন জলে ভরে ওঠে তখন সহজেই নৌকায় যাতায়াত করা যায়। অবশ্য বেশিরভাগ নদীই হল পদ্মা ও যমুনার শাখা প্রশাখা। জেলার অভ্যন্তরভাগের ছোট ছোট নদী বর্ষাকালেই মাত্র জলপূর্ণ থাকে। অন্য সময় শুকিয়ে যায়।

পদ্মা ঃ

ডব্‌লু ডব্‌লু হান্টার এই জেলার নদী সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ "The Padma or Ganges forms a portion of the western, and the whole of the southeren boundary of

Pabna. Its courses within south-east of Pabna town. The river Ichhamatti issues from the Padma, and after passing the Civil Station, flows through he District by a tortuous route and joins the Harasagar, a short distance south of the river Baral. During the rains, the Ichhamati is a wide and beautiful river, but for eight months in the year it is little more than a dry sandy bed ; the length of its course is 32 miles."

আর এই পদ্মা সম্পর্কে সাম্প্রতিক বিবরণে উল্লেখ আছে ঃ "পদ্মা অনেক প্রশস্ত নদী। নতুন নতুন জেগে ওঠা চর বালিয়াড়ির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে পদ্মা প্রবাহিত হয় বর্ষাকালে পদ্মা নদীর স্রোত এত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় যে এর প্রতিকূল লঞ্চ বা স্টিমার সহজে অগ্রসর হতে পারে না। পূর্বে এ নদী বৎসরের সকল সময়েই নাব্য থাকত। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে এখন শুষ্ক মৌসুমে পদ্মা নদী প্রায় শুকিয়ে যায়। তখন নদীতে সামান্য জল থাকলেও কোন স্রোতধারা থাকে না। সে সময়ে নদীর বুকে বড় বড় বালিয়াড়ি জেগে ওঠে। বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে পদ্মা নদীতে লঞ্চ ও স্টিমার চলতে পারে না। পাকশির নিকটে পদ্মা নদীর উপরে হার্ডিঞ্জ সেতু রয়েছে। এই সেতুর উপর দিয়ে রেলগাড়ি চলাচল করে।" *(পাবনা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯০। পৃঃ ৪)*

রবীন্দ্রনাথের ১৮৯৪ সালের ১৫ জুলাই লেখা একটি চিঠিতে আছে ঃ "স্টিমার যখন ইছামতী থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পদ্মার মধ্যে এসে পড়ল তখন যে কী সুন্দর শোভা দেখেছিলুম সে আর কী বলব। কোথাও কোনো কূল কিনারা দেখা যাচ্ছে না—ঢেউ নেই, সমস্ত প্রশান্ত গম্ভীর পরিপূর্ণ। ইচ্ছা করলে যে এখনই প্রলয় করে দিতে পারে সে যখন তার প্রকাণ্ড সুন্দর প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করে, সে যখন তার প্রকাণ্ড প্রবল ক্ষমতাকে সৌম্য মাধুর্যে প্রচ্ছন্ন করে রেখে দেয়, তখন তার সৌন্দর্য এবং মহিমা একত্র মিশে একটি চমৎকার উদার সম্পূর্ণতা ধারণ করে। ক্রমে যখন গোধূলি ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র উঠল তখন আমার মুগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত তারগুলো যেন বেজে উঠতে লাগলো।"

যমুনা ঃ

হান্টার লিখেছেন ঃ The river Jamuna forms the whole eastern boundary of the District (32 miles in length), separating Pabna from the districts of Maimansingh and Dacca. Its principal branch within Pabna District is the Harasagar. The Baral and the Karatoya or Phuljhur are both branches of the Harasagar : the length of the course of the former in this District is 22 miles ; of the latter 16 miles. The jounction of the Karatoya and the Harasagar is about fifteen miles north of the point where the latter river is joined by the Baral. *(S. A. Bengal Vol. IX P. 271-72)*

হান্টার যমুনার যে প্রবাহিত রেখা দেখেছিলেন, বর্তমানে সেই পথ পরিবর্তিত। বর্তমান জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়, জেলার পূর্ব দিকে এই নদীপথ ৮০ মাইল সীমান্ত রচনা করেছে ময়মনসিংহ, টাংগাইল এবং ঢাকার সঙ্গে। আগে যে জেনাই ও কোনাই নামে দুটি ছোট নদী ছিল, সে পথেই বর্তমান যমুনা প্রবাহিত। ১৭৮৭ সালের বন্যার সময়ে ব্রহ্মপুত্রের ধারা পূর্বখাত ত্যাগ করে জেনাই নদী পথে প্রবাহিত হতে থাকে। আবার তিস্তা নদীর প্রবাহ এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় যমুনা পরিণত হয়েছে বিশাল নদীতে। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব প্রবাহ নদী রেখাকে বলা হয় আদি ব্রহ্মপুত্র। এটি এখন মরা নদী। একমাত্র বর্ষাকালেই নৌকা চলাচল করতে পারে। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই পলি জমে উঁচু হয়ে যায়। ফলে নদী জলরাশি পশ্চিমে নবধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। গভীরতা ও প্রশস্ততায় যমুনা এখন বৃহৎ

নদীতে পরিণত। বর্ষায় এই নদী কোথাও কোথাও ৫ থেকে ৮ মাইল প্রশস্ত। শুকনোর সময় প্রশস্ততা থাকে ২ থেকে ৩ মাইল। এই গুরুত্বপূর্ণ নদী পথে সারা বছর ধরে মালবাহী নৌকা, যাত্রীবাহী স্টিমার চলাচল করে।

ধানবন্দ নদী ঃ

যমুনার একটি শাখানদীর নাম ধানবন্দ। সিরাজগঞ্জ শহরের ৬ মাইল উত্তরে সনছলিয়ার কাছে উৎপন্ন হয়ে শহরের পাশ দিয়ে এগিয়ে মাওজুরার কাছে হুরাসাগর নদীতে পতিত হয়। এই নদীর ওপর আছে ১৮৯২ সালে তৈরি ইলিয়ট সেতু। সেতুটি ১২০ ফুট চওড়া। নদীটি সম্পূর্ণই মৃতপ্রায়। কোথাও কোথাও নদী খাতের চিহ্নমাত্র নেই।

কাজিপুর নদী ঃ

জেলার উত্তরে যুমনার এই শাখা নদী কাজিপুর থানা সদর পার্শ্বদেশ হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। সিরাজগঞ্জে-ইছামতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিরাজগঞ্জের এই ইছামতী আর পাবনা সদরের ইছামতী দুটি স্বতন্ত্র নদী রেখা। বগুড়া জেলার ধূনট থানা পেরিয়ে সিরাজগঞ্জ মহকুমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নলকাশেমগঞ্জ নামক ব্যবসাকেন্দ্রের কাছে মিশেছে করতোয়ায়।

একটা কাটাখাল আছে সিরাজগঞ্জে। জনৈক নীলকর সাহেব খালটি খনন করেছিলেন নীল চাষ, শোধন ও পরিবহনের জন্য। খালটিতে বর্ষাকালেই কেবল এখন নৌকা চলাচল করে।

ইছামতী ঃ

পাবনা শহরের দক্ষিণে পদ্মা থেকে বেরিয়ে শহরের মাঝামাঝি স্থান থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। শহরের বিভক্ত, এই দুই অংশে যাতায়াতের জন্য রয়েছে কয়েকটি ব্রিজ। নদী প্রবাহ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের পূর্ব দিয়ে এঁকেবেঁকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে আতাইকুলার কাছে উত্তর দিকে প্রায় অর্ধবৃত্তাকার বাঁক নিয়ে হুরাসাগরে পড়েছে। বেড়া বাস স্ট্যান্ডের কাছে নদীর ওপর একটি কংক্রিটের ব্রিজ রয়েছে।

পাবনা শহরের দক্ষিণে এবং বেড়া পুলিশ স্টেশনের কাছে ইছামতীর দুই মুখে দুটি আড়াআড়ি বাঁধ দেওয়ায় নদীতে কোন সচল প্রবাহ নেই। অবরুদ্ধ জল সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়। নদীটিকে এখন বলে ইছামতী খাল। বেড়া পাম্পিং স্টেশন থেকে সেচের জল ছাড়া হয়।

নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ মাইল।

ইছামতীর রমণীয় রূপে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৪ সালে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "ইছামতীর ভিতরে ঢোকা গেল। কী সুন্দর উজ্জ্বল দিনটি হয়েছিল! ছোটো নদীটির দুই ধারের দৃশ্য দেখে চোখ ফেরানো যায় না। আকাশে মেঘ প্রায় নেই—নদীর ধারের বনগুলি এবং গাঢ় সবুজ শস্যক্ষেত্র রৌদ্রে প্রফুল্ল হয়ে রয়েছে, বাতাসটি বেশ মিষ্টি লাগছে—বিছানার উপরে জানালার কাছে গোটা পাঁচ-ছয় বালিশ উঁচু করে রাজার মতো আরামে বসে রইলুম, চোখের উপরে কে যেন স্বপ্ন মাখিয়ে দিয়েছে—জেলেরা মাছ ধরছে, মেয়েরা কাপড় কাচছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়ে তোলপাড় করছে, গোরুগুলো চরছে, জলমগ্ন ধানের ক্ষেতে বক বসে রয়েছে, সমস্ত ছবির মতো দেখাচ্ছে।..." *ছিন্নপত্রাবলী। পৃঃ ২০৩*

হান্টার লিখেছেন ঃ "At the village of Dogachhi, about seven miles south-east of Pabna town, the Ichhamati issues from Padma, and after passing the Civil Station, flows through the District by a tortuous route and joins the Harsagar, a short distance south of the river Baral. During the rains, the Ichhamati is a wide and beautiful river, but for eight months in the year it is

little more than a dry sandybed ; the length of its course is 32 miles." *(S. A. Bengal. Vol. IX. P. 271)*

করতোয়া-আত্রাই-গুর-গুমানি-হুরাসাগর ঃ

তিস্তার শাখানদী ছিল করতোয়া-পুনর্ভবা-আত্রাই। এইসব শাখা নদী দিয়ে তিস্তার জল পড়ত গঙ্গায়। ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পের পর তিস্তা পুরনো প্রবাহ থেকে বর্তমান প্রবাহপথে সরে আসে। তিস্তার মূল প্রবাহ সরে যাওয়ায় শাখা নদীগুলি মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। বর্তমানে করতোয়ার সঙ্গে তিস্তার কোন সম্পর্কই নেই। মূল প্রবাহ আসে উত্তরাঞ্চলের ক্যাচমেন্ট এলাকা থেকে।

করতোয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে পঞ্চগড় জেলার ভিতরগড়ের কাছে। তারপর আত্রাই নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে সমঝিয়া ঘাটের কাছে আবার ভারতীয় এলাকায় ঢুকেছে। ভারতের মধ্যে ২৪ মাইল পথ পেরিয়ে নওগাঁ জেলার ধামুরহাট দেওয়ানপুরের কাছে বাংলাদেশে ঢুকে রসুলপুরের কাছে যমুনায় মিশেছে। এই যমুনা ব্রহ্মপুত্রের শাখা নয়।

আত্রাই রাজশাহী জেলা থেকে বেরিয়ে প্রবেশ করেছে পাবনা জেলায়। ভাটির দক্ষিণ পূর্ব দিক দিয়ে এসে প্রথমে যমুনায় মিশেছে, তারপর চলনবিলে পড়েছে। নন্দকুঁজা নদীর সঙ্গে আত্রাই নদীর জলরেখা মিলিত হওয়ার পর আত্রাই-এর নাম হয়েছে গুমানি নদী। চলনবিল থেকে বেরিয়ে ছাইখোলা ও নাঙ্গলমোরা গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তারপর প্রবাহিত গুমানি চাটমোহর থানা সদরের পূর্বদিকে নুরনগর গ্রামের কাছে মিশেছে বরাল নদীতে। নদীটি এখানে বরাল নামেই পরিচিত। এবার নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৩০ মাইল প্রবাহিত হয়ে শাহজাদপুর থানার মোয়াকোলা গ্রাম পেরিয়ে হুরাসাগর নদীতে মিশে বেরা থনার আরালিয়া গ্রামের কাছে পড়েছে যমুনা নদীতে। "সাধারণভাবে আত্রাই-গুমানি-বরাল-হুরাসাগর নামক এই ধারাটিকে আত্রাই নদী বলা হলেও বিভিন্ন এলাকায় নদীগুলি নিজ নিজ নামেই পরিচিত। একসময়ে আত্রাই নদী চলন বিল অতিক্রম করার পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রতনগঞ্জের নিকটে পদ্মার সাথে মিলিত হত। আত্রাই নদীর পূর্বখাতের মাঝামাঝি অংশকে বরাল নদী গ্রাস করেছে। তাছাড়া ইছামতী নদী পাবনা সদরের দিক থেকে এসে আত্রাই নদীর এই খাতকে বোয়ালমারির কাছে দ্বিখণ্ডিত করে প্রবাহিত হয়। ফলে বরালও ইছামতী নদীর বিপুল পলিজ অবক্ষেপনে আত্রাই নদীর এই খাত ভরাট হয়ে পড়ে। বোয়ালমারির পর থেকে পূর্ব আত্রাইয়ের দক্ষিণাংশকে এখনও বেরা থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। জেলার নদ-নদীর গতি পরিবর্তনের একটি সুন্দর উদাহরণ হচ্ছে এই নদী।"

(ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার—১৯৯০। পৃঃ ৫)

আত্রাই অতীতে ছিল উত্তর বাংলার অন্যতম নদী। এই নদী পথে তিস্তার জল গিয়ে পড়ত পদ্মায়। কিন্তু ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের বন্যার পর তিস্তার পদ্মামুখীন ধারাপথ পরিবর্তিত হয়ে মিলিত হয় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। সেই সময় থেকে আত্রাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

করতোয়াকে ফুলঝুর নদীও বলে। নদীটির জন্মস্থান জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর পশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুরের এক জলাভূমি। সেখান থেকে প্রবাহিত ধারা বগুড়া জেলায় ঢুকে হালহালিয়া নদীর সঙ্গে মিশেছে। তারপর নাম হয়েছে ফুলঝুর। এবার করতোয়া বা ফুলঝুর বগুড়ার চান্দাইকোণা পেরিয়ে ঢুকেছে পাবনা জেলায়। রায়গঞ্জ ও সুজাপুরের দক্ষিণ দিকে নালকারের কাছে সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ইছামতীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর ৪০ মাইল পথ পেরিয়ে উল্লাপাড়া গ্রামের দক্ষিণ দিকে নারনিয়া নামক স্থানে হুরাসাগরে মিশেছে।

করতোয়া পবিত্র প্রাচীন নদী। অতীতে এই নদী ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। সে সময়ে এই নদীর বিপরীতে ছিল কামরূপ রাজ্য। ১৭৮৭ সালের বন্যার আগে এই

নদীপথে তিস্তার জল আত্রাই ও গঙ্গা নদী খাতে পড়ত। কিন্তু ভয়াবহ ঐ বন্যার পর তিস্তার ধারা পূর্ব দিকে সরে যাওয়ায়, করতোয়া ফুলঝুর নদী পলি জমে যেতে থাকায়, নদীর গুরুত্ব হ্রাস পায়। পাবনা সদরের ৩০ মাইল পূর্ব দিকে বুড়ি তিস্তা বা করতোয়া নামে একটি নদী মিশেছে বরাল নদীতে। পুরনো করতোয়ার একটি সংকীর্ণ প্রবাহপথ চাটমোহর থানায় অষ্ট মনীষার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। কিন্তু বর্তমানে তা বরাল নদীর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গেছে।

বহু নদীর সম্মিলিত স্রোত ধারা হুরাসাগর বর্তমানে জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদীপথ। সিরাজগঞ্জ হল উৎপত্তিস্থল। যমুনা নদী থেকে বেরিয়ে কামারকান্দি ও বেলকুচি থানার ওপর দিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে শাহজাদপুর থানার নারিন্দার কাছে ফুলঝুর নদীতে মিলিত হয়েছে। শাহজাদপুর থেকে বেরিয়ে আসার সময় মিলিত হয়েছে বরাল নদীর সঙ্গে। তারপর প্রথমে দক্ষিণ, তারপর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে বেরা থানা সদরের কাছে ইছামতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মিলিত স্রোত ধারাই হুরাসাগর নামে পরিচিত। হুরাসাগর নদী যমুনায় মিলিত হয়েছে বেরা থানার কিছু দূরে।

পাবনা জেলার বাঘাবাড়ির কাছে বামদিক থেকে গোহাল নদী এসে পড়েছে গুমানিতে। মিলিত প্রবাহের নাম হয়েছে হুবাসাগর। বেড়া পুলিশ স্টেশনের কাছে ডান দিক থেকে এসে ইছামতী পড়েছে হুরাসাগরে—তারপর সেই প্রবাহ পড়েছে ব্রহ্মপুত্র-যমুনায়। বর্তমানে ইছামতী জলপ্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বাঁধ দিয়ে। শুকনো সময়ে বাঘাবাড়ির কাছ গুমানি ও গোহালা নদীর মাঝখানে একটি চর জেগে ওঠে। আবার বর্ষায় চলে যায় জলের নিচে।

বাঘাবাড়িতে নদীর ওপর তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম ব্রিজ—বরাল ব্রিজ। ১৯৮০ সালে উদ্বোধন হয় ব্রিজের। দৈর্ঘ্য ৫৭২ মিঃ ১৮৭৫ ফুট। ব্রিজের নকশা দেশিয় ইঞ্জিনিয়ারদের।

বাঘাবাড়ি থেকে ভাটির দিকে বেড়া বাজারের কাছে উত্তর পশ্চিমে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম সেচ প্রকল্প। হুরাসাগরের জল গিয়ে ইছামতী নদী বা খালে ফেলে, সেই জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া বর্ষার জল হুরাসাগর পথে প্রবাহিত করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

তবে, নদীতে জলের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

বরাল নদী ঃ

জেলায় বরাল নদীর দৈর্ঘ্য ৩৫ মাইল। রাজশাহী জেলার চারঘাটের কাছে পদ্মা নদী থেকে বেরিয়েছে বরাল। আত্রাই নদীর জল গুমানি নদীপথে এসে পড়েছে বরাল নদীতে। সদর মহকুমার উত্তরে চাটমোহর থানা সদরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বরাল শাহজাদপুরের দক্ষিণে পড়েছে হুরাসাগর নদীতে। ঠিক একই জায়গায় হুরাসাগরে পড়েছে সিরাজগঞ্জ মহকুমার ইছামতী। সম্মিলিত স্রোত সদর ও সিরাজগঞ্জেই মহকুমার মধ্যে সীমান্ত হিসাবে প্রবাহিত। শাহজাদপুরের দক্ষিণে রাউটিয়ার কাছে গোহালা নদী এবং শকতলা গ্রামের পাশে কাকিয়ান নদী মিশেছে বরাল নদীতে।

চিকনী নদী ঃ

এক সময় এই নদীর মাছ রপ্তানি হত বিভিন্ন স্থানে। চাটমোহরের পশ্চিমের বিল থেকে উৎপন্ন হয় দক্ষিণ দিকে কদমতলী পৌঁছে তারপর ফরিদপুর থানার মঙ্গলগ্রামের উত্তর-পূর্ব দিকে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিশেছে বরাল নদীতে। বর্ষায় নদী জলে ভরে গেলেও, শুকনোর মরশুমে জল একেবারে কমে যায়। সেখানে মাছের চাষ হয়।

পাবনা জেলার বৃহৎ নদীগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য নদীকূলের ভাঙাগড়া, নদীখাতের বারবার পরিবর্তন। একসময়ের বেশ কিছু খরস্রোতা নদী কোথাও সংকীর্ণ মৃতপ্রায়, কোথাও

বা নিশ্চিহ্ন। উনিশ শতকের শেষে হান্টারের বিবরণে আছে ঃ "Alluvion and Diluvion are constantly taking place along the course of the principal rivers of the district. The collection reports that a remarkable instant of the latter process occured the estate of the Balrampur and annexed to the estates of Bharara and Dogachhi, The change in the course of the Padma, which formerly flowed close to the town of Pabna, but is now (1876) about four miles distant, may also be regarded as a remarkable instance of fluvial change. Old beds of large rivers abound throughout the District. Some are dry in the rains, in others, werre remains throughout the year." *(SA. Bengal Vol-IX. p 272)*

ভাঙাগড়ায় পদ্মা যমুনা অতুলনীয়। কতবার যে এদের গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। নদী সহজ সরলরেখায় কখনও প্রবাহিত হয় না। তার পথ আঁকাবাঁকা হওয়ায়, এক তীরে যেমন প্রচণ্ড আঘাত সৃষ্টি হয়, অপর দিকে থাকে প্রশান্ত। একদিকে পলি জমতে থাকে, অপর দিকে চলে ভাঙন। কিছুদুর এইভাবে এগোবার পর নদীটি হয়ত বিপরীত চেহারা পায়। বারবার ভাঙাগড়ায় নদীর বুকে চর গড়ে ওঠে। আবার গাছপালা মাটিসহ চরটি হয়ত নদীর বুকে হারিয়ে যায় একসময়। নদীপারের জীবনধারায় নদীর ভাঙাগড়া সব সময়ই পরিবর্তিত ঘটায়। বিশেষ করে নদী প্রধান অঞ্চলে এই পরিবর্তন সহজেই ধরা যায়।

জেলা গেজেটিয়ারে ১৮৮১ থেকে ১৮৯১ সালের ব্যাপক নদী রেখা পরিবর্তনের বিবরণ আছে। সে সময়ে গঙ্গা নদী পাবনা শহরের পূর্ব-পশ্চিম দিকে প্রায় ১৬ মাইল পাড় ভেঙে উত্তর দিকে এগিয়ে যায়। পাবনা শহরের ৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গোগাছি গ্রাম থেকে উৎপন্ন ইছামতী নদীর উৎস স্থল পাবনা শহরের ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বাজিতপুরে সরে যাওয়ার ফলে ৮ হাজার মানুষ অধ্যুষিত বেরা থানার কয়েকটি গ্রাম নদী গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আত্রাই নদী পূব দিকে যে সব এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই সব এলাকা পদ্মার ভাঙনের কবলে পড়ায় আত্রাই নদীর জলরাশি সরাসরি এসে পড়তে থাকে পদ্মায়। এই গতিপথ পরিবর্তনের ফল ছিল যথারীতি মারাত্মক। পদ্মার তীর ভেঙে যাওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ বালি ছড়িয়ে পড়ে। ফসল উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কয়েকটি অঞ্চলে কমে যায়। ১৮৯০-৯১ সালে এরকম অবস্থায় পড়ে ছিল পাবনা, সাথিয়া, সুজানগর এবং বেরা থানার বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র। ১৮৯১-১৯০০ সালের মধ্যে বেরা থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভাঙতে থাকে। বিপরীত দিকে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাংগাইলের দিকে নতুন নতুন ভূভাগ সৃষ্টি হতে থাকে। শাহজাদপুর ও সিরাজগঞ্জের বিস্তৃত এলাকায় বড় বড় চরের সৃষ্টি হয়। এইসব চরের মাটি ক্রমশ শক্ত হয়ে যায় ও গাছপালা জন্মায়। মানুষের বসতি গড়ে ওঠে। চাষাবাদ শুরু হয়। পদ্মার ভাঙনের কবলে সাথিয়া এবং সুজানগর থানার বিস্তৃত এলাকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পদ্মায় বারবার বিপন্ন হয়েছে পাবনা শহর। শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা ও শহরের মধ্যে দূরত্ব ১৮৭৬ সালে ছিল ৪ মাইল, যা ১৯৮০ সালে হয় ১ মাইল। কিন্তু পরে এই দূরত্ব আরো বেড়ে যাওয়ায় শহরটি বিপদগ্রস্ত হয়নি।

কেবল পদ্মা নয়, যমুনাও বারবার বিপন্ন করেছে সিরাজগঞ্জ শহরকে। শহরের পশ্চিম দিকের পাড় ১৮৪৮ সালে ভাঙতে ভাঙতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, শহরকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। সে সময়ে বাঁধ দিয়ে শহরটি রক্ষা করা হয়েছিল। পরে ঐ বাঁধের কাছে যে বড় চরটি গড়ে ওঠে, তা আবার ১৯৬৩ সাল নাগাদ ভাঙতে থাকে। সিরাজগঞ্জ শহরকে রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ ও তদারকির কাজ অব্যাহত রয়েছে।

একসময় সিরাজগঞ্জ স্টিমার ঘাটটি চরা পড়ে বিপন্ন হওয়ায় ঘাটটিকে পূব দিকে সরিয়েও নেওয়া হয়।

বিল ও জলাভূমি ঃ

নদীখাত পরিবর্তনের পর পুরনো নদীখাত এবং নিম্নাঞ্চল বর্ষার সময়ে বিলের আকার বা বিস্তৃত জলাশয়ের রূপ পায়। আয়তন ও গভীরতার দিক দিয়ে বিলগুলির মধ্যে তারতম্য আছে। কতকগুলি বেশ গভীর। কতকগুলি অগভীর। অগভীর জলাশয়গুলি কখনও কখনও জলজ গুল্মে ভরে যায়। বিলগুলি জলে ভরে থাকে। মাঝে মাঝে দেখা যায় জলজ উদ্ভিদ। কোথাও পদ্মফুল ফোটে। অনেক সময় জলাশয়কে হ্রদের মত দেখায়।

হান্টার উনিশ শতকের শেষে তিনটি স্থায়ী বিলের উল্লেখ করেছিলেন---বড় বিল (১২ বর্গ মাইল), সোনাপাতিলা বিল (৬ বর্গ মাইল) এবং ঘুঘুদহ বিল (৪ বর্গ মাইল)। এইসব জলাশয় মাছ আর বুনো হাঁসে ভর্তি থাকত। এক ধরনের ফল এখানে জন্মাত, যা দেশিয় লোকদের ছিল খুব পছন্দ। এইসব জলাশয়ের পাশে নিচু জমিতে প্রচুর পরিমাণ ধান জন্মায়। হান্টার বলেছেন এই তিনটি জলাশয় ছাড়াও অসংখ্য ছোট ছোট জলাশয় আছে, যা ছোটখাট বিল থেকে কিছুটা বড়।

আধুনিক জেলা গেজেটিয়ারে (১৯৯০) উল্লিখিত বিলগুলি হল ঃ

১. চলনবিল—সব থেকে বড় বিল—৩৪০ বর্গ মাইল
২. পানজা বিল—৮ বর্গ মাইল
৩. বেরা বিল—১২ বর্গ মাইল
৪ সোনাপাতিলা বিল—১৪ বর্গ মাইল
৫ কুড়ালিয়া বিল—
৬. দিকশি বিল—১৫ বর্গ মাইল
ছোট বিল—
৭. ঘুঘুদহ বিল—৪ বর্গ মাইল
৮. চিরল বিল--৮ বর্গ মাইল
৯. সুরকা বিল—৮ বর্গ মাইল

জেলার সব থেকে বড় বিল চলনবিল হল চাটমোহর, তাড়াস, রায়গঞ্জ থানা এবং উল্লাপাড়া থানার ৫টি ইউনিয়ন জুড়ে বিস্তৃত। রাজশাহী ও পাবনা জেলা জুড়ে যখন বিলটি গড়ে উঠেছিল তখন এর আয়তন ছিল ৪২১ বর্গ মাইল। প্রতিবছর নদী বাহিত পলি জমে বিলের বক্ষদেশ উঁচু হতে থাকায় আয়তনও কমে যাচ্ছে। ১৯০৯ সালে একটি সমীক্ষায় জানা যায়, বিলের আয়তন ১৪২ বর্গ মাইল কমে গেছে পলি জমে। মাত্র ৩৩ বর্গ মাইল এলাকায় সারা বছর জল জমে থাকে। অন্য অংশে জল জমে থাকে বছরের ৬ মাসের মত। জরিপ থেকে আরও জানা যায়, বিলের প্রবাহিত নদীগুলি বছরে প্রায় ২২২.৫ কিউবিক ফুট পলি বহন করে আনে। এর মধ্যে ৫৩ মিলিয়ন কিউবিক ফুট পলি বেরিয়ে গেলেও, বাকি ১৬৯ মিলিয়ন কিউবিক ফুট পলি বিলের বুকেই সঞ্চিত হয়। এই পলি বিলের সর্বত্র নয়, কোন কোন জায়গায় জমতে থাকে।

আরও জানা যায়, বিলের অবস্থা অনুধাবনে ১৯১০ এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে দুবার জরিপ করা হয়েছিল। দেখা যায়, বিলের আয়তন ক্রমশ কমে যাচ্ছে। পাবনার অংশের চলন বিল শুকনা মরশুমে এমন শুকিয়ে যেতে থাকে যে, সেখানে কৃষিকাজ শুরু হয়। আর রাজশাহীর দিকে জলের গভীরতা থাকে মাত্র ১ ফুট। মাত্র ৩৩ বর্গ মাইল থাকত জলের নিচে সারা বছর। ১৯৯০ সালে এই পরিমাণ হয় ১০ বর্গমাইল। এখনও যে এলাকায় বিলের চিহ্ন চোখে পড়ে সেখানে শুকনার সময় চৈত্র-বৈশাখ মাসে জল থাকে মাত্র ৯ থেকে ১৮ ইঞ্চি। চলন

বিলে পলি জমার পরিমাণ অব্যাহত রয়েছে। উঁচু হয়ে যাওয়া জমিতে গ্রাম গড়ে উঠেছে। এবং ক্রমশ তা বাড়ছে। চাষাবাদ হচ্ছে।

বিলগুলি সম্পর্কে জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় ঃ "অসংখ্য নিম্নাঞ্চল জেলার ভূ-প্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বর্ষাকালে এসকল নিম্নাঞ্চল বিল বা জলাভূমির আকার ধারণ করে। অধিকাংশ বিল শীতকালে শুকিয়ে যায়। বর্ষাকালে এই বিলগুলি বিশাল আকার ধারণ করে। তখন বিলগুলিকে স্বচ্ছ জল বিশিষ্ট হ্রদের মত দেখায়। আয়তন ও গভীরতার দিক থেকে জেলার জলাভূমি সমূহের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়—কতকগুলি গভীর ও স্বচ্ছ এবং কতকগুলি ঘাস ও নল খাগড়ায় আচ্ছাদিত অগভীর জলাভূমি। গ্রীষ্মকালে কোন কোন অগভীর জলাশয় জলজ উদ্ভিদ এবং পদ্ম সুশোভিত হয়ে মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করে। অন্যান্য জলাভূমিতে দীর্ঘকায় ধান চাষের ফলন ভাল হয়ে থাকে। বিলগুলিতে শুধু জল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। অবশ্য মাঝে মাঝে গাছপালা ঢাকা উঁচু বসত ভিটা দেখা যায়। বর্ষাকালে অধিকাংশ গ্রামই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন নৌকা ব্যতীত একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করা সম্ভব হয় না। এ সময়ে ছোট বড় নৌকাগুলি ধান খেতের দাঁড়-পথ দিয়ে যাতায়াত করে। সংখ্যাতীত বিল বা জলাভূমিগুলি জেলার স্থল পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বড় বাধা। জেলায় রাস্তা নির্মাণে খুব বেশি পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়। এখানে বড় ও উঁচু বাঁধ ছাড়া সহজে রাস্তা নির্মাণ করা যায় না। বন্যার সময় জলের উচ্চতা ও চাপ অনেক সময় দশ ফুটেরও বেশি হওয়ার কারণে বাঁধগুলির উচ্চতা অত্যন্ত বেশি করার প্রয়োজন হয়।" *(বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার—পাবনা—১৯৯০ পৃঃ ১১)*

বৃহত্তর পাবনা জেলার সড়ক ও জনপথ

	জাতীয় সড়ক	মোট দৈর্ঘ্য	পাকা কি.মি.	কাঁচা কি.মি.
১.	পাবনা-নগরবাড়ি সড়ক	৫০.০	৫০.০০	...
২.	নগরবাড়ি-শেরপুর-গোবিন্দগঞ্জ সড়ক (কাশিনাথপুর থেকে উল্লাপাড়া)	৪৪.০	৪৪.০	
৩.	পাবনা-ঈশ্বরদি সড়ক	২৮.৯৬	২৮.৯৬	
৪.	দাশুরিয়া-মুলাভুলি সড়ক আন্তজেলা সড়ক	৭.০০	৭.০০	
৫.	ঈশ্বরদি-কুষ্টিয়া সড়ক	৮.০০	৮.০০	
৬.	হাতিয়ামরুল-সিরাজগঞ্জ সড়ক	১৯.০০	১৯.০০	
৭.	কাশিনাথপুর-কাজিরহাট সড়ক	১২.০০	...	
	উপজেলা সংযোগ সড়ক			
৮.	পাবনা-সুজানগর সড়ক	২০.৯২	২০.৯২	
৯.	টেবুনিয়া-আটঘোরিয়া-চাটমোহর সড়ক	১৯.১০	১৯.১০	
১০.	চাটমোহর-ভাংগুরা-ফরিদপুর সড়ক	২৩.৮০	২৩.৮০	
১১.	সুজানগর-চিনেখরা সড়ক	১০.০০	২.০০	৮.০
১২.	উল্লাপাড়া-পূর্ণিমা সড়ক	৩.৭০	৩.৫১	০.১৯
১৩.	পোড়াবাড়ি-কামারখন্দ সড়ক	৬.৬১	৬.৬১	০.২১
১৪.	সিরাজগঞ্জ-রায়গঞ্জ সড়ক	২১.৫০	৪.৫০	১৭.০০
১৫.	সিরাজগঞ্জ-বেলকুচি সড়ক	১৯.০০	১৯.০০	
১৬.	ভুঁইয়াগাতি-নিমগাছি-তাড়াস সড়ক	১৬.০০	১৬.০০	
১৭.	সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধনুট সড়ক	৪০.০০	৪০.০০	

	জাতীয় সড়ক	মোট দৈর্ঘ্য	পাকা কি.মি.	কাঁচা কি.মি.
১৮.	বেলকুচি-এনায়েতপুর সড়ক	১০.০০	...	৬.০
১৯.	নগরবাড়ি-শেরপুর-গোবিন্দগঞ্জ সড়ক (বাঘাবাড়ি থেকে কান্দাইকোণা পর্যন্ত)	৫৩.০০	৫৩.০	
২০.	হাটিকামরুল-সিরাজগঞ্জ সড়ক	১৯.০০	১৯.০	
২১.	সিরাজগঞ্জ-বেলকুচি সড়ক	১৯.০০	১৯.০	
২২.	শাহজাদপুর-এনায়েতপুর-বেলকুচি সড়ক	২২.০০	...	৫.০
২৩.	পোড়াবাড়ি-কামারখন্দ সড়ক	৬.৫০	৪.৫০	
২৪.	শাহজাদপুর-পোতাজিয়া সড়ক	৩.৯০	৩.১৫	০.৭৫
২৫.	উল্লাপাড়া-পূর্ণিমাগাতি সড়ক	৪.০০	৪.০০	
২৬.	ভুঁইয়াগাতি-নিমগাছি-তাড়াস সড়ক	১৬.০০	৫.০০	
২৭.	সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-সোনামুখী-ধনুট সড়ক	৪০.০০	৩১.০০	
২৮.	সিরাজগঞ্জ-রায়গঞ্জ সড়ক	২২.০০	৪.০০	
২৯.	শাহজাদপুর লিংক রোড	২.০০	২.০০	

জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ঃ ১৯৮৭

		১৯৭৪	১৯৮৭
১.	সরকারি মহাবিদ্যালয়	১	৯
২.	বেসরকারি মহাবিদ্যালয়	৩৪	২৭
৩.	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪	৭
৪.	বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২১১	২৭৯
৫.	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯৬	৮১
৬.	প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৭৫৩	১,৮৯৩
৭.	মাদ্রাসা (নিম্ন, উচ্চ এবং সিনিয়র)	৫৯	১২১
৮.	মাদ্রাসা (হাফেজিয়া এবং ফোরকানিয়া)	৫৭	—
৯.	সরকারি কারিগরি বিদ্যালয়	১	১
১০	প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়	২	২
১১	কর্মরত কর্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১	১
১২.	সরকারি এতিম খানা	১	১

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য ঃ ১৯৮২

মহকুমা	নিম্ন মাধ্যমিক	শিক্ষক			শিক্ষার্থী		
(বর্তমানে জেলা)	বিদ্যালয়	পুরুষ	মহিলা	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
পাবনা	২৭	১২৯	১৪	১৪৩	৮৭২৯	২৩০০	১১০২৯
সিরাজগঞ্জ	৫৪	২৪৮	১৫	২৬৩	৫১২৪	১৩২৫	৬৪৪৯
বৃহত্তর পাবনা জেলা	৮১	৩৭৭	২৯	৪০৬	১৩৮৫৩	৩৬২৫	১৭৪৭৮

জেলার ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়

১. সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা ১৮৯৮ খ্রিঃ স্থাপিত
২. পাবনা কলেজ
৩. শহিদ বুলবুল কলেজ
৪. পাবনা মহিলা কলেজ, পাবনা
৫. ঈশ্বরদি কলেজ, ঈশ্বরদি ১৯৬৩ খ্রিঃ স্থাপিত
৬. পাক্সি কলেজ, পাক্সি
৭. সিরাজগঞ্জ কলেজ, সিরাজগঞ্জ
৮. বেরা কলেজ, বেরা ১৯৬৭ খ্রিঃ স্থাপিত
৯. শাহজাদপুর কলেজ, শাহজাদপুর ১৯৬৪ খ্রিঃ স্থাপিত
১০. বশিদুজ্জেমান মহিলা কলেজ, সিরাজগঞ্জ
১১. হাজি কুরম আলি মেমোরিয়াল কলেজ, সিরাজগঞ্জ
১২. আকবর আলি কলেজ, উল্লাপাড়া
১৩. বেলকুচি কলেজ, বেলকুচি
১৪. রেফাতুল্লাহ ইম্ফাজ্জাদী মেমোরিয়াল কলেজ, কাজিপুর

ইন্টারমিডিয়েট মহাবিদ্যালয়

১. পাবনা ডে কলেজ, পাবনা
২. আতাইকুলা কলেজ, পাবনা
৩. শহিদ সাধন সংগীত মহাবিদ্যালয়, পাবনা
৪. মোহাঃ ইয়াসিন কলেজ, বনওয়ারিনগর, পাবনা
৫. হাজি জামালউদ্দিন কলেজ, ভাঙুরা, পাবনা
৬ চাটমোহর কলেজ, চাটমোহর, পাবনা
৭ ছেঁকলা কলেজ, ছেঁকলা, পাবনা
৮ বংশেরাব্বদ মহাবিদ্যালয়, দাপুনিয়া, পাবনা
৯. আটঘরিয়া মহাবিদ্যালয়, আটঘরিয়া, পাবনা
১০. শহিদ এন. এইচ. কলেজ, কাশীনাথপুর, পাবনা
১১. সাতবাড়িয়া কলেজ, সাতবাড়িয়া, পাবনা
১২. দাসুড়িয়া নাইট কলেজ, দাসুড়িয়া, পাবনা
১৩. হামজাদ জালাল, মহাবিদ্যালয়, সাগরকান্দি পাবনা

মাদ্রাসা সংক্রান্ত তথ্য ঃ ১৯৮২

মহকুমা	নিম্ন মাধ্যমিক	শিক্ষক			শিক্ষার্থী		
(বর্তমানে জেলা)	বিদ্যালয়	পুরুষ	মহিলা	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
পাবনা	১৭৮	১১১৭		১১১৭	২৮২৪৫	৬৯৪১	৩৫১৮৬
সিরাজগঞ্জ	৯৭	৭৬১		৭৬৪	১৬৯৯৬	২৯৮১	১৯৯৭৭
বৃহত্তর পাবনা জেলা	২৭৬	১৮৭৮		১৮৮১	৪৫২৪১	৯৯২২	৫৫১৬৩

হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি ঃ

পাবনা একসময়ে ছিল চরম অস্বাস্থ্যকর জেলা। ম্যালেরিয়ার আক্রমণ এবং বন্যার প্রকোপে বহু জনবসতিই জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। বর্ষা শুরু হতেই আরম্ভ হত ম্যালেরিয়ার অভিযান। জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ জুন থেকে আগস্ট সময়কাল ছিল কেবলমাত্র স্বাস্থ্যকর। বর্ষার পর চারদিকের পুকুর খানাডোবায় জমে থাকা জলে মশার জন্ম হত। যে কারণে অক্টোবর-নভেম্বর মাস চারদিকের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠত। জনবসতি পরিত্যক্ত হওয়ায় সেই সব অঞ্চল হত জঙ্গল পরিপূর্ণ। অবশ্য পরবর্তীকালে এই সব অঞ্চলে আবার জনবসতি গড়ে উঠেছে। উনিশ শতকের শেষ থেকে শহরাঞ্চলে মৃত্যুর হার ছিল ৩৭.৪৪ এবং গ্রামাঞ্চলে ১৯.০৯। প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার ছিল ২৭.৩৩। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ছিল আমাশয়, গুটিবসন্ত, উদরাময়ের আক্রমণ।

শহর গড়ে ওঠার প্রাথমিকপর্বে চিকিৎসা ব্যবস্থাও ছিল কবিরাজি ও হাকিমি নির্ভর। কিন্তু ১৮৭৬ সালের মধ্যে পাবনা সদর, দুলাই এবং সিরাজগঞ্জে তিনটি ডিসপেনসারি স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাপক ব্যবস্থা না থাকলেও গ্রামের বহু মানুষ এখানে চিকিৎসার সুযোগ পেত। ১৯২৩ সালের মধ্যে জেলায় হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির সংখ্যা ছিল ১৩। সেগুলি হল ঃ

১. পাবনা সদর হাসপাতাল
২. চকসোহাপুর দাতব্য চিকিৎসালয়
৩. সিরাজগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল
৪. স্থলবসন্তপুর দাতব্য চিকিৎসালয়
৫. কাজিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়
৬ শিতলাই দাতব্য চিকিৎসালয়
৭. তারাস দাতব্য চিকিৎসালয়
৮. শাহজাদপুর দাতব্য চিকিৎসালয়
৯. বেরা দাতব্য চিকিৎসালয়
১০. তাঁতিবন্দ দাতব্য চিকিৎসালয়
১১. রায়গঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয়
১২. চাটমোহর দাতব্য চিকিৎসালয়
১৩. ভারেঙ্গা দাতব্য চিকিৎসালয়

জেলায় এখন মোট ৭টি হাসপাতাল রয়েছে। সেগুলি হল ঃ

১. পাবনা সদর হাসপাতাল
২. সিরাজগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল
৩. পাবনা যক্ষা হাসপাতাল
৪. পাবনা পুলিশ হাসপাতাল
৫. পাবনা জেলা হাসপাতাল
৬. মানসিক ব্যাধির হাসপাতাল
৭. বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল

হাসপাতাল ছাড়াও আছে ৪৮টি ডিসপেনসারি রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৪টি শহরাঞ্চলে অবস্থিত। বাকিগুলি গ্রামাঞ্চলে। পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। জনগণকে স্বাস্থ্যসচেতন করতে নানাবিধ সরকারি উদ্যোগ ও কার্যসূচী রূপায়িত হওয়ায়, পাবনাকে অস্বাস্থ্যকর স্থানের অপবাদ আর দেওয়া যাবে না।

ব্যবসা বাণিজ্য ঃ

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতই, পাবনা শহর গড়ে ওঠে নদী রেখা বরাবর। এর অন্যতম কারণ, সেকালের বাণিজ্য ছিল নদী নির্ভরতা। বড় বড় মহাজনী নৌকা নদীর অনুকূল স্থানে নোঙর ফেলে আমদানি-রপ্তানির কাজ চালাত। ক্রমশ নবগঠিত গঞ্জ বা বাণিজ্য কেন্দ্রের পশ্চাদভাগের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠত জনবসতি। এরকমই একটি বাণিজ্য নির্ভর শহর সিরাজগঞ্জ গড়ে ওঠে যমুনা নদী তীরে। সিরাজগঞ্জ মহকুমা সদরও ছিল এখানে। অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তম পাটের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল সিরাজগঞ্জ। সেকালেই উত্তরপূর্ব বাংলার অন্যতম এই ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্রটি ছিল পাবনার সব থেকে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য স্থান। যে কেন্দ্রটিকে ভিত্তি করেই চলত পশ্চিম ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরের ব্যবসা বাণিজ্য। স্থানীয় এলাকার উৎপন্ন দ্রব্য এনে জমা করা হত সিরাজগঞ্জে। সেখান থেকে

সরাসরি নৌপথে পাঠান হত কলকাতায়। অথবা ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়েতেও পাঠান হত। সেখান থেকে রপ্তানি হত ইংলন্ডে।

হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৮৭৫ সাল ছিল নৌপরিবহনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানে নৌকায় যাত্রা স্থান, গন্তব্যস্থল, পরিবাহিত দ্রব্যাদির পরিমাণ, বিবরণ ও দাম নথিভুক্ত করতে হত। সিরাজগঞ্জ ছিল সেরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। লিখিত বা মৌখিকভাবে প্রতিটি যাতায়াতকারী পরিবহন নৌকাকে এই তথ্য জানাতে হত। স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গলে উল্লিখিত একটি তথ্যে আছে, সিরাজগঞ্জে নথিভুক্ত দ্রব্যাদির বিবরণ (সেপ্টেম্বর ১৮৭৫—মে ১৮৭৬) ঃ

মাস		পরিমাণ মন হিসাবে	দাম টাকা হিসাবে
সেপ্টেম্বর	১৮৭৫	৮০২,১৩১	১০৭,৭৩৯
অক্টোবর	”	২৮৮,৪৬৪	১৫,৪৩৭
নভেম্বর	”	৩৫৭,৯৪০	১২৫,২৭৩
ডিসেম্বর	”	৩৪৩,৫০৬	৯৫,৫৭০
জানুয়ারি	১৮৭৬	৩১১,১৮৮	৮৪,২০১
ফেব্রুয়ারি	”	২৫০,৭৩২	৬৮,৭৭১
মার্চ	”	২৪৫,৪৭০	৩৪,১১৯
এপ্রিল	”	২৫১,৭৭৮	৫৯,২৩৯
মে	”	২৫৯,৩৫৭	৮৮,৯১৩
৯ মাসে মোট পরিমাণ		৩,১১০,৫৫৬	৬৭৯,২৬২

হান্টার অবশ্য তাঁর এই হিসাব থেকে, কাঠ, বাঁশ, নারকেল, গুণচট, খড়, শোলা জাতীয় তৃণ, ইট এবং পশু চামড়া—এগুলি বাদ রেখেছেন। কারণ এসব দ্রব্যের কেবলমাত্র সংখ্যা জানাতে হত, দাম বা ওজন জানাবার দরকার হত না।

বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে পাট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৮৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে ১,৫১১,১৯৪ মন বা ৫৫,৫৫৯ টন। এর মধ্যে পাবনা থেকেই রপ্তানি হয় ৪৫০,৪৭৬ মন। অর্থাৎ মোট রপ্তানির পরিমাণের চার ভাগের এক ভাগ। কিন্তু পাবনা থেকে যে পরিমাণ পাট রপ্তানি হত, তার সবটাই এই জেলার উৎপাদন ছিল না। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে আসত পাবনায়। সেপ্টেম্বরে সিরাজগঞ্জে আমদানি হত ২৬০,৪৭২ মন বা ৯,৫৭৬ টন পাট। যা পরে রপ্তানি হত কলকাতায়। ছোট ছোট নৌকায় যমুনাপথে পাট ও তৈলবীজ আসত সিরাজগঞ্জে। সেইসব নৌকা থেকে এখানে মাল খালাস হত। তারপর বড় নৌকায় বোঝাই হয়ে যেত কলকাতায়। ১৮৭৫ সালের অক্টোবরে রপ্তানিকৃত ১,০৮১,৪৩৬ মন পাটের মধ্যে ১৫১,২৮৩ মন গিয়েছিল পাবনা থেকে। পাবনায় পাশ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আমদানিকৃত কলকাতায় রপ্তানিযোগ্য পাটের পরিমাণ ছিল এই সময়ে ১৭৬,৫০৪ মন।

বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সিরাগজঞ্জের পরে উল্লেখযোগ্য ছিল হুরাসাগর তীরে শাহজাদপুর, ইছামতী তীরে পাবনা, যমুনার একটি শাখার তীরে বেলকুচি এবং ফুলঝুরি নদীতীরে উল্লাপাড়া। এইসব গঞ্জ ছিল পূর্ববাংলার অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্র। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাট, তামাক, সরষে, তিল, তিসি, চাল, হলুদ, আদা আর পশুর চামড়া আসত পাবনার বিভিন্ন গঞ্জে। হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায় ঃ

পাবনা জেলার অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্র

শহর বা গ্রাম	থানা	কোন নদী তীরে অবস্থিত	প্রধান পণ্য
১. ধাপারি	পাবনা	পদ্মা	চাল, পাট, লবণ, কলাই।
২. দাশুরিয়া	"	পদ্মার পুরোন খাতের কাছে	চাল, পাট, কলাই, লবণ, চুন, হলুদ।
৩. পাবনা	"	ইছামতী	চাল, বস্ত্র, সূতা, পাট, কলাই, লবণ, তৈলবীজ, চুন।
৪. দোগাছি	"	পদ্মা	চাল, পাট, লবণ, চুন, শালকাঠ, কলাই, তামাক।
৫. ভারারা	"	"	"
৬. চাটমোহর	চাটমোহর	বরাল	চাল, কলাই, বস্ত্র।
৭. নুরনগর	"	"	"
৮. ভাঙরা	"	"	"
৯. ফরিদপুর	"	"	চাল, কলাই, বস্ত্র, পাট।
১০. বেরা	মথুরা	"	চাল, কলাই, বস্ত্র, পাট।
১১. নাকালিয়া	"	হুরাসাগর	"
১২. বেণীপুর	"	"	"
১৩. মথুরা	"	"	চাল, পাট, লবণ, তামাক, বস্ত্র, গুড়।
১৪. মালদা	"	আত্রেয়ী	পাট, কলাই।
১৫. নাজিরগঞ্জ	দুলাই	পদ্মা	চাল, পাট, বস্ত্র, লবণ, তামাক।
১৬. সুজানগর	"	"	"
১৭. সাতবাড়িয়া	"	"	"
১৮. সান্ডিয়া	"	ইছামতী	"
১৯. সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	যমুনা	পাট, তৈলবীজ, চাল, তামাক, চুন লবণ, কয়লা, নারকেল, পিতলের তৈরি বিবিধ দ্রব্য, বস্ত্র থান।
২০. ভদ্রঘাট	রায়গঞ্জ	ফুলঝুরি	চাল।
২১. রায়গঞ্জ	"	"	চাল, তন্তু, কলাই।
২২. চান্দাকোণা	"	"	"
২৩. এরনদা	"	"	"
২৪. ধানেঘরা	"	"	"
২৫. গুরখা	"	"	"
২৬. পাণ্ডাসি	"	ইছামতী	তন্তু, চাল, কলাই, পাট।
২৭. উল্লাপাড়া	উল্লাপাড়া	ফুলঝুরি	"
২৮. শাহজাদপুর	শাহজাদপুর	হুরাসাগর	পাট, চাল, তৈলবীজ।
২৯. কইজুরি	"	"	তৈলবীজ।

এই সঙ্গে হান্টার আরও কয়েকটি প্রাণবন্ত গঞ্জের উল্লেখ করেছেন, যেখান থেকে রপ্তানি হত বিভিন্ন দ্রব্য। সেগুলি হল ঃ

পাট রপ্তানি কেন্দ্র ঃ সিরাজগঞ্জ, নাজিরগঞ্জ, মালদা, দারিয়া, বেরা, উল্লাপাড়া, কেন্দ্রাপাড়া, নাকালিয়া, মথুরা, রায়গঞ্জ, পাঙাসিয়া, কালীগঞ্জ, দোগাছি, দাসিকা, সুজানগর, শাহজাদপুর, সাতবাড়িয়া, ফরিদপুর, কাইমপুর, বাজিতপুর।

চাল রপ্তানি কেন্দ্র ঃ সিরাজগঞ্জ, উল্লাপাড়া, চাটমোহর, নাকালিয়া, বেরা, কাচিকাটা, ভাঙুরা।

কলাই রপ্তানি কেন্দ্র ঃ সিরাজগঞ্জ, নাকালিয়া, চাটমোহর, বেরা, খানগ্রা, নিশ্চিন্তিপুর, ধাপারি।

তিসি রপ্তানি কেন্দ্র ঃ পাবনা, ধাপারি, পাকুড়া।

তৈলবীজ রপ্তানি কেন্দ্র ঃ সিরাজগঞ্জ, বেরা।

তামাক রপ্তানি কেন্দ্র ঃ সিরাজগঞ্জ, বাওরা।

এই সঙ্গে বর্তমান বৃহত্তর পাবনা জেলার ব্যবসা কেন্দ্র ও পণ্য দ্রব্যের চিত্রটিকে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পাবনার গুরুত্ব আজও অম্লান এবং ক্রমবর্ধমান।

একসময়ে পাবনা জেলায় নীলের চাষ হত ব্যাপকভাবে। ১৮৭৬ সালে জেলায় ৫ হাজার একর জমিতে নীল চাষ হয়েছিল। তার আগে ১৮৬০ সালে কৃষকদের বিদ্রোহের পর নীল চাষ কমে আসছিল। পাবনায় কয়েকটি বেশ বড় বড় নীলকুঠিও ছিল। পাবনা শহরের মনজিপাড়ায় এবং শাহজাদপুরের নীলকুঠির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এদের নীল উৎপাদনের পরিমাণও ছিল বেশি।

জেলার অন্যতম পাট শিল্প ব্যাপক আকার পায় বহুকাল আগেই। পাট যেমন রপ্তানি হত, তেমনি রপ্তানি হত পাবনায় তৈরি বস্তা ও থলে। পাট থেকে 'কাছি' বা দড়ি, নৌকাটানার গুণ এবং মাছধরার জাল তৈরি হত। এ সম্পর্কে গ্রন্থ মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৬৪ সালে সিহাজগঞ্জ শহরের কাছে রায়পুরে কওমী জুট মিলে উৎপাদন শুরু হয়। চট, বস্তা ও কার্পেটের বাৎসরিক উৎপাদন পরিমাণ ১৮,০০০ টন। ১৯৭২ সালে মিলটির জাতীয়করণ করা হয়েছে। তাছাড়া আছে ১২টি পাটের গাইট বাঁধার কেন্দ্র। তার মধ্যে সিরাজগঞ্জে স্থাপিত চারটি কেন্দ্রের তিনটি হল ঃ ১. ওরিয়েন্ট জুট প্রেস কোম্পানি লিঃ, ২. র‍্যালি ব্রাদার্স লিঃ, ৩. জুট প্রেস অ্যান্ড চিটাগাং কোম্পানি লিঃ।

মেস্‌তা পাট থেকে একসময় কাগজ তৈরি হত পাবনায়। সেকালে এই কাগজ ছিল বেশ সমাদৃত। কাগজটি তৈরি বিষয়ে হান্টারের বিবরণের অংশবিশেষের বাংলা অনুবাদ আছে পাবনা জেলা গেজেটিয়ারে ঃ

"এক মন মেস্‌তা পাটকে প্রথমাবস্থায় পানি ভরতি একটি মাটির পাত্রে ডুবিয়ে রাখা হয় তারপর সেখান তেকে তুলে রোদে শুকানোর সময় এর উপর অর্ধমন ঝিনুকের চূর্ণ ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং এরপর আবার অল্প পানিতে ফেলে চুনগুলি খুব ভাল করে মিশানোর জন্য পা দিয়ে নাড়ান হয়। এ অবস্থায় ২/৩ দিন ভিজিয়ে রাখার পর সেখান থেকে তুলে নিয়ে রোদে শুকান হয়। তারপর একে ফালিফালি করে কাটা হয়। পরে এই ফালিগুলিকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। এরপর পানি সম্পূর্ণভাবে নিংড়ানর জন্য চটের উপর টান টান করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে বাড়ির দেয়ালের গায়ে এঁটে এগুলিকে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে সমস্ত গ্রামকেই যেন কাগজ দিয়ে ঢাকা মনে হয়। কাগজের রঙ সৃষ্টির জন্য এ অবস্থায় ১০ সের আতপ চালের গুড়ার সঙ্গে ৩৫ সের গরম পানি মিশিয়ে এর উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কাগজ তৈরির শেষ পর্যায়ে মসৃণ পাথর দিয়ে ঘসে লেখার উপযোগী করা হয়। লাউ, তেতুঁলের বিচি বা হরিতাল বেঁটে কাগজে মেখে হলুদ রং করা হত। তাতে কাগজে পোকা ধরত না বা কালি চুপসাতো না। নারী-পুরুষ, উভয়ে মিলেই এ কাজ করত। কাগজ মাড় দেওয়া, পালিশ করা ইত্যাদি কাজ বিশেষ করে মেয়েরাই করত বেশি।" (পৃঃ ১৮০)

জেলায় তাঁতশিল্পর প্রসারও ছিল একসময়ে উল্লেখযোগ্য। বহু হিন্দু মুসলমান তাঁতি সম্প্রদায়ের বাস ছিল এখানে। উৎকৃষ্ট ধুতি তৈরি হত সিরাজগঞ্জের দোগাছি গ্রামে। ধুতি ও চাদর রপ্তানি হত। চাটাই, ঝুড়ি, ধামা তৈরি হত।

দীর্ঘ পথ পেরিয়ে পাবনায় এখন আধুনিক যুগ। আধুনিক ব্যবসার অন্যতম অঙ্গ হল ব্যাঙ্ক। টাকা লেনদেন-আমানত ও বিনিয়োগের আধুনিকতম ব্যবস্থা। বৃহত্তর পাবনা জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ব্যাঙ্ক। তার কয়েকটি হল ঃ

জেলায় ব্যাঙ্ক ঃ ১৯৮০

			শাখা
সোনালি ব্যাঙ্ক	...	...	২৬
অগ্রণী ব্যাঙ্ক	...	...	৩৭
উত্তরা ব্যাঙ্ক	...	...	০৫
জনতা ব্যাঙ্ক	...	...	৪২
রূপালী ব্যাঙ্ক	...	...	২২
কৃষি ব্যাঙ্ক	...	...	১২
পূবালী ব্যাঙ্ক	...	...	১২
শিল্প ব্যাঙ্ক	...	...	০১
		মোট	১৫৭

শহর ও গ্রামে এসে গেছে বিদ্যুৎ। শিল্প অগ্রগতিতে বিদ্যুতের ভূমিকা আজ গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ ঃ জুন ১৯৮৭

	সাবস্টেশন	ভোল্টেজ হার	ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা
১.	ঈশ্বরাদ	১৩২/৬৬	২ × ১২.৫ ৫/১৬.৬৭
২.	শাহজাদপুর	১৩২/৬৬	১ × ১৫/২০
	”	১৩২/৬৬	১ × ১৫/২০
৩.	ঈশ্বরদি	৬৬/৩৩	১ × ৫
৪.	পাবনা	৬৬/১১	৬.২৫, ১ × ১০
৫.	উল্লাপাড়া	৬৬/১১	১ × ০.৭৫
৬.	সিরাজগঞ্জ	৬৬/১১	২ × ৭৫

বর্তমানে জেলার হোসিয়ারি, হস্তচালিত তাঁত ও বস্ত্র শিল্পেরও সমৃদ্ধি ঘটেছে। জেলার সব থেকে বড় বস্ত্র কল আলহাজ টেক্সটাইলস্ মিলস লিমিটেড ঈশ্বরদিতে অবস্থিত। পাবনায় আছে ক্যালিকো কটন মিলস এবং সিরাজগঞ্জে স্পিনিং অ্যান্ড কটন মিলস লিমিটেড। এগুলি ১৯৭২ সালে জাতীয়করণ করা হয়েছে। আলহাজ টেক্সটাইলস মিলে প্রধানত সুতো তৈরি হয়। ক্যালিকো কটন মিলও সুতো তৈরির অন্যতম কেন্দ্র। হোসিয়ারি অর্থাৎ গেঞ্জি-মোজা তৈরির কারখানা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গভঙ্গের সময় ১৯০৫ সালে। পরে ১৯২০ সালে আর একটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমটির নাম পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোম্পানি এবং দ্বিতীয়টি বঙ্গবিজয় কারখানা। ১৯৬১ সালে ছিল ১৬০টি এবং ১৯৭৭ সালে ২০০টি হোসিয়ারি কারখানা। এইসব হোসিয়ারি কারখানায় গেঞ্জি, গেঞ্জি-শার্ট, মোজা, সোয়েটার তৈরি হয়।

জেলার তিনটি ওষুধ কারখানা হল ঃ

১. এড্রুক লিমিটেড

২. স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড

৩. স্ট্যান্ডার্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস

ঈশ্বরদিতে আছে জেলার একমাত্র কাগজ তৈরির কারখানা নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লিঃ। নানারকম কাগজ তৈরি হয় এখানে। তাছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে তেল কল, চাউল কল, ময়দার কল, বিস্কুট কারখানা, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন কারখানা, ওষুধের কারখানা এবং নিজ প্রয়োজনীয় নানারকম দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা আছে।

জেলার অন্যতম প্রাচীন শিল্প হল হস্তচালিত তাঁত শিল্প। এখানকার উৎপাদিত তাঁতের উৎপাদিত কাপড় আন্তর্জাতিক মানের। তাঁতের কাজে নিযুক্ত জনসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। তাঁত শিল্প সংখ্যা ১১,৬২০ এবং কুটির শিল্প সংখ্যা ১০,০০০। অন্যতম তাঁত শিল্প কেন্দ্রগুলি হল ঃ

দেলুয়া, ধুগারিয়া, সোহাগপুর, এনায়েতপুর, সাদুল্লাপুর, রাজবপুর, আজিমপুর, সাইদাবাদ, মোহনপুর, দত্তবাড়ি, শহিদগঞ্জ, নতুন শরটিয়া, বড়শিভাগে, হরপুর, বেজপাতি, আমিনপুর, রাণীগ্রাম, নিশ্চিন্তপুর, পাচারবাড়ি।

তৈরি কাপড়ের বড় বাজার সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি, সোহাগপুর, খৈজুরি এবং পাবনা জেলায় মথুরা, একদণ্ড, সুজানগর, বনগ্রাম, ধুলাউড়ি, কাশীনাথপুর, শীংসৈল, পেলানপুর, ভাঙুরিয়া এবং ডেমরায়।

পাবনা শহরের তিন মাইল পশ্চিমে হেমায়েতপুরে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা কর্তৃক স্থাপিত "পাবনা শিল্প শহর"।

বৃহত্তর পাবনা জেলার ব্যবসা বাণিজ্য ও হাট বাজারের চালচিত্র এরকম ঃ "জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানতঃ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা এবং চট্টগ্রামের সাথেই চলে। প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চাল, ডাল, সরিষার তেল, পাট, হাঁস-মুরগি, গরু-বাছুর, চামড়া, ঘি, তামাক, ঔষধ, পাট, তুলাজাত দ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাট চালান যায় প্রধানত সিরাজগঞ্জ, উল্লাপাড়া, ঈশ্বরদি, সাড়া, নাজিরপুর, নাকাসিয়া এবং বেরা কেন্দ্র থেকে। বগুড়া এবং ময়মনসিংহ জেলায় চালান যায় ছোলা, পেয়াজ ও খেসারি। হলুদের প্রধানকেন্দ্র জামতৈল। এখান থেকে হলুদ চালান যায় ময়মনসিংহ ও ঢাকায়। বেলকুচি থানার খামারুল্লাপাড়া, উল্লাপাড়া থানার বালপাড়া, ফরিদপুর থানার ভাঙুরা, বেরা থানার ভারেঙ্গা প্রভৃতি এলাকা থেকে ঘি চালান যায় ঢাকায়। হাঁস-মুরগি, ডিম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রায় প্রত্যেক রেলস্টেশন থেকে ঢাকা ও খুলনায় চালান যায়। বিভিন্ন হাট বাজার থেকে ছাগল-ভেড়া বেপারিদের মাধ্যমে ঢাকায় চালান দেওয়া হয়। চন্দ্রা, আটঘরিয়া এবং দেবোত্তর প্রভৃতি এলাকা থেকে বেঁতের ঝুড়ি রাজশাহী ও ঢাকায় চালান যায়। পাবনা ও শাহজাদপুরের তৈরি শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, চাদর, গেঞ্জি ইত্যাদি চালান যায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এবং আরও অন্যান্য জায়গায়।

"আমদানি দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কয়লা, তুলা, সুপারি, লোহা, চুন ও চুনাপাথর, লবণ, মসলা, চিনি, কাঠ, বাঁশ, বস্ত্রকলের প্রয়োজনীয় সরঞ্জমাদি, নারিকেল, সিগারেট প্রভৃতি।

"জেলার আভ্যন্তরীণ ব্যবসা হাট-বাজারের মাধ্যমেই চলে। হাটগুলি বসে সপ্তাহের এক বা একাধিক নির্দিষ্ট দিনে। বাজার বসে প্রত্যহ। পল্লীর হাট-বাজার সাধারণত খোলা প্রশস্ত জায়গায় নদীর তীরে কিংবা কোন বড় গাছের নিচে বসে। বিক্রেতারা টিনের দোকানঘর চালা ঘর কিংবা খোলা জায়গায় মাটিতে পণ্য সাজিয়ে বসে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন এবং দূরদূরান্ত থেকে আগত ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা বেচা-কেনার জন্য এসব হাট-বাজারে আসে। এসব

জায়গায় ধান, চাল, পাট, গুড়, শাক-সবজী, পান, মশলা, তামাক, ফল, মাছ, মাটির বাসনকোসন এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায়। যাবতীয় জিনিসপত্রের কেনাবেচা হয়। সাধারণত গ্রামের লোকেরা তাদের উৎপাদিত ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ বাজারে বিক্রি করে এবং সেই অর্থের দ্বারা তারা তাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র কেনে। বড় বড় হাট-বাজারের থেকে দালাল ও ফড়িয়ারা নানা দ্রব্য ক্রয় করে এবং শহরে ও গঞ্জে চালান দেয়।"

পাবনা জেলা গেজেটিয়ার--১৯৯০। পৃঃ ২১৮

জেলার হাট-বাজার ঃ ১৯৭৩

	থানা	হাট-বাজার	বাজারের ধরন	কি বারে বসে	পণ্য সামগ্রী
১.	পাবনা	পাবনা মিউনিসিপ্যাল বাজার	প্রাথমিক	প্রত্যহ	চাল, ডাল সবজি, মশলা, ফল, দুধ, মাছ, ডিম, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি।
২.	"	দোগাছি	"	সোম ও বৃহস্পতি	ধান, চাল, পাট, ডাল, তৈলবীজ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি।
৩.	"	নাজিমপুর	"	বুধ ও রবি	ধনে, চাল, পাট, ডাল, সবজি ও হাঁস, মুরগি।
৪.	আটঘরিয়া		আড়তদারি	বুধ ও শনি	ধনে, পাট, ফল, হলুদ, সবজি।
৫.	"	রোকনপুর	প্রাথমিক	শনি ও বুধ	ধান, পাট, ফল ও সবজি।
৬.	ঈশ্বরদি	ঈশ্বরদি	আড়তদারি	সোম ও বৃহস্পতি	ধান, চাল, পাট, তৈলবীজ, ধনে, সবজি, হাঁস, মুরগি, মাছ, ডিম।
৭.	"	দাশুরিয়া	"	মঙ্গল ও শনি	ধান, চাল, পাট, ডাল, সবজি, হলুদ, ফল, মাছ, ডিম।
৮.	"	পাকসি	"	প্রত্যহ	ধান, চাল, পাট, হলুদ, মাছ, সবজি।
৯.	চাটমোহর	চাটমোহর	"	"	পাট, মটর, খেসারি, মসুর, ধনে, হলুদ, সরিষা, তিশি, ইত্যাদি।
১০.	"	হরিপুর	প্রাথমিক	রবি ও বৃহস্পতি	ধান, চাল, পাট, ডাল, সবজি ও হাঁস মুরগি।
১১.	"	হলদিয়াল	আড়তদারি	সোম ও	ধান, চাল, পাট, খেসারি এবং তৈলবীজ।
১২.	ফরিদপুর	ভাণ্ডারিয়া	প্রাথমিক	মঙ্গল ও শনি	ধান, চাল, পাট, ডাল, সবজি, হলুদ, খেসারি, তৈলবীজ।
১৩.	"	ডেমরা	"	রবি ও বৃহস্পতি	ধান, চাল, পাট, ডাল, সবজি, খেসারি।
১৪.	সাথিয়া	বনগ্রাম	প্রাথমিক	শনি ও মঙ্গল	ধান, চাল, পাট, ডাল, হলুদ, কাঁচা মরিচ, তৈলবীজ, গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া।

	থানা	হাট-বাজার	বাজারের ধরন	কি বারে বসে	পণ্য সামগ্রী
১৫.	”	কাশীনাথপুর	”	রবি ও বৃহস্পতি	ধান, চাল, পাট, ডাল, সবজি, হাঁস-মুরগি, গরু-বাছুর, ছাগল, ভেড়া, কাঁচামরিচ, মাছ ইত্যাদি।
১৬.	”	গোপীনাথপুর	”	রবি ও বুধ	ধান, চাল, পাট, ডাল সবজি, মাছ, হাঁস-মুরগি ও বাঁশ।
১৭.	সাঁথিয়া	সোনাতাল	”	রবি ও বৃহস্পতি	পাট, ধান, চাল ও বাঁশ।
১৮.	বেরা	বেরা	”	শনি ও মঙ্গল	ধান, চাল, পাট, ডাল, খেসারি, মসুর, সবজি, ধনে, হলুদ, ডিম, মাছ, হাঁস-মুরগি।
১৯.	”	নাকালিয়া	আড়তদারি	প্রত্যহ	পাট, গম, ধান, চাল, ডাল, খেসারি, মুগ, সবজি, ধনে।
২০.	”	হাটহাতুরিয়া	”	”	চাল, সবজি ও মাছ।
২১.	সুজানগর	মালদা	প্রাথমিক	শনি ও বুধ	ধান, চাল, পাট, ডাল, মাছ ও সবজি।
২২.	”	চিনাকোরা	আড়তদারি	শনি ও মঙ্গল	পাট, ধনে, চাল, ডাল ও সবজি।
২৩.	”	সুজানগর	প্রাথমিক	রবি ও বুধ	পাট, ধান, চাল, সবজি, মাছ, গরু, ভেড়া, ছাগল।
২৪.	”	সাগরকান্দি	”	প্রত্যহ	ধান, চাল, পাট, ডাল, সবজি, মাছ, গরু, ছাগল।
২৫.	”	সাখারিয়া	আড়তদারি	”	ধান, চাল, পাট, ডাল, সবজি, ধনে, মাছ, ডিম।
২৬.	সিরাজগঞ্জ বাজার	সিরাজগঞ্জ	আড়তদারি	প্রত্যহ	ধান, পাট, চাল, ডাল, তৈলবীজ তেল, পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, মাছ, মাংস, হাঁস-মুরগি, ডিম, আলু, পান, সুপারি, চামড়া, গুড় হলুদ, তেঁতুল।
২৭	”	কাজিবাড়ি বাজার	”	”	চাল, মরিচ, রসুন, পেঁয়াজ, মাছ সবজি, দুধ, হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল, ভেড়া, ডিম।
২৮.	”	গোপীনাথপুর	প্রাথমিক	শনি ও মঙ্গল	ধান, চাল, পাট, মরিচ, সবজি, মাছ, মাংস, রসুন, হলুদ, হাঁস-মুরগি, ডিম, দুধ।
২৯.	”	কয়লাগলি বাজার	”	প্রত্যহ	ফল, মাছ, সারস, সবজি।
৩০.	কামারকান্দি	জামতৈল	”	”	ধান, চাল পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন মাছ, সবজি, হলুদ, দুধ, গুড়।

	থানা	হাট-বাজার	বাজারের ধরন	কি বারে বসে	পণ্য সামগ্রী
৩১.	”	উল্লাপাড়া	”	”	চাল, ডাল, মাছ, সারস, সবজি, দুধ, গুড়, পান-সুপারি।
৩২.	কাউখালি	ওহাটা হাট	”	শনি ও মঙ্গল	ধান, চাল, মরিচ, পেঁয়াজ, ডাল, মাছ, হাঁস-মুরগি, ডিম, সবজি, দুধ, গুড়।
৩৩.	”	শিয়ালকোট	”	প্রত্যহ	ধান, চাল, মাছ, সবজি, ডিম, দুধ।
৩৪.	শাহজাদপুর	তালগাছি	আড়তদারি	রবি ও বুধ	পাট, ধান, চাল, ডাল, মাছ, হাঁস-মুরগি, সবজি, পেঁয়াজ, মরিচ, পান-সুপারি, গরু, ছাগল।
৩৫.	”	শীরামপুর	প্রাথমিক	প্রত্যহ	ধান, চাল, মাছ, সারস, সবজি।
৩৬.	কাজিপুর	হরিনাথপুর হাট	”	সোম ও শুক্র	ধান, চাল, ডাল, মাছ, সারস, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন ও সবজি।
৩৭.	”	কাজিপুরহাট	”	”	ধান, চাল, ডাল, পাট, সরিষা, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, গুড়, সবজি।
৩৮.	বেলকুচি	কান্দাপাড়া	”	রবিবার	ধান, চাল, ডাল, মাছ, ডিম ও গুড়।
৩৯.	উল্লাপাড়া	প্রতাপঘাট	আড়তদারি	বৃহস্পতি	পাট, ধান, চাল, ডাল, তৈলবীজ, পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, মাছ, হাঁস-মুরগি, ডিম।
৪০.	”	উল্লাপাড়া বাজার	”	সোম ও শুক্র	পাট, শন, ধান, চাল, ডাল, ডিম, দুধ, গুড়।
৪১.	”	উলিপুরহাট	প্রাথমিক	”	পাট, শন, ধান, চাল, ডাল, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, দুধ, ডিম, সবজি।
৪২	তাড়াস	তালামহাট	”	রবি ও বুধ	ধান, ফল, মাছ, মাংস, ডিম, সবজি।
৪৩.	”	রানীগঞ্জহাট	”	”	ধান, পাট, চাল, ডাল, মরিচ, রসুন, পেঁয়াজ, মাছ, মাংস, ডিম, সবজি।
৪৪.	রাইগঞ্জ	ধানজোরহাট	আড়তদারি	রবি ও বুধ	পাট, ধান, চাল, ডাল, মাছ, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, তৈলবীজ, গরু, ছাগল, গুড়।
৪৫.	”	সাতানীবাজার	”	সোম ও শুক্র	চাল, ডাল, মরিচ, পেঁয়াজ, দুধ, ডিম, সবজি।

	থানা	হাট-বাজার	বাজারের ধরন	কি বারে বসে	পণ্য সামগ্রী
৪৬.	”	সালঙ্গাহাট	”	সোম, বৃহস্পতি ও প্রত্যহ	পাট, ধান, চাল, ডাল, তৈলবীজ, হাঁস-মুরগি, ডিম, দুধ, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ।

বর্তমানে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি মেলা

		গ্রাম	থানা	সময়
১.	জলিবাড়ি মেলা	রাইদুলাভিপুর	কামারকান্দা	চৈত্র মাসের ৮ম নূতনচাঁদ দিবসে।
২.	থেট্রাগাসা মেলা	ভদ্রঘাট	”	বৈশাখের প্রত্যেক শনিবার।
৩.	গোস্তমেলা	কাউওয়েল	”	জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ তিন দিন।
৪.	সোনামুখি মেলা	সোনামুখি	শাহজাদপুর	চৈত্র মাসের নতুন চাঁদ দিবস এবং কার্তিক মাসের কালীপূজার তিন দিন।
৫.	সুবর্ণাসার মেলা	রাজাপুর	বেলকুটি	চৈত্র মাসের ৮ম নতুন চাঁদ দিবস।
৬.	চলা মেলা	বেলকুচি	”	চৈত্র মাসের পূর্ণচন্দ্র দিবস।
৭.	আঙ্গার মেলা	সালুঙ্গা	উল্লাপাড়া	বৈশাখ মাসের প্রত্যেক শনিবার।
৮.	কুরমা মেলা	দেশীগ্রাম	তাড়াস	বৈশাখ মাসের প্রথম তিন দিন।
৯.	বাদাই মেলা	বারুমাস	তাড়াস	চৈত্র মাসের পূর্ণচন্দ্রে তিন দিন।
১০.	সিদ্ধেশ্বরী মেলা	গুর্খি	তাড়াস	বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার।
১১.	লেরাটগান্তি মেলা	চানিদকোনা	রায়গঞ্জ	বৈশাখ মাসের শেষ দিন।
১২.	ভুঁইয়াগাতি মেলা	সোনাকাড়া	রায়গঞ্জ	চৈত্র মাসের প্রথম দিন।
১৩.	মুরাগাছা মেলা	চানিদকোনা	রায়গঞ্জ	চৈত্র মাসের প্রথম দিন।
১৪.	দরপাতলা মেলা	পাংগানি	রায়গঞ্জ	বৈশাখ মাসের প্রতি রবিবার।

ওপরে মেলার বিবরণ পাবনা জেলা গেজেটিয়ারে থেকে উদ্ধৃত। ড. আশরাফ সিদ্দিকির 'লোকসাহিত্য'-২য় খণ্ডে নিম্নোক্ত মেলার উল্লেখ আছে।

		থানা	
১.	জলিবাড়ি মেলা	কামারকান্দা	অষ্টমী, চৈত্র
২.	থেত্রা—গাজামেলা	”	প্রতি শনিবার, বৈশাখ
৩.	গোষ্ঠমেলা—ঝাওয়াইল	”	শেষ তিনদিন, জ্যৈষ্ঠ
৪.	সোনামুখি মেলা	সোনামুখি	চৈত্র
৫.	কালীপূজা		কার্তিক
৬.	সুবর্ণেশ্বর মেলা—রাজাপুর	বেলকুচি	নবমী, চৈত্র
৭.	চালা মেলা	বেলকুচি	নবমী, চৈত্র

৮. আঙ্গারু মেলা—সলঙ্গা	উল্লাপাড়া	প্রতি শনিবার-বৈশাখ
৯. কুর্ম মেলা—দেশীগ্রাম	তারাস	প্রথম তিন মঙ্গলবার, বৈশাখ
১০. বাদাইমেলা—বরুহাস	”	নবমী থেকে তিন দিন, চৈত্র
১১. সিদ্ধেশ্বরী মেলা—গুর্খি	”	প্রতি শনি ও মঙ্গলবার, বৈশাখ
১২. লেবাতগতি মেলা—চান্দিকোণা	রায়গঞ্জ	শেষ দিন, বৈশাখ
১৩. মুরাগাছা মেলা—চান্দিকোণা	”	১—চৈত্র
১৪. উল্লাপাড়া মেলা		পৌষ ও চৈত্র, ১ মাস
১৫. ভুয়াগাঁতি মেলা—সোনাকারা	উল্লাপাড়া	অষ্টমী, চৈত্র
১৬. দরগাতলা মেলা—পাঙাসি	”	প্রতি রবিবার বৈশাখ
১৭. শাহজাদপুর হজরত মখদুম	শাহদৌলার ওরস	চৈত্র-বৈশাখ ১ মাস
১৮. বসন্ত অষ্টমী		চৈত্র, ১ মাস
১৯. দোল		ফাল্গুন, ১ দিন
২০. চড়ক		চৈত্র, ১ দিন
২১. রাজাপুর, ঈদমেলা-ঈদ-উলআজহা		
২২. কাজিপুর মেলা		ফাল্গুন, ১ মাস
২৩. সাথিয়া মেলা		ফাল্গুন-চৈত্র, ১ মাস

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঃ

১৮৯০ সালের ভয়াবহ বন্যায় পাবনা শহর প্রায় একমাস ছিল জলের নিচে। সমগ্র জেলা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাবনা শহরকে রক্ষার জন্য পরবর্তীকালে ইছামতীর দক্ষিণ তীরে স্লুইসগেট সহ বাঁধ নির্মিত হয়। ১৯০৬ সালের বন্যায় পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধিকাংশ ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

১৯৬৮ সালে বন্যা কবলিত হয়েছিল জেলার ১৭টি থানার ১২টি থানা। ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ। বহু জায়গায় বাঁধ ভেঙে যায়। ৫০ হাজার একর জমির ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট, আংশিকভাবে নষ্ট হয় ৩০ হাজার একর জমির ফসল।

১৯৭০ সালের বন্যাও ছিল ভয়াবহ। ১৪টি থানার ৩ লক্ষ একর জমি জলে ডুবে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ। ৫০ হাজার কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়ে।

১৯৭৪ সালের বন্যায় ৯০ হাজার টন খাদ্য শস্য নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিমাণ ছিল ৯৬১ বর্গ মাইল। ২১ হাজার ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে। বিস্তর গবাদি পশু মারা যায়।

পাবনা জেলার ওপর দিয়ে ১৮৬৪ সালে ভয়াবহ ঘূর্ণি ঝড় বয়ে যায়। বহু গাছপালা ও ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে। ১৮৭২ সালের ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতির পরিমাণ ছিল আরও ব্যাপক। ৫ হাজার ঘরবাড়ি এবং ২০ হাজার গাছপালা ভেঙে পড়ে কেবলমাত্র পাবনা শহরে। যমুনা নদী ও হুরাসাগরে স্টিমার ডুবি ঘটে।

কিন্তু ১৯৬৯ সালের ঘূর্ণিঝড়ের দাপট পূর্বের সব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়। ৪৯ হাজার গাছপালা নষ্ট হয়। কাঁচাবাড়ি ভেঙে পড়ে ১৩ হাজারেরও বেশি। ২৩ হাজার সরকারি ও বেসরকারি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩০৬ বর্গমাইল এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত এই ঘূর্ণিঝড়ে সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ৩২ জন নিহত এবং ১২৫ জন আহত হয়েছিল। সব

থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ছিল শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, চৌহালিয়া, তাড়াস, কামারকান্দা, বেলকুচি ও সিরাজগঞ্জ থানা। পাবনা সদরের ক্ষতির পরিমাণ কম ছিল না। মারা যায় ৪ জন, আহত ৫০ জন এবং কাঁচাবাড়ি ধ্বংস হয় ৪,৫৫৬টি। ৩৯২টি গবাদিপশু, ২০টি ভেড়া ও ৩০টি মহিষ মারা পড়ে। ঘূর্ণিঝড় ৩৬ বর্গ মাইল এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল।

১৮৮০ এবং ১৮৯৭ সালে দুবার ভূমিকম্পে জেলার বিস্তর ক্ষতি হয়েছিল। প্রথমবার বেশ কিছু পাকাবাড়ি ভেঙে পড়ে। দ্বিতীয়বারের ভূমিকম্পে সিরাজগঞ্জের প্রশাসনিক ভবন, আদালত ভবন, জেলখানা, পোস্ট অফিস বিধ্বস্ত হয়। এন্ড্রু ইউল অ্যান্ড কোম্পানির চটের কারখানা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। গ্রামাঞ্চলের বহু স্থানে জমিতে ফাটল দেখা দেয়।

দুর্ভিক্ষ ঃ ১৮৭৪

"১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বিহার ও বঙ্গদেশ ব্যাপক দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়। স্বাভাবিক মৌসুমের ফসলের তুলনায় সে বৎসরে জেলায় অর্ধেক পরিমাণ আউশ ও আমন ধান উৎপাদিত হয়। অপর দিকে তখন এখানে ডালের ফলনও হয় খুব সামান্য। ফলে জেলায় খাদ্যের ঘাটতি দেখা যায়। এই খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়নি। তবে জনগণকে তিন মাস খুব বেশি কষ্টভোগ করতে হয়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) মাসে সিরাজগঞ্জ মহকুমার ২টি থানার বহুলোক অ-পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ করে অতিশয় কৃশ হয়ে পড়ে বলে জানা যায়। সরকারি সাহায্য ও ত্রাণ ব্যবস্থা সরবরাহ করা না হলে হয়ত এদের অনেকেই উপবাসে প্রাণ হারাত। যেসব লোক সরকারি ত্রাণ ও সাহায্য গ্রহণ করে তাদের অনেকে ছিল বিধবা রমণী, রুগ্ন শ্রমিক, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তি এবং তাদের পরিবার পরিজনবর্গ। স্বাভাবিক বৎসরের অভাবী জনগণ স্বচ্ছল প্রতিবেশীদের সাহায্য ও সমর্থন পেয়েই বেঁচে থাকে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) মাসের শেষভাগে রায়গঞ্জ পুলিশ সার্কেলে সাধারণ ঢেঁকি ছাঁটা চাল প্রতিমন ৫ টাকা ৫ আনা ৪ পাই দরে বিক্রি হয় এবং একসময়ে তা বেড়ে ৬টা ১০ আনা ৮ পাইয়ে পৌঁছায়। এমন কি সিরাজগঞ্জ ও উল্লাপাড়া থানায় এ চালের পাইকারি দর ছিল মন প্রতি যথাক্রমে ৪ টাকা এবং ৪ টাকা ৪ আনা। মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) মাসে সাধারণ ঢেঁকিছাটা চালের দর সদর মহকুমায় ছিল প্রতি মন ৩ টাকা ১ আনা এবং সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ছিল ৩ টাকা ৯ আনা ২ পাই। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি (পৌষ-মাঘ) মাসের চালের মূল্য মন প্রতি ৪ টাকা হওয়ার পর জেলায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দেয়। তখন স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ সমূহকে ত্রাণ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কর্মক্ষম লোকদের কাজের ব্যবস্থার জন্য ত্রাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। জমির মালিকদের মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তখন সরকার ত্রাণ সরবরাহের জন্য মোট ৮২,৯১৯ টাকা ২ আনা ৫ পাই, রাস্তা ও ত্রাণ কর্মসূচির কাজে ২৭,৭০৪ টাকা ১৩ আনা এবং জমির মালিকদের মাধ্যমে কৃষকদের অর্থ ও শস্য ঋণ বাবদ মোট ৭৫,৭০২ টাকা ৫ আনা ৯ পাই ব্যয় করে।"

পাবনা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯০। পৃঃ ২৬-২৭

প্রজাবিদ্রোহ ঃ

সেরাজগঞ্জ ও পাবনা এলাকার বহু সংখ্যক প্রজা তাহাদের নায়েব প্রভৃতি কর্মচারির অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া শেষে দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর জমিদারকে যথার্থ খাজনার অতিরিক্ত কিছু দিবে না। স্থানীয় হাকিম তাহাদের সহায় হইয়া সুবিচার করিতেছেন। জমিদার মহাশয়দের ইহাতে কিছু চৈতন্যোদয় হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। রাইয়ত লোকেরা চালাক এবং সাহসী হইয়া স্বাধীনভাবে চলিলে জমিদারকে ঘোল খাওয়াইয়া দিতে পারে। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার অধিক হইলে তাহার শেষ মীমাংসা এইরূপেই হয়, ইহা মানবপ্রকৃতির নিয়ম। *— সুলভ সমাচার, ৪ আষাঢ়, ১২৮৩*

পাবনা ও সিরাজগঞ্জ প্রদেশীয় প্রজাগণ জমিদারের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছে। এই বিষয় কোথাও ভীষণাকার কোথাও অন্য প্রকার মূর্তি ধারণ করিয়া সম্বাদ পত্রিকায় প্রকাশিত ও লোক পরম্পরায় আন্দোলিত হইতেছে। আমরা উক্ত বিষয়ের বাহুল্য বর্ণন না করিয়া পিপলস্‌ফ্রেন্ড (প্রজাবন্ধু) যাহা লিখিয়াছেন প্রজাবৎসল আমাদিগের লেপটেনন্ট গবর্নর মহামতি কেম্বেল বাহাদুর যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ও পাবনা প্রদেশ হইতে আগত পত্র এ স্থলে প্রকাশ করিলাম।

পিপলস্‌ ফ্রেন্ড লিখিয়াছেন "জমিদারেরা প্রজাগণকে দয়া ও শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করিতে এবং তাহারদিগের প্রতি সদ্ভাব রাখিতে ইচ্ছা করেন না। প্রত্যুতঃ তাহারা আপনাদিগের স্বার্থের প্রতিই কেবল দৃষ্টি রাখেন। ধর্মোপদেশরহিত কতকগুলি অশিক্ষিত জমিদার ন্যায় কিংবা অন্যায়চরণ, যে কোন প্রকারেই হউক, আপনাদিগের কোষ পূর্ণ করিতে এবং আপনাদিগের ইচ্ছা অত্যাচার দ্বারা বলবতী রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা ভরসা করি যে, এই সমুদয় বিষয় যখন প্রকাশিত হইবে তখন কোন কোন জমিদার নিশ্চয়ই বিপদগ্রস্ত হইবেন।"

জমিদারগণ অতিরিক্ত কর আদায়ের চেষ্টা করায় প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য হাঙ্গামা করিতেছে অতএব সাধারণ প্রজাগণ প্রজার শান্তিরক্ষার নিমিত্ত বিরোধী প্রজাদিগকে ঐরূপে জমাইত-বস্তু হইতে দেওয়া না হয়। এবং জমিদারগণ আইনানুসারে প্রজার কাছে যাহা পাবেন তাহার সুবিচার করা হয়। বিদ্রোহী প্রজাগণ শান্তভাবে আপনাদের দুঃখ জানাইলে মনোযোগের সহিত তাহা শুনা যাইবে। কিন্তু তাহারা যদি জমিদারদের যথার্থ প্রাপ্য না দিয়া বলে যে আমরা কেবল মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজা, তাহা গ্রাহ্য যোগ্য হইবে না। এ সম্বন্ধে জমিদারদিগের উপর গবর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। জমিদারের কৃত রাজবিধি বহির্ভূত কোন অতিরিক্ত দাওয়ার প্রতিবাদ করিবার জন্য সকলে একত্রিত হওয়ার কোন নিষেধ নাই, কিন্তু সে জন্য বহু লোক একত্রিত হইয়া দাঙ্গা করা আইন সঙ্গত নহে। গবর্নমেন্ট আইনানুসারে জমিদার ও প্রজার যথার্থ স্বত্ব রক্ষা করিবেন। এই বিদ্রোহিতায় আপাতত অনেক অনিষ্ট হইলেও ইহা দ্বারা একটি বিশেষ উপকার হইবে। অনিয়মিত অবৈধ কার্যকে নিয়মিত করিতে হইলে প্রথমে প্রজাগণের মধ্যে শান্তি ভঙ্গ হয় ইহা স্বাভাবিক।

- --গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, (৩ সপ্তাহ), মে [জুন] ১৮৭৩

জমিদারগণ অতিরিক্তহারে কর গ্রহণ করেন বলিয়া প্রজাবর্গ ঐক্যতাপূর্বক বিদ্রোহী হইয়া জমিদারদিগের সর্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। শুদ্ধ জমিদার কেন, এই বিপ্লব দ্বারা আপামর সাধারণের বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত হিন্দুসন্তানগণেরই অধিক অনিষ্ট সমুৎপন্ন হইতেছে। প্রতিদিন চারি-পাঁচ শত দুর্দান্ত প্রজা দলবদ্ধ হইয়া দস্যুবেশে পল্লীগ্রামে প্রবেশপূর্বক নিরীহ লোকদিগকে বিদ্রোহী হইতে পরামর্শ দেয়। ...বাস্তবিক জেঙ্গিস ও টাইমুরের আক্রমণে ভারতবর্ষ যেমন কম্পিত কলেবর হইয়াছিল, এই প্রদেশে সেইরূপ হইয়াছে। ভদ্রলোকদিগকে মানহীন ও জাতিচ্যুত করা, সৎ কুলজাতা কুলাঙ্গনাগণের সতীত্ব, রত্নাপহরণ, দেবমূর্তির চূর্ণীকরণ ও লুটপাট ইহাদের নিত্য ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা প্রকাশ্যস্থান হইতে হাটবাজার উঠাইয়া নিজ অভিপ্রেত স্থানে স্থাপনপূর্বক জমিদার ও ভদ্র সন্তানগণের কষ্টের এক শেষ জন্মাইতেছে। ভদ্রলোকদিগের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পথিমধ্যে ভদ্রলোক দেখিলেই ইহারা জমিদারের কর্মচারিজ্ঞানে তাহাদের উপর অযথাভূত অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে না। *(পাবনার উল্লাপাড়া গ্রামের কোন কৃতবিদ্যা ব্যক্তির পত্র)*

প্রজাবিদ্রোহ অতি অল্পসময়ের মধ্যে এতদূর ব্যাপক হইয়াছে যে, প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক লোক দলে দলে এক গ্রামে পড়িয়া অন্যান্য সমুদায় প্রজাদিগকে ইহাদের দলভুক্ত করিতেছে। কেহ অসম্মতি প্রকাশ করিলে তাহার সর্বনাশ উপস্থিত হয়। বাড়িঘর লুঠ ও দ্রব্যজাত নষ্ট

করিয়াও ইহাদের দুরাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। যাহার বাড়িতে বিদ্রোহী দস্যুগণ উপস্থিত হয়, তাহার গৃহাদি চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করে। গৃহস্বামীকে পাইলে তাহার প্রাণ সংশয় হয়। সুযোগ পাইলে দুরাত্মারা স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। পলো, বাঁশের লাঠি ও সিঙ্গা ইহাদের প্রধান অস্ত্র। ... এক ব্যক্তি সিঙ্গাধ্বনি করিবামাত্র এক একখানা পলো ও লাঠি হাতে করিয়া মুহূর্তমধ্যে সহস্র সহ লোক একত্র হইয়া অল্প অল্প শব্দে এমন ভয়ানক ডাক ছাড়িতে থাকে যে, নিকটবর্তী গ্রামসমূহের কে কোথায় পলায়ন করিবে তাহার ঠিকানা থাকে না। ...এদেশে আর এক জনরব উঠিয়াছে যে, সিরাজগঞ্জের অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জমিদার বিদ্রোহী প্রজাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। জনরব সত্য হউক বা মিথ্যা হউক এই সংস্কার প্রজামণ্ডলীর মনে বদ্ধমূল হওয়াতে বিদ্রোহানল দিনদিন আরও ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। নিরীহ প্রজাগণ একেবারে হতাশ্বাস হইয়া দস্যুহস্তে ধনমান বিসর্জন স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছে। আমরা স্বীকার করি এ বিভাগের কোন কোন জমিদার অধিকহারে খাজনা আদায়ের জন্য উৎপীড়ন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য প্রজাদিগের দ্বারা দেশের মধ্যে এরূপ অত্যাচারের কথা প্রতিদিন শুনিয়াও যেন নলেন সাহেব চক্ষু মুদিয়া রহিয়াছেন, ইহা অত্যল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। --*অমৃতবাজার পত্রিকা,* ২৬.৬.১৮৭৩

এই প্রজাবিদ্রোহীর আকরস্থান সিরাজগঞ্জ মহকুমা। এই মহকুমায় সলফের সান্যাল, পর্যনার ভাদুড়ি, স্থলের পাকড়াশি, নহাটার ভট্টাচার্য, কাশীপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলিকাতার বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি আছে এবং ইহাদের প্রায় সকলের জমিদারিতে প্রজা বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইয়াছে। গত তিন চারি বৎসর হইতে একটু একটু করিয়া এবার প্রজার অত্যাচার ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। আমরা যাহা শুনিলাম—তাহাতে বোধহয় যে সহস্র সহস্র প্রজা একত্র হইয়া এককরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

...এই বিবাদে প্রজা ও জমিদার উভয়েরই দোষ আছে, আমরা স্বীকার করি। আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, বলবান ও ধনবান জমিদার অনেক সময় দুর্বল ও দরিদ্র প্রজাকে নিষ্পীড়ন করে। কিন্তু কথায় কথায় প্রজাকে রাজদ্বারে যাইতে কে শিখাইল? কর বৃদ্ধি করিবার কৌশলসকল জমিদারকে কে শিক্ষা দিল? প্রজা ও জমিদারের মধ্যে পূর্বে যে স্নেহের সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তাহা তিরোহিত করিবার মূল কারণ পেনাল কোড ও দশ আইন।

যাহা হউক সিরাজগঞ্জের প্রজাবিদ্রোহীর আশু প্রকৃত কারণ কি, তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। কেহ বলেন জমিদারগণের করবৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ। কেহ ইহার আর এক কারণ নির্দেশ করেন। তাহারা বলেন এবং পাবনা অঞ্চলের জনরবও এই যে সিরাজগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট নোলেন সাহেব জমিদারগণকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং কেবল তাহার উৎসাহে এইরূপ প্রজা বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইয়াছে।

...আমরা ভরসা করি গবর্নমেন্ট অবিলম্বে পাবনার প্রকৃত অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিবেন। প্রকৃত যদি সহস্র সহস্র প্রজা উন্মত্ত হইয়া সেখানে অত্যাচার আরম্ভ করিয়া থাকে তবে এতদিনে কত সর্বনাশ যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না।... —*অমৃতবাজার পত্রিকা,* ২৬.৬.১৮৭৩

The whole sub-division of Serajgunge in Pubna is in a state of dreadful excitement. Thousands of ryots have combined together and risen against their zemindars. Plundering and devasting everything in their way. The life, property and honor of the people are in imminent danger. We have received a dozen letters of the subject of few of which we publish in our vernacular columns, all telling horrible tales of oppression practised by these frenzied

people. We do not know what has led to this general outbreak but if Govt. do not take immediate steps to supress it, we fear, the contagion like wild fire will spread throughout the whole country and convert it into a scene of bloodshed ar.d plunder. — *অমৃতবাজার পত্রিকা,* ২৬.৬.১৮৭৩

হিন্দু রঞ্জিকা বলেন, 'আমাদিগের দেশ অরাজক হইয়া উঠিল। এত পুলিশ, এত হাকিম প্রভৃতি শান্তিরক্ষক থাকিতে এই অরাজকতা হওয়া সামান্য আক্ষেপজনক নহে। আজিকালি পাবনা, শাহজাদপুর ও শিরাজগঞ্জ অঞ্চলের বহুতর প্রজা জমিদারের বিদ্রোহী হইয়া দলবদ্ধভাবে অন্য এলাকার প্রজাদিগের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া বলিতেছে যে, তোমরা আমাদিগের সঙ্গে যোগ দেও, এবং জমিদারের বিদ্রোহী হও, না দিলে বাড়িঘর ইত্যাদি লুঠ করিব।' এই বিদ্রোহী প্রজাদিগের এইরূপ ভয়ানক অনিষ্টকর বাক্যে কাহার হৃদয় ব্যাকুলিত না হয়? আমরা শুনিতে পাই, এ কারণ এ অঞ্চলস্থ প্রজাদিগের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকের বাড়িঘর লুঠও হইয়াছে। শান্তিরক্ষকেরা কি চুপ করিয়া আমোদ দেখিতেছেন? আমরা ইচ্ছা করি, আমাদিগের সুবিচক্ষণ লেপ্টনন্ট গবর্নর বাহাদুর বিশেষ অনুসন্ধানপূর্বক এই ভয়ানক অনিষ্টকর দলবদ্ধতা নিবারণ করিয়া দেশের শান্তি রক্ষা করুন।"
—*সোমপ্রকাশ,* ৩০.৬ ১৮৭৩

অমৃতবাজার পত্রিকা কয়েকখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছে, পাবনা অঞ্চলের প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া অশেষবিধ উপদ্রব করিতেছে। তাহার মতে এটি জমিদারের সহিত প্রজার বিরোধ। দশ আইন এই অনর্থের মূল। আজিকালি অমৃতবাজার পত্রিকা জমিদারদিগের প্রতি কিছু অধিক প্রসন্ন হইয়াছে। দশ আইন ঐ বিরোধের মূল কি অন্য কোন মূল আছে অগ্রে তাহার অনুসন্ধান না করিয়া অমৃতবাজারের উল্লিখিত প্রকার মত প্রকাশ করা সঙ্গত হয় নাই। আমরা জানি দশ আইন না হইলে জানজিবারের ন্যায় এদেশে প্রজাদাসত্বের নিবারণার্থ স্বতন্ত্র চেষ্টা পাইতে হইত। —*সোমপ্রকাশ,* ৩০ ৬ ১৮৭৩

The Indian Daily News noticed the other day a movement among the ryots in Eastern Bengal, and the Amrita Bazar Putrica publishes several vernacular letters giving accounts of the mischief going on...

The letters to the Putrica indicate that if the local officers do not sympathize with the movement, they are unaccountable inactive in checking this agrarian rising. We hope the Government Translator will give a full translation of the letters published by our contemporary, and lay the same before Government. We hope the inaction noticed does not form a part of the programme of Sir George Campbell's Personal Government.
—*হিন্দু পেট্রিয়ট,* ৩০.৬.১৮৭৩

পাবনা প্রদেশীয় ক্ষিপ্ত প্রজাগণ, জমিদার এবং গবর্নমেন্ট

জমিদারদিগের অত্যাচারে পাবনা প্রদেশের প্রজাগণ ক্ষিপ্ত হইয়া স্থানে স্থান জমিদার ও সাধারণ প্রজাগণের প্রতি যে অত্যাচার ও অবিহিত ব্যবহার করিয়াছে, আমরা গত সংখ্যক পত্রিকায় তাহা পাঠকগণকে সবিশেষ অবগত করাইয়াছি।...

প্রজাদিগের ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা এতাবৎ এতদ্বিষয়ক কোন কথা মুখ দিয়া বাহির করি নাই। এক্ষণে যে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি, কর্তৃপক্ষ

অবধানপূর্বক শ্রবণ করুন। কুকুর শৃগাল ক্ষিপ্ত হইলে লোকের অনিষ্ট করিয়া থাকে, সে স্থলে মানুষ ক্ষেপিলে যে অত্যাচার করিবে, ইহা কি আর আশ্চর্য! প্রজালোকের ক্ষিপ্ততার কারণানুসন্ধান করা, কর্তৃপক্ষের নিতান্ত আবশ্যক। কর্তৃপক্ষ যদি আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা না করিয়া এই সমস্ত ক্ষিপ্ত প্রজাগণের প্রতি, দৃঢ়াদেশ প্রচার করেন, তাহা হইলে, ইহারা শান্তিলাভ দূরে থাকুক বরং অধিকতর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে।... লেপ্টেনান্ট গবর্নর বাহাদুর যেমন প্রজাবন্ধু, তাহার আদেশ তদ্রূপ অনুরঞ্জক হইয়া প্রজা ও জমিদারদিগের মধ্যে শান্তিস্থাপন করিলেই আমরা যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ লাভ করি। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া অনেকে বলিতেছেন, "আপনাদিগের হস্তে করবৃদ্ধির ক্ষমতা থাকাতে, অপরিণামদর্শী ক্ষুৎক্ষামোদর অনেক জমিদার, দেশকালপাত্র বিচার না করিয়া অসম্ভব কর বৃদ্ধি করেন। যতদিন উদরান্নে কষ্ট উপস্থিত না হয়, প্রজারা ততদিন সহ্য করে, অন্নের অভাব দেখিলেই ক্ষেপিয়া উঠে এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যার তার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে।" আমরা এই বাক্য অনুমোদন করিয়া বলিতেছি, সকল জমিদার ও সকল প্রজা দুষ্ট নহে, প্রজা ও জমিদারের মধ্যে ভালমন্দ লোক আছে। গবর্নমেন্ট, কমিশনার নিযুক্ত করিয়া, নির্বাচনপূর্বক ভাল জমিদার ও ভাল প্রজা পৃথক এবং দুষ্ট জমিদার ও দুষ্ট প্রজা শাসন করুন। সকল গোলযোগ নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অন্যথা গোলযোগে শাসন করিলে সৎ জমিদার ও সৎ প্রজাও কখন দণ্ডিত হইবে এবং অসৎ জমিদার ও অসৎ প্রজাও বিনা দণ্ডে অব্যহতি পাইবে। *বস্তুত গবর্নমেন্টের সহিত জমিদারদিগের যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে প্রজার সহিত জমিদারদিগের তদ্রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইলে গোলযোগ একেবারে নিঃশেষ হইবার সম্ভাবনা নাই।*

...গবর্নমেন্ট এবং জমিদার, লেবু চটকাইয়া নিরীহ বঙ্গবাসীদিগকেও তিক্ত ও বিরক্ত করিয়া, ক্রমে বিদ্রোহী করিলেন। যে সকল প্রজা গরুর মত প্রহার সহ্য করিয়া কখন দন্তস্ফুট করে না তাহারা হঠাৎ বিদ্রোহী হইল, ইহা অল্প অত্যাচারের ফল নহে। প্রজারা মর্মাঘাত অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়াছে, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। —*গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ (৪র্থ সপ্তাহ), ১২৮০*

পাবনা প্রদেশের প্রজা বিদ্রোহিতা

পাবনা জেলার অধীন শাহজাদপুর স্টেশনের নিকটস্থ প্রায় ৩০০ শত গ্রামের প্রজা জমিদারদিগের উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে এই সকল প্রজা এক বিঘা জমিতে এক টাকা রাজস্ব দিয়া আসিতেছিল ; কিন্তু জমিদার মহাশয়গণ তাহাদের নিকট নানাপ্রকার বাজে জমায় ১৷৷৹ টাকা হারে কর আদায় করায় ও তাহাদিগের অন্যায্য উৎপাতে প্রজারা বিরক্ত হইয়া "জমিদারকে খাজনা দিব না" বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আমরা শুনিলাম তাহারা দলবদ্ধ হইয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া অন্যান্য প্রজাদিগকে প্রলোভন দ্বারা দলবৃদ্ধি করিতেছে। জমিদার মহাশয়গণ এখন মস্তকে হস্ত দিয়া "কত ধানের কত চাউল" গণনা করিতেছেন। অনেক কাকুতি, মিনতি করিয়াও প্রজাদিগকে বশ করিতে পারিতেছেন না। শুনিলাম প্রজাগণ কালেক্টরিতে নিয়মিত খাজনা দাখিল করিতে চাহে। বাস্তবিক মফস্বলের অনেক জমিদার আজকাল যে প্রকার প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে উপায়হীন প্রজাগণ সহজেই ক্ষেপিয়া উঠে। সেদিন তাঁতিবন্দের জমিদারগণ প্রজাপীড়ন করিয়া বাজে জমা আদায় করিতে চারিদিকে অন্ধকার আর তাহার মধ্যে জোনাকীপোকা দেখিতেছিলেন। পরে বহু ব্যয়ে ব্যরিষ্টার নিযুক্ত করিয়া অনেক ক্লেশে একরূপ অব্যহতি পাইয়াছেন। কিন্তু শুনিলাম, এতেও তাহাদের লোভের শেষ হয় নাই। আমরা তাহাদিগকে এই কথাটি সর্বদা মনে রাখিতে অনুরোধ করি "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"। —আমি একজন।

—*গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, আষাঢ় (১ম সপ্তাহ), ১২৮০*

একখানি পত্র

পাবনা ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে জমিদারদিগের বিরুদ্ধে প্রজাদিগের বিদ্রোহিতার কথা যাহা আমরা পূর্বে লিখিয়াছিলাম তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রজারা উন্মত্ত হইয়া হাল্লা করিয়া বেড়াইতেছে জমিদারের কর্মচারিগণকে দেখিলেই অপমান করে। পুলিশ ও ফৌজাদারিতে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইতেছে না। ইহার ভিতর বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বড় বড় জমিদারদিগের প্রজারা আছে। গোলমাল যাহাতে এখন মিটিয়া যায় জমিদারদের তাহা করা কর্তব্য। তাহাদের এবং তাহাদের কর্মচারিদের দোষই ইহার মূল তাহার সন্দেহ নাই। —*সুলভ সমাচার, ১৮ আষাঢ়, ১২৮০*

পাবনা জেলার অধীন শাহজাদপুর প্রদেশের প্রজাগণ, জমিদারদিগের উপর বিরক্ত হইয়া যে প্রকার বিদ্রোহিতাচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা আমরা পূর্বেই পাঠকদিগকে জানাইয়াছি। বিদ্রোহির দল ক্রমেই বৃদ্ধি হইয়া নানা স্থানে বিস্তার হইয়াছে। পূর্বে কেবল শাহজাদপুরের অধীনস্থ গ্রাম সমূহের প্রজাগণ এই রূপ বিদ্রোহী হইয়াছিল। এবার সিরাজগঞ্জ সবডিবিসনের অধীন যে কয়েকটি স্টেশন আছে প্রায় তাহার সমুদয় প্রজাই ঐ প্রকার ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে দুলাই স্টেশনের কয়েকখানি গ্রামের লোকও এই রূপ ক্ষেপিয়াছে। ইহারা অধিকাংশই মুসলমান, চাঁড়াল এবং অন্যান্য জাতি। জমিদারকে খাজানা দিব না বলিয়া ক্ষেপিয়া ছিল এবার তাহাদের দলবল ক্রমেই বৃদ্ধি হওয়ায় তাহারা নানাপ্রকার অনেক দ্রব্য লুঠ করিয়া পরিশেষে অগ্নি দিয়া কয়েকখানি ঘর পোড়াইয়াছে। শাহজাদপুরের মুনসেফ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ লাহিড়ির বাড়িতে ও অন্যান্য আরও কয়েকখানি বাড়িতে পড়িয়া এই প্রকার লুঠ করিয়াছে। কোন কোন জমিদারের কাছারি বাটি দগ্ধ করিয়াছে। এ প্রকার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াও শাস্তি ভোগ না করায় তাহাদের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি হইয়াছে। জমিদার মহাশয়দিগের এবার আর আহারনিদ্রা নাই, প্রজার দৌরাত্ম্যে কম্পমান হইয়াছেন। তাহাদিগের কর্মচারিগণ কাছারি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ পুলিশ স্টেশনে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। আমরা শুনিলাম এই সকল বিদ্রোহী প্রজা দ্বারা অত্যাচারিত হইয়া কোন কোন জমিদারের কর্মচারি সিরাজগঞ্জে নালিশ করিয়াছিলেন, তাহাতে মোকদ্দমা অপ্রমাণ হেতু ডিসমিস ও ফরিয়াদির শাসন হওয়ায় বিদ্রোহীগণের আস্পর্দ্ধাবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহারা তাহাদের দলের মধ্যে প্রকাশ করে, শ্রীমতী মহারানীর হুকুম হইয়াছে জমিদারদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিলে প্রজার কোন অপরাধ হইবে না। এই অমূল্যক মিথ্যা জনরবে ছোট লোকের মধ্যে দুস্কার্যে বিলক্ষণ উৎসাহ জমিয়াছে। তাহাদের এই দৌরাত্ম্যের বিষয় পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট মান্যবর শ্রীযুক্ত মেঃ টেলার সাহেবের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি স্বয়ং তদারকার্যে মফস্বলে বাহির হইয়াছেন। পরে যে রূপ হয় পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন। আমরা অবগত হইলাম বিস্তর ছোট লোক এই জোট বন্দিতে ভুক্ত হইয়াছে। ইহারা লাঠি, সরকি প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া লুঠপাট করে, সুতরাং ত্বরায় ইহাদের জোট ভঙ্গ না করিলে যে ইহারা ক্রমে ভয়ানক অপরাধের কার্য করিতে সাহসী হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। কেননা যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহাদের দ্বারা সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমাদের মনেও বিলক্ষণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এই জন্য প্রার্থনা করি, শাসন কর্তৃগণ ইহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণের শীঘ্র উপায় করুন। ইহাদের প্রধান প্রধান কয়েকজনকে ধরিয়া শাসন করিলেই দৌরাত্ম্য নিবারণ হয় ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা, তাই বলিয়া হাতে খন্তা দেওয়া উচিত নহে। —*ক্যাম্প নাকালিয়া, ৬ জুলাই*

পাবনা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত টেলার সাহেব নাকালিয়ার ক্যাম্প করিয়া আছেন

বিদ্রোহীদিগের অনেককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তদন্তে লুঠের অনেক দ্রব্য বাহির হইয়াছে। তাহার যেরূপ যত্ন দেখা গেল, একটু কী সত্ত্বর হস্তে কার্য করিলে, বোধ হয় লুঠের অধিকাংশ দ্রব্য পাওয়া যাইবেক এবং বিদ্রোহানল অবিলম্বে নির্বাণ হইবে।

টেলর সাহেবের নিকট বিদ্রোহী রাজার স্টাব্লিসমেন্টের এক তালিকা কোন ব্যক্তি গুপ্তভাবে উপস্থিত করিয়াছে। তিনি তদনুসারে বিদ্রোহী রাজসভার ব্যক্তিগণকে ধৃত করিতেছেন। যাহারা ধৃত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা বিদ্রোহিতা সম্বন্ধে অনেক প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। রাজসভার তালিকার বিবরণ যাহা জানিয়াছি নিম্নে লেখা গেল।

বিদ্রোহী রাজসভার তালিকা

মহারাজা ঈশানচন্দ্র রায়	বিদ্রোহীর রাজা সাঃ দৌলতপুর স্টেশন, সাহাজাতপুর।
খুদি মোল্লা	রাজ মন্ত্রী, যবতলা-স্টেশন, সাহাজাতপুর।
রোমজান সরকার নায়েব	সাঃ ঢলিয়াবাড়ি স্টেশন, ঐ।
জাকের জোয়াদ্দার, গোমস্তা	সাঃ আড়কান্দি, স্টেশন, ঐ।
শম্ভুনাথ পাল	সাঃ মেঘুল্যা, সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট, মৌপুর।
রহিম প্রামাণিক, সর্দার	সাঃ হোড়দিঘলীয়া।
হাজারি প্রামাণিক, পাইক	সাঃ রূপসী।
আরবিন মেধা	মেধা,, সাঃ মহারাজপুর।
নন্দীর সরকার	জরিপ আমিন, সাঃ হাতকোড়া।
জগৎ ভৌমিক	জজ আমিন, সাঃ ঐ।
গঙ্গাচরণ পাল	হুড়াসাগরের পশ্চিম পারের শাসনকর্তা, সাং রুদ্র গাতি।

গঙ্গাচরণ পালের অধীন কর্মচারিগণের নাম প্রকাশ হয় নাই। বড়ল নদীর দক্ষিণ প্রদেশের প্রধান কর্মচারিগণের উপাধি প্রকাশ নাই। সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে কয়েকজনের নাম ফর্দে আছে তাহা নিম্নে নাগডেমরার রাজু সরকার ও ছালু সরকার ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা ও প্রধান কার্য কারক। খরিদা সেখ সাঃ আমশ, দ্বিতীয় বাটি চড়া চিথলিয়া

মানিক সেখ	সাঃ ভিটাপাড়া
কাঙ্খিয়া সেখ	বাঘা বাড়ি
ছালু সরকার	
রাজু সরকার	সাঃ ডেমরা
হরিনাথ বিশ্বাস	দেবলবর মুনসীর বাড়ির কার্যকারক কেহ অনুভব করে,
ও মথুর সরকার	ইহারা গঙ্গাচরণের অধীন লোক, গ্রাম-
হাল মোঃ উল্লাপাড়া ⌋	= গ্রাম বিদ্রোহির জোটনা কারক।

টেলার সাহেবের ওয়ারেন্ট অনুসারে মৌপুরের আউট পোস্টের হেড কনস্টেবল মদন ঘোষ কর্তৃক বিদ্রোহি মহারাজা ঈশানচন্দ্র রায় ধৃত হইয়াছেন। ইহাকে ধৃত করিতে হেড কনস্টেবল বাবু বিশেষ অধ্যবসায়, যত্ন ও বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, এবং একটুকু কষ্টও পাইতে হইয়াছিল। শুনিলাম ইহার এই কৃতকার্যতার সন্তুষ্ট হইয়া টেলার সাহেব ইহাকে সবইন্সপেক্টরি পদে উন্নীত করণার্থ অনুরোধ করিয়াছেন। ঈশানচন্দ্র রায় এক্ষণ নাকালিয়া মোকামে টেলার সাহেবের নিকট আছেন, দেখিয়া আসিলাম। ইনি ধৃত হইলে, নোলেন সাহেব ইহার বাড়িতে খানাতল্লাসী করিয়া কয়েকখানা পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে বিদ্রোহিতা সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে।

ইহাকে গ্রেপ্তার করার সময় যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের নিকট শুনিলাম ইনি ধৃত

হইলে ইহার স্ত্রী প্রকাশ্যরূপে বলিলেন, "পরিণামে আপনার এদশা ঘটিবে জানিয়া পূর্বে নিষেধ করিলে শুনেন নাই, এখন দাসীর কথা ফলিল। আপনি চলিলেন কিন্তু এখন দেশে জমিদারগণ যে আমাকে মুসলমানের সঙ্গে নিকা দিবে তাহার উপাক কি?" ব্রাহ্মণ কন্যার এই অনুশোচনা বাক্য শুনিয়া দেশের জমিদারগণ শুনিলাম যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছেন।

পাবনার কোতোয়ালির ইন্সপেক্টর বাবু শুকগোবিন্দ সিকদার, টেলার সাহেবের ওয়ারেন্ট অনুসারে বিদ্রোহী দলের সুপারিন্টেডেন্ট শম্ভুনাথ পালকে ধৃত করিয়াছেন। শুনিলাম অনেক চেষ্টায় না পাইয়া পরিশেষে কনস্টেবল দ্বারা নোলেন সাহেবের নামোল্লেখ করিয়া ডাকিয়া আনিয়া ধরা হইয়াছে। এরূপ জনশ্রুতি যে শম্ভুনাথ পালের নিকট যে সকল পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ অমুক স্থানের লুটের মাল অমুককে দিবা, অমুক স্থানে অমুক তারিখে লুট করিবা, অমুককে এই কার্যের ভার দিবা ইত্যাদি আদেশ বিশিষ্ট। পত্রগুলি দেখিতে পারি নাই। সুবিধা হইলে পরে দেখিয়া পাঠাইবার যত্ন করিব। রাজ মন্ত্রী খুদি মোল্লার অনুসন্ধানের জন্য দুইজন কনস্টেবল সহ গালার পাখালিয়া সরকার টেলর কর্তৃক ছদ্মবেশে প্রেরিত হইয়াছে। প্রেরিত ব্যক্তির নাম কেহ বলিতে পারিল না। কিন্তু সে ব্যক্তি আকার দীর্ঘের পরিমাণ অপেক্ষা পরিসরে কিছু অধিক, এজন্য এদেশে ব্যবহারিক ভাষায় 'পাখালিয়া' শব্দে খ্যাত উল্লিখিত কয়েক ব্যক্তিই সিরাজগঞ্জ সবডিভিসনের নোলান সাহেবের এলাকাধীন, কিন্তু এটি বড় লজ্জার কথা, যে ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট যত্ন করিয়া ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতেছেন। নোলান সাহেবের এটা কার্যের শিথিলতা কি অসাবধানতা তাহা তিনিই জানেন।

টেলর সাহেবের এই সকল কার্য দেখিয়া, এতদিনে নোলেন সাহেবের চৈতন্য উদয় হইয়াছে। শাকতোলার প্রজাগণ বিদ্রোহী হইতে অস্বীকার হওয়ায় যে সকল বিদ্রোহী তাহাদিগের সর্বস্বান্ত করিয়াছিল নোলেন সাহেব তাহাদের চারি জন প্রজাকে ৩ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাস, ৬০ টাকা জরিমানা, না দিলে আর ১ বৎসর কাবাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন ১২ জন অপরাধী বিচারাধীনে আছে। শাকতোলার বিচার ঐ পর্যন্ত করিয়া তিনি পোতাজিয়া আসিয়াছিলেন। ২০ আষাঢ় তারিখের পত্রিকায় যে পাতিয়াবেড়া লুঠের কথা প্রকাশ হইয়াছিল, সেই ঘটনার কষ্টভোগী নায়েব ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীকে দেখিয়া বোধ হয় তাহার দয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি পাতিয়াবেড়া লুঠের তদারকে যাইবেন বলিয়া পোতাজিয়া হইতে জামিয়তার লুঠের তদারকে গিয়াছেন। টেলর সাহেবও ৭ জুলাই তারিখে সাগরকান্দি গোবিন্দচন্দ্র দত্তের বাড়ি তদারক করিতে গমন করিবেন। এই অবকাশে নোলেন সাহেবের কাছারি দেখিয়া আসিয়া সবিশেষ লিখিতেছি।

গোপালনগরের তদারকে পাবনার ডিস্ট্রিক ডেপুটি মেজেস্টর অমরনাথবাবু নিযুক্ত আছেন। গোপালনগরের প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম্য হইয়াছিল শুনিলাম সেরূপ আর কোন স্থানে হয় নাই, অথচ এ তদারকে যেরূপ লঘু হস্ততা দেখান আবশ্যক ছিল তাহা হইতেছে না। নানা স্থানের লোকে একত্রিত হইয়া লুঠ করিয়াছে। এক স্থানে বসিয়া মৃদুভাবে তদারক করাতে দৌরাত্ম্যকারিগণ সতর্ক হইয়া লুঠিত দ্রব্যাদি গোপন করিবার সময় পাইতেছে। বিলম্ব হইলে সমুদায় দ্রব্য পাওয়ার কোন সম্ভবনা নাই। শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম বিদ্রোহীগণ লুঠ করিয়া যে সকল দ্রব্য লইত, গমনকালে তাহার কিছু গোপন করিত না। পেঁচাখোলার কালাচাঁদ লাহিড়ি উকিলের বাড়ি লুঠ করিয়া সোনার পাঁচলহরী মালা প্রভৃতি অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিয়া প্রকাশ্য ও নিঃশঙ্ক ভাবে গিয়াছিল গোপালনগর হইতে, বান্ধান হুকা ও চাঁদি ফুরশী হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে, ছাতি মাথায় জুতা পায়, পিরাণ গায় দিয়া ধীরে ধীরে গিয়াছিল। বিদ্রোহীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ অনেক দিন পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে বাটিতে লুঠের ফরাশে তাকিয়া লাগাইয়া বসিত। এ প্রদেশ জলে প্লাবিত হইয়াছে. সুতরাং লুঠের দ্রব্য গোপন করা বিদ্রোহিদিগের পক্ষে সহজ হইয়াছে।

আর শুনিলাম বিদ্রোহী রাজার নাম এত বিখ্যাত হইয়াছে যে, ফরিদপুর জেলা হইতে কয়েকজন প্রজা, বিদ্রোহী রাজার হুকুমনামা লওয়ার জন্য কিছু উপঢৌকন সহ আসিয়াছিল। রাজা হুকুমনামা দিতে অস্বীকার হওয়ায় তাহারা বলিয়া গিয়াছে "কর্তা আমাদিগকে পায় ঠেলিলেন কিন্তু আমরা আপনার নাম লইয়াই বিদ্রোহী হইব।" রাজশাহী জেলা হইতেও কয়েকজন আসিয়াছিল। রাজা তাহাদিগকে বলেন "তোরা পর জেলার লোক, আমি হুকুম দিতে পারি না। তোরা আপন জেলায় একটা রাজা করিয়া নে গিয়া।"

গত সংখ্যক পত্রিকায় গঙ্গাচরণ পাল প্রভৃতির ছয় মাস ফাটক ৫০ টাকা জরিমান হাওয়ার কথা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ঠিক নহে তাহাদের ফাটক হয় নাই তাহারা ছয় মাসের মধ্যে কোন অত্যাচার করিতে পারিবে না এই করারে ৫০/৫০ টাকা মুচলেকা দিয়া মুক্তি পাইয়াছিল।

অমৃতবাজার —*গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, আষাঢ় (৩য় সপ্তাহ), মে (জুন), ১৮৭৩*

পাবনার বিদ্রোহ ও কমিশন

পাবনা প্রদেশের গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানার্থ একটি কমিশন নিযুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি, কারণ তাহা হইলে প্রজা এবং জমিদার উভয়ের পক্ষই যে মঙ্গল হইবে এমত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। দরিদ্র প্রজাগণের দুঃখ, দয়াবান, গবর্নমেন্ট যদি একবার জানিতে পারেন, তাহা হইলে দেশে যে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহা কে না স্বীকার করিবে? বিশেষত মহামান্য ক্যাম্বেল সাহেব যেরূপ প্রজাবৎসল, তাহাতে প্রজাদিগের প্রতি যে সুবিচার হইবে এবং প্রজাগণ এতদিন পরে যে অত্যাচারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, ইহা অসম্ভব নহে। কে না জানে যে প্রজাগণ—কৃষকগণ চির অত্যাচারিত, কে না জানে, অনেক সময়ে তাহারা যথাসর্বস্ব প্রদান করিয়া মুক্তি পায় না, কে অত্যাচার করেন? গবর্নমেন্ট না বড় লোক, গবর্নমেন্ট যে প্রজারক্ষক হইয়া তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিবেন তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে; তাহা হইলে প্রজা কি এতদিন রক্ষা পাইত? এবং তাহা হইলে সভ্যতম গবর্নমেন্ট কি কলঙ্কস্পর্শ করিত না? তবে বড় লোক ইহারা কে? হয় জমিদার না হয় ব্যবসায়ী। সাধারণত ব্যবসায়ীগণ অতি নিরীহ, তাহারা প্রায় কাহারও প্রতি অত্যাচার করেন না। কিন্তু আমরা শুনিতে পাই যে প্রায়ই জমিদারগণ প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন। এমন কি শিক্ষিত জমিদারগণেরও দুর্নাম আমরা সময়ে সময়ে শুনিতে পাই। তবে যে শিক্ষিত মান্য জমিদারগণ স্বয়ংই অত্যাচার করেন এমন কথা আমরা বলি না। তাহাদের কর্মকারক সেই অত্যাচারের মধ্যে থাকিলে, আমরা জমিদারকেই সেই দোষ লিপ্ত করিব। আমাদের কোন মান্যবর সহযোগী বলিয়াছেন যে উল্লিখিত কমিশন নিযুক্ত করিতে হইলে তাহাতে একজন হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার জজ সভাপতি হইবেন এবং তাহাতে গবর্নমেন্ট, জমিদার ও প্রজাগণের প্রতিনিধি থাকিবেন তাহা হইলে নিয়মিত মত উচিত অনুসন্ধান হইবে। আমরাও এই মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করি। কিন্তু প্রজাগণ মুর্খ ও দরিদ্র। তাহাদের মনোগতভাব এবং দুঃখ অবগত হইবার নিমিত্ত একটি বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত। গবর্নমেন্টকেই কোন নিরপেক্ষ সূক্ষ্মদর্শী লোক দ্বারা উক্ত কার্য সম্পন্ন করা আবশ্যক। নতুবা শুধু তাহাদের প্রতিনিধির উপর নির্ভর করিলে কোন ফলোদয় হইবে না। প্রতিনিধি কাহাকে বলে, মুর্খ প্রজারা তাহা অবগত নহে। যে ভাল মুখে দুটি মিষ্টকথা বলে, তাহাকেই তাহারা হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করে। এবং সেই জন্যই অনেক সময় গোলযোগে ও বিপদে পতিত হয় কিন্তু তাই বলিয়াই যে প্রজারা অসরল এবং অবাধ্য, ইহা কেহই বলিতে পারিবে না। প্রত্যুতঃ বঙ্গীয় প্রজাগণের ন্যায় শান্ত, প্রভুভক্ত আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদিগের লেঃ গবর্নর বাহাদুর প্রজাবৎসল। ইহাতেই যে তিনি প্রজাগণের পক্ষে, জমিদারের পক্ষে নহে, ইহা কে বলিবে? তিনি ন্যায়ের দিকে। পিতা, দুঃখী পুত্রের

দুঃখে দয়ার্দ্র হইলে অন্য পুত্রগণকে স্নেহ করেন না, ইহা কি কখন বলা যাইতে পারে? একারণে কেহ তাহাকে পক্ষপাতী মনে করিতে পারেন না। পাবনার গোলযোগের সময় লেঃ গবর্নর যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তন্মধ্যে প্রজাগণের উপদেশস্বরূপ একটি বাক্য ছিল যে, জমিদারকৃত রাজবিধি বহির্ভূত কোন অতিরিক্ত দাওয়ার প্রতিবাদ জন্য সকলে শান্তভাবে একত্রিত হওয়ায় কোন নিষেধ নাই" অর্থাৎ তাহা আইন বিরুদ্ধ নহে। এই কথাতে আমাদিগের প্রধান সহযোগী তাহার উপর অত্যন্ত উষ্ণ হইয়াছেন। তিনি ইহাতে যাহা আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি কি এদেশীয় প্রজাগণের ভাব জানেন না। "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" স্কুলে ইহাদের শিক্ষা। মারিয়া ছেড়ে দিলেই ইহারা মহোপকার জ্ঞান করে। ইহারা এ প্রকার মুর্খ যে কি প্রকারে দুঃখের প্রতিবিধান করিতে হয় তাহার কিছুই অবগত নহে। এমত অবস্থায় তাহাদিগকে অত্যাচার হইতে মুক্তির উপায় প্রদর্শন না করিয়া চিরকাল দুঃখসাগরে নিমগ্ন রাখা কি দয়াবান গবর্নমেন্টের কর্তব্য? উক্ত বাক্যে ক্যাম্বেল সাহেব যথার্থ প্রজাবাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সহযোগী বলিয়াছেন যে, ইংলন্ডে শ্রমজীবী দলের মধ্যে সময়ে সময়ে গোলযোগ হয়। সেদিন কুইনের ফারমের শ্রমজীবীগণ বেতন বৃদ্ধি এবং অল্প পরিশ্রমের জন্য ধর্মঘট করে, তাই বলিয়া কি গ্লাডস্টোন সাহেবের এরূপ বলা উচিত যে, বেতন বৃদ্ধি এবং অল্প পরিশ্রমের জন্য মহারানীর ফারমের শ্রমজীবীগণের শান্তভাবে একত্রিত হওয়া আইন বিরুদ্ধ নহে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইংলন্ড এবং ভারতবর্ষের প্রজাগণ কি সমান? ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের সাহস, জ্ঞান এবং বীর্য ইংলন্ডীয় প্রজাগণের ন্যায়? ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ যখন আপনাদের অবস্থা সম্যক অবগত হইবে এবং বুঝিতে পারিবে তখন কি এরূপ অত্যাচার তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে? তখন ভারতবর্ষের আর একদিন উপস্থিত হইবে। দারগার লোক বলিলে যাহাদিগের নিকট হইতে দ্রব্যাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা যে মহারানীর ফারমের শ্রমজীবীগণের স্বরূপ ইহা পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন। জমিদারগণ যে অতিরিক্ত কর আদায় করেন, তাহা আইন বিরুদ্ধ, হয়ত অনেক প্রজাই জানে না। এমত স্থলে তাহাদের স্বত্ব বুঝাইয়া দেওয়া যে গবর্নমেন্টের সম্পূর্ণ কর্তব্য তাহা, কে অস্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহারা যদি জমিদারের যথার্থ প্রাপ্য না দিয়া বলে যে, আমরা কেবল মহারানী বিক্টোরিয়ার প্রজা তাহা গ্রাহ্য হইবে না। এসম্বন্ধে জমিদারদিগের প্রতি গবর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। জমিদারগণের উপরেও যে ক্যাম্বেল সাহেবের দয়া আছে, তাহা কি উক্ত কথাতে প্রকাশ পায় না? সুতরাং আমরা বলি ক্যাম্বল সাহেব কাহারও পক্ষে নহেন, ন্যায়ের পক্ষে।...

—গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, (২য় সপ্তাহ), জুন, ১৮৭৩

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ ও অমৃতবাজার পত্রিকা

অমৃতবাজার যখন অমৃতবাজারে ছিলেন, তখন আমাদের ন্যায় মফস্বলবাসিদিগের সর্বপ্রকার অনুকূলপক্ষ অবলম্বন করিতেন। আমরা তা সময়ের সাহস, নিরপেক্ষ ভাবাদি দর্শন করিয়া আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম। বাস্তবিক, নগরবাসিরা, যেমন নগরাদির অবস্থা পর্যাপ্তরূপে অবগত হইতে পারেন, মফস্বলবাসিরাও তদ্রূপ মফস্বলের অবস্থাদি সম্যক অবগত হইতে পারেন। আমাদের প্রিয় অমৃতবাজার, পল্লিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগর, বিশেষত রাজধানীবাসী হইয়াছেন, দুঃখী প্রজাদিগের দুঃখের দশা কেমন করিয়া অনুভব করিবেন? করিতেও লজ্জাবোধ করেন। আমরা দুঃখিত হইয়া বলিতেছি, অদ্য কয়েক সপ্তাহ কেবল প্রজাদিগের প্রতিকূল পক্ষই অলবম্বনের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, সম্প্রতি ১০ শ্রাবণের অমৃতবাজারে প্রকাশিত কয়েক পক্তিপাঠ করিয়া আমরা একেবারে অবাক হইয়াছি। এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, "প্রকৃতই যদি রাজশাহীর কমিশনর জমিদারদিগকে কম হারে খাজানা লইয়া প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন, তবে ইহা অপেক্ষা ভয়ানক আজ্ঞা

আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার অর্থ কি? "ইহা অপেক্ষা ভয়ানক আজ্ঞা আর কিছুই হইতে পারে না"—এ কি প্রকার ভয়ানক আজ্ঞা আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে কিছুই অনুভব করিতে পারি না। আমরা বলি, মহামান্য কমিশনর সাহেব, যদি এই প্রকার আজ্ঞা প্রচার করিয়া থাকেন এবং নিজে মধ্যস্থ হইয়া জমিদার ও প্রজামণ্ডলীর মধ্যে প্রকৃত শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন, তবে কেম্বল বাহাদুরের প্রচারিত ঘোষণা এবং তাহার আজ্ঞা অবশ্যই সুফল প্রসবিনী হইবে সন্দেহ নাই। আমরা সম্পাদক মহাশয়কে এতদ্বারা নিন্দা বা প্রশংসা করি না, সর্বান্তকরণে বলি তিনি ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রকৃত দেশ হিতৈষিতা প্রদর্শন করুন। জমিদার ও প্রজার মধ্যে যাহাতে চিরশান্ত স্থাপিত হয়, ও যাহাতে উভয়পক্ষই রক্ষা পায়, প্রধান প্রধান পত্র সম্পাদকদিগের তদ্রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করাই কর্তব্য। এতদ্দেশীয় প্রজাগণ নিতান্ত মুর্খ, দুর্বল, কর্তব্যাকর্তব্য বোধ শূন্য। কিসে আপনাদিগের ভাল মন্দ হয় কিছুই বুঝতে পারে না। তাহারা অহরহ যেরূপ প্রবল জমিদারাদি কর্তৃক নিপীড়িত হইতেছে, যদি পত্রিকাসম্পাদক ও গবর্নমেন্ট, তাহাদের প্রতিভূ না হন, তবে তাহারা আশ্রয় শূন্য হইয়া যে বিপথগামী হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? *—গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, (৩য় সপ্তাহ), জুলাই, ১৮৭৩*

সাপ্তাহিক সংবাদ

আমরা জানি, সভ্যতম ইংলিশ গবর্নমেন্টের রাজনীতি এই যে, লোকে যতক্ষণ অপরাধী বলিয়া গণ্য না হয়, সে পর্যন্ত কেহ তাহাদিগের প্রতি অপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে না, অপরাধীও ব্যবস্থানুসারে দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। নবাবি সময়ের ন্যায় স্বেচ্ছা-ব্যবস্থায় দণ্ডিত হয় না। পাবনা হইতে কোন প্রধান ব্যক্তি অমৃতবাজার পত্রিকায় যে এক পত্র লিখিয়াছেন তৎপাঠে আমরা বিস্মিত হইলাম। সিরাজগঞ্জ প্রদেশীয় যে সকল প্রজা, বিদ্রোহী সন্দেহক্রমে ধৃত হইয়াছে, পাবনার প্রকাশ্য পথে পশুর ন্যায় দাঁড় করাইয়া, কনস্টেবলেরা তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়া থাকে। এই সম্বাদ যদি সত্য হয়, তবে বিধি বহির্ভূত প্রদেশ আর কাহাকে বলে? কোকাহত্যাকারী কোয়ান সাহেবের ন্যায় প্রজাদিগকে যে এতদিন তোপে উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই, সেই আশ্চর্য! বোধ করি, আমাদিগের লেপটেনেন্ট গবর্নর ক্যাম্বেল বাহাদুর, তাড়াতাড়ি ঘোষণাপত্র প্রকাশ না করিলে, জঙ্গল গ্রামবাসী প্রজাদিগের ন্যায় পাবনা অঞ্চলের প্রজাদিগেরও দুর্দশা হইত এবং কোকাদিগের ন্যায় এই দুঃখীলোকেরা তোপের মুখে সপরিবারে জীবন আহুতি দিত। লেপটেনেন্ট গবর্নর বাহাদুর যে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে এই দুর্বল লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা কে না স্বীকার করিবে, তাহার এই যশঃ উজ্জ্বল বুধ নক্ষত্রের ন্যায় বঙ্গদেশে চিরকাল প্রকাশিত থাকিবে। আমরা প্রার্থনা করিতেছি, বিচারে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে প্রজারা দণ্ডভোগ করুক, কিন্তু যে পর্যন্ত বিচার নিষ্পত্তি না হয়, সে পর্যন্ত যেন কেহ নির্যাতন সহ্য না করে, সে বিষয়ে তিনি মনোযোগ বিধান করুন।

—গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, (৩য় সপ্তাহ), জুলাই, ১৮৭৩

জমিদার ও প্রজা

আমরা জমিদারদিগের সহিত প্রজাদিগের যে সচরাচর বিবাদ উপস্থিত হয় এবং উক্ত নিবারণের উপায়, যাহাতে প্রজাগণ জমিদারকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও জমিদার প্রজাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, উভয়ই লাভবান হইয়া সুখী হইতে পারেন, যথাসাধ্য ইহা সবিশেষ পাঠকদিগকে ক্রমান্বয়ে অবগত করিব। এতদিনের পর পাবনা প্রদেশের প্রজাবিদ্রোহ সম্বন্ধে যে একখানি পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, সাদরে তাহা অদ্য এই স্থলে প্রকাশ করিলাম। অনন্তর আমাদিগের অভিপ্রায় ক্রমশ প্রকাশ করিব।

আগতপত্র

পাবনা প্রদেশের প্রজাবিদ্রোহ

ইসাবসাহী পরগণা, পূর্বে মহামান্য নাটোরের রাজাদিগের অধীন ছিল। উক্ত রাজপরিবারের দরবস্থায়, নিলামে বিক্রীত হইয়া পাঁচ জন জমিদারের হস্তগত হয়। যথা কলিকাতা নগরীর ঠাকুর, ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়, সলপের সান্যাল, স্থলের পাকড়াশি এবং পোরজানার ভাদুড়ি পরিবার।

নাটোররাজের রাজত্ব সময় ভূমির কর অতি সামান্য ছিল। প্রতি বিঘার খাজানা ।৵৹ আনা হইতে ।।৵৹ আনা। নূতন জমিদারেরা, ক্রমান্বয়ে কর বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করেন। তাহাদিগের সেই আশা আমরা দুরাশা বলিতে পারি না। কারণ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। জমিদারগণ, কর বৃদ্ধির নিমিত্ত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে কোন প্রকার গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা, ব্যয় বাহুল্য এবং আদালতের মোকদ্দমার ফল অনিশ্চিত, ইত্যাদি বিবেচনায় ৵৹ দুই ৵৹ এক আনা আবাওয়াব খরচা স্বরূপ বৃদ্ধি করিলেন। প্রজাগণও জমিদারের দায় এবং এক আনা আধা আনার নিমিত্ত বিবাদ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধি প্রদান করিল। ১৫ বৎসর পূর্বে যে জমির খাজানা এক টাকা ছিল সেই জমির ।।৹ আনা বৃদ্ধি হইয়া ১।।৹ টাকা হইল। এই নিয়মে সাত বৎসর গত হয়। একদা জমিদারেরা, জমি বিশেষের খাজানা আরও চারি আনা বৃদ্ধি করেন। তাহা আদায়ও হয়। পরিশেষে ১৮৭০ সাকলে খাজানা আরও।৹ চারি আনা বৃদ্ধি করা হইলে, কোন কোন প্রজা তাহা এক বৎসর প্রদান করে কিন্তু অধিকাংশ প্রজাই জমিদারের বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠে।

একটি বিশেষ মহল ভিন্ন অধিকাংশ প্রজাই নির্ব্বিবাদে অতিরিক্ত কর প্রদান করিতে ছিল। যে অল্প সংখ্যক প্রজা তাহার বিরুদ্ধাচারণ করে, জমিদার তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে যথাসাধ্য ক্রটি করেন নাই। এবং তজ্জন্য স্থানে স্থানে বিলক্ষণ অত্যাচার ও প্রজা পীড়নও হইয়াছে। ইতিমধ্যে ওড়িশার জমিদারগণ, বেআইনি কর গ্রহণ করিয়া যে রূপ বিপদগ্রস্ত হন, সেই দৃষ্টান্ত ভয় প্রাপ্ত হইয়া সলপের সান্যাল জমিদারগণ, প্রজাবর্গের নিকট হইতে কবুলিয়ত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। আমরা পূর্বে যে সকল আবওয়াব ও কর বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছি, এই সমুদয় কবুলিয়তে তদতিরিক্ত আরও অনেকগুলি অন্যায্য খরচা বার করিয়া সমুদায়কে খাজনা বলিয়া গণ্য করা হয়। কোন কোন গ্রামের লোক ঐরূপ কবুলিয়াত লিখিয়া দেয় এবং কতকগুলি গ্রামের লোক তাহা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ গ্রামের লোকই তাহা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। জমিদারগণ বাধ্য হইয়া শাহজাদপুরের মুনসেফিতে অভিযোগ উপস্থিত করেন। প্রজাগণ, পূর্ব হিসাবে খাজনা আমানত করিয়া মোকদ্দমার জবাব দেয়। মুনসেফ জমিদারের দাবি ডিক্রি দেন। আপিল হওয়াতে জজসাহেব, মুনসেফের হুকুম রদ করিয়া প্রজাদিগের স্বীকৃত জমা ডিক্রি দেন। যে সকল প্রজা পূর্বে বৃদ্ধি দিয়াছিল তদ্দৃষ্টে তাহারা ও বক্র হইয়া ওঠে। এই সময় ঈশানচন্দ্র রায় নামক এক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে, বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারবাবুরা, আপন কাছারিতে ধরিয়া লইয়া যান ও যারপর নাই অপমান এবং তাহার নিকট হইতে অনেকগুলি টাকাও আদায় করেন। ঈশানচন্দ্র রায়, প্রজাদিগের ভাবগতি দেখিয়া দাদ তুলিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এবং তাহার গোমস্তা শম্ভুনাথ পাল, অসহ্য অপমানে ক্ষিপ্ত হইয়া, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়া প্রজাদিগের ক্রমে জোটবন্দি করিলেন। প্রজাগণও ক্ষিপ্ত হইয়া খাজানা দেওয়া একেবারে বন্ধ করিল। ঈশান মহারানীর প্রতিনিধি সদৃশ্য পাবনা জেলার প্রজাবর্গের রাজা স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। প্রজারাও আপনাদিগকে মহারানীর খাস প্রজা মনে করিতে লাগিল। ঈশান প্রজাদিগকে বলিলেন, অতি পূর্বে খাজানার যে হার ছিল তাহাই তোমাদিগকে দিতে হইবে। মুক্দম্ সাহেব ৪১ ইঞ্চি

হাতে জমি মাপ হইবে এবং সমুদায় বেআইনি কর বন্ধ হইয়া যাইবে। জোটবন্দি প্রজারা, খাজানা দিবে না, প্রথমত এই কল্পনা করিয়া ছিল কিন্তু শেষে তাহা অন্যায় বিবেচনা করিয়া, যাহাতে মুক্দম্ সাহেব হাত প্রচলিত এবং সাবেকহারে তাহাদিগের জমাবন্দি হয়, তাহারা সেই চেষ্টা দেখিতে লাগিল। এই সময় দুই এক জমিদারের প্রতি অত্যাচার, ঘর জ্বালানী ও লুঠপাট প্রভৃতি আইন বিরুদ্ধ কার্য আরম্ভ হইল। জেলার কর্তৃপক্ষগণ, এতদূর হইবে অগ্রে বিশ্বাস করেন নাই, পরে ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজকর্মচারি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা পান। প্রজাগণ, তখন তাহাদিগের প্রতি সুবিচার হইবে মনে করিয়া জোটভঙ্গপূর্বক চতুর্দিকে প্রস্থান করে। অনেকগুলি প্রজা, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বন্দিভূত ঈশান রায় ও তাহার গোমস্তা ধৃত হয়। বর্ষার জল নিঃশেষের ন্যায় সমুদয় গোলযোগ নিঃসারিত হয়।

পাঠকগণ! আগত পত্রখানি এতক্ষণ পাঠ করিলেন, ইহার পূর্বে আরও দুই একখানি পত্র ও রাজশাহী বিভাগের কমিশনার সাহেবের রিপোর্ট গ্রামবার্তায় প্রকাশিত হইয়াছে। সকলেরই এক ভাব ও এক তাৎপর্য। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যাহা বলিয়াছেন ও কমিশনার সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, পত্র প্রেরকগণও সেই কথা বলিতেছেন। সকলের সার সংগ্রহ করিলে ইহাই প্রতীতি হয়, বিনাবাতাসে নদীতে ঢেউ উঠে নাই। যে জমিদার অগ্রে অত্যাচার করিয়াছেন, তিনি পরে অত্যাচারিত হইয়াছেন। সুতরাং জমিদার ও প্রজাকেই রাজনিয়ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এই দোষ যাহারা কেবল প্রজা কি জমিদারের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া এক সম্প্রদায়কে তুলসীপত্রের ন্যায় নির্দোষ এবং অপর সম্প্রদায়কে সমস্ত দোষে দোষী করিতে চাহেন, তাহারা ন্যায়ের মস্তকে পদার্পণ করিতেছেন, সন্দেহ নাই। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং অদ্যও বলিতেছি, সকল প্রজা কি সকল জমিদারদুষ্ট নহেন। নির্বাচনপূর্বক শাসন করা কর্তব্য। ...জমিদার এ দেশের রাজা, ইহা অত্যুক্তি নহে। পিতার ন্যায় প্রজার সর্বপ্রকার ভরসার স্থল। আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে জমিদার স্বার্থানুরোধে পুত্রবৎ নিরীহ প্রজাগণের প্রতি এইরূপ বিসদৃশ, ধর্ম ও ন্যায় বিগর্হিত আচরণ করিতে পারেন, তাহা দ্বারা কি না সম্ভবে? এমন ব্যক্তির হস্তে (সদস্য নির্বাচন না করিয়া) দশ আইন ব্রহ্মাস্ত্র অর্পণ করা কি কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইয়াছে? ...আমরা দেখিতেছি, ঈশান রায়ের ক্ষিপ্রতা ও প্রজা কর্তৃক সকল অত্যাচার, স্বার্থপরতা ও অবিমৃষ্যকারতাই তাহার কারণ। এক জমিদারের নিমিত্ত সকলের আশা ও বিড়ম্বনা নিতান্ত দুঃখের সন্দেহ নাই। আমরা তন্নিমিত্ত কর্তৃপক্ষদিগকে বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, কমিশন নিবুক্ত করিয়া কোন জমিদার সৎ ও কোন জমিদার অসৎ নির্বাচন পূর্বক দুষ্টকে শাসন ও শিষ্টকে পালন করুন। এ বিষয়ে বিলম্ব করা শ্রেয় নহে।

—*গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, ১৩.৮.১৮৭৩*

প্রজা বিদ্রোহিতা

পাঠকগণ অবগত থাকিতে পারেন, .. পাবনা ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে ... প্রজা বিদ্রোহিতা আরম্ভ হইয়াছে। ... সান্যাল, পর্যনার ভাদুড়ি, স্থলের পাকড়াশি, নহাটার ভট্টাচার্য কাশীপুর .. মুড়াপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলিকাতার ঠাকুর জমিদারদিগের জমিদারির এবং আরো বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারদিগের তালুকাতের সহস্র সহস্র প্রজা এই বিদ্রোহ কাণ্ডে যোগ দিয়া ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অত্যাচার ... তাহাদিগের মধ্যে অনেক ... আছে। তন্মধ্যে দৌলতপুর নিবাসী ... রায় জগতোলা নিবাসী খুদিমোল্লা এবং রুদ্রগাঁতি নিবাসী গঙ্গাচরণ পাল প্রধান মধ্যে গণনীয় ইহাদিগের পরামর্শ ও আদেশানুসারে বিদ্রোহী প্রজারা যাবতীয় কার্যানুষ্ঠান করিতেছে। সততই তাহার দলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। যে তাহাদিগের সহিত যোগ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহাকে অনতিবিলম্বে সর্বস্বান্ত হইয়া অগত্যা তাহাদিগের সহিত যোগ

দিতে বাধ্য হইতে হয়। এইরূপে কত লোকের প্রতি যে বিদ্রোহীদিগের দ্বারা কত অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার নির্ধারণ করা কঠিন। শুদ্ধ কেবল সামান্য প্রজাদিগের উপরই অত্যাচার হয়, এমন নহে, তালুকদার জমিদারদিগের প্রতিও অত্যাচারের একশেষ হইতেছে। অস্ত্রশস্ত্র সহকৃত বিদ্রোহী প্রজাদিগ কর্তৃক অনেকেরই সম্পত্তি অপহৃত হইতেছে, বাটি লুণ্ঠিত হইতেছে, গৃহদাহ, শারীরিক উৎপীড়ন এবং স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ পর্যন্তও অক্লেশে সম্পাদিত হইতেছে। অনেকে অন্তঃকরণে এরূপ ভয় সঞ্চার হইয়াছে যে কখন কাহার কি দুর্দশা হয়—কখন কাহাকে অপমানিত, সর্বস্বান্ত ও জাত্যন্তরিত হইতে হয় তাহার নির্ণয় নাই। এই নিমিত্ত অনেকেই স্ব স্ব পরিবার ও জিনিসপত্র স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেছেন। শুনিলাম উপরিউক্ত অঞ্চলের অনেক ভদ্রলোকের পরিবার, বিদ্রোহী প্রজাদিগের দৌরাত্ম্য ভয়ে জাফরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ এবং ঢাকায়ও প্রেরিত হইয়াছে। আহা! ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে!

কি নিমিত্ত এই ভয়ঙ্কর প্রজা বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, এতৎ-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথার উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, উপরিউক্ত স্থানসমূহের প্রজা ও জমিদার পরস্পর মধ্যে বহুকাল হইতে মনোবাদ ও বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। কোন কোন জমিদার উচ্চ হারে খাজনা আদায় করাতে এবং আরো উচ্চ হারে খাজনা আদি তলব করাতে প্রজাদিগের বিরাগ উপস্থিত হয়। তৎপর কোন কোন বিষয়ে জমিদার ও প্রজাদিগের মধ্যে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে কোন কোন বিচারক লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের প্রসাদ লাভাকাঙ্খাই হউক, নিজ ইচ্ছায় হউক অথবা কারণান্তর প্রযুক্তই বা হউক, জমিদারদিগের প্রতি নিগ্রহ ও প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহাতেই নির্বোধ প্রজাদিগের ঐকান্তিক প্রশ্রয় বৃদ্ধি পায়। বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারগণ প্রায় ১৪০০০ কুবলিয়তপত্র রেজিস্টারি করিবার নিমিত্ত সিরাজগঞ্জ সবডিবিজনের ভারপ্রাপ্ত নোলেন সাহেবের নিকট অর্পণ করেন। নোলেন সাহেব প্রচলিত নিয়মানুসারে ঐ সমস্ত কবুলিয়ত রেজিস্টরি করিয়া জমিদার পক্ষীয় মোক্তারের নিকট প্রত্যর্পণ করেন নাই, প্রজাদিগের হস্তে ফিরাইয়া দিয়াছেন। এতদ্বারাই প্রজারা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে, ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগের সপক্ষ এবং তাহারা গবর্নমেন্টের আশ্রয় পাইয়াছে, সুতরাং জমিদারের তাহাদিগের আর কিছুই করিতে পারিবেন না। এই ঘটনার পরেই তাহারা বলিয়া বেড়াইতেছে যে "মহারানীর নিকট হইতে এরূপ হুকুম আসিয়াছে. জমিদারেরা আমাদিগকে যে হাতে জমি মাপ করিয়া দেন, তাহা ঠিক হাত নয়। বক্ষের মধ্যস্থান হইতে অঙ্গুলির সীমা পর্যন্ত এক হস্তের পরিমাণ। জমিদারদিগের এই হারে মাপ আমাদিগের জমি জরিপ করিয়া জমাবন্দি করা উচিত। খাজনার নিরেক সম্বন্ধে মহারানী এই বলিয়াছেন যে, ন্যূন সংখ্যায় ।০ আনা ও উর্ধ্ব সংখ্যা ।।৶ থাকিবে। ১৫ আষাঢ়ের মধ্যে যাহারা জমিদারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবে, তাহারা গবর্নমেন্টের প্রজাশ্রেণীভুক্ত হইয়া উক্তরূপ ফলভোগ করিতে পারিবে ইত্যাদি। এইরূপ অমূলক আশ্বাসদান ও সঙ্গে সঙ্গে দৌরাত্ম্য প্রকাশ করাতে যে ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক প্রজা বিদ্রোহি দলভুক্ত হইয়া পরিশেষে দস্যুবৎ আচরণ করিতেছে, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু "সর্বসত্যন্ত গর্হির্তম্" কোন বিষয়েরই আতিশয্য ভাল নয়। সিরাজগঞ্জের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট নোলেন সাহেব বোধ হয় প্রথমে কখনই এরূপ মনে করেন নাই যে, সময়ে প্রজাদিগের বিদ্রোহ এতদূর ভয়ানক হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইদানীন্তনী ঘটনা দৃষ্টে অনুমান হয়, তিনিও এই বিদ্রোহের ভীষণাকৃতি দর্শনে ভীত হইয়াছেন এবং কিসে সত্বর উহার প্রশমন হইবে, তদুপায় বিধানে মনোযোগী হইয়াছেন, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইবেন বলা যায় না। "গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে" ফল প্রত্যাশা কি? যাহা হউক আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কোন এক মোকদ্দমা উপলক্ষে তিনি বিদ্রোহীর অন্যতম সরদার গঙ্গাচরণ পাল প্রভৃতির ছয় ছয় মাস কারাবাস এবং পঞ্চাশ

পঞ্চাশ টাকা জরিমানার আদেশ করিয়াছেন। ইদানীং পাবনার ম্যাজিস্ট্রেটও নাকি প্রজ্জ্বলিত বিদ্রোহাগ্নির নির্বাপণে মনোযোগী হইয়াছেন। রাজশাহীর কমিশনার শীঘ্র পাবনায় আসিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। কতকগুলি সৈন্যসহ পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট ও গোয়ালন্দের কোর্ট ইনস্পেক্টরকেও ঘটনাস্থলে আগমন করিবার আদেশ করা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে কোন কোন স্থানের বিদ্রোহিগণ সম্প্রতি ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। ঢাকার কমিশনার সাহেবেরও সৈন্যসহ সত্বর তথায় যাইবার সম্ভাবনা আছে। কর্তৃপক্ষ ... মনোযোগ বিধান করিয়াছেন, তখন যে প্রোক্ত বিদ্রোহবহ্নি, নির্বাপিত হইবে তাহাতে সন্দেহ হইতেছে না।

এই পর্যন্ত লেখা হইলে পর আমরা জানিতে পারিলাম ... লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বাহাদুর উপরিউক্ত বিদ্রোহিতা সম্বন্ধে গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে একখানি ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন। তাহার সারমর্ম এই—

যেহেতু পাবনা জেলার জমিদারগণ খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করাতে প্রজারা দলবদ্ধ হইয়া অনেক স্থানে হেঙ্গাম ও গোলযোগ করিতেছে এবং তদৃশতঃ গুরুতর রূপে শান্তিভঙ্গ হইয়াছে, অতএব তৎসম্পর্কীয় সমুদায় ব্যক্তিদিগকে অতি গম্ভীরভাবে সতর্ক করা যাইতেছে যে, গবর্নমেন্ট যেমন জমিদারদিগের বলপূর্বক অর্থগ্রহণরূপ অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং জমিদারদিগের কেবল আইন সঙ্গত দাবি মাত্র সাব্যস্ত করিবেন, তেমনই প্রজাদিগেরও যাবতীয় বেআইনি কার্য নিবারণে দৃঢ়চেষ্টা হইবেন। পরন্তু যে কোন শ্রেণীর লোক হউন না কেন, আইন বিরুদ্ধ কার্য করিলে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করিবেন।

দলবদ্ধ প্রজা ও অন্যান্য লোকদিগকে জানান যাইতেছে যে, তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া শান্তভাবে তাহাদিগের দুঃখ সকল জ্ঞাপন করুক। তাহারা শান্তভাব ধারণ করিলে তাহাদিগের কথা সকল ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করা যাইবে। কিন্তু গবর্নমেন্ট কর্মচারিগণ হেঙ্গামাকারিদিগের কথা শুনিতে পারেন না প্রত্যুত ঐ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠিনতর উপায় অবলম্বনই করিবেন। যেসব লোক জমিদারগণের দাবির বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াছে, তাহারা কেবল শ্রীমতী মহারানীর রাইয়তী করিবে এরূপ বলিতেছে। এই সমস্ত লোক এবং যাহারা তাহাদিগের কথা শুনে তাহাদিগকে সাবধান করা যাইতেছে যে, ...অবশ্যই দিতে হইবে। জমিদারগণের অতিরিক্ত দাবির বিরুদ্ধে শান্তভাবে একত্রিত হওয়া আইন সঙ্গত কিন্তু বলপ্রয়োগ ও ভয় প্রদর্শনের নিমিত্ত দলবদ্ধ, হওয়া আইনসঙ্গত নহে। *—ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আষাঢ়, ১২৮২ . ৬ জুলাই, ১৮৭৩*

... the rebellion is not confined now to the sub-division of Serajunge, but that it is gradually spreading all over Pubna. In regard to the cause of it, he says: —In former days, the ryots made but little money by means of cultivating fields, and hence the rate of the rents paid by them was very low. In course of time, however, lands formerly under water rose higher and the cultivation of jute was extensively carried on which led the zemindars to enhance the rents, to four or five times the amount previously paid by the ryots. This was the commencement of the misunderstanding between the two parties. In the meantime Mr. Nolan was appointed to Serajgunge. He showed a little kindness to the ryots, which emboldened them to some extent. The Banerjea zemindars of Cossipore lately presented to Mr. Nolan about fourteen thousand *Kabuliats* for registration. He registered them according to existing regulations, and instead or returning them to the

mooktear of the zemindar, made them over to the ryots, has produced a conviction on the minds of the latter that they enjoy the protection of the Government and the Zemindars will not be able to do anything to them. They have consequently risen against all the zemindars and the number of mal-contents is gradually increasing. The insurgents have three leaders in the persons of Ishan Rai of Dowlotpore to the east of the Hoorsagur river, Khudi Molla of Jagotollah, and Ganga Charan Pal of Rudraganthi to the west of the Hoorsagur river. —*অমৃতবাজার পত্রিকা,* ৩ ৭.১৮৭৩

গতকল্য কৃষ্ণবিহারী দাসের নামীয় মোক্তারের পত্রে জানা গেল যে উল্লাপাড়া মোতালকের বিদ্রোহীদিগের প্রধান গঙ্গাচরণ পাল প্রভৃতির ছয়মাস করিয়া মেয়াদ ও ৫০ টাকা জরিমানার হুকুম হইয়াছে নোলেন সাহেব পুলিশের উপর পরওয়ানা জারি করিয়াছেন যে পুলিশ প্রত্যেক হাটের দিবস সাধারণের জ্ঞাতার্থে ঢোল দিবে যে কোন বিদ্রোহী প্রজা দশজন একত্র হইয়া জমায়তবস্ত হইবে পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিবেক।

—*অমৃতবাজার পত্রিকা,* ৩.৭ ১৮৭৩

পাবনা জেলাস্থ ইস্তকসাহী পরগণায় প্রজা বিদ্রোহানল দীর্ঘকাল প্রধূমিত থাকিয়া অধুনা এতদূর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে যে, জমিদারগণ নিরন্তর শান্তিবারি সেচন করিয়া নির্বাণ করিতে পারিতেছেন না। বর্তমান জমিদারদিগের অনেক সহিষ্ণুতা দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু প্রজানল প্রজ্জ্বলিতই রহিয়াছে। জনরব যে, প্রবল বাত্যা নাকি বিদোহানলের সহায়তা করিতেছে। জনরব সত্য হইলে, অচিরেই হয় প্রজা না হয় জমিদার ইহার একতর পক্ষ দগ্ধীভূত ও অপরপক্ষ নিরস্ত হইয়া পড়িবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি বিদ্রোহী প্রজারা নাকি মৎস্য ধরার ভান করিয়া জমিদার-ভক্ত প্রজাগণের বাড়িতে পড়িয়া লুটপাট করিতেছে। এ সম্বন্ধে পাবনা ও সিরাজগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের বিশেষ অনুসন্ধানপূর্বক দমনের চেষ্টা করা উচিত। —*এডুকেশন গেজেট,* ৪.৭.১৮৭৩

পাবনার কৃষক বিদ্রোহ

পাবনা প্রদেশীয় প্রজাদিগের গোলযোগ আশু একপ্রকার নিবারিত হইয়াছে, তাহারা কোন প্রকার অত্যাচার করিতেছে না। ন্যায় ও আইনের বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করিলে যে বিষময় ফল ভোগ করিতে হয়, জমিদার ও প্রজা উভয়েই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু যে সকল কারণ হইতে এই গোলযোগ উৎপত্তি হয়, তাহা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। ভূমি পরিমাণের গজ ও খাজানার হারই প্রধান কারণ। গবর্নমেন্ট উক্ত দুই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া না দিলে তুষাবৃত বহ্নি পুনর্বার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। তখন আবার সেই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ যে উপস্থিত হইবে না, সাহস করিয়া কে বলিতে পারে? হিন্দু রাজত্বের সময় শস্যাদির অংশ কর স্বরূপ গৃহীত হইত। উক্ত নিয়মে রাজা, প্রজার সহিত তুল্যাংশে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেন। প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপন্ন হইলে রাজার ধনাগার পূর্ণ এবং প্রজাও সুখী হইত। উৎপন্ন না হইলে প্রজার ন্যায় রাজাও ক্ষতি স্বীকার করিতেন। এক্ষণে উক্ত নিয়ম পরিবর্তিত হইয়াছে। ভূমি উর্বর হইয়া অধিক শস্য প্রদান করিলে, দশ আইনানুসারে জমিদার তাহার অংশভোগী হইতেছেন, অনাবৃষ্টিতে শস্য দগ্ধ এবং অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ধৌত হইলে, কেবল প্রজাই সেই ক্ষতি স্বীকার করে। ইহার সরল কথা এই, লাভ জমিদারের, ক্ষতি প্রজার। যাহারা ক্ষতির ভাগী, ক্রোড়ে কিছু লাভ না থাকিলে, তাহারা কোথা হইতে সেই ক্ষতি পূর্ণ করিবে। অত্যন্ত

দুঃখের বিষয়, এই সহজ কথা অনেকেই বুঝিতে পারেন না। অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব সময়, প্রজারা স্বোপার্জিত ধান্যাদির অষ্টাংশ রাজকর প্রদান করিত। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময়ও ঐ প্রকার নিয়ম প্রচলিত ছিল, প্রাচীন গ্রন্থে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুসলমান ভূপতিরা দুর্দান্ত ছিলেন বটে, কিন্তু প্রজাকে চর্বিতচর্বণ করেন নাই।

কেবল পাবনা ও সিরাজগঞ্জ প্রদেশের নহে, অনেক প্রদেশের প্রজাগণই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে। ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া সংবাদ পাইয়াছেন, ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায়ও পাবনা প্রদেশের ন্যায় গোলযোগ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সাপ্তাহিক সমাচার বলেন, কোন কোন জমিদারের অত্যাচার নিবন্ধন, হুগলি জেলাতেও অগৌণে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। প্রজার মনের ভাব আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, কেবল দৃঢ় শাসনে তাহারা নিরস্ত হইয়া থাকিবে না। জমিদারের সহিত তাহাদিগের কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াই গবর্নমেন্টের কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ এই তিন রাজাদিগের রাজত্বকালের ভূমির অবস্থা ও হার, সবিশেষ আলোচনাপূর্বক জমিদারের সহিত প্রজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া না দিলে, গবর্নমেন্ট আইন কৌশল ও বল প্রয়োগে এখন চিরশান্তি স্থাপন করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। —*গ্রামবার্তা প্রকাশিকা,* ২৩.৮.১৮৭৩

সিরাজগঞ্জ প্রদেশের প্রজাবিদ্রোহ

জমিদারের দৌরাত্ম্যে উক্ত প্রদেশের যে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হয়, একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। তৎপ্রদেশীয় সকল জমিদার অত্যাচারী এবং তাহাদিগের দোষেই সেই লোমহর্ষক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা আমরা পূর্বেও বলি নাই এবং এখন স্বীকার করিতেছি না। দুই একজন প্রধান জমিদারের অন্যায় কর বৃদ্ধি হইতে ঐ ভয়ানক অগ্নির প্রথম উৎপত্তি হয়। যেমন কোন গৃহস্থের অনবধানতায় তাহার গৃহে আগুন লাগিলে সেই সঙ্গে গ্রামবাসী অপরাপর অনেক ব্যক্তির সর্বনাশ হইয়া থাকে, সিরাজগঞ্জ প্রদেশের অবস্থাও যে তদ্রূপ হইয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রজারা পূর্ববৎ সহজে খাজানা প্রদান না করায়, অনেক ক্ষুদ্র জমিদারের বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা উর্ধতন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষদিগকে প্রার্থনা করিতেছি, প্রজারা যাহাতে সহজে রাজস্ব প্রদান করে তদ্রূপ উপায় বিধান করুন। অত্যাচারী জমিদারদিগের প্রতি তাহাদিগের যেমন দৃষ্টি আছে, নির্দোষ জমিদারদিগের প্রতিও যেন তদ্রূপ দৃষ্টি থাকে। অন্যথা অনেকের উচ্ছিন্ন যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই উপলক্ষে আমাদিগের কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আক্ষেপপূর্বক যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল। পাঠ করিলেই কর্তৃপক্ষ সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন।

মহাশয়! আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র জমিদারের দুরবস্থা আর কি লিখিয়া জানাইব। প্রজাগণ কর আদায় করিতেছে না। তাহারা ইত্যগ্রে বাড়ি লুঠ করিতে চেষ্টা করিত, এখন কেবল তাহা হইতে ক্ষান্ত আছে। আমাদিগের আহার বন্ধ প্রায়। অত্যাচারি জমিদারদিগের প্রজারা বিদ্রোহী হউক বা খানাজা বন্ধ করুক, তাহাতে আমরা অসন্তুষ্ট নহি। কারণ সকলেই আপন সত্ব নিরাপদ করিতে যত্ন করিয়া থাকে। আমরা অত্যাচারী নহি, একথা আমি বলিতেছি. আপনি অবিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু অকপট হৃদয়ে বলিতে পারি, আমরা প্রজার প্রতি কখন অত্যাচার করি না। দুঃখের কথা বলিতে অশ্রুপাত হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় সলপের সান্যাল ও পোরজানার ভাদুড়ি জমিদারদিগের ২।৶০ আনা নিরিখের ভূমি, আমাদিগের জমিদারি সংলগ্ন আছে, আমরা সেই স্থলে ১, ১/০ আনা নিরিখে খাজানা আদায় করি। উপরি নিরিখের মধ্যে বহুদিন প্রচলিত কোম্পানি বাট্টা প্রতি টাকায় ১০ আধ আনা মাত্র। ইহাতেও প্রজাবিদ্রোহী। আমরা মনে করিলে পার্শ্ববর্তী নিয়মানুসারে অনায়াসে খাজানা আদায় করিতে পারি, কিন্তু প্রজার কষ্ট হইবে মনে করিয়া তাহা গ্রহণ করি না ও গ্রহণ করিতে ইচ্ছাও করি না।

আমাদিগের প্রদেশিয় প্রজাগণ যে কি নিমিত্ত খাজানা বন্ধ করিয়াছে ও লড়াই করিতেছে, বলিতে পারি না। ইহাদের পাট্টাদি কিছুই নাই। জমিদার ধর্মজ্ঞানশূন্য হইলে যে অনায়াসে কর বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাশয়! দুঃশের কথা বলিতে এক কথা মনে হইল। আমি বিদ্রোহিতা নিবারণ করিতে এক দিন চাকলা নামে এক মহলে গিয়াছিলাম। প্রজারা আমার জীবন নাশের অভিসন্ধিতে নৌকা জল মগ্ন করে। সৌভাগ্যক্রমে আমি নৌকায় ছিলাম না। আমি যে তাহাদিগের নিকট কিসে অপরাধী তাহা তাহারাই জানে। ইতি

প্রজাপীড়িত
জনৈক ক্ষুদ্র জমিদার
চাটমোহর রামনগর।

—*গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*, ২৯.১১.১৮৭৩

সিরাজগঞ্জ ও পাবনা অঞ্চলের প্রজা বিদ্রোহিতা নিবারণের জন্য লেপ্টনেন্ট গবর্নর এক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন। তাহার স্থূল মর্ম এই "যে জমিদারগণ অতিরিক্ত কর আদায়ের চেষ্টা করায় প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য হাঙ্গামা করিতেছে, তাহাতে সাধারণ প্রজার শান্তিরক্ষার নিমিত্ত বিরোধী প্রজাদিগকে ঐরূপে জমাইতবস্ত হইতে দেওয়া না হয়। এবং জমিদারগণ আইনানুসারে প্রজার কাছে যাহা পাবেন তাহার সুবিচার করা হয়। বিদ্রোহী প্রজাগণ শান্তভাবে আপনাদের দুঃখ জানাইলে মনোযোগের সহিত তাহা শুনা যাইবে। কিন্তু তাহারা যদি জমিদারের যথার্থ প্রাপ্য না দিয়া বলে যে আমরা কেবল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজা, তাহা গ্রাহ্যযোগ্য হইবে না। এ সম্বন্ধে জমিদারদিগের উপর গবর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। জমিদারের কৃত রাজবিধি বহির্ভূত কোন অতিরিক্ত দাওয়ার প্রতিবাদ করিবার জন্য সকলে একত্রিত হওয়ার কোন নিষেধ নাই, কিন্তু সে জন্য বহুলোক একত্রিত হইয়া দাঙ্গা করা আইন সঙ্গত নহে। গবর্নমেন্ট আইনানুসারে জমিদার ও প্রজার যথার্থ স্বত্ব রক্ষা করিবেন।" এই বিদ্রোহিতার আপাতত অনেক অনিষ্ট হইলেও ইহা দ্বারা একটি বিশেষ উপকার হইবে অনিয়মিত অবৈধ কার্যকে নিয়মিত করিতে হইলে প্রথমে প্রজাগণের মধ্যে শান্তিভঙ্গ হয় ইহা স্বাভাবিক। —*সুলভ সমাচার*, ২৫ আষাঢ়, ১২৮০

পাবনা

পাবনার প্রজাবিদ্রোহিতা এখন পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় নাই। ...জমিদারের কি আর যাহার অত্যাচারেই প্রজারা বিদ্রোহি হউক, যখন তাহারা ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তখন আপাতত তাহাদিগকে থামান কর্তব্য। এখন যাহা ঘটিতেছে তাহাতে প্রজা ও জমিদার উভয়ের সর্বনাশ। প্রজারা যেরূপ উন্মত্ত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের সহস্র সহস্র ব্যক্তি রাজদ্বারে দণ্ডিত যে হইবে তাহার বিচিত্র নাই এবং জমিদারের ও মধ্যবর্তী লোকের তো কষ্টের সীমা নাই।... নলেন সাহেব সিরাজগঞ্জ উপস্থিত হইয়া অবধি ক্রমাগত জমিদারকে দমন ও প্রজার উৎসাহ বর্ধন করিয়াছেন। যখন দেশের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল, চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল তখন পাবনার কর্তৃপক্ষীয়েরা সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। পাবনা হইতে আমাদিগকে একজন লিখিয়াছেন যে, প্রজার দৌরাত্ম্যের বিষয় এত্তলা হইলে বিচারকগণ উপহাস করিতেন। এটি সত্য কি মিথ্যা তাহা বিধাতা জানেন। কিন্তু পাবনার কর্তৃপক্ষেরা এ পর্যন্ত যেরূপ শৈথিল্যের সহিত কাজ করিয়াছেন তাহাতে আমরা উহা বিশ্বাস না করিয়াই বা কি করিব। —*অমৃতবাজার পত্রিকা*, ১০.৭.১৮৭৩

আমরা নিম্নের ঘটনাগুলি পাবনা হইতে প্রেরিত পত্র হইতে সংগ্রহ করিলাম। স্থানাভাবপ্রযুক্ত পত্রগুলি সন্নিবেশিত করিতে পারিলাম না।

বিদ্রোহী প্রজাদিগের প্রায় দুই শত লোক এবং ঈশানচন্দ্র রায় পোলিস কর্তৃক ধৃত হইয়াছে। ইহাদের বিচার এখন পর্যন্ত হয় নাই। ঈশানচন্দ্র রায় যে বিদ্রোহী প্রজার একজন দলপতি তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। যে ব্যক্তি ৫০ হাজার প্রজাকে আপনার শাসনাধীনে আনিতে পারেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নন। বিশেষত আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম যে, তিনি বুদ্ধিমান, লেখাপড়া জানেন এবং আইনজ্ঞ। যে কার্যে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে এরূপ কার্যের মধ্যে তিনি যে থাকিবেন ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। সম্ভবত তিনি প্রজাদিগকে প্রথম পরামর্শ দেন যে, তাহারা ঐক্য হইয়া জমিদারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। তাহার পর বোধহয় তাহারা আর তাহাকে গ্রাহ্য করে নাই। —*অমৃতবাজার পত্রিকা,* ১০.৭.১৮৭৩

For years nothing has occurred in the history of the people of Bengal quite so significant, if not serious, as the union of the peasantry of Pubna to resist the enhchanement of their rents. Altough the majority of the people are Mahomedans and the landlords and upper classes are chiefly Hindoos, there is nothing like a Ferazee rising, nothing of a political character. On the contrary the cultivators proclaim themselves the ryots of the Maharanee Victoria, and declare they will pay rent only to the collector who is her representative. A few houses have been burned or plundered, and two bands have been going about the district, which disappear before the magistrate and his police, Mr. W. V. G. Tayler. As yet there are no signs of the excitement spreading into the neighouring districts of the Dacca and Rajshaye Divisions. Our correspondence is clear on that point. Some of the men who have gone beyond the law have already been convicted of rioting, illegally assembling and house trespass. Other rioters are under arrest. Since the 3rd instant all has been quite. The Lieutenant Governor was close to the distrubed quarter whether he fully conferred with the Pubna authorities and the principal officials of Eastern and Northern Bengal. He at once, on his return to Calcutta, issued the following Proclamation. Insisting first of all that order shall be maintained, it does justice to both sides. But for the first time, the Government pledges itself to see that those exactions, which have been the rule of the Bengalee Zamindar under every administration, shall cease—"the Government will protect the people from all force and extortion."
—*ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া,* ১০.৭.১৮৭৩

প্রজাদ্রোহ

বাঙ্গাল গবর্নমেন্ট নিম্নলিখিত মর্মের ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন।

"পাবনা জেলাতে জমিদারেরা খাজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাতে এবং প্রজারা সে চেষ্টা বিফল করিবার আশায় ধর্মঘট করাতে, অনেক অনেক স্থান বহুসংখ্যক লোক দলবদ্ধ হইয়া অত্যাচার ও দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতেছে। অতএব এই ঘোষণাপত্রের দ্বারা সকল পক্ষকেই বলা যাইতেছে, গবর্নমেন্ট একপক্ষে প্রজাগণকে বলপ্রয়োগ ও অত্যাচারের দায় হইতে রক্ষা করিয়া

জমিদারদের প্রকৃত প্রাপ্য আদায়ের নিমিত্ত তাহাদিগকে কেবল আইনের অনুযায়ী ব্যবহারই করিতে দিবেন, অন্যপক্ষে প্রজাদের অনুষ্ঠিত অবৈধ কার্যের নিমিত্ত যথাবিহিত দণ্ড দেওয়া হইবে। যে সকল প্রজা প্রভৃতি লোকে এক্ষণে দলবদ্ধ রহিয়াছে, তাহারা দলভঙ্গপূর্বক আপনাপন স্থান গমন করুক। তাহাদের যে সকল দুঃখের কথা বলিবার আছে, তাহা যেন তাহারা শান্তভাবে ও কোনপ্রকার শান্তিভঙ্গ না করিয়াই জানায়। তাহারা এরূপে যেসকল কথা জানাইবে, গবর্নমেন্ট তাহা মনোযোগপূর্বক শুনিবেন। নতুবা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিলে তাহাদের কোন কথা শুনা দূরে থাকুক, গবর্নমেন্ট তাহাদের গুরুতর দণ্ডাজ্ঞাই দিবেন। জমিদারদের প্রতিকূলে যে সকল প্রজা ধর্মঘট করিয়াছে, তাহারা না কি এমন কথা বলিতেছে, যে আমরা আর কাহাকে খাজানা না দিয়া কেবল মহারাণীকেই খাজানা দিব। এই সকল লোক, এবং যাহারা এই সকল লোকের কথা শুনিতেছে, তাহাদিগকে এই পূর্ব সাবধান করা যাইতেছে যে, আইনের অনুসারে যাহার যে স্বত্ব আছে, গবর্নমেন্ট তাহা রহিত করিতে পারেনও না, করিবেনও না ; এবং আইনের অনুসারে তাহাদের নিকটে যাহার যে প্রাপ্য, তাহাদিগকে তাহা অবশ্যই দিতে হইবে। জমিদারের প্রজাদের ইহাতে অন্যায়পূর্বক কিছু লইতে চাহিলে তাহাদের প্রতিকূলে শান্তভাবে ধর্মঘট করা আইনের সম্যক সঙ্গত বটে, কিন্তু বলপ্রয়োগ করিবার ও ভয় দেখাইবার নিমিত্ত দলবদ্ধ হওয়া নিতান্ত অবৈধ।" *এডুকেশন গেজেট, ১১ ৭ ১৮৭৩*

রাইয়তি বিদ্রোহ

সম্প্রতি পাবনা জিলায় এবং দেখাদেখি পার্শ্বস্থ অন্যান্য জিলায় জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। আমরা সর্বাগ্রে নিম্নলিখিত প্রেরিত পত্র দুইখানি প্রকটন করিয়া পরে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ আবশ্যক বোধ করেতেছি। প্রথম পত্রপ্রেরক, যেরূপ সবিশেষরূপে বিদ্রোহের কোনো কোনো বৃত্তান্ত ও অবস্থা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাহার পত্র দীর্ঘ হইলেও আমরা তাহা অবিকল গ্রহণ করিলাম।

মান্যবর শ্রীযুক্ত মধ্যস্থ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

ভয়ানক অত্যাচার

সম্পাদক মহাশয়। নিম্নলিখিত হৃদয় বিদারক ঘোরতর অত্যাচারের সংবাদগুলি আপনার পত্রিকাপার্শ্বে স্থানদানে বাধিত করিবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জমিদারমাত্রকেই অত্যাচারী স্থির করিয়া তাহাদিগের দমনকারীদিগকে দমন করিতে অনুৎসাহী আছেন। সত্য বটে কোনও কোনও জমিদার অত্যাচারি আছে কিন্তু তাই বলিয়া সমুদায় জমিদারকে অত্যাচারী মনে করা কি সঙ্গত? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যদি বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অত্যাচারী জমিদারদিগকে দমন করিয়া অন্যান্য নিরীহ জমিদার ও প্রজাদিগকে রক্ষার জন্য বিদ্রোহীদিগের দমন করেন, তাহা হইলে আমরা তাহার প্রতি আন্তরিক বাধ্য হই।

তাং ১৯ আষাঢ় কস্যচিৎ পাবনা জেলা নিবাসিনঃ

সন ১২৮০ সাল

দ্বিতীয় পত্রের সারাংশ এই—

স্থানে স্থানে ২০/৩০ সহস্র লোক দলবদ্ধ আছে। এইরূপে ২/৪ দিনের মধ্যে কত গ্রামে যে কত ভদ্র পরিবার একেবারে গিয়াছে বলা যায় না। এমন কি, কত স্থানে কত মুসলমান কত হিন্দুকে ভাত খাওয়াইতে উদ্যোগ করিয়াছে। এ প্রদেশ মধ্যে কেবল ভারেঙ্গা গ্রাম লুঠ হয় নাই, কারণ এই গ্রামবাসী বাবু উমেশনারায়ণ চৌধুরী, বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী, বাবু রাজেন্দ্ররাজ, অভয়চন্দ্র চক্রবর্তী এবং শ্রীযুক্ত পীতাম্বর চক্রবর্তী মহাশয়গণ এইরূপ দৃঢ় পণে

ছিলেন যে, পরিবারের জন্য গবর্নমেন্টের রাজ্যরক্ষার জন্য সাজ-সরঞ্জামী লইয়া জীবন পর্যন্ত দান করিবেন। এমন সময় আমি আসিয়া আরও বিশেষ উৎসাহ দিলাম। চতুর্দিকে নদী আর এইরূপ জোট সুতরাং লুঠ হয় নাই। কিন্তু ২/৪ দিন মধ্যে অবশ্যই লুঠ হইবে। মহাশয়, অদ্য ম্যাজিস্ট্রেট, ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেট দলবলসহ আসিয়াছেন। লেঃ গবর্নর গোয়ালন্দ মোকামে আসিয়া হুকুম দিয়া গিয়াছেন। অদ্য এখানে আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, যাহা হয় পরে বলিব।

২০ আষাঢ়। পাবনা — শ্রী কেশব
ভারেঙ্গা, পাবনা

ইহা বঙ্গদেশে এক নতুন কাণ্ড। আমরা এমন বহু শুনিয়াছি, যে কোন এক মৌজা, ডিহি বা পরগণার কোন এক শ্রেণী জমিদারের খাজনা দেয় না, জমিদারের নায়েব কি গমস্তা বা অন্যান্য লোকজনকে গোপনে বধ করে অথবা উভয়পক্ষের বিস্তর লাঠালাঠি মারামারি হয়। পূর্বে এমনও শুনা যাইত অমুক জমিদার বা অমুক নীলকর অমুক অমুক গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছে। কয়েক গ্রামের লোক ধর্মঘট করিয়া অত্যাচারি জমিদারের বিরোধী হইয়াছে, ইহাও পুরাতন কথা। কিন্তু জিলা শুদ্ধ বাঙালি রীতিমতো বিদ্রোহাচরণে মত্ত হইয়া ঘোষণা দ্বারা দল সংগ্রহ করে, যাহারা সেই অবৈধ কার্যে লিপ্ত না হয় তাহাদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করে এবং নিরীহ ভদ্রলোকের ধন প্রাণ জাতি মান প্রভৃতি বিনষ্ট করে, এরূপ অসম্ভব অরাজকতা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অধীনতায় কস্মিনকালে শ্রুত হয় নাই। সুতরাং পাবনা জিলায় এই নূতন কাণ্ড ঘটাতে আমরা অবাক হইয়াছি।

রাজপুরুষেরা ঝটিতি কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন না করিলে এই অগ্নি কতদূর পর্যন্ত ব্যাপিয়া পড়িবে এবং ইহার দাহিকাশক্তি কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? শুনিতেছি, ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনার মহাশয়েরা প্রতিবিধানের উপায় না করিতেছেন এমন নয়, কিন্তু যাহা করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে। সিরাজগঞ্জে সবডিভিসন এবং রাজশাহী জিলার অধীন নাটোর মহকুমাতেও এই দাবানল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জমিদারের মাপের রসি ঠিক নহে, জমিদারের ব্যবহার ভাল নহে; সুতরাং আমরা জমিদারগণকে রাজস্ব দিব না। মহারানি স্বয়ং আমাদিগকে খাসে প্রজা না করিলে আমরা ছাড়িব না। ইত্যাদি আপত্তি নাকি তাহাদের বিদ্রোহের কারণ। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় উহাই যে এতদ্রূপ ভয়ঙ্কর কার্যের প্রবল কারণ, ইহা সম্ভাবিত বোধ হয় না। হয়তো তাহাদের মনের কথা এখনও ভালরূপে জানা যায় নাই। অথবা কতকগুলো লোক আপনাদের দুষ্প্রবৃত্তি করিবার সুযোগ পাইয়া প্রজাদের সামান্য অসন্তোষ বহ্নিতে ফুৎকার দিয়া এক কে একুশ করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ যে কারণেই হউক, এই অসহনীয় অত্যাচার ও অরাজকতার আশু দমন করা উচিত।

শুদ্ধ যদি অশিক্ষিত কৃষক রাইয়াত হইত, তবে এই বিদ্রোহ এতদূর অর্থাৎ বিদ্রোহ নাম পাইবার যোগ্যই হইত না—তাহা হইলে দুই এক গ্রামে জমিদারের লোকের সহিত প্রজার দুই একটা লাঠালাঠি বিবাদ হইয়া শেষ হইয়া যাইত। ইহার মধ্যে অনেক ভূসম্পত্তিবান দুষ্ট ভদ্রলোক আছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ—দৌলতপুরের ঈশান রায়, জগুতলার খুদি মোল্লা এবং গাঁতির গঙ্গাচরণ পাল ইহাদের প্রবর্তক ও অধিনায়ক। ইহাদের অথবা এইরূপ দুষ্ট লোকদিকের অধ্যক্ষতায় জমিদার ব্যতীত অপরাপর ভদ্রাভদ্র লোকদিগের ধন, মান, প্রাণ রক্ষা হওয়া ভার হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, দুরাত্মারা কোনও কোনও স্থলে কোনও কোনও ভদ্রলোকের বাটিতে স্ত্রীমহলে অসম্ভব মানহানিকর কাণ্ড করিয়াছে। একজন ভদ্রলোকের বিধবা ভগ্নিকে কোথায় কে লইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি তাহার ঠিকানা হয় নাই।

অতএব আমাদের পূর্ব অনুমান সত্য কি না ভাবিয়া দেখুন। যে কয়টি কথাকে এই বিদ্রোহের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইতেছে, তাহা সত্য হইলে কেন ঐ সব বিসদৃশ অত্যাচার ঘটিবে? পূর্বোক্ত কারণও ইহার সামান্য কারণ হইতে পারে, কিন্তু বোধহয় তৎসঙ্গে আরও অন্য অ-্য কোন গুরুতর কথা আছে, যাহা এখনও জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, সিরাজগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট মেং নোল্যান সাহেবের অতিরিক্ত অনুকূলভাব দৃষ্টেই দুষ্ট লোক প্রশ্রয় পাইয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা লিখেন, কাশীপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারদিগের মোক্তার উক্ত সাহেবের নিকট ১৪,০০০ হাজার কবুলতি রেজেস্টরি করিয়া দেন। নোল্যান সাহেব সেইসব কবুলতি মোক্তারকে ফিরাইয়া না দিয়া রাইয়তগণকে দিয়াছিলেন, ইহাতেই রাইয়তেরা ভাবিল, 'সাহেব আমাদের সপক্ষ, আমরা জামিদারগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিলে আমাদের কোন হানি হইবেক না।' তৎপরে যখন এই ঘটনা ঘটিল, তৎকালে কি ম্যাজিস্ট্রেট, কি পুলিশ কেহই নিবারণের কোনও চেষ্টা পাইলেন না। ফলত উক্ত সংবাদদাতা না লিখিলেও ইহা সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে যে. পাবনা, রাজশাহী কি সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এমন অসমসাহসিক বীর প্রজা অতি কম আছে, যাহারা একদিনে এতদূর উন্মত্ত হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে। স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড বা ভারতবর্ষের উঃ পশ্চিমাঞ্চলের কোনও কোনও ভাগ হইলেও এ কথা একদিন শোভা পাইত বিশেষত উক্ত জেলার জমিদারগণের মধ্যে কলিকাতার ঠাকুর গোষ্ঠী, মুড়াগাছার বাঁড়ুয্যা ও নহাটার ভট্টাচার্য মহাশয়রাই প্রধান। তাহাদের প্রকৃতি আমাদের অগোচর নাই। তাঁহারা যে ঘোর অত্যাচারি জমিদার হইয়া উঠিবেন, ইহা সম্ভাবিত হয় না। যদিও তাহা হইয়া থাকে, তথাপি তজ্জন্য হঠাৎ এতদূর হওয়া কোনমতেই অনুমানে আইসে না। কিন্তু এই কথা বলাতে এমন বলিতেছি না যে ম্যাজিস্ট্রেটের উৎসাহেই ইহা ঘটিয়াছে। আমাদের তাৎপর্য এই এবং সংবাদপত্রের প্রচারও এই, যে ম্যাজিস্ট্রেট হয়তো অতিরিক্ত প্রজা বাৎসল্য এবং জমিদারদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কঠোর ভাব দেখাইতেন, তাহাতেই ভ্রান্ত প্রজাপুঞ্জ দুষ্টলোকের চক্রে পড়িয়া এককালে অধীর হইয়া উঠিয়া থাকিবে। আজকাল অনেক রাজকর্মচারী ও অনেক সংবাদপত্র সম্পাদককে জমিদারের নামে জ্বলিতাঙ্গ ও জমিদারের নিতান্ত দোষদর্শী হইতে দেখা যায় ; তাহা জনকতকের দোষে সে শ্রেণীর তাবৎকে অপরাধী এবং দোষী নির্দোষী প্রজামাত্রকেই নিরপরাধী ভাবিয়া প্রতি ঘোর পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। হয়তো মেং নোল্যান সাহেব সেই ধাতুর কর্মচারী। প্রাত্যহিক এজলাসে তাহার বাক্য বিচার ও ব্যবহারে হয়তো ঐরূপ পক্ষপাত প্রকাশ পাইয়া থাকিবে এবং হয়তো তাহাতেই এই সর্বনাশ বাঁধিয়া উঠিয়াছে। প্রথম পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আমাদের এই অনুমান নিরর্থক হইতেছে না। ...

মধ্যস্থ, ১৮ আষাঢ়, ১২৮০

প্রজা বিদ্রোহ

সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক অরাজক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় নয় দশ ফেরাজী প্রভৃতি জাতীয় হাজার প্রজা জমিদারদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের সর্বনাশ সাধন করিতেছে। অনেক স্থান হইতে এতৎ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার হৃদয় বিদারক ঘটনা আমাদিগকে শ্রুতি প্রবিষ্ট হইতেছে। আমরা ইহার কয়েকটি পাঠকবর্গকে জানাইতেছি।

গত ২৯ জ্যৈষ্ঠ পাবনা জেলার অন্তঃপাতি দাসুড়িয়া গ্রামে প্রায় তিন হাজার লোক সমবেত হইয়া বেলা পূর্বাহ্ন ৮টা হইতে পরাহ্ন ৪টা পর্যন্ত দাসুড়িয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী মানিকেড় পাকুড়িয়া প্রভৃতি ৭/৮ খানি গ্রাম লুঠ করিয়াছে। এই লুণ্ঠনকার্যে একজন প্রায় মৃত ও তিনজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জ প্রদেশে চারি পাঁচ শত দুর্দান্ত প্রজা একত্র দলবদ্ধ হইয়া ভদ্রলোকদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছে। কুলকামিনীগণের সতীত্বহরণ, দেবমূর্তি চূর্ণীকরণ প্রভৃতি ইহাদিগের নিত্যকর্মের মধ্যে গণ্য। ইহারা গ্রামে স্থানীয় লোকদিগকে আপনাদিগের দলভুক্ত করিতে নানাপ্রকার চেষ্টা করে। যদি কেহ সাধুতার বশবর্তী হইয়া তাহাদিগের প্রস্তাবে অসম্মত হয় তাহা হইলে তাহাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে না।

পাবনার অন্তঃপাতী মঙ্গলা প্রভৃতি স্থানের প্রজাগণও এই প্রকার দলবদ্ধ হইয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। গত ১ আষাঢ় সিরাজগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত শোনতলার প্রায় একশত প্রজা দলবদ্ধ হইয়া গ্রামবাসীদিগের গৃহাদি লুণ্ঠন করিয়াছে। উল্লাপাড়া প্রভৃতি স্থানেও এই ঘটনা হয়, গোপালনগরে ৫০/৬০ জন প্রজা সমবেত হইয়া গ্রামের গৃহাদি লুণ্ঠনপূর্বক ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। ক্রমেই এই পরাস্বপহারক দস্যুদিগের দলপুষ্ট হইতেছে। এক গ্রাম হইতে ৪০/৫০ জন বাহির হইয়া কোন প্রান্তরে শিঙ্গাধ্বনি করিতে থাকে, অমনি ৩/৪ হাজার লোক তাহাদিগের অনুগত হয়। পুলিশের চক্ষের উপর এই লোমহর্ষক ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তথাপি কোন প্রতিবিধান হইতেছে না। এটি নিতান্ত বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই, প্রজাদিগের এ প্রকার দৌরাত্ম্য আর কখনও আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় নাই। এই অরাজকতানিবন্ধন ভদ্রলোকের ধনপ্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। অসূর্যস্পর্শা কামিনীগণের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার হইয়াছে, তাহা শুনিলে বোধহয় ..., আমরা কোন মূর্খ ভাবাপন্ন অসভ্য গবর্নমেন্টের অধীনে থাকিয়া নরক যাতনা অনুভব করিতেছি। অত্যাচার পীড়িত ব্যক্তিগণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফল হইতেছে না। আবেদন অগ্রাহ্য হইতেছে। সিরাজগঞ্জই এই বিদ্রোহিতার মূল স্থান। তত্রত্য আসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট নলেন সাহেব জমিদারদিগের উপর নিতান্ত চটা। তিনি জমিদার বিদ্রোহী প্রজাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন আবেদন সমূহ অগ্রাহ্য হয়। এইরূপ জনরব প্রচারদ্রূপ হওয়াতে প্রজাদিগের প্রশ্রয় শতগুণে বর্ধিত হইয়াছে। তাহার সাধারণ্যে এক একখানি লিখিত কাগজ প্রদর্শনপূর্বক তাহা মহারানীর ঘোষণাপত্র বলিয়া প্রচার করিয়া সমুদয় লোককে আপনাদিগের দল নিবিষ্ট করিতেছে। এ সময়ে নলেন সাহেব কিছুই করিতেছেন না, তিনি মুদ্রিত নয়নে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। কি আশ্চর্য!!! সাধারণ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। এটি কি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের কলঙ্ক নয়?

সিরাজগঞ্জের মহকুমায় নহাট্টা স্থানের পাকড়াশি, কাশীপুরের বন্দ্যোপাধ্যায়, সলপের সান্যাল, কলিকাতার বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির জমিদারি আছে। ইহাদিগের প্রায় সমুদয় জমিদারিতেই বিদ্রোহিতা সমুপস্থিত। অনেকে বলিতেছেন, জমিদারগণ কর বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। জমিদার জমির কর বৃদ্ধি করিতে পারেন ; আইনে তাহাদিগকে এ ক্ষমতা দিয়াছে। জমিদার যে রূপ কর বর্ধিত করিতে পারেন, অন্যায় হইলে প্রজাও সেইরূপ আইনানুসারে রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া তাহা রহিত করিতে পারে। কিন্তু যখন প্রজাগণ তাহা না করিয়া সাধারণের সম্পত্তি উৎসন্ন করিতেছে তখন কি গবর্নমেন্টের উদাসীনভাব অবলম্বন করা বিধেয়? রাজ্যকামুক লর্ড ডালহৌসি যেমন ছলে কৌশলে অযোধ্যা বারাণসী প্রভৃতি ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া অন্যায়পরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, লর্ড নথব্রুকাধিষ্ঠিত গবর্নমেন্টও কি সেইরূপ জমিদারদিগকে দূরীভূত করিয়া দিবেন? জমির খাজনাবৃদ্ধি সকলেই করিয়া থাকে। গবর্নমেন্টও এ দোষাস্পর্শশূন্য নহেন। গোয়ালন্দের যে জমির কর বিঘাপ্রতি অর্ধ মুদ্রা ছিল, তাহা এক্ষণে গবর্নমেন্টের অধীনে যাওয়াতে বিঘাপ্রতি ১২০ টাকা হইয়াছে। কোন জমিদার এইরূপ অসঙ্গত রূপে হার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন? এটি আমরা গবর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ফলত প্রস্তাবিত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অমনোযোগ নিতান্ত কষ্টের হইতেছে। কোন কোন জমিদার প্রজাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া নানা প্রকার

ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হইলেও অর্থের সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন এটি আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সকলেই যে এইরূপ প্রকৃতির লোক এটিতে আমাদিগের বিশ্বাস নাই। জমিদার মাত্রেই পঞ্চদশ লুইয়ের স্বভাবাক্রান্ত এরূপ নির্ণয় করা মূঢ়তার পরিচা``ক সন্দেহ নাই। রাজপুরুষদিগের অন্তঃকরণে এইরূপে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইলে নানাপ্রকার অনিষ্ঠাপাত হয়। বর্তমান প্রজাবিদ্রোহ ইহার অন্যতম উদাহরণ। বস্তুত গবর্নমেন্ট নানাবিধ সৃষ্টি ছাড়া আইন কানুন করিয়া জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদনের যেরূপ মূল হইয়াছেন, স্নেহ সংস্থাপনের সেরূপ হেতুভূত হইতে পারেন নাই। যে গবর্নমেন্ট ভারতবর্ষের অর্থদোহন করিয়া বহু দূরস্থ সম্বন্ধবিহীন জাঞ্জিবারের দাসবিক্রয় প্রথা রহিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই গবর্নমেন্ট, ভারতবর্ষের ক্রোড়স্থ বঙ্গভূমিতে জেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লঙ্গ প্রভৃতি কৃত ব্যাপারের যে অভিনয় হইতেছে, তাহাতে দৃকপাতও করিতেছেন না। ভবিষ্যৎবংশীয়গণ এতন্নিবন্ধন ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।

আমরা শুনিলাম, পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট নাকি পুলিশ সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, প্রস্তাবিত অত্যাচার যেন শীঘ্রই তিরোহিত হয়। উপসংহার সময়ে জমিদারগণের প্রতি আমাদিগের সমুদয় বক্তব্য এই, তাহাদিগের সহিত প্রজাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একপক্ষে উৎপথগামী হইলে অন্যতর পক্ষের উভয় অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট লাভ নাই। অতএব যাহাতে বিনা গোলযোগে উভয় দিক রক্ষা পায়, শীঘ্র শীঘ্র তাহার উপায় অবলম্বন করা সর্বথা বিধেয়। —*সোমপ্রকাশ*, ১৪.৭.১৮৭৩

লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের ঘোষণাপত্র বাহির হওয়াতে এবং স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট বিবাদস্থলে উপস্থিত থাকাতে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের প্রজা বিরোধিতা প্রায় কমিয়া আসিয়াছে। কতকগুলিকে ধরিয়া জেলে পাঠান হইয়াছে। লুটের মালও অনেক বাহির হইয়াছে। একদল পুলিশ সৈন্য এজন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে। জমিদারগণ এখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শোনা গেল গোলযোগ শ্রবণে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পাহাড় ত্যাগ করিয়া দেশে আসিতেছেন। এবার বোধহয় ঐ অঞ্চলের জমিদার মহাশয়দিগের কিছু বিশেষ শিক্ষালাভ হইবে। যাহা হউক, গবর্নমেন্ট যেন প্রজাদের দুঃখে কর্ণপাত করেন। তাহারা বিদ্রোহী হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়াছে এবং তজ্জন্য সাধারণ প্রজাদিগের অনেক ক্লেশ ও ক্ষতিও হইয়াছে, ইহাতে তাহারা অপরাধী সন্দেহ নাই, কিন্তু কি জন্য এরূপ হইল, প্রজার প্রতি কোন অসহ্য পীড়ন হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে যেন অনুসন্ধান করা হয়। অবশ্যই তাহাদের দৌরাত্ম্য করিবার কোন গূঢ় কারণ আছে। এ প্রকার না হইলেও কিন্তু জমিদারদিগের চৈতন্যোদয় হইবে না, এবং প্রজাসাধারণের দুঃখও ঘুচিবে না। —*সুলভ সমাচার*, ১ শ্রাবণ, ১২৮০

পাবনার প্রজা অত্যাচারের অনেক নিবারণ হইয়াছে। এতদর্থ পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট টেলর সাহেব মফস্বল ভ্রমন করিতেছেন। অনেকগুলি অতিরিক্ত পুলিশ কর্মচারি ঘটনাস্থল সমূহে গমন করিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের অনেকে ধৃত ও কেহ কেহ দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভরসা করি, অবিলম্বে বিদ্রোহানল নিবৃত্ত হইয়া শান্তি স্থাপিত হইবে এবং নিরপরাধে কাহারও সাজা হইবে না। —*এডুকেশন গেজেট*, ১৮.৭.১৮৭৩

পাবনার বিদ্রোহ

মহাশয়!

আমি পাবনার অধীন শাহজাদপুরের একজন প্রবাসী। পাবনা প্রদেশের বিদ্রোহ গোলযোগ অনেক জানি। কিন্তু লেখনী সরে না, ভয় করে, জানি কি পাছে কোন্ মহাত্মার কোপে পড়ি।

সম্প্রতি এ প্রদেশের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত, তাহাতে আমি কেন প্রাণীমাত্রেও বুঝি এরূপ অবস্থায় চুপ করিতে পারে না।

এ প্রদেশে (পাবনা ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে) বিদ্রোহজনিত ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত, কেবল সংগ্রামও নহে, অগ্নিবল সহগামী। আমি ক্ষুদ্র জীব, সমুদয় প্রদেশ ভ্রমন করিতে পারি নাই। শাহজাদপুরে অবস্থিতি করি, সুতরাং তাহার তন্নিকটবর্তী স্থানের অনেক অবস্থা জানি। বিদ্রোহ-অগ্নি নিজ শাহজাদপুরে প্রজ্জ্বলিত নাই। কিন্তু ইহার দক্ষিণ দিগবর্তী মথুরা, নাকালিয়া, হাটুরিয়া, সাগরকান্দি, তাঁতিবন্দ প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত; উত্তর দেশাগত বায়ু ইহার সাহায্যকারী সমুদায় স্থানের আমূল অবস্থা লিখিতে গেলে পত্রিকায় পাছে স্থান না পাই এই ভয়ে কয়েকটা প্রসিদ্ধ স্থানের অবস্থা লিখিলাম। অনুগ্রহপূর্বক কর্ণপাত করিবেন।

চাটমোহর স্টেশনাধীন গোপালনগরের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানি তারিখ মনে নাই, আষাঢ়ের প্রথম ভাগেই হইবে। বিদ্রোহানল দলবলে নগরে প্রবেশ করিয়া, মজুমদার উপাধিধারী কয়েকজন তালুকদারের বাড়ি প্রথম লুণ্ঠন অবশেষে ভস্মসাৎ করিয়াছে। কি অত্যাচার! কতদূর অরাজকতা! এই ঘটনার পর শুনিলাম বিদ্রোহীরা না কি ইতিপূর্বেও একবার পড়ে, কিন্তু তাড়াসের বিখ্যাত জমিদার বাবু বনওয়ারীলাল রায় মহাশয়ের সহায়তায় মজুমদারেরা সে যাত্রায় রক্ষা পান। অবশেষে সুযোগ পাইয়া অভিপ্রায় সাধিয়া লইয়াছে। এদিকে সহকারী বনওয়ারীলালবাবুকেও স্থির থাকিতে দেয় নাই। বাবু কামান, গোলার সহায়তায় আত্মরক্ষা করিতেছেন।

হুড়াসাগর নদীর দক্ষিণদিকস্থ বিদ্রোহীদল অন্যূন ৩০০/৪০০ গ্রাম লইয়া সংঘটিত ও তাহারা নিতান্ত অত্যাচারী। উত্তর দিকের অর্থাৎ শাহজাদপুর অঞ্চলের তো কথাই নাই। এ অঞ্চল বিদ্রোহিতার জন্মভূমি। সমুদায় প্রদেশে জমিদার ভক্ত ২/১ খান গ্রামও খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ও দিন শুনিলাম বহুতর বিদ্রোহী নাকি মথুরা স্টেশনে পড়িয়া স্টেশন অধিকার পূর্বক কয়েকজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়া সাকল্যা লুট করিয়াছে, বেড়া আউট পোস্টের হেড কনস্টেবলকে ভালরূপে উত্তম মধ্যম দিয়া ১৫ টাকা নজর আদায় করিয়াছে। মহাশয়! বিদ্রোহীদিগকে বাধ্য করার দুটি মহৌষধ আছে একটি নজর, দ্বিতীয়টি “আমরা বিদ্রোহী হইলাম এবং লাঠি স্কন্ধে করিলাম রক্ষা কর” ইত্যাকার উক্তি। শুনিলাম অধিকাংশ ভদ্রলোক এবং কোন কোন জমিদার নাকি এই দুই উপায় অবলম্বন করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মহাশয় দিনে ডাকাতি! দুষ্টেরা রাত্রিতে প্রায় অত্যাচার করে না, দিবসেই লুণ্ঠন এবং অগ্নি প্রদান করিয়া থাকে। শুনিলাম ওদিন বিদ্রোহীরা নাকালিয়া ও পেঁচাকোনা গ্রামে পড়িয়া কতকগুলি ভদ্রলোকের বাড়ি লুঠ করত সর্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, এবং অনেক লোককে আহত করিয়াছে।

মহাশয়! এদিকে একবার উত্তরাঞ্চলের দুর্ঘটনায় অবধান করেন। উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহীরা অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচারী, কিন্তু সাঁকতোলা, বাঐঘোলা কমলদাসের বাড়ির, উল্লাপাড়া, বিনদহ ইত্যাদি স্থানের অবস্থা মনে হইলে ক্রোধ সম্বরণ এবং অশ্রুজল নিবারণ করা সুকঠিন।

এ অঞ্চলের শান্তিরক্ষার স্থান পাবনা ও সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ-ভূমি হইতে বহু দূরবর্তী সুতরাং গবর্নমেন্টের সাহায্যে সত্বর উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইহা ভাবিয়া জমিদার ও নিরীহ ভদ্রলোকেরা সতত শঙ্কিত ছিলেন ঈশ্বরেচ্ছায় শীঘ্রই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদ্বয়ের দৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়াছেন। কয়েক দিবস হইল, পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বহুতর পুলিশ সৈন্যসহ মথুরায় পদার্পণ করিয়াছেন, এবং দুষ্ট লোকদিগকে ধৃত করার চেষ্টায় অস্থির আছেন। শোনা যায়, এ পর্যন্ত ৮০/৮৫ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে অনেকানেক লোপ্ত দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে। বিদ্রোহীরাজ ঈশানচন্দ্র রায় (সেরাজ মহকুমার অধীন দৌলতপুরবাসী) ধৃত হইয়া রাজভূষণ ধারণ করত গারদ ঘর উজ্জ্বল করিয়া

বসিয়াছেন। হাজির জামিনী দিয়া মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সাহেব প্রথমত তাহাতে অনভিপ্রায় প্রকাশ করেন, পরে অনুনয়ের পর "এক লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ জামিনস্বরূপ রাখিলে জামিনীর বিবেচা করা যাইবে" বলিয়াছেন। অন্যান্য আসামীদিগের বিচার শীঘ্রই হইবে। আমাদের লেপ্টেটান্ট গবর্নর বাহাদুর তো প্রদেশের শান্তিরক্ষার জন্য কতক সৈন্য দেওয়ার আজ্ঞা করিয়াছেন। সৈন্যের কিয়দ্ভাগ মথুরায় আসিয়াছে। পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট ভিন্ন আর কতকগুলি সাহেব আসিয়াছেন। এ স্থলে আমরা পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মহোদয়কে বিনীত বাক্যে জানাইতেছি, তিনি যেন মথুরাঞ্চলের বিদ্রোহানলে শান্তিবারি সেচন না করিয়া প্রস্থান না করেন।

আমাদিগের সিরাজগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহ শান্তির জন্য শুভাগমন করিয়া প্রথমত সাঁকতোলার বিদ্রোহ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেন। বহু সন্ধানের পর ৪ জন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া ২ জনকে ২ বৎসর কারাদণ্ড ও ৬০ টাকা অর্থদণ্ড ও অপর দুই জনকে দেড় বৎসর কারাবাসের অনুমতি দিয়াছেন। অন্যূন ১৫ জন আসামি ধৃত করিয়া হাজতে দিয়াছেন, তাহাদের বিচার শীঘ্র হইবে। সাহেব মহাত্মা জামিরতা হইয়া উল্লাপাড়ার দিকে গিয়াছেন। বোধ হয়, উল্লাপাড়ার গোলযোগে হস্তক্ষেপ করিবেন। উল্লাপাড়ার গোলযোগ মথুরার অনুরূপ।

সিরাজগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মফস্বল আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অত্যাচার অনুসন্ধান করিতেছেন, সত্য হইলে সুখের কারণ। ভরসা করি, উপস্থিত বিদ্রোহ শান্তির জন্য তিনি দৃঢ়তর যত্ন করিবেন।

উপসংহারে জমিদার মহাশয়দিগের সম্বন্ধে ২/৪ কথা বলিয়া প্রস্তাব অদ্যকার মত শেষ করিব। উপস্থিত বিদ্রোহ জমিদারদিগের যারপরনাই সহিষ্ণুতা দৃষ্ট হইতেছে। তাহারা গবর্নমেন্টের সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে জমিদারদিগের এবম্বিধ ব্যবহাব বড়ই মঙ্গলের কারণ বলিয়া বোধ হইতেছে।

—বশংবদ

জনৈক পাঠক

- *এডুকেশান গেজেট*, ১৮.৭ ১৮৭৩

পাবনার প্রজাবিপ্লবের একপ্রকার শান্তি হইয়াছে। গবর্নমেন্ট বিপ্লবকারীদের দমনার্থ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সৈন্য প্রভৃতি প্রেরণ করাতে অল্পে অল্পে গোলযোগ নিবারণ হইয়াছে। কিন্তু অল্পে যে ইহার জড় মরিবে বোধ হয় না। জমিদারেরা প্রথমে রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলেন, এখন প্রজাগণ অত্যাচার করিয়া জমিদারদিগের চক্ষের বিষ হইল। উভয়ের মনোভঙ্গ অধিকতর হইয়া পড়িল। গবর্নমেন্ট যখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আরও ভাল করিয়া হস্তক্ষেপ না করিলে রাজ্যের মঙ্গল নাই। জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধীয় আইন আরও কিছু সংশোধন করিয়া উভয়পক্ষের স্বার্থ যাহাতে নির্বিবাদে সংরক্ষিত হয়, এমত ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুবিজ্ঞ সোমপ্রকাশ সম্পাদক পরামর্শ দিয়াছেন, গবর্নমেন্ট, জমিদারদিগের সহিত যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন, প্রজাদিগের সহিত সেইরূপ একটা কিছু করুন। আমরাও গবর্নমেন্টের তজ্জন্য মনোযোগী হইতে বলি। -- *ভারত সংস্কারক*, ১৮.৭.১৮৭৩

প্রজা বিদ্রোহ

পাবনা জেলার অন্তঃপাতী হাটুরিয়া নিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত প্রজাবিদ্রোহিতা সম্বন্ধে তাহার ভ্রাতার নিকট যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন আমরা তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রকটন করিলাম। এতদ্দ্বারা বিদ্রোহ সংক্রান্ত অবস্থা অনেকাংশে অবগত হওয়া যাইবে—

"আমরা চতুঃপার্শ্ববর্তী প্রজাদিগের কুমন্ত্রণার কথা শুনিয়া এবং ভদ্রলোকদিগের দূরবস্থার কথা অবগত হইয়া ক্রমে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। অবশেষে আমরা মন্ত্রণা করিয়া গত ৬ আষাঢ় পূণ্যাহের দিন স্থির করি। প্রজাদিগের মনোগত ভাব সুস্পষ্টরূপে জানিবার নিমিত্ত ও। ...শুনিলাম তাহারা প্রথমতঃ পূণ্যাহ করিবে না বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল জানি না পরে কি ভাবিয়া প্রত্যেকে এক এক পয়সা দ্বারা পূণ্যাহ করিয়াছে। তাহাতে আমাদিগের ৪ টাকা মাত্র হইয়াছে। প্রত্যেকেরই এইরূপ। পরে এক দিবস খাজনার তলব দেওয়াতে তাহারা একেবারে জবাব দেয়। এমনকি আমাদিগের পাইক গোমস্তা প্রভৃতি তাহাদিগের বাটিতে যাইতে পারিবে না, এইরূপ বলে। তাহাতে আমরা কয়েকজন মাতবর প্রজাকে ডাকিয়া আনিয়া নানারূপ প্রবোধ দেই এবং খাজনা কম করিয়া দিতেও সম্মত হই। তাহারা তাহাও না মানিয়া আমাদিগের নামে শান্তিভঙ্গের অভিযোগ করে। তখন লাটের খাজানা দিবার সময় খাজানা কিছুই সংগৃহীত না হওয়াতে অগত্যা ঘর হইতে তাহা কুলন করা হয়। কিন্তু তাহাও পাঠাইতে সাহস হয় নাই। পরে অনেক কৌশলে ১০ তারিখে পাঠাইয়াছি। ইতঃপূর্বে একদিন ৩/৪ শত লোক গোপালনগরের মজুমদার বাড়ি লুঠ করিতে যায় কিন্তু বনোয়ারীবাবু প্রতিরোধ চেষ্টা করাতে কয়েকজন আহত হইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু তখনই বলিয়া আসে তাহারা পুনরায় আক্রমণ করিবে ১১ তারিখে ৪/৫ শত লোক ধোবাদহ তত্রত্য লোকেরা নজর দিয়া বিদ্রোহীদলভুক্ত হইতে স্বীকার পূর্বক স্ব স্ব হস্তে লাঠি গ্রহণ করাতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া সেখান হইতে তলটে আইসে। তথায় গিরিধর রায়ের সরকারকে মাইরপিট করাতে সেও কয়েক টাকা দিয়া বিদ্রোহিতা স্বীকাব করে, পরে করঞ্জায় যায়। তত্রত্য লোকেরাও নজর দিয়া লাঠি হাতে করে। ঐ দিবস দুই প্রহরের সময় যোগেশ ও উমাচরণ চৌধুরীকে শানিলা পর্যন্ত আনয়ন করে সেই দিন এই পর্যন্তই দখল করে এবং বলে যে, এখন হাটুরিয়ায় যাইব। এই কথা শুনিয়াই আমরা চিন্তান্বিত হই। ১২ তারিখে পুনরায় লোক সংগ্রহ করা আরম্ভ হয়। গ্রামের সমস্ত লোক স্ব স্ব পরিবার লইয়া শশব্যস্ত। ইতিমধ্যে শুনা গেল, অদ্য পুনরায় গোপালনগর যাইবে। কারণ বিদ্রোহীরা শুনিয়াছে যে, তথায় নাকি অনেক সর্দার ও বন্দুক সংগৃহীত হইয়াছে, দারোগাও আছেন এবং বনোয়ারীবাবু হাতি ঘোড়া প্রভৃতি লইয়া বিলক্ষণরূপে সসজ্জ রহিয়াছেন, অতএব সেই স্থান দখল করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের অধিকতর আগ্রহ উপস্থিত হয় এই সংবাদ আমাদিগের অনুকূলই বটে। কারণ, বিদ্রোহীরা কোন এক স্থানে পরাস্ত হইলেই মঙ্গল। বড় দাদা ধোপাদহ গিয়াছিলেন। পরদিন তিনি আসিয়া বলিলেন যে, গোপালনগর রাবণপুরীর ন্যায় ছারখার হইয়াছে, লোকের সমস্ত সম্পত্তি ও জিনিসপত্র লইয়া গিয়াছে, ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে, বাবু ও দারোগা পলাইয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া পুলিশ সাহেব উন্মত্তবৎ হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ইহা বিশ্বাস করিতেন না, তজ্জন্যই আমরা নিতান্তই হতাশ হই। ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার পুনরায় লোক সংগ্রহ হইতে আরম্ভ হয়। তাহাতে আমাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। আসিল, আসিল এই এক শব্দ উঠিয়া গেল। তখন কে কোথায় যাইবে তাহার স্থিরতা রহিল না। দুই প্রহরের সময় শয়ন করিয়া আছি এমন সময় শুনি যে, বিদ্রোহীরা আসিল। অমনি আমিও হরঝাড়ি হাতে করিয়া উত্তরের মাঠে যাইয়া দেখি যে প্রায় ৯ শত কি হাজার লোক হাতিয়ারসহ বাগছির চালার উপর দিয়া উঠিতেছে ও দুর্গানাথকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। পরে অনেক লোকের সাহায্যে (অনুনয় বিনয়ে) তাহার প্রাণ বাঁচিয়াছে। তাহার নিকট হইতে ৫ টাকা লইয়া তাহাকে বিদ্রোহীদল ভুক্ত করিয়াছে। বিদ্রোহীরা তথা হইতে যখন দক্ষিণাভিমুখী হইল, তখনই আমরা উর্ধ্বশ্বাসে বাটিতে যাইয়া পরিবারদিগকে গোয়াল বাড়িতে রাখিয়া আসিলাম এবং আমরা টাকা হাতে করিয়া বাটিতে রহিলাম। প্রথমে উত্তরের বাটিতে উপস্থিত হয়। তাহারা এক টাকা মাত্র দিয়া বাটি পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া নানা প্রকার কাকুতি

করাতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া রাজমোহন রায়ের বাটিতে যায়। তাহারাও প্রথমতঃ টাকা দিয়া অনেক প্রকার মিনতি করাতে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আরম্ভ করে। তখন তাহাদিগের কোন প্রজা বিদ্রোহীগণকে সম্বোধন করিয়া বলে যে, তোরা কি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিস? এই কথাতেই তাহারা পুনরায় উত্তেজিত হইয়া একেবারে দালানের উপরে উত্থিত হয় এবং কপাট ভাঙিতে আরম্ভ করে। তদর্শনে বাটির লোকেরা ভীত হইয়া আরও কিছু টাকা দেয়। তৎপরে তাহারা রামেন্দ্র রায়দিগের বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তরাস্বা... ঘরের বেড়া ভাঙিয়া কয়েকটা বাক্স বাহির করে এবং তাহাতে যাহা কিছু ছিল, সমুদয় লইয়া যায়। পরন্তু বাহির বাড়ির ঘরে যে কিছু জিনিসপত্র ছিল, তাহাও আত্মসাৎ করে। তথা হইতে যাদব রায়েদের বাটিতে ঘরে ও দক্ষিণ বাটিতে যায়। তাহাদিগের নিকট হইতে কেবল টাকা লইয়াই ফিরিয়া আসে তৎপর কালীদিগের বাটিতে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ তাহারা টাকা দিয়া বিদায় করে। পরে তাহাদিগের প্রজারা বলে মজুমদারকে ভাল করিয়া দেখিয়া যাওয়া উচিত। তদনুসারে তাহারা তিন হিস্যার বাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সিন্ধুক বাক্স ও পেটারা প্রভৃতি ভাঙিয়া টাকা কাপড় বাসনপত্র যাহা কিছু লইয়াছে, সমুদায়ই নিঃশেষ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এমনকি ঘরের পুস্তক এবং সার্টিফিকেটগুলিও রাখিয়া যায় নাই। তাহাদিগের ঠাকুরটিও লইয়া গিয়াছিল। পরে কয়েকজনে চাহিয়া আনিয়াছে। চন্দ্রমোহনের আর কিছুই নাই। তাহার সিন্ধুকটা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। সে পরদিন কাপড় কিনে তবে পরে। তাহাদিগের সকলেই পলাইয়াছিল, এজন্য প্রাণে বাঁচিয়াছে নতুবা তাহাদিগকে মারিত। তথা হইতে আমাদিগের বাটি অভিমুখে আসিতেছিল। তদ্দর্শনে আমাদিগের ও অন্যান্য কয়েকজন প্রজা সম্মুখীন হইয়া নানারূপ মিনতি করাতে এবং বাটি পুড়িয়া গিয়াছে ইহা জ্ঞাপন করাতে বিদ্রোহীরা কাগজের নাম লেখাইয়া ছাড়িয়া গিয়াছে, তৎপর, পেঁচাখোলার লাহিড়ীদিগের বাড়ি লুঠ করে। তদনন্তর নাকালিয়া গিয়া মজুমদারদিগের বাটি হইতে ২৫ টাকা ও জিনিসপত্র লইয়া গ্রামের ভিতরে কৃপানাথ, আনন্দ ও শিবনাথ কবিরাজ, আনন্দ বাগছি, চন্দ্র রায়, প্রসন্ন রায়, শ্যামাচরণ রায় এবং যাদব রায়দিগের বাটি লুঠ করণান্তর সন্ধ্যার সময় বাটিতে ফিরিয়া যায়। পরদিন সাফল্লা যাইবে, ইহাও বলিয়া আইসে। আমাদিগের গ্রামের সমুদায় লোক জুটিয়া বাজারে শামিলাবাসীদের প্রতীক্ষায় থাকে। এদিগে তিন ব্যক্তি সাফল্লা যাইয়া ভয় প্রদর্শনপূর্বক সকলের নিকট হইতে কিছু কিছু লইয়া আসিতেছিল, নাকালিয়ায় মথুরার দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন। এদিকে শামিলার লোক আসায় যার যার মত বাটিতে যায়। রবিবার সাফল্লা যাইবার কথা থাকে, লোকেরা ইহা শুনিয়া আসিয়া বিরোধিতা স্বীকার করে। দারোগা যে লোকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, তৎপর দিবস সেই সকলকে ছিনিয়া আনিবার নিমিত্ত বিদ্রোহীরা তাহার নিকট যায়। দারোগা পলায়ন করেন। দুইজন কনস্টেবলকে মাইরপিট করিয়া লোকদিগকে লইয়া যায় এবং প্রাণনাথের নিকট হইতে ৮ টাকা গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরা যেদিন আমাদের গ্রামে আইসে, সেইদিন ডাকাইতির দারোগা শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথবাবু বেড়াতে অবস্থান করিতেছিলেন. বিদ্রোহীরা তাহাকে নানারূপ গালাগালি দেন, পরে তিনিও নাকি বিদ্রোহিতা স্বীকার করেন। এই সকল কথা কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিতে কেহই সাহস পায় নাই। কারণ যে জানাইবে, তাহারই অনিষ্টশঙ্কা আছে। কিন্তু বৈদ্যনাথবাবু সে শঙ্কায় শঙ্কিত না হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, এই অত্যাচারের বিবরণ শাসনকর্তাগণের গোচরীভূত করিবেন। তৎপর তিনি পাবনায় যাইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বিদ্রোহীদিগের দৌরাত্ম্যের সংবাদ সবিশেষরূপে জ্ঞাপনকরণান্তর তাহাকে মফস্বলে লইয়া আসেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত ৪০ জন সৈন্য একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বৈদ্যনাথবাবু এবং আরও ৮/১০ জন পুলিশ কর্মচারি আসিতেছেন শুনিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ কিয়ৎ পরিমাণে সাহস সঞ্চার হয়। এদিকে, আমাদিগের গ্রামে নাথু রাজা এবং তাহার অধীনে এ গ্রাম ১৫ জন ও জগন্নাথপুরে ১৬ জন বিচারক নিযুক্ত

হইল। তাহারা সমুদায় বিষয়েরই বিচারাস্ত করিল, আমাদিগের কোন ক্ষমতাই রহিল না। এইভাবে ৮ দিবস গত হইলে পর ২০ তারিখ বৃহস্পতিবার সাহেব নাকালিয়ায় আগমন করিলেন। আমরা এই সংবাদ পাইবামাত্র গোপনে সাহেবের নিকটে যাইয়া নানারূপ কাঁদাকাটি করাতে তখনই১০ জন সৈন্যসহ ২ জন জমাদার আসিয়া ৩২ জন আসামি গ্রেপ্তার করে। ২/৩ দিবস মধ্যে এক আমাদিগের গ্রাম হইতেই ২০০/২২৫ আসামি ধরা পড়িয়াছে। অনেক মালও বাহির হইয়াছে। অন্যান্য স্থান হইতেও ১০০/১৫০ জন আসামি ধৃত হইয়া আসিয়াছে। বিদ্রোহী রাজা ঈশান রায়কে এবং তাহার দেওয়ান শম্ভু পালকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঈশান রায় লক্ষ টাকার জামিন দিতে অক্ষম হওয়াতে, তাহাকে হাজতে সাহেবের সমভিব্যাহারেই থাকিতে হইয়াছে। ইতিমধ্যে সাগরকান্দি হইতে এই মর্মে এক দরখাস্ত আসে যে, বিদ্রোহীরা গোবিন্দ দত্তের বাটি আক্রমণ করিয়া দালান ভাঙিয়া নগদে ও জিনিসপত্রে প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকা লুঠ করিয়া লইয়াছে। এই দরখাস্ত পাইয়াই সাহেব ঘটনাস্থলে গমন করিয়াছেন। এদিকে আমরা খাজনা আদায় আরম্ভ করিয়াছি। এখন আর বিশেষ কিছু গোল নাই।" ইতি ১২৮০ তাং ২৯ আষাঢ়। --*ঢাকা প্রকাশ*, ২০.৭.১৮৭৩

We are sincerely grieved to learn that the Pubna ryots are being treated in a brutal manner by the police. Now that disturbances have ceased, it is realy inhuman to retaliate upon a set of deluded fools for their past doings... We beg to draw the attention of the Pubna authorities to the following letter which has been placed at our disposal by a very respectable inhabitant of Pubna :

"The poor ryots of Pubna are being very greatly oppressed by the police in general and by an inspector in particular. Surely there might be temperate zone between the frizid and the torrid. The poor wretches are treated in the most lamentahle manner. They are made to sit a number of them in a row. The constables begin thrashing them with muskets from front and behind. A man then with a bundle of ropes attached to his waist passes on from one end to the other trying up the hands of all. A long bamboo is now passed through th loops of the rope and two constables holding each one end of the bamboo drag the whole train along. Is such a treatment to be dealt to beings having flesh and blood—and a heart too." —*অমৃতবাজার পত্রিকা* ২৫ ৭.১৮৭৩

Pubna Ryots — The Culcutta correspondent of the Indian Statesman in a long letter regarding the Pubna outbreak tries to prove that the "Amrita Bazar Patrika. a native journal of note is invariably more inclined to sympathise with zemindar than ryots." ... we have every sympathy with the ryots and very little with the zeminders. It is this sincere sympathy which makes us very wary how to trust the false friends of the ryots who would with smooth promises lead them to ruin ... Indeed the greatest foe of the ryots is not the zamindars, who pressed their legal claims to the utmost limit but the Govt. which gave them the power to do it. Not only has the Govt. been a foe but a treacherous friend in the grab of a foe.

--*অমৃতবাজার পত্রিকা* ২৫.৭.১৮৭৩

পাবনার অত্যাচার

পাবনার অত্যাচার ক্ষান্ত হইয়াছে। কতক অপরাধী দণ্ডিত হইয়াছে, কতক অপরাধী বিচারার্থে রহিয়াছে। গবর্নমেন্ট যে ঘোষণাপত্র দিয়াছিলেন, প্রজা মধ্যে তাহা প্রচারিত হইয়াছে। রাজপুরুষগণ দ্রোহকারীদের প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি রাখিতেছেন। সম্বাদপত্রের সম্পাদকগণ, এই দ্রোহ ও ইহার কারণ লইয়া বিতণ্ডা করিতেছেন। বিতণ্ডাকারীরা দুই পক্ষ হইয়াছেন। এক পক্ষ বলিতেছেন, জমিদারদের অত্যাচারে এই প্রজাদ্রোহ ঘটিয়াছিল। আর এক পক্ষ বলিতেছেন, রাজপুরুষেরা জমিদারদের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহাদের প্রতিকূলে প্রজাগণের প্রবৃত্তি লওয়াইয়াছেন। কোন পক্ষের সিদ্ধান্ত ঠিক তাহা এক্ষণে বলা অনাবশ্যাক। গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে অবশ্যই তদন্ত করাইবেন। তদন্তে পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তিরা অবশ্যই নিয়োজিত হইবেন। ইহারা যেরূপ বলিবেন, তাহা অবশ্যই প্রকৃত সমাচার হইবে। লেপ্টেনান্ট গবর্নর শ্রেণীবিশেষের প্রতি যেরূপ পক্ষপাতরহিত হইয়া এক্ষণে রাজ্য পালন করিতেছেন, ভবিষ্যতেও সেইরূপ করিবেন।

---*এডুকেশন গেজেট*, ২৫.৭.১৮৭৩

প্রজাদিগের উপপ্লব ও পাবনার বর্তমান ঘটনা

ভারতবর্ষের প্রজারা চিরকালই রাজপদাবনত। প্রজারা সকলে একত্র হইয়া কখন যে স্বতন্ত্রতা লাভোদ্দেশে রাজ প্রতিকূলে সমুত্থান করিয়াছে এরূপ ঘটনা ভারতবর্ষে কখন সংঘটিত হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে, প্রজাদের "প্রবেশ" ও "প্রস্থান" কেহ কখন দৃষ্টি বা শ্রুতি-গোচর করে নাই ; কেবল মাত্র রাজা রানী মন্ত্রী পাত্র মিত্র সেনাপতি ও সেনাদল এ রঙ্গভূমির সমস্ত ক্রীড়াস্থল চিরদিন অধিকার করিয়া আছে, সাধারণ প্রজাদিগকে ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অভিনেয় অংশকে কখন দেখাইতে দেওয়া হয় নাই। আসিয়া খণ্ডের যাবতীয় দেশ সম্বন্ধেও এ কথা বলা যাইতে পারে। কেবল ইউরোপ খণ্ডের কোন কোন দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেও প্রজাদিগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তাহারা অনেক সময়ে একত্র হইয়া রাজ-প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং রাজ ক্ষমতাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া স্বেচ্ছাভিমত শাসন প্রণালী দেশ মধ্যে প্রবর্তিত করিয়াছে। প্রজাদিগের এইরূপ সংযোগ সৃষ্টি এবং তদ্বারা তাহাদের ক্ষমতা ও প্রভাব লাভ দেশের প্রভূত মঙ্গলই সংসাধন করে। মহাত্মা বকলের মতে এরূপ সংযোগের অভাবই ভারতবর্ষের অবনতি ও দুর্গতির অন্যতম কারণ। যে সমস্ত কারণে এরূপ সংযোগের সৃষ্টি হয় তন্মধ্যে প্রজাপীড়ন একটি প্রধান কারণ। উৎপীড়িত প্রজাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রথমত একটি সহানুভূতি সম্ভূত হইয়া থাকে ; সেই সহানুভূতি হইতে তাহাদের একটি অপূর্ব সংযোগের উৎপত্তি হয়। সেই সংযোগ তাহাদের ক্ষমতা ও প্রভাবের নিদান হইয়া উঠে ; সেই ক্ষমতা ও প্রভাব উপযুক্ত সময়ে অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া রাজশক্তির প্রতিকূলে নিয়োজিত হয়, এবং অনেক সময়ে তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে। বোধহয় একদিকে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের অন্ধ রাজভক্তি ও অপরদিকের রাজগণের অনুপম প্রজাবাৎসল্য এই উভয়বিধ কারণে এ দেশে কখন প্রজা প্রভাব সংসৃষ্ট হইতে পারে নাই। যদিও মধ্যে মধ্যে দুই এক জন রাজা অত্যাচারী হইয়া প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করিয়াছেন কিন্তু প্রজারা সে অত্যাচার স্থায়ী হইবে না জানিয়া অত্যাচারী রাজার মৃত্যুকাল প্রতীক্ষা করিয়া শান্তভাবে সমস্ত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে। হস্তী আপনার বল আপনি জানে না। প্রজারা একত্র হইলে যে সে অত্যাচার অনায়াসে শাসিত হইতে পারে, ভারতবর্ষীয় প্রজারা কখন এ জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। ক্ষমতার প্রয়োগ ভিন্ন ক্ষমতার পরিমাণ হয় না। ভারতবর্ষীয় প্রজারা কখন আপনাদের ক্ষমতাকে প্রয়োগও করে নাই, কখন আপনাদের ক্ষমতাকে জানিতেও পারে নাই। বোধহয় ভারতবর্ষে রাজ অত্যাচার কখন অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, উহা অত্যাচারী রাজার সঙ্গে আবির্ভূত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে।

অত্যাচার যদি কিছু দীর্ঘকালব্যাপী, হইত, প্রজাদিগের অপরিস্ফুট ক্ষমতা নৈসর্গিক নিয়মে আপনি স্ফূর্তি লাভ করিত। যে যে স্থানে প্রজা প্রভাব উপযুক্ত পরিমাণে উৎপত্তি লাভ করিয়া থাকে, সেই সেই স্থানে রাজগণের অত্যাচার কিছু কাল স্থায়ী হওয়া দূরে থাকুক, আবির্ভূত হইতেই অবসর পায় না।

বঙ্গদেশের নীলকর অত্যাচারের তুল্য নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার বোধহয় ভারতবর্ষ আর কখনও দর্শন করে নাই। তদানীন্তন অত্যাচারপীড়িত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যে একটি অপূর্ব যোগ সংঘটিত হইয়াছিল, তৎপূর্বে সেরূপ আর একটি ঘটনা ভারতবর্ষে কেহ কখন দেখিয়াছিল কি না সন্দেহ। এ সময়ে প্রজারা ক্ষিপ্ত হইয়া উত্থিত হয় নাই। কিন্তু অত্যাচারের প্রাবল্য আর একটু গুরুতর হইলে, অথবা আশু নিবারিত না হইলে তাহার পরিমাণ কি হইত তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। জমিদারদিগের অত্যাচারে কোন কোন স্থানের প্রজারা দলবদ্ধ হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বারাসত মহকুমার চৌরাশী পরগণার প্রজারা অনেকদিন হইতে জমিদারের প্রতিকূলে সম্মিলিত হইয়া এ পর্যন্ত তাহাদের যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছে। দুই তিন জন প্রবল জমিদারের ধনবল সামর্থ্যবল তাহাদের যোগ ভঙ্গ করিতে পারে নাই। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অত্যাচারে ডায়মন্ডহারবারের প্রজাগণের মধ্যেও দিব্য একটি যোগ সংসৃষ্ট হইয়াছে। ঐ উভয়স্থানের বিশেষত ডায়মন্ডহারবারের ভূস্বামী প্রজাগণের মৌরস স্বত্ব বিলোপ করিয়া তাহাদের ভূমির উপর কর বৃদ্ধি করিতে চান ; প্রজারা সহজে এক কপর্দকও জমিদারকে বেশি দিতে স্বীকৃত নহে। জমিদারেরা বিশেষত উত্তরপাড়ার জমিদার মহাশয় মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্রজাগণের সর্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রজারা নিরূপায় হইয়া পরস্পরের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্তির জন্য অগত্যা এক পণ এক উদ্দেশ্যে আবদ্ধ ও মিলিত হইয়াছে। পাবনার প্রজাগণের বর্তমান উপপ্লব যে অন্য কারণ হইতে সমদ্ভুত হইয়াছে তাহা আমাদের কখনই বোধ হয় না। পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রজাপ্রিয়তা, রেজিস্টারি কবুলিয়ৎ প্রজাদিগকে প্রত্যর্পণ করা, এ সমস্ত সে উপপ্লবের উপলক্ষ হইতে পারে, কিন্তু কদাপি মূল কারণ হইতে পারে না। পাবনার উপপ্লবপরায়ণ প্রজাগণের মধ্যে যাহারা প্রধান অপরাধী গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে কঠিন দণ্ড প্রদান করুন, কিন্তু যে সমস্ত নির্দয় জমিদার মোকর্দ্দমায় মোকর্দ্দমায় প্রজাগণের সর্বস্বান্ত করিতেছেন, আদালত সকলকে প্রজা পীড়নের যন্ত্র স্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং অত্যাচারে, অত্যাচারে প্রজাগণকে ক্ষিপ্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছেন তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড বিধান করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করুন। আমরাও জমিদার কৃত অত্যাচার সকলের বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। *—ভারত সংস্কারক, ৪ শ্রাবণ, ১২৮০*

পাবনা অঞ্চল হইতে আমাদের কোন গ্রাহক তথাকার প্রজাবিদ্রোহিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, জমিদারদের উপর দোষ দিয়া অনেক বদমায়েস প্রজা দিনে দুই প্রহরে ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছে। নির্দোষী ভদ্র প্রজাগণ তাহাদের উৎপীড়নে একেবারে অস্থির হইয়াছেন। ঐ সকল দুষ্ট প্রজাগণের উপযুক্ত শাস্তি হয় নাই। বিদ্রোহী প্রজাদিগের পক্ষপাতী হইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ দুষ্টদিগকে প্রশ্রয় দিতেছেন। লেপ্টনেন্ট গবর্নর সাহেবের ঘোষণাপত্রে বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। অনেক ভদ্রলোকের ধনমানের সমূহ হানি হইয়াছে। প্রজাদিগের সপক্ষতা সম্বন্ধে পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমাদের উপরেও কতকটা দোষ আসিতেছে। কিন্তু যেখানে জমিদারগণের অত্যাচারই ইহার মূল কারণ, সেখানে স্বভাবতই প্রজাদের প্রতি লোকের দয়া হইবে। মনুষ্যসমাজের বন্ধন এইরূপ যে একজনের দোষ ও গুণের সহিত সমস্ত সমাজের দুখ দুঃখের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। বিশেষত জমিদারদিগের কার্যের উপর বহুসংখ্যক অধীনস্থ লোকের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। সুতরাং বর্তমান ঘটনায়

যে অনেক নির্দোষী প্রজারও অনিষ্ট হইবে তাহা একপ্রকার অপরিহার্য। সে যাহা হউক, এক্ষণে 'গোলমাল কর মা লুটে পুটে খাই' বদমায়েশ প্রজাগণ যেন উচিত দণ্ড পায়। এইরূপ প্রকাশ যে জমিদারগণের ছোট রশি দ্বারা জমি জরিপ এবং অন্যায় করের দাবি করা এবং ভোগাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে বলপূর্বক এগ্রিমেন্ট লেখাইয়া লওয়া প্রভৃতি অত্যাচার এই গণ্ডগোলের কারণ। একশত বিদ্রোহী প্রজা ধৃত হইয়া বিচারাধীনে আছে।

—*সুলভ সমাচার, ৮ শ্রাবণ, ১২৮০*

জমিদার ও প্রজাদিগের সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের কর্তব্য

পাবনা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের প্রজাদিগের উপপ্লব নিবারিত হইয়াছে। যে সমস্ত উপপ্লবলিপ্ত দুর্জন লোক এতদুপলক্ষে অপরাধ পঙ্কে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি সমুচিত দণ্ড-বিধান হইতেছে। আমরা পূর্বাবধিই জানিতাম, যে প্রজাদিগের উপপ্লব অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এতদ্দেশীয় জমিদারদিগের অত্যাচার এরূপ অল্পকাল স্থায়ী নহে। প্রজারা জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রায় কখন সমুত্থান করে না, যখন করে তখন তাহাদের উপপ্লবাগ্নি বিদ্যুদগ্নির ন্যায় আশু নিবারিত হইয়া থাকে, কিন্তু জমিদারদিগের অত্যাচার অধিকতর স্থায়ী ও অনিবার্য। উপরিউক্ত প্রদেশের জমিদারেরা অনেকদিন ধরিয়া প্রজাদিগের উপর যে অত্যাচার করিতেছিল, প্রজাদের এই বিগত উপপ্লব তাহার একটি প্রতিধ্বনি মাত্র। যাহা হউক এই ঘটনা দ্বারা অন্তত ইহা সপ্রমাণ হইল বঙ্গীয় প্রজাগণ প্রতিঘাতক্ষম। কর্দম আঘাত গ্রহণ করে, কিন্তু যদ্দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তাহাকে প্রতিক্ষেপ করিতে পারে না। আমরা এতদিনে মনে করিতাম যে বঙ্গের প্রজারা বুঝি কর্দম বা তদ্রূপ কোন কোমল পদার্থ হইবে, নতুবা কি প্রকারে তাহারা জমিদারদিগের এত অত্যাচার সহ্য করে? এখন দেখিতেছি যে অত্যাচারের পৌনঃপুনিক সংঘর্ষণে সে কর্দম ক্রমে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া কোন কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়াছে বা হইতেছে। জমিদারেরা এখনও কি সাবধান হইবেন না? তাহারা বিলক্ষণ জানেন বঙ্গদেশের নিরীহ প্রজারা শুদ্ধ তাহাদের দোষে দুরন্ত স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা অগ্রে শান্ত হউন, তাহাদের প্রজারাও ক্রমে শান্ত ভাব অবলম্বন করিবে।

ক্যাম্বল সাহেব প্রজাদিগকে শান্তভাবে দলবদ্ধ হইয়া জমিদারের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। জমিদারের পক্ষপাতি কোন কোন সংবাদপত্র-সম্পাদক তাহাতে অনেক কথা বলিতেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ক্যাম্বল সাহেব বঙ্গীয় প্রজাগণকে আর কোন উপদেশ দিতে পারেন না। এই সকল সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা কি এই চান যে ক্যাম্বল সাহেব উপপ্লব লিপ্ত প্রজাগণের প্রতি এইরূপ ঘোষণা পত্র প্রচার করিবেন যে তাহারা তাহার আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র, জমিদারদিগের পদাবনত হয়, এবং তাহারা যে বর্ধিত কর প্রজাদিগের প্রতি নির্ধারণ করেন, অথবা যে পরিমাণরজ্জু দ্বারা তাহাদের ভূমি মাপ করেন, কোন আপত্তি না করিয়া প্রজারা অবিলম্বে তাহাতে সম্মত হয়? যখন দেখা যাইতেছে জমিদারেরা প্রজাগণের সর্বস্ব শোষণ করিতেছেন ও নানা উপায়ে তাহাদের অনিষ্ট 'সাধন করিতেছেন এবং প্রজা রক্ষক আইন ও আদালত তাহাদের আশ্চর্য কৌশলে প্রজাপীড়নের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তখন ক্যাম্বল সাহেব কি প্রজাগণকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে, এবং একে একে জমিদারদিগের বাধ্য হইতে পরামর্শ দিবেন? প্রজারা যদি সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আপনাদের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করে, তাহা হইলেও তাহারা জমিদারদের সম্মুখীন হইতে পারে কি না সন্দেহ। পার্শ্ববর্তী ভূমির কর বর্ধিত হইলে প্রজাদিগকে সেই বর্ধিত কর আইনানুসারে দিতে হয়। যদি প্রজারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া আপন আপন স্বত্ব রক্ষা করে তাহা হইলে উপরি উক্ত কারণে কর বৃদ্ধির হস্ত হইতে তাহারা অনায়াসে এড়াইতে পারে। জমিদার ও প্রজার মধ্যে কোন কর

সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে প্রজাগণের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন হাইকোর্ট পর্যন্ত মোকদ্দমা রায় নির্বাহ করা তাহাদের কখন সাধ্যায়ত্ত নহে। এ অবস্থায় কোন প্রজাহিতৈষী সদ্বিবেকী ব্যক্তি তাহাদিগকে এ সময়ে যোগ ভঙ্গ করিবার পরামর্শ দিতে পারেন না।

জমিদার ও প্রজার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ পরিবর্তিত না হইলে স্থায়ী শান্তির আশা করা যায় না। অধুনা যাহাতে জমিদারের লাভ, তাহাতে প্রজাদের অলাভ এবং যাহাতে প্রজাদের লাভ, তাহাতে জমিদারের অলাভ। এ অবস্থায় পরিণাম অবশ্যই বিষময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তন্নিবন্ধন এক দিকে জমিদার কর্তৃক প্রজা পীড়ন ও অপর দিকে প্রজাদিগের ধর্মঘট ও জমিদারে বিরুদ্ধে উত্থান। আমাদের বিবেচনায় জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধীয় আইন শীঘ্র পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক। প্রজাদের উপর করবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা জমিদারদিগের হস্তে রাখা উচিত নহে। বাণিজ্যের উন্নতি অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কারণে উৎপন্ন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে, অথবা দৈবযোগে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইলে, শুদ্ধ জমিদারকে তাহার ফল ভোগ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। প্রথমত কর বৃদ্ধি বৎসর বৎসর বা শীঘ্র শীঘ্র হইলে প্রজাদিগের অত্যন্ত অসুখের কারণ হয়। এ বিষয়ে একটি সময়ের ব্যবধান থাকা আবশ্যক। আমাদের মতে এ ব্যবধান অন্তত ২৫ বৎসর হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত কর বৃদ্ধি জমিদার কর্তৃক না হইয়া উপযুক্ত গবর্নমেন্ট কর্মচারী দ্বারা হওয়া বিধেয়। যে সকল প্রজার স্বত্ব মোকরবী নহে, তিনি তাহাদিগের সম্বন্ধে উপযুক্ত নিরিখ স্থির করিবেন। জমিদার কেবল সেই নিরিখ প্রজাদের নিকট চাহিতে পারিবেন, প্রজা তাহাতে স্বীকৃত না হইলে আদালতে মোকদ্দমা উত্থাপন করিবেন।

অনেক স্থলে প্রজাদিগের নিকট হইতে নির্ধারিত কর আদায় করা জমিদারের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। জমিদার যদি গবর্নমেন্টের রাজস্ব আদায় করিতে কালবিলম্ব করেন তাহার জমিদারি তৎক্ষণাৎ বিক্রয় হইয়া যায়, কিন্তু প্রজারা খাজনা না দিলে আদালতের বিচারের উপর জমিদারকে নির্ভর করিতে হয়। একারণ প্রজাদিগের উপর কোন কঠিন শাসন থাকা বিধেয়।

—ভারত সংস্কারক, ১১ শ্রাবণ, ১২৮০

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ

হুজুগে বাংলা। একগুণ হইলে এখানকার লোকে শতগুণ করিয়া তুলে। মধ্যে বিদ্রোহ বিদ্রোহ যে প্রকার রব উঠিল, বোধ হইল যেন ১৮৭৩ অব্দের পাবনার বিদ্রোহ ১৮৫৩ অব্দের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের বিদ্রোহ বিস্মৃত হইতে হয়। উপস্থিত বিদ্রোহের যে হেতুবাদ ও স্বরূপ বর্ণনা করা হয়, তাহাতে আমাদিগের সম্পূর্ণ সংশয় ছিল, তাহা অত্যুক্ত হউক আমরা বিরক্ত হইতেছিলাম, পাবনা সুশাসিত প্রদেশ, সেখানে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি জাজ্জ্বল্যমান তবে এরূপ হইতেছেন কেন? উদয়কালেই উহার উন্মূলন না হইবার কারণ কি? যাহা হউক আমরা এক্ষণে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কমিশনর ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট প্রভৃতি সকলেই কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। লেপ্টনান্ট গবর্নর এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। তিনি যে একটি ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অধিকতর প্রীতিলাভ করিলাম। প্রজা ও জমিদার উভয়কেই বৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া আপন প্রার্থয়িতব্যৎ সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আপাতত যে উপায় অবলম্বিত হইল, ইহাতে উপস্থিত আপদের প্রতীকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মূল উদ্ধৃত করা আবশ্যক। তাহা না করিলে ইহার পুনরায় উচ্ছেদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিল। লেপ্টনান্ট গবর্নর বলেন, জমিদারেরা নিরিখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাতেই এই গোলযোগ উপনীত হইয়াছে। পূর্বে এ প্রকার নিরিখ বৃদ্ধি করিলে এ প্রকার গোলযোগ হইত না, এখন হয় তাহার কারণ কি? অনেকে ১০ আইনের প্রতি দোষারোপ

করেন। যাহারা এ কথা বলেন, তাহারা জমিদারদিগের পক্ষ সন্দেহ নাই। ১০ আইন জমিদারের হস্তরোধ করিয়াছে। এটি জমিদার ও তাহার অত্যাচার দর্শনোৎসুক মিত্রগণের অতি অসুখের হইয়াছে। তাহারা যাহা বলুন ১০ আইনের গুণ বিনা দোষ নাই। রাশিয়ার সার্ফদিগের ন্যায় বাংলাদেশের প্রজার যে শোচনীয় অবস্থা ছিল, ১০ আইন তাহার অনেক সংশোধন করিয়াছে। এই আইনটি প্রজাগণের স্বাধীনতার চারটর্ স্বরূপ।

আমরা বলি ১০ আইনের দোষে প্রস্তাবিত গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। বাংলাদেশে কতগুলি অর্ধক্ষিপ্ত অর্ধশিক্ষিত আছেন! বৈধ উপায় দ্বারা অভীষ্ট সাধন চেষ্টা পাইলে জাতের যে অভ্যুদয় লাভ হয়, তাহাদিগের সেই শিক্ষা হয় নাই। বিপ্লব উপস্থিত করিয়া কার্যসাধনকেই তাহারা সাধীয়ান জ্ঞান করেন। চাষারা পশুপালের তুল্য, তাহাদিগের পরিণাম দর্শন ও হিতাহিত বোধ নাই। তাহাদিগকে যে দিকে ফিরান যায়, সেইদিকেই ফিরে। উক্ত অর্ধক্ষিপ্তেরা একটি মূল পাইলেই ইহাদিগের অধিনায়ক হইয়া বসেন। অর্ধক্ষিপ্তদিগের নাম বাহির করিবারও মনে মনে একটি বলবতী ইচ্ছা আছে। উহারাই যাবতীয় বিপ্লব ঘটাইবার মূল। আমরা অনুরোধ করি, লেপ্টটেনান্ট গবর্নর অনুসন্ধান করুন, উপস্থিত বিপ্লবের কে কে অধিনায়ক, তাহাদিগের গুরুদণ্ড বিধান করুন। অপর অনুরোধ এই ১০ আইন আছে বটে, কিন্তু আজিও অনেক জমিদার আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের অভীষ্ট সাধন চেষ্টায় ঔদাসীন্য করেন। তাহারা স্বহস্তে আইন গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টা পান, তাহাদিগকে ধরিয়া নিজ বাটিতে আনয়ন করেন, প্রহারেও পরাঙ্মুখ হন না। উপস্থিত ঘটনায় যদি কোন জমিদারের উল্লিখিত দুর্ব্যবহার দোষ থাকে, তাহারও অনুসন্ধান ও গুরুদণ্ডবিধান বিধেয়। তাহা হইলে ভবিষ্যতে এ প্রকার বিদ্রোহ ঘটনার পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনা অল্প হইবে সন্দেহ নাই। —*সোমপ্রকাশ, ২৪ আষাঢ়, ১২৮০*

উভয়সঙ্কট

সম্প্রতি জমিদারের সহিত প্রজাদিগের যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া গবর্নমেন্ট যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, আমরা তাহার উভয়সঙ্কট নাম দিলাম। সেদিন পাবনাতে ঘোরতর বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল এবং তাহা নির্বাণ হইতে না হইতে শুনা যাইতেছে ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে প্রজারা জমিদারদিগের বিপক্ষ হইয়া দলবদ্ধ হইয়াছে। সকল স্থানেই যে কর বৃদ্ধি কিংবা জমিদারদিগের অত্যাচার এইরূপ দলবদ্ধ হইবার কারণ, তাহার বোধ হইতেছে না। আমরা যাহাদিগকে ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মভীরু বলিয়া জানি, এইরূপ কোনও কোনও জমিদারের অধিকারের মধ্যেই এইরূপ ধর্মঘট হইবার কথা শুনা যাইতেছে। এইসকল নিবারণের উপায় কি? গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে যেদিকে যাইবেন সেইদিকেই বিপদ। প্রথম, জমিদারেরা যে সকল আইনবিরুদ্ধ কর আদায় করেন তাহা ন্যায় বলিয়া যদি প্রজাদিগের নিকট ঘোষণা করা হয় তাহা হইলে মুর্খ প্রজারা অতি গর্হিত ব্যবহার করিতেছে, ন্যায়সঙ্গত সমুদায় কর আদায় করিবার বিষয়ে জমিদারদিগের অধিকার আছে, গবর্নমেন্ট প্রজাদের এ অন্যায় আপত্তি শুনিবেন না, তাহা হইলে আবার প্রজারা হতাশ হইয়া পড়ে এবং জমিদারেরা গবর্নমেন্টের অনুকূল মনে করিয়া অবাধে অত্যাচার আরম্ভ করেন। এই কারণেই এ বিষয়ে লেপ্টনান্ট গবর্নরকে নানা কথা কহিতে হইতেছে। সেদিন পাবনা ঘটিত ঘোষণাতে বলিলেন সে আইন বিরুদ্ধ কর গ্রহণ নিবারণের জন্য প্রজাদিগের ন্যায়সম্মত ধর্মঘট করিবার অধিকার আছে। আবার সম্প্রতি তাহার যে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "ভূমির ন্যায় কর ভিন্ন অনেকগুলি কর জমিদার ও প্রজা উভয়ের সম্মতি অনুসারে নির্ধারিত এবং চিরক্রমাগত সুতরাং সেগুলির নিবারণ করিলে জমিদারদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় অতএব অনেক বিবেচনা করিয়া গবর্নমেন্ট আপাতত এ সকল বিষয়ে

হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" এ কথার এই ফল হইবে যে জমিদারগণ গবর্নমেন্টের সম্মতি জানিয়া এইসকল করের উপলক্ষ করিয়া হয়ত অনেক অত্যাচার করিবেন। এইপত্রে লেপ্টনান্ট গবর্নর ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টরদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তাহাদের এলাকার মধ্যে যদি কোন জমিদার বলপ্রকাশ কিংবা অত্যাচার দ্বারা ন্যায় বিগর্হিত কর আদায়ের চেষ্টা পান, তৎক্ষণাৎ তাহারা সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন। কিন্তু কোন্ করগুলি ন্যায়বিগর্হিত এবং কোন্‌গুলি চির প্রথাসিদ্ধ ও উভয়ের সম্মতিতে স্থাপিত, তাহার কোন মীমাংসা হইল না। লোকে সচরাচর যেগুলিকে "বাব" বলিয়া জানেন, তাহা সকল প্রদেশে কিংবা সকল বিভাগে সমান নহে। সুতরাং এক প্রদেশ ধরিয়া মীমাংসা হইতে পারে না। আবার ভাবিয়া দেখা যাউক যে ক্রমেই ভূমির আয় বৃদ্ধি হইবে, যদি সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করের বৃদ্ধি না হয়, জমিদারদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। প্রজারা যেরূপ মূর্খ, তাহাতে তাহারা বরং পাঁচটা বাহিরের "বাব" দিতে পারে কিন্তু বর্ধিত কর দিতে সহজে সম্মত হয় না। এই কারণেই এই সকল বাবের সৃষ্টি হইয়াছে। জমিদারেরা একদিকে এইসকল উপায় দ্বারা সেই ক্ষতিপূরণ করেন। প্রজারাও এইগুলিকে সাময়িক ও আইন বহির্ভূত জানিয়াও সম্মত হয়। কারণ, তাহারা মনে করে যদি কোন কারণে তাহারা এ গুলি দিতে অসমর্থ হয়, জমিদারেরা আইনের সাহায্যে তাহা আদায় করিতে পারিবেন না। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় এই কারণেই অত্যাচার করা অনেক সময়ে আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইসকল বাব আদায় না করিলে জমিদারদিগের লাভ হয় না, কিন্তু আদায় জন্য রাজদ্বারেও যাইবার উপায় নাই, সুতরাং বল প্রয়োগ কিংবা ভয় প্রদর্শন দ্বারা আদায় করিয়া লইতে হয়। প্রজারা যদি ভূমির আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত কর দিতে প্রস্তুত, তাহা হইলে এইসকল বাব এবং তাহা আদায়ের জন্য অত্যাচার এত হইত না। প্রজার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ উত্থাপন করিলে করবর্ধিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রত্যেক প্রজার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করিতে গেলে জমিদারকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়। এইসকল কারণেই জমিদার ও প্রজার বর্তমান সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদি কোন দিন ইহার নিবারণের কোন বিশেষ উপায় নির্ধারিত না হয়, ততদিন এইরূপ চলিতে থাকিবে। অত্যাচার করিলে জমিদারের নামে অভিযোগ করিয়া কৃতকার্য হওয়া দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে সহজ নয়, সুতরাং তাহারা সহ্য করিয়া থাকে এবং এই সুবিধা অবলম্বন করিয়া অনেক হৃদয়শূন্য জমিদার সহস্র প্রকারে প্রজাদিগকে শোষণ করিয়া থাকেন। সকল বাব্ যে চিরক্রমাগত তাহাও নয়, বৎসর বৎসর নতুন বাবের সৃষ্টি হয়। জমিদারের বাটিতে প্রজা পূজা প্রভৃতির সকল ব্যয় অবশেষে প্রায় প্রজাদিগের স্কন্ধেই পড়িয়া যায়, বাস্তবিক বিষয়টি বড় জটিল। বর্তমান সময়ে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ত প্রজারই সমূহ কষ্ট। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারের দেয় কর চিরকালের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু প্রজাদিগের দেয় করের সীমা নাই। তন্নিবন্ধন জমিদারদিগের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। গবর্নমেন্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং রোড সেস প্রভৃতির উদ্ভাবন করিতে হইতেছে। লেপ্টনান্ট গবর্নর রোড সেস সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টকে বলিয়াছেন প্রজারা বৎসর বৎসর নানা বাবে জমিদারদিগকে যে টাকা দেয় তাহার সহিত তুলনা করিলে রোড সেস সম্বন্ধে যাহা দিবে তাহা কিছুই নয় বলিলে হয়। এই দ্বেষ অপক্ষপাতে প্রজা ও জমিদার উভয়ের উপর করা হইতেছে বলিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহার ভাবা উচিত ছিল যে প্রজারা চিরকাল যে সকল বাব দিয়া আসিতেছে তাহার নিবারণ করিয়া যদি রোড সেস স্থাপন করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাহাদের ভারের লাঘব হইত। প্রত্যুত ইহাতে ভার বৃদ্ধি হইল। দ্বিতীয়ত জমিদারদিগের উপর সেসের যে অংশ নির্ধারিত হইয়াছে গোপনে গোপনে তাহার অধিকাংশ প্রজাদিগের স্কন্ধে পড়িবে। প্রজারা শিক্ষিত হইতে আরম্ভ হইলে এবং জমিদারদিগের কার্যাদির উপর গবর্নমেন্টের দৃষ্টি থাকিলে এইসকল অত্যাচারের অনেক

হ্রাস হইতে পারে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া গবর্নমেন্ট যেরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে এ সকলের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের প্রস্তাবিত প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত যাবৎ না হইতেছে তাবৎ গবর্নমেন্ট যদি ১৫ কিংবা ২০ বৎসর অন্তর এক এক বার সমুদায় প্রদেশের আয় বৃদ্ধি দেখিয়া এক একটি করের হার স্থির করিয়া দেন তাহা হইলে প্রজারাও বুঝিতে পারে যে সেই পরিমাণে কর দিতে হইবে এবং জমিদারেরাও বুঝিতে পারেন যে তাহার অধিক প্রার্থনা করিবার তাহাদের অধিকার নাই। তাহার অতিরিক্ত কর গ্রহণের চেষ্টা হইলেই কঠিন দণ্ড দ্বারা যেন তাহার নিবারণ করা হয়। তাহা হইলে জমিদারদিগের অত্যাচার শেষ হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে সকল কর্মচারী আছেন, তাহাদের দ্বারা গবর্নমেন্ট সেই সেই প্রদেশের ভূমির আয় কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহার নিরূপণ করিতে পারেন। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে যদিও জমিদারদিগের নিজ ভূমির কর সম্বন্ধে যে স্বাধীনতা আছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হয় কিন্তু তাহা না হইলে প্রজারাও বাঁচে না, তাহা না হইলে কৃষকদিগের হস্তে কোন কালে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে না। কৃষকদিগের হস্তে অর্থ সংগ্রহ না হইলে এবং তাহাদিগের মনে সুখ না থাকিলে কৃষিকার্যের উন্নতি হইবে না এবং তাহাদের দরিদ্রতা ও যন্ত্রণার অবসান না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি হইবে।

প্রজাদিগের আর একটি প্রধান কষ্টের কারণ এই ঘটিয়াছে যে তাহাদিগকে একেবারে এক ব্যক্তির নিকট সমুদায় কর না দিয়া অনেক সময় এক জমিদারের ভিন্ন ভিন্ন অংশীর নিকট স্বতন্ত্ররূপে গোমস্তার খরচা প্রভৃতি নানা বাবে ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। ১৭৯৩ অব্দের ৮ আইনে এরূপ বিপদের আশঙ্কা করিয়া এই প্রকার লিখিত হয় যদি ভবিষ্যতে কোন জমিদারির ভাগ হয় সেই সমুদায় অংশীরা একজনকে কার্য সম্পাদক করিবেন এবং প্রজারা তাহারই নিকট সরকারি কর জমা দিবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আজিও এই মতে কার্য হইতেছে কিন্তু ১৮০৫ অব্দ হইতে কতকগুলি জমিদারের আবেদনে বাংলাদেশে এই নিয়ম রহিত হইয়াছে। সুতরাং তদবধি প্রজাদিগের কষ্টের বৃদ্ধি হইয়াছে। উড়িষ্যার কামিসনর প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের কমিশনর প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। গবর্নমেন্টের পুনরায় সেই নিয়ম প্রচলিত করিয়া এই কষ্ট দূর করা উচিত।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের দেশিয় জমিদারেরা যদি ধর্মভীরু এবং ন্যায়পর হইতেন তাহা হইলে এত কথা বলার প্রয়োজন হইবে না। কিছুদিন হইল আয়ারল্যান্ডের কয়েকটি প্রদেশে উপযুক্ত রূপ শস্যাদি না হওয়াতে প্রজাদিগের অত্যন্ত ক্লেশ হয়, তাহাতে সেই সেই প্রদেশের অনেকগুলি জমিদার আপনা হইতে প্রজাদিগকে লিখিয়া পাঠান সে বৎসর তাহাদের নির্ধারিত করের অর্ধেক মাত্র দিলেই হইবে। জমিদারেরা যদি এইরূপ সদ্বিবেচক ও সহৃদয় হন, তাহা হইলে তাহাদের অধিকারে বাস করা সুখের বিনা অসুখের ব্যাপার হয় না। আমরা এস্থলে আর একটি প্রস্তাব করিতেছি আজিও কৃষকেরা যেরূপ অজ্ঞ আছে তাহাতে তাহারা যে ত্বরায় আপনাদের কষ্ট গবর্নমেন্টের গোচর করিতে শিখিবে এরূপ আশা করা যায় না। অতএব দেশিয় কৃতবিদ্যাদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃষকদিগের জন্য বাস্তবিক ভাবিয়া থাকেন, তাহারা যদি একটি সভা করিয়া সর্বদা কৃষকদিগের অভাব ও কষ্টের বিষয় গবর্নমেন্টের গোচর করেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। বর্তমান ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং হিন্দু পেট্রিয়ট জমিদারদিগের পক্ষে যেরূপ কার্য করিতেছেন যদি কৃষকদিগের পক্ষে সেরূপ কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে আজ অনেক অত্যাচার প্রকাশ হইয়া পড়িত ও তাহার নিবারণ হইত তাহার সন্দেহ নাই। জমিদারদিগের সকলেই যে অত্যাচারী এবং প্রজারা সকলেই নিরপরাধ এরূপ বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। জমিদারদিগের মধ্যে অনেকে আছেন যাহারা বাস্তবিক দরিদ্র প্রজাদিগকে

দুঃখ বুঝিয়া থাকেন এবং তাহাদের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অনেক প্রজা এরূপ দুরন্ত যে বিনা অত্যাচারে বশীভূত হয় না। কিন্তু সবল দুর্বলের সমাগমে দুর্বলের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার অধিকসম্ভবনা ইহা একটি চিরপ্রসিদ্ধ কথা। দুর্বলের পক্ষ হইয়া তাহাকে রক্ষণ করা রাজার প্রধান কর্ম। এইজন্যই আমরা গবর্নমেন্টের এ বিষয়ের একটি উপায় করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি। ফল কথা এই প্রজাদিগের কষ্টের কথা আর সহ্য হয় না। শ্রমজীবী ও কৃষক শ্রেণীর উন্নতি না হইলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সমাজের মধ্যে অলস ও অকর্মন্যেরা যতদিন পরিশ্রমী ও কর্মিষ্ঠ দিবসের রক্তমাংস প্রতিপালিত হইবে ততদিন দেশের ভদ্রস্থতা নাই।

—*সোমপ্রকাশ ২৪ ভাদ্র ১২৮০*

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ

বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের জমিদারিতে ঈশানচন্দ্র রায় নামক একজন সামান্য তালুকদার জমিদার বিপক্ষ দলের প্রথম প্রবর্তক হন। এই ব্যক্তি স্বয়ং উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের হস্তে অপমানিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। এবং একখানি তালুকের অংশ সম্বন্ধে ঐ জমিদারদিগের সহিত ঈশান রায়ের এখনও মোকদ্দমা চলিতেছে। ফলত ঈশান রায় এতদূর পর্যন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তাহাকে সকলে রাজা বলিয়া মানিয়াছিল কিন্তু তিনি এবং তাহার সহকারী শম্ভুনাথ পাল, উভয়ে কোন আইনবিরুদ্ধ কার্যে লিপ্ত ছিলেন কি, না, তদ্বিষয়ের এখনও অনুসন্ধান হইতেছে। এবং উভয়েই এক্ষণে টেলর সাহেবের নিকটে অবরুদ্ধ আছেন।

জমিদার-দ্রোহী প্রজাদিগের দ্বারা কত স্থানে কত উপদ্রব হইয়াছে, তাহার এখনও সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায় নাই। থানা চাটমোহরের অন্তর্গত গোপালনগর, থানা মথুরার অন্তর্গত নাকালিয়া এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ দুলাই থানার অন্তর্গত [illegible]রকান্দি এই স্থানগুলিতেই উপদ্রবের আতিশয্য ঘটিয়াছিল, এই সকল স্থানে সম্পত্তির অনেক হানি হইয়াছে।

১৩৪ জন অপরাধী ইতঃপূর্ব ধৃত হইয়াছে, এবং এখনও অনেক হইতেছে। প্রধান প্রধান উপদ্রবীদিগকে ধৃতকরণ পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরা নানা স্থানে বিশেষ পুলিশ নিয়োজিত করিয়াছেন। কোন স্থানে বা গ্রামবাসীদের ব্যয়ে, তথায় পুরাতন বিবাদ আর না উঠিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে পুলিশ নিয়োজিত রাখা হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী এবং ফরিদপুর হইতে অতিরিক্ত পুলিশ যায়, তন্মধ্যে ফরিদপুরের পুলিশের লোকেরা চলিয়া গিয়াছে। অপরাপর পুলিশের লোকেরাও শীঘ্র যাইবে।

ফলতঃ জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপন অল্পদিনের মধ্যেই হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ততঃ ছয় মাস পর্যন্ত অতিরিক্ত পুলিশের বন্দোবস্ত না রাখিলে নিঃশঙ্কতার বিষয় নহে। অতএব প্রত্যেক থানার অধীনে দশজন অতিরিক্ত কনস্টেবল এবং দুইজন হেড কনস্টেবল দিয়া যেখানে যেখানে আবশ্যক আউটপোস্টের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না। এই সকল লোকের বেতন দেশস্থ লোককে সকল স্থলে দিতে হইবে না। যে যে স্থলে বিশেষ আবশ্যক হইবে সেই সেই স্থলে দিতে হইবে।

এই দিবস উপলক্ষে প্রজাদিগের সঙ্গে জমিদারদিগের দেওয়ানি মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে, এতদর্থ স্থানে স্থানে অতিরিক্ত মুন্সেফ নিয়োগেরও আবশ্যকতা হইবে। এবং কোন্ কোন্ স্থানে মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, অবস্থা দেখিয়া তাহা হইবে।

প্রজারা উদ্দেশ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া আইন বিরুদ্ধ পথে যে পদার্পণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, নোলান সাহেব বলিয়াছেন, যে অধিকাংশ প্রজাই এমন কথা বলে যে, তাহারা তাহাদের বর্তমান ওজর পরিত্যাগ করিবে, এবং জমিদারদের সঙ্গে একটা ন্যায্যরূপে বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছে।

বর্তমানে প্রজার দেয় খাজনার হারের সামঞ্জস্য নাই বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত যে হার আদালতে

ডিক্রি হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত কম বলিয়াই বোধ হয়। যাহাই হউক, যে হারে প্রজারা কর দিয়া আসিতেছে, সেই হারেই তাহারা দিতে বাধ্য। জমিদারকে তাহার অতিরিক্ত আদায় করিতে এবং প্রজারা তাহার কম দিবার জন্য ওজর করিতে পারে না। তবে বেশি লওয়া বা কম দেওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ হইলে জমিদার প্রজার হারের তারতম্য স্ব স্ব প্রধান হইয়া করিতে ক্ষমতাবান নহে। তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

—এডুকেশন গেজেট, ৮.৮ ১৮৭৩

পাবনা হইতে এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, এক্ষণে তথায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে ন্যায় আর আইনবিরুদ্ধ জমায়েত হইতেছে না। কিন্তু প্রজারা বর্দ্ধিত কর দিবে না বলিয়া যে পণ করে, তাহা তাহারা ছাড়িতেছে না। এক্ষণে পাবনা জেলে প্রায় দুইশত প্রজা রহিয়াছে। ইহাদিগের বিচার হইতেছে। ইহারা যে সকলে সমবেত হইয়া অত্যাচার করে গবর্নমেন্ট তো তাহারই বিচার করিতেছেন। কিন্তু কর বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেই যে এই গোলযোগের উৎপত্তি হয় তাহার কি করিতেছেন। *—ভারত ভাস্কর, ৮.৮ ১৮৭৩*

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, পাবনার যে ১৪২ জন বিদ্রোহী রায়তকে গ্রেপ্তার করা হয়, উহার মধ্যে ৮১ জন মুক্তিলাভ করিয়াছে। ৯৯ জনের দণ্ড হইযাছে, ৬২ জনের এখনও বিচার শেষ হয় নাই। একমাস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং তৎসঙ্গে কোন কোন ব্যক্তির জরিমানাও হইয়াছে। প্রজাদের তো শান্তিভঙ্গের নিমিত্ত দণ্ড হইল, কিন্তু যে মূল কারণে এই প্রজাবিপ্লব উপস্থিত হয়, গবর্নমেন্ট তাহার কি করিবেন? *—সোমপ্রকাশ, ২২.৯.১৮৭৩*

রাইয়াতি হাঙ্গামা

বিদ্রোহ থামিয়াছে, কিন্তু জমিদার ও প্রজার মহা গোল রহিয়াছে, অনেক জেলার বাইয়তগণ বিলক্ষণ সাহসী হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা রাজস্ব রহিত করণার্থ ধর্মঘট করিয়াছে। জমিদার অনেক দাবি ছাড়িয়া দিতে সম্মত এবং ছোট কর্তার আদেশে রাজকর্মচারীরা মধ্যবর্তী হইয়াও দূরাকাঙক্ষী প্রজামণ্ডলীকে ক্ষান্ত করিতে পারিতেছেন না। একবার আইল ছাড়া হইলে জল যেমন সহজে অবরোধিত হইবার নয়, স্বাভাবিক ও পুরুষানুক্রমিক কর্তার বশ্যতা একবার উল্লঙ্ঘন করিলে সহজে বশীভূত হওয়া সামান্য লোকের স্বভাব নয়। তদ্দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিন্দু পেট্রিয়ট হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়টি সংগ্রহ করিলাম।

পাবনা জেলার শাহজাদপুরের জমিদার ঠাকুর গোষ্ঠীর কোন মহাশয়কে শ্রীযুক্ত লেঃ গবর্নর বাহাদুর ডাকাইয়া রাইয়তদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার পরামর্শ দেন। তিনি তদুত্তরে কহেন যদিও আমরা বেআইনি কোন বাব লই না, যদিও আমাদের মাপের কাঠি আদালত গ্রাহ্য এবং যদিও আমাদের কাঠি সর্বপ্রকারেই অনতিরিক্ত তথাপি আপনার বিবেচনায় যাহা ন্যায্য ও উচিত বলিয়া বোধ হয়, তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। ছোটকর্তা তাহাদেরই সদ্বিবেচনার উপর নির্ভর করিলেন। তাহারা প্রস্তাব করিলেন যে, 'দুই বৎসর পূর্বে প্রজাবা যাহা দিত তাহাই দিউক, চারি আনা করিয়া যে খাজানা বাড়িয়াছে, তাহা আমরা ছাড়িয়া দিতেছি', এই প্রস্তাবে ছোটকর্তা অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশপূর্বক এমন আশা করিলেন, যে অন্যান্য জমিদারগণও তাহাদের সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন। তিনি তাহাদিগকে শাহজাদপুর যাইতে পরামর্শ দিয়া কহিলেন যে, মেঃ নোল্যান সাহেবকে এরূপ আদেশ প্রেরিত হইবে যাহাতে তিনি আপনাদের সহিত রাইয়তদের বন্দোবস্তের বিশেষ সহায়তা করেন।

তাহার আজ্ঞাপালনে তাহারা কালবিলম্ব মাত্র করিলেন না। অর্থাৎ তাহারা শাহজাদপুরে গিয়া মেঃ নোলানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ সদ্ভাব প্রদর্শন পূর্বক রাইয়তগণকে উক্ত কম হারে দশ সনের পাট্টা দিতে পরামর্শ দান করিলেন। তাহারা

তাহাতেই সম্মত হইলেন। এবং তাহার উপদেশানুসারে মাথা মাথা লোকদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সেই মাথা মাথা লোক ডাক শুনিল না—আইল না। তখন মেঃ নোল্যান আপনার লোক দ্বারা তাহাদিগকে জমিদারের কাছারিতে ডাকিয়া আনাইয়া নূতন বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তাহারা আপনাদের বলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী থাকাতে সে প্রস্তাব তাহারা গ্রাহ্য করিল না।

ষাইট বৎসর পূর্বে নাটোর রাজার সময়ে যেরূপ হার ছিল, তাহারা তদপেক্ষা এক পয়সাও বেশি দিতে এবং শাহ মক্‌দুমের আমলে যে মাপকাঠি ছিল তদ্ভিন্ন অন্য মাপে স্বীকৃত নহে।

আশা ছিল, গবর্নমেন্ট কর্মচারির মধ্যবর্তিতায় সকল শেষ হইবে, এক্ষণে সে আশাও বিফলা হইল। অন্য নয়, স্বয়ং নিজে নিজে মেঃ নোল্যান সাহেবের চেষ্টা যখন এইরূপে নিরাশ হইল, তখন গবর্নমেন্টের খাতির যত তাহাও বুঝা যাইতেছে পূর্বে জমিদারই প্রজার অধিনায়ক ছিলেন, তাহারা যখন যে গণ্ডি ছাড়াইয়াছে, তখন কেবল দুষ্ট লোকের মন্ত্রণার অধীনত্ব ভিন্ন অন্য কিছু যে এখন মান্য করিবে না তাহা স্বাভাবিক। এই অপ্রার্থনীয় অবস্থার নিমিত্ত একা ছোট কর্তাই দায়ী। তাহার নিজ কৃতকর্মের ফল তাহার নিজের পক্ষেই বিষময় হইয়া উঠিতেছে। শুদ্ধ পাবনা কেন, শুনা যাইতেছে বোগড়াতেও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এইরূপে বিফলযত্ন হইয়াছেন। এক্ষণে এই সব ভয়ানক গোলযোগের পরিণাম যে কি হইবে, তাহা আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি। মেঃ নোল্যান সাহেব হতাশ্বাস হইয়া শেষে জমিদারকে আদালতে যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাই কি উভয়পক্ষের কল্যাণজনক হইবে? তাহাতে জমিদার রাইয়ত উভয়েরই সর্বনাশ। আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, অনেক জমিদার এবার সূর্যাস্ত নিয়ম পালনে অক্ষম হওয়াতে তাহাদেব জমিদারি নিলামে উঠিবে বাঙ্গালাদেশ একে সংক্রামক জ্বরে উৎসন্ন প্রায় হইতেছিল, তাহার উপর অন্যান্যস্থলে এই বিপ্লব, ইহাতে সমাজবন্ধুমাত্রেরই হৃদয় বিশেষ শঙ্কাকুল হইতেছে! ভরসার মধ্যে রাজ্যের সর্বপ্রধান আসনে লর্ড নর্থব্রক অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি কি ইহার কিছু প্রতিবিধান করিবেন না?

—*ঢাকা প্রকাশ*, ২ ১১ ১৮৭৩

ক্ষুদ্র জমিদারদের উপায় কি?

মহাশয়!

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ লইয়া যে হুলস্থুল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহা আর লিখিয়া জানাইতে হইবে না। বহুদিন গত হইলেও তথায় সে গোলযোগের অবসান হয় নাই। এখনও সুশৃঙ্খলরূপে খাজানা আদায় হইতেছে না। ইহাতে বড় জমিদারদের যেরূপ হউক—ক্ষুদ্র জমিদারেরা বেলের সহিত সরিষার ন্যায় পেষিত হইয়া যাইতেছেন। বড় জমিদারদের সকল দিকেই সকল বল অধিক, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে যে ক্ষুদ্র জমিদারেরা মারা যাইতেছেন, এইটিই বড় আক্ষেপের বিষয়। কারণ বড় জমিদারকৃত করবৃদ্ধি প্রভৃতি অত্যাচার যেমন প্রজাবিদ্রোহের কারণ বলা যাইতেছে ; ক্ষুদ্র জমিদারেরা উহার ত্রিসীমায়ও যাইতে পারেন নাই, অথচ অত্যাচারের ফল ভোগ করিবার সময়ে তাহাদের অংশই আঠার আনা।

লেপ্টনন্ট গবর্নর মহোদয়ের আহ্বান অনুসারে ঠাকুরবাবুরা সিরাজগঞ্জের নোলান সাহেবের সহকারিতায় তাহাদের শাহজাদপুরের সহিত জমাঘটিত গোলযোগে মিটাইতে প্রবৃত্ত হন এবং প্রজাদিগকে ঐ বিষয়ে সম্মত করিবার জন্য পাঁচ আনা পরিমাণে খাজনা রেহাই দিতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তথাপি প্রজারা তাহাতে সম্মত হয় নাই। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র জমিদারদের প্রজারাও বলিতেছে যে, আমাদিগকেও নিতান্তপক্ষে বর্তমান জমা হইতে ঐ পাঁচ আনা রেহাই না দিলে আমরাও খাজানাও দিব না। এই অসুবিধায় সকলেই পরামর্শ দিবেন যে খাজানা বাকির অভিযোগ করাই তো উচিত। কিন্তু উপদেশ দেওয়া যত সহজ,

কার্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। কারণ ৫০/৬০ টাকা লাভবান জমিদারের পক্ষে উহা সঙ্গত হইতে পারে না। তাহার উপর তাহারা এই কয়েক কিস্তির সদর খাজানা দিতেই মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এই শোচনীয় অবস্থা যেরূপ ঘটিয়াছে, তাহা লিখিয়াই এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ কিরূপে বিদ্রোহীদিগকে শাসন করিলে এ গোলযোগ হইত না,—সে পরামর্শের সময় চলিয়া গিয়াছে। এখন এটি কেবল সংক্রামক জ্বরের ন্যায় বর্তমান আছে।

১২৭৮ সালে ঠাকুর বাবুদের প্রসিদ্ধ নায়েব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মৈত্র শাহজাদপুরে জমা বৃদ্ধির আত্যন্তিক চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রজারা তাহার প্রতি নানাকারণে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, যদি এ নায়েবকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা হয়, তবে আমরা কতক পরিমাণে জমাবৃদ্ধিও দিতে স্বীকৃত আছি। সেই সূত্রে তাহাকে কালীগ্রামে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই নায়েব পরিবর্তনের পর ১২৭৯ সালে প্রজাদের প্রতি টাকায় এগার আনা হিসাবে খাজানা বৃদ্ধি হয়। এখন ঠাকুরবাবুরা ঐ বর্ধিত জমার পাঁচ আনা রেহাই দিতে চাহিতেছেন। ইহাতে তাহাদের পর্বজমার কোনই ক্ষতি হইতেছে না, বরং ভালই থাকিতেছে। কিন্তু প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র জমিদারদের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। কারণ তাহাদের মধ্যে অনেকের এরূপ অবস্থা যে, তাহাদের ২/৩ পুরুষের মধ্যে প্রজাদের জমা বৃদ্ধি হয় নাই, এবং নিরিখও অল্প। অথচ ঐ রূপে যদি রেহাই দিতে হয়, তবে তাহাদের থাকে কি? সুতরাং তখন বলিতে হইতেছে, তাহাদের 'উভয় সঙ্কট'।

—পাবনা। শ্রীঃ—

- *এডুকেশন গেজেট, ৬ ৩ ১৮৭৪*

"In 1872-73 agrarian trouble broke out in the district, originating in the Yusufshai *pargana* of the Sirajgant sub-division The actual rental of the estates in the disturbed *pargana* had not been raised for some years, but the zamindars were in the habit of realizing heavy cesses of various sorts, which had gone on for so long that it was scarecely clear what portion of their collections was rent and what illegal cesses. Whereas under the law rents could only be enhanced by a regular process after notice duly given in the previous year, no such notices had been served, but the zamindars, or many of them, attempted irregularly to effect a large enhancement both by direct increase of rent and by the consolidation of rent any cesses. Besides this enhancement they stipulated that the ryots were to pay all cesses that might be imposed by Governemnt, and that occupancy ryots should be made liable to ejectment if they quarrelled with their Zamindar, Enquiries with respect to illegal exactions by Zamindars, and the apprehended extension to the district of the Road Cess Act, under which the rental was registered, induced the zamindars to try to persuade their tenants to give them written engagements. Some zamindars in 1872 actually succeeded in this, and the terms of the engagements granted were very unfair to the ryots. These were partially registered, but before the process was complete they repudiated the authority of the registering agent

"The difficulties were enhanced by disputes as to measurenemt, which all

over Bengal had always afforded a fertile source of quarrel between landlord and tenant, there being no uniform standard and the local measuring rod varying from *pargana* to *pargana* and almost from village to village. In Pubna especially there is extreme diversity of measuring standards. All the Zamindars were not equally bad, but there were undoubtly some among them who resorted to illegal pressure resulting in illegal enhancement ; in cases where the shares were much subdivided special oppression was practised, and the quarrels among the sharers themselves had not a little to do with the outbreaks.

"At first, the ryots gave way for the most part, but later one or two villages, which had not been so submissive, gained success in the courts. One village stood out from the first, certain suits for enhanced rents were rejected on appeal after having been won in the Munsif's Court ; a kidnapped ryot had been liberated and the zamindar punished. These and other successes gradually turned the scale, and there was a reaction against exorbitant demands. In the spring the ryots commenced to organize themselves for systematic resistance. By the month of June the movement had spread over the whole of the Yusufshahi *pargana*. The ryots calmly organized themselves into a league, and assumed the designation of *bidrohi* (rebels) under the influence of an intelligent leader and petty landholder, and peaceably informed the Magistrates that they had united. One Ishan Ray was known as Bidrohir Raja, the rebel cheif. The terms held out by the league were tempting, viz, the use of a very large *bigha* of measurement and very low rent, and it was not therefore necessary to resort to much intimidation to induce fresh villages to join. In some instancs intimidation to induce fresh villages to join In some instances intimidation was resorted to with this object, but it was of a mild form.

"Toward the latter end of June 1872 emissaries were sent in all directions to extend the league and large bands of villagers were formed. Persons who owened private grudges, and bad characters inspired by the hope of plunder, took advantage of these gatherings to turn them to their own ends and to commit excess ; but serious outrages by *bona-fide* tenants were not very numerous, and few houses were actually burnt and plundered. Stories of murders and of other outrages were current, but were without foudnation. No one in the subdivision of Sirajganj was seriously hurt during the disturbances : no zamindar's house was attacked and nothing of considerbie value was stolen. Such cases of violent crime as did occour were due to the criminal classes, who took advantage of the excitement, and the actual riots only lasted only from the middle of June to the 3rd July 1873. Up to the 1st July 69 villages has signified by petition that they had joined the union · after that ten or twelve more a day gave in their adherence.

"On the 4th July the Governement of Bengal issued the following proclamation :

"Whereas in the district of Pabna, owing to attempts of zamindars to enhance re: is and combinations of ryots to resist the same, large bodies of men have assemled at several places in a riotous and tumultous manner, and serious breaches of peace have occoured. This is very gravely to warn all concerned that, while on the one hand the Government will protect the people from all force and extortion, and the zamindars must assert any claims they may have by legal means only, on the other hand the Government will firmly repress all violent and illegal action on the part of the ryots and will strictly bring to justice all who offened against the law, to whatever class they belong.

"The ryots and others who have assemled are hereby required to disperse and to prefer peaceable any quitely any grivances they may have. If they so come forword, they will be patiently listened to : but the officers of Government cannot listen to rioters ; on the contrary they will take severe measures against them. It is asserted by the people who have combined to resist the demands of the zamindars, that they are to be the ryots of Her Majesty the Queen, and of Her only. These people, and all who listen to them, are warned that the Goverment cannot and will not interfere with the rights of property as secured by law : that they must pay what is legally due from them to those to whom it is legally due. It is perfectly lawful to unite in a peaceable manner to resist any excessive demands of the zamindars, but it is not lawful to unite to use violence and intimidation."

"While the attitude of Government was thus made clear, measures were taken for the restoration of peace and order. Extra police were despatched to the district, where upon rioting ceased almost immediately, after many arrests had been made, principally for rioting and illegal assembly and 147 persons convicted. But there was no abatement of the combinations of the ryots and the movement spread through most of the Pubna district and into Bogra : the ryots met the demand of the zamindars for too much by offering too little. The Lieutenant-Governor (Sir G. Campbell) did not see his way to interfere by legislation without raising large questions which could not be settled without long and diffucult discussions. His course was to attempt to promote compromise by influence and advice The zamindars were urged to offer reasonable terms of present settlement and future security to the ryots and the latter were strongly advised and urged to accept such terms as the Govement officers thought reasonable. Considerable success attended these efforts.

"Meanwhile there was a remarkble subsidence of unhealthy excitement. The organs of the zaindars urged direct Government interference by means

of a Commission empowered to settle defferences. The Government of India also suggested this solution. Sir George Campbell had been reluctant to appoint extra Munsifs to try the rent cases, as he found that things settled themselves much more fairly by compromise. He saw that the wole question of the relations of landlords and tenants was being raised and doubted whether it would be possible to avoid some further revision of the tent law, as there was great difficulty in determining what rents were really payable. As to the appointment of a special Commission, he objected to one that would merely deal summarily with the differences between landlord and temant, but expressed his acceptance of one that would deal thoroughly with the points at issue and settle them for a long time. In the end no special Commission was appointed ; partly by compromise, partly by the natural movement of events, partly by the shadow of the impending famine of 1873-74, the Pubna difficulties to a very great extent themselves for the time. The dispute between landlords and tenants, in fact remained to abeyance during the famine which postponed the adjustment of the rent question.

"These rent disturbances of 1873 were however really the origin of the discussion and action which eventually led to the enactment of the Bengal Tenancy Act I of 1885."

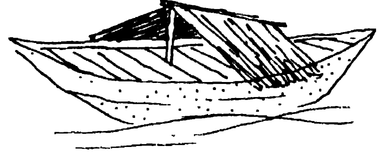
তথ্যসূত্র

Bengal District Gazetteers : Pabna : L S S O'Maley, 1923 : Pp 25-28.

C E. Buckland . *Bengal under the Lieutenant Governors* (Calcutta 1901) Vol. 1, Pp 544-8 ; W W. Hunter *Statistical Account of Bengal* (1876)- -Vol IX, p 319-25,

পাবনার বিবরণ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত



গত ২৯ অগ্রহায়ণ বুধবার বেলা একাদশ ঘটিকার সময় আমরা রাজশাহীর বড়কুটির ঘাট হইতে নৌকা ছাড়িয়া পাবনাভিমুখে যাত্রা করত পর দিবস সন্ধ্যার সময়ে পদ্মানদী পরিত্যাগপূর্বক ইছামতীর ভিতর প্রবেশ করিলাম, এই ইছামতীর মুখ হইতে পাবনার বাজার ও কাছারি বাটি স্থলে এক ক্রোশ পথ, জলে বরং দুই ক্রোশের অধিক হইবেক। প্রাচীন কথা আছে "মরা গাং কুমীরে ভরা" এ নদী যথার্থ তাহাই, অর্থাৎ জীবন বিরহে ইহার জীবন অবসান হইতেছে, কিন্তু তাহারি মধ্যে যথাযথা জল কিঞ্চিৎ গম্ভীর কুম্ভীর তথা তথা বাস করত মৎস্য গ্রাস ও মনুষ্য পশু নাশ করণের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে। বর্ষা সময়ে ইহারদিগের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, কিন্তু এই শীতকালে আহারাভাবে দুর্দশার শেষ হইয়াছে। এ বৎসর এই ইছামতীতে জলের স্বল্পতা হওয়াতে বাণিজ্য কার্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে অর্ধ হস্তের অধিক জল নাই। ইহাতে কি প্রকারে বড় বড় নৌকার গমনাগমন হইতে পারে। বিস্তর মহাজনি নৌকা আটক হইয়া রহিয়াছে, এবং যাঁহারা কোন বিষয় কর্ম উপলক্ষে এ পথ দিয়া যাতায়াত করিতেন তাহারদিগের পক্ষেও বিষমতর ব্যাঘাত হইয়াছে, কারণ এই নদী বহতা থাকিলে ঢাকা, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, জাফরগঞ্জ, মৈমনসিংহ, ভুলুয়া প্রভৃতি অঞ্চল যাইতে এবং তত্তৎ স্থান হইতে আসিতে অত্যন্ত সুযোগ হয়, বিশেষত রংপুর, দিনাজপুর, শেরপুর, বগুড়া, কোচবিহার ও আসাম এবং গোয়ালপাড়া প্রদেশে যাতায়াত পক্ষে এই সময়ে এ পথের অপেক্ষা সুযোগের পর আর নাই।

সংপ্রতি ভ্রমন করিতে করিতে নদনদী সকলের যে প্রকার অবস্থা দেখিলাম তাহাতে অতিশয় ভীত হইয়াছি, কারণ চর রচিত হইয়া প্রায় সর্বত্রই শুষ্ক হইতেছে, পাবনার খালের মোহনা হইতে বাইশ কোদালের মোহনা পর্যন্ত পদ্মার গর্ভে জলের বলের হ্রাসতা হইয়া প্রায় স্থলের সঞ্চার হইয়া উঠিল, যেখানে এপার ওপার দুই ক্রোশের ন্যূন নহে, সেখানে অর্ধপোয়ার মধ্যে গভীর জল দেখিতে পাইলাম না, প্রায় সমস্ত নদী ব্যাপিয়া ভয়ঙ্কর "মসিনা" পড়িয়াছে, তাহার উপর নৌকা পড়িলে আর রক্ষা থাকে না, দৈবাৎ দুই একখানা বাঁচিয়া যায়, নচেৎ প্রায় সমুদয় মারা পড়ে, এই মসিনার নাম চর ; ইহার উপর স্থলচরের পদার্পণ দূরে থাকুক, জলচর মাত্রেই বাস করিতে পারে না। এই মসিনা দুই প্রকার, সচল ও অচল, যাহারা অচল, তাহারা তাদৃশ ভয়ঙ্কর নহে, যাহারা সচল, তাহারা নিমিষের মধ্যে অচল পর্যন্ত রসাতলে দিতে পারে, অধুনা যাহারা এই পথে জলযান লইয়া উজান যান, তাহারদিগের যান রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। যদিও ভাটি পথে বিপদের ঘাটি নাই, তথাচ যৎকিঞ্চিৎ সুসার বটে, যাহারা উজানে পাবনা যাত্রা করিতেছে, নদীর ভীষণ ভঙ্গি দৃষ্টে তাহাদের মনে যাব না যাব না 'পাবনা' পাব না এই ভাবনাই হইতেছে। আমরা 'পাবনা' পাব না ভাবনা করিয়াছিলাম, কিন্তু পরমেশ্বর অনুকূল হইয়া অভিলাষ পরিপূর্ণ করিলেন, গত শুক্রবার বৈকালে পাবনার একটিং সদর আমিন সুবিজ্ঞোত্তম বাবু মাধবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পাল্কি পাঠাইয়া দিলেন। পরে ক্ষুদ্র একখানা ডিঙ্গি করিয়া বহুকষ্টে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে বাজারের ঘাটে উপস্থিত হইলাম, এখানকার বাজার অতি সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ, সমুদয় ইষ্টক নির্মিত দোহারা চকবন্দি ঘর। অনেক প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং পট্টবস্ত্র ও সুতার বস্ত্র যথেষ্ট, মৎস্য, তরকারি, ঘৃত,

দুগ্ধ ও দধি সুলভ বটে, কিন্তু পূর্বাপেক্ষা এ বৎসর দধি দুগ্ধ ও ঘৃত কিঞ্চিৎ দুর্মূল্য হইয়াছে, ইহার কারণ মহামারী জন্য অনেক গোবৎস মারা পড়িয়াছে। *--সংবাদ প্রভাকর, ২১ পৌষ ১২৬১*

এই পাবনা বাণিজ্য কার্যের পক্ষে একটা প্রধান স্থান। এখান বিস্তর ধনী মহাজন আছেন ; চতুর্দিকের নানাস্থানে তাহারদিগের আড়ৎ ও দোকান আছে, যেখানে পাবনার মহাজনের ব্যবসায় নাই, এমত গোলাগঞ্জ প্রায় নাই, ঐ সমস্ত মহাজনের মধ্যে অধিকাংশ শুঁড়ি, এদেশে শুঁড়ি জাতিরাই মান্য ও ধনাঢ্য। সামান্য লোকেরা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগ্যে "সা, জী" শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকে। যথা—'মুখুর্য্যে শা, জী মুশয়, গুপ্ত সা, জী মুশয়, ঘোষ সা, জী মুশয়' যেহেতু তাহাদিগের এমত বোধ আছে যে সা, জীরা অর্থাৎ শুঁড়িরাই সর্বাপেক্ষা বড়লোক।

এ জেলায় নানা প্রকার শস্য জন্মে ও নীলের কুটি অনেক। এবং অধিকাংশ নীলকরেরাই অত্যন্ত অত্যাচারি, ইহার বিশেষ হেতু অবগত হইলাম, যিনি শুভ্রকান্তি শান্তিরক্ষক খোদাবন্দ, তিনি কুটিয়ালগণের পক্ষে বিশেষ আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, প্রধানের সহিত সদ্ভাব থাকাতে তাহারা নির্ভয়ে পীড়নের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

নিজ পাবনায় ভদ্রলোক অতি অল্প, শুঁড়ি ও মুসলমানের অংশই অধিক, কিন্তু জেলার মধ্যে অনেক গ্রামে অনেক ভদ্রলোক আছেন।

পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট মেং বফোর্ড সাহব বাবু রামরত্ন রায় মহাশয়ের বিষয় ঘটিত কোন এক মোকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রদানার্থ যশোহরে গমন করিয়াছেন, শীঘ্রই আসিবেন। ডেপুটি কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ সরকার এবং সদর আমিনবাবু অদ্যাপি বাটি হইতে প্রত্যাগত হয়েন নাই, অবিলম্বেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন। এমন সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম, এস্থলেই ইহাদিগের উভয়েরই বিলক্ষণ সুখ্যাতি আছে, কালোর আলো অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে। রাঙ্গার পশার কিঞ্চিৎ ভাঙা ভাঙা দেখিলাম, ইহাতে হাকিমের দোষ, কি সাকিমেরই দোষ, বড় বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু বিবেচনায় 'হয়ের' দোষি 'সয়ের' অপেক্ষা প্রবল বোধ হয়।

বাবু মাধবচন্দ্র চৌধুরী কয়েক দিবসের নিমিত্ত প্রতিনিধিস্বরূপ সদর আমিনের কর্ম নির্বাহ করিতেছেন, এই সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে তিনি সুবিচার ও সদ্ব্যবহার দ্বারা সর্বপ্রিয় হইয়া সমূহ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সকলেই তাহার অনুরাগ করিতেছেন, আমরা ইহার সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত সুখি হইলাম। যেহেতু ইনি অতি মহৎ ও সুপণ্ডিত, চৌধুরীবাবুর বাসায় বসিয়া স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, পাঠশালার পণ্ডিত ও খাজাঞ্চিবাবু প্রভৃতি কতিপয় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে কথোপকথনের ও সদালাপে অশেযানন্দ লাভ করিলাম, ইহারা অতি সজ্জন।

--সংবাদ প্রভাকর, ২২ পৌষ ১২৬১

ইংরাজি ১৮২৮ সালে পাবনা জেলা স্থাপিত হয়, মেং এ. জে. এস মিলন সাহেব সর্বাগ্রেই ইহার ম্যাজিস্ট্রেট পদে অভিষিক্ত হয়েন। ইনিই আসিয়া জিলা স্থাপন করেন। তৎকালে কেবল জাইন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের 'মহকুমা' মাত্র ছিল, ফৌজদারি ভিন্ন অন্য বিষয়ের সম্বন্ধ গন্ধ ছিল না। পরে ১৮৩৩ সালে তাহার সহিত কালেক্টরি সংযুক্ত হইয়া জাইন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এ পর্যন্ত এক প্রণালী ক্রমে চলিতেছে।

জেলা রাজশাহী ও জেলা যশোহরের কয়েকটি থানা লইয়া পাবনা জেলার জন্ম হয়। এতদ্দ্বারা বিস্তর উপকার দর্শিয়াছে, প্রজাপুঞ্জের অশেষ ক্লেশ নিবারণ হইয়াছে; জলে স্থলে চুরি, ডাকাইতি ও রাহাজানি প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ইতর কার্য রহিত হইয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে যথেষ্ট মঙ্গল হইয়াছে।

সংপ্রতি এই জেলায় কালেক্টরি রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ে অন্যূন ৬,০০,০০০ ছয় লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে ভূমির রাজস্ব ৪,০০,০০০ টাকা।

স্ট্যাম্প, আফকারি, ডাক, গুদারা ও জেলখানার উৎপন্ন ২,০০,০০০ টাকা সর্বশুদ্ধ ৬,০০,০০০ টাকা। বরং ইহার অধিক হইবে, তথাচ অল্প নহে।

অধুনা এই জেলার অধীনে ৮টি থানা ও ২টি ফাঁড়ি আছে। যথা—

থানা	**ফাঁড়ি**
নিজ পাবনা সদর থানা অথবা	
১) কোতয়ালী	১) অরণকোলা
২) হাতিয়াল	২) নওপাড়া
৩) মথুরা	
৪) নাজিরগঞ্জ	
৫) পাঙসা	
৬) ধর্ম্মপুর	
৭) কুষ্টিয়া	
৮) খোক্‌সা	

এই কয়েকটি থানার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর দারোগা একজন মাত্র। তৃতীয় শ্রেণীর দারোগা প্রায় সকলেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর দারোগা দুই একজন আছেন কিনা সন্দেহ।

জেলা সীমা

দক্ষিণ সীমা। কোঁড়পদী, চন্দনা ও কামারখালি নদীর তীর পর্যন্ত ১৮ ক্রোশ পথ হইবে। উত্তর সীমা। বরাল নদ। ১৪ ক্রোশ পথ।

পূর্ব সীমা। যমুনা নদী ও হুড়াসাগরের মোহনা। ১২ ক্রোশ পথ।

পশ্চিম সীমা। পার সিৎলির কুটি পর্যন্ত। ১৮ ক্রোশ পথ।

জেলার শ্বেতবর্ণের কর্মকর্তা মেং বফোর্ড সাহেব। ইনি জাইন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর, ইহার অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্থাৎ সহকারি কেহই নাই।

অচিহ্নিত ডেপুটি কালেক্টর একজন মাত্র।

সদর আমিন ও সদর মুন্সেফ একজন মাত্র।

সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন একজন মাত্র।

বাবু শ্যামচাঁদ সরকার এখানকার বর্তমান ডেপুটি কালেক্টর, ইনি অতি যোগ্য ও কার্য নিপুণ।

সদর আমিন ও সদর মুন্সেফ বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত। এখানে তাবতেই ইহার অনুরাগ করিয়া থাকে।

ডাক্তারটি বাঙালি নহেন, সাহেব, কিন্তু বিলিতি নহেন, দিশি। ইহারই হস্তে ডাকেব ও রেজেস্টরি কর্মের ভারার্পিত আছে।

এতদ্ভিন্ন এই জেলার অধীনে খেতুপাড়া ও সাজাৎপুর এই দুই স্থানে দুইজন মুন্সেফ আছেন।

পাবনার সেশন সম্পর্কীয় কার্য রাজশাহীর সেশন জজের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়।

দেওয়ানির অধিকাংশই যশোহর জিলা ভুক্ত। কিয়ংদশ রাজশাহীর সহিত সম্পর্ক রাখে, অর্থাৎ পদ্মার উত্তর পার রাজশাহী, দক্ষিণ পার যশোহর।

এই জিলার বিশেষ বিশেষ কয়েকটা পরগণা ও তাহার বর্তমান জমিদারদিগের নাম বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম। যথা—

পরগণা	**জমিদার**
বিরাহিমপুর	বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি
বেগ্‌সাবাদ	ব্রজসুন্দরী ও প্যারীসুন্দরী দাসী
ইসলামপুর	ব্রজসুন্দরী ও প্যারীসুন্দরী দাসী
গঙ্গাপথ	ব্রজসুন্দরী ও প্যারীসুন্দরী দাসী

পরগণা	জমিদার
বাজুচম্প	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি
ডিহি শাহজাদপুর	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি
ডিহি কাশীপুর	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ডিহি সড়াতুল	মনোমোহন সান্যাল
নাজির ইনাইৎপুর	আজিম চৌধুরী
পরগণে নাজির	অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়
ফড় ফতেজঙ্গপুর	ভৈরবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মামুদশাহি কিয়দংশ	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী
ইসপ্‌সাহী	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি
তপা	অন্নদাগোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি
সীদুঁরী	হরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতি
মহিমসাহী কিয়দংশ	জার্ডিন স্কিনর এন্ড কোং
নসরৎসাহী	রাজা ইন্দুভূষণ
তরপ হাবাসপুর	রাণী স্বর্ণময়ী
বিরাহিমপুর	আজিম চৌধুরী প্রভৃতি
সোনাবাজু	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি
হলসী	ডবলিউ উড়িন্ সাহেব প্রভৃতি
ডিহি ভদ্রঘাট	ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী
রোকনপুর কিয়দংশ	রাও রামশঙ্কর
জীয়ারথি	শ্রীকান্ত রায় প্রভৃতি

এতদ্ভিন্ন দুই একটা ক্ষুদ্র পরগণা ও ডিহি থাকিলে থাকিতে পারে।

এই জিলায় নীলকুঠি সংক্রান্ত যে কয়েকটি কান্সরণ আছে তদ্বিশেষ নিম্নভাবে প্রকাশ করিলাম। যথা—

কান্সরণ	মাজিপাড়া	কান্সরণ	ধুলাউড়ি
”	সিলিইদহ	”	ধোকড়া কোল
”	হিজলা বট	”	সালঘর মধুয়া
”	দামুদিয়া	”	ভেলনাবাড়িয়া
”	মোহনগঞ্জ	”	ঘোড়াদহ
”	কুমিদপুর	”	জামির্তে
”	বেলেকাঁদি	”	মীরপুর
”	পারসিংলি	”	বামুনদে

এই কয়েকটা প্রধান কান্সরণ, ইহাব এক এক কান্সরণের অধীনে দশ, বারো, পনেরো, ষোল করিয়া কুঠি আছে। কোন কান্সরণেই পাঁচ, সাতটার ন্যূন নাই।

এই সমস্ত কুঠির অধ্যক্ষেরা সকলেই ইংরাজ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ইংরাজ ও জমিদারদিগের অনেক কুঠি আছে।

কান্সরণওয়ালা কুঠিয়ালদিগের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত অত্যাচারী, তাহারদিগের দৌরাত্ম্যে প্রজারা সর্বদাই পীড়িত। তাহারা রাজার আনুকূল্য ও সুবিচার না পাইয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতেছে। নীল রেশমের কুটির অত্যাচারে ভদ্রাভদ্র কোন প্রজাই সুখী নহে। আমি ভ্রমন করিতে করিতে যেখানে সেখানে, যে সে ব্যক্তির মুখে এতদ্রূপ দুঃখজনক ভীষণ সংবাদ শ্রবণ করিলাম। *—সংবাদ প্রভাকর, ২২ পৌষ ১২৬১*

এই জিলা বাণিজ্যের পক্ষে প্রধান স্থান, কুটিয়াল ও ধনি মহাজনদিগের সংখ্যা অধিক।
নীল এবং রেশম প্রচুর ও উত্তম জন্মে।
চাউল বড় অধিক জন্মে না।
রেশমের বস্ত্র অধিক প্রস্তুত হয়।
কলাই, মুগ, খেঁশারি, মুসুরি, মটর ও ছোলা অধিক উৎপন্ন হয়।
গম, যব, তিল, তিসি, সর্ষা ও পাট অধিক জন্মে না।
খেজুরে গুড় ও খেজুরে চিনি, ইক্ষু ও ইক্ষুর গুড় ও চিনি অধিক জন্মে না।

বিবি সাহেবেরা যে পালকের পোশাক পরেন, যে পক্ষির পক্ষ মস্তকে ধরেন, সেই পক্ষির পক্ষের ব্যবসায় এখানে বিস্তর হয়।

পাবনা জেলার মধ্যে ভদ্রলোকের অংশই অধিক। এবং হিন্দুই অনেক, মুসলমান অল্প। এক একটা গ্রাম কেবল বিশিষ্ট লোকেই পরিপূর্ণ। এখানকার মধ্যে শুঁড়ি, তিলি ও গোয়ালা জাতিতেই অধিক ধনি। ঐ সমস্ত জাতির মধ্যে বিদ্যার চালনা প্রায় নাই বলিলেই হয়, ভদ্র জাতির মধ্যে বিদ্যার আলোচনা নিতান্তই নাই এমত নহে। ফলে এ পক্ষে যতদূর করা কর্তব্য তাহা করেন না।

রাজশাহীর দয়াশীল জজ মেং চিপ সাহেব বিশেষ যত্নপূর্বক আপনার মাসিক দানে ও কয়েকজন সাহেব ও জমিদারের সাহায্যে পাবনায় এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহাতে কয়েকজন ইংরাজি শিক্ষক ও একজন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। সেই পাঠশালায় অনেকগুলি বালক কয়েক বৎসর উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিল। পরে এক বৎসর গত হইল, গবর্নমেন্ট সেই স্কুলের সমুদায় ভার গ্রহণ করত 'এডুকেশন কৌন্সেলের' অধীন করাতে তাহার অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক উত্তম হইয়াছে। শিক্ষা ভাল হইতেছে, এবং ১৫০ দেড়শত বালকের অধিক হইয়াছে।

এইক্ষণে চারি জন ইংরাজি শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। প্রধান শিক্ষক গৌরানারায়ণ রায়, ইনি ঢাকা কলেজের ছাত্র, ১৫০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হয়েন। বিদ্বান বটেন, কিন্তু সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই, এ বিষয়ের কারণ কি, তাহা আমি জ্ঞাত নহি।

দ্বিতীয় রামচন্দ্র নন্দী, ইনি হুগলি কলেজের ছাত্র, অতি সুপাত্র, এখানে সকলে সকল বিষয়েই ইহার সুখ্যাতি করেন। ৫০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হয়েন।

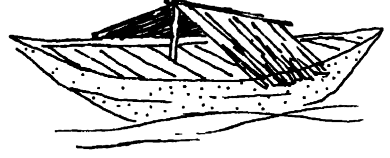
তৃতীয় শিক্ষক কৃষ্ণধন মজুমদার, ইনি ঢাকা কলেজের ছাত্র, ২০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন, সুজন বটেন।

চতুর্থ শিক্ষক উমেশচন্দ্র সরকার, উনি পাবনার পুরাতন স্কুলের ছাত্র, ২০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন, সুজন বটেন।

গবর্নমেন্ট পণ্ডিতের পদ রহিত করাতে মেং চিপ সাহেব ঐ পণ্ডিতকে প্রতিপালন এবং বঙ্গ ভাষার অনুশীলন জন্য এখানে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। এজন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহাকে কত ধন্যবাদ প্রদান করিব তাহা মুখে ব্যক্ত করিতে পারি না।

—সংবাদ প্রভাকর, ২৮ পৌষ ১২৬১

বিশিষ্ট স্থান



পাবনা ঃ

এক সময়ে পাবনা শহর ছিল পদ্মার তীরে। চরা পড়ায় পদ্মা সরে গেছে। কিন্তু ইছামতী নদী পাবনা শহরের মাঝ বরাবর প্রবাহিত। পাবনা শহরের সঙ্গে ঈশ্বরদি রেল জংশনে সংযোগ গড়ে উঠেছে পাকা সড়কের মাধ্যমে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন শহরটি ক্রমশ আয়তনে বাড়ছে। পাবনা পুরসভা যথেষ্ট সক্রিয় এবং শহরটির ওপর দায়িত্ব পালন করে নিষ্ঠার সঙ্গে। পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে। স্টেডিয়াম, গ্রন্থাগার (আনন্দগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি), একটি বড় হাসপাতাল, যক্ষ্মা হাসপাতাল, পুলিশ হাসপাতাল ও জেল হাসপাতাল, সার্কিট হাউস, রেস্ট হাউস এবং একটি ডাকবাঙলো আছে। জেলার প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবনা জেলা স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৩ সালে পাবনা শহরে। জেলার প্রথম কলেজ পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ১৮৯৮ সালে স্থাপিত। প্রথমে ছিল ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, পরে ডিগ্রি কলেজ, এখন অনার্স এবং এম. এ. পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। পাবনা শহরে বেশ কিছু উচ্চ বালক ও বালিকা বিদ্যালয় আছে। বহু সরকারি দপ্তর, ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র, কলকারখানা আছে শহরটিতে।

পাবনা শহরের দোচালা বিশিষ্ট জোড়বাংলা মন্দিরটি অন্যতম প্রত্ননিদর্শন।

"স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে পাবনা শহরের সবচাইতে চিত্তাকর্ষক অট্টালিকা হচ্ছে একটি হিন্দু মন্দির। শহরের উত্তর-পূর্ব সীমায় অবস্থিত মন্দিরটি জোড়বাংলা মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরটির বেদির আকার থেকেই এ নামের উৎপত্তি। বেদিটির আকার দুটি যুক্তাক্ষরের মতো। এটি ইটের তৈরি এবং এর সামনের দিকে সুন্দর সুন্দর ইটে রামায়ণের দৃশ্যাবলী খোদাই করা আছে। এ ধরনের মন্দির বাংলাদেশে অসাধারণ এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে বিষ্ণুপুরের রাজাদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। কথিত আছে, জনৈক ব্রজমোহন ক্রোড়ি মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। অষ্টদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বাংলার নওয়াবের অধীনে একজন তহশীলদার ছিলেন। বর্তমানে মন্দিরটি ১৯০৪ সালের প্রাচীনকীর্তি সংরক্ষণ আইনের অধীনে সংরক্ষিত আছে।" *—পাবনা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯০ পৃঃ ৭৭-৭৮*

পশ্চিমমুখী মন্দিরটির পশ্চিম দিকে একটি বারান্দা আছে। দুটি স্তম্ভের সাহায্যে তিনটি প্রবেশপথ তৈরি হয়েছে। মন্দিরে কোন শিলালিপি নেই। পোড়ামাটির অংলকরণ সমৃদ্ধ মন্দিরটি ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্প্রতি মেরামত করা হয়েছে।

পোতাজিয়া ঃ

শাহজাদপুরের কয়েকমাইল দক্ষিণ পশ্চিমে পোতাজিয়া গ্রামে একটি নবরত্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ৯ চূড়া বিশিষ্ট ভগ্ন মন্দিরটি জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। অনেকের অনুমান, স্থানীয় জমিদার পরিবার সম্ভবত সতের শতকে এই মন্দির তৈরি করেছিলেন। ১৭০০ সালে মন্দিরটি সংস্কার করেন গোবিন্দরাম রায়।

হান্ডিয়াল ঃ

বর্তমানে চাটমোহর উপজেলার একটি গ্রাম হান্ডিয়াল। একসময় হান্ডিয়াল ছিল প্রথম

শ্রেণীর বাণিজ্য কেন্দ্র। রেশম ও সুতিবস্ত্র কেনাকাটা হত। রেশম ও রেশমজাত কাঁচামাল উৎপন্ন হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফ্যাক্টরি ছিল এখানে। হান্ডিয়ালে থানা সদর ছিল ১৮৪৫ খ্রিঃ পর্যন্ত। নদী রেখা পরিবর্তনের ফলে হান্ডিয়ালের খ্যাতিও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে।

হান্ডিয়ালে দুটি মন্দিরের একটি জগন্নাথদেবের। অপরটি জোড়বাংলা মন্দির। দুইটি এখন সংরক্ষিত। এসব ছাড়াও ঘোষপাড়ার গোপীনাথের মন্দির, সাহাপাড়ার দোলমঞ্চ, পোদ্দারপাড়ার গোপীনাথ বিগ্রহমন্দির, পাইকপাড়ার মসজিদ ও বুড়াপীরের দরগা ছিল একসময় বিখ্যাত। এখন মাত্র জগন্নাথ মন্দির ও পাইকপাড়ার মসজিদই টিকে আছে।

"চাটমোহর থানার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত হান্ডিয়ালের গ্রামের হিন্দু মন্দিরটি মধ্যযুগীয় স্থাপত্য শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এতে বক্ররেখা বেষ্টিত এলিভেশন রয়েছে, যা বাংলাদেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রতীক এবং স্পষ্টত বাংলার গ্রামাঞ্চলের চিরাচরিত কুঁড়ে ঘর বা কাঠের ঘরের প্রতিকৃতি থেকে উদ্ভাবিত। এসব মন্দিরের কার্নিশগুলো ধনুকের মত সমান্তরাল বক্ররেখায় সম্মুখভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। বক্ররেখার এ ধরনের প্রয়োগ ছাদ ও কোণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বৃষ্টির পানি নিক্ষেপের জন্য যেমনভাবে বাঁশের কাঠামো তৈরি করা হয় এটাও ঠিক তেমনভাবে নির্মিত এবং নির্মাণের কৌশল ও স্পষ্টত সেখান থেকে নেওয়া।"

—পাবনা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯০ পৃঃ ৭৮

জগন্নাথ মন্দির কবেকার তৈরি সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরটি ৩৭ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। ১৫৯০ সালে মন্দিরটি সংস্কার করেছিলেন ভবানীপ্রসাদ নামক জনৈক ব্যক্তি। সম্ভবত তার অনেক আগেই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। পরে আবার ১৮৬০ সালে মন্দিরটির সংস্কার হয়।

হান্ডিয়াল বাজারের পশ্চিমদিকে পাইকপাড়ার এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি প্রায় ভেঙে পড়েছিল। সম্প্রতি মসজিদটি নতুনভাবে তৈরি হয়েছে। মসজিদের আরবি শিলালিপিটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

হাটি কামরুল ঃ

উল্লাপাড়া উপজেলার একটি সমৃদ্ধ গ্রাম হাটি কুমরুল। নগরবাড়ি-বগুড়া মহাসড়কের আধমাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত গ্রামে বেশ কয়েকটি মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কে বা কারা এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। কারণ কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। জনশ্রুতি, স্থানীয় জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি এইসব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

দিনাজপুরের কান্তনগরের মন্দিরের মত একটি দোলমঞ্চ, মন্দিরের চারদিকে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা। অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকে অলংকৃত। গোটা মন্দিরটি ধ্বংসোন্মুখ।

এই নবরত্ন মন্দিরের ২০০ গজ দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ছোট শিব মন্দির আছে। মন্দিরের একটি মাত্র চূড়া এবং পূব দিকে একটি পুকুর আছে। পোড়ামাটির সুদৃশ্য ফলক আছে।

দোলমঞ্চ মন্দিরের ৫০ গজ উত্তর-পূর্বে এক চূড়া বিশিষ্ট একটি ছোট শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরটিও পোড়ামাটির ফলকে অলংকৃত।

ছোট শিবমন্দিরের ৭৫ গজ উত্তর-পশ্চিমের দোচালা মন্দিরটি অক্ষত অবস্থায় আছে।

নিমগাছি ঃ

রায়গঞ্জ থানার অধীনে নিমগাছিকে একসময় বলা হত বিরাট শহর। শাহজাদপুর-রঙপুর সড়কের পশ্চিমে নিমগাছি গ্রামটি প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। "প্রাচীন করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে (বর্তমানে নদীর একটি পরিত্যক্ত খাত এখনও দেখা যায়) অবস্থিত প্রায় ৮ বর্গমাইল আয়তনের একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজও চোখে পড়ে। প্রাচীন

অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বহনকারী প্রায় ৫০টি উঁচ ঢিবি আজও এখানে দেখা যায়। এগুলি ভিতরে আছে প্রচুর পাথর আর প্রাচীনকালের ইট। পোড়া মাটির ফলক চিত্রের যে সব নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় যে এই ইমারতগুলি অধিকাংশ পরবর্তী যুগে নির্মিত হয়েছিল। এখানে অসংখ্য প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণী আছে। এগুলির আয়তনও বিরাট। জয়সাগর এগুলির মধ্যে একটি। এর জলভাগের আয়তন প্রায় ৮০ একর। পাড়গুলি পাহাড়ের মত উঁচু। এরকম আরও অনেক প্রাচীন জলাশয় এখানে আছে।

—পাবনা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯০ পৃঃ ৪১৬

শাহজাদপুর ঃ

হুরাসাগর তীরে শাহজাদপুর একটি পুরনো শহর। বড় ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি ছিল। এখনও অন্যতম ব্যবসাস্থল। "এখানে মক্‌দুম্ শাহ-দৌলা নামক মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। মক্‌দুম্ শাহ আরবদেশের যমনের রাজপুত্র। কথিত আছে, তিনি পিতার অনুমতি লইয়া ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পূর্বাভিমুখে যাত্রা করেন। পাবনা জেলার শাহজাদপুরের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পোতাজিয়ায় পৌঁছিলে তাহার জাহাজ ডাঙায় লাগিয়া যায়। মক্‌দুম্ শাহ-দৌলা একটি ঘরে আবাস স্থাপন করেন। মক্‌দুম্ শাহ্-দৌলার সহিত তাহার ভগিনী, তিনজন ভাগিনেয়, দ্বাদশ জন 'দরবেশ' এবং সাঙ্গোপাঙ্গো আসিয়াছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে আগন্তুকদিগের সহিত তৎকালের হিন্দুরাজার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ক্রমে যুদ্ধ বাধে। প্রথম দুটি যুদ্ধে মক্‌দুম্ শাহের দল জয়ী হন, তৃতীয় যুদ্ধে তাহারা হারিয়া যান এবং শাহজাদা নিহত হন। তাহার ভগিনী অপমানের ভয়ে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এখনও লোক 'সতীবিবির খাল' দেখাইয়া সেই ঘটনা স্মরণ করে। এখানে মক্‌দুম্ শাহ তাহার ভাগিনেয় ত্রয় এবং সহচর দ্বাদশজন দরবেশের সমাধি ব্যতীত পরবর্তীকালের আরও কয়েকজন আউলিয়ার সমাধি আছে। শেষোক্তদের মধ্যে শাহ হবিবুল্লাহর আস্তানায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই অর্ঘ্য প্রদান করেন এবং শাহ মস্তানের আস্তানা হইতে নাকি অন্ধকার রাত্রে মধ্যে মধ্যে এক ঝলক অত্যুৎজ্জ্বল আলোক আকাশের দিকে উঠিতে দেখা যায়। এখানে শাহজাদা মক্‌দুম্ শাহের প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্দর পুরাতন মসজিদ আছে। মক্‌দুম্ শাহ-দৌলা আরবদেশের রাজপুত্র বা শাহজাদা ছিলেন বলিয়া স্থানটির নাম শাহজাদপুর হইয়াছে। মসজিদটি ইস্টক নির্মিত এবং ৫২ ফুট লম্বা ও ৩১ ফুট চওড়া, ইহার ভিতরে ২৮টি কালো পাথরে থাম আছে। ইহার মধ্যে একটি থামের রঙ অপরগুলি হইতে কিছু ভিন্ন। এ অঞ্চলে লোকের বিশ্বাস এই থামটিকে জড়াইয়া ধরিলে সন্তানহীনা নারী সন্তানলাভ করেন। মসজিদ ও কবরগুলির খরচের জন্য ৭১২ বিঘা নিষ্কর জমি আছে। বৈশাখ মাসে এখানে একটি বড় মেলা হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু লোক ইহাতে যোগদান করেন। এই মেলায় টাট্টু ঘোড়া বিক্রয় হয়। এই মেলায় সুন্দর পুতুল প্রভৃতি লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়।" মেলাটি এখনও অনুষ্ঠিত হয়। *—বাংলায় ভ্রমণ। পৃঃ ১১৭*

মসজিদটি গঠন সাধারণ আয়তক্ষেত্রাকার। ভিতরের মাপ ৫১—৯—৩১—৫ এবং দেয়ালের ঘনত্ব ৫—৭। এর পূর্ব দিকে ৫টি গম্বুজ রয়েছে। গম্বুজগুলি কালোপাথরের স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। মসজিদটির ভিতরে একটি সাতস্তর বিশিষ্ট বেদি রয়েছে। মুঘল আমলে মসজিদটির সংস্কার করা হয়েছিল। তাই এর মূল টেরাকোটা নকশাগুলো এখন নেই। কেবলমাত্র পূর্বদিকের প্যানেলগুলো রয়েছে। মসজিদটির নির্মাণকাল জানা যায়নি। তবে এর মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় এ সম্ভবত ১৫শ শতকে নির্মিত হয়েছিল।

—পাবনা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯০ পৃঃ ৭৮

"গম্বুজগুলোর ড্রাম বিভিন্ন এবং অনুচ্চ এবং ক্ষুদ্রাকৃতি কলস চূড়া রয়েছে। পশ্চিম দিকে

সর্বমোট পাঁচটি মিহরাব থাকার কথা, প্রতিটি 'বে'র বরাবর কিন্তু ছয় ধাপবিশিষ্ট পাথরের মিম্বর নির্মিত হওয়ায় মিহরাবের সংখ্যা ৮টি। আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং খাঁজকাটা খিলান দ্বারা অলংকৃত অবতলাকৃতি মিহরাবগুলো খুবই আকর্ষণীয়। দ্বিতল মিম্বরের উপরে গম্বুজ দেখা যাবে' অসংলগ্ন মিনারটি আধুনিক এবং তা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।"

—বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি—ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। পৃঃ ১৪৩

"শাহজাদপুর মসজিদ নির্মাণে মুসলমানদের প্রথম পর্যায়ের স্থাপত্য নির্মাণ পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। এই ইমারতে গম্বুজ নির্মাণে পানদানতিভ পদ্ধতির সহায়তায় চার কোণকে বৃত্তে পরিবর্তনের মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়েছে। মুসলমানদের প্রথম দিকের নির্মিত ইমারতে এরূপ নির্মাণ-কৌশলের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। সুলতানী যুগের প্রথম ভাগে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে এদেশের সনাতন নির্মাণ পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ মিস্ত্রি-কারিকরগণকে তাদের নির্মাণ কাজে নিয়োগ করে না। এদেরকে ক্রমে খিলান পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং এই নূতন প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে গিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাদের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায় পার হতে হয়। পরবর্তীতে এদের নির্মিত ইমারতে আমরা মুসলিম স্থাপত্যের প্রকৃত খিলান, স্কুইন্স ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করি। অতএব স্থাপত্যগত নির্মাণ কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতঃদৃষ্টিতে শাহজাদপুর মসজিদ বড়ি মসজিদের পূর্ববর্তী নির্মাণ বলে প্রতিভাত হলেও অন্যান্য স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে শাহজাদপুর মসজিদ বড়ি মসজিদের পরবর্তী নির্মাণ হিসাবে অধিক সমর্থন যোগায়।"

—আমাদের ঐতিহ্য শাহজাদপুর মসজিদ—আয়শা বেগম। পৃঃ ৩৫

"... বুকানন হামিলটনের মতে, ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের বহু পূর্ব থেকেই এদেশে মুসলিম সুফীসাধকগণ আগমন করেন। শাহজাদপুরে মক্‌দুম্‌ শাহ বসতি স্থাপন করেন তবে তিনি স্বয়ং মসজিদ স্থাপন করেন কিনা সঠিকভাবে বলা যায় না। কারণ তিনি হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁর মস্তক ছিন্ন করা হয়। তাঁকে মসজিদের দক্ষিণদিকে সমাহিত করা হয়। এখানে আরও অসংখ্য কবর দেখা যাবে যা 'গঞ্জে শহীদান' নামে পরিচিত। আবদুল ওয়ালী বলেন যে, যুদ্ধে পরাস্ত হলে মক্‌দুম্‌ শাহের ভগিনী একটি জলাশয়ে আত্মাহুতি দেন। বর্তমানে এটি 'সতী' বিবির খাল নামে পরিচিত। এখানে কোন খালের চিহ্ন পাওয়া যায় না, হয়ত ভরাট হয়ে চাযের জমিতে পরিণত হয়েছে। মসজিদের পূর্বদিকে রয়েছে বিরাট সাহান এবং সাহানের উত্তর-পূর্ব কোণে অষ্ট-ভূজাকৃতি একটি আধুনিক ইমারত দেখা যাবে। খুব সম্ভব মক্‌দুম্‌ শাহের ওস্তাদ বিখ্যাত সাধক শামসুদ্দিন তাব্রিজীর একটি প্রতীক সমাধি হিসাবে এই ইমারতকে চিহ্নিত করা হয়েছে।"

—বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি— ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। পৃঃ ২৪৪

সিরাজগঞ্জ জেলার উপজেলা শাহজাদপুর কবি রবীন্দ্রনাথের রচনায় অমর হয়ে আছে। অতীতে পাবনার এই বিখ্যাত গ্রামটিকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ও অন্যান্য জমিদারের এলাকাভুক্ত ছিল। ঠাকুর পরিবারের কাছারি ভবনটি দোতলা, যা এখনও বর্তমান। আগে এখানে একটি নীলকুঠি ছিল। বর্তমানে এই ভবনে একটি তহশিল অফিস আছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে শাহজাদপুরের ছবি ধরা আছে, তা এখন অনেক পরিবর্তিত। নানা ধরনের সরকারি অফিস, একটি ডিগ্রি কলেজ, একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, জেলা পরিষদের ডাকবাঙ্‌লো আছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে উল্লাপাড়া রেল স্টেশন নেমে শাহজাদপুরে যাওয়া যায়। তাছাড়া ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডের মাধ্যমেও উল্লাপাড়ার সঙ্গে যুক্ত। এখানে কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। একসময় এখানে একটি মুনসেফ কোর্ট ছিল। ১৯৮৪ সালে আগুনে কোর্ট ভবন ধ্বংসের পর, সিরাজগঞ্জে আদালত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আগে যে ফৌজদারি আদালত ও জেলখানা ছিল, সেটি উঠে যায় ১৯২৯ সালে।

উল্লাপাড়া স্টেশনের ৯ মাইল দক্ষিণে ফুলঝোর বা হুরাসাগর নদীতীরে শাহজাদপুর গ্রাম। ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে সারা-সিরাজগঞ্জ রেলপথে উল্লাপাড়া স্টেশন নেমে যাওয়া যায় শাহজাদপুর। শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিজড়িত কুঠিবাড়ির সম্পর্কে নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 'শাহজাদপুরে-রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আকর্ষণীয় বিবরণ দিয়েছেন। নরেশচন্দ্র ছিলেন শাহজাদপুর কুঠিবাড়ি এলাকার মানুষ। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। শাহজাদপুরে ঢোকার মুখে পথের বামদিকে কিরণমালা বালিকা বিদ্যালয়। শাহজাদপুর ফৌজদারি আদালতের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রজনী নিয়োগীর পত্নীর নামে এই বিদ্যালয়। রাস্তার ডানদিকে ছিল ডঃ পূর্ণচন্দ্র শীলের বিরাট দোতলা টিনের বাড়ি। পূর্ণচন্দ্র মেডিকেল কলেজে পড়বার সময় রবীন্দ্রনাথের আর্থিক সাহায্য পেতেন। এই পথ দিয়ে দক্ষিণ দিক বরাবর গেলেই শাহজাদপুর বাজার। বাজার সীমান্তে হলদে রঙের দোতলা কুঠিবাড়ি। দ্বারকানাথ এখানে জমিদারি কেনার আগে এটি ছিল নীলকুঠি। প্রায় দশ বিঘা জমির ওপর কুঠিবাড়ির সঙ্গে কাছারি, মালখানা ও কর্মচারিদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল। কুঠিবাড়ির উত্তরের মাঠে হাট বসত সোম ও বৃহস্পতিবার। সেই হাটে বিক্রি হত বাঁশ, লাঠি, কাঠ, ধনে এবং স্থানীয় আনাজপাতি। এই মাঠেই ছেলেরা ফুটবল খেলত। কখনও কখনও যাত্রা, ম্যাজিক, সিনেমার আসর বসত। মুকুন্দ দাসের যাত্রা গান হয় এই মাঠে ১৯১২ সালে। মাঠের উত্তরপূর্ব কোণে একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছের পাশ দিয়ে গেছে একটি খাল কুঠিবাড়ির পূর্ব দিক দিয়ে। এ হল ফুলঝোরা নদীর একটি রেখা। এই খালটি দক্ষিণ পশ্চিমে তিন মাইল এগিয়ে মিলেছে হুরাসাগরে। বর্ষায় খালটি জলে ভরে যায়। কবিগুরুর বোট 'চিত্রা' এসে থামত এই খালের পাশে। কুঠিবাড়ির উত্তর দক্ষিণে যে বাগান দুটি ছিল, তার উত্তরেরটি আছে। দক্ষিণের বাগানের চিহ্নমাত্র নেই। সেই বাগানে রবীন্দ্রনাথের পরিচর্যায় একটি দিঘিতে সারা বছর ফুটে থাকত পদ্ম। উত্তরের বাগানে নানান ফল গাছ লাগান হয়েছিল।

কুঠিবাড়ির পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি। দোতলার উত্তর-পূর্ব কোণে রবীন্দ্রনাথের স্নান ঘর। পশ্চিম দিকে জানালার পাশে দুটো আলমারি বোঝাই কাঁচের ও চিনামাটির বাসন। একটি কাঠের বাক্সবোঝাই আসবাবপত্র। ওপরে বড় ঘরটি ছিল রবীন্দ্রনাথের দরবার কক্ষ। মেঝের ওপর সতরঞ্চি পাতা। কয়েকটি সোফা দিয়ে সাজান। একটা শ্বেত পাথরের টেবিল থাকত। বিশেষ অতিথির আগমনে সুন্দরভাবে সাজান হত ঘর। রবিবর্মার আঁকা ছবি, ঠাকুর পরিবারের কয়েকজনের প্রতিকৃতি ঝোলান থাকত দেওয়ালে। রবীন্দ্রনাথের কোন প্রতিকৃতি ছিল না। কবির ব্যবহৃত হারমোনিয়ামটি ছিল এখানে। এই ঘরের পরই শয়নকক্ষে জাজিম বিছানো দুটি খাট, কিছু চেয়ার আর টেবিল-আয়না। পূর্ব দিকের ঘরটি ছোট হলেও, বিশাল জানালা। এই ঘরের নিচে একখানি টালির ঘরে কবির জন্য রান্না করত কালমাদি আর এনাত আলি। কুঠিবাড়ির ওপর নিচের দুটি তলাতেই উত্তর দক্ষিণে রেলিং ঘেরা বারান্দা। উত্তরের বারান্দা দিয়ে একটি সিড়ি উঠে গিয়েছিল ছাদে। নিচে সিঁড়িকোঠার পূর্ব দিকে আট দশটি কাঁচের আলমারি বোঝাই-বই নিয়ে লাইব্রেরি। বহু দুষ্প্রাপ্য বই ছিল এখানে। একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, কয়েকখানা বেঞ্চ ছিল। এখানকার লাইব্রেরির বইপত্র পাবনার অন্নদাগোবিন্দ লাইব্রেরিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয় ১৯৪৬-৪৭ সালে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি এই উদ্যোগ। একখানা পালকি দীর্ঘকাল ছিল নিচের তলায় ছাদের বিমের সঙ্গে ঝোলান। কুঠিবাড়ির পশ্চিমে পাঁচিল ঘেরা কাছারি বাড়ির আয়তনও ছিল বিরাট। সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে বিরাট প্রাঙ্গন। চারদিকে ঘর। প্রাঙ্গনে বিশেষ অতিথিদের আপ্যায়ন করা হত। নাটক, জলসার অনুষ্ঠান হত। কাছারিবাড়ি ঢোকার আগে একটি শান বাঁধানো বকুল গাছ দীর্ঘকাল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বকুল গাছের নিচে ছিল একটি শেড্। রবীন্দ্রনাথের বোট 'চিত্রা'র ছাদ দিয়ে শেডের ওপরকার আচ্ছাদন তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে এখানে স্থানীয় সাহিত্য প্রেমিকদের 'বকুলতলা' বৈঠক বসত।

মোহম্মদ আনসারুজ্জমানের লেখা 'সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ' একখানি মূল্যবান বই। ওপরের দেওয়া কুঠিবাড়ির বিবরণের সঙ্গে আনসারুজ্জামের বিবরণের সাদৃশ্য রয়েছে। এবং এই বইটি থেকে কুঠিবাড়ির সাম্প্রতিক অবস্থা জানা যায়, যা চক্রবর্তীর লেখা বই-এ নেই। "কুঠিবাড়ির সামনের দিক অর্থাৎ উত্তর দিকে প্রধান প্রবেশ পথ। লোহার শিক আর মাঝে মাঝে ইটের থাম দিয়ে কুঠিবাড়ির সামনেটা ঘেরা। এই ঘেরা জায়গাটাই উত্তর দিকের বাগান। দক্ষিণ দিকেও আর একটি বাগান ছিল। কিন্তু এখন তার অস্তিত্ব মাত্র নেই। উত্তর দিকের বাগানে এখনো আম, লিচু, ঝাউগাছ দেখা যাবে। পূর্ব দিকেও কিছু গাছ আছে। আর পশ্চিম দিকে আছে বকুলগাছ, সপ্তপদী গাছও আছে কয়েকটা, আর আছে আমের গাছ। কিন্তু এখানকার দুটো চারটে আম আর লিচু আর বকুল গাছ দিয়ে সেদিনের রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বাগানটিকে খুব অল্পই অনুভব করা যাবে। উত্তর আর দক্ষিণে, দুটো দিকের বাগানই ছিল সযত্ন লালিত। ফুলগাছের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না বাগানে। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির ফুলের বাগানের চেয়েও এটা ছিল বড়। ওখানকার কুঠিবাড়ি গড়তে হয়েছিল নতুন করে। তাই বাগানটিও ছিল নতুন। কিন্তু সাজাদপুরের কুঠিবাড়ি ছিল যেমন পুরাতন, বাগানটিও ছিল পুরাতন। তাই বাগানে পুরনো গাছগাছালির সংখ্যা ছিল প্রচুর। নানান জাতের আমগাছের একটি চমৎকার সংগ্রহ ছিল। ছিল দারুচিনির মত দুষ্প্রাপ্য গাছ। জুঁই, বেলি, কামিনী, বকুল, চাঁপা, শিউলি ফুটত ঋতুভেদে।... কুঠিবাড়ির ম্যাগনোলিয়া গাছটির আকর্ষণও কম ছিল না। সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে তার শাখা। আর সেখানে ফোটে বেশ বড় সড় ফুল—পদ্মের চেয়েও বড়।... নিচের তলায় যেমন উত্তর দক্ষিণ দুদিকেই টানা প্রশস্ত বারান্দা আছে, তেমনি দোতলাতেও। বারান্দাগুলো আগে রেলিং দিয়ে ঘেরা ছিল। এখন ওসবের বালাই নেই। দক্ষিণের বারান্দা থেকে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠবার ব্যবস্থা ছিল। কালের ধোপে এখন তা হারিয়ে গেছে। দক্ষিণের বারান্দার ছাদটাও এখন নেই। উনসত্তুরের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে সেটা উড়ে যায়। কুঠিবাড়ির একতলাতে সেকালে পোস্ট অফিস ছিল।... নিচতলার পশ্চিম দিকের ঘরেই একসময় ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠিত এডওয়ার্ড লাইব্রেরি ছিল।... বলাই বাহুল্য সাজাদপুরের কুঠিবাড়ি কবির অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং ছিন্নপত্রে এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লক্ষণীয়। এক জায়গায় কবির উক্তি "অনেক কাল বোটের মধ্যে বাস করে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড়ো ভালো লাগে। বড় বড় জানালা দরজা, চারিদিক থেকে আলো বাতাস আসছে, যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডালপালা চোখে পড়ে এবং পাখির ডাক শুনতে পাই...।"

মোহাম্মদ আনসারুজ্জামানের বিবরণে জানা যায়, ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে কবির ব্যবহৃত পালকিটা দেখা যাবে। জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেলেও, নতুন কাঠে মেরামত করে রঙ দেওয়া হয়েছে। বসবার ঘরে দেওয়ালে লাগান সেকালের বাতি। আর ছাদ থেকে ঝোলান টানা পাখা। দরজায় সেকেলে পর্দা। দেওয়ালে যেসব ছবি টাঙান ছিল একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা সেসব ভেঙে দিয়ে গেছে। শোবার ঘরের বন্ধ আলমারিতে আছে কবির ব্যবহৃত একজোড়া খড়ম, নল লাগানো হুঁকো, ফুলদানি, শতছিন্ন বালিশের ওয়াড়, ছেঁড়াখোড়া মশারি আর লেপ, রান্নার কিছু বাসন-কোসন, কাপ, লণ্ঠন, যেটুকু যা পাওয়া গেছে তা সযত্নে রক্ষার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

নবগ্রাম ঃ

চাটমোহর থেকে পূর্ব দিকে ৩ মাইল দূরে নবগ্রাম বা নওগাঁ। একসময়ে ছিল গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। নবগ্রামের মসজিদ ও মাজার বিখ্যাত। মসজিদের গায়ের শিলালিপি থেকে জানা যায়, হিজরি ৯৩২ বা ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ নির্মাণ করেন মিয়া আয়াল ওরফে মিয়া মোযাজ্জম। পোড়া ইটের বর্গাকার মসজিদের চারকোণায় আছে খাঁজকাটা বুরুজ। বারান্দার দুই কোণেও খাঁজকাটা বুরুজ আছে। মসজিদের প্রাঙ্গণে হযরত আবদুল আলি বাকি শাহ

শরিফ জিন্দানী নামে একজন সাধকের মাজার আছে। মসজিদের সম্মুখভাগ অলঙ্কৃত। চৈত্র মাসে এখানে ওরস উৎসব হয়।

নবগ্রাম মসজিদের ২০০ গজ দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। শাহী মসজিদের সময়ে নির্মিত এই মসজিদটির ভগ্ন ইট পাথর মাত্র পড়ে রয়েছে। মসজিদটি ভাগনের মসজিদ নাম পরিচিত ছিল।

"হোসেন শাহী আমলে বাংলাদেশে অনেক মসজিদ নির্মাণ করা হয়। নুসরত শাহের রাজত্বকালে ৯০২ হিজরিতে (১৫২৬ সন) তারাস থানার নবগ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এই মসজিদ প্রাঙ্গণে হজরত আবদুল বাকি শাহ্ শরিফ জিন্দানীকে সমাধিস্থ করা হয়। এ একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট দালান এবং প্রত্যেকদিকের দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট। এর চার কোণায় আটভুজা টাওয়ার রয়েছে। গঠন শৈলী ও সাজসজ্জার দিক থেকে এ গৌড়ের লাটন মসজিদ ও গুমতি গেট-এর মত। শেষোক্ত দালানগুলোর মতই, এর টাওয়ারগুলো ছাঁচে ঢালা ব্যান্ডের সাহায্যে তিনটি শাখায় বিভক্ত এবং প্রতিটি শাখা গোলাকৃতি ফ্লুট দ্বারা সজ্জিত। এর উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে একটি করে অর্ধগোলাকার প্রবেশদ্বার রয়েছে। এর সম্মুখভাগ চিত্র ও তাকদ্বারা সজ্জিত। চিত্রগুলিতে বক্রাকারে ফুলের নকশা খোদাইকরা রয়েছে এবং সেগুলো একটি চন্দ্রাকৃতি খিলানের উপর থেকে নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। পূর্বদিকের খিলানে এক সারিতে চারটি কপাটের নক্‌শা আঁকা রয়েছে। চিত্র বিশিষ্ট প্রাচীর ও কার্নিশ সামান্য বাঁকা এবং এর উপরেই গম্বুজ। গম্বুজটি এখন জঙ্গলে আবৃত।"

—পাবনা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯০ পৃঃ ৭৮

ঈশ্বরদি ঃ

বর্তমান পাবনা জেলার অন্যতম উপজেলা ঈশ্বরদি ৫টি ইউনিয়ন ও ১২টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। একটি কর্মমুখর বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র। দর্শনা—চিলাহাটি শাখার রেলওয়ে জংশন। একটি রেলপথ গেছে সিরাজগঞ্জ স্টিমার ঘাট পর্যন্ত। লুপ লাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভাগীয় হেডকোয়ার্টার পাকশির সঙ্গে যুক্ত। একটি রেলওয়ে হাসপাতাল এবং জেলা পরিষদের হাসপাতাল, দুটি কলেজ, দুটি বালিকা বিদ্যালয়, আঠারটি উচ্চ বিদ্যালয়, ছয়টি জুনিয়ার হাইস্কুল, তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র, রূপপুর আনবিক প্রকল্পের একটি বিভাগীয় দপ্তর রয়েছে এই শহরে।

চাটমোহর ঃ

পাবনা শহরের ১৯ মাইল উত্তরে বরাল নদী তীরে চাটমোহর উপজেলা। একসময় বড় থানা ছিল এখানে। গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ, একটি সুদীর্ঘ দিঘি, সরকারি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়, ডাকঘর, তার অফিস, একটি ডাকবাঙলো, ১৫টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৮টি জুনিয়র হাইস্কুল এবং দুটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

চাটমোহর রেল স্টেশনের প্রায় দেড় মাইল উত্তরপূর্বে চাটমোহর নতুন বাজারের আধ মাইল পূর্ব দিকে জনবসতি এলাকায় একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। গম্বুজগুলো প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত ; দেওয়ালের অবস্থাও তাই। মসজিদের উত্তরে একটি পাকা কবর রয়েছে। ভগ্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে এখনও নমাজ পড়া হয়ে থাকে।

চাটমোহরের মসজিদ সম্পর্কে জানা যায় ঃ "চাটমোহরে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। এই মসজিদের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে তুই মহম্মদ খাঁ কাকশালের পুত্র সুলতান মামুদ খাঁ কাবুলি কর্তৃক ইহা নির্মিত হয়। এই মসজিদের প্রস্তর গাত্রে বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে। তুর্কি জাতির একশাখা কাকশাল নামে

পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গে বিশেষত দিনাজপুর জেলায় ইহাদের বহু জায়গির ছিল। নিষ্কর জায়গির উঠাইয়া লওয়ায় এবং ইসলাম ধর্মের উপর সম্রাট আকবরের তাদৃশ্য নিষ্ঠা ছিল না মনে করিয়া কাক্‌সালগণ তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে মাসুম খাঁ নেতৃত্ব করেন। বাদশাহী সেনাদলকে ইহাতে বেগ পাইতে হইয়াছিল। পরে মাসুম খাঁ কাবুলি সোনার গাঁ-এর ঈশা খাঁর সহিত যোগদান করেন; কিন্তু অবশেষে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভাওয়ালের নিকট বাদশাহী ফৌজের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কথিত আছে মাসুম খাঁ চাটমোহরে একটি প্রকাণ্ড দিঘি খনন করান। ইহার উত্তর তীরে নাকি তাহার বাসভবন ছিল। যেস্থানে তাহার পাঠান সৈন্যগণ বাস করিত আজিও উহা পাঠানপাড়া নামে পরিচিত।"

—*বাংলায় ভ্রমণ।* পৃঃ ১১৫-১১৬

চাটমোহরের মসজিদ সম্পর্কে ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন ঃ "...সমসাময়িক স্থাপত্যরীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, চাটমোহরের মসজিদটি সুলতানী এবং মুঘল স্থাপত্যরীতির ক্রান্তিলগ্নে নির্মিত হয়; বরং বলা যায় যে, চাটমোহরের মসজিদটি যদিও ধ্বংসপ্রাপ্ত, এটি সুলতানী থেকে মুঘল স্থাপত্যে উত্তরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এটি যে আয়তাকার এবং আইল বিশিষ্ট তিন গম্বুজ দ্বারা আবৃত মসজিদ ছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।... সুলতানী আমলের টেরাকোটার নকশা দেখে প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের অলঙ্করণ বিলুপ্ত হয়নি। অবশ্য মুঘল আমলের অনেক ইমারতেই এ ধরনের অলঙ্করণ দেখা যাবে। যেমন টাংগাইলের আতিয়া ও ময়মনসিংহের অষ্টগ্রামের মসজিদ।... রাধারমন সাহা তার 'পাবনা জেলার ইতিহাস'-এ উল্লেখ করেন যে, চাটমোহর মসজিদটি একটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত। কিন্তু এটি খুবই স্থূল ও অযৌক্তিক মন্তব্য। মসজিদে প্রাচীন যুগের হিন্দু বৌদ্ধস্তম্ভ, কষ্টিপাথর পাওয়া গেছে। যে শিলালিপিটি উদ্ধার করা হয়েছে তার পিছনে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের মূর্তি ছিল বলে যাকারিয়া বলেছেন। এ ধরনের কষ্টিপাথর ছোট সোনা মসজিদেও পাওয়া গেছে। কিন্তু তাই বলে মসজিদ হিন্দু মন্দিরের উপর নির্মিত হতে পারে না, কারণ মসজিদ ও মন্দিরের ভূমি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ পৃথক। চাটমোহর মসজিদটি বাংলার মুঘল স্থাপত্যের প্রথম যুগের অন্যতম আকর্ষণীয় ইমারত ছিল।"

—*বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি।* পৃঃ ২৪৭-৪৮

তাড়াস ঃ

সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত তাড়াস ছিল একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। বর্তমানে উপজেলা। গ্রামের জমিদার রায় পরিবারের কাছারি ছিল এখানে। পাবনা, বগুড়া ও রাজশাহীতে ছিল এদের বিশাল জমিদারি। পাবনা জেলায় ছিল সব থেকে বড় জমিদারি। এই পরিবারের জনৈক পূর্বপুরুষ বলরাম দাস নাটোর রাজপরিবারের বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। তিনি 'রায়' উপাধি পান। এই পরিবারের রায় বনমালী রায় বাহাদুর পাবনা শহরে ইলিয়ট বনমালী টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, সিরাজগঞ্জে প্রতিষ্ঠা করেন বনওয়ারী হাইস্কুল। ইংরেজ সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর খেতাব দিয়েছিল।

সিরাজগঞ্জ শহরের পূব দিকে তাড়াস গ্রামে কয়েকটি মন্দির আছে। এর একটি শিবমন্দির। মন্দিরগুলি থেকে দুটি লিপি পাওয়া গেছে। লিপি থেকে জানা যায় নারায়ণ দাসমণি এটি নির্মাণ করেন এবং ১৭১১ সালে মন্দিরটি সংস্কার করেছিলেন বলরাম দাস। সম্ভবত স্থানীয় জমিদার পরিবার নানান সময়ে মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিলেন।

তাড়াস সড়ক পথে সিরাজগঞ্জ এবং উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সংযোগ রয়েছে। তাড়াস উপজেলায় আছে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, একটি কলেজ, ছয়টি উচ্চ ও জুনিয়ার হাইস্কুল, মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি ডাকবাঙলো।

ভেষজ উদ্ভিদ *

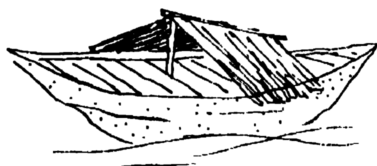
	দেশি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ব্যবহৃত অংশ	কার্যকারিতা
১.	আকন্দ	Calitropis gigantea Br	মূল, ছাল, পাতা	জ্বর নিবারক
২.	আদা	Zingiber officinalis Rescoe	মাটির নিচের অংশ	বায়ুরোগ নাশক
৩.	আনার (ডালিম)	Punica granatum Linn	ছাল	কৃমি নাশক
৪.	আপাঙ	Achyranthes aspera Linn	ফুল, ফল	শক্তিবর্ধক বিষনাশক
৫.	আমরুল	Oxalis corniculata Linn	সম্পূর্ণ গুল্ম	জ্বর, আমাশয় ও গ্যাস ট্রাইটিস রোগ প্রতিশেধক
৬.	আমলকি	Phyllanthus emlica Linn	ফল	মূত্রবর্ধক ও অম্লনাশক
৭.	ঈশ্বরমূল (ইসামূল)	Aristolochia indica Linn	মূল	সর্পবিষ নাশক
৮.	কদম	Anthocephalus indico Linn Rich	ছাল, পাতা	জ্বর প্রতিরোধক
৯.	করবী	Nerium indicum Mill	মূল	চর্মরোগে প্রলেপরূপে ব্যবহৃত
১০.	কালকাসুন্দে	Cassia sophera Linn	ছাল, পাতা বীচি	রেচক
১১.	কালোতুলসী	Ocimum sanctum Linn	রস, পাতা	দাদ, কাশি, গ্যাসটিক ও কানের ব্যথায় আরোগ্যকারী
১২.	কালোজাম	Syzygium cuminil skealo Linn	ছাল, বীচি, পাতা	বহুমূত্র ও আমাশয় নিরাময়কারক
১৩.	কুঁচ বা রতি	Abrus precatorius Linn	মূল	কাশির ওষুধ
১৪.	কেশরাজ কেশুটি	Eclipta prostrata Linn	মূল, পাতা	মস্তিষ্ক ও চুলের টনিক
১৫.	খেত পাপরা	Hedyotis corymbosa Linn	সম্পূর্ণ ফুল	জ্বর ও লিভারের ওষুধ
১৬.	খয়ের	Acacia catichu–Willd	গাছের রস	দেহজকলা সমূহের শক্তিশালী সংকোচক
১৭.	গন্ধবাধুলি	Paederi foetida Linn	পাতা	আমাশয় ও পেটের পীড়া আরোগ্য করে
১৮.	গাজা, ভাং, সিদ্ধি	Cannabis stativa Linn	পাতা	চৈতন্য বিলোপকারী
১৯.	গাব	Diospyros peregiina Guerke	ফল, ছাল	দেহজ কলাসমূহের সংকোচন ও পাচক
২০.	ছাতিম	Alstonia scholaris–R.Rr.	ছাল	জ্বর ও আমাশয় প্রতিরোধক
২১.	জগডুমুর	Ficus Glomerata–Roxle	ছাল, পাতা ও ফলের রস	বহুমূত্র রোগ নিবারক মুখ প্রসাধনে ব্যবহৃত
২২.	জবা	Hobiscus rosa-sinensis Linn	ফুল	স্নায়ু স্নিগ্ধকর

দেশি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ব্যবহৃত অংশ	কার্যকারিতা
২৩. ঝুমকা লতা	Passiflora foetida Linn	পাতা	মাথা ব্যথা, হাঁপানি ও পিত্ত চিকিৎসায় ব্যবহৃত
২৪. টোপাপানা	Pistia stratiotes Linn	মূল	রেচক, মূত্রবর্ধক
২৫. তেঁতুল	Tamarindus indicus Linn	তেঁতুলের কোমলাংশ	দেহ স্নিগ্ধকারক বায়ুরোগ নাশক
২৬. তেলাকুচা	Coccinea cordifolia Linn	রস	বহুমূত্র রোগ প্রতিরোধক
২৭. তুলসী	Ocimum americanum Linn	পাতা	ঠাণ্ডায়, জ্বরে, চর্মরোগে ব্যবহৃত
২৮. থানকুনি	Centella asiatica Linn	টাটকা/শুকনো পাতা বা বোটা	মূত্রবর্ধক, স্নায়ুরোগ, অজীর্ণ, আমাশয় ও কুষ্ঠরোগে ব্যবহৃত
২৯. ধনিয়া	Coriandrum sativum Linn	শুষ্কফল	স্নায়ুস্নিগ্ধকারক, মূত্র বর্ধক, বায়ুরোগ ও মাথাব্যাথা নিরাময় করে
৩০. বনিম	Azadirachta indica A. Juss	ছাল, পাতা	জীবাণুনাশক, জ্বর ও হেপাটাইটিস নিরাময় করে
৩১. নিশিন্দা	Vitex negundo Linn	পাতা	জ্বর নাশক
৩২. নুনে	Portulaca oleracea Linn	বীচি	চর্মরোগ ও বাত নিরাময় করে
৩৩. পলাশ	Butea monosperma, Roxb	আঠা, বীচি	সংকোচন, রেচক
৩৪. পটল	Trichosanthes dioica Roxb	পাতা	রেচক
৩৫. পুদিনা	Mentha arvensis Linn	তেল	পিপারমেন্ট তেলের প্রতিকল্প
৩৬. পুনরনবা	Boerhaaviarepens Linn	সম্পূর্ণ গুল্ম	মূত্রবর্ধক, শোথ রোগ নিবারক
৩৭. পেঁপে	Carica papaya Linn	দুগ্ধবৎ রস	পাচকরসের উপাদান
৩৮. বকুল	Mimusops elengi Linn	কচিফল	দাঁতের মাড়ি শক্ত করে
৩৯. বড়কেরু	Euphorbia birta Linn	ফুল-ফলসহ সম্পূর্ণ গাছ	শিশুদের কৃমি, পেটের রোগ, কাশি, হাঁপানি নিরাময় করে।
৪০. বাবলা	Acacia nilotica Linn	পাতা	শরীরের ব্যথা নিরাময় করে
৪১. বাসক	Adhatoda vasica Nees	সম্পূর্ণ গুল্ম	শ্লেষ্মা দূর করে, কাশি নিরাময় করে

দেশি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ব্যবহৃত অংশ	কার্যকারিতা
৪২. বাবুইতুলসী	Ocimum basilicum Linn	পাতার রস, বিচি	আমাশয়, গনোরিয়া, সর্দি কাশি সারে, কাঁকড়াবিছার কামড়ের যন্ত্রণা দূর করে।
৪৩. বিসকাটালি পাকুর মূল	Polygonum hydropiper Linn	গাছের রস	গবাদি পশু ও মেষের গায়েরএঁটেল পোকা বিনাশ করে।
৪৪. বেল	Aegle marmelos Corr	ফল	পাচক, টনিক, জোলাপ, দেহজকলা সমূহের সংকোচক
৪৫. মুক্তাঝুরি	Acalypha indica Linn	সম্পূর্ণগুল্ম	জোলাপ, পুরনো ব্রঙ্কাইটিস নিরাময় করে
৪৬. মুথা	Cyperus rotundus Linn	মাটির নিচের অংশ, পাতা	পাচক, দেহজ কলাসমূহের সংকোচক
৪৭. লজ্জাবতী	Mimosa pudica Linn	গাছের রস	ভগন্দর ক্ষত নিরাময় করে
৪৮. লাল ভেরেন্ডা	Jatropha gossypifolia Linn	পাতা	রক্ত বিশোধক, যৌনরোগ নিরাময়ক
৪৯. লেবু	Citrus aurartifoia Wing	লেবুর রস	পৈত্তিক রোগ নিরাময়ক
৫০. শতমূলী	Asparagus reamosus willd	মূল	টনিক
৫১, শাপলা	Nymphaea nouchali Burm F	কাণ্ডের গুড়া	অর্শ, আমাশয়, অজীর্ণ নিরাময়ক
৫২. শিয়ালকাটা	Argemone mxicane Linn	হলুদ রস	শোথ, সর্দি, জন্ডিস, চর্মরোগ সারে
৫৩. সর্পগন্ধা	Rauvolfia Serpentina Benth	মূল	স্নায়বিক রোগ সারে, অনিদ্রা দূর করে, উচ্চ রক্তচাপ হ্রাস করে এবং সম্মোহক
৫৪. সজিনা	Moringa oleifera Lanik	পাতা	সাপ, কুকুর ও বানর কামড়ের বিষনাশক
৫৫. সুপারি	Areca Catechu Linn	ফল	দেহজ কলাসমূহের সঙ্কোচক
৫৬ সোনালু, বান্দরলাঠি	Cassia fistua Linn	ফলের কোমলাংশ	রেচক
৫৭ হলুদ	Curcuma domestica Val.	শুষ্ক মূল	রক্ত বিশোধক, ব্যথার প্রলেপ।

* *পাবনা জেলা গেজেটিয়ার —১৯৯০*

পাবনা জেলার লোকসঙ্গীত ও ছড়া



সমৃদ্ধতর লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য রয়েছে পাবন জেলার। বর্তমান বাংলাদেশের এই অঞ্চলের জনজীবনের ছবি ধরা আছে লোকসাহিত্যে। গ্রামীণ জনজীবনে নাগরিক চেতনার প্রসার ঘটলেও, এখনও সব হারিয়ে যায়নি। এখানে কয়েকটি লোকসঙ্গীত ও ছড়া উদ্ধৃত হল ঃ

১.*

ঘুমপাড়ানি গান—

গোম আলা বিটির‍্যা
গোম দিয়া যাও
ছালা বৈর‍্যা মালা থুইচি
গুইন্যা নিয়া যাও
সোনা আমার মানিক আমার
গোম আইস সহালে
আহা শেথ্যা চাঁদ আইন্যা
দেব তোমার কপালে
যুতিবাবা খিজি কর
দুদুম প্যাচা করব জড়ো
দুদুম প্যাচার মস্ত ঠোঁট
তুইল্যা খাইবো তোমার চোখ
সোনা যুতি বাইচপার চাও
শীগগির কইরা গোম যাও।

২.

ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে দেব ছাপা-ননী।
ঘুম যায়রে ঘুম যায়রে সোনার যাদুমণি।।
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে দেব মিঠাই খেতে
খোকার চোখে ঘুম আয়রে সোনার পিঁড়ি পেতে

৩.

মণি ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী আ'ল দ্যাশে।
টিয়ায় ধান খাইলে খাজনা দেবো কিসে।।

৪.

কুকুর বাজায় টুমটুমি—
বানর বাজায় ঢোল,
টুনটুনিয়ে টুন টুনালো
ইঁদুর বাজায় খোল।
সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি
চেয়ে দেখরে খোকন মণি।

৫.

এক শিয়ালে রাঁধে বাড় দুই শিয়ালে খায়,
রাজার বেটা মজুমদার ঘোড়ায় চড়ি যায়।

৬.

কন্যা আন (কন্যার সন্ধান ও বিবাহযাত্রাবোধক)—
ওপারে ধনচে গাছ রাম ছাগলে খায়,
তার তলায় দিয়ে খুকুরাণী বিয়ে হয়ে যায়।
আসে যায় বর মহাশয় চার ঘোড়ার গাড়ি,
তার পিছনে খুকুবাণী চৌদোলাতে চড়ি।
তার পিছনে কাকাবাবু যান দৌড়োদৌড়ি,
তার পিছনে মামাবাবু হাতে সোনার ছড়ি।
তার পিছনে ঝিয়েদের মাথায় রকম রকম হাঁড়ি।
তার পরেতে সব শেষেতে শ্বশুর ঘর গেল,
সাইত শুভক্ষণ করে দুধে আলতা হলো।
সবাই দেখে বললো, ওগো বৌ হয়েছে কালো,
শাশুড়ি ননদ বললে, আমার ঘর করেছে আলো।
নুড়ো নুড়ো খড়ের আগুন শত্রু মুখে জ্বালো।

৭.

কন্যা দান—
নাপিত বাড়ি গেলাম আমি
নাপিত বলে বোসো।
বসব না, বসব না,
বসন বুড়ির বিয়ে।
তোমরা নরুণ নিয়ে যেয়ো।
মালাকার বাড়ি গেলাম আমি
মালাকার বলে বোসো,
বসব না বসব না।
বসন বুড়ির বিয়ে
তোমরা টোপরমালা নিয়ে যেয়ো।

বামুন বাড়ি গেলাম আমি
বামুন বলে বোসো।
বসব না বসব না,
বসন বুড়ির বিয়ে,
তোমরা বামুন নিয়ে যেয়ো।
কুমোর বাড়ি গেলাম আমি
কুমোর বলে বোসো।
বসব না বসব না
বসন বুড়ির বিয়ে।
তোমরা চালন কুলো নিয়ে যেয়ো।
ধোবা বাড়ি গেলাম আমি,
ধোবা বলে বোসো,
বসব না বসব না,
বসন বুড়ির বিয়ে,
তোমরা বার তান নিয়ে যেয়ো।

৮.

কন্যা বিদায়—

বেতের বন্ধন বেতের ছান্দন
তার মধ্যে বস্যা বিবি ছুড়িল কান্দন।
আর কাইন্দ না বেলা উদয় শেষ,
গাও তোল ডুলিতে চড় চলি আপন দেশ।
কন্দুর ঘাটা যায়া বিবি ফিরিয়া চায়,
বাপে ভাইয়ের দালান কোঠার ঝিলিক দেখা যায়।
থাক থাক দালান কোঠা মায়ের আত্ম জুইড়া,
যদি বিবি বাইচা থাকে আবার আইসব ফিরা্যা।

৯.

বাবা কেন কান্দিবে শ্বশুর বাড়ি যাইব,
লোক দিমু লস্কর দিমু সাথে সাথে যাইব।
হাতি দিমু ঘোড়া দিমু তাঁত চইড়া যাইব,
ফুলের বাগিচা দিনু ছায়ায় ছায়ায় যাইব।
বড় বড় কড়ি দিমু খাবার কিনা খাইব।
ছোট ছোট কড়ি দিমু খ্যাওয়াত পার হইব।

১০.

জোড় পুতুলের বিয়ে—

আলতা নুড়িগাছের শুঁড়ি জোড় পুতুলের বিয়ে,
এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে।
এখন কেন কাঁদছ বাবা গামছা মাথায় দিয়ে?
আগে কাঁদে বাপ মা পিছে কাঁদে পর।
পর পত্তেশ লিখে দিলাম শ্বশুর বাড়ির ঘর।
শ্বশুরদের ঘর খানি খড়েরই ছাউনি,
বাপেদের ঘরখানি বেতেরই ছাউনি।
তার মধ্যে বসে আছে মা দুগ্‌গা ভবানী।

১১.

ওপারে ধন্‌চে গাছে ধন্‌চে ফল ধরে,
ওধনচের মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আই ঢাই গলা করে কাঠ,
এদ্দুরে এলাম রে মা হরগৌরীর মাঠ।
হরগৌরীর মাঠে যে মা পাকা পাকা পান,
পান কিন্‌লাম চুন কিন্‌লাম ননদে ভাই-বৌ খেলাম।

১২.

শাউড় নাই ননদ নাই কারে করমু ডর,
আগে বাড়্‌নু ভিজ্যা ভাত পাছে মুছ্‌নু ঘর।

১৩.

এক নৌকা সরু চাল এক নৌকা ঘি,
ভাল করে রান্না কর ময়রা ঠাকুর ঝি।
আমি কি ভাল, রাঁধি না, মন্দ রেঁধেছি?
বাড়ির বেগুন কাঁচকলাটি পটল ভেজেছি।

১৪.

এক শিয়ালে রাঁধে বাড়ে দুই শিয়ালে খায়,
রাজার বেটা মজুমদার ঘোড়ায় চড়ি যায়।
যাতিরে যাতিরে পাঁত কাপড়া পায়।
পাঁচ কাপড়া মাথায় বাঁইধে শাড়ি,
সেই শাড়ি যাইয়া পড়ে চাঁদ রায়ের বাড়ি।
চাঁদ রায় চাঁদ রায় কি কর বসিয়া,
তোমার পুত্র মার খায় সভায় বসিয়া।
বাপে কাঁদে পুত পুত মায়ে কাঁদে শুয়ে,
চোখে মুখে কামড়াল বিজাতি বোল্লা।

সেই বোল্লা কইরে? —গাছে উঠেছে,
সেই গাছ কই রে? —গঙ্গায় ডুবেছে।

১৫.

পিড়রে কদম্বের আছুর,
কাঁদরে গোয়ালার নারী হারায়ে বাছুর,
তার মাঝে এক কন্যা যুবা দেখি ভাল,
এক সের দুধ আইনে ব্রাহ্মণে বিলাল।
পিড়রে কদম্বের আছুর,
কাঁদেরে গোয়ালার নারী হারারে বাছুর!
তার মাঝে এক কন্যা যুবা দেখি ভাল;
এক তোলা সোনা আইনা পীরকে বিলালি!

১৬.

জাগ গান—

ওখান হতে পীর বিদায় হ'ল পঞ্চমানিক সঙ্গে নিল
আয় পীর চ্যালাজীর বাজারে।
শোন রে চ্যালাজী, ভাই, সোওয়া সের চাউল দেও খাই
দোওয়া করিব আল্লাহজীর ফকির।।
শোন রে ফকির মোরে তৈয়ার চাল নাইক ঘরে
ভাড়ালি আল্লাজীব ফকিরে।
পীরের মনে ছিল হক্কা চালেতে মারিল তুক্কা
সব চাল শূন্যেতে উড়াল।।
সুমতি ছিল চ্যালাজীর কুমতি লাগিল।
তৈয়ার চাল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।।
কান্দেরে চ্যালাজীর নারী কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরেরই পায়।
কান্দন শুনিয়া জোরে ডাক দিয়ে বলে পীরে
মনের বাঞ্ছতা পূর্ণ করে খাই।

ওখান হতে নারী বিদায় নিল পঞ্চ মানিক সঙ্গে নিল
যায় গুড়িয়ার বাজারে।
শুন রে গুড়িয়া ভাই, সোওয়া সের দুধ দেও খাই
দোয়া করিব আল্লাজীর ফকির।
সুমতি ছিল গুড়িয়ার কুমতি লাগিল,
তৈয়ার গুঁড় থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল হুক্কা গুড়েতে মারিল তুক্কা
সব গুড় শূন্যেতে উড়িল।।
কান্দেরে গুড়িয়া নারী কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।

কান্দন শুনিয়া দূরে ডাক দিয়া বলে পীরে
মনের বাঞ্ছতা পূর্ণ করে খাই।।
ওখান হতে বিদায় নিল পঞ্চ মানিক সঙ্গে নিল
যায় কুমারের বাজারে।
শুনরে কুমার ভাই, একটি পাতিল দাও খাই,
দোওয়া করিব আল্লাজীর ফকির।।
সুমতি ছিল কুমারের কুমতি ধরিল,
তৈয়ার পাতিল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল হুক্কা পাতিলে মারিল তুক্কা।
সব পাতিল শূন্যেতে উড়িল।।
কান্দে রে কুমারের নারী কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।
কান্দন শুনিয়া জোরে ডাক দিয়ে বলে পীরে
মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করে খাই।
সা জিন্দা ফকরুল্লা ও জিন্দা পীর,
মারিয়া জিলাতে পারে অপার মহিমা তোমার।
শুনতে খেরুয়া ভাই অন্য বাড়ি যাই।
এ বাড়ির মানুষ গরুর বাড়ুক পরমাই।।

১৭.

এ মা দয়া নাইরে তোর,
মা হয়ে কেন বেটায় সদায় বলে ননী চোর।।
কেষ্ট খায়, মা, বিষ্ণুপুরে, যশোদা যায় ঘাটে,
খালি গৃহ পেয়ে গোপাল সকল ননী লোটে।
"ননী খা'লো কে রে, গোপাল, ননী খা'লো কে?"
"আমি না খাই নাই ননী বলাই খা'য়েছে।"
"বলাই যদি খাইত ননী থুতো 'আদা', 'আদা',
তুমি, গোপাল, খাইছো ননী ভাণ্ড করেছো সাদা।"
ছড়ি হাতে নন্দরাণী যায় গোপালের পিছে,
এক লম্ফে উঠলেন গোপাল কদম্বেরই গাছে।
পাতায় পাতায় ফেরেন গোপাল ডালে না দেয় পাও,
গাছের নিচে নন্দরাণী থরে কাঁপে গাও।
"নামো নামো ওরে, গোপাল, পাড়্যা দেই তোর ফুল,
কদম্বেরই ডাল ভাঙ্গিয়ে মজাবি গোকুল।"
"নামি আমি, ওরে মারে, একটি সত্য করো,
নন্দ ঘোষ যে তোমার পিতা যদি আমায় মারো।"
"তা কি আর হয় রে গোপাল, তাকি আর হয়,
নন্দ ঘোষ যে তোমার পিতা সর্বলোকে কয়।"
নালা ভোলা দিয়ে গোপাল গাছ হতে নামাল,
গাভী "ছাঁদা" রসি দিয়ে দুই হাত বাঁধিল।

এ মা দয়া নাই তোর,
এত সাধের নীলমণি বান্ধা রইল তোর।।
কিবা বন্ধন বাঁধলি, মা রে, বন্ধন গেল কসে,
বন্ধনের তাপে মারে, লোহু চল্‌লো ভেসে।
কিবা বন্ধন বাঁধলি, মারে বান্ধনের জ্বালায় মরি,
কাঁচা ডোরের বন্ধন, মারে, সহিতে না পারি।
কিবা বন্ধন বাঁধলি, মা রে, বন্ধন পিঠে মোড়া,
বন্ধনের তাপে মা রে ছুটলো হাঁড়ের জোড়া।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্য করি,
নন্দ ঘোষের ধেনু রেখে দিব ননীর কড়ি।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্য করি,
হাতের বালা বন্ধক থুয়ে দেব ননীর কড়ি।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্য করি,
বাড়ি ছেড়ে যাব আমি মামাদের বাড়ি,
মামাদের গরু রেখে দিব ননীর কড়ি।
ঐ কথাটি শুনে মার একটু দয়া হ'ল,
হাতের বন্ধন ছেড়ে দিয়ে গোপাল কোলে নিল।

১৮.

সোনার হারের জাগ গান—
গিরি ভাই, গিরি ভাই, ছওর ছওর।
সোনার পীরের চেলা আ'ল বছর অন্তর।।
সোনার হারে চেলা দেখে যে করিবে হেলা।
দুই পায় দুই গোদ বাড়াবি চক্ষে বাড়াবি ঢেলা।।
ঢেলা নয় যে, ঢুল্যা নয় রে গায় আইছে জ্বর;
এমন ত দেখি নাইরে সোনার হারের বর।।
সোনার হার ভক্ত ঠাকুর মুখে চাপদাড়ি।
হেলিয়া দুলিয়া গেলেন গোয়ালিনীর বাড়ি।।
গোয়ালিনী গোয়ালিনী বসে কর কি?
তোমার পুত্র মার খাত্যাছে এই সভার মধ্যি।
সুবুদ্ধি গোয়ালের নারী কুবুদ্ধি লাগিল।
সিকার উপর দুগ্ধ থুয়ে পীরকে ভাড়াল।
ঘরে গোয়ালিনী বাথানে মরে গাই।।
সাতশত্র ধেনু মরে লেখা জোখা নাই।।
আগে যদি জানতেম রে, তুমি সত্যপীর।
আগে দিতাম দই দুগ্ধ পাছে দিতাম ক্ষীর।।
হইচই করে পীর বাথানে দিল পাড়ি।
বাথনেতে পড়্যা রইছে চোদ্দ বোঝা দড়ি।।
হইচ্ছ করিয়া পীর বাথানে দিল ভুষ্যা।
সাতদিনকার মরা ধেনু দন্তে কাটা কুটা।।

হইচই করিয়া পীর বাথানে দিল বাড়ি।
সাতদিনকার মরা ধেনু পারে নড়ানড়ি।।
চলো চলো, রাখাল ভাইরে, আর এক বাড়ি যাই।
এ বাড়ির মানুষ গরুর বাড়ুক পরমাই।

১৯.*

ধুয়া—

মনরে লা ইলাহা পড়
মনকে নেকপথে চল
বদপথে হয়ো না খাড়া
আযব হবে বড়।
মনরে গোয়া গঞ্জে আরশ গড়
মনরে ত্রিশ রোজা পাঁচ ওয়াক্ত নমাম
দুজ যাকাত ও কর
পাগলা ফেরন ফের
পাঁচটি ছুরার মোজাম নিয়েরে
নবীর তরিক ধর।

২০.*

জাগ গান—

পীরের বরে জন্ম লইল পুন মাসির চান
বাপো মায়ে রাখিল তার সোনা রায় নাম।

সোনা রায় নাম রাখিল সোনার বরণ
জোড়া মাণিক্য দিয়া গড়িয়াছে নয়ন।

ব্যারার বাঁধ কাট্যা দায় ঘরেতে পশিল
হ্যানো কালে সোনারায় ভূখণ্ডে পড়িল।

ছাওয়ান তুলিল দায় কোলে তুল্যা নিল
নাওয়াইয়া ধোওয়াইয়া তার অচ্ছুৎ করিল।

সোনার ধিচরা দিয়া নাড়ী ছেদ করিল
তোমার ছাওয়াল তুমি লও মা আমারে কি দিবা
পুন্যা বাঁধা পাঁচ টাকা দাইয়ের হাতে দিল।

২১.*

বিয়ের গান—

হোলদি কোটা জামাই মোটা
আর হোলদি কোটপো না

মেয়া বিয়্যা দেবো না
মেয়া আমার সুন্দরী

জামাইয়ের মুহে চাপদাড়ি
গাছের পর বাওইয়ের বাসা
মেয়ার বাপের বড় আশা
মেয়া দিব সাজাইয়া
টাকা দিব বাজাইয়া

এত যুতি রাজী অও
আতে আতে কবুল কও।

২২.

পার্বন সঙ্গীত—

আল্ লড়ি দিয়া যায় রে বাঁটই, গাল লড়ি দিয়া যায়,
গোড়া লড়ির বাড়ি খেয়ে বাপের বাড়ি যায়।
শ্যামের চিকণ কালার বাঁটই রে বাপের-বাড়ি যাব্যা তুমি,
চুল ধরিয়া আন্‌ব আমি, শ্যামের চিকণ কালার বাঁটইরে—
'চুল ধরিয়া আনব্যা তুমি, গোড় খাইয়া পড়ব আমি।'
'গড় খাইয়া পড়ব্যা তুমি, কোলে করে আনব আমি।'
'কালে করে আনব্যা তুমি, গাঙ্গে গিয়া ধুইব আমি।'
'গাঙ্গে নিয়া ধুইবা তুমি গাঙ্গ-মৎস্য হইব আমি।'
শ্যামের চিকণ কালা বাঁটইরে—
'জ্যালা দিয়া ছাক্‌ব্যা তুমি, আকাশ-তারা হব আমি,'
'আকাশ-তারা হব্যা তুমি, তীর বাঁটুল দিয়া মার্‌ব আমি।'
'তীর বাঁটুল দিয়া মারব্যা তুমি, হুরর তলে পলাব আমি।'
'হুরার তলে পলাবে তুমি, হুরার আগু: দিয়া মারব আমি।'
'হুরায় আগুন দিয়া মার্‌ব্যা তুমি, সর্ষা হয়ে রব আমি।'
'সর্ষা হয়ে রবে তুমি, কবিতর হয়ে খুট্‌ব আমি।'
'কবিতর হয়ে খুট্‌ব্যা তুমি ইন্দুর হয়ে রব আমি।'
'ইন্দুর হয়ে রবে তুমি, বিলাই হয়ে মার্‌ব আমি।'
শ্যামের চিকণ কালার বাঁটই রে।।

২৩.

বারমাস্যা—

নীলা, ও সুন্দর রে, আমার নীলা নতুন করোল রে।
তুমি ধোপ-কাপড়ে লাগাইছো কালির মৈলাম রে।।
এ না কালির মৈলাম রে ও মোর সাধু সাবানে উঠানোরে।
আমার মনের কালি না ওঠে জনমে রে।।
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া রে, ও মোর, নীলা, সাজালাম বাঙ্গালা রে।
আর দাড়ি-মাল্লা বস্যা ন্যায় দরমা রে।।
সীতাপাটি বেচ্যা রে ও মোর সাধু দাড়ি-মাল্লারে দেবো রে।
তুমি আরো ছয় মাস রহিবা ও আমার ঘরে।।
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া রে ও মোর, নীলা, সাজালাম বাঙ্গালা রে।
আমার দাড়ি-মাল্লা বস্যা ন্যায় দরমা রে।।
হাতের বাজু বেচ্যা রে ও মার, সাধু, দাড়ি-মাল্লারে দেবো রে।
তুমি আরো ছয়মাস রহিবা ও আমার ঘরে।।
পাতাজলে নাম্যা রে, ও মোর নীলা, পাতা মাজন করে রে।
আমার মনের কালি না গেল জনমে রে।।
হাঁটুজলে নামিয়া রে, ও মোর নীলা, হাঁটু মাজন করে রে।
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর-বাড়ি রে।।
বুক জলে নামিয়া রে, ও মোর নীলা, বুক মাজন করে রে।
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর-বাড়ি রে।।
থুথু জলে নামিয়া রে আমার নীলা থুথু মাজন করে রে।
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর-বাড়ি রে।।
ও সাধু বলে রে একেতে আশ্বিন মাসে নিশিভাগ রাতে।
নিশির শয়নে দেখি নীলা তুই বড় যুবতীরে।।
ও সাধু বলে রে—একেতে অঘ্রাণ মাসে মদনেরই বাড়ি।
আমার সর্বাঙ্গে তুল্যা দেবো অষ্টালঙ্কার।।
সাধু বলে রে—একেতে পৌষ মাসেরে দুগুণ পড়ে জার।
একেলা ঘুমাও নারী জোড়-মন্দিরার ঘর।।
ও নীলা বলে রে—এমন নারী নহে আমরা ঘুমাইয়া ভুলি।
পরে রে পুরুষ নিয়া খেলা নাহি করি।।
ও সাধু বলে রে, খিল খাড়্যা বাঁকমল দেশে পায়েতে পাসলী।
মাঞ্জাতে জিঞ্জিরা দেবো গলেতে হাঁসুলি।।
পরিধান বসন দেবো কামরাঙা সাড়ি।
দুই কানে ঝুল-বিস্তার দেবো সোনার মদন বাড়ি।।
ও নীলা বলে রে—শাশুড়ির দুর্লভ আমার সোয়ামীর পরাণ।
পর রে পুরুষ দেখি আমরা বাপ-ভাই-এর সমান।।
ও নীল বলে রে—একেতে মাঘমাসে গাছে গুয়া পাকা।
মোর সাধু আসবে দ্যাশে কর্‌বো আমি খেলা।।

২৪.*

ওরে শোন শোন বলছি পতি
যাই ও না বিদ্যাশে
পতি ছাইরা সতী নারী
ওরে কেমনে থাইকপো বোইসে।
ওরে তুমি থাইকপ্যা বিদ্যাশেতে
আমি বনবাস
গাছের ডালিম পাইক্যা সাধু
ওহারে মাটিতে পাইরবে রস।
ওরে আইজই খাইব্যা কাইলই আইব্যা
ওহে পান নাথ
দুঃখিনীকে রাইখ মনে ধরি তোমার হাত।

২৫.*

আষাঢ় মাসে আঁদলেতে
বোজাই নদীনালা
পোখ পাহালী বিজ্যা মরে
হারে কিন্যা দুক্কের জ্বালা
ওরে পুরুষেরা খানকায় বইসে
পাহায় নানান রসি
কেহ বানায় খালই টোপা
আবার কেউবা গান ধরিছে কসি,
ওরে মাইয়া লোকে রাইন্ধা বাইর‍্যা
খায় পান পাতা
কেহ বানায় ছিক্যা পাঙ্খা
কেহ শিলায় খ্যাঁতা।

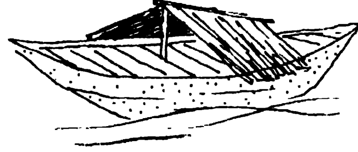
২৬.

নৈসর্গিক—

ও মশা রে—
তুমি দিনে থাক বাগবাগিচায় ফের ডালে ডালে।
পঞ্চস্বরে বাদ্য কর‍্যা আস সন্ধ্যাকালে
রে মশা তোর জ্বালাতে।।
মশার জ্বালাতে বৌঘরে দিল ধুম্যা,
ওরে তউরে আবাগে মশা গালে খাল চুম্যা,
মশার জ্বালাতে বউ চলল বাপের বাড়ি,
তউ না আবাগে মশা চল্‌ল সারি সারি—
পাগল করিলে বনের মশা রে।।
মশার কামড়ে বৌ জলে দিল ঝাপ।
চিত্যাল মাছে ঠোগ্‌ দ্যা নিল সুম্‌খির দুট্যা দাঁত।।
পাগল করিলি বনের মশারে।।
খাটখোট মশা রে লম্বা লম্বা দাড়ি,
কেমুন কর‍্যা চিনলি মশা তেতুল গাছ্যা বাড়ি ;
খাটোখোট মশা রে মুখে চাপ দাড়ি।
কেমুন কর‍্যা চিনলি মশা দালান অওলা বাড়ি।।
কলকাতার থ্যা আল রে মশা সোনা বান্ধা ঠোঁট।
যেখানেতে দেয় রে কামড় যেন তরালিরই চোট।।
পাগল করিলি বনের মশা রে।।
আগান্যা বাগান্যা মশা চল্‌ল সারি গোনা।
ওরে সকল যায়্যা থুয়্যা মশা ধরল চালের কোনা।।
ডাকাতিয়া আল রে মশা লম্বা লম্বা ঠোঁট।
মশার কামড় না কুড়্যালেরই চোট।।
পাগল করিলি বনের মশা রে।।

চিহ্নিত রচনা ঃ বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার—পাবনা—১৯৯০ থেকে উদ্ধৃত।

বিবিধ



১. সিরাজগঞ্জে আর্য ধর্ম প্রচারণী সভা ঃ

শোচনীয় হিন্দু ধর্মের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে সিরাজগঞ্জের হিন্দুবর্গের অসাধারণ অনুরাগ লক্ষিত হয়। শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান যাহাতে স্থিরতর থাকে ও হিন্দুসমাজ গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান কোন হিন্দু না করে, তদর্থে তাহারা বিশেষ উদ্যোগী ও যত্নবান। হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ মদ না খায়, শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কোন দ্রব্য কেহ ভক্ষণ না করে ও সন্ধ্যাগায়ত্রী প্রভৃতি নিত্যক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান সকলেই করে তন্নিমিত্ত তাহাদের মধ্যে বিশেষ শাসন আছে। কেবল শাসন বাক্যেই কার্য হয় না, উপদেশেরও আবশ্যক। একারণ তাহাদের যত্নে দুই বৎসর হইল সিরাজগঞ্জে একটি "আর্যধর্ম প্রচারিণী" সভা স্থাপিত হইয়াছে।

এই সভার উন্নতির নিমিত্ত সিরাজগঞ্জের হিন্দুমাত্রেরই আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতি রবিবারেই এই সভায় অধিবেশন হইয়া থাকে। প্রতি সভায় শতাধিক হিন্দুর সমাগম হইয়া থাকে। সভাধিবেশনের পূর্বে অপরাহ্নে প্রথমতঃ সিরাজগঞ্জের পাড়ায় হরিসঙ্কীর্তন হয়, পরে সন্ধ্যার সময় সঙ্কীর্তন সম্প্রদায় সকল সভায় উপস্থিত হইয়া হরি সঙ্কীর্তন করে। তৎপর সভার আচার্য শ্রী রামরত্ন শিরোমণি মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও অর্থ করেন। শিরোমণি মহাশয় সাধারণের বোধগম্য করন অভিপ্রায়ে যেরূপ সরল ও মিষ্ট ভাষায় ভাগবতের অর্থ করেন, তাহাতে শ্রোতৃবর্গ মাত্রেই চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় আনন্দের উদ্রেক হয়। এতদ্ব্যতীত প্রায় রবিবারের সভাতেই ধর্ম বিষয়িণী লিখিত ও বাচনিক বক্তৃতা হইয়া থাকে।

এই সভার নিমিত্ত ইষ্টক নির্মিত একটি সুদৃশ্য গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। আগামী ২১এ, ২২এ ও ২৩এ মাঘ ঐ গৃহ প্রবেশোপলক্ষে এ সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।-ভারতবর্ষীয় আর্যধর্ম প্রচারিণী সভার সুযোগ্য সম্পাদক বিখ্যাত বক্তা পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়েরা ঐ মহতী সভায় আগমনপূর্বক বক্তৃতা করিবেন এবং দীন দুঃখী লোকের আহারার্থ মহোৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠান হইতেছে। ফলতঃ সভার এই বার্ষিক উৎসবের নিমিত্ত এ অঞ্চলের হিন্দু-মাত্রেই মাতিয়া উঠিয়াছেন।

* পত্রপ্রেরক আমাদের সুপরিচিত, তাহার কথায় আমাদের আস্থা আছে, তিনি স্বয়ং কিম্বা অন্য কেহ আমাদেব পত্র প্রেরক ও সংবাদদাতার যথাযথ প্রতিবাদ কবিবেন। আমরা আহ্লাদের সহিত আমাদের মন্তব্যসহ প্রকাশ করিব। —সম্পাদক।

সভার ঐ নূতন গৃহ নির্মাণার্থ এ প্রদেশীয় হিতৈষী ব্যক্তিগণ প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। স্থানাভাব প্রসূত তন্মধ্যে কয়েক ব্যক্তির দান আপনকার পাঠকবর্গের বিদিতার্থ নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

দান

দাতৃবর্গের নাম	স্বীকৃত দান	এতক আদায়
শ্রীযুক্তা ব্রজেশ্বরী চৌধুরাণী ও	১০০০৲	৭৭৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী রায় জমিদার		
স্থলের পাকড়াশিবাবুরা	২০০৲	১৮২৷৷৲
শ্রীযুক্ত হাফেজ মহম্মদ আলি খাঁ জমিদার	২০০৲	২০০৲
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর মুন্সি জমিদার	১৫০৲	১০০৲
শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন বলরাম চন্দ্রশিখর উদয়চাঁদ,		
কানাইলাল জগবন্ধু শাহ	১২৫৲	১২৫৲
মিঃ এসেস্টার ম্যাগডোলেন সাহেব মোঃ সিরাজগঞ্জ	১০০৲	১০০৲
শ্রীযুক্ত বংশীবদন আনন্দমোহন সাহাচৌধুরী নিঃ শয়দাবাদ	১০০৲	১০০৲
দত্তহাটার ভট্টাচার্য স্টেট	১৯০৲	১০০৲
শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রাধাবল্লভ, মোঃ সিরাজগঞ্জ	৮০৲	৮০৲
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাস, মোঃ সিরাজগঞ্জ	৭৫৲	৭৫৲
শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর হরিদয়াল রামদয়াল		
বটেশ্বর পীতাম্বর মহিমচন্দ্র প্রামাণিক, মোঃ সিরাজগঞ্জ	৭৫৲	৭৫৲
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দত্ত, মোঃ ঐ	৫০৲	৫০৲
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু রায় নিঃ বাগবাড়ি	৫০৲	৫০৲
শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ ভীমচরণ রায়, মোঃ সিরাজগঞ্জ	৫০৲	৫০৲
শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী নিঃ শন্তশ		
শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রঘুনাথ সুবলচন্দ্র চৌধুরী, মোঃ সিরাজগঞ্জ	৫০৲	৫০৲
শ্রীযুক্ত রোহিনীকান্ত তালুকদার, মোঃ বেটগৈর	৫০৲	৫০৲
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সাহা, মোঃ সিরাজগঞ্জ	৫০৲	৫০৲
শ্রীযুক্ত দরবার বনমালী ও দ্বারকানাথ সাহা, মোঃ ঐ	৫০৲	৫০৲
শ্রীযুক্ত হরিদয়াল সিংহ। মিঃ সিমলা	৫০৲	৫০৲
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী জমিদার নিঃ পোরজনা	৪০	৪০

—হিন্দু রঞ্জিকা ১৮৮৮ জানুয়ারি ২৫

২. পাবনা জেলার প্রজাবিদ্রোহ ঃ

একটি গান

রাগিণী কালেংড়া, তাল তেতালা

কি বিদ্রোহী পরিত্রাহী বাপ্‌রে ও বাপ্ মলেম মলেম।
কি তামাসা, সকল চাষা, ভেবেছিল রাজা হলেম।।
হাতে পলো, কাঁধে লাঠি, লোটে যত ঘটি বাটি,
মাংনা খাব রাজার মাটি, ভয়ে ভীরু অবাক হলেম।
দেশের যত ব্রাহ্মণ ভদ্র, তারা কি আর আছে ভদ্র
বিদ্রোহীর দল দেখা মাত্র, নজর আর বাজায় সেলাম।।

[গীত কৌমুদী—উমাচরণ। চাটমোহর জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮১ বৈশাখ ২৮]

অবণীচরণ চৌধুরী

—প্রবাসী ১৩২১ শ্রাবণ

সম্পাদনা প্রসঙ্গে

অবিভক্ত বাংলার গুরুত্বপূর্ণ জেলা পাবনা আজও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত। উত্তর বাংলার এই সমৃদ্ধ জেলাটির অস্তিত্ব বারবার বিপন্ন হলেও, কৃষি ও বাণিজ্যে পাবনার সমৃদ্ধি অম্লান। ইতিহাসের পাতা খুঁজেও প্রাচীন সভ্যতার কোন নিদর্শন এখানে আবিষ্কার করা সম্ভব না হলেও, নবাবী আমলের সমৃদ্ধ জনবসতির বহু নির্দশন এখানে আবিষ্কার করা সম্ভব না হলেও, নবাবী আমলের সমৃদ্ধ জনবসতির বহু নির্দশন ছড়িয়ে আছে আজও। হিন্দু মুসলমান উভয়সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘদিন এক সুন্দর পরিবেশে বসবাস করে এসেছে। পাশাপাশি তাদের সহাবস্থানও ছিল ঈর্ষণীয়। হিন্দু জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আনুকূল্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। তুলনামূলকভাবে মুসলমান সম্প্রদায় সে সময়ে বেশ পিছিয়েই পড়েছিল। আজকের ইতিহাস সব বদলে দিয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায় অনেক অগ্রসর, সুশিক্ষিত এবং আধুনিকমনস্ক। দেশ গঠন, সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে, প্রশাসনিক কাজকর্মে, জীবনের সার্বিকক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

১৩৩০-৩৩ সালের মধ্যে রাধারমণ সাহার "পাবনা জেলার ইতিহাস" প্রকাশিত হয়েছিল ৬ খণ্ডে। আজ শুনলে অনেকেই অবাক হবেন, সে সময়ে ৬টি খণ্ডই ছাপা হয় পাবনায়। বইয়ের পাণ্ডুলিপি হাতে করে লেখককে কলকাতার মুদ্রাকরদের দরজায় ঘুরতে হয়নি। কী অপরিসীম পরিশ্রমে এই সুবিশাল গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল তা বইটি না পড়লে বুঝে ওঠা দুষ্কর। গ্রন্থকার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাছাড়া ছিল সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রকাশিত তথ্যের সন্ধান। কী বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা লেখক ব্যবহার করেছিলেন, তার উল্লেখ আছে যথাস্থানে।

এ পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে, তার মধ্যে বর্তমান গ্রন্থখানি অন্যতম ও উৎকৃষ্ট মানের বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে নতুন নতুন বই লেখা হয়েছে ; বিশেষ করে স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাবের পর আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার ফলে, জানা যাচ্ছে, হারিয়ে যাওয়া, ফেলে আসা দিনগুলি সম্পর্কে নানান তথ্য। আধুনিক বিশ্লেষণে যত নতুন তথ্যই উদঘাটিত হোক না কেন, রাধারমণ সাহার "পাবনার ইতিহাস" আজও অপরিহার্য।

মহাভারতীয় যুগ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল পর্যন্ত লেখকের আলোচনা সীমাবদ্ধ। তারপর ইতিহাসের পাতা বদলে গেছে অনেকখানি। পাবনার জনজীবনও। বর্তমান বইখানি পড়বার সময় সেকথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। সেকারণেই সংযোজন অংশে সম্প্রতিকালের কিছু তথ্য সংযোজন করে সম্পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

রাধারমণ সাহার 'পাবনা জেলার ইতিহাস'কে কেবলমাত্র একটি জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস হিসাবে গণ্য করা উচিত হবে না। জেলার ইতিহাস প্রসঙ্গে বাংলার ইতিহাসের প্রবহমান ধারার বিবরণ দিয়েছেন লেখক। তথ্যের ঘাটতি থাকতে পারে, কিছু অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে ; কিন্তু তিনি ইতিহাসকে যথাযথ রাখবার প্রয়াস পেয়েছেন। কোন বিকৃতি বা অসত্য ভাষণ নেই।

তৎকালীন শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত মৌলবি মোখতার আহমদ সিদ্দিকী ছিলেন চট্টগ্রামের [illegible]য। কর্মসূত্রে ছিলেন সিরাজগঞ্জে। ঐ অঞ্চল সম্পর্কে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই লিখেছিলেন 'সিরাজগঞ্জের ইতিহাস'। সীমিত পরিসরে এমন মূল্যবান রচনা সাধারণত দেখা যায় না। তাঁর লিখিত বিবরণে বহু প্রাচীন স্থান, ব্যক্তি এবং আঞ্চলিক বিবরণ,

মানুষ, জীবিকা, ধর্মীয় উৎসব, সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়। গুরুত্বের দিক থেকে "সিরাজগঞ্জের ইতিহাস" আজও অপরিহার্য। বর্তমান সংকলনে এই বইটিও মুদ্রিত হল।

বাংলা আকাদেমি প্রবর্তিত বানান রীতিকে যথাসম্ভব অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই সময়ের পাঠকের সামনে সেকালের বানানগত জটিলতাকে আমরা পরিহার করেছি। যার ফলে পাঠক কোথাও বাধা না পেয়ে স্বচ্ছন্দে পড়তে পারবেন।

দে'জ পাবলিশিং-এর উদ্যোগে বাংলার ইতিহাসের দুষ্প্রাপ্য রচনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে। কয়েকখানি বেরিয়েছে। আরও বই প্রকাশের অপেক্ষায়। পাঠক সাধারণ ও বিভিন্ন জেলাবাসীর সহযোগিতা আমাদের এই উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করেছে। সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

১৩৩ বিবেকানন্দ সরণি
কুলুপুকুর। বারাসত
২৪ পরগণা উত্তর
দূরভাষ : ২৫৬২-৪৯৫৯

কমল চৌধুরী

নির্ঘণ্ট

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৩৯, ১৪১
অনুখার দিঘি ১৯৯
অবলোকিতেশ্বর ১১১

আজিমউদ্দিন চৌধুরী ২৫৪
আজিম ওশমান ১৩৫, ১৩৬
আটঘরিয়া ৪৪৫
আদিশূর ২০
আনন্দ গোবিন্দ লাইব্রেরী ৬৫৬
আফজল মহম্মদ ২৫৯
আবদুল মহম্মদ শাহ ৫৪৭
আরঙ্গজেব ১৩৪, ১৪১
আ'লিবর্দি ১৪২
আশুতোষ চৌধুরী ১৬৭, ৩৯২
আসল তুমার জমা ১৩৫

ইলিয়ট ব্রিজ ৮৬, ৫৭৭
ইমারসন ব্রিজ ৮৬

ঈশ্বরদি ৬৬২
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৬৫১

উত্তরে হাওয়া ৩২
উধুনিয়া ৪৫২
উল্লাপাড়া ৪৫০

এডওয়ার্ড লাইব্রেরী ৬৬১

ওনেলি ১৫০

কপালি ৪৮০
কপিলেশ্বর শিবমন্দির ১৯৩
কমল খাঁ ১৩২, ২২১
কর্কটনাগ ১১০
কলকুঠি ৫৭৫
কাওয়া খোলা ৪৪১
কাজিপুর ৪৪২
কাটার বাড়ি ৪৪৯
কাটা ঠাকুরাণী ১৯৮
কাদিরা ভূত ৫৮০
কানিংহাম ২২
কায়স্থ ৪৮১
কালাচাঁদ বিগ্রহ ৩৬৪
কালাপাহাড় ১২৯, ১৩০
কালিকাপুরাণ ৪৫
কালীকান্ত বিশ্বাস ৫৫
কালীচরণ সান্যাল ২৬৩
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫, ১৩৯, ১৫১
কুড়িটাকার গাঁতি ৪৩৯
কুমুদনাথ চৌধুরী ৩৯১
কুম্ভকার ৪৮৩
কেদারনাথ ব্রহ্মচারী ২০০
কেদারনাথ মজুমদার ১৫৭
কৈবর্ত ৪৮৩
কৈবর্ত বিদ্রোহ ১১৫
কোহিত ৪৪৬
কৃষ্ণচরণ মজুমদার ২২
কৃত্তিবাসী রামায়ণ ১৯, ৪০
ক্রীড়া ৫১৩

খুলনা ৫৪
খোয়াজদিঘি ১২০

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ১৯
গন্ধবণিক ৪৮৫
গাড়াদহ ৪৫৫
গোপালদেব ১১৩
গৌড়রাজমালা ১১৫

চটাধর নাগ ১১০
চন্দ্রগুপ্ত ১০৭
চলনবিল ৫২, ৬০
চান্দাইকোণা ৪৪৪
চাঁড়াল ১০৫
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৫৭৩

চৈতন্য মহাপ্রভু ১২৩
চৈত্রহাটি ৪৫২
চৌহালি ৪৫৭

ছয়কুড়ি পুকুর ১৮৫
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ১৫৫

জগৎশেঠ ১২১, ২০৩, ৫৪৯
জগন্নাথের মন্দির ১৯২
জঙ্গীপীর ৫৫৪
জমা কামেল তুমারী ১৩৫
জয়চন্দ্র ঠাকুর ৩৪৫
জয়শঙ্কর সান্যাল ২৬৪
জয়সাগর ৬৫৭
জামতৈল ৪৫৩
জালালউদ্দিন ১২২
জাহাঙ্গীর ৫৫
জে. এল. দাশগুপ্ত ৪৯

টোডরমল্ল ১৩১, ১৩৫

ঠাকুর শম্ভুনাথ ৩৪০, ৫০২

ঢাকুর ২২, ১১৬, ১৩১

তন্তুবায় ৪৮৬
তাড়াস ৬৬৩
তারাসুন্দরী ১০৯
তারিণীচরণ ঠাকুর ১২১
তালনবমী ৩৭১
তিলি ৪৮৭

দিগম্বর ১০৮
দ্বিত্বশাসন ১৫৪
দীনেশচন্দ্র সেন ৩৬
দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ১১৬, ১৩০
দুর্ভিক্ষ ৬০৮
দেবীদাস ৪৯২
দৌলতপুর ৪৬০

ধর্মপালদেব ৪৭১
ধান ৫৭০
ধানঘরা ৪৪৩
ধোবা ৪৮৮

নগেন্দ্রনাথ বসু ৫৩, ৭৫, ১০৯, ১১৩, ১১৭, ২০৪
নবগ্রাম ৪৫০, ৬৬১
নবশাক ৪৭৩
নবরত্ন মন্দির ১৮৮
নবাব সামসউদ্দিন ১২১
নবীনচন্দ্র সেন ১৮৮
নমঃশূদ্র ৪৮৮
নরহরি দাস ১১৭
নসরৎ শাহ ১৮১
নাগার্জুন ১০৯
নাড়ামুড়া ১১২
নিখিলনাথ রায় ৩৮, ১৩৬
নিমগাছি ৪৪৭, ৬৫৭
নীলবিদ্রোহ ১৬৩
নেদু আকন্দ ৫৮৮
নেমিমনাথ ১০৭

পঞ্চসন বন্দোবস্ত ১৫৯
পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৪, ১০৬
পলোনাথ কোম্পানি ২৩১
পাঙাসি ৪৪৪
পাট ৫৬৬
পাটনি ৪৯০
পাঠানপাড়া ৬৬৩
পাণ্ডব ১৭
পার্শ্বনাথ ১০৭
পিপুলবাড়িয়া ৪৪০
পীরসাহেবের দরগাহ ১৮৫
পুণ্ড্রদেশ ২০
পুরাণ হাওয়া ৩১
পৌণ্ড্রবর্ধন ১৯-২২, ১০৫
পৌষনারায়ণী মেলা ৪৯
প্রজাবিদ্রোহ ১০২, ১৬৪, ৫৭৪, ৬০৮
প্রভাসচন্দ্র সেন ১০৯, ১২১
প্রমথনাথ চৌধুরী ৩৯২
প্রাগজ্যোতিষ ১০৪

ফাল্গুনে বাও ৩২
ফ্রেডারিক হ্যালিডে ১৬৩

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৪, ১২৯, ১৫৫, ১৫৭, ৪৭০, ৪৭১
বনওয়ারিলাল রায় ২৪৪
বর্গীর হাঙ্গামা ১৫১
বাখরগঞ্জ ৩০
বয়রা ৪৪২
বলরাম দাস ৬৬৩
বাগবাটি ৪৩৭
বারুই ৪৯৩
বারুহাম ৪৪৯
বাঁওর ৫৮
বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী ২২৬, ২৫০
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১১৮
বিজয়সেন ১১৬
বিগ্রহপাল ১১৫
বিশ্বকোষ ১৯, ২০, ২৬
বুকানন হ্যামিলটন ৬৫৯
বুড়াপীরের দরগা ১০৩
বুদ্ধদেব ১০৭
বেণী রায় ১৩০, ১৩৯
বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ২৬৩
বৈষ্ণব ৪৯৭
বৈদ্য ৪৯৫
ব্রতপূজাদি ৫১৪
ব্রাহ্মণ ৪৯৬

ভাগিনেয়ের মসজিদ ১৮২, ১৮৩
ভানুসিংহ ১৩১
ভিনসেন্ট স্মিথ ১০৬
ভীমওঝা ৪১২
ভীমের জাঙ্গাল ৭৫, ২০৫
ভেষজ উদ্ভিদ ৬৮৪
ভুইয়া গাঁতি ৪৪৫
ভৃগু নন্দী ১১০, ১১৭, ১২০, ৪৫৬

মইজউদ্দিন ১২৯
মনমোহন চক্রবর্তী ১০৭
মওলাশ কারামত আলি সাহেব ৫৮০
মক্‌দুম্‌ সাহেব ১৭৭, ৪৫৪, ৪৫৫, ৫৫৪
ময়দান দিঘি ১০৩
মরিচপুরাণ ১৩০
মহম্মদ বক্তিয়ার ১২০
মহাবীর ১০৭
মহাস্থানগড় ১১২
মহিমচন্দ্র সরকার ৩৭১
মানসিং ১৩৯
মাৎস্যন্যায় ১১৩
মামার মসজিদ ১৮২, ১৮৩
মালগুজারি ১৩৫
মালি ৪৯১
মালো ৪৯১
মাসুম খাঁ ১২৫, ১২৬, ১৮০
মীরকাশিম ১৫৪
মুচিচামার ৪৯১
মুকুন্দ দাস ৬৬০
মুণ্ডা ৪৯৩
মুর্শিদকুলি খাঁ ১৩৫, ১৩৬, ২৩৮, ২৬০
মুতাক্ষরীণ ১৩৬
মুসলমান ৫০১
মোহনপুর ৪৫১
মিঃ গেট ৩৯, ৪৭
মিঃ গেল ৮৫
মিঃ ভি. জি. টেলার ২৩৩
মিঃ বেরি ৫৭৫
মৌলবি আবদুলওয়ালী ১৭৮

যদুনাথ সরকার ১০৪, ১২৫, ১৩২
যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ৩৪২
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ৩৯২

রঘু রায় ১৩৩
রবীন্দ্রনাথ ৬৫৯-৬২
রমাপ্রসাদ চন্দ ১১৫
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১১২, ১১৪, ১৮৩
রাজমহল ৫৫, ৮২, ১৩৪
রাজবংশী ১১৫
রাজবল্লভ চৌধুরী ২৪৮
রাজাগণেশ ১২২
রাজা দেবীদাস ১২৪

রাজা রায় ১৩৩
রাজা সীতারাম রায় ১৪০
রাণীগ্রাম ৪৪২
রাণী ভবানী ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৫৬, ১৫৯, ২৬১
রাণী সর্বাণী ১৩৮, ১৩৯
রামনাথ ভাদুড়ি ১৯০, ১৯১
রামশঙ্কর ভাদুড়ি ২৫৭
রায়গঞ্জ ৪৪৩
রেনেল সাহেব ৪৪, ৬৬, ১৫০, ৪৩০

লক্ষণাবতী ১২০
লর্ড ক্লাইভ ১৪৯

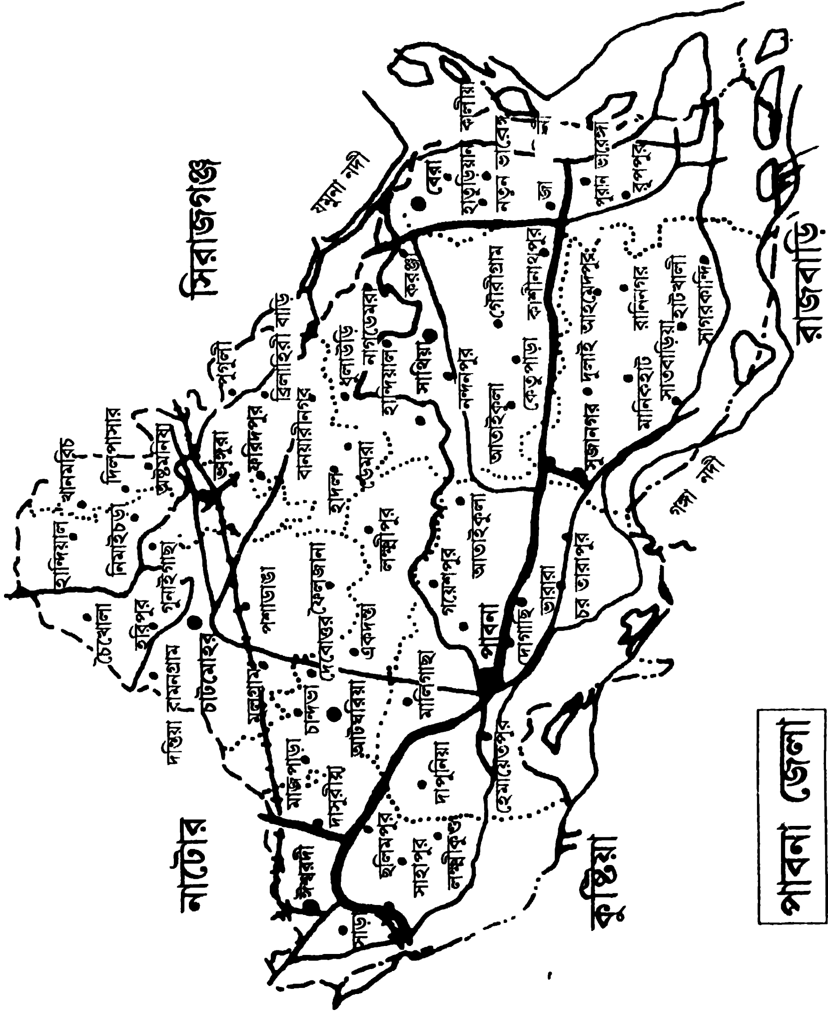
শঙ্খাসুর ১৯
শব্দকল্পদ্রুম ৪৯
শম্ভুনাথ চৌধুরী ২৫৬
শশিভূষণ দাস ১৮
শাহ কামালের দরগাহ ১৮৬
শাহজাদপুর ৪৫৩
শাহমস্তান ৬৫৮
শাহীপথ ২০৬
শাহনুরের দরগাহ ১৮৬
শাহহবিবুল্লাহ ৬৫৮
শুকদেব তালুকদার ২৪১
শুকদেব সেন ২০
শেঠের বাঙ্লা ১৯৪
শেরশাহ ১২৪
শ্বেতাম্বর ১০৮

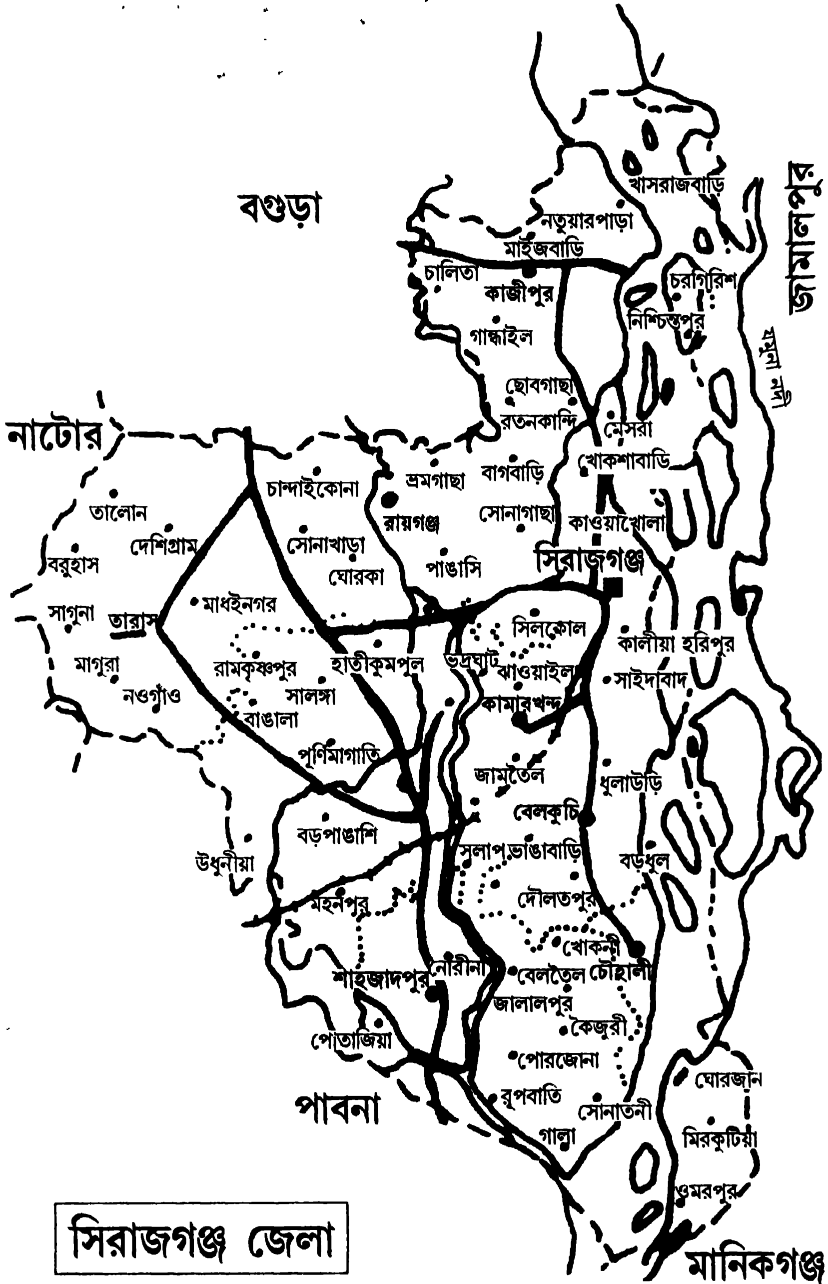
সতী বিবির খাল ১৭৯, ৬৫৮, ৬৫৯
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১৫৬
সদিয়া চাঁদপুর ৪৫৯
সৈয়দাবাদ ৪৪১
সরফরাজ ১৪২, ১৪৭
সলপ ৪৫২
সলঙ্গা ৪৫১
সংবাদপ্রভাকর ৬৫১—৫৫
সাহা ৪৯৭
সিদ্ধেশ্বরী পূজা ১১৪
সিপাহী বিদ্রোহ ১৬৩
সিরাজ-উদৌল্লা ১৪৮, ১৫২
সিরাজালী চৌধুরী ২৫৯, ২৬০, ৪৩০, ৫৪৮
সুবর্ণ বণিক ৫০০
সুজাউদ্দীন ১৪৭
সুবুদ্ধি খাঁ ১৩২, ২২১
সুরাজ ১৮, ১৯
সুলেমান কেরানি ১২৫
সূত্রধর ৫০০

সেকেন্দরীগঞ্জ ১৮০

সোনামুখী ৪৪৩
সোহাগপুর ৪৫৭
স্বামী বিবেকানন্দ ১১৯
স্থল ৪৫৭
স্যর জন ক্যাম্ববেল ৫৭৬

হরগোপাল দাস ৪০, ৪৯
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১১০
হর্ষদেব ১১২
হার্ডিঞ্জ ব্রিজ/সাড়া ব্রিজ ৩৬, ৭৪, ৮০
হান্টার ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯৮
হেস্টিংস ১৫৮
হোসেন শাহ ১২২, ১২৩
হাটিকামরুল ৬৫৭


পাবনা জেলা
সিরাজগঞ্জ
নাটোর
কুষ্টিয়া
রাজবাড়ি
যমুনা নদী
গঙ্গা নদী
পাবনা


বগুড়া
নাটোর
জামালপুর
যমুনা নদী
খাসরাজবাড়ি
নতুয়ারপাড়া
মাইজবাড়ি
চালিতা
কাজীপুর
চরগিরিশ
নিশ্চিন্তপুর
গান্ধাইল
ছোবগাছা
রতনকান্দি
মেসরা
খোকশাবাড়ি
চান্দাইকোনা
ভ্রমগাছা
বাগবাড়ি
রায়গঞ্জ
সোনাগাছা
কাওয়াখোলা
তালোন
দেশিগ্রাম
বরুহাস
সোনাখাড়া
ঘোরকা
পাঙাসি
সিরাজগঞ্জ
সাগুনা
তাড়াশ
মাধইনগর
সিলকোল
কালীয়া হরিপুর
মাগুরা
রামকৃষ্ণপুর
হাতীকুমপুল
ভদ্রঘাট
ঝাওয়াইল
সাইদাবাদ
নওগাঁও
সালঙ্গা
বাঙালা
কামারখন্দ
পূর্ণিমাগাতি
জামতৈল
ধুলাউড়ি
বেলকুচি
বড়পাঙাশি
উধুনীয়া
সলাপ
ভাঙাবাড়ি
বড়ধুল
দৌলতপুর
মহনপুর
খোকনী
শাহজাদপুর
নৌরীনা
বেলতৈল
চৌহালী
জালালপুর
কৈজুরী
পোতাজিয়া
পোরজোনা
ঘোরজান
পাবনা
বৃপবাতি
সোনাতনী
মিরকুটিয়া
গালা
ওমরপুর
মানিকগঞ্জ
সিরাজগঞ্জ জেলা

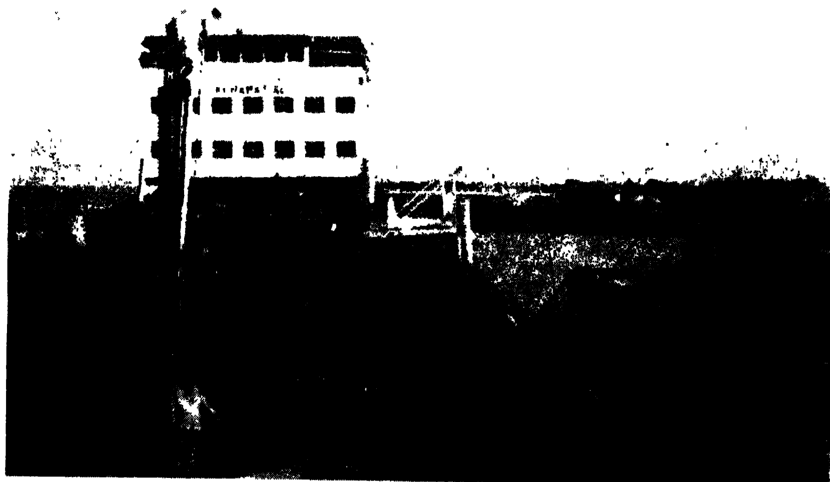


মখদুম শাহ দৌলা শহীদ মসজিদ, শাহজাদপুর





হার্ডিঞ্জ ব্রীজ, পাকশী



ফেরীঘাট, নগরবাড়ি, উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রবেশদ্বার



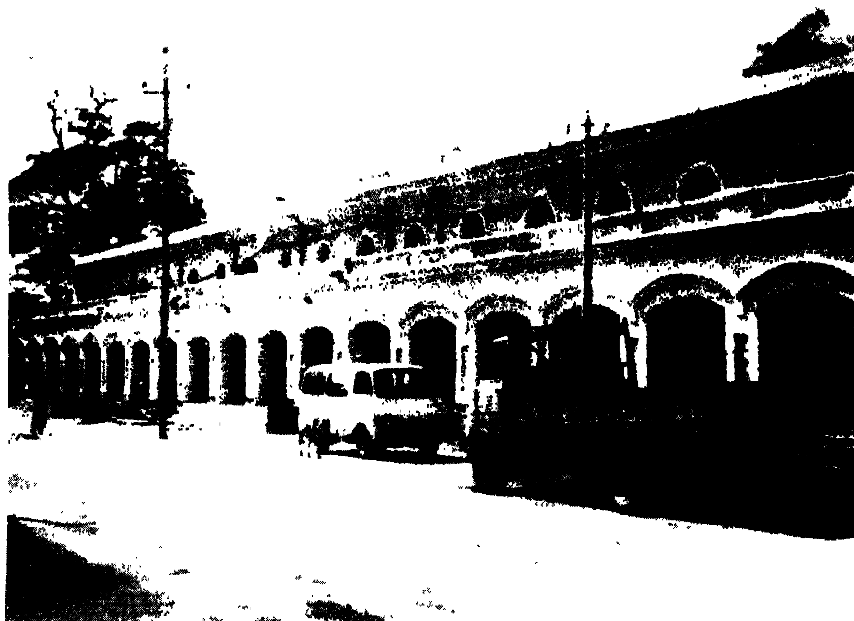
এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাবনা



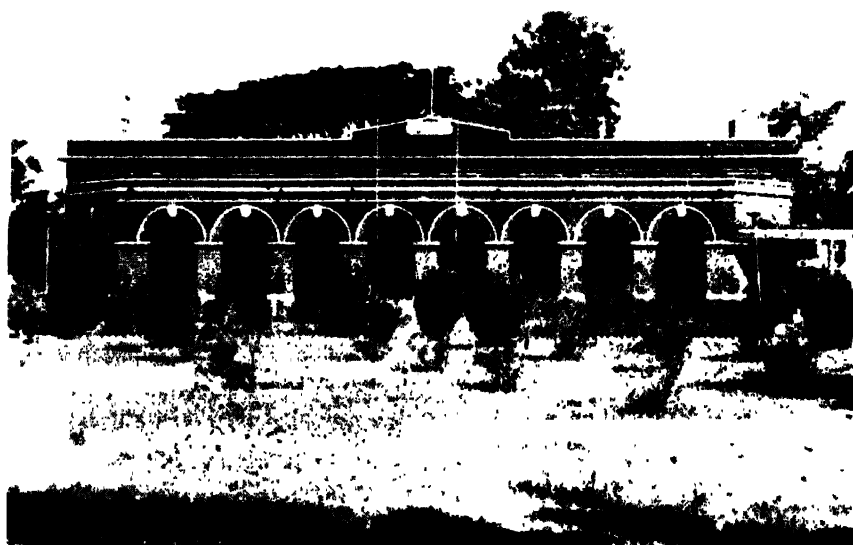
অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, পাবনা



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাচারি বাড়ি, শাহজাদপুর



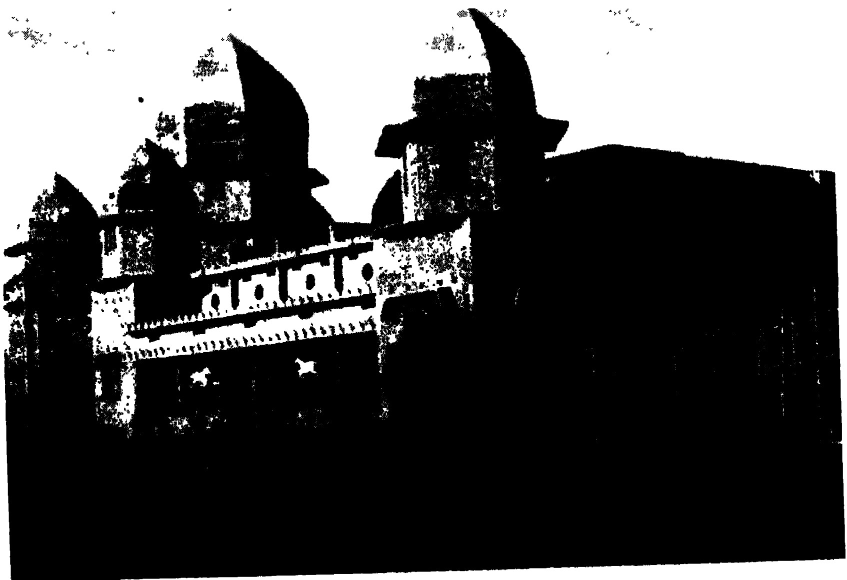
কালেক্টরেট ভবন, পাবনা



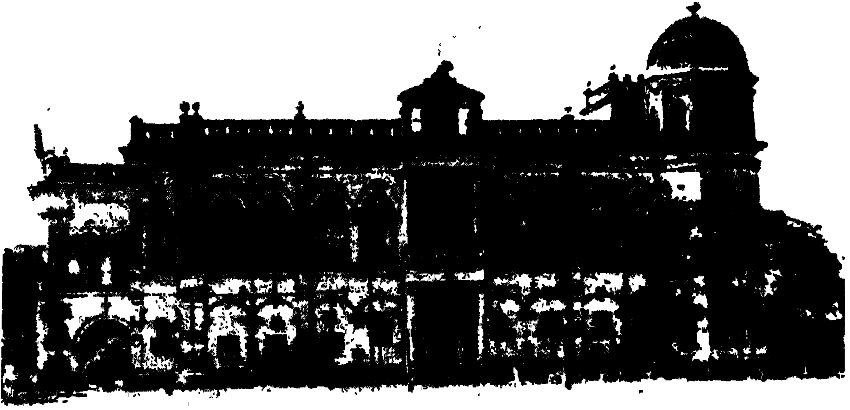
সার্কিট হাউজ, পাবনা



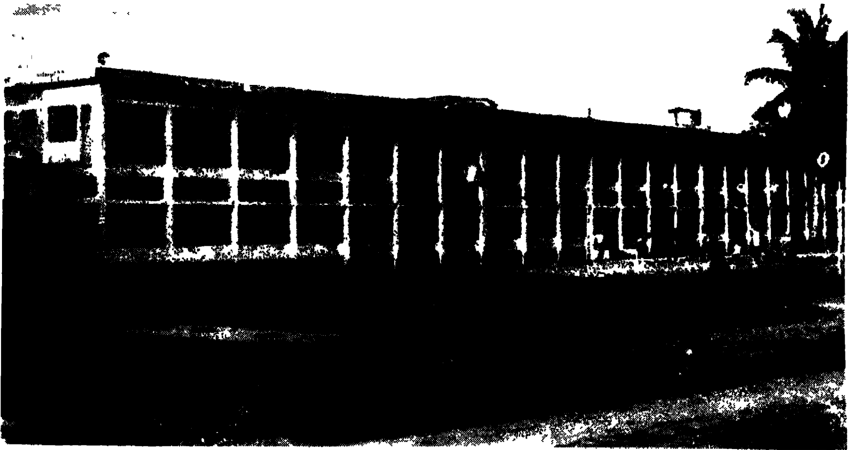
ক্যাডেট কলেজ, পাবনা



অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম, হেমায়েতপুর



শীলতাই জমিদার বাড়ি, বর্তমানে এডরুক ঔষধ কারখানা



সদর হাসপাতাল, পাবনা



জেলা পরিষদ, পাবনা



পৌরসভা, পাবনা